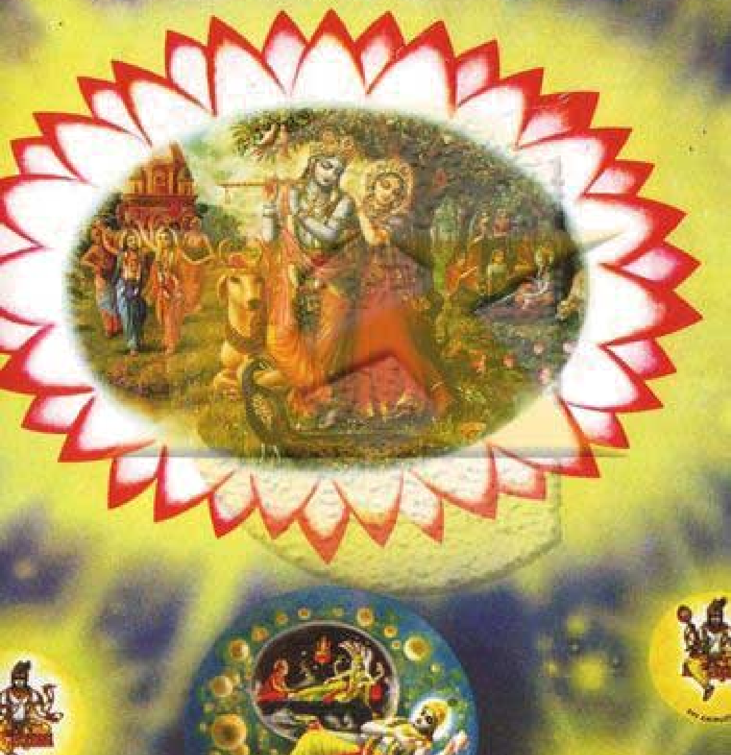
শ্রীমদ্ভাগবত

প্রথম স্কন্ধ



কৃষ্ণকৃপাশ্রীমূর্তি

শ্রীল অভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ

শ্রীমদ্ভাগবত

প্রথম স্কন্ধ

"সৃষ্টি"

কৃষ্ণকৃপাশ্রীমূর্তি শ্রীল

অভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ

আন্তর্জাতিক কৃষ্ণভাবনামৃত সংঘের প্রতিষ্ঠাতা ও আচার্য

কর্তৃক

ভগবৎ ধর্মের আদর্শ প্রচারক শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর সংক্ষিপ্ত জীবনী,
মূল সংস্কৃত শ্লোক, শব্দার্থ, অনুবাদ এবং বিশদ তাৎপর্যসহ ইংরেজি
SRIMAD BHAGABATAM গ্রন্থের বাংলা অনুবাদ

অনুবাদক : শ্রীমদ্ ভক্তিচারু স্বামী

ভক্তিবেদান্ত বুক ট্রাস্ট

শ্রীমায়াপুর, কলিকাতা, বোম্বাই, নিউইয়র্ক, লস্ এঞ্জেলেস, লণ্ডন, সিডনি, প্যারিস, রোম, হংকং

প্রথম অধ্যায়

ঋষিদের প্রশ্ন

শ্লোক ১

ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায়
জন্মাদ্যস্য যতোঽন্বয়াদিতরতশ্চার্থেষ্বভিজ্ঞঃ স্বরাট্
তেনে ব্রহ্ম হৃদা য আদিকবয়ে মুহ্যন্তি যৎসূরয়ঃ।
তেজোবারিমৃদাং যথা বিনিময়ো যত্র ত্রিসর্গোঽমৃষা
ধাম্না স্বেন সদা নিরস্তকুহকং সত্যং পরং ধীমহি ॥ ১ ॥

ওঁ—হে ভগবান; **নমঃ**—আমি আমার প্রণতি নিবেদন করি; **ভগবতে**—পরমেশ্বর ভগবানকে; **বাসুদেবায়**—(বসুদেবের পুত্র) বাসুদেবকে, অথবা আদি পুরুষ শ্রীকৃষ্ণকে; **জন্ম-আদি**—সৃষ্টি, স্থিতি এবং প্রলয়; **অস্য**—প্রকাশিত ব্রহ্মাণ্ড সমূহের; **যতঃ**—যাঁর থেকে; **অন্বয়াৎ**—সরাসরিভাবে; **ইতরতঃ**—ব্যতিরেকভাবে; **চ**—এবং; **অর্থেষু**—অর্থসমূহ; **অভিজ্ঞঃ**—সম্পূর্ণরূপে অবগত; **স্বরাট্**—সম্পূর্ণরূপে স্বাধীন; **তেনে**—প্রকাশ করেছিলেন; **ব্রহ্ম**—বৈদিক জ্ঞান; **হৃদা**—হৃদয়ের বুদ্ধিবৃত্তি; **য**—যিনি; **আদিকবয়ে**—ব্রহ্মাকে; **মুহ্যন্তি**—মোহাচ্ছন্ন; **যৎ**—যার সম্বন্ধে; **সূরয়ঃ**—মহান্ ঋষিরা এবং দেবতারা; **তেজঃ**—অগ্নি; **বারি**—জল; **মৃদাং**—মাটি; **যথা**—যেভাবে; **বিনিময়ঃ**—পরস্পর মিশ্রণ; **যত্র**—যার ফলে; **ত্রিসর্গঃ**—প্রকৃতির তিনটি গুণ; **অমৃষা**—সত্যবৎ; **ধাম্না**—সমস্ত অপ্রাকৃত বৈশিষ্ট্য সহ; **স্বেন**—স্বয়ং সম্পূর্ণরূপে; **সদা**—সব সময়; **নিরস্ত**—নিবৃত্ত; **কুহকম্**—কুহক; **সত্যম্**—সত্য; **পরম্**—পরম; **ধীমহি**—আমি ধ্যান করি।

অনুবাদ

হে বসুদেব তনয় শ্রীকৃষ্ণ, হে সর্বব্যাপ্ত পরমেশ্বর ভগবান, আমি আপনাকে আমার সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি। আমি শ্রীকৃষ্ণের ধ্যান করি, কেননা তিনি হচ্ছেন প্রকাশিত ব্রহ্মাণ্ড সমূহের সৃষ্টি, স্থিতি এবং প্রলয়ের পরম কারণ। তিনি প্রত্যক্ষ এবং

পরোক্ষভাবে সব কিছু সম্বন্ধে অবগত, এবং তিনি সম্পূর্ণভাবে স্বাধীন, কেননা তাঁর অতীত আর কোনও কারণ নেই। তিনিই আদি কবি ব্রহ্মার হৃদয়ে সর্বপ্রথম বৈদিক জ্ঞান প্রদান করেছিলেন। তাঁর দ্বারা মহান্ ঋষিরা এবং স্বর্গের দেবতারাও মোহাচ্ছন্ন হয়ে পড়েন, ঠিক যেভাবে মোহাচ্ছন্ন হয়ে পড়লে আগুনে জল দর্শন হয়, অথবা জলে মাটি দর্শন হয়। তাঁরই প্রভাবে জড়া প্রকৃতির তিনটি গুণের মাধ্যমে জড় জগৎ সাময়িকভাবে প্রকাশিত হয়, এবং তা অলীক হলেও সত্যবৎ প্রতিভাত হয়। তাই আমি সেই পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের ধ্যান করি, যিনি জড় জগতের মোহ থেকে সম্পূর্ণভাবে মুক্ত তাঁর ধামে নিত্যকাল বিরাজ করেন। আমি তাঁর ধ্যান করি, কেননা তিনিই হচ্ছেন পরম সত্য।

তাৎপর্য

ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায় এই বন্দনার মাধ্যমে বসুদেব এবং দেবকীর পুত্র শ্রীকৃষ্ণকেই প্রণতি নিবেদন করা হচ্ছে। এই তত্ত্ব এই গ্রন্থে আরও বিশদভাবে বিশ্লেষণ করা হবে। এখানে শ্রীল ব্যাসদেব ঘোষণা করছেন যে, শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন আদি পুরুষ—পরমেশ্বর ভগবান, এবং অন্য সব কিছুই প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষভাবে তাঁরই প্রকাশ। এই বিষয়ে শ্রীল জীব গোস্বামী তাঁর *কৃষ্ণসন্দর্ভ* নামক গ্রন্থে আরও বিশদভাবে আলোচনা করেছেন। এই ব্রহ্মাণ্ডের প্রথম সৃষ্ট জীব ব্রহ্মা তাঁর রচিত *ব্রহ্ম-সংহিতায়* শ্রীকৃষ্ণ-তত্ত্ব বিশদভাবে আলোচনা করেছেন। *সামবেদেও* বলা হয়েছে যে, শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন দেবকীর দিব্য পুত্র। তাই এই প্রার্থনায়, প্রথমেই প্রতিপন্ন করা হয়েছে যে, শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন আদি পুরুষ, সেই পরমেশ্বর ভগবানকে যদি কোন অপ্রাকৃত নামের দ্বারা সম্বোধন করতে হয়, তা হলে তা হচ্ছে কৃষ্ণ, অর্থাৎ সর্বাকর্ষক। *ভগবদ্গীতায়* বহু স্থানে তিনি নিজেকে পরমেশ্বর ভগবান বলে ঘোষণা করেছেন, এবং তা অর্জুন সত্য বলে সমর্থন করেছেন, এবং নারদ, ব্যাস প্রমুখ সমস্ত মহর্ষিরাও তা নিঃশঙ্কচিত্তে স্বীকার করেছেন। *পদ্মপুরাণেও* বলা হয়েছে যে, ভগবানের অনন্ত নামের মধ্যে কৃষ্ণ নামটিই হচ্ছে মুখ্য। বাসুদেব হচ্ছেন পরমেশ্বর ভগবানের অংশপ্রকাশ, এবং বাসুদেব-সদৃশ ভগবানের অন্য সমস্ত রূপেরও উল্লেখ এই শ্লোকে করা হয়েছে। বাসুদেব নামটি বিশেষভাবে বসুদেব এবং দেবকীর দিব্য-সন্তানকেই বোঝায়। পরমহংসেরা, যাঁরা সন্ন্যাস আশ্রমের পরম পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়েছেন, তাঁরা নিরন্তর শ্রীকৃষ্ণের ধ্যান করেন।

বাসুদেব, অথবা শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন সর্ব কারণের পরম কারণ। সব কিছু তাঁর থেকেই প্রকাশিত হয়েছে। কিভাবে যে সব কিছু তাঁর থেকে প্রকাশিত হয়, তা এই গ্রন্থের পরবর্তী অধ্যায়গুলিতে বিশদভাবে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। *শ্রীমদ্ভাগবতকে* শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু *অমল পুরাণ* বলে বর্ণনা করেছেন, কেননা এতে পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের অপ্রাকৃত লীলাবিলাসের কাহিনী বর্ণিত হয়েছে। শ্রীমদ্ভাগবতের ইতিহাসও অত্যন্ত

মহিমান্বিত। মহামুনি বেদব্যাস যখন পরিপক্বরূপে দিব্য জ্ঞান লাভ করেছিলেন, তখন তিনি এই গ্রন্থটি সংকলন করেন। তিনি তাঁর গুরুদেব দেবর্ষি নারদের উপদেশ অনুসারে এই গ্রন্থটি রচনা করেন। ব্যাসদেব চতুর্বেদ, *বেদান্ত-সূত্র* (অথবা *ব্রহ্মসূত্র*), পুরাণ, মহাভারত ইত্যাদি সমস্ত বৈদিক শাস্ত্র সংকলন করেছিলেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও তিনি সন্তুষ্ট হতে পারেননি। তাঁর গুরুদেব দেবর্ষি নারদ তাঁর সেই অসন্তুষ্টি দর্শন করে তাঁকে নির্দেশ দিয়েছিলেন পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের অপ্রাকৃত কার্যকলাপ বর্ণনা করতে। পরমেশ্বর ভগবানের অপ্রাকৃত কার্যকলাপ বিশেষভাবে এই গ্রন্থের দশম স্কন্ধে বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু সেই মূল বস্তুটিতে প্রবেশ করতে হলে ধীরে ধীরে উন্নত থেকে উন্নততর জ্ঞান লাভ করে অগ্রসর হতে হয়।

চিন্তাশীল মানুষের পক্ষে সৃষ্টির উৎস সম্বন্ধে জানতে চাওয়াটা স্বাভাবিক। রাত্রিবেলায় অগণিত তারকাখচিত আকাশের দিকে তাকিয়ে তার মনে স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন জাগে সেখানে কি জীব রয়েছে? এই ধরনের প্রশ্নগুলি মানুষের পক্ষে করা স্বাভাবিক, কেননা, মানুষের চেতনা পশুদের চেতনা থেকে অনেক উন্নত। এই ধরনের প্রশ্নের উত্তর সরাসরিভাবে *শ্রীমদ্ভাগবতের* রচয়িতা দান করেছেন। তিনি বলেছেন যে, শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন সমস্ত সৃষ্টির আদি উৎস। তিনি কেবল এই ব্রহ্মাণ্ডেরই স্রষ্টা নন, তিনি তার ধ্বংসকর্তাও। পরমেশ্বর ভগবানের ইচ্ছার প্রভাবে এক বিশেষ সময়ে এই জড় প্রকৃতির প্রকাশ হয়। কিছুকালের জন্য তার স্থিতি হয়, এবং তারপর তাঁর ইচ্ছার প্রভাবে তার বিনাশ হয়। তাই, এই জগতের সমস্ত কার্যকলাপের পেছনে রয়েছে পরমেশ্বর ভগবানের ইচ্ছা। নাস্তিকেরা অবশ্য বিশ্বাস করে না যে, একজন সৃষ্টিকর্তা রয়েছেন, কিন্তু সেটি তাদের অজ্ঞতারই পরিচায়ক। যেমন, আধুনিক বৈজ্ঞানিকেরা কৃত্রিম উপগ্রহ সৃষ্টি করেছে, এবং এই উপগ্রহগুলি বৈজ্ঞানিকদের দ্বারা পরিচালিত হয়ে মহাশূন্যে কিছুকালের জন্য ভাসছে। তেমনই, অসংখ্য গ্রহ-নক্ষত্র-সমন্বিত ব্রহ্মাণ্ডগুলি পরমেশ্বর ভগবানের বুদ্ধিমত্তার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে।

বৈদিক শাস্ত্রে বলা হয়েছে যে, পরমেশ্বর ভগবান সমস্ত পুরুষদের মধ্যে সর্বোত্তম। প্রথম সৃষ্ট জীব ব্রহ্মা থেকে শুরু করে একটি ক্ষুদ্র পিপীলিকা পর্যন্ত সকলেই হচ্ছে এক-একটি চেতন সত্তা। অন্য সমস্ত জীবের মতো তাঁরও ব্যক্তিত্ব রয়েছে। কিন্তু পরমেশ্বর ভগবান, অথবা পরম চৈতন্য হচ্ছেন সর্বশ্রেষ্ঠ বুদ্ধিমত্তাসম্পন্ন, এবং তিনি অচিন্ত্য শক্তিসম্পন্ন। একটি মানুষের মস্তিষ্ক যদি একটি কৃত্রিম উপগ্রহ তৈরি করতে পারে, তা হলে সহজেই অনুমান করা যায় যে, মানুষের থেকে উন্নত বুদ্ধিমত্তাসম্পন্ন যিনি, তিনি তার থেকে অনেক আশ্চর্যজনক এবং অনেক উন্নত বস্তু সৃষ্টি করতে পারেন। সুস্থ মনোবৃত্তিসম্পন্ন মানুষ সহজেই এই যুক্তিটি মেনে নেবেন, কিন্তু অনেক একগুঁয়ে নাস্তিক রয়েছে, যারা তা স্বীকার করতে চায় না। শ্রীল ব্যাসদেব কিন্তু সেই পরম বুদ্ধিমত্তাসম্পন্ন পুরুষকে পরমেশ্বররূপে স্বীকার করেছেন। তিনি সেই পরম বুদ্ধিমত্তা-সম্পন্ন পুরুষকে পরমেশ্বর বলে সম্বোধন করে তাঁর প্রতি সশ্রদ্ধ প্রণতি

নিবেদন করেছেন। সেই পরমেশ্বর হচ্ছেন শ্রীকৃষ্ণ, যা ব্যাসদেব প্রণীত *ভগবদ্গীতা* এবং অন্যান্য শাস্ত্র গ্রন্থে, বিশেষ করে *শ্রীমদ্ভাগবতে* বর্ণনা করা হয়েছে। *ভগবদ্গীতায়* ভগবান বলেছেন যে, তাঁর থেকে মহৎ বা পরমতত্ত্ব আর কিছু নেই। তাই শ্রীল ব্যাসদেব সেই পরমতত্ত্ব শ্রীকৃষ্ণকে তৎক্ষণাৎ আরাধনা করেছেন, যাঁর অপ্রাকৃত কার্যকলাপ *শ্রীমদ্ভাগবতের* দশম স্কন্ধে বর্ণিত হয়েছে।

বিকৃত মনোভাবাপন্ন অসৎ মানুষেরা সরাসরিভাবে দশম স্কন্ধে প্রবেশ করতে চায়, বিশেষ করে দশম স্কন্ধের সেই পাঁচটি অধ্যায়ে যেখানে পরমেশ্বর ভগবানের রাসলীলার বর্ণনা করা হয়েছে। *শ্রীমদ্ভাগবতের* এই অংশটি হচ্ছে সব চাইতে গোপনীয়। যতক্ষণ পর্যন্ত না কেউ পরমেশ্বর ভগবানের অপ্রাকৃততত্ত্ব সম্বন্ধে পূর্ণরূপে অবগত হচ্ছেন, ততক্ষণ পরমেশ্বর ভগবানের রাসলীলা নামক পরম শ্রদ্ধেয় লীলাবিলাসের তত্ত্ব এবং ব্রজগোপিকাদের সঙ্গে তাঁর প্রেমের তত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করা কখনই সম্ভব নয়। এটি হচ্ছে ভগবানের অপ্রাকৃত লীলাবিলাসের সর্বোচ্চ বিষয় এবং যে সমস্ত মুক্ত পুরুষ ধীরে ধীরে পরমহংস স্তরে উন্নীত হয়েছেন, তাঁরাই কেবল এই রাসলীলার অপ্রাকৃত মাধুর্য আস্বাদন করতে পারেন। শ্রীল ব্যাসদেব তাই পাঠককে ধীরে ধীরে পারমার্থিক তত্ত্বজ্ঞান হৃদয়ঙ্গম করে উন্নত থেকে উন্নততর স্তরে অধিষ্ঠিত হয়ে অবশেষে ভগবানের এই লীলাবিলাসের মাধুর্য আস্বাদন করার সুযোগ দান করেছেন। তাই তিনি 'ধীমহি' কথাটির মাধ্যমে গায়ত্রী মন্ত্রের আবাহন করেছেন। এই গায়ত্রী মন্ত্র পারমার্থিক প্রগতিসম্পন্ন মানুষদের জন্য। কেউ যখন যথাযথভাবে গায়ত্রী মন্ত্র উচ্চারণ করতে পারেন, তখন তিনি ব্রহ্মভূত স্তরে অধিষ্ঠিত হন। তাই গায়ত্রী মন্ত্রে সিদ্ধিলাভ করতে হলে ব্রাহ্মণোচিত গুণাবলী অর্জন করতে হয় অথবা যথার্থভাবে সত্ত্বগুণে অধিষ্ঠিত হতে হয়, এবং তখনই কেবল পরমেশ্বর ভগবানের অপ্রাকৃত নাম, রূপ, গুণ ইত্যাদির অপ্রাকৃত মহিমা হৃদয়ঙ্গম করা যায়।

শ্রীমদ্ভাগবত হচ্ছে পরমেশ্বর ভগবানের অপ্রাকৃত শক্তিসম্ভূত তাঁর স্বরূপের বর্ণনা এবং তাঁর এই অন্তরঙ্গা শক্তি, আমাদের গোচরীভূত এই জড় জগতকে প্রকাশিত করেছেন যে বহিরঙ্গা শক্তি, তা থেকে ভিন্ন। শ্রীল ব্যাসদেব এই শ্লোকে এই দুইয়ের পার্থক্য স্পষ্টভাবে নিরূপণ করেছেন। শ্রীল ব্যাসদেব এখানে বলেছেন যে, ভগবানের অন্তরঙ্গা শক্তির প্রকাশ নিত্য, কিন্তু জড় জগতের প্রকাশকারী তাঁর বহিরঙ্গা শক্তি মরুভূমির বুকে মরীচিকার মতো ক্ষণস্থায়ী এবং অলীক। মরুভূমির বুকে যে মরীচিকা দেখা যায়, তাতে প্রকৃতপক্ষে জল নেই। সেখানে কেবল জলের আভাস রয়েছে। প্রকৃত জল অন্য কোথাও রয়েছে। এই জড় সৃষ্টিকে বাস্তব বলে মনে হয়, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এটি হচ্ছে অপ্রাকৃত জগতের প্রতিবিম্ব মাত্র। পরম সত্য রয়েছে অপ্রাকৃত জগতে, এই জড় জগতে তার প্রকাশ নেই। এই জড় জগতে সব কিছুই হচ্ছে আপেক্ষিক সত্য। অর্থাৎ এখানে সত্য অন্য কোন কিছুর ওপর নির্ভর করে রয়েছে। এই জড় সৃষ্টির প্রকাশ হয় প্রকৃতির তিনটি গুণের সমন্বয়ের ফলে, এবং এই ক্ষণস্থায়ী

সৃষ্টির উদ্দেশ্য হচ্ছে বদ্ধ জীবের মোহাচ্ছন্ন চিত্তে বাস্তবের কুহক সৃষ্টি করা, এবং তার ফলে ব্রহ্মা, ইন্দ্র, চন্দ্র আদি দেবতারাও পর্যন্ত মুহ্যমান হয়ে পড়েন। প্রকৃতপক্ষে, এই জড় জগতে বাস্তব বলে কিছু নেই। এই জড় জগতকে বাস্তব বলে মনে হতে পারে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে বাস্তব বস্তু হচ্ছে চিন্ময় জগৎ, যেখানে পরমেশ্বর ভগবান তাঁর পার্ষদ সহ নিত্য বিরাজ করেন।

কোন জটিল কলকব্জার নির্মাতা যে মুখ্য ইঞ্জিনিয়ার, তিনি কখনও সরাসরিভাবে সেটি তৈরির ব্যাপারে অংশগ্রহণ করেন না, তবুও তিনি তার প্রতিটি অংশ পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে জানেন, কেননা সব কিছু তারই পরিচালনায় সম্পাদিত হয়েছে। তিনি প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে সেটি তৈরির ব্যাপারে সব কিছু জানেন। তেমনই পরমেশ্বর ভগবান, যিনি হচ্ছেন এই জড় জগতের পরম সৃষ্টিকর্তা, সে সম্বন্ধে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে অবগত, যদিও এখানকার কার্যকলাপ সম্পাদিত হয় স্বর্গের দেব-দেবীদের মাধ্যমে। এই জড় জগতে ব্রহ্মা থেকে শুরু করে একটি পিপীলিকা পর্যন্ত কেউই স্বাধীন নয়। ভগবানের প্রভাব সর্বত্রই দেখতে পাওয়া যায়। সমস্ত জড় বস্তু এবং চিৎ-স্ফুলিঙ্গ তাঁর থেকেই প্রকাশিত হয়। জড় এবং চেতন, এই দুটি শক্তির সমন্বয়ের ফলেই এই জড় জগতে সব কিছুর সৃষ্টি হয়েছে, এবং দুটি শক্তিই, পরম সত্য পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ থেকে উদ্ভূত হয়েছে। কোন রসায়নবিদ রসায়নাগারে হাইড্রোজেনের সঙ্গে অক্সিজেনের মিলন ঘটিয়ে জল তৈরি করতে পারেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে রসায়নবিদ রসায়নাগারে যে কর্ম করছে, তা পরমেশ্বর ভগবানের নির্দেশনায় সম্পাদিত হচ্ছে এবং যে সমস্ত উপাদান নিয়ে তারা কাজ করছে, সে সবই সরবরাহ করছেন পরমেশ্বর ভগবান। ভগবান প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে সব কিছু সম্বন্ধেই অবগত, এবং অতি ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র বিষয় সম্বন্ধেও তিনি অভিজ্ঞ এবং তিনি হচ্ছেন সম্পূর্ণরূপে স্বাধীন। ভগবানকে একটি স্বর্ণখনির সঙ্গে তুলনা করা যায়, আর এই জড় জগতের সৃষ্ট সব কিছুকে আংটি, হার ইত্যাদি স্বর্ণনির্মিত বিভিন্ন বস্তুর সঙ্গে তুলনা করা যায়। আংটি, হার ইত্যাদি বস্তুগুলিও গুণগতভাবে স্বর্ণখনির সমস্ত স্বর্ণের সঙ্গে এক, কিন্তু আয়তনগতভাবে স্বর্ণখনিগুলি স্বর্ণ থেকে ভিন্ন। তেমনই পরমতত্ত্বও যুগপৎ ভিন্ন এবং অভিন্ন। কোন কিছুই পরম সত্যের সমপর্যায়ভুক্ত নয়, কিন্তু তবুও কোন কিছুই পরমতত্ত্ব থেকে স্বতন্ত্র নয়।

এই জড় জগতের সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মা থেকে শুরু করে একটি নগণ্য পিপীলিকা পর্যন্ত সমস্ত বদ্ধ জীবেরাই কিছু না কিছু সৃষ্টি করছে, কিন্তু তারা কেউই পরমেশ্বর ভগবানের থেকে স্বতন্ত্র নয়। জড়বাদীরা ভ্রান্তিবশত মনে করে যে, তারাই হচ্ছে একমাত্র সৃষ্টিকর্তা। একে বলা হয় মায়া অথবা মোহাচ্ছন্ন অবস্থা। জ্ঞানের অভাবের ফলেই জড়বাদীরা তাদের অপূর্ণ ইন্দ্রিয়ের সংকীর্ণ গণ্ডির বাইরে আর কিছু দেখতে পায় না, এবং তাই তারা মনে করে যে, উন্নত বুদ্ধিমত্তা ব্যতীত আপনা থেকেই জড় জগতের প্রকাশ হয়েছে। এই শ্লোকে শ্রীল ব্যাসদেব তাদের সেই নির্বোধ মতবাদকে খণ্ডন

করেছেন ঃ "যেহেতু সেই পূর্ণ বস্তু অথবা পরম সত্য হচ্ছেন সব কিছুর উৎস, তাই কোন কিছুই সেই পরম সত্য থেকে স্বতন্ত্র হতে পারে না।" দেহে যা কিছু ঘটে দেহী তৎক্ষণাৎ তা বুঝতে পারে। তেমনই এই সৃষ্টি হচ্ছে সেই পূর্ণ বস্তুর দেহ। তাই এই সৃষ্টিতে যা কিছু হচ্ছে সে সম্বন্ধে পূর্ণ পুরুষোত্তম প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে অবগত।

শ্রুতি মন্ত্রে বর্ণনা করা হয়েছে যে, পূর্ণ বস্তু অথবা ব্রহ্ম হচ্ছে সব কিছুরই পরম উৎস। সব কিছু তাঁর থেকেই প্রকাশিত হয়, এবং সব কিছুই তাঁর দ্বারা প্রতিপালিত হয়, এবং অবশেষে সব কিছুই তাঁর মধ্যে প্রবিষ্ট হয়। এটিই হচ্ছে প্রকৃতির নিয়ম। স্মৃতি মন্ত্রেও এই তত্ত্ব প্রতিপন্ন হয়েছে। সেখানে বলা হয়েছে যে, ব্রহ্মার আয়ুষ্কালের শুরু থেকে যা কিছু প্রকাশিত হয়েছে এবং যাঁর মধ্যে অবশেষে সব কিছু প্রবিষ্ট হবে, সে সবেরই উৎস হচ্ছেন পরম সত্য বা ব্রহ্ম। জড় বৈজ্ঞানিকেরা স্থির করেছেন যে, সূর্য হচ্ছে গ্রহমণ্ডলীর উৎস, কিন্তু সূর্যের উৎস যে কি তা বিশ্লেষণ করতে তাঁরা অক্ষম। এখানে সব কিছুর পরম উৎস বিশ্লেষণ করা হয়েছে। বৈদিক শাস্ত্রের বর্ণনা অনুসারে, ব্রহ্মা, যাঁকে সূর্যের সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে, তিনি পরম স্রষ্টা নন। এই শ্লোকে বলা হয়েছে যে,পরমেশ্বর ভগবান ব্রহ্মাকে বৈদিক জ্ঞান দান করেছিলেন। এই সম্বন্ধে কেউ তর্ক করতে পারে যে, যেহেতু ব্রহ্মা হচ্ছেন প্রথম সৃষ্ট জীব, তাই অন্য কেউই তাঁকে জ্ঞান দান করতে পারে না, কেন না সে সময় আর অন্য কোনও জীব ছিল না। কিন্তু এখানে বর্ণনা করা হয়েছে যে গৌণ স্রষ্টা ব্রহ্মাকে পরমেশ্বর ভগবান জ্ঞান দান করেছিলেন যাতে ব্রহ্মা তাঁর সৃষ্টিকার্য সম্পাদন করতে পারেন। তাই সমস্ত সৃষ্টির পিছনে রয়েছে পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের পরম বুদ্ধিমত্তা। ভগবদ্গীতায় শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন যে তিনিই সৃষ্টিশক্তি, প্রকৃতিকে পরিচালনা করেন, যা হচ্ছে পূর্ণ জড় সৃষ্টির মূল আধার। তাই শ্রীল ব্যাসদেব ব্রহ্মার বন্দনা না করে পরমেশ্বর ভগবানের বন্দনা করেছেন, যিনি সৃষ্টিকার্যে ব্রহ্মাকে পরিচালিত করেন। এই শ্লোকে 'অভিজ্ঞ' এবং 'স্বরাট' শব্দ দুটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই শব্দ দুটি অন্য সমস্ত জীব থেকে পরমেশ্বর ভগবানের পার্থক্য নিরূপণ করে। অন্য কোনও জীবই 'অভিজ্ঞ' অথবা 'স্বরাট' নয়। অর্থাৎ কেউই সম্পূর্ণরূপে সব কিছু সম্বন্ধে জ্ঞাত নয় অথবা সম্পূর্ণরূপে স্বাধীন নয়। ব্রহ্মাকেও সৃষ্টিকার্য সম্পাদন করার জন্য পরমেশ্বর ভগবানের ধ্যান করতে হয়েছিল। তা হলে আইনস্টাইনের মত বৈজ্ঞানিকদের কি কথা! এ ধরনের বৈজ্ঞানিকদের মস্তিষ্ক অবশ্যই কোন মানুষ সৃষ্টি করেনি। কোন বৈজ্ঞানিক এই ধরনের মস্তিষ্ক তৈরি করতে পারে না, সুতরাং যে সমস্ত গণ্ডমূর্খ নাস্তিক ভগবানের অস্তিত্বকে অস্বীকার করে, তাদের কি কথা? যে সমস্ত মায়াবাদী (নির্বিশেষবাদী) পরমেশ্বর ভগবানের সঙ্গে এক হয়ে যাওয়ার স্বপ্ন দেখে, তারাও অভিজ্ঞ অথবা স্বরাট নয়। এই ধরনের নির্বিশেষবাদীরাও ভগবানের সঙ্গে এক হয়ে যাওয়ার প্রচেষ্টায় জ্ঞান অর্জন করবার জন্য বহু তপস্যা করে, কিন্তু অবশেষে তারা তাদের যে সমস্ত ধনী শিষ্য তাদের টাকা সরবরাহ করে এবং মন্দির বানিয়ে দেয় তাদের হুকুমের গোলামে

পরিণত হয়। রাবণ, হিরণ্যকশিপু প্রমুখ নাস্তিকদের ভগবানের কর্তৃত্ব অস্বীকার করার জন্য কঠোর তপস্যা করতে হয়েছিল। কিন্তু অবশেষে ভগবান যখন নিষ্ঠুর মৃত্যুরূপে তাদের সম্মুখে উপস্থিত হলেন, তখন তারা সম্পূর্ণভাবে অসহায় হয়ে পড়েছিল। আধুনিক যুগের যে সমস্ত নাস্তিকেরা ভগবানের অস্তিত্ব অস্বীকার করে তাদেরও সেই একই অবস্থা হবে। এই ধরনের নাস্তিকদেরও ঠিক তেমনভাবেই দণ্ডভোগ করতে হবে, কেন না ইতিহাস তার পুনরাবৃত্তি করে। মানুষ যখনই পরমেশ্বর ভগবানের ভগবত্তা অস্বীকার করে তখন প্রকৃতি এবং প্রকৃতির নিয়ম তাদের দণ্ডদান করে। সে কথা ভগবদ্গীতায় অতি প্রসিদ্ধ শ্লোক *যদা যদা হি ধর্মস্য গ্লানিঃ* শ্লোকটিতে বর্ণনা করা হয়েছে। অর্থাৎ "যখন ধর্মের গ্লানি হয় এবং অধর্মের বিস্তার হয়, হে অর্জুন, তখন আমি অবতরণ করি।" (ভগবদ্গীতা ৪/৭)

পরমেশ্বর ভগবান যে সম্যক্‌ভাবে পূর্ণ সেকথা সমস্ত শ্রুতি মন্ত্রে প্রতিপন্ন হয়েছে। শ্রুতি মন্ত্রে বর্ণিত হয়েছে যে সর্বতোভাবে পূর্ণ পরমেশ্বর ভগবান জড়া প্রকৃতির প্রতি ঈক্ষণ করেন এবং তার ফলে জড় জগতের প্রাণের সঞ্চার হয়ে সৃষ্টি শুরু হয়। জীব হচ্ছে ভগবানের বিভিন্ন অংশ, এবং তিনি তাঁর দৃষ্টিপাতের মাধ্যমে চেতনের স্ফুলিঙ্গ স্বরূপ জীবদের প্রকৃতির গর্ভে সঞ্চারিত করেন, এবং তার ফলে তাঁর সৃষ্টিশক্তি কার্যকরী হয়ে অপূর্ব সুন্দর সমস্ত সৃষ্টি প্রকাশ করে। একজন নাস্তিক তর্ক করতে পারে যে ভগবান একজন ঘড়ি-নির্মাতার চেয়ে অভিজ্ঞ নন, কিন্তু ভগবান তাঁর সৃষ্টি থেকে অনেক অনেক শ্রেষ্ঠ, কেন না তিনি স্ত্রী এবং পুরুষ রূপী দুটি যন্ত্র সৃষ্টি করেছেন এবং এই যন্ত্র দুটির মাধ্যমে সেরকম অসংখ্য যন্ত্র সৃষ্টি করতে পারেন। কোন মানুষ যদি এমন কোন যন্ত্র সৃষ্টি করতে পারে যা তার সাহায্য বা অভিনিবেশ ছাড়াই সেরকম যন্ত্র তৈরি করতে পারে, তা হলে সে ভগবানের বুদ্ধিমত্তার ধারে কাছে যেতে পারে। কিন্তু সেটি সম্ভব নয়, কেন না মানুষের তৈরি কোন যন্ত্রই স্বতন্ত্রভাবে কার্যকরী হতে পারে না। তাই কেউই ভগবানের মত সৃষ্টি করতে পারে না। ভগবানের আর একটি নাম হচ্ছে অসমোর্ধ্ব, অর্থাৎ তাঁর সমান অথবা তাঁর থেকে মহৎ আর কেউ নেই। পরম সত্য হচ্ছেন তিনিই, যাঁর সমকক্ষ অথবা যাঁর থেকে মহৎ কেউই হতে পারে না। সে কথা শ্রুতি মন্ত্রে বর্ণিত হয়েছে। সেখানে বলা হয়েছে যে এই জড় ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টির পূর্বে কেবল ভগবানই ছিলেন, যিনি হচ্ছেন সকলেরই প্রভু। ভগবান ব্রহ্মাকে বৈদিক জ্ঞান দান করেছিলেন। সেই ভগবানের সমস্ত নির্দেশ সর্বতোভাবে পালন করা উচিত। কেউ যদি জড় জগতের বন্ধন থেকে মুক্ত হতে চায় তা হলে তাকে অবশ্যই ভগবানের শরণাগত হতে হবে। সে কথা ভগবদ্গীতাতেও প্রতিপন্ন হয়েছে।

যতক্ষণ পর্যন্ত না কেউ পরমেশ্বর ভগবানের শ্রীপাদপদ্মে আত্মসমর্পণ করছে, ততক্ষণ তাকে মোহাচ্ছন্ন থাকতেই হবে। কোন বুদ্ধিমান মানুষ যখন পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের শ্রীপাদপদ্মে আত্মনিবেদন করেন এবং সম্পূর্ণভাবে অবগত হন যে শ্রীকৃষ্ণই হচ্ছেন সর্বকারণের পরম কারণ, যে কথা ভগবদ্গীতায় প্রতিপন্ন হয়েছে,

তখন সেই অতি উন্নত বুদ্ধিমত্তা-সম্পন্ন মানুষ মহাত্মায় পর্যবসিত হন। তবে এই ধরনের মহাত্মা অত্যন্ত দুর্লভ। মহাত্মারাই কেবল পরমেশ্বর ভগবানকে সমস্ত সৃষ্টির পরম কারণ রূপে জানতে পারেন। তিনিই পরম অথবা চরম সত্য, কেন না আর সমস্ত সত্যই তাঁর উপরে নির্ভর করে বিরাজ করে। তিনি সর্বজ্ঞ। তিনি কখনই মোহের দ্বারা আচ্ছন্ন হন না।

কোন কোন মায়াবাদী পণ্ডিত তর্ক করে যে শ্রীল ব্যাসদেব শ্রীমদ্ভাগবত রচনা করেননি, এবং তাদের কেউ কেউ বলে যে শ্রীমদ্ভাগবত হচ্ছে বোপদেব নামক জনৈক ব্যক্তির রচিত একটি আধুনিক গ্রন্থ। এই ধরনের মতামতগুলি সম্পূর্ণরূপে যুক্তিহীন। শ্রীধর স্বামী দেখিয়ে গেছেন যে বহু প্রাচীন পুরাণে শ্রীমদ্ভাগবতের উল্লেখ রয়েছে। সবচাইতে প্রাচীন পুরাণ মৎস্য পুরাণে শ্রীমদ্ভাগবতের উল্লেখ রয়েছে। এই পুরাণে উল্লেখ করা হয়েছে যে শ্রীমদ্ভাগবতের শুরু হয়েছে গায়ত্রী মন্ত্র দিয়ে এবং তাতে বহু পারমার্থিক নির্দেশের বর্ণনা রয়েছে। তাতে বৃত্রাসুরের ইতিহাস রয়েছে। পূর্ণিমার দিনে এই গ্রন্থটি কাউকে দান করলে জীবনের পরম পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়ে ভগবদ্ধামে ফিরে যাওয়া যায়। অন্যান্য পুরাণেও শ্রীমদ্ভাগবতের উল্লেখ রয়েছে, যেখানে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে যে এই গ্রন্থটি ১২টি স্কন্ধে সমাপ্ত হয়েছে, এবং তাতে ১৮,০০০ শ্লোক রয়েছে। পদ্ম পুরাণেও গৌতম মুনি এবং মহারাজ অম্বরীষের আলোচনায় শ্রীমদ্ভাগবতের উল্লেখ রয়েছে। সেখানে গৌতম মুনি মহারাজ অম্বরীষকে উপদেশ দিয়েছেন যে তিনি যদি জড় জগতের বন্ধন থেকে মুক্ত হতে চান তা হলে তিনি যেন নিয়মিতভাবে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ করেন। এইভাবে আমরা দেখতে পাই যে শ্রীমদ্ভাগবতের প্রামাণিকতা সম্বন্ধে কোন সন্দেহেরই অবকাশ নেই। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর অবতরণের পরেও, গত ৫০০ বছর ধরে শ্রীল জীব গোস্বামী, শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর, শ্রীপাদ বল্লভাচার্য প্রমুখ বহু বিদগ্ধ পণ্ডিত শ্রীমদ্ভাগবতের বিস্তৃত ভাষ্য রচনা করেছেন। যাঁরা ঐকান্তিকভাবে জ্ঞানের অন্বেষী তাঁরা যেন আরও গভীরভাবে দিব্য জ্ঞান আস্বাদন করার জন্য সেই সমস্ত ভাষ্য পাঠ করার চেষ্টা করেন।

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর জড় কামোন্মত্ততা-রহিত আদি রসের আলোচনা করেছেন। সমস্ত জড় সৃষ্টিই কামভাবের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে পরিচালিত হচ্ছে। আধুনিক যুগে কামই হচ্ছে সমস্ত কার্যকলাপের মূল অনুপ্রেরণা। যেদিকেই তাকানো যায় দেখা যায় যৌন আবেদনের হাতছানি। সুতরাং এই যৌন আবেদন অবাস্তব নয়। তবে তার যথার্থ প্রকাশ হচ্ছে চিৎ জগতে—ভগবদ্ধামে। এই জড় জগতের যৌন জীবন হচ্ছে প্রকৃত প্রেমের বিকৃত প্রতিফলন। বাস্তব বস্তু হচ্ছে পরম সত্য, এবং তাই পরম সত্য কখনই নির্বিশেষ হতে পারে না। নির্বিশেষ বা নিরাকার কোন কিছুর পক্ষে বিশুদ্ধ প্রেম আস্বাদন করা সম্ভব হতে পারে না। মায়াবাদী দার্শনিকেরা যেহেতু পরম সত্যে নির্বিশেষত্ব আরোপ করেছে তাই তারা অতি ঘৃণ্য যৌন জীবনের প্রতি

পরোক্ষভাবে আসক্ত হয়ে পড়ে। যে মানুষের অপ্রাকৃত ভগবৎ-প্রেম সম্বন্ধে কোন ধারণাই নেই, তারা ভগবৎ-প্রেমের বিকৃত প্রতিফলন কাম বা যৌন আবেদনকেই জীবনের পরম উদ্দেশ্য বলে গ্রহণ করে। এই জড় জগতের বিকৃত যৌন জীবনের সঙ্গে অপ্রাকৃত জগতের বিশুদ্ধ প্রেমের আকাশ-পাতাল তফাৎ রয়েছে।

এই *শ্রীমদ্ভাগবত* ধীরে ধীরে নিরপেক্ষ পাঠককে পারমার্থিক জীবনের সর্বোচ্চ স্তরে উন্নীত করে। এই গ্রন্থ মানুষকে জড়া প্রকৃতির তিনটি গুণের দ্বারা প্রভাবিত কার্যকলাপ—সকাম কর্ম, জল্পনা-কল্পনা-প্রসূত জ্ঞান এবং আনুষ্ঠানিক উপাসনার স্তর অতিক্রম করতে সাহায্য করে।

শ্লোক ২

ধর্মঃ প্রোজ্‌ঝিতকৈতবোঽত্র পরমো নির্মৎসরাণাং সতাং
বেদ্যং বাস্তবমত্র বস্তু শিবদং তাপত্রয়োন্মূলনম্।
শ্রীমদ্ভাগবতে মহামুনিকৃতে কিং বা পরৈরীশ্বরঃ
সদ্যো হৃদ্যবরুধ্যতেঽত্র কৃতিভিঃ শুশ্রূষুভিস্তৎক্ষণাৎ ॥ ২ ॥

ধর্ম—ধর্ম; **প্রোজ্‌ঝিত**—সম্পূর্ণভাবে বর্জন করে; **কৈতবঃ**—ভুক্তিমুক্তি বাসনা যুক্ত; **অত্র**—এখানে; **পরমঃ**—সর্বোচ্চ; **নির্মৎসরাণাম্**—যাঁর হৃদয় সম্পূর্ণভাবে নির্মল হয়েছে; **সতাম্**—ভক্ত; **বেদ্যম্**—বোধগম্য; **বাস্তবম্**—বাস্তব; **অত্র**—এখানে; **বস্তু**—বস্তু; **শিবদম্**—পরমানন্দদায়ক; **তাপ-ত্রয়**—ত্রিতাপ; **উন্মূলনম্**—সমূলে উৎপাটিত করে; **শ্রীমৎ**—সুন্দর; **ভাগবতে**—ভাগবত পুরাণ; **মহামুনি**—মহামুনি (ব্যাসদেব); **কৃতে**—রচিত; **কিম্**—কি; **বা**—প্রয়োজন; **পরৈঃ**—অন্য কিছু; **ঈশ্বরঃ**—পরমেশ্বর ভগবান; **সদ্যঃ**—অবিলম্বে; **হৃদি**—হৃদয়ে; **অবরুধ্যতে**—অবরুদ্ধ হয়; **অত্র**—এখানে; **কৃতিভিঃ**—সুকৃতি সম্পন্ন মানুষদের দ্বারা; **শুশ্রূষুভিঃ**—অনুশীলনের ফলে; **তৎ-ক্ষণাৎ**—অবিলম্বে।

অনুবাদ

জড় বাসনাযুক্ত সব রকমের ধর্ম সম্পূর্ণভাবে বর্জন করে এই ভাগবত পুরাণ পরম সত্যকে প্রকাশ করেছে যা কেবল সর্বতোভাবে নির্মৎসর ভক্তরাই হৃদয়ঙ্গম করতে পারেন। পরম সত্য হচ্ছে পরম মঙ্গলময় বাস্তব বস্তু; সেই সত্যকে জানতে পারলে ত্রিতাপ দুঃখ সমূলে উৎপাটিত হয়। মহামুনি বেদব্যাস (উপলব্ধির পরিপক্ক অবস্থায়) এই শ্রীমদ্ভাগবত রচনা করেছেন এবং ভগবত্তত্ত্বজ্ঞান হৃদয়ঙ্গম করতে এই গ্রন্থটিই যথেষ্ট। সুতরাং অন্য কোনও শাস্ত্রগ্রন্থের আর কি প্রয়োজন? কেউ যখন শ্রদ্ধাবনত চিত্তে এবং একাগ্রতা সহকারে এই ভাগবতের বাণী শ্রবণ করেন, তখন তাঁর হৃদয়ে ভগবত্তত্ত্বজ্ঞান প্রকাশিত হয়।

তাৎপর্য

ধর্মের অন্তর্গত চারটি মৌলিক বিষয় হচ্ছে—পুণ্যকর্ম, অর্থনৈতিক উন্নতি, ইন্দ্রিয় সুখভোগ এবং চরমে জড় জগতের বন্ধন থেকে মুক্তি। ধর্মবিহীন জীবন হচ্ছে অসভ্য জীবন। ধর্ম আচরণ শুরু হলেই কেবল যথার্থ মানব জীবনের শুরু হয়। আহার, নিদ্রা, ভয় এবং মৈথুন এই চারটি হচ্ছে পশু জীবনের ভিত্তি। এই প্রবৃত্তিগুলি মানুষ এবং পশু উভয়ের মধ্যেই রয়েছে। কিন্তু ধর্ম আচরণ হচ্ছে মানব জীবনের একটি বিশেষ কার্য। ধর্মবিহীন মনুষ্য জীবন পশুজীবনের থেকে কোন অংশেই উন্নত নয়। তাই মানব সমাজে ধর্ম-অনুষ্ঠানের প্রচলন রয়েছে যার উদ্দেশ্য হচ্ছে আত্মজ্ঞান লাভ করা এবং পরমেশ্বর ভগবানের সঙ্গে জীবের নিত্য সম্পর্কের কথা অবগত হওয়া।

মানব সভ্যতার নিম্ন স্তরে সব সময়ই জড় জগতকে ভোগ করার তীব্র বাসনা থাকে এবং তার ফলে নিরন্তর ইন্দ্রিয়-তৃপ্তির জন্য পরস্পরের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা হয়। এই ধরনের চেতনার দ্বারা তাড়িত হয়ে মানুষ ক্রমান্বয়ে বিপর্যস্ত হতে হতে অবশেষে ধর্মের প্রতি উন্মুখ হয়। সে তখন জড় সুখভোগের আশায় পুণ্যকর্ম অথবা ধর্ম-অনুষ্ঠান করে। কিন্তু এই ধরনের জড় সুখভোগ যদি অন্য উপায়ে লাভ করা যায়, তখন তারা তথাকথিত সেই সমস্ত ধর্ম আচরণে অবহেলা করে। এটিই হচ্ছে আধুনিক সভ্যতার পরিস্থিতি। মানুষ যথেষ্ট অর্থনৈতিক উন্নতি সাধন করেছে, তাই এখন আর তারা ধর্মের প্রতি ততটা উৎসাহী নয়। মন্দির, মসজিদ অথবা গির্জাগুলি এখন প্রায় শূন্যই পড়ে থাকে। মানুষ এখন তাদের পূর্ব পুরুষদের তৈরি ধর্ম-আচরণের স্থানগুলি থেকে কল-কারখানা, দোকান-বাজার এবং প্রেক্ষাগৃহ ইত্যাদির প্রতি অধিক উৎসাহী। এর থেকে সহজেই প্রমাণিত হয় যে কেবল অর্থনৈতিক উন্নতি সাধনের জন্যই সেই ধরনের ধর্ম অনুষ্ঠান হয়। অর্থনৈতিক উন্নতির প্রয়োজন ইন্দ্রিয় সুখভোগের জন্য। অনেক সময় দেখা যায় যে কেউ যখন ইন্দ্রিয় সুখভোগের প্রচেষ্টায় ব্যর্থ হয়, তখন সে মোক্ষলাভের চেষ্টা করে এবং পরমেশ্বর ভগবানের সঙ্গে এক হয়ে যেতে চায়। প্রকৃতপক্ষে, এই ধরনের প্রচেষ্টাগুলিও ইন্দ্রিয় সুখভোগেরই নামান্তর।

বেদে এই চারটি কর্মেরই নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, যাতে মানুষ যথাযথভাবে তাদের জীবনপথে অগ্রসর হতে পারে এবং ইন্দ্রিয় সুখভোগের জন্য পরস্পরের মধ্যে অনর্থক প্রতিযোগিতা না হয়। কিন্তু *শ্রীমদ্ভাগবত* হচ্ছে ইন্দ্রিয়তৃপ্তি সাধনের উদ্দেশ্যে সমস্ত কার্যকলাপের অতীত এক দিব্য শাস্ত্র। এটি হচ্ছে পূর্ণরূপে জড় জগতের কলুষ থেকে মুক্ত একটি গ্রন্থ, যা কেবল জড় ভোগ-বাসনা রহিত ভগবানের শুদ্ধ ভক্তরাই হৃদয়ঙ্গম করতে পারেন। জড় জগতের মানুষে মানুষে, পশুতে-পশুতে, সম্প্রদায়ে-সম্প্রদায়ে, জাতিতে-জাতিতে নিরন্তর প্রতিযোগিতা হচ্ছে। কিন্তু ভগবানের ভক্তরা এই ধরনের প্রতিযোগিতার অতীত। তাঁরা জড়বাদীদের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করেন না, কেন না তাঁরা ভগবদ্ধামের দিকে এগিয়ে চলেছেন, যেখানে জীবন নিত্য

এবং আনন্দময়। এই ধরনের মহাত্মারা সম্পূর্ণরূপে নির্মৎসর এবং তাঁদের হৃদয়বৃত্তি সম্পূর্ণরূপে নির্মল। জড় জগতের সকলকেই একে অপরকে হিংসা করে, এবং তাই পরস্পরের সঙ্গে প্রতিযোগিতা হয়। কিন্তু ভগবানের ভক্তরা কেবল জড়জাগতিক ঈর্ষা থেকেই মুক্ত নন, তাঁরা সকলেরই শুভাকাঙ্ক্ষী,-এবং তাঁরা চেষ্টা করেন প্রতিদ্বন্দ্বিতাবিহীন ভগবৎ-কেন্দ্রিক সমাজ প্রতিষ্ঠা করার। আধুনিক যুগের সাম্যবাদও প্রতিদ্বন্দ্বিতাবিহীন সমাজ প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করছে। কিন্তু তাদের সেই প্রচেষ্টা যথাযথ নয়, কেন না সমাজতান্ত্রিক দেশগুলিতেও রাষ্ট্রপ্রধানের পদের জন্য প্রতিযোগিতা রয়েছে। বৈদিক দৃষ্টিভঙ্গির পরিপ্রেক্ষিতে অথবা সাধারণ মানবিক কার্যকলাপের পরিপ্রেক্ষিতে দেখা যায় যে ইন্দ্রিয় সুখভোগ হচ্ছে পার্থিব জীবনের ভিত্তি। বেদে তিনটি পন্থার উল্লেখ করা হয়েছে। তার একটি হচ্ছে উচ্চতর লোকে উন্নীত হওয়ার জন্য সকাম কর্ম, দ্বিতীয়টি হচ্ছে বিভিন্ন দেবদেবীর পূজা করে তাঁদের লোকে উন্নীত হওয়া এবং তৃতীয়টি হচ্ছে নির্বিশেষরূপে পরম সত্যকে উপলব্ধি করে তাঁর সঙ্গে এক হয়ে যাওয়া।

পরমতত্ত্বের নির্বিশেষ রূপ তাঁর সর্বোচ্চ প্রকাশ নয়। নির্বিশেষ রূপের ঊর্ধ্বে হচ্ছে ভগবানের পরমাত্মা রূপ এবং তারও ঊর্ধ্বে হচ্ছে পরমতত্ত্বের সবিশেষ রূপ—তাঁর ভগবান রূপ। *শ্রীমদ্ভাগবতে* পরমতত্ত্বের সবিশেষ রূপের বর্ণনা হয়েছে। এটি নির্বিশেষ তত্ত্ব-সমন্বিত গ্রন্থাবলী এবং বেদের জ্ঞানকাণ্ড থেকে অনেক উচ্চস্তরের বিষয়। এমন কি এটি কর্মকাণ্ড এবং উপাসনাকাণ্ডেরও ঊর্ধ্বে, কেন না এতে পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের আরাধনার পন্থা নির্দেশিত হয়েছে। কর্মকাণ্ডে উন্নততর ইন্দ্রিয় সুখভোগের জন্য স্বর্গলোকে উন্নীত হওয়ার কামনা রয়েছে, এবং জ্ঞানকাণ্ড এবং উপাসনাকাণ্ডেও এই ধরনের কামনা রয়েছে। কিন্তু *শ্রীমদ্ভাগবত* সেগুলি থেকে অনেক ঊর্ধ্বে, কারণ তাঁর লক্ষ্য হচ্ছে পরম সত্যের সবিশেষ প্রকাশ পরমেশ্বর ভগবান, যিনি হচ্ছেন সব কিছুরই পরম কেন্দ্র। *শ্রীমদ্ভাগবতের* মাধ্যমে মূল তত্ত্ব এবং তাঁর বৈশিষ্ট্য উভয় সম্বন্ধেই অবগত হওয়া যায়। মূল তত্ত্ব হচ্ছেন পরম সত্য পরমেশ্বর ভগবান, এবং অন্য সব কিছুই হচ্ছে তাঁর শক্তির আপেক্ষিক প্রকাশ।

কোন কিছুই মূল তত্ত্ব থেকে বিচ্যুত নয়, কিন্তু তা সত্ত্বেও শক্তি শক্তিমান থেকে ভিন্ন। এই ধারণাটি পরস্পরবিরোধী নয়। বেদান্ত-সূত্রের একটি সূত্র *জন্মাদ্যস্য যতঃ* এর মাধ্যমে শুরু হয়েছে যে *শ্রীমদ্ভাগবত*, তাতে বেদান্ত-সূত্রের অচিন্ত্য ভেদাভেদ তত্ত্ব স্পষ্টভাবে প্রকাশিত হয়েছে।

যে সমস্ত মনোধর্মী শক্তিকে পরমতত্ত্ব বলে প্রচার করতে চায় তাদের সেই বিকৃত সিদ্ধান্তের উত্তর হচ্ছে *শ্রীমদ্ভাগবতের* বিজ্ঞান, যাতে বিশ্লেষণ করা হয়েছে যে ভগবানের শক্তি ভগবানের সঙ্গে যুগপৎ ভিন্ন এবং অভিন্ন। এই জ্ঞান যখন যথাযথভাবে হৃদয়ঙ্গম করা যায়, তখন দেখা যায় যে দ্বৈতবাদ এবং অদ্বৈতবাদ উভয়ই অপূর্ণ। এই অচিন্ত্য ভেদাভেদ তত্ত্বের ভিত্তিতে যখন দিব্য চেতনার বিকাশ

হয় তখন মানুষ জড় জগতের ত্রিতাপ দুঃখ থেকে মুক্ত হন। এই ত্রিতাপ দুঃখ হচ্ছে—(১) মন এবং দেহজাত আধ্যাত্মিক ক্লেশ, (২) অন্য প্রাণীজনিত আধিভৌতিক ক্লেশ, এবং (৩) প্রাকৃতিক বিপর্যয়জাত আধিদৈবিক ক্লেশ। *শ্রীমদ্ভাগবতের* সূচনা হচ্ছে ভগবানের চরণে শরণাগতির মাধ্যমে। ভক্ত সর্বতোভাবে অবগত থাকেন যে তিনি পরমেশ্বরের সঙ্গে এক, তবে তাঁর স্থিতি হচ্ছে পরমেশ্বরের নিত্য সেবক রূপে। জড় জগতে ভ্রান্তিবশত কেউ মনে করতে পারে যে তিনিই হচ্ছেন সব কিছুর অধীশ্বর, এবং তার ফলে তিনি নিরন্তর ত্রিতাপ দুঃখ ভোগ করেন। কিন্তু কেউ যখন হৃদয়ঙ্গম করতে পারেন যে তার যথার্থ স্বরূপে তিনি হচ্ছেন ভৃত্য, তৎক্ষণাৎ তিনি সমস্ত দুঃখ-দুর্দশা থেকে মুক্ত হন। জীব যতক্ষণ জড় জগতের উপর প্রভুত্ব করার চেষ্টা করে, ততক্ষণ তার পক্ষে ভগবানের সেবক হওয়ার কোন রকম সম্ভাবনাই থাকে না। পরমেশ্বর ভগবানের সেবা পারমার্থিক স্বরূপের শুদ্ধ চেতনার মাধ্যমেই কেবল সাধিত হয়; এই সেবার মাধ্যমে তৎক্ষণাৎ জড় জগতের বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়া যায়।

সর্বোপরি, *শ্রীমদ্ভাগবত* হচ্ছে *বেদান্ত-সূত্রের* রচয়িতা শ্রীল ব্যাসদেব কর্তৃক প্রদত্ত বেদান্ত-সূত্রের ভাষ্য। তাঁর পারমার্থিক জীবনের পরিপক্ক অবস্থায় নারদ মুনির কৃপায় তিনি সেটি রচনা করেন। শ্রীল ব্যাসদেব হচ্ছেন পরমেশ্বর ভগবান নারায়ণের অবতার। তাই তাঁর প্রামাণিকতা সম্বন্ধে কোন প্রশ্নই উঠতে পারে না। তিনি হচ্ছেন বৈদিক শাস্ত্রগ্রন্থের প্রণেতা, আর তিনি নির্দেশ দিয়েছেন যে অন্যান্য শাস্ত্রগ্রন্থ অধ্যয়ন করার আর কোন প্রয়োজন নেই, কেবল *শ্রীমদ্ভাগবত* অধ্যয়ন করলেই পরমার্থ সাধিত হবে। অন্যান্য পুরাণে বিভিন্ন দেবদেবীর উপাসনা করার পন্থা নির্দিষ্ট হয়েছে। কিন্তু *শ্রীমদ্ভাগবতে* কেবল পরমেশ্বর ভগবানের কথাই বর্ণিত হয়েছে। পরমেশ্বর ভগবান হচ্ছেন পূর্ণ, এবং বিভিন্ন দেব-দেবীরা হচ্ছেন তাঁর অংশ-সদৃশ। তাই পরমেশ্বর ভগবানের আরাধনা করলে আর অন্য দেব-দেবীর পূজা করতে হয় না। পরমেশ্বর ভগবান তৎক্ষণাৎ ভক্তের হৃদয়ে অধিষ্ঠিত হন। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু *শ্রীমদ্ভাগবতকে অমল পুরাণ* বলে অভিহিত করে অন্যান্য সমস্ত পুরাণ থেকে তার স্বাতন্ত্র্য নিরূপণ করেছেন।

পারমার্থিক জ্ঞান লাভ করার যথার্থ পন্থা হচ্ছে শ্রদ্ধাবনত চিত্তে শ্রবণ। উদ্ধত ভাবসম্পন্ন হলে এই অপ্রাকৃত বাণী হৃদয়ঙ্গম করা যায় না। যথার্থভাবে এই জ্ঞান আহরণ করা সম্বন্ধে 'শুশ্রূষু' শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে। এই অপ্রাকৃত বাণী শ্রবণ করার জন্য ঐকান্তিকভাবে উৎকণ্ঠিত হতে হবে। নিষ্ঠাভরে তা শ্রবণ করাই হচ্ছে এই জ্ঞান আহরণের প্রাথমিক যোগ্যতা।

যে সমস্ত মানুষ দুর্ভাগা, তারা এই *শ্রীমদ্ভাগবত* শ্রবণে বিন্দুমাত্রও উৎসাহী নয়। এই পন্থাটি অত্যন্ত সরল, কিন্তু তার প্রয়োগ অত্যন্ত কঠিন। দুর্ভাগা মানুষেরা রাজনৈতিক এবং সামাজিক বিষয়ে অলস আলোচনা করার যথেষ্ট সময় পায়, কিন্তু

যখন তাদের ভক্তসঙ্গে শ্রীমদ্ভাগবত শ্রবণ করার জন্য আহ্বান করা হয় তখন তারা তাতে তাদের অনিচ্ছা প্রকাশ করে। কখনও কখনও পেশাদারি ভাগবত পাঠকেরা শুরুতেই পরমেশ্বর ভগবানের অতি অন্তরঙ্গ এবং অতি গোপনীয় লীলাবিলাসের আলোচনা করে, যা শুনে আপাতদৃষ্টিতে মনে হয় তা যেন একটি কাম-বিষয়ক গ্রন্থ। শ্রীমদ্ভাগবত শ্রবণ করতে হয় প্রথম থেকে। এই গ্রন্থটির বিষয়বস্তু হৃদয়ঙ্গম করার যোগ্যতা সম্বন্ধে এই শ্লোকে বলা হয়েছেঃ "বহু সুকৃতি অর্জন করার ফলে শ্রীমদ্ভাগবত শ্রবণ করার যোগ্যতা লাভ করা যায়।" বুদ্ধিমান মানুষেরা তাঁদের চিন্তাশীল বিচারের দ্বারা উপলব্ধি করতে পারেন যে মহর্ষি বেদব্যাস আশ্বাস দিয়ে গেছেন যে শ্রীমদ্ভাগবত শ্রবণ করার মাধ্যমে পরমেশ্বর ভগবানকে জানা যায়। বেদে নির্দেশিত পারমার্থিক উপলব্ধির বিভিন্ন স্তরে উন্নীত না হয়েও, কেবলমাত্র শ্রীমদ্ভাগবতের এই জ্ঞান শ্রবণ করার মাধ্যমেই কেবল সরাসরিভাবে পরমহংস স্তরে উন্নীত হওয়া যায়।

শ্লোক ৩

নিগমকল্পতরোর্গলিতং ফলং
শুকমুখাদমৃতদ্রবসংযুতম্‌।
পিবত ভাগবতং রসমালয়ং
মুহুরহো রসিকা ভুবি ভাবুকাঃ ॥ ৩ ॥

নিগম—বৈদিক শাস্ত্রসমূহ; কল্প-তরোঃ—কল্পবৃক্ষ; গলিতম্‌—অত্যন্ত সুপক্ক; ফলম্‌—ফল; শুক—শ্রীমদ্ভাগবতের আদি বক্তা শ্রীল শুকদেব গোস্বামী; মুখাৎ—মুখ থেকে; অমৃত—অমৃত; দ্রব—ঈষৎ কঠিন এবং কোমল হওয়ার ফলে যা সহজে গেলা যায়; সংযুতম্‌—সর্বতোভাবে পূর্ণ; পিবত—আস্বাদন করেন; ভাগবতম্‌—পরমেশ্বর ভগবানের সঙ্গে জীবের নিত্য সম্পর্কের বিজ্ঞান বিষয়ক গ্রন্থ; রসম্‌—রস (যা আস্বাদন করা যায়); আলয়ম্‌—মুক্তি পর্যন্ত, অথবা মুক্ত অবস্থাতে; মুহুঃ—নিরন্তর; অহো—হে; রসিকাঃ—যারা সম্পূর্ণরূপে ভগবৎ-প্রীতিরস সম্পর্কে অবগত; ভুবি—এই পৃথিবীতে; ভাবুকাঃ—বিচক্ষণ এবং চিন্তাশীল।

অনুবাদ

হে বিচক্ষণ এবং চিন্তাশীল মানুষ, কল্পবৃক্ষরূপী বৈদিক শাস্ত্রের অত্যন্ত সুপক্ক ফল শ্রীমদ্ভাগবত আস্বাদন করুন। তা শ্রীল শুকদেব গোস্বামীর শ্রীমুখ থেকে নিঃসৃত হয়েছিল। তাই এই ফলটি আরও অধিক উপাদেয় হয়েছে, যদিও এই অমৃতময় রস মুক্ত পুরুষেরা পর্যন্ত আস্বাদন করে থাকেন।

তাৎপর্য

পূর্ববর্তী দুটি শ্লোকে স্পষ্টভাবে প্রতিপন্ন হয়েছে যে, *শ্রীমদ্ভাগবত* তার অপ্রাকৃত গুণাবলীর প্রভাবে সমস্ত বৈদিক শাস্ত্রের মধ্যে সর্বোত্তম। এই গ্রন্থে যে জ্ঞান বিতরণ করা হয়েছে তা সব রকমের জাগতিক কার্যকলাপ এবং পার্থিব জ্ঞানের অতীত। এই শ্লোকে বর্ণনা করা হয়েছে যে *শ্রীমদ্ভাগবত* কেবল উন্নত জ্ঞান-সমন্বিত শাস্ত্রই নয়, তা হচ্ছে সমস্ত বৈদিক শাস্ত্রের সুপক্ক ফল। পক্ষান্তরে বলা যায় এটি হচ্ছে সমস্ত বৈদিক জ্ঞানের সারাতিসার। এই সমস্ত তথ্য বিবেচনা করে ধৈর্য এবং বিনয় সহকারে তা শ্রবণ করা অত্যন্ত প্রয়োজন। ঐকান্তিক শ্রদ্ধা এবং একাগ্রতা সহকারে *শ্রীমদ্ভাগবতের* বাণী শ্রবণ করা উচিত।

বেদকে কল্পবৃক্ষের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। কেন না তাতে মানুষের জ্ঞাতব্য সমস্ত জ্ঞান রয়েছে। বেদে পরমার্থ-বিষয়ক জ্ঞান যেমন প্রচার করা হয়েছে, তেমনই জাগতিক প্রয়োজনগুলি সম্বন্ধে তাতে বিশদভাবে আলোচনা করা হয়েছে। বেদে সামাজিক, রাজনৈতিক, ধর্মীয়, অর্থনৈতিক, সামরিক, চিকিৎসা বিজ্ঞান, রসায়ন, পদার্থবিদ্যা, অধিবিদ্যা ইত্যাদি সব রকম জাগতিক বিষয়-সম্বন্ধীয় বৈধজ্ঞান প্রদত্ত হয়েছে এবং এইগুলি শরীর ও মন নির্বাহ করার জন্য প্রয়োজন হতে পারে। এই সমস্ত বিষয়ের উর্ধ্বে অধ্যাত্ম বিষয়ের নির্দেশ রয়েছে। বিধিবদ্ধ জ্ঞানের মাধ্যমে জীবকে ক্রমান্বয়ে পারমার্থিক স্তরে উন্নীত করা হয় এবং সর্বোচ্চ পারমার্থিক জ্ঞান হচ্ছে সমস্ত দিব্য আনন্দ বা রসের আধার পরমেশ্বর ভগবানকে জানা।

এই জড় জগতের প্রথম জীব ব্রহ্মা থেকে শুরু করে একটি নগণ্য পিপীলিকা পর্যন্ত সকলেই ইন্দ্রিয়ানুভূতি-প্রসূত অন্য কোন রকম সুখ আস্বাদন করতে চায়। এই সমস্ত ইন্দ্রিয় সুখগুলিকে বলা হয় রস। বিভিন্ন রকমের রস রয়েছে। বৈদিক শাস্ত্রে নিম্নলিখিত বারোটি রসের উল্লেখ করা হয়েছে: ১) রৌদ্র, ২) অদ্ভুত, ৩) হাস্য, ৪) বীর, ৫) করুণ, ৬) বীভৎস, ৭) ভয়ানক, ৮) শান্ত, ৯) দাস্য, ১০) সখ্য, ১১) বাৎসল্য, এবং ১২) মাধুর্য।

এই সমস্ত রসের সমন্বয়কে বলা হয় প্রেম। প্রেমের মুখ্য লক্ষণগুলি হচ্ছে সম্ভ্রম, সেবা, সখ্য, বাৎসল্য এবং মাধুর্য। এই পাঁচটি রস যখন অনুপস্থিত থাকে, তখন প্রেম পরোক্ষভাবে হাস্য, অদ্ভুত, বীর, রৌদ্র, করুণ, ভয়ানক এবং বীভৎস রসের মাধ্যমে প্রকাশিত হয়। যেমন,কোন পুরুষ যখন কোন স্ত্রীর প্রতি আসক্ত থাকে, তখন সেই রসকে বলা হয় মাধুর্য রস। কিন্তু পরস্পরের প্রতি তাদের এই আসক্তি যখন ব্যাহত হয় তখন বিস্ময়, ক্রোধ, বীভৎস অথবা ভয়ানক ভাবের উদয় হতে পারে। অনেক সময় স্ত্রী-পুরুষের প্রণয় ভয়ঙ্কর হত্যাকাণ্ডে পর্যবসিত হতে দেখা যায়। এই সমস্ত রসগুলি মানুষের সঙ্গে মানুষের অথবা পশুর সঙ্গে পশুর মধ্যে দেখা যায়। মানুষের সঙ্গে অন্য কোন জীবের এই ধরনের বিনিময়ের সম্ভাবনা নেই। রসের বিনিময়

স্বজাতির মধ্যেই হয়ে থাকে। গুণগতভাবে জীবাত্মা পরমেশ্বর ভগবানের স্বজাতীয়। তাই চিন্ময় স্তরে পরমেশ্বর ভগবানের সঙ্গে জীবের রস-বিনিময় পূর্ণরূপে প্রকাশিত হয়।

তাই শ্রুতি মন্ত্রে ভগবানকে *রসো বৈ সঃ* অর্থাৎ সমস্ত রসের উৎস বলে বর্ণনা করা হয়েছে। যখন পরমেশ্বর ভগবানের সঙ্গে কারও স্বরূপগত রসের বিনিময় হয় তখনই কেবল যথার্থভাবে আনন্দ আস্বাদন হয়। তখনই কেবল যথার্থভাবে সুখী হওয়া যায়।

শ্রুতি মন্ত্রে বলা হয়েছে যে প্রতিটি জীবই তার স্বরূপে কোন বিশেষ রসে পরমেশ্বর ভগবানের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। মুক্ত অবস্থাতেই কেবল জীবের স্বরূপগত রস পূর্ণরূপে অনুভূত হয়। জড় জগতে যে রস আস্বাদিত হয়ে থাকে তা প্রকৃত রসের বিকৃত প্রতিফলন এবং অনিত্য। জড় জগতে রসের যে প্রকাশ দেখা যায় তা হচ্ছে চিন্ময় রসগুলির জড়জাগতিক রূপ—তা প্রকৃত রস নয়।

তাই যিনি এই সমস্ত রসগুলির সম্বন্ধে সম্পূর্ণভাবে অবগত হয়েছেন, যা হচ্ছে সমস্ত কার্যকলাপের মৌলিক অনুপ্রেরণা, তিনি বুঝতে পারেন কিভাবে প্রকৃত রসগুলি জড় জগতে বিকৃতভাবে প্রতিফলিত হচ্ছে। যাঁরা যথার্থ তত্ত্বজ্ঞানী তাঁরা তাঁদের চিন্ময় স্বরূপে যথার্থ রস আস্বাদন করার প্রয়াস করেন। প্রাথমিক স্তরে তাঁরা পরমেশ্বর ভগবানের সঙ্গে এক হয়ে যাওয়ার বাসনা করেন। তাই অল্পবুদ্ধি-সম্পন্ন অধ্যাত্মবাদীরা যেহেতু বিভিন্ন রস সম্বন্ধে অজ্ঞ, তাই তাঁরা ব্রহ্মে লীন হয়ে যাওয়ার সাযুজ্য মুক্তির ঊর্ধ্বে অগ্রসর হতে পারেন না।

এই শ্লোকে স্পষ্টভাবে ব্যক্ত হয়েছে যে *শ্রীমদ্ভাগবত* যেহেতু বৈদিক জ্ঞানের সুপক্ক ফল, তাই তা মুক্ত অবস্থাতেই আস্বাদন করা যায়। শ্রদ্ধাযুক্ত চিত্তে এই অপ্রাকৃত শাস্ত্র শ্রবণ করার ফলে হৃদয় ভরে এই পূর্ণ আনন্দ আস্বাদন করা যায়। তবে যথার্থ বক্তার কাছ থেকে এই বাণী শ্রবণ করতে হবে—যার-তার কাছ থেকে *শ্রীমদ্ভাগবত* শ্রবণ করলে চলবে না। যথার্থ গুরুপরম্পরার ধারায় এই জ্ঞান আহরণ করতে হয়। চিন্ময় জগৎ থেকে এই জ্ঞান নিয়ে আসেন নারদ মুনি এবং তিনি তাঁর শিষ্য ব্যাসদেবকে তা দান করেন। ব্যাসদেব তা তাঁর পুত্র শুকদেব গোস্বামীকে দান করেন, এবং শুকদেব গোস্বামী মহারাজ পরীক্ষিতের মৃত্যুর সাতদিন পূর্বে তাঁকে এই জ্ঞান দান করেছিলেন। শুকদেব গোস্বামী তাঁর জন্মের পূর্বে থেকেই মুক্ত পুরুষ ছিলেন। তিনি যখন তাঁর মাতৃগর্ভে ছিলেন তখনই তিনি মুক্ত ছিলেন, এবং তাঁর জন্মের পর তাঁকে কোন রকম পারমার্থিক শিক্ষালাভের সংস্কার করতে হয় নি। জন্মের সময়, তা সে জড়জাগতিক বিচার শক্তি হোক্ অথবা পারমার্থিক বিচার শক্তি হোক্, জীবের যথার্থ যোগ্যতা থাকে না। কিন্তু শ্রীল শুকদেব গোস্বামী যেহেতু সম্পূর্ণরূপে মুক্ত পুরুষ ছিলেন, তাই তাঁকে ক্রমান্বয়ে পারমার্থিক তত্ত্বজ্ঞান লাভ করতে হয় নি। কিন্তু তিনি জড় জগতের তিনটি গুণের অতীত এবং মুক্ত অবস্থায় অধিষ্ঠিত হলেও, তিনি মুক্ত পুরুষদের দ্বারা বৈদিক শ্লোকে বন্দিত পরমেশ্বর ভগবানের অপ্রাকৃত রসের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন।

পরমেশ্বর ভগবানের লীলাবিলাস বদ্ধ জীবদের থেকে মুক্ত পুরুষদের আরও বেশি করে আকৃষ্ট করে। সেই পরমেশ্বর ভগবান অবশ্য নির্বিশেষ বা নিরাকার নন, কেন না রস আস্বাদন করা কেবল সবিশেষ পুরুষের পক্ষেই সম্ভব।

শ্রীমদ্ভাগবতে পরমেশ্বর ভগবানের অপ্রাকৃত লীলাবিলাসের কাহিনী বর্ণিত হয়েছে, এবং শ্রীল শুকদেব গোস্বামী তা অত্যন্ত সুসংবদ্ধভাবে বর্ণনা করেছেন। এইভাবে সেই বিষয়টি সকলকেই আকৃষ্ট করে, এমন কি ব্রহ্ম-জ্যোতিতে লীন হয়ে যাওয়ার প্রয়াসী মুমুক্ষুদেরও তা আকৃষ্ট করে।

সংস্কৃত ভাষায় টিয়া পাখিকে বলা হয় শুক। এই শুক পক্ষী যখন তার বক্রিম চঞ্চু দিয়ে কোন পক্ক ফলের স্বাদ গ্রহণ করে, তখন সেই ফল আরও মধুর হয়ে ওঠে। বৈদিক কল্পবৃক্ষের এই সুপক্ক ফল তেমনই শ্রীল শুকদেব গোস্বামীর শ্রীমুখ থেকে নিঃসৃত হয়েছে বলে আরও মধুর হয়ে উঠেছে। শুকদেব গোস্বামী তাঁর পিতৃদেবের কাছ থেকে প্রাপ্ত *শ্রীমদ্ভাগবত* যথাযথভাবে আবৃত্তি করতে পারেন বলে তাঁকে শুক পক্ষীর সঙ্গে তুলনা করা হয় নি, সমস্ত শ্রেণীর মানুষের উপযুক্ত করে তা প্রদান করার যোগ্যতার জনাই তাঁকে শুক পক্ষীর সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে।

শ্রীল শুকদেব গোস্বামীর শ্রীমুখ থেকে এই বিষয়টি এমনভাবে প্রকাশিত হয়েছে যে, যে কোনও নিষ্ঠাবান শ্রোতা যদি শ্রদ্ধাযুক্ত চিত্তে তা শ্রবণ করেন, তা হলে তিনি তৎক্ষণাৎ সেই অপ্রাকৃত রস আস্বাদন করতে পারেন, যা হচ্ছে জড়জাগতিক রস থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। এই সুপক্ক ফলটি অপ্রাকৃত জগতের সর্বোচ্চ লোক কৃষ্ণলোক থেকে হঠাৎ পতিত হয় নি। পক্ষান্তরে, তা অত্যন্ত সাবধানতার সঙ্গে গুরু-শিষ্য-পরম্পরার মাধ্যমে সম্পূর্ণ অবিকৃতভাবে এবং অক্ষতভাবে এখানে নিয়ে আসা হয়েছে। যে সমস্ত মূর্খ মানুষ পারমার্থিক পরম্পরার অন্তর্ভুক্ত নয়, তারা শ্রীল শুকদেব গোস্বামীর পদাঙ্ক অনুসরণ না করে পারমার্থিক জগতে সর্বোচ্চ রস রাসলীলার তত্ত্ব বোঝার চেষ্টা করে মহাবিপর্যয়ের সৃষ্টি করে। শ্রীল শুকদেব গোস্বামী অত্যন্ত সাবধানতার সঙ্গে স্তরে স্তরে এই পারমার্থিক তত্ত্ব উন্মোচন করেছেন। তাই যথার্থ বুদ্ধিমান মানুষের কর্তব্য হচ্ছে শুকদেব গোস্বামী যে সতর্কতার সঙ্গে এই বিষয়টি প্রকাশ করেছেন সে কথা বিবেচনা করে *শ্রীমদ্ভাগবতের* মহিমা হৃদয়ঙ্গম করার চেষ্টা করা। ভাগবত-সম্প্রদায়ে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে, ভবিষ্যতেও *শ্রীমদ্ভাগবতের* তত্ত্ব সম্বন্ধে শিক্ষালাভ করতে হবে শ্রীল শুকদেব গোস্বামীর উপযুক্ত প্রতিনিধির কাছ থেকে। যে সমস্ত মানুষ অর্থ উপার্জন করার জন্য *শ্রীমদ্ভাগবত* পাঠ করে, তারা কখনই শ্রীল শুকদেব গোস্বামীর প্রতিনিধি নয়। এই ধরনের মানুষের কাজ হচ্ছে জীবিকা নির্বাহ করার জন্য *শ্রীমদ্ভাগবত* পাঠ করা। তাই এই ধরনের পেশাদারি ভাগবত-পাঠকদের ভাগবত পাঠ কখনই শোনা উচিত নয়। এই ধরনের মানুষেরা সাধারণত *শ্রীমদ্ভাগবতের* বিষয়বস্তুর গুরুত্ব স্তরে স্তরে হৃদয়ঙ্গম না করে সরাসরি *শ্রীমদ্ভাগবতের* সবচাইতে গোপনীয় বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করতে শুরু

করে। তারা সাধারণত সরাসরিভাবে ভগবানের রাসলীলা নিয়ে আলোচনা করে, যার পারমার্থিক তত্ত্ব মূর্খ লোকেরা বুঝতে পারে না। কিছু কিছু মানুষ ভগবানের এই লীলা-বিলাসকে অশ্লীল বলে মনে করে, আর কিছু লোক তাদের মূর্খ ভাষ্যের দ্বারা তা ঢাকবার চেষ্টা করে। শ্রীল শুকদেব গোস্বামীর পদাঙ্ক অনুসরণ করার কোন রকম বাসনাই তাদের নেই।

তাই রস সম্বন্ধে যারা জানতে ঐকান্তিকভাবে আগ্রহী, তাদের শ্রীল শুকদেব গোস্বামীর ধারায় গুরু-পরম্পরার মাধ্যমে *শ্রীমদ্ভাগবতের* বাণী গ্রহণ করতে হবে, কেন না শ্রীল শুকদেব গোস্বামীই হচ্ছেন *শ্রীমদ্ভাগবতের* আদি বক্তা এবং তিনি পারমার্থিক বিজ্ঞান সম্বন্ধে অনভিজ্ঞ কতকগুলি বিষয়ী মানুষের মনোরঞ্জন করার জন্য তাঁর মনগড়া কতকগুলি কথা বলেননি। *শ্রীমদ্ভাগবত* এত সাবধানতার সঙ্গে প্রদান করা হয়েছে যে, ঐকান্তিক এবং নিষ্ঠাবান শ্রোতা শ্রীল শুকদেব গোস্বামী অথবা তাঁর আদর্শ প্রতিনিধির শ্রীমুখ থেকে এই অমৃতময় রস পান করার ফলে তৎক্ষণাৎ বৈদিক জ্ঞানের সুপক্ক ফল আস্বাদন করতে পারেন।

শ্লোক ৪

নৈমিষেঽনিমিষক্ষেত্রে ঋষয়ঃ শৌনকাদয়ঃ ।
সত্রং স্বর্গায়লোকায় সহস্রসমমাসত ॥ ৪ ॥

নৈমিষে—নৈমিষারণ্য নামক অরণ্যে ; **অনিমিষ-ক্ষেত্র**—যাঁর চক্ষের পলক পড়ে না, সেই পরমেশ্বর ভগবান বিষ্ণুর বিশেষ প্রিয় স্থান ; **ঋষয়ঃ**—ঋষিরা ; **শৌনক-আদয়ঃ**—শৌনক আদি ; **সত্রম্**—যজ্ঞ ; **স্বর্গায়**—পরমেশ্বর ভগবান যিনি স্বর্গে বন্দিত হন ; **লোকায়**—যাঁরা পরমেশ্বর ভগবানের ভক্ত, এবং যাঁরা নিরন্তর পরমেশ্বর ভগবানের সঙ্গে যুক্ত ; **সহস্র**—এক হাজার ; **সমম্**—বছর ; **আসত**—অনুষ্ঠান করেছিলেন।

অনুবাদ

এক সময় শৌনক আদি ঋষিরা পরমেশ্বর ভগবান এবং তাঁর ভক্তদের প্রীতি সাধনের জন্য বিষ্ণু-তীর্থ নৈমিষারণ্যে সহস্র বর্ষ ব্যাপী এক যজ্ঞ অনুষ্ঠান করেছিলেন।

তাৎপর্য

পূর্ববর্তী তিনটি শ্লোক হচ্ছে *শ্রীমদ্ভাগবতের* ভূমিকাস্বরূপ। এখন এই মহান্ শাস্ত্রগ্রন্থের মূল বিষয়টি উপস্থাপন করা হচ্ছে। শ্রীল শুকদেব গোস্বামী প্রথম *শ্রীমদ্ভাগবত* শোনান, তারপর দ্বিতীয়বার তার পুনরাবৃত্তি হয় নৈমিষারণ্যে।

বায়বীয় তন্ত্রে উল্লেখ রয়েছে যে এই ব্রহ্মাণ্ডের কারিগর ব্রহ্মা একটি বিশাল চাকার কথা চিন্তা করেছিলেন, যা এই ব্রহ্মাণ্ডকে পরিবেষ্টন করে থাকবে। সেই বিশাল চক্রের কেন্দ্রটি নৈমিষারণ্য নামক একটি বিশেষ স্থানে রয়েছে। তেমনই, বরাহ পুরাণেও নৈমিষারণ্য উল্লেখ রয়েছে, সেখানে বর্ণনা করা হয়েছে যে এই স্থানে যজ্ঞ-অনুষ্ঠান করার ফলে আসুরিক মনোভাবাপন্ন মানুষদের শক্তি নষ্ট হয়ে যায়। ব্রাহ্মণেরা এই ধরনের যজ্ঞ-অনুষ্ঠানের জন্য নৈমিষারণ্যকে পছন্দ করেন।

ভগবান শ্রীবিষ্ণুর ভক্তরা তাঁর প্রীতি সাধনের জন্য নানা রকম যজ্ঞ অনুষ্ঠান করেন। ভগবানের ভক্ত নিরন্তর ভগবানের সেবা করতে চান, কিন্তু যারা অত্যন্ত অধঃপতিত, তারা জড়জাগতিক সুখ-ভোগের প্রতি আসক্ত। ভগবদ্গীতায় বলা হয়েছে যে ভগবান শ্রীবিষ্ণুর প্রীতিসাধন ব্যতীত জড়জাগতিক স্তরে যে কাজই করা হোক না কেন, তার ফলে অনুষ্ঠানকারীর বন্ধনই কেবল বৃদ্ধি পায়। তাই নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে, সমস্ত কর্মই যেন ভগবান শ্রীবিষ্ণু এবং তাঁর ভক্তদের সন্তুষ্টি বিধানের জন্যই সাধিত হয়। তার ফলে সকলের শান্তি এবং সমৃদ্ধি লাভ হয়।

মহান ঋষিরা সর্বদাই জনসাধারণের মঙ্গল সাধনের জন্য উৎকণ্ঠিত থাকেন, এবং শৌনক আদি ঋষিরা এই নৈমিষারণ্যে সমবেত হয়েছিলেন এক মহান্ এবং দীর্ঘকালব্যাপী যজ্ঞ অনুষ্ঠান করার জন্য। আত্মবিস্মৃত মানুষেরা শান্তি এবং সমৃদ্ধি লাভের যথার্থ পন্থা সম্বন্ধে অবগত নয় কিন্তু ঋষিরা সেই পন্থাটি সম্বন্ধে অত্যন্ত সুষ্ঠুভাবে অবগত, এবং তাই সমস্ত মানুষের মঙ্গল সাধনের জন্য তাঁরা সর্বদাই সেই সমস্ত কর্ম করতে উৎকণ্ঠিত থাকেন, যার ফলে জগতে শান্তি স্থাপিত হয়। তাঁরা সমস্ত জীবের যথার্থ সুহৃদ, এবং তাঁদের ব্যক্তিগত অনেক অসুবিধা হলেও তাঁরা সর্বদাই পরমেশ্বর ভগবানের সেবায় এবং জনসাধারণের মঙ্গল সাধনে যুক্ত থাকেন। শ্রীবিষ্ণু হচ্ছেন একটি বিশাল বৃক্ষের মতো, এবং অন্য সকলে—স্বর্গের দেবতা, মানুষ, সিদ্ধ, চারণ, বিদ্যাধর এবং অন্য সমস্ত জীবেরা হচ্ছে সেই বৃক্ষটির শাখা-প্রশাখা এবং পত্র-স্বরূপ। এই বৃক্ষটির মূলে জল সিঞ্চন করা হলে বৃক্ষটির বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলির আপনা থেকেই পুষ্টিসাধন হয়। কিন্তু যে-সমস্ত শাখা-প্রশাখা এবং পত্র-মূল গাছটি থেকে বিচ্যুত, তারাই কেবল অতৃপ্ত থাকে। যে সমস্ত শাখা-প্রশাখা এবং পত্র-মূল বৃক্ষটি থেকে বিচ্যুত, তাদের যতই জল সিঞ্চন করা হোক্ না কেন, তবুও তারা ধীরে ধীরে শুকিয়ে যায়। তেমনই মনুষ্য-সমাজ যখন বিচ্যুত শাখা-প্রশাখা এবং পত্রের মতো পরমেশ্বর ভগবান থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে, তখন তাদের আর কোনভাবেই পুষ্টিসাধন করা যায় না, এবং যারা সেই চেষ্টা করে তারা কেবল তাদের শক্তিরই অপচয় করে।

আধুনিক জড়বাদী সমাজ পরমেশ্বর ভগবানের সঙ্গে তার সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন করেছে। আর তাই সেই সমাজে নাস্তিক নেতাদের সমস্ত পরিকল্পনা প্রতি পদক্ষেপে ব্যর্থ হচ্ছে, তবুও তাদের জ্ঞান হচ্ছে না।

এই যুগে অজ্ঞানের অন্ধকার থেকে জেগে ওঠার পন্থা হচ্ছে সংঘবদ্ধভাবে পরমেশ্বর ভগবানের দিব্য নাম কীর্তন করা। সেই পন্থা এবং তার উপায় শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু অত্যন্ত বিজ্ঞানসম্মতভাবে প্রদান করে গেছেন, এবং বুদ্ধিমান মানুষদের কর্তব্য হচ্ছে যথার্থ শান্তি এবং সমৃদ্ধি লাভ করার জন্য তাঁর সেই শিক্ষা গ্রহণ করা। শ্রীমদ্ভাগবতও সেই উদ্দেশ্যেই প্রকাশিত হয়েছে, এবং তা আরও বিশদভাবে পরবর্তী অধ্যায়ে বিশ্লেষণ করা হবে।

শ্লোক ৫

ত একদা তু মুনয়ঃ প্রাতর্হুতহুতাগ্নয়ঃ।
সৎকৃতং সূতমাসীনং পপ্রচ্ছুরিদমাদরাৎ ॥ ৫ ॥

ত—ঋষিরা; **একদা**—একদিন; **তু**—কিন্তু; **মুনয়ঃ**—মুনিরা; **প্রাতঃ**—প্রাতঃকালে; **হুত**—আহুতি দিয়ে; **হুত-অগ্নয়ঃ**—হুতাগ্নি; **সৎকৃতম**—যথার্থ শ্রদ্ধা সহকারে; **সূতম্**—সূত গোস্বামীকে; **আসীনম**—উপবিষ্ট; **পপ্রচ্ছুঃ**—জিজ্ঞাসা করলেন; **ইদম্**—এই বিষয়ে; **আদরাৎ**—আদরের সঙ্গে।

অনুবাদ

একদিন প্রাতঃকালে সেই শৌনকাদি ঋষিরা হুতাগ্নিতে আহুতি প্রদান করে সমাদৃত আসনে উপবিষ্ট শ্রীল সূত গোস্বামীকে শ্রদ্ধার সঙ্গে এই প্রশ্নগুলি জিজ্ঞাসা করেছিলেন।

তাৎপর্য

প্রাতঃকাল হচ্ছে পারমার্থিক কার্যকলাপ অনুষ্ঠানের সর্বশ্রেষ্ঠ সময়। মহর্ষিরা শ্রীমদ্ভাগবতের বক্তাকে শ্রদ্ধা সহকারে ব্যাসাসন নামক উচ্চ-আসন প্রদান করেছিলেন। শ্রীল ব্যাসদেব হচ্ছেন সমস্ত মানুষের আদি গুরু। অন্য সমস্ত গুরুদেব তাঁর প্রতিনিধি বলে গণ্য করা হয়। যথার্থ প্রতিনিধি হচ্ছেন তিনি, যিনি যথাযথভাবে ব্যাসদেবের দৃষ্টিভঙ্গি প্রদান করতে পারেন। শ্রীল ব্যাসদেব *শ্রীমদ্ভাগবতের* বাণী শ্রীল শুকদেব গোস্বামীকে দান করেছিলেন এবং শ্রীল সূত গোস্বামী তা শ্রবণ করেছিলেন শ্রীল শুকদেব গোস্বামীর কাছ থেকে। গুরু-পরম্পরার ধারায় ব্যাসদেবের সমস্ত আদর্শ প্রতিনিধিরা হচ্ছেন গোস্বামী। এই সমস্ত গোস্বামীরা সর্বতোভাবে তাঁদের ইন্দ্রিয়গুলি সংযত করে পূর্ববর্তী আচার্যদের প্রদর্শিত পথ অনুসরণ করেন। গোস্বামীরা তাঁদের খেয়াল-খুশিমত ভাগবতের অর্থ বা কদর্থ করে বক্তৃতা দেন না। পক্ষান্তরে, তাঁরা অত্যন্ত সাবধানতার সঙ্গে পূর্ববর্তী যে-সমস্ত আচার্যরা অবিকৃতভাবে এই পারমার্থিক জ্ঞান প্রদান করে গেছেন, তাঁদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে তাঁদের কার্য সম্পাদন করেন।

ভাগবতের শ্রোতারা স্পষ্টভাবে তার অর্থ হৃদয়ঙ্গম করার জন্য বক্তার কাছে প্রশ্ন করতে পারেন, তবে তা কখনই উদ্ধত মনোভাব নিয়ে করা উচিত নয়। ভাগবতের বক্তা এবং সেই বিষয়ের প্রতি গভীর শ্রদ্ধাশীল হয়ে বিনীতভাবে প্রশ্ন করা কর্তব্য। সেই পন্থা ভগবদ্গীতাতেও নির্দেশিত হয়েছে। যথার্থ তত্ত্বদ্রষ্টার কাছে বিনীতভাবে শ্রবণ করার মাধ্যমে এই অপ্রাকৃত জ্ঞান লাভ করতে হয়। তাই নৈমিষারণ্যের ঋষিরা গভীর শ্রদ্ধা সহকারে বক্তা শ্রীল সূত গোস্বামীকে সম্বোধন করেছিলেন।

শ্লোক ৬

ঋষয় উচুঃ

ত্বয়া খলু পুরাণানি সেতিহাসানি চানঘ।
আখ্যাতান্যপ্যধীতানি ধর্মশাস্ত্রাণি যান্যুত ॥ ৬ ॥

ঋষয়ঃ—ঋষিরা; **উচুঃ**—বললেন; **ত্বয়া**—আপনার দ্বারা; **খলু**—নিঃসন্দেহে; **পুরাণানি**—পুরাণসমূহ; **স-ইতিহাসানি**—ইতিহাস সহ; **চ**—এবং; **অনঘ**—নিষ্পাপ; **আখ্যাতানি**—ব্যাখ্যা করা হয়েছে; **অপি**—যদিও; **অধীতানি**—অধ্যয়ন করেছেন; **ধর্ম-শাস্ত্রাণি**—ধর্মশাস্ত্রসমূহ; **যানি**—এই সমস্ত; **উত**—বলেছেন।

অনুবাদ

ঋষিরা বললেনঃ হে পরম শ্রদ্ধেয় সূত গোস্বামী, আপনি সম্পূর্ণরূপে নিষ্পাপ। আপনি মহাভারত আদি ইতিহাস সহ অষ্টাদশ পুরাণ এবং সমস্ত ধর্মশাস্ত্র সদ্গুরুর কাছে অধ্যয়ন করেছেন। শুধু তা-ই নয়, তা আপনি ব্যাখ্যাও করেছেন।

তাৎপর্য

গোস্বামী অথবা শ্রীল ব্যাসদেবের উপযুক্ত প্রতিনিধিকে অবশ্যই সব রকমের পাপ থেকে মুক্ত হতে হবে। কলিযুগের চারটি মুখ্য পাপকর্ম হচ্ছেঃ ১) অবৈধ স্ত্রী-সঙ্গ, ২) পশু-হত্যা, ৩) আসব পান, ৪) সব রকমের দ্যূতক্রীড়া। শ্রীল ব্যাসদেবের আসন, ব্যাসাসনে উপবেশন করার আগে গোস্বামীকে অবশ্যই এই সমস্ত পাপ থেকে মুক্ত হতে হবে। যার চরিত্র সম্পূর্ণরূপে নিষ্কলুষ নয় এবং যে পূর্বোল্লিখিত ঐ সমস্ত পাপ থেকে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত নয়, তাকে কখনই ব্যাসাসনে বসতে দেওয়া উচিত নয়। তাকে কেবল এই সমস্ত পাপ থেকে মুক্ত হলেই চলবে না, তাকে অবশ্যই সমস্ত বৈদিক শাস্ত্রে পারদর্শী হতে হবে। অষ্টাদশ পুরাণও হচ্ছে বেদের অংশ; আর মহাভারত অথবা রামায়ণ আদি ইতিহাসও হচ্ছে বেদের অংশ। আচার্য অথবা গোস্বামীকে অবশ্যই এই সমস্ত শাস্ত্র সম্বন্ধে যথার্থভাবে অভিজ্ঞ হতে হবে। তা শ্রবণ করা এবং ব্যাখ্যা করা পাঠ করার থেকে অধিক গুরুত্বপূর্ণ। কেবল শ্রবণ এবং

বিশ্লেষণ করার মাধ্যমে এই শাস্ত্রজ্ঞান অনুধাবন করা যায়। এই তত্ত্ব বিশ্লেষণ করাকে বলা হয় কীর্তন। এই দুটি পন্থা—শ্রবণ এবং কীর্তন হচ্ছে পারমার্থিক জীবনে উন্নতি করার সব চাইতে গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ। যিনি যথার্থ সদ্‌গুরুর কাছে বিনীতভাবে শ্রবণ করার মাধ্যমে এই অপ্রাকৃত জ্ঞান লাভ করেছেন, তিনিই কেবল সেই বিষয় যথাযথভাবে বিশ্লেষণ করতে পারেন।

শ্লোক ৭

যানি বেদবিদাং শ্রেষ্ঠো ভগবান্ বাদরায়ণঃ।
অন্যে চ মুনয়ঃ সূত পরাবরবিদো বিদুঃ ॥ ৭ ॥

যানি—সেই সব; **বেদ-বিদাম্**—বেদবিদ; **শ্রেষ্ঠঃ**—সর্বোত্তম; **ভগবান্**— পরমেশ্বর ভগবানের অবতার; **বাদরায়ণঃ**—ব্যাসদেব; **অন্যে**—অন্য সকলে; **চ**—এবং; **মুনয়ঃ**—মুনি-ঋষিরা; **সূত**—হে সূত গোস্বামী; **পরাবর-বিদঃ**—বিদ্বান পণ্ডিতদের মধ্যে যিনি ভৌতিক এবং আধিভৌতিক জ্ঞান সম্বন্ধে অভিজ্ঞ; **বিদুঃ**—যিনি জানেন।

অনুবাদ

হে সর্বপ্রবীণ বেদান্তবিদ সূত গোস্বামী, আপনি ভগবানের অবতার ব্যাসদেবের জ্ঞান প্রাপ্ত হয়েছেন, এবং যে সমস্ত ঋষিরা ভৌতিক এবং আধিভৌতিক জ্ঞান পূর্ণরূপে লাভ করেছেন তাদের কাছ থেকেও আপনি জ্ঞানপ্রাপ্ত হয়েছেন।

তাৎপর্য

শ্রীমদ্ভাগবত হচ্ছে ব্রহ্মসূত্র বা বাদরায়ণ বেদান্ত-সূত্রের যথার্থ ভাষ্য। একে যথার্থ বলা হচ্ছে, কেন না ব্যাসদেব হচ্ছেন বেদান্ত-সূত্র এবং শ্রীমদ্ভাগবত বা সমস্ত বৈদিক শাস্ত্রের সারমর্ম—এই দুইয়ের প্রণেতা। ব্যাসদেব ছাড়াও অন্য কয়েকজন ঋষি ছ'টি বৈদিক দর্শন প্রণয়ন করে গেছেন। তাঁরা হচ্ছেন—গৌতম, কণাদ, কপিল, পতঞ্জলি, জৈমিনি এবং অষ্টাবক্র। আস্তিক্যবাদ পূর্ণরূপে বিশ্লেষণ করা হয়েছে বেদান্ত-সূত্রে, কিন্তু অন্যান্য দর্শনগুলি দার্শনিক কল্পনা-প্রসূত জ্ঞান, সেগুলিতে সর্বকারণের পরম কারণ সম্বন্ধে কোন উল্লেখ করা হয়নি। সব ক'টি দার্শনিক মতবাদ সম্বন্ধে যথার্থভাবে অবগত হওয়ার পরেই ব্যাসাসনে বসা যায়, যাতে অন্য সমস্ত মতবাদ খণ্ডন করে শ্রীমদ্ভাগবতের আস্তিক্যবাদ পূর্ণরূপে প্রতিষ্ঠা করা যায়। শ্রীল সূত গোস্বামী ছিলেন যথার্থ শিক্ষক, এবং তাই নৈমিষারণ্যের ঋষিরা তাঁকে ব্যাসদেবের উচ্চ-আসন প্রদান করেছিলেন। শ্রীল ব্যাসদেবকে ভগবান বলে সম্বোধন করা হয়েছে কেন না তিনি হচ্ছেন ভগবানের শক্ত্যাবেশ অবতার।

শ্লোক ৮

বেত্থ ত্বং সৌম্য তৎসর্বং তত্ত্বতস্তদনুগ্রহাৎ।
ব্রূয়ুঃ স্নিগ্ধস্য শিষ্যস্য গুরবো গুহ্যমপ্যুত ॥ ৮ ॥

বেত্থ—আপনি খুব ভালভাবে জানেন; **ত্বম্**—আপনি; **সৌম্য**—সরল এবং নির্মল যে পুরুষ; **তৎ**—তাঁহারা; **সর্বম্**—সমস্ত; **তত্ত্বতঃ**—যথার্থ; **তৎ**—তাঁহাদের; **অনুগ্রহাৎ**—অনুগ্রহের প্রভাবে; **ব্রূয়ুঃ**—বলবেন; **স্নিগ্ধস্য**—বিনীত এবং শ্রদ্ধাশীল; **শিষ্যস্য**—শিষ্যের; **গুরবঃ**—গুরুদেবেরা; **গুহ্যম্**—গোপনীয়; **অপি উত**—সমৃদ্ধ।

অনুবাদ

যেহেতু আপনি শ্রদ্ধাশীল এবং বিনীত, তাই আপনার গুরুদেবেরা বিশেষভাবে অনুগ্রহ করেছেন। কেন না, স্নিগ্ধ স্বভাবসম্পন্ন অর্থাৎ প্রীতিশীল শিষ্যের কাছেই গুরুবর্গ অতি নিগূঢ় রহস্য ব্যক্ত করেন।

তাৎপর্য

পারমার্থিক জীবনে সিদ্ধিলাভের যথার্থ উপায় হচ্ছে শ্রীল গুরুদেবের সন্তুষ্টিবিধান করা এবং তার ফলে তাঁর আন্তরিক আশীর্বাদ লাভ করা। শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর তাঁর বিখ্যাত গুর্বষ্টকমে বলেছেন ঃ

যস্য প্রসাদাদ্ভগবৎপ্রসাদো যস্যাপ্রসাদান্ন গতিঃ কুতোঽপি।
ধ্যায়ংস্তুবংস্তস্য যশস্ত্রিসন্ধ্যং বন্দে গুরোঃ শ্রীচরণারবিন্দম্ ॥

অর্থাৎ, "যিনি প্রীত হলে পরমেশ্বর ভগবান সন্তুষ্ট হন এবং যিনি অসন্তুষ্ট হলে জীবের আর কোন গতি থাকে না, আমার সেই পরমারাধ্য গুরুদেবের শ্রীপাদপদ্মে আমি আমার সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি।" তাই শিষ্যের কর্তব্য হচ্ছে অত্যন্ত বিনীতভাবে সদ্গুরুর সেবা করা। শ্রীল সূত গোস্বামী আদর্শ শিষ্যের এই সমস্ত গুণাবলী প্রদর্শন করছিলেন, এবং তাই শ্রীল ব্যাসদেব আদি তাঁর সমস্ত তত্ত্বদ্রষ্টা গুরুদেবের কাছ থেকে বিশেষ কৃপাপ্রাপ্ত হয়েছিলেন। নৈমিষারণ্যের ঋষিরা নিশ্চিতভাবে জানতেন যে শ্রীল সূত গোস্বামী হচ্ছেন একজন যথার্থ সদ্গুরু। তাই তাঁরা তাঁর শ্রীমুখের বাণী শ্রবণ করার জন্য উদ্গ্রীব হয়েছিলেন।

শ্লোক ৯

তত্র তত্রাঞ্জসায়ুষ্মন্ ভবতা যদ্বিনিশ্চিতম্।
পুংসামেকান্ততঃ শ্রেয়স্তন্নঃ শংসিতুমর্হসি ॥ ৯ ॥

তত্র—উহার; **তত্র**—উহার; **অঞ্জসা**—সহজবোধ্য; **আয়ুষ্মন্**—দীর্ঘ আয়ুসম্পন্ন; **ভবতা**—আপনার দ্বারা; **যৎ**—যা; **বিনিশ্চিতম্**—নিশ্চিতভাবে প্রতিপন্ন হয়েছে;

পুংসাম্—জনসাধারণের জন্য; একান্ততঃ—সম্পূর্ণরূপে; শ্রেয়ঃ—পরম মঙ্গল; তৎ—তাহা; নঃ—আমাদের; শংসিতুম্—বিশ্লেষণ করতে; অর্হসি—উপযুক্ত।

অনুবাদ

হে আয়ুষ্মন্! আপনি জনসাধারণের পরম মঙ্গল কিভাবে সাধিত হয়, তা সহজবোধ্যভাবে আমাদের কাছে শোনান।

তাৎপর্য

ভগবদ্গীতায় আচার্য উপাসনার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। আচার্য এবং গোস্বামীরা সর্বদাই জনসাধারণের মঙ্গল চিন্তায় মগ্ন থাকেন, বিশেষ করে তাঁদের পারমার্থিক মঙ্গলের জন্য। পারমার্থিক মঙ্গল সাধিত হলে পার্থিব হিত আপনা থেকেই সাধিত হয়ে যায়। তাই আচার্যরা জনসাধারণের পারমার্থিক মঙ্গলের নির্দেশ দিয়ে থাকেন। কলিযুগের মানুষদের অধঃপতিত অবস্থা দর্শন করে ঋষিরা সূত গোস্বামীকে অনুরোধ করেছিলেন সমস্ত শাস্ত্রের সারমর্ম প্রদান করতে, কেন না এই কলিযুগের মানুষেরা সম্পূর্ণভাবে অধঃপতিত। তাই ঋষিরা জনসাধারণের হিত-সাধনের জন্য পরম মঙ্গল সম্বন্ধে প্রশ্ন করেছিলেন। কলিযুগের মানুষের অধঃপতিত অবস্থা পরবর্তী কয়েকটি শ্লোকে বর্ণনা করা হয়েছে।

শ্লোক ১০

প্রায়েণাল্পায়ুষঃ সভ্য কলাবস্মিন্ যুগে জনাঃ।
মন্দাঃ সুমন্দমতয়ো মন্দভাগ্যা হ্যুপদ্রুতাঃ ॥ ১০ ॥

প্রায়েণ—প্রায় সর্বদা; **অল্প**—অল্প; **আয়ুষঃ**—আয়ু; **সভ্য**—জ্ঞানবান সমাজের সদস্য; **কলৌ**—এই কলিযুগে; **অস্মিন্**—এখানে; **যুগে**—যুগে; **জনাঃ**—জনসাধারণ; **মন্দাঃ**—অলস; **সুমন্দ-মতয়ঃ**—অত্যন্ত মন্দ গতি; **মন্দ-ভাগ্যাঃ**—দুর্ভাগা; **হিঃ**—এবং সর্বোপরি; **উপদ্রুতাঃ**—রোগাদির দ্বারা উপদ্রুত।

অনুবাদ

হে মহাজ্ঞানী, এই কলিযুগের মানুষেরা প্রায় সকলেই অল্পায়ু। তারা কলহপ্রিয়, অলস, মন্দ গতি, ভাগ্যহীন এবং সর্বোপরি তারা নিরন্তর রোগাদির দ্বারা উপদ্রুত।

তাৎপর্য

ভগবানের ভক্তরা সর্বদাই জনসাধারণের পারমার্থিক মঙ্গলসাধনের জন্য ব্যগ্র থাকেন। নৈমিষারণ্যের ঋষিরা যখন কলিযুগের মানুষদের অবস্থা বিশ্লেষণ করলেন, তখন তাঁরা দেখতে পেয়েছিলেন যে, এই যুগের মানুষদের আয়ু হবে অত্যন্ত কম।

কলিযুগের মানুষদের আয়ু অল্প হওয়ার কারণ খাদ্যাভাব নয় তার কারণ হচ্ছে অনিয়ম এবং অনাচার। সুনিয়ন্ত্রিতভাবে জীবন যাপন করলে, সাদাসিধে খাদ্য আহার করলে যে কোনও মানুষ সুস্থ ও সরলভাবে জীবনধারণ করতে পারে। অত্যাচার, অত্যধিক ইন্দ্রিয়তৃপ্তি, অন্যের করুণার উপর অত্যধিক নির্ভরশীলতা এবং কৃত্রিমভাবে জীবনের মান উন্নত করার চেষ্টা মানুষের জীবনী-শক্তি শোষণ করে নেয়। তাই তাদের আয়ু কমে যায়।

এই যুগের মানুষেরা অত্যন্ত অলস, তারা কেবল জাগতিক বিষয়েই অলস নয়,পারমার্থিক জ্ঞানলাভের বিষয়েও তারা অত্যন্ত অলস। মানব জীবনের বিশেষ উদ্দেশ্য হচ্ছে আত্মজ্ঞান লাভ করা। অর্থাৎ, মানুষের জানা উচিত যে সে কে, এই জড় জগৎ কি এবং পরম সত্য কি। মনুষ্য জীবন হচ্ছে একটি অপূর্ব সুন্দর সুযোগ, যার মাধ্যমে জীব এই জড় জগতে বেঁচে থাকার সংগ্রামরূপী সমস্ত দুঃখ-দুর্দশার সমাপ্তি সাধন করতে পারে এবং তার নিত্য আলয় ভগবদ্ধামে ফিরে যেতে পারে। কিন্তু কু-শিক্ষার প্রভাবে, মানুষদের আজ আর আত্মজ্ঞান লাভের কোন রকম বাসনা নেই। তারা যদি সে সম্বন্ধে জানতেও পারে, দুর্ভাগ্যবশত তারা কতকগুলি কপট প্রচারকের দ্বারা ভ্রান্ত পথে পরিচালিত হয়।

এই কলিযুগে মানুষ কেবল বিভিন্ন রাজনৈতিক সংস্থা এবং দলের শিকারই হচ্ছে না, ইন্দ্রিয়-তৃপ্তির বিভিন্ন রকমের প্রলোভনের দ্বারাও বিপথগামী হচ্ছে। যেমন সিনেমা, অনর্থক খেলাধুলা, জুয়া, ক্লাব, জড় জাগতিক গ্রন্থাগার, অসৎ সঙ্গ, ধূমপান, আসব পান, প্রতারণা, চুরি, বাটপাড়ি ইত্যাদি। তাদের মন এই ধরনের বিভিন্ন কার্যকলাপের ফলে সর্বদাই বিচলিত এবং উৎকণ্ঠায় পূর্ণ। এই যুগে অনেক অসৎ মানুষ তাদের মনগড়া নানা রকম ধর্ম-বিশ্বাস তৈরি করে, যা শাস্ত্রের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত নয়, এবং ইন্দ্রিয়-সুখভোগের প্রতি আসক্ত বিষয়ী মানুষেরা এই ধরনের সমস্ত ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের প্রতি আকৃষ্ট হয়। পরিণামে ধর্মের নামে এত পাপকার্য হতে থাকে যে মানুষের মনের শান্তি এবং দেহের স্বাস্থ্য সম্পূর্ণভাবে নষ্ট হয়ে যায়। আজকাল আর কেউ ব্রহ্মচর্য পালন করে না। আর গৃহস্থরাও গৃহস্থ আশ্রমের বিধি-বিধানগুলি অনুসরণ করে না। তার ফলে এই ধরনের গৃহস্থ আশ্রম থেকে আগত তথাকথিত সমস্ত বানপ্রস্থী এবং সন্ন্যাসীরা সহজেই বিপথগামী হয়। এই কলিযুগের সমস্ত আবহাওয়া অবিশ্বাসে পূর্ণ। মানুষেরা পারমার্থিক জীবনের প্রতি মোটেই উৎসাহী নয় এবং পারমার্থিক বিষয়ের প্রতি তারা কোন রকম গুরুত্ব দেয় না। জড় ইন্দ্রিয়-তর্পণই হচ্ছে এখনকার সভ্যতার মাপকাঠি। এই ধরনের জড় সভ্যতা সংরক্ষণ করার জন্য মানুষ অত্যন্ত জটিল জাতি এবং গোষ্ঠী তৈরি করেছে, এবং তাদের মধ্যে নিরন্তর যুদ্ধ, বিবাদ লেগেই রয়েছে। আজকের মানব-সমাজের নীতিবোধ এত বিকৃত হয়ে গেছে যে মানুষকে পারমার্থিক স্তরে উন্নীত করা অত্যন্ত কঠিন হয়ে দাঁড়িয়েছে। নৈমিষারণ্যের ঋষিরা সমস্ত অধঃপতিত জীবদের জড়

জগতের বন্ধন থেকে মুক্ত করতে ব্যগ্র ছিলেন, তাই তাঁরা এখানে শ্রীল সূত গোস্বামীকে তার নিরাময়ের উপায় সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করেছেন।

শ্লোক ১১

ভূরীণি ভূরিকর্মাণি শ্রোতব্যানি বিভাগশঃ।
অতঃ সাধোঽত্র যৎসারং সমুদ্ধৃত্য মনীষয়া।
ব্রূহি ভদ্রায়ভূতানাং যেনাত্মা সুপ্রসীদতি ॥ ১১ ॥

ভূরীণি—বহুবিধ; **ভূরি**—বিবিধ; **কর্মাণি**—কর্তব্য-কর্ম; **শ্রোতব্যানি**—শ্রবণযোগ্য শাস্ত্রসমূহ; **বিভাগশঃ**—বিভিন্ন বিভাগক্রমে; **অতঃ**—তাই; **সাধো**—হে সাধু; **অত্র**—এতাদৃশ; **যৎ**—যা; **সারম্**—সার; **সমুদ্ধৃত্য**—বাছাই করে সংগৃহীত হয়েছে; **মনীষয়া**—তীক্ষ্ণ বুদ্ধির দ্বারা; **ব্রূহি**—দয়া করে আমাদের বলুন; **ভদ্রায়**—মঙ্গলের জন্য; **ভূতানাম্**—সমস্ত জীবের; **যেন**—যার দ্বারা; **আত্মা**—আত্মা; **সুপ্রসীদতি**—সম্পূর্ণরূপে তৃপ্ত হয়।

অনুবাদ

বহুবিধ শাস্ত্র রয়েছে এবং সেই সমস্ত শাস্ত্রে নানা রকমের কর্তব্য-কর্মের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, যা বহু বছর ধরে বিভাগক্রমে পাঠ করার ফলে কেবল জানতে পারা যায়। তাই হে মহর্ষি, দয়া করে আপনি সেই সমস্ত শাস্ত্রের সারমর্ম সমস্ত জীবের মঙ্গলের জন্য বিশ্লেষণ করে শোনান, যাতে তাদের হৃদয় সম্পূর্ণভাবে সুপ্রসন্ন হতে পারে।

তাৎপর্য

আত্মা জড় পদার্থ থেকে সম্পূর্ণরূপে ভিন্ন। তা চিন্ময়, এবং তাই সব রকমের জড় পরিকল্পনার দ্বারা কখনই আত্মার তৃপ্তিসাধন করা যায় না। সমস্ত শাস্ত্রীয় এবং পারমার্থিক নির্দেশগুলির উদ্দেশ্য হচ্ছে আত্মার সন্তুষ্টি বিধান করা। বিভিন্ন স্থানে, বিভিন্ন কালে, বিভিন্ন ধরনের জীবদের জন্য বিভিন্ন পন্থা নির্দেশিত হয়েছে। এইভাবে অসংখ্য শাস্ত্রগ্রন্থের প্রকাশ হয়েছে। এই সমস্ত ভিন্ন ভিন্ন শাস্ত্রে কর্তব্য-কর্ম অনুষ্ঠানের ভিন্ন ভিন্ন পন্থা প্রদর্শিত হয়েছে। কলিযুগের মানুষদের অধঃপতিত অবস্থার কথা বিবেচনা করে নৈমিষারণ্যের ঋষিরা শ্রীল সূত গোস্বামীকে অনুরোধ করেন যে তিনি যেন এই সমস্ত শাস্ত্রের সারমর্ম বিশ্লেষণ করেন। কেন না এই যুগের অধঃপতিত জীবদের পক্ষে বর্ণ এবং আশ্রম ধর্ম অবলম্বনপূর্বক সমস্ত শাস্ত্রের শিক্ষা হৃদয়ঙ্গম করে পরম পুরুষার্থ সাধন করা সম্ভব হবে না।

বর্ণাশ্রম সমাজ-ব্যবস্থা মানুষকে পারমার্থিক স্তরে উন্নীত করার সর্বশ্রেষ্ঠ পন্থা। কিন্তু কলিযুগের প্রভাবে এই বর্ণাশ্রম অনুশীলন করা সম্ভব নয়। এই যুগের

জনসাধারণের পক্ষে বর্ণাশ্রম-ব্যবস্থার নির্দেশ অনুসারে তাদের পরিবারের সঙ্গে সব রকমের সম্পর্ক ছিন্ন করা সম্ভব নয়। এই যুগের সমস্ত আবহাওয়া শাস্ত্র-বিরুদ্ধ ভাবধারায় পরিপূর্ণ এবং তার ফলে সহজেই বোঝা যায় যে, এই যুগে সাধারণ মানুষদের পক্ষে পারমার্থিক উন্নতি সাধন করা অত্যন্ত কঠিন। ঋষিরা যে কেন এই বিষয়ে সূত গোস্বামীকে প্রশ্ন করেছিলেন তা পরবর্তী শ্লোকগুলিতে বিশ্লেষণ করা হবে।

শ্লোক ১২

সূত জানাসি ভদ্রং তে ভগবান্ সাত্বতাং পতিঃ।
দেবক্যাং বসুদেবস্য জাতো যস্য চিকীর্ষয়া ॥ ১২ ॥

সূত—হে সূত গোস্বামী; **জানাসি**—আপনি জানেন; **ভদ্রম্ তে**—সর্বতোভাবে আপনার মঙ্গল হোক; **ভগবান্**—পরমেশ্বর ভগবান; **সাত্বতাম্**—শুদ্ধ ভক্তদের; **পতিঃ**—রক্ষাকর্তা; **দেবক্যাম্**—দেবকীর গর্ভে; **বসুদেবস্য**—বসুদেবের দ্বারা; **জাতঃ**—জন্মগ্রহণ করেছিলেন; **যস্য**—উদ্দেশ্যে; **চিকীর্ষয়া**—অনুষ্ঠান করার ইচ্ছা।

অনুবাদ

হে সূত গোস্বামী! আপনার সর্ববিধ মঙ্গল হোক। আপনিও অবগত আছেন যে কি উদ্দেশ্যে পরমেশ্বর ভগবান বসুদেব-পত্নী দেবকীর গর্ভে আবির্ভূত হয়েছিলেন।

তাৎপর্য

ভগবান হচ্ছেন তিনি, যিনি সমগ্র ঐশ্বর্য, সমগ্র বীর্য, সমগ্র যশ, সমগ্র শ্রী, সমগ্র জ্ঞান এবং সমগ্র বৈরাগ্যের পূর্ণ অধীশ্বর। তিনি তাঁর শুদ্ধ ভক্তদের রক্ষা করেন। ভগবান যদিও সকলের প্রতি সমদৃষ্টিসম্পন্ন, তবুও তিনি তাঁর ভক্তের প্রতি বিশেষভাবে অনুরক্ত। সৎ কথাটির অর্থ হচ্ছে পরম সত্য। আর যে সমস্ত মানুষ সেই পরম সত্যের সেবা করেন, তাঁদের বলা হয় 'সাত্বত'। আর পরমেশ্বর ভগবানের, যিনি এই ধরনের শুদ্ধ ভক্তদের রক্ষা করেন, তাঁর আরেক নাম 'সাত্বতাং পতিঃ।' ভদ্রম্ অর্থাৎ 'আপনার সর্ববিধ মঙ্গল হোক,' কথাটির মাধ্যমে শ্রীল সূত গোস্বামীর কাছ থেকে পরমতত্ত্ব সম্বন্ধে জানবার জন্য ঋষিদের ব্যাকুলতা প্রকাশ পাচ্ছে। পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বসুদেবের পত্নী দেবকীর সন্তানরূপে আবির্ভূত হয়েছিলেন। বসুদেব হচ্ছেন চিন্ময় স্থিতির প্রতীক, যেখানে পরমেশ্বর ভগবান প্রকাশিত হন।

শ্লোক ১৩

তন্নঃ শুশ্রূষমাণানামর্হস্যঙ্গানুবর্ণিতুম্।
যস্যাবতারো ভূতানাং ক্ষেমায় চ ভবায় চ ॥ ১৩ ॥

তৎ—যে সমস্ত ; নঃ—আমাদের ; শুশ্রূষমাণানাম্—শ্রবণাভিলাষী ; অর্হসি—কর্তব্য ; অঙ্গ—হে সূত গোস্বামী ; অনুবর্ণিতুম্—পূর্বতন আচার্যদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে বর্ণনা করা ; যস্য—যাঁর ; অবতারঃ—অবতার ; ভূতানাম্—জীবসমূহের ; ক্ষেমায়—মঙ্গলের জন্য ; চ—এবং ; ভবায়—উন্নতিসাধন ; চ—এবং।

অনুবাদ

হে সূত গোস্বামী ! যাঁর অবতার এবং আবির্ভাব সমস্ত জীবের মঙ্গল এবং সমৃদ্ধির জন্য হয়ে থাকে, আমরা সেই বাসুদেবের লীলাসমূহ শ্রবণ করতে অভিলাষী। আপনি অনুগ্রহ করে গুরু-পরম্পরায় লব্ধ সেই জ্ঞান আমাদের কাছে ব্যাখ্যা করুন, কেন না তা শ্রবণ ও কীর্তনে উভয়েরই কল্যাণ সাধিত হয়।

তাৎপর্য

পরম সত্য সম্বন্ধে অপ্রাকৃত বাণী শ্রবণ করার পন্থা এখানে বর্ণিত হয়েছে। এই বাণী শ্রবণ করার প্রথম যোগ্যতা হচ্ছে যে শ্রোতাকে তা শ্রবণ করার জন্য ঐকান্তিকভাবে আগ্রহী হতে হবে। আর তার বক্তাকে পূর্বতন আচার্যদের পরম্পরায় যুক্ত হতে হবে। যে সমস্ত মানুষ জড় বিষয়ের প্রতি আসক্ত, তাদের পক্ষে পরম-তত্ত্ব সম্বন্ধীয় এই চিন্ময় বাণী হৃদয়ঙ্গম করা সম্ভব নয়। সদ্গুরুর নির্দেশনায় শিষ্য ধীরে ধীরে পবিত্র হয়। তাই শ্রদ্ধাবনত চিত্তে গুরু-শিষ্য পরম্পরার ধারায় প্রবাহিত পরম তত্ত্বজ্ঞান শ্রবণ করাই হচ্ছে চিন্ময় জ্ঞান লাভের পন্থা। সূত গোস্বামী এবং নৈমিষারণ্যের ঋষিরা—উভয়ের ক্ষেত্রেই এই যোগ্যতাগুলি যথাযথভাবে প্রকাশ পেয়েছে, কেন না শ্রীল সূত গোস্বামী শ্রীল ব্যাসদেবের ধারায় এই জ্ঞান লাভ করেছিলেন এবং নৈমিষারণ্যের ঋষিরা সকলেই ছিলেন সেই পরম তত্ত্বজ্ঞান লাভে ঐকান্তিকভাবে প্রয়াসী। এইভাবে পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের অলৌকিক লীলাবিলাস, তাঁর জন্ম, আবির্ভাব এবং অপ্রকট, তাঁর রূপ, তাঁর নাম ইত্যাদি সমন্বিত এই অপ্রাকৃত বিষয় অনায়াসে হৃদয়ঙ্গম করার যোগ্যতা তাঁরা অর্জন করেছিলেন। এই ধরনের আলোচনা সমস্ত মানুষকে পারমার্থিক তত্ত্বজ্ঞানের পথে অগ্রসর হতে সাহায্য করে।

শ্লোক ১৪

আপন্নঃ সংসৃতিং ঘোরাং যন্নাম বিবশো গৃণন্।
ততঃ সদ্যো বিমুচ্যেত যদ্বিভেতি স্বয়ং ভয়ম্ ॥ ১৪ ॥

আপন্নঃ—আবদ্ধ হয়ে ; সংসৃতিম্—জন্ম এবং মৃত্যুর আবর্তে ; ঘোরাম্—অত্যন্ত ভয়ঙ্কর ; যৎ—যা ; নাম—ভগবানের অপ্রাকৃত নাম ; বিবশঃ—অচেতনভাবে ; গৃণন্—উচ্চারণ করে ; ততঃ—তার ফলে ; সদ্যঃ—তৎক্ষণাৎ ; বিমুচ্যেত—মুক্ত হয় ; যৎ—যা ; বিভেতি—মহাকাল ; স্বয়ম্—সাক্ষাৎ ; ভয়ম্—ভয় স্বয়ং।

অনুবাদ

জন্ম-মৃত্যুর ভয়ঙ্কর আবর্তে আবদ্ধ মানুষ বিবশ হয়েও পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের দিব্য নাম উচ্চারণ করতে করতে অচিরেই সেই সংসারচক্র থেকে মুক্ত হয়, সেই নামে স্বয়ং মহাকালও ভীত হন।

তাৎপর্য

বাসুদেব অর্থাৎ পরমেশ্বর ভগবান হচ্ছেন শ্রীকৃষ্ণ, সবকিছুর পরম নিয়ন্তা। এই জগতে এমন কেউ নেই যিনি সর্বশক্তিমান ভগবানের ভয়ে ভীত নন। রাবণ, হিরণ্যকশিপু, কংস আদি বহু বড় বড় অসুর ছিল অত্যন্ত শক্তিশালী জীব, কিন্তু তারা সকলেই পরমেশ্বর ভগবানের হাতে নিহত হয়েছিল। সর্বশক্তিমান বাসুদেব তাঁর দিব্য নামে তাঁর সর্বশক্তি অর্পণ করেছেন। সবকিছুই তাঁর সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত এবং সব কিছুর যথার্থ পরিচয় তাঁরই মধ্যে বর্তমান। এখানে বলা হয়েছে যে, স্বয়ং ভয় অর্থাৎ মহাকাল শ্রীকৃষ্ণের নামকে ভয় করেন। তার অর্থ হচ্ছে এই যে, শ্রীকৃষ্ণের নাম শ্রীকৃষ্ণের থেকে অভিন্ন। তাই শ্রীকৃষ্ণের নাম শ্রীকৃষ্ণেরই মতো সর্বশক্তিমান। তাঁদের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই,তাই যে কেউই মহা বিপদেও পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের দিব্য নামের আশ্রয় গ্রহণ করতে পারেন। বিবশ হয়ে অথবা পারিপার্শ্বিক অবস্থার প্রভাবে বাধ্য হয়েও যদি কেউ শ্রীকৃষ্ণের দিব্য নাম উচ্চারণ করেন, তা তাঁকে জন্ম-মৃত্যুর আবর্ত থেকে মুক্ত হতে সাহায্য করতে পারে।

শ্লোক ১৫

যৎপাদসংশ্রয়াঃ সূত মুনয়ঃ প্রশমায়নাঃ।
সদ্যঃ পুনন্ত্যুপস্পৃষ্টাঃ স্বর্ধুন্যাপোঽনুসেবয়া ॥ ১৫ ॥

যৎ—যাঁর; **পাদ**—শ্রীপাদপদ্ম; **সংশ্রয়াঃ**—যাঁরা আশ্রয় গ্রহণ করেছেন; **সূত**—হে সূত গোস্বামী; **মুনয়ঃ**—মহান ঋষিরা; **প্রশমায়নাঃ**—ভগবদ্ভক্তিতে মগ্ন; **সদ্যঃ**—তৎক্ষণাৎ; **পুনন্তি**—পবিত্র হয়; **উপস্পৃষ্টাঃ**—কেবলমাত্র সঙ্গ প্রভাবেই; **স্বর্ধুনী**—পবিত্র গঙ্গা নদী; **আপঃ**—জল; **অনুসেবয়া**—স্পর্শন, অবগাহন আদি সেবার দ্বারা।

অনুবাদ

হে সূত গোস্বামী, যে সমস্ত মহর্ষিরা সর্বতোভাবে পরমেশ্বর ভগবানের শ্রীপাদপদ্মের আশ্রয় গ্রহণ করেছেন, তাঁদের সঙ্গ-প্রভাবে অর্থাৎ দর্শন মাত্রই জীব পবিত্র হয়, কিন্তু সুরধুনী গঙ্গার জল সাক্ষাৎ সেবা অর্থাৎ স্পর্শন, অবগাহন আদি করার পরেই কেবল মানুষকে পবিত্র করে।

তাৎপর্য

পরমেশ্বর ভগবানের ভক্তের পাবনী শক্তি গঙ্গার থেকেও অধিক। দীর্ঘকাল ধরে গঙ্গার জলে অবগাহন করলে এবং গঙ্গার জল পান করলে পারমার্থিক মঙ্গল সাধিত হয়। কিন্তু ভগবানের শুদ্ধ ভক্তের কৃপা যে কোন জীবকে তৎক্ষণাৎ সব রকমের কলুষ থেকে মুক্ত করতে পারে। *ভগবদ্গীতায়* বলা হয়েছে যে, স্ত্রী, বৈশ্য অথবা শূদ্র আদি যে কোনও মানুষ পরমেশ্বর ভগবানের শ্রীপাদপদ্মের আশ্রয় গ্রহণ করতে পারেন এবং তার ফলে ভগবদ্ধামে ফিরে যেতে পারেন। পরমেশ্বর ভগবানের শ্রীপাদপদ্মের আশ্রয় গ্রহণ করার অর্থ হচ্ছে ভগবানের শুদ্ধ ভক্তের আশ্রয় গ্রহণ করা। ভগবানের শুদ্ধ ভক্তদের একমাত্র কাজ হচ্ছে পরমেশ্বর ভগবানের সেবা করা এবং তাই তাঁদের প্রভুপাদ এবং বিষ্ণুপাদ আদি উপাধিতে ভূষিত করা হয়, যার অর্থ হচ্ছে পরমেশ্বর ভগবানের শ্রীপাদপদ্মের প্রতিনিধি। তাই কেউ যখন পরমেশ্বর ভগবানের শুদ্ধ ভক্তের শিষ্যত্ব বরণ করে পরমেশ্বর ভগবানের শ্রীপাদপদ্মের আশ্রয় গ্রহণ করেন, তিনি তৎক্ষণাৎ পবিত্র হন। ভগবানের এই শুদ্ধ ভক্তদের ভগবানেরই মতো সম্মান করা হয়, কেন না তাঁরা ভগবানের সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ সেবায় যুক্ত। ভগবান সব সময়ই চান যে এই জড় জগতের অধঃপতিত জীবেরা যেন তাঁর কাছে ফিরে যায়, এবং ভগবানের শুদ্ধ ভক্তরা অত্যন্ত বিচক্ষণতার সঙ্গে সেই কার্যটি সম্পাদন করেন। এই ধরনের শুদ্ধ ভক্তদের শাস্ত্রে 'সাক্ষাৎ হরি' বলে বর্ণনা করা হয়েছে। শুদ্ধ ভক্তের নিষ্ঠাবান শিষ্যরা তাঁদের গুরুদেবকে পরমেশ্বর ভগবানেরই সমপর্যায়ভুক্ত বলে মনে করেন ; কিন্তু শুদ্ধ ভক্ত সর্বদাই মনে করেন যে তিনি হচ্ছেন পরমেশ্বর ভগবানের দাসানুদাস। এটিই হচ্ছে শুদ্ধ ভক্তির পথ।

শ্লোক ১৬

কো বা ভগবতস্তস্য পুণ্যশ্লোকেড্যকর্মণঃ।
শুদ্ধিকামো ন শৃণুয়াদ্যশঃ কলিমলাপহম্ ॥ ১৬ ॥

কঃ—কে ; বা—বরঞ্চ ; ভগবতঃ—ভগবানের ; তস্য—তাঁর ; পুণ্য—পুণ্য ; শ্লোকেড্য—উত্তম শ্লোকের দ্বারা আরাধ্য ; কর্মণঃ—কর্মসমূহ ; শুদ্ধিকামঃ—সব রকমের পাপ থেকে মুক্ত হওয়ার আকাঙ্ক্ষী ; ন—না ; শৃণুয়াৎ—শ্রবণ করে ; যশঃ—যশ ; কলি—কলিযুগে ; মলাপহম্—কলিযুগের কলুষ নাশকারী।

অনুবাদ

কলিযুগের পাপ-পঙ্কিল অবস্থা থেকে মুক্ত হওয়ার আকাঙ্ক্ষী এমন কে আছে যে পরমেশ্বর ভগবানের অপ্রাকৃত মহিমা শ্রবণ করতে অনিচ্ছুক ?

তাৎপর্য

এই কলিযুগ হচ্ছে সব চাইতে অধঃপতিত যুগ, কেন না এই যুগে সকলে অত্যন্ত কলহপরায়ণ। কলিযুগের মানুষের প্রবৃত্তি এতই জঘন্য যে একটু ভুল বোঝাবুঝির ফলেই তারা প্রচণ্ড সংগ্রামে লিপ্ত হয়। যাঁরা পরমেশ্বর ভগবানের প্রতি শুদ্ধ ভক্তিপরায়ণ, যাঁরা নিজেদের ধনসম্পদ বৃদ্ধির বাসনারহিত এবং যাঁরা সব রকমের সকাম কর্ম এবং জল্পনা-কল্পনা প্রসূত জ্ঞানের প্রতি নিরাসক্ত তাঁরাই কেবল এই অত্যন্ত জটিল যুগের বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়ার যোগ্য। আজকালকার নেতারা শান্তি এবং সৌহার্দ্যপূর্ণভাবে বসবাস করার প্রয়াসের কথা বলে, কিন্তু ভগবানের মহিমা শ্রবণ করার অতি সরল পন্থা অবলম্বন করার মাধ্যমেই যে কেবল সমস্ত জগৎ জুড়ে শান্তি প্রতিষ্ঠা হতে পারে সে সম্বন্ধে তাদের কোন জ্ঞান নেই। পক্ষান্তরে, এই ধরনের নেতারা ভগবানের মহিমা প্রচারের বিরোধী। অর্থাৎ, সেই সমস্ত নেতারা ভগবানের অস্তিত্ব সম্পূর্ণরূপে অস্বীকার করতে চায়। ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রের নামে এই ধরনের নেতারা প্রতি বছরই নানা রকমের পরিকল্পনা করে, কিন্তু ভগবানের দুরতিক্রম্য প্রকৃতির প্রভাবে সেই সমস্ত পরিকল্পনাগুলি নিরন্তর ব্যর্থ হয়। তাদের শান্তি এবং সৌহার্দ্য প্রতিষ্ঠার সব রকম প্রচেষ্টাগুলি যে ব্যর্থ হচ্ছে, সেটা দেখার দৃষ্টিশক্তিও তাদের নেই। কিন্তু এখানে সেই বাধা অতিক্রম করার উপায়ের আভাস দেওয়া হয়েছে। আমরা যদি যথার্থই শান্তি চাই, তা হলে আমাদের পরমেশ্বর ভগবানকে জানার পথ উন্মুক্ত করতে হবে এবং *শ্রীমদ্ভাগবতের* বর্ণনা অনুসারে তাঁর পবিত্র কার্যকলাপ কীর্তন করার মাধ্যমে তাঁর মহিমা প্রচার করতে হবে।

শ্লোক ১৭

তস্য কর্মাণ্যুদারাণি পরিগীতানি সূরিভিঃ।
ব্রূহি নঃ শ্রদ্দধানানাং লীলয়া দধতঃ কলাঃ ॥ ১৭ ॥

তস্য—তাঁর; **কর্মাণি**—অপ্রাকৃত কার্যকলাপ; **উদারাণি**—মহান; **পরিগীতানী**—সংকীর্তিত; **সূরিভিঃ**—মহাত্মাদের দ্বারা; **ব্রূহি**—দয়া করে বলুন; **নঃ**—আমাদের; **শ্রদ্দধানানাং**—শ্রদ্ধা সহকারে গ্রহণ করতে প্রস্তুত; **লীলয়া**—লীলাবিলাস; **দধতঃ**—আবির্ভূত হন; **কলাঃ**—অবতারসমূহ।

অনুবাদ

তাঁর অপ্রাকৃত কার্যকলাপ অত্যন্ত মহৎ এবং উদার, এবং নারদ আদি মহান ঋষিরা তা কীর্তন করেন। তা শ্রবণ করার জন্য আমরা অত্যন্ত আকুল হয়েছি, দয়া করে আপনি বিভিন্ন অবতারে তাঁর বিভিন্ন লীলাবিলাসের কথা আমাদের বলুন।

তাৎপর্য

পরমেশ্বর ভগবান কখনই নিষ্ক্রিয় নন, যে কথা কিছু অল্প বুদ্ধিসম্পন্ন লোকেরা বলে থাকে। তাঁর কার্যকলাপ মহৎ এবং উদার। তিনি যে জড় এবং চিন্ময় জগৎ সৃষ্টি করেছেন, তা অত্যন্ত অদ্ভুত এবং সেগুলি সব রকম বৈচিত্র্যে পরিপূর্ণ। নারদ মুনি, ব্যাস, বাল্মীকি, দেবল, অসিত, মধ্ব, শ্রীচৈতন্য, রামানুজ, বিষ্ণুস্বামী, নিম্বার্ক, শ্রীধর, বিশ্বনাথ, বলদেব, ভক্তিবিনোদ, ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী এবং অন্যান্য সমস্ত তত্ত্বদ্রষ্টা পুরুষেরা সে সম্বন্ধে বর্ণনা করে গেছেন। ভগবানের জড় এবং চিন্ময় উভয় সৃষ্টিই শ্রী, ঐশ্বর্য এবং জ্ঞানে পরিপূর্ণ, কিন্তু চিন্ময় জগৎ সৎ, চিৎ এবং আনন্দময় হওয়ার ফলে আরও অধিক চমৎকার। অপ্রাকৃত জগতের বিকৃত প্রতিফলন এই জড় জগতের প্রকাশ হয় ক্ষণকালের জন্য, এবং তাকে চলচ্চিত্রের সঙ্গে তুলনা করা যায়। যে সমস্ত অল্প বুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ মেকি জিনিসের প্রতি আকৃষ্ট হয় তারাই কেবল এই জড় জগতের দ্বারা আকৃষ্ট হয়। এই ধরনের অল্পবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষদের বাস্তব জগৎ সম্বন্ধে কোন ধারণাই নেই, এবং তারা মনে করে যে এই জড় জগতের মিথ্যা প্রকাশই হচ্ছে সব কিছু। কিন্তু ব্যাসদেব এবং নারদ প্রমুখ মহর্ষিদের দ্বারা পরিচালিত বুদ্ধিমান মানুষেরা জানেন যে ভগবদ্ধাম হচ্ছে আরও আনন্দদায়ক, আরও বিশাল এবং নিত্য আনন্দ এবং জ্ঞানময়। যারা ভগবানের অপ্রাকৃত ধাম এবং ভগবানের অপ্রাকৃত কার্যকলাপ সম্বন্ধে অবগত নয়, তাদের প্রতি কৃপা করেই ভগবান এই জগতে অবতরণ করে, তাঁর সঙ্গ করার ফলে যে কি অচিন্তনীয় আনন্দ উপভোগ করা যায় তা প্রদর্শন করেন। এই ধরনের কার্যকলাপের মাধ্যমে তিনি এই জড় জগতের বদ্ধ জীবদের আকৃষ্ট করেন। এই ধরনের বদ্ধ জীবদের কেউ কেউ জড় ইন্দ্রিয়-সুখ উপভোগের মিথ্যা প্রচেষ্টায় লিপ্ত, আর অন্যরা 'নেতি নেতি' করে চিন্ময় জগতে তাদের যথার্থ আনন্দময় জীবনকে প্রত্যাখ্যান করছে। এই ধরনের অল্প বুদ্ধিসম্পন্ন মানুষদের বলা হয় কর্মী এবং জ্ঞানী। কিন্তু এই দুই শ্রেণীর মানুষদের ঊর্ধ্বে রয়েছেন প্রকৃত তত্ত্বদ্রষ্টা মহাত্মা, যাঁদের বলা হয় সাত্বত বা ভক্ত, যারা কোন রকম অর্থহীন জাগতিক কার্যকলাপে লিপ্ত নন, অথবা মনোধর্মপ্রসূত জ্ঞানের প্রয়াসীও নন। তাঁরা পরমেশ্বর ভগবানের সেবায় যুক্ত এবং তার ফলে তাঁরা কর্মী এবং জ্ঞানীদের অজ্ঞাত যে সর্বোচ্চ পারমার্থিক কল্যাণ, তা সাধন করেন।

জড় এবং চিন্ময় জগতে পরম নিয়ন্তারূপে পরমেশ্বর ভগবানের বহু অবতার রয়েছে। ব্রহ্মা, রুদ্র, মনু, পৃথু এবং ব্যাসদেব হচ্ছেন তাঁর জড়া শক্তির আবেশ-অবতার; কিন্তু রাম, নৃসিংহ, বরাহ এবং বামন আদি অবতারেরা হচ্ছেন তাঁর চিন্ময় অবতার। শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন সমস্ত অবতারের উৎস, এবং তাই তিনিই হচ্ছেন সর্বকারণের পরম কারণ।

শ্লোক ১৮

অথাখ্যাহি হরের্ধীমন্নবতারকথাঃ শুভাঃ।
লীলা বিদধতঃ স্বৈরমীশ্বরস্যাত্মমায়য়া ॥ ১৮ ॥

অথ—অতএব; **আখ্যাহি**—বলুন; **হরেঃ**—পরমেশ্বর ভগবানের; **ধীমন্**—হে বুদ্ধিমান; **অবতার**—অবতারসমূহ; **কথাঃ**—বৃত্তান্ত; **শুভাঃ**—মঙ্গলময়; **লীলা**—অপ্রাকৃত কার্যকলাপ; **বিদধতঃ**—অনুষ্ঠিত; **স্বৈরম্**—স্বতন্ত্রভাবে; **ঈশ্বরস্য**—পরমেশ্বর ভগবানের; **আত্ম**—স্বীয়; **মায়য়া**—শক্তির দ্বারা।

অনুবাদ

হে মহাজ্ঞানী সূত গোস্বামী, দয়া করে আপনি আমাদের কাছে পরমেশ্বর ভগবানের অসংখ্য অবতারের অপ্রাকৃত লীলাবিলাসের কথা বর্ণনা করুন। পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সেই পরম মঙ্গলময় লীলাবিলাস সম্পাদিত হয় তাঁর চিৎ-শক্তি যোগমায়ার দ্বারা।

তাৎপর্য

জড় জগতের সৃষ্টি, স্থিতি এবং প্রলয়ের জন্য পরমেশ্বর ভগবান হাজার হাজার রূপে অবতরণ করেন এবং তাঁর এই চিন্ময় রূপে এই সমস্ত চিন্ময় কার্যকলাপ পরম মঙ্গলময়। সেই সমস্ত কার্যকলাপ সম্পাদিত হওয়ার সময় যাঁরা উপস্থিত থাকেন তাঁরা এবং যাঁরা সেই সমস্ত কার্যকলাপের অপ্রাকৃত বর্ণনা শ্রবণ করেন তাঁদের উভয়েরই মঙ্গল সাধিত হয়।

শ্লোক ১৯

বয়ং তু ন বিতৃপ্যাম উত্তমশ্লোকবিক্রমে।
যচ্ছৃণ্বতাং রসজ্ঞানাং স্বাদু স্বাদু পদে পদে ॥ ১৯ ॥

বয়ম্—আমরা; **তু**—কিন্তু; **ন**—না; **বিতৃপ্যামঃ**—তৃপ্ত হব না; **উত্তম-শ্লোক**—পরমেশ্বর ভগবান, উত্তম শ্লোক বা অপ্রাকৃত প্রার্থনার দ্বারা যাঁর মহিমা কীর্তিত হয়; **বিক্রমে**—বিক্রমপূর্ণ লীলাবিলাস; **যৎ**—যাহা; **শৃণ্বতাম্**—নিরন্তর শ্রবণ করার ফলে; **রস-জ্ঞানাম্**—রসিকদের; **স্বাদু**—আস্বাদন করেন; **স্বাদু**—সুস্বাদু; **পদে পদে**—প্রতি মুহূর্তে।

অনুবাদ

উত্তম শ্লোকের দ্বারা বন্দিত হন যে পরমেশ্বর ভগবান, তাঁর অপ্রাকৃত লীলাকথা যতই আমরা শ্রবণ করি না কেন, আমাদের তৃপ্তি হবে না। যাঁরা তাঁর সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত

হওয়ার অপ্রাকৃত রস আস্বাদন করেছেন তাঁরা নিরন্তর তাঁর লীলাবিলাসের রস আস্বাদন করেন।

তাৎপর্য

পরমেশ্বর ভগবানের অপ্রাকৃত লীলাবিলাসের সঙ্গে জড় জগতের গল্প-উপন্যাসের অথবা ইতিহাসের একটা মস্ত বড় পার্থক্য রয়েছে। প্রকৃতপক্ষে এই ব্রহ্মাণ্ডের ইতিহাস হচ্ছে ভগবানের বিভিন্ন অবতারের লীলাবিলাসের ইতিহাস। *রামায়ণ, মহাভারত,* এবং *অষ্টাদশ পুরাণ* হচ্ছে পুরাকালের ভগবানের বিভিন্ন অবতারের অপ্রাকৃত কার্যকলাপের বর্ণনা সমন্বিত ইতিহাস। তাই বারবার পাঠ করলেও তা চিরকাল নতুনই থাকে। যেমন, যে কেউ *ভগবদ্গীতা* অথবা *শ্রীমদ্ভাগবত* সারা জীবন ধরে বারবার পড়ে যেতে পারে, কিন্তু তবুও প্রত্যেকবারই তা তার কাছে নতুন বলে মনে হবে—প্রতিবারই নতুন নতুন তথ্য উদ্ঘাটিত হবে। এই জড় জগতের সমস্ত খবরগুলি স্থাবর বা নিশ্চল, কিন্তু অপ্রাকৃত সংবাদ গতিশীল, ঠিক যেমন আত্মা গতিশীল আর জড় পদার্থ স্থাবর। যাঁরা অপ্রাকৃত বিষয় হৃদয়ঙ্গম করার স্বাদ পেয়েছেন তাঁরা বারবার সেই বৃত্তান্ত শ্রবণ করেও ক্লান্ত হন না। জড়জাগতিক কার্যকলাপে অচিরেই অতৃপ্তির উদয় হয়, কিন্তু ভগবদ্ভক্তির চিন্ময় সেবায় যুক্ত হলে কখনই যেন তৃপ্তি হয় না। উত্তম-শ্লোক বলতে সেই সমস্ত শাস্ত্রগ্রন্থের বর্ণনা করা হয়েছে, যা অজ্ঞানতা-প্রসূত নয়। জড় জগতের সমস্ত সাহিত্য তমোগুণ বা অজ্ঞানের প্রকাশ, কিন্তু অপ্রাকৃত শাস্ত্রগ্রন্থ সেরকম নয়। অপ্রাকৃত শাস্ত্রগ্রন্থ তমোগুণের অতীত, এবং তার বিষয়বস্তু যত বেশি করে হৃদয়ঙ্গম করা যায়, তার আলোকও তত উজ্জ্বল হয়ে উঠে। তথাকথিত সমস্ত মুক্ত পুরুষেরা *অহং ব্রহ্মাস্মি, অহং ব্রহ্মাস্মি* বারবার উচ্চারণ করেও অপ্রাকৃত রস আস্বাদন করতে পারে না। এই ধরনের কৃত্রিম ব্রহ্মজ্ঞান সম্পূর্ণ নীরস, তাই যথার্থ রস আস্বাদন করার জন্য তারা *শ্রীমদ্ভাগবতের* শরণাপন্ন হয়। যারা ততটা ভাগ্যবান নয়, তারা পরার্থবাদ এবং লোকহিতৈষণা করতে শুরু করে। এর থেকে বোঝা যায় যে মায়াবাদী দার্শনিকেরা জড় স্তরে রয়েছে, কিন্তু *ভগবদ্গীতা* এবং *শ্রীমদ্ভাগবতের* দর্শন হচ্ছে চিন্ময়।

শ্লোক ২০

কৃতবান্ কিল কর্মাণি সহ রামেণ কেশবঃ।
অতিমর্ত্যানি ভগবান্ গূঢ়ঃ কপটমানুষঃ ॥ ২০ ॥

কৃতবান্—করেছেন; **কিল**—যা; **কর্মাণি**—কার্যকলাপ; **সহ**—সহিত; **রামেণ**—বলরাম; **কেশবঃ**—শ্রীকৃষ্ণ; **অতিমর্ত্যানি**—অলৌকিক; **ভগবান্**—পরমেশ্বর ভগবান; **গূঢ়ঃ**—প্রচ্ছন্ন; **কপট**—আপাতদৃষ্টিতে; **মানুষঃ**—মানুষ।

অনুবাদ

পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাঁর ভ্রাতা বলরামের সঙ্গে মনুষ্যরূপে লীলাবিলাস করেছেন, এবং এইভাবে তাঁর স্বরূপ গোপন রেখে তিনি বহু অলৌকিক কার্যকলাপ সম্পাদন করেছেন।

তাৎপর্য

ভগবানকে নরমূর্তিধারী এবং নরসুলভ গুণসম্পন্ন বলে কল্পনা করার যে মতবাদ, তা পরমেশ্বর ভগবান অথবা শ্রীকৃষ্ণের ক্ষেত্রে কখনই প্রযোজ্য হতে পারে না। আজকাল অনেকে প্রচার করছে যে, কৃচ্ছ্রসাধন এবং তপশ্চর্যার মাধ্যমে মানুষ ভগবান হয়ে যায়। এই মতবাদ আজকাল তো ভারতবর্ষে বেশ ভাল মতোই প্রচারিত হয়েছে। যেহেতু শ্রীরামচন্দ্র, শ্রীকৃষ্ণ এবং শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু শাস্ত্র-প্রমাণে পরমেশ্বর ভগবান, তাই অনেক প্রতারক আজকাল তাদের মনগড়া সমস্ত ভগবানের অবতার সৃষ্টি করছে। এইভাবে মনগড়া ভগবানের অবতার সৃষ্টি করা আজকাল একটা সাধারণ ব্যবসা হয়ে দাঁড়িয়েছে, বিশেষ করে এই বাংলায়। যে কোন মানুষ একটু ভেলকিবাজি দেখিয়ে অতি সহজে মূর্খ জনসাধারণের স্বীকৃতির মাধ্যমে ভগবান হয়ে যাচ্ছে। শ্রীকৃষ্ণ সেই ধরনের অবতার ছিলেন না। তিনি তাঁর আবির্ভাবের ক্ষণ থেকেই পরমেশ্বর ভগবান। তিনি তাঁর জন্মের পরেই তাঁর মাতা দেবকীর সম্মুখে তাঁর চতুর্ভুজ বিষ্ণুরূপ নিয়ে আবির্ভূত হয়েছিলেন। তারপর তাঁর মায়ের অনুরোধে তিনি নরশিশুর রূপ ধারণ করেছিলেন এবং তাঁর পিতা বসুদেবকে বলেছিলেন তাঁকে গোকুলে তাঁর আর এক ভক্তের কাছে নিয়ে যেতে, যেখানে তিনি নন্দ মহারাজ এবং যশোদা মায়ের পুত্ররূপে লীলাবিলাস করেছিলেন। তেমনই, শ্রীকৃষ্ণের অংশপ্রকাশ বলরামও বসুদেবের আর এক পত্নী রোহিণীর পুত্ররূপে লীলাবিলাস করেছিলেন। *ভগবদ্গীতায়* ভগবান বলেছেন যে, তাঁর জন্ম এবং কর্ম হচ্ছে দিব্য এবং কেউ যদি সৌভাগ্যবশে সেই তত্ত্ব অবগত হতে পারেন, তা হলে তিনি এই জড় জগতের বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়ার যোগ্যতা অর্জন করে ভগবদ্ধামে ফিরে যান। অর্থাৎ, শ্রীকৃষ্ণের জন্ম ও কর্মের অপ্রাকৃতত্ব হৃদয়ঙ্গম করতে পারলেই অনায়াসে মুক্তিলাভ করা যায়। *শ্রীমদ্ভাগবতের* ন'টি স্কন্ধে ভগবানের অপ্রাকৃত প্রকৃতির বর্ণনা করা হয়েছে এবং দশম স্কন্ধে তাঁর অপ্রাকৃত লীলাবিলাস বর্ণিত হয়েছে। তাই *শ্রীমদ্ভাগবত* পাঠ করার মাধ্যমে পাঠকের কাছে ভগবানের স্বরূপ উদ্ঘাটিত হয়। এখানে একটা জিনিস মনে রাখতে হবে যে ভগবান তাঁর মায়ের কোল থেকেই তাঁর দিব্য কার্যকলাপ প্রদর্শন করতে থাকেন। তাঁর সমস্ত কার্যকলাপই অলৌকিক, তাঁর বয়স যখন মাত্র ৭ বছর তখন তিনি তাঁর বাঁ-হাতের কনিষ্ঠ আঙ্গুলের ওপর গিরি-গোবর্ধন ধারণ করেছিলেন। তাঁর এই সমস্ত কার্যকলাপের মাধ্যমে সহজেই প্রমাণিত হয় যে তিনি যথার্থই পরমেশ্বর ভগবান। কিন্তু তবুও যোগমায়ার দ্বারা আবৃত থাকার ফলে তাঁর পিতা-মাতা এবং অন্যান্য

আত্মীয়স্বজনেরা তাঁকে একজন সাধারণ নরশিশু বলেই মনে করতেন। তিনি যখনই কোন অসাধ্য কর্ম সাধন করতেন, তখন তাঁর পিতা-মাতা মনে করতেন যে ভগবানের কৃপায় অথবা দৈবাৎ যেন তা ঘটেছে। তাঁরা কখনই মনে করতে পারতেন না যে তাঁদের সেই ছোট্ট শিশুটি সেই অসম্ভব কার্য সম্পাদন করেছে; এবং তাঁদের পুত্রের প্রতি বাৎসল্য স্নেহে তাঁদের হৃদয় পূর্ণ করেই তাঁরা তৃপ্ত ছিলেন। তাই নৈমিষারণ্যের ঋষিরা তাঁকে আপাতদৃষ্টিতে একজন মানুষের মতো বলে বর্ণনা করেছেন, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তিনি হচ্ছেন সর্বশক্তিমান পরমেশ্বর ভগবান।

শ্লোক ২১

কলিমাগতমাজ্ঞায় ক্ষেত্রেঽস্মিন্ বৈষ্ণবে বয়ম্।
আসীনা দীর্ঘসত্রেণ কথায়াং সক্ষণা হরেঃ ॥ ২১ ॥

কলিম্—কলিযুগে; **আগতম্**—আগত হয়েছে; **আজ্ঞায়**—সে কথা জেনে; **ক্ষেত্রে**—এই স্থানে; **অস্মিন্**—এই; **বৈষ্ণবে**—বিশেষ করে বিষ্ণুভক্তদের জন্য; **বয়ম্**—আমরা; **আসীনা**—উপবিষ্ট; **দীর্ঘ**—বহুকাল ব্যাপী; **সত্রেণ**—যজ্ঞ অনুষ্ঠানের জন্য; **কথায়াম্**—কথা; **সক্ষণা**—যথেষ্ট সময় হাতে নিয়ে; **হরেঃ**—পরমেশ্বর ভগবানের।

অনুবাদ

কলিযুগের আগমন হয়েছে জেনে আমরা এই বৈষ্ণব-ক্ষেত্র নৈমিষারণ্যে দীর্ঘকাল ব্যাপী যজ্ঞ অনুষ্ঠানের জন্য এসে উপস্থিত হয়েছি; এখন আমাদের হরিকথা শ্রবণের অবসর লাভ হয়েছে।

তাৎপর্য

এই কলিযুগ সত্য, ত্রেতা অথবা দ্বাপর যুগের মতো আত্মজ্ঞান লাভের উপযোগী নয়। সত্য যুগে মানুষের আয়ু ছিল একশো হাজার বছর এবং তাঁরা দীর্ঘকাল ধরে ধ্যান করার মাধ্যমে আত্মজ্ঞান লাভ করতেন। ত্রেতা যুগে মানুষের আয়ু যখন ছিল দশ হাজার বছর, তখন তাঁরা মহাযজ্ঞ অনুষ্ঠান করে আত্মজ্ঞান লাভ করতেন। দ্বাপর যুগে মানুষের আয়ু যখন ছিল এক হাজার বছর, তখন তাঁরা পরমেশ্বর ভগবানের পূজা করে আত্মজ্ঞান লাভ করতেন। কিন্তু এই কলি যুগে মানুষের আয়ু বড় জোর একশো বছর এবং তাও আবার নানা রকম দুঃখ-দুর্দশা এবং প্রতিবন্ধকে পরিপূর্ণ; আর তাই এই যুগের আত্মজ্ঞান লাভের পন্থা হচ্ছে পরমেশ্বর ভগবানের নাম, যশ ও লীলা আদি শ্রবণ করা এবং কীর্তন করা। সেই সমস্ত মহর্ষিরা এই পন্থার প্রবর্তন করেছিলেন বৈষ্ণবক্ষেত্র নৈমিষারণ্যে। তাঁরা এক হাজার বছর ধরে পরমেশ্বর ভগবানের কথা শোনবার জন্য প্রস্তুত হয়েছিলেন। এই সমস্ত মহর্ষিদের এই দৃষ্টান্তের মাধ্যমে

সকলেরই বোঝা উচিত যে নিয়মিতভাবে *শ্রীমদ্ভাগবত* পাঠ এবং কীর্তন করাই হচ্ছে আত্মজ্ঞান লাভের একমাত্র পন্থা। এ ছাড়া অন্য সমস্ত পন্থাই হচ্ছে কেবল সময়ের অপচয় মাত্র, কেন না তার ফলে কোন লাভই হয় না। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু এই ভাগবত-ধর্ম প্রচার করে গেছেন এবং তিনি নির্দেশ দিয়ে গেছেন যে, ভারত-ভূমিতে যারা মনুষ্য জন্ম লাভ করেছেন, তাঁরা যেন পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের বাণী, বিশেষ করে *ভগবদ্গীতার* বাণী সমস্ত পৃথিবী জুড়ে প্রচার করেন। কেউ যখন *ভগবদ্গীতার* বাণী যথাযথভাবে হৃদয়ঙ্গম করতে পারেন, তখন আত্মজ্ঞান লাভের পথে আরও অগ্রসর হওয়ার জন্য তাঁরা *শ্রীমদ্ভাগবত* পাঠ করতে পারেন।

শ্লোক ২২

ত্বং নঃ সংদর্শিতো ধাত্রা দুস্তরং নিস্তিতীর্ষতাম্।
কলিং সত্ত্বহরং পুংসাং কর্ণধার ইবার্ণবম্ ॥ ২২ ॥

ত্বম্—হে মহানুভব; **নঃ**—আমাদেরকে; **সন্দর্শিতঃ**—আমাদের দৃষ্টিপথে প্রেরিত; **ধাত্রা**—পরমেশ্বর ভগবানের কৃপায়; **দুস্তরম্**—দুর্লঙ্ঘ্য; **নিস্তিতীর্ষতাম্**—অতিক্রম করতে ইচ্ছুক; **কলিম্**—কলিযুগ; **সত্ত্ব-হরম্**—যা সৎ গুণাবলীকে ক্ষয় করে; **পুংসাম্**—মানুষের; **কর্ণধারঃ**—কর্ণধার; **ইব**—মতন; **অর্ণবম্**—সমুদ্র।

অনুবাদ

আমরা মানুষের সদ্‌গুণ অপহরণকারী কলিকাল-রূপ দুর্লঙ্ঘ্য সমুদ্র উত্তীর্ণ হতে ইচ্ছুক। সমুদ্রের পরপারে গমন করতে ইচ্ছুক মানুষের কাছে কর্ণধার সদৃশ আপনাকে বিধাতাই আমাদের কাছে পাঠিয়ে আপনার দর্শন লাভ ঘটিয়েছেন।

তাৎপর্য

এই কলি যুগ মানুষের পক্ষে অত্যন্ত ভয়ঙ্কর। মানব জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য হচ্ছে আত্মজ্ঞান লাভ করা। কিন্তু এই ভয়ঙ্কর যুগের প্রভাবে মানুষ তার জীবনের এই উদ্দেশ্য সম্পূর্ণভাবে বিস্মৃত হয়েছে। এই যুগে মানুষের আয়ু ক্রমে ক্রমে কমে আসবে। মানুষের স্মৃতি, সূক্ষ্ম অনুভূতি, বল, বীর্য এবং সমস্ত সদ্‌গুণ ধীরে ধীরে নষ্ট হয়ে যাবে। এই যুগের ভয়ঙ্কর অবস্থা *শ্রীমদ্ভাগবতের* দ্বাদশ স্কন্ধে বর্ণিত হয়েছে। সুতরাং যে সমস্ত মানুষ আত্মজ্ঞান লাভের চেষ্টায় তাঁদের জীবন সার্থক করতে চান, তাদের পক্ষে এই যুগ অত্যন্ত ভয়ঙ্কর। এই যুগের মানুষ ইন্দ্রিয় তৃপ্তির প্রচেষ্টায় এত ব্যস্ত যে তারা আত্মজ্ঞান লাভের প্রয়োজনীয়তা সম্পূর্ণভাবে বিস্মৃত হয়েছে। উন্মাদের মতো তারা খোলাখুলিভাবেই বলে যে আত্মজ্ঞান লাভের প্রচেষ্টা করার কোন প্রয়োজন নেই; কারণ তারা বুঝতে পারে না যে এই ক্ষণস্থায়ী জীবন হচ্ছে আত্মজ্ঞান

লাভের দীর্ঘ যাত্রাপথের স্বল্পকাল মাত্র। আধুনিক যুগের শিক্ষা-ব্যবস্থায় মানুষকে কেবল ইন্দ্রিয়-তৃপ্তির শিক্ষাই দেওয়া হচ্ছে এবং যে কোনও চিন্তাশীল মানুষ যদি একটু চিন্তা করে দেখেন, তা হলেই তিনি বুঝতে পারবেন যে এই যুগের শিশুরা কীভাবে ইচ্ছাকৃতভাবে তথাকথিত শিক্ষার কসাইখানায় বলি হওয়ার জন্য প্রেরিত হচ্ছে। তাই শিক্ষিত মানুষদের কর্তব্য হচ্ছে এই যুগ সম্বন্ধে সচেতন হওয়া এবং তারা যদি কলিযুগ রূপী এই দুর্লঙ্ঘ্য সমুদ্র উত্তীর্ণ হতে চান, তা হলে অবশ্যই তাঁদের নৈমিষারণ্যের ঋষিদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে শ্রীল সূত গোস্বামী অথবা তাঁর উপযুক্ত প্রতিনিধিকে তাঁদের তরণীর কর্ণধাররূপে গ্রহণ করতে হবে। সেই তরণীটি হচ্ছে ভগবদ্গীতা অথবা *শ্রীমদ্ভাগবত* রূপী পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের বাণী।

শ্লোক ২৩

ব্রূহি যোগেশ্বরে কৃষ্ণে ব্রহ্মণ্যে ধর্মবর্মণি।
স্বাং কাষ্ঠামধুনোপেতে ধর্মঃ কং শরণং গতঃ ॥ ২৩ ॥

ব্রূহি—দয়া করে বলুন; **যোগ-ঈশ্বরে**—সমস্ত যৌগিক শক্তির ঈশ্বর; **কৃষ্ণে**—শ্রীকৃষ্ণ; **ব্রহ্মণ্যে**—পরম ব্রহ্ম; **ধর্ম**—ধর্ম; **বর্মণি**—রক্ষক; **স্বাম্**—নিজের; **কাষ্ঠাম্**—ধাম; **অধুনা**—এখন; **উপেতে**—চলে যাওয়ায়; **ধর্মঃ**—ধর্ম; **কম্**—কার; **শরণম্**—শরণ; **গতঃ**—গিয়েছে।

অনুবাদ

পরম ব্রহ্ম যোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ সম্প্রতি তাঁর নিত্য ধামে অন্তর্ধান রূপ অপ্রকট লীলায় প্রবেশ করলে সনাতন ধর্ম কার শরণাপন্ন হয়েছে, তা আমাদের বলুন।

তাৎপর্য

ধর্ম হচ্ছে পরমেশ্বর ভগবানের প্রদত্ত পন্থা। যখন ধর্মের গ্লানি অথবা অবমাননা হয়, তখন পরমেশ্বর ভগবান ধর্ম সংস্থাপন করার জন্য আবির্ভূত হন। সে কথা ভগবদ্গীতায় বর্ণিত হয়েছে। এখানে নৈমিষারণ্যের ঋষিরা সেই সম্বন্ধেই জিজ্ঞাসা করছেন। এই প্রশ্নের উত্তর পরে দেওয়া হয়েছে। *শ্রীমদ্ভাগবত* হচ্ছে অপ্রাকৃত শব্দরূপে পরমেশ্বর ভগবানের অবতার, এবং তাই তা হচ্ছে দিব্য জ্ঞান এবং ধর্মনীতির পূর্ণ প্রকাশ।

ইতি—শ্রীমদ্ভাগবতের "ঋষিদের প্রশ্ন" নামক প্রথম স্কন্ধের প্রথম অধ্যায়ের ভক্তিবেদান্ত তাৎপর্য।

দ্বিতীয় অধ্যায়

দিব্য ভাব এবং দিব্য সেবা

শ্লোক ১

ব্যাস উবাচ

ইতি সম্প্রশ্নসংহৃষ্টো বিপ্রাণাং রৌমহর্ষণিঃ।
প্রতিপূজ্য বচস্তেষাং প্রবক্তুমুপচক্রমে ॥ ১ ॥

ব্যাসঃ উবাচ—ব্যাসদেব বললেন; ইতি—এইভাবে; সম্প্রশ্ন—সম্যক্ প্রশ্ন; সংহৃষ্টঃ—সম্যকরূপে পরিতৃপ্ত; বিপ্রাণাম্—সেখানকার ঋষিদের; রৌমহর্ষণিঃ—রোমহর্ষণ ঋষির পুত্র উগ্রশ্রবা; প্রতিপূজ্য—তাঁদের ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে; বচঃ—বাক্য; তেষাম্—তাঁদের; প্রবক্তুম্—বিশেষভাবে বললেন; উপচক্রমে—প্রয়াস করলেন।

অনুবাদ

রোমহর্ষণ-পুত্র উগ্রশ্রবা (সূত গোস্বামী) শৌনকাদি ব্রাহ্মণদের সেই সব প্রশ্নে সম্পূর্ণরূপে পরিতৃপ্ত হয়ে তাঁদের ধন্যবাদ জানালেন এবং তাঁদের প্রশ্নের উত্তর দিতে শুরু করলেন।

তাৎপর্য

নৈমিষারণ্যের ঋষিরা সূত গোস্বামীকে ছ'টি প্রশ্ন করেছিলেন, এবং তাই তিনি একে-একে সেই প্রশ্নগুলির উত্তর দিয়েছিলেন।

শ্লোক ২

সূত উবাচ

যং প্রব্রজন্তমনুপেতমপেতকৃত্যং
দ্বৈপায়নো বিরহকাতর আজুহাব।
পুত্রেতি তন্ময়তয়া তরবোঽভিনেদু-
স্তং সর্বভূতহৃদয়ং মুনিমানতোঽস্মি ॥ ২ ॥

সূতঃ—সূত গোস্বামী; উবাচ—বললেন; যম্—যাঁর; প্রব্রজন্তম্—সন্ন্যাস আশ্রম অবলম্বন করে যখন গৃহ থেকে চলে যাচ্ছিলেন; অনুপেতম্—উপনয়ন অনুষ্ঠানের

মাধ্যমে সংস্কারসাধন হওয়ার পূর্বেই ; **অপেত**—অনুষ্ঠান না করেই ; **কৃত্যম্**—কর্তব্য-কর্ম ; **দ্বৈপায়নঃ**—ব্যাসদেব ; **বিরহ**—বিচ্ছেদ ; **কাতরঃ**—ভীত হয়ে ; **আজুহাব**—আহ্বান করেছিলেন ; **পুত্র-ইতি**—হে পুত্র ; **তন্ময়তয়া**—সেইভাবে তন্ময়যুক্ত হয়ে ; **তরবঃ**—সমস্ত বৃক্ষরাজি ; **অভিনেদুঃ**—প্রত্যুত্তর করেছিল ; **তম্**—তাঁকে ; **সর্ব**—সমস্ত ; **ভূত**—জীব ; **হৃদয়ম্**—হৃদয় ; **মুনিম্**—মুনি ; **আনতঃ অস্মি**—প্রণাম করি।

অনুবাদ

শ্রীল সূত গোস্বামী বললেন ঃ আমি সেই মহর্ষিকে (শুকদেব গোস্বামী) আমার প্রণতি নিবেদন করছি, যিনি সমস্ত জীবের হৃদয়ে প্রবেশ করতে পারেন। তিনি যখন সন্ন্যাস অবলম্বন করার জন্য উপনয়ন অনুষ্ঠান হওয়ার আগেই গৃহত্যাগ করে চলে যাচ্ছিলেন, তখন তাঁর পিতৃদেব শ্রীল ব্যাসদেব তাঁর বিরহে কাতর হয়ে তাঁকে "হে পুত্র! হে পুত্র!" বলে আহ্বান করেছিলেন, তখন তাঁর ভাবনায় তন্ময় বৃক্ষরাজিও বিরহকাতর পিতার ব্যথায় ব্যথিত হয়ে প্রত্যুত্তর করেছিল।

তাৎপর্য

বর্ণাশ্রম ধর্মের অনুগামীদের বহু বিধি-বিধান পালন করতে হয়। তার একটি বিধি হচ্ছে, বৈদিক শাস্ত্র অধ্যয়নের অভিলাষী শিক্ষার্থীকে অবশ্যই সদ্‌গুরুর শরণাপন্ন হতে হবে এবং তাঁর কাছে দীক্ষার জন্য প্রার্থনা করতে হবে। পবিত্র যজ্ঞোপবীত হচ্ছে আচার্যের কাছে বেদ-পাঠের উপযুক্ত যোগ্যতা লাভের স্বীকৃতি। শুকদেব গোস্বামীকে এই ধরনের পবিত্রীকরণ অনুষ্ঠান করতে হয়নি, কেন না তিনি তাঁর জন্মের সময় থেকেই মুক্ত পুরুষ ছিলেন।

সাধারণত মানুষের জন্ম হয় অজ্ঞানের অন্ধকারে, এবং পবিত্রীকরণ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে তার দ্বিতীয় জন্ম হয় বা দ্বিজত্ব প্রাপ্তি হয়। কেউ যখন নতুন আলোক দর্শন করেন এবং পারমার্থিক উন্নতি লাভের পন্থা অনুসন্ধান করেন, তখন তিনি বৈদিক জ্ঞান আহরণ করার জন্য সদ্‌গুরুর শরণাগত হন। সদ্‌গুরু কেবল ঐকান্তিক তত্ত্বানুসন্ধানীকেই তাঁর শিষ্যরূপে গ্রহণ করেন এবং তাকে উপনয়নের মাধ্যমে যজ্ঞোপবীত দান করেন। এইভাবে মানুষের দ্বিতীয় জন্ম বা দ্বিজত্ব লাভ হয়। দ্বিজত্ব লাভের পর বেদ পাঠের যোগ্যতা অর্জন করা যায় এবং যথাযথভাবে বৈদিক জ্ঞান লাভ হলে বিপ্র হওয়া যায়। বিপ্র অথবা উপযুক্ত ব্রাহ্মণ এইভাবে পরম তত্ত্বজ্ঞান লাভ করে পারমার্থিক জীবনে উন্নতি সাধন করে এবং তারপর তিনি বৈষ্ণব স্তরে অধিষ্ঠিত হন। বৈষ্ণব স্তর হচ্ছে ব্রাহ্মণত্বের স্নাতকোত্তর। প্রগতিশীল ব্রাহ্মণকে অবশ্যই বৈষ্ণব হতে হয়, কেন না বৈষ্ণবই হচ্ছে যথার্থ আত্মজ্ঞানী, তত্ত্বদ্রষ্টা ব্রাহ্মণ।

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী প্রথম থেকেই বৈষ্ণব ছিলেন ; তাই তাঁর বর্ণাশ্রম প্রথা অবলম্বন করার কোনও প্রয়োজন ছিল না। বর্ণাশ্রম ধর্মের চরম লক্ষ্য হচ্ছে কলুষিত

মানুষকে ভগবানের শুদ্ধ ভক্ত বা বৈষ্ণবে পরিণত করা। তাই কেউ যখন উত্তম-অধিকারী বৈষ্ণবের কৃপায় বৈষ্ণবত্ব লাভ করেন, তখন তাঁর যে কুলেই জন্ম, হোক না কেন, তাঁকে ব্রাহ্মণ বলে গণ্য করা হয়। সেই ভাবধারা গ্রহণ করেই শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু যবন কুলজাত শ্রীল হরিদাস ঠাকুরকে নামাচার্যের পদে অভিষিক্ত করেছিলেন। শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বৈষ্ণবরূপেই জন্মগ্রহণ করেছিলেন এবং সেই সূত্রে ব্রাহ্মণোচিত সমস্ত গুণাবলী স্বাভাবিকভাবেই তাঁর মধ্যে বিরাজমান ছিল। তাই আনুষ্ঠানিকভাবে কিছু করার প্রয়োজন তাঁর ছিল না। বৈষ্ণবের কৃপায় কিরাত, হূণ, আন্ধ্র, পুলিন্দ, পুক্কশ, আভীর, শুম্ভ, যবন, খস ইত্যাদি নীচ-কুলোদ্ভূত মানুষেরাও সর্বোচ্চ পারমার্থিক স্তরে উন্নীত হতে পারে। শ্রীল শুকদেব গোস্বামী ছিলেন শ্রীল সূত গোস্বামীর গুরুদেব, তাই নৈমিষারণ্যের ঋষিদের প্রশ্নের উত্তর দিতে শুরু করার আগে তিনি শ্রীল শুকদেব গোস্বামীকে তাঁর সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করেছেন।

শ্লোক ৩

যঃ স্বানুভাবমখিলশ্রুতিসারমেক-
মধ্যাত্মদীপমতিতিতীর্ষতাং তমোহন্ধম্।
সংসারিণাং করুণয়াহ পুরাণগুহ্যং
তং ব্যাসসূনুমুপয়ামি গুরুং মুনীনাম্ ॥ ৩ ॥

যঃ—যিনি; **স্বানুভাবম্**—অনুভবের দ্বারা যিনি অভিজ্ঞতা অর্জন করেছেন; **অখিল**—সমগ্র; **শ্রুতি**—বেদ; **সারম্**—সার; **একম্**—অদ্বিতীয়; **অধ্যাত্ম**—অধ্যাত্ম; **দীপম্**—দীপ; **অতিতিতীর্ষতাম্**—অতিক্রম করতে ইচ্ছুক; **তমঃ অন্ধম্**—গভীর অন্ধকারাচ্ছন্ন জড় অস্তিত্ব; **সংসারিণাম্**—জড় জগতের বন্ধনে আবদ্ধ মানুষদের; **করুণয়া**—অহৈতুকী করুণার প্রভাবে; **আহ**—বলেছিলেন; **পুরাণ**—মহাপুরাণ শ্রীমদ্ভাগবত; **গুহ্যম্**—অত্যন্ত গোপনীয়; **তম্**—তাঁকে; **ব্যাস-সূনুম্**—ব্যাসদেবের পুত্র; **উপয়ামি**—আমি প্রণতি নিবেদন করি; **গুরুম্**—গুরুদেব; **মুনীনাম্**—মহর্ষিদের।

অনুবাদ

সংসাররূপ গভীর অন্ধকার উত্তীর্ণ হওয়ার অভিলাষী বিষয়াসক্ত মানুষদের কাছে কৃপা করে যিনি স্বীয় প্রভাব-জ্ঞাপক সমস্ত বৈদিক জ্ঞানের সারভূত অনুপম আত্মতত্ত্ব প্রকাশক দীপ-সদৃশ সর্বপুরাণ-রহস্য শ্রীমদ্ভাগবত বলেছিলেন, সেই মুনিগণের গুরু ব্যাস-তনয় শ্রীল শুকদেবকে আমি আমার সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি।

তাৎপর্য

এই প্রার্থনায় শ্রীল সূত গোস্বামী *শ্রীমদ্ভাগবতের* ভূমিকার সারমর্ম বিশ্লেষণ করেছেন। *শ্রীমদ্ভাগবত* হচ্ছে বেদান্ত-সূত্রের যথার্থ ভাষ্য। শ্রীল ব্যাসদেব সমস্ত বৈদিক জ্ঞানের সার-সংকলনরূপ বেদান্ত-সূত্র বা ব্রহ্ম-সূত্র প্রণয়ন করেছিলেন। সেই সারবস্তুর প্রকৃত ভাষ্য হচ্ছে *শ্রীমদ্ভাগবত*। শ্রীল শুকদেব গোস্বামী ছিলেন বেদান্ত-সূত্র সম্বন্ধে সম্পূর্ণভাবে অভিজ্ঞ তত্ত্ববিদ, এবং তাই তিনি তাঁর ভাষ্য *শ্রীমদ্ভাগবত* স্বীয় অনুভবের দ্বারা হৃদয়ঙ্গম করেছিলেন। আর মোহাচ্ছন্ন জড় বিষয়াসক্ত যে সমস্ত মানুষ জড় জগতের অজ্ঞান-অন্ধকার অতিক্রম করতে ইচ্ছুক, তাদের প্রতি তাঁর অন্তহীন করুণা প্রদর্শন করার জন্য তিনি এই অতি গোপনীয় জ্ঞান দান করেছিলেন।

জড় বিষয়াসক্ত মানুষ যে সুখী হতে পারে না, সে সম্বন্ধে তর্ক করে কোন লাভ নেই। ভব-বন্ধনে আবদ্ধ কোন জীবই—তা সে ব্রহ্মাই হোন অথবা একটি নগণ্য পিপীলিকাই হোক—কখনই সুখী হতে পারে না। সকলেই সুখী হওয়ার চেষ্টা করে, কিন্তু জড়া প্রকৃতির প্রভাবে সেই প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়। তাই জড় জগতকে বলা হয় ভগবানের সৃষ্টির অন্ধকারাচ্ছন্ন প্রদেশ। তবে জড় বিষয়াসক্ত অসুখী মানুষেরা কেবল সেখান থেকে বেরিয়ে আসার বাসনা করার মাধ্যমেই সেখান থেকে বেরিয়ে আসতে পারে। দুর্ভাগ্যবশত তারা এত মূর্খ যে তারা সেখান থেকে বেরিয়ে আসতে চায় না। তাই তাদের উটের সঙ্গে তুলনা করা হয়, যে উট কাঁটা চেবানোর ফলে তার ক্ষত-বিক্ষত মুখের রক্তের স্বাদকে কাঁটার স্বাদ মনে করে তা উপভোগ করে। কিন্তু সে বুঝতে পারে না যে তা কাঁটার আঘাতে ক্ষত-বিক্ষত তার নিজের মুখেরই রক্ত। তেমনই, জড়বাদীদের কাছে তাদের নিজের রক্তের স্বাদ মধুর মতো মিষ্টি বলে মনে হয়, এবং যদিও সে নিরন্তর তার নিজের সৃষ্ট জড় বিষয়ের দ্বারা নানা রকম দুঃখ-দুর্দশা ভোগ করে, তবুও সে সেখান থেকে বেরিয়ে আসতে চায় না। এই ধরনের জড়বাদীদের বলা হয় 'কর্মী'। এইরকম শত-সহস্র কর্মীর মধ্যে কেবল দু'-একজন জড় জগতের কার্যকলাপে পরিশ্রান্ত হয়ে সেই বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়ার বাসনা করে। এই ধরনের বুদ্ধিমান মানুষদের বলা হয় 'জ্ঞানী'। বেদান্ত-সূত্র এই ধরনের জ্ঞানীদের জন্যই প্রণয়ন করা হয়েছে। কিন্তু পরমেশ্বর ভগবানের অবতার শ্রীল ব্যাসদেব বুঝতে পেরেছিলেন যে, ভবিষ্যতে বিবেক-বর্জিত মানুষেরা বেদান্ত-সূত্রের অপব্যবহার করবে, এবং তাই তিনি এই বেদান্ত-সূত্রের ভাষ্যরূপে ভাগবত-পুরাণ প্রণয়ন করেছিলেন। এখানে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে যে, *শ্রীমদ্ভাগবত* হচ্ছে ব্রহ্ম-সূত্রের প্রাকৃত ভাষ্য। শ্রীল ব্যাসদেব তাঁর পুত্র শ্রীল শুকদেব গোস্বামীকে, যিনি ছিলেন মুক্ত পুরুষ, *শ্রীমদ্ভাগবত* দান করেছিলেন। শ্রীল শুকদেব গোস্বামী ব্যক্তিগতভাবে তা উপলব্ধি করেছিলেন এবং তারপর তা বিশ্লেষণ করেছিলেন। শ্রীল শুকদেব গোস্বামীর করুণার প্রভাবে জড় জগতের বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়ার অভিলাষী জীবদের কাছে ভাগবত-বেদান্ত-সূত্র সহজলভ্য হয়েছে।

শ্রীমদ্ভাগবত হচ্ছে বেদান্ত-সূত্রের অপ্রতিদ্বন্দ্বী ভাষ্য। শ্রীপাদ শঙ্করাচার্য ইচ্ছাকৃতভাবেই তা স্পর্শ করেননি, কেন না তিনি জানতেন যে বেদান্ত-সূত্রের এই স্বাভাবিক ভাষ্যটিকে বিকৃত করা সম্ভব হবে না। তিনি তাঁর *শারীরক-ভাষ্য* রচনা করেছিলেন, এবং তাঁর তথাকথিত অনুগামীরা *শ্রীমদ্ভাগবত* আধুনিক রচনা বলে তার প্রতি তাদের ঔদাসীন্য প্রদর্শন করে। *শ্রীমদ্ভাগবতের* বিরুদ্ধে মায়াবাদীদের এই অপপ্রচারের দ্বারা কখনই প্রভাবিত হওয়া উচিত নয়। *শ্রীমদ্ভাগবতের* প্রথম শ্লোক থেকেই বোঝা যায় যে 'মাৎসর্য' নামক জড় রোগ থেকে সম্পূর্ণভাবে মুক্ত পরমহংসদের জন্যই এই অপ্রাকৃত শাস্ত্র প্রকাশিত হয়েছে। পরমেশ্বর ভগবান নারায়ণ যে এক জড় সৃষ্টির অতীত শ্রীপাদ শঙ্করাচার্যের সেই নির্দেশ সত্ত্বেও মায়াবাদীরা পরমেশ্বর ভগবানের প্রতি ঈর্ষাপরায়ণ। ঈর্ষাপরায়ণ মায়াবাদীরা কখনই *শ্রীমদ্ভাগবত* স্পর্শ করতে পারে না, কিন্তু যাঁরা এই জড় জগতের বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য ঐকান্তিকভাবে আগ্রহী, তাঁরা *শ্রীমদ্ভাগবতের* শরণ গ্রহণ করতে পারেন, কেন না তা বর্ণনা করেছেন মুক্ত পুরুষ শ্রীল শুকদেব গোস্বামী। তা হচ্ছে অপ্রাকৃত দীপবর্তিকা, যার দ্বারা ব্রহ্ম, পরমাত্মা এবং ভগবানরূপে পরম তত্ত্বকে দর্শন করা যায়।

শ্লোক ৪

নারায়ণং নমস্কৃত্য নরং চৈব নরোত্তমম্।
দেবীং সরস্বতীং ব্যাসং ততো জয়মুদীরয়েৎ ॥ ৪ ॥

নারায়ণম্—পরমেশ্বর ভগবান নারায়ণকে; **নমস্কৃত্য**—সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি; **নরম্ চ এব**—এবং নারায়ণ ঋষিকে; **নরোত্তমম্**—সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষ; **দেবীম্**—দেবী; **সরস্বতীম্**—জ্ঞানের অধিষ্ঠাত্রী দেবী সরস্বতীকে; **ব্যাসম্**— ব্যাসদেব; **ততঃ**—তারপর; **জয়ম্**—সংসার বিজয়ী; **উদীরয়েৎ**—উচ্চারণ করা।

অনুবাদ

সংসার-বিজয়ী গ্রন্থ শ্রীমদ্ভাগবত উচ্চারণ করার পূর্বে পরমেশ্বর ভগবান নারায়ণ, সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষ নর-নারায়ণ ঋষি নামক ভগবৎ-অবতার, বিদ্যাদেবী সরস্বতী এবং ব্যাসদেবকে আমি আমার সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি।

তাৎপর্য

সমস্ত বৈদিক শাস্ত্র এবং পুরাণসমূহের উদ্দেশ্য হচ্ছে জড় অস্তিত্বের অজ্ঞানতম অন্ধকার জয় করা। অনাদিকাল ধরে জড়-ইন্দ্রিয় সুখভোগের প্রতি আসক্ত হয়ে পড়ার ফলে জীব পরমেশ্বর ভগবানের সঙ্গে তার নিত্য সম্পর্কের কথা ভুলে গেছে। এই জড় জগতে সে নিরন্তর জীবন-সংগ্রামে লিপ্ত, এবং নানা রকম পরিকল্পনা করা সত্ত্বেও সে কখনই এই জড় জগতের বন্ধন থেকে মুক্ত হতে পারে না। এই

জীবন-সংগ্রামে সে যদি জয়ী হতে চায়, তা হলে তাকে অবশ্যই পরমেশ্বর ভগবানের সঙ্গে তার নিত্য সম্পর্কের পুনঃপ্রতিষ্ঠা করতে হবে। এইভাবে যারা ভবরোগ নিরাময় করতে চায়, তাদের অবশ্য বেদ এবং পুরাণ আদি শাস্ত্র গ্রন্থের শরণাগত হতে হবে। মূর্খ লোকেরা বলে যে, বেদের সঙ্গে পুরাণের কোন সম্পর্ক নেই। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে পুরাণ হচ্ছে বিভিন্ন ধরনের মানুষের কাছে ভগবত্তত্ত্ব বিশ্লেষণ করার উদ্দেশ্যে বেদেরই সংযোজন। সমস্ত মানুষই সমপর্যায়ভুক্ত নয়। কিছু মানুষ সত্ত্বগুণের দ্বারা প্রভাবিত, কিছু মানুষ রজোগুণের দ্বারা প্রভাবিত, আর কিছু মানুষ তমোগুণের দ্বারা প্রভাবিত। পুরাণগুলি এমনভাবে বিভক্ত হয়েছে যে, যে কোনও শ্রেণীর মানুষই সেই সুযোগের সদ্ব্যবহার করে তাদের স্বরূপে অধিষ্ঠিত হতে পারে এবং জড় জগতের দুর্দশাগ্রস্ত অবস্থা থেকে মুক্ত হতে পারে। শ্রীল সূত গোস্বামী দেখিয়ে গেছেন, পুরাণ কীভাবে পাঠ করতে হয়। যে সমস্ত মানুষ বৈদিক শাস্ত্র এবং পুরাণের বাণী প্রচার করতে চান, তাঁদের পক্ষে এই পন্থা অনুসরণ করা উচিত। *শ্রীমদ্ভাগবত* হচ্ছে অমল পুরাণ, এবং যে সমস্ত মানুষ চিরতরে এই জড় জগতের বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়ার অভিলাষী, তাঁদের জন্যই এটি বিশেষভাবে নির্দিষ্ট হয়েছে।

শ্লোক ৫

মুনয়ঃ সাধু পৃষ্টোঽহং ভবদ্ভির্লোকমঙ্গলম্ ।
যৎকৃতঃ কৃষ্ণসংপ্রশ্নো যেনাত্মা সুপ্রসীদতি ॥ ৫ ॥

মুনয়ঃ—হে ঋষিগণ; **সাধু**—প্রসঙ্গোচিত; **পৃষ্টঃ**—জিজ্ঞাসিত; **অহম্**—আমি; **ভবদ্ভিঃ**—আপনাদের সকলের দ্বারা; **লোক**—জগৎ; **মঙ্গলম্**—মঙ্গল; **যৎ**—কেন না; **কৃতঃ**—করে; **কৃষ্ণ**—পরমেশ্বর ভগবান; **সংপ্রশ্নঃ**—পরিপ্রশ্ন; **যেন**—যার দ্বারা; **আত্মা**—আত্মা; **সুপ্রসীদতি**—সম্পূর্ণরূপে প্রসন্ন হয়।

অনুবাদ

হে ঋষিগণ, আপনারা আমাকে যথার্থ প্রশ্নই জিজ্ঞাসা করেছেন। আপনাদের প্রশ্নগুলি অতি উত্তম, কেন না সেগুলি কৃষ্ণ-বিষয়ক এবং তাই তা জগতের মঙ্গল সাধন করে। এই ধরনের পরিপ্রশ্নের দ্বারাই কেবল আত্মা সম্পূর্ণরূপে প্রসন্ন হয়।

তাৎপর্য

পূর্বে বলা হয়েছে যে *শ্রীমদ্ভাগবতে* পরম সত্যই হচ্ছে জ্ঞাতব্য বিষয়। তাই নৈমিষারণ্যের ঋষিদের প্রশ্নগুলি ছিল যথার্থ পরিপ্রশ্ন, কেন না সেগুলি ছিল পরমেশ্বর ভগবান, পরম সত্য শ্রীকৃষ্ণের সম্বন্ধে। *ভগবদ্গীতায়* (১৫/১৫) পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন যে, সমস্ত বেদের একমাত্র জ্ঞাতব্য বিষয় হচ্ছেন তিনি। তাই শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধীয় প্রশ্নগুলিই হচ্ছে বৈদিক অনুসন্ধানের সারবস্তু।

সমগ্র জগৎ প্রশ্ন এবং উত্তরে পূর্ণ। পশু, পক্ষী, মনুষ্য—সকলেই নিরন্তর প্রশ্ন এবং উত্তরে ব্যস্ত। সকালবেলায় পাখিরা তাদের কুলায় প্রশ্ন এবং উত্তরে ব্যস্ত হয়, আবার সন্ধ্যাবেলায় তারা নীড়ে ফিরে প্রশ্ন এবং উত্তরে ব্যস্ত হয়। মানুষ রাত্রে গভীর নিদ্রায় যখন মগ্ন থাকে, সেই সময়টি ছাড়া সর্বক্ষণ সে হয় প্রশ্ন করে নয়ত উত্তর দেয়। বাজারের দোকানদারেরা প্রশ্ন-উত্তরে ব্যস্ত, বিচারালয়ে আইনজীবীরা প্রশ্ন-উত্তরে ব্যস্ত, আর স্কুল-কলেজে ছাত্ররাও প্রশ্ন-উত্তরে ব্যস্ত। সংসদে দেশনেতারা সকলে প্রশ্ন-উত্তরে ব্যস্ত; রাজনীতিবিদেরা এবং সাংবাদিকেরাও প্রশ্ন-উত্তরে ব্যস্ত। যদিও তারা সারা জীবন ধরে এইভাবে প্রশ্ন-উত্তর নিয়েই ব্যস্ত থাকে, তবুও তারা প্রসন্ন হতে পারে না। আত্মার প্রসন্নতা কেবল কৃষ্ণ-বিষয়ক প্রশ্ন এবং উত্তরের মাধ্যমেই লাভ করা যায়।

শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন আমাদের সবচাইতে অন্তরঙ্গ প্রভু, সখা, পিতা, পুত্র এবং প্রেমিক। শ্রীকৃষ্ণকে ভুলে যাওয়ার ফলে আমরা প্রশ্ন এবং উত্তরের কত বিষয় উদ্ভাবন করেছি, কিন্তু তার একটিও আমাদের পূর্ণ প্রসন্নতা দান করতে পারে না। শ্রীকৃষ্ণ ব্যতীত সব কিছুই কেবল ক্ষণিকের তৃপ্তিদান করতে পারে। তাই আমরা যদি পূর্ণরূপে পরিতৃপ্ত হতে চাই, তা হলে আমাদের শ্রীকৃষ্ণের সম্বন্ধে প্রশ্ন করতে হবে অথবা শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধীয় প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে। আমরা প্রশ্ন না করে অথবা উত্তর না দিয়ে এক মুহূর্তও থাকতে পারি না। যেহেতু *শ্রীমদ্ভাগবত* শ্রীকৃষ্ণ-বিষয়ক প্রশ্ন এবং উত্তরের আলোচনা করে, তাই এই অপ্রাকৃত গ্রন্থটি পাঠ করে অথবা শ্রবণ করে আমরা সর্বোচ্চ আনন্দ লাভ করতে পারি। তাই মানুষের কর্তব্য হচ্ছে শ্রীমদ্ভাগবতের তত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করে সব রকমের সামাজিক, রাজনৈতিক অথবা ধর্ম-বিষয়ক সমস্যার সমাধান করা। শ্রীমদ্ভাগবত এবং শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন সব কিছুর সার-সমষ্টি।

শ্লোক ৬

স বৈ পুংসাং পরো ধর্মো যতো ভক্তিরধোক্ষজে।
অহৈতুক্যপ্রতিহতা যয়াত্মা সুপ্রসীদতি ॥ ৬ ॥

সঃ—সেই; **বৈ**—অবশ্যই; **পুংসাম্**—মানুষের জন্য; **পরঃ**—শ্রেষ্ঠ; **ধর্মঃ**—ধর্ম; **যতঃ**—যার দ্বারা; **ভক্তিঃ**—ভগবদ্ভক্তি; **অধোক্ষজে**—ইন্দ্রিয়লব্ধ জ্ঞানের অতীত; **অহৈতুকী**—ফলভোগের বাসনা রহিত; **অপ্রতিহতা**—নিরবচ্ছিন্ন; **যয়া**—যার দ্বারা; **আত্মা**—আত্মা; **সুপ্রসীদতি**—সম্পূর্ণরূপে প্রসন্ন হয়।

অনুবাদ

সমস্ত মানুষের পরম ধর্ম হচ্ছে সেই ধর্ম যার দ্বারা ইন্দ্রিয়জাত জ্ঞানের অতীত শ্রীকৃষ্ণে অহৈতুকী এবং অপ্রতিহতা ভক্তি লাভ করা যায়। সেই ভক্তিবলে অনর্থ নিবৃত্তি হয়ে আত্মা যথার্থ প্রসন্নতা লাভ করে।

তাৎপর্য

এইখানে শ্রীল সূত গোস্বামী নৈমিষারণ্যের ঋষিদের প্রথম প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছেন। ঋষিরা তাঁকে অনুরোধ করেছিলেন সমস্ত বৈদিক শাস্ত্রের সারমর্ম বিশ্লেষণ করতে এবং তার মূল তত্ত্বটি দান করতে, যাতে কলিযুগের অধঃপতিত মানুষেরা তা অনায়াসে গ্রহণ করতে পারে। বেদে মানুষের জন্য দুটি মার্গ বর্ণিত হয়েছে। তার একটি হচ্ছে প্রবৃত্তি মার্গ অথবা ইন্দ্রিয়-সুখ উপভোগের পন্থা, এবং অন্যটি হচ্ছে নিবৃত্তি মার্গ অথবা ইন্দ্রিয়-সুখ ত্যাগের পন্থা। প্রবৃত্তি মার্গ হচ্ছে নিকৃষ্ট, এবং পরমেশ্বর ভগবানের জন্য ইন্দ্রিয়-সুখ ত্যাগ করার পন্থা নিবৃত্তি মার্গ হচ্ছে উৎকৃষ্ট পন্থা। জড়জাগতিক জীবন হচ্ছে জীবের একটি রোগগ্রস্ত অবস্থা। প্রকৃত জীবন হচ্ছে পারমার্থিক জীবন বা ব্রহ্মভূত অবস্থা, যেখানে জীবন নিত্য, পূর্ণ জ্ঞানময় এবং আনন্দময়। জড় জীবন অনিত্য, মোহাচ্ছন্ন এবং দুঃখময়। এই জীবনে কোন রকম আনন্দ নেই। এখানে যা রয়েছে, তা হচ্ছে দুর্দশাগ্রস্ত অবস্থা থেকে উদ্ধার পাওয়ার অর্থহীন প্রচেষ্টা এবং সেই সাময়িক দুঃখ-নিবৃত্তিকেই বলা হয় সুখ। তাই অনিত্য, অজ্ঞান এবং নিরানন্দময় জড় সুখভোগের উন্নতিসাধন করার যে প্রচেষ্টা, তা নিকৃষ্ট। কিন্তু পরমেশ্বর ভগবানের প্রতি ভক্তি, যা মানুষকে নিত্য, জ্ঞানময় এবং আনন্দময় জীবনের দিকে পরিচালিত করে, তা অবশ্যই অনেক উন্নত মার্গ। এই ভক্তি কখনো কখনো নিকৃষ্ট স্তরের বাসনার দ্বারা প্রভাবিত হয়ে কলুষিত হয়ে পড়ে। যেমন, জড়জাগতিক লাভের আশায় ভগবদ্ভক্তির পন্থা অবলম্বন করার যে প্রয়াস তা নিবৃত্তি মার্গে অগ্রসর হওয়ার পথে একটি মস্ত বড় প্রতিবন্ধক। পরম মঙ্গল সাধনের জন্য বিষয়বাসনা ত্যাগ করা অবশ্যই অনেক উন্নত স্তরের বৃত্তি। বিষয়-সুখ কেবল ভবরোগের যন্ত্রণা বৃদ্ধি করে। তাই ভগবদ্ভক্তি সব সময় বিশুদ্ধ হওয়া উচিত, অর্থাৎ তাতে যেন জড় সুখভোগের কোন রকম বাসনা মিশ্রিত না থাকে। তাই মানুষের কর্তব্য হচ্ছে সব রকমের জড় সুখভোগের কামনা-বাসনা রহিত হয়ে, সকাম কর্মের বাসনার দ্বারা প্রভাবিত না হয়ে এবং মনোধর্ম প্রসূত জ্ঞানের প্রয়াস রহিত হয়ে শুদ্ধ ভগবদ্ভক্তির উন্নত পন্থা অবলম্বন করা। এইভাবে তাঁর সেবায় যুক্ত হওয়ার মাধ্যমেই কেবল নিত্য আনন্দ লাভ করা যায়।

আমরা ইচ্ছাকৃতভাবেই ধর্মকে বৃত্তি বলে অভিহিত করেছি, কেন না ধর্ম কথাটির মৌলিক অর্থ হচ্ছে "অস্তিত্ব বজায় রাখার পন্থা।" জীবের অস্তিত্বের সার্থকতা হচ্ছে পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে নিত্য সম্পর্কযুক্ত হয়ে কর্ম করা। শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন সমস্ত জীবের মূল আশ্রয়, এবং তিনি হচ্ছেন সমস্ত নিত্য বস্তুর পরম নিত্য পুরুষ, এবং সমস্ত চেতন বস্তুর মধ্যে পরম চেতন পুরুষ। প্রতিটি জীবই তাই স্বরূপে নিত্য, এবং শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন তাদের সকলের নিত্য আকর্ষণ। শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন পূর্ণ পুরুষোত্তম, এবং অন্য সব কিছুই হচ্ছে তাঁর বিভিন্ন অংশ। শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে সমস্ত জীবের সম্পর্ক

হচ্ছে প্রভু-ভৃত্যের সম্পর্ক। সেই অস্তিত্ব হচ্ছে চিন্ময় এবং তা আমাদের জড় জগতের অভিজ্ঞতা থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। এই প্রভু-ভৃত্যের সম্পর্ক হচ্ছে স্বতঃস্ফূর্ত ভালবাসার সম্পর্ক। ভগবদ্ভক্তির মার্গে কিছুটা অগ্রসর হওয়ার পর এই তত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করা যায়। সকলের কর্তব্য হচ্ছে পরমেশ্বর ভগবানের প্রেমময়ী সেবায় যুক্ত হওয়া উচিত। তার ফলে মানুষ ধীরে ধীরে তার যথার্থ জীবন সম্বন্ধে অবগত হয়ে সম্পূর্ণভাবে প্রসন্ন হতে পারবে।

শ্লোক ৭

বাসুদেবে ভগবতি ভক্তিযোগঃ প্রয়োজিতঃ।
জনয়ত্যাশু বৈরাগ্যং জ্ঞানং চ যদহৈতুকম্ ॥ ৭ ॥

বাসুদেবে—শ্রীকৃষ্ণকে; **ভগবতি**—পরমেশ্বর ভগবানকে; **ভক্তিযোগঃ**—ভক্তিযোগ; **প্রয়োজিতঃ**—অনুষ্ঠিত; **জনয়তি**—উৎপাদন করে; **আশু**—অচিরে; **বৈরাগ্যম্**—বিষয়ে বিরক্তি; **জ্ঞানম্**—জ্ঞান; **চ**—এবং; **যৎ**—যা; **অহৈতুকম্**—কোন রকম ফলের বাসনারহিত।

অনুবাদ

ভক্তি সহকারে পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সেবা করা হলে অচিরেই শুদ্ধ জ্ঞানের উদয় হয় এবং জড়জাগতিক বিষয়ের প্রতি অনাসক্তি আসে।

তাৎপর্য

যারা মনে করে যে পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের প্রতি ভক্তি ভাবুকের ভাব-প্রবণতা ছাড়া আর কিছু নয়, তারা তর্ক উত্থাপন করে বলতে পারে যে, শাস্ত্রে যজ্ঞ, দান, তপশ্চর্যা, জ্ঞান, যোগ ইত্যাদি পারমার্থিক উপলব্ধির বহু পন্থা নির্দেশিত হয়েছে। তাদের মতে, যারা উচ্চস্তরের কার্যকলাপ অনুষ্ঠান করতে পারে না, তাদের জন্যই ভগবদ্ভক্তির পন্থা নির্দেশিত হয়েছে। অনেকে আবার বলে যে, ভগবদ্ভক্তির পন্থা শূদ্র, বৈশ্য এবং স্ত্রীলোকদের জন্য নির্দেশিত হয়েছে। কিন্তু তাদের এই উক্তির কোনও সত্যতা নেই। ভগবদ্ভক্তি হচ্ছে সমস্ত পারমার্থিক কার্যকলাপের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ, এবং তাই এই পন্থা মহিমান্বিত এবং তা অত্যন্ত সরল। যে সমস্ত শুদ্ধ ভক্ত ঐকান্তিকভাবে ভগবানের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত হওয়ার প্রয়াসী, তাদের কাছে এই পন্থা হচ্ছে সর্বশ্রেষ্ঠ, এবং ভক্তিযোগের দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে আছেন যে সমস্ত নবীন ভক্ত, তাঁদের কাছে এই পন্থাটি অত্যন্ত সরল। পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত হওয়ার এই পন্থাটি একটি মহৎ বিজ্ঞান, এবং তা প্রতিটি জীবের জন্যই উন্মুক্ত। এমন কি স্ত্রী, বৈশ্য, শূদ্রের থেকেও নিম্নস্তরে রয়েছে যে সমস্ত অন্ত্যজ, তাদের সকলের জন্যই ভগবদ্ভক্তির দ্বার উন্মুক্ত। সুতরাং, উচ্চস্তরের ব্রাহ্মণ এবং আত্মজ্ঞানী রাজাদের

আর কি কথা। অন্য যে সমস্ত পন্থা বেদে নির্দেশিত হয়েছে, যথা—যজ্ঞ, দান, তপশ্চর্যা ইত্যাদি, তা সবই ভগবদ্ভক্তির আনুষঙ্গিক ক্রিয়া।

জ্ঞান এবং বৈরাগ্য হচ্ছে পারমার্থিক উন্নতির পথে দুটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ। পারমার্থিক পথ জড় এবং চিন্ময়—উভয় বিষয়েই পূর্ণ জ্ঞান দান করে, এবং এইভাবে পূর্ণ জ্ঞান লাভ করে মানুষ জড়-বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে পারমার্থিক কার্যকলাপে অগ্রসর হয়। জড় বিষয়ের প্রতি অনাসক্ত নিষ্ক্রিয়তা নয়, যা অল্প বুদ্ধিসম্পন্ন মানুষেরা মনে করে থাকে। 'নৈষ্কর্ম' কথাটির অর্থ হচ্ছে অপ্রয়োজনীয় বিষয়গুলি ত্যাগ করা। ত্যাগ বলতে প্রয়োজনীয় বিষয় ত্যাগের কথা বলা হচ্ছে না। তেমনই, জড় বিষয় ত্যাগ বলতে জীবের যথার্থ কর্ম-ত্যাগের কথা বলা হচ্ছে না। ভক্তি-মার্গের উদ্দেশ্য হচ্ছে বাস্তব বস্তু সম্পর্কে অবগত হওয়া। যখন বাস্তব বস্তুকে জানা যায়, তখন অবাস্তব বিষয়গুলি আপনা থেকেই দূর হয়ে যায়। তাই বাস্তব বস্তুর প্রতি বাস্তবভাবে সেবাযুক্ত হওয়ার ফলে ভগবদ্ভক্তির বিকাশ হয় এবং তখন জীব আপনা থেকেই নিকৃষ্ট বিষয়ের প্রতি নিরাসক্ত হয়। তখন স্বাভাবিকভাবেই সে উৎকৃষ্ট বস্তুর প্রতি আসক্ত হয়। তেমনই, ভগবদ্ভক্তি জীবের পরম বৃত্তি হওয়ার ফলে তা মানুষকে জড় জগতে ইন্দ্রিয় সুখভোগের প্রচেষ্টা থেকে মুক্ত করে। সেটিই হচ্ছে শুদ্ধ ভক্তের লক্ষণ। তিনি মূর্খ নন অথবা তিনি নিকৃষ্ট স্তরের কার্যকলাপে যুক্ত নন, অথবা তাঁর কোন জাগতিক আসক্তিও নেই। শুষ্ক যুক্তি-তর্ক দিয়ে এই স্তরে উন্নীত হওয়া যায় না। তা সম্ভব হয় কেবল পরমেশ্বর ভগবানের কৃপার প্রভাবেই। অর্থাৎ, ভগবানের শুদ্ধ ভক্তের মধ্যে জ্ঞান বৈরাগ্য আদি সব ক'টি দিব্য গুণই বর্তমান থাকে, কিন্তু জ্ঞান থাকলেই অথবা অনাসক্ত হলেই ভগবদ্ভক্তির তত্ত্ব জানা যায় না। ভক্তিই হচ্ছে মানুষের সর্বশ্রেষ্ঠ বৃত্তি।

শ্লোক ৮

ধর্মঃ স্বনুষ্ঠিতঃ পুংসাং বিষ্বক্‌সেনকথাসু যঃ।
নোৎপাদয়েদ্‌যদি রতিং শ্রম এব হি কেবলম্‌ ॥ ৮ ॥

ধর্মঃ—ধর্ম; **স্বনুষ্ঠিতঃ**—ব্যক্তিগত অবস্থা অনুসারে অনুষ্ঠিত; **পুংসাম্‌**—মানুষদের; **বিষ্বক্‌সেন**—পরমেশ্বর ভগবান; **কথাসু**—বাণীতে; **যঃ**—যা; **ন**—না; **উৎপাদয়েৎ**—উৎপাদন করা; **যদি**—যদি; **রতিম্‌**—আসক্তিরূপ রুচি; **শ্রমঃ**—অনর্থক পরিশ্রম; **এব**—কেবল; **হি**—অবশ্যই; **কেবলম্‌**—সম্পূর্ণরূপে।

অনুবাদ

স্বীয় বৃত্তি অনুসারে বর্ণাশ্রম পালন রূপ স্ব-ধর্ম অনুষ্ঠান করার ফলেও যদি পরমেশ্বর ভগবানের মহিমা শ্রবণ-কীর্তনে আসক্তির উদয় না হয়, তা হলে তা বৃথা শ্রম মাত্র।

তাৎপর্য

মানুষের বিভিন্ন রকমের প্রবৃত্তি অনুসারে বিভিন্ন রকমের ধর্ম রয়েছে। জড় বিষয়াসক্ত যে মানুষ তার স্থূল জড় শরীরটির ঊর্ধ্বে আর কিছুই দর্শন করতে পারে না, তার কাছে তার ইন্দ্রিয়ের অতীত আর কিছুই নেই। তাই তার বৃত্তিগত কার্যকলাপ কেন্দ্রীভূত ও প্রসারিত স্বার্থপরতার মধ্যে আবদ্ধ থাকে। কেন্দ্রীভূত স্বার্থপরতা দেহকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠে—যা সাধারণত নিম্ন স্তরের পশুদের মধ্যে দেখা যায়; আর প্রসারিত স্বার্থপরতা মানব সমাজে দেখা যায় এবং তা পরিবার, সমাজ, জাতি, দেশ এবং পৃথিবীকে কেন্দ্র করে স্থূল দেহের বিষয়গত স্বাচ্ছন্দ্যের সঙ্গে যুক্ত সমস্ত বিষয়ে প্রসারিত হয়। এই সমস্ত স্থূল জড়বাদীদের ঊর্ধ্বে রয়েছে মনোধর্মীরা, যারা তাদের মনোরাজ্যে বিচরণ করে এবং তাদের বৃত্তিগত কার্যকলাপ হচ্ছে কবিতা রচনা করা বা দার্শনিক মতবাদ সৃষ্টি করা, যেগুলি হচ্ছে দেহ এবং মনের মধ্যে সীমাবদ্ধ স্বার্থপরতা। কিন্তু এই দেহ এবং মনের ঊর্ধ্বে অবস্থান করছেন সুপ্ত আত্মা, দেহে যাঁর অনুপস্থিতির ফলে দেহগত এবং মনোগত স্বার্থপরতাই অর্থহীন হয়ে যায়। কিন্তু অল্প বুদ্ধিসম্পন্ন মানুষদের আত্মার প্রয়োজন সম্বন্ধে কোনও ধারণা নেই।

যেহেতু মূর্খ মানুষদের আত্মা সম্বন্ধে কোনও ধারণা নেই এবং যেহেতু তারা জানে না যে আত্মা দেহ এবং মনের অতীত, তাই তারা তাদের বৃত্তি অনুসারে কর্ম করেও তৃপ্ত হতে পারে না। আত্মার তৃপ্তি বা প্রসন্নতা সম্বন্ধে প্রশ্নের উত্থাপন এখানে করা হয়েছে। আত্মা স্থূল দেহ এবং সূক্ষ্ম মনের অতীত। দেহ এবং মনকে সক্রিয় করে আত্মা। সুপ্ত আত্মার প্রয়োজনগুলি সম্বন্ধে অবগত না হয়ে শুধুমাত্র দেহ এবং মনের চাহিদাগুলি মিটিয়ে কখনই সুখী হওয়া যায় না। দেহ এবং মন হচ্ছে বাহ্যিক আবরণ। আত্মার সন্তুষ্টি-বিধানের জন্য আত্মার প্রয়োজনগুলি মেটাতে হবে। একটি পাখির খাঁচা পরিষ্কার করে যেমন পাখিটিকে আনন্দ দান করা যায় না, তেমনই দেহ এবং মনের প্রয়োজনগুলি মিটিয়ে আত্মাকে আনন্দ দান করা যায় না। পাখিটিকে আনন্দ দান করতে হলে যেমন তার প্রয়োজনগুলি সম্বন্ধে জানতে হবে, ঠিক তেমনই আত্মাকে আনন্দ দান করতে হলে আত্মার প্রয়োজনগুলি সম্বন্ধে অবগত হতে হবে।

আত্মার প্রয়োজন হচ্ছে এই জড় জগতের সীমিত গণ্ডি অতিক্রম করে পূর্ণ স্বাধীনতা লাভ করা। সে চায় এই ব্রহ্মাণ্ডের আবরণগুলি ভেদ করে বেরিয়ে যেতে। সে চায় মুক্তির আলোক এবং মুক্তির আনন্দ উপভোগ করতে। সেই মুক্তি সে তখনই লাভ করতে পারে, যখন সে পূর্ণ আনন্দময় পরমেশ্বর ভগবানের সঙ্গে যুক্ত হয়। সকলের হৃদয়েই ভগবানের প্রতি সুপ্ত প্রেম রয়েছে, স্থূল এবং সূক্ষ্ম জড় বস্তুর প্রতি জীবের যে আসক্তি, তা জড় দেহ এবং মনের মাধ্যমে চিন্ময় ভগবৎ-প্রেমেরই বিকৃত প্রকাশ। তাই আমাদের স্বধর্মপরায়ণ হতে হবে, যাতে আমরা আমাদের হৃদয়ে দিব্য চেতনার বিকাশ করতে পারি। তা সম্ভব হয় কেবল পরমেশ্বর ভগবানের অপ্রাকৃত

কার্যকলাপের মহিমা শ্রবণ এবং কীর্তন করার মাধ্যমে, এবং যে ধর্ম বা বৃত্তিগত কার্যকলাপ অনুষ্ঠানের ফলে পরমেশ্বর ভগবানের অপ্রাকৃত মহিমা শ্রবণ এবং কীর্তনের প্রতি আসক্তির উদয় হয় না, তাকে এখানে 'শ্রম এব হি কেবলম্' বলে বর্ণনা করা হয়েছে। তার কারণ হচ্ছে, অন্য সমস্ত ধর্ম (তা সে যে মতবাদের অন্তর্গত হোক্ না কেন) আত্মাকে মুক্তিদান করতে পারেনা। এমন কি মুক্তিকামীদের কার্যকলাপও অর্থহীন বলে বিবেচনা করা হয়েছে, কেন না তারা সমস্ত মুক্তির উৎস যে মুকুন্দ তাঁর সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত হতে পারছে না। স্থূল জড়বাদীরা দেখতে পায় যে, তাদের সমস্ত জড়-জাগতিক বিষয়গুলি সময় এবং স্থানের মধ্যে সীমাবদ্ধ, তা সে এই জগতেই হোক অথবা অন্য জগতেই হোক; এমন কি সে যদি স্বর্গলোকে উন্নীত হয়, সেখানেও সে তার অতৃপ্ত আত্মার আবাস-স্বরূপ কোন নিত্য স্থিতি লাভ করতে পারে না। অতৃপ্ত আত্মার তৃপ্তি-সাধনের একমাত্র উপায় হচ্ছে শুদ্ধ ভগবদ্ভক্তির পূর্ণ বৈজ্ঞানিক পন্থা অবলম্বন করা।

শ্লোক ৯

ধর্মস্য হ্যাপবর্গ্যস্য নার্থোঽর্থায়োপকল্পতে।
নার্থস্য ধর্মৈকান্তস্য কামো লাভায় হি স্মৃতঃ ॥ ৯ ॥

ধর্মস্য—ধর্মের; **হি**—অবশ্যই; **আপবর্গ্যস্য**—পরম মুক্তি; **ন**—না; **অর্থঃ**—অর্থ; **অর্থায়**—জাগতিক লাভের জন্য; **উপকল্পতে**—উদ্দেশ্য; **ন**—না; **অর্থস্য**—জড় বিষয় লাভের; **ধর্ম-এক-অন্তস্য**—পরম ধর্ম আচরণকারী; **কামঃ**—ইন্দ্রিয়-সুখভোগ; **লাভায়**—ফল লাভ; **হি**—যথার্থ; **স্মৃতঃ**—মহর্ষিদের দ্বারা বর্ণিত হয়েছে।

অনুবাদ

সমস্ত ধর্মের উদ্দেশ্যই হচ্ছে চরম মুক্তি লাভ করা। তা কখনো জড় বিষয় লাভের আশায় অনুষ্ঠান করা উচিত নয়। অধিকন্তু, তত্ত্বদ্রষ্টা মহর্ষিরা নির্দেশ দিয়ে গেছেন যে, যাঁরা পরম ধর্ম অনুষ্ঠানে যুক্ত হয়েছেন, তাঁরা যেন কখনই ইন্দ্রিয়-সুখভোগের উদ্দেশ্যে জড়-জাগতিক লাভের প্রত্যাশী না হন।

তাৎপর্য

আমরা পূর্বেই আলোচনা করেছি যে, পরমেশ্বর ভগবানের প্রতি শুদ্ধ ভক্তি অনুশীলনের ফলে আপনা থেকেই শুদ্ধ জ্ঞানের উদয় হয় এবং জড় বিষয়ের প্রতি আসক্তি রহিত হয়। কিন্তু বহু লোক আছে, যারা মনে করে যে সমস্ত কার্যকলাপেরই একমাত্র উদ্দেশ্য হচ্ছে জড়-জাগতিক বিষয় লাভ; এমন কি ধর্ম অনুশীলনের উদ্দেশ্যও তাই। পৃথিবীর প্রায় সর্বত্রই জনসাধারণ জাগতিক লাভের আশাতেই কেবল ধর্ম অনুষ্ঠান করে। এমন কি বৈদিক শাস্ত্রেও, সব রকমের ধর্ম আচরণের সঙ্গে

জড়-জাগতিক লাভের প্রলোভনও জুড়ে দেওয়া হয়েছে, এবং অধিকাংশ মানুষই ধর্ম আচরণের মাধ্যমে এই সমস্ত লাভের প্রতি অথবা প্রলোভনগুলির প্রতি আসক্ত। তথাকথিত ধর্মপরায়ণ মানুষদের কেন এই ধরনের জড় বিষয় লাভের প্রলোভন দেখানো হয়েছে? কেন না, জড় বিষয় লাভের ফলে তাদের ইন্দ্রিয়-সুখ উপভোগের বাসনা পূর্ণ হয়। এই ধরনের তথাকথিত ধর্ম অনুশীলনের ফলে বিষয় লাভ হয়, এবং বিষয় লাভের ফলে জড় কামনা-বাসনা চরিতার্থ করা যায়। ইন্দ্রিয়-সুখভোগই হচ্ছে সকাম কর্মীদের সমস্ত কর্মের উদ্দেশ্য। কিন্তু শ্রীল সূত গোস্বামীর মতে, শ্রীমদ্ভাগবতের সিদ্ধান্ত অনুসারে এই শ্লোকে তা বাতিল করা হয়েছে।

কেবল জড় বিষয় লাভের উদ্দেশ্যে কখনই কোন রকম ধর্ম-আচরণ করা উচিত নয়। জড় বিষয় লাভ হলেও তা ইন্দ্রিয়-সুখ উপভোগের জন্য ব্যবহার করা উচিত নয়। জড় বিষয় কীভাবে উপযোগ করা উচিত তা নিম্নে বর্ণিত হয়েছে।

শ্লোক ১০

কামস্য নেন্দ্রিয়প্রীতির্লাভো জীবেত যাবতা।
জীবস্য তত্ত্বজিজ্ঞাসা নার্থো যশ্চেহ কর্মভিঃ ॥ ১০ ॥

কামস্য—কামনা-বাসনার; **ন**—না; **ইন্দ্রিয়**—ইন্দ্রিয় সমূহ; **প্রীতিঃ**—প্রীতি; **লাভঃ**—লাভ; **জীবেত**—জীবন-ধারণ; **যাবতা**—যতটুকু পরিমাণ; **জীবস্য**—জীবের; **তত্ত্ব**—পরম-তত্ত্ব; **জিজ্ঞাসা**—জিজ্ঞাসা; **ন**—না; **অর্থঃ**—অর্থ; **যঃ চ ইহ**—তা ছাড়া; **কর্মভিঃ**—কর্মের দ্বারা।

অনুবাদ

ইন্দ্রিয় সুখভোগকে কখনই জীবনের উদ্দেশ্য বলে গ্রহণ করা উচিত নয়। সুস্থ জীবন যাপন করা অথবা আত্মাকে নির্মল রাখার বাসনাই কেবল করা উচিত, কেন না মানব জীবনের উদ্দেশ্য হচ্ছে পরম-তত্ত্ব সম্বন্ধে অনুসন্ধান করা। এ ছাড়া অন্য কোনও উদ্দেশ্য নিয়ে কর্ম করা উচিত নয়।

তাৎপর্য

সম্পূর্ণরূপে মোহাচ্ছন্ন জাগতিক সভ্যতা আজ ভ্রান্তভাবে বিষয়-ভোগের উদ্দেশ্যে পরিচালিত হচ্ছে। এই ধরনের সভ্যতায়, জীবনের প্রতিটি স্তরে বিষয়-ভোগই জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য হয়ে দাঁড়িয়েছে। রাজনীতিতে, সমাজ-সেবায়, পরার্থবাদে, লোকহিতৈষণায় এবং চরমে ধর্ম অনুষ্ঠানে, এমন কি মুক্তির আকাঙ্ক্ষাতেও সেই ইন্দ্রিয়-তৃপ্তির বাসনা ক্রমান্বয়ে বর্ধিত অবস্থায় বর্তমান। রাজনীতির ক্ষেত্রে গণনেতারাও তাদের ইন্দ্রিয়-সুখভোগের প্রয়াসে পরস্পরের সঙ্গে লড়াই করছে। ভোটদানকারী জনসাধারণও, যে নেতা তাদের সব চাইতে বেশি ইন্দ্রিয়-সুখভোগের

আশ্বাস দিচ্ছে, তাকেই ভোট দিচ্ছে। ভোটদানকারী জনসাধারণের ইন্দ্রিয়-তৃপ্তির যখন বিঘ্ন ঘটছে, তখন তারা নেতাদের গদিচ্যুত করছে। নেতারা সর্বদাই ভোটদানকারীদের নিরাশ করছে, কেন না তারা তাদের প্রতিশ্রুতি অনুসারে ভোটদানকারীদের ইন্দ্রিয়-তৃপ্তি সাধন করতে পারছে না। সমস্ত ক্ষেত্রেই এটা চলছে; জীবনের সমস্যাগুলি নিয়ে কেউ মাথা ঘামাচ্ছে না। এমন কি যারা মুক্তির কামনা করছে, তারাও তাদের ইন্দ্রিয়ের তৃপ্তি সাধনের জন্য পরম-তত্ত্ব বা ব্রহ্মে লীন হয়ে গিয়ে তাদের সত্তা বা আত্মাকে হত্যা করার চেষ্টা করছে। কিন্তু শ্রীমদ্ভাগবতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে, ইন্দ্রিয়-সুখভোগের উদ্দেশ্যে জীবন যাপন করা উচিত নয়। কেবল জীবন ধারণের জন্য যতটুকু বিষয় ভোগের প্রয়োজন ততটুকুই গ্রহণ করা উচিত, ইন্দ্রিয়-সুখভোগের জন্য নয়। দেহটি যেহেতু ইন্দ্রিয় দিয়ে গঠিত, সেই জন্য তার অন্তত কিছু পরিমাণ বিধি-নিষেধগুলি মেনে চলতে হবে। উচ্ছৃঙ্খলভাবে ইন্দ্রিয় সুখভোগ করা উচিত নয়। যেমন, সন্তান-সন্ততি উৎপাদনের জন্য বিবাহের মাধ্যমে স্ত্রী এবং পুরুষের মিলনের পন্থা রয়েছে, কিন্তু ইন্দ্রিয়-সুখভোগের জন্য তা নির্দিষ্ট হয়নি। আজকের সমাজে সংযমের অভাব বলেই জন্ম-নিয়ন্ত্রণের এত পরিকল্পনা করতে হচ্ছে, কিন্তু মূর্খ লোকেরা জানে না যে পরম সত্যের অনুসন্ধান যখন শুরু হয়, তখন জন্ম-নিয়ন্ত্রণ আপনা থেকেই সাধিত হয়। যাঁরা পরম সত্যের অনুসন্ধানী, তাঁরা কখনই ইন্দ্রিয়-সুখভোগের অর্থহীন কার্যকলাপে আকৃষ্ট হন না। কেন না তাঁরা পরম সত্যের অনুসন্ধানে সর্বদাই মগ্ন। তাই জীবনের প্রতিটি স্তরেই মানুষের পরম সত্যের অনুসন্ধান করা উচিত এবং তার ফলেই কেবল মানুষ সুখী হতে পারবে, কেন না সে তখন ইন্দ্রিয়-সুখভোগের বিভিন্ন প্রচেষ্টা থেকে বিরত হয়। পরম সত্য যে কি তা পরবর্তী শ্লোকে বর্ণিত হয়েছে।

শ্লোক ১১

বদন্তি তত্তত্ত্ববিদস্তত্ত্বং যজ্‌জ্ঞানমদ্বয়ম্।
ব্রহ্মেতি পরমাত্মেতি ভগবানিতি শব্দ্যতে ॥ ১১ ॥

বদন্তি—তাঁরা বলেন; **তৎ**—তাকে; **তত্ত্ব-বিদঃ**—তত্ত্বজ্ঞানীরা; **তত্ত্বম্**—পরম-তত্ত্ব; **যৎ**—যা; **জ্ঞানম্**—জ্ঞান; **অদ্বয়ম্**—অদ্বিতীয়; **ব্রহ্ম ইতি**—ব্রহ্ম নামে অভিহিত; **পরমাত্মা ইতি**—পরমাত্মা নামে অভিহিত; **ভগবান্ ইতি**—ভগবান নামে অভিহিত; **শব্দ্যতে**—শব্দিত হয় অর্থাৎ কথিত হয়।

অনুবাদ

যা অদ্বয় জ্ঞান, অর্থাৎ এক এবং অদ্বিতীয় বাস্তব বস্তু, জ্ঞানীগণ তাকেই পরমার্থ বলেন। সেই তত্ত্ববস্তু ব্রহ্ম, পরমাত্মা ও ভগবান—এই ত্রিবিধ সংজ্ঞায় সংজ্ঞিত বা কথিত হন।

তাৎপর্য

পরম-তত্ত্ব দৃশ্য এবং দ্রষ্টা উভয়ই, এবং গুণগতভাবে তাঁদের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। তাই ব্রহ্ম, পরমাত্মা এবং ভগবান গুণগতভাবে অভিন্ন। উপনিষদের অনুগামী জ্ঞানীদের কাছে তা নির্বিশেষ ব্রহ্মরূপে উপলব্ধ হয়, যোগীদের কাছে পরমাত্মা বা হিরণ্যগর্ভরূপে উপলব্ধ হন এবং ভক্তদের কাছে ভগবানরূপে প্রকাশিত হন। পক্ষান্তরে বলা যায়, ভগবান অথবা পরম ঈশ্বর হচ্ছেন পরম-তত্ত্বের সর্বোচ্চ উপলব্ধি। পরমাত্মা হচ্ছেন পরমেশ্বর ভগবানের আংশিক প্রকাশ, এবং নির্বিশেষ ব্রহ্ম হচ্ছেন পরমেশ্বর ভগবানের রশ্মিচ্ছটা, যেমন সূর্যকিরণ হচ্ছে সূর্যদেবের রশ্মিচ্ছটা। এই মার্গগুলির অল্প-বুদ্ধিসম্পন্ন শিক্ষার্থীরা কখনও কখনও তাদের পন্থার স্বপক্ষে তর্ক করে, কিন্তু যাঁরা যথার্থ তত্ত্বদ্রষ্টা, তাঁরা ভালভাবেই জানেন যে উপরোক্ত তিনটি তত্ত্বই বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গির পরিপ্রেক্ষিতে সেই একই পরম-তত্ত্বের বিভিন্ন প্রকাশ।

শ্রীমদ্ভাগবতের প্রথম অধ্যায়ের প্রথম শ্লোকে বর্ণিত হয়েছে যে, পরম সত্য হচ্ছেন অভিজ্ঞ, স্বরাট এবং আপেক্ষিক জগতের সব রকম মোহ থেকে মুক্ত। আপেক্ষিক জগতে জ্ঞাতা জ্ঞেয় থেকে ভিন্ন, কিন্তু অদ্বয়-তত্ত্বে জ্ঞাতা এবং জ্ঞেয় এক এবং অভিন্ন। আপেক্ষিক জগতে জ্ঞাতা হচ্ছেন চেতন আত্মা, উৎকৃষ্ট শক্তি, আর জ্ঞেয় হচ্ছে জড় পদার্থ বা নিকৃষ্ট শক্তি। তাই সেখানে উৎকৃষ্ট এবং নিকৃষ্ট শক্তির দ্বন্দ্ব রয়েছে, কিন্তু চিন্ময় জগতে জ্ঞাতা এবং জ্ঞেয় উভয়েই উৎকৃষ্ট শক্তি। পরম শক্তিমানের তিন রকমের শক্তি রয়েছে। শক্তি এবং শক্তিমানের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই, তবে তার প্রকাশের তারতম্য রয়েছে। চিন্ময় জগৎ এবং চেতন আত্মা উভয়েই উৎকৃষ্ট শক্তিজাত, কিন্তু জড় জগৎ ভগবানের নিকৃষ্ট শক্তিজাত। জীব যখন নিকৃষ্ট প্রকৃতির সংস্পর্শে আসে, তখন সে নিজেকে নিকৃষ্ট শক্তির অন্তর্গত বলে মনে করে মোহাচ্ছন্ন হয়। তাই এই জড় জগতে আপেক্ষিকতা অনুভূত হয়। চিন্ময় স্তরে জ্ঞাতা এবং জ্ঞেয়ের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই, এবং তাই সেখানে সব কিছুই হচ্ছে পরম-তত্ত্ব।

শ্লোক ১২

তচ্ছ্রদ্দধানা মুনয়ো জ্ঞানবৈরাগ্যযুক্তয়া।
পশ্যন্ত্যাত্মনি চাত্মানং ভক্ত্যা শ্রুতগৃহীতয়া ॥ ১২ ॥

তৎ—তা; **শ্রদ্দধানাঃ**—ঐকান্তিকভাবে জিজ্ঞাসু; **মুনয়ঃ**—মুনিগণ; **জ্ঞান**—জ্ঞান; **বৈরাগ্য**—বৈরাগ্য; **যুক্তয়া**—সমন্বিত; **পশ্যন্তি**—দেখেন; **আত্মনি**—নিজের মধ্যে; **চ**—এবং; **আত্মানম্**—পরমাত্মাকে; **ভক্ত্যা**—ভক্তির মাধ্যমে; **শ্রুত**—বেদসমূহ; **গৃহীতয়া**—সুচারুরূপে প্রাপ্ত।

অনুবাদ

অপ্রাকৃত বস্তুতে সুদৃঢ় ও নিশ্চয় বিশ্বাসযুক্ত মুনিগণ জ্ঞান এবং বৈরাগ্যযুক্ত হয়ে শাস্ত্র শ্রবণজনিত উপলব্ধি অনুসারে ভগবানের প্রতি প্রেমময়ী সেবার দ্বারা তাঁদের শুদ্ধ হৃদয়ে পরমাত্মারূপে সেই তত্ত্ববস্তুকে দর্শন করেন।

তাৎপর্য

বাসুদেব বা পরমেশ্বর ভগবানের প্রতি ভক্তিযুক্ত সেবার মাধ্যমেই পরমতত্ত্বকে জানা যায়, কেন না তিনিই হচ্ছেন পূর্ণ পরম-তত্ত্ব। ব্রহ্ম হচ্ছে তাঁর দেহ নির্গত রশ্মিচ্ছটা, এবং পরমাত্মা হচ্ছে তাঁর আংশিক প্রকাশ। তাই ব্রহ্ম-উপলব্ধি অথবা পরমাত্মা-উপলব্ধি হচ্ছে পরম-তত্ত্বের আংশিক উপলব্ধি। চার শ্রেণীর মানুষ রয়েছে—কর্মী, জ্ঞানী, যোগী এবং ভক্ত। কর্মীরা হচ্ছে জড়বাদী, কিন্তু অন্য তিনটি শ্রেণীর মানুষেরা অধ্যাত্মবাদী। সর্বশ্রেষ্ঠ অধ্যাত্মবাদী হচ্ছেন ভগবদ্ভক্ত, যাঁরা পরমেশ্বর ভগবানকে উপলব্ধি করতে পেরেছেন। দ্বিতীয় স্তরের অধ্যাত্মবাদী হচ্ছেন তাঁরা, যাঁরা পরমেশ্বর ভগবানের অংশ প্রকাশ পরমাত্মাকে আংশিকভাবে উপলব্ধি করেছেন, আর তৃতীয় শ্রেণীর অধ্যাত্মবাদী হচ্ছেন তাঁরা, যাঁরা সেই পরমপুরুষের চিন্ময় রশ্মিচ্ছটা দর্শন করেছেন। ভগবদ্গীতা এবং অন্যান্য বৈদিক শাস্ত্রে নির্দেশিত হয়েছে যে, পরমেশ্বর ভগবানকে জ্ঞান এবং বৈরাগ্যযুক্ত ভক্তির মাধ্যমেই কেবল জানা যায়। আমরা ইতিপূর্বেই জ্ঞান এবং বৈরাগ্যের মাধ্যমে কিভাবে ভক্তিযোগ অবলম্বন করা যায়, এ বিষয়ে আলোচনা করেছি। যেহেতু ব্রহ্ম-উপলব্ধি এবং পরমাত্মা-উপলব্ধির পন্থা দুটি অর্থাৎ জ্ঞান এবং যোগ—পরম-তত্ত্ব উপলব্ধির অপূর্ণ পন্থা। ভগবদ্ভক্তি পূর্ণ জ্ঞানের উপর প্রতিষ্ঠিত এবং জড় বিষয়াসক্তি রহিত বৈরাগ্যযুক্ত, এবং তদুপরি তা বেদান্ত-শ্রুতির ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত। এই পূর্ণাঙ্গ পন্থাটির মাধ্যমেই কেবল ঐকান্তিকভাবে অনুসন্ধিৎসু মানুষেরা পরম-তত্ত্বকে উপলব্ধি করতে পারেন। তাই ভগবদ্ভক্তির পন্থা অল্প-বুদ্ধিসম্পন্ন অধ্যাত্মবাদীদের জন্য নয়। তিন রকমের ভক্ত রয়েছেন, যথা—উত্তম অধিকারী ভক্ত, মধ্যম অধিকারী ভক্ত এবং কনিষ্ঠ অধিকারী ভক্ত। কনিষ্ঠ অধিকারী ভক্ত হচ্ছে তারা, যাদের যথার্থ জ্ঞান নেই এবং যারা জড় বিষয়ের প্রতি বৈরাগ্যযুক্ত নয়; কিন্তু তারা মন্দিরে ভগবানের পূজার প্রতি আকৃষ্ট। তাদের বলা হয় প্রাকৃত ভক্ত। প্রাকৃত ভক্তরা পারমার্থিক উন্নতির থেকে জড় বিষয় লাভের প্রতি বেশি আসক্ত। তাই এই প্রাকৃত ভক্তের স্তর থেকে মধ্যম অধিকারী ভক্তের স্তরে উন্নীত হওয়ার জন্য ভক্তকে সর্বতোভাবে চেষ্টা করতে হবে। মধ্যম অধিকারী ভক্তির স্তরে ভক্ত ভক্তিমার্গের চারটি তত্ত্ব দর্শন করতে পারেন। যথা পরমেশ্বর ভগবান, ভগবানের ভক্ত, ভগবান সম্বন্ধে অনভিজ্ঞ মানুষ এবং ভগবদ্বিদ্বেষী। পরম তত্ত্বকে জানবার যোগ্যতা অর্জন করার জন্য ভক্তকে অন্তত মধ্যম অধিকারীর ভক্তির স্তরে উন্নীত হতে হবে।

সেই জন্য কনিষ্ঠ অধিকারী ভক্তকে ভগবদ্ভক্তি সম্বন্ধে ভাগবতের প্রামাণিক সূত্র থেকে নির্দেশ গ্রহণ করতে হবে। প্রথম শ্রেণীর ভাগবত হচ্ছেন ভগবানের শুদ্ধ ভক্ত এবং অন্য ভাগবতটি হচ্ছে ভগবানের বাণী। কনিষ্ঠ অধিকারী ভক্তকে তাই ভগবদ্ভক্তি সম্বন্ধে জানবার জন্য ব্যক্তি-ভাগবতের শরণাগত হতে হয়। এই ধরনের ব্যক্তি-ভাগবত *শ্রীমদ্ভাগবতের* পেশাদারি পাঠক নয়, যারা তাদের জীবিকা-নির্বাহের জন্য ভাগবত পাঠ করে অর্থ উপার্জন করে। যথার্থ ব্যক্তি-ভাগবত হচ্ছেন তিনি, যিনি শ্রীল সূত গোস্বামীর মতো শুকদেব গোস্বামীর প্রতিনিধি, এবং যিনি অবশ্যই জনসাধারণের সর্বাঙ্গীণ মঙ্গলের জন্য ভগবদ্ভক্তির মাহাত্ম্য প্রচার করেন। কনিষ্ঠ ভক্তের ভগবানের কথা শ্রবণে কোন রুচি নেই বললেই চলে। এই ধরনের কনিষ্ঠ ভক্ত পেশাদারি ভাগবত পাঠকের কাছে পাঠ শোনার অভিনয় করে। কিন্তু তাদের এই পাঠ শোনা ইন্দ্রিয়-তৃপ্তি ছাড়া আর কিছু নয়। এই ধরনের কলুষযুক্ত শ্রবণ এবং কীর্তনের ফলে সর্বনাশ হয়, তাই এই ভ্রান্তি সম্বন্ধে সকলকে খুব সতর্ক হতে হবে। পরমেশ্বর ভগবানের পবিত্র বাণী *শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা* ও *শ্রীমদ্ভাগবতে* বর্ণিত হয়েছে। এই বিষয়টি নিঃসন্দেহে অপ্রাকৃত বিষয়, কিন্তু তা হলেও তা পেশাদারি মানুষদের কাছ থেকে গ্রহণ করা উচিত নয়, কেন না সর্পের জিহ্বার স্পর্শে দুধ যেমন বিষে পরিণত হয়, ঠিক তেমনই এই পেশাদারি পাঠকদের মুখ থেকে *শ্রীমদ্ভাগবত* শুনলে তার ফলও বিষবৎ হয়।

তাই ঐকান্তিক ভক্তকে তাঁর পারমার্থিক মঙ্গল সাধনের জন্য উপনিষদ, বেদান্ত এবং পূর্বতন আচার্য অথবা গোস্বামীদের প্রদত্ত গ্রন্থাবলীর মাধ্যমে বৈদিক জ্ঞান গ্রহণ করার জন্য প্রস্তুত হতে হবে। এই সমস্ত গ্রন্থাবলী শ্রবণ না করলে যথার্থ উন্নতি সাধন করতে পারে না। শ্রবণ এবং অনুশীলন না করে কেবল লোক দেখানো ভক্তি আচরণ করা সম্পূর্ণ অর্থহীন এবং তার ফলে ভগবদ্ভক্তির পথে এক রকমের উৎপাতের সৃষ্টি হয়। তাই শ্রুতি, স্মৃতি, পুরাণ অথবা পঞ্চরাত্র আদি শাস্ত্রসমূহে প্রদত্ত বিধি বিহীন লোকদেখানো ভক্তি তৎক্ষণাৎ বর্জন করতে হবে। অনধিকারী মানুষকে কখনও শুদ্ধ ভক্ত বলে মনে করা উচিত নয়। বৈদিক শাস্ত্র থেকে প্রাপ্ত জ্ঞানের মাধ্যমে পরমাত্মারূপে নিরন্তর পরমেশ্বর ভগবানকে দর্শন করা যায়। তাকে বলা হয় সমাধি।

শ্লোক ১৩

অতঃ পুম্ভির্দ্বিজশ্রেষ্ঠা বর্ণাশ্রমবিভাগশঃ।
স্বনুষ্ঠিতস্য ধর্মস্য সংসিদ্ধির্হরিতোষণম্ ॥ ১৩ ॥

অতঃ—অতএব; **পুম্ভিঃ**—মানুষের দ্বারা; **দ্বিজ-শ্রেষ্ঠাঃ**—হে শ্রেষ্ঠ (দ্বিজ) ব্রাহ্মণগণ; **বর্ণাশ্রম**—বর্ণাশ্রম ধর্ম; **বিভাগশঃ**—বিভাগের দ্বারা; **স্বনুষ্ঠিতস্য**—

স্বধর্মের; **ধর্মস্য**—ধর্মের; **সংসিদ্ধিঃ**—চরম সিদ্ধি, **হরি**—পরমেশ্বর ভগবান; **তোষণম্**—সন্তুষ্টি-বিধান।

অনুবাদ

হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ, তাই সিদ্ধান্ত করা হয়েছে যে, স্বীয় প্রবণতা অনুসারে বর্ণাশ্রম ধর্ম পালন করার মাধ্যমে পরমেশ্বর ভগবান শ্রীহরির সন্তুষ্টি-বিধান করাই হচ্ছে স্ব-ধর্মের চরম ফল।

তাৎপর্য

সারা পৃথিবীর মানব সমাজ চারটি বর্ণ এবং জীবনের চারটি আশ্রমে বিভক্ত। চারটি বর্ণ হচ্ছে—বুদ্ধিমান শ্রেণী, সৈনিক, ব্যবসায়ী এবং শ্রমিক। এই শ্রেণী বিভাগগুলি গুণ এবং কর্ম অনুসারে হয়ে থাকে, জন্ম অনুসারে নয়। তারপর জীবনেরও আবার চারটি স্তর রয়েছে, যথা—জ্ঞান আহরণের স্তর, গার্হস্থ্য জীবনের স্তর, অবসর-প্রাপ্ত জীবন এবং ভক্তিযোগ অবলম্বনপূর্বক পারমার্থিক জীবন। মানব সমাজের সর্বশ্রেষ্ঠ হিত-সাধনের জন্য জীবনের এই বিভাগগুলি অপরিহার্য, তা না হলে কোন সমাজ-ব্যবস্থাই সুষ্ঠুভাবে গড়ে উঠতে পারে না। পরমেশ্বর ভগবানের সন্তুষ্টি-বিধানই পূর্বোল্লিখিত বিভাগগুলির উদ্দেশ্য হওয়া উচিত। মানব সমাজের এই বৃত্তি-বিভাগকে বলা হয় বর্ণাশ্রম ধর্ম, যা হচ্ছে সভ্য জীবন যাপনের স্বাভাবিক পন্থা। বর্ণাশ্রম বিভাগের উদ্দেশ্য হচ্ছে পরম-তত্ত্বকে জানা। এক শ্রেণীর লোকদের অপর শ্রেণীর লোকদের ওপর কৃত্রিমভাবে আধিপত্য করার জন্য এই বর্ণাশ্রম ধর্ম নয়। অত্যধিক ইন্দ্রিয়-প্রীতির ফলে যখন জীবনের চরম উদ্দেশ্য অর্থাৎ পরমেশ্বর ভগবানকে জানার উদ্দেশ্য ব্যর্থ হয়, তখন স্বার্থপর মানুষেরা এই বর্ণাশ্রম পন্থাকে নিম্নতর শ্রেণীর লোকদের উপর আধিপত্য করার জন্য অসংভাবে ব্যবহার করে। কলিযুগে এই কৃত্রিম আধিপত্যের প্রভাব চারিদিকেই দেখা যাচ্ছে। কিন্তু বিচক্ষণ মানুষেরা ভালভাবেই জানেন যে, এই বর্ণ এবং আশ্রমের উদ্দেশ্য হচ্ছে আত্মজ্ঞানের উন্নত চিন্তাধারার বিকাশ সাধন করা। এর মাধ্যমে সমাজকে সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করা যায়; এ ছাড়া এই বর্ণাশ্রম প্রথার আর কোন উদ্দেশ্য নেই।

শ্রীমদ্ভাগবতের এই শ্লোকে বর্ণনা করা হয়েছে যে, জীবনের চরম উদ্দেশ্য অথবা বর্ণাশ্রম ধর্মের চরম ফল হচ্ছে পরমেশ্বর ভগবানের সন্তুষ্টি বিধানের জন্য সম্মিলিতভাবে প্রচেষ্টা করা। সে কথা *ভগবদ্গীতাতেও* (৪/১৩) প্রতিপন্ন হয়েছে।

শ্লোক ১৪

তস্মাদেকেন মনসা ভগবান্ সাত্বতাং পতিঃ।
শ্রোতব্যঃ কীর্তিতব্যশ্চ ধ্যেয়ঃ পূজ্যশ্চ নিত্যদা ॥ ১৪ ॥

তস্মাৎ—অতএব ; **একেন**—একাগ্র **মনসা**—চিত্তে ; **ভগবান্**—পরমেশ্বর ভগবান্ ; **সাত্বতাম্**—ভক্তদের ; **পতিঃ**—রক্ষক ; **শ্রোতব্যঃ**—শ্রবণীয় ; **কীর্তিতব্যঃ**—কীর্তনীয় ; **চ**—এবং ; **ধ্যেয়ঃ**—স্মরণীয় ; **পূজ্যঃ**—পূজনীয় ; **চ**—এবং ; **নিত্যদা**—সর্বক্ষণ।

অনুবাদ

তাই একাগ্র চিত্তে, নিরন্তর ভক্তবৎসল ভগবানের মহিমা শ্রবণ, কীর্তন, স্মরণ এবং তাঁর আরাধনা করা কর্তব্য।

তাৎপর্য

পরম-তত্ত্বকে জানা যদি জীবনের চরম উদ্দেশ্য হয়, তা হলে তা অবশ্যই সর্বতোভাবে সম্পাদন করতে হবে। পূর্বোক্ত বর্ণ এবং আশ্রমের প্রতিটি স্তরেই এই চারটি পন্থা, অর্থাৎ ভগবানের মহিমা কীর্তন, ভগবানের মহিমা শ্রবণ, ভগবানের লীলা স্মরণ এবং ভগবানের আরাধনা—এ সবই হচ্ছে সাধারণ বৃত্তি। জীবনের এই উদ্দেশ্য রহিত হয়ে কেউ বাঁচতে পারে না। এই চারটি কার্য নিয়েই মানুষের জীবন, বিশেষ করে আধুনিক সমাজের সমস্ত কার্যকলাপই শ্রবণ এবং কীর্তন কেন্দ্রিক। সমাজের যে-কোনও স্তরের যে-কোনও মানুষের সম্বন্ধে যখন যথার্থভাবে অথবা ভ্রান্তভাবে সংবাদপত্রে প্রশংসা করে অনেক কিছু লেখা হয়, তখন সে অচিরেই সমাজের একজন গণ্যমান্য ব্যক্তিতে পরিণত হয়। কখনও কখনও কোন বিশেষ দলের রাজনৈতিক নেতাদের সম্বন্ধে সংবাদপত্রে প্রচার হতে দেখা যায়, এবং এই ধরনের প্রচারের ফলে একজন নগণ্য অতি অল্প সময়ের মধ্যে একজন গণ্যমান্য ব্যক্তিতে পরিণত হয়। তবে এই ধরনের প্রচার হচ্ছে অযোগ্য মানুষের অপকীর্তির প্রচার, এবং তার ফলে কারোরই কোন মঙ্গল সাধিত হয় না। এই ধরনের প্রচারের ফলে সাময়িক প্রতিক্রিয়া দেখা দিলেও তার কোন স্থায়ী ফল নেই। তাই এই ধরনের কার্যকলাপগুলি সময়ের অপচয় মাত্র। পরমেশ্বর ভগবানের মহিমাই কেবল কীর্তন করা উচিত, যিনি হচ্ছেন আমাদের সম্মুখে দৃশ্যমান সব কিছুরই সৃষ্টিকর্তা। শ্রীমদ্ভাগবতের প্রথমেই *জন্মাদ্যস্য* শ্লোকে আমরা বিশদভাবে সে সম্বন্ধে আলোচনা করেছি। অপরের মহিমা কীর্তন করা অথবা অপরের কথা শ্রবণ করার যে প্রবৃত্তি আমাদের রয়েছে, তা যথার্থভাবে ভগবানের মহিমা-কীর্তনে নিয়োগ করতে হবে, এবং তার ফলেই যথার্থ শান্তি এবং আনন্দ লাভ হবে।

শ্লোক ১৫

যদনুধ্যাসিনা যুক্তাঃ কর্মগ্রন্থিনিবন্ধনম্।
ছিন্দন্তি কোবিদাস্তস্য কো ন কুর্যাৎকথারতিম্ ॥ ১৫ ॥

যৎ—যা ; অনুধ্যা—অনুস্মরণ ; অসিনা—তরবারির দ্বারা ; যুক্তাঃ—যুক্ত হয়ে ; কর্ম—কর্ম ; গ্রন্থি—গ্রন্থি ; নিবন্ধনম্—বন্ধনকারী ; ছিন্দন্তি—ছেদন করে ; কোবিদাঃ—বিবেকী ; তস্য—তাঁর ; কঃ—কে ; ন—না ; কুর্যাৎ—করবে ; কথা—কথা ; রতিম্—রতি।

অনুবাদ

পরমেশ্বর ভগবানের অনুস্মরণ রূপ তরবারির দ্বারা যথার্থ জ্ঞানী পুরুষেরা কর্ম-বন্ধন ছেদন করেন। তাই সেই ভগবানের কথায় কেই বা রতিযুক্ত হবে না?

তাৎপর্য

চিন্ময় স্ফুলিঙ্গ যখন জড় পদার্থের সংস্পর্শে আসে তখন একটি গ্রন্থির সৃষ্টি হয়, যা কর্ম-বন্ধন থেকে মুক্তিকামী মানুষদের অবশ্যই ছেদন করতে হয়। 'মুক্তি' কথাটির অর্থ হচ্ছে কর্মফলের বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়া। যাঁরা নিরন্তর পরমেশ্বর ভগবানের অপ্রাকৃত লীলাসমূহ স্মরণ করেন, তাঁদের আপনা থেকেই মুক্তি লাভ হয়ে যায়। কেন না পরমেশ্বর ভগবানের সমস্ত কার্যকলাপই (লীলা) জড়া প্রকৃতির গুণের অতীত। সেগুলি হচ্ছে সর্বাকর্ষক চিন্ময় কার্যকলাপ, এবং তাই পরমেশ্বর ভগবানের চিন্ময় কার্যকলাপে নিরন্তর মগ্ন থাকলে, বদ্ধ জীব ধীরে ধীরে চিন্ময়ত্ব লাভ করেন এবং অবশেষে জড়বন্ধন ছেদন করেন।

তাই, জড় বন্ধন থেকে মুক্তি লাভ ভগবদ্ভক্তির একটি আনুষঙ্গিক ফল। চিন্ময় জ্ঞান মুক্তি লাভের জন্য যথেষ্ট নয়। সেই জ্ঞান অবশ্যই ভক্তিযুক্ত সেবা সমন্বিত হতে হবে, যাতে অবশেষে ভগবদ্ভক্তির প্রাধান্যই কেবল বর্তমান থাকে। তখনই মুক্তি লাভ সম্ভব হয়। এমন কি সকাম কর্মীদের কর্মও ভক্তিযুক্ত সেবা-মিশ্রিত হলেই তবে মুক্তিদান করে। ভগবদ্ভক্তি-মিশ্রিত কর্মকে বলা হয় কর্মযোগ। তেমনই, মনোধর্মী জ্ঞান যখন ভক্তিযুক্ত হয় তখন তাকে বলা হয় জ্ঞানযোগ। তবে শুদ্ধ-ভক্তি জ্ঞান এবং কর্মের আবরণ থেকে মুক্ত, কেন না তা কেবল জীবকে জড় জগতের বন্ধন থেকেই মুক্ত করে না, তা পরমেশ্বর ভগবানের প্রতি প্রেমভক্তিও প্রদান করে থাকে।

তাই, বিচক্ষণ জ্ঞানী মানুষেরা নিরন্তর পরমেশ্বর ভগবানের মহিমা শ্রবণ এবং কীর্তন করার মাধ্যমে নিরন্তর তাঁকে স্মরণ করেন। অপ্রতিহতভাবে এবং অহৈতুকীভাবে তাঁরা নিরন্তর পরমেশ্বর ভগবানের আরাধনা করেন। সেটিই হচ্ছে ভগবদ্ভক্তি অনুশীলনের আদর্শ পন্থা। বৃন্দাবনের গোস্বামীরা যাঁরা ভক্তিযোগের পন্থা প্রচার করার জন্য শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর দ্বারা আদিষ্ট হয়েছিলেন, তাঁরা অত্যন্ত কঠোরভাবে সেই নিয়ম পালন করেছিলেন, এবং আমাদের মঙ্গলের জন্য পারমার্থিক বিষয় সম্বন্ধে তাঁরা বহু গ্রন্থ রচনা করে গেছেন। তাঁরা বিভিন্ন বর্ণ ও বিভিন্ন আশ্রমের মানুষদের জন্য শ্রীমদ্ভাগবতআদি প্রামাণিক শাস্ত্রগ্রন্থের নির্দেশ অনুসারে বিভিন্ন পন্থার উদ্ভাবন করে গেছেন।

শ্লোক ১৬

শুশ্রূষোঃ শ্রদ্দধানস্য বাসুদেবকথারুচিঃ।
স্যান্মহৎসেবয়া বিপ্রাঃ পুণ্যতীর্থনিষেবণাৎ ॥ ১৬ ॥

শুশ্রূষোঃ—ভগবৎ-কথা শ্রবণাভিলাষী; **শ্রদ্দধানস্য**—মনোযোগ এবং সাবধানতা সহকারে; **বাসুদেব**—বাসুদেব বা শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধীয়; **কথা**—কথা; **রুচিঃ**—আসক্তি; **স্যাৎ**—সম্ভব হয়; **মহৎ-সেবয়া**—ভগবানের শুদ্ধ ভক্তের সেবা করার ফলে; **বিপ্রাঃ**—হে ব্রাহ্মণগণ; **পুণ্য-তীর্থ**—যাঁরা সব রকম পাপ থেকে মুক্ত; **নিষেবণাৎ**—সেবা করার মাধ্যমে।

অনুবাদ

হে ব্রাহ্মণ ঋষিগণ, সব রকমের পাপ থেকে সম্পূর্ণভাবে মুক্ত ভগবদ্ভক্তদের সেবা করার ফলে মহৎ-সেবা সাধিত হয়। এই ধরনের সেবার ফলে কৃষ্ণকথা শ্রবণে আসক্তির উদয় হয়।

তাৎপর্য

ভগবানের বিরুদ্ধাচরণ করার ফলেই জীব বদ্ধ-দশায় পতিত হয়। কিছু মানুষ আছেন, যাঁদের বলা হয় দেব এবং কিছু মানুষ আছে, যাদের বলা হয় অসুর। যাঁরা পরমেশ্বর ভগবানের শরণাগত হয়ে তাঁর সেবা করেন, তাঁদের বলা হয় দেব, আর যারা পরমেশ্বর ভগবানের বিরুদ্ধাচরণ করে, তাঁদের বলা হয় অসুর। *ভগবদ্গীতায়* ষোড়শ অধ্যায়ে অসুরদের সম্বন্ধে বিশদভাবে বর্ণনা করে বলা হয়েছে যে, অসুরেরা জন্ম-জন্মান্তরে নিম্ন থেকে নিম্নতর জীবন প্রাপ্ত হয়ে অজ্ঞানের গভীরতম প্রদেশে প্রক্ষিপ্ত হয়—তারা অত্যন্ত অধঃপতিত পশু-শরীর লাভ করে এবং পরম-তত্ত্ব, পরমেশ্বর ভগবান সম্বন্ধে তাদের কোন জ্ঞান থাকে না। পরমেশ্বর ভগবানের ইচ্ছায় এই সমস্ত অসুরেরা বিভিন্ন স্থানে নিত্য-মুক্ত ভগবদ্ভক্তের কৃপার প্রভাবে কলুষমুক্ত হয়ে কৃষ্ণভাবনার অমৃত লাভ করে। ভগবানের এই ধরনের ভক্তরা, যাঁরা ভগবানের ইচ্ছা অনুসারে বিভিন্ন স্থানে গিয়ে আসুরিক ভাবাপন্ন বদ্ধ-জীবদের উদ্ধার করেন, তাঁরা ভগবানের অতি অন্তরঙ্গ পার্ষদ, এবং তাঁরা যখন নাস্তিকতার ভয়ঙ্কর বিপদ থেকে সমাজকে রক্ষা করতে আসেন, তখন বুঝতে হয় তাঁরা হচ্ছেন ভগবানের শক্ত্যাবেশ অবতার। তাঁরা ভগবানের পুত্রের মতো, ভৃত্যের মতো অথবা তাঁর অন্তরঙ্গ পার্ষদের মতো, কিন্তু তাঁরা কেউই নিজেদের ভগবান বলে দাবি করেন না। এই রকমের অসৎ দাবি কেবল অসুরেরাই করে থাকে এবং এই সমস্ত অসুরদের আসুরিক অনুগামীরাও এই সমস্ত ভণ্ডদের ভগবান অথবা ভগবানের অবতার বলে গ্রহণ করে। বৈদিক শাস্ত্রে ভগবানের অবতার সম্বন্ধে স্পষ্টভাবে সমস্ত তথ্য প্রদান করা হয়েছে।

শাস্ত্রপ্রমাণ ব্যতীত কখনই কাউকে ভগবান অথবা ভগবানের অবতার বলে মেনে নেওয়া উচিত নয়।

যে সমস্ত ভক্ত প্রকৃতই ভগবদ্ধামে ফিরে যেতে চান, তাঁরা ভগবানের সেবকদের ভগবানের মতো শ্রদ্ধা করেন। ভগবানের এই ধরনের সেবকদের বলা হয় মহাত্মা অথবা তীর্থ; তাঁরা স্থান এবং কাল অনুসারে ভগবানের বাণী প্রচার করেন। ভগবানের সেবকেরা মানুষকে ভগবানের ভক্ত হওয়ার জন্য অনুপ্রাণিত করেন। কেউ যখন তাদের ভগবান বলে সম্বোধন করে, তখন তাঁরা কখনই সেটা বরদাস্ত করেন না। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ছিলেন পরমেশ্বর ভগবান এবং বৈদিক শাস্ত্রে তাঁর আবির্ভাবের উল্লেখ রয়েছে, কিন্তু তবুও তিনি ভগবানের ভক্তরূপে লীলাবিলাস করেছিলেন। যাঁরা জানতেন যে তিনি হচ্ছেন পরমেশ্বর ভগবান, তাঁরা তাঁকে ভগবান বলে সম্বোধন করতেন, কিন্তু তিনি তখন হাত দিয়ে কান দুটি ঢেকে বিষ্ণুনাম উচ্চারণ করতেন। এইভাবে, তিনি ভগবান বলে সম্বোধিত হলে প্রতিবাদ করতেন—যদিও নিঃসন্দেহে তিনি ছিলেন পরমেশ্বর ভগবান স্বয়ং। ভগবান নিজেই এইভাবে আচরণ করে কপটচারী যে সমস্ত ভণ্ড নিজেদের ভগবান বলে প্রতিপন্ন করতে চায়, তাদের সম্বন্ধে আমাদের সাবধান করে দিয়ে গেছেন।

ভগবানের সেবকেরা ভগবানের বাণী প্রচার করার জন্য আসেন এবং বুদ্ধিমান মানুষদের কর্তব্য হচ্ছে সর্বতোভাবে তাঁদের সাহায্য করা। সরাসরিভাবে ভগবানের সেবা করার থেকে ভগবানের সেবকের সেবা করার মাধ্যমে ভগবানকে অধিক সন্তুষ্ট করা যায়। ভগবান যখন দেখেন যে তাঁর সেবকদের যথাযথভাবে শ্রদ্ধা করা হচ্ছে তখন তিনি অত্যন্ত প্রীত হন। কেন না এই ধরনের সেবকেরা ভগবানের বাণী প্রচার করার জন্য সব রকমের বিপদের সম্মুখীন হতে প্রস্তুত থাকেন এবং তাই তাঁরা ভগবানের অত্যন্ত প্রিয়। ভগবদ্গীতায় (১৮/৬৯) ভগবান ঘোষণা করেছেন, যাঁরা তাঁর মহিমা প্রচার করার জন্য সব রকমের বিপদকে তুচ্ছ করেছেন, তাঁরাই হচ্ছেন তাঁর সব চাইতে প্রিয়। কেউ যখন ভগবানের সেবকদের সেবা করেন, তখন তাঁর মধ্যে ভগবানের সেবকদের গুণগুলি প্রকাশিত হয়, এবং তার ফলে তিনি ভগবানের মহিমা শ্রবণ করার যোগ্যতা অর্জন করেন। ভগবানের কথা শ্রবণ করার ঐকান্তিক আগ্রহ হচ্ছে ভগবদ্ধামে প্রবেশ করার সর্বপ্রথম যোগ্যতা।

শ্লোক ১৭

শৃণ্বতাং স্বকথাঃ কৃষ্ণঃ পুণ্যশ্রবণকীর্তনঃ।
হৃদ্যন্তঃস্থো হ্যভদ্রাণি বিধুনোতি সুহৃৎসতাম্ ॥ ১৭ ॥

শৃণ্বতাম্—ভগবানের কথা শ্রবণে আগ্রহশীল; **স্ব-কথাঃ**—তাঁর স্বীয় কথা; **কৃষ্ণঃ**—পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ; **পুণ্য**—পুণ্য; **শ্রবণ**—শ্রবণ; **কীর্তনঃ**—কীর্তন;

হৃদি অন্তঃস্থঃ—হৃদয়াভ্যন্তরে; **হি**—অবশ্যই; **অভদ্রাণি**—জড় জগতকে ভোগ করার বাসনা; **বিধুনোতি**—নাশ করে; **সু-হৃৎ**—হিতকারী; **সতাম্**—সাধুদের।

অনুবাদ

পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ, যিনি পরমাত্মারূপে সকলের হৃদয়েই বিরাজ করেন এবং যিনি হচ্ছেন সাধুবর্গের সুহৃদ, তিনি তাঁর পবিত্র কথা শ্রবণ এবং কীর্তনে রতিযুক্ত ভক্তদের হৃদয়ের সমস্ত ভোগ-বাসনা বিনাশ করেন।

তাৎপর্য

পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের কথা শ্রীকৃষ্ণ থেকে অভিন্ন। তাই যখন নিরপরাধে ভগবানের মহিমা শ্রবণ এবং কীর্তন হয়, তখন বুঝতে হবে যে শ্রীকৃষ্ণ তাঁর অপ্রাকৃত নামরূপে সেখানে বর্তমান, এবং সেই নাম ভগবানেরই মতো পূর্ণ শক্তিমান। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তাঁর *'শিক্ষাষ্টকে'* স্পষ্টভাবে ঘোষণা করে গেছেন যে, ভগবান তাঁর দিব্য নামে তাঁর সর্বশক্তি অর্পণ করেছেন। সেই নাম উচ্চারণ করার জন্য কোন স্থান, কাল বা পাত্রের বাধ্য-বাধকতা নেই এবং যে কেউ তার সুবিধা অনুসারে শ্রদ্ধা এবং মনোযোগ সহকারে সেই নাম কীর্তন করতে পারেন। ভগবান আমাদের প্রতি এতই কৃপালু যে, তাঁর অপ্রাকৃত নাম-রূপে তিনি স্বয়ং আমাদের সম্মুখে উপস্থিত থাকতে পারেন। কিন্তু আমরা এমনই দুর্ভাগা যে ভগবানের নাম এবং মহিমা শ্রবণ ও কীর্তনে আমাদের কোন রুচি নেই। ভগবানের দিব্য নাম শ্রবণ এবং কীর্তনে কীভাবে রুচি লাভ করা যায়, সে সম্বন্ধে আমরা ইতিমধ্যেই আলোচনা করেছি। তা সম্ভব হয় কেবল ভগবানের শুদ্ধ ভক্তের সেবা করার মাধ্যমে।

ভগবান তাঁর ভক্তের ডাকে সাড়া দেন। তিনি যখন দেখেন যে কোন ভক্ত তাঁর অপ্রাকৃত সেবা লাভের জন্য ঐকান্তিকভাবে আগ্রহী এবং তার ফলে তাঁর কথা শ্রবণে গভীরভাবে উৎসুক হয়েছেন, তখন ভগবান তাঁর হৃদয় থেকে তাঁকে এমনভাবে পরিচালিত করেন, যাতে ভক্ত অনায়াসে তাঁর কাছে ফিরে যেতে পারেন। ভগবানের কাছে ফিরে যাওয়ার জন্য আমাদের যে বাসনা, তার থেকে আমাদের তাঁর কাছে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য ভগবানের উৎকণ্ঠা অনেক বেশি। আমরা প্রায় কেউই ভগবানের কাছে ফিরে যেতে চাই না। কেবল মুষ্টিমেয় কয়েকজন ভগবানের কাছে ফিরে যেতে চান। কিন্তু কেউ যখন ভগবানের কাছে ফিরে যাওয়ার প্রত্যাশী হন, তখন ভগবান সর্বতোভাবে তাকে সাহায্য করেন।

সর্বতোভাবে পাপমুক্ত না হলে ভগবানের রাজ্যে প্রবেশ করা যায় না। জড় জগতের পাপগুলি আমাদের জড়া প্রকৃতিকে ভোগ করার বাসনা থেকে উদ্ভূত। এই ধরনের কামনা-বাসনা মুক্ত হওয়া অত্যন্ত কঠিন। কামিনী এবং কাঞ্চন হচ্ছে ভগবানের কাছে ফিরে যাওয়ার পথে সব চাইতে বড় প্রতিবন্ধক। ভক্তিমার্গে বহু বড়

বড় ভক্ত এই প্রলোভনের বলি হয়ে ভক্তিমার্গ থেকে অধঃপতিত হয়েছেন। কিন্তু ভগবান নিজে যখন কাউকে সাহায্য করেন, তখন ভগবানের কৃপায় তা অত্যন্ত সহজসাধ্য হয়।

কামিনী এবং কাঞ্চনের দ্বারা বিচলিত হওয়া খুবই স্বাভাবিক। কেন না জীব অনাদিকাল ধরে তাদের সঙ্গ করে আসছে, তাই তার প্রভাব থেকে মুক্ত হতে কিছু সময় তো লাগবেই। কিন্তু কেউ যদি নিষ্ঠাভরে ভগবানের মহিমা শ্রবণ করেন, তখন ধীরে ধীরে তিনি তাঁর স্বরূপ সম্বন্ধে অবগত হন। পরমেশ্বর ভগবানের কৃপায় ভক্ত তখন সেই সমস্ত আক্রমণ থেকে নিজেকে রক্ষা করার জন্য যথেষ্ট শক্তি লাভ করেন, এবং ধীরে ধীরে তাঁর মন থেকে চাঞ্চল্য সৃষ্টিকারী সব কটি প্রতিবন্ধক বিদূরিত হয়।

শ্লোক ১৮

নষ্টপ্রায়েষ্বভদ্রেষু নিত্যং ভাগবতসেবয়া।
ভগবত্যুত্তমশ্লোকে ভক্তির্ভবতি নৈষ্ঠিকী ॥ ১৮ ॥

নষ্ট—বিনাশ প্রাপ্ত হয়; **প্রায়েষু**—প্রায় সম্পূর্ণরূপে; **অভদ্রেষু**—যা কিছু অমঙ্গলজনক; **নিত্যম্**—নিয়ত; **ভাগবত**—শ্রীমদ্ভাগবত, অথবা ভগবানের শুদ্ধ ভক্ত; **সেবয়া**—সেবার দ্বারা; **ভগবতি**—পরমেশ্বর ভগবানকে; **উত্তম**—উৎকৃষ্ট; **শ্লোকে**—বন্দনা; **ভক্তিঃ**—প্রেমময়ী সেবা; **ভবতি**—হয়; **নৈষ্ঠিকী**—সুদৃঢ়।

অনুবাদ

নিয়মিতভাবে শ্রীমদ্ভাগবত শ্রবণ করলে এবং ভগবানের শুদ্ধ ভক্তের সেবা করলে হৃদয়ের সমস্ত কলুষ সম্পূর্ণরূপে বিনষ্ট হয়, এবং তখন উত্তম শ্লোকের দ্বারা বন্দিত পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের প্রতি প্রেমময়ী ভক্তি সুদৃঢ়রূপে প্রতিষ্ঠিত হয়।

তাৎপর্য

আত্মোপলব্ধির পথে প্রতিবন্ধক স্বরূপ হৃদয়ের সমস্ত অশুভ প্রবৃত্তিগুলি নির্মল করার উপায় এখানে বর্ণনা করা হয়েছে। এই উপায়টি হচ্ছে ভাগবতের সঙ্গ করা। দু'রকমের ভাগবত রয়েছেন; যথা—গ্রন্থ-ভাগবত এবং ভক্ত-ভাগবত। এই উভয় ভাগবতই হচ্ছেন ভবরোগ নিরাময়ের উপযুক্ত উপায়, এবং তাতে উভয়ের অথবা একজনের শরণাগত হলেই সব রকমের প্রতিবন্ধক বিদূরিত হয়। ভক্ত-ভাগবত গ্রন্থ-ভাগবতের মতোই মঙ্গলপ্রদ, কেননা ভক্ত-ভাগবত গ্রন্থ-ভাগবতের নির্দেশ অনুসারেই তাঁর জীবনকে পরিচালনা করেন এবং গ্রন্থ-ভাগবত পরমেশ্বর ভগবান এবং তাঁর শুদ্ধ ভক্ত বা ভাগবতদের তথ্যে পূর্ণ। গ্রন্থ-ভাগবত এবং ভক্ত-ভাগবতে অভেদ সম্বন্ধ রয়েছে।

ভক্ত-ভাগবত হচ্ছেন পরমেশ্বর ভগবানের প্রত্যক্ষ প্রতিনিধি। তাই ভক্ত-ভাগবতের সন্তুষ্টি-বিধানের ফলেই গ্রন্থ-ভাগবতের কৃপা লাভ হয়। ভক্ত-ভাগবত অথবা গ্রন্থ-ভাগবতের সেবা করার ফলে যে কিভাবে ধীরে ধীরে ভগবদ্ভক্তির পথে উন্নতি লাভ করা যায়, তা যুক্তি দিয়ে বিচার করা যায় না। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তা সত্য, এবং শ্রীল নারদ মুনি, যিনি তাঁর পূর্ব জীবনে ছিলেন একজন দাসীর পুত্র, তা বিশ্লেষণ করেছেন। নারদ মুনির পূর্ব জীবনে তাঁর মাতা ছিলেন একজন দাসী এবং তিনি কয়েকজন ঋষির সেবায় যুক্ত ছিলেন, এবং তাঁর ফলে নারদ মুনিও সেই ঋষিদের সংস্পর্শে এসেছিলেন। তাঁদের সঙ্গ প্রভাবে এবং তাঁদের উচ্ছিষ্ট আহার করার ফলে, দাসী-পুত্র হওয়া সত্ত্বেও তিনি পরবর্তী জীবনে ভগবৎ-পার্ষদ মহাভক্ত শ্রীল নারদ মুনিতে পরিণত হন। এমনই হচ্ছে ভাগবত-সঙ্গের অলৌকিক প্রভাব। এই প্রভাব সম্বন্ধে ব্যবহারিকভাবে অবগত হতে হলে আমাদের মনে রাখতে হবে যে, ঐকান্তিক নিষ্ঠা সহকারে ভাগবত-সঙ্গ করার ফলে অনায়াসে দিব্য জ্ঞান লাভ হয়, এবং যার ফলে জীব পরমেশ্বর ভগবানের প্রেমময়ী সেবায় সুদৃঢ়ভাবে যুক্ত হন। ভাগবতের তত্ত্বাবধানে ভগবদ্ভক্তির পথে যতই উন্নতি লাভ হয়, ভক্ত ততই পরমেশ্বর ভগবানের অপ্রাকৃত প্রেমময়ী সেবায় যুক্ত হন। তাই গ্রন্থ-ভাগবতের বাণী ভক্ত-ভাগবতের কাছ থেকেই গ্রহণ করতে হয়, এবং এই দুই ভাগবতের সমন্বয়ের ফলে নবীন ভক্ত প্রভূতভাবে লাভবান হয়ে ভক্তিমার্গে ক্রমোন্নতি লাভ করেন।

শ্লোক ১৯

তদা রজস্তমোভাবাঃ কামলোভাদয়শ্চ যে।
চেত এতৈরনাবিদ্ধং স্থিতং সত্ত্বে প্রসীদতি ॥ ১৯ ॥

তদা—সেই সময়ে; **রজঃ**—রজোগুণে; **তমঃ**—তমোগুণে; **ভাবাঃ**—স্থিতি; **কাম**—কাম এবং বাসনা; **লোভ**—লোভ; **আদয়ঃ**—ইত্যাদি; **চ**—এবং; **যে**—যা কিছু; **চেতঃ**—মন; **এতৈঃ**—এগুলির দ্বারা; **অনাবিদ্ধম্**—প্রভাবিত না হয়ে; **স্থিতম্**—স্থিত হয়ে; **সত্ত্বে**—সত্ত্বগুণে; **প্রসীদতি**—এইভাবে সম্পূর্ণরূপে সন্তুষ্ট হন।

অনুবাদ

যখন হৃদয়ে নৈষ্ঠিকী ভক্তির উদয় হয়, তখন রজ ও তমোগুণের প্রভাবজাত কাম, ক্রোধ, লোভ ইত্যাদি রিপুসমূহ হৃদয় থেকে বিদূরিত হয়ে যায়। তখন ভক্ত সত্ত্বগুণে অধিষ্ঠিত হয়ে সম্পূর্ণরূপে প্রসন্ন হন।

তাৎপর্য

জীব যখন তার স্বরূপে অধিষ্ঠিত হয়ে দিব্য আনন্দে মগ্ন হয়, তখনই সে সম্পূর্ণভাবে প্রসন্ন হয়। সেই অবস্থাকে বলা হয় ব্রহ্মভূত বা আত্মানন্দী অবস্থা। এই আত্মতৃপ্ত

অবস্থা নিষ্ক্রিয় মূর্খের আত্মতৃপ্তির মতো নয়। নিষ্ক্রিয় মূর্খ অজ্ঞানের দ্বারা আচ্ছন্ন, কিন্তু আত্মতৃপ্ত আত্মানন্দী জড়াতীত চিন্ময় স্তরে অধিষ্ঠিত। পরমেশ্বর ভগবানের প্রতি অনন্য ভক্তিযুক্ত হওয়া মাত্রই এই স্তরে অধিষ্ঠিত হওয়া যায়। ভগবদ্ভক্তি নিষ্ক্রিয়তা নয়, পক্ষান্তরে তা হচ্ছে আত্মার স্বাভাবিক সক্রিয়তা।

জীব যখন জড়া প্রকৃতির সংস্পর্শে আসে, তখন আত্মার বৃত্তি কলুষিত হয়ে যায় ; এবং সেই কলুষিত বা বিকৃত বৃত্তির প্রকাশ হচ্ছে কাম, ক্রোধ, লোভ, নিষ্ক্রিয়তা, অজ্ঞান এবং নিদ্রা। রজ এবং তমোগুণের এই সমস্ত প্রভাবগুলির সম্পূর্ণ নিবৃত্তি হচ্ছে ভগবদ্ভক্তির প্রকাশের ফল। ভক্ত তৎক্ষণাৎ সত্ত্বগুণে অধিষ্ঠিত হন, এবং তারপর আরও ঊর্ধ্বে উন্নীত হয়ে তিনি শুদ্ধসত্ত্ব বা বাসুদেব স্তরে অধিষ্ঠিত হন। এই শুদ্ধ-সত্ত্ব স্তরেই কেবল ভগবানের প্রতি শুদ্ধ প্রেম লাভ করে তাঁকে চাক্ষুষ দর্শন করা যায়।

ভক্ত সর্বদাই বিশুদ্ধ সত্ত্বে অধিষ্ঠিত, তাই তিনি কখনও কারও কোন রকম অনিষ্ট করেন না। কিন্তু অভক্ত, তা সে যত শিক্ষিতই হোক না কেন,সর্বদাই অপরের ক্ষতি করার চেষ্টা করে। ভক্ত মূর্খ বা আবেগপ্রবণ নয়। অপরের অনিষ্টকারী মূর্খ বা আবেগপ্রবণ মানুষেরা বাহ্যিকভাবে যতই ভগবানের ভক্ত হওয়ার অভিনয় করুক না কেন, তারা কখনই ভগবানের ভক্ত হতে পারে না। ভক্ত সর্বদাই ভগবানের সৎ গুণাবলীর দ্বারা গুণান্বিত। আয়তনগতভাবে এই গুণগুলির তারতম্য রয়েছে, কিন্তু গুণগতভাবে ভক্ত এবং ভগবান এক এবং অভিন্ন।

শ্লোক ২০

এবং প্রসন্নমনসো ভগবদ্ভক্তিযোগতঃ।
ভগবত্তত্ত্ববিজ্ঞানং মুক্তসঙ্গস্য জায়তে ॥ ২০ ॥

এবম্—এইভাবে ; **প্রসন্ন**—প্রসন্ন ; **মনসঃ**—মনের ; **ভগবদ্ভক্তি**—শ্রদ্ধা সহকারে ভগবানের সেবা ; **যোগতঃ**—প্রভাবে ; **ভগবৎ**—পরমেশ্বর ভগবান সম্বন্ধীয় ; **তত্ত্ব**—জ্ঞান ; **বিজ্ঞানম্**—বিজ্ঞান ; **মুক্ত**—মুক্ত ; **সঙ্গস্য**—সঙ্গের ; **জায়তে**—কার্যকরী হয়।

অনুবাদ

এইভাবে শুদ্ধ-সত্ত্বে অধিষ্ঠিত হয়ে ভক্তিযোগে যুক্ত হওয়ার ফলে যাঁর চিত্ত প্রসন্ন হয়েছে, তিনি সব রকম জড়-বন্ধন মুক্ত হয়ে ভগবত্তত্ত্ব-বিজ্ঞান উপলব্ধি করেন।

তাৎপর্য

ভগবদ্গীতায় (৭/৩) বলা হয়েছে যে, হাজার হাজার মানুষের মধ্যে কেবল দু'একজন সৌভাগ্যবান মানুষই জীবনের যথার্থ উদ্দেশ্য সাধনে প্রয়াসী হন। অধিকাংশ মানুষই

রজ এবং তমোগুণের দ্বারা প্রভাবিত এবং তাই তারা সর্বদাই কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, অজ্ঞান এবং নিদ্রায় মগ্ন। এই রকম বহু নররূপী পশুর মধ্যে কদাচিৎ একজন মানুষ মানব জীবনের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে অবগত হয়ে তার সেই কর্তব্য সম্পাদনে প্রয়াসী হয়। আর এই রকম হাজার হাজার সিদ্ধিকামী মানুষের মধ্যে কেবল দু'একজন মাত্র তত্ত্বগতভাবে পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে জানতে পারেন। ভগবদ্গীতাতে (১৮/৫৫) আরও বলা হয়েছে যে পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে জানার যে বিজ্ঞান তা কেবল ভক্তিযোগের মাধ্যমেই জানা যায়।

সেই কথাই এই শ্লোকে প্রতিপন্ন হয়েছে। কোন সাধারণ মানুষ, অথবা মানব-জীবনের উদ্দেশ্য সাধন করেছেন যে মানুষ, তিনিও পরমেশ্বর ভগবানকে বিজ্ঞানসম্মতভাবে অথবা পূর্ণরূপে জানতে পারেন না। মানব জীবনের উদ্দেশ্য তখনই সিদ্ধ হয়, যখন মানুষ বুঝতে পারে যে সে জড় পদার্থ নয়, তার স্বরূপে সে হচ্ছে চিন্ময় আত্মা। যখন কেউ সে কথা জানতে পারে, তখন আর জড় জগতের প্রতি কোন আসক্তি থাকে না, সে তৎক্ষণাৎ জড় কামনা-বাসনাগুলি পরিত্যাগ করে। তার চিন্ময় স্বরূপে, সে তখনই যথার্থ প্রসন্নতা অনুভব করে। মানুষ যখন রজ এবং তমোগুণের প্রভাব থেকে মুক্ত হয়, তখনই কেবল এই উপলব্ধি সম্ভব হয়, অর্থাৎ ব্রহ্মভূত স্তরে অধিষ্ঠিত হয়ে কেউ যখন যথার্থ ব্রাহ্মণোচিত গুণ অর্জন করে, তখনই কেবল তা সম্ভব হয়। ব্রাহ্মণ হচ্ছেন সত্ত্বগুণের প্রতীক; আর অন্যরা, যারা সত্ত্বগুণে অধিষ্ঠিত নয়, তারা হয় ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র অথবা শূদ্রাধম। মানব জীবনে ব্রাহ্মণের স্তরই হচ্ছে সর্বোচ্চ স্তর, কেন না তাঁরা সত্ত্বগুণে অধিষ্ঠিত। তাই গুণগতভাবে ব্রাহ্মণ না হওয়া পর্যন্ত ভক্ত হওয়া যায় না। ভক্ত তাঁর কার্যকলাপের মাধ্যমে ইতিমধ্যেই ব্রাহ্মণের স্তরে অধিষ্ঠিত হয়েছেন। তবে সেটিই সর্বোচ্চ স্তর নয়। পূর্বে যা বলা হয়েছে, সেই ধরনের ব্রাহ্মণকে গুণাতীত চিন্ময় স্তরে অধিষ্ঠিত হতে হলে বৈষ্ণব হতে হবে। শুদ্ধ বৈষ্ণব হচ্ছেন মুক্ত জীব এবং তিনি ব্রাহ্মণ স্তরেরও ঊর্ধ্বে অধিষ্ঠিত। জড় জগতে ব্রাহ্মণও বদ্ধ জীব, কেননা ব্রাহ্মণ যদিও ব্রহ্মভূত স্তরে অধিষ্ঠিত এবং তিনি জড় জগতের অনিত্যতা উপলব্ধি করতে পেরেছেন, কিন্তু তবুও পরমেশ্বর ভগবানের ভগবত্তত্ত্ব-বিজ্ঞান তাঁর জানা হয়নি। ব্রাহ্মণ-স্তর অতিক্রম করে বাসুদেব-স্তরে অধিষ্ঠিত হলে পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে জানা যায়। পরমেশ্বর ভগবানকে জানার যে বিজ্ঞান, তা হচ্ছে পারমার্থিক মার্গে স্নাতকোত্তর বিষয়। মূর্খ লোকেরা অথবা অল্পবুদ্ধিসম্পন্ন লোকেরা পরমেশ্বর ভগবানকে জানতে পারে না, এবং তারা খেয়াল-খুশিমত কৃষ্ণতত্ত্ব-বিজ্ঞান বিশ্লেষণ করে। কেউ যদি ব্রাহ্মণ স্তরে অধিষ্ঠিত হওয়া সত্ত্বেও জড় জগতের গুণের প্রভাব থেকে মুক্ত হতে না পারে, তা হলে তার পক্ষে ভগবত্তত্ত্ব-বিজ্ঞান লাভ করা সম্ভব হয় না। কোন যথার্থ ব্রাহ্মণ যখন বৈষ্ণবে পরিণত হন, তখন তিনি জড় জগতের প্রভাব থেকে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত এবং সেই আত্মতৃপ্ত অবস্থায় পরমেশ্বর ভগবানকে যথাযথভাবে জানতে পারেন।

শ্লোক ২১

ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিশ্ছিদ্যন্তে সর্বসংশয়াঃ।
ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্মাণি দৃষ্ট এবাত্মনীশ্বরে ॥ ২১ ॥

ভিদ্যতে—ভেদ করে; **হৃদয়**—হৃদয়; **গ্রন্থিঃ**—গ্রন্থি; **ছিদ্যন্তে**—ছেদন করে; **সর্ব**—সমস্ত; **সংশয়াঃ**—সংশয়; **ক্ষীয়ন্তে**—বিনাশ করে; **চ**—এবং; **অস্য**—তাঁর; **কর্মাণি**—সকাম কর্মজ্ঞান; **দৃষ্ট**—দর্শন করে; **এব**—অবশ্যই; **আত্মনি**—আত্মায়; **ঈশ্বরে**—ঈশ্বরকে।

অনুবাদ

আত্মার আত্মা পরমাত্মা ভগবানকে দর্শন হলে হৃদয়গ্রন্থি ছিন্ন হয়, সমস্ত সংশয় দূর হয় এবং সমস্ত কর্মফল ক্ষয়প্রাপ্ত হয়।

তাৎপর্য

ভগবত্তত্ত্ব-বিজ্ঞান লাভ হলে সেই সঙ্গে আত্মাকেও দর্শন হয়। চিন্ময় আত্মারূপে জীবের পরিচিতি সম্বন্ধে অনেক কল্পনা এবং সন্দেহ রয়েছে। জড়বাদীরা আত্মার অস্তিত্বে বিশ্বাস করে না, আর জ্ঞানীরা মনে করে যে, নির্বিশেষ, নিরাকার, অদ্বয় ব্রহ্ম থেকে আত্মা অভিন্ন—তারা আত্মার স্বাতন্ত্র্যে বিশ্বাস করে না। কিন্তু যাঁরা তত্ত্বদ্রষ্টা, তাঁরা বলেন যে আত্মা এবং পরমাত্মা দুটি ভিন্ন সত্তা; তাঁরা গুণগতভাবে এক, কিন্তু আয়তনগতভাবে ভিন্ন। এ ছাড়া অন্য বহু মতবাদ রয়েছে, কিন্তু ভক্তিযোগের মাধ্যমে যখনই কৃষ্ণতত্ত্ব-বিজ্ঞান উপলব্ধ হয়, তৎক্ষণাৎ সমস্ত কল্পনাপ্রসূত মতবাদ বিদূরিত হয়ে যায়। শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন সূর্যের মতো, আর পরম তত্ত্ব সম্বন্ধে জড়বাদীদের সমস্ত জল্পনা-কল্পনা মধ্যরাত্রির অন্ধকারের মতো। হৃদয়াকাশে যখনই কৃষ্ণ-সূর্যের উদয় হয়, পরমতত্ত্ব সম্বন্ধে জড়বাদীদের সমস্ত জল্পনা-কল্পনা তৎক্ষণাৎ বিদূরিত হয়। সূর্যের উদয়ে যেমন অন্ধকার থাকতে পারে না, তেমনই অজ্ঞানের গভীর অন্ধকারে লুকিয়ে থাকে যে সমস্ত আপেক্ষিক সত্য, তা পরমাত্মারূপে সকলের হৃদয়ে বিরাজমান শ্রীকৃষ্ণের কৃপায় প্রকাশিত হয়ে পড়ে।

ভগবদ্গীতায় (১০/১১) ভগবান বলেছেন যে, তাঁর শুদ্ধ ভক্তদের প্রতি তাঁর বিশেষ কৃপা প্রদর্শন করে তিনি তাঁদের হৃদয়ে বিশুদ্ধ জ্ঞানের আলোকবর্তিকা জ্বালিয়ে তাঁদের হৃদয়ের সংশয়রূপী সমস্ত অন্ধকার বিদূরিত করেন। তাই যেহেতু তিনি নিজেই তাঁর ভক্তদের হৃদয়কে আলোকিত করেন, তাই তাঁর সেবাপরায়ণ ভক্তের অজ্ঞানের অন্ধকারে পড়ে থাকার কোন প্রশ্নই ওঠে না। তিনি পরম সত্য এবং আপেক্ষিক সত্য সম্বন্ধে সব কিছু অবগত হন। ভক্ত কখনই অজ্ঞানের অন্ধকারে আচ্ছন্ন থাকতে পারেন না, এবং যেহেতু ভগবান নিজে তাঁকে জ্ঞান দান করেন, তাই তাঁর জ্ঞান অবশ্যই পূর্ণ। কিন্তু যারা তাদের সীমিত জ্ঞানের মাধ্যমে অসীম এবং অনন্ত

পরমতত্ত্বকে জানবার জন্য জল্পনা কল্পনা করে, তারা কোন দিনই তাঁকে জানতে পারে না; যথার্থ জ্ঞানকে বলা হয় পরম্পরা; অর্থাৎ যে জ্ঞান শ্রদ্ধা-সমন্বিত শরণাগতির মাধ্যমে গুরু-শিষ্য পরম্পরায় অবরোহ পন্থায় লাভ হয়। পরমেশ্বর ভগবানের পরম ঈশ্বরত্ব অস্বীকার করে তাঁকে কখনও জানা যায় না। এই ধরনের অবিশ্বাসীদের কাছে তিনি কখনও নিজেকে প্রকাশ করেন না। একটি আগুনের স্ফুলিঙ্গ যেমন আগুন থেকে বেরিয়ে এলেই তার দহনশক্তি হারিয়ে ভস্মে পরিণত হয়, ঠিক তেমনই অণুসদৃশ জীব পরমেশ্বর ভগবানের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়লেই মায়ার কবলিত হয়। ভক্তরা বিনীত, এবং তাই দিব্য জ্ঞান অবরোহ পন্থায় তাঁদের কাছে নেমে আসে। এই পন্থায় পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ প্রথমে এই জ্ঞান দান করেন ব্রহ্মাকে, তারপর ব্রহ্মা তাঁর পুত্র এবং শিষ্যদের সেই জ্ঞান দান করেন। এইভাবে গুরু-শিষ্য-পরম্পরার ধারায় এই জ্ঞান প্রবাহিত হয়। পরমাত্মারূপে ভক্তের হৃদয়ে থেকে ভগবান তাঁকে এই জ্ঞান লাভ করতে সাহায্য করেন। এইটিই হচ্ছে পারমার্থিক জ্ঞান লাভের যথার্থ পন্থা।

এই জ্ঞানের প্রভাবে ভক্ত চেতন আত্মা এবং জড় পদার্থের মধ্যে পার্থক্য নিরূপণ করতে সম্পূর্ণভাবে সমর্থ হন। কেন না যে গ্রন্থির দ্বারা চেতন আত্মা এবং জড় পদার্থ আবদ্ধ ছিল, ভগবান স্বয়ং তা ছেদন করেন। এই গ্রন্থিটিকে বলা হয় অহঙ্কার, এবং তার ফলে জীব মোহাচ্ছন্ন হয়ে জড় উপাদানের সমন্বয়ে গঠিত তার দেহকে তার স্বরূপ বলে মনে করে। যখন এই গ্রন্থি ছিন্ন হয়, তখন সমস্ত সংশয় বিদূরিত হয়। তখন জীব তার প্রভুকে দর্শন করতে পারে এবং সর্বতোভাবে তাঁর অপ্রাকৃত প্রেমময়ী সেবায় যুক্ত হয়; তখন তার সমস্ত কর্ম-বন্ধন ছিন্ন হয়। জড় জগতে জীব নিজেকে তার কর্মের ভোক্তা বলে মনে করে জন্ম-জন্মান্তরে তার পাপ এবং পুণ্য কর্মের ফল ভোগ করে। কিন্তু যে মুহূর্তে সে পরমেশ্বর ভগবানের সেবায় যুক্ত হয়, তৎক্ষণাৎ সে কর্মবন্ধন থেকে মুক্ত হয়। তখন তার কর্ম আর কোনও ফল প্রসব করে না।

শ্লোক ২২

অতো বৈ কবয়ো নিত্যং ভক্তিং পরময়া মুদা।
বাসুদেবে ভগবতি কুর্বন্ত্যাত্মপ্রসাদনীম্ ॥ ২২ ॥

অতঃ—অতএব; **বৈ**—অবশ্যই; **কবয়ঃ**—সমস্ত পরমার্থবাদীরা; **নিত্যম্**—সর্বক্ষণ; **ভক্তিম্**—ভগবানের সেবা; **পরময়া**—পরম; **মুদা**—গভীর আনন্দ সহকারে; **বাসুদেবে**—শ্রীকৃষ্ণে; **ভগবতি**—পরমেশ্বর ভগবান; **কুর্বন্তি**—করেন; **আত্ম**—স্বীয়; **প্রসাদনীম্**—যা অনুপ্রাণিত করে।

অনুবাদ

তাই সমস্ত পরমার্থবাদীরা চিরকাল গভীর আনন্দ সহকারে পরমেশ্বর ভগবান

শ্রীকৃষ্ণের সেবা করে আসছেন, কেন না এই ধরনের প্রেমময়ী সেবা আত্মাকে অনুপ্রাণিত করে।

তাৎপর্য

পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের প্রতি প্রেমময়ী সেবার বৈশিষ্ট্য এখানে বিশেষভাবে বর্ণিত হয়েছে। শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন স্বয়ংরূপ পরমেশ্বর ভগবান, এবং বলদেব, সঙ্কর্ষণ, বাসুদেব, অনিরুদ্ধ, প্রদ্যুম্ন ও নারায়ণ থেকে শুরু করে পুরুষাবতার, গুণাবতার, লীলাবতার, যুগাবতার এবং পরমেশ্বর ভগবানের অন্যান্য অনন্ত কোটি প্রকাশ হচ্ছে শ্রীকৃষ্ণের অংশ এবং কলা। জীব হচ্ছে পরমেশ্বর ভগবানের বিভিন্ন অংশ। তাই শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন ভগবানের আদি রূপ, এবং চিন্ময় স্তরে তিনিই হচ্ছেন সব কিছুর পরম উৎস। তাই যে সমস্ত উন্নত স্তরের পরমার্থবাদী ভগবানের নিত্য লীলাবিলাসের কাহিনী শ্রবণে আগ্রহী, তাঁদের কাছে তিনিই হচ্ছেন সবচাইতে বেশি আকর্ষণীয়। শ্রীকৃষ্ণ এবং বলদেব ভিন্ন ভগবানের অন্যান্য রূপে বৃন্দাবনের মতো অপ্রাকৃত লীলায় শ্রীকৃষ্ণের ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে আসার অন্য কোনও সুযোগ নেই। কিন্তু মূর্খ লোক তর্ক করে বলে যে, শ্রীকৃষ্ণের অপ্রাকৃত লীলাবিলাস ইদানীং স্বীকৃতি লাভ করেছে; কিন্তু তাদের সে যুক্তি সত্য নয়, কেন না শ্রীকৃষ্ণের লীলা নিত্য এবং ব্রহ্মার প্রতিদিনে একবার তিনি অবতীর্ণ হন, ঠিক যেমন প্রতিদিন ২৪ ঘণ্টা অন্তর সূর্য একবার করে পূর্ব-দিগন্তে উদিত হয়।

শ্লোক ২৩

সত্ত্বং রজস্তম ইতি প্রকৃতের্গুণাস্তৈ-
র্যুক্তঃ পরঃ পুরুষ এক ইহাস্য ধত্তে।
স্থিত্যাদয়ে হরিবিরিঞ্চিহরেতি সংজ্ঞাঃ
শ্রেয়াংসি তত্র খলু সত্ত্বতনোর্নৃণাং স্যুঃ ॥ ২৩ ॥

সত্ত্বম্—সত্ত্বগুণ; **রজঃ**—রজোগুণ; **তমঃ**—তমোগুণ; **ইতি**—এইভাবে; **প্রকৃতেঃ**—জড়া-প্রকৃতির; **গুণাঃ**—গুণত্রয়; **তৈঃ**—তাহাদের দ্বারা; **যুক্তঃ**—যুক্ত; **পরঃ**—দিব্য; **পুরুষঃ**—পরম পুরুষ; **একঃ**—এক; **ইহাস্য**—এই জড় জগতের; **ধত্তে**—ধারণ করে; **স্থিতি-আদয়ে**—সৃষ্টি, স্থিতি এবং বিনাশ ইত্যাদির জন্য; **হরি**—পরমেশ্বর ভগবান শ্রীবিষ্ণু; **বিরিঞ্চি**—ব্রহ্মা; **হর**—মহাদেব **ইতি**—এইরূপ; **সংজ্ঞাঃ**—বিভিন্ন রূপ; **শ্রেয়াংসি**—আত্যন্তিক লাভ; **তত্র**—তার মধ্যে, **খলু**—অবশ্যই; **সত্ত্ব**—সত্ত্বগুণ; **তনোঃ**—রূপ; **নৃণাম্**—মানুষদের; **স্যুঃ**—প্রাপ্ত হয়।

অনুবাদ

পরমেশ্বর ভগবান সত্ত্ব, রজ এবং তম নামক জড়া প্রকৃতির তিনটি গুণের সঙ্গে

পরোক্ষভাবে যুক্ত। জড় জগতের সৃষ্টি, পালন এবং বিনাশের জন্য তিনি ব্রহ্মা, বিষ্ণু এবং শিব এই তিনটি গুণজাত রূপ ধারণ করেন। এই তিনটি রূপের মধ্যে, সমস্ত মানুষই সত্ত্বগুণজাত রূপ বিষ্ণুর থেকে আত্যন্তিক মঙ্গল লাভ করতে পারেন।

তাৎপর্য

ভক্তি যে কেবল পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এবং তাঁর অংশ প্রকাশদেরই উদ্দেশ্যে সাধিত হওয়া উচিত, তা পূর্বে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এবং তাঁর সমস্ত অংশ-প্রকাশ হচ্ছেন বিষ্ণু-তত্ত্ব বা ভগবত্তত্ত্ব। শ্রীকৃষ্ণের দ্বিতীয় প্রকাশ হচ্ছেন বলদেব। বলদেব থেকে সঙ্কর্ষণ, সঙ্কর্ষণ থেকে নারায়ণ, নারায়ণ থেকে দ্বিতীয় সঙ্কর্ষণ এবং এই সঙ্কর্ষণ থেকে পুরুষাবতার বিষ্ণু। বিষ্ণু অথবা এই জড় জগতের সত্ত্ব গুণাবতার হচ্ছেন ক্ষীরোদকশায়ী বিষ্ণুরূপী পুরুষ অবতার বা পরমাত্মা। ব্রহ্মা হচ্ছেন রজোগুণের বিগ্রহ এবং শিব হচ্ছেন তমোগুণের বিগ্রহ। এই তিনজন হচ্ছেন জড় জগতের তিনটি গুণের ঈশ্বর। জড় জগতের সৃষ্টি হয় ব্রহ্মার দ্বারা রজোগুণের প্রভাবে। তার পালন হয় সত্ত্বগুণে বিষ্ণুর দ্বারা এবং তারপর যখন তা বিনাশ করার প্রয়োজন হয়, তখন শিব তাঁর তাণ্ডব নৃত্যের মাধ্যমে তা সাধন করেন। জড়বাদীরা এবং মূর্খ মানুষেরা যথাক্রমে ব্রহ্মা এবং শিবের পূজা করে। কিন্তু প্রকৃত পরমার্থবাদীরা সত্ত্বগুণে বিষ্ণু এবং তাঁর বিভিন্ন রূপের আরাধনা করেন। বিষ্ণু তাঁর অনন্ত কোটি অংশ এবং কলায় প্রকাশিত হন। সেই পরমেশ্বরের পূর্ণ রূপ হচ্ছেন ভগবান এবং তাঁর বিভিন্ন অংশ হচ্ছে জীব। জীব এবং ভগবান উভয়েরই চিন্ময় স্বরূপ রয়েছে। জীব কখনও কখনও জড়া প্রকৃতির বশীভূত হয়ে পড়ে, কিন্তু বিষ্ণুতত্ত্ব সর্বদাই মায়ার অধীশ্বর। পরমেশ্বর ভগবান শ্রীবিষ্ণু এই জগতে আবির্ভূত হন জড় জগতের বন্ধনে আবদ্ধ জীবদের উদ্ধার করার জন্য। এই ধরনের জীবেরা জড় জগতে আসে জড় জগতের উপর প্রভুত্ব করবার সঙ্কল্প নিয়ে, এবং এইভাবে তারা জড়া প্রকৃতির তিনটি গুণের দ্বারা আবদ্ধ হয়ে পড়ে। তাই এই জড় জগতরূপী কারাগারে বিভিন্ন রকমের দণ্ডভোগ করার জন্য জীবকে বিভিন্ন রকমের জড় শরীর ধারণ করতে হয়। পরমেশ্বর ভগবানের নির্দেশ অনুসারে ব্রহ্মা এই জড় জগতরূপী কারাগার সৃষ্টি করেন এবং কল্পান্তে শিব এই সৃষ্টি ধ্বংস করেন। আর এই কারাগারের পালনকার্য সম্পাদন করেন বিষ্ণু, ঠিক যেমন রাজা তাঁর রাজ্যের কারাগারগুলি পালন করেন। তাই কেউ যদি জন্ম, মৃত্যু, জরা এবং ব্যাধিরূপী দুঃখ-দুর্দশায় পূর্ণ এই জড় জগতের কারাগার থেকে মুক্ত হতে চায়, তা হলে তাকে অবশ্যই পরমেশ্বর ভগবানের সন্তুষ্টিবিধান করতে হবে। ভগবান শ্রীবিষ্ণুকে কেবল ভক্তিযুক্ত সেবার মাধ্যমেই আরাধনা করা যায়, এবং কেউ যদি এই জড় জগতরূপী কারাগারে থাকতে চায়, তা হলে তারা সাময়িক দুঃখ-নিবৃত্তির জন্য ক্ষণস্থায়ী কিছু সুযোগ-সুবিধা লাভের আশায় শিব, ব্রহ্মা, ইন্দ্র, বরুণ আদি দেবতাদের পূজা করতে পারে। কোন দেবতাই কিন্তু

জড় জগতের বন্ধন থেকে মুক্ত করতে পারেন না। তা কেবল শ্রীবিষ্ণুই করতে পারেন। তাই চরম মঙ্গল কেবল পরমেশ্বর ভগবানের কৃপার প্রভাবেই সাধিত হয়।

শ্লোক ২৪

পার্থিবাদ্দারুণো ধূমস্তস্মাদগ্নিস্ত্রয়ীময়ঃ।
তমসস্তু রজস্তস্মাৎসত্ত্বং যদ্ব্রহ্মদর্শনম্ ॥ ২৪ ॥

পার্থিবাৎ—মাটি থেকে; **দারুণঃ**—কাঠ; **ধূমঃ**—ধূম; **তস্মাৎ**—তা থেকে; **অগ্নিঃ**—আগুন; **ত্রয়ী**—বৈদিক যজ্ঞ; **ময়ঃ**—তৈরি হয়; **তমসঃ**—তমোগুণে; **তু**—কিন্তু; **রজঃ**—রজোগুণে; **তস্মাৎ**—তা থেকে; **সত্ত্বম্**—সত্ত্বগুণে; **যৎ**—যা; **ব্রহ্ম**—পরম তত্ত্ব; **দর্শনম্**—উপলব্ধি।

অনুবাদ

কাঠ হচ্ছে মৃত্তিকার বিকার, কিন্তু ধোঁয়া কাঠ থেকে শ্রেয়। আর অগ্নি তার থেকেও শ্রেয়, কেন না অগ্নির দ্বারা (বৈদিক যজ্ঞের মাধ্যমে) উচ্চতর জ্ঞান লাভ করা যায়। তেমনই, রজোগুণ তমোগুণ অপেক্ষা শ্রেয়; কিন্তু সত্ত্বগুণ সর্বশ্রেষ্ঠ, কেন না সত্ত্বগুণের দ্বারা আমরা পরম সত্যকে উপলব্ধি করতে পারি।

তাৎপর্য

পূর্বেই বিশ্লেষণ করা হয়েছে যে, পরমেশ্বর ভগবানের প্রেমময়ী সেবার দ্বারা জীব জড় জগতের বন্ধন থেকে মুক্ত হতে পারে। এখন আরও বিস্তারিতভাবে বোঝানো হচ্ছে যে, ভগবদ্ভক্তি অনুশীলন করার যোগ্যতা অর্জন করার জন্য প্রথমে সত্ত্বগুণের স্তরে উন্নীত হতে হবে। কিন্তু উন্নতির পথে যদি কোন বাধা আসে, তবে যে কেউ সদ্গুরুর সুদক্ষ পরিচালনায় এমন কি তমোগুণের স্তর থেকে সত্ত্বগুণে উন্নীত হতে পারে। তাই ভগবদ্ভক্তি লাভে ঐকান্তিকভাবে আগ্রহী ব্যক্তিকে সে পথে অগ্রসর হওয়ার জন্য সদ্গুরুর শরণাগত হতে হবে; এবং সদ্গুরু হচ্ছেন তিনি, যিনি তাঁর শিষ্যকে জীবনের যে কোনও স্তর থেকে—তা সে তমই হোক বা রজই হোক বা সত্ত্বই হোক, সুদক্ষভাবে পারমার্থিক পথে পরিচালিত করতে পারেন।

তাই কেউ যদি মনে করে যে পরমেশ্বর ভগবানের যে কোনও রূপের পূজা করলে তার ফল একই হবে, তা হলে সে ভুল করবে। বিষ্ণু-তত্ত্ব ছাড়া অন্যান্য সমস্ত রূপই জড়া প্রকৃতির গুণের প্রভাবে প্রকাশিত, এবং তাই জড়া প্রকৃতিজাত রূপগুলি মানুষকে সত্ত্বগুণের স্তরে উন্নীত হতে সাহায্য করতে পারে না; অথচ জড় জগতের বন্ধন থেকে মুক্ত হতে হলে সত্ত্বগুণে অধিষ্ঠিত হওয়া একান্ত প্রয়োজন।

অসভ্য জীবন অথবা নিম্নস্তরের পশুজীবন তমোগুণের দ্বারা প্রভাবিত। বিভিন্ন রকমের জড় জাগতিক লাভের প্রত্যাশী যে সভ্য মানুষ, তার জীবন রজোগুণের দ্বারা

প্রভাবিত। রজোগুণের স্তরে দর্শন, শিল্পকলা, নীতিবোধ ইত্যাদির সূক্ষ্ম আবেগের মাধ্যমে পরম সত্যকে জানার স্বল্প আভাস দেখা যায়। কিন্তু সত্ত্বগুণ হচ্ছে তারও অনেক উর্ধ্বে জড়া প্রকৃতির গুণ, যা পরম সত্যকে জানার জন্য মানুষকে যথার্থভাবে সাহায্য করে। অর্থাৎ, বিভিন্ন গুণের দ্বারা প্রভাবিত বিভিন্ন রকমের পূজা-পদ্ধতির মধ্যে ব্রহ্মা, বিষ্ণু এবং মহেশ্বরের পূজার মধ্যে গুণগত পার্থক্য রয়েছে এবং সেগুলির ফলও ভিন্ন।

শ্লোক ২৫

ভেজিরে মুনয়োঽথাগ্রে ভগবন্তমধোক্ষজম্।
সত্ত্বং বিশুদ্ধং ক্ষেমায় কল্পন্তে যেঽনু তানিহ ॥ ২৫ ॥

ভেজিরে—সেবা করে; **মুনয়ঃ**—ঋষিরা; **অথ**—এইভাবে; **অগ্রে**—পূর্বে; **ভগবন্তম্**—পরমেশ্বর ভগবানকে; **অধোক্ষজম্**—ইন্দ্রিয়জাত জ্ঞানের অতীত; **সত্ত্বম্**—অস্তিত্ব; **বিশুদ্ধম্**—জড়া প্রকৃতির তিনটি গুণের অতীত; **ক্ষেমায়**—আত্যন্তিক লাভের জন্য; **কল্পন্তে**—যোগ্যতা; **যে**—যারা; **অনু**—অনুসরণ; **তান্**—তারা; **ইহ**—এই জড় জগতে।

অনুবাদ

পূর্বে সমস্ত মহর্ষিরা পরমেশ্বর ভগবানের সেবা করেছিলেন, কেন না তিনি জড়া প্রকৃতির তিনটি গুণের অতীত। তাঁরা জড় জগতের বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে আত্যন্তিক মঙ্গল সাধনের জন্য তাঁর আরাধনা করেছিলেন। যাঁরা সেই সমস্ত মহাত্মাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করেন, তাঁরাও এই জড় জগতের বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়ার যোগ্যতা অর্জন করেন।

তাৎপর্য

জড়জাগতিক বিষয় লাভ এবং জড় চেতনের পার্থক্য নিরূপণকারী জ্ঞান লাভ ধর্ম আচরণের উদ্দেশ্য নয়। ধর্ম আচরণের চরম উদ্দেশ্য হচ্ছে জড় জগতের বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে চিন্ময় জগতে, যেখানে পরমেশ্বর ভগবান পরম পুরুষরূপে বিরাজ করছেন, সেখানে মুক্ত জীবন লাভ করা। তাই ধর্মীয় অনুশাসন হচ্ছে পরমেশ্বর ভগবানের দেওয়া আইন, এবং মহাজন বা ভগবানের অনুমোদিত প্রতিনিধি ছাড়া আর কেউই ধর্মের যথার্থ উদ্দেশ্য সম্বন্ধে অবগত নন। ভগবানের বিশেষ প্রতিনিধিস্বরূপ বারোজন মহাজন রয়েছেন, যাঁরা ধর্মতত্ত্ব সম্বন্ধে যথাযথভাবে অবগত, এবং তাঁরা সকলেই ভক্তিভরে ভগবানের সেবা করেন। যে সমস্ত মানুষ যথার্থ মঙ্গল সাধনের অভিলাষী, তাঁরা এই মহাজনদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে পরম মঙ্গল লাভ করতে পারেন।

শ্লোক ২৬

মুমুক্ষবো ঘোররূপান্ হিত্বা ভূতপতীনথ।
নারায়ণকলাঃ শান্তা ভজন্তি হ্যনসূয়বঃ ॥ ২৬ ॥

মুমুক্ষবঃ—মুক্তি লাভের আকাঙ্ক্ষী; **ঘোর**—ভয়ঙ্কর; **রূপান্**—আকৃতি বিশিষ্ট; **হিত্বা**—পরিত্যাগ করে; **ভূত-পতীন্**—দেবতা; **অথ**—অতএব; **নারায়ণ**—পরমেশ্বর ভগবান নারায়ণ; **কলাঃ**—অংশ; **শান্তাঃ**—আনন্দপূর্ণ; **ভজন্তি**—ভজনা করে; **হি**—অবশ্যই; **অনসূয়বঃ**—অসূয়ারহিত।

অনুবাদ

যাঁরা মুক্তি লাভের জন্য ঐকান্তিকভাবে আগ্রহী, তাঁরা অবশ্যই অসূয়ারহিত এবং তাঁরা সকলের প্রতি শ্রদ্ধাপরায়ণ। তথাপি তাঁরা ভয়ঙ্কর আকৃতি বিশিষ্ট দেব-দেবীদের ত্যাগ করে কেবল পরমেশ্বর ভগবান শ্রীবিষ্ণু এবং তাঁর অংশ অবতারদের নিত্য আনন্দময় রূপের আরাধনা করেন।

তাৎপর্য

পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ, যিনি হচ্ছেন সমস্ত বিষ্ণু-তত্ত্বের আদি পুরুষ, তিনি নিজেকে দুরকমভাবে বিস্তার করেন, যথা—পূর্ণাংশ এবং বিভিন্নাংশ। তাঁর বিভিন্ন অংশগুলি হচ্ছে তাঁর সেবক, আর তাঁর বিষ্ণুতত্ত্বের পূর্ণ অংশ হচ্ছে সেব্য।

সমস্ত দেবতারা, যাঁরা পরমেশ্বর ভগবানের শক্তির দ্বারা শক্তিমান, তাঁরাও তাঁর বিভিন্নাংশে। তাঁরা বিষ্ণু-তত্ত্ব নন। সকল বিষ্ণু-তত্ত্বই পরম পুরুষ ভগবানের মত শক্তি-সম্পন্ন এবং তাঁরা বিভিন্ন স্থান, এবং কালের পরিপ্রেক্ষিতে তাঁদের বিভিন্ন শক্তি প্রকাশ করেন। কিন্তু ভগবানের বিভিন্নাংশে জীবেরা সীমিত শক্তিসম্পন্ন। তারা বিষ্ণু-তত্ত্বের মতো অনন্ত শক্তিসম্পন্ন নয়। তাই কখনই বিষ্ণুতত্ত্বদের জীবতত্ত্বদের সমপর্যায়ভুক্ত বলে মনে করা উচিত নয়। কেউ যদি তা করে, তা হলে তৎক্ষণাৎ সে ভগবানের চরণে অপরাধ করে এবং পাষণ্ডী আখ্যা প্রাপ্ত হয়। কলিযুগে মূর্খ লোকেরা এই দুটি তত্ত্বকে সমান বলে প্রচার করে ভগবানের চরণে গর্হিত অপরাধ করে।

জড়া প্রকৃতির পরিপ্রেক্ষিতে এই সমস্ত বিভিন্ন অংশদের বিভিন্ন পদ রয়েছে, এবং তার কয়েকটি হচ্ছে কালভৈরব, শ্মশানভৈরব, শনি, মহাকালি, চণ্ডিকা ইত্যাদি। যে মানুষ তমোগুণের গভীরতম স্তরে অধিষ্ঠিত, তারাই এই সমস্ত দেবতাদের পূজা করে। ব্রহ্মা, শিব, সূর্য, গণেশ এবং এই ধরনের দেবতারা রজোগুণের দ্বারা প্রভাবিত জড় ভোগেচ্ছু মানুষদের দ্বারা পূজিত হন। কিন্তু যাঁরা সত্ত্বগুণে অধিষ্ঠিত, তাঁরা কেবল বিষ্ণু-তত্ত্বদেরই আরাধনা করেন। বিষ্ণু-তত্ত্বদের বিভিন্ন নাম এবং রূপ রয়েছে। যেমন নারায়ণ, দামোদর, বামন, গোবিন্দ, অধোক্ষজ ইত্যাদি।

যোগ্যতাসম্পন্ন ব্রাহ্মণেরা বিষ্ণুতত্ত্বের প্রতীক 'শালগ্রাম-শিলার' আরাধনা করেন, এবং কিছু উচ্চবর্ণের মানুষ, যেমন ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্যরাও সাধারণত বিষ্ণু-তত্ত্বের আরাধনা করে থাকে।

সত্ত্বগুণে অধিষ্ঠিত উন্নত মনোভাবাপন্ন ব্রাহ্মণেরা কখনও অন্যের পূজাপদ্ধতির প্রতি অসন্তোষ প্রকাশ করেন না। তাঁরা বিভিন্ন দেবতাদের প্রতি শ্রদ্ধাপরায়ণ; কালভৈরব অথবা মহাকালীর রূপ ভয়ঙ্কর হওয়া সত্ত্বেও তাঁরা তাঁদের অশ্রদ্ধা করেন না। তাঁরা খুব ভালভাবেই জানেন যে, এই ভয়ঙ্কর রূপসমন্বিত এই সমস্ত দেবতারাও পরমেশ্বর ভগবানেরই সেবক। তবে তাঁরা ভয়ঙ্কর এবং মনোরম—উভয় রূপসম্পন্ন দেবতাদেরই পূজা পরিত্যাগ করেন এবং তাঁরা কেবল একাগ্রচিত্তে পরমেশ্বর ভগবান শ্রীবিষ্ণুরই আরাধনা করেন। কেন না তাঁরা এই জড় জগতের বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য ঐকান্তিকভাবে আগ্রহী। ব্রহ্মা সহ বিভিন্ন দেবদেবীরা কখনও কাউকে মুক্তি দান করতে পারেন না। হিরণ্যকশিপু অমর হওয়ার জন্য কঠোর তপস্যা করেছিল, কিন্তু তার আরাধ্য দেবতা ব্রহ্মা তাকে তার ঈপ্সিত বর দান করতে পারেননি। তাই বিষ্ণুকেই কেবল বলা হয় মুক্তিপাদ, অর্থাৎ সেই পরমেশ্বর ভগবানই কেবল মুক্তি দান করতে পারেন। এ ছাড়া আর কাউকেই মুক্তিপাদ বলা হয় না। এই জগতের অন্য সমস্ত জীবের মত স্বর্গের দেবতারাও প্রলয়ের সময় বিনাশপ্রাপ্ত হন। তাঁরা নিজেরাই মুক্তি লাভ করতে পারেন না, সুতরাং তাঁরা তাঁদের ভক্তদের কিভাবে মুক্তি দেবেন? দেবতারা তাঁদের ভক্তদের সাময়িক কিছু সুযোগ-সুবিধা দিতে পারেন, কিন্তু ওদের আত্যন্তিক মঙ্গল-সাধন করতে পারেন না।

তাই মুক্তি লাভেচ্ছু ব্যক্তিরা স্বেচ্ছাকৃতভাবে বিভিন্ন দেব-দেবীর পূজা পরিত্যাগ করেন, যদিও তাঁদের প্রতি তাঁরা অশ্রদ্ধাপরায়ণ নন।

শ্লোক ২৭

রজস্তমঃপ্রকৃতয়ঃ সমশীলা ভজন্তি বৈ।
পিতৃভূতপ্রজেশাদীন্ শ্রিয়ৈশ্বর্যপ্রজেপ্সবঃ ॥ ২৭ ॥

রজঃ—রজোগুণ; **তমঃ**—তমোগুণ; **প্রকৃতয়ঃ**—মনোভাবাপন্ন; **সম-শীলাঃ**—সমপর্যায়ভুক্ত; **ভজন্তি**—ভজনা করে; **বৈ**—প্রকৃতপক্ষে; **পিতৃ**—পিতৃপুরুষ; **ভূত**—অন্যান্য জীবসমূহ; **প্রজেশ-আদীন্**—জগতের শাসন-কার্যের নিয়ন্ত্রক; **শ্রিয়া**—সমৃদ্ধি; **ঐশ্বর্য**—ধন এবং শক্তি; **প্রজা**—প্রজা; **ঈপ্সবঃ**—এই বাসনা করে।

অনুবাদ

যারা রজ ও তমোগুণের অধীন, তারা পিতৃপুরুষ, ভূত এবং প্রজাপতিদের পূজা করে, কেন না তারা স্ত্রী, ঐশ্বর্য, শক্তি এবং সন্তান-সন্ততি আদি জড় বিষয়-ভোগের বাসনার দ্বারা প্রভাবিত।

তাৎপর্য

ভগবানের কাছে ফিরে যাওয়ার প্রত্যাশী মানুষদের কোনও দেব-দেবীর পূজা করার প্রয়োজন হয় না। ভগবদ্গীতায় (৭।২০,২৩) স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে যে, যারা জড় সুখভোগের বাসনায় উন্মত্ত, তারাই কেবল অনিত্য সুখভোগের আশায় বিভিন্ন দেব-দেবীর পূজা করে। এই ধরনের দেব-দেবীর পূজা কেবল অল্পবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষদের জন্য নির্দিষ্ট হয়েছে। আমাদের কখনই জড় সুখভোগ বৃদ্ধির বাসনা করা উচিত নয়। জীবন ধারণের জন্য যতটুকু প্রয়োজন ঠিক ততটুকু বিষয়ই গ্রহণ করা উচিত। ইন্দ্রিয়-সুখ বৃদ্ধির অর্থ হচ্ছে আরও গভীরভাবে জড় জগতের দুঃখ-দুর্দশার বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে পড়া। অধিক ঐশ্বর্য, অধিক স্ত্রী-সম্ভোগ এবং মিথ্যা আভিজাত্যের আকাঙ্ক্ষা তারাই করে, যারা জড় জগতের প্রতি আসক্ত। এই ধরনের অল্পবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষেরা জানে না যে বিষ্ণুর আরাধনা করলে কি লাভ হয়। বিষ্ণুর আরাধনা করলে এই জীবনে তো লাভ হয়ই, উপরন্তু মৃত্যুর পরেও লাভ হয়। সে কথা ভুলে গিয়ে মূর্খ লোকেরা অধিক ঐশ্বর্য, অধিক স্ত্রী-সম্ভোগ এবং অধিক সন্তান-সন্ততি লাভের আশায় বিভিন্ন দেব-দেবীদের পূজা করে। জীবনের উদ্দেশ্য হচ্ছে জড়জাগতিক দুঃখ-দুর্দশার নিবৃত্তি করা—সেগুলি বর্ধিত করা নয়।

জড় সুখভোগের জন্য বিভিন্ন দেব-দেবীর শরণাপন্ন হওয়ার কোনও প্রয়োজন নেই। এই সমস্ত দেব-দেবীরাও হচ্ছেন পরমেশ্বর ভগবানের সেবক-সেবিকা। তাঁরা জল, বায়ু, আগুন, আলোক ইত্যাদি সরবরাহ করার কর্তব্য সাধন করছেন; মানুষের কর্তব্য হচ্ছে নিষ্ঠাভরে কর্ম করে সেই কর্মের ফল পরমেশ্বর ভগবানকে নিবেদন করা এবং সেটিই জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য হওয়া উচিত। ভগবানের প্রতি শ্রদ্ধান্বিত হয়ে যথাযথভাবে এবং অত্যন্ত সাবধানতার সঙ্গে কর্তব্য-কর্ম সম্পাদন করা উচিত, এবং তার ফলে ভগবানের কাছে ফিরে যাওয়ার পথে আমরা ক্রমান্বয়ে অগ্রসর হতে পারব।

শ্রীকৃষ্ণ যখন ব্রজধামে তাঁর লীলাবিলাস করছিলেন,তখন তিনি ইন্দ্রের পূজা বন্ধ করে দেন এবং ব্রজবাসীদের উপদেশ দেন যে তাঁরা যেন ভগবানের প্রতি শ্রদ্ধাযুক্ত হয়ে তাঁদের বৃত্তি অনুসারে তাঁর সেবা করেন। জড় বিষয় লাভের জন্য বিভিন্ন দেব-দেবীর পূজা করা প্রকৃতপক্ষে ধর্ম অনুশীলনের একটি বিকৃত রূপ। শ্রীমদ্ভাগবতের শুরুতেই এই ধরনের ধর্ম আচরণকে 'কৈতব ধর্ম' বলে বর্জন করা হয়েছে। সমস্ত জগতে কেবলমাত্র একটিই ধর্ম রয়েছে এবং সকলেরই কর্তব্য হচ্ছে সেই ধর্ম অনুশীলন করা এবং তা হচ্ছে ভাগবতধর্ম অথবা একমাত্র পরমেশ্বর ভগবানের আরাধনা করাই ধর্ম।

শ্লোক ২৮-২৯

বাসুদেবপরা বেদা বাসুদেবপরা মখাঃ।
বাসুদেবপরা যোগা বাসুদেবপরাঃ ক্রিয়াঃ ॥ ২৮ ॥
বাসুদেবপরং জ্ঞানং বাসুদেবপরং তপঃ।
বাসুদেবপরো ধর্মো বাসুদেবপরা গতিঃ ॥ ২৯ ॥

বাসুদেব—পরমেশ্বর ভগবান; **পরাঃ**—পরম উদ্দেশ্য; **বেদাঃ**—বৈদিক শাস্ত্র; **বাসুদেব**—পরমেশ্বর ভগবান; **পরাঃ**—পূজার জন্য; **মখাঃ**—বেদবিহিত যজ্ঞ; **বাসুদেব**—পরমেশ্বর ভগবান; **পরাঃ**—প্রাপ্তির উপায়; **যোগাঃ**—যোগ সাধন; **বাসুদেব**—পরমেশ্বর ভগবান; **পরাঃ**—তাঁর নিয়ন্ত্রণাধীন; **ক্রিয়াঃ**—সকাম কর্ম; **বাসুদেব**—পরমেশ্বর ভগবান; **পরম্**—পরম; **জ্ঞানম্**—জ্ঞান; **বাসুদেব**—পরমেশ্বর ভগবান; **পরম্**—শ্রেষ্ঠ; **তপঃ**—তপশ্চর্যা; **বাসুদেব**—পরমেশ্বর ভগবান; **পরঃ**—উচ্চতর গুণ; **ধর্ম**—ধর্ম; **বাসুদেব**—পরমেশ্বর ভগবান; **পরাঃ**—অন্তিম; **গতিঃ**—জীবনের উদ্দেশ্য।

অনুবাদ

বৈদিক শাস্ত্রে জ্ঞানের পরম উদ্দেশ্য হচ্ছেন পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ। যজ্ঞ সম্পাদনের উদ্দেশ্য হচ্ছে ভগবানের প্রীতি-বিধান এবং যোগের উদ্দেশ্য হচ্ছে তাঁকে জানা। সমস্ত সকাম কর্মের চরম ফল তিনিই দান করেন। পরম জ্ঞান এবং সমস্ত তপশ্চর্যার উদ্দেশ্য হচ্ছে তাঁকে জানা এবং তাঁর প্রতি প্রেমময়ী সেবায় যুক্ত হওয়াই হচ্ছে ধর্মের উদ্দেশ্য। তিনি হচ্ছেন জীবনের পরম উদ্দেশ্য।

তাৎপর্য

পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যে আরাধনার একমাত্র বিষয়, সে কথা এই দুটি শ্লোকে প্রতিপন্ন হয়েছে। বৈদিক শাস্ত্রের উদ্দেশ্যই হচ্ছে তাই ঃ তাঁর সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত হওয়া এবং চরমে তাঁর প্রতি প্রেমময়ী সেবাপরায়ণ হওয়া। এইটিই হচ্ছে সমস্ত বেদের মূল তত্ত্ব। *ভগবদ্গীতাতেও* সেই সত্যকে প্রতিপন্ন করে ভগবান বলেছেন ঃ সমস্ত বেদের একমাত্র উদ্দেশ্য হচ্ছে তাঁকে জানা। সমস্ত শাস্ত্র তিনি রচনা করেছেন তাঁর অবতার শ্রীল ব্যাসদেবের মাধ্যমে, যাতে জড় জগতের বন্ধনে আবদ্ধ অধঃপতিত জীবেরা তাঁকে (পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে) জানতে পারে। কোন দেবতাই জড় জগতের বন্ধন থেকে জীবকে মুক্তি দান করতে পারেন না। সে কথা সমস্ত বৈদিক শাস্ত্রে ঘোষিত হয়েছে। ভগবত্তত্ত্ব সম্বন্ধে সম্পূর্ণরূপে অজ্ঞ নির্বিশেষবাদীরা ভগবানের সর্বশক্তিমত্তাকে খর্ব করে তাঁকে জীবেদের সমপর্যায়ভুক্ত করে, এবং সেই জন্য বহু সাধ্যসাধনা করেও নির্বিশেষবাদীরা জড় জগতের বন্ধন থেকে মুক্ত হতে পারে না।

বহু বহু জন্মের পর পারমার্থিক জ্ঞান লাভ করে তারা পরমেশ্বর ভগবানের শরণাগত হতে পারে।

এখানে কেউ তর্ক করে বলতে পারে যে, বৈদিক কার্যকলাপ যজ্ঞ অনুষ্ঠানের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত। সে কথা সত্যি। কিন্তু এই সমস্ত যজ্ঞের উদ্দেশ্য হচ্ছে বাসুদেবকে তত্ত্বত জানা। বাসুদেবের আরেক নাম হচ্ছে যজ্ঞ, এবং *ভগবদ্গীতায়* স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে যে, সমস্ত যজ্ঞ এবং সমস্ত কর্মসমূহ পরমেশ্বর ভগবান শ্রীবিষ্ণুর সন্তুষ্টি বিধানের জন্য সাধিত হওয়া উচিত। যোগের উদ্দেশ্যও তাই। 'যোগ' কথাটির অর্থ হচ্ছে পরমেশ্বর ভগবানের সংস্পর্শে আসা। এই প্রক্রিয়ায় অবশ্য আসন, প্রাণায়াম, ধ্যান, ধারণা ইত্যাদি কতকগুলি অঙ্গ রয়েছে, এবং সে সবেরই উদ্দেশ্য হচ্ছে বাসুদেবের প্রকাশ পরমাত্মায় চিত্তকে একাগ্র করা। পরমাত্মা-উপলব্ধি হচ্ছে আংশিকভাবে বাসুদেব উপলব্ধি, এবং যখন কেউ সেই প্রচেষ্টায় সিদ্ধি লাভ করেন, তখন তিনি পূর্ণরূপে বাসুদেবকে জানতে পারেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত অধিকাংশ যোগীরাই যোগ-অনুশীলনের মাধ্যমে কতকগুলি যোগসিদ্ধি লাভ করে সেই সিদ্ধির বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে পড়ে। এই ধরনের ভ্রষ্ট যোগীরা পরবর্তী জীবনে শুচিসম্পন্ন ব্রাহ্মণ অথবা শ্রীসম্পন্ন বণিকের গৃহে জন্মগ্রহণ করে বাসুদেব উপলব্ধির অপূর্ণ কার্য পূর্ণ করার সুযোগ পায়। এই ধরনের ভাগ্যবান ব্রাহ্মণ অথবা ধনবান বণিকের পুত্ররা যদি এই সুযোগের যথার্থ সদ্ব্যবহার করে, তা হলে তারা সাধুসঙ্গের প্রভাবে অনায়াসে বাসুদেবকে জানতে পারে। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত এই ধরনের ভাগ্যবান মানুষেরা আবার জড় ঐশ্বর্য এবং যশের বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে পড়ে এবং তাদের জীবনের যথার্থ উদ্দেশ্য বিস্মৃত হয়।

জ্ঞান আহরণের ব্যাপারে এই একই অবস্থা হয়। *ভগবদ্গীতায়* বর্ণনা করা হয়েছে যে, জ্ঞান আহরণের আঠারোটি অঙ্গ রয়েছে। এই প্রক্রিয়ায় জ্ঞান আহরণ করার ফলে মানুষ ধীরে ধীরে অমানী, অদাম্ভিক, অহিংস, ক্ষান্ত, সরল, সদ্গুরুর অনুগত এবং আত্মসংযমী হন। জ্ঞান আহরণের ফলে বিজ্ঞ মানুষ বিষয়ের প্রতি অনাসক্ত হয়ে জন্ম, মৃত্যু, জরা এবং ব্যাধির দুঃখ-দুর্দশা সম্বন্ধে সচেতন হন। সমস্ত জ্ঞানই চরমে পরমেশ্বর ভগবান বাসুদেবের ভক্তিতে পর্যবসিত হয়। তাই বাসুদেব হচ্ছেন সমস্ত জ্ঞানের চরম উদ্দেশ্য। যে জ্ঞান মানুষকে পারমার্থিক স্তরে উন্নীত করে বাসুদেবের দর্শন লাভ করায়, তাই হচ্ছে যথার্থ জ্ঞান। জড়জাগতিক জ্ঞানের বিভিন্ন শাখাকে *ভগবদ্গীতায়* অজ্ঞান বলে বর্জন করা হয়েছে। জড়জাগতিক জ্ঞানের চরম লক্ষ্য হচ্ছে ইন্দ্রিয়সুখভোগ, যার অর্থ হচ্ছে জড় অস্তিত্ব বৃদ্ধি, অর্থাৎ ত্রিতাপ-দুঃখ বৃদ্ধি। তাই দুঃখ-দুর্দশাগ্রস্ত জড়জাগতিক অস্তিত্ব বৃদ্ধি হচ্ছে অজ্ঞান। কিন্তু সেই জ্ঞান যখন পারমার্থিক জ্ঞানের পথে অগ্রসর হতে সাহায্য করে, তখন দুঃখ-দুর্দশাপূর্ণ জীবনের সমাপ্তি হয় এবং বাসুদেব স্তরে পারমার্থিক জীবনের শুরু হয়।

সব রকমের তপস্যারও এই একই উদ্দেশ্য। 'তপস্যা' কথাটির অর্থ হচ্ছে কোন মহৎ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য স্বেচ্ছাকৃতভাবে দৈহিক কষ্ট স্বীকার করা। রাবণ এবং হিরণ্যকশিপু জড় বিষয়-ভোগের উদ্দেশ্যে কঠোর তপস্যা করেছিল। আধুনিক যুগের রাজনীতিবিদদেরও মাঝে মাঝে কোন রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সাধনের জন্য কঠোর তপস্যা করতে দেখা যায়। কিন্তু এগুলি যথার্থ তপস্যা নয়। তপস্যা কেবল বাসুদেবকে জানার উদ্দেশ্যেই সাধন করা উচিত। বাসুদেবকে জানার জন্য যখন দৈহিক কষ্ট বা অসুবিধা স্বীকার করা হয় সেটি হচ্ছে যথার্থ তপস্যা। এ ছাড়া অন্য সব রকম তপস্যাই রজ এবং তমোগুণের দ্বারা প্রভাবিত। রজ এবং তমোগুণ জীবের দুঃখ-দুর্দশার নিবৃত্তি করতে পারে না। সত্ত্বগুণই কেবল ত্রিতাপ-দুঃখ নিবৃত্তি করতে পারে; শ্রীকৃষ্ণের পিতা-মাতা বসুদেব এবং দেবকী তাঁকে তাঁদের সন্তানরূপে পাওয়ার জন্য কঠোর তপস্যা করেছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন সমস্ত জীবের পিতা (ভগবদ্গীতা ১৪/৪)। তাই তিনি হচ্ছেন সমস্ত চেতন বস্তুর পরম চেতন। তিনি হচ্ছেন সমস্ত ভোক্তাদের মধ্যে পরম ভোক্তা। তাই কেউই তাঁর পিতা হতে পারে না, যেভাবে মূর্খ লোকেরা অনেক সময়ে মনে করে থাকে। বসুদেব এবং দেবকীর কঠোর তপস্যায় সন্তুষ্ট হয়ে শ্রীকৃষ্ণ তাঁদের সন্তানরূপে আবির্ভূত হতে সম্মত হন। তাই যদি তপস্যা করতে হয়, তবে তা যেন অবশ্যই জ্ঞানের পরম লক্ষ্য বাসুদেবকে জানবার জন্য সাধিত হয়।

বাসুদেব হচ্ছেন পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ। সে কথা পূর্বেই বিশ্লেষণ করা হয়েছে। পরমেশ্বর ভগবান নিজেকে অনন্তরূপে বিস্তার করেন। তাঁর এই বিভিন্ন প্রকাশ সম্ভব বিভিন্ন শক্তির দ্বারা। তাঁর শক্তিও অনন্ত, এবং তার মধ্যে তাঁর অন্তরঙ্গা শক্তি হচ্ছে উৎকৃষ্ট শক্তি এবং বহিরঙ্গা শক্তি হচ্ছে নিকৃষ্ট শক্তি। *ভগবদ্গীতায়* এই দুই শ্রেণীর শক্তিকে ভগবানের পরা এবং অপরা প্রকৃতি বলে বর্ণনা করা হয়েছে (৭/৪৬)। তাই তাঁর অন্তরঙ্গা শক্তির প্রভাবে তাঁর যে বিভিন্ন প্রকাশ হয় সেই রূপগুলি হচ্ছে উৎকৃষ্ট এবং তাঁর বহিরঙ্গা শক্তির প্রভাবে তাঁর যে প্রকাশ হয় তা হচ্ছে নিকৃষ্ট। জীবও তাঁর প্রকাশ। যে সমস্ত জীব তাঁর অন্তরঙ্গা প্রকৃতিতে প্রকাশিত, তারা নিত্যমুক্ত জীব, আর যারা তাঁর বহিরঙ্গা প্রকৃতিতে অবস্থিত, তারা নিত্যবদ্ধ জীব। তাই, সমস্ত জ্ঞানের প্রয়াস, তপশ্চর্যা, দান এবং কর্মের উদ্দেশ্য হওয়া উচিত এই বহিরঙ্গা প্রকৃতির প্রভাব থেকে মুক্ত হওয়া। এখন আমরা সকলে ভগবানের বহিরঙ্গা শক্তির দ্বারা পরিচালিত হচ্ছি, এবং এই প্রভাব থেকে মুক্ত হতে হলে আমাদের চিন্ময় প্রকৃতিতে অধিষ্ঠিত হওয়ার চেষ্টা করতে হবে। *ভগবদ্গীতায়* বলা হয়েছে যে, মহাত্মা হচ্ছেন তাঁরা, যাঁদের মনোবৃত্তি অত্যন্ত প্রশস্ত এবং তার ফলে যাঁরা পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সেবায় যুক্ত হয়েছেন। তাঁরা ভগবানের অন্তরঙ্গা প্রকৃতির দ্বারা প্রভাবিত। তাই এই মহৎ আশয়সম্পন্ন পুরুষেরা নিরন্তর অনন্য ভক্তি সহকারে পরমেশ্বর ভগবানের সেবায় যুক্ত। এইটিই জীবনের উদ্দেশ্য হওয়া উচিত, এবং সমস্ত বৈদিক

শাস্ত্রে সেই নির্দেশই দেওয়া হয়েছে। সকাম কর্মে অথবা শুষ্ক জ্ঞানের প্রয়াসে অনর্থক যুক্ত হওয়া উচিত নয়। সকলেরই কর্তব্য হচ্ছে এই মুহূর্তে পরমেশ্বর ভগবানের অপ্রাকৃত প্রেমময়ী সেবায় যুক্ত হওয়া। এই জগতে সৃষ্টি, স্থিতি অথবা বিনাশকার্যে ভগবানের সহায়ক যে সমস্ত দেব-দেবী রয়েছেন, তাঁদের পূজা করে সময়ের অপচয় করা উচিত নয়। অসংখ্য শক্তিশালী দেব-দেবী রয়েছেন, যাঁরা ভগবানের বহিরঙ্গা প্রকৃতি এই জড় জগতের পরিচালনার তত্ত্বাবধান করেন। তাঁরা সকলেই পরমেশ্বর ভগবান বাসুদেবের সহকারী। এমন কি শিব এবং ব্রহ্মাও এই সমস্ত দেবতাদের পর্যায়ভুক্ত, কিন্তু শ্রীবিষ্ণু অথবা বাসুদেব সর্বদাই পরা প্রকৃতিতে অধিষ্ঠিত। তিনি যদিও এই জড় জগতের সত্ত্বগুণকে স্বীকার করেন, তবুও তিনি জড়া প্রকৃতির সমস্ত গুণের অতীত। সেই তত্ত্ব আরও স্পষ্টভাবে বোঝানোর জন্য একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যায়। কারাগারে কয়েদি রয়েছে এবং কারাগারের পরিচালকরা রয়েছে। কারাগারের কয়েদি এবং পরিচালক উভয়েই রাজার আইনের দ্বারা পরিচালিত হয়। কিন্তু রাজা যদি কখনও কারাগারে আসেনও, তবুও তিনি কারাগারের আইনের দ্বারা বদ্ধ হন না। তাই সর্ব অবস্থাতেই রাজা কারাগারের নিয়মকানুনের অতীত। ঠিক তেমনই পরমেশ্বর ভগবানও এই জড় জগতের সমস্ত নিয়ম-কানুনের অতীত।

শ্লোক ৩০

স এবেদং সসর্জাগ্রে ভগবানাত্মমায়য়া।
সদসদ্রূপয়া চাসৌ গুণময্যাগুণো বিভুঃ ॥ ৩০ ॥

সঃ—তা; **এব**—অবশ্যই; **ইদম্**—এই; **সসর্জ**—সৃষ্টি করেছেন; **অগ্রে**—পূর্বে; **ভগবান**—পরমেশ্বর ভগবান; **আত্ম-মায়য়া**—তাঁর নিজের শক্তির দ্বারা; **সৎ**—কারণ; **অসৎ**—পরিণাম; **রূপয়া**—রূপের দ্বারা; **চ**—এবং; **অসৌ**—সেই ভগবান; **গুণময়**—জড় জগতের গুণে; **অগুণঃ**—গুণাতীত; **বিভুঃ**—পরম।

অনুবাদ

এই পরমেশ্বর ভগবান স্বয়ং নির্গুণ হয়ে প্রথমে কার্য-কারণাত্মিকা ত্রিগুণময়ী স্বীয় বহিরঙ্গা শক্তি মায়াকে নিরীক্ষণ করে এই বিশ্ব সৃষ্টি করেছিলেন।

তাৎপর্য

ভগবান সর্বদাই নির্গুণ স্তরে অধিষ্ঠিত, কেন না এই জড় জগতের সৃষ্টির জন্য যে শক্তির প্রয়োজন সেগুলিও তাঁরই সৃষ্টি। তাই তিনি জড় জগতের গুণের দ্বারা প্রভাবিত হন না। তাঁর সত্তা, রূপ, কার্যকলাপ ইত্যাদি জড় জগতের সৃষ্টির পূর্বেও

ছিল।* তিনি সম্পূর্ণরূপে চিন্ময় এবং জড়া প্রকৃতির গুণের সঙ্গে তাঁর কোন সম্পর্ক নেই। সেই গুণগুলি পরমেশ্বর ভগবানের অপ্রাকৃত গুণ থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন।

শ্লোক ৩১

তয়া বিলসিতেষ্বেষু গুণেষু গুণবানিব।
অন্তঃপ্রবিষ্ট আভাতি বিজ্ঞানেন বিজৃম্ভিতঃ ॥ ৩১ ॥

তয়া—তাদের দ্বারা; **বিলসিতেষু**—উদ্ভূত হলেও; **এষু**—এই সমস্ত; **গুণেষু**—জড়া প্রকৃতির গুণগুলি; **গুণবান্**—গুণের দ্বারা প্রভাবিত; **ইব**—যেন; **অন্তঃ**—মধ্যে; **প্রবিষ্টঃ**—প্রবেশ করে; **আভাতি**—প্রতিভাত হয়; **বিজ্ঞানেন**—চিন্ময় জ্ঞানের দ্বারা; **বিজৃম্ভিতঃ**—পূর্ণ জ্ঞানময়।

অনুবাদ

জড় জগৎ সৃষ্টি করার পর ভগবান (বাসুদেব) নিজেকে বিস্তার করে তার মধ্যে প্রবেশ করেন। যদিও তিনি জড়া প্রকৃতির গুণগুলির মধ্যে অবস্থিত এবং যদিও মনে হয় যে এই জড় জগতে তাঁর সৃষ্টি হয়েছে, তবুও তিনি তাঁর অপ্রাকৃত স্তরে অধিষ্ঠিত এবং পূর্ণ জ্ঞানময়।

তাৎপর্য

জীব হচ্ছে ভগবানের বিভিন্ন অংশ, এবং বদ্ধ জীবেরা, যারা চিন্ময় ভগবদ্ধামের অযোগ্য, তারা পূর্ণরূপে জড় বস্তুকে ভোগ করার জন্য এই জড় জগতে প্রক্ষিপ্ত হয়। পরমাত্মা এবং জীবের পরম সুহৃৎরূপে পরমেশ্বর ভগবান নিজেকে বিস্তার করে জড় জগতকে ভোগ করার বিষয়ে জীবকে সাহায্য করার জন্য এবং তার প্রতিটি কার্যকলাপের সাক্ষী হওয়ার জন্য সর্বক্ষণ জীবের সঙ্গে থাকেন। জীব যখন জড় জগতকে ভোগ করে, ভগবান তখন জড়া প্রকৃতির পরিবেশের দ্বারা প্রভাবিত না হয়ে তাঁর অপ্রাকৃত স্থিতি বজায় রাখেন। বৈদিক শাস্ত্রে (শ্রুতিতে) বলা হয়েছে, একটি বৃক্ষে দুটি পাখি বসে রয়েছে।♣ সেই পাখি দুটির একটি পাখি গাছের ফল খাচ্ছে, এবং অন্য পাখিটি অপর পাখিটির কার্যকলাপের সাক্ষী থাকছে। সাক্ষী হচ্ছেন ভগবান, আর ফল ভক্ষণরত পাখিটি হচ্ছে জীব। ফল-ভক্ষণরত জীব তার প্রকৃত স্বরূপের

---

* মায়াবাদী সম্প্রদায়ের শিরোমণি শ্রীপাদ শঙ্করাচার্যও তাঁর ভগবদ্গীতার ভাষ্যে শ্রীকৃষ্ণের এই অপ্রাকৃত স্থিতি স্বীকার করেছেন।

♣ দ্বা সুপর্ণা সযুজা সখায়া সমানং বৃক্ষং পরিষস্বজাতে।
তয়োরন্যঃ পিপ্পলং স্বাদ্বত্ত্যনশ্নন্নন্যোঽভিচাকশীতি॥
(মুণ্ডক উপনিষদ ৩/১/১)

কথা ভুলে গেছে এবং জড়া প্রকৃতির সকাম কর্মে মোহাচ্ছন্ন হয়ে পড়েছে। কিন্তু পরমাত্মা সর্ব অবস্থাতেই চিন্ময়, জ্ঞানময়। সেটিই হচ্ছে পরমাত্মা এবং জীবাত্মার মধ্যে পার্থক্য। জীবাত্মা প্রকৃতির গুণের দ্বারা পরিচালিত বা নিয়ন্ত্রিত হয়, কিন্তু পরমাত্মা সর্ব অবস্থাতেই জড়া প্রকৃতির অধীশ্বর।

শ্লোক ৩২

যথা হ্যবহিতো বহ্নির্দারুষ্বেকঃ স্বযোনিষু।
নানেব ভাতি বিশ্বাত্মা ভূতেষু চ তথা পুমান্ ॥ ৩২ ॥

যথা—যতখানি; **হি**—ঠিক তেমন; **অবহিতঃ**—নিহিত; **বহ্নিঃ**—অগ্নি; **দারুষু**—কাঠে; **একঃ**—এক; **স্ব-যোনিষু**—প্রকাশের উৎস; **নানেব**—প্রকাশের তারতম্যের জন্য বিভিন্ন; **ভাতি**—প্রকাশ করে; **বিশ্বাত্মা**—পরমাত্মারূপে ভগবান; **ভূতেষু**—জীবের মধ্যে; **চ**—এবং; **তথা**—সেই রকম। **পুমান্**—পরম পুরুষ।

অনুবাদ

আগুন যেমন কাঠের মধ্যে নিহিত থাকে, তেমনই পরমেশ্বর ভগবানও পরমাত্মারূপে সব কিছুর মধ্যে পরিব্যাপ্ত। যদিও তিনি অদ্বিতীয় পরম পুরুষ, তবুও মনে হয় তিনি যেন নানারূপে প্রকাশিত হয়েছেন।

তাৎপর্য

পরমেশ্বর ভগবান বাসুদেব তাঁর এক অংশের দ্বারা নিজেকে সমস্ত জড় জগতে বিস্তার করেন এমন কি অতি ক্ষুদ্র পরমাণুতেও তিনি রয়েছেন। জড় পদার্থ, অ-জড় বা চিন্ময় পদার্থ, প্রোটন, নিউট্রন ইত্যাদি ভগবানের পরমাত্মা স্বরূপের বিভিন্ন পরিণাম। যেমন কাঠ থেকে আগুনের প্রকাশ হয়, অথবা দুধ থেকে মাখন তৈরি হয়, তেমনই উপনিষদ, বেদান্ত প্রভৃতি বৈদিক শাস্ত্রের অপ্রাকৃত বিষয়বস্তু শ্রবণ এবং কীর্তন করার মাধ্যমে পরমাত্মারূপে ভগবানের অস্তিত্ব উপলব্ধি করা যায়। *শ্রীমদ্ভাগবত* হচ্ছে এই সমস্ত বৈদিক শাস্ত্রের যথার্থ ভাষ্য। পারমার্থিক তত্ত্ব শ্রবণ করার মাধ্যমে পরমেশ্বর ভগবানকে জানা যায়, এবং সেটিই হচ্ছে এই অপ্রাকৃত বিষয় জানবার একমাত্র পন্থা। অন্য আগুনের সংযোগে যেমন কাঠের মধ্যে আগুন জ্বলে ওঠে, তেমনিই দিব্য কৃপার প্রভাবে মানুষের দিব্য চেতনা প্রকাশিত হয়। দিব্য কৃপার মূর্ত বিগ্রহ হচ্ছেন শ্রীগুরুদেব, এবং কাষ্ঠ সদৃশ জীবের মধ্যে তিনি সেই দিব্য অগ্নি প্রজ্বলিত করতে পারেন পারমার্থিক জ্ঞান প্রদান করার মাধ্যমে। তাই পারমার্থিক জ্ঞান শ্রবণ করার ঐকান্তিক বাসনা নিয়ে সদ্গুরুর শরণাগত হতে হয়, এবং তার ফলে ধীরে ধীরে ভগবানের অপ্রাকৃত স্থিতি উপলব্ধি করা যায়। পশু এবং মানুষের মধ্যে এটাই হচ্ছে পার্থক্য—মানুষ যথাযথভাবে শ্রবণ করতে পারে, কিন্তু একটা পশু তা পারে না।

শ্লোক ৩৩

অসৌ গুণময়ৈর্ভাবৈর্ভূতসূক্ষ্মেন্দ্রিয়াত্মভিঃ ।
স্বনির্মিতেষু নির্বিষ্টো ভুঙ্‌ক্তে ভূতেষু তদ্‌গুণান্ ॥ ৩৩ ॥

অসৌ—সেই পরমাত্মা; **গুণময়ৈঃ**—জড়া প্রকৃতির গুণের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে; **ভাবৈঃ**—স্বাভাবিকভাবে; **ভূত**—সৃষ্ট; **সূক্ষ্ম**—সূক্ষ্ম; **ইন্দ্রিয়**—ইন্দ্রিয়; **আত্মভিঃ**—জীবের দ্বারা; **স্ব-নির্মিতেষু**—তাঁর নিজের সৃষ্টিতে; **নির্বিষ্টঃ**—প্রবেশ করে; **ভুঙ্‌ক্তে**—ভোগ করান; **ভূতেষু**—জীবেদের মধ্যে; **তৎ-গুণান্**—প্রকৃতির সেই গুণগুলি।

অনুবাদ

পরমাত্মা প্রকৃতির গুণের দ্বারা প্রভাবিত তাঁর সৃষ্ট জীবেদের দেহে প্রবেশ করেন এবং সূক্ষ্ম মনের দ্বারা তাদের এই সমস্ত গুণগুলির প্রতিক্রিয়া ভোগ করান।

তাৎপর্য

ব্রহ্মা থেকে শুরু করে একটি নগণ্য পিপীলিকা পর্যন্ত চুরাশি লক্ষ বিভিন্ন রকমের জীব-শরীরে সকলেই তাদের সূক্ষ্ম মন এবং স্থূল শরীরের বাসনা অনুসারে জড় জগতকে ভোগ করছে। সূক্ষ্ম মন অনুসারে স্থূল জড় শরীর গঠিত হয়, এবং জীবের বাসনা অনুসারে তার ইন্দ্রিয়গুলির সৃষ্টি হয়। পরমাত্মারূপে ভগবান জীবকে জড়-সুখ ভোগ করতে সাহায্য করেন, কেন না তার বাসনা অনুসারে কোন কিছু লাভ করতে জীব সম্পূর্ণভাবে অসহায়। জীব অভিপ্রায় করে এবং ভগবান তা অনুমোদন করেন। অর্থাৎ, জীব হচ্ছে ভগবানের বিভিন্ন অংশ, তাই তারা ভগবানের সঙ্গে এক। ভগবদ্গীতাতেও ভগবান সমস্ত জীবকে তাঁর সন্তান বলে ঘোষণা করেছেন। সন্তানদের সুখ এবং দুঃখ ভোগ পরোক্ষভাবে পিতার সুখ এবং দুঃখ ভোগ। তবুও পিতা সরাসরিভাবে পুত্রদের সুখ ও দুঃখের দ্বারা প্রভাবিত হন না। ভগবান এতই কৃপালু যে তিনি পরমাত্মারূপে সর্বক্ষণ তাদের সঙ্গে থাকেন এবং সর্বদাই তাদের মোহ-অন্ধকার দূর করে যথার্থ আনন্দের পথে নিয়ে যেতে চেষ্টা করেন।

শ্লোক ৩৪

ভাবয়ত্যেষ সত্ত্বেন লোকান্ বৈ লোকভাবনঃ ।
লীলাবতারানুরতো দেবতির্যঙ্‌ নরাদিষু ॥ ৩৪ ॥

ভাবয়তি—পালন করেন; **এষঃ**—এই সমস্ত; **সত্ত্বেন**—সত্ত্বগুণের দ্বারা; **লোকান্**—সমগ্র জগতে; **বৈ**—সাধারণত; **লোক-ভাবনঃ**—সমগ্র জগতের ঈশ্বর; **লীলা**—

লীলা; অবতার—অবতার; অনুরতঃ—অনুরত; দেব—দেবতা; তির্যক্‌—নিম্ন স্তরের পশু; নরাদিষু—মানুষদের মধ্যে।

অনুবাদ

এইভাবে সমস্ত জগতের পতি দেবতা, মনুষ্য এবং পশু অধ্যুষিত সমস্ত গ্রহলোকগুলি প্রতিপালন করেন। বিভিন্ন অবতারে তিনি তাঁর লীলা-বিলাস করে বিশুদ্ধ-সত্ত্বে অধিষ্ঠিত জীবসমূহকে উদ্ধার করেন।

তাৎপর্য

অনন্ত কোটি জড় ব্রহ্মাণ্ড রয়েছে এবং প্রতিটি ব্রহ্মাণ্ডে অসংখ্য গ্রহ রয়েছে, যেখানে অসংখ্য জীব প্রকৃতির বিভিন্ন গুণের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে বিরাজ করছে। ভগবান শ্রীবিষ্ণু প্রতিটি ব্রহ্মাণ্ডে এবং প্রতিটি লোকে অবতরণ করেন। তিনি বিভিন্ন লোকে জীবেদের মাঝে তাঁর লীলাবিলাস করেন, যাতে তারা ভগবদ্ধামে ফিরে যাওয়ার অভিলাষী হয়। ভগবান তাঁর অপ্রাকৃত স্থিতির পরিবর্তন করেন না, কিন্তু বিভিন্ন সময়ে, বিভিন্ন পরিবেশে এবং বিভিন্ন সমাজে তিনি বিভিন্নরূপে আবির্ভূত হয়েছেন বলে মনে হয়।

কখনও কখনও তিনি কোন উপযুক্ত জীবকে তাঁর হয়ে কোন কর্ম সাধন করার জন্য তাঁর শক্তির দ্বারা আবিষ্ট করেন। কিন্তু উভয় ক্ষেত্রেই উদ্দেশ্য হচ্ছে একই—ভগবান চান যে দুঃখ-দুর্দশাগ্রস্ত জীবেরা যেন ভগবদ্ধামে ফিরে গিয়ে নিত্য আনন্দ লাভ করতে পারে। যে আনন্দ লাভের আশায় জীব আকুল হয়ে রয়েছে, তা এই জড় জগতের কোথাও খুঁজে পাওয়া যাবে না। যে নিত্য আনন্দের অন্বেষণ জীব করছে তা কেবল ভগবদ্ধামেই পাওয়া যায়; কিন্তু জড়া প্রকৃতির গুণের প্রভাবে মোহাচ্ছন্ন জীবের ভগবদ্ধাম সম্বন্ধে কোন ধারণাই নেই। তাই ভগবান নিজে এসে অথবা তাঁর উপযুক্ত পুত্রসদৃশ প্রতিনিধিদের পাঠিয়ে বদ্ধ জীবদের কাছে ভগবদ্ধামের মহিমা প্রচার করেন। এই ধরনের অবতারেরা অথবা ভগবানের পুত্রেরা কেবল মানব সমাজের মধ্যেই ভগবদ্ধামে ফিরে যাওয়ার বাণী প্রচার করেন না, তাঁরা দেবতা আদি অন্যান্য সমাজেও সেই বাণী প্রচার করেন।

ইতি—"দিব্য ভাব এবং দিব্য সেবা" নামক শ্রীমদ্ভাগবতের প্রথম স্কন্ধের দ্বিতীয় অধ্যায়ের ভক্তিবেদান্ত তাৎপর্য।

তৃতীয় অধ্যায়

শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন সমস্ত অবতারের উৎস

শ্লোক ১

সূত উবাচ

জগৃহে পৌরুষং রূপং ভগবান্মহদাদিভিঃ।
সম্ভূতং ষোড়শকলমাদৌ লোকসিসৃক্ষয়া ॥ ১ ॥

সূতঃ উবাচ—সূত গোস্বামী বললেন; **জগৃহে**—গ্রহণ করে; **পৌরুষম্**—ভগবানের অংশ পুরুষ-অবতার; **রূপম্**—রূপ; **ভগবান্**—পরমেশ্বর ভগবান; **মহৎ-আদিভিঃ**—মহত্তত্ত্ব ইত্যাদির দ্বারা; **সম্ভূতম্**—সুনিষ্পন্ন; **ষোড়শ-কলম্**—ষোলটি মৌলিক তত্ত্ব; **আদৌ**—আদিতে; **লোক**—ব্রহ্মাণ্ডসমূহ; **সিসৃক্ষয়া**—সৃষ্টি করার ইচ্ছায়।

অনুবাদ

শ্রীল সূত গোস্বামী বললেনঃ সৃষ্টির আদিতে পরমেশ্বর ভগবান প্রথমে তাঁর পুরুষ-অবতারে বিরাট রূপে নিজেকে প্রকাশ করেন এবং মহত্তত্ত্ব, অহঙ্কার এবং পঞ্চতন্মাত্র আদি জড় সৃষ্টির সমস্ত উপাদানগুলি প্রকাশ করেন। এইভাবে জড় জগৎকে সৃষ্টি করার জন্য তিনি প্রথমে ষোলটি তত্ত্ব সৃষ্টি করেন।

তাৎপর্য

ভগবদ্গীতায় বলা হয়েছে যে, পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাঁর পূর্ণাংশ বিস্তার করে এই জড় জগতের প্রতিপালন করেন। এই পুরুষাবতার সেই তত্ত্বকেই বিশ্লেষণ করে। পরমেশ্বর ভগবান বাসুদেব বা শ্রীকৃষ্ণ, যিনি বসুদেবের পুত্র অথবা নন্দ মহারাজের পুত্র বলে প্রসিদ্ধ, তিনি সর্ব ঐশ্বর্যে পূর্ণ—সমগ্র ঐশ্বর্য, সমগ্র যশ, সমগ্র বীর্য, সমগ্র শ্রী, সমগ্র জ্ঞান এবং সমগ্র বৈরাগ্য তাঁর মধ্যে পূর্ণরূপে বিরাজমান। তাঁর ঐশ্বর্যের একটি অংশ নির্বিশেষ ব্রহ্মরূপে প্রকাশিত, এবং অপর একটি অংশ পরমাত্মারূপে প্রকাশিত। পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সেই পুরুষ রূপ হচ্ছে আদি পরমাত্মা। জড় সৃষ্টিতে তিনটি পুরুষ রূপ রয়েছে, যাঁরা কারণোদকশায়ী বিষ্ণু, গর্ভোদকশায়ী বিষ্ণু এবং ক্ষীরোদকশায়ী বিষ্ণু নামে পরিচিত। তাঁদের সম্বন্ধে আমরা একে একে অবগত

হব। কারণোদকশায়ী বিষ্ণুর রোমকূপ থেকে অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ডের উৎপত্তি হয় এবং প্রতিটি ব্রহ্মাণ্ডে তিনি গর্ভোদকশায়ী বিষ্ণুরূপে প্রবিষ্ট হন।

ভগবদ্গীতাতে আরও বলা হয়েছে যে, নির্দিষ্ট সময়ের ব্যবধানে এই জড় জগতের সৃষ্টি হয় এবং তারপর তা আবার ধ্বংস হয়ে যায়। নিত্যবদ্ধ জীবেদের জন্য পরমেশ্বর ভগবানের পরম ইচ্ছার প্রভাবে এই সৃষ্টি এবং ধ্বংস সাধিত হয়। নিত্যবদ্ধ জীবেদের স্বতন্ত্রতা বোধ বা অহঙ্কার রয়েছে, যার ফলে ইন্দ্রিয়-সুখভোগের প্রতি আসক্ত হয়, যদিও প্রকৃতপক্ষে কোন কিছুই ভোগ করার ক্ষমতা তাদের নেই। ভগবানই হচ্ছেন একমাত্র ভোক্তা, এবং অন্য সব কিছু হচ্ছে তাঁর ভোগের বিষয়। জীবেরা হচ্ছেন অধীন ভোক্তা। কিন্তু তাদের স্বরূপ বিস্মৃত হওয়ার ফলে নিত্যবদ্ধ জীবেদের প্রবল ভোগ-বাসনার উদয় হয়। এই জড় জগতে জড় পদার্থ ভোগ করার সুযোগ বদ্ধ জীবকে দেওয়া হয়েছে, আবার সেই সঙ্গে তাদের স্বরূপ সম্বন্ধে অবগত হওয়ার সুযোগও দেওয়া হয়েছে। যে সমস্ত সৌভাগ্যবান জীব যথার্থ সত্য সম্বন্ধে অবগত হয়ে বহু জন্মান্তরের পর বাসুদেবের চরণারবিন্দে শরণাগত হন, তাঁরা নিত্যমুক্ত আত্মাদের সঙ্গ-প্রভাবে ভগবদ্ধামে প্রবেশ করার অনুমতি লাভ করেন। সেখানে প্রবেশ করার পর এই রকম সৌভাগ্যবান জীবকে আর এই জড় সৃষ্টিতে ফিরে আসতে হয় না। কিন্তু যারা এই স্বরূপগত সত্যকে উপলব্ধি করতে পারে না,তারা এই জড় জগতের প্রলয়ের পর মহত্তত্ত্বে লীন হয়ে যায়। তারপর যখন আবার সৃষ্টি হয়, তখন তারা মহত্তত্ত্ব থেকে জেগে ওঠে; এই মহত্তত্ত্বে জড় সৃষ্টির সমস্ত উপাদানগুলি রয়েছে, এমন কি বদ্ধ জীবাত্মারাও এই মহত্তত্ত্বে রয়েছে। মৌলিকভাবে এই মহত্তত্ত্বকে ষোলটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে। যেমন, পঞ্চভূত এবং একাদশ ইন্দ্রিয়। মহত্তত্ত্ব অনেকটা নির্মল আকাশে মেঘের মতো। চিন্ময় জগতের সর্বত্রই ব্রহ্মজ্যোতির দ্বারা উদ্ভাসিত এবং সেখানে সব কিছুই চিন্ময় জ্যোতিতে উজ্জ্বল। অন্তহীন বিরাট চিদাকাশের এক কোণে মহত্তত্ত্ব এসে জড়ো হয়, এবং যে অংশ মহত্তত্ত্বের দ্বারা আচ্ছাদিত হয়ে পড়ে তাকে বলা হয় জড় জগৎ। মহত্তত্ত্বের দ্বারা আচ্ছাদিত এই অংশটি সমগ্র চিন্ময় জগতের তুলনায় অত্যন্ত নগণ্য, অথচ সেই মহত্তত্ত্বের ভিতরেই অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ড রয়েছে। এই সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডগুলির উৎপত্তি হয় কারণোদকশায়ী বিষ্ণু বা মহাবিষ্ণু থেকে, যিনি কেবলমাত্র জড়া প্রকৃতির প্রতি দৃষ্টিপাতের মাধ্যমে এই জড় জগতকে সক্রিয় করেন।

শ্লোক ২

যস্যাম্ভসি শয়ানস্য যোগনিদ্রাং বিতন্বতঃ।
নাভিহ্রদাম্বুজাদাসীদ্‌ব্রহ্মা বিশ্বসৃজাং পতিঃ ॥ ২ ॥

যস্য—যাঁর; **অম্ভসি**—জলে; **শয়ানস্য**—শায়িত; **যোগনিদ্রাম্**—যোগনিদ্রায়; **বিতন্বতঃ**—বিস্তারিত; **নাভি**—নাভি; **হ্রদ**—সরোবর; **অম্বুজাৎ**—পদ্ম থেকে;

আসীৎ—প্রকাশিত হয়েছিল ; **ব্রহ্মা**—সমস্ত জীবের পিতামহ ব্রহ্মা ; **বিশ্ব**—বিশ্ব ; **সৃজাম্**—সৃষ্টিকারী ; **পতিঃ**—প্রভু।

অনুবাদ

পুরুষাবতারের এক অংশে গর্ভোদকে শয়ন করে যোগনিদ্রা বিস্তার করেন। তাঁর নাভি থেকে একটি পদ্ম বিকশিত হয় এবং সেই পদ্ম থেকেই প্রজাপতিদের পতি ব্রহ্মা জন্মগ্রহণ করেন।

তাৎপর্য

প্রথম পুরুষাবতার হচ্ছেন কারণোদকশায়ী বিষ্ণু। তাঁর রোমকূপ থেকে অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ডের প্রকাশ হয়। এই ব্রহ্মাণ্ডগুলির প্রতিটির ভিতর তিনি আবার গর্ভোদকশায়ী বিষ্ণুরূপে প্রবেশ করেন। ব্রহ্মাণ্ডের যে অর্ধাংশ তাঁর দেহ নির্গত স্বেদবিন্দুতে পূর্ণ হয়, সেখানে তিনি শয়ন করেন। এই গর্ভোদকশায়ী বিষ্ণুর নাভি-সরোবর থেকে একটি পদ্ম প্রকাশিত হয়, সেটি হচ্ছে সমস্ত জীব এবং ব্রহ্মাণ্ডের কার্যকলাপ পরিচালনকারী প্রজাপতিদের আদি পিতা ব্রহ্মার আবির্ভাব স্থান। সেই পদ্মের বোঁটায় রয়েছে চতুর্দশ ভুবন, এবং আমাদের এই ভূ-মণ্ডল তার মধ্যভাগে অবস্থিত। তার উর্ধ্বে রয়েছে উন্নত লোকসমূহ এবং সর্বোচ্চ লোক হচ্ছে ব্রহ্মলোক বা সত্যলোক। ভূ-মণ্ডলের নিচে রয়েছে সাতটি পাতাল লোক, সেখানে অসুর এবং এই ধরনের অন্যান্য জড় জীবেরা বাস করে।

গর্ভোদকশায়ী বিষ্ণু থেকে ক্ষীরোদকশায়ী বিষ্ণুর প্রকাশ হয়, যিনি হচ্ছেন সমস্ত জীবের পরমাত্মা। তাঁকে বলা হয় হরি এবং তাঁর থেকে এই ব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত অবতারদের প্রকাশ হয়।

এইভাবে তিনটি রূপে পুরুষাবতারের প্রকাশ হয়—প্রথমে কারণোদকশায়ী বিষ্ণু, যিনি মহত্তত্ত্ব আদি সমস্ত জড় উপাদানগুলি সৃষ্টি করেন, দ্বিতীয় হচ্ছেন গর্ভোদকশায়ী বিষ্ণু, যিনি প্রতিটি ব্রহ্মাণ্ডে প্রবেশ করেন এবং তৃতীয় হচ্ছেন ক্ষীরোদকশায়ী বিষ্ণু, যিনি সজীব অথবা নির্জীব সমস্ত জড় বস্তুরই পরমাত্মা। যিনি পরমেশ্বর ভগবানের এই রূপগুলি সম্বন্ধে অবগত তিনি ভগবানকে যথাযথভাবে জানেন এবং এইভাবে ভগবান সম্বন্ধে অবগত হয়ে জীব জন্ম-মৃত্যু-জরা-ব্যাধি সমন্বিত জড় জগতের বন্ধন থেকে মুক্ত হন, সে কথা *ভগবদ্গীতায়* প্রতিপন্ন হয়েছে। এই শ্লোকে মহাবিষ্ণু-তত্ত্ব সংক্ষেপে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। মহাবিষ্ণু তাঁর স্বতন্ত্র ইচ্ছার প্রভাবে চিদাকাশের এক অংশে শয়ন করেন। এইভাবে তিনি কারণ-সমুদ্রে শায়িত হন এবং সেখান থেকে তিনি জড়া প্রকৃতির প্রতি দৃষ্টিপাত করেন ও তার ফলে তৎক্ষণাৎ মহত্তত্ত্বের সৃষ্টি হয়। এইভাবে ভগবানের শক্তির দ্বারা সঞ্চালিত হয়ে জড়া প্রকৃতি তৎক্ষণাৎ অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করে, ঠিক যেমন একটি বৃক্ষ অসংখ্য সুপক্ব ফলের দ্বারা শোভিত হয়।

মালী মাটিতে গাছের বীজ বপন করে এবং যথাসময়ে গাছটি বর্ধিত হয়ে ফুলে-ফলে শোভিত হয়। কারণ ব্যতীত কোন কিছুই কার্যকরী হয় না। তাই এই সমুদ্রটির নাম 'কারণ-সমুদ্র' দেওয়া হয়েছে। এই কারণ-সমুদ্র থেকে সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড উদ্ভূত হয়েছে। মূর্খের মতো নাস্তিকদের সৃষ্টিতত্ত্ব বিশ্বাস করা উচিত নয়। এই নাস্তিকদের সম্বন্ধে *ভগবদ্গীতায়* বর্ণনা করা হয়েছে। তারা বিশ্বাস করে না যে কোনও সৃষ্টিকর্তা রয়েছে, অথচ সৃষ্টি-তত্ত্ব বিশ্লেষণ করে কোন যথার্থ যুক্তিও তারা উপস্থাপিত করতে পারে না। যেমন পুরুষের সংযোগ ব্যতিরেকে কোন স্ত্রী সন্তান উৎপাদন করতে পারে না, ঠিক তেমনই ভগবানের শক্তি ছাড়াও জড়া প্রকৃতির কোন কিছু সৃষ্টি করার ক্ষমতা নেই। পুরুষ গর্ভসঞ্চার করে এবং প্রকৃতি প্রসব করে। ছাগলের গলায় গলস্তন দেখতে যদিও স্তনের মতো, কিন্তু তা থেকে যেমন কখনও দুধ পাওয়া যায় না, তেমনই জড় পদার্থ থেকে কোন কিছুই সৃষ্টি হতে পারে না; আমাদের অবশ্যই পুরুষের শক্তিকে বিশ্বাস করতে হবে, যিনি প্রকৃতির গর্ভে বীজ সঞ্চার করেন। ভগবান যখন যোগনিদ্রায় শায়িত হলেন, তখন জড়া প্রকৃতি অসংখ্য ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করলেন। তারপর প্রতিটি ব্রহ্মাণ্ডে ভগবান গর্ভোদকশায়ী বিষ্ণুরূপে শায়িত হলেন। এইভাবে ভগবানের ইচ্ছার প্রভাবে বিভিন্ন গ্রহনক্ষত্র এবং উপাদান তৎক্ষণাৎ সৃষ্টি হল। ভগবান অনন্ত শক্তির অধীশ্বর, তাই যদিও তাঁর করণীয় কিছুই নেই, তবুও তিনি তাঁর ইচ্ছা অনুসারে নিখুঁত পরিকল্পনা সহকারে সব কিছুই করতে পারেন। ভগবানের সমান বা ভগবানের থেকে মহৎ কেউই নেই। সেটিই হচ্ছে বেদের সিদ্ধান্ত।

শ্লোক ৩

যস্যাবয়বসংস্থানৈঃ কল্পিতো লোকবিস্তরঃ।
তদ্বৈ ভগবতো রূপং বিশুদ্ধং সত্ত্বমূর্জিতম্ ॥ ৩ ॥

যস্য—যাঁর; **অবয়ব**—অবয়ব; **সংস্থানৈঃ**—অবস্থিত; **কল্পিতঃ**—কল্পিত; **লোক**—জীব অধ্যুষিত গ্রহ; **বিস্তরঃ**—বিস্তর; **তৎ বৈ**—কিন্তু তা; **ভগবতঃ**—পরমেশ্বর ভগবানের; **রূপম্**—রূপ; **বিশুদ্ধম্**—বিশুদ্ধ; **সত্ত্বম্**—অস্তিত্ব; **ঊর্জিতম্**—পরম উৎকর্ষ।

অনুবাদ

সমগ্র বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড পুরুষের বিরাট শরীরে অবস্থিত, কিন্তু তাঁর সৃষ্ট এই জড় উপাদানের সঙ্গে তাঁর কোনও সম্বন্ধ নেই। তাঁর শরীর পরম উৎকর্ষ সহকারে পরা-প্রকৃতিতে অবস্থিত।

তাৎপর্য

পরমেশ্বর ভগবানের বিরাট রূপ অথবা বিশ্বরূপের ধারণা নির্দিষ্ট হয়েছে বিশেষ করে কনিষ্ঠ অধিকারী ভক্তদের জন্য, যাদের পক্ষে ভগবানের দিব্য স্বরূপ হৃদয়ঙ্গম করা

অত্যন্ত কঠিন। তারা মনে করে যে, রূপ মানে হচ্ছে প্রাকৃত জগতের কোনও বস্তু। তাই প্রারম্ভিক স্তরে অদ্বয় তত্ত্ব সম্বন্ধে একটি বিপরীত ধারণার প্রয়োজন হয়ে পড়ে, যাতে তারা ভগবানের শক্তি বিস্তারের ধ্যানে মনকে নিবদ্ধ করতে পারে। পূর্বেই বলা হয়েছে যে, ভগবান মহত্তত্ত্বরূপে তাঁর শক্তি বিস্তার করেন, যা হচ্ছে সমস্ত জড় উপাদানের আধার। একদিক দিয়ে বিচার করলে স্বয়ং ভগবান এবং তাঁর শক্তি একই, কিন্তু তা সত্ত্বেও মহত্তত্ত্ব ভগবান থেকে ভিন্ন। তাই ভগবানের শক্তি বা ভগবান স্বয়ং একাধারে ভিন্ন এবং অভিন্ন। তাই বিশেষ করে নির্বিশেষবাদীদের জন্য বিরাট রূপের ধারণা ভগবানের নিত্য রূপ থেকে অভিন্ন। ভগবানের নিত্য বিগ্রহ মহত্তত্ত্বের সৃষ্টির পূর্বেও বর্তমান ছিল এবং তাই এখানে জোর দিয়ে বলা হয়েছে যে, ভগবানের নিত্য রূপ হচ্ছে জড়া প্রকৃতির অতীত পরম উৎকর্ষ সমন্বিত চিন্ময় রূপ। ভগবানের এই দিব্য রূপ তাঁর অন্তরঙ্গা প্রকৃতিতে প্রকাশিত হয় এবং তাঁর অসংখ্য অবতারসমূহ সর্বদাই সেই অপ্রাকৃত স্তরেই প্রকাশিত এবং তাঁরা কখনই মহত্তত্ত্বের দ্বারা প্রভাবিত নন।

শ্লোক ৪

পশ্যন্ত্যদো রূপমদভ্রচক্ষুষা সহস্রপাদোরুভুজাননাদ্ভুতম্।
সহস্রমূর্ধশ্রবণাক্ষিনাসিকং সহস্রমৌল্যম্বরকুণ্ডলোল্লসৎ ॥ ৪ ॥

পশ্যন্তি—দেখেন; **অদঃ**—পুরুষের রূপ; **রূপম্**—রূপ; **অদভ্র**—পূর্ণ; **চক্ষুষা**—চক্ষুর দ্বারা; **সহস্র-পাদ**—সহস্র পাদ; **উরু**—জঙ্ঘা; **ভুজ-আনন**—হস্ত এবং মুখ; **অদ্ভুতম্**—আশ্চর্যজনক; **সহস্র**—হাজার হাজার; **মূর্ধ**—মস্তক; **শ্রবণ**—কর্ণ; **অক্ষি**—আঁখি; **নাসিকম্**—নাসিকা; **সহস্র**—হাজার হাজার; **মৌলি**—মালিকা; **অম্বর**—পরনের পোশাক; **কুণ্ডল**—কুণ্ডল; **উল্লসৎ**—উদ্ভাসিত।

অনুবাদ

ভক্তরা তাঁদের বিজ্ঞান-চক্ষুর দ্বারা পরম চমৎকার অসংখ্য হস্ত-পদ-মুখ যুক্ত পুরুষের দিব্য রূপ দর্শন করেন। সেই শরীরে অসংখ্য মস্তক, কর্ণ, চক্ষু এবং নাসিকা রয়েছে। সেগুলি অসংখ্য মুকুট, উজ্জ্বল কুণ্ডল এবং মালিকার দ্বারা শোভিত।

তাৎপর্য

আমাদের জড় ইন্দ্রিয়ের দ্বারা আমরা অপ্রাকৃত রূপ দর্শন করতে পারি না। ভগবদ্ভক্তি অনুশীলনের ফলে যখন আমাদের ইন্দ্রিয়গুলি শুদ্ধ হয়, তখন ভগবান স্বয়ং আমাদের কাছে প্রকাশিত হন। *ভগবদ্গীতায়* বলা হয়েছে যে, ত্রিগুণাতীত ভগবানকে কেবল শুদ্ধ-ভক্তির মাধ্যমেই অনুভব করা যায়। তাই বেদেও প্রতিপন্ন হয়েছে, কেবল ভগবদ্ভক্তির মাধ্যমে জীব ভগবন্মুখী হয়। এবং ভগবদ্ভক্তির প্রভাবেই কেবল ভগবান

তাঁর হৃদয়ে প্রকাশিত হন। *ব্রহ্মসংহিতাতেও* বলা হয়েছে যে, প্রেমরূপী অঞ্জনের দ্বারা যাঁদের চক্ষু রঞ্জিত হয়েছে, সেই ভক্তরাই কেবল নিরন্তর ভগবানকে দর্শন করতে পারেন। তাই ভগবানের অপ্রাকৃত রূপের তত্ত্ব সেই মহান্ পুরুষদের কাছ থেকে গ্রহণ করতে হবে যাঁরা প্রেমরূপ অঞ্জনে রঞ্জিত চক্ষুর দ্বারা পরমেশ্বর ভগবানকে দর্শন করেছেন। এই জড় জগতেও আমরা আমাদের চক্ষুর দ্বারা সব সময় সব কিছু দর্শন করতে পারি না; অভিজ্ঞ ব্যক্তির অভিজ্ঞতার মাধ্যমে আমরা অনেক কিছু দর্শন করে থাকি। জড় বিষয়েই যদি আমাদের এইভাবে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করতে হয়, তা হলে চিন্ময় বিষয়ের ব্যাপারে তা আরও বেশি করে প্রয়োজন। তাই ধৈর্য এবং অধ্যবসায়ের মাধ্যমেই কেবল আমরা পরম সত্য এবং তাঁর বিভিন্ন রূপ সম্বন্ধে জানতে পারি; প্রাথমিক স্তরের পরমার্থবাদীদের কাছে তিনি নিরাকার হতে পারেন, কিন্তু তাঁর সুদক্ষ সেবকের কাছে তিনি তাঁর চিন্ময় রূপে প্রকাশিত।

শ্লোক ৫

এতন্নানাবতারাণাং নিধানং বীজমব্যয়ম্।
যস্যাংশাংশেন সৃজ্যন্তে দেবতির্যঙ্নরাদয়ঃ ॥ ৫ ॥

এতৎ—এই (রূপ); **নানা**—বিবিধ; **অবতারাণাম্**—অবতারদের; **নিধানম্**—উৎস; **বীজম্**—বীজ; **অব্যয়ম্**—অবিনশ্বর; **যস্য**—যাঁর; **অংশ**—অংশ; **অংশেন**—অংশের দ্বারা; **সৃজ্যন্তে**—সৃষ্টি করেন; **দেব**—দেবতা; **তির্যক্**—পশু; **নর-আদয়ঃ**—মনুষ্য আদি।

অনুবাদ

এই রূপ (দ্বিতীয় পুরুষাবতার) ব্রহ্মাণ্ডে প্রকাশিত অসংখ্য অবতারদের উৎস এবং অবিনশ্বর বীজ। এই রূপের অংশ এবং কলা থেকে দেবতা, মনুষ্য আদি বিভিন্ন জীবের সৃষ্টি হয়েছে।

তাৎপর্য

মহত্তত্ত্বে অসংখ্য ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করার পর পুরুষ দ্বিতীয় পুরুষ অবতার গর্ভোদকশায়ী বিষ্ণুরূপে প্রতিটি ব্রহ্মাণ্ডে প্রবেশ করেন। তিনি যখন দেখলেন যে, ব্রহ্মাণ্ডে কেবল অন্ধকার এবং শূন্যস্থান রয়েছে, কিন্তু বিশ্রাম করার কোন স্থান নেই, তখন তিনি ব্রহ্মাণ্ডের অর্ধাংশ তাঁর স্বেদবিন্দুর দ্বারা পূর্ণ করে সেই জলে শয়ন করলেন। এই জলকে বলা হয় গর্ভোদক। তারপর তাঁর নাভিপদ্ম থেকে একটি পদ্মের প্রকাশ হয়, এবং সেই পদ্মের মধ্যে এই ব্রহ্মাণ্ডের নির্মাতা ব্রহ্মার জন্ম হয়। ব্রহ্মা এই ব্রহ্মাণ্ডের নির্মাণ-কার্য সম্পাদন করেন, এবং ভগবান বিষ্ণুরূপে এই ব্রহ্মাণ্ড পালন করেন। প্রকৃতির রজোগুণে ব্রহ্মার উৎপত্তি হয়েছিল এবং বিষ্ণু হচ্ছেন সত্ত্বগুণের অধীশ্বর।

বিষ্ণু যেহেতু প্রকৃতির সমস্ত গুণের অতীত, তাই তিনি সর্বদাই এই জড় জগৎ সম্বন্ধে সম্পূর্ণ নিস্পৃহ। এই তত্ত্ব পূর্বেই বিশ্লেষিত হয়েছে। ব্রহ্মার থেকে রুদ্র (শিব) প্রকাশিত হন, যিনি হচ্ছেন তমোগুণের পরিচালক। ভগবানের ইচ্ছায় তিনি সমস্ত সৃষ্টি ধ্বংস করেন। তাই ব্রহ্মা, বিষ্ণু এবং শিব—এঁরা সকলেই গর্ভোদকশায়ী বিষ্ণুর অবতার। দক্ষ, মরীচি, মনু এবং এ রকম অনেক দেবতা ব্রহ্মাণ্ডে প্রজা সৃষ্টি করার জন্য আবির্ভূত হন। বেদে গর্ভস্তুতি মন্ত্রে এই গর্ভোদকশায়ী বিষ্ণুর মহিমা কীর্তিত হয়েছে, যার শুরুতে ভগবানের সহস্র মস্তকাদির কথা বর্ণনা করা হয়েছে। গর্ভোদকশায়ী বিষ্ণু হচ্ছেন ব্রহ্মাণ্ডের অধীশ্বর, এবং যদিও মনে হয় যে,তিনি এই ব্রহ্মাণ্ডে শায়িত রয়েছেন, তবুও সর্বদাই তিনি সমস্ত জড় গুণের অতীত। এই তত্ত্বও পূর্বে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। আবার গর্ভোদকশায়ী বিষ্ণুর অংশরূপ যে বিষ্ণু, তিনি হচ্ছেন সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডের পরমাত্মা। তিনি এই ব্রহ্মাণ্ডের পালনকর্তা বা ক্ষীরোদকশায়ী বিষ্ণু নামেও পরিচিত। এইভাবে আদি পুরুষের তিনটি রূপ সম্বন্ধে অবগত হওয়া যায়। এই ব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত অবতারেরা হচ্ছেন এই ক্ষীরোদকশায়ী বিষ্ণুর প্রকাশ।

বিভিন্ন কল্পে বিভিন্ন অবতারের প্রকাশ হয় এবং তাদের সংখ্যা অনন্ত, যদিও তাঁদের মধ্যে কয়েকজন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ; যেমন—মৎস্য, কূর্ম, বরাহ, রাম, নৃসিংহ, বামন এবং অন্য অনেক অবতার। এই সমস্ত অবতারদের বলা হয় লীলা-অবতার। তারপর ব্রহ্মা, বিষ্ণু এবং শিব অথবা রুদ্র আদি গুণাবতার রয়েছেন, যাঁরা জড়া প্রকৃতির বিভিন্ন গুণের অধ্যক্ষতা করেন।

শ্রীবিষ্ণু পরমেশ্বর ভগবান থেকে অভিন্ন। শিব পরমেশ্বর ভগবান এবং জীবের মধ্যবর্তী তটস্থ অবস্থায় রয়েছেন। ব্রহ্মা সর্বদাই জীবতত্ত্ব। সব চাইতে পুণ্যবান জীব অথবা ভগবানের কোনও মহান ভক্ত সৃষ্টিকার্য সাধন করার জন্য ভগবানের শক্তির দ্বারা আবিষ্ট হন, এবং তাঁকে বলা হয় ব্রহ্মা। তাঁর শক্তি অনেকটা মণি-মাণিক্যে প্রতিফলিত সূর্য-কিরণের মতো। যখন ব্রহ্মার পদ গ্রহণ করার মতো কোন জীব থাকে না, তখন ভগবান নিজেই ব্রহ্মার পদ গ্রহণ করেন।

শিব কোন সাধারণ জীব নন, তিনি ভগবানের অংশ। কিন্তু যেহেতু শিব সরাসরিভাবে জড়া প্রকৃতির সঙ্গে যুক্ত, তাই তিনি ঠিক বিষ্ণুর মতো পূর্ণরূপে গুণাতীত নন। তাঁদের মধ্যে পার্থক্য অনেকটা দুধ এবং দইয়ের মধ্যে পার্থক্যের মতো। দই দুধ ছাড়া আর কিছু নয়, তবুও তা দুধ নয়।

পরবর্তী অবতার হচ্ছেন মনু। ব্রহ্মার এক দিনে (যা আমাদের সৌর বৎসরের তুলনায় ৪৩,০০,০০০×১০০০ বৎসর) চৌদ্দজন মনুর আবির্ভাব হয়। সেই হিসাবে ব্রহ্মার এক মাসে ৪২০ জন মনুর আবির্ভাব হয় এবং এক বছরে ৫,০৪০ জন মনুর আবির্ভাব হয়। ব্রহ্মার আয়ু তাঁর সময়ের হিসাবে একশ' বছর এবং তাই ব্রহ্মার জীবনে ৫,০৪,০০০ মনুর আবির্ভাব হয়। অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ড রয়েছে এবং প্রতিটি

ব্রহ্মাণ্ডে একজন ব্রহ্মা রয়েছেন, এবং তাঁরা সকলেই পুরুষের নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসের সঙ্গে সৃষ্টি হন এবং বিনষ্ট হন। তাই আমরা সহজেই অনুমান করতে পারি যে, পুরুষের এক নিঃশ্বাসে কত কোটি মনু রয়েছেন।

এই ব্রহ্মাণ্ডে যে-সমস্ত মনু অত্যন্ত প্রসিদ্ধ, তাঁরা হচ্ছেন ঃ স্বায়ম্ভুব মনুরূপে যজ্ঞ, স্বারোচিষ মনুরূপে বিভু, উত্তম মনুরূপে সাত্যসেন, তামস মনুরূপে হরি, রৈবত মনুরূপে বৈকুণ্ঠ, চাক্ষুষ মনুরূপে অজিত, বৈবস্বত মনুরূপে বামন (বর্তমান মনু হচ্ছেন বৈবস্বত মনু), সাবর্ণি মনুরূপে সার্বভৌম, দক্ষসাবর্ণি মনুরূপে ঋষভ, ব্রহ্মসাবর্ণি মনুরূপে বিষ্বক্‌সেন, ধর্মসাবর্ণি মনুরূপে ধর্মসেতু, রুদ্রসাবর্ণি মনুরূপে সুধামা, দেবসাবর্ণি মনুরূপে যোগেশ্বর এবং ইন্দ্রসাবর্ণি মনুরূপে বৃহদ্‌ভানু। এইগুলি হচ্ছে ব্রহ্মার একদিনে, অর্থাৎ আমাদের সৌর বৎসরের হিসাবে ৪৩০,০০,০০,০০০ কোটি বছরে চৌদ্দজন মনুর নাম।

তারপর রয়েছেন যুগাবতারেরা। সত্য যুগ, ত্রেতা যুগ, দ্বাপর যুগ এবং কলি যুগ—এই চারটি যুগ রয়েছে এবং এই চারটি যুগের যুগাবতারের গায়ের রঙ যথাক্রমে শ্বেত, রক্ত, শ্যাম এবং পীত। দ্বাপর যুগে শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গকান্তি শ্যাম এবং কলিযুগে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর গায়ের রং পীত।

এইভাবে ভগবানের সমস্ত অবতারদের কথা শাস্ত্রে বর্ণিত হয়েছে। কোন ভণ্ডের অবতার সাজবার অবকাশ নেই, কেন না সমস্ত অবতারের উল্লেখ শাস্ত্রে থাকবেই। কোন অবতার নিজেকে ভগবানের অবতার বলে ঘোষণা করেন না, কিন্তু তত্ত্ব-জ্ঞানী মহর্ষিরা শাস্ত্রপ্রমাণের ভিত্তিতে অবতারের লক্ষণগুলি দেখতে পান। শাস্ত্রের মাধ্যমে তাঁরা অবতারের অবয়ব এবং কার্যকলাপ দর্শন করে অবতার চিনতে পারেন।

প্রত্যক্ষ অবতার ছাড়াও অসংখ্য শক্ত্যাবেশ অবতার রয়েছে। তাঁদের কথাও শাস্ত্রে উল্লেখ করা হয়েছে। এই ধরনের অবতারেরা প্রত্যক্ষভাবে এবং পরোক্ষভাবে ভগবানের শক্তির দ্বারা আবিষ্ট। যখন তাঁরা প্রত্যক্ষভাবে ভগবানের শক্তির দ্বারা আবিষ্ট হন তখন তাঁদের বলা হয় অবতার, কিন্তু যখন তাঁরা পরোক্ষভাবে ভগবানের শক্তির দ্বারা আবিষ্ট হন, তখন তাঁদের বলা হয় বিভূতি। প্রত্যক্ষভাবে আবিষ্ট অবতারেরা হচ্ছেন চতুঃসন, নারদ, পৃথু, শেষ, অনন্ত ইত্যাদি। ভগবদ্গীতার 'বিভূতি-যোগ' নামক দশম অধ্যায়ে ভগবানের বিভূতি সম্বন্ধে বিশদভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। এই সমস্ত অবতারদের উৎস হচ্ছেন গর্ভোদকশায়ী বিষ্ণু।

শ্লোক ৬

স এব প্রথমং দেবঃ কৌমারং সর্গমাশ্রিতঃ।
চচার দুশ্চরং ব্রহ্মা ব্রহ্মচর্যমখণ্ডিতম্ ॥ ৬ ॥

সঃ—সেই; **এব**—অবশ্যই; **প্রথমম্**—প্রথম; **দেবঃ**—পরমেশ্বর ভগবান; **কৌমারম্**—চার কুমার (চারজন নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী); **সর্গম্**—সৃষ্টি; **আশ্রিতঃ**—আশ্রয়ে; **চচার**—অনুষ্ঠান করেছিলেন; **দুশ্চরম্**—অত্যন্ত দুঃসাধ্য; **ব্রহ্মা**—ব্রহ্মা; **ব্রহ্মচর্যম্**—পরম ব্রহ্মকে জানবার পন্থা; **অখণ্ডিতম্**—অখণ্ড।

অনুবাদ

সৃষ্টির আদিতে প্রথমে ব্রহ্মার চারজন অবিবাহিত পুত্র (চতুঃসন বা কুমারেরা) ছিলেন, যাঁরা ব্রহ্মচর্য অবলম্বন করে পরম সত্যকে উপলব্ধি করার জন্য কঠোর তপস্যা করেছিলেন।

তাৎপর্য

একটি নির্দিষ্ট সময়ের ব্যবধানে এই জড় জগতের সৃষ্টি হয়, প্রতিপালন হয় এবং তারপর তা বিনাশপ্রাপ্ত হয়। তাই সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মার নামানুসারে সৃষ্টির বিভিন্ন নামকরণ হয়েছে। পূর্বোল্লিখিত চার কুমারেরা সৃষ্টির কৌমার অবস্থায় আবির্ভূত হন, এবং ব্রহ্ম-উপলব্ধির পন্থা শিক্ষা দেওয়ার জন্য তাঁরা ব্রহ্মচারীরূপে কঠোর তপশ্চর্যা পালন করেছিলেন। এই কুমারেরা হচ্ছেন ভগবানের শক্ত্যাবেশ অবতার। কঠোর নিয়ম-কানুন পালন করে তপস্যা শুরু করার আগে তাঁরা সকলেই সুযোগ্য ব্রাহ্মণ হয়েছিলেন। এই দৃষ্টান্ত থেকে বোঝা যায় যে, কেবল ব্রাহ্মণ পরিবারে জন্ম হলেই ব্রাহ্মণ হওয়া যায় না, ব্রাহ্মণের গুণাবলী অর্জন করলে তবেই ব্রাহ্মণ হওয়া যায়, এবং তারপরই কেবল ব্রহ্মোপলব্ধির পন্থা অবলম্বন করা সম্ভব।

শ্লোক ৭

দ্বিতীয়ং তু ভবায়াস্য রসাতলগতাং মহীম্।
উদ্ধরিষ্যন্নুপাদত্ত যজ্ঞেশঃ সৌকরং বপুঃ ॥ ৭ ॥

দ্বিতীয়ম্—দ্বিতীয়; **তু**—কিন্তু; **ভবায়**—মঙ্গলের জন্য; **অস্য**—এই পৃথিবীর; **রসাতল**—ব্রহ্মাণ্ডের নিম্নতম প্রদেশ; **গতাম্**—পতিত হয়ে; **মহীম্**—পৃথিবী; **উদ্ধরিষ্যন্**—উঠিয়ে; **উপাদত্ত**—স্থাপিত করেছিলেন; **যজ্ঞেশঃ**—পরম ঈশ্বর অথবা পরম ভোক্তা; **সৌকরম্**—শূকরের (বরাহ); **বপুঃ**—রূপ।

অনুবাদ

এই পৃথিবী যখন রসাতলে পতিত হয়েছিল, তখন এই বিশ্বের মঙ্গলের জন্য পৃথিবীকে উদ্ধার করতে ইচ্ছুক হয়ে সমস্ত যজ্ঞের পরম ভোক্তা যজ্ঞেশ্বর বিষ্ণু দ্বিতীয় অবতারে বরাহ রূপ ধারণ করেছিলেন।

তাৎপর্য

এখানে দেখানো হয়েছে যে, শাস্ত্রে পরমেশ্বর ভগবানের প্রতিটি অবতারের বিশেষ বিশেষ কার্যকলাপেরও উল্লেখ থাকে। কোন বিশেষ উদ্দেশ্য ব্যতীত ভগবান কখনও অবতরণ করেন না, এবং তাঁর সেই কার্যকলাপ সর্বদাই অসাধারণ। কোন জীবের পক্ষে সেই ধরনের কার্যকলাপ সম্পাদন করা সম্পূর্ণ অসম্ভব। বরাহ অবতারের উদ্দেশ্য ছিল রসাতল থেকে পৃথিবীকে উদ্ধার করা। নোংরা জায়গা থেকে কোন কিছু তোলা শূকরের কাজ, এবং সর্বশক্তিমান পরমেশ্বর ভগবান অদ্ভুত এই লীলা অসুরদের দেখিয়েছিলেন, যারা সেই নোংরা জায়গায় পৃথিবীকে লুকিয়ে রেখেছিল। পরমেশ্বর ভগবানের পক্ষে কোন কিছুই করা অসম্ভব নয়, এবং যদিও তিনি একটি শূকররূপে লীলাবিলাস করেছিলেন, তথাপি সর্বদাই তাঁর ভক্তদের দ্বারা আরাধিত হয়ে পরম দিব্য অবস্থায় অবস্থান করেন।

শ্লোক ৮

তৃতীয়মৃষিসর্গং বৈ দেবর্ষিত্বমুপেত্য সঃ।
তন্ত্রং সাত্বতমাচষ্ট নৈষ্কর্ম্যং কর্মণাং যতঃ ॥ ৮ ॥

তৃতীয়ম্—তৃতীয়; **ঋষি-সর্গম্**—ঋষিকল্পে; **বৈ**—অবশ্যই; **দেবর্ষিত্বম্**—দেবতাদের মধ্যে ঋষিরূপী অবতার; **উপেত্য**—স্বীকার করে; **সঃ**—তিনি; **তন্ত্রম্**—বেদের প্রকাশ; **সাত্বতম্**—যা বিশেষরূপে ভগবানের প্রেমময়ী সেবার উপায়; **আচষ্ট**—সংগৃহীত; **নৈষ্কর্ম্যম্**—ফলেচ্ছারহিত; **কর্মণাম্**—কর্মের; **যতঃ**—যা থেকে।

অনুবাদ

ঋষিকল্পে পরমেশ্বর ভগবান দেবর্ষি নারদরূপে তাঁর তৃতীয় শক্ত্যাবেশ অবতারে আবির্ভূত হন। বেদের যে সমস্ত বর্ণনা ভগবদ্ভক্তি এবং নিষ্কাম কর্ম সম্বন্ধে জীবকে অনুপ্রাণিত করে, তিনি সেগুলি সংকলন করেছিলেন।

তাৎপর্য

মহর্ষি নারদ, যিনি হচ্ছেন পরমেশ্বর ভগবানের শক্ত্যাবেশ অবতার, তিনি সমস্ত জগৎ জুড়ে ভগবদ্ভক্তির বাণী প্রচার করেন। সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডের বিভিন্ন গ্রহে বিভিন্ন ধরনের জীবেদের মধ্যে সমস্ত মহান্ ভক্তই হচ্ছেন তাঁর শিষ্য। *শ্রীমদ্ভাগবতের* প্রণেতা শ্রীল ব্যাসদেবও তাঁর শিষ্য। নারদ মুনি হচ্ছেন *নারদ-পঞ্চরাত্রের* প্রণেতা, যা হচ্ছে বেদে ভগবদ্ভক্তি-বিষয়ক বর্ণনার সংকলন। *নারদ-পঞ্চরাত্র* সকল কর্মীদের কর্মবন্ধন থেকে মুক্ত হওয়ার শিক্ষা দান করে। প্রায় সমস্ত বদ্ধ জীবেরাই সকাম কর্মের প্রতি আকৃষ্ট, কেন না তারা তাদের মাথার ঘাম পায়ে ফেলে তাদের জীবন উপভোগ করতে চায়।

সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডের প্রায় সব রকম প্রজাতিই সকাম কর্মী। সকাম কর্মে নানা রকম অর্থনৈতিক উন্নতির পরিকল্পনা থাকে। কিন্তু প্রকৃতির নিয়ম হচ্ছে যে,প্রতিটি ক্রিয়াই প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে এবং যে কোন কর্মের কর্তা সেই প্রতিক্রিয়ার বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে পড়ে। সেই প্রতিক্রিয়ার ফল কখনও ভাল, আবার কখনও মন্দ। ভাল কর্মের ফলে জড় জগতে আপেক্ষিক উন্নতি লাভ হয়, আর খারাপ কর্মের ফলে জড় জগতে আপেক্ষিক দুর্দশা ভোগ করতে হয়। তবে জড় জগতে জীবের অবস্থা, তা সে তথাকথিত সুখদায়কই হোক অথবা দুঃখদায়কই হোক, পরিণামে তা সবই দুঃখময়। মূর্খ জড়বাদীদের কোন ধারণাই নেই যে,জড় জগতের বন্ধন মুক্ত হয়ে কিভাবে নিত্য আনন্দ লাভ করা যেতে পারে। কিভাবে প্রকৃত আনন্দ লাভ করা যায়, শ্রীনারদ মুনি এই সমস্ত মূর্খ সকাম কর্মীদের সেই সম্বন্ধে নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি জড় জগতের রোগগ্রস্ত মানুষদের শিক্ষা দেন যে,কিভাবে জীব তার বর্তমান বৃত্তি অনুসারে পারমার্থিক জ্ঞান লাভের পথে অগ্রসর হতে পারে। অত্যধিক দুগ্ধজাত খাদ্য আহার করার ফলে যখন কেউ অজীর্ণ জনিত রোগ ভোগ করে, তখন ডাক্তার তাকে সেই রোগ নিরাময়ের জন্য দুগ্ধ থেকে জাত আরেকটি খাদ্য দই খেতে দেন। সুতরাং, রোগের কারণ এবং রোগ নিরাময়ের ঔষধ একই দ্রব্য থেকে উদ্ভূত হতে পারে, কিন্তু তা অবশ্যই নারদ মুনির মতো একজন সুদক্ষ চিকিৎসকের তত্ত্বাবধানে সম্পাদন হওয়া আবশ্যক। ভগবদ্গীতাতেও ভগবানকে কর্মফল অর্পণ করার মাধ্যমে ভগবানের সেবা করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। তা জীবকে নৈষ্কর্ম্য বা মুক্তির পথে পরিচালিত করে।

শ্লোক ৯

তুর্যে ধর্মকলাসর্গে নরনারায়ণাবৃষী।
ভূত্বাত্মোপশমোপেতমকরোৎ দুশ্চরং তপঃ ॥ ৯ ॥

তুর্যে—চতুর্থ অবতারে; **ধর্ম-কলা**—ধর্মরাজের পত্নী; **সর্গে**—জন্মগ্রহণ করে; **নর-নারায়ণৌ**—নর এবং নারায়ণ নামক; **ঋষী**—ঋষিগণ; **ভূত্বা**—ভূত হয়ে; **আত্ম-উপশম**—ইন্দ্রিয়গুলিকে নিয়ন্ত্রণ করে; **উপেতম্**—প্রাপ্ত হওয়ার জন্য; **অকরোৎ**—করেছিলেন; **দুশ্চরম্**—অত্যন্ত দুঃসাধ্য; **তপঃ**—তপশ্চর্যা।

অনুবাদ

চতুর্থ অবতারে ভগবান ধর্মরাজের পত্নীর গর্ভে নর এবং নারায়ণ নামক যমজ পুত্ররূপে আবির্ভূত হয়েছিলেন। তাঁরা ইন্দ্রিয়-সংযমের আদর্শ প্রদর্শন করার জন্য কঠোর তপস্যা করেছিলেন।

তাৎপর্য

মহারাজ ঋষভদেব তাঁর পুত্রদের উপদেশ দেন যে,তপস্যা, অর্থাৎ পরমতত্ত্বকে উপলব্ধি করার জন্য কষ্ট স্বীকার করাই হচ্ছে মানুষের একমাত্র কর্তব্য। আমাদের

শিক্ষা দান করার জন্য ভগবান স্বয়ং আচরণ করেছেন। আত্ম-বিস্মৃত জীবেদের প্রতি ভগবান অত্যন্ত কৃপালু। তাই সমস্ত বদ্ধ জীবদের তাঁর কাছে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য তিনি স্বয়ং অবতীর্ণ হয়ে প্রয়োজনীয় নির্দেশাদি প্রদান করেন এবং তাঁর সুযোগ্য সন্তানদের তাঁর প্রতিনিধিরূপে প্রেরণ করেন। আজ থেকে মাত্র ৫০৭ বছর পূর্বে সেই উদ্দেশ্য সাধন করার জন্য তিনি শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুরূপে আবির্ভূত হয়েছিলেন কলিযুগের অত্যন্ত অধঃপতিত মানুষদের উদ্ধার করার জন্য। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর অবতরণের কথা প্রায় সকলেরই মনে আছে। হিমালয় পর্বতে বদরিকাশ্রমে নর-নারায়ণ ঋষি এখনও পূজিত হন।

শ্লোক ১০

পঞ্চমঃ কপিলো নাম সিদ্ধেশঃ কালবিপ্লুতম্।
প্রোবাচাসুরয়ে সাংখ্যং তত্ত্বগ্রামবিনির্ণয়ম্॥ ১০॥

পঞ্চমঃ—পঞ্চম; **কপিলঃ**—কপিল; **নাম**—নামক; **সিদ্ধেশঃ**—সিদ্ধদের মধ্যে অগ্রগণ্য; **কাল**—কাল; **বিপ্লুতম্**—লুপ্ত; **প্রোবাচ**—বলেছিলেন; **আসুরয়ে**—আসুরি নামক ব্রাহ্মণকে; **সাংখ্যম্**—সাংখ্য শাস্ত্র; **তত্ত্ব-গ্রাম**—জড়-সৃষ্টির মৌলিক উপাদানের মোট সংখ্যা; **বিনির্ণয়ম্**—বিনির্ণীত।

অনুবাদ

পঞ্চম অবতারে তিনি ঋষিশ্রেষ্ঠ শ্রীকপিল নামে অবতরণ করেন। তিনি আসুরি নামক ব্রাহ্মণকে সৃষ্টির উপাদানসমূহ বিশ্লেষণ করে সাংখ্য দর্শন প্রদান করেন, কেন না কালের প্রভাবে সেই জ্ঞান লুপ্ত হয়ে গিয়েছিল।

তাৎপর্য

সৃষ্টির উপাদানগুলির মোট সংখ্যা হচ্ছে চব্বিশটি। তার প্রতিটি উপাদানই সাংখ্য দর্শনে বিশদভাবে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। পাশ্চাত্যের পণ্ডিতেরা এই সাংখ্য দর্শনকেই সাধারণত মেট্যাফিজিক্স্ বা অধিবিদ্যা বলে থাকেন। 'সাংখ্য' শব্দটির আক্ষরিক অর্থ হচ্ছে "যা অত্যন্ত সরলভাবে জড় উপাদানগুলি সম্বন্ধে বিশ্লেষণ করে।" এই দর্শন সর্বপ্রথম শ্রীকপিলদেব প্রদান করেন, এখানে যাঁকে ভগবানের পঞ্চম অবতার বলে বর্ণনা করা হয়েছে।

শ্লোক ১১

ষষ্ঠম্ অত্রেরপত্যত্বং বৃতঃ প্রাপ্তোঽনসূয়য়া।
আন্বীক্ষিকীমলর্কায় প্রহ্লাদাদিভ্য উচিবান্॥ ১১॥

ষষ্ঠম্—ষষ্ঠ ; **অত্রেঃ**—অত্রির ; **অপত্যত্বম্**—পুত্রত্ব ; **বৃতঃ**—প্রার্থিত ; **প্রাপ্তঃ**—প্রাপ্ত ; **অনসূয়য়া**—অনসূয়ার দ্বারা ; **আন্বীক্ষিকীম্**—আত্মতত্ত্ব-বিষয়ক ; **অলর্কায়**—অলর্ককে ; **প্রহ্লাদ-আদিভ্যঃ**—প্রহ্লাদ আদিকে ; **ঊচিবান্**—বলেছিলেন।

অনুবাদ

পরম পুরুষের ষষ্ঠ অবতার হচ্ছেন মহর্ষি অত্রির পুত্র ভগবান দত্তাত্রেয়। মাতা অনসূয়ার প্রার্থনায় তিনি তাঁর গর্ভে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তিনি অলর্ক, প্রহ্লাদ এবং অন্য অনেককে পারমার্থিক জ্ঞান দান করেছিলেন।

তাৎপর্য

ভগবান ঋষি অত্রি এবং অনসূয়ার পুত্র, দত্তাত্রেয়রূপে অবতীর্ণ হন। *ব্রহ্মাণ্ড পুরাণে* পতিব্রতা পত্নীর কথা প্রসঙ্গে দত্তাত্রেয়রূপে ভগবানের আবির্ভাবের ইতিহাস বর্ণিত হয়েছে। সেখানে বলা হয়েছে যে, ঋষি অত্রির পত্নী অনসূয়া ব্রহ্মা, বিষ্ণু এবং শিবের কাছে প্রার্থনা করেন, "হে প্রভুগণ, আপনারা যদি আমার প্রতি প্রসন্ন হয়ে থাকেন, এবং আপনারা যদি আমাকে আশীর্বাদ করতে চান, তা হলে আমি আপনাদের কাছে প্রার্থনা করি যে, আপনারা তিনজনে যেন একত্রিত হয়ে আমার পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করেন।" ব্রহ্মা, বিষ্ণু, এবং শিব তাতে সম্মত হয়েছিলেন, দত্তাত্রেয়রূপে ভগবান অলর্ক, প্রহ্লাদ, যদু, হৈহয় এবং আরও অনেককে আত্মতত্ত্ব-জ্ঞান দান করেন।

শ্লোক ১২

ততঃ সপ্তম আকূত্যাং রুচের্যজ্ঞোঽভ্যজায়ত।
স যামাদ্যৈঃ সুরগণৈরপাৎস্বায়ম্ভুবান্তরম্॥ ১২॥

ততঃ—তারপর ; **সপ্তমে**—সপ্তম ; **আকূত্যাম্**—আকূতির গর্ভে ; **রুচেঃ**—প্রজাপতি রুচির দ্বারা ; **যজ্ঞঃ**—যজ্ঞরূপে ভগবানের অবতার ; **অভ্যজায়ত**—আবির্ভূত হয়েছিলেন ; **সঃ**—তিনি ; **যাম-আদ্যৈঃ**—যাম আদির সঙ্গে ; **সুর-গণৈঃ**—দেবতাদের সঙ্গে ; **অপাৎ**—আধিপত্য করেছিলেন ; **স্বায়ম্ভুব-অন্তরম্**—স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরে।

অনুবাদ

সপ্তম অবতার হচ্ছেন প্রজাপতি রুচি ও তাঁর পত্নী আকূতির পুত্র যজ্ঞ। স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরে তিনি এই ব্রহ্মাণ্ড পালন করেছিলেন এবং তাঁর পুত্র যাম আদি দেবতারা তাঁকে সেই কার্যে সাহায্য করেছিলেন।

তাৎপর্য

এই জড় জগতের পরিচালনা করার অতি উচ্চ পদগুলি দান করা হয় অতি পুণ্যবান জীবদের। যখন সে রকম পুণ্যবান জীবের অভাব হয়, তখন ভগবান নিজেই ব্রহ্মা,

প্রজাপতি, ইন্দ্র আদি রূপে আবির্ভূত হন এবং পরিচালনার দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। স্বায়ম্ভুব মনুর সময় (বর্তমানে এই ব্রহ্মাণ্ড বৈবস্বত মনুর দ্বারা পরিচালিত হচ্ছে) ইন্দ্রের পদ অধিকার করার মতো কোন উপযুক্ত জীব না থাকায় ভগবান নিজেই ইন্দ্রের পদ গ্রহণ করেছিলেন। যাম আদি তাঁর পুত্র এবং অন্যান্য দেবতারা তখন তাঁকে সহায়তা করেছিলেন। ভগবান যজ্ঞ তখন ব্রহ্মাণ্ডের পরিচালনা করেছিলেন।

শ্লোক ১৩

অষ্টমে মেরুদেব্যাং তু নাভের্জাত উরুক্রমঃ।
দর্শয়ন্ বর্ত্ম ধীরাণাং সর্বাশ্রমনমস্কৃতম্ ॥ ১৩ ॥

অষ্টমে—অষ্টম অবতারে; **মেরুদেব্যাম্ তু**—মেরুদেবীর গর্ভে; **নাভেঃ**— মহারাজ নাভির দ্বারা; **জাতঃ**—জন্মগ্রহণ করেছিলেন; **উরুক্রমঃ**—সর্বশক্তিমান ভগবান; **দর্শয়ন্**—প্রদর্শন করে; **বর্ত্ম**—পথ; **ধীরাণাম্**—যথার্থ জ্ঞানীদের; **সর্ব**— সমস্ত; **আশ্রম**—জীবনের বিভিন্ন স্তর; **নমস্কৃতম্**—পূজিত।

অনুবাদ

ভগবানের অষ্টম অবতার হচ্ছেন মহারাজ নাভি ও তাঁর পত্নী মেরুদেবীর পুত্র মহারাজ ঋষভদেব। এই অবতারে ভগবান পূর্ণ সিদ্ধি লাভের পন্থা প্রদর্শন করেছিলেন, যে পন্থা সর্বতোভাবে জিতেন্দ্রিয় এবং সমস্ত বর্ণ ও আশ্রমের মানুষদের দ্বারা পূজিত পরমহংসেরা অবলম্বন করে থাকেন।

তাৎপর্য

মানব-সমাজকে প্রকৃতিগতভাবে চারটি বর্ণ এবং চারটি আশ্রমে বিভাগ করা হয়েছে। চারটি বর্ণ হচ্ছে মানুষের বৃত্তি অনুসারে চারটি বিভাগ এবং চারটি আশ্রম হচ্ছে চেতনার ক্রম বিকাশ অনুসারে চারটি বিভাগ। বৃত্তি অনুসারে চারটি বিভাগ হচ্ছে অত্যন্ত উন্নত বুদ্ধিমত্তাসম্পন্ন মানুষের স্তর বা ব্রাহ্মণ, পরিচালকবর্গ বা ক্ষত্রিয়, উৎপাদক ও ব্যবসায়ী সম্প্রদায় বা বৈশ্য এবং শ্রমিক সম্প্রদায় বা শূদ্র; এবং ব্রহ্মচর্য, গার্হস্থ্য, বানপ্রস্থ এবং সন্ন্যাস—এই চারটি বিভাগ হচ্ছে পারমার্থিক চেতনার উন্নতির পথে চারটি স্তর। তার মধ্যে সন্ন্যাস আশ্রম বা সর্বত্যাগীর জীবন হচ্ছে সর্বশ্রেষ্ঠ, তাই সন্ন্যাসীরা হচ্ছেন সমস্ত বর্ণ এবং আশ্রমের গুরু। সন্ন্যাস আশ্রমেও চারটি স্তর রয়েছে, সেগুলি হচ্ছে কুটীচক, বহূদক, পরিব্রাজকাচার্য এবং পরমহংস। পরমহংস স্তর হচ্ছে পূর্ণতার চরম স্তর এবং তাই পরমহংস সকলেরই পূজ্য। মহারাজ নাভি এবং মেরুদেবীর পুত্র মহারাজ ঋষভদেব ছিলেন পরমেশ্বর ভগবানের অবতার, এবং তিনি তাঁর পুত্রদের তপশ্চর্যা পালন করার মাধ্যমে চিত্তবৃত্তি সংশোধন করে নিত্য আনন্দে মগ্ন হওয়ার পন্থা সম্বন্ধে উপদেশ প্রদান করেছিলেন। প্রতিটি জীবই আনন্দের

অন্বেষণ করছে, কিন্তু কেউই জানে না অন্তহীন শাশ্বত আনন্দ কোথায় পাওয়া যায়। মূর্খ মানুষেরা জড় ইন্দ্রিয়-সুখভোগের মাধ্যমে আনন্দের অন্বেষণ করে, কিন্তু এই ধরনের মূর্খ মানুষেরা ভুলে যায় যে ইন্দ্রিয়-সুখ-তর্পণের মাধ্যমে লব্ধ এই অনিত্য সুখ কুকুর-বেড়ালেরাও উপভোগ করে। এই ইন্দ্রিয়-সুখ থেকে কোন পশু-পক্ষী বা কীট-পতঙ্গও বঞ্চিত নয়। সব রকমের জীবের মধ্যে এমন কি মনুষ্য জীবনেও এই ধরনের সুখ প্রচুর পরিমাণে লাভ করা যায়। কিন্তু এই ধরনের সস্তা সুখ উপভোগ করা মনুষ্য জীবনের উদ্দেশ্য নয়। মনুষ্য জীবনের উদ্দেশ্য হচ্ছে দিব্য-জ্ঞান লাভ করে নিত্য, শাশ্বত, অন্তহীন আনন্দ উপভোগ করা। এই দিব্য-জ্ঞান লাভ করা যায় তপশ্চর্যার মাধ্যমে। 'তপশ্চর্যা' কথাটির অর্থ হচ্ছে স্বতঃস্ফূর্তভাবে কষ্ট স্বীকার করা এবং জড় সুখভোগ থেকে বিরত হওয়া। যারা জড় সুখভোগ থেকে বিরত হওয়ার শিক্ষা লাভ করেছেন, তাঁদের বলা হয় 'ধীর' অর্থাৎ যিনি তাঁর ইন্দ্রিয়ের দ্বারা বিচলিত হন না। এই ধরনের ধীররাই কেবল সন্ন্যাস গ্রহণ করতে পারেন এবং তাঁরা ধীরে ধীরে পরমহংস স্তরে উন্নীত হতে পারেন, যে স্তর সমাজের সমস্ত মানুষের দ্বারা পূজিত হয়ে থাকে। মহারাজ ঋষভদেব এই পন্থা প্রদর্শন করে গিয়েছিলেন এবং তাঁর জীবনের চরম স্তরে তিনি জড় দেহের সমস্ত প্রয়োজনগুলি থেকে সম্পূর্ণভাবে মুক্ত হয়েছিলেন। এই স্তর অত্যন্ত উন্নত, এবং মূর্খের মতো তা অনুকরণ করার চেষ্টা করা উচিত নয়, পক্ষান্তরে শ্রদ্ধাবনত চিত্তে এই স্তরের মানুষদের পূজা করা উচিত।

শ্লোক ১৪

ঋষিভির্যাচিতো ভেজে নবমং পার্থিবং বপুঃ।
দুগ্ধেমামোষধীর্বিপ্রাস্তেনায়ং স উশত্তমঃ ॥ ১৪ ॥

ঋষিভিঃ—ঋষিদের দ্বারা; **যাচিতঃ**—প্রার্থিত হয়ে; **ভেজে**—স্বীকৃত; **নবমম্**—নবম; **পার্থিবম্**—পৃথিবীর রাজা; **বপুঃ**—শরীর; **দুগ্ধ**—দোহন করে; **ইমাম্**—এই সমস্ত; **ওষধীঃ**—পৃথিবী থেকে উৎপন্ন; **বিপ্রাঃ**—হে ব্রাহ্মণগণ; **তেন**—দ্বারা; **অয়ম্**—এই; **সঃ**—তিনি; **উশত্তমঃ**—কমনীয়তম।

অনুবাদ

হে বিপ্রগণ, ঋষিদের দ্বারা প্রার্থিত হয়ে নবম অবতারে ভগবান পৃথুরূপে রাজদেহ ধারণ করেছিলেন। এই পৃথিবীর ওষধীসমূহকে তিনি দোহন করেছিলেন। তাই পৃথিবী তখন পরম কমনীয় হয়ে উঠেছিল।

তাৎপর্য

মহারাজ পৃথুর আবির্ভাবের পূর্বে তাঁর পিতা বেনের অনাচারের ফলে সর্বত্র প্রচণ্ড বিশৃঙ্খলা দেখা দিয়েছিল। তখন সমাজের সমস্ত বুদ্ধিমান ও উচ্চশ্রেণীর মানুষেরা,

অর্থাৎ ঋষিরা এবং ব্রাহ্মণেরা ভগবানের কাছে প্রার্থনা করেছিলেন যে, তিনি যেন স্বয়ং আবির্ভূত হয়ে সেই অত্যাচারী রাজাকে সিংহাসনচ্যুত করেন; রাজার কর্তব্য হচ্ছে ধর্মপরায়ণ হওয়া এবং তাঁর প্রজাদের সর্বাঙ্গীণ মঙ্গলসাধন করা। যখনই রাজা তাঁর এই কর্তব্য-কর্ম সম্পাদনে অবহেলা করেন, তখন সমাজের বুদ্ধিমান মানুষদের কর্তব্য হচ্ছে তাঁকে সিংহাসনচ্যুত করা। সমাজের অতি উন্নত শ্রেণীর বুদ্ধিমত্তাসম্পন্ন মানুষেরা কিন্তু নিজেরা সিংহাসন অধিকার করে বসেন না, কেন না জনসাধারণের মঙ্গলের জন্য তাঁদের অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ কর্তব্য রয়েছে। রাজসিংহাসন অধিকার করার পরিবর্তে তাঁরা ভগবানকে অবতরণ করার জন্য প্রার্থনা করেছিলেন, এবং তাঁদের সেই প্রার্থনা শুনে ভগবান মহারাজ পৃথুরূপে আবির্ভূত হয়েছিলেন। যথার্থ বুদ্ধিমত্তাসম্পন্ন মানুষেরা অথবা বিচক্ষণ ব্রাহ্মণেরা কখনও রাজনৈতিক পদ প্রাপ্ত হওয়ার উচ্চাকাঙ্ক্ষা পোষণ করেন না। মহারাজ পৃথু পৃথিবীকে কর্ষণ করে বহু সম্পদ উৎপাদন করেছিলেন, এবং তাঁর মতো এক মহান রাজাকে পেয়ে প্রজারাই কেবল সুখী হয় নি, সেই সঙ্গে পৃথিবীও পরম কমনীয় রূপ ধারণ করেছিল।

শ্লোক ১৫

রূপং স জগৃহে মাৎস্যং চাক্ষুষোদধিসম্প্লবে।
নাব্যারোপ্য মহীময্যামপাদ্বৈবস্বতং মনুম্॥ ১৫ ॥

রূপম্—রূপ; **সঃ**—তিনি; **জগৃহে**—ধারণ করেছিলেন; **মাৎস্যম্**—মৎস্যের; **চাক্ষুষ**—চাক্ষুষ; **উদধি**—জল; **সম্প্লবে**—প্লাবন; **নাবি**—নৌকার উপর; **আরোপ্য**—রেখে; **মহী**—পৃথিবী; **ময্যাম্**—নিমজ্জিত ছিল; **অপাৎ**—রক্ষিত; **বৈবস্বতম্**—বৈবস্বত; **মনুম্**—মানবকুলের পিতা মনু।

অনুবাদ

চাক্ষুষ মন্বন্তরে যখন মহাপ্লাবন হয় এবং সমস্ত পৃথিবী জলের অতল তলে নিমজ্জিত হয়, তখন ভগবান মৎস্যরূপ ধারণ করে বৈবস্বত মনুকে একটি নৌকার উপর রেখে তাঁকে রক্ষা করেছিলেন।

তাৎপর্য

শ্রীমদ্ভাগবতের আদি ভাষ্যকার শ্রীপাদ শ্রীধর স্বামী বলেছেন যে, প্রত্যেক মনুর অবসানে প্রলয় হয় না। তবে চাক্ষুষ মনুর অবসানে এই প্রলয় হয়েছিল, মহারাজ সত্যব্রতকে কিছু অদ্ভুত কার্যকলাপ প্রদর্শন করবার জন্য। কিন্তু শ্রীজীব গোস্বামী বিষ্ণু-ধর্মোত্তর, মার্কণ্ডেয় পুরাণ, হরিবংশ ইত্যাদি শাস্ত্র থেকে প্রমাণ করে গেছেন যে, প্রত্যেক মনুর অবসানেই প্রলয় হয়। শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুরও শ্রীজীব গোস্বামীকে সমর্থন করেছেন এবং তিনি ভাগবতামৃত থেকে প্রত্যেক মনুর অবসানে

প্লাবন হওয়ার কথা উল্লেখ করেছেন। এ ছাড়া পরমেশ্বর ভগবান তাঁর ভক্ত সত্যব্রতের প্রতি বিশেষ কৃপা প্রদর্শন করার জন্য সেই বিশেষ কল্পে অবতরণ করেছিলেন।

শ্লোক ১৬

সুরাসুরাণামুদধিং মথতাং মন্দরাচলম্।
দধ্রে কমঠরূপেণ পৃষ্ঠ একাদশে বিভুঃ ॥ ১৬ ॥

সুর—ভগবৎ-বিশ্বাসী ভক্তগণ; **অসুরাণাম্**—ভগবদ্বিদ্বেষী নাস্তিকদের; **উদধিম্**—সমুদ্রে; **মথতাম্**—মন্থনকারী; **মন্দরাচলম্**—মন্দরাচল পর্বত; **দধ্রে**—ধারণ করেছিলেন; **কমঠ**—কূর্ম; **রূপেণ**—রূপে; **পৃষ্ঠে**—পৃষ্ঠে; **একাদশে**—একাদশ অবতারে; **বিভুঃ**—মহান।

অনুবাদ

একাদশ অবতারে ভগবান কূর্মরূপ পরিগ্রহ করে তাঁর পৃষ্ঠে মন্দরাচল পর্বতকে ধারণ করেছিলেন, যা সমুদ্র-মন্থনকারী দেবতা এবং দানবেরা মন্থন-দণ্ডরূপে ব্যবহার করেছিল।

তাৎপর্য

এক সময় দেবতা এবং অসুরেরা অমর হওয়ার জন্য অমৃত লাভের আশায় সমুদ্র মন্থন করেছিল। সেই সময় তারা মন্দরাচল পর্বতকে মন্থনদণ্ডরূপে ব্যবহার করছিল, এবং ভগবান তখন কূর্মরূপ পরিগ্রহ করে সমুদ্রগর্ভে তাঁর পৃষ্ঠে সেই পর্বতকে ধারণ করেছিলেন।

শ্লোক ১৭

ধান্বন্তরং দ্বাদশমং ত্রয়োদশমমেব চ।
অপায়য়ৎ সুরানন্যান্মোহিন্যা মোহয়ন্ স্ত্রিয়া ॥ ১৭ ॥

ধান্বন্তরম্—ধন্বন্তরি নামক ভগবানের অবতার; **দ্বাদশমম্**—দ্বাদশ; **ত্রয়ো-দশমম্**—ত্রয়োদশ; **এব**—অবশ্যই; **চ**—এবং; **অপায়য়ৎ**—পান করতে দিয়েছিলেন; **সুরান্**—দেবতাদের; **অন্যান্**—অন্যদের; **মোহিন্যা**—মোহিনী রূপের দ্বারা; **মোহয়ন্**—প্রলুব্ধ; **স্ত্রিয়া**—স্ত্রীরূপে।

অনুবাদ

দ্বাদশ অবতারে ভগবান ধন্বন্তরিরূপে আবির্ভূত হয়েছিলেন, এবং ত্রয়োদশ অবতারে তিনি মোহিনীরূপে অসুরদের সম্মোহিত করে দেবতাদের অমৃত পান করতে দিয়েছিলেন।

শ্লোক ১৮

চতুর্দশং নারসিংহং বিভ্রদ্দৈত্যেন্দ্রমূর্জিতম্ ।
দদার করজৈরূরাবেরকাং কটকৃদ্যথা ॥ ১৮ ॥

চতুর্দশম্—চতুর্দশ; **নারসিংহম্**—ভগবানের অর্ধ নর ও অর্ধ সিংহরূপ অবতার; **বিভ্রৎ**—আবির্ভূত হয়েছিলেন; **দৈত্যেন্দ্রম্**—দৈত্যদের রাজা; **ঊর্জিতম্**—দৃঢ়ভাবে নির্মিত; **দদার**—বিদীর্ণ করেছিলেন; **করজৈঃ**—নখের দ্বারা; **ঊরৌ**—ঊরুতে; **এরকাম্**—তৃণবিশেষ; **কট-কৃৎ**—সূত্রধর; **যথা**—যেমন।

অনুবাদ

চতুর্দশ অবতারে ভগবান নৃসিংহরূপে আবির্ভূত হয়ে তাঁর নখের দ্বারা দৈত্যরাজ হিরণ্যকশিপুর সুদৃঢ় শরীর বিদীর্ণ করেছিলেন, ঠিক যেভাবে একজন সূত্রধর এরকা তৃণ বিদীর্ণ করে।

শ্লোক ১৯

পঞ্চদশং বামনকং কৃত্বাগাদধ্বরং বলেঃ ।
পদত্রয়ং যাচমানঃ প্রত্যাদিৎসুস্ত্রিপিষ্টপম্ ॥ ১৯ ॥

পঞ্চদশম্—পঞ্চদশ; **বামনকম্**—বামন; **কৃত্বা**—ধারণ করে; **অগাৎ**—গিয়েছিলেন; **অধ্বরম্**—যজ্ঞ-স্থানে; **বলেঃ**—বলী মহারাজের; **পদ-ত্রয়ম্**—কেবল ত্রিপাদ ভূমি; **যাচমানঃ**—ভিক্ষা করে; **প্রত্যাদিৎসুঃ**—ফিরিয়ে দেওয়ার ইচ্ছায়; **ত্রি-পিষ্টপম্**—ত্রিভুবন।

অনুবাদ

পঞ্চদশ অবতারে ভগবান বামনরূপ ধারণ করে দৈত্যরাজ বলির যজ্ঞস্থানে গমন করেছিলেন। যদিও তিনি দেবতাদের কাছে ফিরিয়ে দেওয়ার জন্য ত্রিভুবন অধিকার করতে যাচ্ছিলেন, কিন্তু তবুও তিনি কেবল ত্রিপাদ ভূমি ভিক্ষা করেছিলেন।

তাৎপর্য

সর্বশক্তিমান ভগবান ইচ্ছা করলে যে কোন ব্যক্তিকে সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডের সার্বভৌমত্ব দান করতে পারেন, এবং তেমনই তিনি ইচ্ছা করলে ছোট্ট একখণ্ড ভূমি ভিক্ষা করার অছিলায় সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডের আধিপত্য ছিনিয়ে নিতে পারেন।

শ্লোক ২০

অবতারে ষোড়শমে পশ্যন্ ব্রহ্মদ্রুহো নৃপান্।
ত্রিঃসপ্তকৃত্বঃ কুপিতো নিঃক্ষত্রামকরোন্মহীম্ ॥ ২০ ॥

অবতারে—ভগবানের অবতারে; **ষোড়শমে**—ষোড়শ; **পশ্যন্**—দেখে; **ব্রহ্ম-দ্রুহঃ**—ধর্মাচার-পরাঙ্মুখ দেব-দ্বিজ বিরোধী; **নৃপান্**—নৃপতিবর্গ; **ত্রিঃ-সপ্ত**—একুশ-বার; **কৃত্বঃ**—করেছিলেন; **কুপিতঃ**—ক্রুদ্ধ হয়ে; **নিঃ**—বিনাশ; **ক্ষত্রাম্**—ক্ষত্রিয়দের; **অকরোৎ**—করেছিলেন; **মহীম্**—পৃথিবী।

অনুবাদ

ষোড়শ অবতারে ভগবান ভৃগুপতিরূপে অবতীর্ণ হয়ে ক্ষত্রিয় রাজাদের দেব-দ্বিজ বিদ্বেষী দেখে তাদের প্রতি ক্রুদ্ধ হয়ে পৃথিবীকে একুশবার ক্ষত্রিয়শূন্য করেছিলেন।

তাৎপর্য

ক্ষত্রিয় বা সমাজের পরিচালকবর্গের কর্তব্য হচ্ছে ব্রাহ্মণ বা তত্ত্বজ্ঞানী পুরুষদের নির্দেশ অনুসারে পৃথিবীকে পরিচালনা করা। ব্রাহ্মণেরা শাস্ত্রের নির্দেশ অনুসারে রাজন্যবর্গকে উপদেশ দান করেন এবং তাঁদের উপদেশ অনুসারে রাজন্যবর্গ পৃথিবীকে পরিচালনা করেন। যখন ক্ষত্রিয়েরা ব্রাহ্মণদের নির্দেশ অমান্য করে, তখন বলপূর্বক তাদের অপসারিত করা হয় এবং যোগ্যতর শাসন-ব্যবস্থার আয়োজন করা হয়।

শ্লোক ২১

ততঃ সপ্তদশে জাতঃ সত্যবত্যাং পরাশরাৎ।
চক্রে বেদতরোঃ শাখা দৃষ্ট্বা পুংসোঽল্পমেধসঃ ॥ ২১ ॥

ততঃ—তারপর; **সপ্তদশে**—সপ্তদশ অবতারে; **জাতঃ**—আবির্ভূত হয়েছিলেন; **সত্যবত্যাম্**—সত্যবতীর গর্ভে; **পরাশরাৎ**—পরাশর মুনির দ্বারা; **চক্রে**—প্রস্তুত করেছিলেন; **বেদ-তরোঃ**—বৈদিক কল্পবৃক্ষের; **শাখাঃ**—শাখাসমূহ; **দৃষ্ট্বা**—দর্শন করে; **পুংসঃ**—জনসাধারণ; **অল্পমেধসঃ**—অল্পবুদ্ধিসম্পন্ন।

অনুবাদ

তারপর সপ্তদশ অবতারে ভগবান শ্রীব্যাসদেবরূপে পরাশর মুনির পত্নী সত্যবতীর গর্ভে আবির্ভূত হন। মানবকুলের ভিতর বুদ্ধিমত্তার স্বল্পতা দর্শন করে তিনি তাদের কল্যাণের জন্য বেদবৃক্ষের বিভিন্ন শাখা-প্রশাখা বিস্তার করেছিলেন।

তাৎপর্য

মূল বেদ একটি। কিন্তু শ্রীল ব্যাসদেব সেই মৌলিক বেদকে চারটি ভাগে বিভক্ত করেন। যথা—সাম, ঋক্‌, যজুঃ, অথর্ব এবং তারপর আবার তিনি পুরাণ এবং মহাভারত আদি বিভিন্ন শাখায় তাদের ব্যাখ্যা করেন। বেদের ভাষা এবং বেদের বিষয়বস্তু সাধারণ মানুষের পক্ষে হৃদয়ঙ্গম করা অত্যন্ত কঠিন। তা কেবল অত্যন্ত উন্নত বুদ্ধিমত্তাসম্পন্ন আত্মজ্ঞানী ব্রাহ্মণেরাই হৃদয়ঙ্গম করতে পারেন। কিন্তু এই কলিযুগের অধিকাংশ মানুষই অত্যন্ত মূর্খ। এমন কি ব্রাহ্মণ কুলোদ্ভূত মানুষেরাও স্ত্রী এবং শূদ্রের মতো অল্পবুদ্ধিসম্পন্ন। দ্বিজ অর্থাৎ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্যরা সাধারণত সংস্কারের মাধ্যমে চেতনার বিকাশ করে থাকে, কিন্তু এই যুগের অত্যন্ত কলুষিত প্রভাবের ফলে তথাকথিত ব্রাহ্মণ কুলোদ্ভূত মানুষেরা এবং উচ্চবর্ণের মানুষেরাও উন্নত সংস্কৃতিসম্পন্ন নয়। তাদের বলা হয় দ্বিজবন্ধু, অর্থাৎ দ্বিজ-কুলোদ্ভূত হলেও দ্বিজগুণসম্পন্ন নয়। এই দ্বিজবন্ধুদের স্ত্রী এবং শূদ্রের সমপর্যায়ভুক্ত বলে গণ্য করা হয়। শ্রীল ব্যাসদেব বেদকে বিভিন্ন শাখা এবং উপশাখায় বিভক্ত করেছিলেন, যাতে অল্পবুদ্ধিসম্পন্ন স্ত্রী, শূদ্র এবং দ্বিজবন্ধুদের কাছে বেদের যথার্থ তাৎপর্য সহজবোধ্য হয়।

শ্লোক ২২

নরদেবত্বমাপন্নঃ সুরকার্যচিকীর্ষয়া।
সমুদ্রনিগ্রহাদীনি চক্রে বীর্যাণ্যতঃ পরম্‌ ॥ ২২ ॥

নর—মানুষ; **দেবত্বম্‌**—দেবত্ব; **আপন্নঃ**—রূপ ধারণ করে; **সুর**—দেবতারা; **কার্য**—কার্যকলাপ; **চিকীর্ষয়া**—সম্পন্ন করার উদ্দেশ্যে; **সমুদ্র**—ভারত মহাসাগর; **নিগ্রহ-আদীনি**—নিয়ন্ত্রণ আদি; **চক্রে**—সম্পাদন করেছিলেন; **বীর্যাণি**—অলৌকিক শক্তি; **অতঃ পরম্‌**—তারপর।

অনুবাদ

অষ্টাদশ অবতারে ভগবান শ্রীরামচন্দ্ররূপে আবির্ভূত হয়েছিলেন। দেবতাদের অভীষ্ট সিদ্ধির জন্য তিনি সেতুবন্ধন তথা রাবণ-বধ আদি কার্য সম্পাদন করে তাঁর অলৌকিক শক্তি প্রদর্শন করেছিলেন।

তাৎপর্য

পরমেশ্বর ভগবান শ্রীরামচন্দ্র এই ধরাধামে প্রকট হয়েছিলেন। তিনি ব্রহ্মাণ্ডের নিয়ম-শৃঙ্খলা রক্ষার অধিকর্তা বিভিন্ন দেব-দেবীর প্রসন্নতা উৎপাদনকারী বহু অলৌকিক লীলা সম্পাদন করেছিলেন। কখনও কখনও রাবণ, হিরণ্যকশিপু আদি

ভগবৎ-বিদ্বেষী রাক্ষস এবং দৈত্যরা জড়-বিজ্ঞানের প্রগতির মাধ্যমে প্রভূত জাগতিক উন্নতি সাধন করে অত্যন্ত প্রসিদ্ধ হয়, এবং পরমেশ্বর ভগবানের আধিপত্যকে অবজ্ঞা করে। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায়, জড় উপায়ের দ্বারা অন্যান্য গ্রহে যাওয়ার প্রচেষ্টা প্রতিষ্ঠিত নিয়মের বিরুদ্ধাচরণ। বিভিন্ন গ্রহের পৃথক পৃথক অবস্থা রয়েছে এবং ভগবানের নিয়ম অনুসারে বিভিন্ন বর্ণের জীব বিভিন্ন প্রয়োজন সম্পাদন করার জন্য সেখানে রয়েছে। কিন্তু অতি ক্ষুদ্র জড়-জাগতিক সাফল্যের গর্বে গর্বিত হয়ে ভগবদ্বিমুখ জড়বাদীরা কখনও কখনও ভগবানের অস্তিত্ব অস্বীকার করে। রাবণ ছিল তাদের একজন, এবং সে যোগ্যতার কথা বিবেচনা না করে সকলের স্বর্গে যাওয়ার জন্য জড় উপায়ে একটি সিঁড়ি তৈরি করতে চেয়েছিল। সে সরাসরি স্বর্গে যাওয়ার এমন একটি সিঁড়ি তৈরি করতে চেয়েছিল, যাতে মানুষ পুণ্যকর্ম না করেই স্বর্গে চলে যেতে পারে। সে ভগবানের নিয়মের বিরুদ্ধাচরণ করে আরও অনেক কিছু করতে চেয়েছিল। সে পরমেশ্বর ভগবান শ্রীরামচন্দ্রের ঈশ্বরত্ব অস্বীকার করেছিল এবং তাঁর পত্নী সীতাদেবীকে অপহরণ করেছিল। রামচন্দ্র দেবতাদের প্রার্থনা অনুসারে এই রাক্ষসকে দণ্ডদান করার জন্য এই ধরাধামে অবতীর্ণ হয়েছিলেন। তিনি রাবণের এই বিরুদ্ধাচরণের উপযুক্ত শাস্তি দিয়েছিলেন, যা বিস্তারিতভাবে রামায়ণে বর্ণিত হয়েছে। শ্রীরামচন্দ্র যেহেতু ছিলেন পরমেশ্বর ভগবান, তাই তিনি নানা রকম অলৌকিক কার্যকলাপ প্রদর্শন করেছিলেন, যা রাবণের মতো জড় বিষয়ে উন্নত রাক্ষসেরা কখনও সম্পাদন করতে পারে না। শ্রীরামচন্দ্র ভাসমান শিলার দ্বারা ভারত মহাসাগরের বুকে এক সেতু নির্মাণ করেছিলেন। আধুনিক বৈজ্ঞানিকেরা বস্তুর ভারহীনতা সম্বন্ধে নানা গবেষণা করছে, কিন্তু কখনও কোন অবস্থাতেই ভারহীনতা সম্ভব নয়। কিন্তু ভগবান তাঁর সৃষ্টির সর্বত্র বিরাট বিরাট সমস্ত গ্রহগুলিকে ভারহীন করে মহাশূন্যে ভাসিয়ে রেখেছেন। তিনি এই পৃথিবীতেও পাথরকে ভারহীন করে উদ্বেলিত মহাসাগরের বুকে স্তম্ভহীন প্রস্তরসেতু নির্মাণ করেছিলেন। সেটিই হচ্ছে ভগবানের শক্তির প্রকাশ।

শ্লোক ২৩

একোনবিংশে বিংশতিমে বৃষ্ণিষু প্রাপ্য জন্মনী।
রামকৃষ্ণাবিতি ভুবো ভগবানহরদ্ভরম্ ॥ ২৩ ॥

একোনবিংশে—ঊনবিংশতিতে; **বিংশতিমে**—বিংশতিতেও; **বৃষ্ণিষু**—বৃষ্ণিকুলে; **প্রাপ্য**—প্রাপ্ত হয়ে; **জন্মনী**—জন্ম; **রাম**—বলরাম; **কৃষ্ণৌ**—শ্রীকৃষ্ণ; **ইতি**—এই-ভাবে; **ভুবঃ**—পৃথিবীর; **ভগবান্**—পরমেশ্বর ভগবান; **অহরৎ**—দূর করেছিলেন; **ভরম্**—ভার।

অনুবাদ

ঊনবিংশতি এবং বিংশতি অবতরণে পরমেশ্বর ভগবান শ্রীবলরাম এবং শ্রীকৃষ্ণরূপে বৃষ্ণিকুলে (যদু-বংশে) আবির্ভূত হয়ে পৃথিবীর ভার গ্রহণ করেছিলেন।

তাৎপর্য

এই শ্লোকটিতে বিশেষভাবে 'ভগবান' শব্দটির ব্যবহার এই ইঙ্গিত করছে যে, বলরাম এবং শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন ভগবানের মুখ্য রূপ। পরে তা আরও বিশেষভাবে বিশ্লেষণ করা হবে। এই অধ্যায়ের শুরু থেকে আমরা যা জানতে পেরেছি—শ্রীকৃষ্ণ পুরুষের অবতার নন, তিনি হচ্ছেন সমস্ত অবতারের অবতারী পরমেশ্বর ভগবান, এবং বলরাম হচ্ছেন তাঁর প্রথম অংশ-প্রকাশ। বলরামের থেকে আদি চতুর্ব্যূহ বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ, অনিরুদ্ধ এবং প্রদ্যুম্নের প্রকাশ হয়। শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন বাসুদেব এবং বলদেব হচ্ছেন সঙ্কর্ষণ।

শ্লোক ২৪

ততঃ কলৌ সম্প্রবৃত্তে সম্মোহায় সুরদ্বিষাম্ ।
বুদ্ধো নাম্নাঞ্জনসুতঃ কীকটেষু ভবিষ্যতি ॥ ২৪ ॥

ততঃ—তারপর; **কলৌ**—কলিযুগে; **সম্প্রবৃত্তে**—আসার পর; **সম্মোহায়**—সম্মোহিত করার উদ্দেশ্যে; **সুর**—আস্তিক; **দ্বিষাম্**—ঈর্ষাপরায়ণ; **বুদ্ধঃ**—ভগবান বুদ্ধদেব; **নাম্না**—নামক; **অঞ্জন-সুতঃ**—অঞ্জনার পুত্র; **কীকটেষু**—বিহারের গয়া প্রদেশ; **ভবিষ্যতি**—হবে।

অনুবাদ

তারপর কলিযুগের প্রারম্ভে ভগবান ভগবদ্বিদ্বেষী নাস্তিকদের সম্মোহিত করার জন্য বুদ্ধদেব নামে গয়া প্রদেশে অঞ্জনার পুত্ররূপে আবির্ভূত হবেন।

তাৎপর্য

ভগবানের শক্ত্যাবেশ অবতার বুদ্ধদেব অঞ্জনার পুত্ররূপে গয়া প্রদেশে আবির্ভূত হয়েছিলেন। তিনি অহিংসার বাণী প্রচার করেন এবং বেদ-বিহিত পশুবলিরও নিন্দা করেন। বুদ্ধদেব যখন আবির্ভূত হয়েছিলেন, তখন মানুষ অত্যন্ত নাস্তিক হয়ে গিয়েছিল। তারা মাংসাহার-প্রিয় এবং বৈদিক যজ্ঞের নামে সব জায়গাই কসাইখানাতে পরিণত হয়েছিল। তখন অবৈধভাবে অসংখ্য পশুবলি হচ্ছিল। নিরীহ পশুদের প্রতি সদয় হয়ে ভগবান তখন শ্রীবুদ্ধদেবরূপে অহিংসার বাণী প্রচার করেছিলেন। তিনি প্রচার করেছিলেন যে, তিনি বৈদিক নির্দেশ মানেন না এবং পশুহত্যার ফলে মনোবৃত্তি যে কিভাবে কলুষিত হয়ে যায়, সে কথা তিনি মানুষদের

বুঝিয়েছিলেন। ভগবত্তত্ত্বজ্ঞানরহিত কলিযুগের অল্পবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষেরা তাঁর সেই তত্ত্ব অনুসরণ করেছিল এবং নীতিবোধ ও অহিংসা সম্বন্ধে শিক্ষালাভ করে ভগবৎ-উপলব্ধির পথে অগ্রসর হওয়ার প্রাথমিক যোগ্যতা অর্জন করেছিল। তিনি এইভাবে ভগবত্তত্ত্বজ্ঞানবিহীন নাস্তিকদের বিমোহিত করেছিলেন। এই সমস্ত নাস্তিকেরা, যারা তাঁকে অনুসরণ করেছিল তারা ভগবানকে মানত না, কিন্তু তারা তাঁকে পূর্ণরূপে মেনেছিল এবং তাঁর প্রতি শ্রদ্ধাযুক্ত হয়েছিল, যিনি নিজেই ছিলেন ভগবানের অবতার। এইভাবে বুদ্ধরূপে তিনি অবিশ্বাসী নাস্তিকদের আস্তিকে পরিণত করেছিলেন। সেটিই হচ্ছে বুদ্ধদেবের দয়াঃ তিনি নাস্তিকদের আস্তিকে পরিণত করেছিলেন।

বুদ্ধদেবের আবির্ভাবের পূর্বে পশুবলিই ছিল সমাজের সব চাইতে লক্ষণীয় আচরণ। লোকেরা দাবি করত যে, বৈদিক নির্দেশ অনুসারে সেই সমস্ত পশু বলি হচ্ছে। আদর্শ পরম্পরার মাধ্যমে বৈদিক জ্ঞান লাভ না হলে বেদের অনিয়মিত পাঠক তার আলঙ্কারিক ভাষার প্রভাবে বিপথগামী হয়। *ভগবদ্গীতায়* বলা হয়েছে যে, এই ধরনের তত্ত্বজ্ঞানবিহীন তথাকথিত পণ্ডিতেরা যারা তত্ত্বদ্রষ্টা গুরুর কাছ থেকে পরম্পরা ধারায় এই অপ্রাকৃত বাণী গ্রহণ করতে চায় না, তারা অবশ্যই মোহাচ্ছন্ন হয়ে পড়ে। তাদের আচার-অনুষ্ঠানগুলির ঊর্ধ্বে বেদের মুখ্য তত্ত্ব সম্বন্ধে তারা সম্পূর্ণভাবে অজ্ঞই থেকে যায়। তাদের জ্ঞানের কোন গভীরতা নেই। *ভগবদ্গীতায়* (১৫/১৫) বলা হয়েছে, *বেদৈশ্চ সর্বৈরহমেব বেদ্যঃ*—সমস্ত বৈদিক পন্থা ধীরে ধীরে পরমেশ্বর ভগবানকে জানার পথে জীবকে এগিয়ে নিয়ে যায়। সমস্ত বৈদিক শাস্ত্রের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে ভগবত্তত্ত্ব, জীবতত্ত্ব, সৃষ্টিতত্ত্ব প্রভৃতি সম্বন্ধে জানা এবং তাদের মধ্যে সম্বন্ধ নিরূপণ করা। যখন এই সম্বন্ধ সম্পর্কে জানা হয়, তখন সম্বন্ধ প্রতিষ্ঠার শুরু হয় এবং তার ফলে অত্যন্ত সরলভাবে জীবনের পরম উদ্দেশ্য ভগবদ্ধামে ফিরে যাওয়ার পথ সুগম হয়। দুর্ভাগ্যবশত, বেদের অবৈধ পাঠকেরা কেবল বৈদিক সংস্কারগুলির দ্বারাই মোহাচ্ছন্ন হয়ে পড়ে এবং তার ফলে তাদের স্বাভাবিক প্রগতি ব্যাহত হয়।

আসুরিকভাবাপন্ন এই ধরনের বিভ্রান্ত মানুষদের কাছে বুদ্ধদেব হচ্ছেন আস্তিকতার প্রতীক। তাই তিনি সর্বপ্রথমে তাদের পশুহত্যা করা থেকে বিরত করেন। ভগবৎ-চেতনা বিকাশের পথে পশুহত্যা হচ্ছে সব চাইতে ভয়ঙ্কর প্রতিবন্ধক। দু'রকমের পশুঘাতী রয়েছে। আত্মাকে কখনও কখনও 'পশু' অথবা জীব বলা হয়। তাই যারা পারমার্থিক জীবনের পথে অগ্রসর হওয়ার প্রচেষ্টা না করে আত্মঘাতী হয়, তারাও পশুঘাতী বা পশুঘ্ন।

মহারাজ পরীক্ষিৎ বলেছেন যে, পশুঘাতীরা কখনও পরমেশ্বর ভগবানের দিব্য মহিমা আস্বাদন করতে পারে না। তাই মানুষকে যদি ভগবৎ ভক্তির পথে পরিচালিত করতে হয়, তা হলে সর্বপ্রথম তাদের পশুহত্যা থেকে বিরত করতে হবে। যারা বলে

যে পশুহত্যার সঙ্গে পারমার্থিক প্রগতির কোন সম্বন্ধ নেই, তারা এক-একটি মূর্খ। এই ভয়ঙ্কর মতবাদের প্রভাবে কলির চেলা কয়েকজন তথাকথিত সন্ন্যাসী বেদের নাম করে পশুহত্যায় লিপ্ত হচ্ছে এবং অন্যদের সেই কাজে উদ্বুদ্ধ করছে। এই সম্বন্ধে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর সঙ্গে মৌলানা চাঁদ কাজীর আলোচনার কথা পূর্বেই বর্ণনা করা হয়েছে। বেদে যে পশুবলির কথা উল্লেখ করা হয়েছে, তার সঙ্গে কসাইখানায় অবিধিপূর্বক যে পশুহত্যা হচ্ছে তার পার্থক্য অনেক। অসুরেরা অথবা তথাকথিত বেদজ্ঞরা বেদে পশুবলির দৃষ্টান্ত উল্লেখ করে, কিন্তু সেই পশুবলি যে প্রকৃতপক্ষে কি তা তাদের জানা নেই। তাই বুদ্ধদেব আপাতভাবে বেদকে অস্বীকার করেছিলেন। পশুহত্যাজনিত প্রচণ্ড পাপ থেকে মানুষকে উদ্ধার করার জন্য এবং যে সমস্ত মানুষ মুখে বিশ্ব-ভ্রাতৃত্ব, শান্তি, সাম্য এবং স্বাধীনতার বাণী আউড়ে কাজের বেলায় নৃশংসভাবে নিরীহ পশুদের হত্যা করে, তাদের হাত থেকে পশুদের রক্ষা করার জন্য বুদ্ধদেব এই পন্থা অবলম্বন করেছিলেন। যেখানে পশুহত্যা হয়, সেখানে ন্যায় নীতির কোনও প্রশ্ন থাকতে পারে না। বুদ্ধদেব সর্বতোভাবে এই পশুহত্যা বন্ধ করতে চেয়েছিলেন। তাই তাঁর এই অহিংসার বাণী প্রচারিত হয়েছিল।

বুদ্ধদেবের দর্শনকে ব্যবহারিক পরিভাষায় 'প্রচ্ছন্ন নাস্তিকাবাদ' বলে বর্ণনা করা হয়। কেন না এই মতবাদে পরমেশ্বর ভগবানকে স্বীকার করা হয়নি এবং বেদের প্রামাণিকত্ব স্বীকার করা হয়নি। কিন্তু আসলে তা হচ্ছে নাস্তিকদের বিমোহিত করে ভগবন্মুখী করার একটি ব্যবস্থা। বুদ্ধদেব হচ্ছেন পরমেশ্বর ভগবানের অবতার। প্রকৃতপক্ষে তিনিই হচ্ছেন বৈদিক জ্ঞানের আদি প্রবর্তক। তাই তিনি বৈদিক তত্ত্বদর্শন কখনই অস্বীকার করতে পারেন না। বাহ্যিকভাবে তিনি তা অস্বীকার করেছিলেন। কিন্তু 'সুর-দ্বিষ' বা অসুরদের জন্য, যারা সব সময় ভগবদ্বিদ্বেষী এবং যারা বেদের অজুহাত দেখিয়ে গো-হত্যা অথবা পশুহত্যা সমর্থন করতে চায়, তাদের সেই জঘন্য কার্যকলাপ রোধ করবার জন্য বুদ্ধদেবকে সর্বতোভাবে বেদের প্রামাণিকতা অস্বীকার করতে হয়েছিল। তাঁর কার্য-সিদ্ধির জন্য কেবল তিনি এটি করেছিলেন। তা না হলে তাঁকে ভগবানের অবতার বলে স্বীকার করা হত না; তা না হলে জয়দেব আদি বৈষ্ণব আচার্যরা তাঁর অপ্রাকৃত মহিমা কীর্তন করতেন না। বুদ্ধদেব বেদের প্রারম্ভিক সিদ্ধান্ত তৎকালীন জনসাধারণের উপযোগী করে প্রচার করেছিলেন বেদের যথার্থ তত্ত্ব প্রতিষ্ঠা করার জন্য (এবং শ্রীপাদ শঙ্করাচার্যও তাই করেছিলেন)। এইভাবে বুদ্ধদেব এবং শঙ্করাচার্য ভগবৎ-বিশ্বাসের পথ প্রশস্ত করে গিয়েছিলেন, এবং বৈষ্ণব আচার্যরা, বিশেষ করে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু পূর্ণরূপে ভগবৎ-চেতনা বিকাশের পথে মানুষকে পরিচালিত করেছিলেন।

মানুষ যে বুদ্ধদেবের অহিংস আন্দোলনের প্রতি উৎসাহ প্রদর্শন করছে, তা দেখে আমরা অত্যন্ত আনন্দিত হচ্ছি। কিন্তু তারা কি এই বিষয়টি যথার্থ ঐকান্তিকতা

সহকারে গ্রহণ করবে এবং সমস্ত কসাইখানাগুলি বন্ধ করবে? তা যদি না হয়, তা হলে অহিংসার বাণীর কোন অর্থ হয় না।

শ্রীমদ্ভাগবত রচনা হয়েছিল কলিযুগ আরম্ভ হওয়ার ঠিক পূর্বে (আজ থেকে প্রায় ৫০০০ বছর আগে), এবং বুদ্ধদেব আবির্ভূত হয়েছিলেন আজ থেকে প্রায় ২৬০০ বছর আগে। এইভাবে *শ্রীমদ্ভাগবতে* বুদ্ধদেবের আগমনের ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছিল। এমনই হচ্ছে এই অমল শাস্ত্রটির প্রামাণিকতা। এ রকম বহু ভবিষ্যদ্বাণী ভাগবতে রয়েছে, এবং সেগুলি একের পর এক ফলপ্রসূ হচ্ছে। তার ফলে *শ্রীমদ্ভাগবতের* মহিমা প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে, যা প্রকৃতপক্ষে ভ্রম, প্রমাদ, বিপ্রলিপ্সা এবং করণাপাটব—এই চারটি দোষ থেকে মুক্ত। মুক্ত পুরুষেরা এই সমস্ত দোষের অতীত, তাঁরা ভবিষ্যতকে দর্শন করে ভবিষ্যদ্বাণী করতে পারেন এবং তা কখনও বিফল হয় না।

শ্লোক ২৫

অথাসৌ যুগসন্ধ্যায়াং দস্যুপ্রায়েষু রাজসু।
জনিতা বিষ্ণুযশসো নাম্না কল্কির্জগৎপতিঃ ॥ ২৫ ॥

অথ—তারপর; **অসৌ**—সেই পরমেশ্বর ভগবান; **যুগসন্ধ্যায়াম্**—যুগের সন্ধিক্ষণে; **দস্যু**—দস্যু; **প্রায়েষু**—প্রায়; **রাজসু**—রাজারা; **জনিতা**—জন্মগ্রহণ করবেন; **বিষ্ণু-যশসঃ**—বিষ্ণুযশ; **নাম্না**—নামক; **কল্কিঃ**—কল্কি নামক ভগবানের অবতার; **জগৎপতিঃ**—জগতের পতি।

অনুবাদ

তারপর দ্বাবিংশ অবতারে যুগ সন্ধিকালে, অর্থাৎ কলিযুগের অন্তে নৃপতিরা যখন দস্যুপ্রায় হয়ে যাবে, তখন ভগবান কল্কি অবতার নামে বিষ্ণুযশ নামক ব্রাহ্মণের পুত্ররূপে অবতরণ করবেন।

তাৎপর্য

এখানে ভগবানের কল্কি অবতারের আবির্ভাব সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছে। তিনি যুগ-সন্ধ্যায়, অর্থাৎ কলিযুগের শেষ এবং সত্য যুগের শুরুতে দুটি যুগের সন্ধিক্ষণে আবির্ভূত হবেন। দেওয়াল-পঞ্জীর (ক্যালেণ্ডার) মাসের মতো সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর এবং কলি এই চারটি যুগ আবর্তিত হয়। এই কলিযুগের স্থায়িত্ব হচ্ছে ৪,৩২,০০০ বছর। তার মধ্যে, কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের পর মহারাজ পরীক্ষিতের রাজত্বকালের শুরু থেকে ৫,০০০ বছর গত হয়েছে। সুতরাং, কলিযুগের আরও ৪,২৭,০০০ বছর বাকি রয়েছে। সেই সময়ের পর কল্কি অবতারের আবির্ভাব হবে, যে কথা *শ্রীমদ্ভাগবতে* ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছে। তাঁর পিতা হবেন বিষ্ণুযশ নামক এক তত্ত্বজ্ঞানী ব্রাহ্মণ, এবং তিনি যে সম্ভল গ্রামে আবির্ভূত হবেন তারও উল্লেখ সেখানে রয়েছে। পূর্বের বর্ণনা

অনুসারে এই সমস্ত ভবিষ্যদ্বাণীগুলি যথাসময়ে সত্য বলে প্রমাণিত হবে। সেটিই হচ্ছে শ্রীমদ্ভাগবতের প্রামাণিকতার পরিচায়ক।

শ্লোক ২৬

অবতারা হ্যসংখ্যেয়া হরেঃ সত্ত্বনিধের্দ্বিজাঃ।
যথাবিদাসিনঃ কুল্যাঃ সরসঃ স্যুঃ সহস্রশঃ ॥ ২৬ ॥

অবতারাঃ—অবতারসমূহ; **হি**—অবশ্যই; **অসংখ্যেয়াঃ**—অসংখ্য; **হরেঃ**— ভগবান শ্রীহরির; **সত্ত্ব-নিধেঃ**—সত্ত্বগুণের সমুদ্র; **দ্বিজাঃ**—ব্রাহ্মণেরা; **যথা**—যথাযথ; **অবিদাসিনঃ**—অক্ষয়; **কুল্যাঃ**—ছোট ছোট নদী; **সরসঃ**—বিশাল সরোবর; **স্যুঃ**—হয়; **সহস্রশঃ**—হাজার হাজার।

অনুবাদ

হে ব্রাহ্মণগণ, বিশাল জলাশয় থেকে যেমন অসংখ্য নদী প্রবাহিত হয়, ঠিক তেমনই ভগবানের থেকে অসংখ্য অবতার প্রকাশিত হন।

তাৎপর্য

ভগবানের অবতারের যে তালিকা এখানে দেওয়া হয়েছে তা সম্পূর্ণ নয়। তা কেবল সমস্ত অবতারের আংশিক দিগ্দর্শন। আরও অসংখ্য অবতার রয়েছেন, যেমন হয়গ্রীব, হরি, হংস, পৃশ্নিগর্ভ, বিভু, সত্যসেন, বৈকুণ্ঠ, সার্বভৌম, বিষ্বক্সেন, ধর্মসেতু, সুধামা, যোগেশ্বর, বৃহদ্ভানু ইত্যাদি বহু বহু অবতার। প্রহ্লাদ মহারাজ তাঁর প্রার্থনায় বলেছেন, "হে ভগবান, আপনার করুণা অপরিসীম। তাই আপনি জলচর, উদ্ভিদ, কীট, পক্ষী, বনচর, মনুষ্য, দেবতা আদি সমস্ত যোনিতে অবতরণ করেন সাধুদের পরিত্রাণ করবার জন্য এবং দুষ্কৃতকারীদের বিনাশ করবার জন্য। এইভাবে বিভিন্ন যুগের আবশ্যকতা অনুসারে আপনি আবির্ভূত হন। কলিযুগে আপনি ভক্তরূপে আবির্ভূত হয়েছেন।" কলিযুগে ভগবানের এই অবতার হচ্ছেন শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু। *শ্রীমদ্ভাগবত* আদি অন্যান্য বহু শাস্ত্রে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর আবির্ভাবের কথা স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। *ব্রহ্ম-সংহিতাতেও* বলা হয়েছে যে, যদিও রাম, নৃসিংহ, বরাহ, মৎস্য, কূর্ম ইত্যাদি ভগবানের বহু অবতার রয়েছেন, তবুও ভগবান স্বয়ং কখনও কখনও অবতরণ করেন। শ্রীকৃষ্ণ এবং শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তাই অবতার নন, তাঁরা হচ্ছেন সমস্ত অবতারের অবতারী। সে কথা পরবর্তী শ্লোকে স্পষ্টভাবে বিশ্লেষণ করা হবে। তাই ভগবান হচ্ছেন সমস্ত অবতারের অক্ষয় উৎস। ভগবানের অবতারদের চেনা যায় তাঁদের অলৌকিক কার্যকলাপের মাধ্যমে, যা অন্য কারোর পক্ষেই সম্ভব নয়। সেটিই হচ্ছে ভগবানের প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ শক্তিসম্পন্ন অবতারদের চেনবার উপায়। যে সমস্ত অবতারদের উল্লেখ করা হয়েছে, তাঁরা প্রায় সকলেই

অংশ-অবতার। যেমন, চতুঃসনেরা হচ্ছেন দিব্য জ্ঞানের আবেশ অবতার, নারদ মুনি হচ্ছেন ভক্তির আবেশ অবতার। মহারাজ পৃথু হচ্ছেন কোন বিশেষ কার্য সম্পাদন করার শক্তির দ্বারা আবিষ্ট অবতার। মৎস্য অবতার হচ্ছেন ভগবানের প্রত্যক্ষ অংশ-অবতার। এইভাবে সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড জুড়ে ভগবানের অসংখ্য অবতার প্রকাশিত হচ্ছেন, ঠিক যেভাবে জলাশয় থেকে নিরন্তর জল প্রবাহিত হয়।

শ্লোক ২৭

ঋষয়ো মনবো দেবা মনুপুত্রা মহৌজসঃ।
কলাঃ সর্বে হরেরেব সপ্রজাপতয়ঃ স্মৃতাঃ ॥ ২৭ ॥

ঋষয়ঃ—সমস্ত ঋষিরা; **মনবঃ**—সমস্ত মনুরা; **দেবাঃ**—সমস্ত দেবতারা; **মনু-পুত্রাঃ**—মনুর সমস্ত বংশধরেরা; **মহা-ওজসঃ**—অত্যন্ত শক্তিশালী; **কলাঃ**—অংশের অংশ; **সর্বে**—সকলে; **হরেঃ**—ভগবানের; **এব**—অবশ্যই; **স-প্রজাপতয়ঃ**—প্রজাপতিগণ সহ; **স্মৃতাঃ**—জ্ঞাত।

অনুবাদ

সমস্ত ঋষি, মনু, দেবতা এবং মনুর বংশধরেরা যাঁরা বিশেষ শক্তিসম্পন্ন, তাঁরাও হচ্ছেন ভগবানের অংশ এবং কলা। প্রজাপতিরাও এই অংশ ও কলার অন্তর্গত।

তাৎপর্য

যাঁরা তুলনামূলকভাবে কম শক্তিসম্পন্ন তাঁদের বলা হয় বিভূতি, এবং যাঁরা অধিক শক্তিশালী তাঁদের বলা হয় আবেশ অবতার।

শ্লোক ২৮

এতে চাংশকলাঃ পুংসঃ কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্।
ইন্দ্রারিব্যাকুলং লোকং মৃড়য়ন্তি যুগে যুগে ॥ ২৮ ॥

এতে—এই সমস্ত; **চ**—এবং; **অংশ**—অংশ; **কলাঃ**—অংশের অংশ; **পুংসঃ**—পরম পুরুষের; **কৃষ্ণঃ**—শ্রীকৃষ্ণ; **তু**—কিন্তু; **ভগবান্**—পরমেশ্বর ভগবান; **স্বয়ম্**—স্বয়ং; **ইন্দ্র-অরি**—ইন্দ্রের শত্রুরা; **ব্যাকুলম্**—বিচলিত; **লোকম্**—সমস্ত গ্রহ; **মৃড়য়ন্তি**—রক্ষা করেন; **যুগে যুগে**—বিভিন্ন যুগে।

অনুবাদ

পূর্বোল্লিখিত এই সমস্ত অবতারেরা হচ্ছেন ভগবানের অংশ অথবা কলা অবতার, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন পরমেশ্বর ভগবান স্বয়ং। যখন নাস্তিকদের অত্যাচার বেড়ে যায়, তখন আস্তিকদের রক্ষা করার জন্য ভগবান এই ধরাধামে অবতীর্ণ হন।

তাৎপর্য

এই বিশেষ শ্লোকটিতে পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে অন্যান্য অবতারদের পার্থক্য নিরূপিত হয়েছে। তাঁকে অবতারের মধ্যে গণনা করা হয়, কেন না তাঁর অহৈতুকী কৃপার প্রভাবে ভগবান তাঁর চিন্ময় ধাম থেকে এই জগতে অবতরণ করেন। ভগবানের সমস্ত অবতার, এমন কি ভগবান নিজেও এই জড় জগতের বিভিন্ন গ্রহে বিভিন্নরূপে অবতরণ করেন কোন বিশেষ উদ্দেশ্য সাধন করার জন্য। কখনো তিনি স্বয়ং অবতরণ করেন, আবার কখনো বা বিভিন্ন অংশ অথবা অংশের অংশ বা কলা অথবা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে তাঁর শক্তির দ্বারা আবিষ্ট শক্ত্যাবেশ অবতার কোন বিশেষ উদ্দেশ্য সাধন করার জন্য এই জগতে অবতরণ করেন। ভগবান ষড়ৈশ্বর্যপূর্ণ—তাঁর মধ্যে সমস্ত ঐশ্বর্য, সমস্ত বীর্য, সমস্ত যশ, সমস্ত শ্রী, সমস্ত জ্ঞান এবং সমস্ত বৈরাগ্য রয়েছে। সেগুলি যখন আংশিকভাবে তাঁর অংশ অথবা কলার মাধ্যমে প্রকাশিত হয়, তখন বুঝতে হবে যে,তাঁর বিভিন্ন শক্তির এই প্রকাশ কোনও বিশেষ কর্ম সম্পাদন করার জন্য। ঘরে একটি ছোট বৈদ্যুতিক বাতি জ্বালাতে গেলে আমাদের মনে হওয়া উচিত নয় যে,'ইলেকট্রিক পাওয়ার হাউস' এই ছোট বাতিটির মধ্যেই সীমাবদ্ধ। সেই পাওয়ার হাউসটি আরও অনেক বেশি শক্তিসম্পন্ন 'ইণ্ডাস্ট্রিয়াল ডায়নামো' চালাতে পারে। তেমনই, ভগবানের বিভিন্ন অবতারেরা সীমিত শক্তি প্রদর্শন করেন, কেন না সেই বিশেষ সময়ে ঠিক ততটুকু শক্তিই প্রকাশ করার প্রয়োজন হয়।

দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায়, পরশুরাম এবং নৃসিংহদেব যথাক্রমে একুশবার পৃথিবীকে নিঃক্ষত্রিয় করে এবং দৈত্যরাজ হিরণ্যকশিপুকে সংহার করে অস্বাভাবিক ঐশ্বর্য প্রদর্শন করেছিলেন। হিরণ্যকশিপু এত শক্তিশালী ছিল যে, তার ভ্রুকুটিতে স্বর্গের দেবতারা পর্যন্ত ভয়ে কম্পিত হত। জড় জগতের অনেক উচ্চ স্তরে অধিষ্ঠিত দেবতাদের আয়ু, শ্রী, ঐশ্বর্য এবং অন্য সমস্ত সম্পদ মানুষদের থেকে অনেক অনেক গুণে বেশি। কিন্তু তাঁরাও হিরণ্যকশিপুর ভয়ে ভীত ছিলেন। এইভাবে আমরা সহজেই অনুমান করতে পারি যে,হিরণ্যকশিপু কত শক্তিশালী ছিল। কিন্তু ভগবান নৃসিংহদেব তাঁর নখের দ্বারা সেই হিরণ্যকশিপুর দেহ বিদীর্ণ করে তাকে সংহার করেন। এ থেকে বোঝা যায় যে,জড় জগতে যে-কোনও মানুষ যত শক্তিশালীই হোক না কেন, ভগবানের নখের শক্তির কাছে তার শক্তি নিতান্তই নগণ্য। তেমনই, যে সমস্ত অবাধ্য রাজারা তাদের স্ব-স্ব রাজ্যে প্রভূত শক্তি সহকারে বিরাজ করছিল, তাদের সংহার করে জামদগ্ন্য ভগবানের শক্তি প্রদর্শন করে গেছেন। ভগবানের শক্ত্যাবেশ অবতার নারদ ও অংশ অবতার বরাহ এবং পরোক্ষভাবে শক্ত্যাবিষ্ট অবতার বুদ্ধ জনসাধারণের মনে বিশ্বাস উৎপাদন করেছিলেন। শ্রীরামচন্দ্র এবং ধন্বন্তরি তাঁর যশ প্রকাশ করেছেন; আর বলরাম, মোহিনী এবং বামন তাঁর সৌন্দর্য প্রকাশ করেছেন। দত্তাত্রেয়, মৎস্য, কুমার

এবং কপিল তাঁর অপ্রাকৃত জ্ঞান প্রদর্শন করেছেন। নর এবং নারায়ণ ঋষি তাঁর বৈরাগ্য প্রদর্শন করেছেন। এইভাবে ভগবানের বিভিন্ন অবতারেরা প্রত্যক্ষভাবে অথবা পরোক্ষভাবে বিভিন্ন রূপ প্রকাশ করেছেন; কিন্তু পরম পুরুষ শ্রীকৃষ্ণ ভগবানের পূর্ণ রূপ প্রদর্শন করেন। এইভাবে প্রতিপন্ন হয় যে, তিনিই হচ্ছেন সমস্ত অবতারের অবতারী। আর পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সব চাইতে অদ্ভুত লীলা হচ্ছে ব্রজগোপিকাদের সঙ্গে তাঁর অপ্রাকৃত লীলাবিলাস। ব্রজগোপিকাদের সঙ্গে তাঁর লীলাসমূহ যদিও আপাতদৃষ্টিতে কাম বলে মনে হয়, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তা সৎ, এবং আনন্দময়। ব্রজগোপিকাদের সঙ্গে তাঁর যে লীলাবিলাস, তা কখনও ভুল বুঝা উচিত নয়। *শ্রীমদ্ভাগবতের* দশম স্কন্ধে এই সমস্ত অপ্রাকৃত লীলাবিলাসের কাহিনী বর্ণিত হয়েছে, এবং ব্রজগোপিকাদের সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের এই অপ্রাকৃত লীলাবিলাসের কথা হৃদয়ঙ্গম করা যায় একে একে প্রথম ন'টি স্কন্ধের তত্ত্ব উপলব্ধি করার পর।

শ্রীল জীব গোস্বামীর বর্ণনা অনুসারে, মহাজনদের মতে শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন সমস্ত অবতারের অবতারী। এমন নয় যে, শ্রীকৃষ্ণের কোন অবতারী রয়েছে। পরমতত্ত্বের লক্ষণগুলি পূর্ণরূপে শ্রীকৃষ্ণে রয়েছে, এবং *ভগবদ্গীতায়* ভগবান নিজেই ঘোষণা করে গেছেন যে, তাঁর থেকে বড় অথবা তাঁর সমান আর কোনও সত্তা নেই। এই শ্লোকে 'স্বয়ম্' কথাটির বিশেষ উল্লেখের মাধ্যমে প্রতিপন্ন হয়েছে যে, শ্রীকৃষ্ণের কোনও অবতারী নেই। যদিও অন্যান্য অবতারদেরও ভগবান বলে বর্ণনা করা হয়েছে, কিন্তু কোথাও তাঁদের পরমেশ্বর বলে বর্ণনা করা হয়নি। এই শ্লোকে 'স্বয়ম্' শব্দটির মাধ্যমে পরম মঙ্গলময়ের শ্রেষ্ঠত্ব নিরূপিত হয়েছে।

পরম মঙ্গলময় শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন এক এবং অদ্বিতীয়। তিনি স্বয়ং-রূপ, স্বয়ং-প্রকাশ, তদেকাত্ম, প্রাভব, বিলাস, অবতার, আবেশ এবং জীবরূপে বিভিন্ন অংশ ও কলায় নিজেকে বিস্তার করেন। তাঁদের সকলেই তাঁদের ব্যক্তিত্ব ও বৈশিষ্ট্য অনুসারে অনন্ত শক্তিসম্পন্ন। অপ্রাকৃত জ্ঞানসম্পন্ন পণ্ডিতেরা অত্যন্ত সাবধানতার সঙ্গে পরম মঙ্গলময় শ্রীকৃষ্ণের চৌষট্টিটি গুণ বিশ্লেষণ করেছেন। ভগবানের সমস্ত অংশ এবং কলা অবতারদের মধ্যে তাঁর এই সমস্ত গুণ আংশিকভাবে প্রকাশিত হয়। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন সম্পূর্ণরূপে এই সমস্ত গুণসম্পন্ন। আর স্বয়ং-প্রকাশ, তদেকাত্ম থেকে শুরু করে অবতার পর্যন্ত সকলেই হচ্ছেন বিষ্ণুতত্ত্ব। তাঁদের মধ্যে শতকরা তিরানব্বই ভাগ পর্যন্ত এই সমস্ত অপ্রাকৃত গুণগুলির প্রকাশ হতে দেখা যায়। দেবাদিদেব মহাদেব, যিনি অবতার নন আবার আবেশও নন, কিন্তু এই উভয়ের মধ্যবর্তী, তাঁর মধ্যে এই সমস্ত গুণের শতকরা প্রায় চুরাশি ভাগ রয়েছে। কিন্তু জীবেরা কেবল শতকরা আটাত্তর ভাগ পর্যন্ত এই সমস্ত গুণের অধিকারী হতে পারে। বদ্ধ অবস্থায় জীবেদের মধ্যে এই সমস্ত গুণাবলী অতি অল্প মাত্রায় প্রকাশিত হয়, এবং তা নির্ভর করে তার পুণ্যফলের উপর। সর্বোত্তম জীব হচ্ছেন ব্রহ্মাণ্ডের পরিচালক ব্রহ্মা। তাঁর

মধ্যে এই সমস্ত গুণাবলী শতকরা আটাত্তর ভাগ প্রকাশিত হতে দেখা যায়। আর মানুষের মধ্যে তা খুবই অল্প পরিমাণে প্রকাশিত হয়। মানব জীবনের পূর্ণতা হচ্ছে এই সমস্ত গুণাবলীর আটাত্তর ভাগ পূর্ণরূপে প্রকাশ করা। জীব কখনই শিব, বিষ্ণু, অথবা শ্রীকৃষ্ণের মতো গুণসম্পন্ন হতে পারে না। পূর্ণরূপে শতকরা আটাত্তর ভাগ গুণ প্রকাশ করে জীব দেবত্ব প্রাপ্ত হতে পারে, কিন্তু সে কখনই শিব, বিষ্ণু অথবা কৃষ্ণের মতো ভগবত্তা লাভ করতে পারে না। যথা সময়ে সে ব্রহ্মা হতে পারে। দেবতারা হচ্ছেন হরিধাম এবং মহেশধাম আদি চিৎ জগতের বিভিন্ন লোকে ভগবানের নিত্য পার্ষদ। চিন্ময় লোক বা বৈকুণ্ঠধামের ঊর্ধ্বে হচ্ছে কৃষ্ণলোক বা গোলোক-বৃন্দাবন, এবং পূর্ণতাপ্রাপ্ত জীবেরা এই সমস্ত গুণের শতকরা আটাত্তর ভাগ পূর্ণরূপে লাভ করে এই জড় দেহ ত্যাগ করার পর কৃষ্ণলোকে প্রবেশ করতে পারেন।

শ্লোক ২৯

জন্ম গুহ্যং ভগবতো য এতৎপ্রয়তো নরঃ।
সায়ং প্রাতর্গৃণন্ ভক্ত্যা দুঃখগ্রামাদ্বিমুচ্যতে ॥ ২৯ ॥

জন্ম—জন্ম ; **গুহ্যম্**—রহস্যজনক ; **ভগবতঃ**—ভগবানের ; **যঃ**—যে ; **এতৎ**—এই সমস্ত ; **প্রয়তঃ**—সাবধানতাপূর্বক ; **নরঃ**—মানুষ ; **সায়ম্**—সন্ধ্যা ; **প্রাতঃ**—সকাল ; **গৃণন্**—আবৃত্তি করেন ; **ভক্ত্যা**—ভক্তিপূর্বক ; **দুঃখ-গ্রামাৎ**—সব রকমের দুঃখ থেকে ; **বিমুচ্যতে**—মুক্ত হয়।

অনুবাদ

যে মানুষ মনোযোগ সহকারে ভগবানের রহস্যপূর্ণ প্রকট অর্থাৎ অবতরণের কথা সকাল এবং সন্ধ্যায় ভক্তিপূর্বক পাঠ করেন, তিনি জড় জগতের সমস্ত দুঃখ-দুর্দশা থেকে মুক্ত হন।

তাৎপর্য

ভগবদ্গীতায় ভগবান ঘোষণা করেছেন যে, কেউ যদি তত্ত্বগতভাবে ভগবানের জন্ম এবং কর্ম সম্বন্ধে অবগত হয়, তা হলে সে দেহত্যাগের পর এই জড় জগতের বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে ভগবদ্ধামে ফিরে যেতে পারে। তাই কেবলমাত্র পরমেশ্বর ভগবানের রহস্যাবৃত অবতরণের কথা তত্ত্বতঃ জানতে পারলে জড় জগতের বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়া যায়। তাই জগজ্জীবের মঙ্গলের জন্য ভগবান যে তাঁর জন্ম এবং কর্ম এই জগতে প্রকাশ করেন তা সাধারণ নয়। তা রহস্যজনক, এবং যাঁরা ভক্তি সহকারে অত্যন্ত সাবধানতার সঙ্গে তার গভীরে প্রবেশ করেন, তাঁদের কাছেই কেবল এই রহস্য উদ্ঘাটিত হয়। এইভাবে জীব জড় বন্ধন থেকে মুক্ত হতে পারে। সেই জন্যই ভগবানের আবির্ভাব এবং বিভিন্ন অবতরণের কথা বর্ণিত হয়েছে এবং কেউ

যদি কেবল ঐকান্তিক ভক্তি সহকারে তা পাঠ করেন, তা হলে তিনি ভগবানের দিব্য জন্ম এবং কর্ম সম্বন্ধে অন্তর্দৃষ্টি লাভ করতে পারেন। এখানে 'বিমুক্ত' কথাটির মাধ্যমে বোঝানো হচ্ছে যে,ভগবানের জন্ম এবং কর্ম দিব্য ; তা না হলে কেবল তা পাঠ করার মাধ্যমে মুক্তি লাভ করা সম্ভব হত না। তাই তা রহস্যাবৃত, এবং যারা ভগবদ্ভক্তির বিধিগুলি অনুসরণ করে না, তাঁরা জন্ম এবং কর্মের রহস্য হৃদয়ঙ্গম করতে পারে না।

শ্লোক ৩০

এতদ্‌রূপং ভগবতো হ্যরূপস্য চিদাত্মনঃ ।
মায়াগুণৈর্বিরচিতং মহদাদিভিরাত্মনি ॥ ৩০ ॥

এতৎ—এই সমস্ত; **রূপম্**—রূপ; **ভগবতঃ**—ভগবানের; **হি**—অবশ্যই; **অরূপস্য**—যাঁর কোন জড় রূপ নেই; **চিৎ-আত্মনঃ**—চিন্ময় জগতের; **মায়া**—জড়া প্রকৃতি; **গুণৈঃ**—গুণের দ্বারা; **বিরচিতম্**—নির্মিত; **মহৎ-আদিভিঃ**—মহত্তত্ত্ব আদি জড় উপাদানের দ্বারা; **আত্মনি**—আত্মার।

অনুবাদ

জড় জগতে ভগবানের যে বিরাট রূপের ধারণা, তা কল্পনাপ্রসূত। তা অল্পবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষদের (এবং নব্য ভক্তদের) ভগবানের রূপ সম্বন্ধে ধারণা প্রদান করার জন্য। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ভগবানের কোন প্রাকৃত বা জড় রূপ নেই।

তাৎপর্য

ভগবানের বিভিন্ন অবতারের বর্ণনা প্রসঙ্গে এখানে ভগবানের বিশ্বরূপ বা বিরাট-রূপের উল্লেখ করা হয়নি, কেন না পূর্বোল্লিখিত ভগবানের সব কটি অবতারই হচ্ছেন অপ্রাকৃত। চিন্ময় রূপে জড়ের কোন সংস্রব নেই। বদ্ধ জীবের মতো তাঁর দেহ এবং আত্মার মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। কনিষ্ঠ স্তরের ভক্তদের জন্যই বিরাট-রূপের কল্পনা করা হয়েছে। তাদের জন্যই বিরাট-রূপের উপস্থাপনা করা হয়েছে, এবং তা *শ্রীমদ্ভাগবতের* দ্বিতীয় স্কন্ধে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে এই সমস্ত বর্ণনা কনিষ্ঠ স্তরের ভক্তদের জন্য। কনিষ্ঠ স্তরের ভক্তরা জড়াতীত কোন কিছুর ধারণা করতে পারে না। ভগবানের রূপের প্রাকৃত ধারণা তাঁর বাস্তবিক স্বরূপের মধ্যে গণনা করা হয়নি। পরমাত্মা বা অন্তর্যামীরূপে ভগবান প্রতিটি প্রাকৃত রূপেই রয়েছেন, এমন কি তিনি পরমাণুর মধ্যেও রয়েছেন ; কিন্তু তাঁর বাহ্যিক প্রাকৃত (জড়) রূপ ভগবান এবং জীব উভয়েরই কাছে কাল্পনিক। বদ্ধ জীবের বর্তমান রূপও বাস্তব নয়। অর্থাৎ, এখানে সিদ্ধান্ত হচ্ছে এই যে, ভগবানের বিরাট রূপ সম্বন্ধে যে জড় ধারণা রয়েছে, তা কাল্পনিক। ভগবান এবং জীব উভয়েই হচ্ছেন চেতন বস্তু এবং তাঁদের স্বরূপে তাঁরা হচ্ছেন চিন্ময়।

শ্লোক ৩১

যথা নভসি মেঘৌঘো রেণুর্বা পার্থিবোঽনিলে।
এবং দ্রষ্টরি দৃশ্যত্বমারোপিতমবুদ্ধিভিঃ ॥ ৩১ ॥

যথা—যথাযথ; **নভসি**—আকাশে; **মেঘৌঘঃ**—মেঘসমূহ; **রেণুঃ**—ধূলিকণা; **বা**—এবং; **পার্থিবঃ**—পার্থিব; **অনিলে**—বায়ুতে; **এবম্**—সেইভাবে; **দ্রষ্টরি**—দ্রষ্টাকে; **দৃশ্যত্বম্**—দর্শন করার জন্য; **আরোপিতম্**—আরোপিত; **অবুদ্ধিভিঃ**—অল্পবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষদের দ্বারা।

অনুবাদ

মেঘ এবং ধূলিকণা বায়ুর দ্বারা বাহিত হয়, কিন্তু অল্পবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষেরা বলে যে আকাশ মেঘাচ্ছন্ন এবং বায়ু ধূলাচ্ছন্ন। তেমনই, তারা আত্মায় জড় শরীরের ধারণা আরোপ করে।

তাৎপর্য

এখানে পুনরায় প্রতিপন্ন হচ্ছে যে,আমাদের জড় চক্ষু এবং ইন্দ্রিয়ের দ্বারা আমরা অধোক্ষজ ভগবানকে দর্শন করতে পারি না। এমন কি আমরা জীবের জড় দেহে যে চিৎ স্ফুলিঙ্গ রয়েছে তারও সন্ধান জানি না। আমরা জীবের স্থূল জড় দেহ অথবা সূক্ষ্ম মনকে দর্শন করতে পারি, কিন্তু আমরা দেহের অভ্যন্তরে স্থিত চিৎ স্ফুলিঙ্গটি দর্শন করতে পারি না। তাই জড় দেহের উপস্থিতির মাধ্যমেই আমরা জীবের উপস্থিতি স্বীকার করি। তেমনই, যারা তাদের বর্তমান জড় চক্ষু অথবা জড় ইন্দ্রিয়ের দ্বারা ভগবানকে দর্শন করতে চান, তাঁদের উপদেশ দেওয়া হয়েছে বিরাট-রূপ নামক ভগবানের বাহ্যিক রূপের ধ্যান করতে। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায়, কোন ভদ্রলোক যখন তাঁর গাড়ি চালিয়ে যান, তখন আমরা দৃশ্যমান গাড়িটির দ্বারা গাড়িতে বসে থাকা সেই মানুষটির পরিচয় দিয়ে থাকি। রাষ্ট্রপতি যখন তাঁর বিশেষ গাড়িতে করে যান, তখন আমরা বলি, "রাষ্ট্রপতি যাচ্ছেন।" সাময়িকভাবে আমরা গাড়িটির মাধ্যমে রাষ্ট্রপতির পরিচয় দিয়ে থাকি। তেমনই যে-সমস্ত অল্পবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ উপযুক্ত যোগ্যতা অর্জন করার আগেই ভগবানকে দেখতে চায়, তাদের বিশাল রূপের মাধ্যমে ভগবানের বিরাট-রূপ দেখানো হয়, যদিও ভগবান বাহিরে এবং অভ্যন্তরে উভয় স্তরেই রয়েছেন। আকাশের নীলিমা সেই প্রসঙ্গে একটি সুন্দর দৃষ্টান্ত। যদিও আকাশ এবং আকাশের নীলিমা ভিন্ন,তবু আমরা মনে করি যে,আকাশের রঙ নীল। কিন্তু সেটি অল্পজ্ঞ মানুষদের ধারণা মাত্র।

শ্লোক ৩২

অতঃ পরং যদব্যক্তমব্যূঢ়গুণবৃংহিতম্ ।
অদৃষ্টাশ্রুতবস্তুত্বাৎস জীবো যৎপুনর্ভবঃ ॥ ৩২ ॥

অতঃ—এই ; **পরম্**—উর্ধ্বে ; **যৎ**—যা ; **অব্যক্তম্**—অপ্রকাশিত ; **অব্যূঢ়**— পরিণত রূপবিহীন ; **গুণবৃংহিতম্**—গুণের দ্বারা প্রভাবিত ; **অদৃষ্ট**—যা দেখা যায় না ; **অশ্রুত**—যা শোনা যায় না ; **বস্তুত্বাৎ**—সেই রকম হয়ে ; **সঃ**—তা ; **জীবঃ**—জীব ; **যৎ**—যা ; **পুনর্ভবঃ**—পুনঃ পুনঃ জন্মগ্রহণ করে।

অনুবাদ

এই স্থুল রূপের ধারণার উর্ধ্বে আরেকটি সূক্ষ্ম রূপ রয়েছে, যার কোন পরিণত রূপ নেই এবং যা দেখা যায় না, যাকে শোনা যায় না এবং যা অপ্রকাশিত। এই সূক্ষ্ম স্তরের উর্ধ্বে হচ্ছে জীবের স্বরূপ, তা না হলে সে বারংবার জন্মগ্রহণ করতে পারত না।

তাৎপর্য

স্থুল জগতকে যেমন পরমেশ্বর ভগবানের বিরাট শরীর বলে অনুমান করা হয়, তেমনই তাঁর সূক্ষ্ম রূপের ধারণা রয়েছে, যা দেখা বা শোনা না গেলেও অথবা প্রকাশিত না হলেও উপলব্ধি করা যায়। কিন্তু এই সমস্ত সূক্ষ্ম অথবা স্থুল শরীরের ধারণা জীব-চেতনার সঙ্গে আপেক্ষিকভাবে সম্পর্কিত ; স্থুল জড় রূপ এবং সূক্ষ্ম মানসিক অস্তিত্বের উর্ধ্বে জীবের স্বরূপ রয়েছে। জীব যখন তার জড় শরীরটি ত্যাগ করে, তখন তার স্থুলদেহ এবং সূক্ষ্ম মনের কার্যকলাপ বন্ধ হয়ে যায়। প্রকৃতপক্ষে আমরা বলি, জীব দেহত্যাগ করে চলে গেছে, কেন না তাকে আর কিছু করতে দেখা যায় না এবং তার কাছ থেকে কিছু শোনাও যায় না। গভীর নিদ্রায় নিদ্রিত থাকার সময় স্থুল শরীর যদিও কোন ক্রিয়া করে না, তবুও তাকে নিশ্বাস-প্রশ্বাস নিতে দেখে আমরা বুঝতে পারি যে, সে শরীরের ভিতরে রয়েছে। সুতরাং, জীব দেহত্যাগ করে চলে গেলেও তার অর্থ এই নয় যে, তার আর কোন অস্তিত্ব থাকে না। তা অবশ্যই থাকে, তা না হলে বারবার কিভাবে তার জন্ম হয় ?

এর থেকে আমরা সিদ্ধান্তে আসতে পারি যে, ভগবান চিন্ময় রূপে নিত্য বিরাজমান। তাঁর সেই রূপ জীবের মতো স্থুল বা সূক্ষ্ম নয় ; জীবের স্থুল এবং সূক্ষ্ম রূপের সঙ্গে তার কোন তুলনা চলে না। ভগবানের রূপ সম্পর্কে সেই সমস্ত ধারণা কাল্পনিক। জীবের নিত্য চিন্ময় রূপ রয়েছে, যা কেবল জড় জগতের কলুষের দ্বারা প্রভাবিত হতে পারে।

শ্লোক ৩৩

যত্রেমে সদসদ্রূপে প্রতিষিদ্ধে স্বসংবিদা ।
অবিদ্যয়াত্মনি কৃতে ইতি তদ্‌ব্রহ্মদর্শনম্ ॥ ৩৩ ॥

যত্র—যখন ; **ইমে**—এই সব কিছুতে ; **সৎ-অসৎ**—স্থূল এবং সূক্ষ্ম ; **রূপে**—রূপে ; **প্রতিষিদ্ধে**—নিবারিত হওয়ায় ; **স্ব-সংবিদা**—স্বরূপ-উপলব্ধির দ্বারা ; **অবিদ্যয়া**—অজ্ঞানের দ্বারা ; **আত্মনি**—আত্মাতে ; **কৃতে**—আরোপিত হওয়ায় ; **ইতি**—এইভাবে ; **তৎ**—তা ; **ব্রহ্ম-দর্শনম্**—পরম ব্রহ্মকে দর্শন করার পন্থা ।

অনুবাদ

আত্মোপলব্ধির দ্বারা কেউ যখন হৃদয়ঙ্গম করতে পারে যে স্থূল এবং সূক্ষ্ম শরীরের সঙ্গে শুদ্ধ আত্মার কোন সম্পর্ক নেই, তখন সে নিজেকে এবং পরমেশ্বর ভগবানকে দর্শন করে।

তাৎপর্য

আত্মোপলব্ধি এবং জড় ভ্রমের মধ্যে পার্থক্য হচ্ছে, আত্মার বাহ্য আবরণরূপ স্থূল এবং সূক্ষ্ম শরীরকে জড়া প্রকৃতি কৃত অনিত্য এবং ভ্রমাত্মক বলে জানা। এই আবরণের কারণ হচ্ছে অজ্ঞান। পরমেশ্বর ভগবান কখনও এই জাতীয় আবরণের দ্বারা প্রভাবিত হন না। সেটি স্থির নিশ্চিতরূপে জানার নামই হচ্ছে মুক্তি, অথবা ভগবৎ-দর্শন। অর্থাৎ, দিব্য বা পারমার্থিক জীবন-যাপন করার ফলেই কেবল আত্মোপলব্ধি সম্ভব। আত্মোপলব্ধি মানে হচ্ছে স্থূল এবং সূক্ষ্ম শরীরের প্রয়োজনগুলির প্রতি উদাসীন হওয়া এবং আত্মার কার্যকলাপে নিষ্ঠাপরায়ণ হওয়া। কোন কিছু করার অনুপ্রেরণা আসে আত্মা থেকে, কিন্তু সমস্ত কার্যকলাপ ভ্রমাত্মক হয়ে পড়ে আত্মার যথার্থ অবস্থা সম্পর্কে অজ্ঞতার ফলে। অজ্ঞানের ফলে জীব স্থূল এবং সূক্ষ্ম দেহের পরিপ্রেক্ষিতে তার আত্মার মঙ্গল সাধনের হিসাব-নিকাশ করে, এবং তার ফলে জন্ম-জন্মান্তরে তার সমস্ত কার্যকলাপ বিফল হয়। কিন্তু যথার্থ অনুশীলনের মাধ্যমে কেউ যখন আত্মাকে জানতে পারে, তখনই আত্মার কার্যকলাপ শুরু হয়। তাই যে মানুষ আত্মার কার্যকলাপে যুক্ত, তাঁকে বলা হয় জীবন্মুক্ত, অর্থাৎ আপাতদৃষ্টিতে বদ্ধ অবস্থায় থাকলেও তিনি মুক্ত।

আত্মোপলব্ধির এই পূর্ণ স্তর কখনও কৃত্রিম সাধনের মাধ্যমে লাভ করা যায় না, তা লাভ হয় পরমেশ্বর ভগবানের শ্রীপাদপদ্মের আশ্রয় গ্রহণ করার ফলে। *ভগবদ্গীতায়* ভগবান বলেছেন যে, তিনি সকলেরই হৃদয়ে বিরাজ করছেন এবং সমস্ত জ্ঞান, স্মৃতি, অথবা বিস্মৃতি তাঁর থেকেই আসে। জীব যখন জড় জগতকে ভোগ করার ভ্রান্ত প্রয়াস করে, তখন ভগবান জীবকে বিস্মৃতির আবরণে আচ্ছাদিত করেন, এবং জীব

তখন তার স্থূল দেহকে এবং সূক্ষ্ম মনকে তার স্বরূপ বলে মনে করে। কিন্তু পারমার্থিক জ্ঞান অনুশীলন করার ফলে জীব যখন বিস্মৃতির কবল থেকে মুক্ত হবার জন্য ভগবানের কাছে প্রার্থনা করে, ভগবান তখন তাঁর অহৈতুকী কৃপার প্রভাবে সেই জীবের মায়া-যবনিকা উত্তোলন করেন এবং তার ফলে সে নিজেকে চিনতে পারে। সে তখন তার নিত্য স্বরূপে ভগবানের সেবায় যুক্ত হয় এবং বদ্ধ অবস্থা থেকে মুক্ত হয়। এই সমস্ত কার্য ভগবান তাঁর বহিরঙ্গা শক্তির দ্বারা অথবা সরাসরিভাবে তাঁর অন্তরঙ্গা শক্তির দ্বারা সম্পাদন করেন।

শ্লোক ৩৪

যদ্যেষোপরতা দেবী মায়া বৈশারদী মতিঃ।
সম্পন্ন এবেতি বিদুর্মহিম্নি স্বে মহীয়তে ॥ ৩৪ ॥

যদি—যদি; **এষা**—তারা; **উপরতা**—প্রশমিত হওয়া; **দেবী মায়া**—মায়াশক্তি; **বৈশারদী**—জ্ঞানসম্পন্ন; **মতিঃ**—আলোকপ্রাপ্তি; **সম্পন্নঃ**—সমৃদ্ধ; **এব**—অবশ্যই; **ইতি**—এইভাবে; **বিদুঃ**—অবগত হয়ে; **মহিম্নি**—মহিমায়; **স্বে**—আত্মার; **মহীয়তে**—প্রতিষ্ঠিত হয়ে।

অনুবাদ

ভগবানের কৃপায় যখন মায়াশক্তির প্রভাব প্রশমিত হয় এবং জীব পূর্ণ জ্ঞানপ্রাপ্ত হন, তখন তিনি আত্মজ্ঞানের আলোকে উদ্ভাসিত হন এবং স্বীয় মহিমায় অধিষ্ঠিত হন।

তাৎপর্য

যেহেতু ভগবান হচ্ছেন পরমতত্ত্ব, তাই তাঁর নাম, রূপ, লীলা, পরিকর, বৈশিষ্ট্য এবং শক্তি—সবই তাঁর থেকে অভিন্ন। তাঁর সর্বশক্তিমত্তার প্রভাবে তাঁর অপ্রাকৃত শক্তি কার্যকরী হয়। তাঁর সেই শক্তি অন্তরঙ্গা, বহিরঙ্গা এবং তটস্থা শক্তিরূপে কার্যকরী হয়, এবং তাঁর সর্বশক্তিমত্তার প্রভাবে তিনি পূর্বোক্ত যে কোন শক্তির মাধ্যমে যে কোন কার্য সম্পাদন করতে পারেন। তিনি তাঁর ইচ্ছার প্রভাবে বহিরঙ্গা শক্তিকে অন্তরঙ্গা শক্তিতে রূপান্তরিত করতে পারেন। তাই বদ্ধ জীব যখন বন্ধন-মুক্তির জন্য আকুল হয়ে প্রার্থনা করে এবং তপশ্চর্যা করে, তখন ভগবানের বহিরঙ্গা শক্তি, যা বদ্ধ জীবকে মোহাচ্ছন্ন করে রাখে, তাঁর কৃপার প্রভাবে তৎক্ষণাৎ প্রশমিত হয়। তখন সেই শক্তিই সেই শরণাগত জীবকে পরমার্থ লাভের পথে উন্নতি সাধন করতে সহায়তা করে। এই বিষয়ে বিদ্যুৎ-শক্তির দৃষ্টান্তটি খুবই যথাযথ। সুদক্ষ মিস্ত্রি বিদ্যুৎ-শক্তিকে যথাযথভাবে ব্যবহার করে তাপ উৎপাদন করতে পারে, আবার শীতলতাও উৎপাদন করতে পারে। তেমনই, যে বহিরঙ্গা শক্তি জীবকে জন্ম-মৃত্যুর চক্রে আবর্তিত করছে, তা ভগবানের ইচ্ছার প্রভাবে অন্তরঙ্গা শক্তিতে রূপান্তরিত হয়ে জীবকে নিত্য জীবন

লাভের পথে পরিচালিত করতে পারে। জীব যখন এইভাবে ভগবানের কৃপাপাত্র হয়, তখন সে তার স্বরূপে অধিষ্ঠিত হয়ে নিত্য চিন্ময় জীবন লাভ করে।

শ্লোক ৩৫

এবং জন্মানি কর্মাণি হ্যকর্তুরজনস্য চ।
বর্ণয়ন্তি স্ম কবয়ো বেদগুহ্যানি হৃৎপতেঃ ॥ ৩৫ ॥

শব্দার্থ

এবম্—এইভাবে; **জন্মানি**—জন্ম; **কর্মাণি**—কার্যকলাপ; **হি**—অবশ্যই; **অকর্তুঃ**—নিষ্ক্রিয়ের; **অজনস্য**—জন্মহীনের; **চ**—এবং; **বর্ণয়ন্তি**—বর্ণনা করে; **স্ম**—অতীতে; **কবয়ঃ**—বিদ্বান; **বেদ-গুহ্যানি**—বেদেও যা অজ্ঞেয়; **হৃৎ-পতেঃ**—হৃদয়েশ্বরের।

অনুবাদ

এইভাবে বিদ্বানেরা সেই জন্মরহিত এবং প্রাকৃত কর্মরহিত ভগবানের জন্ম এবং কর্মের বর্ণনা করেন, যা বৈদিক শাস্ত্রেও অনাবিষ্কৃত। তিনিই হচ্ছেন হৃদয়েশ্বর।

তাৎপর্য

জীব এবং ভগবান উভয়েই চিন্ময়। তাই তাঁরা উভয়েই নিত্য, এবং তাঁদের কারোরই জন্ম হয় না বা মৃত্যু হয় না। তবে পার্থক্যটি হচ্ছে এই যে, ভগবানের তথাকথিত জন্ম বা আবির্ভাব এবং তিরোভাব জীবের জন্ম-মৃত্যুর মতো নয়। যে সমস্ত জীব জন্মগ্রহণ করে এবং তারপর আবার মৃত্যুবরণ করে, তারা জড়া প্রকৃতির নিয়মের দ্বারা বদ্ধ। কিন্তু পরমেশ্বর ভগবানের দিব্য আবির্ভাব এবং তিরোভাব জড়া প্রকৃতির দ্বারা প্রভাবিত নয়, তা হচ্ছে ভগবানের অন্তরঙ্গা শক্তির কার্য। তাঁর সেই কার্যকলাপের মহিমা মহান্ ঋষিরা আত্মজ্ঞান লাভের জন্য কীর্তন করে থাকেন। পরমেশ্বর ভগবান স্বয়ং ভগবদ্গীতায় বলেছেন যে, এই জড় জগতে তাঁর তথাকথিত জন্ম এবং কর্ম সবই দিব্য, এবং তাঁর সেই কার্যকলাপ ধ্যান করার ফলে ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হয় এবং জীব তখন জড় জগতের বন্ধন থেকে মুক্ত হয়। শ্রুতিতেও বলা হয়েছে যে, অজন্মা যেন জন্মগ্রহণ করেন বলে মনে হয়। পরমেশ্বর ভগবানের করণীয় কিছুই নেই, কিন্তু যেহেতু তিনি সর্বশক্তিমান, তাই সব কিছুই স্বাভাবিকভাবে তাঁর দ্বারাই সম্পাদিত হয়, যেন আপনা থেকেই সেগুলি হয়ে যাচ্ছে। প্রকৃতপক্ষে পরমেশ্বর ভগবানের আবির্ভাব এবং তিরোভাব এবং তাঁর বিভিন্ন কার্যকলাপ সবই অত্যন্ত গোপনীয়, এমন কি বৈদিক শাস্ত্রেও সেই সমস্ত বিষয়গুলি নিয়ে খোলাখুলিভাবে আলোচনা করা হয়নি। কিন্তু তবুও বদ্ধজীবের প্রতি তাঁর কৃপা প্রদর্শন করার জন্য ভগবান সেই সব লীলাবিলাস করেন। আমাদের কর্তব্য হচ্ছে ভগবানের অপ্রাকৃত কার্যকলাপের বর্ণনার

যথার্থ সদ্ব্যবহার করা, যা হচ্ছে সবচাইতে সহজ এবং সুন্দরভাবে ব্রহ্মের ধ্যান করার পন্থা।

শ্লোক ৩৬

স বা ইদং বিশ্বমমোঘলীলঃ সৃজত্যবত্যত্তি ন সজ্জতেঽস্মিন্।
ভূতেষু চান্তর্হিত আত্মতন্ত্রঃ ষাড়্বর্গিকং জিঘ্রতি ষড়্গুণেশঃ ॥ ৩৬ ॥

সঃ—সেই পরমেশ্বর ভগবান; **বা**—পর্যায়ক্রমে; **ইদম্**—এই; **বিশ্বম্**—প্রকাশিত জগৎ; **অমোঘ-লীলঃ**—যাঁর কার্যকলাপ সম্পূর্ণরূপে নিষ্কলুষ; **সৃজতি**—সৃজন করেন; **অবতি অত্তি**—পালন করেন এবং ধ্বংস করেন; **ন**—না; **সজ্জতে**—প্রভাবিত হয়; **অস্মিন্**—তাদের মধ্যে; **ভূতেষু**—সমস্ত জীবে; **চ**—ও; **অন্তর্হিতঃ**—অন্তরে বিরাজমান; **আত্মতন্ত্রঃ**—আত্মনির্ভর; **ষাট্-বর্গিকম্**—ষড় ঐশ্বর্যসম্পন্ন; **জিঘ্রতি**—ঘ্রাণ গ্রহণ করার মতো আপাত আসক্তি; **ষট্-গুণেশঃ**—ছ'টি ইন্দ্রিয়ের ঈশ্বর।

অনুবাদ

যাঁর চরিত্র সর্বদাই নির্মল এবং নিষ্কলঙ্ক, সেই ভগবান ষড় ইন্দ্রিয়ের এবং ষড় ঐশ্বর্যের অধীশ্বর। তিনি কোনভাবে প্রভাবিত না হয়ে এই বিশ্ব সৃষ্টি করেন, পালন করেন এবং ধ্বংস করেন। তিনি প্রতিটি জীবের অন্তরে বিরাজ করেন এবং তিনি সর্ব অবস্থাতেই সম্পূর্ণভাবে স্বাধীন।

তাৎপর্য

জীব এবং ভগবানের মধ্যে মূল পার্থক্য হচ্ছে যে, ভগবান হচ্ছেন স্রষ্টা এবং জীব হচ্ছে তাঁর সৃষ্টি। এখানে তাঁকে 'অমোঘলীলঃ' বলে বর্ণনা করা হয়েছে, তার অর্থ হচ্ছে তাঁর সৃষ্টিতে কোন কিছুই দুঃখদায়ক নয়। যারা তাঁর সৃষ্টিতে বিঘ্ন উৎপাদন করে তারাই কেবল দুঃখ ভোগ করে। তিনি সব রকম জড় দুঃখ-দুর্দশার অতীত কেন না তিনি সমগ্র ঐশ্বর্য, বীর্য, যশ, শ্রী, জ্ঞান এবং বৈরাগ্যসম্পন্ন, এবং তাই তিনি হচ্ছেন সমস্ত ইন্দ্রিয়ের অধীশ্বর। ত্রিতাপ দুঃখে জর্জরিত বদ্ধ জীবেদের উদ্ধার করার জন্য তিনি এই জড় জগৎ প্রকাশ করেন, তা পালন করেন এবং অবশেষে তা ধ্বংস করেন। তার এই ধরনের কার্যকলাপে তিনি কখনই কোন কিছুর দ্বারা প্রভাবিত হন না। এই জড় সৃষ্টির সাথে তাঁর সম্পর্ক অত্যন্ত অগভীর, ঠিক যেমন সুগন্ধী বস্তুর সংস্পর্শে না এসেই আমরা তার ঘ্রাণ গ্রহণ করতে পারি, অনেকটা সেই রকম। তাই সব রকম প্রচেষ্টা সত্ত্বেও অ-ভগবদ্ভক্ত কখনো তাঁর সান্নিধ্যে আসতে পারে না।

শ্লোক ৩৭

**ন চাস্য কশ্চিন্নিপুণেন ধাতুরবৈতি জন্তুঃ কুমনীষ ঊতীঃ।
নামানি রূপাণি মনোবচোভিঃ সন্তন্বতো নটচর্যামিবাজ্ঞঃ ॥ ৩৭ ॥**

ন—না; **চ**—এবং; **অস্য**—তাঁর; **কশ্চিৎ**—কেউ; **নিপুণেন**—দক্ষতা সহকারে; **ধাতুঃ**—সৃষ্টিকর্তার; **অবৈতি**—জানতে পারে; **জন্তুঃ**—জীব; **কুমনীষঃ**—অতি অল্প জ্ঞানসম্পন্ন; **ঊতীঃ**—ভগবানের কার্যকলাপ; **নামানি**—তাঁর নামসমূহ; **রূপাণি**—তাঁর রূপসমূহ; **মনঃ-বচোভিঃ**—মনের জল্পনা-কল্পনা অথবা বাক্যের দ্বারা; **সন্তন্বতঃ**—প্রদর্শন করে; **নটচর্যাম্**—নাটকীয় কার্য; **ইব**—মতো; **অজ্ঞঃ**—মূর্খ।

অনুবাদ

নটবৎ অভিনয়পরায়ণ পরমেশ্বর ভগবানের নাম, রূপ এবং লীলাবিলাসের অপ্রাকৃত স্বভাব বিকৃত মনোভাবাপন্ন মূর্খ মানুষেরা জানতে পারে না। তারা তাদের জল্পনা-কল্পনায় অথবা বাক্যের মাধ্যমে তা ব্যক্ত করতে পারে না।

তাৎপর্য

পরম সত্য পরমেশ্বর ভগবানের দিব্য প্রকৃতির বর্ণনা কেউই যথাযথভাবে করতে পারে না। তাই তাঁকে বলা হয় 'অবাঙ্‌মনসগোচর'। কিন্তু তবুও বিকৃত মনোভাবাপন্ন অল্পজ্ঞ কিছু মানুষ রয়েছে, যারা তাদের অপূর্ণ মনের জল্পনা-কল্পনার দ্বারা এবং তাঁর চিন্ময় কার্যকলাপ সম্বন্ধে তাদের ভ্রান্ত বর্ণনার দ্বারা তাঁকে জানতে চায়। সাধারণ মানুষের কাছে তাঁর কার্যকলাপ, তাঁর আবির্ভাব এবং তিরোভাব, তাঁর নাম, তাঁর রূপ, তাঁর পরিকর, তাঁর ব্যক্তিত্ব এবং তাঁর সাথে সম্পর্কিত সব কিছুই রহস্যজনক বলে মনে হয়। দু'রকমের জড়বাদী রয়েছে; যথা—সকাম কর্মী এবং জ্ঞানী দার্শনিক। সকাম কর্মীদের পরম সত্য সম্বন্ধে কোন ধারণাই নেই, আর মনোধর্মী জ্ঞানীরা সকাম কর্মে ব্যর্থ হয়ে তাদের মনোধর্মপ্রসূত জল্পনা-কল্পনার মাধ্যমে পরমতত্ত্বকে জানবার চেষ্টা করে। এই উভয় শ্রেণীর লোকের কাছেই পরমতত্ত্ব রহস্যাবৃত, ঠিক যেমন একটি শিশুর কাছে যাদুকরের ভেল্‌কিবাজি রহস্যাবৃত। অভক্তরা সকাম কর্মে এবং জল্পনা-কল্পনায় যতই পারদর্শী হোক না কেন, পরমেশ্বর ভগবানের মায়ার দ্বারা মোহিত হয়ে তারা সর্বদাই অজ্ঞানের অন্ধকারে আচ্ছন্ন। তাদের সীমিত জ্ঞান নিয়ে তারা অপ্রাকৃত জগতের রহস্যাবৃত প্রদেশে প্রবেশ করতে পারে না। মনোধর্মী জ্ঞানীরা অবশ্য স্থূল জড়বাদী বা সকাম কর্মীদের থেকে একটু উন্নত, কিন্তু যেহেতু তারা মায়ার দ্বারা আচ্ছন্ন, সেহেতু তারা মনে করে যে, যারই রূপ আছে, নাম আছে এবং কার্যকলাপ রয়েছে, তা নিশ্চয়ই জড়া প্রকৃতি থেকে উৎপন্ন হয়েছে। তাদের কাছে পরমেশ্বর ভগবান নিরাকার, নামহীন এবং কর্মহীন। আর যেহেতু এই ধরনের

মনোধর্মীরা পরমেশ্বর ভগবানের অপ্রাকৃত নাম এবং রূপকে জড় নাম এবং রূপের সমপর্যায়ভুক্ত বলে মনে করে, তাই তারা এক-একটি মহামূর্খ ছাড়া আর কিছু নয়। তাদের সেই স্বল্প জ্ঞানের দ্বারা তারা কখনই পরমেশ্বর ভগবানের যথার্থ প্রকৃতিতে প্রবেশ করতে পারে না। *ভগবদ্গীতায়* বর্ণনা করা হয়েছে যে, পরমেশ্বর ভগবান সর্বদাই তাঁর দিব্য প্রকৃতিতে বিরাজ করেন, এমন কি যখন তিনি এই জগতে অবতরণ করেন, তখনও তিনি তাঁর দিব্য প্রকৃতিতেই অধিষ্ঠিত থাকেন। কিন্তু মূর্খ মানুষেরা মনে করে যে, পরমেশ্বর ভগবান এই পৃথিবীর আর পাঁচ জন মহৎ মানুষের মতো, এবং এইভাবে তারা ভগবানের মায়াশক্তির দ্বারা মোহাচ্ছন্ন হয়।

শ্লোক ৩৮

স বেদ ধাতুঃ পদবীং পরস্য দুরন্তবীর্যস্য রথাঙ্গপাণেঃ ।
যোঽমায়য়া সন্ততয়ানুবৃত্ত্যা ভজেত তৎপাদসরোজগন্ধম্ ॥ ৩৮ ॥

সঃ—কেবল তিনি ; **বেদ**—জানতে পারেন ; **ধাতুঃ**—সৃষ্টিকর্তার ; **পদবীম্**— মহিমা ; **পরস্য**—পরা-প্রকৃতির ; **দুরন্তবীর্যস্য**—পরম শক্তিমানের ; **রথ-অঙ্গ-পাণেঃ**— ভগবান শ্রীকৃষ্ণ, যিনি তাঁর হস্তে রথের চাকা ধারণ করেছিলেন ; **যঃ**—যিনি ; **অমায়য়া**—আসক্তিরহিত ; **সন্ততয়া**—অবাধগতি ; **অনুবৃত্ত্যা**—অনুকূলভাবে ; **ভজেত**—সেবা করেন ; **তৎ-পাদ**—তাঁর শ্রীপাদপদ্মের ; **সরোজ-গন্ধম্**—পদ্মফুলের সৌরভ।

অনুবাদ

যাঁরা দুরন্তবীর্য রথচক্রধারী ভগবান শ্রীকৃষ্ণের শ্রীপাদপদ্মে অনুকূলভাবে অহৈতুকী এবং অপ্রতিহতা সেবাপরায়ণ, তাঁরাই কেবল জগতের সৃষ্টিকর্তার পূর্ণ মহিমা, শক্তি এবং দিব্য ভাব সম্বন্ধে অবগত হতে পারেন।

তাৎপর্য

শুদ্ধ ভক্তরাই কেবল পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের অপ্রাকৃত নাম, রূপ এবং কার্যকলাপ সম্বন্ধে অবগত হতে পারেন। কেন না তাঁরা সম্পূর্ণরূপে সকাম কর্মের ফল এবং মনোধর্মপ্রসূত জ্ঞানের বন্ধন থেকে মুক্ত হয়েছেন। শুদ্ধ ভক্তরা পরমেশ্বর ভগবানের প্রতি তাঁদের অনন্য ভক্তির বিনিময়ে কোন রকম ব্যক্তিগত লাভের আকাঙ্ক্ষা করেন না। তাঁরা স্বতস্ফূর্তভাবে সব রকম আকাঙ্ক্ষা রহিত হয়ে নিরন্তর ভগবানের সেবা করেন। ভগবানের সৃষ্টিতে সকলেই প্রত্যক্ষভাবে বা পরোক্ষভাবে ভগবানের সেবা করছেন। ভগবানের এই আইন থেকে কেউই রেহাই পায় না। যারা ভগবানের মায়া-শক্তির প্রভাবে বাধ্য হয়ে পরোক্ষভাবে ভগবানের সেবা করছে, তাদের সেই সেবা প্রতিকূল-ভাবাপন্ন। কিন্তু যাঁরা ভগবানের প্রিয় প্রতিনিধির

আনুগত্যে সরাসরিভাবে ভগবানের সেবা করছেন, তাঁদের সেই সেবা অনুকূল ভাবযুক্ত। এই ধরনের অনুকূল সেবকেরা হচ্ছেন ভগবানের ভক্ত, এবং ভগবানের কৃপার প্রভাবে তাঁরা রহস্যাবৃত ভগবদ্ধামে প্রবেশ করতে পারেন। কিন্তু মনোধর্মীরা সর্বদাই অজ্ঞানান্ধকারে আচ্ছন্ন থাকে। ভগবদ্গীতায় ভগবান নিজেই বলেছেন যে, তিনি তাঁর শুদ্ধ ভক্তদের এগিয়ে যেতে পথ প্রদর্শন করেন, কেন না তাঁরা স্বতঃস্ফূর্ত প্রেমে ভগবানের সেবায় যুক্ত। সেটিই হচ্ছে ভগবদ্ধামে প্রবেশ করার একমাত্র উপায়। সকাম কর্ম এবং মনোধর্মপ্রসূত জল্পনা-কল্পনা এখানে প্রবেশের যোগ্যতা নয়।

শ্লোক ৩৯

অথেহ ধন্যা ভগবন্ত ইত্থং যদ্বাসুদেবেঽখিললোকনাথে।
কুর্বন্তি সর্বাত্মকমাত্মভাবং ন যত্র ভূয়ঃ পরিবর্ত উগ্রঃ ॥ ৩৯ ॥

অথ—এইভাবে ; **ইহ**—এই জগতে ; **ধন্যাঃ**—সার্থক ; **ভগবন্তঃ**—সম্পূর্ণরূপে জ্ঞাত ; **ইত্থম্**—এই রকম ; **যৎ**—যা ; **বাসুদেবে**—পরমেশ্বর ভগবান বাসুদেবের প্রতি ; **অখিল**—সম্পূর্ণ ; **লোকনাথে**—সমগ্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের অধীশ্বরের প্রতি ; **কুর্বন্তি**—অনুপ্রাণিত করে ; **সর্বাত্মকম্**—পূর্ণমাত্রায় ; **আত্ম**—আত্মা ; **ভাবম্**—দিব্য আনন্দ ; **ন**—কখনই না ; **যত্র**—যেখানে ; **ভূয়ঃ**—পুনরায় ; **পরিবর্তঃ**—পুনরাবৃত্তি ; **উগ্রঃ**—ভয়ানক।

অনুবাদ

এই ধরনের প্রশ্ন করার মাধ্যমেই কেবল এই জগতে সফল হওয়া যায় এবং পূর্ণ জ্ঞান লাভ করা যায়। কেন না এই ধরনের প্রশ্ন জগৎপতি পরমেশ্বর ভগবানের প্রতি অপ্রাকৃত প্রেম বিকশিত করে, এবং জন্ম-মৃত্যুর ভয়ানক আবর্ত থেকে জীবকে সম্পূর্ণভাবে মুক্ত করে।

তাৎপর্য

সূত গোস্বামী এখানে শৌনকাদি ঋষিদের প্রশ্নের প্রশংসা করেছেন, কেন না তা ছিল ভগবৎ-বিষয়ক প্রশ্ন। পূর্বেই আলোচনা করা হয়েছে যে, ভগবানের ভক্তরাই কেবল তাঁকে সন্তোষজনক মাত্রায় জানতে পারে, তা ছাড়া অন্য কেউ তাঁর সম্বন্ধে কিছুই জানতে পারে না। তাই ভক্তরা পারমার্থিক জ্ঞান সম্বন্ধে সম্পূর্ণরূপে অবগত। পরমেশ্বর ভগবান হচ্ছেন অদ্বয় জ্ঞানের পরমতত্ত্ব। ব্রহ্ম এবং পরমাত্মা হচ্ছেন ভগবত্তত্ত্বজ্ঞানের অন্তর্ভুক্ত। তাই যিনি পরমেশ্বর ভগবানকে জানেন, তিনি স্বাভাবিকভাবেই তাঁর সম্বন্ধে, তাঁর অনন্ত শক্তি সম্বন্ধে অবগত। তাই ভক্তদের সর্বতোভাবে সার্থক বলে অভিনন্দন জানানো হয়েছে। পরমেশ্বর ভগবানের শুদ্ধ ভক্ত জন্ম-মৃত্যুর ভয়ঙ্কর দুঃখ থেকে মুক্ত।

শ্লোক ৪০

ইদং ভাগবতং নাম পুরাণং ব্রহ্মসম্মিতম্ ।
উত্তমশ্লোকচরিতং চকার ভগবানৃষিঃ ।
নিঃশ্রেয়সায় লোকস্য ধন্যং স্বস্ত্যয়নং মহৎ ॥ ৪০ ॥

ইদম্—এই; **ভাগবতম্**—পরমেশ্বর ভগবান এবং তাঁর শুদ্ধ ভক্তদের বর্ণনা সমন্বিত গ্রন্থ; **নাম**—নামের; **পুরাণম্**—পুরাণ; **ব্রহ্ম-সম্মিতম্**—শ্রীকৃষ্ণের অবতার; **উত্তম-শ্লোক**—পরমেশ্বর ভগবানের; **চরিতম্**—কার্যকলাপ; **চকার**—সংকলিত হয়েছে; **ভগবান্**—পরমেশ্বর ভগবানের অবতার; **ঋষিঃ**—শ্রীল ব্যাসদেব; **নিঃশ্রেয়সায়**—পরম মঙ্গলের জন্য; **লোকস্য**—সমস্ত মানুষদের; **ধন্যম্**—সম্পূর্ণরূপে সার্থক; **স্বস্তি-অয়নম্**—পূর্ণ আনন্দময়; **মহৎ**—পরিপূর্ণ।

অনুবাদ

এই শ্রীমদ্ভাগবত হচ্ছে পরমেশ্বর ভগবানের বাঙ্ময় বিগ্রহ এবং তা সংকলন করেছেন ভগবানের অবতার শ্রীল ব্যাসদেব। তাঁর উদ্দেশ্য হচ্ছে সমস্ত মানুষের পরম মঙ্গল সাধন করা, এবং এটি সর্বতোভাবে সার্থক, পূর্ণ আনন্দময় এবং সর্বতোভাবে পরিপূর্ণ।

তাৎপর্য

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ঘোষণা করেছেন যে, *শ্রীমদ্ভাগবত* হচ্ছে সমস্ত বৈদিক জ্ঞানের এবং ইতিহাসের নির্মল এবং পূর্ণ বর্ণনা। তাতে পরমেশ্বর ভগবানের কয়েকজন অন্তরঙ্গ ভক্তের কাহিনী বর্ণিত হয়েছে। *শ্রীমদ্ভাগবত* হচ্ছে শ্রীকৃষ্ণের বাঙ্ময় বিগ্রহ এবং তাই তা শ্রীকৃষ্ণ থেকে অভিন্ন। আমরা যেভাবে পরমেশ্বর ভগবানের আরাধনা করি, ঠিক সেইভাবেই আমাদের *শ্রীমদ্ভাগবতের* পূজা করা উচিত। তা যত্ন সহকারে এবং ধৈর্য সহকারে পাঠ করার ফলে আমরা পরমেশ্বর ভগবানের পরম আশীর্বাদ লাভ করতে পারি, যদি তা গুরু-পরম্পরার ধারায় অধিষ্ঠিত সদ্গুরুর কাছ থেকে লাভ করা যায়। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর অন্তরঙ্গ সচিব শ্রীল স্বরূপ দামোদর গোস্বামী উপদেশ দিয়ে গেছেন, যাঁরা জগন্নাথপুরীতে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর দর্শনাভিলাষী তাঁরা যেন অবশ্যই ব্যক্তি-ভাগবতের কাছে গ্রন্থ ভাগবত পাঠ করেন। ব্যক্তি-ভাগবত হচ্ছেন কৃষ্ণতত্ত্ববেত্তা সদ্গুরু এবং *শ্রীমদ্ভাগবত* পাঠ করে উপযুক্ত ফল লাভের জন্য তাঁর কাছ থেকে *শ্রীমদ্ভাগবতের* তত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করতে হয়। পরমেশ্বর ভগবানের উপস্থিতিতে যে পারমার্থিক লাভ হয়, *শ্রীমদ্ভাগবত* পাঠ করেও সেই একই ফল লাভ করা যায়। তাই *শ্রীমদ্ভাগবত* সর্বদাই পরমেশ্বর ভগবানের অপ্রাকৃত আশীর্বাদ বহন করে, যা তাঁর সান্নিধ্যে এলেই কেবল লাভ করা যায়।

শ্লোক ৪১

তদিদং গ্রাহয়ামাস সুতমাত্মবতাং বরম্ ।
সর্ববেদেতিহাসানাং সারং সারং সমুদ্ধৃতম্ ॥ ৪১ ॥

তৎ—তা ; **ইদম্**—এই ; **গ্রাহয়ামাস**—গ্রহণ করতে বাধ্য করানো হয় ; **সুতম্**— তাঁর পুত্রকে ; **আত্মবতাম্**—আত্ম-তত্ত্ব জ্ঞানীদের ; **বরম্**—সব চাইতে সম্মানিত ; **সর্ব**—সমস্ত ; **বেদ**—বৈদিক শাস্ত্রগ্রন্থ ; **ইতিহাসানাম্**—সমস্ত ইতিহাসের ; **সারম্**—সার ; **সারম্**—সার ; **সমুদ্ধৃতম্**—উদ্ধৃত।

অনুবাদ

শ্রীল ব্যাসদেব সমস্ত বৈদিক শাস্ত্র এবং এই ব্রহ্মাণ্ডের ইতিহাসের সারতত্ত্ব আহরণ করার পর সমস্ত আত্মজ্ঞানীদের মুকুটমণিস্বরূপ তাঁর পুত্রকে তা দান করেছিলেন।

তাৎপর্য

অল্পজ্ঞ মানুষেরা মনে করেন যে, পৃথিবীর ইতিহাস শুরু হয়েছে বুদ্ধদেবের সময় থেকে, অথবা খ্রিস্টপূর্ব ৬০০ বছর থেকে এবং শাস্ত্রে তার পূর্বের যে ইতিহাস বর্ণিত হয়েছে, সেগুলি কেবল কাল্পনিক কাহিনী। সেটি তাদের মূর্খতারই পরিচায়ক। পুরাণ ও মহাভারত আদি শাস্ত্র-গ্রন্থে যে সমস্ত কাহিনী বর্ণিত হয়েছে, সেগুলি যথার্থই ইতিহাস; সেগুলি কেবল এই পৃথিবীর ইতিহাস নয়, ব্রহ্মাণ্ডের অগণিত গ্রহ-নক্ষত্রেরও ইতিহাস। সেই সমস্ত অল্পজ্ঞ মানুষদের কাছে শাস্ত্রে বর্ণিত সেই সমস্ত অন্যান্য গ্রহের ইতিহাস অবিশ্বাস্য বলে মনে হয়। কিন্তু তারা জানে না যে, অন্যান্য গ্রহগুলি সর্বতোভাবে সমপর্যায়ভুক্ত নয়। তাই এই পৃথিবীর অভিজ্ঞতার পরিপ্রেক্ষিতে অন্যান্য গ্রহের ঘটনার তারতম্য থাকতে পারে। বিভিন্ন লোকের পরিস্থিতি, সময় এবং অবস্থার কথা বিবেচনা করলে বোঝা যায় যে, পুরাণ আদি শাস্ত্রে বর্ণিত ঘটনাবলী কাল্পনিক নয় বা অবিশ্বাস্য নয়। আমাদের সব সময় মনে রাখা উচিত যে, এক মানুষের আহার অন্য মানুষের বিষ হতে পারে। তাই পুরাণের কাহিনী কাল্পনিক বলে অস্বীকার করা উচিত নয়। শ্রীল ব্যাসদেবের মতো মহর্ষিদের তাঁদের সাহিত্যে কতকগুলি কাল্পনিক কাহিনীর উল্লেখ করার কোন প্রয়োজন ছিল না।

শ্রীমদ্ভাগবতে বিভিন্ন লোকের ইতিহাস থেকে কয়েকটি ঐতিহাসিক তথ্য বাছাই করে বর্ণিত হয়েছে। তাই সমস্ত মহাজনেরা তাকে মহাপুরাণ বলে স্বীকার করেছেন। এই সমস্ত ঐতিহাসিক তথ্যের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, সেগুলি বিভিন্ন সময়ে এবং বিভিন্ন পরিস্থিতিতে ভগবানের দিব্য লীলার সাথে যুক্ত। শ্রীল শুকদেব গোস্বামী হচ্ছেন সমস্ত আত্মজ্ঞানীদের শিরোমণি, এবং তিনি এই *শ্রীমদ্ভাগবতকে* যথার্থ তত্ত্বজ্ঞানরূপে বিবেচনা করে তাঁর পিতা শ্রীল ব্যাসদেবের কাছ থেকে এই জ্ঞান লাভ করেছিলেন।

শ্রীল ব্যাসদেব হচ্ছেন একজন মহাজন, এবং *শ্রীমদ্ভাগবতের* বিষয়কে সর্বশ্রেষ্ঠ তত্ত্বজ্ঞান বলে বিচার করে তিনি প্রথমে তা তাঁর মহান পুত্র শ্রীল শুকদেব গোস্বামীকে দান করেছিলেন। এই ভাগবতকে দুধের সার-স্বরূপ ননীর সাথে তুলনা করা হয়। বৈদিক শাস্ত্র হচ্ছে দুধের সমুদ্রের মতো। ননী বা মাখন হচ্ছে দুধের সব চাইতে উপাদেয় সারাতিসার। আর *শ্রীমদ্ভাগবতও* হচ্ছে তেমনই, কেন না তাতে পরমেশ্বর ভগবান এবং তাঁর শুদ্ধ ভক্তের অতি উপাদেয় এবং শিক্ষাপ্রদ প্রামাণিক সমস্ত লীলা বিলাসের কাহিনী বর্ণিত হয়েছে। অবিশ্বাসী, নাস্তিক এবং পেশাদার পাঠকদের কাছ থেকে *শ্রীমদ্ভাগবতের* বাণী গ্রহণ করলে কোন লাভ হয় না। এই ভাগবত দান করেছিলেন শ্রীল শুকদেব গোস্বামী, এবং তিনি অর্থ উপার্জনের জন্য তা করেননি। ভাগবত পাঠের অছিলায় অর্থ উপার্জন করে পরিবার প্রতিপালন করার প্রয়োজনীয়তা শ্রীল শুকদেব গোস্বামীর ছিল না। তাই *শ্রীমদ্ভাগবতের* তত্ত্বজ্ঞান গ্রহণ করা উচিত শ্রীল শুকদেব গোস্বামীর আদর্শ প্রতিনিধির কাছ থেকে, যাঁকে অবশ্যই পরিবার প্রতিপালনের দায়মুক্ত সন্ন্যাসী হতে হবে। দুধ নিঃসন্দেহে অতি উপাদেয় এবং স্বাস্থ্যকর, কিন্তু কোন সর্প যখন তা স্পর্শ করে তখন তা আর পুষ্টিকর আহারযোগ্য থাকে না; পক্ষান্তরে তা তখন ভয়ঙ্কর বিষে পরিণত হয়। তেমনই, যারা যথার্থ বৈষ্ণব-পরম্পরার অন্তর্ভুক্ত নন, তারা যেন কখনই অর্থ উপার্জনের জন্য ভাগবত পাঠ করার ব্যবস্থা শুরু করে বহু শ্রোতার পারমার্থিক মৃত্যুর কারণ না হয়ে দাঁড়ান। *ভগবদ্গীতায়* ভগবান বলেছেন যে, সমস্ত বেদের উদ্দেশ্য হচ্ছে তাঁকে (শ্রীকৃষ্ণকে) জানা, আর *শ্রীমদ্ভাগবত* হচ্ছে সংকলিত জ্ঞানরূপে সাক্ষাৎ ভগবান শ্রীকৃষ্ণ। তাই তা হচ্ছে বেদের সারাতিসার, এবং তাতে বিভিন্ন যুগে শ্রীকৃষ্ণের সম্বন্ধে ঐতিহাসিক সমস্ত তথ্য বর্ণিত হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে তা হচ্ছে সমস্ত ইতিহাসের সারাতিসার।

শ্লোক ৪২

স তু সংশ্রাবয়ামাস মহারাজং পরীক্ষিতম্।
প্রায়োপবিষ্টং গঙ্গায়াং পরীতং পরমর্ষিভিঃ ॥ ৪২ ॥

সঃ—শ্রীল ব্যাসদেবের পুত্র; **তু**—পুনরায়; **সংশ্রাবয়ামাস**—শুনিয়েছিলেন; **মহারাজম্**—মহারাজকে; **পরীক্ষিতম্**—পরীক্ষিৎ নামক; **প্রায়-উপ-বিষ্টম্**—আমরণ অনশন; **গঙ্গায়াম্**—গঙ্গার তীরে; **পরীতম্**—পরিবেষ্টিত হয়ে; **পরম-ঋষিভিঃ**—মহান ঋষিদের দ্বারা।

অনুবাদ

ব্যাসদেবের পুত্র শুকদেব গোস্বামী গঙ্গার তটে প্রায়োপবেশনে উপবিষ্ট এবং মহান ঋষিদের দ্বারা পরিবেষ্টিত মহারাজ পরীক্ষিতকে শ্রীমদ্ভাগবত শুনিয়েছিলেন।

তাৎপর্য

সমস্ত দিব্য-জ্ঞান গুরুপরম্পরায় গ্রহণ করতে হয়। গুরুপরম্পরার ধারায় গ্রহণ না করলে যথাযথভাবে *শ্রীমদ্ভাগবত* বা অন্যান্য বৈদিক জ্ঞান লাভ করা যায় না। শ্রীল ব্যাসদেব এই জ্ঞান দান করেছিলেন শ্রীল শুকদেব গোস্বামীকে এবং শুকদেব গোস্বামীর কাছ থেকে তা লাভ করেছিলেন শ্রীল সূত গোস্বামী। তাই সূত গোস্বামী অথবা তাঁর প্রতিনিধির কাছ থেকে এই ভাগবতের বাণী গ্রহণ করতে হয়। কতকগুলি অসঙ্গত ব্যাখ্যাকারীর কাছ থেকে সেই জ্ঞান লাভ করা উচিত নয়।

মহারাজ পরীক্ষিৎ যথাসময়ে জানতে পেরেছিলেন যে, তাঁর মৃত্যু আসন্ন, তাই তিনি তৎক্ষণাৎ তাঁর রাজ্য এবং পরিবার-পরিজন পরিত্যাগ করে গঙ্গার তীরে প্রায়োপবেশনে উপবিষ্ট হয়েছিলেন। সেই মহান্ সম্রাটের মৃত্যু আসন্ন জেনে সমস্ত মুনি-ঋষি-যোগী আদি সমস্ত মহাত্মারা সেখানে সমবেত হয়েছিলেন। অন্তিম সময়ে তাঁর কর্তব্য সম্বন্ধে তাঁরা তাঁকে নানা উপদেশ দিয়েছিলেন, এবং অবশেষে তিনি স্থির করেছিলেন যে, তিনি শ্রীল শুকদেব গোস্বামীর কাছে কৃষ্ণকথা শ্রবণ করবেন। তাই শ্রীল শুকদেব গোস্বামী তাঁকে *শ্রীমদ্ভাগবত* শোনান।

শ্রীপাদ শঙ্করাচার্য, যিনি মায়াবাদ-দর্শন প্রচার করেছিলেন এবং নির্বিশেষ ব্রহ্মবাদ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, তিনিও নির্দেশ দিয়ে গেছেন যে, সকলেরই কর্তব্য হচ্ছে পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের চরণাশ্রয় গ্রহণ করা, কেন না তর্ক করে কোন কিছুই লাভ করা যাবে না। পরোক্ষভাবে শ্রীপাদ শঙ্করাচার্য স্বীকার করে গেছেন যে, তিনি যে বেদান্ত-সূত্রের ব্যাখ্যারূপে পুষ্পিতা বাণী প্রচার করে গেছেন, তা মৃত্যুর সময় জীবকে রক্ষা করতে পারবে না। মৃত্যুর শোচনীয় অবস্থার সময় অবশ্যই গোবিন্দের নাম উচ্চারণ করতে হবে। সেটিই হচ্ছে সমস্ত মহান্ পরমার্থবাদীদের উপদেশ। বহু পূর্বে শুকদেব গোস্বামীও সেই সত্যকেই প্রতিপন্ন করে গেছেন যে, অন্তিম সময়ে নারায়ণকে স্মরণ করতে হবে। সমস্ত পারমার্থিক কার্যকলাপের সেইটি হচ্ছে সারাতিসার। এই নিত্য সত্যকে অনুসরণ করে মহারাজ পরীক্ষিৎ *শ্রীমদ্ভাগবত* শ্রবণ করেছিলেন, এবং তা কীর্তন করেছিলেন শ্রীল শুকদেব গোস্বামী। এই *শ্রীমদ্ভাগবতের* শ্রোতা এবং বক্তা উভয়েরই উদ্ধারের মাধ্যম ছিল এক।

শ্লোক ৪৩

কৃষ্ণে স্বধামোপগতে ধর্মজ্ঞানাদিভিঃ সহ।
কলৌ নষ্টদৃশামেষ পুরাণার্কোঽধুনোদিতঃ ॥ ৪৩ ॥

কৃষ্ণে—শ্রীকৃষ্ণ; **স্ব-ধাম**—স্বীয় ধাম; **উপগতে**—ফিরে গেলে; **ধর্ম**—ধর্ম; **জ্ঞান**—জ্ঞান; **আদিভিঃ**—যুক্ত; **সহ**—সহিত; **কলৌ**—কলিযুগে; **নষ্ট-দৃশাম্**—

দৃষ্টিহীন মানুষদের ; **এষঃ**—এই সমস্ত ; **পুরাণ-অর্কঃ**—সূর্যের মতো উজ্জ্বল পুরাণ ; **অধুনা**—এখন ; **উদিতঃ**—উদিত হয়েছে।

অনুবাদ

শ্রীকৃষ্ণ যখন তাঁর লীলা সংবরণ করে ধর্ম ও তত্ত্বজ্ঞান সহ নিজ ধামে গমন করলেন, তখন সূর্যের মতো উজ্জ্বল এই পুরাণের উদয় হয়েছে। কলিযুগের অন্ধকারে আচ্ছন্ন ভগবৎ-দর্শনে অক্ষম মানুষেরা এই পুরাণ থেকে আলোক প্রাপ্ত হবে।

তাৎপর্য

পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের নিত্য ধাম রয়েছে, সেখানে তিনি নিত্যকাল ধরে তাঁর নিত্য পার্ষদ এবং পরিকর সহ নিত্য আনন্দ উপভোগ করেন। তাঁর সেই নিত্য ধাম তাঁর অন্তরঙ্গা শক্তির প্রকাশ, কিন্তু এই জড় জগৎ হচ্ছে তাঁর বহিরঙ্গা শক্তির প্রকাশ। তিনি যখন এই জড় জগতে অবতরণ করেন, তখন তিনি তাঁর অন্তরঙ্গা শক্তি সহ সমস্ত পরিকরদের নিয়ে স্বয়ং প্রকাশিত হন ; তাকে বলা হয় আত্মমায়া। ভগবদ্গীতায় ভগবান বলেছেন যে, তিনি তাঁর স্বীয় শক্তির (আত্মমায়া) দ্বারা প্রকট হন। তাই তাঁর রূপ, নাম, লীলা, পরিকর, ধাম ইত্যাদি জড় সৃষ্টি নয়। তিনি আসেন বদ্ধ জীবদের উদ্ধার করার জন্য এবং ধর্ম সংস্থাপন করার জন্য। ধর্ম হচ্ছে ভগবানেরই প্রণীত আইন। ভগবান ছাড়া কেউই ধর্ম-তত্ত্ব স্থাপন করতে পারেন না। তিনি অথবা তাঁর শক্তির দ্বারা আবিষ্ট উপযুক্ত প্রতিনিধিই কেবল ধর্মতত্ত্ব নির্দেশ করতে পারেন। প্রকৃত ধর্মের অর্থ হচ্ছে—ভগবানকে জানা, তাঁর সঙ্গে আমাদের সম্পর্কের কথা জানা, তাঁর প্রতি আমাদের কর্তব্য সম্বন্ধে জানা এবং এই জড় দেহ ত্যাগ করার পর আমরা যে চরমে কোথায় যাব সে সম্বন্ধে জানা। জড় জগতের বন্ধনে আবদ্ধ বদ্ধ জীবেরা এই মহান উদ্দেশ্য সম্বন্ধে প্রায় কিছুই জানে না। তাদের অধিকাংশই পশুর মতো আহার, নিদ্রা, ভয় এবং মৈথুনে মগ্ন। তারা ধর্ম, জ্ঞান অথবা মুক্তির অছিলায় ইন্দ্রিয়-তৃপ্তির প্রচেষ্টায় ব্যস্ত। বিশেষ করে এই কলিযুগে তারা আরও বেশি অন্ধ হয়ে পড়েছে। এই কলিযুগের জনসাধারণ এক উন্নত স্তরের পশু ছাড়া আর কিছুই নয়। পারমার্থিক জ্ঞান অথবা ধর্মপরায়ণ জীবনের প্রতি তাদের কোন রকম স্পৃহা নেই। তারা এতই অন্ধ যে, তারা তাদের মন, বুদ্ধি অথবা অহংকারের ঊর্ধ্বে আর কিছুই দেখতে পায় না, কিন্তু তবুও তারা জ্ঞান, বিজ্ঞান এবং জাগতিক উন্নতির গর্বে অত্যন্ত গর্বিত। তাদের বর্তমান দেহ ত্যাগ করার পর তারা কুকুর অথবা শূকরের শরীর প্রাপ্ত হবে, কেন না মানব জীবনের প্রকৃত লক্ষ্য থেকে তারা সম্পূর্ণভাবে ভ্রষ্ট হয়েছে। কলিযুগ শুরু হওয়ার কিছু পূর্বে পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এই পৃথিবীতে আবির্ভূত হয়েছিলেন, এবং ঠিক কলিযুগ শুরু হওয়ার প্রারম্ভে তিনি তাঁর নিত্য ধামে ফিরে গিয়েছিলেন। তিনি যখন এখানে বর্তমান ছিলেন, তখন তাঁর কার্যকলাপের মাধ্যমে তিনি সব কিছু প্রদর্শন করে

গেছেন। তিনি বিশেষ করে *ভগবদ্গীতার* বাণী দান করে গেছেন এবং ধর্মের নামে যে সমস্ত প্রবঞ্চনা সমাজে চলছিল, সে সব তিনি নির্মূল করেছিলেন। আর এই জগৎ থেকে অপ্রকট হওয়ার পূর্বে তিনি শ্রীল নারদ মুনির মাধ্যমে শ্রীল ব্যাসদেবের মধ্যে শক্তি সঞ্চার করেছিলেন *শ্রীমদ্ভাগবত* প্রণয়ন করার জন্য। এইভাবে *ভগবদ্গীতা* হচ্ছে এই কলিযুগের অন্ধকারাচ্ছন্ন মানুষদের জন্য আলোকবাহী পথ-প্রদর্শকের মতো। অর্থাৎ, এই কলিযুগের মানুষ যদি জীবনের যথার্থ আলোক প্রাপ্ত হয়ে চায়, তা হলে কেবল এই দুটি গ্রন্থের শরণাপন্ন হতে হবে এবং তা হলেই তাদের জীবনের উদ্দেশ্য সফল হবে। *ভগবদ্গীতা* হচ্ছে *শ্রীমদ্ভাগবতের* প্রাথমিক পাঠ। আর *শ্রীমদ্ভাগবত* হচ্ছে জীবনের সার-সর্বস্ব, সাক্ষাৎ শ্রীকৃষ্ণ। তাই আমাদের অবশ্যই *শ্রীমদ্ভাগবতকে* শ্রীকৃষ্ণের প্রত্যক্ষ প্রতিনিধি বলে গ্রহণ করতে হবে। যিনি *শ্রীমদ্ভাগবতকে* দর্শন করতে পারেন, তিনি শ্রীকৃষ্ণকেও সাক্ষাৎ দর্শন করতে পারেন; কেন না *শ্রীমদ্ভাগবত* এবং শ্রীকৃষ্ণ অভিন্ন।

শ্লোক ৪৪

তত্র কীর্তয়তো বিপ্রা বিপ্রর্ষের্ভূরিতেজসঃ।
অহং চাধ্যগমং তত্র নিবিষ্টস্তদনুগ্রহাৎ।
সোঽহং বঃ শ্রাবয়িষ্যামি যথাধীতং যথামতি ॥ ৪৪ ॥

তত্র—সেখানে; **কীর্তয়তঃ**—কীর্তন করার সময়; **বিপ্রাঃ**—হে ব্রাহ্মণগণ; **বিপ্রর্ষেঃ**—মহান ব্রহ্মর্ষি থেকে; **ভূরি**—মহৎ; **তেজসঃ**—শক্তিশালী; **অহম্**—আমি; **চ**—ও; **অধ্যগমম্**—বুঝতে পেরেছিলেন; **তত্র**—সেই সভায়; **নিবিষ্টঃ**—পূর্ণ একাগ্রতা সহকারে; **তৎ-অনুগ্রহাৎ**—তাঁর কৃপার প্রভাবে; **সঃ**—সেই বিষয়; **অহম্**—আমি; **বঃ**—আপনাদের; **শ্রাবয়িষ্যামি**—শোনাব; **যথাধীতম্ যথামতি**—আমার উপলব্ধি অনুসারে।

অনুবাদ

হে তত্ত্বজ্ঞানী ব্রাহ্মণগণ, (মহারাজ পরীক্ষিতের সমক্ষে) শুকদেব গোস্বামী যখন শ্রীমদ্ভাগবত কীর্তন করেন, তখন নিবিষ্ট চিত্তে আমি তা শ্রবণ করেছিলাম, এবং তাই সেই মহান্ শক্তিশালী বিপ্রর্ষির কৃপায় আমি শ্রীমদ্ভাগবত হৃদয়ঙ্গম করেছিলাম। এখন তাঁর কাছ থেকে আমি যা শুনেছিলাম, তা আমার উপলব্ধি অনুসারে আপনাদের শোনাতে চেষ্টা করব।

তাৎপর্য

শুকদেব গোস্বামীর মতো আত্মজ্ঞানী মহাত্মার কাছ থেকে কেউ যখন *শ্রীমদ্ভাগবত* শ্রবণ করেন, তখন তাঁরা সেই গ্রন্থের প্রতিটি পৃষ্ঠায় প্রত্যক্ষভাবে শ্রীকৃষ্ণের উপস্থিতি

উপলব্ধি করতে পারেন। তথাকথিত যে সমস্ত ভাগবত-পাঠক অর্থ উপার্জন করার জন্য ভাগবত পাঠ করে এবং সেই অর্থ নিয়ে কামক্রীড়ায় লিপ্ত হয়, সেই সমস্ত মূর্খের ভাগবত পাঠ শুনে *শ্রীমদ্ভাগবতের* অর্থ হৃদয়ঙ্গম করা যায় না। যারা কামাসক্ত মানুষের সঙ্গ করে, তারা কখনও *শ্রীমদ্ভাগবতের* তত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করতে পারে না। সেটিই হচ্ছে *শ্রীমদ্ভাগবত* উপলব্ধির রহস্য। যে সমস্ত মানুষ তাদের জাগতিক জ্ঞানের মাধ্যমে ভাগবতের ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করে, তাদের কাছ থেকেও *শ্রীমদ্ভাগবতের* অর্থ জানা যায় না। শ্রীল শুকদেব গোস্বামীর আদর্শ প্রতিনিধি ছাড়া আর কারও কাছ থেকে *শ্রীমদ্ভাগবতের* শিক্ষা লাভ করা যায় না। কেউ যদি *শ্রীমদ্ভাগবতের* পৃষ্ঠায় পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করতে চান, তা হলে তাঁকে এই পন্থাই অবলম্বন করতে হবে। এটিই হচ্ছে যথার্থ পন্থা, এবং এ ছাড়া আর অন্য কোন উপায় নেই। শ্রীল সূত গোস্বামী হচ্ছেন শ্রীল শুকদেব গোস্বামীর আদর্শ প্রতিনিধি, কেন না সেই মহান্ ব্রহ্মর্ষির কাছ থেকে যেই জ্ঞান তিনি প্রাপ্ত হয়েছিলেন, তাই তিনি যথাযথভাবে প্রদান করেছিলেন। শ্রীল শুকদেব গোস্বামী তাঁর পিতা শ্রীল ব্যাসদেবের কাছ থেকে যেভাবে *শ্রীমদ্ভাগবত* শ্রবণ করেছিলেন, ঠিক সেইভাবেই তিনি তা প্রদান করেছিলেন, আর শ্রীল সূত গোস্বামীও প্রদান করেছিলেন ঠিক সেইভাবে, যেভাবে তিনি তা শ্রীল শুকদেব গোস্বামীর কাছ থেকে শ্রবণ করেছিলেন। কেবল শুনলেই হয় না, নিবিষ্ট চিত্তে তার অর্থ হৃদয়ঙ্গম করতে হয়। 'নিবিষ্ট' কথাটির অর্থ হচ্ছে যে, সূত গোস্বামী *শ্রীমদ্ভাগবতের* রসামৃত তাঁর কর্ণকুহরের মাধ্যমে পান করেছিলেন। সেটিই হচ্ছে *শ্রীমদ্ভাগবত* জ্ঞান লাভ করার প্রকৃত পন্থা। সম্পূর্ণভাবে নিবিষ্ট চিত্তে এই জ্ঞান আহরণ করতে হয় এবং তা হলেই কেবল *শ্রীমদ্ভাগবতের* প্রতিটি পৃষ্ঠায়, প্রতিটি শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণের উপস্থিতি উপলব্ধি করা যায়। এখানে *শ্রীমদ্ভাগবতের* জ্ঞান আহরণ করার রহস্য বর্ণিত হয়েছে। যার হৃদয় নির্মল নয়, পবিত্র নয়, সে কখনও নিবিষ্ট চিত্তে এই জ্ঞান আহরণ করতে পারে না। যে মানুষের কার্যকলাপ পবিত্র নয়, তার মনও পবিত্র হতে পারে না। আহার, নিদ্রা, ভয়, এবং মৈথুনাদির প্রভাবমুক্ত হয়ে যারা পবিত্র হয়নি, তাদের কার্যকলাপও পবিত্র হতে পারে না। কিন্তু কেউ যদি নিবিষ্ট চিত্তে উপযুক্ত বক্তার শ্রীমুখ থেকে *শ্রীমদ্ভাগবতের* বাণী শ্রবণ করেন, তা হলে নিঃসন্দেহে প্রথম থেকেই তিনি *শ্রীমদ্ভাগবতের* প্রতিটি পৃষ্ঠায় পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করতে পারবেন।

ইতি—"শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন সমস্ত অবতারের উৎস" নামক শ্রীমদ্ভাগবতের প্রথম স্কন্ধের তৃতীয় অধ্যায়ের ভক্তিবেদান্ত তাৎপর্য সমাপ্ত।

চতুর্থ অধ্যায়

শ্রীনারদ মুনির আবির্ভাব

শ্লোক ১

ব্যাস উবাচ

ইতি ব্রুবাণং সংস্তূয় মুনীনাং দীর্ঘসত্রিণাম্।
বৃদ্ধঃ কুলপতিঃ সূতং বহ্বৃচঃ শৌনকোঽব্রবীৎ ॥ ১ ॥

শব্দার্থ

ব্যাসঃ—শ্রীল ব্যাসদেব; **উবাচ**—বললেন; **ইতি**—এইভাবে; **ব্রুবাণম্**—বলে; **সংস্তূয়**—অভিনন্দন জানিয়ে; **মুনীনাম্**—মুনিদের; **দীর্ঘ**—দীর্ঘকালব্যাপী; **সত্রিণাম্**—যাঁরা যজ্ঞ-অনুষ্ঠানে রত ছিলেন; **বৃদ্ধঃ**—প্রবীণ; **কুল-পতিঃ**—সভার প্রধান; **সূতম্**—শ্রীল সূত গোস্বামীকে; **বহু-ঋচঃ**—বিদ্বান; **শৌনকঃ**—শৌনক নামক; **অব্রবীৎ**—বললেন।

অনুবাদ

সূত গোস্বামীকে এইভাবে বলতে শুনে সেই দীর্ঘকালব্যাপী যজ্ঞ অনুষ্ঠানে রত সমস্ত ঋষিদের মধ্যে সব চাইতে প্রবীণ এবং বিদ্বান শৌনক মুনি তাঁকে অভিনন্দন জানিয়ে বললেন।

তাৎপর্য

বিদ্বানদের সভায় যখন বক্তাকে অভিনন্দন জানানো হয়, তখন সভায় যিনি নেতৃস্থানীয় এবং বয়ঃপ্রবীণ, তিনি তাঁকে অভিনন্দন জানান। তাঁকে অবশ্যই মহান্ পণ্ডিতও হতে হয়। শ্রীশৌনক ঋষি সেই সমস্ত গুণে গুণান্বিত ছিলেন এবং শ্রীল সূত গোস্বামী যখন শ্রীল শুকদেব গোস্বামীর কাছ থেকে প্রাপ্ত *শ্রীমদ্ভাগবত* যথাযথভাবে প্রদান করার ইচ্ছা প্রকাশ করলেন, তখন শ্রীশৌনক ঋষি উঠে দাঁড়িয়ে তাঁকে অভিনন্দন জানালেন। ব্যক্তিগত উপলব্ধির অর্থ এই নয় যে,পূর্বতন আচার্যদের মর্যাদা লঙ্ঘন করার চেষ্টা করে গর্বোদ্ধতভাবে নিজের বিদ্যা জাহির করা। বক্তাকে অবশ্যই পূর্ণভাবে পূর্বতন আচার্যদের প্রতি শ্রদ্ধাসম্পন্ন হতে হবে এবং সেই বিষয়ে তাঁকে এত ভালভাবে অবগত হতে হবে, যাতে তিনি বিশেষ বিশেষ অবস্থা অনুসারে তা

উপস্থাপন করতে পারেন। সেই বিষয়ের মূল উদ্দেশ্য অবশ্যই অব্যাহত থাকে। তার কোন রকম অসৎ অর্থ করা কখনই উচিত নয়, তথাপি শ্রোতাদের বোধগম্য করার জন্য তা সহজ এবং উৎসাহব্যঞ্জকভাবে উপস্থাপন করা উচিত। তাকেই বলা হয় উপলব্ধ জ্ঞান। সেই সভার প্রধান শ্রীশৌনক ঋষি, বক্তা শ্রীল সূত গোস্বামীর মর্যাদা উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন। তিনি তাঁর মুখ থেকে 'যথাধীতম্' এবং 'যথামতি' শব্দ দুটি শ্রবণ করে তাঁর বক্তব্যের গভীরতা সম্বন্ধে অনুমান করতে পেরেছিলেন এবং তার ফলে অত্যন্ত আনন্দিত চিত্তে তিনি তাঁকে অভিনন্দন জানাতে চেয়েছিলেন। যে সমস্ত মানুষ পূর্বতন আচার্যদের প্রতিনিধিত্ব করে না, পণ্ডিতদের পক্ষে কখনই তাদের কথা শোনা উচিত নয়। এই সভায়, যেখানে দ্বিতীয়বার শ্রীমদ্ভাগবত আলোচনা হচ্ছিল, শ্রোতা এবং বক্তা উভয়েই ছিলেন আদর্শবাদী। সেটিই ভাগবত-পাঠের মান হওয়া উচিত, যাতে যথার্থ উদ্দেশ্য অনায়াসে সাধিত হতে পারে। সেই পরিবেশ যদি সৃষ্টি না করা হয়, তা হলে শ্রোতা এবং বক্তা উভয়ের ক্ষেত্রেই ভাগবত পাঠ কেবল অর্থহীন পরিশ্রম ছাড়া আর কিছু নয়।

শ্লোক ২

শৌনক উবাচ

সূত সূত মহাভাগ বদ নো বদতাং বর।
কথাং ভাগবতীং পুণ্যাং যদাহ ভগবাঞ্ছুকঃ ॥ ২ ॥

শৌনকঃ—শৌনক ঋষি; **উবাচ**—বললেন; **সূত সূত**—হে সূত গোস্বামী; **মহাভাগ**—মহা ভাগ্যবান; **বদ**—দয়া করে বলুন; **নঃ**—আমাদের; **বদতাম্**—যাঁরা বলতে পারেন; **বর**—শ্রদ্ধার্হ; **কথাম্**—বাণী; **ভাগবতীম্**—শ্রীমদ্ভাগবতের; **পুণ্যাম্**—পুণ্য; **যৎ**—যা; **আহ**—বললেন; **ভগবান্**—অত্যন্ত বীর্যবান; **শুকঃ**—শ্রীশুকদেব গোস্বামী।

অনুবাদ

শৌনক ঋষি বললেনঃ হে সূত গোস্বামী, যাঁরা আবৃত্তি করতে পারেন এবং বলতে পারেন, তাঁদের মধ্যে আপনিই হচ্ছেন সব চাইতে ভাগ্যবান এবং শ্রদ্ধার্হ। আপনি দয়া করে শ্রীমদ্ভাগবতের পবিত্র বাণী বর্ণনা করুন, যা মহান্ শক্তিশালী মহর্ষি শ্রীল শুকদেব গোস্বামী কর্তৃক পূর্বে বর্ণিত হয়েছিল।

তাৎপর্য

এখানে শৌনক ঋষি শ্রীল সূত গোস্বামীকে দু'বার তাঁর নাম ধরে সম্বোধন করেছিলেন, কেন না তিনি এবং সেই সভার সমস্ত সদস্যরা শ্রীল শুকদেব গোস্বামীর মুখ-নিঃসৃত শ্রীমদ্ভাগবত শোনবার জন্য অত্যন্ত উৎসুক ছিলেন এবং তাই তিনি

অত্যন্ত গভীরভাবে আনন্দিত হয়েছিলেন। কোন মূর্খ লোকের কাছ থেকে তার নিজের উদ্দেশ্য সাধনের জন্য মনগড়া কতকগুলি ব্যাখ্যা শুনতে তাঁরা উৎসাহী ছিলেন না। সাধারণত তথাকথিত সমস্ত ভাগবত পাঠকেরা হয় জীবিকা-নির্বাহের জন্য ভাগবত পাঠ করে, নয়ত তারা হচ্ছে তথাকথিত মায়াবাদী পণ্ডিত, যারা পরমেশ্বর ভগবানের অপ্রাকৃত লীলায় প্রবেশ করতে পারে না। এই ধরনের মায়াবাদীরা তাদের নির্বিশেষ মতবাদ প্রতিষ্ঠা করার উদ্দেশ্যে ভাগবতের কদর্থ করে। আর পেশাদারি ভাগবত পাঠকেরা সরাসরিভাবে *শ্রীমদ্ভাগবতের* দশম স্কন্ধে প্রবেশ করে পরমেশ্বর ভগবানের গুহ্যতম লীলার ভ্রান্ত ব্যাখ্যা করে। *শ্রীমদ্ভাগবতের* এই দু'রকম পাঠকেরাই ভাগবত পাঠের অযোগ্য। যাঁরা শ্রীল শুকদেব গোস্বামী প্রদত্ত ব্যাখ্যার আলোকে *শ্রীমদ্ভাগবতের* বাণী প্রচার করতে প্রস্তুত এবং যাঁরা শ্রীল শুকদেব গোস্বামীর শ্রীমুখ থেকে এবং তাঁর প্রতিনিধির শ্রীমুখ থেকে *শ্রীমদ্ভাগবত* শ্রবণ করতে প্রস্তুত, তাঁরাই কেবল *শ্রীমদ্ভাগবতের* অপ্রাকৃত মহিমা আলোচনা করার উপযুক্ত।

শ্লোক ৩

কস্মিন্ যুগে প্রবৃত্তেয়ং স্থানে বা কেন হেতুনা।
কুতঃ সঞ্চোদিতঃ কৃষ্ণঃ কৃতবান্ সংহিতাং মুনিঃ ॥ ৩ ॥

কস্মিন্—কোন্; **যুগে**—যুগে; **প্রবৃত্তা**—শুরু হয়েছিল; **ইয়ম্**—এই; **স্থানে**—স্থানে; **বা**—অথবা; **কেন**—কোন্; **হেতুনা**—কারণের দ্বারা; **কুতঃ**—কোথা থেকে; **সঞ্চোদিতঃ**—অনুপ্রাণিত হয়ে; **কৃষ্ণঃ**—শ্রীকৃষ্ণ-দ্বৈপায়ন ব্যাস; **কৃতবান্**—সংকলন করেছিলেন; **সংহিতাম্**—বৈদিক শাস্ত্র; **মুনিঃ**—তত্ত্বজ্ঞানী।

অনুবাদ

কোন্ সময়ে এবং কোন্ স্থানে তা প্রথম শুরু হয়েছিল, আর কেনই বা তা গ্রহণ করা হয়েছিল? মহামুনি শ্রীকৃষ্ণ-দ্বৈপায়ন ব্যাস কোথা থেকে এই শাস্ত্র প্রণয়ন করার অনুপ্রেরণা লাভ করেছিলেন?

তাৎপর্য

যেহেতু *শ্রীমদ্ভাগবত* হচ্ছে শ্রীল ব্যাসদেবের বিশেষ দান, তাই মহাজ্ঞানী শ্রীশৌনক ঋষি সে সম্বন্ধে প্রশ্ন করেছেন। তাঁরা জানতেন যে অল্প বুদ্ধিসম্পন্ন স্ত্রী, শূদ্র এবং দ্বিজবন্ধুদের বোধগম্য করার জন্য শ্রীল ব্যাসদেব ইতিমধ্যেই বৈদিক শাস্ত্রকে মহাভারত পর্যন্ত বিভিন্নভাবে বিশ্লেষণ করেছিলেন। *শ্রীমদ্ভাগবত* সে সবের অতীত, কেন না কোন রকম জড় বিষয়ের সঙ্গে তার কোন সম্পর্ক নেই। তাই এই প্রশ্নগুলি ছিল অত্যন্ত বুদ্ধিমত্তা-সম্পন্ন এবং প্রাসঙ্গিক।

শ্লোক ৪

তস্য পুত্রো মহাযোগী সমদৃঙ্ নির্বিকল্পকঃ ।
একান্তমতিরুন্নিদ্রো গূঢ়ো মূঢ় ইবেয়তে ॥ ৪ ॥

তস্য—তাঁর; **পুত্রঃ**—পুত্র; **মহা-যোগী**—মহান্ ভক্ত; **সমদৃক্**—সমদ্রষ্টা; **নির্বিকল্পকঃ**—পরম অদ্বৈতবাদী; **একান্ত-মতিঃ**—একাগ্র-চিত্ত; **উন্নিদ্রঃ**—যিনি অজ্ঞানের অন্ধকার অতিক্রম করেছেন; **গূঢ়ঃ**—অপ্রকাশিত; **মূঢ়ঃ**—মূঢ়; **ইব**—এইরূপ; **ইয়তে**—প্রতিভাত হয়।

অনুবাদ

তাঁর (ব্যাসদেবের) পুত্র ছিলেন এক মহান্ ভক্ত, এক অদ্বিতীয় তত্ত্বজ্ঞানী, এবং তাঁর চিত্ত ছিল সর্বদাই পরমার্থ সাধনে একাগ্র। তিনি সব রকম জড়-জাগতিক কার্যকলাপের ঊর্ধ্বে ছিলেন এবং যদিও তিনি জ্ঞানী ছিলেন, কিন্তু আপাতদৃষ্টিতে তাঁকে দেখে একজন মূঢ় লোক বলে মনে হত।

তাৎপর্য

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী ছিলেন মুক্ত পুরুষ, এবং তাই তিনি সর্বদাই সচেতন থাকতেন, যাতে মায়ার দ্বারা তিনি আবদ্ধ না হয়ে পড়েন। ভগবদ্গীতায় এইভাবে সতর্ক থাকার কথা অত্যন্ত সুন্দরভাবে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। মুক্ত জীব এবং বদ্ধ জীবের কার্যকলাপ সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের। মুক্ত জীবেরা সর্বদাই পারমার্থিক উদ্দেশ্য সাধনের প্রগতিশীল পথে যুক্ত থাকেন, যা জীবেদের কাছে স্বপ্নের মতো অলীক বলে প্রতিভাত হয়। বদ্ধ জীবেরা মুক্ত জীবদের অপ্রাকৃত কার্যকলাপের কথা কল্পনাও করতে পারে না। বদ্ধ জীবেরা যখন পারমার্থিক কার্যকলাপের স্বপ্ন দেখে, মুক্ত জীবেরা তখন পূর্ণরূপে জাগরিত। তেমনই মুক্ত জীবদের কাছে বদ্ধ জীবনের কার্যকলাপ স্বপ্নের মত। বদ্ধ জীব এবং মুক্ত জীবদের আপাতদৃষ্টিতে একই স্তরে অধিষ্ঠিত বলে মনে হয়, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাদের কার্যকলাপ ভিন্ন। বদ্ধ জীবেদের চিত্তবৃত্তি সর্বদা ইন্দ্রিয়-সুখভোগের চিন্তায় মগ্ন, পক্ষান্তরে মুক্ত জীবেরা সর্বদাই পরমার্থ সাধনে তৎপর। বদ্ধ জীবেরা সর্বদাই জড় বিষয়ে আসক্ত, আর মুক্ত জীব জড় বিষয়ের প্রতি সম্পূর্ণভাবে উদাসীন। এই পার্থক্য পরবর্তী শ্লোকে বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

শ্লোক ৫

দৃষ্ট্বানুয়ান্তমৃষিমাত্মজমপ্যনগ্নং
দেব্যো হ্রিয়া পরিদধুর্ন সুতস্য চিত্রম্ ।

তদ্বীক্ষ্য পৃচ্ছতি মুনৌ জগদুস্তবাস্তি
স্ত্রীপুম্ভিদা ন তু সুতস্য বিবিক্তদৃষ্টেঃ ॥ ৫ ॥

দৃষ্ট্বা—দর্শন করে; **অনুযান্তম্**—অনুসরণ করে; **ঋষিম্**—ঋষি; **আত্মজম্**—তাঁর পুত্র; **অপি**—তা সত্ত্বেও; **অনগ্নম্**—নগ্ন নয়; **দেব্যঃ**—সুন্দরী মহিলারা; **হ্রিয়া**—লজ্জাবশত; **পরিদধুঃ**—বস্ত্র পরিধান করেছিলেন; **ন**—না; **সুতস্য**—পুত্রের; **চিত্রম্**—বিস্মিত হয়ে; **তৎ-বীক্ষ্য**—তা দেখে; **পৃচ্ছতি**—জিজ্ঞাসা করেছিলেন; **মুনৌ**—মহামুনি ব্যাসদেবকে; **জগদুঃ**—উত্তর দিয়েছিলেন; **তব**—আপনার; **অস্তি**—রয়েছে; **স্ত্রী-পুম্**—স্ত্রী এবং পুরুষ; **ভিদা**—পার্থক্য; **ন**—না; **তু**—কিন্তু; **সুতস্য**—পুত্রের; **বিবিক্ত**—পবিত্র; **দৃষ্টেঃ**—দৃষ্টিসম্পন্ন।

অনুবাদ

শ্রীল ব্যাসদেব যখন তাঁর পুত্রকে অনুসরণ করছিলেন, তখন নগ্ন অবস্থায় স্নানরতা সুন্দরী যুবতীরা, যাঁরা ব্যাসদেবের নগ্ন যুবক-পুত্রকে দেখে কোন রকম লজ্জা অনুভব করেননি, তাঁরা অনগ্ন ব্যাসদেবকে দেখে লজ্জাবশত তাঁদের বস্ত্র পরিধান করেছিলেন। সেই সম্বন্ধে ব্যাসদেব যখন তাঁদের জিজ্ঞাসা করেছিলেন, তখন সেই যুবতীরা উত্তর দিয়েছিলেন যে, তাঁর পুত্রের পবিত্র দৃষ্টিতে স্ত্রী এবং পুরুষে কোন ভেদ ছিল না, কিন্তু মহর্ষির দৃষ্টিতে সেই ভেদ ছিল।

তাৎপর্য

ভগবদ্গীতায় (৫/১৮) বলা হয়েছে যে, তত্ত্বজ্ঞানী ঋষি তাঁর আধ্যাত্মিক দর্শনে বিদ্যা-বিনয়-সম্পন্ন ব্রাহ্মণ, চণ্ডাল, কুকুর, গাভী এবং হস্তী—এদের সকলকেই সমদৃষ্টিতে দর্শন করেন। শ্রীল শুকদেব গোস্বামী সেই স্তরে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তাই তাঁর দৃষ্টিতে স্ত্রী অথবা পুরুষ ভেদ ছিল না। তিনি বিভিন্ন পোশাকে সমস্ত জীবাত্মাদের দর্শন করতেন। সরোবরে স্নানরতা দেবাঙ্গনারা মানুষের আচরণ দেখে তাদের মনোভাব বুঝতে পারতেন, ঠিক যেমন একটি শিশুকে দেখে বোঝা যায় সে কত সরল। শুকদেব গোস্বামী ছিলেন ষোল বছর বয়স্ক বালক, তাই তাঁর দেহের প্রতিটি অঙ্গ সুগঠিত ছিল। তিনি নগ্ন ছিলেন এবং দেবাঙ্গনারাও নগ্ন ছিলেন। কিন্তু যেহেতু শুকদেব গোস্বামীর চিত্তে কামভাবের লেশমাত্রও ছিল না, তাই তাঁর আচরণ ছিল অত্যন্ত সরল। সেই দেবাঙ্গনারা তাঁদের বিশেষ যোগ্যতার দ্বারা তা বুঝতে পেরেছিলেন এবং তাই তাঁরা তাঁকে দেখে বিচলিত হননি। কিন্তু শুকদেব গোস্বামীর পিতা ব্যাসদেবকে দেখে তাঁরা লজ্জাবশত বস্ত্র পরিধান করেছিলেন। সেই মহিলারা ছিলেন তাঁর কন্যা বা পৌত্রীর মতো, কিন্তু তবুও ব্যাসদেবকে দেখে তাঁরা সামাজিক রীতি অনুসারে আচরণ করেছিলেন। কেন না শ্রীল ব্যাসদেব গৃহস্থ আশ্রমে অধিষ্ঠিত থাকার লীলাবিলাস করেছিলেন। গৃহস্থকে স্ত্রী এবং পুরুষের মধ্যে পার্থক্য নিরূপণ

করতে হয়, তা না হলে তিনি গৃহস্থ হতে পারেন না। তাই মানুষের কর্তব্য হচ্ছে স্ত্রী এবং পুরুষের ভেদ দর্শন না করে সব রকম আসক্তি রহিত হয়ে আত্মাকে জানার প্রচেষ্টা করা। যতক্ষণ পর্যন্ত এই ভেদজ্ঞান থাকে, ততক্ষণ শুকদেব গোস্বামীর মতো সন্ন্যাসী হওয়ার চেষ্টা করা উচিত নয়। অন্তত তত্ত্বগতভাবে সচেতন হওয়া উচিত যে, জীব স্ত্রী অথবা পুরুষ কোনটিই নয়। প্রকৃতির দেওয়া বাইরের পোশাকরূপী জড় দেহটি স্ত্রী বা পুরুষ রূপ ধারণ করে যৌন-আবেদন দ্বারা পরস্পরকে আকৃষ্ট করে জড় জগতের বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে পড়ে। মুক্ত পুরুষ এই ধরনের বিকৃত ভেদজ্ঞানের অতীত। তিনি সমস্ত জীবের প্রতি সমদৃষ্টিসম্পন্ন। তাঁর দৃষ্টিতে কোনও ভেদজ্ঞান নেই। এই আধ্যাত্মিক দৃষ্টির পূর্ণতা লাভ হয় মুক্ত অবস্থায় এবং শ্রীল শুকদেব গোস্বামী সেই স্তরে অধিষ্ঠিত ছিলেন। শ্রীল ব্যাসদেবও চিন্ময় স্তরে অধিষ্ঠিত ছিলেন, কিন্তু যেহেতু তিনি গৃহস্থ জীবন-যাপন করছিলেন, তাই প্রচলিত রীতি অনুসারে সন্ন্যাসীর মতো আচরণ করেননি।

শ্লোক ৬

কথমালক্ষিতঃ পৌরৈঃ সম্প্রাপ্তঃ কুরুজাঙ্গলান্।
উন্মত্তমূকজড়বদ্বিচরন্ গজসাহ্বয়ে ॥ ৬ ॥

কথম্—কিভাবে; **আলক্ষিতঃ**—চিনতে পেরে; **পৌরৈঃ**—পুরবাসীদের দ্বারা; **সম্প্রাপ্তঃ**—পৌঁছানোর পর; **কুরু-জাঙ্গলান্**—কুরু-জাঙ্গল প্রদেশে; **উন্মত্ত**—উন্মাদ; **মূক**—মূক; **জড়বৎ**—জড়ের মতো; **বিচরন্**—বিচরণ করতে করতে; **গজ-সাহ্বয়ে**—হস্তিনাপুরে।

অনুবাদ

কুরু এবং জাঙ্গল প্রদেশে উন্মাদ, মূক এবং জড়ের মতো বিচরণ করে তিনি যখন হস্তিনাপুর (আধুনিক দিল্লী) নগরে প্রবেশ করলেন, তখন পুরবাসীরা ব্যাসদেব-তনয় শ্রীল শুকদেব গোস্বামীকে কিভাবে চিনতে পারলেন?

তাৎপর্য

আধুনিক দিল্লী নগরী পূর্বে হস্তিনাপুর নামে পরিচিত ছিল, কেন না মহারাজ হস্তি সেই নগর প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। শুকদেব গোস্বামী তাঁর পিত্রালয় পরিত্যাগ করার পর উন্মাদের মতো ইতস্তত বিচরণ করেছিলেন, এবং তাই পুরবাসীদের পক্ষে তাঁর অতি উন্নত অবস্থার কথা বুঝতে পারা অত্যন্ত কঠিন ছিল। চোখ দিয়ে দেখে সাধুকে চেনা যায় না, তাঁকে চিনতে হয় তাঁর মুখ-নিঃসৃত বাণী শ্রবণ করে। তাই চোখ দিয়ে দর্শন করার জন্য কোন সাধু বা মহাত্মার কাছে যাওয়া উচিত নয়, তাঁর কাছে যাওয়া উচিত তাঁর মুখের কথা শোনার জন্য। কেউ যদি সাধুর উপদেশ শুনতে প্রস্তুত না থাকে, তা

হলে কেবল সাধুকে দর্শন করে কোনও লাভ হয় না। শুকদেব গোস্বামী ছিলেন পরমেশ্বর ভগবানের অপ্রাকৃত লীলাবিলাসের কাহিনী বর্ণনে সক্ষম সাধু। তিনি জনসাধারণের মনোরঞ্জনের কোন রকম প্রয়াস করেননি। তাঁকে চেনা গিয়েছিল যখন তিনি শ্রীমদ্ভাগবতের কীর্তন করতে শুরু করেন। তিনি যাদুকরের ভেল্কিবাজি দেখাবার প্রচেষ্টা করেন নি। বাহ্যিক দৃষ্টিতে তাঁকে দেখে মনে হয়েছিল যেন জড়, মূক এক উন্মাদ, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তিনি ছিলেন সর্বশ্রেষ্ঠ মহাত্মা।

শ্লোক ৭

কথং বা পাণ্ডবেয়স্য রাজর্ষের্মুনিনা সহ।
সংবাদঃ সমভূত্তাত যত্রৈষা সাত্বতী শ্রুতিঃ ॥ ৭ ॥

কথম্—কিভাবে; **বা**—ও; **পাণ্ডবেয়স্য**—পাণ্ডবদের বংশধর (পরীক্ষিৎ); **রাজর্ষেঃ**—যে রাজা ছিলেন ঋষি; **মুনিনা**—মুনিদের; **সহ**—সঙ্গে; **সংবাদঃ**—আলোচনা; **সমভূৎ**—হয়েছিল; **তাত**—হে প্রিয়; **যত্র**—যেখানে; **এষা**—এইভাবে; **সাত্বতী**—চিন্ময়; **শ্রুতিঃ**—বেদের নির্যাস।

অনুবাদ

কিভাবে মহারাজ পরীক্ষিতের সঙ্গে এই মহর্ষির সাক্ষাৎ হল, যার ফলে সমস্ত বেদের অপ্রাকৃত নির্যাস (শ্রীমদ্ভাগবত) তাঁর কাছে কীর্তিত হয়েছিল?

তাৎপর্য

শ্রীমদ্ভাগবতকে এখানে সমস্ত বেদের নির্যাস বলে বর্ণনা করা হয়েছে। শ্রীমদ্ভাগবত কোন মনগড়া অলীক কল্পনা নয়, যা কখনও কখনও অল্পজ্ঞ মানুষেরা মনে করে থাকে। তাকে বলা হয় শুক-সংহিতা, অথবা মহর্ষি শুকদেব গোস্বামীর মুখ-নিঃসৃত বৈদিক মন্ত্র।

শ্লোক ৮

স গোদোহনমাত্রং হি গৃহেষু গৃহমেধিনাম্।
অবেক্ষতে মহাভাগস্তীর্থীকুর্বংস্তদাশ্রমম্ ॥ ৮ ॥

সঃ—তিনি (শুকদেব গোস্বামী); **গো-দোহন-মাত্রম্**—গোদোহনকাল পর্যন্ত; **হি**—অবশ্যই; **গৃহেষু**—গৃহে; **গৃহ-মেধিনাম্**—গৃহমেধিদের; **অবেক্ষতে**—অপেক্ষা করতেন; **মহা-ভাগঃ**—অত্যন্ত ভাগ্যবান; **তীর্থী**—তীর্থ; **কুর্বন্**—রূপান্তরিত করতেন; **তৎ আশ্রমম্**—সেই গৃহ।

অনুবাদ

তিনি (শুকদেব গোস্বামী) গোদোহনকাল পর্যন্ত গৃহমেধিদের দুয়ারে অবস্থান করতেন, এবং তিনি তা করতেন কেবল তাদের গৃহকে পবিত্র করার জন্য।

তাৎপর্য

শুকদেব গোস্বামী মহারাজ পরীক্ষিতের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে তাঁকে *শ্রীমদ্ভাগবতের* তত্ত্ব বিশ্লেষণ করে শুনিয়েছিলেন। তিনি কোন গৃহস্থের গৃহে আধ ঘন্টার বেশি (গোদোহন করার জন্য যতটুকু সময় লাগে) অবস্থান করতেন না, এবং তিনি ভাগ্যবান গৃহস্থদের কাছ থেকে ভিক্ষা গ্রহণ করতেন। তা তিনি করতেন তাঁর পবিত্র উপস্থিতির দ্বারা তাদের গৃহকে পবিত্র করার জন্য। তাই শুকদেব গোস্বামী হচ্ছেন অপ্রাকৃত স্তরে অধিষ্ঠিত আদর্শ প্রচারক। যাঁরা সন্ন্যাস আশ্রম গ্রহণ করেছেন এবং ভগবানের বাণী প্রচার করার ব্রত গ্রহণ করেছেন, শুকদেব গোস্বামীর আচরণ থেকে তাঁদের এই শিক্ষা লাভ করা উচিত যে, দিব্য জ্ঞান দান করা ছাড়া গৃহস্থদের গৃহে তাঁদের করণীয় আর কিছু নেই। তাদের গৃহকে পবিত্র করার উদ্দেশ্যেই কেবল গৃহস্থদের কাছ থেকে ভিক্ষা গ্রহণ করা উচিত। যাঁরা সন্ন্যাস আশ্রম গ্রহণ করেছেন তাঁদের কখনই গৃহস্থদের জাগতিক ঐশ্বর্যের চাকচিক্য দর্শন করে মোহিত হওয়া উচিত নয় এবং এইভাবে বিষয়ীদের অনুগত হয়ে পড়া উচিত নয়। যিনি সন্ন্যাস আশ্রম গ্রহণ করেছেন তাঁর পক্ষে তা বিষপান করা অথবা আত্মহত্যা করার সমতুল্য।

শ্লোক ৯

অভিমন্যুসুতং সূত প্রাহুর্ভাগবতোত্তমম্।
তস্য জন্ম মহাশ্চর্যং কর্মাণি চ গৃণীহি নঃ ॥ ৯ ॥

অভিমন্যু-সুতম্—অভিমন্যুর পুত্র; **সূত**—হে সূত; **প্রাহুঃ**—কথিত আছে; **ভাগবত-উত্তমম্**—পরমেশ্বর ভগবানের উত্তম ভক্ত; **তস্য**—তাঁর; **জন্ম**—জন্ম; **মহাশ্চর্যম্**—অত্যন্ত আশ্চর্যজনক; **কর্মাণি**—কার্যকলাপ; **চ**—এবং; **গৃণীহি**—দয়া করে বলুন; **নঃ**—আমাদের।

অনুবাদ

কথিত আছে যে, অভিমন্যু-পুত্র মহারাজ পরীক্ষিৎ হচ্ছেন পরমেশ্বর ভগবানের এক মহান্ ভক্ত এবং তাঁর জন্ম এবং কার্যকলাপ অত্যন্ত অদ্ভুত। দয়া করে আপনি আমাদের তাঁর কথা বলুন।

তাৎপর্য

পরীক্ষিৎ মহারাজের জন্ম অত্যন্ত আশ্চর্যজনক, কেন না তিনি যখন তাঁর মাতৃগর্ভে ছিলেন তখন পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাঁকে রক্ষা করেছিলেন। তাঁর কার্যকলাপও অত্যন্ত অদ্ভুত, কেন না গাভী হত্যা করতে উদ্যত কলিকে তিনি দণ্ডদান করেছিলেন। গো-হত্যা করা হলে মানব সমাজের সর্বনাশ হয়। গাভী-হত্যা করতে উদ্যত পাপের প্রতিনিধির হাত থেকে তিনি গাভীকে রক্ষা করেছিলেন। তাঁর দেহত্যাগও অত্যন্ত অদ্ভুত, কেন না তিনি পূর্বেই তাঁর দেহত্যাগের সময়ের কথা জানতে পেরেছিলেন, যা যে কোন মরণশীল মানুষদের পক্ষে অত্যন্ত অদ্ভুত, এবং তাই তিনি গঙ্গার তীরে প্রায়োপবেশনে উপবিষ্ট হয়ে পরমেশ্বর ভগবানের অপ্রাকৃত লীলাবিলাসের কাহিনী শ্রবণ করতে করতে দেহত্যাগের জন্য প্রস্তুত হয়েছিলেন। সেই সাতদিন তিনি সর্বক্ষণ শ্রীমদ্ভাগবত শ্রবণ করেছিলেন। তিনি কোন কিছু আহার করেননি অথবা পান করেননি এবং এক মুহূর্তও ঘুমোননি। তাই তাঁর সব কিছুই ছিল অত্যন্ত অদ্ভুত এবং তাঁর কার্যকলাপ মনোযোগ সহকারে শ্রবণ করার যোগ্য। এখানে তাঁর সম্বন্ধে বিস্তারিতভাবে শ্রবণ করার বাসনা পোষণ করা হয়েছে।

শ্লোক ১০

স সম্রাট্ কস্য বা হেতোঃ পাণ্ডূনাং মানবর্ধনঃ ।
প্রায়োপবিষ্টো গঙ্গায়ামনাদৃত্যাধিরাট্‌শ্রিয়ম্ ॥ ১০ ॥

সঃ—তিনি; **সম্রাট্**—সম্রাট; **কস্য**—কি জন্য; **বা**—অথবা; **হেতোঃ**—কারণে; **পাণ্ডূনাম্**—পাণ্ডু-পুত্রদের; **মান-বর্ধনঃ**—বংশের মান বর্ধনকারী; **প্রায়-উপবিষ্টঃ**—অনশন করতে বসে; **গঙ্গায়াম্**—গঙ্গার তীরে; **অনাদৃত্য**—অবহেলা করে; **অধিরাট্**—অধিকৃত রাজ্য; **শ্রিয়ম্**—ঐশ্বর্য।

অনুবাদ

তিনি ছিলেন এক মহান্ সম্রাট এবং তাঁর রাজ্যের সমস্ত ঐশ্বর্যের তিনি ছিলেন অধীশ্বর। তিনি এতই মহিমান্বিত ছিলেন যে, তিনি পাণ্ডু-বংশের মান বর্ধন করেছিলেন। তিনি কেন সব কিছু পরিত্যাগ করে গঙ্গার তীরে উপবিষ্ট হয়ে অনশনরত অবস্থায় মৃত্যুর প্রতীক্ষা করছিলেন?

তাৎপর্য

মহারাজ পরীক্ষিৎ ছিলেন সসাগরা পৃথিবীর অধীশ্বর এবং তাঁকে তাঁর নিজের প্রচেষ্টার দ্বারা এই বিশাল সাম্রাজ্য লাভ করতে হয়নি। তিনি তাঁর পিতামহ মহারাজ যুধিষ্ঠির এবং তাঁর ভাইদের কাছ থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে তা প্রাপ্ত হয়েছিলেন। আর তা

ছাড়া তাঁর পূর্বপুরুষদের সুযোগ্য বংশধররূপে তিনি অত্যন্ত যোগ্যতা সহকারে রাজ্যশাসন করেছিলেন। তাঁর ঐশ্বর্য এবং তাঁর রাজ্য পরিচালনায় কোন রকম অবাঞ্ছিত কিছু ছিল না; তা হলে কেন তিনি সেই সুখের জীবন পরিত্যাগ করে গঙ্গার তীরে উপবিষ্ট হয়ে অনশন করে মৃত্যুর প্রতীক্ষা করছিলেন? তা ছিল অত্যন্ত আশ্চর্যজনক এবং তাই সকলেই সেই কারণ জানবার জন্য উদ্‌গ্রীব হয়েছিলেন।

শ্লোক ১১

নমন্তি যৎপাদনিকেতমাত্মনঃ শিবায় হানীয় ধনানি শত্রবঃ।
কথং স বীরঃশ্রিয়মঙ্গ দুস্ত্যজাং যুবৈষতোৎস্রষ্টুমহো সহাসুভিঃ ॥ ১১ ॥

নমন্তি—নমস্কার করে; **যৎ-পাদ**—যাঁর শ্রীপাদপদ্ম; **নিকেতম্**—নিম্নে; **আত্মনঃ**—স্বীয়; **শিবায়**—মঙ্গল; **হানীয়**—নিয়ে আসত; **ধনানি**—ধনসম্পদ; **শত্রবঃ**—শত্রুরা; **কথম্**—কি কারণে; **সঃ**—তিনি; **বীরঃ**—বীর; **শ্রিয়ম্**—ঐশ্বর্য; **অঙ্গ**—হে; **দুস্ত্যজাম্**—দুস্ত্যজ; **যুবা**—পূর্ণ যৌবন; **ঐষত**—আকাঙ্ক্ষা করেছিলেন; **উৎস্রষ্টুম্**—ত্যাগ করতে; **অহো**—বিস্ময়সূচক; **সহ**—সঙ্গে; **অসুভিঃ**—জীবন।

অনুবাদ

তিনি ছিলেন এতই মহান্ এক সম্রাট যে,তাঁর সমস্ত শত্রুরা তাঁর পদতলে প্রণতি নিবেদন করে তাদের নিজেদের মঙ্গলের জন্য তাদের সমস্ত ঐশ্বর্য সমর্পণ করত। তিনি ছিলেন পূর্ণ যৌবনসম্পন্ন মহাবীর এবং তিনি ছিলেন অসীম রাজকীয় ঐশ্বর্যের অধীশ্বর। তিনি কেন সব কিছু, এমন কি তাঁর জীবন পর্যন্ত ত্যাগ করতে ইচ্ছা করেছিলেন?

তাৎপর্য

তাঁর জীবনে অবাঞ্ছিত কিছুই ছিল না। তিনি ছিলেন পূর্ণ যৌবনসম্পন্ন এবং তাঁর শক্তি এবং ঐশ্বর্য সহকারে তিনি তাঁর জীবন উপভোগ করতে পারতেন। সুতরাং কর্মমুখর জীবন থেকে অবসর গ্রহণ করার কোন প্রশ্নই ছিল না। তাঁর রাজ্যের রাজস্ব আদায় করতে তাঁর কোন রকম অসুবিধা ছিল না, কেন না তিনি ছিলেন এতই শক্তিমান এবং বীর্যবান যে তাঁর শত্রুরা পর্যন্ত তাঁর পদতলে প্রণতি নিবেদন করে নিজেদের মঙ্গলের জন্য তাদের সমস্ত সম্পদ সমর্পণ করত। মহারাজ পরীক্ষিৎ ছিলেন এক পুণ্যবান রাজা। তিনি তাঁর শত্রুদের পরাভূত করেছিলেন এবং তাই তাঁর রাজ্য ছিল ঐশ্বর্যে পরিপূর্ণ। সেখানে অপর্যাপ্ত দুধ ছিল, শস্য ছিল, ধাতু ছিল এবং সমস্ত নদ-নদী এবং গিরিপর্বত ছিল মণিরত্নে পরিপূর্ণ। সুতরাং, জাগতিক দিক দিয়ে সব কিছুই ছিল সন্তুষ্টিজনক। তাই অসময়ে তাঁর রাজ্য ত্যাগ করার এবং জীবন ত্যাগ করার কোন প্রশ্নই ছিল না। ঋষিরা এই সমস্ত বিষয়ে শ্রবণ করতে অত্যন্ত আগ্রহী হয়েছিলেন।

শ্লোক ১২

শিবায় লোকস্য ভবায় ভূতয়ে য উত্তমশ্লোকপরায়ণা জনাঃ।
জীবন্তি নাত্মার্থমসৌ পরাশ্রয়ং মুমোচ নির্বিদ্য কুতঃ কলেবরম্ ॥ ১২ ॥

শিবায়—মঙ্গল; **লোকস্য**—জীবসমূহের; **ভবায়**—প্রগতির সাধনের জন্য; **ভূতয়ে**—অর্থনৈতিক উন্নতির জন্য; **যে**—যিনি; **উত্তম-শ্লোক-পরায়ণাঃ**—পরমেশ্বর ভগবানের প্রতি ভক্তিপরায়ণ; **জনাঃ**—মানুষের; **জীবন্তি**—জীবনধারণ করে; **ন**—কিন্তু না; **আত্ম-অর্থম্**—ব্যক্তিগত স্বার্থে; **অসৌ**—যা; **পরাশ্রয়ম্**—অপরের আশ্রয়; **মুমোচ**—পরিত্যাগ করে; **নির্বিদ্য**—সমস্ত আসক্তি থেকে মুক্ত; **কুতঃ**—কি কারণে; **কলেবরম্**—জড় দেহ।

অনুবাদ

যাঁরা পরমেশ্বর ভগবানের প্রতি ভক্তিপরায়ণ, তাঁরা কেবল অপরের মঙ্গল সাধন, উন্নতি সাধন এবং সুখ-প্রদানের জন্য জীবন ধারণ করেন। তাঁরা কোন রকম স্বার্থসিদ্ধির জন্য জীবন যাপন করেন না। তাই মহারাজ (পরীক্ষিৎ) যদিও সব রকম জড়-জাগতিক বিষয়াসক্তি থেকে মুক্ত ছিলেন, তবু কেন তিনি তাঁর দেহত্যাগ করলেন, যা ছিল অন্যদের আশ্রয়স্বরূপ?

তাৎপর্য

মহারাজ পরীক্ষিৎ ছিলেন একজন আদর্শ রাজা এবং গৃহস্থ কেন না তিনি ছিলেন পরমেশ্বর ভগবানের ভক্ত। ভগবদ্ভক্ত স্বাভাবিকভাবেই সর্বগুণে গুণান্বিত। আর মহারাজ পরীক্ষিৎ ছিলেন তার এক আদর্শ দৃষ্টান্ত। ব্যক্তিগতভাবে সব রকম জাগতিক ভোগৈশ্বর্যের প্রতি তাঁর কোন আসক্তি ছিল না। কিন্তু যেহেতু তিনি ছিলেন একজন রাজা, তাই তিনি নিরন্তর জনসাধারণের মঙ্গল সাধনের কাজে ব্যস্ত ছিলেন। তিনি কেবল তাদের ঐহিক মঙ্গল সাধনই করেননি, তাদের পারত্রিক মঙ্গল সাধনও করেছিলেন। তাঁর রাজ্যে তিনি গো-হত্যা অনুমোদন করেননি। তিনি মূর্খের মতো এক শ্রেণীর জীবকে রক্ষা করে অন্য ধরনের জীবদের হত্যা করার নির্দেশ দিয়ে আংশিকভাবে রাজ্য পরিচালনা করেন নি। যেহেতু তিনি ছিলেন পরমেশ্বর ভগবানের ভক্ত, তাই তিনি যথাযথভাবে জানতেন কিভাবে সকলের মঙ্গল সাধন করা যায়। তিনি মানুষ, পশু-পাখি, কীট-পতঙ্গ, গাছ-পালা আদি সমস্ত জীবের মঙ্গল সাধনের জন্য রাজ্যশাসন করেছিলেন। তাঁর কোন রকম স্বার্থসিদ্ধির বাসনা ছিল না। স্বার্থ দু'রকমের আত্মকেন্দ্রিক এবং বিস্তৃত স্বার্থ। তাঁর কোনটাই ছিল না। তাঁর একমাত্র বাসনা ছিল পরম সত্য, পরমেশ্বর ভগবানকে সন্তুষ্ট করা। রাজা হচ্ছেন পরমেশ্বর ভগবানের প্রতিনিধি, তাই রাজার উদ্দেশ্য পরমেশ্বর ভগবানের উদ্দেশ্যের সঙ্গে এক হওয়া উচিত। পরমেশ্বর ভগবান চান সমস্ত জীবই যেন তাঁর অনুগত হয় এবং তার

ফলে সুখী হয়। তাই রাজার রাজ্যশাসনের উদ্দেশ্য হচ্ছে তার সমস্ত প্রজাদের ভগবদ্ধামে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য পরিচালিত করা। তাই প্রজাদের কার্যকলাপ এমনভাবে পরিচালিত করতে হয়, যাতে তারা তাদের জীবনের শেষে তাদের প্রকৃত আলয় ভগবদ্ধামে ফিরে যেতে পারে। আদর্শ রাজার রাজ্য সব রকমের ঐশ্বর্যে পূর্ণ। সে রাজ্যে মানুষদের পশুমাংস আহার করতে হয় না। তখন অপর্যাপ্ত শস্য, দুধ, ফল-মূল, শাক-সবজি উৎপন্ন হয়, যাতে মানুষ, পশু-পাখি ইত্যাদি সমস্ত প্রাণীরা পেট ভরে খেতে পারে। সমস্ত জীবই যদি আহার এবং বাসস্থানের ব্যাপারে সন্তুষ্ট থাকে এবং বিধি-নিষেধগুলি পালন করে চলে, তা হলে এক জীবের সঙ্গে আরেক জীবের কোন রকম কলহ থাকতে পারে না। পরীক্ষিৎ মহারাজ ছিলেন একজন আদর্শ রাজা এবং তাই তাঁর রাজত্বকালে সকলেই খুব সুখী ছিল।

শ্লোক ১৩

তৎসর্বং নঃ সমাচক্ষ্ব পৃষ্টো যদিহ কিঞ্চন।
মন্যে ত্বাং বিষয়ে বাচাং স্নাতমন্যত্র ছান্দসাৎ ॥ ১৩ ॥

তৎ—তা; **সর্বম্**—সমস্ত; **নঃ**—আমাদের; **সমাচক্ষ্ব**—স্পষ্টভাবে; **পৃষ্টঃ**— জিজ্ঞাসা করেছিলেন; **যৎ ইহ**—এখানে; **কিঞ্চন**—সব কিছু; **মন্যে**—আমরা মনে করি; **ত্বাম্**—আপনি; **বিষয়ে**—সমস্ত বিষয়ে; **বাচাম্**—শব্দের অর্থ; **স্নাতম্**— সম্পূর্ণরূপে পরিচিত; **অন্যত্র**—ব্যতীত; **ছান্দসাৎ**—বেদের অংশ।

অনুবাদ

আমরা জানি যে, বেদের কয়েকটি অংশ ব্যতীত সমস্ত বিষয়ের অর্থ সম্বন্ধে আপনি বিশেষভাবে পারদর্শী, এবং তাই আমরা আপনাকে যে প্রশ্নগুলি করেছি তার উত্তর আপনি স্পষ্টভাবে বিশ্লেষণ করতে পারেন।

তাৎপর্য

বেদ এবং পুরাণের পার্থক্য হচ্ছে ব্রাহ্মণ এবং পরিব্রাজকের পার্থক্যের মতো। ব্রাহ্মণদের উদ্দেশ্য হচ্ছে বেদে নির্দেশিত সকাম যজ্ঞ অনুষ্ঠান করা। কিন্তু পরিব্রাজকাচার্য বা তত্ত্বজ্ঞানী প্রচারকদের উদ্দেশ্য হচ্ছে সকলকে দিব্য জ্ঞান দান করা। অনেক সময় পরিব্রাজকাচার্যরা বৈদিক ক্রিয়াকলাপে পারদর্শী ব্রাহ্মণদের মতো পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে এবং ছন্দোবদ্ধভাবে বৈদিক মন্ত্র উচ্চারণে পারদর্শী হন না। কিন্তু তবুও কখনই ব্রাহ্মণদের ভগবদ্বাণীর প্রচারকদের থেকে অধিক মর্যাদাসম্পন্ন বলে মনে করা উচিত নয়। এদের উভয়েরই উদ্দেশ্য এক, কিন্তু ভিন্নভাবে সেই উদ্দেশ্য সাধিত হচ্ছে। তাই বুঝতে হবে যে, তা একাধারে ভিন্ন এবং অভিন্ন।

বৈদিক মন্ত্র, পুরাণ ও ইতিহাসে যা বিশ্লেষণ করা হয়েছে, তাদের মধ্যেও কোন পার্থক্য নেই। শ্রীল জীব গোস্বামীর মতে *মাধ্যন্দিন-শ্রুতিতে* বর্ণনা করা হয়েছে যে, সমস্ত বৈদিক শাস্ত্র, যথা সাম, অর্থব, ঋক্, যজু, পুরাণ, ইতিহাস, উপনিষদ ইত্যাদি পরমেশ্বর ভগবানের নিঃশ্বাস থেকে উদ্ভূত হয়েছে। তাদের মধ্যে একমাত্র পার্থক্য হচ্ছে যে অধিকাংশ বৈদিক মন্ত্রই প্রণব ওঁকার দিয়ে শুরু হয়, এবং তা আবৃত্তি করতে ছন্দ এবং উচ্চারণের শিক্ষা গ্রহণ করতে হয়। তবে তার অর্থ এই নয় যে, *শ্রীমদ্ভাগবতের* গুরুত্ব বৈদিক মন্ত্র থেকে কম; পক্ষান্তরে *শ্রীমদ্ভাগবত* হচ্ছে সমস্ত বেদের সুপক্ক ফল, যা পূর্বেও বর্ণনা করা হয়েছে। আর তা ছাড়া শ্রীল শুকদেব গোস্বামী প্রমুখ সম্পূর্ণরূপে মুক্ত পুরুষেরা আত্মজ্ঞান লাভ করা সত্ত্বেও *শ্রীমদ্ভাগবত* পাঠে ছিলেন মগ্ন। শ্রীল সূত গোস্বামী তাঁরই পদাঙ্ক অনুসরণ করেছেন, এবং তাই যদিও তিনি ছন্দোবদ্ধভাবে বৈদিক মন্ত্র উচ্চারণে পারদর্শী ছিলেন না, তবুও তাঁর পদমর্যাদা কোনমতেই কম গুরুত্বপূর্ণ ছিল না। বৈদিক মন্ত্র উচ্চারণের পারদর্শিতা নির্ভর করে অভ্যাসের উপর, কিন্তু তত্ত্বজ্ঞান উপলব্ধির বিষয়। তত্ত্বজ্ঞান উপলব্ধি করা তোতাপাখির মতো মন্ত্র উচ্চারণের থেকে অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ।

শ্লোক ১৪

সূত উবাচ

দ্বাপরে সমনুপ্রাপ্তে তৃতীয়ে যুগপর্যয়ে।
জাতঃ পরাশরাদ্‌যোগী বাসব্যাং কলয়া হরেঃ ॥ ১৪ ॥

সূতঃ—সূত গোস্বামী; **উবাচ**—বললেন; **দ্বাপরে**—দ্বাপর যুগে; **সমনুপ্রাপ্তে**—আবির্ভাব হলে; **তৃতীয়ে**—তৃতীয়; **যুগ**—যুগ; **পর্যয়ে**—সেই স্থানে; **জাতঃ**—আবির্ভূত হয়েছিলেন; **পরাশরাৎ**—পরাশর মুনি থেকে; **যোগী**—মহান্ ঋষি; **বাসব্যাম্**—বসু-দুহিতার গর্ভে; **কলয়া**—অংশরূপে; **হরেঃ**—পরমেশ্বর ভগবানের।

অনুবাদ

শ্রীসূত গোস্বামী বললেনঃ ত্রেতা এবং দ্বাপরের যুগপর্যায়ে বসু-দুহিতা সত্যবতীর গর্ভে পরাশর মুনির পুত্ররূপে মহর্ষির (ব্যাসদেবের) জন্ম হয়।

তাৎপর্য

কালচক্রে সত্য, দ্বাপর, ত্রেতা এবং কলি—এই চারটি যুগের পুনঃপ্রকাশ হয়। কিন্তু কখনও কখনও যুগপর্যায় হয়। বৈবস্বত মনুর রাজত্বকালে অষ্টবিংশতি চতুর্যুগে যুগপর্যায় হয়, এবং দ্বাপরের পূর্বে ত্রেতাযুগের আবির্ভাব হয়। সেই বিশেষ চতুর্যুগে শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব হয় এবং তার ফলে কতকগুলি পরিবর্তন হয়। মহর্ষি বেদব্যাসের মাতা ছিলেন বসু (ধীবর) কন্যা সত্যবতী, এবং তাঁর পিতা ছিলেন মহামুনি পরাশর।

এই হচ্ছে ব্যাসদেবের জন্ম-বৃত্তান্ত। প্রতিটি যুগ তিনটি ভাগে বিভক্ত এবং সেই প্রতিটি ভাগকে বলা হয় 'সন্ধ্যা'। ব্যাসদেব আবির্ভূত হয়েছিলেন সেই যুগের তৃতীয় সন্ধ্যায়।

শ্লোক ১৫

স কদাচিৎ সরস্বত্যা উপস্পৃশ্য জলং শুচিঃ।
বিবিক্ত এক আসীন উদিতে রবিমণ্ডলে ॥ ১৫ ॥

সঃ—তিনি; **কদাচিৎ**—একদা; **সরস্বত্যাঃ**—সরস্বতীর তটে; **উপস্পৃশ্য**—প্রাতঃস্নান সমাপনান্তে; **জলম্**—জল; **শুচিঃ**—পবিত্র হয়ে; **বিবিক্ত**—একাগ্র চিত্তে; **একঃ**—একাকী; **আসীনঃ**—উপবিষ্ট হয়ে; **উদিতে**—উদয় হলে; **রবি-মণ্ডলে**—সূর্যমণ্ডলে।

অনুবাদ

একসময়ে তিনি (ব্যাসদেব) সূর্যোদয়ের সময় সরস্বতী নদীর জলে প্রাতঃস্নান করে একাকী উপবিষ্ট হয়ে ধ্যানস্থ হলেন।

তাৎপর্য

হিমালয়ের শিখরে বদরিকাশ্রমের পাশ দিয়ে সরস্বতী নদী প্রবাহিত হচ্ছে। সুতরাং, এখানে যে স্থানের উল্লেখ করা হয়েছে তা হচ্ছে বদরিকাশ্রমের শম্যাপ্রাস নামক স্থান, যেখানে শ্রীব্যাসদেব অবস্থান করছিলেন।

শ্লোক ১৬

পরাবরজ্ঞঃ স ঋষিঃ কালেনাব্যক্তরংহসা।
যুগধর্মব্যতিকরং প্রাপ্তং ভুবি যুগে যুগে ॥ ১৬ ॥

পরাবর—অতীত এবং ভবিষ্যৎ; **জ্ঞঃ**—যিনি জানেন; **সঃ**—তিনি; **ঋষিঃ**—ব্যাসদেব; **কালেন**—কালক্রমে; **অব্যক্ত**—অপ্রকাশিত; **রংহসা**—মহান্ শক্তির প্রভাবে; **যুগধর্ম**—যুগোচিত ধর্ম; **ব্যতিকরম্**—ব্যতিরেক; **প্রাপ্তম্**—প্রাপ্ত হয়ে; **ভুবি**—পৃথিবীতে; **যুগে যুগে**—বিভিন্ন যুগে।

অনুবাদ

মহর্ষি বেদব্যাস এই যুগের ধর্ম-বিপর্যয় দর্শন করলেন। কালের অদৃশ্য শক্তির প্রভাবে বিভিন্ন যুগে পৃথিবীতে তা হয়ে থাকে।

তাৎপর্য

ব্যাসদেবের মতো মহান্ ঋষিরা হচ্ছেন মুক্ত পুরুষ, এবং তাই তাঁরা অতীত এবং ভবিষ্যৎ স্পষ্টরূপে দর্শন করতে পারেন। তাই তিনি কলিযুগের দুর্দশাগ্রস্ত ভবিষ্যৎ দর্শন করতে পেরেছিলেন, এবং সেই জন্য এই অন্ধকারাচ্ছন্ন যুগের মানুষেরা যাতে পারমার্থিক জীবন লাভ করতে পারে, তার আয়োজন করেছিলেন। এই কলিযুগের মানুষেরা সাধারণত অত্যন্ত গভীরভাবে অনিত্য বিষয়ের প্রতি আসক্ত। অজ্ঞানাচ্ছন্ন থাকার ফলে তারা দুর্লভ মানব জীবনকে সার্থক করে পারমার্থিক জ্ঞানের আলোকে উদ্ভাসিত হতে পারে না।

শ্লোক ১৭-১৮

ভৌতিকানাং চ ভাবানাং শক্তিহ্রাসং চ তৎকৃতম্।
অশ্রদ্দধানান্নিঃসত্ত্বান্দুর্মেধান্ হ্রসিতায়ুষঃ ॥ ১৭ ॥
দুর্ভগাংশ্চ জনান্ বীক্ষ্য মুনির্দিব্যেন চক্ষুষা।
সর্ববর্ণাশ্রমাণাং যদ্দধ্যৌ হিতমমোঘদৃক্ ॥ ১৮ ॥

ভৌতিকানাম্ চ—ভৌতিক বিষয়েরও; **ভাবানাম্**—কার্যকলাপ; **শক্তি-হ্রাসম্ চ**—স্বাভাবিক শক্তি হ্রাস হলেও; **তৎ-কৃতম্**—তার দ্বারা কৃত; **অশ্রদ্দধানান্**—অবিশ্বাসীদের; **নিঃসত্ত্বান্**—সত্ত্বগুণের অভাবে ধৈর্যহীন; **দুর্মেধান্**—দুর্বুদ্ধিসম্পন্ন; **হ্রসিত**—হ্রাসপ্রাপ্ত; **আয়ুষঃ**—আয়ুর; **দুর্ভগান্ চ**—ভাগ্যহীনও; **জনান্**—জনসাধারণ; **বীক্ষ্য**—দর্শন করে; **মুনিঃ**—মুনি; **দিব্যেন চক্ষুষা**—দিব্য দৃষ্টির দ্বারা; **সর্ব**—সমস্ত; **বর্ণাশ্রমাণাম্**—সমস্ত বর্ণ এবং আশ্রমের; **যৎ**—যা; **দধ্যৌ**—চিন্তা করেছিলেন; **হিতম্**—মঙ্গল; **অমোঘ-দৃক্**—যিনি সম্পূর্ণরূপে জ্ঞানবান।

অনুবাদ

পূর্ণ জ্ঞানসম্পন্ন মহর্ষি তাঁর দিব্য দৃষ্টির দ্বারা এই যুগের প্রভাবে জড় জগতের অধঃপতন দর্শন করলেন। তিনি দেখলেন যে, এই যুগের শ্রদ্ধাহীন জনসাধারণের আয়ু অত্যন্ত হ্রাস পাবে এবং সত্ত্বগুণের অভাবে তারা ধৈর্যহীন হয়ে পড়বে। তাই তিনি সমস্ত বর্ণ এবং আশ্রমের মানুষের কি ভাবে মঙ্গলসাধন করা যায় সেই চিন্তা করলেন।

তাৎপর্য

কালের অদৃশ্য শক্তি এতই প্রবল যে, তা সব কিছুই বিস্মৃতির অতলে বিলীন করে দেয়। চতুর্যুগের শেষ যুগ কলিতে কালের প্রভাবে জড় জগতের সব কিছুর শক্তি ক্ষীণ হয়ে যায়। এই যুগে মানুষের শরীরের স্থিতি ভীষণভাবে হ্রাস পায়, এবং তার

স্মৃতিও অত্যন্ত ক্ষীণ হয়ে যায়। জাগতিক কার্যকলাপের তেমন অনুপ্রেরণা থাকে না। ভূমি অন্যান্য যুগের মতো খাদ্যশস্য উৎপাদন করে না। গাভীরা আর আগের মতো প্রচুর পরিমাণে দুধ দেয় না। ফল-মূল এবং শাক-সবজির উৎপাদন অনেক কমে যায়, এবং তার ফলে মানুষ এবং পশু আদি সমস্ত জীবেরই পুষ্টিকর খাদ্যের অভাব দেখা দেয়। জীবনধারণের উপযোগী এই সমস্ত বস্তুগুলির অভাব হওয়ার ফলে স্বাভাবিকভাবেই আয়ু হ্রাস পায়, স্মৃতি ক্ষীণ হয়, বুদ্ধি হ্রাস পায়, পরস্পরের প্রতি ব্যবহার মিথ্যা আচরণে পূর্ণ হয়ে ওঠে ইত্যাদি।

মহামুনি বেদব্যাস তাঁর দিব্যচক্ষুর দ্বারা তা দর্শন করেছিলেন। জ্যোতিষী যেমন মানুষের ভবিষ্যৎ দর্শন করতে পারেন, অথবা জ্যোতির্বিদ যেমন সূর্যগ্রহণ অথবা চন্দ্রগ্রহণের দিন-ক্ষণ ঘোষণা করতে পারেন, তেমনই শাস্ত্র-জ্ঞানের মাধ্যমে মুক্ত পুরুষেরা সমস্ত মানব সমাজের ভবিষ্যৎ দর্শন করতে পারতেন। তাঁদের পারমার্থিক জ্ঞানের প্রভাবে তাঁরা তা দর্শন করতে পারতেন।

এই সমস্ত তত্ত্বজ্ঞানী পুরুষেরা, যাঁরা ছিলেন স্বাভাবিকভাবেই ভগবদ্ভক্ত, তাঁরা সর্বদাই জনসাধারণের মঙ্গল সাধনে উদ্‌গ্রীব থাকতেন। তাঁরাই হচ্ছেন জনসাধারণের যথার্থ বন্ধু। তথাকথিত সমস্ত জননেতা, যারা আদৌ জানে না যে, পাঁচ মিনিট পরে কি হবে, তারা জনগণের বন্ধু নয়। এই যুগে জনসাধারণ এবং তাদের তথাকথিত সমস্ত নেতৃবর্গ উভয়েই অত্যন্ত দুর্ভাগা, তারা পারমার্থিক জ্ঞানের প্রতি শ্রদ্ধাহীন এবং কলিযুগের প্রভাবে সম্পূর্ণভাবে আচ্ছন্ন। তারা সর্বদাই বিভিন্ন রোগের দ্বারা আক্রান্ত। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায়, এই যুগে বহু মানুষ যক্ষ্মা, ক্যানসার আদি দুরারোগ্য রোগের দ্বারা আক্রান্ত, কিন্তু পূর্বে এগুলি ছিল না, কেন না কালের প্রভাব তখন এত মর্মান্তিক ছিল না। এই যুগের দুর্ভাগ্যগ্রস্ত মানুষেরা তত্ত্বজ্ঞানী মহাপুরুষদের শ্রদ্ধা প্রদর্শন করতে অনিচ্ছুক, যাঁরা হচ্ছেন শ্রীল ব্যাসদেবের প্রতিনিধি এবং সমাজের সমস্ত বর্ণ ও আশ্রমের মানুষদের মঙ্গল সাধনের পরিকল্পনায় সর্বতোভাবে উৎসর্গীকৃত প্রাণ। সব চাইতে বড় দাতা হচ্ছেন তিনি, যিনি ব্যাস, নারদ, মধ্ব, চৈতন্য, রূপ, সরস্বতী প্রমুখ ভাগবতগণের প্রতিনিধিরূপে ভগবত্তত্ত্বজ্ঞান প্রদাতা। ঐরা সকলেই হচ্ছেন এক এবং অভিন্ন। তাঁদের ব্যক্তিত্ব ভিন্ন হতে পারে, কিন্তু তাঁদের উদ্দেশ্য এক এবং অভিন্ন, এবং তা হচ্ছে সমস্ত অধঃপতিত জীবকে উদ্ধার করে পরমেশ্বর ভগবানের কাছে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়া।

শ্লোক ১৯

চাতুর্হোত্রং কর্ম শুদ্ধং প্রজানাং বীক্ষ্য বৈদিকম্।
ব্যদধাদ্‌যজ্ঞসন্তত্যৈ বেদমেকং চতুর্বিধম্ ॥ ১৯ ॥

চাতুঃ—চার; হোত্রম্—যজ্ঞাগ্নি; কর্ম শুদ্ধম্—কর্মের পবিত্রীকরণ; প্রজানাম্—জনসাধারণের; বীক্ষ্য—দর্শন করে; বৈদিকম্—বৈদিক নির্দেশ অনুসারে; ব্যদধাৎ—করেছিলেন; যজ্ঞ—যজ্ঞ; সন্তত্যৈ—বিস্তার করার জন্য; বেদম্-একম্—এক বেদকে; চতুঃ-বিধম্—চারটি ভাগে।

অনুবাদ

তিনি দেখলেন যে, বেদে নির্দেশিত যজ্ঞ-অনুষ্ঠানের উদ্দেশ্য হচ্ছে মানুষের বৃত্তি অনুসারে তার কার্যকলাপকে পবিত্র করা। এই প্রক্রিয়াকে সরলীকৃত করার উদ্দেশ্যে তিনি এক বেদকে চার ভাগে ভাগ করেছিলেন, মানুষের মধ্যে তা বিস্তার করার জন্য।

তাৎপর্য

পূর্বে বেদ ছিল একটি এবং তার নাম ছিল যজুর্বেদ। তাতে চার রকমের যজ্ঞের কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছিল। তবে তা আরও সহজভাবে অনুষ্ঠান করার জন্য বেদকে চারটি ভাগে ভাগ করা হয়েছিল, যাতে চার বর্ণের মানুষেরা তাদের বৃত্তি অনুসারে পবিত্র হতে পারে। ঋক্, যজু, সাম এবং অথর্ব—এই চারটি বেদ ছাড়াও ছিল পুরাণ, মহাভারত, সংহিতা ইত্যাদি, যাদের বলা হত পঞ্চম বেদ। শ্রীল ব্যাসদেব এবং তাঁর শিষ্যরা সকলেই হচ্ছেন ঐতিহাসিক পুরুষ এবং তাঁরা ছিলেন কলিযুগের অধঃপতিত মানুষদের প্রতি অত্যন্ত কৃপাপরায়ণ এবং সহানুভূতিসম্পন্ন। পুরাণ এবং মহাভারত হচ্ছে ঐতিহাসিক তথ্যের বর্ণনা যা বেদের শিক্ষা বিশ্লেষণ করে। বেদের অঙ্গস্বরূপ যে পুরাণ এবং মহাভারত তাদের প্রামাণিকতা সম্বন্ধে সন্দিহান হওয়া উচিত নয়। ছান্দোগ্য উপনিষদে পুরাণ এবং মহাভারতকে পঞ্চম বেদ বলে বর্ণনা করা হয়েছে। শ্রীল জীব গোস্বামীর মতে শাস্ত্রের যথার্থ মূল্য নিরূপণ করার এটিই হচ্ছে পন্থা।

শ্লোক ২০

ঋগ্‌যজুঃসামাথর্বাখ্যা বেদাশ্চত্বার উদ্ধৃতাঃ।
ইতিহাসপুরাণং চ পঞ্চমো বেদ উচ্যতে ॥ ২০ ॥

ঋগ্-যজুঃ-সাম-অথর্ব-আখ্যা—ঋক্, যজু, সাম, অথর্ব নামক চারটি বেদ; বেদাঃ—বেদসমূহ; চত্বারঃ—চার; উদ্ধৃতাঃ—বিভিন্ন ভাগে বিভক্ত করা হয়েছিল; ইতিহাস—ইতিহাস (মহাভারত); পুরাণম্ চ—এবং পুরাণসমূহ; পঞ্চমঃ—পঞ্চম; বেদঃ—জ্ঞানের আদি উৎস; উচ্যতে—বলা হয়।

অনুবাদ

জ্ঞানের আদি উৎস বেদকে চারটি বিভিন্ন ভাগে ভাগ করা হয়েছিল। কিন্তু ঐতিহাসিক তথ্য এবং পুরাণে উল্লিখিত সত্য ঘটনার বর্ণনাগুলিকে পঞ্চম বেদ বলা হয়।

শ্লোক ২১

তত্রর্গ্বেদধরঃ পৈলঃ সামগো জৈমিনিঃ কবিঃ।
বৈশম্পায়ন এবৈকো নিষ্ণাতো যজুষামুত ॥ ২১ ॥

তত্র—তারপর; **ঋক্-বেদ-ধরঃ**—ঋক্‌বেদের অধ্যাপক; **পৈলঃ**—পৈল নামক ঋষি; **সামগঃ**—সামবেদের অধ্যাপক; **জৈমিনিঃ**—জৈমিনি নামক ঋষি; **কবিঃ**— অত্যন্ত পারদর্শী; **বৈশম্পায়ন**—বৈশম্পায়ন নামক ঋষি; **এব**—কেবল; **একঃ**— একাকী; **নিষ্ণাতঃ**—বিশেষভাবে পারদর্শী; **যজুষাম্**—যজুর্বেদের; **উত**—মহিমান্বিত।

অনুবাদ

বেদকে চারটি ভাগে ভাগ করার পর, পৈল ঋষি হলেন ঋক্‌বেদের অধ্যাপক, জৈমিনি হলেন সামবেদের অধ্যাপক এবং বৈশম্পায়ন যজুর্বেদের দ্বারা মহিমান্বিত হলেন।

তাৎপর্য

বিভিন্ন বেদকে বিভিন্ন তত্ত্বজ্ঞানী পুরুষদের হাতে অর্পণ করা হয়েছিল যথাযথভাবে তাদের বিস্তার করার জন্য।

শ্লোক ২২

অথর্বাঙ্গিরসামাসীৎসুমন্তুর্দারুণো মুনিঃ।
ইতিহাসপুরাণানাং পিতা মে রোমহর্ষণঃ ॥ ২২ ॥

অথর্ব—অথর্ব বেদ; **অঙ্গিরসাম্**—অঙ্গিরা ঋষিকে; **আসীৎ**—অর্পণ করা হয়েছিল; **সুমন্তুঃ**—সুমন্তু মুনি নামে পরিচিত; **দারুণঃ**—অথর্ব বেদের প্রতি ঐকান্তিকভাবে অনুরক্ত; **মুনিঃ**—মুনি; **ইতিহাস-পুরাণানাম্**—ঐতিহাসিক তথ্য এবং পুরাণসমূহের; **পিতা**—পিতা; **মে**—আমার; **রোমহর্ষণ**—রোমহর্ষণ ঋষি।

অনুবাদ

সুমন্তু মুনি অঙ্গিরা, যিনি অত্যন্ত শ্রদ্ধা সহকারে সেবাপরায়ণ ছিলেন, তাঁকে অথর্ব বেদ দান করা হয়েছিল, এবং আমার পিতা রোমহর্ষণ ঋষির হাতে পুরাণ এবং ঐতিহাসিক তথ্যসমূহ অর্পণ করা হয়েছিল।

তাৎপর্য

শ্রুতিমন্ত্রেও বর্ণনা করা হয়েছে যে, অঙ্গিরা মুনি, যিনি অত্যন্ত নিষ্ঠা সহকারে অথর্ব বেদের কঠোর তত্ত্বগুলি অনুশীলন করেছিলেন, তিনি হচ্ছেন অথর্ব বেদের অনুগামীদের নেতা।

শ্লোক ২৩

ত এত ঋষয়ো বেদং স্বং স্বং ব্যস্যন্ননেকধা।
শিষ্যৈঃ প্রশিষ্যৈস্তচ্ছিষ্যৈর্বেদাস্তে শাখিনোঽভবন্ ॥ ২৩ ॥

তে—তারা; **এতে**—এই সমস্ত; **ঋষয়ঃ**—তত্ত্বজ্ঞানী পণ্ডিতেরা; **বেদম্**—বিভিন্ন বেদকে; **স্বম্ স্বম্**—নিজের নিজের বিষয়ে; **ব্যসান্**—প্রদান করেছিলেন; **অনেকধা**—বহু; **শিষ্যৈঃ**—শিষ্যদের; **প্রশিষ্যৈঃ**—প্রশিষ্যদের; **তৎ-শিষ্যৈঃ**—প্রশিষ্যদের শিষ্যদের; **বেদাঃ তে**—সেই সমস্ত বেদের অনুগামীদের; **শাখিনঃ**—বিভিন্ন শাখা; **অভবন্**—এইভাবে হয়েছিল।

অনুবাদ

সেই সমস্ত তত্ত্বদ্রষ্টা ঋষিরা বিভিন্ন বেদকে তাঁদের শিষ্য, প্রশিষ্য এবং প্রশিষ্যের শিষ্যদের প্রদান করেছিলেন এবং এইভাবে গুরু-শিষ্য-পরম্পরায় অনন্ত শাখায় বেদ-অনুশীলন শুরু হয়।

তাৎপর্য

জ্ঞানের আদি উৎস হচ্ছে বেদ। জাগতিক অথবা পারমার্থিক এমন কোন জ্ঞান নেই যা বেদ থেকে আসেনি। তারা কেবল বিভিন্ন শাখায় বিস্তারিত হয়েছে। আদিতে তা প্রদান করে গেছেন মহান্ তত্ত্বজ্ঞানী মুনিঋষিরা। অর্থাৎ, বৈদিক জ্ঞান বিভিন্ন পরম্পরায় বিভিন্ন শাখায় বিভক্ত হয়ে সারা পৃথিবী জুড়ে বিতরণ করা হয়েছে। তাই কেউই দাবি করতে পারে না যে, বেদের আনুগত্য ছাড়াই সে স্বাধীনভাবে জ্ঞান লাভ করতে পারে।

শ্লোক ২৪

ত এব বেদা দুর্মেধৈর্ধার্যন্তে পুরুষৈর্যথা।
এবং চকার ভগবান্ ব্যাসঃ কৃপণবৎসলঃ ॥ ২৪ ॥

তে—তা; **এব**—অবশ্যই; **বেদাঃ**—বেদ; **দুর্মেধৈঃ**—অল্প বুদ্ধিমান মানুষদের দ্বারা; **ধার্যন্তে**—উপলব্ধি করতে পারে; **পুরুষৈঃ**—মানুষের দ্বারা; **যথা**—যতখানি

সম্ভব ; **এবম্**—এইভাবে ; **চকার**—সম্পাদিত হয়েছে ; **ভগবান্**—শক্তিমান ; **ব্যাসঃ**—মহর্ষি বেদব্যাস ; **কৃপণ-বৎসলঃ**—অজ্ঞানীদের প্রতি অত্যন্ত কৃপালু।

অনুবাদ

এইভাবে অজ্ঞানীদের প্রতি অত্যন্ত কৃপালু মহর্ষি বেদব্যাস বেদ সংকলন করেন, যাতে অল্পবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষেরা তা হৃদয়ঙ্গম করতে পারে।

তাৎপর্য

বেদ একটিই, এবং এখানে তার বিভিন্ন ভাগে বিভক্ত হওয়ার কারণ বর্ণিত হয়েছে। সমস্ত জ্ঞানের বীজ বা বেদ, সাধারণ মানুষের কাছে সহজবোধ্য নয়। শাস্ত্রে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, উপযুক্ত যোগ্যতাসম্পন্ন ব্রাহ্মণ ছাড়া অন্য কারোর বেদ পাঠ করার চেষ্টা করা উচিত নয়। বিভিন্নভাবে এই নির্দেশটির ভুল অর্থ করা হয়েছে। এক শ্রেণীর মানুষ যারা কেবল ব্রাহ্মণ পরিবারে জন্মগ্রহণ করার ফলে নিজেদের ব্রাহ্মণ বলে জাহির করতে চায়, তারা দাবি করে যে,বেদ কেবল জাত-ব্রাহ্মণদেরই সম্পত্তি। আরেক শ্রেণীর লোক এই নির্দেশটিকে ব্রাহ্মণ পরিবারে জন্মগ্রহণ করেনি যে সমস্ত মানুষ,তাদের প্রতি অন্যায় অবিচার বলে মনে করে। কিন্তু তারা উভয়েই ভ্রান্ত। বেদ হচ্ছে এমনই একটি বিষয়,যা ব্রহ্মাকে পর্যন্ত ভগবানের কাছ থেকে বুঝতে হয়েছিল ; তাই এই জ্ঞান তাঁরাই হৃদয়ঙ্গম করতে পারেন, যাঁরা সত্ত্বগুণে অধিষ্ঠিত। রজ এবং তমোগুণের দ্বারা প্রভাবিত মানুষেরা কখনই বেদের তত্ত্ব বুঝতে পারে না। বৈদিক জ্ঞানের চরম লক্ষ্য হচ্ছেন পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ। রজ এবং তমোগুণের দ্বারা প্রভাবিত মানুষেরা কখনই বেদের তত্ত্ব বুঝতে পারে না। বৈদিক জ্ঞানের চরম লক্ষ্য হচ্ছেন পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ। রজ এবং তমোগুণের দ্বারা প্রভাবিত মানুষেরা সাধারণত তাঁকে জানতে পারে না। সত্য যুগে সকলেই সত্ত্বগুণে অধিষ্ঠিত ছিল। ত্রেতা এবং দ্বাপর যুগে সত্ত্বগুণ ধীরে ধীরে হ্রাস পেতে থাকে এবং সাধারণ মানুষ কলুষিত হয়ে পড়ে। বর্তমান কলিযুগে সত্ত্বগুণ প্রায় নেই বললেই চলে, তাই সাধারণ মানুষের জন্য অত্যন্ত কৃপাময় মহর্ষি বেদব্যাস বেদকে বিভিন্ন ভাগে বিভক্ত করেন যাতে রজ এবং তমোগুণের দ্বারা প্রভাবিত অল্পবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষেরা তা অনুসরণ করতে পারে। পরবর্তী শ্লোকে তা বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

শ্লোক ২৫

স্ত্রীশূদ্রদ্বিজবন্ধূনাং ত্রয়ী ন শ্রুতিগোচরা।
কর্মশ্রেয়সি মূঢ়ানাং শ্রেয় এবং ভবেদিহ।
ইতি ভারতমাখ্যানং কৃপয়া মুনিনা কৃতম্ ॥ ২৫ ॥

স্ত্রী—স্ত্রী জাতি; **শূদ্র**—শ্রমিক শ্রেণী; **দ্বিজ-বন্ধূনাম্**—দ্বিজোচিত গুণাবলীবিহীন দ্বিজকুলোদ্ভূত মানুষদের; **ত্রয়ী**—তিন; **ন**—না; **শ্রুতি-গোচরা**—বোধগম্য; **কর্ম**—কার্যকলাপে; **শ্রেয়সি**—কল্যাণ সাধনে; **মূঢ়ানাম্**—মূর্খদের; **শ্রেয়ঃ**—পরম কল্যাণ; **এবম্**—এইভাবে; **ভবেৎ**—প্রাপ্ত হয়; **ইহ**—এটির দ্বারা; **ইতি**—এইভাবে বিবেচনা করে; **ভারতম্**—মহাভারত; **আখ্যানম্**—ঐতিহাসিক তথ্য; **কৃপয়াঃ**—কৃপাপূর্বক; **মুনিনা**—মুনির দ্বারা; **কৃতম্**—রচিত হয়েছিল।

অনুবাদ

স্ত্রী, শূদ্র এবং দ্বিজোচিত গুণাবলীবিহীন ব্রাহ্মণ কুলোদ্ভূত মানুষদের বেদের তাৎপর্য হৃদয়ঙ্গম করার ক্ষমতা নেই, তাই তাদের প্রতি কৃপাপরবশ হয়ে মহর্ষি বেদব্যাস মহাভারত নামক ইতিহাস রচনা করলেন, যাতে তারা তাদের জীবনের পরম উদ্দেশ্য লাভে সমর্থ হতে পারে।

তাৎপর্য

যে সমস্ত মানুষ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য অথবা আধ্যাত্মিক দিক দিয়ে সংস্কৃতিসম্পন্ন পরিবারে জন্মগ্রহণ করেছে, অথচ যাদের মধ্যে তাদের পূর্বপুরুষদের সদ্‌গুণগুলি প্রকাশিত হয়নি, তাদের বলা হয় দ্বিজবন্ধু। যথাযথ সংস্কার না থাকায় তাদের দ্বিজ বলে স্বীকার করা হয় না। বৈদিক সমাজে সংস্কারগুলি জন্মের পূর্ব থেকেই অনুষ্ঠান হয়। মাতৃগর্ভে বীজ রোপণ করার প্রক্রিয়াকে বলা হয় গর্ভাধান সংস্কার। এই গর্ভাধান সংস্কার বা পারমার্থিক পরিবার-পরিকল্পনা ব্যতীত যার জন্ম হয়েছে, তাকে যথার্থ দ্বিজ-পরিবারভুক্ত বলে গণনা করা হত না। গর্ভাধান সংস্কারের পর অন্য আরও সংস্কার রয়েছে যার একটি হচ্ছে উপনয়ন সংস্কার। এটি অনুষ্ঠিত হয় দীক্ষা গ্রহণের সময়। এই বিশেষ সংস্কারটির পর তাকে 'দ্বিজ' বলা হয়। প্রথম জন্ম হয় গর্ভাধান সংস্কারের সময়, এবং দ্বিতীয় বার জন্মটি হয় সদ্‌গুরুর কাছে দীক্ষা গ্রহণের সময়। যাঁরা এই মহান্ সংস্কারগুলির দ্বারা যথাযথভাবে সংস্কৃত হয়েছেন, তাঁদেরই প্রকৃতপক্ষে দ্বিজ বলা হয়।

পিতামাতা যদি গর্ভাধান সংস্কাররূপ পারমার্থিক পরিবার-পরিকল্পনা না করে কেবল কামার্ত হয়ে সন্তান উৎপাদন করে, তা হলে তাদের সন্তানদের বলা হয় দ্বিজবন্ধু। এই দ্বিজবন্ধুরা যথাযথ সংস্কারের দ্বারা সংস্কৃত দ্বিজ পরিবারের সন্তানদের মতো ততটা বুদ্ধিমান হয় না। দ্বিজবন্ধুদের সাধারণত বুদ্ধিসম্পন্ন স্ত্রী এবং শূদ্রদের সমকক্ষ বলে বিবেচনা করা হয়। শূদ্র এবং স্ত্রীদের বিবাহ সংস্কার ব্যতীত অন্য কোনও সংস্কার অনুষ্ঠান করতে হয় না।

অল্প বুদ্ধিসম্পন্ন মানুষেরা, অর্থাৎ স্ত্রী, শূদ্র এবং দ্বিজবন্ধুদের বেদের অর্থ হৃদয়ঙ্গম করার ক্ষমতা নেই। তাদের জন্য *মহাভারত* রচনা করা হয়েছিল। *মহাভারতের*

উদ্দেশ্য হচ্ছে বেদের তাৎপর্য বুঝিয়ে দেওয়া এবং তাই এই মহাভারতে বেদের সারস্বরূপ *ভগবদ্গীতা* গ্রথিত হয়েছে। অল্পবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষেরা দর্শনের থেকে গল্প শুনতে বেশি ভালবাসে, এবং তাই শ্রীকৃষ্ণ ভগবদ্গীতারূপে বৈদিক দর্শন দান করে গেছেন। ব্যাসদেব এবং শ্রীকৃষ্ণ উভয়েই পারমার্থিক স্তরে রয়েছেন, এবং তাই এই যুগের অধঃপতিত জীবদের কল্যাণ সাধনের জন্য উভয়েই সচেষ্ট হয়েছেন। *ভগবদ্গীতা* হচ্ছে সমস্ত বৈদিক জ্ঞানের সারাতিসার। এটি হচ্ছে পারমার্থিক জ্ঞানের সর্বশ্রেষ্ঠ উপনিষদ। পারমার্থিক স্তরে যাঁরা স্নাতক তাঁদের জন্য বেদান্ত দর্শন। পারমার্থিক দিক দিয়ে যাঁরা স্নাতকোত্তর স্তরে রয়েছেন, তাঁরাই কেবল পরমেশ্বর ভগবানের প্রতি প্রেমময়ী সেবার জগতে প্রবেশ করতে পারেন। এটি একটি মহান্ বিজ্ঞান, এবং তার মহান্ আচার্য হচ্ছেন শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুরূপে পরমেশ্বর ভগবান স্বয়ং। আর যাঁরা তাঁর শক্তিতে আবিষ্ট হয়েছেন, তাঁরা ভগবানের প্রেমময়ী সেবায় আমাদের দীক্ষিত করতে পারেন।

শ্লোক ২৬

এবং প্রবৃত্তস্য সদা ভূতানাং শ্রেয়সি দ্বিজাঃ।
সর্বাত্মকেনাপি যদা নাতুষ্যাদ্‌ধৃদয়ং ততঃ ॥ ২৬ ॥

এবম্—এইভাবে; **প্রবৃত্তস্য**—যুক্ত; **সদা**—নিরন্তর; **ভূতানাম্**—জীবদের; **শ্রেয়সি**—পরম মঙ্গল সাধনের; **দ্বিজাঃ**—হে দ্বিজগণ; **সর্বাত্মকেন অপি**—সর্বতোভাবে; **যদা**—যখন; **ন**—না; **অতুষ্যৎ**—সন্তুষ্ট হওয়া; **হৃদয়ম্**—চিত্ত; **ততঃ**—তখন।

অনুবাদ

হে দ্বিজগণ, যদিও তিনি সমস্ত মানুষের সর্বাঙ্গীণ কল্যাণ সাধনে সচেষ্ট হয়েছিলেন, তবুও তাঁর চিত্ত সন্তুষ্ট ছিল না।

তাৎপর্য

যদিও তিনি জনসাধারণের সর্বাঙ্গীণ মঙ্গল সাধনের জন্য তাদের উপযোগী করে বৈদিক শাস্ত্র সংকলন করেছিলেন, তবুও শ্রীল ব্যাসদেব চিত্তচাঞ্চল্য অনুভব করেছিলেন। তিনি আশা করেছিলেন যে,এত কিছু করার পর তিনি নিশ্চয়ই অন্তরে প্রসন্নতা অনুভব করবেন, কিন্তু চরমে তিনি প্রসন্ন হতে পারেননি।

শ্লোক ২৭

নাতিপ্রসীদদ্‌ধৃদয়ঃ সরস্বত্যাস্তটে শুচৌ।
বিতর্কয়ন্ বিবিক্তস্থ ইদং চৌবাচ ধর্মবিৎ ॥ ২৭ ॥

ন—না; অতিপ্রসীদৎ—অত্যন্ত প্রসন্ন; হৃদয়ঃ—হৃদয়ে; সরস্বত্যাঃ—সরস্বতী নদীর; তটে—তটে; শুচৌ—পবিত্র হয়ে; বিতর্কয়ন্—বিবেচনা করেছিলেন; বিবিক্ত-স্থঃ—নির্জন স্থানে স্থিত; ইদম্ চ—এটিও; উবাচ—বলেছিলেন; ধর্ম-বিৎ—ধর্মতত্ত্ববেত্তা।

অনুবাদ

হৃদয়ে অপ্রসন্ন হয়ে মহর্ষি তৎক্ষণাৎ গভীরভাবে বিচার করতে শুরু করলেন। তিনি ধর্মতত্ত্ব সম্বন্ধে অবগত ছিলেন, তাই তিনি মনে মনে ভাবতে লাগলেন।

তাৎপর্য

মহর্ষি তাঁর অসন্তোষের কারণ তাঁর হৃদয়ে অনুসন্ধান করতে শুরু করলেন। হৃদয় যতক্ষণ না প্রসন্ন হচ্ছে, ততক্ষণ পর্যন্ত পূর্ণতা লাভ করা যায় না। হৃদয়ের এই প্রসন্নতা অনুসন্ধান করতে হয় জড়া প্রকৃতির ঊর্ধ্বে।

শ্লোক ২৮-২৯

ধৃতব্রতেন হি ময়া ছন্দাংসি গুরবোঽগ্নয়ঃ।
মানিতা নির্ব্যলীকেন গৃহীতং চানুশাসনম্ ॥ ২৮ ॥
ভারতব্যপদেশেন হ্যাম্নায়ার্থশ্চ প্রদর্শিতঃ।
দৃশ্যতে যত্র ধর্মাদি স্ত্রীশূদ্রাদিভিরপ্যুত ॥ ২৯ ॥

ধৃত-ব্রতেন—কঠোর ব্রত অবলম্বন করে; হি—অবশ্যই; ময়া—আমার দ্বারা; ছন্দাংসি—বৈদিক স্তব; গুরবঃ—গুরুদেবগণ; অগ্নয়ঃ—যজ্ঞাগ্নি; মানিতাঃ—যথাযথভাবে পূজিত হয়ে; নির্ব্যলীকেন—নিষ্কপট; গৃহীতম্ চ—স্বীকার করে; অনুশাসনম্—পরম্পরাগত নিয়ম; ভারত—মহাভারত; ব্যপদেশেন—সংকলন করে; হি—অবশ্যই; আম্নায়-অর্থঃ—গুরু-শিষ্য পরম্পরায় লব্ধ জ্ঞান; চ—এবং; প্রদর্শিতঃ—যথাযথভাবে বিশ্লেষিত; দৃশ্যতে—দৃষ্টিগোচর হয়; যত্র—যেখানে; ধর্ম-আদিঃ—ধর্মের পথ; স্ত্রী-শূদ্র-আদিভিঃ অপি—স্ত্রী-শূদ্র প্রভৃতিরাও; উত— বলা হয়েছে।

অনুবাদ

কঠোর ব্রত অবলম্বন করে নিষ্কপটভাবে আমি বেদ, গুরুবর্গ এবং যজ্ঞাগ্নির পূজা করেছি। আমি তাঁদের নির্দেশ যথাযথভাবে পালন করেছি এবং গুরুপরম্পরাক্রমে লব্ধ জ্ঞান মহাভারতের মাধ্যমে বিশ্লেষণ করেছি, যাতে স্ত্রী, শূদ্র এবং অন্য সকলে (দ্বিজবন্ধুরা) ধর্মের পথ অবলম্বন করতে পারে।

তাৎপর্য

কঠোর ব্রত অবলম্বন এবং গুরুদেবের নির্দেশ অনুসরণ করা ব্যতীত কেউই বৈদিক জ্ঞান হৃদয়ঙ্গম করতে পারে না। জ্ঞানলাভেচ্ছু শিক্ষার্থীকে অবশ্যই বেদ, গুরুবর্গ এবং যজ্ঞাগ্নির পূজা করতে হয়। বৈদিক জ্ঞানের সমস্ত নিগূঢ় রহস্য মহাভারতে সুসংবদ্ধভাবে প্রদান করা হয়েছে, যাতে স্ত্রী, শূদ্র এবং দ্বিজবন্ধুরাও তার অর্থ হৃদয়ঙ্গম করতে পারে। এই যুগে মূল বেদের থেকেও মহাভারতের উপযোগিতা অধিক।

শ্লোক ৩০

তথাপি বত মে দৈহ্যো হ্যাত্মা চৈবাত্মনা বিভুঃ।
অসম্পন্ন ইবাভাতি ব্রহ্মবর্চস্যসত্তমঃ ॥ ৩০ ॥

তথাপি—তবুও; **বত**—ত্রুটি; **মে**—আমার; **দৈহ্যঃ**—দেহস্থ; **হি**—অবশ্যই; **আত্মা**—জীব; **চ**—এবং; **এব**—যদিও; **আত্মনা**—আমি স্বয়ং; **বিভুঃ**—পর্যাপ্ত; **অসম্পন্নঃ**—অপূর্ণ; **ইব-আভাতি**—মনে হয়; **ব্রহ্ম-বর্চস্য**—বৈদান্তিকদের; **সত্তমঃ**—সর্বোচ্চ।

অনুবাদ

যদিও আমি বৈদিক দর্শনের অভিপ্রেত সমস্ত যোগ্যতা অর্জন করেছি, তথাপি আমার হৃদয়ে আমি অপূর্ণতা অনুভব করছি।

তাৎপর্য

নিঃসন্দেহে শ্রীল ব্যাসদেব সমস্ত বৈদিক যোগ্যতাসম্পন্ন ছিলেন। বেদের কর্মকাণ্ডের নির্দেশ অনুসারে কর্ম করার ফলে বিষয়াসক্ত মানুষ কলুষমুক্ত হয়, কিন্তু বেদের চরম উদ্দেশ্য প্রকৃতপক্ষে তা নয়। যতক্ষণ পর্যন্ত না তা লাভ হচ্ছে, জীব সমস্ত যোগ্যতাসম্পন্ন হলেও পারমার্থিক স্তরে অধিষ্ঠিত হতে পারে না। শ্রীল ব্যাসদেব যেন সেই সূত্র বিস্মৃত হয়েছেন এবং তাই অসন্তোষ অনুভব করছেন।

শ্লোক ৩১

কিং বা ভাগবতা ধর্মা ন প্রায়েণ নিরূপিতাঃ।
প্রিয়াঃ পরমহংসানাং ত এব হ্যচ্যুতপ্রিয়াঃ ॥ ৩১ ॥

কিম্ বা—অথবা; **ভাগবতাঃ ধর্মাঃ**—ভগবানের প্রতি ভক্তিপরায়ণ কার্যকলাপ; **ন**—না; **প্রায়েণ**—প্রায়; **নিরূপিতাঃ**—নির্দেশিত; **প্রিয়াঃ**—প্রিয়; **পরমহংসানাম্**—পরমহংসদের; **তে এব**—তাও; **হি**—অবশ্যই; **অচ্যুত**—অচ্যুত; **প্রিয়াঃ**—আকর্ষণীয়।

অনুবাদ

আমি যে বিশেষভাবে ভগবদ্ভক্তি বর্ণনা করিনি, যা পরমহংসদের এবং অচ্যুত পরমেশ্বর ভগবানের অত্যন্ত প্রিয়, তাই হয়ত আমার এই অসন্তোষের কারণ।

তাৎপর্য

শ্রীল ব্যাসদেব যে তাঁর হৃদয়ে অসন্তোষ অনুভব করেছিলেন তা এখানে তাঁর নিজের ভাষায় ব্যক্ত হয়েছে। এটি ভগবানের সেবায় যুক্ত জীবের স্বাভাবিক অনুভূতি। জীব যতক্ষণ পর্যন্ত ভগবানের সেবারূপী তার স্বাভাবিক বৃত্তিতে যুক্ত না হচ্ছে, ততক্ষণ পর্যন্ত সে পূর্ণরূপে সন্তুষ্ট হতে পারে না এবং ভগবানেরও প্রীতিসাধন করতে পারে না। ব্যাসদেব তাঁর এই ত্রুটি অনুভব করতে পেরেছিলেন যখন তাঁর গুরুদেব শ্রীনারদ মুনি তাঁর কাছে আসেন। পরবর্তী শ্লোকে তা বর্ণনা করা হয়েছে।

শ্লোক ৩২

তস্যৈবং খিলমাত্মানং মন্যমানস্য খিদ্যতঃ।
কৃষ্ণস্য নারদোঽভ্যাগাদাশ্রমং প্রাগুদাহৃতম্ ॥ ৩২ ॥

তস্য—তাঁর; **এবম্**—এইভাবে; **খিলম্**—অধম; **আত্মানম্**—আত্মা; **মন্য-মানস্য**—মনে মনে চিন্তা করে; **খিদ্যতঃ**—অনুশোচনা করে; **কৃষ্ণস্য**—শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাসের; **নারদঃ অভ্যাগাৎ**—নারদ মুনি সেখানে এসেছিলেন; **আশ্রমম্**—আশ্রম; **প্রাক্**—পূর্বে; **উদাহৃতম্**—বর্ণিত হয়েছে।

অনুবাদ

পূর্বে যেমন বর্ণিত হয়েছে, ব্যাসদেব যখন তাঁর অসন্তোষের জন্য অনুশোচনা করছিলেন তখন নারদ মুনি সরস্বতী নদীর তীরে তাঁর আশ্রমে এসে উপস্থিত হলেন।

তাৎপর্য

ব্যাসদেব যে শূন্যতা অনুভব করছিলেন তা তাঁর জ্ঞানাভাবজনিত ছিল না। ভাগবৎ ধর্ম হচ্ছে সর্বতোভাবে ভগবানের প্রেমময়ী সেবা, যাতে নির্বিশেষবাদীদের কোনও অধিকার নেই। নির্বিশেষবাদীদের পরমহংসদের (সন্ন্যাস আশ্রমের সর্বোচ্চ স্তর) মধ্যে গণনা করা হয় না। শ্রীমদ্ভাগবত পরমেশ্বর ভগবানের দিব্য লীলাবিলাসের বর্ণনায় পূর্ণ। ব্যাসদেব যদিও ছিলেন ভগবানের শক্ত্যাবেশ অবতার, তবুও তিনি তাঁর হৃদয়ে অতৃপ্তি অনুভব করেছিলেন, কেন না তাঁর কোন রচনায় তিনি পরমেশ্বর ভগবানের দিব্য লীলাবিলাসের কাহিনী যথাযথভাবে বর্ণনা করেননি। সেই অনুপ্রেরণা শ্রীকৃষ্ণ সরাসরিভাবে ব্যাসদেবের হৃদয়ে সঞ্চার করেছিলেন। এখানে স্পষ্টভাবে ব্যক্ত হয়েছে যে, পরমেশ্বর ভগবানের প্রেমময়ী সেবা ব্যতীত সব কিছুই শূন্য; কিন্তু অপ্রাকৃত

ভগবদ্ভক্তিতে সকাম কর্ম অথবা জ্ঞানের পৃথক প্রয়াস ব্যতীত সব কিছুই পূর্ণ হয়ে ওঠে।

শ্লোক ৩৩

তমভিজ্ঞায় সহসা প্রত্যুত্থায়াগতং মুনিঃ।
পূজয়ামাস বিধিবন্নারদং সুরপূজিতম্ ॥ ৩৩ ॥

তম্ অভিজ্ঞায়—তাঁর (নারদ মুনির) শুভাগমন দর্শন করেন; **সহসা**—সহসা; **প্রত্যুত্থায়**—উঠে দাঁড়িয়ে; **আগতম্**—এসে পৌঁছলেন; **মুনিঃ**—ব্যাসদেব; **পূজয়ামাস**—পূজা; **বিধিবৎ**—বিধি বা ব্রহ্মার প্রতি যেভাবে শ্রদ্ধা প্রদর্শন করা হয় সেই ভাবে; **নারদম্**—নারদ মুনিকে; **সুর-পূজিতম্**—দেবতাদের দ্বারা পূজিত।

অনুবাদ

শ্রীনারদ মুনির শুভাগমনে শ্রীল ব্যাসদেব শ্রদ্ধা সহকারে উঠে দাঁড়িয়ে সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মাকে যেভাবে সম্মান প্রদর্শন করা হয়, সেইভাবে তাঁকে অভ্যর্থনা করলেন।

তাৎপর্য

বিধি মানে হচ্ছে ব্রহ্মা, এই জগতের সৃষ্ট জীব। তিনি হচ্ছেন বৈদিক জ্ঞানের প্রথম বিদ্যার্থী এবং অধ্যাপক। তিনি বৈদিক জ্ঞান শ্রীকৃষ্ণের কাছ থেকে লাভ করেছিলেন এবং সর্বপ্রথমে নারদ মুনিকে তা দান করেছিলেন। তাই নারদ মুনি হচ্ছেন গুরু-পরম্পরার ধারায় দ্বিতীয় আচার্য। তিনি সমস্ত বিধির (নিয়মের) পিতা ব্রহ্মার প্রতিনিধি, তাই তাঁকেও ঠিক ব্রহ্মার মতো শ্রদ্ধা প্রদর্শন করা হয়। তেমনই, এই পরম্পরার ধারায় অন্য সমস্ত আচার্যদেরও আদি গুরুর মতোই সম্মান প্রদর্শন করা হয়।

ইতি—"শ্রীনারদ মুনির আবির্ভাব" নামক শ্রীমদ্ভাগবতের প্রথম স্কন্ধের চতুর্থ অধ্যায়ের ভক্তিবেদান্ত তাৎপর্য সমাপ্ত।

পঞ্চম অধ্যায়

ব্যাসদেবকে শ্রীমদ্ভাগবত সম্বন্ধে দেবর্ষি নারদের নির্দেশ

শ্লোক ১

সূত উবাচ

অথ তং সুখমাসীন উপাসীনং বৃহচ্ছ্রবাঃ।
দেবর্ষিঃ প্রাহ বিপ্রর্ষিং বীণাপাণিঃ স্ময়ন্নিব ॥ ১ ॥

সূত—শ্রীল সূত গোস্বামী; উবাচ—বললেন; অথ—সুতরাং; তম্—তাঁকে; সুখম্ আসীনঃ—সুখে উপবিষ্ট; উপাসীনম্—নিকটে যিনি বসে আছেন তাঁকে; বৃহৎ-শ্রবাঃ—অত্যন্ত সম্মানিত; দেবর্ষিঃ—দেবর্ষি; প্রাহ—বলেছিলেন; বিপ্রর্ষিম্—বিপ্রর্ষিকে; বীণা-পাণিঃ—যিনি তাঁর হাতে বীণা ধারণ করেন; স্ময়ন্ ইব—স্মিত হেসে।

অনুবাদ

সূত গোস্বামী বললেনঃ তখন দেবর্ষি (নারদ) সুখে উপবিষ্ট হয়ে স্মিত হেসে বিপ্রর্ষিকে (বেদব্যাসকে) বললেন।

তাৎপর্য

নারদ মুনি তখন হাসছিলেন, কেন না তিনি মহর্ষি বেদব্যাসের অসন্তোষের কারণ ভালভাবেই জানতেন। বেদব্যাসের অসন্তোষের কারণ ছিল ভগবদ্ভক্তি-বিজ্ঞান পূর্ণরূপে প্রদানে তাঁর অক্ষমতা, যা তিনি ধীরে ধীরে বিশ্লেষণ করবেন। নারদ মুনি তাঁর সেই ত্রুটির কথা জানতেন এবং ব্যাসদেবের মনের অবস্থা তা সমর্থন করেছে।

শ্লোক ২

নারদ উবাচ

পারাশর্য মহাভাগ ভবতঃ কচ্চিদাত্মনা।
পরিতুষ্যতি শারীর আত্মা মানস এব বা ॥ ২ ॥

নারদঃ—নারদ; **উবাচ**—বললেন; **পারাশর্য**—হে পরাশর পুত্র; **মহাভাগ**—মহা-ভাগ্যবান; **ভবতঃ**—তোমার; **কচ্চিৎ**—যদি হয়; **আত্মনা**—আত্মজ্ঞান দ্বারা; **পরিতুষ্যতি**—সন্তুষ্ট হয় কি; **শারীরঃ**—দেহকে; **আত্মা**—আত্মা; **মানসঃ**—মনকে; **এব**—অবশ্যই; **বা**—অথবা।

অনুবাদ

পরাশর-পুত্র ব্যাসদেবকে সম্বোধন করে নারদ মুনি জিজ্ঞাসা করলেনঃ তুমি কি তোমার দেহ অথবা মনকে তোমার স্বরূপ বলে মনে করে সন্তুষ্ট হয়েছ?

তাৎপর্য

নারদ মুনি এখানে ব্যাসদেবের অসন্তুষ্টির কারণ ইঙ্গিত করেছেন। মহর্ষি পরাশরের পুত্র ব্যাসদেবের পক্ষে এভাবে বিষণ্ণ হওয়া উচিত নয়। এক মহান্ পিতার মহান্ সন্তানরূপে দেহ অথবা মনকে আত্মা বলে মনে করা তাঁর উচিত হয়নি। অল্পজ্ঞ মানুষেরা দেহ অথবা মনকে তাদের স্বরূপ বলে মনে করতে পারে, কিন্তু ব্যাসদেবের পক্ষে সেটি করা উচিত হয়নি। জীব যতক্ষণ পর্যন্ত না জড় দেহ এবং মনের অতীত বিশুদ্ধ আত্মজ্ঞানের স্তরে অধিষ্ঠিত হচ্ছে, ততক্ষণ পর্যন্ত প্রসন্ন হতে পারে না।

শ্লোক ৩

জিজ্ঞাসিতং সুসম্পন্নমপি তে মহদদ্ভুতম্।
কৃতবান্ ভারতং যস্ত্বং সর্বার্থপরিবৃংহিতম্ ॥ ৩ ॥

জিজ্ঞাসিতম্—পূর্ণরূপে অনুসন্ধান করে; **সুসম্পন্নম্**—সুসম্পন্ন; **অপি**—তা সত্ত্বেও; **তে**—তোমার; **মহৎ-অদ্ভুতম্**—মহৎ এবং অদ্ভুত; **কৃতবান্**—রচনা করেছ; **ভারতম্**—মহাভারত; **যঃ ত্বম্**—তুমি যা করেছ; **সর্ব-অর্থ**—সমস্ত অর্থযুক্ত; **পরিবৃংহিতম্**—বিস্তারিতভাবে বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

অনুবাদ

তোমার প্রশ্নগুলি ছিল পূর্ণ এবং তোমার অধ্যয়নও যথাযথভাবে সম্পন্ন হয়েছে, আর তুমি যে সমস্ত বৈদিক নির্দেশ বিস্তারিতভাবে বিশ্লেষণ করে মহৎ এবং অদ্ভুত মহাভারত রচনা করেছ সে সম্বন্ধে কোনও সন্দেহ নেই।

তাৎপর্য

জ্ঞানের অভাব অবশ্যই ব্যাসদেবের অসন্তোষের কারণ ছিল না, কেন না শিক্ষাকালে তিনি বৈদিক শাস্ত্রের যথার্থ তাৎপর্য সম্বন্ধে পূর্ণরূপে অনুসন্ধান করেছিলেন এবং তার প্রকাশ স্বরূপ বেদের যথার্থ উদ্দেশ্য সম্বন্ধে বিস্তৃত বিশ্লেষণ করে তিনি মহাভারত রচনা করেছিলেন।

শ্লোক ৪

জিজ্ঞাসিতমধীতং চ ব্রহ্মযত্তৎ সনাতনম্ ।
তথাপি শোচস্যাত্মানমকৃতার্থ ইব প্রভো ॥ ৪ ॥

জিজ্ঞাসিতম্—পূর্ণরূপে বিবেচনা করে; **অধীতম্**—উপলব্ধ জ্ঞান; **চ**—এবং; **ব্রহ্ম**—পরম-তত্ত্ব; **যৎ**—যা; **তৎ**—তা; **সনাতনম্**—নিত্য; **তথাপি**—তা সত্ত্বেও; **শোচসি**—অনুশোচনা করছ; **আত্মানম্**—আত্মাকে; **অকৃত-অর্থঃ**—অকৃতার্থ; **ইব**—মতো; **প্রভো**—হে প্রভু।

অনুবাদ

তুমি নির্বিশেষ ব্রহ্মতত্ত্ব পূর্ণরূপে উপলব্ধি করেছ এবং তৎসংলগ্ন জ্ঞান হৃদয়ঙ্গম করেছ। তথাপি হে প্রভু, তুমি কেন নিজেকে অকৃতার্থ বলে মনে করে বিষাদগ্রস্ত হয়েছ?

তাৎপর্য

শ্রীল ব্যাসদেব রচিত *বেদান্ত-সূত্র* বা *ব্রহ্মসূত্র* হচ্ছে নির্বিশেষ ব্রহ্মজ্ঞানের পরিপূর্ণ বর্ণনা, এবং তা পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ দর্শন বলে স্বীকৃত। তাতে নিত্য সনাতন বস্তুর পূর্ণ বর্ণনা রয়েছে এবং তা অত্যন্ত পাণ্ডিত্যপূর্ণ। সুতরাং ব্যাসদেবের আধ্যাত্মিক পাণ্ডিত্য সম্বন্ধে কোন প্রশ্নই থাকতে পারে না। তা হলে তিনি অনুশোচনা করছেন কেন?

শ্লোক ৫

ব্যাস উবাচ

অস্ত্যেব মে সর্বমিদং ত্বয়োক্তং তথাপি নাত্মা পরিতুষ্যতে মে।
তন্মূলমব্যক্তমগাধবোধং পৃচ্ছামহে ত্বাত্মভবাত্মভূতম্ ॥ ৫ ॥

ব্যাসঃ—ব্যাসদেব; **উবাচ**—বললেন; **অস্তি**—আছে; **এব**—অবশ্যই; **মে**—আমার; **সর্বম্**—সমস্ত; **ইদম্**—এই; **ত্বয়া**—আপনার দ্বারা; **উক্তম্**—উক্ত; **তথাপি**—তবুও; **ন**—না; **আত্মা**—আত্মা; **পরিতুষ্যতে**—শান্ত হয়; **মে**—আমাকে; **তৎ**—তার; **মূলম্**—মূল; **অব্যক্তম্**—অব্যক্ত; **অগাধ-বোধম্**—অসীম জ্ঞানসম্পন্ন; **পৃচ্ছামহে**—জিজ্ঞাসা করে; **ত্বা**—আপনাকে; **আত্ম-ভব**—স্বয়ং-জন্মা; **আত্ম-ভূতম্**—সন্তান।

অনুবাদ

শ্রীব্যাসদেব বললেন: আপনি আমার সম্বন্ধে যা বলেছেন তা সম্পূর্ণ সত্য, কিন্তু এ সমস্ত সত্ত্বেও আমার হৃদয় সন্তুষ্ট হচ্ছে না। তাই আমি আপনাকে আমার এই

অসন্তোষের মূল কারণ জিজ্ঞাসা করছি, কেন না স্বয়ম্ভুব (ব্রহ্মা) সন্তান আপনি অসীম জ্ঞানের অধিকারী।

তাৎপর্য

জড় জগতে সকলেই দেহ অথবা মনকে তাদের স্বরূপ বলে মনে করে। এই দেহাত্ম-বুদ্ধিতে মগ্ন থাকার ফলে তারা জগতের বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে আছে। এই জড় জগতে লব্ধ সমস্ত জ্ঞান দেহ অথবা মনের সঙ্গে সম্পর্কিত, এবং সেটাই হচ্ছে আমাদের সমস্ত অসন্তোষের মূল কারণ। সেই কারণটি অবশ্য সব সময় বুঝতে পারা যায় না। জড়জাগতিক জ্ঞানের সব চাইতে বড় পণ্ডিতের পক্ষেও তা খুঁজে বার করা সম্ভব নয়। তাই আমাদের অসন্তোষের মূল কারণ সম্বন্ধে অবগত হওয়ার জন্য নারদ মুনির মতো মহাজনের শরণাপন্ন হওয়া মঙ্গলজনক। নারদ মুনির শরণাগত কেন হতে হবে তা পরবর্তী শ্লোকে বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

শ্লোক ৬

স বৈ ভবান্ বেদ সমস্তগুহ্যমুপাসিতো যৎপুরুষঃ পুরাণঃ।
পরাবরেশো মনসৈব বিশ্বং সৃজত্যবত্যত্তি গুণৈরসঙ্গঃ ॥ ৬ ॥

সঃ—এইভাবে; **বৈ**—অবশ্যই; **ভবান্**—আপনি; **বেদ**—জানেন; **সমস্ত**—সমস্ত; **গুহ্যম্**—গোপনীয়; **উপাসিতঃ**—ভক্ত; **যৎ**—যেহেতু; **পুরুষঃ**—পরমেশ্বর ভগবান; **পুরাণঃ**—প্রাচীনতম; **পরাবরেশঃ**—জড় জগৎ এবং চিৎ জগতের নিয়ন্তা; **মনসা**—মনের দ্বারা; **এব**—কেবল; **বিশ্বম্**—জগৎ; **সৃজতি**—সৃজন করেন; **অবতি অত্তি**—ধ্বংস করেন; **গুণৈঃ**—গুণের দ্বারা; **অসঙ্গঃ**—অনাসক্ত।

অনুবাদ

হে প্রভু! সমস্ত গোপন তত্ত্ব সম্বন্ধে আপনি অবগত, কেন না আপনি এই জড় জগতের সৃষ্টিকর্তা ও ধ্বংসকর্তা এবং চিৎ জগতের পালনকর্তা পরমেশ্বর ভগবানের উপাসনা করেন, যিনি জড় জগতের তিনটি গুণের অতীত।

তাৎপর্য

যে মানুষ পরমেশ্বর ভগবানের সেবায় যুক্ত, তিনি হচ্ছেন সমস্ত জ্ঞানের প্রতীক। ভগবদ্ভক্তির পূর্ণতা প্রাপ্ত এই ধরনের ভক্ত পরমেশ্বর ভগবানের গুণাবলীতে ভূষিত। এই চিন্ময় ঐশ্বর্যের কাছে যোগীর অষ্টসিদ্ধি অত্যন্ত তুচ্ছ। পারমার্থিক পূর্ণতা প্রাপ্ত নারদ মুনির মতো ভক্ত তাঁর পারমার্থিক পূর্ণতার প্রভাবে অতি অদ্ভুত সমস্ত কার্য সম্পাদন করতে পারেন, যা সকলেই লাভ করার চেষ্টা করে থাকে। শ্রীল নারদ মুনি হচ্ছেন নিত্যসিদ্ধ জীব, কিন্তু তবুও তিনি পরমেশ্বর ভগবানের সমকক্ষ নন।

শ্লোক ৭

ত্বং পর্যটন্নর্ক ইব ত্রিলোকীমন্তশ্চরো বায়ুরিবাত্মসাক্ষী ।
পরাবরে ব্রহ্মণি ধর্মতো ব্রতৈঃ স্নাতস্য মে ন্যূনমলং বিচক্ষ্ব ॥ ৭ ॥

ত্বম্—আপনি ; **পর্যটন্**—ভ্রমণ করেন ; **অর্কঃ**—সূর্য ; **ইব**—মতো ; **ত্রি-লোকীম্**—ত্রিভুবন ; **অন্তঃ-চরঃ**—সকলের হৃদয়ে প্রবেশ করতে পারেন ; **বায়ুঃ ইব**—সর্বব্যাপ্ত বায়ুর মতো ; **আত্ম**—আত্মতত্ত্বজ্ঞ ; **সাক্ষী**—সাক্ষী ; **পরাবরে**—কার্য এবং কারণ বিষয়ে ; **ব্রহ্মণি**—নির্গুণ ব্রহ্মে ; **ধর্মতঃ**—ধর্মের অনুশাসন অনুসারে ; **ব্রতৈঃ**—ব্রততে ; **স্নাতস্য**—নিষ্ণাত ;**মে**—আমার ; **ন্যূনম্**—অসম্পূর্ণতা ; **অলম্**—স্পষ্টভাবে ; **বিচক্ষ্ব**—খুঁজে দেখুন।

অনুবাদ

সূর্যের মতো আপনি ত্রিভুবনের সর্বত্র বিচরণ করতে পারেন এবং বায়ুর মতো আপনি সকলের হৃদয়ে প্রবেশ করতে পারেন। আপনি অন্তর্যামীর মতো সর্বব্যাপ্ত। তাই দয়া করে আপনি খুঁজে দেখুন ধর্ম আচরণে এবং ব্রত পালনে নিষ্ণাত থাকা সত্ত্বেও আমার অক্ষমতা কোথায়।

তাৎপর্য

দিব্য জ্ঞান, পুণ্য কর্ম, শ্রীবিগ্রহ আরাধনা, দান, ক্ষমা, অহিংসা এবং কঠোর নিয়মানুবর্তিতা সহকারে শাস্ত্র-অধ্যয়ন ভগবদ্ভক্তি লাভের পক্ষে সহায়ক।

শ্লোক ৮

শ্রীনারদ উবাচ

ভবতানুদিতপ্রায়ং যশো ভগবতোঽমলম্ ।
যেনৈবাসৌ ন তুষ্যেত মন্যে তদ্দর্শনং খিলম্ ॥ ৮ ॥

শ্রীনারদঃ—শ্রীনারদ ; **উবাচ**—বললেন ; **ভবতা**—তোমার দ্বারা ; **অনুদিত-প্রায়ম্**—প্রায় অপ্রশংসিত ; **যশঃ**—মহিমা ; **ভগবতঃ**—পরমেশ্বর ভগবানের ; **অমলম্**—নিষ্কলুষ ; **যেন**—যাঁর দ্বারা ; **ইব**—অবশ্যই ; **অসৌ**—তিনি (পরমেশ্বর ভগবান) ; **ন**—করে না ; **তুষ্যেত**—সন্তুষ্ট ; **মন্যে**—আমি মনে করি ; **তৎ**—তা ; **দর্শনম্**—দর্শন ; **খিলম্**—নিরস্তর।

অনুবাদ

শ্রীনারদ মুনি বললেন ঃ তুমি পরমেশ্বর ভগবানের অত্যন্ত মহিমান্বিত এবং নির্মল কীর্তি যথার্থভাবে কীর্তন করনি। যে দর্শন পরমেশ্বর ভগবানের অপ্রাকৃত ইন্দ্রিয়গুলির সন্তুষ্টি বিধান করে না, তা অর্থহীন।

তাৎপর্য

জীবাত্মার সঙ্গে পরমাত্মা পরমেশ্বর ভগবানের নিত্য সম্পর্ক হচ্ছে—নিত্য প্রভু এবং নিত্য ভৃত্যের সম্পর্ক। ভগবান জীবরূপে নিজেকে বিস্তার করেছেন তাদের থেকেই প্রেমময়ী সেবা গ্রহণ করার জন্য, এবং সেটিই কেবল ভগবান এবং জীব উভয়েরই সন্তুষ্টি বিধান করতে পারে। ব্যাসদেবের মতো মহাপ্রাজ্ঞ মহর্ষি বৈদিক শাস্ত্রকে অনেক বিস্তৃতরূপে সংকলন করেছেন এবং চরমে বেদান্ত-দর্শন প্রণয়ন করেছেন, কিন্তু তাদের একটিও সরাসরিভাবে পরমেশ্বর ভগবানের মহিমা কীর্তন করেনি। শুষ্ক দার্শনিক জল্পনা-কল্পনা পরম-তত্ত্বকে বিশ্লেষণ করলেও সরাসরিভাবে ভগবানের মহিমা কীর্তন না করার ফলে মোটেই আকর্ষণীয় হয় না। পারমার্থিক জ্ঞানের শেষ কথা হচ্ছেন পরমেশ্বর ভগবান। নির্বিশেষ ব্রহ্ম অথবা অন্তর্যামী পরমাত্মারূপে যখন পরম-তত্ত্ব উপলব্ধ হয়, তাও পরমেশ্বর ভগবানের ভগবত্তার মহিমা উপলব্ধির দিব্য আনন্দের কাছে অতি নগণ্য।

বেদান্ত-দর্শনের রচয়িতা হচ্ছেন শ্রীল ব্যাসদেব স্বয়ং। তথাপি তিনি বিচলিত হয়ে পড়েছেন, যদিও তিনিই হচ্ছেন তার রচয়িতা। সুতরাং, বেদান্ত-দর্শনের রচয়িতা শ্রীল ব্যাসদেব যে ভাষ্য বিশ্লেষণ করেননি, সেই বেদান্ত-দর্শন পড়ে অথবা শুনে কি আনন্দ লাভ হতে পারে? এখানে শ্রীমদ্ভাগবত-রূপে বেদান্ত-সূত্রের রচয়িতার বেদান্ত-ভাষ্য প্রণয়ন করার প্রয়োজনীয়তা উত্থাপন করা হয়েছে।

শ্লোক ৯

যথা ধর্মাদয়শ্চার্থা মুনিবর্যানুকীর্তিতাঃ।
ন তথা বাসুদেবস্য মহিমা হ্যনুবর্ণিতঃ ॥ ৯ ॥

যথা—যতখানি সম্ভব; **ধর্ম-আদয়ঃ**—ধর্ম-আচরণের চারটি তত্ত্ব; **চ**—এবং; **অর্থাঃ**—উদ্দেশ্যসমূহ; **মুনি-বর্য**—হে মহান্ ঋষি, তোমার দ্বারা; **অনুকীর্তিতাঃ**—পুনঃ পুনঃ বর্ণিত হয়েছে; **ন**—না; **তথা**—সেইভাবে; **বাসুদেবস্য**—পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের; **মহিমা**—মহিমা; **হি**—অবশ্যই; **অনুবর্ণিতঃ**—নিরন্তর বর্ণিত হয়েছে।

অনুবাদ

হে মহান্ ঋষি, যদিও তুমি ধর্ম আদি চতুর্বর্গ অত্যন্ত বিস্তৃতভাবে বর্ণনা করেছ, কিন্তু তুমি পরমেশ্বর ভগবান বাসুদেবের মহিমা বর্ণনা করনি।

তাৎপর্য

শ্রীনারদ মুনি তৎক্ষণাৎ শ্রীল ব্যাসদেবের অপ্রসন্নতার কারণ ঘোষণা করলেন। তাঁর অনুশোচনার মূল কারণ ছিল বিভিন্ন পুরাণে পরমেশ্বর ভগবানের মহিমা কীর্তনে তাঁর

ইচ্ছাকৃত অবহেলা। তিনি অবশ্যই পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের মহিমা স্থানে স্থানে বর্ণনা করেছেন, তবে তা ধর্ম, অর্থ, কাম এবং মোক্ষের মতো এত বিস্তারিতভাবে করা হয়নি। এই চতুর্বর্গ ভগবদ্ভক্তির থেকে অনেক নিকৃষ্ট স্তরের বিষয়। বিদগ্ধ পণ্ডিত শ্রীল ব্যাসদেব সে কথা খুব ভালভাবেই জানতেন, কিন্তু ভগবদ্ভক্তির উন্নত বৃত্তির প্রতি অধিকতর গুরুত্ব প্রদান না করে তিনি অনেকটা অসঙ্গতভাবে তাঁর মূল্যবান সময়ের অপচয় করেছেন, এবং তাই তিনি এইভাবে বিষাদগ্রস্ত হয়ে পড়েছিলেন। এ থেকে স্পষ্টভাবেই বোঝা যায় যে পরমেশ্বর ভগবানের প্রেমময়ী সেবায় যুক্ত না হলে কেউই যথাযথভাবে সন্তুষ্ট হতে পারে না। সে কথা *ভগবদ্গীতায়* স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে।

চতুর্বর্গের চরম ফল 'মুক্তি'র পরেও পুরুষেরা শুদ্ধ ভগবদ্ভক্তিতে যুক্ত হন। এই স্তরটিকে বলা হয় আত্মোপলব্ধির স্তর বা ব্রহ্মভূত স্তর। এই ব্রহ্মভূত স্তরে অধিষ্ঠিত হওয়ার পর জীব যথার্থভাবে প্রসন্ন হয়। কিন্তু এই প্রসন্নতা হচ্ছে দিব্য আনন্দের প্রাথমিক স্তর। এই আপেক্ষিক জগতে শান্তি এবং সমতা অর্জন করে পারমার্থিক স্তরে অগ্রসর হতে হয়। সমতা স্তর অতিক্রম করে জীব পরমেশ্বর ভগবানের অপ্রাকৃত প্রেমময়ী সেবায় যুক্ত হয়। সেই নির্দেশ পরমেশ্বর ভগবান *ভগবদ্গীতায়* দিয়ে গেছেন। অর্থাৎ, ব্রহ্মভূত স্তরে স্থিত হলে এবং পরমার্থ উপলব্ধির মাত্রা বৃদ্ধি করতে হলে, নারদ মুনি শ্রীল ব্যাসদেবকে নির্দেশ দিলেন যে তাঁর কর্তব্য হচ্ছে, ঐকান্তিক নিষ্ঠা সহকারে বারংবার তিনি যেন ভগবদ্ভক্তির পন্থা বর্ণনা করেন। তার ফলে তাঁর প্রবল বিষাদ দূর হবে।

শ্লোক ১০

ন যদ্বচশ্চিত্রপদং হরের্যশো জগৎপবিত্রং প্রগৃণীত কর্হিচিৎ।
তদ্বায়সং তীর্থমুশন্তি মানসা ন যত্র হংসা নিরমন্ত্যুশিক্ক্ষয়াঃ ॥ ১০ ॥

ন—না; **যৎ**—যা; **বচঃ**—শব্দকোষ; **চিত্রপদম্**—সুসজ্জিত; **হরেঃ**—পরমেশ্বর ভগবানের; **যশঃ**—মহিমা; **জগৎ**—জগৎ; **পবিত্রম্**—পবিত্র; **প্রগৃণীত**—বর্ণিত; **কর্হিচিৎ**—অতি অল্প; **তৎ**—তা; **বায়সম্**—কাক; **তীর্থম্**—তীর্থ; **উশন্তি**—মনে করে; **মানসাঃ**—সন্ত পুরুষেরা; **ন**—না; **যত্র**—যেখানে; **হংসাঃ**—পারমার্থিক পূর্ণতাপ্রাপ্ত জীব; **নিরমন্তি**—আনন্দ আস্বাদন করেছেন; **উশিক্ক্ষয়াঃ**—যাঁরা ভগবদ্ধামে বাস করেন।

অনুবাদ

যে বাণী জগৎ পবিত্রকারী ভগবানের মহিমা বর্ণনা করে না, তাকে সন্ত পুরুষেরা কাকেদের তীর্থ বলে বিবেচনা করেন। ভগবদ্ধামে নিবাসকারী পরমহংসেরা সেখানে কোন রকম আনন্দ অনুভব করেন না।

তাৎপর্য

কাক এবং হংসেরা সমপর্যায়ভুক্ত পক্ষী নয়। কেন না তাদের মানসিক প্রবৃত্তি ভিন্ন। সকাম কর্মী অথবা বিষয়াসক্ত মানুষদের কাকের সঙ্গে তুলনা করা হয়, আর সর্বতোভাবে পারমার্থিক স্তরে অধিষ্ঠিত সন্ত পুরুষদের হংসের সাথে তুলনা করা হয়। যেখানে আবর্জনা ফেলা হয় কাকেরা সেখানে সুখে সমবেত হয়, ঠিক যেমন বিষয়াসক্ত সকাম কর্মীদের যেখানে সুরা, স্ত্রীলোক এবং স্থূল ইন্দ্রিয় সুখ লাভ হয়, সেই সমস্ত স্থানে আনন্দের অন্বেষণ করে। কাকেরা যেখানে সুখের অন্বেষণে সমবেত হয়, হংসেরা সেখানে আনন্দের অন্বেষণ করে না। পক্ষান্তরে, সুন্দর প্রাকৃতিক পরিবেশে বিভিন্ন বর্ণের পদ্মফুলের দ্বারা শোভিত নির্মল সরোবরে তাদের দেখতে পাওয়া যায়। সেটিই হচ্ছে এই দুটি পক্ষীর মধ্যে পার্থক্য।

বিভিন্ন ধরনের জীবকে প্রকৃতি তাদের মনোবৃত্তি অনুসারে প্রভাবিত করে এবং তাদের কখনই সমপর্যায়ভুক্ত করা যায় না। তেমনই, বিভিন্ন ধরনের মনোবৃত্তিসম্পন্ন মানুষদের জন্য বিভিন্ন রকমের সাহিত্য রয়েছে। বাজারের যে সমস্ত সাহিত্য কাক সদৃশ মানুষদের আকৃষ্ট করে, তার বিষয়বস্তু হচ্ছে পূতিগন্ধময় ইন্দ্রিয়-সুখভোগের বিষয়। সেগুলি সাধারণত স্থূল দেহ এবং সূক্ষ্ম মন সম্পর্কিত জাগতিক বিষয়। সেগুলি নানা রকম আলঙ্কারিক ভাষায় বর্ণিত পার্থিব দৃষ্টান্ত এবং রূপক সমন্বিত বর্ণনায় পূর্ণ। কিন্তু তা হলেও সেগুলি পরমেশ্বর ভগবানের মহিমা বর্ণনা করে না। এই ধরনের কবিতা এবং রচনা, তা সে যে বিষয়েই হোক না কেন, মৃতদেহকে সাজানোর মতো বলে বর্ণনা করা হয়েছে। আধ্যাত্মিক স্তরে উন্নত মানুষ, যাঁদের হংসের সাথে তুলনা করা হয়েছে, কখনই এই ধরনের মৃত সাহিত্যে আনন্দের অন্বেষণ করেন না, যা হচ্ছে আধ্যাত্মিক বিচারে মৃত মানুষদের সুখভোগের উৎস। এই সমস্ত রাজসিক ও তামসিক সাহিত্যগুলি বিভিন্ন ধরনের ছাপ মেরে বিতরণ করা হয়, কিন্তু তা মানুষের আধ্যাত্মিক আকাঙ্ক্ষার সহায়ক হয় না এবং তাই হংস সদৃশ সাধু পুরুষেরা কখনই তা স্পর্শ করে না। পারমার্থিক স্তরে উন্নত এই সব মানুষদের বলা হয় 'মানস'। কেন না তাঁরা সর্বদাই চিন্ময় স্তরে পরমেশ্বর ভগবানের প্রেমময়ী সেবার মর্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখেন। তা স্থূল ইন্দ্রিয়সুখ অথবা অহংকারাচ্ছন্ন মনের সূক্ষ্ম জল্পনা-কল্পনা সর্বতোভাবে বর্জন করে।

সামাজিক দিক দিয়ে উচ্চশিক্ষিত মানুষ, বৈজ্ঞানিক, জড় বিষয়ের কবি, দার্শনিক এবং রাজনীতিবিদেরা, যারা কেবল জড় ইন্দ্রিয় সুখভোগের উন্নতি সাধনের প্রচেষ্টাতেই মগ্ন, তারা হচ্ছে মায়ার হাতের ক্রীড়নক। যেখানে পরিত্যক্ত বিষয়গুলি ফেলে দেওয়া হয়, সেখানেই তারা আনন্দের অন্বেষণ করে। শ্রীধর স্বামীর মতে, এটি হচ্ছে বেশ্যাসক্তদের সুখ।

কিন্তু যে-সমস্ত সাহিত্য পরমেশ্বর ভগবানের মহিমা বর্ণনা করে, মানব জীবনের মূল উদ্দেশ্য সম্বন্ধে অবগত পরমহংসেরা তা আস্বাদন করেন।

শ্লোক ১১

তদ্বাগ্বিসর্গো জনতাঘবিপ্লবো
যস্মিন্ প্রতিশ্লোকমবদ্ধবত্যপি ।
নামান্যনন্তস্য যশোঽঙ্কিতানি যৎ
শৃণ্বন্তি গায়ন্তি গৃণন্তি সাধবঃ ॥ ১১ ॥

তৎ—তা; **বাক্**—শব্দকোষ; **বিসর্গঃ**—সৃষ্টি; **জনতা**—জনসাধারণ; **অঘ**—পাপ; **বিপ্লবঃ**—বিপ্লব; **যস্মিন্**—যাতে; **প্রতি-শ্লোকম্**—প্রতিটি শ্লোক; **অবদ্ধবতি**—অনিয়মিতভাবে রচিত; **অপি**—সত্ত্বেও; **নামানি**—দিব্য নাম আদি; **অনন্তস্য**—অন্তহীন ভগবানের; **যশঃ**—মহিমা; **অঙ্কিতানি**—চিত্রিত; **যৎ**—যা; **শৃণ্বন্তি**—শ্রবণ করেন; **গায়ন্তি**—গান করেন; **গৃণন্তি**—গ্রহণ করেন; **সাধবঃ**—সৎ এবং বিশুদ্ধচেতা পুরুষ।

অনুবাদ

পক্ষান্তরে যে সাহিত্য অন্তহীন পরমেশ্বর ভগবানের নাম, রূপ, যশ, লীলা ইত্যাদির বর্ণনায় পূর্ণ, তা দিব্য শব্দ-তরঙ্গে পরিপূর্ণ এক অপূর্ব সৃষ্টি, যা এই জগতের উদ্ভ্রান্ত জনসাধারণের পাপ-পঙ্কিল জীবনে এক বিপ্লবের সূচনা করে। এই অপ্রাকৃত সাহিত্য যদি নির্ভুলভাবে রচিত নাও হয়, তবুও তা সৎ এবং নির্মল চিত্ত সাধুরা শ্রবণ করেন, কীর্তন করেন এবং গ্রহণ করেন।

তাৎপর্য

মহান চিন্তাশীল ব্যক্তিদের একটি বৈশিষ্ট্য হচ্ছে যে তারা খারাপের মধ্যে থেকেও ভালটি গ্রহণ করেন। কথিত আছে যে, বুদ্ধিমান মানুষের বিষভাণ্ড থেকেও অমৃত আহরণ করা উচিত, স্বর্ণ অত্যন্ত নোংরা জায়গা থেকেও গ্রহণ করা উচিত, গুণবতী সতী স্ত্রী অজ্ঞাত কুলশীলা হলেও গ্রহণ করা উচিত এবং অস্পৃশ্য কুলোদ্ভূত হলেও যথার্থ শিক্ষকের কাছ থেকে সৎশিক্ষা গ্রহণ করা উচিত। এগুলি সর্বস্থানে সর্বস্তরে মানুষদের প্রতি কয়েকটি নৈতিক উপদেশ। কিন্তু একজন সাধু হচ্ছেন জনসাধারণের থেকে অনেক উচ্চস্তরের মানুষ। তিনি সর্বদাই পরমেশ্বর ভগবানের মহিমা কীর্তনে মগ্ন, কেন না পরমেশ্বর ভগবানের দিব্য নাম এবং যশ কীর্তিত হলে জগতের কলুষিত পরিবেশ পবিত্র হয় এবং *শ্রীমদ্ভাগবতের* মতো অপ্রাকৃত শাস্ত্রের প্রচারের ফলে মানুষ প্রকৃতিস্থ হয়।

শ্রীমদ্ভাগবতের এই বিশেষ শ্লোকটির ভাষ্য রচনা করার সময় আমাদের একটি সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়েছে। আমাদের প্রতিবেশী দেশ চীন সামরিক শক্তির সাহায্যে ভারতের সীমান্ত আক্রমণ করেছে। রাজনীতির সাথে আমাদের কোনই

সম্পর্ক নেই, তবুও আমরা দেখছি যে পূর্বে ভারত এবং চীন উভয় দেশই পরস্পরের প্রতি বন্ধুভাবাপন্ন হয়ে শান্তিপূর্ণভাবে বহু বছর সহাবস্থান করে এসেছে। তার কারণ হচ্ছে যে সেই সময় তারা ভগবৎ চেতনাময় পরিবেশে বাস করছিল, এবং পৃথিবীর প্রতিটি দেশ ছিল ভগবৎ-বিশ্বাসী, নির্মল হৃদয়সম্পন্ন ও সরল এবং তখন কোন রকম রাজনৈতিক কপটতা ছিল না। ভারত এবং চীনের মধ্যে মানুষের বসবাসের অনুপযোগী একফালি জমি নিয়ে বিবাদ করার কোন কারণ ছিল না, এবং অবশ্যই তা নিয়ে যুদ্ধেও নামার কোন প্রয়োজন ছিল না।

কিন্তু কলহের যুগ এই কলির প্রভাবে, যা আমরা পূর্বেই আলোচনা করেছি, অতি সামান্য বিষয় নিয়েও বিবাদের সম্ভাবনা রয়েছে। তার কারণ হচ্ছে এই যুগের অত্যন্ত কলুষিত পরিস্থিতি, একদল মানুষ অত্যন্ত সুপরিকল্পিতভাবে পরমেশ্বর ভগবানের নাম এবং মহিমা কীর্তন বন্ধ করার চেষ্টা করছে। তাই, সারা পৃথিবী জুড়ে ভাগবতের বাণী প্রচার করার এক মহান প্রয়োজন আজ দেখা দিয়েছে। প্রতিটি দায়িত্বসম্পন্ন ভারতবাসীর কর্তব্য হচ্ছে সমস্ত পৃথিবীর পরম মঙ্গল সাধন করে পৃথিবীতে বহু আকাঙ্ক্ষিত শান্তি প্রতিষ্ঠা করার জন্য সমস্ত পৃথিবী জুড়ে শ্রীমদ্ভাগবতের বাণী প্রচার করা। ভারতবর্ষ যেহেতু তার দায়িত্ব সম্পাদনে অবহেলা করছে, তাই আজ সারা পৃথিবী জুড়ে এই সংকট এবং বিবাদ দেখা দিয়েছে। আমরা নিঃসন্দেহে জানি যে শ্রীমদ্ভাগবতের অপ্রাকৃত বাণী যদি পৃথিবীর নেতৃস্থানীয় লোকেরা গ্রহণ করেন তা হলে অবশ্যই তাঁদের হৃদয়ের পরিবর্তন হবে এবং স্বাভাবিকভাবেই জনসাধারণ তাঁদের অনুসরণ করবে। সাধারণত জনসাধারণ রাজনীতিবিদ্ এবং নেতাদের হাতের ক্রীড়নক; যদি নেতাদের মনোভাবের পরিবর্তন হয়, তবে অবশ্যই সমস্ত পৃথিবীর পরিস্থিতির এক আমূল পরিবর্তন হবে। আমরা জানি যে জনসাধারণের হৃদয়ে ভগবৎ চেতনার পুনঃপ্রকাশ করার জন্য এবং সমস্ত পৃথিবীর বুকে ধর্মের পুনঃপ্রতিষ্ঠা করার জন্য এই মহান গ্রন্থ প্রচারে আমাদের চেষ্টা ঐকান্তিক হলেও তাতে বহু অসুবিধা রয়েছে। যথার্থভাবে এই বিষয়টি উপস্থাপন করতে, বিশেষ করে একটি বিদেশি ভাষায়, অবশ্যই ব্যর্থতার সম্মুখীন হতে হবে, এবং আমাদের ঐকান্তিক প্রচেষ্টা সত্ত্বেও তাতে অনেক ভুলভ্রান্তি থাকবে। কিন্তু তবুও আমরা নিশ্চিন্তভাবে জানি যে আমাদের ভুল-ভ্রান্তি সত্ত্বেও এই বিষয়টির গাম্ভীর্য যথাযথভাবে বিবেচনা করা হবে এবং সমাজের নেতারা পরমেশ্বর ভগবানের মহিমা কীর্তনে এক সৎ প্রচেষ্টারূপে তা গ্রহণ করবেন। গৃহে যখন আগুন লাগে, তখন বিদেশি প্রতিবেশীর কাছেও গৃহবাসীরা সাহায্য প্রার্থনা করে, এবং তাদের ভাষায় কথা বলতে না পারলেও তারা তাদের মনোভাব ব্যক্ত করতে পারে এবং তাদের বোধগম্য ভাষায় ব্যক্ত না করা হলেও প্রতিবেশীরাও তাদের প্রয়োজন বুঝতে পারে। সমস্ত পৃথিবীর পাপ-পঙ্কিল পরিবেশে শ্রীমদ্ভাগবতের অপ্রাকৃত বাণী প্রচার করার জন্য সেই ধরনের সহযোগিতারই প্রয়োজন। প্রকৃতপক্ষে এটি হচ্ছে পারমার্থিক মূল্য সমন্বিত এক বিজ্ঞান, এবং তাই

আমরা তার বিষয়বস্তুর কথাই বিবেচনা করি, ভাষার নয়। এই মহান শাস্ত্রগ্রন্থের বিষয়বস্তু যদি পৃথিবীর মানুষ হৃদয়ঙ্গম করতে পারে, তা হলে আমাদের প্রচেষ্টা সার্থক হবে।

সারা পৃথিবীর মানুষ যখন জড় বিষয়ের প্রতি প্রবলভাবে আসক্ত হয়ে পড়েছে তখন যে সামান্য কারণেও মানুষে-মানুষে অথবা দেশে-দেশে যুদ্ধ লাগবে, তাতে আশ্চর্য হওয়ার কিছুই নেই। এটি হচ্ছে কলহের যুগ কলিযুগের নিয়ম। সমস্ত পরিবেশ আজ সব রকম পাপে পূর্ণ হয়ে উঠেছে, এবং সকলেই সেটা খুব ভালভাবে জানে। ইন্দ্রিয়-সুখভোগের উপায় বর্ণনা করে কত গ্রন্থ রচিত হয়েছে। পৃথিবীর বহু দেশে অশ্লীল সাহিত্য বর্জন করার জন্য সরকারি বিভাগ রয়েছে। তা থেকে বোঝা যায় যে সরকার এবং দায়িত্বসম্পন্ন নেতারা এই ধরনের সাহিত্য অনুমোদন করেন না, কিন্তু তবুও তা বাজারে বিক্রি হচ্ছে; কেন না মানুষ ইন্দ্রিয়-তৃপ্তি সাধনের জন্য সেগুলি চায়। জনসাধারণ পড়তে চায় (সেটি তাদের স্বাভাবিক প্রবৃত্তি), কিন্তু যেহেতু তাদের মনোবৃত্তি কলুষিত হয়ে গেছে, তাই তারা এই ধরনের সাহিত্য চায়।

এই পরিস্থিতিতে *শ্রীমদ্ভাগবতের* মতো অপ্রাকৃত সাহিত্য যে কেবল জনসাধারণের কলুষিত মনকেই নিষ্কলুষ করবে তা নয়, উপরন্তু তা তাদের উৎসাহ-দ্যোতক সাহিত্য পাঠের আকাঙ্ক্ষাও চরিতার্থ করবে। প্রথমে তা পড়তে তারা অনিচ্ছুক হতে পারে কেন না পাণ্ডু রোগাক্রান্ত রোগী মিছরি খেতে চায় না, কিন্তু মিছরিই হচ্ছে সেই রোগের ঔষধ। তেমনই, সুপরিকল্পিতভাবে *ভগবদ্গীতা* এবং *শ্রীমদ্ভাগবতের* জনপ্রিয়তা বর্ধন করা হোক, যাতে জনসাধারণ তা পড়তে আগ্রহী হয়। তা হলে তা ইন্দ্রিয়-তৃপ্তি সাধনরূপ পাণ্ডুরোগে মিছরির মতো কাজ করবে। মানুষ যখন এই গ্রন্থের রস একবার আস্বাদন করবে, তখন অন্য সমস্ত সাহিত্য, যা প্রকৃতপক্ষে সমাজে বিষ প্রদান করছে, আপনা থেকেই বন্ধ হয়ে যাবে।

তাই আমরা নিশ্চিতভাবে জানি, বহু ভুল-ভ্রান্তি সহ উপস্থাপন করা হলেও মানব সমাজের প্রতিটি মানুষ *শ্রীমদ্ভাগবতকে* সাদরে গ্রহণ করবে, কেন না শ্রীনারদ মুনির মতো মহাজন এই অধ্যায়ে আবির্ভূত হয়ে তা গ্রহণ করার পরামর্শ দিয়েছেন।

শ্লোক ১২

নৈষ্কর্ম্যমপ্যচ্যুতভাববর্জিতং ন শোভতে জ্ঞানমলং নিরঞ্জনম্‌।
কুতঃ পুনঃ শশ্বদভদ্রমীশ্বরে ন চার্পিতং কর্ম যদপ্যকারণম্‌॥ ১২॥

নৈষ্কর্ম্যম্‌—সকাম কর্মের বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে আত্মোপলব্ধি; **অপি**—তথাপি; **অচ্যুত**—পরমেশ্বর ভগবান, যিনি তাঁর স্বরূপাবস্থা থেকে কখনও চ্যুত হন না; **ভাব**—ধারণা; **বর্জিতম্‌**—বর্জিত; **ন**—না; **শোভতে**—শোভা পায়; **জ্ঞানম্‌**—দিব্য জ্ঞান; **অলম্‌**—ক্রমশ; **নিরঞ্জনম্‌**—উপাধিমুক্ত; **কুতঃ**—কোথায়; **পুনঃ**—পুনরায়;

শশ্বৎ—নিরন্তর; **অভদ্রম্**—অশুভ; **ঈশ্বরে**—ভগবানে; **ন**—না; **চ**—এবং; **অর্পিতম্**—অর্পিত; **কর্ম**—সকাম কর্ম; **যৎ অপি**—যা; **অকারণম্**—কারণ রহিত।

অনুবাদ

আত্মোপলব্ধির জ্ঞান সব রকমের জড় সংসর্গবিহীন হলেও তা যদি অচ্যুত ভগবানের মহিমা বর্ণনা না করে তা হলে তা অর্থহীন। তেমনই যে সকাম কর্ম শুরু থেকেই ক্লেশদায়ক এবং অনিত্য, তা যদি পরমেশ্বর ভগবানের ভক্তিযুক্ত সেবার উদ্দেশ্যে সাধিত না হয় তা হলে তার কি প্রয়োজন?

তাৎপর্য

এখানে বর্ণনা করা হয়েছে যে, ভগবানের দিব্য মহিমাবিহীন সাধারণ সাহিত্যই কেবল নয়, বৈদিক শাস্ত্রাদি নির্বিশেষ ব্রহ্মজ্ঞানও যখন ভগবদ্ভক্তির মহিমা বর্ণনা করে না, তখন তাও নিন্দনীয় বলে বর্জন করা হয়। ব্রহ্মজ্ঞানের যেখানে নিন্দা করা হচ্ছে, তখন ভগবদ্ভক্তিহীন সকাম কর্মের কি কথা? এই ধরনের কল্পনাপ্রধান জ্ঞান এবং সকাম কর্ম জীবকে কলুষ মুক্ত করতে পারে না। সকাম কর্ম, যাতে প্রায় সমস্ত মানুষই যুক্ত, শুরুতে অথবা শেষে সর্বদাই ক্লেশদায়ক। তা কেবল তখনই সার্থক হতে পারে যখন তা পরমেশ্বর ভগবানের ভক্তির অনুকূল হয়। ভগবদ্গীতাতেও প্রতিপন্ন হয়েছে যে সেই ধরনের কর্মের ফল ভগবানের সেবায় নিবেদন করা যেতে পারে, তা না হলে তা কর্মবন্ধনে পরিণত হয়। সমস্ত কর্মের যথার্থ ভোক্তা হচ্ছেন পরমেশ্বর ভগবান, এবং তাই যখন তা জীবের ইন্দ্রিয়-তৃপ্তির উদ্দেশ্যে সাধিত হয়, তখন তা কেবল চরম দুঃখ-দুর্দশায় পর্যবসিত হয়।

শ্লোক ১৩

অথো মহাভাগ ভবানমোঘদৃক্ শুচিশ্রবাঃ সত্যরতো ধৃতব্রতঃ।
উরুক্রমস্যাখিলবন্ধমুক্তয়ে সমাধিনানুস্মর তদ্বিচেষ্টিতম্ ॥ ১৩ ॥

অথো—সুতরাং; **মহা-ভাগ**—অত্যন্ত ভাগ্যবান; **ভবান্**—তুমি; **অমোঘ-দৃক্**—পূর্ণদ্রষ্টা; **শুচি**—নিষ্কলঙ্ক; **শ্রবাঃ**—প্রসিদ্ধ; **সত্য-রতঃ**—সত্যবাদিতার ব্রতপরায়ণ; **ধৃত-ব্রতঃ**—দিব্য গুণাবলীযুক্ত; **উরুক্রমস্য**—যিনি অলৌকিক কার্যকলাপ সম্পাদন করতে পারেন (ভগবান); **অখিল**—সমগ্র বিশ্বের; **বন্ধ**—বন্ধন; **মুক্তয়ে**—মুক্তির জন্য; **সমাধিনা**—সমাধি দ্বারা; **অনুস্মর**—নিরন্তর চিন্তা কর এবং তারপর তা বর্ণনা কর; **তৎ-বিচেষ্টিতম্**—ভগবানের বিভিন্ন লীলাবিলাসের।

অনুবাদ

হে ব্যাসদেব, তোমার দৃষ্টি সর্বতোভাবে পূর্ণ। তোমার যশ নিষ্কলঙ্ক। তুমি দৃঢ়ব্রত এবং সত্যপ্রতিষ্ঠ। তাই জনসাধারণের জড় বন্ধন মোচন করার জন্য তুমি সমাধিমগ্ন হয়ে পরমেশ্বর ভগবানের লীলাসমূহ দর্শন করতে পার।

তাৎপর্য

সাহিত্যের প্রতি মানুষের স্বাভাবিক রুচি রয়েছে। অজ্ঞাত বিষয়ে তারা প্রামাণিক সূত্র থেকে শুনতে চায় এবং পড়তে চায়, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত তাদের এই রুচির সুযোগ নিয়ে একদল প্রবঞ্চক ইন্দ্রিয়-তৃপ্তি সম্বন্ধীয় সমস্ত সাহিত্য রচনা করছে। সেই সমস্ত সাহিত্য মায়ার দ্বারা প্রভাবিত বিভিন্ন রকমের জড় কবিতা এবং মনোধর্মপ্রসূত দর্শনে পূর্ণ, এবং তাদের চরম উদ্দেশ্য হচ্ছে জড়-ইন্দ্রিয়-ভোগ। এই ধরনের সাহিত্য যদিও সম্পূর্ণভাবে অর্থহীন, তবুও অল্পবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষদের আকর্ষণ করার জন্য তা বিভিন্নভাবে অলঙ্কৃত। এইভাবে জীব সেই সমস্ত সাহিত্যের দ্বারা মোহিত হয়ে কোটি কোটি জন্ম-জন্মান্তরে মুক্তির আশারহিত হয়ে জড় জগতের বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে থাকে। বৈষ্ণব চূড়ামণি শ্রীনারদ ঋষি এই ধরনের অর্থহীন সাহিত্যের করাল কবলগ্রস্ত হয়েছে যে সমস্ত মানুষ, তাদের প্রতি অত্যন্ত কৃপাপরবশ হয়ে শ্রীল ব্যাসদেবকে উপদেশ দিলেন ভগবতত্ত্বজ্ঞান সমন্বিত সাহিত্য রচনা করতে, যা কেবল মানুষকে আকৃষ্টই করবে না উপরন্তু তাদের সমস্ত বন্ধন থেকে মুক্ত করবে। শ্রীল ব্যাসদেব অথবা তাঁর প্রতিনিধিরা এই কার্য সম্পাদনে যথার্থভাবে যোগ্য, কেন না তাঁরা সত্য দর্শন করার যথার্থ শিক্ষা প্রাপ্ত হয়েছেন। শ্রীল ব্যাসদেব এবং তাঁর প্রতিনিধিরা তাঁদের পারমার্থিক জ্ঞানের প্রভাবে বিশুদ্ধ চেতনাবিশিষ্ট এবং ভগবানের ভক্তি সম্পাদনে দৃঢ়ব্রত ; তাঁরা পাপপঙ্কিল জড়জাগতিক কার্যকলাপ থেকে বদ্ধ জীবদের উদ্ধার করতে বদ্ধপরিকর। বদ্ধ জীবেরা নতুন নতুন তথ্য জানবার জন্য অত্যন্ত আগ্রহী এবং শ্রীল নারদ মুনি অথবা ব্যাসদেবের মতো দিব্য জ্ঞানসম্পন্ন পরমার্থবাদীরা নতুন নতুন জ্ঞান আহরণে উৎসুক মানুষদের অপ্রাকৃত জগতের অন্তহীন সংবাদ প্রদান করতে পারেন। ভগবদ্গীতায় বলা হয়েছে যে এই জড় জগৎ ভগবানের সৃষ্টির একটি নগণ্য অংশ এবং এই পৃথিবী হচ্ছে জড় জগতের একটি অতি ক্ষুদ্র অংশ।

সমগ্র পৃথিবীতে হাজার হাজার পণ্ডিত রয়েছেন, এবং তাঁরা হাজার হাজার বছর ধরে মানুষকে নানা রকম তথ্য প্রদান করার জন্য হাজার হাজার গ্রন্থ রচনা করেছেন। দুর্ভাগ্যবশত সেই সমস্ত গ্রন্থ পৃথিবীতে শান্তি এবং সৌহার্দ প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়নি। তার কারণ হচ্ছে সেই সমস্ত শাস্ত্রে পারমার্থিক বিষয়ের অভাব ; তাই যে জড় সভ্যতা মানুষের জীবনীশক্তি শোষণ করে এক চরম দুঃখদায়ক পরিস্থিতির সৃষ্টি করেছে, তা থেকে জনসাধারণকে উদ্ধার করার জন্য বৈদিক সাহিত্য, বিশেষ করে *ভগবদ্গীতা* এবং *শ্রীমদ্ভাগবত* অনুসরণ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। *ভগবদ্গীতা* হচ্ছে পরমেশ্বর ভগবানের শ্রীমুখনিঃসৃত বাণী, যা ব্যাসদেব লিপিবদ্ধ করেছেন, আর *শ্রীমদ্ভাগবত* হচ্ছে সেই পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের দিব্য লীলাবিলাসের বর্ণনা। এই সাহিত্যই কেবল অন্তহীন দুঃখ-দুর্দশা থেকে মানুষকে মুক্ত করে দিব্য আনন্দ লাভের আকাঙ্ক্ষা চরিতার্থ করাতে পারে। তাই *শ্রীমদ্ভাগবত* হচ্ছে সমস্ত জগতের সমস্ত

মানুষকে জাগতিক বন্ধন থেকে মুক্ত করার উদ্দেশ্যে রচিত গ্রন্থ। পরমেশ্বর ভগবানের এই অপ্রাকৃত লীলাবিলাসের কাহিনী কেবল ব্যাসদেব এবং তাঁর আদর্শ প্রতিনিধিরাই বর্ণনা করতে পারেন, যাঁরা পরমেশ্বর ভগবানের অপ্রাকৃত সেবায় সম্পূর্ণরূপে মগ্ন। এই ধরনের ভগবদ্ভক্তদের হৃদয়েই কেবল তাঁদের অনন্য ভক্তির প্রভাবে ভগবানের দিব্য লীলাসমূহ স্বাভাবিকভাবে প্রকাশিত হয়। তা ছাড়া, বহু বহু বছর ধরে জল্পনা-কল্পনা করলেও অন্য কেউ ভগবানের কার্যকলাপ সম্বন্ধে জানতে পারে না বা বর্ণনা করতে পারে না। *শ্রীমদ্ভাগবতের* বর্ণনা এত নিখুঁত এবং যথাযথ যে আজ থেকে পাঁচ হাজার বছর আগে তাতে যে ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছে তা আজ ঠিক সেইভাবে ঘটেছে। কেন না এই গ্রন্থের প্রণেতা ত্রিকালদর্শী, তিনি অতীত, বর্তমান এবং ভবিষ্যৎ দর্শন করতে পারতেন। ব্যাসদেবের মতো মুক্ত পুরুষেরা কেবল তাঁদের দৃষ্টি এবং জ্ঞানেই পূর্ণতা প্রাপ্ত হননি, তাঁরা তাঁদের শ্রবণে, চিন্তায়, অনুভূতিতে এবং অন্য সমস্ত কার্যকলাপেও পূর্ণতা প্রাপ্ত। মুক্ত পুরুষদের ইন্দ্রিয়গুলি সম্পূর্ণরূপে পবিত্র, এবং সেই পবিত্র ইন্দ্রিয়ের দ্বারাই কেবল সমস্ত ইন্দ্রিয়ের অধীশ্বর হৃষিকেশের (শ্রীকৃষ্ণের) সেবা করা যায়। তাই *শ্রীমদ্ভাগবত* হচ্ছে বেদের রচয়িতা, সর্বতোভাবে বিশুদ্ধ-আত্মা শ্রীল ব্যাসদেব কৃত পূর্ণ পুরুষোত্তম পরমেশ্বর ভগবানের দিব্য বর্ণনা।

শ্লোক ১৪

ততোঽন্যথা কিঞ্চন যদ্বিবক্ষতঃ পৃথগ্দৃশস্তৎকৃতরূপনামভিঃ।
ন কর্হিচিৎক্কাপি চ দুঃস্থিতা মতির্লভেত বাতাহতনৌরিবাস্পদম্ ॥ ১৪ ॥

ততঃ—তা থেকে; **অন্যথা**—ব্যতীত; **কিঞ্চন**—কিছু; **যৎ**—যা কিছু; **বিবক্ষতঃ**—বর্ণনা করতে ইচ্ছুক; **পৃথক্**—ভিন্ন; **দৃশঃ**—দৃষ্টি; **তৎকৃতঃ**—তার প্রতিক্রিয়া; **রূপ**—রূপ; **নামভিঃ**—নামের দ্বারা; **ন কর্হিচিৎ**—কখনও নয়; **ক্কাপি**—যে কোন; **চ**—এবং; **দুঃস্থিতা মতিঃ**—চঞ্চল চিত্ত; **লভেত**—লাভ করে; **বাত-আহত**—বায়ুতাড়িত; **নৌঃ**—নৌকা; **ইব**—মতো; **আস্পদম্**—স্থান।

অনুবাদ

ভগবানকে ছাড়া তুমি আর যা কিছু বর্ণনা করতে চাও, তা সবই বিভিন্ন রূপ, নাম এবং পরিণামরূপে মানুষের চিত্তকে উদ্বিগ্ন এবং উত্তেজিত করবে, ঠিক যেভাবে একটি আশ্রয়বিহীন নৌকা বায়ুর দ্বারা তাড়িত হয়ে ইতস্তত বিক্ষিপ্ত হয়।

তাৎপর্য

শ্রীল ব্যাসদেব হচ্ছেন সমস্ত বৈদিক শাস্ত্রের সম্পাদক, এবং তাই তিনি পারমার্থিক তত্ত্ব বিভিন্নভাবে বর্ণনা করেছেন, যেমন সকাম কর্ম, জ্ঞান, যোগ এবং ভক্তি। তা

ছাড়াও, বিভিন্ন পুরাণে তিনি বিভিন্ন নাম এবং রূপ সমন্বিত বিভিন্ন দেব-দেবীদের পূজা করার পন্থাও বর্ণনা করেছেন। তার ফলে পরমেশ্বর ভগবানের সেবায় মনকে একাগ্র করতে জনসাধারণ একটু বিভ্রান্ত হতে পারে। আত্মজ্ঞান লাভের যথার্থ পন্থা সম্বন্ধে তারা এমনিতেই বিভ্রান্ত। শ্রীল নারদ মুনি শ্রীল ব্যাসদেবের বৈদিক সাহিত্য সংকলনে এই বিশেষ ত্রুটিটি সম্বন্ধে তাঁকে বোঝালেন, এবং তাই কেবল পরমেশ্বর ভগবানকে কেন্দ্র করে সব কিছুর বর্ণনা করতে নির্দেশ দিলেন। প্রকৃতপক্ষে ভগবান ছাড়া আর অন্য কোন কিছুরই অস্তিত্ব নেই। বিভিন্ন রূপে ভগবান প্রকাশিত হয়েছেন। তিনি হচ্ছেন একটি গাছের মূলস্বরূপ। তিনি হচ্ছেন একটি দেহের উদরস্বরূপ। গাছের গোড়ায় জল দিলে যেমন সমস্ত গাছটিতে জল দেওয়া হয়, উদরকে খাদ্য দিয়ে যেমন সমস্ত দেহে শক্তি সঞ্চার হয়, ঠিক তেমনই ভগবানই হচ্ছেন সমস্ত সৃষ্টির মূল। তাই ভাগবত পুরাণ ছাড়া অন্য কোন পুরাণ রচনা করা ব্যাসদেবের পক্ষে সমীচীন হয়নি, কেন না ভগবদ্ভক্তির মার্গ থেকে একটু বিক্ষিপ্ত হলেই আত্মজ্ঞান লাভের প্রচেষ্টায় উপদ্রব সৃষ্টি হতে পারে। যদি একটি ছোট ভ্রান্তির ফলে এইরূপ উপদ্রব সৃষ্টি হয়, তা হলে অদ্বয় তত্ত্ব ভগবানের থেকে ভিন্ন ভাবধারায় স্বেচ্ছাকৃত প্রচারের ফলে যে কি সর্বনাশ হতে পারে তা সহজেই অনুমান করা যায়। বিভিন্ন দেব-দেবীর পূজা করার সব চাইতে বড় বিপদ হচ্ছে যে তার ফলে এক বিশেষ সর্বেশ্বরবাদের সৃষ্টি হয় এবং তার ফলস্বরূপ বহু ধর্ম-সম্প্রদায় গড়ে ওঠে যা জীবের সঙ্গে ভগবানের প্রেমময়ী সম্পর্ক প্রতিষ্ঠার পথে প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়ায়। ভগবানের সঙ্গে জীবের এই নিত্য সম্পর্কের প্রতিষ্ঠাই হচ্ছে তার ভববন্ধন মোচনের একমাত্র উপায়। কিন্তু সর্বেশ্বরবাদের প্রভাবে জীব যখন মনে করে যে, যে-কোন একজনকে পূজা করলে চরমে তার ফল একই হবে, এবং তাই ভ্রান্ত মতবাদের দ্বারা পরিচালিত হয়ে সে যখন ভগবৎ-সেবাবিমুখ হয়, তার পারমার্থিক জীবনের সর্বনাশ হয়। এই সম্পর্কে ঘূর্ণিবায়ু দ্বারা তাড়িত নৌকার দৃষ্টান্তটি অত্যন্ত উপযুক্ত। সর্বেশ্বরবাদীদের বিক্ষিপ্ত মন, তার আরাধনার বস্তু নির্বাচন করতে না পারার ফলে কখনই পূর্ণরূপে আত্ম-জ্ঞান লাভ করতে পারে না।

শ্লোক ১৫

জুগুপ্সিতং ধর্মকৃতেঽনুশাসতঃ স্বভাবরক্তস্য মহান্ ব্যতিক্রমঃ।
যদ্বাক্যতো ধর্ম ইতীতরঃ স্থিতো ন মন্যতে তস্য নিবারণং জনঃ ॥ ১৫ ॥

জুগুপ্সিতম্—বিশেষভাবে নিন্দিত; **ধর্ম-কৃতে**—ধর্মের জন্য; **অনু-শাসতঃ**—অনুশাসন; **স্ব-ভাব-রক্তস্য**—স্বাভাবিকভাবে অনুরক্ত; **মহান্**—মহান; **ব্যতিক্রমঃ**—ব্যতিক্রম; **যৎ-বাক্যতঃ**—যার নির্দেশ অনুসারে; **ধর্মঃ**—ধর্ম; **ইতি**—এইভাবে; **ইতরঃ**—জনসাধারণ; **স্থিতঃ**—স্থিত; **ন**—করে না; **মন্যতে**—মনে কর; **তস্য**—তার; **নিবারণম্**—নিবারণ; **জনঃ**—তারা।

অনুবাদ

জনসাধারণ স্বাভাবিকভাবেই ভোগের প্রতি আসক্ত, এবং ধর্মের নামে তুমি তাদের তাতে আরও অনুপ্রাণিত করেছ। তা বিশেষভাবে নিন্দনীয় এবং অবিবেচকের মতো কাজ হয়েছে। তোমার দ্বারা এইভাবে নির্দেশিত হয়ে তারা ধর্মের নামে প্রবৃত্তি মার্গে লিপ্ত হবে এবং নিবৃত্তি মার্গ আর অনুসরণ করবে না।

তাৎপর্য

এখানে শ্রীল নারদ মুনি মহাভারত আদি শাস্ত্রে বর্ণিত সকাম কর্মপর বিভিন্ন বৈদিক সাহিত্য রচনা করার জন্য শ্রীল ব্যাসদেবকে তিরস্কার করছেন। জন্ম-জন্মান্তরের জড়-জাগতিক আসক্তির প্রভাবে মানুষ স্বাভাবিকভাবেই জড় জগৎকে ভোগ করার অভিলাষী। মানব জীবনের যথার্থ উদ্দেশ্য সম্বন্ধে তারা সচেতন নয়। এই মনুষ্য জীবন হচ্ছে মায়ার বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়ার একটি সুযোগ। বেদের উদ্দেশ্য হচ্ছে জীবকে তার প্রকৃত আলয় ভগবদ্ধামে ফিরে যাওয়ার পথ প্রদর্শন করা। বদ্ধ জীব ভগবদ্বিমুখ হওয়ার ফলে চুরাশি লক্ষ বিভিন্ন যোনিতে আবর্তিত হয়ে দণ্ডভোগ করে। মনুষ্য জীবন লাভ করার ফলে জীবের এই বদ্ধ অবস্থা থেকে মুক্ত হওয়ার একটি সুযোগ আসে, এবং তাই মনুষ্য জীবনের একমাত্র কর্তব্য হচ্ছে পরমেশ্বর ভগবানের সঙ্গে তার হারিয়ে যাওয়া সম্পর্কের পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা। এই অবস্থায় ধর্ম-অনুষ্ঠানের নামে ইন্দ্রিয় সুখভোগের পরিকল্পনায় কখনই তাদের অনুপ্রাণিত করা উচিত নয়। মানব জীবনের এই সম্ভাবনা ব্যাহত হলে সমস্ত সমাজ-ব্যবস্থা বিকৃত হয়ে যায়। শ্রীল ব্যাসদেব হচ্ছেন মহাভারত আদি সাহিত্যের আচার্য, এবং তিনি যদি মানুষকে ইন্দ্রিয় সুখভোগে অনুপ্রাণিত করেন, তা হলে পারমার্থিক প্রগতির পথে তা এক মস্ত বড় প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়াবে, কেন না জনসাধারণ তা হলে জড় বন্ধনরূপ জড়জাগতিক কার্যকলাপ থেকে কখনই বিরত হতে চাইবে না। একসময় মানুষ যখন ধর্মের নামে যজ্ঞে অসংখ্য পশুবলি দেওয়া শুরু করেছিল, তখন ভগবান বুদ্ধদেবরূপে আবির্ভূত হয়ে ধর্মের নামে এই পশুবলি বন্ধ করার জন্য মানুষকে বেদ-বিমুখ করেছিলেন। নারদ মুনি তাঁর দিব্য দৃষ্টিতে দর্শন করেছিলেন এবং তাই সেই ধরনের সাহিত্যের তিনি নিন্দা করেছিলেন। মাংসাহারী মানুষেরা এখনও ধর্মের নামে বিভিন্ন দেব-দেবীর কাছে পশুবলি দেয়, কেন না কোন কোন বৈদিক সাহিত্যে বিধিবদ্ধভাবে পশুবলির নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এই সমস্ত নির্দেশের মুখ্য উদ্দেশ্য হচ্ছে মাংস আহার থেকে মানুষকে নিবৃত্ত করা। কিন্তু কালক্রমে সেই উদ্দেশ্যের কথা মানুষ বিস্মৃত হয়েছে এবং তাই আজ সারা পৃথিবী জুড়ে অসংখ্য কসাইখানা গড়ে উঠেছে। তার কারণ হচ্ছে জড়বাদী মূর্খ মানুষেরা বৈদিক বিধি বিশ্লেষণে সক্ষম মানুষদের কথা শুনতে চায় না।

বেদে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে যে, প্রচণ্ড কর্ম করা অথবা অপর্যাপ্ত অর্থ সংগ্রহ করা অথবা প্রজাবৃদ্ধি করা মানব জীবনের উদ্দেশ্য নয়। মানব জীবনের উদ্দেশ্য হচ্ছে জড় আসক্তি রহিত হওয়া। জড়বাদী মানুষেরা এই সমস্ত নির্দেশ শুনতে চায় না। তাদের মতে যে সমস্ত মানুষ তাদের জীবন-ধারণের জন্য অর্থ উপার্জনে অক্ষম অথবা যে-সমস্ত মানুষ সাংসারিক জীবনে উন্নতি লাভ করতে পারেনি, তথাকথিত সন্ন্যাস জীবন তাদেরই জন্য।

মহাভারতের মতো ঐতিহাসিক গ্রন্থে অবশ্য নানা রকম জড় বিষয়ের সাথে পারমার্থিক বিষয়েরও আলোচনা করা হয়েছে। মহাভারতে *ভগবদ্গীতা* রয়েছে। সম্পূর্ণ মহাভারতের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে *ভগবদ্গীতার* চরম নির্দেশ—'সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।' অর্থাৎ, অন্য সব রকম ধর্ম পরিত্যাগ করে কেবল ভগবানের শরণ গ্রহণ করাই হচ্ছে জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য। কিন্তু বিষয়াসক্ত মানুষেরা মহাভারতের এই মূল বিষয় *ভগবদ্গীতার* থেকে রাজনীতি, অর্থনীতি এবং জনসেবার প্রতি অধিক আকৃষ্ট। ব্যাসদেবের এই সমন্বয়বাদী মনোভাবের জন্য নারদ মুনি স্পষ্টভাবে তাঁকে তিরস্কার করেছেন এবং তাঁকে উপদেশ দিয়েছেন যে তিনি যেন সরাসরিভাবে ঘোষণা করেন যে মানব জীবনের পরম প্রয়োজন হচ্ছে অচিরেই ভগবানের সঙ্গে নিত্য সম্পর্কের কথা অবগত হয়ে তাঁর শরণাগত হওয়া।

রোগগ্রস্ত মানুষের স্বাভাবিক প্রবণতা হচ্ছে নিষিদ্ধ খাদ্য আহার করা। সুদক্ষ চিকিৎসক কখনই রোগীকে তার ইচ্ছামত আহার করতে দেওয়ার প্রবণতার সঙ্গে আপোষ মীমাংসা করেন না। *ভগবদ্গীতাতে* বলা হয়েছে যে, যে মানুষ সকাম কর্মের প্রতি আসক্ত তাকে তার বৃত্তি থেকে নিরুৎসাহ করা উচিত নয়, কেন না ধীরে ধীরে সে আত্মজ্ঞানের স্তরে উন্নীত হতে পারে। যে সমস্ত মানুষ তত্ত্বজ্ঞানরহিত শুষ্ক জ্ঞানমার্গে অধিষ্ঠিত, তাদের বেলায় এই নির্দেশ প্রযোজ্য হতে পারে, কিন্তু যারা ভগবদ্ভক্তির মার্গে অধিষ্ঠিত তাদের এই ধরনের উপদেশের প্রয়োজন হয় না।

শ্লোক ১৬

বিচক্ষণোঽস্যার্হতি বেদিতুং বিভোরনন্তপারস্য নিবৃত্তিতঃ সুখম্।
প্রবর্তমানস্য গুণৈরনাত্মনস্ততো ভবান্দর্শয় চেষ্টিতং বিভোঃ ॥ ১৬ ॥

বিচক্ষণঃ—অত্যন্ত দক্ষ; **অস্য**—তার; **অর্হতি**—যোগ্য হয়; **বেদিতুম্**—বুঝতে পারা; **বিভোঃ**—পরমেশ্বর ভগবানের; **অনন্ত-পারস্য**—অসীমের; **নিবৃত্তিতঃ**—নিবৃত্ত হয়েছেন; **সুখম্**—জড়-জাগতিক সুখ; **প্রবর্ত-মানস্য**—আসক্ত জীবনের; **গুণৈঃ**—জড় গুণের দ্বারা; **অনাত্মনঃ**—পারমার্থিক জ্ঞান-রহিত; **ততঃ**—সে জন্য; **ভবান্**—তোমার মতো মহৎ আশয়সম্পন্ন ব্যক্তি; **দর্শয়**—পথ প্রদর্শন কর; **চেষ্টিতম্**—কার্য-কলাপ; **বিভোঃ**—পরমেশ্বর ভগবানের।

অনুবাদ

পরমেশ্বর ভগবান অসীম। জড় সুখভোগের বাসনা থেকে বিরত, অত্যন্ত বিচক্ষণ ব্যক্তিরাই কেবল এই পারমার্থিক তত্ত্বজ্ঞান উপলব্ধি করার যোগ্য। তাই যারা জড় বিষয়াসক্তির ফলে এই স্তরে অধিষ্ঠিত হতে পারেনি, তোমার মতো মহৎ আশয়সম্পন্ন ব্যক্তির কর্তব্য হচ্ছে পরমেশ্বর ভগবানের অপ্রাকৃত লীলাবিলাসের কাহিনী বর্ণনা করার মাধ্যমে তাদের পথ-প্রদর্শন করা।

তাৎপর্য

ভগবত্তত্ত্ব-বিজ্ঞান অত্যন্ত কঠিন বিষয়, বিশেষ করে তা যখন পরমেশ্বর ভগবানের দিব্য স্বরূপ বর্ণনা করে। এই বিষয়টি সাংসারিক কার্যে অত্যন্ত আসক্ত ব্যক্তিদের বোধগম্য নয়। যাঁরা অত্যন্ত বিচক্ষণ, যাঁরা পারমার্থিক জ্ঞানলাভের দ্বারা জাগতিক কার্যকলাপ থেকে প্রায় বিরত হয়েছেন, তাঁরাই কেবল এই মহৎ বিজ্ঞান অধ্যয়ন করার যোগ্য। *ভগবদ্গীতায়* স্পষ্টভাবে বর্ণনা করা হয়েছে যে, হাজার হাজার মানুষের মধ্যে কেবল দু'একজন পারমার্থিক সিদ্ধিলাভের প্রচেষ্টা করেন, এবং হাজার হাজার সিদ্ধ পুরুষদের মধ্যে দু'একজন কেবল সবিশেষ ভগবত্তত্ত্ব-বিজ্ঞানের মাধ্যমে পরমেশ্বর ভগবানকে তত্ত্বত জানতে পারেন। তাই নারদ মুনি শ্রীল ব্যাসদেবকে নির্দেশ দিয়েছেন সরাসরিভাবে ভগবানের অপ্রাকৃত লীলাবিলাসের কাহিনী বর্ণনা করতে। সেই বিজ্ঞানে শ্রীল ব্যাসদেব অত্যন্ত পারদর্শী এবং তিনি জড় ইন্দ্রিয়-সুখভোগের প্রতি অনাসক্ত। তাই তা বর্ণনা করতে তিনিই হচ্ছেন যথার্থ যোগ্য ব্যক্তি, এবং শ্রীল ব্যাসদেবের পুত্র শুকদেব গোস্বামী হচ্ছেন তাঁর আদর্শ গ্রহীতা। *শ্রীমদ্ভাগবত* হচ্ছে সর্বশ্রেষ্ঠ ভগবত্তত্ত্ব-বিজ্ঞান, তাই বিষয়াসক্ত জনসাধারণের হৃদয়ে তা ঔষধের মতো কার্য করে। যেহেতু এই শাস্ত্রে পরমেশ্বর ভগবানের অপ্রাকৃত লীলাবিলাসের কাহিনী বর্ণিত হয়েছে, তাই তা পরমেশ্বর ভগবান থেকে অভিন্ন। প্রকৃতপক্ষে এই গ্রন্থটি হচ্ছে শব্দরূপে ভগবানের অবতার। সাধারণ মানুষ তার মাধ্যমে ভগবানের লীলাবিলাসের বর্ণনা হৃদয়ঙ্গম করতে পারে, এবং তার ফলে তারা ভগবানের সঙ্গলাভ করতে পারে এবং ধীরে ধীরে ভবরোগ থেকে মুক্ত হয়ে পবিত্র হতে পারে। স্থান এবং কালের পরিপ্রেক্ষিতে সুদক্ষ ভক্তরা জনসাধারণকে কৃষ্ণভক্তে পরিণত করার জন্য নতুন নতুন উপায় উদ্ভাবন করতে পারেন। ভগবানের প্রেমময়ী সেবা অত্যন্ত শক্তিশালী, এবং সুদক্ষ ভক্ত বিষয়াসক্ত জনসাধারণের স্থূল মস্তিষ্কে তা সঞ্চারিত করার বিচক্ষণ উপায় উদ্ভাবন করতে পারেন। ভগবানের সেবার উদ্দেশ্যে সম্পাদিত ভক্তদের এই ধরনের অপ্রাকৃত কার্যকলাপ বিষয়াসক্ত মানুষদের মূর্খ সমাজে এক নবজীবনের সূচনা করতে পারে। এই বিষয়ে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু এবং তাঁর অনুগামীরা অত্যন্ত কুশলতা অবলম্বন করেছেন। সেই পন্থা অনুসরণ করে এই কলিযুগে কলহপরায়ণ মানব সমাজে শান্তি প্রতিষ্ঠা করা যেতে পারে এবং ভগবত্তত্ত্ব-জ্ঞান লাভ করা যেতে পারে।

শ্লোক ১৭

ত্যক্ত্বা স্বধর্মং চরণাম্বুজং হরে-
র্ভজন্নপক্বোঽথ পতেত্ততো যদি।
যত্র ক্ব বাভদ্রমভূদমুষ্য কিং
কো বার্থ আপ্তোঽভজতাং স্বধর্মতঃ ॥ ১৭ ॥

ত্যক্ত্বা—ত্যাগ করে; **স্ব-ধর্মম্**—স্বধর্ম; **চরণ-অম্বুজম্**—শ্রীপাদপদ্ম; **হরেঃ**—শ্রীহরির; **ভজন্**—ভগবানের প্রেমময়ী সেবা; **অপক্বঃ**—অপরিণত; **অথ**—অতএব; **পতেত**—পতিত হয়; **ততঃ**—সেখান থেকে; **যদি**—যদি; **যত্র**—যেখানে; **ক্ব**—কি রকম; **বা**—অথবা; **অভদ্রম্**—প্রতিকূল; **অভূৎ**—হবে; **অমুষ্য**—তার; **কিম্**—কিছুই নয়; **কঃ বা অর্থঃ**—কি লাভ; **আপ্তঃ**—প্রাপ্ত; **অভজতাম্**—অভক্তদের; **স্ব-ধর্মতঃ**—বৃত্তিগত ধর্মের যুক্ত হয়ে।

অনুবাদ

ভগবানের প্রেমময়ী সেবায় যুক্ত হওয়ার জন্য যিনি জাগতিক কর্তব্য পরিত্যাগ করেছেন, অপক্ক অবস্থায় যদি কোন কারণে তাঁর পতনও হয়, তবুও তাঁর বিফল হওয়ার কোন সম্ভাবনা থাকে না। পক্ষান্তরে, অভক্ত যদি সর্বতোভাবে নৈমিত্তিক ধর্ম-অনুষ্ঠানে যুক্ত হয়, তবুও তাতে তার কোন লাভ হয় না।

তাৎপর্য

মানুষের অসংখ্য কর্তব্য রয়েছে। মানুষ তার পিতামাতা, আত্মীয়স্বজন, সমাজ, দেশ বিভিন্ন জীব বা দেবতাদের প্রতিই কেবল নয়, মহান দার্শনিক, কবি, বৈজ্ঞানিক প্রভৃতিদের প্রতিও কর্তব্যের বন্ধনে আবদ্ধ। শাস্ত্রে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, কেউ যখন ভগবানের সেবায় যুক্ত হন, তখন তিনি এই সমস্ত কর্তব্য থেকে মুক্ত হন। তাই কেউ যদি তা করেন এবং ভগবদ্ভক্তির অনুশীলনে সফল হন, তা হলে খুবই ভাল হয়। কিন্তু কখনো কখনো এমনও হতে পারে যে সাময়িক ভাবপ্রবণতার বশবর্তী হয়ে কেউ ভগবানের সেবায় যুক্ত হয়ে ভগবানের শরণাগত হল এবং তারপর অসৎ সঙ্গের প্রভাবে সে ভক্তিমার্গ থেকে অধঃপতিত হল। ইতিহাসে সে রকম কত দৃষ্টান্ত রয়েছে। একটি হরিণ শিশুর প্রতি আসক্ত হওয়ার ফলে মহারাজ ভরতকে হরিণ-শরীরে জন্মগ্রহণ করতে হয়েছিল। তাঁর মৃত্যুর সময় তিনি সেই হরিণটির কথা চিন্তা করতে করতে দেহত্যাগ করেন। তার ফলে পরবর্তী জীবনে তিনি একটি হরিণ-শরীর প্রাপ্ত হন। তবে তিনি তাঁর পূর্বজন্মের কথা ভুলে যাননি। তেমনই, দেবাদিদেব মহাদেবের চরণে অপরাধ করার ফলে মহারাজ চিত্রকেতুও অধঃপতিত হয়েছিলেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও এখানে অত্যন্ত দৃঢ়তার সঙ্গে ঘোষণা করা হয়েছে যে

ভগবানের চরণারবিন্দে শরণাগত হওয়ার পর যদি কারো পতনও হয়, তবুও তিনি কখনই পরমেশ্বর ভগবানের শ্রীপাদপদ্মের কথা বিস্মৃত হবেন না। একবার ভগবানের সেবায় যুক্ত হলে সর্ব অবস্থাতেই সেই সেবা চলতে থাকে। *ভগবদ্গীতায়* বলা হয়েছে যে স্বল্প ভগবদ্ভক্তির অনুশীলনও অত্যন্ত ভয়ংকর অবস্থা থেকে জীবকে উদ্ধার করতে পারে। ইতিহাসে তার বহু দৃষ্টান্ত রয়েছে। তার একটি হচ্ছে অজামিল। অজামিল তাঁর প্রথম জীবনে ভক্ত ছিলেন, কিন্তু যৌবনে তাঁর পতন হয়। কিন্তু তবুও অন্তিম সময়ে ভগবান তাঁকে রক্ষা করেন।

শ্লোক ১৮

তস্যৈব হেতোঃ প্রযতেত কোবিদো
ন লভ্যতে যদ্ভ্রমতামুপর্যধঃ।
তল্লভ্যতে দুঃখবদন্যতঃ সুখং
কালেন সর্বত্র গভীররংহসা ॥ ১৮ ॥

তস্য—সেই হেতু; **এব**—কেবল; **হেতোঃ**—কারণ; **প্রযতেত**—প্রয়াস করা উচিত; **কোবিদঃ**—আধ্যাত্মিক-ভাবাপন্ন মানুষ; **ন**—না; **লভ্যতে**—লাভ করতে পারে; **যৎ**—যা; **ভ্রমতাম্**—ভ্রমণ করতে করতে; **উপরি অধঃ**—উপর থেকে নিচ পর্যন্ত; **তৎ**—তা; **লভ্যতে**—লাভ করতে পারে; **দুঃখবৎ**—দুঃখের মতো; **অন্যতঃ**—পূর্ব কর্মের ফল; **সুখম্**—ইন্দ্রিয় সুখ; **কালেন**—কালের প্রভাবে; **সর্বত্র**—সর্বত্র; **গভীর**—সূক্ষ্ম; **রংহসা**—প্রগতি।

অনুবাদ

যে সমস্ত মানুষ যথার্থই বুদ্ধিমান এবং পারমার্থিক বিষয়ে উৎসাহী, তাদের কর্তব্য হচ্ছে সেই চরম লক্ষ্যে উপনীত হওয়ার জন্য প্রয়াস করা, যা এই ব্রহ্মাণ্ডের সর্বোচ্চ লোক (ব্রহ্মলোক) থেকে শুরু করে সর্বনিম্ন লোক (পাতাল লোক) পর্যন্ত ভ্রমণ করেও লাভ করা যায় না। ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে লব্ধ যে জড়-সুখ, তা কালের প্রভাবে আপনা থেকেই লাভ হয়, ঠিক যেমন আকাঙ্ক্ষা না করলেও কালক্রমে আমরা দুঃখভোগ করে থাকি।

তাৎপর্য

সর্বত্রই বিভিন্ন রকমের প্রচেষ্টার মাধ্যমে মানুষ যত বেশি সম্ভব ইন্দ্রিয়-সুখ উপভোগ করার চেষ্টা করে। কোন কোন মানুষ ব্যবসা করে, চাকরি করে, অর্থনৈতিক উন্নতি সাধন করে, রাজনৈতিক পদ লাভ করে ইন্দ্রিয়-সুখ-ভোগ করার চেষ্টা করছে, আর কেউ পুণ্য কর্ম করে পরবর্তী জীবনে উচ্চতর লোকে গিয়ে সুখভোগ করার চেষ্টা করছে। শাস্ত্রে বর্ণিত হয়েছে যে চন্দ্রলোকের অধিবাসীরা সোমরস পান করে

কল্পনাতীত সুখ উপভোগ করেন, আর অনেক দান করার ফলে পিতৃলোকে উন্নীত হওয়া যায়। এইভাবে এই জীবনে অথবা মৃত্যুর পরবর্তী জীবনে ইন্দ্রিয়-সুখভোগের বিভিন্ন উপায় রয়েছে। পুণ্য কর্ম করার ফলে মানুষ উচ্চতর লোকে উন্নীত হতে পারে, কিন্তু আজকাল কিন্তু মানুষ এই রকম পুণ্য কর্ম না করেই যান্ত্রিক উপায়ে চন্দ্র আদি উচ্চতর লোকে যাওয়ার জন্য উদগ্রীব, কিন্তু সেটা কখনই সম্ভব হবে না। পরমেশ্বর ভগবানের আইন অনুসারে জীব তার পূর্বকৃত কর্মের ফলস্বরূপ বিভিন্ন স্থানে অধিষ্ঠিত হয়। শাস্ত্র নির্দেশিত সৎ কর্মের প্রভাবেই কেবল উচ্চ কুলে জন্ম হয়, ঐশ্বর্য লাভ হয় এবং দৈহিক সৌন্দর্য লাভ হয়। এই জীবনেও কেউ যখন ভাল কাজ করে, তখন সে উচ্চশিক্ষা প্রাপ্ত হয় অথবা ধন-সম্পদ লাভ করে। তেমনই, আমরা আমাদের সৎ কর্মের প্রভাবে পরবর্তী জীবনে এই ধরনের আকাঙ্ক্ষিত অবস্থা লাভ করতে পারি। তা না হলে, একই স্থানে একই সময়ে জন্মগ্রহণ করে দু'জন মানুষ ভিন্ন অবস্থা প্রাপ্ত হত না। কিন্তু এই সমস্ত জাগতিক স্থিতি অনিত্য। সর্বোচ্চ স্তরের ব্রহ্মলোকের স্থিতি অথবা সর্বনিম্ন পাতাললোকের স্থিতি আমাদের কর্ম অনুসারে পরিবর্তন হয়। দার্শনিক মনোভাবাপন্ন মানুষদের কখনই এই সব অনিত্য স্থিতির দ্বারা প্রলোভিত হওয়া উচিত নয়। তাঁদের কর্তব্য হচ্ছে পূর্ণ জ্ঞান এবং নিত্য আনন্দময় ভগবদ্ধামে নিত্য জীবন লাভ করা, যেখান থেকে এই দুঃখ-দুর্দশাগ্রস্ত জড় জগতে আর ফিরে আসতে হবে না। দুঃখ এবং মিশ্র সুখ হচ্ছে জড় জীবনের দুটি বৈশিষ্ট্য এবং তা ব্রহ্মলোক ও অন্য সমস্ত লোকে একইভাবে লাভ হয়। স্বর্গের দেবতাদেরও তা লাভ হয়, আবার কুকুর-শূকরদের জীবনেও তা লাভ হয়। দুঃখ এবং মিশ্র সুখ কেবল অনুভূতির পার্থক্য মাত্র, কিন্তু এই জগতে কেউই জন্ম, মৃত্যু, জরা এবং ব্যাধির নিত্য দুঃখ থেকে মুক্ত নয়। তেমনই, সকলের আবার বরাদ্দ অনুসারে সুখও লাভ হয়ে থাকে। ব্যক্তিগত প্রচেষ্টার মাধ্যমে বেশি বা কম সুখ লাভ করা যায় না। তা লাভ হলেও আবার চলে যায়। তাই এই অনিত্য বস্তু লাভের জন্য সময়ের অপচয় করা উচিত নয়। কেবলমাত্র ভগবানের কাছে ফিরে যাওয়ার চেষ্টা করা উচিত। সেইটিই প্রতিটি মানুষের জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য হওয়া উচিত।

শ্লোক ১৯

ন বৈ জনো জাতু কথঞ্চনাব্রজে-
ন্মুকুন্দসেব্যন্যবদঙ্গ সংসৃতিম্।
স্মরন্মুকুন্দাঙ্‌ঘ্র্যুপগূহনং পুন-
র্বিহাতুমিচ্ছেন্ন রসগ্রহো জনঃ ॥ ১৯ ॥

ন—কখনই না; **বৈ**—অবশ্যই; **জনঃ**—ব্যক্তি; **জাতু**—যে কোন সময়; **কথঞ্চন**—কোন না কোনভাবে; **আব্রজেৎ**—ভোগ করে না; **মুকুন্দ-সেবী**—

ভগবানের ভক্ত; **অন্যবৎ**—অন্যদের মতো; **অঙ্গ**—হে প্রিয়; **সংসৃতিম্**—জড় অস্তিত্ব; **স্মরন্**—স্মরণ করে; **মুকুন্দ-অঙ্ঘ্রি**—পরমেশ্বর ভগবানের শ্রীপাদপদ্মে; **উপগূহনম্**—আলিঙ্গন করে; **পুনঃ**—পুনরায়; **বিহাতুম্**—পরিত্যাগ করতে ইচ্ছুক; **ইচ্ছেৎ**—বাসনা করে; **ন**—না; **রসগ্রহঃ**—যিনি রস আস্বাদন করেছেন; **জনঃ**—ব্যক্তি।

অনুবাদ

হে প্রিয় ব্যাস, কোন না কোন কারণে কৃষ্ণভক্তের পতন হলেও তাঁকে কখনই অন্যদের মতো (সকাম কর্মী ইত্যাদি) সংসার-চক্রে পতিত হতে হয় না, কেন না, যে মানুষ একবার পরমেশ্বর ভগবানের শ্রীপাদপদ্মের অমৃত আস্বাদন করেছেন, তিনি নিরন্তর ভগবানের স্মরণ করা ছাড়া আর কিছুই করতে পারেন না।

তাৎপর্য

ভগবদ্ভক্ত আপনা থেকেই জড় বিষয়ের প্রতি অনাসক্ত, কেন না তিনি হচ্ছেন রসগ্রহ, অর্থাৎ যিনি শ্রীকৃষ্ণের শ্রীপাদপদ্মের মাধুর্য আস্বাদন করেছেন। অসৎ সঙ্গের প্রভাবে সর্বদাই পতনোন্মুখ সকাম কর্মীদের মতো ভক্তদেরও অধঃপতনের বহু দৃষ্টান্ত রয়েছে। কিন্তু তার পতন হলেও ভক্তকে কখনই অধঃপতিত কর্মীর মতো বলে মনে করা উচিত নয়। কর্মী তার কর্মফল ভোগ করে, কিন্তু ভক্তকে ভগবান নিজে দণ্ড দান করে সংশোধন করেন। একটি অনাথের দুঃখ এবং রাজার প্রিয় পুত্রের দুঃখ এক নয়। অনাথ যথার্থই দুর্দশাগ্রস্ত, কেন না তাকে দেখবার কেউ নেই; কিন্তু কোন ধনী মানুষের প্রিয় পুত্রকে আপাত দৃষ্টিতে অনাথের মতো মনে হলেও সে সর্বদাই তার পিতার পর্যবেক্ষণে রয়েছে। অসৎ সঙ্গের প্রভাবে ভগবদ্ভক্ত কখনও কখনও সকাম কর্মীদের অনুকরণ করতে পারেন। সকাম কর্মীরা জড় জগতকে ভোগ করতে চায়। তেমনই, কনিষ্ঠ ভক্তও অজ্ঞানতাবশত ভগবদ্ভক্তির বিনিময়ে আধিপত্য লাভের আকাঙ্ক্ষা করতে পারে। এই ধরনের অনভিজ্ঞ ভক্তদের ভগবান কখনও কখনও বিভিন্ন অসুবিধার মধ্যে ফেলেন। তাঁর বিশেষ কৃপাস্বরূপ তিনি তাদের সমস্ত জড় সম্পদ অপহরণ করে নিতে পারেন। তার ফলে সেই বিভ্রান্ত ভক্তকে তাঁর সমস্ত আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব পরিত্যাগ করে এবং তখন তিনি ভগবানের কৃপায় পুনরায় জ্ঞানপ্রাপ্ত হয়ে ভগবৎ-সেবাপরায়ণ হন।

ভগবদ্গীতায় বলা হয়েছে যে, এই ধরনের অকৃতকার্য ভক্তরা নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ পরিবারে অথবা ধনী ব্যবসায়ী পরিবারে জন্মগ্রহণ করে পুনরায় ভগবদ্ভক্তি অনুশীলনের সুযোগ পান। তবে এই ধরনের অবস্থায় স্থিত ভক্তরা, ভগবান যাঁদের নিজে দণ্ডদান করে আপাত দৃষ্টিতে অত্যন্ত অসহায় অবস্থায় ফেলেছেন, তাঁদের মতো সৌভাগ্যসম্পন্ন নন। যে সমস্ত ভক্ত ভগবানের প্রভাবে সম্পূর্ণভাবে অসহায় হয়ে পড়েছেন, তাঁরা উচ্চকুলে জন্মগ্রহণকারী ভক্তদের থেকে অনেক বেশি ভাগ্যবান।

উচ্চকুলে জন্মলাভ করেছেন যে সমস্ত ভক্ত, তাঁরা দুর্ভাগ্যবশত ভগবানের শ্রীপাদপদ্মের কথা ভুলে যেতে পারেন, কিন্তু যে সমস্ত ভক্ত অত্যন্ত অসহায় অবস্থার পতিত হয়েছেন তাঁরা অধিক ভাগ্যবান। কেন না তাঁরা তাঁদের সম্পূর্ণ অসহায় অবস্থায় প্রভাবে অচিরেই ভগবানের শ্রীপাদপদ্মে ফিরে যান।

ভগবানের শুদ্ধ-ভক্তির দিব্য আস্বাদন এতই মধুর যে তা আস্বাদন করার ফলে ভক্ত আপনা থেকেই জড় সুখের প্রতি অনাসক্ত হয়ে পড়েন। সেটিই হচ্ছে ভগবদ্ভক্তির মার্গে উন্নতির লক্ষণ। শুদ্ধ ভগবদ্ভক্ত নিরন্তর পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের শ্রীপাদপদ্মের কথা স্মরণ করেন এবং তিনি কখনও এক মুহূর্তের জন্যও তাঁকে ভুলে যান না। এমন কি তাঁকে যদি ত্রিভুবনের সমস্ত ঐশ্বর্য দানও করা হয় তবুও তিনি এক মুহূর্তের জন্য ভগবানকে ভুলে থাকতে পারেন না।

শ্লোক ২০

ইদং হি বিশ্বং ভগবানিবেতরো
যতো জগৎস্থাননিরোধসম্ভবাঃ।
তদ্ধি স্বয়ং বেদ ভবাংস্তথাপি তে
প্রাদেশমাত্রং ভবতঃ প্রদর্শিতম্ ॥ ২০ ॥

ইদম্—এই; **হি**—সমস্ত; **বিশ্বম্**—বিশ্ব; **ভগবান্**—পরমেশ্বর ভগবান; **ইব**—প্রায় এক রকম; **ইতরঃ**—ভিন্ন; **যতঃ**—যার থেকে; **জগৎ**—জগৎ; **স্থান**—বিদ্যমান; **নিরোধ**—বিনাশ; **সম্ভবাঃ**—সৃষ্টি; **তৎ হি**—সব কিছু সম্বন্ধে; **স্বয়ম্**—ব্যক্তিগতভাবে; **বেদ**—জানে; **ভবান্**—মহৎ আশয়সম্পন্ন তুমি; **তথাপি**—তথাপি; **তে**—তোমাকে; **প্রাদেশ-মাত্রম্**—কেবল সংক্ষিপ্তসার; **ভবতঃ**—তোমাকে; **প্রদর্শিতম্**—বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

অনুবাদ

পরমেশ্বর ভগবান স্বয়ং এই বিশ্ব, তথাপি তিনি তার অতীত। তাঁর থেকেই এই জগৎ প্রকাশিত হয়েছে, তাঁকে আশ্রয় করেই এই জগৎ বর্তমান, এবং প্রলয়ের পর তাঁর মধ্যেই তা লীন হয়ে যায়। তুমি সে সবই জান। আমি কেবল সংক্ষেপে তোমাকে তা বলেছি।

তাৎপর্য

শুদ্ধ ভক্তের কাছে মুকুন্দ বা পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধে ধারণা সবিশেষ ও নির্বিশেষ উভয়েই। অব্যক্ত জগৎও মুকুন্দ, কেন না তা মুকুন্দের শক্তি থেকে প্রকাশিত হয়েছে। যেমন, একটি বৃক্ষ হচ্ছে একটি পূর্ণ সত্তা, কিন্তু তার শাখা-প্রশাখা এবং পাতাগুলি হচ্ছে সেই বৃক্ষের বিভিন্ন অংশ। বৃক্ষের পাতা এবং

শাখা-প্রশাখাগুলিও বৃক্ষ ; কিন্তু পূর্ণ বৃক্ষটি পাতা নয় অথবা শাখা-প্রশাখা নয় ; বেদে বলা হয়েছে, 'সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম'—অর্থাৎ, সমস্ত জগৎ ব্রহ্ম ছাড়া আর কিছুই নয়। এই উক্তিটির অর্থ হচ্ছে যেহেতু সব কিছুই পরম ব্রহ্ম থেকে প্রকাশিত হয়েছে, তাই সবই ব্রহ্ম। তেমনই, দেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ হাত-পাগুলিকে দেহ বলা হয়, কিন্তু পূর্ণ দেহটি হাত অথবা পা নয়। ভগবান হচ্ছেন সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ, এবং তাই ভগবানের সৃষ্টিও আংশিকভাবে নিত্য, পূর্ণ জ্ঞানময় এবং সুন্দর বলে মনে হয়। ভগবানের বহিরঙ্গা শক্তি মায়ার প্রভাবে মোহাচ্ছন্ন বদ্ধ জীবেরা তাই এই জগতের বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে রয়েছে। তারা এই জগতটিকেই সব কিছু বলে মনে করে, কেন না তাদের সর্বকারণের পরম কারণ পরমেশ্বর ভগবান সম্বন্ধে কোন জ্ঞানই নেই। তারা এও জানে না যে, দেহের বিভিন্ন অঙ্গগুলি যখন দেহের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে তখন আর সেগুলি দেহের সঙ্গে যুক্ত হাত অথবা পায়ের মতো থাকে না। তেমনই, ভগবদ্বিহীন সভ্যতা, যা পরমেশ্বর ভগবানের দিব্য প্রেমময়ী সেবা থেকে বিচ্ছিন্ন, তা ঠিক দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন হাত পায়ের মতো। সেই বিভিন্ন অঙ্গ প্রত্যঙ্গগুলি দেখতে অনেকটা হাত অথবা পায়ের মতো হলেও তা দিয়ে কোন কাজ হয় না। ভগবদ্ভক্ত শ্রীল ব্যাসদেব সে কথা খুব ভালভাবেই জানতেন। শ্রীল নারদ মুনি তাঁকে উপদেশ দিয়েছিলেন সেই তত্ত্বজ্ঞান প্রচার করতে, যাতে মায়াবদ্ধ জীবেরা সর্বকারণের পরম কারণ পরমেশ্বর ভগবানকে তাঁর কাছ থেকে জানতে পারে।

বেদে বর্ণনা করা হয়েছে যে, পরমেশ্বর ভগবান স্বাভাবিকভাবে পূর্ণশক্তিমান, এবং তাই তাঁর পরা-শক্তি সর্বদাই পূর্ণ এবং তাঁরই মতো। চিৎ এবং জড় এই উভয় জগৎ এবং তাদের আভ্যন্তরীণ বস্তুগুলি হচ্ছে ভগবানের অন্তরঙ্গা এবং বহিরঙ্গা শক্তির প্রকাশ। তুলনামূলকভাবে ভগবানের বহিরঙ্গা শক্তি হচ্ছে নিকৃষ্ট এবং তাঁর অন্তরঙ্গা শক্তি উৎকৃষ্ট। এই উৎকৃষ্ট শক্তি হচ্ছে চেতন সত্তা, এবং তাই তা পূর্ণভাবে অভিন্ন ; কিন্তু বহিরঙ্গা শক্তি জড় হওয়ার ফলে আংশিকভাবে অভিন্ন। কিন্তু এ দুটি শক্তিই ভগবানের সমান অথবা ভগবানের থেকে মহৎ নয়, কেন না ভগবান হচ্ছেন এই শক্তিগুলির অধীশ্বর বা শক্তিমান। এই শক্তিগুলি সর্বদাই তাঁর নিয়ন্ত্রণাধীন, ঠিক যেমন বিদ্যুৎ-শক্তি ; বিদ্যুৎ-শক্তি যতই শক্তিশালী হোক না কেন, তা সর্বদাই ইঞ্জিনিয়ারের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত।

মানুষ এবং অন্য সমস্ত জীব হচ্ছে ভগবানের অন্তরঙ্গা শক্তি সম্ভূত। তাই জীবও ভগবানের মতো। কিন্তু কোন অবস্থাতেই জীব ভগবানের সমকক্ষ অথবা ভগবানের থেকে বড় হতে পারে না। ভগবান এবং সমস্ত জীবের স্বতন্ত্র ব্যক্তিত্ব রয়েছে। জড়া শক্তির সাহায্যে জীবও সৃষ্টি করছে, কিন্তু তাদের সৃষ্টি কখনই ভগবানের সৃষ্টির সমান অথবা তার থেকে মহৎ হতে পারে না। মানুষ একটি ছোট স্পুটনিক তৈরি করে মহাশূন্যে তা প্রেরণ করতে পারে, কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে সে ভগবানের মতো এই পৃথিবী অথবা চন্দ্রের সমান গ্রহ-উপগ্রহের সৃষ্টি করে মহাশূন্যে তা ভাসিয়ে

রাখতে পারে। তারা কখনই ভগবানের সমকক্ষ নয়। সেটা কখনই সম্ভব নয়। মানুষ পূর্ণতা প্রাপ্ত হওয়ার পর ভগবানের গুণাবলীর একটি বৃহৎ অংশ লাভ করতে পারে (প্রায় শতকরা ৭৮ ভাগ), কিন্তু সে কখনই পরমেশ্বর ভগবানকে অতিক্রম করতে পারে না বা তাঁর সমকক্ষ হতে পারে না। বিকৃত অবস্থাতেই কেবল মূর্খ মানুষেরা ভগবানের সমকক্ষ হতে চায় ও তার ফলে মায়াশক্তির দ্বারা প্রতারিত হয়। তাই বিপথগামী জীবদের অবশ্য কর্তব্য হচ্ছে পরমেশ্বর ভগবানের মাহাত্ম্য স্বীকার করে তাঁর প্রেমময়ী সেবায় যুক্ত হওয়া। সে জন্যই ভগবান তাদের সৃষ্টি করেছেন। তা না হলে এই জগতে কখনই শান্তি আসতে পারে না। শ্রীল নারদ মুনি শ্রীল ব্যাসদেবকে উপদেশ দিয়েছেন শ্রীমদ্ভাগবতের সেই তত্ত্ব বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করতে। ভগবদ্গীতাতেও সেই তত্ত্ব বিশ্লেষণ করা হয়েছে : সর্বতোভাবে পরমেশ্বর ভগবানের শ্রীপাদপদ্মের শরণাগত হও। সেটিই হচ্ছে যথার্থ মানুষের প্রকৃত কর্তব্য।

শ্লোক ২১

ত্বমাত্মনাত্মানমবেহ্যমোঘদৃক্
পরস্য পুংসঃ পরমাত্মনঃ কলাম্ ।
অজং প্রজাতং জগতঃ শিবায় ত-
ন্মহানুভাবাভ্যুদয়োঽধিগণ্যতাম্ ॥ ২১ ॥

ত্বম্—তুমি ; **আত্মনা**—আত্মার দ্বারা ; **আত্মানম্**—পরমাত্মাকে ; **অবেহি**—সন্ধান কর ; **অমোঘ-দৃক্**—পূর্ণদ্রষ্টা ; **পরস্য**—পরম তত্ত্বের ; **পুংসঃ**—পরমেশ্বর ভগবান ; **পরমাত্মনঃ**—পরমাত্মার ; **কলাম্**—অংশ ; **অজম্**—জন্মরহিত ; **প্রজাতম্**—জন্মগ্রহণ করেছেন ; **জগতঃ**—জগতের ; **শিবায়**—মঙ্গলের জন্য ; **তৎ**—তা ; **মহানুভাব**—পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের ; **অভ্যুদয়ঃ**—লীলাসমূহ ; **অধিগণ্যতাম্**—সব চাইতে উজ্জ্বলভাবে বর্ণনা কর।

অনুবাদ

তুমি পূর্ণদ্রষ্টা। তুমি আত্মার দ্বারা অন্তর্যামী পরমাত্মা ভগবানকে জানতে পার, কেন না তুমি ভগবানের কলা-অবতার। যদিও তুমি জন্মহীন, তবুও সমস্ত মানুষের মঙ্গল সাধনের জন্য তুমি এই পৃথিবীতে আবির্ভূত হয়েছ। তাই দয়া করে তুমি পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের দিব্য লীলাসমূহ অত্যন্ত উজ্জ্বলভাবে বর্ণনা কর।

তাৎপর্য

শ্রীল ব্যাসদেব হচ্ছেন পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের শক্ত্যাবেশ অবতার। এই জড় জগতের অধঃপতিত মানুষদের উদ্ধার করার জন্য তিনি তাঁর অহৈতুকী কৃপার প্রভাবে এই ধরাধামে অবতরণ করেছেন। অধঃপতিত জীবেরা পরমেশ্বর ভগবানকে

ভুলে গেছে এবং তাঁর প্রেমময়ী সেবা থেকে বিচ্যুত হয়েছে। জীব হচ্ছে পরমেশ্বর ভগবানের বিভিন্ন অংশ এবং তাঁর নিত্য সেবক। তাই বদ্ধ জীবদের মঙ্গলের জন্য সমস্ত বৈদিক শাস্ত্র সুসংবদ্ধভাবে ক্রমপর্যায়ে প্রদান করা হয়েছে, এবং প্রতিটি জীবের কর্তব্য হচ্ছে এই সমস্ত শাস্ত্রের যথার্থ উপযোগিতা গ্রহণ করে এই জড় জগতের বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়া। শ্রীল নারদ মুনি যদিও আনুষ্ঠানিকভাবে শ্রীল ব্যাসদেবের গুরুদেব, তবুও শ্রীল ব্যাসদেব তাঁর গুরুদেবের উপর নির্ভরশীল নন, কেন না মূলত তিনি হচ্ছেন সকলের গুরু। কিন্তু যেহেতু তিনি এখানে আচার্যের কার্য সম্পাদন করছেন, তাই তিনি নিজের আচরণের মাধ্যমে আমাদের শিক্ষা দিচ্ছেন যে সকলকেই গুরু গ্রহণ করতে হয়, এমন কি স্বয়ং ভগবান হলেও। শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীরামচন্দ্র এবং শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু, ভগবানের সমস্ত অবতারেরা সর্বজ্ঞ হওয়া সত্ত্বেও গুরু গ্রহণ করেছেন। জনসাধারণকে তাঁর শ্রীপাদপদ্মের প্রতি পরিচালিত করার জন্য তিনি স্বয়ং ব্যাসদেবরূপে আবির্ভূত হয়ে তাঁর দিব্য লীলাবিলাসের কাহিনী বর্ণনা করেছেন।

শ্লোক ২২

ইদং হি পুংসস্তপসঃ শ্রুতস্য বা
স্বিষ্টস্য সূক্তস্য চ বুদ্ধিদত্তয়োঃ।
অবিচ্যুতোঽর্থঃ কবিভির্নিরূপিতো
যদুত্তমশ্লোকগুণানুবর্ণনম্ ॥ ২২ ॥

ইদম্—এই; **হি**—অবশ্যই; **পুংসঃ**—সকলের; **তপসঃ**—তপস্যার প্রভাবে; **শ্রুতস্য**—বেদ অনুশীলনের মাধ্যমে; **বা**—অথবা; **স্বিষ্টস্য**—যজ্ঞ; **সূক্তস্য**—পারমার্থিক শিক্ষা; **চ**—এবং; **বুদ্ধি**—জ্ঞানানুশীলন; **দত্তয়োঃ**—দান; **অবিচ্যুতঃ**—অবিচ্যুত; **অর্থঃ**—লাভ; **কবিভিঃ**—যথার্থ তত্ত্বজ্ঞানীর দ্বারা; **নিরূপিতঃ**—নিরূপণ করা হয়েছে; **যৎ**—যা; **উত্তমশ্লোক**—উত্তম শ্লোকের দ্বারা যাঁকে বর্ণনা করা হয়, সেই ভগবান; **গুণ-অনুবর্ণনম্**—অপ্রাকৃত গুণের বর্ণনা।

অনুবাদ

তত্ত্বদ্রষ্টা মহর্ষিরা যথাযথভাবে সিদ্ধান্ত করেছেন যে তপশ্চর্যা, বেদপাঠ, যজ্ঞ, মন্ত্রোচ্চারণ এবং দান আদির একমাত্র উদ্দেশ্য হচ্ছে উত্তমশ্লোক, ভগবানের অপ্রাকৃত লীলাবিলাসের বর্ণনা করা।

তাৎপর্য

মানুষের বুদ্ধিমত্তা বিকশিত হয় কলা, বিজ্ঞান, দর্শন, মনস্তত্ত্ব, অর্থনীতি, রাজনীতি ইত্যাদি বিষয়ে প্রগতি সাধন করার জন্য। এই সমস্ত জ্ঞান অর্জন করার মাধ্যমে মানব সমাজ জীবনের পূর্ণতা প্রাপ্ত হতে পারে। জীবনের এই পূর্ণতার চরম অবস্থা হচ্ছে

পরমেশ্বর ভগবান শ্রীবিষ্ণুকে উপলব্ধি করা। তাই শ্রুতিতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে, যাঁরা যথাযথভাবে অতি উন্নত জ্ঞান অর্জন করেছেন, তাঁদের কর্তব্য হচ্ছে শ্রীবিষ্ণুর সেবার আকাঙ্ক্ষী হওয়া। দুর্ভাগ্যবশত যে সমস্ত মানুষ বিষ্ণুমায়ার বাহ্যিক সৌন্দর্যের দ্বারা মোহিত হয়ে পড়েছে তারা বুঝতে পারে না যে আত্মোপলব্ধির পূর্ণতা নির্ভর করে বিষ্ণুকে উপলব্ধি করার উপর। 'বিষ্ণুমায়া' কথাটির অর্থ হচ্ছে ইন্দ্রিয়-সুখভোগ, যা অনিত্য এবং ক্লেশদায়ক। যারা বিষ্ণুমায়ার দ্বারা আবদ্ধ, তারা তাদের ইন্দ্রিয়ের তৃপ্তিসাধনের উদ্দেশ্যে তাদের উন্নত জ্ঞানকে ব্যবহার করে। শ্রীনারদ মুনি বিশ্লেষণ করেছেন যে এই বিশ্ব-চরাচরের সমস্ত কিছুই হচ্ছে পরমেশ্বর ভগবানের বিভিন্ন শক্তিসম্ভূত, কেন না অচিন্ত্য শক্তির প্রভাবে, কার্য এবং কারণের দ্বারা ভগবান এই জগতকে সৃষ্টি করেছেন এবং সক্রিয় করেছেন। এই পৃথিবীর সব কিছুই তাঁর শক্তিতে আশ্রয় করে বিরাজ করছে এবং প্রলয়ের পর সব কিছুই তাঁর মধ্যে লীন হয়ে যাবে। তাই কোন কিছুই তাঁর থেকে ভিন্ন নয়, কিন্তু সেই সঙ্গে ভগবান সর্বদাই তাদের থেকে ভিন্ন।

যখন জ্ঞানের প্রগতি ভগবানের সেবায় নিয়োজিত হয়, তখন তা পরমতত্ত্বে পর্যবসিত হয়। পরমেশ্বর ভগবানের অপ্রাকৃত নাম, যশ, মহিমা ইত্যাদি সবই তাঁর থেকে অভিন্ন। তাই সমস্ত মুনি-ঋষি এবং ভগবদ্ভক্তেরা নির্দেশ দিয়ে গেছেন যে শিল্পকলা, বিজ্ঞান, দর্শন, রসায়ন, মনস্তত্ত্ব আদি জ্ঞানের সমস্ত শাখাগুলি সর্বতোভাবে যেন ভগবানের সেবায় নিয়োজিত হয়। শিল্পকলা, সাহিত্য, কবিতা, চিত্র ইত্যাদি সব কিছুই ভগবানের মহিমা প্রচারে ব্যবহৃত হতে পারে। সাহিত্যিক, কবি এবং বিখ্যাত পণ্ডিতেরা সাধারণত কামোদ্দীপক বিষয় নিয়েই লেখালেখি করেন। কিন্তু তাঁরা যদি ভগবানের সেবার প্রতি উন্মুখ হন, তা হলে তাঁরা তাঁদের সাহিত্যের মাধ্যমে ভগবানের অপ্রাকৃত লীলাবিলাসের কাহিনী বর্ণনা করতে পারেন। বাল্মীকি ছিলেন একজন মহান কবি, তেমনই ব্যাসদেব ছিলেন একজন মহান লেখক, এবং তাঁরা উভয়েই পরমেশ্বর ভগবানের অপ্রাকৃত লীলাবিলাসের কাহিনী বর্ণনা করতে সম্পূর্ণভাবে ব্রতী হয়েছিলেন, এবং তার ফলে তাঁরা অমর হয়ে রয়েছেন। তেমনই, বিজ্ঞান এবং দর্শনও ভগবানের সেবায় নিয়োগ করা উচিত। ইন্দ্রিয়ের তৃপ্তিসাধনের জন্য মনোধর্মপ্রসূত শুষ্ক মতবাদ সৃষ্টি করে কোন লাভ হয় না। ভগবানের মহিমা প্রতিষ্ঠা করার উদ্দেশ্যেই দর্শন এবং বিজ্ঞানকে নিয়োগ করা উচিত। উন্নত বুদ্ধিসম্পন্ন মানুষদের বিজ্ঞানের মাধ্যমে পরম-তত্ত্বকে জানার জন্য উৎসুক হতে দেখা যায়, তাই মহান বৈজ্ঞানিকদের কর্তব্য হচ্ছে বিজ্ঞানের ভিত্তিতে ভগবানের অস্তিত্ব প্রমাণ করার চেষ্টা করা। তেমনই, দার্শনিক মতবাদগুলি পরম-তত্ত্বকে সবিশেষ এবং সর্বশক্তিমানরূপে প্রতিপন্ন করার জন্য প্রয়োগ করা উচিত। এইভাবে জ্ঞানের অন্যান্য শাখাগুলিও সর্বদাই ভগবানের সেবায় নিযুক্ত করা উচিত। ভগবদ্গীতাতেও সেই

নির্দেশই দেওয়া হয়েছে। 'জ্ঞান' যদি ভগবানের সেবায় নিয়োগ না করা হয়, তা হলে তা অজ্ঞান ছাড়া আর কিছুই নয়। প্রগতিশীল জ্ঞানের যথার্থ উপযোগিতা হচ্ছে পরমেশ্বর ভগবানের মহিমা প্রচার করা এবং সেটিই হচ্ছে যথার্থ তত্ত্ব। বৈজ্ঞানিক জ্ঞান এবং কার্যকলাপ যখন ভগবানের সেবায় নিযুক্ত হয়, তখন তা সবই হচ্ছে যথার্থ হরিকীর্তন বা ভগবানের মহিমা কীর্তন।

শ্লোক ২৩

অহং পুরাতীতভবেঽভবং মুনে
দাস্যাস্তু কস্যাশ্চন বেদবাদিনাম্।
নিরূপিতো বালক এব যোগিনাং
শুশ্রূষণে প্রাবৃষি নির্বিবিক্ষতাম্ ॥ ২৩ ॥

অহম্—আমি; **পুরা**—পূর্বকল্পে; **অতীত-ভবে**—পূর্বজন্মে; **অভবম্**—হয়েছিলাম; **মুনে**—মুনির; **দাস্যাঃ**—দাসীর; **তু**—কিন্তু; **কস্যাশ্চন**—কোন; **বেদ-বাদিনাম্**—বেদজ্ঞ ঋষিদের; **নিরূপিতঃ**—নিযুক্ত; **বালকঃ**—বালক সেবক; **এব**—কেবল; **যোগিনাম্**—ভক্তদের; **শুশ্রূষণে**—সেবায়; **প্রাবৃষি**—বর্ষাকালের চারটি মাসে; **নির্বিবিক্ষতাম্**—একত্রে বসবাস করছিলেন।

অনুবাদ

হে মুনিবর, পূর্বকল্পে আমি বেদজ্ঞ ঋষিদের পরিচর্যারত এক দাসীর পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করেছিলাম। বর্ষাকালের চারটি মাসে তাঁরা যখন একত্রে বসবাস করছিলেন, তখন আমি তাঁদের সেবায় নিযুক্ত ছিলাম।

তাৎপর্য

ভগবানের প্রতি প্রেমময়ী সেবার প্রভাবে পবিত্রীভূত এক দিব্য পরিবেশের অদ্ভুত গুণাবলীর কথা শ্রীনারদ মুনি এখানে সংক্ষেপে বর্ণনা করেছেন। তিনি ছিলেন দাসীপুত্র। তিনি যথাযথভাবে শিক্ষালাভ করেননি। কিন্তু তবুও যেহেতু তাঁর সমস্ত শক্তিই ভগবানের সেবায় নিযুক্ত হয়েছিল, তাই তিনি এক দেবর্ষিতে পরিণত হয়েছিলেন। এমনই হচ্ছে ভগবদ্ভক্তির প্রভাব। জীব হচ্ছে ভগবানের তটস্থা শক্তি, এবং তাই তাদের কর্তব্য হচ্ছে পরমেশ্বর ভগবানের অপ্রাকৃত সেবায় যথাযথভাবে যুক্ত হওয়া। তা যখন করা হয় না, তখনকার সেই অবস্থাকে বলা হয় 'মায়া'। তাই ইন্দ্রিয়ের তৃপ্তিসাধনের পরিবর্তে সমস্ত শক্তি যখন ভগবানের সেবায় নিয়োজিত হয়, মায়ার মোহাচ্ছন্ন প্রভাব তৎক্ষণাৎ বিদূরিত হয়ে যায়। শ্রীল নারদ মুনির পূর্বজন্মের দৃষ্টান্ত থেকে স্পষ্টই বোঝা যায় যে ভগবানের সেবা শুরু হয় ভগবানের সেবকের সেবা করার মাধ্যমে। ভগবান বলেছেন যে, সরাসরিভাবে তাঁর সেবা করার থেকে

তাঁর সেবকের সেবা করা শ্রেয়। ভগবদ্ভক্তের সেবা ভগবানের সেবার থেকেও অধিক মহিমামণ্ডিত। তাই মানুষের কর্তব্য হচ্ছে ভগবানের একজন যথার্থ সেবকের সন্ধান লাভ করা এবং ভগবানের এই রকম সেবককে পরমারাধ্য গুরুরূপে বরণ করে তাঁর সেবায় সর্বতোভাবে যুক্ত হওয়া। এই রকম সদ্‌গুরু হচ্ছেন ভগবানকে দর্শন করার স্বচ্ছ মাধ্যম। তিনি সব রকমের জড় প্রভাব থেকে মুক্ত। এইভাবে সদ্‌গুরুর সেবা করা হলে, সেই সেবার অনুপাত অনুসারে ভগবান নিজেকে সেই ভক্তের হৃদয়ে প্রকাশিত করেন। সমস্ত শক্তি ভগবানের সেবায় নিয়োগ করাই হচ্ছে মুক্তি লাভের যথার্থ উপায়। সদ্‌গুরুর পরিচালনায় জীব যখন ভগবানের প্রতি সেবাপরায়ণ হয়, তখন সমস্ত জড় জগৎ তার কাছে ভগবানেরই মতো চিন্ময় হয়ে ওঠে। সুদক্ষ সদ্‌গুরু ভগবানের মহিমা প্রচারে সব কিছুকে ব্যবহার করার কৌশল জানেন এবং তাই ভগবানের সেবকের অপ্রাকৃত করুণার প্রভাবে সমস্ত জগৎ ভগবদ্ধামে পরিণত হতে পারে।

শ্লোক ২৪

তে ময্যপেতাখিলচাপলেঽর্ভকে
দান্তেঽধৃতক্রীড়নকেঽনুবর্তিনি।
চক্রুঃ কৃপাং যদ্যপি তুল্যদর্শনাঃ
শুশ্রূষমাণে মুনয়োঽল্পভাষিণি ॥ ২৪ ॥

তে—তারা; **ময়ি**—আমাকে; **অপেত**—অনুষ্ঠান না করে; **অখিল**—সব রকমের; **চাপলে**—চাপল্য; **অর্ভকে**—একটি বালককে; **দান্তে**—সমস্ত ইন্দ্রিয়গুলি সংযত করে; **অধৃত-ক্রীড়নকে**—খেলাধুলা সম্বন্ধে উদাসীন; **অনুবর্তিনি**—বাধ্য; **চক্রুঃ**—অর্পণ করেছিলেন; **কৃপাম্**—অহৈতুকী করুণা; **যদ্যপি**—যদিও; **তুল্য-দর্শনাঃ**—সমদর্শী; **শুশ্রূষমাণে**—বিশ্বস্তজনকে; **মুনয়ঃ**—বেদজ্ঞ মুনিগণ; **অল্প-ভাষিণি**—মিতভাষী।

অনুবাদ

যদিও তাঁরা ছিলেন সমদর্শী, সেই বেদজ্ঞ মুনিরা তাঁদের অহৈতুকী করুণার প্রভাবে আমাকে আশীর্বাদ করেছিলেন। যদিও আমি তখন ছিলাম একটি বালক মাত্র, কিন্তু তবুও আমি ছিলাম সংযত এবং সব রকম শিশুসুলভ খেলাধুলার প্রতি উদাসীন। তদুপরি, আমি দুরন্ত ছিলাম না এবং আমি প্রয়োজনের অতিরিক্ত কথা বলতাম না।

তাৎপর্য

ভগবদ্গীতায় পরমেশ্বর ভগবান বলেছেন, "*বেদৈশ্চ সর্বৈরহমেব বেদ্যঃ।*" অর্থাৎ, সমস্ত বেদের উদ্দেশ্য হচ্ছে আমাকে জানা। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু বলেছেন যে, বেদের

বিষয়বস্তু কেবল তিনটি। যথা—পরমেশ্বর ভগবানের সঙ্গে জীবের সম্বন্ধ প্রতিষ্ঠা করা, সেই সম্বন্ধযুক্ত হয়ে ভগবানের সেবা করা এবং তার ফলে পরম লক্ষ্য ভগবদ্ধামে ফিরে যাওয়া। প্রকৃতপক্ষে বেদান্তবাদী বলতে পরমেশ্বর ভগবানের শুদ্ধ ভক্তদেরই বোঝায়। এই ধরনের বেদান্তবাদী বা ভক্তিবেদান্ত ভগবদ্ভক্তির অপ্রাকৃত জ্ঞান বিতরণে সর্বদাই সমদর্শী। তাঁদের কাছে কেউই শত্রু নয় অথবা বন্ধু নয়; তাঁদের কাছে কেউই শিক্ষিত নয় অথবা অশিক্ষিত নয়। ভক্তিবেদান্তদের দৃষ্টিতে সাধারণ মানুষ মিথ্যা ইন্দ্রিয়তৃপ্তির প্রচেষ্টায় তাদের সময়ের অপচয় করছে। তাঁরা তাই অজ্ঞানাচ্ছন্ন মানুষদের পরমেশ্বর ভগবানের সঙ্গে তাদের হারিয়ে যাওয়া সম্পর্কের পুনঃপ্রতিষ্ঠা করার বাণী শোনান। এই ধরনের প্রচেষ্টার মাধ্যমে সব চাইতে আত্মবিস্মৃত জীবও পারমার্থিক জীবনের প্রতি আকৃষ্ট হয়, এবং এইভাবে ভক্তিবেদান্তদের দ্বারা দীক্ষিত হয়ে সাধারণ মানুষ ধীরে ধীরে পারমার্থিক জীবনের পথে অগ্রসর হয়। তাই সেই বেদান্তবাদীরা সেই বালকটিকে সংযত-চিত্ত এবং শিশুসুলভ খেলাধুলার প্রতি উদাসীন হওয়ার পূর্বেই পারমার্থিক জীবনে দীক্ষিত করেছিলেন। কিন্তু দীক্ষার পূর্বে সেই বালকটি সংযতচিত্ত হয়েছিল, যা পারমার্থিক জীবনের প্রগতি লাভের জন্য অত্যন্ত প্রয়োজন। বর্ণাশ্রম ধর্মে, যা হচ্ছে যথার্থ মানব জীবনের শুরু, পাঁচ বছর বয়স হলে পরে বালককে ব্রহ্মচারীরূপে গুরুদেবের আশ্রমে পাঠানো হত। সেখানে এই সমস্ত বিষয় সুসংবদ্ধভাবে বালকদের শেখানো হত—তা সে রাজারই পুত্র হোক অথবা সাধারণ মানুষের পুত্র হোক। সেই শিক্ষাব্যবস্থা কেবল সৎ নাগরিক তৈরি করার জনাই ছিল না, তার যথার্থ উদ্দেশ্য ছিল বালকদের ভবিষ্যৎ জীবনে পারমার্থিক পথে উপযুক্ত করে তোলা। ইন্দ্রিয়-তৃপ্তির অসংযত জীবন বর্ণাশ্রম প্রথা অনুশীলনকারী শিশুদের কাছে অজ্ঞাত ছিল। সেই যুগে এমন কি গর্ভ-সঞ্চার করবার পূর্বেই আগামী দিনের শিশুর হৃদয়ে পারমার্থিক ভাবধারা সঞ্চার করা হত। জড় জগতের বন্ধন থেকে সন্তানের মুক্তির দায়িত্ব পিতা এবং মাতা উভয়েই গ্রহণ করতেন। সেটিই হচ্ছে যথার্থ পরিবার-পরিকল্পনা। সম্পূর্ণভাবে সার্থক সন্তান উৎপাদন করাই হচ্ছে পরিবার-পরিকল্পনা। আত্ম-সংযত না হলে, সুনিয়ন্ত্রিত না হলে এবং সম্পূর্ণরূপে বাধ্য না হলে কেউই সদ্‌গুরুর নির্দেশ যথাযথভাবে অনুসরণ করতে পারে না, এবং তা না করলে কেউই ভগবানের কাছে ফিরে যেতে পারে না।

শ্লোক ২৫

উচ্ছিষ্টলেপাননুমোদিতো দ্বিজৈঃ
সকৃৎস্ম ভুঞ্জে তদপাস্তকিল্বিষঃ।
এবং প্রবৃত্তস্য বিশুদ্ধচেতস-
স্তদ্ধর্ম এবাত্মরুচিঃ প্রজায়তে ॥ ২৫ ॥

উচ্ছিষ্ট-লেপান্—উচ্ছিষ্ট আহার সামগ্রী; **অনুমোদিতঃ**—অনুমতি লাভ করে; **দ্বিজৈঃ**—বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণদের দ্বারা; **সকৃৎ**—কোন এক সময়ে; **স্ম**—অতীতে; **ভুঞ্জে**—গ্রহণ করেছিলাম; **তৎ**—সেই আচরণের দ্বারা; **অপাস্ত**—মোচন হয়েছিল; **কিল্বিষঃ**—সব রকমের পাপ; **এবম্**—এইভাবে; **প্রবৃত্তস্য**—প্রবৃত্ত হয়ে; **বিশুদ্ধ-চেতসঃ**—বিশুদ্ধচেতা; **তৎ**—সেই বিশেষ; **ধর্মঃ**—প্রকৃতি; **এব**—অবশ্যই; **আত্ম-রুচিঃ**—চিন্ময় আকর্ষণ; **প্রজায়তে**—প্রকাশিত হয়েছিল।

অনুবাদ

একবার কেবল অনুমতি গ্রহণপূর্বক আমি তাঁদের উচ্ছিষ্ট গ্রহণ করেছিলাম, এবং তার ফলে আমার সমস্ত পাপ তৎক্ষণাৎ বিদূরিত হয়েছিল। তার ফলে আমার হৃদয় নির্মল হয় এবং সেই সময় সেই পরমার্থবাদীদের আচরণের প্রতি আমি আকৃষ্ট হই।

তাৎপর্য

শুদ্ধ-ভক্তি অনেকটা সংক্রামক ব্যাধির মতো, তবে তা শুভ অর্থে সংক্রামক ব্যাধির মতো। শুদ্ধ ভক্ত সব রকমের পাপ থেকে মুক্ত। পরমেশ্বর ভগবান হচ্ছেন পবিত্র, এবং যতক্ষণ পর্যন্ত না কেউ জড় জগতের কলুষ থেকে মুক্ত হয়ে সে রকমভাবে পবিত্র হচ্ছে, ততক্ষণ পরমেশ্বর ভগবানের শুদ্ধ ভক্ত হতে পারে না। যে সমস্ত ভক্তিবেদান্তদের কথা এখানে উল্লেখ করা হয়েছে, তাঁরা সকলেই ছিলেন শুদ্ধ ভক্ত, এবং সেই বালকটি তাঁদের সঙ্গ-প্রভাবে ও একবার মাত্র তাঁদের উচ্ছিষ্ট গ্রহণ করার ফলে তাঁদের পবিত্র গুণাবলীর দ্বারা প্রভাবিত হয়ে পড়ে। শুদ্ধ ভক্তদের এই ধরনের উচ্ছিষ্ট গ্রহণ এমন কি অনেক সময় তাঁদের অনুমতি ব্যতিরেকেই করা যেতে পারে। কখনও কখনও কিছু নকল ভক্তও দেখা যায়, এবং তাদের সম্বন্ধে অত্যন্ত সাবধান হওয়া উচিত। ভগবদ্ভক্তির জগতে প্রবেশ করার পথে নানা রকম প্রতিবন্ধক রয়েছে। কিন্তু শুদ্ধ ভক্তের সঙ্গ করার ফলে সব রকম বাধা-বিপত্তি দূর হয়ে যায়। শুদ্ধ ভক্তের সঙ্গ-প্রভাবে কনিষ্ঠ ভক্ত শুদ্ধ ভক্তের দিব্য গুণাবলীর দ্বারা ভূষিত হন, যার অর্থ হচ্ছে পরমেশ্বর ভগবানের নাম, যশ, লীলা ইত্যাদির প্রতি আকৃষ্ট হওয়া। শুদ্ধ ভক্তের গুণাবলীর দ্বারা সংক্রামিত হওয়ার অর্থ হচ্ছে সর্বদা পরমেশ্বর ভগবানের অপ্রাকৃত প্রেমময়ী সেবায় নিরন্তর যুক্ত থাকার আস্বাদন লাভ করা। এই অপ্রাকৃত স্বাদ লাভ করার ফলে সব রকমের জড় বিষয়ের প্রতি বিতৃষ্ণা আসে। তাই শুদ্ধ ভক্ত কোন রকম জড় কার্যকলাপের প্রতি আকৃষ্ট হন না। সব রকমের পাপ থেকে মুক্ত হলে অথবা ভগবদ্ভক্তির পথে সব রকমের প্রতিবন্ধকগুলি দূর হলে ভক্ত পারমার্থিক জীবনের প্রতি আকৃষ্ট হন, ভগবদ্ভক্তির প্রতি সুদৃঢ় নিষ্ঠা লাভ করেন, ভগবদ্ভক্তির প্রতি রুচি আসে, ভগবদ্ভক্তির অপ্রাকৃত ভাব অনুভব করেন এবং চরমে প্রেমভক্তির স্তরে অধিষ্ঠিত হতে পারেন। শুদ্ধ ভক্তের সঙ্গ প্রভাবে এই সমস্ত গুণগুলি ক্রমে ক্রমে বিকশিত হয় এবং সেটিই হচ্ছে এই শ্লোকের তাৎপর্য।

শ্লোক ২৬

তত্রান্বহং কৃষ্ণকথাঃ প্রগায়তা-
মনুগ্রহেণাশৃণবং মনোহরাঃ।
তাঃ শ্রদ্ধয়া মেঽনুপদং বিশৃণ্বতঃ
প্রিয়শ্রবস্যঙ্গ মমাভবদ্রুচিঃ ॥ ২৬ ॥

তত্র—সেখানে; **অনু**—প্রতিদিন; **অহম্**—আমি; **কৃষ্ণ-কথাঃ**—শ্রীকৃষ্ণের অপ্রাকৃত কার্যকলাপের বর্ণনা; **প্রগায়তাম্**—বর্ণনা করে; **অনুগ্রহেণ**—অহৈতুকী করুণার দ্বারা; **অশৃণবম্**—শ্রবণ করে; **মনঃ-হরাঃ**—মনোহর; **তাঃ**—তাঁরা; **শ্রদ্ধয়া**—শ্রদ্ধা সহকারে; **মে**—আমাকে; **অনুপদম্**—প্রতি পদক্ষেপে; **বিশৃণ্বতঃ**— বিশেষ মনোযোগ সহকারে শ্রবণ করে; **প্রিয়শ্রবসি**—পরমেশ্বর ভগবানের; **অঙ্গ**— হে ব্যাসদেব; **মম**—আমার; **অভবৎ**—হয়েছিল; **রুচিঃ**—রুচি।

অনুবাদ

হে ব্যাসদেব, সেখানে সেই ঋষিরা প্রতিদিন পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের চিত্তাকর্ষক কার্যকলাপের বর্ণনা করতেন। তাঁদের অনুগ্রহে আমি তা শ্রবণ করতাম। এইভাবে নিবিষ্ট চিত্তে তা শ্রবণ করার ফলে প্রতি পদে পরমেশ্বর ভগবানের মহিমা শ্রবণে আমার রুচি বৃদ্ধি পেতে থাকে।

তাৎপর্য

পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের রূপই কেবল আকর্ষণীয় নয়। তাঁর অপ্রাকৃত কার্যকলাপও পরম আকর্ষণীয়। তার কারণ হচ্ছে পরমেশ্বর ভগবানের নাম, রূপ, মহিমা, লীলা, পার্ষদ, পরিকর ইত্যাদি সবই অপ্রাকৃত। তিনি তাঁর অহৈতুকী করুণার প্রভাবে জড় জগতে অবতরণ করেন এবং একজন মানুষের মতো রূপ পরিগ্রহ করে তিনি তাঁর বিভিন্ন অপ্রাকৃত লীলাবিলাস প্রদর্শন করেন, যাতে মানুষ তাঁর প্রতি আকৃষ্ট হয়ে চিজ্জগতে ফিরে যেতে পারে। মানুষ স্বাভাবিকভাবে জড় কার্যকলাপে লিপ্ত বিভিন্ন মানুষের কার্যকলাপ ও ইতিহাস শুনতে ভালবাসে, কিন্তু সে জানে না যে তার ফলে কেবল তার মূল্যবান সময়েরই অপচয় হয়, এবং জড়া প্রকৃতির তিনটি গুণের প্রতি সে আসক্ত হয়ে পড়ে। এইভাবে সময়ের অপচয় না করে পরমেশ্বর ভগবানের অপ্রাকৃত লীলাবিলাসের কাহিনী শ্রবণ করার ফলে পারমার্থিক সাফল্য লাভ হয়। পরমেশ্বর ভগবানের লীলাবিলাসের বর্ণনা শ্রবণ করার ফলে সরাসরিভাবে পরমেশ্বর ভগবানের সঙ্গলাভ হয়, এবং পূর্বে যে কথা বলা হয়েছে, পরমেশ্বর ভগবানের সম্বন্ধে শ্রবণ করার ফলে জড় বিষয়ে আসক্ত মানুষের হৃদয়ে সঞ্চিত সমস্ত পাপ বিদূরিত হয়। এইভাবে সব রকমের পাপ থেকে মুক্ত হওয়ার ফলে শ্রোতা ধীরে ধীরে জড়

জগতের কলুষিত প্রভাব থেকে মুক্ত হন এবং পরমেশ্বর ভগবানের প্রতি আকর্ষণ ক্রমেই বাড়তে থাকে। নারদ মুনি তাঁর ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার দ্বারা তা বিশ্লেষণ করেছেন ; অর্থাৎ কেবলমাত্র পরমেশ্বর ভগবানের লীলাবিলাসের কাহিনী শ্রবণ করার ফলে ভগবানের পার্ষদত্ব লাভ করা যায়। নারদ মুনি অবিনশ্বর জীবন, অনন্ত জ্ঞান এবং পরম আনন্দ প্রাপ্ত হয়েছেন, এবং তিনি জড় ও চিন্ময় জগতের সর্বত্র ভ্রমণ করতে পারেন। যথাযথ সূত্র থেকে পরমেশ্বর ভগবানের অপ্রাকৃত লীলাবিলাসের কাহিনী মনোযোগ সহকারে শ্রবণ করার মাধ্যমেই কেবল জীবনের পরম পূর্ণতা প্রাপ্ত হওয়া যায়, ঠিক যেমন শ্রীনারদ মুনি তাঁর পূর্বজন্মে শুদ্ধ ভক্তদের (ভক্তিবেদান্তদের) কাছ থেকে তা প্রাপ্ত হয়েছিলেন। ভক্তসঙ্গে ভগবানের কথা শ্রবণ করার পন্থা কলহের যুগ এই কলিযুগে বিশেষভাবে অনুমোদিত হয়েছে।

শ্লোক ২৭

তস্মিংস্তদা লব্ধরুচের্মহামতে
প্রিয়শ্রবস্যস্খলিতা মতির্মম।
যয়াহমেতৎসদসৎস্বমায়য়া
পশ্যে ময়ি ব্রহ্মণি কল্পিতং পরে ॥ ২৭ ॥

তস্মিন্—তার ফলে ; **তদা**—সেই সময়ে ; **লব্ধ**—লাভ হয়েছিল ; **রুচেঃ**—রুচি ; **মহামতে**—হে মহর্ষি ; **প্রিয়শ্রবসি**—ভগবানের প্রতি ; **অস্খলিতা মতিঃ**—অপ্রতিহতা মতি ; **মম**—আমার ; **যয়া**—যার দ্বারা ; **অহম্**—আমি ; **এতৎ**—এই সমস্ত ; **সৎ-অসৎ**—সূক্ষ্ম এবং স্থূল ; **স্ব-মায়য়া**—স্বীয় অজ্ঞান ; **পশ্যে**—দৃষ্ট হয়েছিল ; **ময়ি**—আমার মধ্যে ; **ব্রহ্মণি**—ব্রহ্ম ; **কল্পিতম্**—কল্পিত ; **পরে**—প্রপঞ্চাতীত।

অনুবাদ

হে মহর্ষি, পরমেশ্বর ভগবানের প্রতি রুচি লাভ করা মাত্রই ভগবানের মহিমা শ্রবণে আমি স্থির মতিসম্পন্ন হয়েছিলাম। সেই রুচি যত বৃদ্ধি পেতে থাকে, ততই আমি বুঝতে পারি যে আমার অজ্ঞানতার ফলে আমাকে এই স্থূল এবং সূক্ষ্ম শরীর গ্রহণ করতে হয়েছে, কেন না ভগবান এবং জীব উভয়ই প্রপঞ্চাতীত।

তাৎপর্য

জড় জীবনের অজ্ঞানতাকে অন্ধকারের সঙ্গে তুলনা করা হয়, এবং সমস্ত বৈদিক শাস্ত্রে পরমেশ্বর ভগবানকে সূর্যের সঙ্গে তুলনা করা হয়। আলোক থাকলে সেখানে আর অন্ধকার থাকতে পারে না। পরমেশ্বর ভগবানের লীলাবিলাসের কাহিনী শ্রবণ হচ্ছে ভগবানের অপ্রাকৃত সঙ্গ, কেন না ভগবান এবং তাঁর অপ্রাকৃত লীলা অভিন্ন। পরম আলোকের সঙ্গে যুক্ত হওয়ার অর্থ হচ্ছে সব রকমের অজ্ঞান-অন্ধকার দূরীভূত

হওয়া। অজ্ঞানতার ফলেই বদ্ধ জীব ভ্রান্তভাবে মনে করে যে সে এবং ভগবান উভয়েই এই জড়া প্রকৃতির সৃষ্টি, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে পরমেশ্বর ভগবান এবং জীব উভয়েই অপ্রাকৃত এবং প্রকৃতিতে তাদের করণীয় কিছুই নেই। অজ্ঞান যখন দূর হয় এবং যখন পূর্ণরূপে জানা যায় যে পরমেশ্বর ভগবান ব্যতীত আর কিছুরই অস্তিত্ব নেই, তখন অবিদ্যার অন্ধকার বিদূরিত হয়। যেহেতু স্থূল এবং সূক্ষ্ম উভয় শরীরই পরমেশ্বর ভগবানের থেকে প্রকাশিত, তাই জ্ঞানের আলোক সেই উভয় শরীরকেই ভগবানের সেবায় নিযুক্ত করে। কায়িক পরিশ্রমের দ্বারা স্থূল শরীরকে ভগবানের সেবায় যুক্ত করতে হবে (যেমন ভগবানের জন্য জল আনা, মন্দির পরিষ্কার করা অথবা প্রণতি নিবেদন করা)। অর্চন পদ্ধতির দ্বারা অথবা মন্দিরে ভগবানের পূজার দ্বারা স্থূল শরীর ভগবানের সেবায় যুক্ত হয়। তেমনই, সূক্ষ্ম মনকে ভগবানের অপ্রাকৃত লীলাবিলাসের কাহিনী শ্রবণ, স্মরণ, তাঁর নাম উচ্চারণ ইত্যাদির দ্বারা ভগবানের সেবায় যুক্ত করতে হয়। এই ধরনের সমস্ত কার্যকলাপগুলি প্রপঞ্চাতীত। এ ছাড়া অন্য কোনভাবে স্থূল এবং সূক্ষ্ম শরীরকে ভগবানের সেবায় নিয়োগ করা যায় না। পারমার্থিক কার্যকলাপ সম্বন্ধে এই উপলব্ধি তখনই সম্ভব হয়, যখন বহু বছর ধরে ভগবানের প্রেমময়ী সেবার শিক্ষালাভ করে ভগবানের প্রতি স্বতঃস্ফূর্ত অনুরাগ লাভ হয়, যা নারদ মুনির ক্ষেত্রে হয়েছিল—ভগবানের কথা শ্রবণ করার ফলে তিনি গভীরভাবে প্রভাবিত হয়েছিলেন।

শ্লোক ২৮

ইত্থং শরৎপ্রাবৃষিকাবৃতূ হরে-
র্বিশৃণ্বতো মেঽনুসবং যশোঽমলম্।
সংকীর্ত্যমানং মুনিভির্মহাত্মভি-
র্ভক্তিঃ প্রবৃত্তাত্মরজস্তমোপহা ॥ ২৮ ॥

ইত্থম্—এইভাবে; **শরৎ**—শরৎকাল; **প্রাবৃষিকৌ**—বর্ষাকাল; **ঋতূ**—ঋতুদ্বয়; **হরেঃ**—ভগবানের; **বিশৃণ্বতঃ**—ক্রমান্বয়ে শ্রবণ করে; **মে**—আমি স্বয়ং; **অনুসবম্**—নিরন্তর; **যশঃ-অমলম্**—অমল কীর্তি; **সংকীর্ত্য-মানম্**—কীর্তন করেন; **মুনিভিঃ**—মহান মুনি-ঋষিরা; **মহাত্মভিঃ**—মহাত্মারা; **ভক্তিঃ**—ভক্তি; **প্রবৃত্তা**—প্রবৃত্তি; **আত্ম**—জীব; **রজঃ**—রজোগুণ; **তমঃ**—তমোগুণ; **অপহা**—অপগত হয়ে যায়।

অনুবাদ

এইভাবে বর্ষা এবং শরৎ—এই দুটি ঋতুতে সেই মহান ঋষিদের দ্বারা কীর্তিত পরমেশ্বর ভগবান শ্রীহরির কীর্তন শোনার সৌভাগ্য আমার হয়েছিল। ভগবদ্ভক্তির প্রতি আমার প্রবৃত্তি যখন প্রবাহিত হতে শুরু করল, তখন রজ এবং তমোগুণের আবরণ বিদূরিত হয়ে গেল।

তাৎপর্য

পরমেশ্বর ভগবানকে ভালবাসার স্বাভাবিক প্রবৃত্তি প্রতিটি জীবেরই রয়েছে। সকলের মধ্যেই সেই প্রবণতাটি সুপ্তভাবে রয়েছে, কিন্তু জড়া প্রকৃতির সঙ্গ-প্রভাবে অনাদিকাল ধরে তা রজ এবং তমোগুণের আচ্ছাদনে আচ্ছাদিত। পরমেশ্বর ভগবানের কৃপায় অথবা তাঁর মহদাশয় ভক্তের কৃপায় যদি জীব ভগবানের শুদ্ধ ভক্তের সঙ্গলাভ করার সৌভাগ্য অর্জন করে এবং ভগবানের অমল মহিমা শ্রবণ করার সুযোগ পায়, তা হলে অবশ্যই নদীর স্রোতের মতো ভক্তির প্রবাহ প্রবাহিত হতে শুরু করে। নদী যেমন সমুদ্রে মিলিত হওয়া পর্যন্ত অপ্রতিহতভাবে প্রবাহিত হতে থাকে, তেমনই শুদ্ধ ভক্তের সঙ্গ-প্রভাবে শুদ্ধ ভগবদ্ভক্তিও চরম লক্ষ্য ভগবৎ-প্রেম লাভ পর্যন্ত অপ্রতিহতভাবে প্রবাহিত হতে থাকে। ভগবদ্ভক্তির এই প্রবাহ রোধ করা যায় না। পক্ষান্তরে, তা অন্তহীনভাবে প্রবাহিত হতে থাকে। ভগবদ্ভক্তির প্রবাহ এতই শক্তিশালী যে তার দর্শনের ফলেও রজ এবং তমোগুণের প্রভাব থেকে মুক্ত হওয়া যায়। এইভাবে প্রকৃতির এই দুটি গুণের প্রভাব বিদূরিত হয় এবং জীব তার স্বরূপে অধিষ্ঠিত হয়ে জড় জগতের বন্ধন থেকে মুক্ত হয়।

শ্লোক ২৯

তস্যৈবং মেঽনুরক্তস্য প্রশ্রিতস্য হতৈনসঃ।
শ্রদ্দধানস্য বালস্য দান্তস্যানুচরস্য চ ॥ ২৯ ॥

তস্য—তার; **এবম্**—এইভাবে; **মে**—আমার; **অনুরক্তস্য**—তাঁদের প্রতি অনুরক্ত; **প্রশ্রিতস্য**—বিনীতভাবে; **হত**—মুক্ত; **এনসঃ**—পাপসমূহ; **শ্রদ্দধানস্য**—শ্রদ্ধাসম্পন্ন; **বালস্য**—বালকের; **দান্তস্য**—সংযত ইন্দ্রিয়; **অনুচরস্য**—কঠোরভাবে নির্দেশাদি মেনে চলা; **চ**—এবং।

অনুবাদ

আমি সেই ঋষিদের প্রতি অত্যন্ত আসক্ত হয়েছিলাম। আমার ব্যবহার ছিল নম্র এবং তাঁদের সেবা করার ফলে আমার সমস্ত পাপ মোচন হয়েছিল। আমার হৃদয়ে তাঁদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা ছিল। আমি আমার সমস্ত ইন্দ্রিয়গুলিকে সংযত করেছিলাম, এবং আমার দেহ ও মনের দ্বারা আমি অবিচলিতভাবে তাঁদের আজ্ঞা পালন করেছিলাম।

তাৎপর্য

নির্মল শুদ্ধ-ভক্তির স্তরে উন্নীত হওয়ার জন্য যোগ্য প্রার্থীর সেগুলিই হচ্ছে যোগ্যতা। এই ধরনের ভক্তের সর্বদাই শুদ্ধ ভক্তদের সঙ্গ অন্বেষণ করা উচিত। কখনই কপট ভক্তের দ্বারা বিপথগামী হওয়া উচিত নয়। শুদ্ধ-ভক্তির অভিলাষী জনকে অবশ্যই

সরল এবং বিনম্র চিত্তে এই ধরনের শুদ্ধ ভক্তের নির্দেশ গ্রহণ করতে হয়। শুদ্ধ ভক্ত হচ্ছেন পরমেশ্বর ভগবানের চরণে সর্বতোভাবে নিবেদিত আত্মা। তিনি জানেন যে পরমেশ্বর ভগবানই হচ্ছেন পরম ঈশ্বর এবং অন্য সকলেই হচ্ছেন তাঁর সেবক। অসৎ সঙ্গ-প্রভাবে সঞ্চিত পাপ কেবল শুদ্ধ ভক্তের সঙ্গ-প্রভাবেই মোচন হয়; কনিষ্ঠ অধিকারী ভক্তের কর্তব্য হচ্ছে সুদৃঢ় বিশ্বাস সহকারে শুদ্ধ ভক্তের সেবা করা এবং অত্যন্ত বিনীতভাবে তাঁর সমস্ত নির্দেশগুলি পালন করা; এইগুলি হচ্ছে এই জীবনেই সাফল্য লাভে বদ্ধপরিকর ভক্তের কয়েকটি বিশেষ লক্ষণ।

শ্লোক ৩০

জ্ঞানং গুহ্যতমং যত্তৎসাক্ষাদ্ভগবতোদিতম্ ।
অন্ববোচন্ গমিষ্যন্তঃ কৃপয়া দীনবৎসলাঃ ॥ ৩০ ॥

জ্ঞানম্—জ্ঞান; **গুহ্যতমম্**—সব চাইতে গোপনীয়; **যৎ**—যা; **তৎ**—তা; **সাক্ষাৎ**—সরাসরিভাবে; **ভগবতা উদিতম্**—স্বয়ং ভগবান কর্তৃক প্রদত্ত; **অন্ববোচন্**—উপদেশ প্রদান করেছিলেন; **গমিষ্যন্তঃ**—চলে যাওয়ার সময়; **কৃপয়া**—অহৈতুকী কৃপার প্রভাবে; **দীন-বৎসলাঃ**—দীনবৎসল।

অনুবাদ

দীনবৎসল সেই ভক্তিবেদান্তরা যখন চলে যাচ্ছিলেন, তখন তাঁরা স্বয়ং ভগবান প্রদত্ত পরম গুহ্যজ্ঞান আমাকে দান করেছিলেন।

তাৎপর্য

ভগবান স্বয়ং যে উপদেশ দিয়ে গেছেন, শুদ্ধ বৈদান্তিক বা ভক্তিবেদান্ত তাঁর অনুগামীদের সেই উপদেশ দান করে থাকেন। পরমেশ্বর ভগবান *শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা* এবং অন্যান্য সমস্ত শাস্ত্রে নির্দেশ দিয়ে গেছেন কেবল তাঁকেই অনুসরণ করার জন্য। ভগবান হচ্ছেন সব কিছুর সৃষ্টিকর্তা, পালনকর্তা এবং ধ্বংসকর্তা। সমগ্র সৃষ্টি তাঁরই ইচ্ছার প্রভাবে বিরাজমান এবং এক সময় তাঁরই ইচ্ছার প্রভাবে সব কিছু ধ্বংস হয়ে যাবে। কিন্তু তখন তিনি তাঁর নিত্য ধামে তাঁর পরিকর সহ বিরাজ করবেন। সৃষ্টির পূর্বে তিনি তাঁর নিত্য ধামে ছিলেন সৃষ্টির পরেও তিনি থাকবেন। তাই তিনি কোন সৃষ্ট জীবের মতো নন। তিনি প্রপঞ্চাতীত। *ভগবদ্গীতায়* ভগবান বলেছেন যে, অর্জুনকে সেই উপদেশ দেওয়ার বহু পূর্বে তিনি সেই উপদেশ সূর্যদেবকে দান করেছিলেন, এবং কালের প্রভাবে পরম্পরা ছিন্ন হওয়ার ফলে এবং সেই জ্ঞান নষ্ট হওয়ার ফলে তিনি আবার সেই উপদেশ অর্জুনকে দিচ্ছেন, কেন না তিনি হচ্ছেন তাঁর প্রকৃত ভক্ত ও বন্ধু। তাই, ভগবানের উপদেশ কেবল ভক্তরাই হৃদয়ঙ্গম করতে পারেন এবং অন্য কেউ তা পারে না। নির্বিশেষবাদীরা, যাদের পরমেশ্বর ভগবানের সচ্চিদানন্দ রূপ

সম্বন্ধে কোন ধারণা নেই, ভগবানের গুহ্যতম উপদেশ তারা হৃদয়ঙ্গম করতে পারে না। এখানে 'গুহ্যতম' কথাটি খুব তাৎপর্যপূর্ণ, কেন না ভগবদ্ভক্তির জ্ঞান নির্বিশেষ ব্রহ্মজ্ঞানের অনেক অনেক উপরের বিষয়। 'জ্ঞান' বলতে সাধারণ জ্ঞান অথবা যে কোন ধরনের জ্ঞান বোঝায়। সেই জ্ঞান নির্বিশেষ ব্রহ্ম পর্যন্ত পৌঁছতে পারে। তার উপরে, সেই জ্ঞান যখন আংশিকভাবে ভক্তি-মিশ্রিত হয়, তখন তা পরমাত্মা উপলব্ধি বা ভগবানের সর্বব্যাপকতা উপলব্ধি পর্যন্ত প্রসারিত হয়। এই জ্ঞান গুহ্যতর। কিন্তু এই জ্ঞান যখন শুদ্ধ ভক্তিতে পর্যবসিত হয়, তখন তাকে বলা হয় গুহ্যতম জ্ঞান। এই গুহ্যতম জ্ঞান ভগবান ব্রহ্মা, অর্জুন, উদ্ধব আদি শুদ্ধ ভক্তদের দান করেছিলেন।

শ্লোক ৩১

যেনৈবাহং ভগবতো বাসুদেবস্য বেধসঃ।
মায়ানুভাবমবিদং যেন গচ্ছন্তি তৎপদম্ ॥ ৩১ ॥

যেন—যার দ্বারা; **এব**—অবশ্যই; **অহম্**—আমি; **ভগবতঃ**—পরমেশ্বর ভগবানের; **বাসুদেবস্য**—ভগবান শ্রীকৃষ্ণের; **বেধসঃ**—বিধাতার; **মায়া**—শক্তি; **অনুভাবম্**—প্রভাব; **অবিদম্**—সহজবোধ্য; **যেন**—যার দ্বারা; **গচ্ছন্তি**—যায়; **তৎ-পদম্**—পরমেশ্বর ভগবানের শ্রীপাদপদ্মে।

অনুবাদ

সেই গুহ্যতম জ্ঞানের প্রভাবে আমি সব কিছুর সৃষ্টিকর্তা, পালনকর্তা এবং ধ্বংসকর্তা পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের শক্তির প্রভাব স্পষ্টভাবে হৃদয়ঙ্গম করতে পেরেছিলাম। তা জানার ফলে সহজেই তাঁর কাছে ফিরে যাওয়া যায় এবং তাঁর সাক্ষাৎ লাভ করা যায়।

তাৎপর্য

ভগবদ্ভক্তির প্রভাবে অথবা গুহ্যতম জ্ঞানের প্রভাবে, ভগবানের বিভিন্ন শক্তি কিভাবে কাজ করছে, তা সহজেই হৃদয়ঙ্গম করা যায়। ভগবানের শক্তির একাংশের দ্বারা এই জড় জগৎ প্রকাশিত, তাঁর শক্তির অন্য (পরা) অংশের দ্বারা চিন্ময় জগৎ প্রকাশিত; এবং এই দুইয়ের মধ্যবর্তী তটস্থা শক্তি থেকে জীব প্রকাশিত হয়েছে, যারা হয় ভগবানের অন্তরঙ্গা শক্তির সেবা করছে, নয় তো ভগবানের বহিরঙ্গা শক্তির সেবা করছে। যে সমস্ত জীব জড়া প্রকৃতির সেবা করছে, তারা তাদের জীবন-ধারণের জন্য এবং মায়া প্রদত্ত অলীক সুখভোগের জন্য কঠোর সংগ্রাম করছে। কিন্তু যাঁরা পরা-প্রকৃতিতে রয়েছে, তাঁরা পরমেশ্বর ভগবানের সচ্চিদানন্দময় সেবায় যুক্ত। *ভগবদ্গীতায়* ভগবান স্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছেন যে, তিনি চান জড় জগতে নিরন্তর দুঃখ-দুর্দশা ভোগ করছে যে সমস্ত বদ্ধ জীব, তারা যেন জড় জগতের সমস্ত

কার্যকলাপ ত্যাগ করে তাঁর কাছে ফিরে যায়। সেটিই হচ্ছে সব চাইতে গুহ্যতম জ্ঞান। কিন্তু তার মর্ম কেবল শুদ্ধ ভক্তরাই উপলব্ধি করতে পারেন, এবং সেই ধরনের ভক্তরাই কেবল ভগবানের ধামে প্রবেশ করতে পারেন, প্রত্যক্ষভাবে ভগবানকে দর্শন করতে পারেন এবং তাঁর নিত্য সেবায় যুক্ত হতে পারেন। তার একটি সুন্দর দৃষ্টান্ত হচ্ছেন নারদ মুনি স্বয়ং, যিনি সেই নিত্য জ্ঞানময় এবং আনন্দময় স্তরে অধিষ্ঠিত। নারদ মুনির পদাঙ্ক যিনি অনুসরণ করেন তাঁর কাছেও সেই পথ উন্মুক্ত। শ্রুতির নির্দেশ অনুসারে, পরমেশ্বর ভগবানের অনন্ত শক্তি রয়েছে, এবং সেগুলিকে উপরোক্ত তিনটি প্রধান স্তরে বিভক্ত করা হয়।

শ্লোক ৩২

এতৎসংসূচিতং ব্রহ্মংস্তাপত্রয়চিকিৎসিতম্ ।
যদীশ্বরে ভগবতি কর্ম ব্রহ্মণি ভাবিতম্ ॥ ৩২ ॥

এতৎ—এতটুকু ; **সংসূচিতম্**—শাস্ত্রজ্ঞদের দ্বারা নিরূপিত হয়েছে ; **ব্রহ্মন্**—হে ব্রাহ্মণ (ব্যাসদেব) ; **তাপত্রয়**—ত্রিতাপ দুঃখ ; **চিকিৎসিতম্**—নিরাময়ের উপায় ; **যৎ**— যা ; **ঈশ্বরে**—সর্ব নিয়ন্তা ; **ভগবতি**—পরমেশ্বর ভগবানকে ; **কর্ম**—বিহিত কর্ম ; **ব্রহ্মণি**—পরমাত্মাকে ; **ভাবিতম্**—সমর্পিত।

অনুবাদ

হে ব্রাহ্মণ, শাস্ত্রজ্ঞরা বলে গেছেন যে ত্রিতাপ দুঃখ নিরাময়ের সর্বশ্রেষ্ঠ উপায় হচ্ছে পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের উদ্দেশ্যে সমস্ত কর্ম সমর্পণ করা।

তাৎপর্য

শ্রীনারদ মুনি ব্যক্তিগতভাবে উপলব্ধি করেছেন যে সব রকমের দুঃখ উপশম করার বা ভববন্ধন থেকে মুক্ত হওয়ার সব চাইতে ব্যবহারিক এবং সব চাইতে সরল পন্থা হচ্ছে প্রামাণিক এবং নির্ভরযোগ্য সূত্র থেকে পরমেশ্বর ভগবানের অপ্রাকৃত কার্যকলাপের বর্ণনা বিনীতভাবে শ্রবণ করা। সেটিই হচ্ছে একমাত্র ঔষধ। জড় জগতের অস্তিত্ব অত্যন্ত দুঃখময়। মূর্খ মানুষেরা তাদের ক্ষুদ্র বুদ্ধি দিয়ে আধিআত্মিক, আধিদৈবিক এবং আধিভৌতিক—এই ত্রিতাপ দুঃখ থেকে মুক্ত হওয়ার নানা রকম উপায় উদ্ভাবন করেছে। সমস্ত পৃথিবী এই ত্রিতাপ দুঃখ থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য নানাভাবে সংগ্রাম করছে, কিন্তু মানুষ জানে না যে ভগবানের অনুমোদন ছাড়া কোন পরিকল্পনা অথবা প্রচেষ্টা তাদের এই ত্রিতাপ দুঃখ থেকে মুক্ত করতে পারে না এবং তাদের বা আকাংক্ষিত শান্তি দান করতে পারে না। ওষুধ দিয়ে রোগীর রোগ নিরাময়ের চেষ্টা অর্থহীন, যদি তা ভগবানের দ্বারা অনুমোদিত না হয়। নৌকা যতই মজবুত হ

উপযুক্ত হোক না কেন, ভগবানের অনুমোদন না থাকলে তাতে চড়ে নদী বা সমুদ্র পার হওয়া যায় না। আমাদের জানতে হবে যে পরম অনুমোদন কর্তা হচ্ছেন পরমেশ্বর ভগবান, এবং তাই আমাদের সমস্ত প্রচেষ্টার চরম সাফল্যের জন্য অথবা সাফল্যের পথে সমস্ত প্রতিবন্ধকগুলি দূর করার জন্য আমাদের সমস্ত প্রচেষ্টাগুলি ভগবানের করুণার কাছে সমর্পণ করতে হবে। ভগবান সর্বব্যাপ্ত, সর্বশক্তিমান এবং সর্বজ্ঞ—সব রকমের সৎ এবং অসৎ কার্যের তিনিই হচ্ছেন পরম অনুমোদনকারী। তাই আমাদের কর্তব্য হচ্ছে ভগবানের করুণার উদ্দেশ্যে আমাদের সমস্ত কার্যকলাপ সমর্পণ করা এবং নির্বিশেষ ব্রহ্ম, পরমাত্মা অথবা পরমেশ্বর ভগবানরূপে তাঁকে মেনে নেওয়া। জাতি, ধর্ম এবং বৃত্তি নির্বিশেষে সকলেরই কর্তব্য হচ্ছে পরমেশ্বর ভগবানের সেবার উদ্দেশ্যে সব কিছু নিবেদন করা। কেউ যদি বিদগ্ধ পণ্ডিত হন, বৈজ্ঞানিক হন, দার্শনিক হন, কবি হন—তাঁদের সকলেরই কর্তব্য হচ্ছে পরমেশ্বর ভগবানের পরমেশ্বরত্ব প্রতিষ্ঠা করার জন্য তাঁদের জ্ঞানের সদ্ব্যবহার করা। তাঁদের কর্তব্য হচ্ছে জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে ভগবানের শক্তিকে বুঝবার চেষ্টা করা। তাঁকে অস্বীকার করে তাঁর মতো হওয়ার চেষ্টা করা অথবা একটু জ্ঞান অর্জন করে তাঁর সমকক্ষ হওয়ার চেষ্টা করা কখনই উচিত নয়। কেউ যদি পরিচালক হন, রাজপুরুষ হন, যোদ্ধা হন, রাজনীতিবিদ হন—তা হলে তাঁদের কর্তব্য হচ্ছে তাঁর উপযুক্ত যোগ্যতা দিয়ে ভগবানের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করা। অর্জুন যেভাবে ভগবানের জন্য যুদ্ধ করেছিলেন, সেইভাবেই ভগবানের জন্য যুদ্ধ করতে হবে। প্রথমে কিন্তু মহাবীর অর্জুন যুদ্ধ করতে চাননি, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ যখন তাঁকে বোঝালেন যে যুদ্ধ করা অত্যন্ত প্রয়োজন, তখন শ্রীঅর্জুন তাঁর মত পরিবর্তন করে ভগবানের জন্য যুদ্ধ করেছিলেন। তেমনই, ব্যবসায়ী, শিল্পপতি, কৃষক—যে যে বৃত্তিতেই নিযুক্ত থাকুক না কেন, তাঁদের কর্তব্য হচ্ছে তাঁদের কষ্টার্জিত ধন ভগবানের উদ্দেশ্যে ব্যয় করা। তাঁদের সর্বদাই মনে করা কর্তব্য যে, যে অর্থ তিনি সংগ্রহ করেছেন তা ভগবানের সম্পদ। ঐশ্বর্যকে সৌভাগ্যের অধিষ্ঠাত্রী লক্ষ্মীদেবী বলে মনে করা হয়, আর ভগবান হচ্ছেন নারায়ণ বা শ্রীমতী লক্ষ্মীদেবীর পতি। লক্ষ্মীদেবীকে নারায়ণের সেবায় যুক্ত করে সুখী হওয়ার চেষ্টাটাই সমীচীন। এইভাবেই ভগবানকে জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে উপলব্ধি করতে পারা যায়। সকলেরই জন্য সর্বশ্রেষ্ঠ কর্তব্য হচ্ছে, পরমেশ্বর ভগবানের অপ্রাকৃত লীলাবিলাসের কাহিনী শ্রবণ করে সব রকমের জড় কার্যকলাপ থেকে মুক্ত হওয়া। কিন্তু সে রকম সুযোগ না পাওয়া গেলে, যেই-যেই বস্তুর প্রতি বিশেষ আসক্তি রয়েছে সেগুলি ভগবানের সেবায় নিযুক্ত করতে চেষ্টা করা উচিত, এবং সেটিই হচ্ছে যথার্থ শান্তি এবং সমৃদ্ধি লাভের উপায়। এই শ্লোকে 'সংসূচিতম্' কথাটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। কখনই মনে করা উচিত নয় যে নারদ মুনির এই উপলব্ধি ছিল শিশুসুলভ কল্পনা মাত্র। বিদগ্ধ পণ্ডিত এবং বিশেষজ্ঞরাও তা উপলব্ধি করেছেন, এবং সেটিই হচ্ছে 'সংসূচিতম্' কথাটির যথার্থ অর্থ।

শ্লোক ৩৩

আময়ো যশ্চ ভূতানাং জায়তে যেন সুব্রত।
তদেব হ্যাময়ং দ্রব্যং ন পুনাতি চিকিৎসিতম্ ॥ ৩৩ ॥

আময়ঃ—রোগ; **যঃ চ**—যা কিছু; **ভূতানাম্**—জীবসমূহের; **জায়তে**—সম্ভব হয়; **যেন**—যা দিয়ে; **সুব্রত**—হে পুণ্যাত্মা; **তৎ**—তা; **এব**—বিশেষ; **হি**—অবশ্যই; **আময়ম্**—রোগ; **দ্রব্যম্**—দ্রব্য; **ন**—করে না; **পুনাতি**—নিরাময়; **চিকিৎসিতম্**—চিকিৎসা।

অনুবাদ

হে ভগবান-নিষ্ঠ ব্যাসদেব, যেই দ্রব্যের প্রভাবে রোগ জন্মায়, সেই দ্রব্যই যখন অন্য দ্রব্য বা ঔষধের সঙ্গে রসায়ন-যোগে মিশ্রিত হয়, তখন তা গ্রহণ করার ফলে সেই রোগের কি নিবৃত্তি হয় না?

তাৎপর্য

সুদক্ষ চিকিৎসক ঔষধ এবং পথ্যের দ্বারা তাঁর রোগীর চিকিৎসা করেন। যেমন, অত্যধিক দুগ্ধজাত দ্রব্য আহারের ফলে পেটের অসুখ হয়; কিন্তু সেই দুগ্ধেরই রূপান্তর দধি অন্য কয়েকটি ঔষধের সঙ্গে গ্রহণ করার ফলে সেই রোগের উপশম হয়। তেমনই, জাগতিক কার্যকলাপের দ্বারা ত্রিতাপ দুঃখ নিবৃত্ত হয় না। কিন্তু সেই কার্যকলাপ যখন ভগবৎ-সেবায় রূপান্তরিত হয়, তখন আগুনের সংস্পর্শে লোহা যেমন আরক্তিম হয়ে আগুনের প্রকৃতি গ্রহণ করে, তেমনই যখন কোন কিছু ভগবানের সেবায় নিবেদিত হয় তখন তা সমস্ত জড় ধর্ম পরিত্যাগ করে চিন্ময় তত্ত্বে পর্যবসিত হয়। সেটিই হচ্ছে পারমার্থিক জীবনে সাফল্যের রহস্য। জড় জগতের উপর আধিপত্য করার চেষ্টা করা উচিত নয়, আবার জড় বস্তু পরিত্যাগ করাও উচিত নয়। সর্বশ্রেষ্ঠ পন্থা হচ্ছে সব কিছুই পরমেশ্বর ভগবানের সেবায় ব্যবহার করা। সবই হচ্ছে ভগবানের সম্পত্তি, এবং তাঁর অচিন্ত্য শক্তির প্রভাবে তিনি চেতনকে জড়ে পরিণত করতে পারেন, এবং জড়কে চেতনে পরিণত করতে পারেন। সুতরাং (তথাকথিত) সমস্ত জড় বস্তু পরমেশ্বর ভগবানের চিন্ময় শক্তির প্রভাবে তৎক্ষণাৎ চেতনে রূপান্তরিত হয়। এই ধরনের পরিবর্তন সাধনের পন্থা হচ্ছে তথাকথিত জড় বস্তুকে পরমেশ্বর ভগবানের সেবায় নিয়োগ করা। সেটিই হচ্ছে আমাদের ভবরোগ নিরাময়ের উপায়, এবং তা করার ফলে আমরা চিন্ময় স্তরে উন্নীত হতে পারি, যেখানে কোন দুঃখ নেই, অনুশোচনা নেই এবং ভয় নেই। এইভাবে সব কিছুই যখন ভগবানের সেবায় যুক্ত হয় তখন আমরা অনুভব করতে পারি যে, সবই পরম ব্রহ্মময়। "সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম"—এই মন্ত্রটি আমরা এইভাবে উপলব্ধি করতে পারি।

শ্লোক ৩৪

এবং নৃণাং ক্রিয়াযোগাঃ সর্বে সংসৃতিহেতবঃ ।
ত এবাত্মবিনাশায় কল্পন্তে কল্পিতাঃ পরে ॥ ৩৪ ॥

এবম্—এইভাবে; **নৃণাম্**—মানুষদের; **ক্রিয়া-যোগাঃ**—শাস্ত্র-বিহিত কর্ম; **সর্বে**—সব কিছু; **সংসৃতি**—জড় অস্তিত্ব; **হেতবঃ**—কারণসমূহ; **তে**—তা; **এব**—অবশ্যই; **আত্ম**—কর্মরূপী বৃক্ষ; **বিনাশায়**—বিনাশের জন্য; **কল্পন্তে**—সমর্থ হয়; **কল্পিতাঃ**—সমর্পিত; **পরে**—পরমেশ্বরকে।

অনুবাদ

মানুষের নৈমিত্তিক কাম্য কর্মসমূহ সংসার-বন্ধন বা যোনি-ভ্রমণের কারণ। কিন্তু সেই সমস্ত কর্মই যখন পরমেশ্বর ভগবানের উদ্দেশ্যে সমর্পিত হয়, তখন তা কর্মরূপী বৃক্ষকে বিনাশ করতে সমর্থ হয়।

তাৎপর্য

সকাম কর্ম, যা জীবকে নিরন্তর জড় জগতের বন্ধনে আবদ্ধ করে রাখে, তাকে *ভগবদ্গীতায়* একটি অশ্বত্থ বৃক্ষের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে; কেন না তার মূল অত্যন্ত গভীর। যতক্ষণ পর্যন্ত কর্মফল ভোগ করার প্রবৃত্তি থাকে, ততক্ষণ জীবকে তার কর্ম অনুসারে এক দেহ থেকে আরেক দেহে দেহান্তরিত হতে হয়। সুখভোগের প্রবৃত্তিকে ভগবানের সেবা করার বাসনায় রূপান্তরিত করা যায়। তা করার ফলে মানুষের কর্ম কর্মযোগে পরিণত হয়, অর্থাৎ তার স্বাভাবিক প্রবণতা অনুসারে কর্ম করে সে পারমার্থিক সিদ্ধি লাভ করতে পারে। এখানে 'আত্ম' কথাটি সব রকম সকাম কর্মকে বোঝাচ্ছে। অর্থাৎ, সব রকমের সকাম কর্ম এবং অন্যান্য কর্মের ফল যখন পরমেশ্বর ভগবানের সেবায় উৎসর্গীকৃত হয়, তখন তার ফলে কর্মবন্ধনের বিনাশ হয়ে ধীরে ধীরে অপ্রাকৃত প্রেমময়ী সেবার বিকাশ হয়, যা কর্মরূপী সেই অশ্বত্থ বৃক্ষের মূলটি কেবল ছেদনই করে না, উপরন্তু তা অনুষ্ঠানকারীকে পরমেশ্বর ভগবানের শ্রীপাদপদ্মে নিয়ে যায়।

এর সারমর্ম হচ্ছে যে সর্বপ্রথমে মানুষকে সেই সব শুদ্ধ ভক্তের সঙ্গ লাভের জন্য অনুসন্ধান করতে হবে, যাঁরা কেবল বেদান্তবিদই নন উপরন্তু আত্মতত্ত্বজ্ঞ এবং পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের অনন্য ভক্ত। সেই সাধুসঙ্গে, কনিষ্ঠ ভক্তকে অবশ্যই দৈহিকভাবে এবং মানসিকভাবে প্রেমময়ী সেবা সম্পাদন করতে হয়। এই সেবা-প্রবৃত্তির প্রভাবে মহাত্মারা তাদের প্রতি আরও কৃপা-পরবশ হয়ে তাঁদের কৃপাবর্ষণ করেন, যার ফলে কনিষ্ঠ ভক্তের হৃদয়ে সেই সমস্ত শুদ্ধ ভক্তের সমস্ত দিব্য গুণাবলী প্রকাশিত হয়। তার ফলে ধীরে ধীরে তাদের পরমেশ্বর ভগবানের অপ্রাকৃত কার্যকলাপ শ্রবণে গভীর আসক্তি জন্মায়, এবং তখন মানুষ তার স্থূল এবং সূক্ষ্ম

দেহের স্বরূপ উপলব্ধি করতে পেরে তারও ঊর্ধ্বে তার শুদ্ধ আত্মার স্বরূপ হৃদয়ঙ্গম করতে পারে এবং পরমেশ্বর ভগবানের সঙ্গে তার নিত্য সম্পর্কের কথা অবগত হতে পারে। এই সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হলে শুদ্ধ-ভক্তির ক্রমবিকাশ হয় এবং অবশেষে নির্বিশেষ ব্রহ্ম এবং পরমাত্মার স্তর অতিক্রম করে পরমেশ্বর ভগবানের সম্বন্ধে বিশুদ্ধ জ্ঞান প্রকাশিত হয়। *ভগবদ্গীতায়* বর্ণিত এই সমস্ত পুরুষোত্তম-যোগে অনুশীলনের প্রভাবে যে কোনও অবস্থায় অধিষ্ঠিত মানুষ পরম সিদ্ধি লাভ করতে পারে এবং তখন তাদের মধ্যে পরমেশ্বর ভগবানের সব রকম দিব্যগুণাবলী প্রকাশিত হয়। এমনই হচ্ছে শুদ্ধ ভক্ত-সঙ্গের চিন্ময় প্রভাব।

শ্লোক ৩৫

যদত্র ক্রিয়তে কর্ম ভগবৎপরিতোষণম্।
জ্ঞানং যত্তদধীনং হি ভক্তিযোগসমন্বিতম্ ॥ ৩৫ ॥

যৎ—যা কিছু; **অত্র**—এই জীবনে বা জগতে; **ক্রিয়তে**—অনুষ্ঠান করা হয়; **কর্ম**—কর্ম; **ভগবৎ**—পরমেশ্বর ভগবানকে; **পরিতোষণম্**—সন্তুষ্টির জন্য; **জ্ঞানম্**—জ্ঞান; **যৎ-তৎ**—যা কিছু; **অধীনম্**—অধীন; **হি**—অবশ্যই; **ভক্তি-যোগ**—ভক্তিযোগ; **সমন্বিতম্**—সমন্বিত হয়।

অনুবাদ

এই জীবনে পরমেশ্বর ভগবানের সন্তুষ্টি বিধানের জন্য যে কর্ম করা হয়, তাকে বলা হয় ভক্তিযোগ বা পরমেশ্বর ভগবানের প্রতি প্রেমময়ী সেবা, এবং সব রকমের জ্ঞান তখন তার অধীন তত্ত্বরূপে আপনা থেকেই প্রকাশিত হয়।

তাৎপর্য

সাধারণত মানুষ মনে করে যে, শাস্ত্রের নির্দেশ অনুসারে সকাম কর্ম করার ফলে পরম-তত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করার পারমার্থিক জ্ঞান পূর্ণরূপে লাভ করা যায়। কেউ কেউ মনে করে যে, ভক্তিযোগ হচ্ছে আরেক ধরনের কর্ম। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ভক্তিযোগ কর্ম এবং জ্ঞানের অতীত। ভক্তিযোগ জ্ঞান অথবা কর্ম থেকে স্বতন্ত্র; পক্ষান্তরে, জ্ঞান এবং কর্ম হচ্ছে ভক্তিযোগের অধীন। এই ক্রিয়াযোগ অথবা কর্মযোগ, যে সম্বন্ধে শ্রীনারদ মুনি ব্যাসদেবকে নির্দেশ দিচ্ছেন তা বিশেষভাবে অনুমোদন করা হয়েছে, কেন না তার উদ্দেশ্য হচ্ছে পরমেশ্বর ভগবানের সন্তুষ্টি বিধান করা। ভগবান চান না যে তাঁর সন্তানেরা অর্থাৎ জীবেরা জড় জগতের ত্রিতাপ দুঃখ ভোগ করুক, তিনি চান যে তারা সকলেই যেন তাঁর কাছে ফিরে গিয়ে তাঁর সঙ্গে বাস করে। কিন্তু ভগবানের কাছে ফিরে যেতে হলে সব রকম জড় কলুষ থেকে মুক্ত হতে হয়। তাই ভগবানের সন্তুষ্টি বিধানের জন্য যখন কর্ম করা হয় তখন সেই কর্মের প্রভাবে জীব ধীরে ধীরে

জড় জগতের বন্ধন থেকে মুক্ত হয়। এইভাবে পবিত্র হওয়ার অর্থ হচ্ছে পারমার্থিক জ্ঞান লাভ করা। তাই জ্ঞান পরমেশ্বর ভগবানের উদ্দেশ্যে সাধিত কর্মের অধীন। অন্যান্য জ্ঞান ভগবদ্ভক্তিবিহীন হওয়ার ফলে ভগবানের রাজ্যে নিয়ে যেতে পারে না, অর্থাৎ তা মুক্তি পর্যন্ত দান করতে পারে না, যা ইতিমধ্যে "*নৈষ্কর্ম্যমপ্যচ্যুত-ভাববর্জিতম্*" শ্লোকে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। অর্থাৎ, ভক্ত যখন অনন্য ভক্তি সহকারে ভগবানের সেবায় যুক্ত হন, বিশেষ করে ভগবানের অপ্রাকৃত মহিমা শ্রবণ এবং কীর্তনে, তখন ভগবৎ-কৃপার প্রভাবে তিনি দিব্য জ্ঞান লাভ করেন, যা *ভগবদ্গীতায়* প্রতিপন্ন হয়েছে।

শ্লোক ৩৬

কুর্বাণা যত্র কর্মাণি ভগবচ্ছিক্ষয়াসকৃৎ।
গৃণন্তি গুণনামানি কৃষ্ণস্যানুস্মরন্তি চ ॥ ৩৬ ॥

কুর্বাণাঃ—সম্পাদন করার সময়ে; **যত্র**—যখন; **কর্মাণি**—কর্ম; **ভগবৎ**— পরমেশ্বর ভগবান; **শিক্ষয়া**—উপদেশের দ্বারা; **অসকৃৎ**—বারংবার; **গৃণন্তি**— কীর্তন করা; **গুণ**—গুণাবলী; **নামানি**—নামসমূহ; **কৃষ্ণস্য**—শ্রীকৃষ্ণের; **অনুস্মরন্তি**— নিরন্তর স্মরণ করেন; **চ**—এবং।

অনুবাদ

ভক্ত যখন পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের উপদেশ অনুসারে কর্ম করেন, তখন তিনি পুনঃ পুনঃ শ্রীকৃষ্ণের গুণ ও নামসমূহ কীর্তন করেন এবং স্মরণ করেন।

তাৎপর্য

ভগবানের সুদক্ষ ভক্ত তাঁর জীবন এমনভাবে গড়ে তুলতে পারেন যে ইহ জীবনের জন্য অথবা পর জীবনের জন্য তাঁর সমস্ত কর্তব্য সম্পাদন করার সময়ও তিনি নিরন্তর ভগবানের নাম, গুণ, লীলা ইত্যাদি নিরন্তর স্মরণ করতে পারেন। ভগবান *ভগবদ্গীতায়* স্পষ্টভাবে তার নির্দেশ দিয়ে গেছেন ঃ জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে মানুষের কর্তব্য হচ্ছে কেবল ভগবানের জন্যই কর্ম করা এবং ভগবানকেই সব কিছুর মালিকরূপে অধিষ্ঠিত করা। বৈদিক অনুশাসন অনুসারে, ইন্দ্র, ব্রহ্মা, সরস্বতী, দুর্গা, গণেশ ইত্যাদি দেবদেবীর পূজার সময়ও পরম পূজ্য যজ্ঞেশ্বর বিষ্ণুর বিগ্রহ 'শালগ্রাম-শিলা'র পূজা হয়। শাস্ত্রে বিশেষ বিশেষ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য বিভিন্ন দেবদেবীর পূজা করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, কিন্তু তা হলেও সেই পূজা যথাযথভাবে সম্পাদন করার জন্য শ্রীবিষ্ণুর উপস্থিতি সর্বতোভাবে আবশ্যক।

এই ধরনের বৈদিক কার্যকলাপ ছাড়াও, সাধারণ কার্যকলাপেও (যেমন আমাদের গৃহস্থালির কার্যে অথবা ব্যবসায় অথবা পেশায়) আমাদের সমস্ত কর্মের ফল পরম

ভোক্তা, পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে অর্পণ করার কথা বিবেচনা করা উচিত। *ভগবদ্গীতায়* শ্রীকৃষ্ণ ঘোষণা করেছেন যে, তিনিই হচ্ছেন সব কিছুর পরম ভোক্তা, তিনিই হচ্ছেন সর্বলোক মহেশ্বর এবং তিনিই হচ্ছেন সমস্ত জীবের পরম সুহৃদ। শ্রীকৃষ্ণ ছাড়া অন্য কেউই এই জগতের সব কিছুর ঈশ্বর বা মালিক বলে দাবি করতে পারে না। ভগবানের শুদ্ধ ভক্ত নিরন্তর সে কথা স্মরণ করেন, এবং তা করার সময় তিনি ভগবানের দিব্য নাম, মহিমা, এবং গুণাবলী বারংবার উচ্চারণ করেন। তার ফলে তিনি সর্বদাই পরমেশ্বর ভগবানের সঙ্গে যুক্ত থাকেন। ভগবানের নাম, গুণ ইত্যাদি তাঁর থেকে অভিন্ন এবং তাই তাঁর নাম ইত্যাদির সঙ্গে নিরন্তর যুক্ত থাকার অর্থ হচ্ছে ভগবানেরই সঙ্গে যুক্ত থাকা।

আমরা যে অর্থ উপার্জন করি তার অধিকাংশ, অন্ততপক্ষে অর্ধাংশ পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের শিক্ষা এবং বাণী প্রচারের উদ্দেশ্যে ব্যয় করা উচিত। সেই উদ্দেশ্যে আমাদের উপার্জিত অর্থ দান করাই যথেষ্ট নয়, ভগবদ্ভক্তির বাণী প্রচারের আয়োজন করাও আমাদের কর্তব্য ; কেন না সেটি ভগবানের একটি আদেশ। ভগবান স্পষ্টভাবে বলেছেন যে, সমস্ত পৃথিবী জুড়ে যাঁরা তাঁর মহিমা প্রচারের কাজে নিরন্তর যুক্ত, তাঁরা হচ্ছেন তাঁর সব চাইতে প্রিয়, তাঁদের থেকে প্রিয় আর কেউ নেই। ভগবানের সেই নির্দেশ পালন করার জন্য জড় জগতের বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারগুলিও নিয়োগ করা যেতে পারে। তিনি চান যে *ভগবদ্গীতার* বাণী যেন তাঁর ভক্তদের কাছে প্রচারিত হয়। জ্ঞান, দান, তপশ্চর্যা ইত্যাদির দ্বারা যাদের হৃদয় নির্মল হয়নি, তারা সাধারণত ভগবানের বাণী গ্রহণ করতে পারে না। তাই অনিচ্ছুক মানুষকেও ভগবদ্ভক্তে পরিণত করার চেষ্টা করতে হবে। সে বিষয়ে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু এক অতি সরল পন্থার শিক্ষা দিয়ে গেছেন। তিনি ভগবানের সেই অপ্রাকৃত বাণী কীর্তন, নর্তন এবং প্রসাদ-সেবনের মাধ্যমে প্রচার করার শিক্ষা দিয়ে গেছেন ; এইভাবে আমাদের উপার্জনের অর্ধাংশ এই উদ্দেশ্যে ব্যয় করা যেতে পারে। কলহ এবং বিভেদের যুগ এই কলিযুগে, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর শিক্ষা অনুসারে সমাজের নেতৃস্থানীয় এবং বিত্তশালী ব্যক্তিরা যদি তাঁদের উপার্জনের অর্ধাংশ ভগবানের সেবায় ব্যয় করেন, তা হলে নিঃসন্দেহে পৃথিবীর এই নারকীয় পরিবেশকে ভগবদ্ধামের অপ্রাকৃত পরিবেশে রূপান্তরিত করা যায়। যে অনুষ্ঠানে সুন্দর নাচ-গান হয় এবং সুস্বাদু খাবার দেওয়া হয়, সেই অনুষ্ঠানে যোগদান করতে কেউই অসম্মত হবে না। এই ধরনের অনুষ্ঠানে সকলেই যোগ দেবে এবং সেখানে সকলেই ব্যক্তিগতভাবে পরমেশ্বর ভগবানের দিব্য উপস্থিতি অনুভব করতে পারবে। এইভাবে সেই অনুষ্ঠানে যোগদানকারীরা পরমেশ্বর ভগবানের সঙ্গ লাভ করবে এবং তার ফলে পবিত্র হয়ে পারমার্থিক তত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করতে পারবে। এই ধরনের পারমার্থিক কার্যকলাপ সফলতার সঙ্গে সম্পাদন করার একটি শর্ত রয়েছে, এবং সেটি হচ্ছে, তা যেন সব রকমের জড় কামনা-বাসনা থেকে সর্বতোভাবে মুক্ত ভগবানের শুদ্ধ ভক্তের তত্ত্বাবধানে সম্পাদিত হয়। ভগবানের শুদ্ধ

ভক্ত কেবল জড় কামনা-বাসনা থেকেই মুক্ত নন, তিনি সকাম কর্ম এবং ভগবানের প্রকৃতি সম্বন্ধে মনোধর্মপ্রসূত শুষ্ক জ্ঞানের প্রভাব থেকেও মুক্ত। ভগবানের প্রকৃতি সম্বন্ধে জল্পনা কল্পনা করার কোনও প্রয়োজন নেই। সমস্ত বৈদিক শাস্ত্রে এবং বিশেষ করে *ভগবদ্গীতায়* ভগবান নিজে তাঁর তত্ত্ব প্রকাশ করে গেছেন। আমাদের কেবল তা যথাযথভাবে গ্রহণ করতে হবে এবং ভগবানের নির্দেশ পালন করতে হবে। তা হলেই তা আমাদের পূর্ণতা প্রাপ্তির পথে পরিচালিত করবে। যে যেখানে রয়েছে সেখানেই থাকতে পারে। কারোরই তার নিজ নিজ অবস্থা বা বৃত্তি পরিবর্তন করার প্রয়োজন নেই, বিশেষ করে এই কলিযুগে। তবে পরম-তত্ত্ব সম্বন্ধে মনোধর্মপ্রসূত জল্পনা-কল্পনা, যার উদ্দেশ্য হচ্ছে ভগবানের সঙ্গে এক হয়ে যাওয়ার প্রচেষ্টা, সেই অভ্যাসটি বর্জন করতে হবে। এই ধরনের গর্বোদ্ধত প্রচেষ্টা বর্জন করার পর শ্রদ্ধাবনত চিত্তে *ভগবদ্গীতা* অথবা *শ্রীমদ্ভাগবতের* বাণী পূর্ববর্ণিত গুণাবলী সমন্বিত ভগবানের শুদ্ধ ভক্তের শ্রীমুখ থেকে শ্রবণ করতে হবে। তা হলে নিঃসন্দেহে সব কিছু সাফল্যমণ্ডিত হবে।

শ্লোক ৩৭

ওঁ নমো ভগবতে তুভ্যং বাসুদেবায় ধীমহি।
প্রদ্যুম্নায়ানিরুদ্ধায় নমঃ সঙ্কর্ষণায় চ ॥ ৩৭ ॥

ওঁ—ভগবানের অপ্রাকৃত মহিমা-সমন্বিত প্রণব মন্ত্র; **নমঃ**—ভগবানকে প্রণতি নিবেদন; **ভগবতে**—পরমেশ্বর ভগবানকে; **তুভ্যম্**—আপনাকে; **বাসুদেবায়**—বসুদেবনন্দন ভগবান বাসুদেবকে; **ধীমহি**—কীর্তন করি; **প্রদ্যুম্নায়, অনিরুদ্ধায়, সঙ্কর্ষণায়**—ভগবান বাসুদেবের সমস্ত অংশ-প্রকাশ-কে; **নমঃ**—সশ্রদ্ধ প্রণাম; **চ**—এবং।

অনুবাদ

প্রণবস্বরূপ হে শ্রীকৃষ্ণ, আপনি বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধ এই চতুর্ব্যূহাত্মক; আপনাকে মনের দ্বারা নমস্কার ও ধ্যান করি।

তাৎপর্য

'পঞ্চরাত্র' অনুসারে নারায়ণ হচ্ছেন ভগবানের সমস্ত প্রকাশের আদি কারণ। এই সমস্ত প্রকাশ হচ্ছেন বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন এবং অনিরুদ্ধ। বাসুদেব এবং সঙ্কর্ষণ মাঝখানের বাঁ দিকে এবং ডান দিকে, প্রদ্যুম্ন সঙ্কর্ষণের ডান দিকে এবং অনিরুদ্ধ বাসুদেবের বাঁ দিকে—এইভাবে চারটি বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত। এঁদের বলা হয় শ্রীকৃষ্ণের চতুর্ব্যূহ।

এটি হচ্ছে একটি বৈদিক মন্ত্র, যা শুরু হয়েছে ওঁ-কার প্রণব দিয়ে এবং 'ওঁ নমো ধীমহি' ইত্যাদি বীজ মন্ত্র সমন্বিত চতুর্ব্যূহের এই মন্ত্রকে বৈদিক মন্ত্র বলেই স্বীকার করা হয়েছে।

যে কোন কর্ম, তা সকাম কর্মের স্তরেই অধিষ্ঠিত হোক অথবা মনোধর্মপ্রসূত দর্শনের স্তরেই হোক, তা যদি পরমেশ্বর ভগবানের অপ্রাকৃত তত্ত্বউপলব্ধির উদ্দেশ্যে সাধিত না হয়, তা হলে সম্পূর্ণ অর্থহীন বলেই বিবেচনা করা হয়। তাই নারদ মুনি ভগবদ্ভক্তির ক্রমবিকাশের ফলে ভগবানের সঙ্গে জীবের আন্তরিক সম্পর্ক যে কিভাবে গভীর থেকে গভীরতর হয় তা তাঁর ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার মাধ্যমে বর্ণনা করে অনন্য ভক্তির স্বরূপ বিশ্লেষণ করেছেন। ভগবানের প্রতি এই অপ্রাকৃত ভক্তির পরম প্রাপ্তি হচ্ছে ভগবানের প্রতি প্রেমময়ী সেবা। এই প্রেম বিভিন্ন অপ্রাকৃত রসের মাধ্যমে প্রকাশিত হয়। এই ভগবৎ-সেবা মিশ্রভাবেও সম্পাদিত হয়, সকাম কর্মমিশ্রা ভক্তি অথবা মনোধর্ম প্রসূত জ্ঞানমিশ্রা ভক্তি।

শৌনক আদি ঋষিরা সদ্‌গুরুর সেবায় সূত গোস্বামীর সাফল্যের গূঢ়তত্ত্ব সম্বন্ধে যে প্রশ্ন করেছিলেন তা এখানে বিশ্লেষণ করা হয়েছে—তেত্রিশ অক্ষর সমন্বিত এই মন্ত্র উচ্চারণের ফলে তাঁর হৃদয়ে দিব্য জ্ঞান প্রকাশিত হয়েছিল। এটি চতুর্ব্যূহের মন্ত্র। কেন্দ্রে রয়েছেন শ্রীকৃষ্ণ। কেন না চতুর্ব্যূহ হচ্ছেন তাঁরই প্রকাশ। তাঁর নির্দেশের সব চাইতে গোপনীয় অর্থ হচ্ছে—সর্বদাই বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন এবং অনিরুদ্ধরূপে প্রকাশিত ভগবানের অংশপ্রকাশ সহ পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের মহিমা কীর্তন ও স্মরণ করা উচিত। এই চতুর্ব্যূহ হচ্ছেন বিষ্ণুতত্ত্ব অথবা শক্তিতত্ত্বরূপ অন্য সমস্ত সত্যের আদি উৎস।

শ্লোক ৩৮

ইতি মূর্ত্যভিধানেন মন্ত্রমূর্তিমমূর্তিকম্।
যজতে যজ্ঞপুরুষং স সম্যগ্দর্শনঃ পুমান্ ॥ ৩৮ ॥

ইতি—এইভাবে; **মূর্তি**—প্রতিরূপ; **অভিধানেন**—শব্দের দ্বারা; **মন্ত্রমূর্তিম্**—মন্ত্রমূর্তি; **অমূর্তিকম্**—পরমেশ্বর ভগবান, যাঁর কোন জড় রূপ নেই; **যজতে**—আরাধনা করা; **যজ্ঞপুরুষম্**—পরমেশ্বর ভগবান শ্রীবিষ্ণু; **সঃ**—তিনিই কেবল; **সম্যক্ দর্শনঃ**—সম্পূর্ণরূপে জ্ঞানবান; **পুমান্**—পুরুষ।

অনুবাদ

এইভাবে যিনি বাসুদেব আদি চার মূর্তির নামাত্মক মন্ত্রের দ্বারা মন্ত্রোক্ত চিন্ময়রূপী অথবা প্রাকৃত মূর্তিরহিত যজ্ঞেশ্বরকে পূজা করেন, তিনিই হচ্ছেন প্রকৃত জ্ঞানবান।

তাৎপর্য

আমাদের বর্তমান ইন্দ্রিয়গুলি জড় উপাদান দ্বারা গঠিত, এবং তাই পরমেশ্বর ভগবান শ্রীবিষ্ণুর অপ্রাকৃত রূপ দর্শনে তা অসমর্থ। তাই তিনি মন্ত্রের দ্বারা মন্ত্রমূর্তিতে পূজিত হন। যা কিছুই আমাদের ভ্রান্ত ইন্দ্রিয়ের অভিজ্ঞতার অতীত তা কেবল শব্দের মাধ্যমে জানা যেতে পারে। আমরা আমাদের অভিজ্ঞতায় দেখেছি যে বহু দূর থেকেও কিভাবে শব্দের মাধ্যমে বস্তু বা ঘটনা সম্বন্ধে জানা যায়। জড়ের মাধ্যমে যদি তা সম্ভব হয়, তা হলে চিন্ময় স্তরে তা সম্ভব হবে না কেন? এটি কোন অস্পষ্ট নির্বিশেষ অভিজ্ঞতা নয়। এটি প্রকৃতপক্ষে চিন্ময় পরমেশ্বর ভগবানের বাস্তব অভিজ্ঞতা যাঁর রূপ বিশুদ্ধ সৎ, চিৎ এবং আনন্দময়।

সংস্কৃত অভিধান অমরকোষে 'মূর্তি' শব্দটির দুটি অর্থ দেওয়া হয়েছে, প্রতিরূপ এবং বিঘ্ন। আচার্য শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর তাঁর ভাষ্যে 'অমূর্তিকম্' শব্দটি 'নির্বিঘ্নে' বলে বিশ্লেষণ করেছেন। আমাদের চিন্ময় স্বরূপে চিন্ময় ইন্দ্রিয়ের দ্বারাই ভগবানের সচ্চিদানন্দময় অপ্রাকৃত রূপ দর্শন করা যায়; অপ্রাকৃত শব্দতরঙ্গ উচ্চারণ করার ফলে আমাদের চিন্ময় স্বরূপের পুনঃপ্রকাশ হয়। এই মন্ত্র ভগবানের আদর্শ প্রতিনিধি সদ্‌গুরুর কাছ থেকে গ্রহণ করতে হয় এবং তাঁর তত্ত্বাবধানে মন্ত্র জপ করার অনুশীলন করতে হয়। তার ফলে আমরা ধীরে ধীরে ভগবানের নিকটবর্তী হতে পারি। পাঞ্চরাত্রিক প্রথায় অর্চনের পন্থা নির্দেশিত হয়েছে, যা হচ্ছে প্রামাণিক এবং স্বীকৃত। পাঞ্চরাত্রিক প্রথাই হচ্ছে অপ্রাকৃত ভগবৎ-সেবার সব চাইতে প্রামাণিক প্রক্রিয়া। এই প্রক্রিয়ার সাহায্য ব্যতীত কেউই ভগবানের নিকটবর্তী হতে পারে না, আর শুষ্ক জ্ঞানের জল্পনা-কল্পনার মাধ্যমে তো নয়ই। পাঞ্চরাত্রিক প্রথা এই কলিযুগের জন্য যথার্থই উপযুক্ত। কলিযুগের জন্য বেদান্ত থেকেও পাঞ্চরাত্রিক প্রক্রিয়া অধিক গুরুত্বপূর্ণ।

শ্লোক ৩৯

ইমং স্বনিগমং ব্রহ্মন্নবেত্য মদনুষ্ঠিতম্।
অদান্মে জ্ঞানমৈশ্বর্যং স্বস্মিন্ ভাবং চ কেশবঃ ॥ ৩৯ ॥

ইমম্—এইভাবে; **স্বনিগমম্**—বেদে পরমেশ্বর ভগবান সম্বন্ধীয় গুহ্য জ্ঞান; **ব্রহ্মন্**—হে ব্রাহ্মণ (ব্যাসদেব); **অবেত্য**—ভালভাবে জেনে; **মৎ**—আমার দ্বারা; **অনুষ্ঠিতম্**—অনুষ্ঠিত হয়েছে; **অদাৎ**—দেওয়া হয়েছে; **মে**—আমাকে; **জ্ঞানম্**—দিব্য জ্ঞান; **ঐশ্বর্যম্**—ঐশ্বর্য; **স্বস্মিন্**—ব্যক্তিগত; **ভাবম্**—অন্তরঙ্গ স্নেহ এবং প্রীতি; **চ**—এবং; **কেশবঃ**—শ্রীকৃষ্ণ।

অনুবাদ

হে ব্রাহ্মণ, পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ আমাকে বেদগুহ্য জ্ঞান দান করেন, এবং

তারপর অণিমা আদি দিব্য ঐশ্বর্য দান করেন এবং সেগুলির প্রতি আমার অনাসক্তি দর্শন করে তিনি আমাকে প্রেম প্রদান করেছিলেন।

তাৎপর্য

অপ্রাকৃত শব্দতরঙ্গে ভগবানের যে প্রকাশ তা স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ থেকে অভিন্ন। এটিই হচ্ছে পরমেশ্বর ভগবানের সান্নিধ্যে আসার সর্বোত্তম পন্থা। দশটি নাম-অপরাধ বর্জন করে, ভগবানের সঙ্গে এইভাবে বিশুদ্ধ সংযোগ স্থাপনের ফলে ভক্ত জড় জগতের স্তর অতিক্রম করে শুদ্ধ সত্ত্বে অধিষ্ঠিত হতে পারেন এবং বৈদিক শাস্ত্রের অন্তর্নিহিত অর্থ হৃদয়ঙ্গম করতে পারেন—অপ্রাকৃত জগতে ভগবানের অস্তিত্ব সম্বন্ধে সম্পূর্ণরূপে অবহিত হতে পারেন। যাঁরা ভগবান এবং শ্রীগুরুদেবের প্রতি ঐকান্তিক-শ্রদ্ধাসম্পন্ন, ভগবান তাঁদের কাছে ধীরে ধীরে তাঁর স্বরূপ প্রকাশ করেন। তারপর, ভক্ত আটটি যৌগিক সিদ্ধিলাভ করেন, এবং চরমে, ভক্ত ভগবানের স্বপার্ষদত্ব লাভ করেন এবং গুরুদেবের মাধ্যমে ভগবানের বিশেষ সেবা লাভ করেন। শুদ্ধ ভক্ত যোগসিদ্ধি প্রদর্শন করার চাইতে ভগবানের সেবা করার প্রতি অধিক আগ্রহী। শ্রীনারদ মুনি তাঁর ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে এই সমস্ত তথ্য বিশ্লেষণ করেছেন এবং নারদ মুনি যা লাভ করেছিলেন, তা ভগবানের শব্দরূপ প্রকাশের শুদ্ধ উচ্চারণের মাধ্যমে লাভ করা যেতে পারে। এই অপ্রাকৃত শব্দতরঙ্গ গ্রহণে কোন বাধ্যবাধকতা নেই, যদি তা গুরু-পরম্পরার ধারায় নারদ মুনির মতো প্রতিনিধির কাছ থেকে প্রাপ্ত হওয়া যায়।

শ্লোক ৪০

ত্বমপ্যদভ্রশ্রুত বিশ্রুতং বিভোঃ
সমাপ্যতে যেন বিদাং বুভুৎসিতম্।
প্রাখ্যাহি দুঃখৈর্মুহুরর্দিতাত্মনাং
সংক্লেশনির্বাণমুশন্তি নান্যথা ॥ ৪০ ॥

ত্বম্—তুমি; **অপি**—ও; **অদভ্র**—বিশাল; **শ্রুত**—বৈদিক শাস্ত্র; **বিশ্রুতম্**—শ্রবণ করা হয়েছে; **বিভোঃ**—সর্বশক্তিমানের; **সমাপ্যতে**—তুষ্ট; **যেন**—যার দ্বারা; **বিদাম্**—বিদ্বানের; **বুভুৎসিতম্**—যিনি সর্বদাই অপ্রাকৃত জ্ঞান লাভের আকাঙ্ক্ষী; **প্রাখ্যাহি**—বর্ণনা করা; **দুঃখৈঃ**—দুঃখের দ্বারা; **মুহুঃ**—সর্বদা; **অর্দিত-আত্মনাম্**—দুঃখ-দুর্দশাগ্রস্ত মানুষেরা; **সংক্লেশ**—দুঃখ-দুর্দশা; **নির্বাণম্**—নিবৃত্তি; **উশন্তি ন**—বের হয় না; **অন্যথা**—অন্য কোন উপায়ে।

অনুবাদ

তাই দয়া করে তুমি সর্বশক্তিমান ভগবানের কার্যকলাপের কাহিনী বর্ণনা কর, যা তুমি তোমার বিশাল বৈদিক জ্ঞান থেকে জানতে পেরেছ। কেন না, তা জানলে

মহান বিদ্বানদের সব কিছু জানা হয় এবং সেই সঙ্গে সাধারণ মানুষেরা যারা নিরন্তর জড়জাগতিক দুঃখ ভোগ করছে, তাদের দুঃখ-দুর্দশার সমাপ্তি হয়। এ ছাড়া দুঃখ-নিবৃত্তির আর কোন উপায় নেই।

তাৎপর্য

শ্রীনারদ মুনি তাঁর ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে স্পষ্টভাবেই বর্ণনা করেছেন যে জড় জগতের সমস্ত সমস্যার একমাত্র সমাধান হচ্ছে ব্যাপকভাবে পরমেশ্বর ভগবানের মহিমা প্রচার করা। চার রকমের ভাল মানুষেরা পরমেশ্বর ভগবানের অস্তিত্ব স্বীকার করে এবং এই ধরনের ভাল মানুষেরা—১) যখন আর্ত হয়, ২) যখন অর্থার্থী হয়, ৩) যখন তত্ত্বজ্ঞানের জিজ্ঞাসু হয় এবং ৪) যখন তারা বেশি করে ভগবানের কথা জানতে চায়, তখন তারা স্বাভাবিকভাবেই পরমেশ্বর ভগবানের শরণাগত হয়। নারদ মুনি ব্যাসদেবকে উপদেশ দিলেন বিশাল বৈদিক জ্ঞানের পরিপ্রেক্ষিতে অপ্রাকৃত ভগবত্তত্ত্বজ্ঞান প্রচার করতে, যা তিনি ইতিমধ্যেই লাভ করেছেন। চার রকমের খারাপ মানুষ রয়েছে ঃ ১) যারা সকাম কর্মের প্রতি অত্যন্ত আসক্ত এবং তার ফলে তারা দুঃখ ভোগ করে, এদের বলা হয় মূঢ়, ২) যারা তাদের ইন্দ্রিয়-তৃপ্তির জন্য নানা রকম জঘন্য কর্মের প্রতি আসক্ত এবং তার ফলে তারা তার ফল ভোগ করে, এদের বলা হয় নরাধম, ৩) যারা জড় বিদ্যায় মস্ত বড় পণ্ডিত, কিন্তু তারা নিরন্তর নানা রকম দুঃখ-কষ্ট ভোগ করে, কেন না তারা পরমেশ্বর ভগবানের অস্তিত্ব স্বীকার করতে চায় না, এদের বলা হয় মায়া-অপহৃত-জ্ঞান এবং ৪) যারা হচ্ছে নাস্তিক এবং তাই তারা নিরন্তর নানা রকম দুঃখ-দুর্দশা ভোগ করলেও ভগবানের নাম পর্যন্ত শুনতে চায় না, এই ধরনের ভগবদ্বিদ্বেষীদের বলা হয় আসুরী।

শ্রীনারদ মুনি ব্যাসদেবকে ভগবানের মহিমা প্রচার করতে উপদেশ দিলেন, যাতে ভাল এবং খারাপ এই উভয় স্তরের আট রকমের মানুষের মঙ্গল সাধিত হয়। *শ্রীমদ্ভাগবত* তাই কোন বিশেষ ধরনের মানুষ বা বিশেষ জাতির জন্য নয়। তা হচ্ছে ঐকান্তিক জীবদের জন্য, যাঁরা তাঁদের যথার্থ মঙ্গল সাধন করে প্রকৃত শান্তি লাভ করতে চান।

ইতি—"ব্যাসদেবকে শ্রীমদ্ভাগবত সম্বন্ধে দেবর্ষি নারদের নির্দেশ" নামক শ্রীমদ্ভাগবতের প্রথম স্কন্ধের পঞ্চম অধ্যায়ের ভক্তিবেদান্ত তাৎপর্য।

ষষ্ঠ অধ্যায়

নারদ মুনি এবং ব্যাসদেবের কথোপকথন

শ্লোক ১

সূত উবাচ

এবং নিশম্য ভগবান্ দেবর্ষের্জন্ম কর্ম চ।
ভূয়ঃ পপ্রচ্ছ তং ব্রহ্মন্ ব্যাসঃ সত্যবতীসুতঃ ॥ ১ ॥

সূতঃ উবাচ—সূত গোস্বামী বললেন; **এবম্**—এইভাবে; **নিশম্য**—শুনে; **ভগবান্**—ভগবানের শক্ত্যাবেশ অবতার; **দেবর্ষেঃ**—দেবর্ষির; **জন্ম**—জন্ম; **কর্ম**—কর্ম; **চ**—এবং; **ভূয়ঃ**—পুনরায়; **পপ্রচ্ছ**—জিজ্ঞাসা করলেন; **তম্**—তাঁকে; **ব্রহ্মন্**—হে ব্রহ্মজ্ঞগণ; **ব্যাসঃ**—ব্যাসদেব; **সত্যবতী-সুতঃ**—সত্যবতীর পুত্র।

অনুবাদ

সূত গোস্বামী বললেনঃ হে ব্রহ্মজ্ঞগণ, এইভাবে দেবর্ষি নারদের জন্ম এবং কর্ম-বৃত্তান্ত শ্রদ্ধা সহকারে শ্রবণ করে সত্যবতী-তনয় ভগবানের শক্ত্যাবেশ অবতার শ্রীব্যাসদেব শ্রীনারদকে পুনরায় জিজ্ঞাসা করলেন।

তাৎপর্য

ব্যাসদেব নারদ মুনির পূর্ণতা সম্বন্ধে আরও জানতে উৎসুক হয়েছিলেন, এবং তাই তিনি আরও প্রশ্ন করেছিলেন। এই অধ্যায়ে শ্রীনারদ মুনি বর্ণনা করবেন, যখন তিনি ভগবানের বিরহে অত্যন্ত বেদনাদায়ক অবস্থায় অপ্রাকৃত চিন্তায় মগ্ন ছিলেন, তখন তিনি কিভাবে ক্ষণকালের জন্য তাঁর বাণী শুনতে পেয়েছিলেন।

শ্লোক ২

শ্রীব্যাস উবাচ

ভিক্ষুভির্বিপ্রবসিতে বিজ্ঞানাদেষ্টৃভিস্তব।
বর্তমানো বয়স্যাদ্যে ততঃ কিমকরোদ্ভবান্ ॥২ ॥

শ্রীব্যাস উবাচ—শ্রীব্যাসদেব বললেন; **ভিক্ষুভিঃ**—মহান পরিব্রাজকদের দ্বারা; **বিপ্রবসিতে**—দূর দেশে গমন করলে; **বিজ্ঞান**—উপলব্ধ পারমার্থিক জ্ঞান;

আদেষ্টৃভিঃ—যাঁরা উপদেশ দিয়েছিলেন; **তব**—আপনার; **বর্তমানঃ**—বর্তমান; **বয়সি**—বাল্যকালে; **আদ্যে**—আদিতে; **ততঃ**—তারপর; **কিম্**—কি; **অকরোৎ**—করেছিলেন; **ভবান্**—আপনি।

অনুবাদ

শ্রীব্যাসদেব বললেন: হে দেবর্ষি, আপনার সেই গুহ্য ভগবত্তত্ত্বজ্ঞান বিষয়ে উপদেশদাতা পরিব্রাজকেরা যখন দূরদেশে গমন করলেন, তখন পূর্ব জীবনের সেই বাল্যাবস্থায় আপনি কি করেছিলেন?

তাৎপর্য

ব্যাসদেব নিজেও ছিলেন নারদ মুনির শিষ্য, এবং তাই তাঁর গুরুদেবের কাছ থেকে দীক্ষা প্রাপ্ত হওয়ার পর নারদ মুনি কি করেছিলেন সে সম্বন্ধে জানতে তিনি স্বাভাবিকভাবেই উৎসুক ছিলেন। নারদ মুনির মতো তাঁর জীবনকে সর্বাঙ্গসুন্দর করে তোলার জন্য তিনি নারদ মুনির পদাঙ্ক অনুসরণ করতে চেয়েছিলেন। এভাবে গুরুদেবের কাছ থেকে তত্ত্ব-অনুসন্ধানের বাসনা গতিশীল পারমার্থিক জীবনের পক্ষে অত্যন্ত আবশ্যক। এই পন্থাকে বলা হয় 'সদ্ধর্ম-পৃচ্ছা'।

শ্লোক ৩

স্বায়ম্ভুব কয়া বৃত্ত্যা বর্তিতং তে পরং বয়ঃ।
কথং চেদমুদস্রাক্ষীঃ কালে প্রাপ্তে কলেবরম্ ॥ ৩ ॥

স্বায়ম্ভুব—হে ব্রহ্মার পুত্র; **কয়া**—কোন্ অবস্থায়; **বৃত্ত্যা**—বৃত্তি; **বর্তিতম্**—অতিবাহিত হয়েছে; **তে**—আপনি; **পরম্**—দীক্ষার পরে; **বয়ঃ**—আয়ুষ্কাল; **কথম্**—কিভাবে; **চ**—এবং; **ইদম্**—এই; **উদস্রাক্ষীঃ**—আপনি ত্যাগ করেছিলেন; **কালে**—যথাসময়ে; **প্রাপ্তে**—প্রাপ্ত হয়ে; **কলেবরম্**—দেহ।

অনুবাদ

হে ব্রহ্মার পুত্র, আপনি দীক্ষা গ্রহণের পর কিভাবে আপনার জীবন অতিবাহিত করেছিলেন, এবং আপনার পূর্ব দেহ যথাসময়ে ত্যাগ করার পর কিভাবে আপনি এই দেহ প্রাপ্ত হন?

তাৎপর্য

তাঁর পূর্ব জীবনে নারদ মুনি ছিলেন একজন দাসী-পুত্র, সুতরাং কিভাবে যে তিনি সচ্চিদানন্দময় চিন্ময় শরীর লাভ করেছিলেন তা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। শ্রীল ব্যাসদেব চেয়েছিলেন সকলের সন্তুষ্টিবিধানের জন্য সেই তত্ত্ব তিনি যেন ব্যক্ত করেন।

শ্লোক ৪

প্রাক্কল্পবিষয়ামেতাং স্মৃতিং তে মুনিসত্তম।
ন হ্যেষ ব্যবধাৎকাল এষ সর্বনিরাকৃতিঃ ॥ ৪ ॥

প্রাক্—পূর্ব; **কল্প**—ব্রহ্মার একদিন; **বিষয়াম্**—বিষয় বস্তু; **এতাম্**—এই সমস্ত; **স্মৃতিম্**—স্মৃতি; **তে**—আপনার; **মুনি-সত্তম**—হে মহর্ষি; **ন**—না; **হি**—অবশ্যই; **এষঃ**—এই সমস্ত; **ব্যবধাৎ**—পার্থক্য নিরূপণ করা; **কালঃ**—সময়ের গতি; **এষঃ**—এই সমস্ত; **সর্ব**—সমস্ত; **নিরাকৃতিঃ**—প্রলয়।

অনুবাদ

হে মহর্ষি, যথাসময়ে কাল সব কিছু বিনাশ করে, তা হলে কিভাবে এই বিষয়-বস্তু কালের দ্বারা প্রভাবিত না হয়ে আপনার স্মৃতিতে এখনও উজ্জ্বলভাবে বিরাজ করছে?

তাৎপর্য

প্রলয়ের সময় জড় দেহের বিনাশ হলেও যেমন আত্মার বিনাশ হয় না, তেমনই আধ্যাত্মিক চেতনারও বিনাশ হয় না। পূর্বকল্পে নারদ মুনির জড় শরীরে আধ্যাত্মিক চেতনার বিকাশ হয়েছিল। জড় চেতনা হচ্ছে জড় শরীরের মাধ্যমে আধ্যাত্মিক চেতনারই প্রকাশ। এই চেতনা নিকৃষ্ট, নশ্বর এবং বিকৃত। কিন্তু আধ্যাত্মিক স্তরে চিন্ময় মনের পারমার্থিক চেতনা চিন্ময় আত্মারই মতো পরা-প্রকৃতি সম্ভূত এবং তার কোন বিনাশ হয় না।

শ্লোক ৫

নারদ উবাচ

ভিক্ষুভির্বিপ্রবসিতে বিজ্ঞানাদেষ্টৃভির্মম।
বর্তমানো বয়স্যাদ্যে তত এতদকারষম্ ॥ ৫ ॥

নারদ উবাচ—শ্রীনারদ মুনি বললেন; **ভিক্ষুভিঃ**—মহর্ষিদের দ্বারা; **বিপ্রবসিতে**—দূর দেশে গমন করলে; **বিজ্ঞান**—পারমার্থিক জ্ঞান; **আদেষ্টৃভিঃ**—যাঁরা আমাকে দান করেছিলেন; **মম**—আমার; **বর্তমানঃ**—বর্তমান; **বয়সি আদ্যে**—এই জীবনের পূর্বে; **ততঃ**—তারপর; **এতৎ**—এইটুকু; **অকারষম্**—অনুষ্ঠিত হয়েছিল।

অনুবাদ

শ্রীনারদ মুনি বললেনঃ সেই মহর্ষিরা, যাঁরা আমাকে পারমার্থিক তত্ত্বজ্ঞান দান করেছিলেন, তাঁরা দূর দেশে গমন করলেন এবং আমি এইভাবে আমার জীবন অতিবাহিত করেছিলাম।

তাৎপর্য

তাঁর পূর্ব জন্মে নারদ মুনি যখন সেই মহর্ষিদের কৃপার প্রভাবে পারমার্থিক জ্ঞান লাভ করেছিলেন, তখন যদিও তিনি ছিলেন পাঁচ বছর বয়সের একটি বালক মাত্র, কিন্তু তবুও তাঁর জীবনে এক বিরাট পরিবর্তন এসেছিল। সদ্গুরু কর্তৃক দীক্ষিত হওয়ার এটি একটি উল্লেখযোগ্য লক্ষণ। যথার্থ ভক্তসঙ্গের প্রভাবে পারমার্থিক জ্ঞান লাভ করার ফলে জীবনে দ্রুত পরিবর্তন আসে। শ্রীনারদ মুনির পূর্ব জন্মে কিভাবে তা হয়েছিল এই অধ্যায়ে তা ধীরে ধীরে বর্ণনা করা হয়েছে।

শ্লোক ৬

একাত্মজা মে জননী যোষিন্মূঢ়া চ কিঙ্করী।
ময্যাত্মজেঽনন্যগতৌ চক্রে স্নেহানুবন্ধনম্ ॥ ৬ ॥

একাত্মজা—কেবলমাত্র একটি পুত্রের; **মে**—আমার; **জননী**—মাতা; **যোষিৎ**—স্ত্রীজাতি; **মূঢ়া**—মূর্খ; **চ**—এবং; **কিংকরী**—দাসী; **ময়ি**—আমাকে; **আত্মজে**—তাঁর সন্তান হওয়ার ফলে; **অনন্য-গতৌ**—যাঁর অন্য কোন গতি ছিল না; **চক্রে**—করেছিলেন; **স্নেহ-অনুবন্ধনম্**—স্নেহের বন্ধনে আবদ্ধ।

অনুবাদ

আমার মাতা ছিলেন একজন অতি সাধারণ স্ত্রীলোক এবং তিনি ছিলেন দাসী; আমি ছিলাম তাঁর একমাত্র পুত্র। আমি ছাড়া তাঁর আর অন্য কোনও আশ্রয় ছিল না, তাই তিনি আমাকে তাঁর স্নেহের বন্ধনে আবদ্ধ করে রেখেছিলেন।

শ্লোক ৭

সাস্বতন্ত্রা ন কল্পাসীদ্‌যোগক্ষেমং মমেচ্ছতী।
ঈশস্য হি বশে লোকো যোষা দারুময়ী যথা ॥ ৭ ॥

সা—তিনি; **অস্বতন্ত্রা**—নির্ভরশীল ছিলেন; **ন**—না; **কল্পা**—সমর্থ; **আসীৎ**—ছিলেন; **যোগ-ক্ষেমম্**—ভরণপোষণ; **মম**—আমার; **ইচ্ছতী**—যদিও ইচ্ছুক ছিলেন; **ঈশস্য**—ভগবানের বিধান অনুসারে; **হি**—সেই জন্য; **বশে**—নিয়ন্ত্রণাধীন; **লোকঃ**—সকলে; **যোষা**—পুতুল; **দারুময়ী**—কাঠের তৈরী; **যথা**—যেমন।

অনুবাদ

তিনি যথাযথভাবে আমাকে প্রতিপালন করতে চাইতেন, কিন্তু যেহেতু তিনি স্বতন্ত্র ছিলেন না, তাই তিনি আমার জন্য কিছুই করতে পারতেন না। এই জগৎ সর্বতোভাবে পরমেশ্বর ভগবানের নিয়ন্ত্রণাধীন, তাই সকলেই তাঁর হাতের কাঠের পুতুলের মতো।

শ্লোক ৮

অহং চ তদ্‌ব্রহ্মকুলে ঊষিবাংস্তদ্‌পেক্ষয়া।
দিগ্‌দেশকালাব্যুৎপন্নো বালকঃ পঞ্চহায়নঃ ॥ ৮ ॥

অহম্—আমি; **চ**—ও; **তৎ**—তা; **ব্রহ্মকুলে**—ব্রাহ্মণদের বিদ্যালয়ে; **ঊষিবান্**—বাস করতাম; **তৎ**—তাঁর; **উপেক্ষয়া**—নির্ভরশীল হয়ে; **দিক্‌-দেশ**—দিক এবং দেশ; **কাল**—সময়; **অব্যুৎপন্নঃ**—অনভিজ্ঞ; **বালকঃ**—বালক; **পঞ্চ-হায়নঃ**—পাঁচ বছর বয়স্ক।

অনুবাদ

আমার বয়স যখন মাত্র পাঁচ বছর, তখন আমি ব্রাহ্মণদের বিদ্যালয়ে অবস্থান করছিলাম। আমি আমার মায়ের স্নেহের উপর নির্ভরশীল ছিলাম এবং আমার কোনই অভিজ্ঞতা ছিল না।

শ্লোক ৯

একদা নির্গতাং গেহাদ্দুহন্তীং নিশি গাং পথি।
সর্পোঽদশৎপদা স্পৃষ্টঃ কৃপণাং কালচোদিতঃ ॥ ৯ ॥

একদা—এক সময়ে; **নির্গতাম্**—নির্গত হয়ে; **গেহাৎ**—গৃহ থেকে; **দুহন্তীম্**—দোহন করার জন্য; **নিশি**—রাত্রিবেলা; **গাম্**—গাভী; **পথি**—পথমধ্যে; **সর্পঃ**—সর্প; **অদশৎ**—দংশিত; **পদা**—পায়ে; **স্পৃষ্টঃ**—আহত হয়ে; **কৃপণাম্**—অভাগিনী; **কাল-চোদিতঃ**—কালের দ্বারা প্রভাবিত।

অনুবাদ

এক সময়ে আমার অভাগিনী মা যখন রাত্রিবেলা গো-দোহন করতে যাচ্ছিলেন, তখন মহাকালের প্রভাবে তাঁর পায়ের দ্বারা আহত একটি সর্প তাঁকে দংশন করে।

তাৎপর্য

ভগবান এইভাবেই তাঁর ঐকান্তিক ভক্তকে তাঁর কাছে টেনে নেন। সেই অসহায় বালকটির একমাত্র আশ্রয় ছিল তাঁর স্নেহময়ী মাতা, কিন্তু পরমেশ্বর ভগবানের উপর সর্বতোভাবে নির্ভরশীল হওয়ার জন্য ভগবান তাঁর মাকে এই পৃথিবী থেকে সরিয়ে নিলেন।

শ্লোক ১০

তদা তদহমীশস্য ভক্তানাং শমভীপ্সতঃ।
অনুগ্রহং মন্যমানঃ প্রাতিষ্ঠং দিশমুত্তরাম্ ॥ ১০ ॥

তদা—সেই সময়ে; **তৎ**—তা; **অহম্**—আমি; **ঈশস্য**—ভগবানের; **ভক্তানাম্**—ভক্তদের; **শম**—কৃপা; **অভীপ্সতঃ**—ইচ্ছা করেছিল; **অনুগ্রহম্**—বিশেষ কৃপা; **মন্যমানঃ**—সেইভাবে চিন্তা করে; **প্রাতিষ্ঠম্**—যাত্রা করি; **দিশম্ উত্তরাম্**—উত্তর দিকে।

অনুবাদ

সেই ঘটনাটিকে আমি ভক্তবৎসল ভগবানের বিশেষ কৃপা বলে মনে করে উত্তর দিকে যাত্রা করি।

তাৎপর্য

ভগবানের অন্তরঙ্গ ভক্তরা সব কিছুকেই ভগবানের আশীর্বাদ বলে মনে করেন। জড় জগতের পরিপ্রেক্ষিতে যা দুঃখদায়ক অথবা বিপজ্জনক, ভক্ত তাকে ভগবানের বিশেষ করুণা বলে গ্রহণ করেন। জাগতিক উন্নতি এক ধরনের জড় রোগ, এবং ভগবানের কৃপার প্রভাবে এই রোগের তাপ ধীরে ধীরে উপশম হয় এবং পারমার্থিক স্বাস্থ্য লাভ হয়। জড়বাদী মানুষেরা তা বুঝতে পারে না।

শ্লোক ১১

স্ফীতাঞ্জনপদাংস্তত্র পুরগ্রামব্রজাকরান্।
খেটখর্বটবাটীশ্চ বনান্যুপবনানি চ ॥ ১১ ॥

স্ফীতান—অত্যন্ত সমৃদ্ধশালী; **জন-পদান্**—জনপদ; **তত্র**—সেখানে; **পুর**—নগর; **গ্রাম**—গ্রাম; **ব্রজ**—বড় খামার; **আকরান্**—খনি; **খেট**—ক্ষেত; **খর্বট**—উপত্যকা; **বাটীঃ**—ফুলের বাগান; **চ**—এবং; **বনানি**—বন; **উপবনানি**—উপবন; **চ**—এবং।

অনুবাদ

গৃহত্যাগ করার পর আমি বহু সমৃদ্ধশালী জনপদ, নগর, গ্রাম, গোচারণ ভূমি, খনি, ক্ষেত, উপত্যকা, বাগান, উপবন এবং বন অতিক্রম করেছিলাম।

তাৎপর্য

কৃষি, খনি থেকে খনিজ পদার্থ উত্তোলন, পশুপালন, ফুলের চাষ ইত্যাদি মানুষের বিভিন্ন কার্যকলাপ এখনকার মতো পূর্বেও ছিল, এমন কি বর্তমান সৃষ্টির আগেও তা ছিল এবং পরবর্তী সৃষ্টিতেও সে সমস্ত কার্যকলাপগুলি থাকবে। প্রকৃতির নিয়মে বহু লক্ষ লক্ষ বছর পরে আবার সৃষ্টির শুরু হয় এবং প্রায় একই রকমভাবে ব্রহ্মাণ্ডের ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি হয়। জড়বাদীরা জীবনের যথার্থ প্রয়োজনগুলির অনুসন্ধান না করে প্রত্নতাত্ত্বিক খননকার্য ইত্যাদির প্রচেষ্টায় তাদের সময়ের অপচয় করে। নারদ মুনি যদিও তখন একটি শিশু ছিলেন, কিন্তু পারমার্থিক জীবনের অনুপ্রেরণা পাওয়া

মাত্রই তিনি আর অর্থনৈতিক উন্নতি সাধন ইত্যাদি অনর্থক কার্যকলাপে এক মুহূর্তও নষ্ট না করে পরমার্থ সাধনের পথে অগ্রসর হয়েছিলেন। যদিও তিনি নগরী, গ্রাম, খনি এবং সমৃদ্ধ জনপদের মধ্য দিয়ে গিয়েছিলেন, কিন্তু তবুও অর্থনৈতিক উন্নতি সাধনের কোন রকম প্রয়াস তিনি করেননি। তিনি কেবল তাঁর পারমার্থিক উন্নতি সাধনের পথে ক্রমান্বয়ে এগিয়ে চলেছিলেন। *শ্রীমদ্ভাগবত* হচ্ছে লক্ষ লক্ষ বছর পূর্বের ঘটনার ইতিহাস। সে কথা এখানে বলা হয়েছে, ইতিহাসের সব চাইতে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাগুলিই কেবল এই অপ্রাকৃত গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে।

শ্লোক ১২

চিত্রধাতুবিচিত্রাদ্রীনিভভগ্নভুজদ্রুমান্।
জলাশয়াঞ্ছিবজলান্নলিনীঃ সুরসেবিতাঃ।
চিত্রস্বনৈঃ পত্ররথৈর্বিভ্রমদ্ভ্রমরশ্রিয়ঃ ॥ ১২ ॥

চিত্রধাতু—স্বর্ণ, রৌপ্য, তাম্র আদি মূল্যবান ধাতু; **বিচিত্র**—বিচিত্র; **অদ্রীন্**—পাহাড় এবং পর্বত; **ইভভগ্ন**—বৃহদাকার হস্তী দ্বারা বিধ্বস্ত; **ভুজ**—শাখা; **দ্রুমান্**—গাছপালা; **জলাশয়ান্-শিব**—স্বাস্থ্যকর; **জলান্**—জলাশয়; **নলিনীঃ**—পদ্মফুল; **সুর-সেবিতাঃ**—স্বর্গের দেবতাদের দ্বারা সেবিত; **চিত্রস্বনৈঃ**—চিত্তাকর্ষক; **পত্র-রথৈঃ**—পাখিদের দ্বারা; **বিভ্রমৎ**—বিভ্রান্তকারী; **ভ্রমর-শ্রিয়ঃ**—ভ্রমরদের দ্বারা অলঙ্কৃত।

অনুবাদ

আমি স্বর্ণ রৌপ্য এবং তাম্র আদি ধাতুতে পূর্ণ পাহাড় এবং পর্বত অতিক্রম করেছিলাম, এবং সুন্দর পদ্মফুলে সুশোভিত, বিভ্রান্ত ভ্রমর এবং সঙ্গীতমুখর পাখিদের দ্বারা অলঙ্কৃত স্বর্গের দেবতাদের উপযুক্ত জলাশয় এবং স্থলভূমি অতিক্রম করেছিলাম।

শ্লোক ১৩

নলবেণুশরস্তন্বকুশকীচকগহ্বরম্
এক এবাতিয়াতোঽহমদ্রাক্ষং বিপিনং মহৎ।
ঘোরং প্রতিভয়াকারং ব্যালোলূকশিবাজিরম্ ॥ ১৩ ॥

নল—নল; **বেণু**—বাঁশ; **শরঃ**—শর; **তন্ব**—পূর্ণ; **কুশ**—কুশ ঘাস; **কীচক**—লতাগুল্ম; **গহ্বরম্**—গুহা; **এক**—একলা; **এব**—কেবল; **অতিয়াতঃ**—দুর্গম; **অহম্**—আমি; **অদ্রাক্ষম্**—গমন করেছিলাম; **বিপিনম্**—গভীর অরণ্য; **মহৎ**—মহৎ; **ঘোরম্**—ভয়ঙ্কর; **প্রতিভয়াকারম্**—ভীষণ ভীতিজনক; **ব্যাল**—সর্প; **উলূক**—পেঁচা; **শিব**—শৃগাল; **অজিরম্**—বিচরণক্ষেত্র।

অনুবাদ

তারপর আমি নল, বাঁশ, শর, কুশ, লতাগুল্ম ইত্যাদিতে পূর্ণ অত্যন্ত দুর্গম অরণ্যানী একাকী অতিক্রম করেছিলাম। আমি ভয়ঙ্কর অন্ধকারাচ্ছন্ন বিপদসঙ্কুল বনের মধ্য দিয়ে গিয়েছিলাম, যা ছিল সর্প, পেচক এবং শৃগালদের বিচরণক্ষেত্র।

তাৎপর্য

পরিব্রাজকাচার্যদের কর্তব্য হচ্ছে বন, অরণ্য, পাহাড়, পর্বত, নগর, গ্রাম ইত্যাদির মধ্য দিয়ে একাকী ভ্রমণ করে ভগবানের সৃষ্টির অভিজ্ঞতা অর্জন করা, যাতে ভগবানের প্রতি বিশ্বাস এবং মনের বল অর্জন করা যায় এবং সেই সমস্ত স্থানের অধিবাসীদের ভগবত্তত্ত্বজ্ঞান দান করা যায়। সন্ন্যাসীর কর্তব্য হচ্ছে নির্ভয়ে এই সমস্ত বিপদের ঝুঁকি গ্রহণ করা, এবং বর্তমান যুগের আদর্শ সন্ন্যাসী হচ্ছেন শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু, যিনি মধ্য ভারতের ঝারিখণ্ড জঙ্গলের মধ্য দিয়ে গমন করে সেখানকার বাঘ, ভাল্লুক, সাপ, হরিণ, হাতি এবং অন্যান্য বহু বন্য জন্তুকে ভগবৎ-প্রেম দান করেছিলেন। এই কলিযুগে সাধারণ মানুষের সন্ন্যাস গ্রহণ করা নিষেধ। যে মানুষ লোক দেখাবার জন্য কেবল বেশ পরিবর্তন করে, সে আদর্শ সন্ন্যাসী থেকে ভিন্ন। আদর্শ সন্ন্যাসী হচ্ছেন তিনি যিনি সব রকমের জড় আদান-প্রদান সম্পূর্ণভাবে ত্যাগ করার প্রতিজ্ঞা করে তাঁর জীবন সর্বতোভাবে ভগবানের সেবায় উৎসর্গ করেন। বেশ পরিবর্তন কেবল একটি বাহ্যিক রীতি মাত্র। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু সন্ন্যাস নেওয়ার পর শাস্ত্রের নির্দেশ অনুসারে সন্ন্যাসের নাম গ্রহণ করেননি। এই কলিযুগে তথাকথিত সন্ন্যাসীদেরও শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর পদাঙ্ক অনুসরণ করে তাঁদের পূর্বের নাম পরিবর্তন করা উচিত নয়। এই যুগে পরমেশ্বর ভগবানের দিব্য মহিমা শ্রবণ এবং কীর্তনরূপ ভগবদ্ভক্তির অনুশীলনই হচ্ছে একমাত্র অনুমোদিত পন্থা, এবং যিনি সংসার ত্যাগ করার প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করেছেন, তাঁকে নারদ মুনি অথবা শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর মতো পরিব্রাজকাচার্যদের অনুকরণ করার প্রয়োজন নেই; পক্ষান্তরে, তিনি কোনও পবিত্র স্থানে স্থিত হয়ে তাঁর সমস্ত শক্তি এবং সময় বৃন্দাবনের ষড় গোস্বামীদের মতো মহান আচার্যদের লেখা পবিত্র শাস্ত্রগ্রন্থ শ্রবণ এবং অধ্যয়নে নিয়োজিত করতে পারেন।

শ্লোক ১৪

পরিশ্রান্তেন্দ্রিয়াত্মাহং তৃট্‌পরীতো বুভুক্ষিতঃ।
স্নাত্বা পীত্বা হ্রদে নদ্যা উপস্পৃষ্টো গতশ্রমঃ ॥ ১৪ ॥

পরিশ্রান্ত—শ্রান্ত হয়ে; **ইন্দ্রিয়**—দৈহিক; **আত্মা**—মানসিক; **অহম্**—আমি; **তৃট্‌পরীতঃ**—তৃষ্ণার্ত হয়ে; **বুভুক্ষিতঃ**—ক্ষুধার্ত হয়ে; **স্নাত্বা**—স্নান করে; **পীত্বা**—পান করে; **হ্রদে**—হ্রদে; **নদ্যাঃ**—নদীতে; **উপস্পৃষ্টঃ**—সংস্পর্শে; **গত**—দূর হয়েছিল; **শ্রমঃ**—শ্রম।

অনুবাদ

এইভাবে ভ্রমণ করে আমি দৈহিক এবং মানসিক উভয় দিক দিয়েই পরিশ্রান্ত হয়ে পড়েছিলাম, এবং আমি তৃষ্ণার্ত ও ক্ষুধার্ত হয়েছিলাম। তখন নদীতে এবং হ্রদে স্নান করে এবং সেখানকার জল পান করে ও স্পর্শ করে আমি আমার শ্রান্তি দূর করেছিলাম।

তাৎপর্য

পরিব্রাজককে ক্ষুধা-তৃষ্ণা আদি দেহের প্রয়োজনগুলি মেটাবার জন্য গৃহস্থের দ্বারে দ্বারে গিয়ে ভিক্ষা করতে হয় না। প্রকৃতির দানের মাধ্যমেই তা মেটানো যায়। তাই পরিব্রাজক গৃহস্থের গৃহে ভিক্ষা করার জন্য যান না, তাদের পারমার্থিক জ্ঞান দান করার জন্য যান।

শ্লোক ১৫

তস্মিন্নির্মনুজেঽরণ্যে পিপ্পলোপস্থ আশ্রিতঃ।
আত্মনাত্মানমাত্মস্থং যথাশ্রুতমচিন্তয়ম্ ॥ ১৫ ॥

তস্মিন্—সেই; **নির্মনুজে**—লোকবসতিবিহীন; **অরণ্যে**—অরণ্যে; **পিপ্পল**—অশ্বত্থ বৃক্ষ; **উপস্থ**—উপবেশন করে; **আশ্রিতঃ**—আশ্রয় গ্রহণ করে; **আত্মনা**—বুদ্ধির দ্বারা; **আত্মানম্**—পরমাত্মাকে; **আত্মস্থম্**—আমার অন্তরে অবস্থিত; **যথাশ্রুতম্**—যে ভাবে আমি সেই মুক্ত পুরুষদের কাছ থেকে শ্রবণ করেছিলাম; **অচিন্তয়ম্**—চিন্তা করেছিলাম।

অনুবাদ

তারপর, জনমানবশূন্য এক অরণ্যে একটি অশ্বত্থ বৃক্ষের নিচে উপবেশন করে আমি আমার বুদ্ধি দ্বারা মুক্ত পুরুষদের কাছ থেকে ঠিক যেভাবে শ্রবণ করেছিলাম, সেই বর্ণনা অনুসারে আমার অন্তরের অন্তঃস্থলে বিরাজমান পরমাত্মার ধ্যান করতে শুরু করেছিলাম।

তাৎপর্য

ধ্যান নিজের ইচ্ছামত করা যায় না। সদ্‌গুরুর মাধ্যমে শাস্ত্রের প্রামাণিক নির্দেশ অনুসারে যোগের পন্থা সম্বন্ধে যথাযথভাবে অবগত হয়ে এবং বুদ্ধিকে যথাযথভাবে পরিচালিত করে সমস্ত জীবের হৃদয়ে বিরাজ করছেন যে পরমাত্মা তাঁর ধ্যান করতে হয়। যে ভক্ত তাঁর গুরুদেবের নির্দেশ অনুসারে প্রীতিপূর্বক ভগবানের সেবা করেছেন, তাঁর মধ্যে এই চেতনা সুদৃঢ়ভাবে বিকশিত হয়। শ্রীনারদ মুনি সদ্‌গুরুর শরণাগত হয়েছিলেন, নিষ্ঠা সহকারে তাঁর সেবা করেছিলেন এবং তার ফলে

যথাযথভাবে দিব্য জ্ঞান লাভ করেছিলেন। এইভাবে তিনি ধ্যান করতে শুরু করেছিলেন।

শ্লোক ১৬

ধ্যায়তশ্চরণাম্ভোজং ভাবনির্জিতচেতসা।
ঔৎকণ্ঠ্যাশ্রুকলাক্ষস্য হৃদ্যাসীন্মে শনৈর্হরিঃ ॥ ১৬ ॥

ধ্যায়তঃ—এইভাবে ধ্যান করে; **চরণাম্ভোজম্**—পরমাত্মার চরণকমল; **ভাব-নির্জিত**—ভগবৎ-প্রীতির ভাবে আপ্লুত চিত্ত; **চেতসা**—সমস্ত চেতনা (চিন্তা, অনুভূতি এবং ইচ্ছা); **ঔৎকণ্ঠ্যা**—উৎকণ্ঠা; **অশ্রু-কল**—অশ্রু বর্ষিত হয়েছিল; **অক্ষস্য**—চোখের; **হৃদি**—আমার হৃদয়াভ্যন্তরে; **আসীৎ**—আবির্ভূত হয়েছিলেন; **মে**—আমার; **শনৈঃ**—অচিরে; **হরিঃ**—পরমেশ্বর ভগবান শ্রীহরি।

অনুবাদ

আমি যখন আমার হৃদয়ে পরমেশ্বর ভগবানের চরণারবিন্দের ধ্যান করতে শুরু করেছিলাম, তখন আমার চিত্তে এক অপ্রাকৃত ভাবের উদয় হয়েছিল, আমার চক্ষুদ্বয় অশ্রুপ্লাবিত হয়েছিল এবং অচিরেই পরমেশ্বর ভগবান শ্রীহরি, আমার হৃদয়কমলে আবির্ভূত হয়েছিলেন।

তাৎপর্য

এখানে 'ভাব' কথাটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। ভগবানের প্রতি অপ্রাকৃত অনুরাগের ফলে 'ভাব' প্রাপ্ত হওয়া যায়। ভগবদ্ভক্তির প্রথম স্তরটি হচ্ছে শ্রদ্ধা, এবং ভগবানের প্রতি এই শ্রদ্ধা বর্ধিত করার জন্য ভগবানের শুদ্ধ ভক্তের সঙ্গ করতে হয়; সেটি হচ্ছে দ্বিতীয় স্তর। তৃতীয় স্তরটি হচ্ছে ভগবদ্ভক্তির বিধান অনুসারে ভগবানের ভজন করা। এই ভজনক্রিয়ার ফলে সব রকমের অনর্থ নিবৃত্তি হয়, অর্থাৎ সব রকমের জড় আসক্তির নিবৃত্তি হয় এবং ভগবদ্ভক্তির পথে অগ্রসর হওয়ার সমস্ত প্রতিবন্ধকগুলি দূর হয়ে যায়।

অনর্থ নিবৃত্তির পর পারমার্থিক বিষয়ের প্রতি প্রগাঢ় নিষ্ঠার উদয় হয়, এবং তার ফলে ভগবদ্ভক্তি অনুশীলনের প্রতি রুচি বর্ধিত হয়। তার থেকে আসক্তির উদয় হয়, এবং তারপর ভাবের উদয় হয়। এই ভাব হচ্ছে ভগবানের প্রতি অনন্য ভক্তির প্রাথমিক স্তর। পূর্বোল্লিখিত এই সমস্ত স্তরগুলি হচ্ছে ভগবানের প্রতি অপ্রাকৃত প্রেমের ক্রমবিকাশের স্তর। এইভাবে ভগবৎ প্রেমের দ্বারা উদ্বুদ্ধ হওয়ার ফলে গভীর বিরহের অনুভূতির উদয় হয় এবং তা থেকে অষ্টসাত্ত্বিক বিকার দেখা দেয়; ভক্তের চোখ দিয়ে যে অশ্রু ঝরে পড়ে তা ভগবৎ-প্রেমের স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া, এবং যেহেতু শ্রীনারদ মুনি তাঁর পূর্বজীবনে গৃহত্যাগ করার পর অতি শীঘ্র ভগবদ্ভক্তির এই অতি

উন্নত স্তরে অধিষ্ঠিত হয়েছিলেন, তার ফলে তিনি সব রকমের জড় কলুষ থেকে মুক্ত, চিন্ময় ইন্দ্রিয়ের দ্বারা তাঁর হৃদয়াভ্যন্তরে পরমেশ্বর ভগবানকে দর্শন করতে পেরেছিলেন।

শ্লোক ১৭

প্রেমাতিভরনির্ভিন্নপুলকাঙ্গোঽতিনির্বৃতঃ।
আনন্দসম্প্লবে লীনো নাপশ্যমুভয়ং মুনে ॥ ১৭ ॥

প্রেমা—প্রেম; **অতিভর**—অত্যন্ত; **নির্ভিন্ন**—বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন; **পুলক**—আনন্দানুভূতি; **অঙ্গঃ**—দেহের বিভিন্ন অঙ্গ; **অতিনির্বৃতঃ**—সম্পূর্ণরূপে অভিভূত হয়ে; **আনন্দ**—আনন্দ; **সম্প্লবে**—আনন্দের সমুদ্রে; **লীনঃ**—লীন; **ন**—না; **অপশ্যম্**—দেখতে পেরেছিলাম; **উভয়ম্**—উভয়কে; **মুনে**—হে ব্যাসদেব।

অনুবাদ

হে ব্যাসদেব, সেই সময় প্রবল আনন্দের অনুভূতিতে অভিভূত হয়ে পড়ার ফলে আমার দেহের প্রতিটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ পুলকিত হয়েছিল। আনন্দের সমুদ্রে নিমগ্ন হয়ে আমি সেই মুহূর্তে ভগবানকে এবং নিজেকেও দর্শন করতে পারছিলাম না।

তাৎপর্য

চিন্ময় সুখানুভূতি এবং গভীর আনন্দের সঙ্গে জড়জাগতিক কোন কিছুর তুলনা করা চলে না। তাই এই ধরনের অনুভূতির যথাযথ বর্ণনা করা অত্যন্ত কঠিন। শ্রীনারদ মুনির বর্ণনায় এই ধরনের আনন্দানুভূতির একটু আভাস আমরা পাচ্ছি। দেহের প্রতিটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ এবং ইন্দ্রিয়ের বিশেষ বিশেষ কার্য রয়েছে। ভগবানকে দর্শন করার পর প্রতিটি ইন্দ্রিয় ভগবানের সেবা করার জন্য সম্পূর্ণরূপে সচেতন হয়ে ওঠে, কেন না মুক্ত অবস্থায় ইন্দ্রিয়গুলি ভগবানের সেবায় সম্পূর্ণরূপে কার্যকরী হয়। দিব্য আনন্দে ইন্দ্রিয়গুলি ভগবানের সেবা করার জন্য স্বতন্ত্রভাবে পুনরুজ্জীবিত হয়ে ওঠে। তার ফলে নারদ মুনি একই সঙ্গে তাঁর স্বরূপ দর্শন করে এবং ভগবানকে দর্শন করে আত্মহারা হয়েছিলেন।

শ্লোক ১৮

রূপং ভগবতো যত্তন্মনঃকান্তং শুচাপহম্।
অপশ্যন্ সহসোত্তস্থে বৈক্লব্যাদ্দুর্মনা ইব ॥ ১৮ ॥

রূপম্—রূপ; **ভগবতঃ**—পরমেশ্বর ভগবানের; **যৎ**—যথাযথ; **তৎ**—তা; **মনঃ**—মনের; **কান্তম্**—বাসনা অনুসারে; **শুচাপহম্**—সমস্ত প্রভেদ দূর করে; **অপশ্যন্**—

দর্শন না করে ; সহসা—সহসা ; উত্তস্থে—উঠে দাঁড়িয়ে ; বৈক্লব্যাৎ—বিচলিত হয়ে ; দুর্মনা—আকাঙ্ক্ষিতকে হারিয়ে ; ইব—যেমন।

অনুবাদ

ভগবানের অপ্রাকৃত রূপ যথাযথভাবে মনের বাসনা পূর্ণ করে এবং সব রকমের মানসিক বৈষম্য দূর করে। তাঁর সেই রূপ দর্শন করতে না পেরে, অত্যন্ত প্রিয় বস্তু হারালে মানুষ যেভাবে বিচলিত হয়ে পড়ে, সেইভাবে বিচলিত হয়ে আমি হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়েছিলাম।

তাৎপর্য

ভগবান যে নিরাকার নন তা নারদ মুনি উপলব্ধি করেছিলেন। কিন্তু তাঁর রূপ আমাদের অভিজ্ঞতালব্ধ সমস্ত জড় রূপের থেকে ভিন্ন। আমাদের জীবদ্দশায় আমরা জড় জগতে বিভিন্ন রূপ দর্শন করে থাকি, কিন্তু তাদের কোনটিই আমাদের চিত্তকে সন্তুষ্ট করতে পারে না এবং মনের সব রকম চঞ্চলতাও দূর করতে পারে না। কিন্তু ভগবানের অপ্রাকৃত রূপের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে যে সেই রূপ একবার দর্শন করলে আর অন্য কোন কিছুর প্রতি আসক্তি থাকে না ; এই জড় জগতের কোনও রূপ তখন তাকে সন্তুষ্ট করতে পারে না। শাস্ত্রে যে ভগবানকে অনেক সময় অ-রূপ বা নিরাকার বলা হয়, তার অর্থ হচ্ছে যে তাঁর রূপ জড় নয়।

আমরা সকলেই হচ্ছি চিন্ময় জীব, তাই পরমেশ্বর ভগবানের অপ্রাকৃত রূপের সঙ্গে নিত্য সম্পর্কিত হয়ে আমরা জন্ম-জন্মান্তরে ভগবানের সেই রূপের অনুসন্ধান করছি, এবং জড় জগতের অন্য কোনও রূপ দর্শন করে আমরা সন্তুষ্ট হতে পারছি না। নারদ মুনি ক্ষণিকের জন্য সেই রূপ দর্শন করেছিলেন, এবং সেই রূপ পুনরায় দর্শন না করতে পেরে তিনি অত্যন্ত বিচলিত হয়ে সেই রূপের অন্বেষণ করার জন্য তড়িৎস্পৃষ্টের মতো উঠে দাঁড়িয়েছিলেন। আমরা জন্ম-জন্মান্তরে যা আকাঙ্ক্ষা করছি নারদ মুনি তা পেয়েছিলেন এবং তাঁকে পুনরায় দর্শন করতে না পেরে তিনি গভীরভাবে মর্মাহত হয়েছিলেন।

শ্লোক ১৯

দিদৃক্ষুস্তদহং ভূয়ঃ প্রণিধায় মনো হৃদি।
বীক্ষমাণোঽপি নাপশ্যমবিতৃপ্ত ইবাতুরঃ ॥ ১৯ ॥

দিদৃক্ষুঃ—দর্শনের আকাঙ্ক্ষা করে ; **তৎ**—তা ; **অহম্**—আমি ; **ভূয়ঃ**—পুনরায় ; **প্রণিধায়**—মনকে একাগ্র করে ; **মনঃ**—মন ; **হৃদি**—হৃদয়ে ; **বীক্ষমাণঃ**—দর্শন করার প্রতীক্ষায় ; **অপি**—তা সত্ত্বেও ; **ন**—না ; **অপশ্যম্**—দেখতে না পেয়ে ; **অবিতৃপ্তঃ**—অতৃপ্ত ; **ইব**—মতন ; **আতুরঃ**—আতুর।

অনুবাদ

আমি ভগবানের সেই অপ্রাকৃত রূপ আবার দর্শন করতে চেয়েছিলাম, কিন্তু তাঁকে পুনরায় দর্শন করার আশায় একাগ্র চিত্তে হৃদয়াভ্যন্তরে দর্শন করার চেষ্টা করা সত্ত্বেও তাঁকে আমি আর দেখতে পাইনি, এবং এইভাবে অতৃপ্ত হয়ে আমি অত্যন্ত শোকাতুর হয়ে পড়েছিলাম।

তাৎপর্য

কোন রকম কৃত্রিম যৌগিক পন্থার দ্বারা ভগবানকে দর্শন করা যায় না। তা সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করে ভগবানের অহৈতুকী কৃপার উপর। আমাদের ইচ্ছামত আমরা যেমন সূর্যের উদয় দাবি করতে পারি না, ঠিক তেমনই আমাদের ইচ্ছামত আমরা আমাদের সম্মুখে ভগবানের উপস্থিতিও দাবি করতে পারি না। সূর্য তাঁর নিজের ইচ্ছা অনুসারে উদিত হন; তেমনই ভগবান তাঁর অহৈতুকী কৃপার প্রভাবে যখন আমাদের দর্শন দিতে ইচ্ছা করেন, তখনই তাঁকে দর্শন করা যায়। আমাদের কর্তব্য হচ্ছে সেই শুভ মুহূর্তের প্রতীক্ষা করে ভক্তি সহকারে তাঁর সেবা করে যাওয়া। নারদ মুনি মনে করেছিলেন যে, যৌগিক প্রক্রিয়ার দ্বারা তিনি পুনরায় ভগবানকে দর্শন করতে সক্ষম হবেন, যেভাবে তিনি তাঁর প্রথম প্রচেষ্টায় তাঁর দর্শন পেয়েছিলেন, কিন্তু দ্বিতীয়বারে যথাসাধ্য চেষ্টা করা সত্ত্বেও তিনি আর ভগবানের দর্শন পেলেন না। ভগবান হচ্ছেন সম্পূর্ণরূপে স্বতন্ত্র এবং স্বাধীন। কেবলমাত্র অনন্য ভক্তির দ্বারাই তাঁকে লাভ করা যায়। তিনি আমাদের জড় ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নন। কেউ যখন সম্পূর্ণরূপে তাঁর করুণার উপর নির্ভর করে ঐকান্তিক নিষ্ঠা সহকারে তাঁর সেবা করে, তখন তিনি তাঁর স্বতন্ত্র ইচ্ছার প্রভাবে তাঁকে দর্শন দান করতে পারেন।

শ্লোক ২০

এবং যতন্তং বিজনে মামাহাগোচরো গিরাম্।
গম্ভীরশ্লক্ষ্ণয়া বাচা শুচঃ প্রশময়ন্নিব ॥ ২০ ॥

এবম্—এইভাবে; যতন্তম্—চেষ্টাপরায়ণ; বিজনে—সেই নির্জন স্থানে; মাম্—আমাকে; আহ—বলেছিলেন; অগোচরঃ—জড় শব্দের অতীত; গিরাম্—বাণী; গম্ভীর—গম্ভীর; শ্লক্ষ্ণয়া—শ্রুতিমধুর; বাচা—বাণী; শুচঃ—অনুশোচনা; প্রশময়ন্—উপশম; ইব—মতো।

অনুবাদ

সেই নির্জন স্থানে আমার প্রচেষ্টা দর্শন করে সমস্ত জড় বর্ণনার অতীত যে পরমেশ্বর ভগবান, তিনি অত্যন্ত গম্ভীর ও শ্রুতিমধুর স্বরে আমার অন্তরের বেদনা উপশম করার জন্য কথা বলেছিলেন।

তাৎপর্য

বেদে বলা হয়েছে যে ভগবান প্রাকৃত বাণী এবং বুদ্ধির অতীত। কিন্তু তবুও তাঁর অহৈতুকী করুণার প্রভাবে কেউ যখন উপযুক্ত ইন্দ্রিয় প্রাপ্ত হন, তখন তিনি তাঁর বাণী শুনতে পান অথবা তাঁর সঙ্গে কথা বলতে পারেন। এটি হচ্ছে ভগবানের অচিন্ত্য শক্তি। ভগবান যাঁকে কৃপা করেন তিনি তাঁর বাণী শুনতে পান। ভগবান নারদ মুনির প্রতি অত্যন্ত প্রসন্ন হয়েছিলেন, এবং তাই তিনি তাঁকে উপযুক্ত শক্তি দান করেছিলেন, যাতে তিনি তাঁর কথা শুনতে পান। বৈধী ভক্তির স্তরে অন্য কারও পক্ষে কিন্তু সরাসরিভাবে ভগবানের সংস্পর্শ অনুভব করা সম্ভব নয়। নারদ মুনি যখন ভগবানের মধুর বাণী শুনতে পান, তখন তাঁর বিরহ-বেদনা কিয়দংশে উপশম হয়েছিল। ভগবানের প্রতি প্রীতিপরায়ণ ভক্ত সর্বদাই ভগবানের বিরহ-বেদনা অনুভব করেন এবং তাই তিনি সর্বদাই দিব্য আনন্দে অভিভূত থাকেন।

শ্লোক ২১

হন্তাস্মিন্ জন্মনি ভবান্মা মাং দ্রষ্টুমিহার্হতি।
অবিপক্বকষায়াণাং দুর্দর্শোঽহং কুযোগিনাম্ ॥ ২১ ॥

হন্ত—হে নারদ; **অস্মিন্**—এই; **জন্মনি**—আয়ুষ্কালে; **ভবান্**—তুমি; **মা**—না; **মাম্**—আমাকে; **দ্রষ্টুম্**—দর্শন করতে; **ইহ**—এখানে; **অর্হতি**—যোগ্যতা; **অবিপক্ক**—অপরিণত; **কষায়াণাম্**—জড় কলুষ; **দুর্দর্শঃ**—দর্শন করা কঠিন; **অহম্**—আমি; **কুযোগিনাম্**—যার সেবা পূর্ণ হয়নি।

অনুবাদ

(ভগবান বললেন) হে নারদ, এই জীবনে তুমি আর আমাকে দর্শন করতে পারবে না। যাদের সেবা পূর্ণ হয়নি এবং যারা সব রকম জড় কলুষ থেকে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত হতে পারেনি, তারা আমাকে কদাচিৎ দর্শন করতে পারে।

তাৎপর্য

ভগবদ্গীতায় পরমেশ্বর ভগবানকে পরম পবিত্র, পরম পুরুষ এবং পরম তত্ত্বরূপে বর্ণনা করা হয়েছে। তাঁর মধ্যে একটুও জড় কলুষ নেই, এবং তাই যদি কারো মধ্যে অল্প একটুও জড় আসক্তি থাকে, তা হলে তিনি ভগবানের সান্নিধ্যে আসতে পারেন না। কেউ যখন জড়া প্রকৃতির অন্তত দুটি গুণ, অর্থাৎ রজোগুণ এবং তমোগুণের প্রভাব থেকে মুক্ত হন, তখনই ভগবদ্ভক্তি শুরু হয়। সেই দুটি গুণের প্রভাব থেকে মুক্ত হওয়ার লক্ষণ হচ্ছে কাম এবং লোভ থেকে মুক্ত হওয়া। অর্থাৎ ইন্দ্রিয়-তৃপ্তির বাসনা থেকে মুক্ত হতে হবে এবং ইন্দ্রিয়-তৃপ্তি সাধনের লোভ থেকে মুক্ত হতে হবে। সত্ত্বগুণ হচ্ছে প্রকৃতির গুণের সমতা। সব রকমের জড় প্রভাব থেকে মুক্ত হওয়ার

অর্থ হচ্ছে সত্ত্বগুণের প্রভাব থেকেও মুক্ত হওয়া। নির্জন অরণ্যে ভগবানের ধ্যান করা হচ্ছে সত্ত্বগুণের ক্রিয়া। কেউ বনে গিয়ে পারমার্থিক সিদ্ধিলাভের প্রচেষ্টা করতে পারে, কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে তিনি প্রত্যক্ষভাবে ভগবানকে দর্শন করতে পারবেন। সব রকমের জড় আসক্তি থেকে সম্পূর্ণভাবে মুক্ত হয়ে শুদ্ধ সত্ত্বে অধিষ্ঠিত হলেই কেবল পরমেশ্বর ভগবানের সান্নিধ্যে আসা যায়। সে জন্য সর্বোৎকৃষ্ট পন্থা হচ্ছে সেই স্থানে বাস করা, যেখানে ভগবানের অপ্রাকৃত রূপের আরাধনা হয়। ভগবানের মন্দির হচ্ছে প্রপঞ্চাতীত, কিন্তু বনে গিয়ে ধ্যান করাটা হচ্ছে সাত্ত্বিক ক্রিয়া। তাই কনিষ্ঠ অধিকারী ভক্তকে বনে গিয়ে ভগবানকে না খুঁজে ভগবানের অর্চা-বিগ্রহের অর্চনা করতে সর্বদা নির্দেশ দেওয়া হয়ে থাকে। ভগবদ্ভক্তির শুরু হয় অর্চনা থেকে, যা বনে গিয়ে ভগবানকে খোঁজার চেয়ে অনেক উন্নত। নারদ মুনি বর্তমান জীবনে বনে যাননি, কেন না এই জীবনে তিনি সব রকমের জড় আকাঙ্ক্ষা থেকে সম্পূর্ণভাবে মুক্ত ছিলেন ; তিনি তাঁর উপস্থিতির প্রভাবে যে কোনও জায়গাকে বৈকুণ্ঠে পরিণত করতে পারতেন। তিনি এক গ্রহ থেকে আরেক গ্রহে গিয়ে মানুষ, দেবতা, কিন্নর, গন্ধর্ব, ঋষি, মুনি এবং অন্য সকলকে ভগবদ্ভক্তে পরিণত করেন। তাঁর কৃপার প্রভাবে তিনি প্রহ্লাদ মহারাজ, ধ্রুব মহারাজ আদি বহু ভক্তকে ভগবানের চিন্ময় সেবায় যুক্ত করেছিলেন। ভগবানের শুদ্ধ ভক্ত তাই নারদ মুনি, প্রহ্লাদ মহারাজ প্রমুখ মহান ভক্তদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে নিরন্তর ভগবানের মহিমা কীর্তন করেন। ভগবানের এই মহিমা প্রচার হচ্ছে সব রকমের জড় গুণের অতীত চিন্ময় ক্রিয়া।

শ্লোক ২২

সকৃদ্‌যদ্ দর্শিতং রূপমেতৎকামায় তেঽনঘ ।
মৎকামঃ শনকৈঃ সাধু সর্বান্মুঞ্চতি হৃচ্ছয়ান্ ॥ ২২ ॥

সকৃৎ—একবার মাত্র ; **যৎ**—যে ; **দর্শিতম্**—দেখানো হয়েছিল ; **রূপম্**—রূপ ; **এতৎ**—এই ; **কামায়**—তীব্র লালসা ; **তে**—তোমার ; **অনঘ**—হে নিষ্পাপ ; **মৎ**—আমার ; **কামঃ**—কামনা ; **শনকৈঃ**—বৃদ্ধির দ্বারা ; **সাধুঃ**—ভক্ত ; **সর্বান্**—সমস্ত ; **মুঞ্চতি**—মোচন করে ; **হৃচ্ছয়ান্**—জড় কামনা-বাসনা।

অনুবাদ

হে নিষ্পাপ, তুমি কেবল একবার মাত্র আমার রূপ দর্শন করেছ এবং তা কেবল আমার প্রতি তোমার আসক্তি বৃদ্ধি করার জন্য ; কেন না তুমি যতই আমাকে লাভ করার জন্য লালায়িত হবে, ততই তুমি সমস্ত জড় কামনা-বাসনা থেকে মুক্ত হবে।

তাৎপর্য

জীব কখনও বাসনারহিত হতে পারে না। সে একটি প্রাণহীন পাথর নয়। কর্ম করা, চিন্তা করা, অনুভব করা এবং ইচ্ছা করা হচ্ছে তার স্বাভাবিক বৃত্তি। কিন্তু সে যখন

জড় বিষয়ে চিন্তা করে, অনুভব করে এবং ইচ্ছা করে, তখন সে জড় বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে পড়ে। পক্ষান্তরে, সে যখন ভগবানের সেবার কথা চিন্তা করে, অনুভব করে, এবং ইচ্ছা করে, তখন সে ধীরে ধীরে সব রকমের বন্ধন থেকে মুক্ত হয়। জীব যতই ভগবানের অপ্রাকৃত সেবায় যুক্ত হয়, ততই তাঁর প্রতি আসক্তি বৃদ্ধি পায়। সেটিই হচ্ছে ভগবৎ-সেবার অপ্রাকৃত গুণ। সাধারণত জড় কর্মে বিরক্তি আসে, কিন্তু ভগবানের প্রেমময়ী সেবায় কোন রকমের বিরক্তি নেই অথবা তার অন্ত নেই। ভগবানের প্রেমময়ী সেবা অন্তহীনভাবে বর্ধিত হতে পারে, এবং তবুও তাতে বিরক্তি আসে না বা তার সমাপ্তি হয় না। ঐকান্তিক ভগবৎ-সেবার মাধ্যমে ভগবানের অপ্রাকৃত উপস্থিতি অনুভব করা যায়। তাই ভগবানকে দর্শন করার অর্থ হচ্ছে ভগবানের সেবায় যুক্ত হওয়া, কেন না তাঁর সেবা এবং তিনি স্বয়ং অভিন্ন। তাঁর ঐকান্তিক ভক্তের কর্তব্য হচ্ছে নিষ্ঠা সহকারে ভগবানের সেবা করে যাওয়া। ভগবান তখন কিভাবে সেই সেবা সম্পাদন করতে হবে এবং কোথায় তা সম্পাদন করতে হবে তার নির্দেশ প্রদান করেন। নারদ মুনির কোন জড় বাসনা ছিল না, কেবল ভগবানের প্রতি তাঁর আসক্তি বৃদ্ধি করার জন্য ভগবান তাঁকে এইভাবে উপদেশ দিয়েছিলেন।

শ্লোক ২৩

সৎসেবয়াদীর্ঘয়াপি জাতা ময়ি দৃঢ়া মতিঃ।
হিত্বাবদ্যমিমং লোকং গন্তা মজ্জনতামসি ॥ ২৩ ॥

সৎসেবয়া—ভগবদ্ভক্ত সাধু-সেবার দ্বারা; **অদীর্ঘয়া**—অল্পকালের জন্য; **অপি**—এমন কি; **জাতা**—লাভ হয়; **ময়ি**—আমার প্রতি; **দৃঢ়া**—দৃঢ়; **মতিঃ**—মতি; **হিত্বা**—বর্জন করে; **অবদ্যম্**—দুঃখদায়ক; **ইমম্**—এই; **লোকম্**—জড় জগৎ; **গন্তা**—যায়; **মজ্জনতাম্**—আমার পার্ষদ; **অসি**—হয়।

অনুবাদ

অল্পকালের জন্যও যদি ভগবদ্ভক্ত সাধু-সেবা করা হয়, তা হলে আমার প্রতি সুদৃঢ় মতি উৎপন্ন হয়। তার ফলে সে দুঃখদায়ক এই জড় জগৎ ত্যাগ করার পর আমার অপ্রাকৃত ধামে আমার পার্ষদত্ব লাভ করে।

তাৎপর্য

পরম তত্ত্বের সেবা করার অর্থ হচ্ছে সদ্গুরুর নির্দেশ অনুসারে পরমেশ্বর ভগবানের সেবা। সদ্গুরু হচ্ছেন কনিষ্ঠ অধিকারী ভক্ত এবং ভগবানের মধ্যবর্তী স্বচ্ছ মাধ্যম। কনিষ্ঠ অধিকারী ভক্তের ভ্রান্ত ইন্দ্রিয়ের দ্বারা পরমেশ্বর ভগবানের সান্নিধ্য লাভ করার সামর্থ্য নেই এবং তাই সদ্গুরুর তত্ত্বাবধানে তাঁকে অপ্রাকৃত ভগবৎ-সেবার

শিক্ষালাভ করতে হয়। এই শিক্ষার প্রভাবে স্বল্পকালের জন্য হলেও কনিষ্ঠ অধিকারী ভক্ত এই ধরনের অপ্রাকৃত সেবায় মতিসম্পন্ন হন, যা তাঁকে চরমে জড় জগতের বন্ধন থেকে মুক্ত করে এবং চিন্ময় জগতে উন্নীত হয়ে ভগবানের নিত্য পার্ষদত্ব লাভ করতে সাহায্য করে।

শ্লোক ২৪

মতির্ময়ি নিবদ্ধেয়ং ন বিপদ্যেত কর্হিচিৎ।
প্রজাসর্গনিরোধেঽপি স্মৃতিশ্চ মদনুগ্রহাৎ॥ ২৪॥

মতিঃ—মতি; **ময়ি**—আমার প্রতি ভক্তি পরায়ণ; **নিবদ্ধা**— নিবদ্ধ; **ইয়ম্**—এইভাবে; **ন**—কখনই নয়; **বিপদ্যেত**—পৃথক; **কর্হিচিৎ**—যে কোনও সময়ে; **প্রজা**—জীব; **সর্গ**—সৃষ্টির সময়; **নিরোধে**—প্রলয়ের সময়েও; **অপি**—এমন কি; **স্মৃতিঃ**—স্মৃতি; **চ**—এবং; **মৎ**—আমার; **অনুগ্রহাৎ**—অনুগ্রহের প্রভাবে।

অনুবাদ

আমার সেবায় নিবদ্ধ বুদ্ধি কখনই প্রতিহত হতে পারে না। সৃষ্টির সময় এমন কি প্রলয়ের সময়েও আমার কৃপায় তোমার স্মৃতি অপ্রতিহত থাকবে।

তাৎপর্য

পরমেশ্বর ভগবানের প্রতি ভক্তিযুক্ত সেবা কখনই বিফল হয় না। পরমেশ্বর ভগবান যেহেতু নিত্য, তাই মতি বা বুদ্ধি যখন তাঁর সেবায় যুক্ত হয় অথবা কোন কিছু যখন তাঁর উদ্দেশ্যে সাধিত হয় তখন তাও নিত্যত্ব প্রাপ্ত হয়। ভগবদ্গীতাতে বলা হয়েছে যে, পরমেশ্বর ভগবানের প্রতি প্রেমময়ী সেবা জন্ম-জন্মান্তরে সঞ্চিত হতে থাকে এবং ভক্ত যখন পূর্ণতা প্রাপ্ত হন তখন তার জন্মজন্মান্তরে সমস্ত সেবা স্মরণ করে ভগবান তাঁকে তাঁর চিন্ময় ধামে তাঁর পার্ষদত্ব করেন। ভগবানের প্রতি সম্পাদিত সেবা কখনই বিনষ্ট হয় না, পক্ষান্তরে পূর্ণতা প্রাপ্তি পর্যন্ত তা ক্রমান্বয়ে বর্ধিত হতে থাকে।

শ্লোক ২৫

এতাবদুক্ত্বোপররাম তন্মহদ্
ভূতং নভোলিঙ্গমলিঙ্গমীশ্বরম্।
অহং চ তস্মৈ মহতাং মহীয়সে
শীর্ষ্ণাবনামং বিদধেঽনুকম্পিতঃ॥ ২৫॥

এতাবৎ—এইভাবে; **উক্ত্বা**—উক্ত; **উপররাম**—প্রতিহত হয়ে; **তৎ**—তা; **মহৎ**—মহান; **ভূতম্**—অদ্ভুত; **নভঃ-লিঙ্গম্**—শব্দরূপে প্রকাশিত; **অলিঙ্গম্**—চক্ষুর দ্বারা

দৃশ্যমান নন; **ঈশ্বরম্**—পরম নিয়ন্তা; **অহম্**—আমি; **চ**—ও; **তস্মৈ**—তাঁকে; **মহত্তাম্**—মহৎ; **মহীয়সে**—মহিমা-মণ্ডিত; **শীর্ষ্ণা**—মস্তক দ্বারা; **অবনামম্**—প্রণতি; **বিদধে**—করেছিলাম; **অনুকম্পিতঃ**—তাঁর দ্বারা অনুকম্পিত হয়ে।

অনুবাদ

তারপর সেই পরম ঈশ্বর, যিনি শব্দের দ্বারা প্রকাশিত এবং চক্ষুর দ্বারা অদৃশ্য, কিন্তু পরম অদ্ভুত, তাঁর বাণী শেষ করলেন। গভীর কৃতজ্ঞতা অনুভব করে আমি নত মস্তকে তাঁকে আমার প্রণতি নিবেদন করেছিলাম।

তাৎপর্য

সেই পরমেশ্বর ভগবানকে যে দেখা যায়নি, কেবল তাঁর বাণী শোনা গিয়েছিল, তার মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। পরমেশ্বর, ভগবান তাঁর নিঃশ্বাসের মাধ্যমে বেদ সৃষ্টি করেছিলেন। বেদের অপ্রাকৃত শব্দের মাধ্যমে তাঁকে দর্শন করা যায় এবং উপলব্ধি করা যায়। তেমনই, ভগবদ্গীতা হচ্ছে পরমেশ্বর ভগবানের শব্দরূপ প্রকাশ, এবং তাই তাঁর থেকে তা অভিন্ন। অর্থাৎ, নিরন্তর অপ্রাকৃত শব্দতরঙ্গ সমন্বিত ভগবানের নাম কীর্তন করার ফলে তাঁকে দর্শন করা যায় এবং শ্রবণ করা যায়।

শ্লোক ২৬

নামান্যনন্তস্য হতত্রপঃ পঠন্
গুহ্যানি ভদ্রাণি কৃতানি চ স্মরন্।
গাং পর্যটংস্তুষ্টমনা গতস্পৃহঃ
কালং প্রতীক্ষন্ বিমদো বিমৎসরঃ ॥ ২৬ ॥

নামানি—ভগবানের দিব্য নাম, মহিমা ইত্যাদি; **অনন্তস্য**—অনন্তের; **হতত্রপঃ**—জড় জগতের সব রকমের রীতি-নীতি থেকে মুক্ত হয়ে; **পঠন্**—পুনঃ পুনঃ পাঠ করা, আবৃত্তি করা ইত্যাদি; **গুহ্যানি**—গোপনীয়; **ভদ্রাণি**—সমস্ত আশীর্বাদ; **কৃতানি**—কার্যকলাপ; **চ**—এবং; **স্মরন্**—নিরন্তর স্মরণ করা; **গাম্**—পৃথিবীতে; **পর্যটন্**—পর্যটন; **তুষ্টমনাঃ**—সম্পূর্ণরূপে পরিতৃপ্ত; **গতস্পৃহঃ**—সব রকমের জড় কামনা বাসনা থেকে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত হয়ে; **কালম্**—কাল; **প্রতীক্ষন্**—প্রতীক্ষা; **বিমদঃ**—গর্বিত না হয়ে; **বিমৎসরঃ**—নির্মৎসর।

অনুবাদ

এইভাবে সব রকম সামাজিক লৌকিকতা উপেক্ষা করে আমি ভগবানের দিব্য নাম এবং মহিমা নিরন্তর কীর্তন করতে শুরু করি। ভগবানের অপ্রাকৃত লীলা এইভাবে কীর্তন এবং স্মরণ অত্যন্ত মঙ্গলজনক। এইভাবে ভগবানের মহিমা কীর্তন করতে

করতে আমি সর্বতোভাবে তৃপ্ত হয়ে অত্যন্ত বিনীত এবং নির্মৎসর চিত্তে সমস্ত পৃথিবী পর্যটন করতে থাকি।

তাৎপর্য

নারদ মুনি তাঁর ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার মাধ্যমে ভগবানের ঐকান্তিক ভক্তের জীবন সংক্ষেপে বর্ণনা করলেন। এই ধরনের ভক্ত ভগবান অথবা তাঁর আদর্শ প্রতিনিধির কাছ থেকে দীক্ষালাভ করার পর অত্যন্ত ঐকান্তিকভাবে সমস্ত পৃথিবী ভ্রমণ করে ভগবানের মহিমা প্রচার করেন, যাতে অন্যেরাও ভগবানের মহিমা শ্রবণ করতে পারে। এই ধরনের ভক্তদের কোন রকম জাগতিক লাভের কোনও বাসনা থাকে না। তাঁরা কেবল একটিমাত্র বাসনার দ্বারাই অনুপ্রাণিত—ভগবানের কাছে ফিরে যাওয়া, এবং যথাসময়ে তাঁরা তাঁদের জড় দেহটি ত্যাগ করে ভগবানের কাছে ফিরে যান। ভগবানের কাছে ফিরে যাওয়াই হচ্ছে তাঁদের জীবনের চরম উদ্দেশ্য। তাই তাঁরা কারোর প্রতি কখনও ঈর্ষাপরায়ণ হন না এবং ভগবানের কাছে ফিরে যাওয়ার যোগ্যতা অর্জন করেছেন বলে তাঁরা কোন রকম গর্ব অনুভব করেন না। তাঁদের একমাত্র কাজ হচ্ছে ভগবানের নাম, মহিমা এবং লীলা কীর্তন করা ও স্মরণ করা। তা তাঁরা ব্যক্তিগতভাবে করেন এবং কোন রকম জাগতিক লাভের আশা না নিয়ে অন্যের মঙ্গল সাধন করার জন্য সেই বাণী বিতরণ করেন।

শ্লোক ২৭

এবং কৃষ্ণমতের্ব্রহ্মন্নাসক্তস্যামলাত্মনঃ।
কালঃ প্রাদুরভূৎকালে তড়িৎসৌদামনী যথা ॥ ২৭ ॥

এবম্—এইভাবে; **কৃষ্ণমতেঃ**—যিনি সম্পূর্ণরূপে শ্রীকৃষ্ণের চিন্তায় মগ্ন; **ব্রহ্মন্**—হে ব্যাসদেব; **ন**—না; **আসক্তস্য**—আসক্ত; **অমলাত্মনঃ**—যিনি সর্বতোভাবে সব রকমের জড় কলুষ থেকে মুক্ত; **কালঃ**—মৃত্যু; **প্রাদুরভূৎ**—প্রাদুর্ভূত হয়েছিল; **কালে**—যথাসময়ে; **তড়িৎ**—বিদ্যুৎ; **সৌদামনী**—আলোক; **যথা**—যেমন।

অনুবাদ

হে ব্রাহ্মণ ব্যাসদেব, আমি যখন শ্রীকৃষ্ণের চিন্তায় সম্পূর্ণরূপে মগ্ন হয়েছিলাম, তখন আমার আর কোন আসক্তি ছিল না। সব রকমের জড় কলুষথেকে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত হয়ে আমার মৃত্যু হয়েছিল, ঠিক সেভাবে তড়িৎ এবং আলোক যুগপৎভাবে দেখা যায়।

তাৎপর্য

শ্রীকৃষ্ণের চিন্তায় সর্বতোভাবে মগ্ন হওয়ার অর্থ হচ্ছে সব রকম জড় কলুষ অথবা জড় আকাঙ্ক্ষা থেকে মুক্ত হওয়া। অত্যন্ত ঐশ্বর্যশালী মানুষের যেমন ছোটখাটো

জিনিষের প্রতি আকাঙ্ক্ষা থাকে না, তেমনই ভগবান শ্রীকৃষ্ণের ভক্ত, যাঁর ভগবদ্ধামে ফিরে গিয়ে সচ্চিদানন্দময় জীবন লাভ অবশ্যম্ভাবী, তাঁর স্বভাবতই অনিত্য, অলীক এবং অর্থহীন জড় বিষয়ের প্রতি আর কোন আসক্তি থাকে না। সেটিই হচ্ছে পারমার্থিক চেতনায় উন্নত ভক্তের লক্ষণ। তারপর শুদ্ধ ভক্ত যখন সর্বতোভাবে প্রস্তুত হন, তখন হঠাৎ দেহের পরিবর্তন ঘটে, যাকে সাধারণত বলা হয় মৃত্যু। বিদ্যুতের সঙ্গে সঙ্গে যেমন আলোকের প্রকাশ হয়, ঠিক তেমনই শুদ্ধ ভক্তের জড় দেহ ত্যাগ এবং চিন্ময় দেহ লাভ ভগবানের ইচ্ছার প্রভাবে একই সঙ্গে হয়ে থাকে। মৃত্যুর পূর্বেও শুদ্ধ ভক্তের কোন রকম জড় আসক্তি থাকে না। আগুনের সংস্পর্শে লোহাও যেমন গরম হয়ে আগুনের গুণ প্রাপ্ত হয়, ঠিক তেমনই শুদ্ধ ভক্তের জাগতিক শরীরও চিন্ময়ত্ব প্রাপ্ত হয়।

শ্লোক ২৮

প্রযুজ্যমানে ময়ি তাং শুদ্ধাং ভাগবতীং তনুম্।
আরব্ধকর্মনির্বাণো ন্যপতৎ পাঞ্চভৌতিকঃ ॥ ২৮ ॥

প্রযুজ্যমানে—লাভ করে; **ময়ি**—আমাকে; **তাম্**—তা; **শুদ্ধাম্**—বিশুদ্ধ; **ভাগবতীম্**—পরমেশ্বর ভগবানের সঙ্গ করার উপযুক্ত; **তনুম্**—দেহ; **আরব্ধ**—সঞ্চিত; **কর্ম**—সকাম কর্ম; **নির্বাণঃ**—নিবৃত্ত করা; **ন্যপতৎ**—ত্যাগ করা; **পাঞ্চভৌতিকঃ**—পঞ্চভৌতিক দেহ।

অনুবাদ

পরমেশ্বর ভগবানের সঙ্গ করার উপযুক্ত একটি চিন্ময় শরীর লাভ করে আমি পঞ্চভৌতিক দেহটি ত্যাগ করি, এবং তার ফলে আমার সমস্ত কর্মফল নিবৃত্ত হয়।

তাৎপর্য

পরমেশ্বর ভগবানের কাছ থেকে নারদ মুনি প্রতিশ্রুতি পেয়েছিলেন যে তাঁর সঙ্গে সঙ্গ করার উপযুক্ত শরীর তিনি পাবেন, এবং সেই প্রতিশ্রুতি অনুসারে নারদ মুনি তাঁর জাগতিক দেহটি ত্যাগ করা মাত্রই তাঁর চিন্ময় শরীর প্রাপ্ত হয়েছিলেন। এই চিন্ময় শরীর সব রকম জড় প্রভাব থেকে মুক্ত এবং তা তিনটি প্রধান চিন্ময় গুণের দ্বারা ভূষিত, যথা নিত্যত্ব, জড় গুণের প্রভাব থেকে মুক্ত এবং সকাম কর্মের ফল থেকে মুক্ত। জড় শরীর সর্বদাই এই তিনটি গুণের অভাবে দুর্দশাগ্রস্ত। ভক্ত যখন ভগবানের অপ্রাকৃত সেবায় যুক্ত হন, তৎক্ষণাৎ তাঁর দেহ চিন্ময় গুণাবলীর দ্বারা সম্পৃক্ত হয়। এটি অনেকটা লোহার উপর চিন্তামণির স্পর্শের প্রভাবের মতো। চিন্তামণির স্পর্শে লোহা যেমন সোনা হয়ে যায়, ভগবদ্ভক্তির চিন্ময় প্রভাবে জীবও তেমন চিন্ময়ত্ব প্রাপ্ত হয়। তাই দেহত্যাগ মানে হচ্ছে শুদ্ধ ভক্তের উপর জড়া প্রকৃতির তিনটি গুণের

প্রভাব স্তব্ধ হওয়া। এই সম্পর্কে শাস্ত্রে বহু নিদর্শন রয়েছে। ধ্রুব মহারাজ, প্রহ্লাদ মহারাজ আদি বহু ভক্ত তাঁদের সেই শরীরেই পরমেশ্বর ভগবানকে দেখতে সমর্থ হয়েছিলেন। তার অর্থ হচ্ছে যে তখন সেই ভক্তদের দেহ জড় থেকে চিন্ময়ত্ব প্রাপ্ত হয়েছিল। সেটিই হচ্ছে প্রামাণিক শাস্ত্রের মাধ্যমে তত্ত্বদ্রষ্টা গোস্বামীদের সিদ্ধান্ত। *ব্রহ্ম-সংহিতায়* বলা হয়েছে যে, ইন্দ্রগোপ থেকে শুরু করে দেবরাজ ইন্দ্র পর্যন্ত সমস্ত জীব কর্মের বন্ধনে আবদ্ধ এবং তাদের কর্ম অনুসারে তারা সুখভোগ করে অথবা দুঃখভোগ করে। ভক্তরাই কেবল পরমেশ্বর ভগবানের অহৈতুকী কৃপার প্রভাবে সেই প্রতিক্রিয়া থেকে মুক্ত।

শ্লোক ২৯

কল্পান্ত ইদমাদায় শয়ানেঽম্ভস্যুদন্বতঃ।
শিশয়িষোরনুপ্রাণং বিবিশেঽন্তরহং বিভোঃ ॥ ২৯ ॥

কল্পান্ত—প্রতিটি কল্পের শেষে; **ইদম্**—এই; **আদায়**—সংগ্রহ করে; **শয়ানে**—শয়ন করে; **অম্ভসি**—কারণ বারিতে; **উদন্বতঃ**—প্রলয়; **শিশয়িষোঃ**—পরমেশ্বর ভগবানের (নারায়ণের) শয়ন; **অনুপ্রাণম্**—নিঃশ্বাস; **বিবিশে**—প্রবেশ করে; **অন্তঃ**—অন্তরে; **অহম্**—আমি; **বিভোঃ**—ব্রহ্মার।

অনুবাদ

কল্পান্তে যখন পরমেশ্বর ভগবান নারায়ণ কারণ বারিতে শয়ন করলেন, ব্রহ্মা তখন সৃষ্টির সমস্ত উপাদানগুলি নিয়ে তাঁর মধ্যে প্রবেশ করলেন, এবং আমিও তখন তাঁর নিঃশ্বাসের মাধ্যমে তাঁর মধ্যে প্রবেশ করেছিলাম।

তাৎপর্য

নারদ মুনি ব্রহ্মার পুত্ররূপেই পরিচিত, ঠিক যেমন শ্রীকৃষ্ণ বসুদেবের পুত্ররূপে পরিচিত। পরমেশ্বর ভগবান এবং নারদ মুনির মতো তাঁর নিত্যমুক্ত ভক্তরা একইভাবে জড় জগতে আবির্ভূত হন। *ভগবদ্গীতায়* বলা হয়েছে যে, ভগবানের জন্ম এবং কর্ম দিব্য। তাই আচার্যদের সিদ্ধান্ত অনুসারে ব্রহ্মার পুত্ররূপে নারদ মুনির আবির্ভাবও একটি দিব্য লীলা। তাঁর আবির্ভাব এবং তিরোভাব ভগবানের আবির্ভাব এবং তিরোভাবেরই সমপর্যায়ভুক্ত। তাই ভগবান এবং তাঁর ভক্তরা একই সঙ্গে ভিন্ন এবং অভিন্ন। তাঁরা উভয়েই একই চিন্ময় স্তরের অন্তর্গত।

শ্লোক ৩০

সহস্রযুগপর্যন্তে উত্থায়েদং সিসৃক্ষতঃ।
মরীচিমিশ্রা ঋষয়ঃ প্রাণেভ্যোঽহং চ জজ্ঞিরে ॥ ৩০ ॥

সহস্র—এক হাজার; **যুগ**—তেতাল্লিশ লক্ষ বছর; **পর্যন্তে**—সেই স্থায়িত্বের পর; **উত্থায়**—মেয়াদ শেষ হয়ে গেলে; **ইদম্**—এই; **সিসৃক্ষতঃ**—পুনরায় সৃষ্টি করার বাসনা; **মরীচি-মিশ্রাঃ**—মরীচি আদি ঋষিরা; **ঋষয়ঃ**—সমস্ত ঋষিরা; **প্রাণেভ্যঃ**—তাঁর ইন্দ্রিয় থেকে; **অহম্**—আমি; **চ**—ও; **জজ্ঞিরে**—আবির্ভূত হয়েছিলাম।

অনুবাদ

৪৩০,০০,০০,০০০ সৌর বৎসরের পর ব্রহ্মা যখন ভগবানের ইচ্ছা অনুসারে পুনরায় সৃষ্টি করার জন্য মরীচি, অঙ্গিরা, অত্রি আদি ঋষিদের তাঁর দিব্য দেহ থেকে সৃষ্টি করেন, তখন তাঁদের সঙ্গে আমিও আবির্ভূত হয়েছিলাম।

তাৎপর্য

ব্রহ্মার একটি দিন হচ্ছে ৪৩২,০০,০০,০০০ সৌর বৎসর। সে কথা *ভগবদ্গীতাতে* বলা হয়েছে। সেই হিসাবে তাঁর রাত্রিও ৪৩২,০০,০০,০০০ সৌর বৎসর। *ভগবদ্গীতাতে* সে কথাও বলা হয়েছে। তাই সেই সময়ে ব্রহ্মা তাঁর স্রষ্টা গর্ভোদকশায়ী বিষ্ণুর শরীরে যোগনিদ্রায় নিদ্রিত থাকেন। এইভাবে নিদ্রিত অবস্থা থেকে জেগে উঠে ব্রহ্মা ভগবানের ইচ্ছা অনুসারে পুনরায় সৃষ্টি শুরু করেন; তখন ভগবানের অপ্রাকৃত শরীরের বিভিন্ন অঙ্গ থেকে সমস্ত মহর্ষিরা আবার আবির্ভূত হন এবং নারদ মুনিও তখন আবির্ভূত হন। অর্থাৎ নারদ মুনি তাঁর একই চিন্ময় শরীর নিয়ে আবির্ভূত হন, ঠিক যেমন মানুষ সেই একই শরীরে জেগে ওঠে। নারদ মুনি সর্বশক্তিমান ভগবানের জড় সৃষ্টিতে এবং চিন্ময় জগতের যে কোনও জায়গায় বিচরণ করতে পারেন। তিনি তাঁর চিন্ময় শরীরে আবির্ভূত হন এবং অন্তর্হিত হন। তাঁর সেই শরীরে দেহ এবং আত্মার কোন পার্থক্য নেই, যা বদ্ধ জীবের মধ্যে দেখা যায়।

শ্লোক ৩১

অন্তর্বহিশ্চ লোকাংস্ত্রীন্ পর্যেম্যস্কন্দিতব্রতঃ।
অনুগ্রহান্মহাবিষ্ণোরবিঘাতগতিঃ ক্বচিৎ ॥ ৩১ ॥

অন্তঃ—চিন্ময় জগতে; **বহিঃ**—জড় জগতে; **চ**—এবং; **লোকান্-ত্রিন্**—ত্রিভুবন; **পর্যেমি**—পর্যটন করেছি; **অস্কন্দিত**—নিরবচ্ছিন্ন; **ব্রতঃ**—ব্রত; **অনুগ্রহাৎ**—অহৈতুকী কৃপার প্রভাবে; **মহাবিষ্ণোঃ**—মহাবিষ্ণুর (কারণোদকশায়ী বিষ্ণু); **অবিঘাত**—অপ্রতিহত; **গতিঃ**—গতি; **ক্বচিৎ**—কোন সময়ে।

অনুবাদ

তখন থেকে সর্বশক্তিমান বিষ্ণুর কৃপায় আমি অপ্রাকৃত জগতে এবং জড় জগতের

ত্রিভুবনে অপ্রতিহতভাবে সর্বত্র ভ্রমণ করছি। কেন না আমি নিরন্তর ভগবানের প্রেমময়ী সেবায় দৃঢ়ব্রত হয়েছি।

তাৎপর্য

ভগবদ্গীতায় বলা হয়েছে যে, জড় জগতের তিনটি লোক রয়েছে, যথা ঊর্ধ্বলোক, মধ্যলোক এবং অধঃলোক। ঊর্ধ্বলোকের ঊর্ধ্বে, অর্থাৎ ব্রহ্মলোকের ঊর্ধ্বে রয়েছে ব্রহ্মাণ্ডের জড় আবরণ এবং তার ঊর্ধ্বে চিদাকাশ, যার বিস্তৃতি অন্তহীন ; সেখানে অসংখ্য জ্যোতির্ময় বৈকুণ্ঠলোক রয়েছে, যেখানে ভগবান তাঁর নিত্যমুক্ত পার্ষদদের সঙ্গে বিরাজ করেন। নারদ মুনি জড় জগতের এবং চিজ্জগতের এই সমস্ত লোকে ভ্রমণ করতে পারেন, ঠিক যেমন পরমেশ্বর ভগবান নিজে তাঁর সৃষ্টির যে কোনও জায়গায় যেতে পারেন। জড় জগতের জীবেরা জড়া প্রকৃতির সত্ত্ব, রজ এবং তম—এই তিনটি গুণের দ্বারা প্রভাবিত। কিন্তু শ্রীনারদ মুনি জড়া প্রকৃতির এই সমস্ত গুণের অতীত, এবং তাই তিনি এইভাবে সর্বত্র ভ্রমণ করতে পারেন। তিনি হচ্ছেন একজন মুক্ত মহাকাশচারী। ভগবান শ্রীবিষ্ণুর অহৈতুকী কৃপা অতুলনীয় ; এবং তাঁর এই ধরনের কৃপা ভক্তরাই কেবল উপলব্ধি করতে পারেন। তাই ভক্তদের কখনও অধঃপতন হয় না, কিন্তু জড়বাদীদের অর্থাৎ সকাম কর্মী এবং মনোধর্মী জ্ঞানীদের প্রকৃতির গুণের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে অধঃপতন হয়। ঋষিরা, যাঁদের কথা পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে, নারদ মুনির মতো চিজ্জগতে প্রবেশ করতে পারেন না। সে কথা *নরসিংহ-পুরাণে* উল্লেখ করা হয়েছে। মরীচি আদি ঋষিরা হচ্ছেন সকাম কর্মের আচার্য এবং সনক, সনাতন আদি ঋষিরা হচ্ছেন মনোধর্মী জ্ঞানের আচার্য। কিন্তু নারদ মুনি হচ্ছেন ভগবদ্ভক্তির আচার্য। ভগবদ্ভক্তি মার্গের সমস্ত মহাজনেরা 'নারদ-ভক্তি-সূত্রের' নির্দেশ অনুসারে নারদ মুনির পদাঙ্ক অনুসরণ করেন, তাই সমস্ত ভগবদ্ভক্তরা নির্দ্বিধায় ভগবানের রাজ্য বৈকুণ্ঠলোকে প্রবেশ করার যোগ্যতা লাভ করেন।

শ্লোক ৩২

দেবদত্তামিমাং বীণাং স্বরব্রহ্মবিভূষিতাম্।
মূর্চ্ছয়িত্বা হরিকথাং গায়মানশ্চরাম্যহম্ ॥ ২৯ ॥

দেবদত্তাম্—পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক প্রদত্ত ; **ইমাম্**—এই ; **বীণাম্**—বীণা ; **স্বরব্রহ্ম**—চিন্ময় সঙ্গীতের স্বর ; **বিভূষিতাম্**—বিভূষিত ; **মূর্চ্ছয়িত্বা**—মূর্চ্ছনা ; **হরিকথাম্**—ভগবানের কথা ; **গায়মানঃ**—নিরন্তর গান গেয়ে ; **চরামি**—ভ্রমণ করি ; **অহম্**—আমি।

অনুবাদ

এইভাবে আমি পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক প্রদত্ত এই বীণা বাজিয়ে স্বরব্রহ্ম বিভূষিত ভগবানের মহিমা নিরন্তর কীর্তন করি।

তাৎপর্য

পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যে নারদ মুনিকে বীণা দান করেছিলেন, সে কথা *লিঙ্গ পুরাণে* বর্ণিত হয়েছে এবং শ্রীল জীব গোস্বামীও সে কথার উল্লেখ করেছেন। এই অপ্রাকৃত বাদ্যযন্ত্রটি শ্রীকৃষ্ণ এবং নারদ মুনি থেকে অভিন্ন, কেন না তাঁরা সকলেই অধোক্ষজ তত্ত্ব। এই বীণার স্বর অপ্রাকৃত, এবং তাই এই বীণা বাজিয়ে নারদ মুনি যে ভগবানের মহিমা এবং লীলা বর্ণনা করেন তাও জড়াতীত অপ্রাকৃত তত্ত্ব। সঙ্গীতের সাতটি সুর—সা (ষড়জ), রে (ঋষভ), গা (গান্ধার), মা (মধ্যম), পা (পঞ্চম), ধা (ধৈবত), নি (নিষাদ) জড়াতীত এবং বিশেষ করে চিন্ময় সঙ্গীতের জন্যই সেগুলি ব্যবহার করা হয়ে থাকে। ভগবানের শুদ্ধ ভক্তরূপে শ্রীনারদ মুনি সর্বদাই তাঁর দেওয়া বীণা বাজিয়ে তাঁর প্রতি তাঁর কৃতজ্ঞতা প্রদর্শন করেন এবং এইভাবে তিনি নিরন্তর ভগবানের দিব্য মহিমা কীর্তন করেন, এবং তাই সেই অতি উচ্চ পদ থেকে তাঁর কখনও পতন হয় না। শ্রীল নারদ মুনির পদাঙ্ক অনুসরণ করে এই জড় জগতের মুক্ত পুরুষদেরও কর্তব্য হচ্ছে সা-রে-গা-মা আদি সপ্ত স্বরের যথাযথ সদ্ব্যবহার করে নিরন্তর পরমেশ্বর ভগবানের মহিমা কীর্তন করা, যে নির্দেশ ভগবান নিজেও *ভগবদ্গীতায়* দিয়ে গেছেন।

শ্লোক ৩৩

প্রগায়তঃ স্ববীর্যাণি তীর্থপাদঃ প্রিয়শ্রবাঃ।
আহূত ইব মে শীঘ্রং দর্শনং যাতি চেতসি ॥ ৩৩ ॥

প্রগায়তঃ—এইভাবে গান করে; **স্ববীর্যাণি**—স্বীয় কার্যকলাপ; **তীর্থপাদঃ**—পরমেশ্বর ভগবান, যাঁর শ্রীপাদপদ্ম হচ্ছে সমস্ত সদ্গুণ এবং পবিত্রতার উৎস; **প্রিয়শ্রবাঃ**—শ্রুতিমধুর; **আহূত**—আহূত; **ইব**—ঠিক যেমন; **মে**—আমাকে; **শীঘ্রম্**—অতি সত্বর; **দর্শনম্**—দর্শন; **যাতি**—প্রকাশিত হন; **চেতসি**—হৃদয়ের আসনে।

অনুবাদ

যখনই আমি পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের অত্যন্ত শ্রুতিমধুর মহিমা এবং কার্যকলাপ কীর্তন করতে শুরু করি, তৎক্ষণাৎ তিনি আমার হৃদয় আসনে আবির্ভূত হন, যেন আমার ডাক শুনে তিনি চলে আসেন।

তাৎপর্য

পরমেশ্বর ভগবান তাঁর দিব্য নাম, রূপ, লীলা আদি থেকে অভিন্ন। শুদ্ধ ভক্ত যখনই ভগবানের নাম, মহিমা এবং লীলা শ্রবণ, কীর্তন এবং স্মরণ করার মাধ্যমে শুদ্ধ ভগবৎ-সেবায় যুক্ত হন, ভগবান তখন সেই শুদ্ধ ভক্তের হৃদয়রূপ দর্পণে প্রতিবিম্বিত হয়ে তাঁর চিন্ময় দৃষ্টিতে প্রকাশিত হন। তাই ভগবানের প্রেমময়ী সেবায় যুক্ত শুদ্ধ ভক্ত সর্বক্ষণ ভগবানের সান্নিধ্য অনুভব করেন। অন্যের মুখ থেকে নিজের মহিমা শোনার স্বাভাবিক প্রবণতা সকলের মধ্যেই দেখা যায়। ভগবানও একজন ব্যক্তি হওয়ার ফলে এই স্বাভাবিক প্রবণতা তাঁর মধ্যেও রয়েছে। কেন না জীবের মধ্যে যে সমস্ত চারিত্রিক গুণাবলী দেখা যায় তা সবই ভগবানের গুণাবলীরই প্রতিবিম্ব। তবে পার্থক্য হচ্ছে এই যে, ভগবান হচ্ছেন তাঁর সমস্ত কার্যকলাপে পরম পুরুষ, যখন আমরা দেখি যে ভগবান তাঁর শুদ্ধ ভক্তের মহিমা কীর্তনে আকৃষ্ট হন, তখন আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই। যেহেতু তিনি হচ্ছেন পরম পুরুষ, তাই যেখানেই তাঁর মহিমা কীর্তন হয় সেখানেই তিনি আবির্ভূত হতে পারেন, কেন না এই দুটিই অভিন্ন। শ্রীল নারদ মুনি তাঁর ব্যক্তিগত লাভের জন্য ভগবানের মহিমা কীর্তন করেন না। পক্ষান্তরে, ভগবানের মহিমা কীর্তন ভগবানের থেকে অভিন্ন বলেই তিনি তা কীর্তন করেন। শ্রীল নারদ মুনি তাঁর দিব্য কীর্তনের মাধ্যমে ভগবানের কাছে পৌঁছে যান।

শ্লোক ৩৪

এতদ্ধ্যাতুরচিত্তানাং মাত্রাস্পর্শেচ্ছয়া মুহুঃ।
ভবসিন্ধুপ্লবো দৃষ্টো হরিচর্যানুবর্ণনম্ ॥ ৩৪ ॥

এতৎ—এই; **হি**—অবশ্যই; **আতুর-চিত্তানাম্**—যাদের চিত্ত সর্বদাই উৎকণ্ঠায় আতুর; **মাত্রা**—ইন্দ্রিয় উপভোগের বিষয়; **স্পর্শ**—ইন্দ্রিয়; **ইচ্ছয়া**—ইচ্ছার দ্বারা; **মুহুঃ**—নিরন্তর; **ভবসিন্ধু**—ভবসিন্ধু; **প্লবঃ**-নৌকা; **দৃষ্টঃ**—অভিজ্ঞ; **হরিচর্যা**—পরমেশ্বর ভগবান শ্রীহরির কার্যকলাপ; **অনুবর্ণনম্**—নিরন্তর কীর্তন।

অনুবাদ

আমি ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার মাধ্যমে দেখেছি যে যারা সর্বদাই ইন্দ্রিয়ের দ্বারা বিষয়ভোগ-বাসনায় আতুর, তারা এক অতি উপযুক্ত নৌকায় করে ভবসিন্ধু পার হতে পারে—তা হচ্ছে নিরন্তর পরমেশ্বর ভগবানের অপ্রাকৃত মহিমা কীর্তন করা।

তাৎপর্য

জীব ক্ষণকালের জন্যও নীরব থাকতে পারে না। তাকে সব সময়ই কিছু না কিছু করতে হয়, কোন কিছু সম্বন্ধে চিন্তা করতে হয় অথবা কোন কিছু সম্বন্ধে কথা বলতে হয়। বিষয়াসক্ত মানুষেরা সাধারণত তাদের ইন্দ্রিয়ের তৃপ্তিদায়ক বিষয় সম্বন্ধে চিন্তা

করে অথবা আলোচনা করে। কিন্তু সেই বিষয়গুলি সম্পাদিত হয় বহিরঙ্গা মায়াশক্তির প্রভাবে, এবং ইন্দ্রিয় সুখভোগের উদ্দেশ্যে সম্পাদিত এই সমস্ত কার্যকলাপগুলি কখনও আনন্দ দান করতে পারে না। পক্ষান্তরে, তা উৎকণ্ঠা এবং উদ্বেগে পূর্ণ হয়ে ওঠে। একেই বলা হয় মায়া, অর্থাৎ 'যা নয়'। যা আনন্দ দান করতে পারে না, তাকে আনন্দ লাভের উপায় বলে মনে করা। তাই নারদ মুনি তাঁর ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার মাধ্যমে বলছেন যে, ইন্দ্রিয়-সুখভোগের প্রচেষ্টার নৈরাশ্য জর্জরিত মানুষ যদি যথার্থ আনন্দ উপভোগ করতে চায়, তা হলে তারা যেন নিরন্তর ভগবানের অপ্রাকৃত কার্যকলাপের মহিমা কীর্তন করে। অর্থাৎ, কার্যের পরিবর্তন না করে কেবল উদ্দেশ্যের পরিবর্তন করার মাধ্যমেই মানুষ তাদের ঈপ্সিত বস্তু লাভ করতে পারে। জীবের চিন্তা করার প্রবণতা, অনুভব করার প্রবণতা, ইচ্ছা করার প্রবণতা অথবা কার্য করার প্রবণতা কখনই বন্ধ করা যায় না। কিন্তু কেউ যদি যথার্থ আনন্দ উপভোগ করতে চায়, তা হলে তাকে কেবল বিষয়বস্তুটির পরিবর্তন করতে হবে। মরণশীল মানুষের রাজনীতির কথা আলোচনা না করে ভগবানের প্রবর্তিত রাজনীতির কথা আলোচনা করা যেতে পারে। চিত্রতারকার কার্যকলাপের আলোচনা না করে নিত্য পার্ষদ গোপিকাদের সঙ্গে এবং লক্ষ্মীদেবীর সঙ্গে ভগবানের অপ্রাকৃত লীলাবিলাসের চিন্তায় মনকে নিবদ্ধ করা যেতে পারে। সর্বশক্তিমান পরমেশ্বর ভগবান তাঁর অহৈতুকী কৃপার প্রভাবে এই জগতে অবতরণ করেন এবং এই জগতের মানুষদের মতোই প্রায় কার্যকলাপ করেন, কিন্তু তা সত্ত্বেও তাঁর সমস্ত কার্যকলাপ অসাধারণ এবং অলৌকিক; কেন না তিনি হচ্ছেন সর্বশক্তিমান। বদ্ধ জীবদের মঙ্গল সাধনের জন্য তিনি তা করেন, যাতে তারা পারমার্থিক জীবনের প্রতি আকৃষ্ট হতে পারে। তা করার ফলে বদ্ধ জীবেরা ধীরে ধীরে চিন্ময় স্তরে উন্নীত হতে পারে এবং অনায়াসে সমস্ত দুঃখ-দুর্দশার উৎস এই ভবসমুদ্র পার হয়ে যেতে পারে। সে কথা নারদ মুনির মতো একজন অভিজ্ঞ মহাপুরুষের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে বর্ণিত হয়েছে, এবং আমরা যদি ভগবানের অত্যন্ত প্রিয় ভক্ত সেই মহর্ষির পদাঙ্ক অনুসরণ করতে শুরু করি, তা হলে আমরাও সেই অভিজ্ঞতা লাভ করতে সক্ষম হব।

শ্লোক ৩৫

যমাদিভির্যোগপথৈঃ কামলোভহতো মুহুঃ।
মুকুন্দসেবয়া যদ্বত্তথাত্মাদ্ধা ন শাম্যতি ॥ ৩৫ ॥

যমাদিভিঃ—আত্ম-সংযমের পন্থা অনুশীলনের দ্বারা; **যোগপথৈঃ**—যৌগিক পন্থার দ্বারা; **কাম**—ইন্দ্রিয়-সুখভোগের বাসনা; **লোভ**—ইন্দ্রিয়-তৃপ্তি সাধনের লোভ; **হতঃ**—ব্যাহত; **মুহুঃ**—নিরন্তর; **মুকুন্দ**—পরমেশ্বর ভগবান; **সেবয়া**—সেবার দ্বারা; **যদ্বৎ**—ঠিক যেমন; **তথা**—ঠিক তেমন; **আত্মা**—আত্মা; **অদ্ধা**—সব রকম ব্যবহারিক উদ্দেশ্য সাধনের জন্য; **ন**—করে না; **শাম্যতি**—সন্তুষ্টি।

অনুবাদ

যোগ-প্রণালীর দ্বারা ইন্দ্রিয়-সংযমের অনুশীলনের মাধ্যমে কাম এবং লোভের প্রভাব থেকে মুক্ত হওয়া যেতে পারে, কিন্তু আত্মার আভ্যন্তরীণ পরিতৃপ্তির জন্য তা যথেষ্ট নয়; এই পরিতৃপ্তি কেবল পরমেশ্বর ভগবানের ভক্তিযুক্ত সেবার মাধ্যমেই লাভ করা যায়।

তাৎপর্য

যোগের উদ্দেশ্য হচ্ছে ইন্দ্রিয় সংযম করা। যোগ অনুশীলনের মাধ্যমে আসন, প্রাণায়াম, ধারণা, ধ্যান এবং চরমে ব্রহ্মে লীন হয়ে গিয়ে ইন্দ্রিয়গুলিকে দমন করা যায়। ইন্দ্রিয়গুলির সঙ্গে বিষধর সর্পের তুলনা করা হয়েছে, এবং যোগ প্রণালী হচ্ছে তাদের বশ করার প্রক্রিয়া। কিন্তু নারদ মুনি ভগবদ্ভক্তি অনুশীলনের মাধ্যমে ইন্দ্রিয় দমন করার জন্য আর একটি পন্থা প্রদর্শন করেছেন। তিনি বলেছেন যে তাঁর ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতায় তিনি উপলব্ধি করেছেন যে কৃত্রিমভাবে ইন্দ্রিয় দমন করার পন্থার থেকে পরমেশ্বর ভগবানের ভক্তিযুক্ত সেবার পন্থা অনেক বেশি কার্যকরী এবং ব্যবহারিক। ভগবান মুকুন্দের সেবায় এগুলি অপ্রাকৃতভাবে যুক্ত হয়। তার ফলে তখন আর ইন্দ্রিয়-তৃপ্তি সাধনের প্রচেষ্টায় নিযুক্ত হওয়ার কোন সম্ভাবনা থাকে না। ইন্দ্রিয়গুলি সব সময়ই কিছু না কিছু করতে চায়। কৃত্রিমভাবে তাদের দমন করার প্রচেষ্টা করা হলেও প্রকৃতপক্ষে সেগুলিকে মোটেই দমন করা যায় না, কেন না যখনই ইন্দ্রিয়-সুখভোগের কোন সুযোগ আসে, সর্প-সদৃশ ইন্দ্রিয়গুলি তৎক্ষণাৎ সেই সুযোগের সদ্ব্যবহার করে। ইতিহাসের পাতায় তার বহু দৃষ্টান্ত রয়েছেঃ যেমন বিশ্বামিত্র মুনির মেনকার রূপে আকৃষ্ট হওয়ার ঘটনা। কিন্তু হরিদাস ঠাকুরকে প্রলোভিত করার জন্য মায়াদেবী স্বয়ং মধ্যরাত্রে তাঁর কাছে এসেছিলেন, কিন্তু তিনি সেই মহান ভগবদ্ভক্তকে বিচলিত করতে পারেননি।

অর্থাৎ, ভগবদ্ভক্তি ব্যতীত যোগের পন্থা অথবা শুষ্ক মনোধর্মের পন্থা কখনই কার্যকরী হতে পারে না। সকাম কর্ম, অষ্টাঙ্গ যোগ অথবা মনোধর্মী জ্ঞানের প্রভাব থেকে মুক্ত শুদ্ধ ভগবদ্ভক্তি হচ্ছে আত্মজ্ঞান লাভের সর্বশ্রেষ্ঠ পন্থা। এই শুদ্ধভক্তি হচ্ছে সর্বোত্তম পন্থা এবং যোগ ও জ্ঞান এর থেকে নিকৃষ্টতর পন্থা। ভগবদ্ভক্তি যখন কোন একটি নিকৃষ্ট পন্থার সঙ্গে মিশ্রিত থাকে, তখন তা আর অপ্রাকৃত শুদ্ধভক্তি থাকে না, তখন তাকে মিশ্রা ভক্তি বলা হয়। *শ্রীমদ্ভাগবতের* প্রণেতা শ্রীল ব্যাসদেব ধীরে ধীরে পারমার্থিক জ্ঞান লাভের বিভিন্ন পন্থাগুলি বর্ণনা করবেন।

শ্লোক ৩৬

সর্বং তদিদমাখ্যাতং যৎপৃষ্টোঽহং ত্বয়ানঘ।
জন্মকর্মরহস্যং মে ভবতশ্চাত্মতোষণম্ ॥ ৩৬ ॥

সর্বম্—সমস্ত ; **তৎ**—তা ; **ইদম্**—এই ; **আখ্যাতম্**—বর্ণনা করা হয়েছে ; **যৎ**—যা কিছু ; **পৃষ্টঃ**—জিজ্ঞাসিত হয়ে ; **অহম্**—আমি ; **ত্বয়া**—তোমার দ্বারা ; **অনঘ**—নিষ্পাপ ; **জন্ম**—জন্ম ; **কর্ম**—কর্ম ; **রহস্যম্**—রহস্যজনক ; **মে**—আমার ; **ভবতঃ**—তোমার ; **চ**—এবং ; **আত্ম**—আত্মা ; **তোষণম্**—সন্তুষ্টিবিধানের জন্য।

অনুবাদ

হে ব্যাসদেব, তুমি নিষ্পাপ। তাই তোমার প্রশ্ন অনুসারে আমি আমার জন্ম এবং কার্যকলাপের কথা তোমাকে বললাম। তা তোমার সন্তুষ্টিবিধানেরও সহায়ক হবে।

তাৎপর্য

ব্যাসদেবের প্রশ্নের উত্তরে নারদ মুনি ভগবদ্ভক্তির পন্থার শুরু থেকে চিন্ময় স্তর পর্যন্ত বিশ্লেষণ করেছেন। তিনি বিশ্লেষণ করেছেন কিভাবে সাধু-সঙ্গের প্রভাবে ভগবদ্ভক্তির বীজ তাঁর হৃদয়ে রোপিত হয় এবং কিভাবে সাধুদের বাণী শোনার ফলে ধীরে ধীরে তা বর্ধিত হয়। এই শ্রবণের ফলে জড় বিষয়ের প্রতি তাঁর এতই অনাসক্তি আসে যে তিনি তাঁর একমাত্র আশ্রয় তাঁর মায়ের মৃত্যু সংবাদকে ভগবানের আশীর্বাদরূপে গ্রহণ করেছিলেন, এবং তৎক্ষণাৎ ভগবানকে পাওয়ার উদ্দেশ্যে গৃহত্যাগ করেছিলেন। তাই তাঁর ভগবানকে দর্শন করার ঐকান্তিক বাসনা চরিতার্থ হয়, যদিও জড় চক্ষু দিয়ে কারোর পক্ষেই ভগবানকে দর্শন করা সম্ভব নয়। তিনি আরও বিশ্লেষণ করেছেন যে, শুদ্ধ ভগবদ্ভক্তি অনুশীলন করার ফলে তিনি কি ভাবে কর্মফলের বন্ধন থেকে মুক্ত হয়েছিলেন এবং কিভাবে তাঁর জড় দেহ চিন্ময় দেহে রূপান্তরিত হয়েছিল। চিন্ময় শরীরেই কেবল ভগবানের শুদ্ধ ভক্তদেরই রয়েছে। নারদ মুনি ব্যক্তিগতভাবে সব রকমের অলৌকিক চিন্ময় অভিজ্ঞতা অর্জন করেছিলেন, এবং তাই তাঁর মতো একজন মহাপুরুষের কাছ থেকে ভগবদ্ভক্তি অনুশীলনের ফল সম্বন্ধে কিছুটা ধারণা আমরা করতে পারি, যা বেদে স্পষ্টভাবে বর্ণিত হয়নি। বেদ এবং উপনিষদে শুদ্ধ ভগবদ্ভক্তি সম্বন্ধে পরোক্ষভাবে ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে। সেখানে সরাসরিভাবে কিছুই বিশ্লেষণ করা হয়নি এবং তাই শ্রীমদ্ভাগবত হচ্ছে বৈদিক কল্পবৃক্ষের সুপক্ব ফল।

শ্লোক ৩৭

সূত উবাচ

এবং সম্ভাষ্য ভগবান্নারদো বাসবীসুতম্।
আমন্ত্র্য বীণাং রণয়ন্ যযৌ যাদৃচ্ছিকো মুনিঃ ॥ ৩৭ ॥

সূতঃ—সূত গোস্বামী ; **উবাচ**—বললেন ; **এবম্**—এইভাবে ; **সম্ভাষ্য**—সম্ভাষণ করে ; **ভগবান্**—দিব্য শক্তিসম্পন্ন ; **নারদঃ**—নারদ মুনি ; **বাসবী-সুতম্**—বাসবী

(সত্যবতী) তনয় ব্যাসদেবকে; **আমন্ত্র্য**—আমন্ত্রণ জানিয়ে; **বীণাম্**—বীণা; **রণয়ন্**—বাজিয়ে; **যযৌ**—প্রস্থান করলেন; **যাদৃচ্ছিকঃ**—যেখানে ইচ্ছা; **মুনিঃ**—মুনি।

অনুবাদ

সূত গোস্বামী বললেন ঃ এইভাবে বাসবী-সুত ব্যাসদেবকে নির্দেশ দিয়ে শ্রীল নারদ মুনি তাঁর কাছ থেকে বিদায় নিলেন, এবং তাঁর বীণা বাজাতে বাজাতে তিনি তাঁর ইচ্ছাক্রমে বিচরণ করার জন্য সেখান থেকে প্রস্থান করলেন।

তাৎপর্য

প্রতিটি জীবই পূর্ণ স্বাধীনতা লাভের আকাঙ্ক্ষী, কেন না সেটিই হচ্ছে তার স্বরূপগত প্রকৃতি। এই স্বাধীনতা কেবল চিন্ময় ভগবৎ-সেবার মাধ্যমেই লাভ করা যায়। ভগবানের বহিরঙ্গা শক্তির দ্বারা মোহিত হয়ে সকলেই মনে করে যে সে মুক্ত, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সে প্রকৃতির নিয়মের বন্ধনে আবদ্ধ। বদ্ধ জীব এমন কি এই পৃথিবীর এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় স্বাধীনভাবে বিচরণ করতে পারে না, সুতরাং অন্য গ্রহে যাওয়ার তো কোন প্রশ্নই ওঠে না। কিন্তু নারদ মুনির মতো মুক্ত জীব, যিনি সর্বদাই ভগবানের মহিমা কীর্তনে মগ্ন, তিনি কেবল এই পৃথিবীতেই নয়, এই ব্রহ্মাণ্ডের যে কোনও স্থানে যেতে পারেন, এমন কি চিজ্জগতেরও যে কোনও স্থানে যেতে পারেন। সুতরাং, তিনি যে কত স্বাধীন তা আমরা সহজেই অনুমান করতে পারি। তিনি প্রায় ভগবানেরই মতো স্বাধীন। তাঁর ভ্রমণের কোন হেতু নেই অথবা বাধ্যবাধকতা নেই, এবং তাঁর এই স্বাধীন বিচরণে কেউ বাধা দিতে পারে না। তেমনই, ভগবদ্ভক্তির চিন্ময় পদ্ধতিও স্বাধীন। সব রকমের আচার-অনুষ্ঠানগুলি অনুশীলন করা সত্ত্বেও কোন বিশেষ ব্যক্তির মধ্যে ভগবদ্ভক্তির বিকাশ নাও হতে পারে। তেমনই, ভগবদ্ভক্তের সঙ্গও মুক্ত। সৌভাগ্যক্রমে কেউ তা লাভ করতে পারে, আবার হাজার হাজার বছরের প্রচেষ্টার পরেও কেউ তা লাভ নাও করতে পারে। তাই ভগবদ্ভক্তির সর্বক্ষেত্রেই স্বাধীনতা হচ্ছে মূলমন্ত্র। স্বাধীনতা ছাড়া ভগবদ্ভক্তি অনুশীলন করা যায় না। ভগবানের কাছে আত্মনিবেদন করার অর্থ এই নয় যে ভক্ত সর্বতোভাবে পরাধীন হয়ে যায়। সদ্গুরুর মাধ্যমে ভগবানের কাছে আত্মসমর্পণ করার উদ্দেশ্য হচ্ছে সর্বতোভাবে স্বাধীনতা লাভ করা।

শ্লোক ৩৮

অহো দেবর্ষির্ধন্যোঽয়ং যৎকীর্তিং শার্ঙ্গধন্বনঃ।
গায়ন্মাদ্যন্নিদং তন্ত্র্যা রময়ত্যাতুরং জগৎ ॥ ৩৮ ॥

অহো—সর্বতোভাবে জয়যুক্ত হোক; **দেবর্ষিঃ**—দেবর্ষি; **ধন্যঃ**—ধন্য; **অয়ম্-যৎ**—যিনি; **কীর্তিম্**—কীর্তি; **শার্ঙ্গধন্বনঃ**—পরমেশ্বর ভগবানের; **গায়ন**—গান করে;

মাদ্যন্—আনন্দ দান করে; **ইদম্**—এই; **তন্ত্র্যা**—যন্ত্রের দ্বারা; **রময়তি**—আনন্দ আস্বাদন করে; **আতুরম্**—দুঃখ-দুর্দশাক্লিষ্ট; **জগৎ**—জগৎ।

অনুবাদ

শ্রীল নারদ মুনির সাফল্য জয়যুক্ত হোক, কেন না তিনি পরমেশ্বর ভগবানের মহিমা কীর্তন করেন, এবং তা করে তিনি আনন্দ আস্বাদন করেন এবং দুঃখ-দুর্দশাক্লিষ্ট জগতকে আনন্দ দান করেন।

তাৎপর্য

শ্রীনারদ মুনি তাঁর বীণা বাজিয়ে পরমেশ্বর ভগবানের মহিমা কীর্তন করে সমস্ত জগতের দুর্দশাক্লিষ্ট জীবদের আনন্দ দান করেন। এই জগতে কেউই সুখী নয়, এবং সুখ বলে যা অনুভব হয় তা হচ্ছে মায়ার মোহ। ভগবানের মায়াশক্তি এতই প্রবল যে বিষ্ঠাভোজী শূকর পর্যন্ত মনে করে যে সে খুব সুখে আছে। এই জড় জগতে কেউই যথাযথভাবে সুখী হতে পারে না। দুর্দশাগ্রস্ত জীবদের জ্ঞানালোক প্রদান করার জন্য নারদ মুনি সর্বত্র বিচরণ করেন। তাঁর উদ্দেশ্য হচ্ছে দুর্দশাক্লিষ্ট জীবদের ভগবানের কাছে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়া। সেই মহর্ষির পদাঙ্ক অনুসরণ করে সেটি সম্পাদন করাই হচ্ছে প্রকৃত ভগবদ্ভক্তের উদ্দেশ্য।

ইতি—"নারদ মুনি এবং ব্যাসদেবের কথোপকথন" নামক শ্রীমদ্ভাগবতের প্রথম স্কন্ধের ষষ্ঠ অধ্যায়ের ভক্তিবেদান্ত তাৎপর্য।

সপ্তম অধ্যায়

দ্রোণপুত্র দণ্ডিত

শ্লোক ১

শৌনক উবাচ

নির্গতে নারদে সুত ভগবান্ বাদরায়ণঃ ।
শ্রুতবাংস্তদভিপ্রেতং ততঃ কিমকরোদ্বিভুঃ ॥ ১ ॥

শব্দার্থ

শৌনক—শ্রীশৌনক; **উবাচ**—বললেন; **নির্গতে**—চলে গেলে; **নারদে**—নারদ মুনি; **সুত**—হে সুত; **ভগবান্**—দিব্য শক্তিসম্পন্ন; **বাদরায়ণঃ**—ব্যাসদেব; **শ্রুতবান্**—শুনেছিলেন; **তৎ**—তাঁর; **অভিপ্রেতম্**—মনোবাঞ্ছা; **ততঃ**—তারপর; **কিম্**—কি; **অকরোৎ**—করেছিলেন; **বিভুঃ**—মহৎ।

অনুবাদ

শৌনক ঋষি জিজ্ঞাসা করলেনঃ হে সূত গোস্বামী, অত্যন্ত মহৎ এবং দিব্য গুণসম্পন্ন ব্যাসদেব শ্রীনারদমুনির কাছ থেকে সব কিছু শুনেছিলেন। সুতরাং নারদ মুনি চলে যাওয়ার পর ব্যাসদেব কি করলেন?

তাৎপর্য

শ্রীমদ্ভাগবতের এই অধ্যায়ে বর্ণনা করা হয়েছে, পরীক্ষিৎ মহারাজ যখন তাঁর মাতৃগর্ভে ছিলেন তখন কি রকম অলৌকিকভাবে তাঁর জীবন রক্ষা হয়। দ্রোণাচার্যের পুত্র অশ্বত্থামা দ্রৌপদীর পাঁচ পুত্রকে নিদ্রিত অবস্থায় হত্যা করে এবং সে জন্য অর্জুন তাকে দণ্ডদান করেন। *শ্রীমদ্ভাগবত* মহাপুরাণ রচনা করার পূর্বে শ্রীল ব্যাসদেব ধ্যানে তা জানতে পেরেছিলেন।

শ্লোক ২

সূত উবাচ

ব্রহ্মনদ্যাং সরস্বত্যামাশ্রমঃ পশ্চিমে তটে ।
শম্যাপ্রাস ইতি প্রোক্ত ঋষীণাং সত্রবর্ধনঃ ॥ ২ ॥

সূতঃ—শ্রীসূত; **উবাচ**—বলেছিলেন; **ব্রহ্মনদ্যাম্**—বেদ, ব্রাহ্মণ, সাধু এবং ভগবানের সঙ্গে অত্যন্ত অন্তরঙ্গভাবে সম্পর্কিত নদী; **সরস্বত্যাম্**—সরস্বতী; **আশ্রমঃ**—আশ্রম; **পশ্চিমে**—পশ্চিম দিকে; **তটে**—তটে; **শম্যাপ্রাসঃ**—শম্যাপ্রাস নামক স্থানে; **ইতি**—এইভাবে; **প্রোক্তঃ**—উক্ত; **ঋষীণাম্**—ঋষিদের; **সত্রবর্ধনঃ**—কার্যে আনন্দ বর্ধনকারী।

অনুবাদ

শ্রীসূত বললেন ঃ বেদের সঙ্গে অতি অন্তরঙ্গভাবে সম্পর্কিত সরস্বতী নদীর পশ্চিম তটে ঋষিদের চিন্ময় কার্যকলাপের আনন্দ বর্ধনকারী শম্যাপ্রাস নামক স্থানে একটি আশ্রম আছে।

তাৎপর্য

পারমার্থিক উন্নতি সাধনের জন্য উপযুক্ত স্থান এবং পরিবেশ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সরস্বতী নদীর পশ্চিম তট সেজন্য বিশেষভাবে উপযুক্ত। সেখানে শম্যাপ্রাস নামক স্থানে শ্রীল ব্যাসদেবের আশ্রম। শ্রীল ব্যাসদেব ছিলেন গৃহস্থ, তবুও তাঁর গৃহকে আশ্রম বলা হয়েছে। আশ্রম হচ্ছে সেই স্থান যেখানে পারমার্থিক প্রগতি সাধনই হচ্ছে মুখ্য উদ্দেশ্য। এই স্থানটি গৃহস্থ না সন্ন্যাসীর সেটি বিচার্য নয়। বর্ণাশ্রম প্রথা এমনভাবে পরিকল্পিত হয়েছে যে জীবনের প্রতিটি স্তরকেই এখানে আশ্রম বলা হয়েছে। অর্থাৎ, সেই সমাজ-ব্যবস্থায় সকলেরই উদ্দেশ্য হচ্ছে পারমার্থিক উন্নতি সাধন করা। সেই সমাজ-ব্যবস্থায় ব্রহ্মচারী, গৃহস্থ, বানপ্রস্থ এবং সন্ন্যাসী, সকলের জীবনেরই উদ্দেশ্য একটি—পরমেশ্বর ভগবানকে জানা। সুতরাং সেই সমাজ-ব্যবস্থায় কেউ কারো থেকে নগণ্য নয়। বিভিন্ন আশ্রমের পার্থক্যগুলি ত্যাগের মাত্রা অনুসারে আনুষ্ঠানিক পার্থক্য মাত্র। সেই সমাজব্যবস্থায় সন্ন্যাসীদের সব চাইতে শ্রদ্ধার দৃষ্টিতে দর্শন করা হয় তাদের ত্যাগের জন্য।

শ্লোক ৩

তস্মিন্ স্ব আশ্রমে ব্যাসো বদরীষণ্ডমণ্ডিতে।
আসীনোঽপ উপস্পৃশ্য প্রণিদধ্যৌ মনঃ স্বয়ম্ ॥ ৩ ॥

তস্মিন্—সেই (আশ্রম); **স্বে**—নিজস্ব; **আশ্রমে**—আশ্রমে; **ব্যাসঃ**—ব্যাসদেব; **বদরীষণ্ড**—বদরী বৃক্ষ; **মণ্ডিতে**—মণ্ডিত; **আসীনঃ**—উপবেশন করে; **অপঃ উপস্পৃশ্য**—জল স্পর্শ করে; **প্রণিদধ্যৌ**—একাগ্র করেছিলেন; **মনঃ**—মন; **স্বয়ম্**—স্বয়ং।

অনুবাদ

সেই স্থানে, শ্রীল ব্যাসদেব বদরী বৃক্ষ পরিবৃত তাঁর আশ্রমে উপবেশন করলেন এবং জল স্পর্শ করে তাঁর চিত্তকে পবিত্র করার জন্য ধ্যানস্থ হলেন।

তাৎপর্য

তাঁর গুরুদেব শ্রীল নারদ মুনির নির্দেশ অনুসারে ব্যাসদেব পারমার্থিক কার্য সম্পাদনের উপযুক্ত সেই স্থানে তাঁর মনকে একাগ্র করলেন।

শ্লোক ৪

ভক্তিযোগেন মনসি সম্যক্ প্রণিহিতেঽমলে।
অপশ্যৎপুরুষং পূর্ণং মায়াং চ তদপাশ্রয়ম্ ॥ ৪ ॥

ভক্তি—ভগবানের প্রেমময়ী সেবা; **যোগেন**—যুক্ত হওয়ার পন্থার দ্বারা; **মনসি**—মনে; **সম্যক্**—পূর্ণরূপে; **প্রণিহিতে**—যুক্ত; **অমলে**—জড় কলুষ থেকে মুক্ত; **অপশ্যৎ**—দর্শন করেছিলেন; **পুরুষম্**—পরমেশ্বর ভগবানকে; **পূর্ণম্**—পূর্ণ; **মায়াম্**—শক্তি; **চ**—ও; **তৎ**—তাঁর; **অপাশ্রয়ম্**—সম্পূর্ণরূপে বশীভূত।

অনুবাদ

এইভাবে তাঁর মনকে একাগ্র করে জড় কলুষ থেকে সর্বতোভাবে মুক্ত হয়ে তিনি যখন পূর্ণরূপে ভক্তিযোগে যুক্ত হয়েছিলেন, তখন তিনি পরমেশ্বর ভগবানকে তাঁর মায়াশক্তি সহ দর্শন করেছিলেন, যে মায়া পূর্ণরূপে তাঁর বশীভূত ছিল।

তাৎপর্য

ভক্তিযোগে যুক্ত হওয়ার ফলেই কেবল পরম-তত্ত্বকে পূর্ণরূপে দর্শন করা সম্ভব হয়। সে কথা *ভগবদ্গীতায়* বর্ণনা করা হয়েছে। ভগবদ্ভক্তির মাধ্যমেই কেবল পরম-সত্য পরমেশ্বর ভগবানকে পূর্ণরূপে জানা যায় এবং এই পূর্ণ জ্ঞানের মাধ্যমেই কেবল ভগবানের রাজ্যে প্রবেশ করা যায়। পরম তত্ত্বের আংশিক উপলব্ধি নির্বিশেষ ব্রহ্মজ্ঞান অথবা সাক্ষীরূপে জীব-হৃদয়ে বিরাজমান পরমাত্মাকে উপলব্ধি করার মাধ্যমে ভগবদ্ধামে প্রবেশ করা যায় না। শ্রীনারদ মুনি শ্রীল ব্যাসদেবকে উপদেশ দিয়েছিলেন পরমেশ্বর ভগবানের অপ্রাকৃত কার্যকলাপের ধ্যানে মগ্ন হতে। শ্রীল ব্যাসদেব ব্রহ্মজ্যোতিতে মনোনিবেশ করেননি, কেন না তা পরম দর্শন নয়। পরম দর্শন হচ্ছে ভগবৎ-দর্শন, যা *ভগবদ্গীতায়* প্রতিপন্ন হয়েছে: *'বাসুদেবঃ সর্বমিতি'* (৭/১৯)। উপনিষদেও প্রতিপন্ন হয়েছে যে বাসুদেব, পরমেশ্বর ভগবান ব্রহ্মজ্যোতির (*হিরণ্ময়েন পাত্রেণ*) আবরণের দ্বারা আচ্ছাদিত, এবং ভগবানের কৃপায় যখন সেই আবরণ উন্মোচিত হয় তখন পরমেশ্বর ভগবানের প্রকৃত রূপ দর্শন করা যায়। পরম-তত্ত্বকে এখানে পুরুষ বলে বর্ণনা করা হয়েছে। পরমেশ্বর ভগবান সম্বন্ধে বিভিন্ন বৈদিক শাস্ত্রে উল্লেখ করা হয়েছে, এবং *ভগবদ্গীতায়* বর্ণনা করা হয়েছে যে সেই পুরুষই হচ্ছেন অনাদি এবং আদি পুরুষ। পরমেশ্বর ভগবান হচ্ছেন পূর্ণ পুরুষোত্তম। ভগবানের বিভিন্ন শক্তি রয়েছে, তার মধ্যে অন্তরঙ্গা, বহিরঙ্গা এবং তটস্থা শক্তিই

প্রধান। এখানে ভগবানের যে শক্তির কথা বলা হয়েছে তা তাঁর বহিরঙ্গা শক্তি, যা তাঁর কার্যকলাপের বর্ণনা থেকে স্পষ্টভাবে বোঝা যাবে। চন্দ্রের সঙ্গে যেমন জ্যোৎস্না বিরাজ করে, তেমনই পরম পুরুষের সঙ্গে তাঁর অন্তরঙ্গা শক্তি বিরাজ করেন। বহিরঙ্গা শক্তির সঙ্গে অন্ধকারের তুলনা করা হয়েছে, কেন না তা জীবকে অজ্ঞানের অন্ধকারে আচ্ছন্ন করে রাখে। 'অপাশ্রয়ম্' শব্দটির মাধ্যমে ইঙ্গিত করা হচ্ছে যে ভগবানের এই শক্তি পূর্ণরূপে ভগবানের নিয়ন্ত্রণাধীন। অন্তরঙ্গা শক্তি বা পরা শক্তিকেও মায়া বলা হয়, কিন্তু তা হচ্ছে যোগমায়া, অথবা যে শক্তি চিজ্জগতে প্রকাশিত হয়। কেউ যখন এই অন্তরঙ্গা শক্তির আশ্রয়ে থাকেন, তখন জড়া প্রকৃতির অজ্ঞানান্ধকার দূর হয়ে যায়। এমন কি যাঁরা আত্মারাম, তাঁরাও এই যোগমায়া অথবা অন্তরঙ্গা শক্তির আশ্রয় গ্রহণ করেন। ভক্তিযোগ হচ্ছে অন্তরঙ্গা শক্তির ক্রিয়া; তাই সেখানে বহিরঙ্গা শক্তি বা জড়া শক্তির কোন স্থান নেই, ঠিক যেমন চিন্ময় জ্ঞানের আলোকের সামনে অন্ধকারের কোন স্থান নেই। নির্বিশেষ ব্রহ্ম-সাযুজ্যের মাধ্যমে যে দিব্য আনন্দ অনুভব করা যায়, এই অন্তরঙ্গা শক্তি তার থেকে অনেক শ্রেয়। *ভগবদ্গীতায়* বলা হয়েছে যে, নির্বিশেষ ব্রহ্মজ্যোতিও পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের প্রকাশ। পরম পুরুষ স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ ছাড়া আর কেউ হতে পারেন না, যা পরবর্তী শ্লোকে বিশ্লেষণ করা হবে।

শ্লোক ৫

যয়া সম্মোহিতো জীব আত্মানং ত্রিগুণাত্মকম্।
পরোঽপি মনুতেঽনর্থং তৎকৃতং চাভিপদ্যতে ॥ ৫ ॥

যয়া—যার দ্বারা; **সম্মোহিতঃ**—সম্মোহিত; **জীবঃ**—জীব; **আত্মানম্**—আত্মা; **ত্রিগুণাত্মকম্**—প্রকৃতির তিনটি গুণের দ্বারা বদ্ধ, অথবা জড় পদার্থ; **পরঃ**—পরা; **অপি**—সত্ত্বেও; **মনুতে**—বিনা বিচারে স্বীকার করে নেওয়া; **অনর্থম্**—অনর্থ; **তৎ**—তার দ্বারা; **কৃতম্ চ**—প্রতিক্রিয়া; **অভিপদ্যতে**—ভোগ করা হয়।

অনুবাদ

এই বহিরঙ্গা শক্তির প্রভাবে জীব জড়া প্রকৃতির তিনটি গুণের অতীত হওয়া সত্ত্বেও নিজেকে জড়া প্রকৃতি সম্ভূত বলে মনে করে এবং তার ফলে জড় জগতের দুঃখ ভোগ করে।

তাৎপর্য

বিষয়াসক্ত জীবের দুঃখ ভোগের মূল কারণ এখানে উল্লেখ করা হয়েছে এবং পরম পুরুষার্থ লাভের জন্য কিভাবে সেই দুঃখের নিবৃত্তি করা যায় তার পন্থাও বর্ণিত হয়েছে। তা সবই এই শ্লোকটিতে উল্লেখ করা হয়েছে। জীব তার স্বরূপে জড় জগতের বন্ধনের অতীত, কিন্তু এখন সে বহিরঙ্গা শক্তির প্রভাবে আবদ্ধ হয়ে পড়েছে

এবং তাই সে নিজেকে জড়া প্রকৃতি সম্ভূত বলে মনে করছে। এইভাবে জড়া প্রকৃতির সংস্পর্শে আসার ফলে শুদ্ধ চিন্ময় আত্মা জড়া প্রকৃতির গুণের প্রভাবে ত্রিতাপ দুঃখ ভোগ করে। জীব ভ্রান্তিবশত নিজেকে জড় পদার্থ বলে মনে করে। অর্থাৎ, জড়া প্রকৃতির প্রভাবে তার বর্তমান বিকৃত চিন্তা, অনুভূতি এবং ইচ্ছা তার স্বাভাবিক অবস্থা নয়। তার স্বাভাবিক চিন্তা, অনুভূতি এবং ইচ্ছা রয়েছে। তার স্বরূপে জীব চিন্তা, ইচ্ছা এবং অনুভূতিরহিত নয়। ভগবদ্গীতাতে বর্ণিত হয়েছে যে, বদ্ধ অবস্থায় জীবের প্রকৃত জ্ঞান অজ্ঞানের দ্বারা আচ্ছাদিত থাকে। যে মতবাদ প্রচার করে যে জীব নির্বিশেষ ব্রহ্ম তা এখানে ভ্রান্ত বলে প্রতিপন্ন হয়েছে। তা কখনই সম্ভব নয়। কেন না তার স্বাভাবিক মুক্ত অবস্থায় জীবের চিন্তা করার ক্ষমতা রয়েছে। জীবের বর্তমান বদ্ধ অবস্থার কারণ বহিরঙ্গা শক্তির প্রভাব, যার অর্থ হচ্ছে মায়াশক্তি তাকে পরিচালিত করছে এবং পরমেশ্বর ভগবান পৃথকভাবে দূরে রয়েছেন। ভগবান চান না যে জীব বহিরঙ্গা শক্তির দ্বারা সম্মোহিত হয়ে থাকুক। বহিরঙ্গা শক্তি বা মায়া সে কথা জানেন, কিন্তু তবুও তিনি বিস্মৃত আত্মাদের তাঁর বিভ্রান্তিকর প্রভাবের দ্বারা সম্মোহিত করে রাখার অপ্রশংসনীয় কর্তব্য গ্রহণ করেন। ভগবান মায়া শক্তির প্রভাবকে হস্তক্ষেপ করেন না, কেন না বদ্ধ জীবের চেতনার সংশোধনের জন্য মায়ার এই প্রভাবের প্রয়োজন রয়েছে। স্নেহপরায়ণ পিতা যেমন চান না যে অন্য কেউ তাঁর সন্তানকে তিরস্কার করুক, তবুও তিনি তাঁর অবাধ্য সন্তানদের বশে আনার জন্য কঠোর শিক্ষকের তত্ত্বাবধানে রাখেন। পরম স্নেহময় পরম পিতাও তেমনই চান যে সমস্ত বদ্ধ জীব যেন মায়ার দুঃখময় প্রভাব থেকে মুক্ত হতে পারে। রাজা তাঁর অবাধ্য প্রজাদের কারাগারে আবদ্ধ করে রাখেন, কিন্তু কখনও কখনও কয়েদিদের দুঃখ-নিবৃত্তির জন্য রাজা ব্যক্তিগতভাবে কারাগারে গিয়ে তাদের বিকৃত মনোবৃত্তির পরিবর্তন করার জন্য উপদেশ দেন, এবং তাঁর অনুরোধ অনুসারে আচরণ করার ফলে কয়েদিরা তৎক্ষণাৎ কারামুক্ত হয়। তেমনই, পরমেশ্বর ভগবান তাঁর ধাম থেকে এই জড় জগতে অবতরণ করেন এবং *ভগবদ্গীতা* আদি শাস্ত্রের মাধ্যমে উপদেশ দেন যে যদিও এই মায়াশক্তির প্রভাব অতিক্রম করা অত্যন্ত কঠিন, তবুও তাঁর শরণাগত হওয়ার ফলে অনায়াসে এই দুরতিক্রম্য মায়াকে অতিক্রম করা যায়। এই শরণাগতির পন্থাই হচ্ছে মায়ার সম্মোহিনী প্রভাব থেকে মুক্ত হওয়ার পন্থা। এই শরণাগতি লাভ করা যায় সাধু সঙ্গের প্রভাবে। ভগবান তাই নির্দেশ দিয়েছেন যে ভগবত্তত্ত্বজ্ঞানী সাধুদের বাণীর প্রভাবে মানুষ তার অপ্রাকৃত সেবায় যুক্ত হতে পারে। তখন বদ্ধ জীব ভগবানের প্রতি শ্রদ্ধা, ভক্তি এবং আসক্তির স্তরে উন্নীত হয়। এই পন্থায় পূর্ণতা লাভ করা যায় শরণাগতির মাধ্যমে। এখানে ব্যাসদেবরূপে তাঁর অবতরণে ভগবান সেই নির্দেশই দিয়েছেন। অর্থাৎ, বহিরঙ্গা শক্তির মাধ্যমে দণ্ডদান করে এবং স্বয়ং সদ্গুরুরূপে অন্তরে এবং বাহিরে পথ প্রদর্শন করে ভগবান বদ্ধ জীবদের উদ্ধার করেন। প্রতিটি জীবের হৃদয়ে পরমাত্মারূপে বিরাজ করে তিনি গুরু হন, এবং বাহিরে

সাধু, শাস্ত্র এবং দীক্ষাগুরুরূপে তিনি গুরু হন। তা পরবর্তী শ্লোকে আরও বিশদভাবে বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

বেদের কেন উপনিষদে দেবতাদের নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা সম্বন্ধে বর্ণনা প্রসঙ্গে মায়াশক্তির অধ্যক্ষতা প্রতিপন্ন হয়েছে। এখানেও স্পষ্টভাবে বর্ণনা করা হয়েছে যে জীব ব্যক্তিগতভাবে বহিরঙ্গা শক্তির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। জীব ভিন্নভাবে অধিষ্ঠিত। কিন্তু *শ্রীমদ্ভাগবতের* এই শ্লোকটিতে স্পষ্টভাবে বর্ণনা করা হয়েছে যে সেই বহিরঙ্গা শক্তি পরমেশ্বর ভগবানের অধীন তত্ত্ব। মায়াও পূর্ণ পুরুষোত্তম ভগবানের সমীপবর্তী হতে পারেন না। মায়া কেবল জীবের উপর ক্রিয়া করতে পারেন। তাই যে সমস্ত ভ্রান্ত মতবাদ প্রচার করে যে পরমেশ্বর ভগবান মায়ার দ্বারা প্রভাবিত হয়ে জীব হন, তা অলীক কল্পনা ছাড়া আর কিছুই নয়। জীব এবং ভগবান যদি সমপর্যায়ভুক্ত হন, তা হলে ব্যাসদেব অবশ্যই তা দর্শন করতে পারতেন, এবং বদ্ধ জীবের জড়-জাগতিক দুঃখ ভোগ করার কোন প্রশ্নই উঠত না, কেন না পরম পুরুষ পূর্ণ জ্ঞানময়। অবিবেকী অদ্বৈতবাদীরা নানা রকম জল্পনা-কল্পনার মাধ্যমে ভগবান এবং জীবকে সমপর্যায়ভুক্ত করতে চায়। ভগবান এবং জীব যদি সমপর্যায়ভুক্ত হতেন, তা হলে শ্রীল শুকদেব গোস্বামীর ভগবানের অপ্রাকৃত লীলা বর্ণনা করার কোন প্রয়োজন ছিল না, কেন না অদ্বৈতবাদীদের মতানুসারে তা তো মায়াশক্তির প্রভাবে জড় কার্যকলাপ ছাড়া আর কিছুই নয়।

শ্রীমদ্ভাগবত হচ্ছে দুর্দশাক্লিষ্ট মানুষের মায়ার কবল থেকে উদ্ধার পাওয়ার সর্বাপেক্ষা মঙ্গলময় পন্থা। তাই শ্রীল ব্যাসদেব সর্বপ্রথমে বদ্ধ জীবের যথার্থ রোগ নির্ণয় করেছেন, যা হচ্ছে বহিরঙ্গা শক্তির দ্বারা তার সম্মোহন। তিনি দেখেছিলেন যে পূর্ণ পুরুষোত্তম ভগবানের চেয়ে মায়াশক্তি বহু দূরে অবস্থিত, এবং তিনি বদ্ধ জীবের রোগগ্রস্ত অবস্থা এবং তাদের রোগের কারণ দর্শন করেছিলেন। সেই রোগ নিরাময়ের উপায় পরবর্তী শ্লোকে বর্ণনা করা হয়েছে। পরমেশ্বর ভগবান এবং জীব নিঃসন্দেহে গুণগতভাবে এক, কিন্তু ভগবান হচ্ছেন মায়াশক্তির অধীশ্বর, আর জীব হচ্ছে সেই মায়াশক্তির অধীন। এইভাবে জীব এবং ভগবান এক এবং ভিন্ন। এখানে আর একটি বিষয়েও স্পষ্টভাবে বোঝানো হয়েছেঃ ভগবানের সঙ্গে জীব নিত্য চিন্ময় সম্পর্কে সম্পর্কিত, তা না হলে ভগবান বদ্ধ জীবদের মায়ার কবল থেকে মুক্ত করার কষ্ট স্বীকার করতেন না। তেমনই, জীবেরও কর্তব্য হচ্ছে ভগবানের প্রতি তার স্বাভাবিক প্রেম এবং শ্রদ্ধা পুনর্জাগরিত করা, এবং সেটিই হচ্ছে জীবের সর্বোচ্চ সিদ্ধি। *শ্রীমদ্ভাগবত* বদ্ধ জীবদের সেই চরম লক্ষ্য সাধনে পরিচালিত করে।

শ্লোক ৬

অনর্থোপশমং সাক্ষাদ্ভক্তিযোগমধোক্ষজে।
লোকস্যাজানতো বিদ্বাংশ্চক্রে সাত্বতসংহিতাম্ ॥ ৬ ॥

অনর্থ—যা অর্থহীন ; **উপশমম্**—উপশম ; **সাক্ষাৎ**—প্রত্যক্ষভাবে ; **ভক্তি-যোগম্**—ভক্তিযোগ ; **অধোক্ষজে**—ইন্দ্রিয়াতীত ; **লোকস্য**—জনসাধারণের ; **অজানতঃ**—যারা অজ্ঞান ; **বিদ্বান্**—বিদ্বান ; **চক্রে**—সংকলন করেছেন ; **সাত্বত**—পরম সত্য সম্বন্ধীয় ; **সংহিতাম্**—বৈদিক শাস্ত্র।

অনুবাদ

জীবের জাগতিক দুঃখ-দুর্দশা, যা হচ্ছে তার কাছে অনর্থ, ভক্তিযোগের মাধ্যমে অচিরেই তার উপশম হয়। কিন্তু সাধারণ মানুষ তা জানে না, এবং তাই মহাজ্ঞানী ব্যাসদেব পরম-তত্ত্ব সমন্বিত এই সাত্বত সংহিতা সংকলন করেছেন।

তাৎপর্য

শ্রীল ব্যাসদেব পূর্ণ পুরুষোত্তম ভগবানকে দর্শন করেছিলেন। তা থেকে বোঝা যায় যে তিনি পরমেশ্বর ভগবানকে এবং তাঁর সঙ্গে তাঁর বিভিন্ন অংশেও দর্শন করেছিলেন। তাই তিনি তাঁর বিভিন্ন শক্তি, যথা অন্তরঙ্গা শক্তি, বহিরঙ্গা শক্তি এবং তটস্থা শক্তিকেও দর্শন করেছিলেন। তিনি ভগবানের বিভিন্ন অংশ এবং অংশের অংশ কলা অর্থাৎ ভগবানের বিভিন্ন অবতারদেরও দর্শন করেছিলেন, এবং তিনি বিশেষভাবে মায়াশক্তির দ্বারা আচ্ছন্ন বদ্ধ জীবদের দুঃখ-দুর্দশাও দর্শন করেছিলেন। এবং সবশেষে তিনি জীবের বদ্ধ অবস্থার নিরাময়ের উপায়স্বরূপ ভগবদ্ভক্তির পন্থা দর্শন করেছিলেন। এটি হচ্ছে এক মহান পারমার্থিক বিজ্ঞান, যার শুরু হয় ভগবানের নাম, যশ, মহিমা ইত্যাদি শ্রবণ এবং কীর্তনের মাধ্যমে। সুপ্ত ভগবৎ-প্রেমের পুনর্বিকাশ শ্রবণ এবং কীর্তনের যান্ত্রিক পদ্ধতির উপর নির্ভর করে না, তা সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করে ভগবানের অহৈতুকী কৃপার উপর। ভগবান যখন ভক্তের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় সম্পূর্ণরূপে প্রীত হন, তখন তিনি তাকে তাঁর প্রেমময়ী সেবা দান করতে পারেন। তবে শ্রবণ, কীর্তনাদি নির্দেশিত পন্থায় জড় জগতের অবাঞ্ছিত দুঃখ-দুর্দশার তৎক্ষণাৎ নিবৃত্তি হয়। এই জড় আসক্তির নিবৃত্তি চিন্ময় জ্ঞানের বিকাশের অপেক্ষা করে না। পক্ষান্তরে, জ্ঞান পরম-তত্ত্ব উপলব্ধির ভক্তিযুক্ত সেবার উপর নির্ভরশীল।

শ্লোক ৭

যস্যাং বৈ শ্রূয়মাণায়াং কৃষ্ণে পরমপুরুষে।
ভক্তিরুৎপদ্যতে পুংসঃ শোকমোহভয়াপহা ॥ ৭ ॥

যস্যাম্—এই বৈদিক শাস্ত্র ; **বৈ**—অবশ্যই ; **শ্রূয়মাণায়াম্**—কেবলমাত্র শ্রবণ করার ফলে ; **কৃষ্ণে**—পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের প্রতি ; **পরম পুরুষে**—পরম পুরুষ ; **ভক্তিঃ**—ভক্তি ; **উৎপদ্যতে**—উৎপন্ন হয় ; **পুংসঃ**—জীবের ; **শোক**—শোক ; **মোহ**—মোহ ; **ভয়**—ভয় ; **অপহা**—যা নিবৃত্ত করে।

অনুবাদ

কেবলমাত্র বৈদিক শাস্ত্র শ্রবণ করার মাধ্যমে পরম পুরুষ শ্রীকৃষ্ণের প্রতি ভক্তির উদয় হয় এবং তার ফলে শোক, মোহ এবং ভয় তৎক্ষণাৎ অপগত হয়।

তাৎপর্য

অনেক রকমের ইন্দ্রিয় রয়েছে, তার মধ্যে কর্ণেন্দ্রিয় হচ্ছে সব চাইতে সক্রিয়। মানুষ যখন গভীর নিদ্রায় মগ্ন থাকে, তখনও এই ইন্দ্রিয়টি সক্রিয় থাকে। জাগ্রত অবস্থায় শত্রুর আক্রমণ থেকে নানাভাবে আত্মরক্ষা করা যায়, কিন্তু নিদ্রিত অবস্থায় কেবল কর্ণের দ্বারাই আত্মরক্ষা করা যায়। এখানে জীবনের পরম পূর্ণতা লাভের সম্পর্কে, অর্থাৎ জড় জগতের ত্রিতাপ দুঃখ থেকে মুক্ত হওয়ার বিষয়ে শ্রবণের গুরুত্ব বর্ণনা করা হয়েছে। প্রতিটি জীবই সর্বদা শোকগ্রস্ত, তারা নিরন্তর মায়া-মরীচিকার পিছনে ধাবিত হচ্ছে এবং তারা সর্বদাই তাদের কল্পিত শত্রুর ভয়ে ভীত। এগুলিই হচ্ছে ভবরোগের প্রধান লক্ষণ। এখানে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে যে, কেবলমাত্র *শ্রীমদ্ভাগবতের* বাণী শ্রবণ করার মাধ্যমেই পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের প্রতি আসক্ত হওয়া যায় এবং তার ফলে তৎক্ষণাৎ ভবরোগের নিরাময় হয়। শ্রীল ব্যাসদেব পূর্ণ পুরুষোত্তম ভগবানকে দর্শন করেছিলেন, এবং এই শ্লোকে পূর্ণ পুরুষোত্তম ভগবান যে শ্রীকৃষ্ণ তা স্পষ্টভাবে বর্ণিত হয়েছে।

ভগবদ্ভক্তির চরম ফল হচ্ছে পরমেশ্বর ভগবানের প্রতি বিশুদ্ধ প্রেম লাভ করা। 'প্রেম' কথাটি প্রায়ই স্ত্রী-পুরুষের পরস্পরের প্রতি আসক্তির ক্ষেত্রে উল্লেখ করা হয়। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে প্রেম বলতে পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে জীবের সম্পর্ক বোঝায়। *ভগবদ্গীতায়* জীবকে প্রকৃতি বলে বর্ণনা করা হয়েছে এবং সংস্কৃত ভাষায় প্রকৃতি হচ্ছে স্ত্রীলিঙ্গ বাচক। ভগবানকে সর্বদাই পরম পুরুষ বলে বর্ণনা করা হয়। তাই পরমেশ্বর ভগবান এবং জীবের মধ্যে যে প্রীতির সম্পর্ক তা অনেকটা স্ত্রী এবং পুরুষের সম্পর্কের মতো। তাই প্রকৃত প্রেম হচ্ছে ভগবৎ-প্রেম।

ভগবদ্ভক্তির শুরু হয় ভগবানের কথা শ্রবণ করার মাধ্যমে। ভগবৎ সম্বন্ধীয় কথা শ্রবণ করা এবং ভগবানের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। ভগবান সর্বতোভাবে পূর্ণ, এবং তাই তাঁর সম্বন্ধে শ্রবণ করার সঙ্গে তাঁর কোনও পার্থক্য নেই। তাই তাঁর মহিমা শ্রবণ করার মাধ্যমে তৎক্ষণাৎ শব্দ-ব্রহ্মের মাধ্যমে তাঁর সংস্পর্শে আসা যায়। আর এই অপ্রাকৃত শব্দ-তরঙ্গ এতই প্রভাবশালী যে তা তৎক্ষণাৎ সব রকমের জড় আসক্তি দূর করে দেয়, যে কথা পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। জীব যখন জড়া প্রকৃতির সংস্পর্শে আসে তখন সে এক রকম জটিলতা প্রাপ্ত হয় এবং তখন সে অলীক জড় দেহের বন্ধনকে বাস্তব বলে মনে করতে শুরু করে। এই ধরনের ভ্রান্ত জটিলতার প্রভাবে জীব বিভিন্ন ধরনের জীবনে বিভিন্নভাবে আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে। এমন কি মানব জীবনের সর্বোচ্চ স্তরেও এই মোহ বিভিন্ন মতবাদের রূপ নিয়ে ভগবৎ-প্রেমকে আচ্ছাদিত

করে রাখে এবং তার ফলে মানুষের মধ্যে বিদ্বেষের বিষ ছড়ায়। *শ্রীমদ্ভাগবতের* বাণী শ্রবণ করার ফলে জড়-জাগতিক এই মিথ্যা জটিলতা বিদূরিত হয়, এবং সমাজে যথার্থ শান্তির সূচনা হয়, যা রাজনীতিবিদেরা নানা রকমের রাজনৈতিক পরিস্থিতির মাধ্যমে লাভ করার জন্য উদ্গ্রীব হয়ে আছেন। রাজনীতিবিদেরা চান যে মানুষে মানুষে এবং জাতিতে জাতিতে শান্তিপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে উঠুক, কিন্তু যেহেতু তারা জড় আধিপত্যের প্রতি অত্যন্ত আসক্ত তাই তারা মোহাচ্ছন্ন এবং ভীতিগ্রস্ত। তাই রাজনীতিবিদ্দের শান্তি-সংযম সমাজের শান্তি আনতে পারছে না। তা সম্ভব হবে কেবল *শ্রীমদ্ভাগবতে* বর্ণিত পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের মহিমা শ্রবণ করার মাধ্যমে। অজ্ঞ রাজনীতিবিদেরা শত শত বছর ধরে শান্তি-সম্মেলন করে যেতে পারেন, কিন্তু তা কখনও কার্যকরী হবে না। যতক্ষণ পর্যন্ত না আমরা পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে আমাদের হারিয়ে যাওয়া সম্পর্কের পুনঃপ্রতিষ্ঠা করছি, যতক্ষণ আমরা আমাদের জড় দেহটিকে আমাদের প্রকৃত স্বরূপ বলে মনে করে মোহাচ্ছন্ন থাকছি এবং তার ফলে ভীতিগ্রস্ত হয়ে থাকছি, ততক্ষণ আমরা যথার্থ শান্তি লাভ করতে পারব না। শ্রীকৃষ্ণের ভগবত্তা সম্বন্ধে শাস্ত্রে শত-সহস্র প্রমাণ রয়েছে, এবং বৃন্দাবন, নবদ্বীপ, পুরী ইত্যাদি পবিত্র স্থানের অসংখ্য ভক্তের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতাপ্রসূত শত-সহস্র প্রমাণ রয়েছে। এমন কি কৌমুদী অভিধানে কৃষ্ণের সংজ্ঞা প্রদান করে বলা হয়েছে, যশোদাদুলাল এবং পরমেশ্বর ভগবান পরম ব্রহ্ম। অর্থাৎ কেবলমাত্র *শ্রীমদ্ভাগবত* শ্রবণ করার মাধ্যমে পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে সরাসরিভাবে সম্পর্কযুক্ত হওয়া যায় এবং তার ফলে জড় জগতের দুঃখ-দুর্দশা, মোহ এবং ভয় থেকে মুক্ত হয়ে পরম পূর্ণতা লাভ করা যায়। শ্রদ্ধাবনত চিত্তে *শ্রীমদ্ভাগবত* পাঠ শ্রবণ করা হচ্ছে কিনা তা এ থেকে বোঝা যায়।

শ্লোক ৮

স সংহিতাং ভাগবতীং কৃত্বানুক্রম্য চাত্মজম্।
শুকমধ্যাপয়ামাস নিবৃত্তিনিরতং মুনিঃ ॥ ৮ ॥

সঃ—সেই; **সংহিতাম্**—বৈদিক সাহিত্য; **ভাগবতীম্**—পরমেশ্বর ভগবান সম্বন্ধীয়; **কৃত্বা**—করে; **অনুক্রম্য**—সংশোধন করে এবং পুনরাবৃত্তি করে; **চ**—এবং; **আত্মজম্**—তাঁর পুত্র; **শুকম্**—শুকদেব গোস্বামী; **অধ্যাপয়ামাস**—শিক্ষা দান করেছিলেন; **নিবৃত্তি**—নিবৃত্তি মার্গ; **নিরতম্**—নিরত; **মুনিঃ**—মুনি।

অনুবাদ

শ্রীমদ্ভাগবত রচনা করার পর মহর্ষি বেদব্যাস পুনর্বিচারপূর্বক তা সংশোধন করেন এবং তা তাঁর পুত্র শ্রীশুকদেব গোস্বামীকে শিক্ষা দান করান, যিনি ইতিমধ্যেই নিবৃত্তি মার্গে নিরত ছিলেন।

তাৎপর্য

শ্রীমদ্ভাগবত হচ্ছে ব্রহ্মসূত্রের প্রকৃত ভাষ্য যা একই গ্রন্থকার রচনা করেছেন। এই ব্রহ্মসূত্র বা বেদান্ত-সূত্র নিবৃত্তি মার্গে নিরত মহাপুরুষদের জন্য। *শ্রীমদ্ভাগবত* এমনভাবে রচনা করা হয়েছে যে তা শ্রবণ করা মাত্রই মানুষ নিবৃত্তি মার্গে নিরত হতে পারে। যদিও তা বিশেষ করে পরমহংসদের জন্য রচিত, তবুও তা বৈষয়িক মানুষদের হৃদয়ের গভীরেও ক্রিয়া করে। বিষয়ী মানুষেরা সর্বদা ইন্দ্রিয়-তৃপ্তির প্রচেষ্টায় রত, কিন্তু এই ধরনের মানুষেরা এই বৈদিক সাহিত্যটিকে তাদের ভবরোগ নিরাময়ের উপায়-স্বরূপ গ্রহণ করতে পারবে। শ্রীল শুকদেব গোস্বামী তাঁর জন্ম থেকেই ছিলেন মুক্ত পুরুষ, এবং তাঁর পিতা তাঁকে *শ্রীমদ্ভাগবতের* শিক্ষা দান করিয়েছিলেন। জড় পণ্ডিতদের মধ্যে *শ্রীমদ্ভাগবতের* রচনাকাল নিয়ে কিছু মতবিরোধ রয়েছে। কিন্তু *শ্রীমদ্ভাগবতের* শ্লোক থেকে এটি স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয় যে তা পরীক্ষিৎ মহারাজের তিরোভাবের পূর্বে এবং শ্রীকৃষ্ণের অপ্রকটের পরে রচিত হয়েছিল। পরীক্ষিৎ মহারাজ যখন ভারতবর্ষের একচ্ছত্র সম্রাটরূপে সমস্ত পৃথিবী শাসন করেছিলেন, তখন তিনি কলিকে দণ্ডদান করেন। বৈদিক শাস্ত্র ও জ্যোতিষ শাস্ত্রের গণনা অনুসারে কলিযুগের শুরু হয় আজ থেকে প্রায় ৫,০০০ বছর আগে। সুতরাং *শ্রীমদ্ভাগবত* রচিত হয়েছিল ৫,০০০ বছরেরও আগে। *মহাভারত* রচিত হয় *শ্রীমদ্ভাগবতের* আগে এবং পুরাণসমূহ রচিত হয় *মহাভারত* রচনার আগে। এইভাবে আমরা বিভিন্ন বৈদিক সাহিত্যের রচনাকাল গণনা করতে পারি। বিস্তারিতভাবে *শ্রীমদ্ভাগবত* রচনার পূর্বে নারদ মুনি তার সারমর্ম ব্যাসদেবকে উপদেশ দিয়েছিলেন। *শ্রীমদ্ভাগবত* হচ্ছে নিবৃত্তি মার্গ অনুশীলন করার বিজ্ঞান। নারদ মুনি প্রবৃত্তি মার্গের নিন্দা করে গেছেন। বদ্ধ জীবেরা প্রবৃত্তি মার্গের প্রতি স্বাভাবিকভাবেই অনুরক্ত। *শ্রীমদ্ভাগবতের* বিষয়বস্তু হচ্ছে মানুষের ভবরোগ নিরাময়ের ঔষধ অথবা ত্রিতাপ দুঃখ সমূলে উৎপাটন করার পন্থা।

শ্লোক ৯

শৌনক উবাচ

স বৈ নিবৃত্তিনিরতঃ সর্বত্রোপেক্ষকো মুনিঃ।
কস্য বা বৃহতীমেতামাত্মারামঃ সমভ্যসৎ ॥ ৯ ॥

শৌনকঃ উবাচ—শ্রীশৌনক জিজ্ঞাসা করলেন; **সঃ**—তিনি; **বৈ**—অবশ্যই; **নিবৃত্তি**—নিবৃত্তি মার্গ; **নিরতঃ**—নিরত; **সর্বত্র**—সর্বতোভাবে; **উপেক্ষকঃ**—উদাসীন; **মুনিঃ**—মুনি; **কস্য**—কি কারণে; **বা**—অথবা; **বৃহতীম্**—বৃহৎ; **এতাম্**—এই; **আত্মারামঃ**—আত্মারাম; **সমভ্যসৎ**—অধ্যয়ন করতে হয়েছিল।

অনুবাদ

শ্রীশৌনক সূত গোস্বামীকে জিজ্ঞাসা করলেনঃ শ্রীশুকদেব গোস্বামী ইতিমধ্যেই নিবৃত্তি মার্গে নিরত ছিলেন, এবং তার ফলে তিনি ছিলেন আত্মারাম। তা হলে কেন তাঁকে এই বিশাল সাহিত্য অধ্যয়ন করার কষ্ট স্বীকার করতে হয়েছিল?

তাৎপর্য

সাধারণ মানুষের কাছে জীবনের পরম সিদ্ধি হচ্ছে জড়-জাগতিক কার্যকলাপ থেকে নিরত হয়ে আত্মোপলব্ধির পথে দৃঢ়ব্রত হওয়া। যারা ইন্দ্রিয়-সুখভোগের মাধ্যমে আনন্দ লাভ করতে চায় অথবা যারা জড় দেহের সুখ-সুবিধার চেষ্টায় ব্যস্ত, তাদের বলা হয় কর্মী। এ রকম হাজার হাজার কর্মীর মধ্যে দু'একজন কেবল আত্মজ্ঞান লাভ করার মাধ্যমে আত্মারাম হতে পারেন। 'আত্মারাম' কথাটির অর্থ হচ্ছে, আত্মায় যাঁরা আনন্দ অনুভব করেন। সকলেই আনন্দের অন্বেষণ করছে, কিন্তু একজনের আনন্দের স্তর অপরের আনন্দের স্তর থেকে ভিন্ন হতে পারে। তাই কর্মীদের আনন্দের স্তর আত্মারামের আনন্দের স্তর থেকে ভিন্ন। আত্মারামেরা সর্বতোভাবে জড় সুখভোগের প্রতি সম্পূর্ণ উদাসীন। শ্রীল শুকদেব গোস্বামী ইতিমধ্যেই সেই স্তর প্রাপ্ত হয়েছিলেন, কিন্তু তবুও তিনি মহান সাহিত্য *শ্রীমদ্ভাগবত* অধ্যয়ন করার প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন। তা থেকে বোঝা যায় যে *শ্রীমদ্ভাগবত* হচ্ছে সমস্ত বৈদিক জ্ঞান প্রাপ্ত হয়েছেন যে সমস্ত আত্মারামেরা, তাঁদেরও অধ্যয়নের বিষয়।

শ্লোক ১০

সূত উবাচ

আত্মারামাশ্চ মুনয়ো নির্গ্রন্থা অপ্যুরুক্রমে।
কুর্বন্ত্যহৈতুকীং ভক্তিমিত্থম্ভূতগুণো হরিঃ ॥ ১০ ॥

সূতঃ উবাচ—সূত গোস্বামী বললেন; **আত্মারামাঃ**—আত্মারাম; **চ**—ও; **মুনয়ঃ**—ঋষিরা; **নির্গ্রন্থাঃ**—সমস্ত বন্ধনমুক্ত; **অপি**—সত্ত্বেও; **উরুক্রমে**—মহা বিক্রমশালী ভগবান; **কুর্বন্তি**—করেন; **অহৈতুকীম্**—অহৈতুকী; **ভক্তিম্**—ভক্তি; **ইত্থম্-ভূত**—এমন অদ্ভুত; **গুণঃ**—গুণাবলী; **হরিঃ**—ভগবান শ্রীহরি।

অনুবাদ

সমস্ত আত্মারামেরা, বিশেষ করে যাঁরা নিবৃত্তি মার্গে নিরত, সব রকমের জড় বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়া সত্ত্বেও পরমেশ্বর ভগবানের অহৈতুকী ভক্তি লাভের আকাঙ্ক্ষা করেন। পরমেশ্বর ভগবান দিব্য গুণাবলীতে বিভূষিত এবং তাই তিনি সকলকে আকর্ষণ করেন, এমন কি মুক্ত পুরুষদেরও।

তাৎপর্য

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তাঁর প্রধান ভক্ত শ্রীল সনাতন গোস্বামীর কাছে এই আত্মারাম শ্লোকটি বিশদভাবে বিশ্লেষণ করেন; তিনি এই শ্লোকে এগারটি তত্ত্ব উল্লেখ করেন, যথা—১) আত্মারাম, ২) মুনয়ঃ, ৩) নির্গ্রন্থ, ৪) অপি, ৫) চ, ৬) উরুক্রম, ৭) কুর্বন্তি, ৮) অহৈতুকীম্, ৯) ভক্তিম্, ১০) ইত্থম্ভূতগুণ এবং ১১) হরিঃ। বিশ্বকোষ সংস্কৃত অভিধানে 'আত্মারাম' শব্দটির সাতটি অর্থ রয়েছে ঃ যথা—১) ব্রহ্ম, ২) দেহ, ৩) মন, ৪) যত্ন, ৫) ধৃতি, ৬) বুদ্ধি এবং ৭) স্বভাব।

'মুনয়ঃ' শব্দটির অর্থ হচ্ছে—১) মননশীল, ২) গম্ভীর এবং মৌন, ৩) তপস্বী, ৪) ব্রতী, ৫) যতি, ৬) ঋষি এবং ৭) মুনি।

নির্গ্রন্থ শব্দটির অর্থ হচ্ছে—১) অবিদ্যা থেকে মুক্ত, ২) বিধি-নিষেধ, বেদশাস্ত্র জ্ঞানাদিবিহীন, অর্থাৎ নীতি, বেদ, দর্শন, আদি শাস্ত্রজ্ঞানরহিত (অর্থাৎ মূর্খ, নিচ, ম্লেচ্ছ আদি শাস্ত্র-নির্দেশের সঙ্গে সম্পর্করহিত মানুষ), ৩) ধন সঞ্চয়ী এবং ৪) নির্ধন।

বিশ্বকোষ অভিধান অনুসারে, নি উপাঙ্গটি ১) নিশ্চয়ার্থে, ২) নিক্রমার্থে, ৩) নির্মাণার্থে এবং ৪) নিষেধার্থে ব্যবহৃত হয়েছে এবং গ্রন্থ শব্দটি ধন, সন্দর্ভ, বর্ণ সংগ্রহ ইত্যাদি অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

উরুক্রম শব্দটির অর্থ 'যাঁর কার্যকলাপ মহিমামণ্ডিত'। ক্রম মানে হচ্ছে 'পদক্ষেপ'। এই উরুক্রম শব্দটি বিশেষ করে বামনদেব রূপে ভগবানের অবতারের দ্যোতক, যিনি তাঁর দুটি পদক্ষেপের দ্বারা সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডকে আবৃত করেছিলেন। ভগবান বিষ্ণু অনন্ত শক্তিসম্পন্ন, এবং তাঁর কার্যকলাপ এতই মহিমামণ্ডিত যে তিনি তাঁর অন্তরঙ্গা শক্তির দ্বারা চিজ্জগৎ সৃষ্টি করেছেন এবং তাঁর বহিরঙ্গা শক্তির দ্বারা জড় জগৎ সৃষ্টি করেছেন। সর্বব্যাপ্ত হওয়ার ফলে পরম সত্যরূপে তিনি সর্বত্রই বিরাজমান, এবং তাঁর স্বরূপে তিনি নিত্য গোলোক বৃন্দাবনে বিরাজ করেন, যেখানে তিনি সমস্ত বৈচিত্র্য সমন্বিত তাঁর অপ্রাকৃত লীলাবিলাস করেন। অন্য কারও কার্যকলাপের সঙ্গে তাঁর কার্যকলাপের তুলনা করা যায় না, এবং তাই 'উরুক্রম' শব্দটি কেবল তাঁর ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য।

সংস্কৃত ব্যাকরণ অনুসারে 'কুর্বন্তি' অর্থে বোঝায় অন্য কারোর জন্য কিছু করা। তাই, এক অর্থ হচ্ছে আত্মারামেরা পরমেশ্বর ভগবান উরুক্রমের আনন্দ বিধানের জন্য তাঁর সেবা করেন, তাঁদের ব্যক্তিগত স্বার্থে নয়।

'হেতু' কথাটির অর্থ হচ্ছে 'কারণ'। ইন্দ্রিয়-তৃপ্তির বহু কারণ রয়েছে, এবং সেগুলি জড় ভোগ, যোগসিদ্ধি এবং মুক্তি—এই তিনটি প্রধান শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়, যা সাধারণত উন্নতিকামী মানুষেরা আশা করেন। জড় ভোগ অসংখ্য রকমের রয়েছে, এবং জড়বাদীরা সেগুলি অধিক থেকে অধিকতর করতে আগ্রহী, কেন না তারা মায়াশক্তির দ্বারা প্রভাবিত। জড় সুখভোগের শেষ নেই, এমন কি এই জড় ব্রহ্মাণ্ডে

এমন কেউ নেই যার সেই সবগুলি রয়েছে। যোগসিদ্ধি আট রকমের (যেমন অত্যন্ত ক্ষুদ্র হয়ে যাওয়া, অত্যন্ত লঘু হয়ে যাওয়া, বাসনা অনুসারে যা কিছু প্রাপ্ত হওয়া, জড়া প্রকৃতির উপর আধিপত্য করা, অন্য জীবদের বশীভূত করা, পৃথিবীকে কক্ষচ্যুত করে মহাশূন্যে নিক্ষেপ করা ইত্যাদি)। এই সমস্ত যোগসিদ্ধির কথা শ্রীমদ্ভাগবতে উল্লেখ করা হয়েছে। মুক্তি পাঁচ রকমের।

সুতরাং অনন্য ভক্তি বলতে বোঝায় পূর্বোক্ত এই সমস্ত ব্যক্তিগত লাভের আশা রহিত হয়ে ভগবানের সেবা করা। পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ব্যক্তিগত বাসনা রহিত এই ধরনের অনন্য ভক্তদের দ্বারা সম্পূর্ণভাবে প্রীত হন।

ভগবানের প্রতি অনন্য ভক্তির বিভিন্ন স্তর রয়েছে। জড়-জাগতিক স্তরে ভগবদ্ভক্তি অনুশীলনের একাশিটি বিভিন্ন গুণ রয়েছে, এবং এই ধরনের সেবার ঊর্ধ্বে রয়েছে চিন্ময় ভগবদ্ভক্তি, যাকে বলা হয় সাধনভক্তি। সাধনভক্তির ঐকান্তিক অনুশীলন যখন পূর্ণতা প্রাপ্ত হয় তখন তা প্রেমভক্তিতে পরিণত হয়। প্রেমভক্তি নয় প্রকার—রতি, প্রেম, স্নেহ, মান, প্রণয়, রাগ, অনুরাগ, ভাব এবং মহাভাব।

শান্ত ভক্তের রতি 'প্রেম' পর্যন্ত বাড়ে। দাস্য ভক্তের রতি 'রাগ' পর্যন্ত বিকশিত হয় এবং সখ্য ভক্তের রতি 'অনুরাগ' পর্যন্ত। বাৎসল্য ভক্তের রতিও 'অনুরাগ' পর্যন্ত, আর মাধুর্য ভক্তের রতির সীমা হচ্ছে 'মহাভাব' পর্যন্ত। এইগুলি পরমেশ্বর ভগবানের অনন্য ভক্তির কয়েকটি বৈশিষ্ট্য।

হরিভক্তি সুধোদয় গ্রন্থে 'ইত্থম্ভূত' শব্দটির অর্থ 'পূর্ণ আনন্দ' বলে বর্ণনা করা হয়েছে। সেখানে ব্রহ্মানন্দকে গোষ্পদে সঞ্চিত জলের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে, ভগবৎ প্রেমানন্দ সিন্ধুর সঙ্গে তার কোন তুলনাই হতে পারে না। শ্রীকৃষ্ণের সবিশেষ রূপ এতই সুন্দর যে তাঁর মধ্যে সমস্ত আকর্ষণ, সমস্ত আনন্দ এবং সমস্ত রস রয়েছে। এই আকর্ষণ এতই প্রবল যে তার আভাসেই ভুক্তি, মুক্তি এবং সিদ্ধির সুখ মানুষ বর্জন করে। এই সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে শাস্ত্রযুক্তির প্রয়োজন হয় না, কেন না জীব স্বাভাবিকভাবেই শ্রীকৃষ্ণের গুণের প্রতি আকৃষ্ট হয়। আমাদের এখানে নিশ্চিতভাবে জানতে হবে যে শ্রীকৃষ্ণের গুণের সঙ্গে জড় গুণের কোন সম্পর্ক নেই, কেন না তা সবই হচ্ছে সচ্চিদানন্দময়। শ্রীকৃষ্ণের গুণ অনন্ত, এবং একজন একটি গুণের প্রতি আকৃষ্ট হতে পারেন এবং অপরে অন্য গুণের প্রতি আকৃষ্ট হতে পারেন।

সনক, সনাতন, সনন্দ এবং সনৎকুমার—এই চারজন মহর্ষি শ্রীকৃষ্ণের চরণে অর্পিত ফুল, তুলসী এবং চন্দনের সৌরভে আকৃষ্ট হয়েছিলেন। তেমনই, শ্রীল শুকদেব গোস্বামী ভগবানের লীলা শ্রবণ করে তাঁর প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন। শুকদেব গোস্বামী ইতিমধ্যেই মুক্ত স্তরে অধিষ্ঠিত ছিলেন, কিন্তু তবুও তিনি ভগবানের লীলার প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন। তার থেকে প্রমাণিত হয় যে তাঁর লীলার সঙ্গে জড়-জাগতিক কার্যকলাপের কোন সম্পর্ক নেই। ঠিক তেমনই ব্রজগোপিকারা

শ্রীকৃষ্ণের রূপে আকৃষ্ট হয়েছিলেন, এবং রুক্মিণী দেবী শ্রীকৃষ্ণের মহিমা শ্রবণ করে তাঁর প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ তাঁর বংশী-গীতে লক্ষ্মীদেবীরও মন হরণ করেন। বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে তিনি জগতের সমস্ত যুবতীর মন হরণ করেন। বাৎসল্য রসের দ্বারা তিনি বয়স্কা মহিলাদের চিত্ত আকর্ষণ করেন এবং দাস্য রসে এবং সখ্য রসে পুরুষদের মন আকর্ষণ করেন।

'হরি' শব্দটির অনেক অর্থ রয়েছে। কিন্তু তার দুটি মুখ্য অর্থ হল—তিনি সর্ব অমঙ্গল হরণ করেন এবং প্রেম দান করে তিনি মন হরণ করেন। গভীর দুঃখে কেউ যদি ভগবানকে স্মরণ করেন তা হলে তিনি সব রকমের দুঃখ-দুর্দশা এবং উৎকণ্ঠা থেকে মুক্ত হতে পারেন। ভগবান ধীরে ধীরে শুদ্ধ ভক্তের ভক্তি অনুশীলনের সমস্ত বিঘ্ন দূর করেন এবং শ্রবণ-কীর্তন আদি নবধা ভক্তি অনুশীলনের ফলস্বরূপ 'প্রেম' প্রকাশ করেন।

তাঁর স্বীয় গুণ এবং অপ্রাকৃত কার্যকলাপের দ্বারা ভগবান শুদ্ধ ভক্তের চিত্তকে সর্বতোভাবে আকর্ষণ করেন। এমনই হচ্ছে শ্রীকৃষ্ণের আকর্ষণ-শক্তি। তাঁর আকর্ষণ এতই প্রবল যে শুদ্ধ ভক্ত ধর্ম, অর্থ, কাম এবং মোক্ষ এই চতুর্বর্গের প্রতিও আর আকৃষ্ট হন না। এমনই হচ্ছে পরমেশ্বর ভগবানের অপ্রাকৃত আকর্ষণ। আর সেই সঙ্গে 'অপি' এবং 'চ' এই শব্দ দুটি যুক্ত হওয়ার ফলে তার অর্থ অন্তহীনভাবে বর্ধিত হয়েছে। সংস্কৃত ব্যাকরণ অনুসারে অপি শব্দটির সাতটি অর্থ রয়েছে।

এইভাবে এই শ্লোকের প্রতিটি শব্দের অর্থ বিশ্লেষণ করে শ্রীকৃষ্ণের অনন্ত গুণাবলী সম্বন্ধে জানা যায়, যা তাঁর শুদ্ধ ভক্তের চিত্তকে আকর্ষণ করে।

শ্লোক ১১

হরের্গুণাক্ষিপ্তমতির্ভগবান্ বাদরায়ণিঃ।
অধ্যগান্মহদাখ্যানং নিত্যং বিষ্ণুজনপ্রিয়ঃ ॥ ১১ ॥

হরেঃ—পরমেশ্বর ভগবান শ্রীহরির; **গুণ**—দিব্য গুণ; **আক্ষিপ্ত**—আকৃষ্ট; **মতিঃ**—মন; **ভগবান্**—শক্তিমান; **বাদরায়ণিঃ**—ব্যাসদেবের পুত্র; **অধ্যগাৎ**—অধ্যয়ন করেছিলেন; **মহৎ**—মহৎ; **আখ্যানম্**—বর্ণনা; **নিত্যম্**—নিয়মিতভাবে; **বিষ্ণু-জন**—ভগবানের ভক্ত; **প্রিয়ঃ**—প্রিয়।

অনুবাদ

ব্যাসনন্দন শ্রীল শুকদেবের চিত্ত ভগবান শ্রীহরির গুণে আকৃষ্ট হওয়ায় এই ভাগবত-পুরাণ অত্যন্ত বিশাল হলেও তা তিনি অধ্যয়ন করেছিলেন। সেই ভগবত্তত্ত্ব বিশ্লেষণ করার ফলে তিনি বৈষ্ণবদের অত্যন্ত প্রিয়পাত্র হয়েছিলেন।

তাৎপর্য

ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণ অনুসারে শ্রীল শুকদেব গোস্বামী তাঁর মাতৃগর্ভে অবস্থান কালেই মুক্ত পুরুষ ছিলেন। শ্রীল ব্যাসদেব জানতেন যে তাঁর এই সন্তানটি জন্মের পর গৃহে থাকবেন না। তাই তিনি (ব্যাসদেব) *শ্রীমদ্ভাগবতের* সারমর্ম তাঁকে জানান, যাতে সেই শিশুটি পরমেশ্বর ভগবানের অপ্রাকৃত লীলার প্রতি আসক্ত হতে পারে। তাঁর জন্মের পর *শ্রীমদ্ভাগবতের* শ্লোক আবৃত্তি করার মাধ্যমে সেই বিষয়ে তিনি আরও শিক্ষালাভ করেন।

মুক্ত পুরুষেরা সাধারণত নির্বিশেষ ব্রহ্মের প্রতি আকৃষ্ট হন এবং অদ্বৈতবাদের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে তাঁরা ব্রহ্মের সঙ্গে এক হয়ে যেতে চান। কিন্তু ব্যাসদেবের মতো শুদ্ধ ভক্তের সঙ্গ-প্রভাবে মুক্ত পুরুষেরাও পরমেশ্বর ভগবানের দিব্য গুণাবলীর প্রতি আকৃষ্ট হন। শ্রীল নারদ মুনির কৃপায় শ্রীল ব্যাসদেব *শ্রীমদ্ভাগবত* মহাকাব্য বর্ণনা করতে সক্ষম হয়েছিলেন, এবং ব্যাসদেবের কৃপায় শ্রীল শুকদেব গোস্বামী তার অর্থ হৃদয়ঙ্গম করতে পেরেছিলেন। ভগবানের অপ্রাকৃত গুণাবলী এতই আকর্ষণীয় যে শ্রীল শুকদেব গোস্বামী নির্বিশেষ ব্রহ্মে মগ্ন হওয়ার প্রতি অনাসক্ত হন এবং ভগবৎ-সেবায় যুক্ত হন।

প্রকৃতপক্ষে তিনি নির্বিশেষ ব্রহ্মের প্রতি আসক্ত থেকে অনর্থক বহুকাল নষ্ট করেছেন বলে মনে করে তিনি ব্রহ্মবাদ থেকে বিচ্যুত হন, অর্থাৎ তিনি উপলব্ধি করতে পারেন যে নির্বিশেষ ব্রহ্ম থেকে সবিশেষ ভগবানের প্রতি আসক্ত হওয়ার ফলে অনেক বেশি আনন্দ অনুভব করা যায়। এবং সেই সময় থেকে তিনিই কেবল বিষ্ণুজনদের প্রিয় হন না, বিষ্ণুজনেরাও তাঁর অত্যন্ত প্রিয় হন। ভগবদ্ভক্ত, যাঁরা জীবের স্বতন্ত্রতা বিনাশ করতে চান না এবং যাঁরা পরমেশ্বর ভগবানের সেবক হওয়ার বাসনা করেন, তাঁরা নির্বিশেষবাদীদের খুব একটা পছন্দ করেন না, এবং তেমনই নির্বিশেষবাদীরাও, যাঁরা ব্রহ্মে লীন হয়ে যাওয়ার বাসনা করেন, তাঁরাও ভগবদ্ভক্তদের ঠিক বুঝতে পারেন না। তাই অনাদিকাল ধরে এই দুই ধরনের পরমার্থবাদীরা কখনও কখনও পরস্পরের প্রতিদ্বন্দ্বী হয়েছেন। অর্থাৎ, তাঁদের উদ্দেশ্যের তারতম্যের জন্য তাঁরা উভয়েই পরস্পরের থেকে ভিন্ন থাকতে চান। তাই মনে হয় যেন শ্রীল শুকদেব গোস্বামীও ভগবদ্ভক্তদের পছন্দ করতেন না। কিন্তু যেহেতু তিনি নিজেই ভগবদ্ভক্তে পরিণত হন, তাই তিনি নিরন্তর বিষ্ণুজনদের দিব্য সঙ্গ কামনা করেন এবং বিষ্ণুজনেরা তাঁর সঙ্গ লাভ করার আকাঙ্ক্ষা করেন, কেন না তিনি হচ্ছেন ব্যক্তি-ভাগবত। এইভাবে পিতা-পুত্র উভয়েই ব্রহ্মজ্ঞান সম্পর্কে পূর্ণরূপে অবগত ছিলেন এবং পরে তাঁরা উভয়েই পরমেশ্বর ভগবানের সবিশেষ রূপের প্রতি আকৃষ্ট হন। শুকদেব গোস্বামী যে কিভাবে *শ্রীমদ্ভাগবতের* বর্ণনার প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন তা এই শ্লোকে পূর্ণরূপে বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

শ্লোক ১২

পরীক্ষিতোঽথ রাজর্ষের্জন্মকর্মবিলাপনম্ ।
সংস্থাং চ পাণ্ডুপুত্রাণাং বক্ষ্যে কৃষ্ণকথোদয়ম্ ॥ ১২ ॥

পরীক্ষিতঃ—মহারাজ পরীক্ষিতের; **অথ**—এইভাবে; **রাজর্ষেঃ**—রাজর্ষির; **জন্ম**—জন্ম; **কর্ম**—কর্ম; **বিলাপনম্**—মুক্তি; **সংস্থাম্**—মহাপ্রস্থান; **চ**—এবং; **পাণ্ডুপুত্রাণাম্**—পাণ্ডুপুত্রদের; **বক্ষ্যে**—আমি বলব; **কৃষ্ণকথা-উদয়ম্**—পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের কথার উদয়।

অনুবাদ

সূত গোস্বামী শৌনকাদি ঋষিদের বললেনঃ এখন মুখ্যভাবে কৃষ্ণকথাই যাতে উদিত হয় সেইভাবে আমি রাজর্ষি পরীক্ষিতের জন্ম ও কর্মবৃত্তান্ত এবং দেহত্যাগ বা মুক্তিবৃত্তান্ত এবং পাণ্ডবদের মহাপ্রস্থান বর্ণনা করব।

তাৎপর্য

শ্রীকৃষ্ণ বদ্ধ জীবদের প্রতি এতই কৃপালু যে বিভিন্ন প্রাণী সমাজে তিনি স্বয়ং অবতরণ করে দৈনন্দিন কার্যকলাপে অংশগ্রহণ করেন। ভগবৎ সম্বন্ধীয় যে কোনও ঐতিহাসিক তথ্য—তা সে নতুনই হোক বা পুরান হোক, তা ভগবানের অপ্রাকৃত মহিমার বর্ণনা বলে গ্রহণ করতে হবে। শ্রীকৃষ্ণ ব্যতীত পুরাণ, মহাভারত আদি সমস্ত বৈদিক শাস্ত্র কেবল কতকগুলি ঐতিহাসিক তথ্য মাত্র। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে সম্পর্কিত হওয়ার ফলে সেগুলি অপ্রাকৃত শাস্ত্রে পরিণত হয়, এবং আমরা যখন তা শ্রবণ করি তখন আমরা পরমেশ্বর ভগবানের সঙ্গে অপ্রাকৃত সম্পর্কে যুক্ত হই। শ্রীমদ্ভাগবতও একটি পুরাণ, কিন্তু এই পুরাণের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে যে তাতে ভগবানের কার্যকলাপ হচ্ছে মুখ্য বিষয়বস্তু, তা কেবল কতকগুলি ঐতিহাসিক তথ্য নয়। তাই শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু শ্রীমদ্ভাগবতকে অমল পুরাণ বলে বর্ণনা করেছেন। ভাগবত-পুরাণের কিছু অল্পজ্ঞ ভক্ত রয়েছে, যারা ভাগবতের প্রাথমিক স্কন্ধগুলি শিক্ষা গ্রহণ না করেই সরাসরিভাবে দশম স্কন্ধে ভগবানের লীলা-বর্ণনা আস্বাদন করতে চায়। ভ্রান্তভাবে তারা মনে করে যে অন্যান্য স্কন্ধগুলি শ্রীকৃষ্ণবিষয়ক নয়। এবং তাই মূর্খের মতো তারা প্রথমেই দশম স্কন্ধ পাঠ করতে শুরু করে। এই সমস্ত পাঠকদের উদ্দেশ্যে এখানে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে, 'শ্রীমদ্ভাগবতের' অন্যান্য স্কন্ধগুলি দশম স্কন্ধের মতোই গুরুত্বপূর্ণ। পূর্ববর্তী নটি স্কন্ধের তাৎপর্য যথাযথভাবে হৃদয়ঙ্গম না করে দশম স্কন্ধে প্রবেশ করার চেষ্টা করা উচিত নয়। শ্রীকৃষ্ণ এবং পাণ্ডবাদি তাঁর ভক্তরা একই স্তরে রয়েছেন। শ্রীকৃষ্ণ বিভিন্ন রসের ভক্তদের থেকে বিচ্ছিন্ন নন, এবং পাণ্ডবদের মতো তাঁর শুদ্ধ ভক্তরাও শ্রীকৃষ্ণবিহীন নন। ভক্ত এবং ভগবান পরস্পরের

সঙ্গে যুক্ত এবং তাঁদের আলাদা আলাদা করা যায় না। তাই তাঁদের সম্বন্ধীয় কথাও কৃষ্ণকথা বা ভগবৎ সম্বন্ধীয় কথা।

শ্লোক ১৩-১৪

যদা মৃধে কৌরবসৃঞ্জয়ানাং
বীরেম্বথো বীরগতিং গতেষু।
বৃকোদরাবিদ্ধগদাভিমর্শ-
ভগ্নোরুদণ্ডে ধৃতরাষ্ট্রপুত্রে ॥ ১৩ ॥
ভর্তুঃ প্রিয়ং দ্রৌণিরিতি স্ম পশ্যন্
কৃষ্ণাসুতানাং স্বপতাং শিরাংসি।
উপ হরদ্বিপ্রিয়মেব তস্য
জুগুপ্সিতং কর্ম বিগর্হয়ন্তি ॥ ১৪ ॥

যদা—যখন; **মৃধে**—রণাঙ্গনে; **কৌরব**—ধৃতরাষ্ট্রের পক্ষ; **সৃঞ্জয়ানাম্**—পাণ্ডবদের পক্ষ; **বীরেষু**—বীরদের; **অথো**—এইভাবে; **বীর-গতিম**—বীরদের গন্তব্যস্থল; **গতেষু**—প্রাপ্ত হয়ে; **বৃকোদর**—ভীম; **আবিদ্ধ**—পরাজিত হয়ে; **গদা**—গদার দ্বারা; **অভিমর্শ**—শোক করতে করতে; **ভগ্ন**—ভগ্ন; **উরুদণ্ডে**—উরুদণ্ড; **ধৃতরাষ্ট্র-পুত্রে**—মহারাজ ধৃতরাষ্ট্রের পুত্র; **ভর্তুঃ**—পতির; **প্রিয়ম্**—প্রিয়; **দ্রৌণিঃ**—দ্রোণাচার্যের পুত্রের; **ইতি**—এইভাবে; **স্ম**—হবে; **পশ্যন্**—দেখে; **কৃষ্ণা**—দ্রৌপদী; **সুতানাম্**—পুত্রদের; **স্বপতাম্**—নিদ্রিত অবস্থায়; **শিরাংসি**—মস্তক; **উপহরৎ**—পুরস্কারস্বরূপ প্রদান করেছিল; **বিপ্রিয়ম্**—প্রিয়; **এব**—মতো; **তস্য**—তার; **জুগুপ্সিতম্**—অত্যন্ত জঘন্য; **কর্ম**—কর্ম; **বিগর্হয়ন্তি**—বিশেষভাবে গর্হিত।

অনুবাদ

কৌরব এবং পাণ্ডব উভয় পক্ষের বীরেরা যখন কুরুক্ষেত্রের রণাঙ্গণে হত হয়ে তাঁদের গন্তব্যস্থল প্রাপ্ত হন, এবং যখন ভীমের গদাঘাতে ভগ্ন উরু ধৃতরাষ্ট্রপুত্র শোক করতে করতে ধরাশায়ী হয়, তখন দ্রোণাচার্যের পুত্র (অশ্বত্থামা) দ্রৌপদীর পঞ্চপুত্রকে নিদ্রিত অবস্থায় হত্যা করে তাদের মস্তক তার প্রভুকে পুরস্কারস্বরূপ দান করে। মূর্খের মতো সে মনে করেছিল যে তার ফলে দুর্যোধন প্রসন্ন হবে। দুর্যোধন কিন্তু তার এই গর্হিত কর্ম অনুমোদন করেনি এবং সে তাতে মোটেই প্রীত হয়নি।

তাৎপর্য

শ্রীমদ্ভাগবতে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের কার্যকলাপের যে অপ্রাকৃত বর্ণনা রয়েছে তার শুরু হয় কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের পর থেকে, যেখানে *ভগবদ্গীতার* মাধ্যমে ভগবান স্বয়ং তাঁর নিজের সম্বন্ধে বলেছেন। তাই *ভগবদ্গীতা* এবং *শ্রীমদ্ভাগবত* উভয়ই হচ্ছে ভগবান

শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধীয় চিন্ময় বিষয়। গীতা হচ্ছে কৃষ্ণকথা বা শ্রীকৃষ্ণের কথা, কেন না তা ভগবান স্বয়ং বর্ণনা করেছেন, আর *শ্রীমদ্ভাগবত*ও হচ্ছে কৃষ্ণকথা, কেন না তা হচ্ছে ভগবান সম্বন্ধীয় কথা। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু চেয়েছিলেন যে সকলেই যেন তাঁর নির্দেশ অনুসারে কৃষ্ণকথা শ্রবণ করে। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু হচ্ছেন ভক্তরূপে শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং, এবং তাই শ্রীকৃষ্ণের উপদেশ এবং শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর উপদেশ অভিন্ন। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু চেয়েছিলেন যে, ভারত-ভূমিতে যাঁরা জন্মগ্রহণ করেছেন তাঁরা যেন এই কৃষ্ণকথা গভীরভাবে হৃদয়ঙ্গম করার চেষ্টা করেন, এবং সেই জ্ঞান যথাযথভাবে প্রাপ্ত হওয়ার পর সেই অপ্রাকৃত বাণী পৃথিবীর সর্বত্র সকলের কাছে প্রচার করেন। তার ফলে এই দুর্দশাগ্রস্ত পৃথিবীতে বহু আকাঙ্ক্ষিত শান্তি এবং সমৃদ্ধি আসবে।

শ্লোক ১৫

মাতা শিশূনাং নিধনং সুতানাং
নিশম্য ঘোরং পরিতপ্যমানা।
তদারুদদ্‌বাষ্পকলাকুলাক্ষী
তাং সান্ত্বয়ন্নাহ কিরীটমালী ॥ ১৫ ॥

মাতা—মাতা; **শিশূনাম্**—শিশুদের; **নিধনম্**—নিধন; **সুতানাম্**—পুত্রদের; **নিশম্য**—শোনার পর; **ঘোরম্**—বীভৎস; **পরিতপ্যমানা**—পরিতাপ করতে করতে; **তদা**—সেই সময়; **অরুদৎ**—ক্রন্দন করতে শুরু করেন; **বাষ্প-কল-আকুলাক্ষী**—অশ্রুপূর্ণ নয়নে; **তাম্**—তাঁর; **সান্ত্বয়ন্**—শান্ত করে; **আহ**—বলেছিলেন; **কিরীটমালী**—অর্জুন।

অনুবাদ

পাণ্ডবদের পাঁচ পুত্রের জননী দ্রৌপদী তাঁর পুত্রদের মৃত্যু সংবাদ শ্রবণ করে অশ্রুপূর্ণ নয়নে আকুলভাবে ক্রন্দন করতে থাকেন। তাঁর গভীর শোক শান্ত করার চেষ্টায় অর্জুন তাঁকে বললেন।

শ্লোক ১৬

তদা শুচস্তে প্রমৃজামি ভদ্রে
যদ্‌ব্রহ্মবন্ধোঃ শির আততায়িনঃ।
গাণ্ডীবমুক্তৈর্বিশিখৈরুপাহরে
ত্বাক্রম্য যৎস্নাস্যসি দগ্ধপুত্রা ॥ ১৬ ॥

তদা—সেই সময়ে; **শুচঃ**—শোকাকুল অশ্রু; **তে**—তোমার; **প্রমৃজামি**—মুছিয়ে দেব; **ভদ্রে**—হে ভদ্রে; **যৎ**—যখন; **ব্রহ্ম-বন্ধোঃ**—অধঃপতিত ব্রাহ্মণের; **শিরঃ**—মস্তক; **আততায়িনঃ**—আততায়ীর; **গাণ্ডীবমুক্তৈঃ**—গাণ্ডীব নামক ধনুক থেকে নিক্ষিপ্ত; **বিশিখৈঃ**—তীরের আঘাতে; **উপাহরে**—তোমাকে এনে দেব; **ত্বা**—তোমার জন্য; **আক্রম্য**—তাতে চড়ে; **যৎ**—যা; **স্নাস্যসি**—স্নান করো; **দগ্ধ-পুত্রা**—পুত্রদের পুড়িয়ে।

অনুবাদ

হে ভদ্রে, আমার গাণ্ডীবের থেকে নিক্ষিপ্ত তীর দিয়ে তোমার পুত্রদের হত্যাকারীর মস্তক ছেদন করে আমি তোমাকে তা উপহার দেব। তখন আমি তোমার চোখের জল মুছিয়ে দেব এবং আমি তোমাকে সান্ত্বনা দেব। তারপর, তোমার পুত্রদের মৃতদেহ সৎকার করে তুমি তার মাথার উপর দাঁড়িয়ে স্নান করো।

তাৎপর্য

যে শত্রু গৃহে আগুন লাগায়, বিষ প্রদান করে, ভয়ঙ্কর অস্ত্র নিয়ে হঠাৎ আক্রমণ করে, ধন-সম্পদ লুণ্ঠন করে অথবা ক্ষেতের শস্য নষ্ট করে এবং পত্নীকে প্রলুব্ধ করার চেষ্টা করে, তাকে বলা হয় আক্রমণকারী। এই ধরনের আক্রমণকারী যদি ব্রাহ্মণও হয় অথবা ব্রহ্মবন্ধু হয়, তা হলে সর্ব অবস্থাতেই তাকে দণ্ডদান করা বিধেয়। অর্জুন তখন প্রতিজ্ঞা করেন যে অশ্বত্থামা নামক আক্রমণকারীর মস্তক তিনি ছেদন করবেন। তিনি জানতেন যে অশ্বত্থামা ছিলেন ব্রাহ্মণের পুত্র, কিন্তু তথাকথিত ব্রাহ্মণেরা যখন একজন কসাইয়ের মতো আচরণ করে, তখন তাকে একটি কসাই বলেই মনে করা হয়, এবং কলিযুগে এই রকম ব্রাহ্মণের পুত্রকে হত্যা করলে কোন পাপ হয় না।

শ্লোক ১৭

ইতি প্রিয়াং বল্গুবিচিত্রজল্পৈঃ
স সান্ত্বয়িত্বাচ্যুতমিত্রসূতঃ।
অন্বাদ্রবদ্দংশিত উগ্রধন্বা
কপিধ্বজো গুরুপুত্রং রথেন ॥ ১৭ ॥

ইতি—এইভাবে; **প্রিয়াম্**—প্রিয়জনকে; **বল্গু**—মধুর; **বিচিত্র**—বৈচিত্র্যপূর্ণ; **জল্পৈঃ**—বর্ণনার দ্বারা; **সঃ**—তিনি; **সান্ত্বয়িত্বা**—সন্তুষ্ট করে; **অচ্যুত-মিত্র-সূতঃ**—অর্জুন, যিনি পরমেশ্বর ভগবান অচ্যুতের দ্বারা পরিচালিত; **অন্বাদ্রবৎ**—অনুসরণ করে; **দংশিতঃ**—কবচের দ্বারা সুরক্ষিত; **উগ্র-ধন্বা**—উগ্র অস্ত্রশস্ত্র ধারণ করে; **কপিধ্বজঃ**—অর্জুন; **গুরুপুত্রম্**—গুরুপুত্র; **রথেন**—রথে চড়ে।

অনুবাদ

অর্জুন, যাঁকে পরমেশ্বর ভগবান শ্রীঅচ্যুত সখা এবং সারথিরূপে সর্বদা পরিচালিত করেন, তিনি এই ধরনের বাক্যের দ্বারা দ্রৌপদীকে সান্ত্বনা দিলেন। তারপর ভয়ঙ্কর অস্ত্রশস্ত্রের দ্বারা সজ্জিত হয়ে রথে চড়ে তিনি তাঁর অস্ত্রগুরুর পুত্র অশ্বত্থামার পশ্চাদ্ধাবন করলেন।

শ্লোক ১৮

তমাপতন্তং স বিলক্ষ্য দূরাৎ
কুমারহোদ্বিগ্নমনা রথেন।
পরাদ্রবৎপ্রাণপরীপ্সুরুর্ব্যাং
যাবদ্গমং রুদ্রভয়াদ্যথাকঃ ॥ ১৮ ॥

তম্—তাকে; **আপতন্তম্**—ভয়ঙ্করভাবে ধাবিত; **সঃ**—সে; **বিলক্ষ্য**—দেখে; **দূরাৎ**—দূর থেকে; **কুমার-হা**—রাজপুত্রদের হত্যাকারী; **উদ্বিগ্নমনাঃ**—উদ্বিগ্ন চিত্ত; **রথেন**—রথে করে; **পরাদ্রবৎ**—পলায়ন করে; **প্রাণ**—জীবন; **পরীপ্সুঃ**—রক্ষা করার জন্য; **উর্ব্যাম্**—প্রচণ্ড গতিতে; **যাবদ্গমম্**—যেভাবে সে পালাতে থাকে; **রুদ্র-ভয়াৎ**—রুদ্রের ভয়ে; **যথা**—যেমন; **কঃ**—ব্রহ্মা(অথবা অর্ক বা সূর্য)।

অনুবাদ

রাজপুত্রদের হত্যাকারী অশ্বত্থামা দূর থেকে অর্জুনকে প্রচণ্ড গতিতে তার দিকে আসতে দেখে অত্যন্ত ভীত হয়ে তার জীবন রক্ষার জন্য রথে করে পলায়ন করে, ঠিক যেভাবে ব্রহ্মা রুদ্রের ভয়ে পলায়ন করেছিলেন।

তাৎপর্য

এই শ্লোকে পুরাণের দুটি উপাখ্যানের বর্ণনা রয়েছে। 'কঃ' হচ্ছে ব্রহ্মার একটি নাম, যিনি এক সময় তাঁর কন্যার রূপে মোহিত হয়ে তার অনুগমন করতে শুরু করেন। তার ফলে শিব অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হন এবং তাঁর ত্রিশূল নিয়ে তিনি ব্রহ্মাকে আক্রমণ করেন। প্রাণভয়ে ভীত হয়ে ব্রহ্মা তখন পলায়ন করেন। অর্ক হচ্ছে সূর্যের একটি নাম। এই বর্ণনাটি বামন পুরাণে রয়েছে। বিদ্যুন্মালি নামক এক অসুরের এক জ্যোতির্ময়-স্বর্ণ-বিমান ছিল, যাতে চড়ে সে সূর্যের পশ্চাতে গমন করত, এবং তার বিমানের উজ্জ্বল জ্যোতিতে রাত্রিবেলায়ও আলোকে উদ্ভাসিত হয়ে থাকত। তার ফলে সূর্যদেব অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হন এবং তাঁর প্রচণ্ড রশ্মির দ্বারা সেই বিমানটিকে তিনি গলিয়ে ফেলেন। তার ফলে শিব অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে সূর্যদেবকে আক্রমণ করেন এবং অবশেষে সূর্যদেব বারাণসীতে পতিত হন। সেই স্থান এখন লোলার্ক নামে খ্যাত।

শ্লোক ১৯

যদাশরণমাত্মানমৈক্ষত শ্রান্তবাজিনম্ ।
অস্ত্রং ব্রহ্মশিরো মেনে আত্মত্রাণং দ্বিজাত্মজঃ ॥ ১৯ ॥

যদা—যখন; **অশরণম্**—উপযুক্তভাবে রক্ষিত না হয়ে; **আত্মানম্**—স্বয়ং; **ঐক্ষত**—দেখে; **শ্রান্ত-বাজিনম্**—শ্রান্ত অশ্ব; **অস্ত্রম্**—অস্ত্র; **ব্রহ্ম-শিরঃ**—পরম (আণবিক) অস্ত্র; **মেনে**—প্রয়োগ করেছিল; **আত্ম-ত্রাণম্**—নিজেকে রক্ষা করার জন্য; **দ্বিজ-আত্ম-জঃ**—ব্রাহ্মণের পুত্র।

অনুবাদ

দ্বিজপুত্র (অশ্বত্থামা) যখন দেখল যে তার অশ্বগুলি ক্লান্ত হয়ে পড়েছে, তখন সে বিবেচনা করল যে ব্রহ্মশির নামক (পারমাণবিক অস্ত্র) চরম অস্ত্র ব্যবহার করা ছাড়া তার আত্মরক্ষা করার আর কোনও উপায় নেই।

তাৎপর্য

যখন আর অন্য কোনও গতি থাকে না, সেই চরম সংকটের সময়েই কেবল ব্রহ্মশির নামক পারমাণবিক অস্ত্র প্রয়োগ করা হয়। এখানে 'দ্বিজাত্মজঃ' শব্দটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। কেন না অশ্বত্থামা যদিও ছিল দ্রোণাচার্যের পুত্র, তবুও সে উপযুক্ত গুণসম্পন্ন ব্রাহ্মণ ছিল না। সব চাইতে উন্নত বুদ্ধিমত্তা সম্পন্ন মানুষকে বলা হয় ব্রাহ্মণ, এবং তা কোন জন্মগত উপাধি নয়। পূর্বে অশ্বত্থামাকে ব্রহ্মবন্ধু বলে বর্ণনা করা হয়েছে। ব্রাহ্মণের বন্ধু বলতে গুণগতভাবে ব্রাহ্মণকে বোঝায় না। ব্রাহ্মণের বন্ধু অথবা পুত্র, যখন পূর্ণরূপে যোগ্যতাসম্পন্ন হয়, তখনই কেবল তাকে ব্রাহ্মণ বলা হয়, তা না হলে নয়। যেহেতু অশ্বত্থামার এই বিবেচনা ছিল অপরিণত, তাই এখানে তাকে ব্রাহ্মণের পুত্র অথবা দ্বিজাত্মজ বলে সম্বোধন করা হয়েছে।

শ্লোক ২০

অথোপস্পৃশ্য সলিলং সংদধে তৎসমাহিতঃ ।
অজানন্নপিসংহারং প্রাণকৃচ্ছ্র উপস্থিতে ॥ ২০ ॥

অথ—এইভাবে; **উপস্পৃশ্য**—পবিত্র হওয়ার জন্য স্পর্শ করে; **সলিলম্**—জল; **সংদধে**—মন্ত্র উচ্চারণ করে; **তৎ**—তা; **সমাহিতঃ**—একাগ্র চিত্তে; **অজানন্**—না জেনে; **অপি**—যদিও; **সংহারম্**—সংবরণ; **প্রাণকৃচ্ছ্রে**—জীবন বিপন্ন হওয়ায়; **উপস্থিতে**—সেই রকম অবস্থায় পতিত হয়।

অনুবাদ

তার জীবন বিপন্ন হওয়ার ফলে সে জল স্পর্শপূর্বক আচমন করে ব্রহ্মশির অস্ত্র প্রয়োগ করার জন্য একাগ্র চিত্তে মন্ত্র উচ্চারণ করল, যদিও সে জানত না কিভাবে সেই অস্ত্রটিকে সংবরণ করা যায়।

তাৎপর্য

সূক্ষ্ম জড় কার্যকলাপ স্থূল জড় কার্যকলাপের থেকে অধিক শক্তিশালী। এই ধরনের সূক্ষ্ম কার্যকলাপ সম্পাদিত হয় বিশুদ্ধ শব্দের প্রভাবে, যাকে বলা হয় মন্ত্র। এখানে সেই মন্ত্রের প্রভাবে পারমাণবিক অস্ত্র প্রয়োগের পন্থা উল্লিখিত হয়েছে।

শ্লোক ২১

ততঃ প্রাদুষ্কৃতং তেজঃ প্রচণ্ডং সর্বতোদিশম্।
প্রাণাপদমভিপ্রেক্ষ্য বিষ্ণুং জিষ্ণুরুবাচ হ॥ ২১॥

ততঃ—তার ফলে; **প্রাদুষ্কৃতম্**—বিকীরিত; **তেজঃ**—তেজরাশি; **প্রচণ্ডম্**—প্রচণ্ড; **সর্বতঃ**—সর্বত্র; **দিশম্**—দিকে; **প্রাণাপদম্**—প্রাণ বিপন্ন; **অভিপ্রেক্ষ্য**—তা দেখে; **বিষ্ণুম্**—ভগবান শ্রীবিষ্ণুকে; **জিষ্ণুঃ**—অর্জুন; **উবাচ**—বলেছিলেন; **হ**—পূর্বে।

অনুবাদ

তার ফলে এক প্রচণ্ড তেজরাশি সর্বদিকে ছড়িয়ে পড়ল। তা এত প্রচণ্ড ছিল যে অর্জুন মনে করেছিলেন যে তাঁর জীবন বিপন্ন, এবং তখন তিনি শ্রীকৃষ্ণকে সম্বোধন করে বললেন।

শ্লোক ২২

অর্জুন উবাচ

কৃষ্ণ কৃষ্ণ মহাবাহো ভক্তানামভয়ঙ্কর।
ত্বমেকো দহ্যমানানামপবর্গোঽসি সংসৃতেঃ॥ ২২॥

অর্জুনঃ উবাচ—অর্জুন বললেন; **কৃষ্ণ**—হে কৃষ্ণ; **কৃষ্ণ**—হে কৃষ্ণ; **মহাবাহো**—সর্বশক্তিমান; **ভক্তানাম্**—ভক্তদের; **অভয়ঙ্কর**—অভয় দানকারী; **ত্বম্**—তুমি; **একঃ**—একমাত্র; **দহ্য-মানানাম্**—দুঃখ-দুর্দশাক্লিষ্ট; **অপবর্গঃ**—মুক্তির পথ; **অসি**—হও; **সংসৃতেঃ**—জড় জগতের দুঃখ-কষ্টের মধ্যে।

অনুবাদ

অর্জুন বললেনঃ হে কৃষ্ণ, তুমি হচ্ছ সর্বশক্তিমান পরমেশ্বর ভগবান। তোমার বিভিন্ন শক্তির কোন সীমা নেই। তাই তুমি তোমার ভক্তদের হৃদয়ে অভয় দান করতে পার। জড় জগতের দুঃখ-দুর্দশার তাপে দগ্ধ সকলেরই মুক্তির পথ হচ্ছ তুমি।

তাৎপর্য

অর্জুন শ্রীকৃষ্ণের অপ্রাকৃত গুণ সম্বন্ধে সচেতন ছিলেন। তিনি ইতিমধ্যেই কুরুক্ষেত্রের রণাঙ্গনে তা উপলব্ধি করেছিলেন। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে শ্রীকৃষ্ণ এবং অর্জুন উভয়েই উপস্থিত ছিলেন। তাই শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধে অর্জুনের উক্তি সর্বতোভাবে প্রামাণিক। শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন সর্বশক্তিমান এবং তিনি বিশেষ করে ভক্তদের অভয় দানকারী। ভগবানের ভক্ত সর্ব অবস্থাতেই নির্ভীক, কেন না ভগবান সর্বদাই তাঁকে রক্ষা করেন। জড় অস্তিত্ব হচ্ছে অনেকটা বনের মধ্যে দাবানলের মতো, যা কেবল শ্রীকৃষ্ণের কৃপার প্রভাবেই নির্বাপিত হতে পারে। গুরুদেব হচ্ছেন শ্রীকৃষ্ণের কৃপার মূর্ত প্রকাশ। তাই, যে মানুষ সংসাররূপী দাবানলে দগ্ধ হচ্ছে, সে ভগবত্তত্ত্ববেত্তা সদ্‌গুরুর মাধ্যমে করুণার বৃষ্টি লাভ করতে পারে। সদ্‌গুরু তাঁর উপদেশের মাধ্যমে ত্রিতাপ দুঃখ জর্জরিত মানুষের হৃদয়ে দিব্য জ্ঞান প্রকাশ করতে পারেন, এবং এই দিব্য জ্ঞানই কেবল সংসাররূপী দাবানলের আগুন নির্বাপিত করতে পারে।

শ্লোক ২৩

ত্বমাদ্যঃ পুরুষঃ সাক্ষাদীশ্বরঃ প্রকৃতেঃ পরঃ।
মায়াং ব্যুদস্য চিচ্ছক্ত্যা কৈবল্যে স্থিতআত্মনি ॥ ২৩ ॥

ত্বম আদ্যঃ—তুমিই হচ্ছ আদি; **পুরুষঃ**—আনন্দ উপভোগকারী পুরুষ; **সাক্ষাৎ**—সাক্ষাৎ; **ঈশ্বরঃ**—নিয়ন্তা; **প্রকৃতেঃ**—জড়া প্রকৃতির; **পরঃ**—অতীত; **মায়াম্**—জড়া শক্তি; **ব্যুদস্য**—যিনি পরিহার করেছেন; **চিচ্ছক্ত্যা**—চিৎ শক্তির দ্বারা; **কৈবল্যে**—শুদ্ধ দিব্য জ্ঞান এবং আনন্দে; **স্থিতঃ**—অবস্থিত; **আত্মনি**—স্বয়ং।

অনুবাদ

তুমিই হচ্ছ সেই আদি পুরুষ ভগবান যিনি সৃষ্টির সর্বত্র নিজেকে বিস্তার করেছেন এবং যিনি হচ্ছেন মায়াশক্তির অতীত। তুমি তোমার চিৎ শক্তির প্রভাবে জড়া প্রকৃতির প্রভাব প্রতিহত করেছ। তুমি সর্বদাই চিন্ময় জ্ঞান এবং আনন্দে অধিষ্ঠিত।

তাৎপর্য

'ভগবদ্গীতা'য় ভগবান বলেছেন যে কেউ যখন তাঁর শ্রীপাদপদ্মের শরণাগত হন, তখন তিনি মায়ার বন্ধন থেকে মুক্ত হন। শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন সূর্যের মতো, এবং মায়া অথবা জড় অস্তিত্ব হচ্ছে অন্ধকার। সূর্যের আলোকের প্রকাশ হলে, তৎক্ষণাৎ অজ্ঞানের অন্ধকার বিদূরিত হয়ে যায়। এখানে জড় জগতের অজ্ঞানান্ধকার থেকে মুক্ত হওয়ার সর্বশ্রেষ্ঠ পন্থা প্রদর্শিত হয়েছে। এখানে শ্রীকৃষ্ণকে আদি পুরুষ পরমেশ্বর ভগবান বলে সম্বোধন করা হয়েছে। তাঁর থেকে অন্য সমস্ত অবতারেরা প্রকাশিত হন। সর্বব্যাপ্ত শ্রীবিষ্ণু হচ্ছেন শ্রীকৃষ্ণের অংশ প্রকাশ। ভগবান অসংখ্য অবতাররূপে,

অসংখ্য জীবরূপে এবং তাঁর বিভিন্ন শক্তিরূপে নিজেকে প্রকাশিত করেন। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন আদি পুরুষ ভগবান, তাঁর থেকে সব কিছু প্রকাশিত হয়েছে। ভগবানের সর্বব্যাপকতা, যা এই জড় জগতে উপলব্ধ হয়, তা হচ্ছে ভগবানের অংশ প্রকাশ। তাই পরমাত্মাও তাঁরই অধীন তত্ত্ব। তিনি হচ্ছেন পূর্ণ পুরুষোত্তম। জড় জগতের কর্ম এবং কর্মফলের সঙ্গে তাঁর কোন সম্পর্ক নেই, কেন না তিনি জড় সৃষ্টির অনেক অনেক উর্ধ্বে। অন্ধকার হচ্ছে সূর্যের বিকৃত প্রকাশ এবং তাই অন্ধকারের অস্তিত্ব নির্ভর করে সূর্যের উপর, কিন্তু সূর্যে অন্ধকারের কোন অস্তিত্ব নেই। সূর্য যেমন পূর্ণ আলোকে উদ্ভাসিত, তেমনই পরমেশ্বর ভগবান এই জড় অস্তিত্বের অতীত পূর্ণ আনন্দময়। তিনি কেবল আনন্দময়ই নন, তিনি সব রকম দিব্য বৈচিত্র্যে পূর্ণ। তিনি ত্রিগুণাত্মিকা, জড়া প্রকৃতির অতীত। তিনি পরম, অর্থাৎ তিনি প্রধান। তাঁর শক্তি অসংখ্য, এবং তাঁর বিভিন্ন শক্তির দ্বারা তিনি এই জড় জগৎ সৃষ্টি করেন, প্রকাশিত করেন, পালন করেন এবং ধ্বংস করেন। কিন্তু তাঁর স্বীয় ধামে সব কিছুই নিত্য এবং পরম। তাঁর শক্তিসম্পন্ন প্রতিনিধিরা স্বতন্ত্রভাবে এই জড় জগৎ পরিচালিত করেন না, তা তাঁরা পরিচালনা করেন তাঁরই শক্তিতে শক্তিমান হয়ে, তাঁরই নির্দেশ অনুসারে।

শ্লোক ২৪

স এব জীবলোকস্য মায়ামোহিতচেতসঃ।
বিধৎসে স্বেন বীর্যেণ শ্রেয়ো ধর্মাদিলক্ষণম্ ॥ ২৪ ॥

সঃ—সেই চিন্ময়; **এব**—অবশ্যই; **জীব-লোকস্য**—বদ্ধ জীবদের; **মায়া-মোহিত**—মায়ার দ্বারা মোহিত; **চেতসঃ**—চেতনার দ্বারা; **বিধৎসে**—সম্পাদন করে; **স্বেন**—তুমি স্বয়ং; **বীর্যেণ**—প্রভাবের দ্বারা; **শ্রেয়ঃ**—পরম মঙ্গলময়; **ধর্মাদি**—চতুর্বর্গ; **লক্ষণম্**—লক্ষণের দ্বারা।

অনুবাদ

যদিও তুমি এই জড়া প্রকৃতির অতীত, তবুও বদ্ধ জীবের পরম মঙ্গল সাধনের জন্য তুমি চতুর্বর্গাদি অনুষ্ঠান করে মানুষকে মুক্তির পথ প্রদর্শন কর।

তাৎপর্য

পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাঁর অহৈতুকী কৃপার প্রভাবে এই জড় জগতে অবতরণ করেন, কিন্তু তিনি কখনও জড়া প্রকৃতির গুণের দ্বারা প্রভাবিত হন না। তিনি অবশ্যই জড়া প্রকৃতির অতীত। তিনি তাঁর অহৈতুকী করুণার প্রভাবে অবতরণ করেন মায়ার দ্বারা মোহিত বদ্ধ জীবদের পুনরুদ্ধার করার জন্য। বদ্ধ জীবেরা মায়াশক্তির দ্বারা আক্রান্ত, এবং ভ্রান্তভাবে তারা মায়া উপভোগ করতে চায়, যদিও স্বরূপগতভাবে জীব

কখনও ভোগ করতে পারে না। জীব সর্ব অবস্থাতেই পরমেশ্বর ভগবানের সেবক, এবং যখন সে তার এই প্রকৃত অবস্থার কথা ভুলে যায়, তখন সে জড়া প্রকৃতিকে ভোগ করতে চায়, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সেটি হচ্ছে তার মায়াবদ্ধ অবস্থা। ভগবান অবতরণ করেন জীবের এই ভ্রান্ত উপভোগের বাসনা মোচন করে জীবকে তাঁর ধামে ফিরিয়ে নেওয়ার জন্য। সেটিই হচ্ছে বদ্ধ জীবের প্রতি পরম ভগবানের করুণার প্রকাশ।

শ্লোক ২৫

তথায়ং চাবতারস্তে ভুবো ভারজিহীর্ষয়া।
স্বানাং চানন্যভাবানামনুধ্যানায় চাসকৃৎ॥ ২৫॥

তথা—এইভাবে; **অয়ম্**—এই; **চ**—এবং; **অবতারঃ**—অবতার; **তে**—তোমার; **ভুবঃ**—জড় জগতের; **ভার**—ভার; **জিহীর্ষয়া**—দূর করার জন্য; **স্বানাম্**—বন্ধুদের; **চ অনন্য-ভাবানাম**—এবং অনন্য ভক্তদের; **অনুধ্যানায়**—পুনঃ পুনঃ স্মরণ করার জন্য; **চ**—এবং; **অসকৃৎ**—পূর্ণরূপে তৃপ্ত।

অনুবাদ

এইভাবে ভূ-ভার হরণ করার জন্য এবং তোমার সখাদের এবং তোমার অনন্য ভক্তদের নিরন্তর তোমার কথা স্মরণ করাবার জন্য তুমি অবতরণ কর।

তাৎপর্য

এখানে মনে হয় যেন ভগবান তাঁর ভক্তদের প্রতি পক্ষপাতিত্বপূর্ণ। সকলেই ভগবানের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। তিনি সকলের প্রতিই সমভাবাপন্ন, কিন্তু তবুও তিনি তাঁর আপনজন—তাঁর ভক্তদের প্রতি অধিক অনুগ্রহশীল। ভগবান সকলেরই পিতা। কেউই তাঁর পিতা হতে পারে না, এবং কেউ তাঁর পুত্রও হতে পারে না। কিন্তু তাঁর ভক্তরা হচ্ছেন তাঁর আপনজন, এবং তাঁর ভক্তরা হচ্ছেন তাঁর আত্মীয়-স্বজন। এটি ভগবানের অপ্রাকৃত লীলা। এর সঙ্গে জড় জগতের পিতা-মাতা আদি আত্মীয়তার সম্পর্কের কোন সাদৃশ্য নেই। পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে, ভগবান হচ্ছেন সমস্ত জড় গুণের অতীত, এবং তার ফলে ভক্তিমার্গে তাঁর আত্মীয়-স্বজন এবং আপনজনদের সঙ্গে ·· যে সম্পর্ক তার সঙ্গে জড় জগতের কোন যোগাযোগ নেই।

শ্লোক ২৬

কিমিদং স্বিৎকুতো বেতি দেবদেব ন বেদ্মাহম্।
সর্বতোমুখমায়াতি তেজঃ পরমদারুণম্॥ ২

কিম্—কি ; **ইদম্**—এই ; **স্বিৎ**—আসে ; **কুতঃ**—কোথা থেকে ; **বেত্তি**—অন্যথায় ; **দেব-দেব**—দেবতাদের দেবতা ; **ন**—না ; **বেদ্মি**—আমি জানি ; **অহম্**—আমি ; **সর্বতঃ**—সর্বত্র ; **মুখম্**—দিকসকল ; **আয়াতি**—আসছে ; **তেজঃ**—তেজ ; **পরম**—পরম ; **দারুণম্**—ভয়ঙ্কর।

অনুবাদ

হে দেবতাদের দেবতা, এই ভয়ঙ্কর তেজ কিভাবে সর্বত্র বিস্তৃত হচ্ছে? তা আসছে কোথা থেকে? আমি তা বুঝতে পারছি না।

তাৎপর্য

পরমেশ্বর ভগবানকে যা নিবেদন করা হয়, তা সশ্রদ্ধ বন্দনার মাধ্যমে নিবেদন করতে হয় ; সেটিই হচ্ছে প্রচলিত রীতি, এবং অর্জুন যদিও হচ্ছেন পরমেশ্বর ভগবানের অতি অন্তরঙ্গ সখা, তবুও জনসাধারণের শিক্ষার্থে তিনি সেই নীতি অনুসরণ করেছেন।

শ্লোক ২৭

শ্রীভগবানুবাচ

বেত্থেদং দ্রোণপুত্রস্য ব্রাহ্মমস্ত্রং প্রদর্শিতম্।
নৈবাসৌ বেদ সংহারং প্রাণবাধ উপস্থিতে ॥ ২৭ ॥

শ্রী ভগবান্ উবাচ—পরমেশ্বর ভগবান বললেন ; **বেত্থ**—আমার কাছ থেকে জেনে রাখ ; **ইদম্**—এই ; **দ্রোণ-পুত্রস্য**—দ্রোণাচার্যের পুত্র ; **ব্রাহ্মম্ অস্ত্রম্**—ব্রাহ্ম (পারমাণবিক) অস্ত্র প্রয়োগ করার মন্ত্র ; **প্রদর্শিতম্**—প্রদর্শিত ; **ন**—না ; **এব**—এমন কি ; **অসৌ**—সে ; **বেদ**—জানে ; **সংহারম্**—সংবরণ ; **প্রাণবাধ**—প্রাণব[illegible] **উপস্থিতে**—উপস্থিত হয়েছে।

অনুবাদ

পরমেশ্বর ভগবান বললেনঃ এটি দ্রোণপুত্রের কর্ম। যদিও সে সেই অস্ত্র সংবরণ করার উপায় জানে না, তবুও সে এই ব্রহ্মশির অস্ত্র নিক্ষেপ করেছে। সে তার আসন্ন মৃত্যুভয়ে ভীত হয়ে এই কাজ করেছে।

তাৎপর্য

ব্রহ্মশির অস্ত্র অনেকটা আধুনিক যুগের পারমাণবিক অস্ত্রের মতো। পারমাণবিক শক্তি সব কিছু দহন করতে পারে এবং ব্রহ্মাস্ত্রও তা পারে। তা আণবিক তেজ বিকীরণের মতো এক অসহ্য তাপ সৃষ্টি করে, কিন্তু তাদের মধ্যে পার্থক্য হচ্ছে যে, আণবিক অস্ত্র হচ্ছে স্থূল, কিন্তু ব্রহ্মশির অস্ত্র হচ্ছে মন্ত্রের প্রভাবে বস্তুত সূক্ষ্ম অস্ত্র। এটি এক ভি[illegible] ধরনের বিজ্ঞান, এবং পুরাকালে এই বিজ্ঞান ভারতবর্ষে অনুশীলন করা হত। ম[illegible]

উচ্চারণরূপ যে সূক্ষ্ম বিজ্ঞান তাও জড়, কিন্তু আধুনিক জড় বৈজ্ঞানিকেরা এখনও সে সম্বন্ধে কিছু জানতে পারে নি। সূক্ষ্ম জড় বিজ্ঞান পারমার্থিক নয়, কিন্তু তবুও তার সঙ্গে পারমার্থিক পন্থার সরাসরি যোগ রয়েছে, যা হচ্ছে আরও অধিক সূক্ষ্ম। মন্ত্র উচ্চারণকারী জানতেন কিভাবে সেই অস্ত্র প্রয়োগ করতে হয়, এবং কিভাবে তা সংবরণ করতে হয়। সেটিই ছিল পূর্ণ জ্ঞান। কিন্তু দ্রোণাচার্যের পুত্র, যে এই সূক্ষ্ম বিজ্ঞান ব্যবহার করেছিল, সে জানত না কিভাবে সেই অস্ত্র সংবরণ করতে হয়। মৃত্যুভয়ে ভীত হয়ে সে সেই অস্ত্র প্রয়োগ করেছিল, এবং তার ফলে এই প্রয়োগ কেবল অসমীচীনই ছিল না, তা ছিল অধার্মিক। ব্রাহ্মণের পুত্ররূপে এত ভুল করা তার উচিত হয়নি, এবং তার কর্তব্যকর্মের প্রতি প্রচণ্ড অবহেলার জন্য ভগবান তাকে শাস্তি দিয়েছিলেন।

শ্লোক ২৮

ন হ্যস্যান্যতমং কিঞ্চিদস্ত্রং প্রত্যবকর্শনম্।
জহ্যস্ত্রতেজ উন্নদ্ধমস্ত্রজ্ঞো হ্যস্ত্রতেজসা ॥ ২৮ ॥

ন—না; **হি**—অবশ্যই; **অস্য**—এর; **অন্যতমম্**—অন্য; **কিঞ্চিৎ**—কোন রকম; **অস্ত্রম্**—অস্ত্র; **প্রতি**—প্রতি; **অবকর্শনম্**—প্রতিক্রিয়া; **জহি**—প্রতিহত করা; **অস্ত্র-তেজঃ**—অস্ত্রের তেজ; **উন্নদ্ধম্**—অত্যন্ত শক্তিশালী; **অস্ত্রজ্ঞঃ**—অস্ত্রবিশারদ; **হি**—কার্যত; **অস্ত্র-তেজসা**—তোমার অস্ত্রের প্রভাবের দ্বারা।

অনুবাদ

হে অর্জুন, আর একটি ব্রহ্মশির অস্ত্র প্রয়োগের দ্বারাই কেবল এই অস্ত্রের প্রভাব প্রতিহত করা যাবে। তুমি হচ্ছ অস্ত্রবিশারদ, তোমার নিজের অস্ত্রের দ্বারা তুমি এই অস্ত্রের তেজ প্রতিহত কর।

তাৎপর্য

আণবিক অস্ত্রের প্রভাব প্রতিহত করার মতো কোন অস্ত্র আধুনিক যুগে আবিষ্কার করা হয়নি। কিন্তু সূক্ষ্ম বিজ্ঞানের দ্বারা ব্রহ্মশির অস্ত্রের প্রভাব প্রতিহত করা সম্ভব ছিল, এবং পুরাকালে যাঁরা অস্ত্র-বিজ্ঞানে অত্যন্ত পারদর্শী ছিলেন তাঁরা ব্রহ্মশির অস্ত্রকে প্রতিহত করতে পারতেন। দ্রোণাচার্যের পুত্র সেই অস্ত্র সংবরণ করার কৌশল জানত না, এবং তাই ভগবান অর্জুনকে নির্দেশ দিয়েছিলেন তাঁর নিজের অস্ত্রের দ্বারা সেই অস্ত্রের প্রভাব প্রতিহত করতে।

শ্লোক ২৯

সূত উবাচ

শ্রুত্বা ভগবতা প্রোক্তং ফাল্গুনঃ পরবীরহা।
স্পৃষ্টাপস্তং পরিক্রম্য ব্রাহ্মং ব্রাহ্মাস্ত্রং সংদধে ॥ ২৯ ॥

সূতঃ উবাচ—সূত গোস্বামী বললেন; **শ্রুত্বা**—শ্রবণ করে; **ভগবতা**—পরমেশ্বর ভগবানের দ্বারা; **প্রোক্তম্**—উক্ত; **ফাল্গুনঃ**—ফাল্গুনী (অর্জুনের আর একটি নাম); **পরবীরহা**—প্রতিপক্ষের বীরদের হত্যাকারী; **স্পৃষ্ট্বা**—স্পর্শ করে; **অপঃ**—জল; **তম্**—তাঁকে; **পরিক্রম্য**—পরিক্রমা করে; **ব্রাহ্মম্**—পরমেশ্বর ভগবান; **ব্রাহ্মাস্ত্রম্**—পরম অস্ত্র; **সংদধে**—ক্রিয়া করলেন।

অনুবাদ

শ্রীসূত গোস্বামী বললেনঃ পরমেশ্বর ভগবানের কাছ থেকে সে কথা শুনে অর্জুন পবিত্র হওয়ার জন্য জল স্পর্শ করে আচমন করলেন, এবং তারপর পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে প্রদক্ষিণ করে তিনি ব্রহ্মশির অস্ত্রকে প্রতিহত করার জন্য তাঁর ব্রহ্মশির অস্ত্র প্রয়োগ করলেন।

শ্লোক ৩০

সংহত্যান্যোন্যমুভয়োস্তেজসী শরসংবৃতে।
আবৃত্য রোদসী খং চ ববৃধাতেঽর্কবহ্নিবৎ ॥ ৩০ ॥

সংহত্য—সমন্বয়ের দ্বারা; **অন্যোন্যম্**—পরস্পর; **উভয়োঃ**—উভয়ের; **তেজসী**—তেজের দ্বারা; **শর**—অস্ত্র; **সংবৃতে**—আচ্ছাদন করে; **আবৃত্য**—আবৃত করে; **রোদসী**—পূর্ণ প্রভাব; **খম্ চ**—নভোমণ্ডলও; **ববৃধাতে**—বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়ে; **অর্ক**—সূর্যমণ্ডল; **বহ্নিবৎ**—অগ্নির মতো।

অনুবাদ

সেই দুটি ব্রহ্মশির অস্ত্রের তেজপুঞ্জের সংঘর্ষের ফলে সূর্যমণ্ডলের মতো এক প্রকাণ্ড অগ্নিপিণ্ড নভোমণ্ডল এবং সমস্ত গ্রহগুলি আচ্ছাদিত করেছিল।

তাৎপর্য

ব্রহ্মশির অস্ত্রের সংঘর্ষের ফলে যে প্রচণ্ড তাপের সৃষ্টি হয়েছিল, তা প্রলয়কালে সূর্যের আগুনের মতো। আণবিক অস্ত্রের প্রভাবে যে তাপ সৃষ্টি হয়, ব্রহ্মশির অস্ত্রের তুলনায় সেই তাপ অত্যন্ত নগণ্য। পারমাণবিক অস্ত্র বড় জোর একটি গ্রহকে ধ্বংস করতে পারে, কিন্তু ব্রহ্মশির অস্ত্র সমস্ত গ্রহ-নক্ষত্রকে ধ্বংস করে দিতে পারে। তাই সেই তাপের সঙ্গে প্রলয়াগ্নির তুলনা করা হয়েছে।

শ্লোক ৩১

দৃষ্ট্বাস্ত্রতেজস্তু তয়োস্ত্রীঁল্লোকান্ প্রদহন্মহৎ।
দহ্যমানাঃ প্রজাঃ সর্বাঃ সাংবর্তকমমংসত ॥ ৩১ ॥

দৃষ্ট্বা—দর্শন করে; **অস্ত্র**—অস্ত্র; **তেজঃ**—তেজ; **তু**—কিন্তু; **তয়োঃ**—উভয়ের; **ত্রিন্ লোকান্**—ত্রিভুবন; **প্রদহৎ**—দগ্ধ; **মহৎ**—প্রচণ্ডভাবে; **দহ্যমানাঃ**—দগ্ধ; **প্রজাঃ**—প্রজা; **সর্বাঃ**—সর্বত্র; **সাংবর্তকম্**—যে অগ্নি প্রলয়ের সময় ব্রহ্মাণ্ড ধ্বংস করে; **অমংসত**—ভাবতে শুরু করল।

অনুবাদ

ত্রিভুবনের সমস্ত অধিবাসীরা সেই অস্ত্র দুটির সংঘর্ষের আগুনের তাপ অনুভব করে প্রলয়কালীন সংবর্তক আগুনের কথা ভাবতে লাগলেন।

তাৎপর্য

তিনটি ভুবন হচ্ছে উচ্চতর স্বর্গলোক, মধ্যবর্তী ভূলোক এবং নিম্নবর্তী পাতাললোক। ব্রহ্মশির অস্ত্র যদিও এই পৃথিবীতে নিক্ষেপ করা হয়েছিল, কিন্তু সেই অস্ত্র দুটি সংঘর্ষের ফলে যে তাপ সৃষ্টি হয়েছিল, তা সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড জুড়ে প্রসারিত হয়েছিল, এবং বিভিন্ন লোকের অধিবাসীরা সেই প্রচণ্ড তাপ অনুভব করেছিলেন এবং তার সঙ্গে সংবর্তক আগুনের তুলনা করেছিলেন। এর থেকে বোঝা যায় যে মূর্খ লোকেরা যে বলে অন্যান্য গ্রহে কোন জীব নেই, তা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত।

শ্লোক ৩২

প্রজোপদ্রবমালক্ষ্য লোকব্যতিকরং চ তম্।
মতং চ বাসুদেবস্য সংজহারার্জুনো দ্বয়ম্ ॥ ৩২ ॥

প্রজা—জনসাধারণ; **উপদ্রবম্**—উপদ্রব; **আলক্ষ্য**—দর্শন করে; **লোক**—গ্রহসকল; **ব্যতিকরম্**—ধ্বংস; **চ**—ও; **তম্**—তা; **মতম্**—মত; **চ**—এবং; **বাসুদেবস্য**—বাসুদেব শ্রীকৃষ্ণের; **সংজহার**—সংবরণ; **অর্জুনঃ**—অর্জুন; **দ্বয়ম্**—উভয় অস্ত্র।

অনুবাদ

এইভাবে জনসাধারণকে উপক্রুত দেখে এবং গ্রহসমূহের অবশ্যম্ভাবী ধ্বংসে আশঙ্কা করে অর্জুন তৎক্ষণাৎ ভগবান শ্রীকৃষ্ণের ইচ্ছা অনুসারে সেই দুটি ব্রহ্মশির অস্ত্রকেই তৎক্ষণাৎ সংবরণ করলেন।

তাৎপর্য

আধুনিক আণবিক অস্ত্র যে এই পৃথিবী ধ্বংস করতে পারে বলে মনে করা হয়, তা একটি শিশুসুলভ কল্পনা ছাড়া আর কিছুই নয়। প্রথমত, আণবিক অস্ত্রের পৃথিবী ধ্বংস করার ক্ষমতা নেই এবং দ্বিতীয়ত, পরমেশ্বর ভগবানের অনুমোদন ব্যতীত কোন কিছুর সৃষ্টি হতে পারে না অথবা ধ্বংস হতে পারে না। প্রকৃতির নিয়ম যে চরম

শক্তিসম্পন্ন, সে কথা মনে করাও ভুল। জড়া প্রকৃতির নিয়ম ভগবানের অধ্যক্ষতায় কার্যকরী হয়, যে কথা *ভগবদ্গীতায়* প্রতিপন্ন হয়েছে। ভগবান বলেছেন যে, তাঁর অধ্যক্ষতায় প্রকৃতি পরিচালিত হয়। ভগবানের ইচ্ছার প্রভাবেই কেবল এই পৃথিবী ধ্বংস হতে পারে, রাজনীতিবিদদের খামখেয়ালীর দ্বারা নয়। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যখন চাইলেন যে দ্রৌণী এবং অর্জুন উভয়ের অস্ত্র দুটিই সংবরণ করা হোক, তখন অর্জুন তৎক্ষণাৎ তা সম্পাদন করেছিলেন। তেমনই, সর্বশক্তিমান ভগবানের প্রতিনিধি রয়েছেন, এবং তাঁর ইচ্ছা অনুসারেই কেবল কার্য সম্পাদিত হয়।

শ্লোক ৩৩

তত আসাদ্য তরসা দারুণং গৌতমীসুতম্।
ববন্ধামর্ষতাম্রাক্ষঃ পশুং রশনয়া যথা ॥ ৩৩ ॥

ততঃ—তখন; **আসাদ্য**—গ্রেপ্তার করে; **তরসা**—দক্ষতা সহকারে; **দারুণম্**—ভয়ঙ্কর; **গৌতমী-সুতম্**—গৌতমীর পুত্র; **ববন্ধ**—বন্ধন করে; **অমর্ষ**—ক্রুদ্ধ; **তাম্র-অক্ষঃ**—তাম্রের মতো রক্তিম চক্ষুদ্বয়; **পশুম্**—পশু; **রশনয়া**—রজ্জুর দ্বারা; **যথা**—যেমন।

অনুবাদ

অর্জুন, ক্রোধে যাঁর চোখ দুটি তাম্র-গোলকের মতো রক্তিম হয়ে উঠেছিল, ক্ষিপ্রভাবে গৌতমীর পুত্রকে গ্রেপ্তার করে একটি পশুর মতো দড়ি দিয়ে বেঁধে ফেললেন।

তাৎপর্য

অশ্বত্থামার মাতা কৃপী ছিলেন গৌতম কুলোদ্ভূতা। এই শ্লোকের উল্লেখযোগ্য বিষয় হচ্ছে যে অশ্বত্থামাকে একটি পশুর মতো দড়ি দিয়ে বাঁধা হয়েছিল। শ্রীধর স্বামীর মতে, অর্জুন তাঁর ধর্ম অনুসারে এই ব্রাহ্মণ-পুত্রটিকে একটি পশুর মতো রজ্জুবদ্ধ করতে বাধ্য হয়েছিলেন। শ্রীধর স্বামীর এই মন্তব্যটি শ্রীকৃষ্ণের পরবর্তী উক্তির দ্বারা প্রতিপন্ন হয়েছে। অশ্বত্থামা যদিও ছিল দ্রোণাচার্য এবং কৃপীর পুত্র কিন্তু অধঃপতিত হওয়ার ফলে তার সঙ্গে ব্রাহ্মণোচিত ব্যবহার না করে পশুর মতো আচরণ করা উপযুক্তই হয়েছে।

শ্লোক ৩৪

শিবিরায় নিনীষন্তং রজ্জ্বা বদ্ধ্বা রিপুং বলাৎ।
প্রাহার্জুনং প্রকুপিতো ভগবানম্বুজেক্ষণঃ ॥ ৩৪ ॥

শিবিরায়—শিবিরে যাওয়ার পথে; **নিনীষন্তম্**—তাকে নিয়ে যাওয়ার সময়; **রজ্জ্বা**—রজ্জুর দ্বারা; **বদ্ধ্বা**—বদ্ধ; **রিপুম্**—শত্রু; **বলাৎ**—বলপূর্বক; **প্রাহ**—বলেছিলেন; **অর্জুনম্**—অর্জুনকে; **প্রকুপিতঃ**—ক্রুদ্ধ; **ভগবান্**—পরমেশ্বর ভগবান; **অম্বুজ-ঈক্ষণঃ**—পদ্মের মতো সুন্দর যাঁর দৃষ্টিপাত।

অনুবাদ

অশ্বত্থামাকে রজ্জুবদ্ধ করার পর অর্জুন তাকে শিবিরে নিয়ে যেতে চেয়েছিলেন। পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তখন তাঁর পদ্মের মতো সুন্দর চক্ষুর দ্বারা দৃষ্টিপাত করে ক্রুদ্ধ অর্জুনকে বলেছিলেন।

তাৎপর্য

এখানে অর্জুন এবং কৃষ্ণ উভয়কেই ক্রুদ্ধ বলে বর্ণনা করা হয়েছে। কিন্তু অর্জুনের চক্ষুদ্বয় ক্রোধে তাম্রের মতো আরক্তিম হলেও শ্রীকৃষ্ণের চক্ষুদ্বয় পদ্মের মতো বলে বর্ণনা করা হয়েছে। এ থেকে বোঝা যায় যে অর্জুনের ক্রোধ এবং শ্রীকৃষ্ণের ক্রোধ সমপর্যায় নয়। ভগবান অপ্রাকৃত, এবং তাই তিনি সর্ব অবস্থাতেই পরম ভাব সমন্বিত। তাঁর ক্রোধ জড়া প্রকৃতির গুণের দ্বারা প্রভাবিত বদ্ধ জীবের ক্রোধের মতো নয়। যেহেতু তিনি হচ্ছেন পরম-তত্ত্ব, তাই তাঁর ক্রোধ এবং আনন্দ উভয়ই সমান। তাঁর ক্রোধ জড়া প্রকৃতির তিনটি গুণের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে প্রকাশিত হয় না। এটি কেবল তাঁর ভক্তের প্রতি পক্ষপাতিত্বের প্রকাশ, কেন না সেটিই হচ্ছে তাঁর অপ্রাকৃত প্রকৃতি। তাই তিনি ক্রুদ্ধ হলেও তাঁর ক্রোধের পাত্র তাঁর আশীর্বাদপুষ্ট হন। তিনি সর্ব অবস্থাতেই অপরিবর্তনীয়।

শ্লোক ৩৫

মৈনং পার্থার্হসি ত্রাতুং ব্রহ্মবন্ধুমিমং জহি।
যোঽসাবনাগসঃ সুপ্তানবধীন্নিশি বালকান্ ॥ ৩৫ ॥

মা—না; **এনম্**—তাকে; **পার্থ**—হে অর্জুন; **অর্হসি**—উচিত; **ত্রাতুম্**—ত্রাণ করা; **ব্রহ্ম-বন্ধুম্**—ব্রাহ্মণের আত্মীয়; **ইমম্**—তাকে; **জহি**—হত্যা করা; **যঃ**—যার আছে; **অসৌ**—সেই সমস্ত; **অনাগসঃ**—নিষ্পাপ; **সুপ্তান্**—সুপ্ত অবস্থায়; **অবধীৎ**—হত্যা করেছিল; **নিশি**—রাত্রিবেলা; **বালকান্**—বালকদের।

অনুবাদ

হে পার্থ, যে অশ্বত্থামা নিরপরাধ, নিদ্রিত শিশুদের রাত্রিবেলা হত্যা করেছে, এই সেই ব্রাহ্মণাধমকে ছেড়ে দেওয়া যুক্তিসঙ্গত নয়, একে বধ কর।

তাৎপর্য

এখানে ব্রহ্মবন্ধু কথাটি তাৎপর্যপূর্ণ। ব্রাহ্মণকুলে জন্ম হওয়া সত্ত্বেও যদি তার মধ্যে ব্রাহ্মণোচিত গুণাবলী না থাকে তা হলে তাকে ব্রাহ্মণ বলা চলে না, তাকে বলা হয় ব্রহ্মবন্ধু। হাইকোর্টের বিচারপতির পুত্র যেমন বিচারপতি নয়, তবে তাকে বিচারপতির পুত্র বা বিচারপতির আত্মীয় বলে সম্বোধন করা যেতে পারে। তেমনি, জন্ম অনুসারে কেউ ব্রাহ্মণ হয় না, ব্রাহ্মণোচিত গুণাবলীর দ্বারাই মানুষ ব্রাহ্মণ হয়। হাইকোর্টের বিচারপতির পদ যেমন উপযুক্ত যোগ্যতা অনুসারে লাভ করা যায়, তেমনই ব্রাহ্মণত্ব উপযুক্ত গুণাবলীর দ্বারাই কেবল লাভ করা যায়। শাস্ত্রে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে ব্রাহ্মণেতর কুলোদ্ভূত মানুষের মধ্যে যদি ব্রাহ্মণোচিত গুণাবলী প্রকাশ হতে দেখা যায়, তা হলে তাকে ব্রাহ্মণ বলে স্বীকার করতে হবে; এবং ব্রাহ্মণ কুলোদ্ভূত কোনও মানুষের মধ্যে যদি ব্রাহ্মণোচিত গুণাবলী না দেখা যায়, তা হলে তাকে ব্রাহ্মণ বলে স্বীকার করা যায় না, বড় জোর তাকে ব্রাহ্মণের আত্মীয় বা ব্রহ্মবন্ধু বলে গ্রহণ করা যেতে পারে। সমস্ত ধর্মের অধিনায়ক শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং বেদে সে পার্থক্য নিরূপণ করেছেন, এবং তার কারণ তিনি পরবর্তী শ্লোকগুলিতে বিশ্লেষণ করেছেন।

শ্লোক ৩৬

মত্তং প্রমত্তমুন্মত্তং সুপ্তং বালং স্ত্রিয়ং জড়ম্।
প্রপন্নং বিরথং ভীতং ন রিপুং হন্তি ধর্মবিৎ ॥ ৩৬ ॥

মত্তম্—মত্ত; **প্রমত্তম্**—প্রমত্ত; **উন্মত্তম্**—উন্মত্ত; **সুপ্তম্**—নিদ্রিত; **বালম্**—বালক; **স্ত্রিয়ম্**—স্ত্রীলোক; **জড়ম্**—মূর্খ; **প্রপন্নম্**—শরণাগত; **বিরথম্**—রথবিহীন; **ভীতম্**—ভীত; **ন**—না; **রিপুম্**—শত্রু; **হন্তি**—হত্যা করা; **ধর্ম-বিৎ**—ধর্মজ্ঞ।

অনুবাদ

মত্ত, প্রমত্ত, উন্মত্ত, নিদ্রিত, নিশ্চেষ্ট, শরণাগত, ভগ্নরথ, ভয়ার্ত, বালক বা স্ত্রীলোক শত্রু হলেও ধার্মিক ব্যক্তি তাকে বধ করেন না।

তাৎপর্য

যে শত্রু বাধা দান করে না তাকে ধর্মের বীর কখনও হত্যা করেন না; পূর্বে যুদ্ধ হত ধর্ম অনুশাসনের ভিত্তিতে; ইন্দ্রিয়-তৃপ্তির জন্য কখনও তা হত না। শত্রু যদি পানোন্মত্ত, নিদ্রিত ইত্যাদি উপরোক্ত অবস্থায় থাকত, তা হলে কখনও তাকে হত্যা করা হত না। এগুলি হচ্ছে ধর্মযুদ্ধের কয়েকটি নীতি। পূর্বে কখনও স্বার্থপর রাজনৈতিক নেতাদের খেয়ালের ফলে যুদ্ধ হত না; তা অনুষ্ঠিত হত সব রকমের পাপ থেকে মুক্ত ধর্মনীতি অনুসারে। ধর্মনীতির ভিত্তিতে হিংসা আচরণ করা তথাকথিত অহিংসা থেকে অনেক উন্নত।

শ্লোক ৩৭

স্বপ্রাণান্ যঃ পরপ্রাণৈঃ প্রপুষ্ণাত্যঘৃণঃ খলঃ।
তদ্বধস্তস্য হি শ্রেয়ো যদ্দোষাদ্যাত্যধঃ পুমান্ ॥ ৩৭ ॥

স্ব-প্রাণান্—নিজের জীবন; **যঃ**—যে; **পরপ্রাণৈঃ**—অনেক হত্যা করে; **প্রপুষ্ণাতি**—যথাযথভাবে প্রতিপালন করা হয়; **অঘৃণঃ**—নির্লজ্জ; **খলঃ**—ক্রূর; **তৎ-বধঃ**—তাকে হত্যা করা; **তস্য**—তার; **হি**—অবশ্যই; **শ্রেয়ঃ**—শ্রেয়; **যৎ**—যার দ্বারা; **দোষাৎ**—দোষের দ্বারা; **যাতি**—গমন করে; **অধঃ**—নিম্নতর লোকে; **পুমান্**—মানুষ।

অনুবাদ

যে ঘৃণ্য, ক্রূর ব্যক্তি পরের প্রাণ বধ করে স্বীয় প্রাণ পরিপোষণ করে, তাকে বধ করাই তার পক্ষে মঙ্গলজনক, তা না হলে তার সেই পাপের ফলে সে নরকগামী হবে।

তাৎপর্য

যে মানুষ অপরকে হত্যা করে অত্যন্ত নিষ্ঠুর এবং নির্লজ্জভাবে জীবনধারণ করে, তাকে প্রাণদণ্ড দেওয়াই উপযুক্ত শাস্তি। রাজ্য-শাসনের নীতি হচ্ছে নিষ্ঠুর হত্যাকারীকে নরক থেকে উদ্ধার করার জন্য প্রাণদণ্ড দেওয়া। সরকার যে হত্যাকারীকে প্রাণদণ্ড দান করে তার পক্ষে তা মঙ্গলজনক, কেন না তা না হলে তার পরবর্তী জীবনে তার সেই পাপের ফল তাকে ভোগ করতে হবে। হত্যাকারীকে এইভাবে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করা যদিও সব চাইতে কঠোর দণ্ড, তবুও সেটাতার মঙ্গলেরই জন্য। স্মৃতি শাস্ত্রে বলা হয়েছে যে, রাজা যখন হত্যাকারীকে এই দণ্ড দান করেন, তার ফলে সে তার সমস্ত পাপ থেকে মুক্ত হয়। এমন কি তার ফলে সে স্বর্গলোকেও উন্নীত হতে পারে। ধর্মনীতি এবং সমাজনীতির প্রণেতা মনু নির্দেশ দিয়ে গেছেন যে, পশুঘাতকদেরও হত্যাকারী বলে বিবেচনা করতে হবে, কেন না পশুর মাংস উন্নত মানুষদের আহার্য নয়। মানুষের মুখ্য কর্তব্য হচ্ছে ভগবদ্ধামে ফিরে যাওয়ার জন্য নিজেকে প্রস্তুত করা। তিনি বলেছেন যে পশুহত্যা সংঘবদ্ধভাবে চক্রান্ত করে মানুষ হত্যা করারই মতো, এবং তার ফলে তাদের সকলকে দণ্ডভোগ করতে হবে। পশুহত্যায় যে অনুমতি দেয়, যে পশুকে হত্যা করে, যে পশু-মাংস বিক্রয় করে, যে পশু-মাংস পরিবেশন করে, তারা সকলেই হচ্ছে ঘাতক এবং প্রকৃতির নিয়মে তাদের সকলকেই দণ্ডভোগ করতে হবে। আধুনিক বিজ্ঞানের অনেক উন্নতি সত্ত্বেও কেউই আজ পর্যন্ত একটি জীবও তৈরি করতে পারেনি, এবং তাই কোন প্রাণীকে হত্যা করার অধিকার কারও নেই। যারা মাংসাহারী তাদের জন্য যজ্ঞে পশুবলি দিয়ে কেবল সেই মাংস আহার করার অনুমতি শাস্ত্রে দেওয়া হয়েছে, এবং

এই ধরনের অনুমোদন পশুহত্যা করতে উদ্বুদ্ধ করার জন্য নয়, পক্ষান্তরে কসাইখানায় ইচ্ছামত পশুবলি দেওয়া বন্ধ করার জন্য। যজ্ঞবেদিতে পশুবলি দেওয়া হলে সেই পশু সরাসরিভাবে মনুষ্য স্তরে উন্নীত হয়, এবং পশু-মাংস আহারীও তার পাপ থেকে মুক্ত হয়। জড় জগৎ সর্বদাই নানা রকম উৎকণ্ঠায় পূর্ণ, এবং পশুহত্যার ফলে সেই পরিবেশ অত্যন্ত কলুষিত হয়ে উঠেছে এবং তার ফলে যুদ্ধ, মহামারী, দুর্ভিক্ষ এবং নানা রকমের প্রাকৃতিক গোলযোগ দেখা দেবে।

শ্লোক ৩৮

প্রতিশ্রুতং চ ভবতা পাঞ্চাল্যৈ শৃণ্বতো মম।
আহরিষ্যে শিরস্তস্য যস্তে মানিনি পুত্রহা ॥ ৩৮ ॥

প্রতিশ্রুতম্—প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে; **চ**—এবং; **ভবতা**—তোমার দ্বারা; **পাঞ্চাল্যৈঃ**—পাঞ্চালের রাজকন্যা (দ্রৌপদী); **শৃণ্বতঃ**—যা শোনা হয়েছে; **মম**—ব্যক্তিগতভাবে আমার দ্বারা; **আহরিষ্যে**—আমাকে আহরণ করতে হবে; **শিরঃ**—মস্তক; **তস্য**—তার; **যঃ**—যার; **তে**—তোমার; **মানিনি**—বিবেচনা; **পুত্র-হা**—পুত্রদের হত্যাকারী।

অনুবাদ

হে অর্জুন, আমি শুনেছি যে তুমি দ্রৌপদীর কাছে এই বলে প্রতিজ্ঞা করেছ যে তুমি তাঁর পুত্রহত্যাকারীর মস্তক তাঁকে উপহার দেবে।

শ্লোক ৩৯

তদসৌ বধ্যতাং পাপ আততায্যাত্মবন্ধুহা।
ভর্তুশ্চ বিপ্রিয়ং বীর কৃতবান্ কুলপাংসনঃ ॥ ৩৯ ॥

তৎ—তার ফলে; **অসৌ**—এই; **বধ্যতাম্**—হত্যা করা হবে; **পাপঃ**—পাপী; **আততায়ী**—আততায়ী; **আত্ম**—নিজের; **বন্ধু-হা**—স্বজন হত্যাকারী; **ভর্তুঃ**—পতি; **চ**—ও; **বিপ্রিয়ম্**—অপ্রিয়; **বীর**—হে বীর; **কৃতবান্**—করেছ; **কুল-পাংসনঃ**—কুলাঙ্গার।

অনুবাদ

অতএব হে বীর! এই পাপিষ্ঠ কুলাঙ্গার তোমার স্বজনদের হত্যা করেছে, এবং স্বীয় প্রভু দুর্যোধনের অনভিপ্রেত কার্য অনুষ্ঠান করেছে। সুতরাং এই অশ্বত্থামাকে বধ কর।

তাৎপর্য

এখানে দ্রোণাচার্যের পুত্রকে কুলাঙ্গার বলে নিন্দা করা হয়েছে। দ্রোণাচার্য ছিলেন শ্রদ্ধার্হ। যদিও তিনি শত্রুপক্ষে যোগদান করেছিলেন, তবুও পাণ্ডবেরা তাঁকে সর্বদাই গভীর দৃষ্টিতে দেখতেন, এবং কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ হওয়ার পূর্বে অর্জুন প্রণতি নিবেদন করেছিলেন। এইভাবে তাঁদের সম্পর্ক অক্ষুণ্ণ ছিল। কিন্তু দ্রোণাচার্যের পুত্র এমন সমস্ত জঘন্য কর্ম করেছিল, যা উচ্চ কুলোদ্ভূত কোন দ্বিজ কখনও করেনি। দ্রোণাচার্যের পুত্র অশ্বত্থামা দ্রৌপদীর পাঁচ পুত্রকে নিদ্রিত অবস্থায় হত্যা করেছিল। তার এই জঘন্য কর্ম তার প্রভু দুর্যোধনও অনুমোদন করেনি, এবং এই রকম নৃশংসভাবে পাণ্ডবদের নিদ্রিত পুত্রদের হত্যা করার জন্য দুর্যোধন তার প্রতি অসন্তুষ্ট হয়েছিলেন। অর্জুনের পরিবারের সদস্যদের হত্যা করার ফলে অশ্বত্থামাকে দণ্ডদান করা অর্জুনের কর্তব্য ছিল। শাস্ত্রে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, যে অতর্কিতে আক্রমণ করে অথবা পিছন থেকে আক্রমণ করে প্রাণ সংহার করতে উদ্যত হয় অথবা গৃহে আগুন লাগায় অথবা স্ত্রী অপহরণকারী, তাকে হত্যা করাই হচ্ছে বিধেয়। শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে সে কথা মনে করিয়ে দেন যাতে অর্জুন যথাযথভাবে তাঁর কর্তব্য সম্পাদন করেন।

শ্লোক ৪০

সূত উবাচ

এবং পরীক্ষতা ধর্মং পার্থঃ কৃষ্ণেন চোদিতঃ।
নৈচ্ছদ্ধন্তুং গুরুসুতং যদ্যপ্যাত্মহনং মহান্ ॥ ৪০ ॥

সূতঃ উবাচ—সূত গোস্বামী বললেন; **এবম্**—এইভাবে; **পরীক্ষতা**—পরীক্ষিত হয়ে; **ধর্মম্**—কর্তব্যকর্ম সম্পাদন সম্বন্ধে; **পার্থঃ**—শ্রীঅর্জুন; **কৃষ্ণেন**—শ্রীকৃষ্ণের দ্বারা; **চোদিতঃ**—অনুপ্রাণিত হয়ে; **ন ঐচ্ছৎ**—করতে চাইলেন না; **হন্তুম্**—হত্যা করতে; **গুরু-সুতম্**—গুরুপুত্র; **যদ্যপি**—যদিও; **আত্ম-হনম্**—পুত্রদের হত্যাকারী; **মহান্**—মহান।

অনুবাদ

সূত গোস্বামী বললেন ঃ এইভাবে অর্জুনের ধর্মনিষ্ঠা পরীক্ষা করতে করতে শ্রীকৃষ্ণ যদিও তাঁকে উত্তেজিত করছিলেন, তবুও মহাত্মা অর্জুন তাঁর মহত্ত্ব হেতু পুত্রহন্তা হলেও গুরুপুত্র অশ্বত্থামাকে হত্যা করতে চাইলেন না।

তাৎপর্য

অর্জুন ছিলেন নিঃসন্দেহে একজন মহাত্মা, যা এখানে পুনরায় প্রমাণিত হয়েছে। এখানে ভগবান স্বয়ং তাঁকে অনুপ্রাণিত করেছিলেন দ্রোণাচার্যের পুত্রকে হত্যা করার জন্য, কিন্তু অর্জুন বিবেচনা করেছিলেন যে দ্রোণাচার্যের পুত্র যদিও ছিল কুলাঙ্গার

এবং যদিও সে অনর্থক নানা রকম নৃশংস কর্ম করেছিল, কিন্তু তবুও তাঁর গুরুদেবের পুত্র বলে তিনি তাকে ক্ষমা করতে চেয়েছিলেন।

শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনের ধর্মনিষ্ঠা পরীক্ষা করার জন্য বাহ্যিকভাবে তাঁকে অনুপ্রাণিত করছিলেন। এমন নয় যে ধর্ম সম্বন্ধে অর্জুনের যথার্থ জ্ঞান ছিল না, অথবা শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনের ধর্মনিষ্ঠা সম্বন্ধে অবগত ছিলেন না। শ্রীকৃষ্ণ এইভাবে তাঁর শুদ্ধ ভক্তদের পরীক্ষা করেন লোকসমক্ষে তাঁদের ধর্মনিষ্ঠা উজ্জ্বল দৃষ্টান্তরূপে প্রদর্শন করার জন্য। গোপিকাদের তিনি এইভাবে পরীক্ষা করেছিলেন, প্রহ্লাদ মহারাজকে তিনি পরীক্ষা করেছিলেন। সমস্ত শুদ্ধ ভক্তরাই ভগবানের এই পরীক্ষায় সাফল্য সহকারে উত্তীর্ণ হন।

শ্লোক ৪১

অথোপেত্য স্বশিবিরং গোবিন্দপ্রিয়সারথিঃ।
ন্যবেদয়ত্তং প্রিয়ায়ৈ শোচন্ত্যা আত্মজান্ হতান্ ॥ ৪১ ॥

অথ—তারপর; **উপেত্য**—উপস্থিত হয়ে; **স্ব**—স্বীয়; **শিবিরম্**—শিবিরে; **গোবিন্দ**—গোবিন্দ (শ্রীকৃষ্ণ); **প্রিয়**—প্রিয়; **সারথি**—সারথি; **ন্যবেদয়ৎ**—সমর্পণ করে; **তম্**—তাঁকে; **প্রিয়ায়ৈ**—তাঁর প্রিয়া দ্রৌপদীকে; **শোচন্ত্যা**—শোকমগ্না; **আত্ম-জান্**—পুত্রদের; **হতান্**—হত্যা করেছে।

অনুবাদ

তারপর শ্রীকৃষ্ণকে যিনি সখা ও সারথিরূপে বরণ করেছিলেন, সেই অর্জুন নিজ শিবিরে উপস্থিত হয়ে নিহত পুত্রশোকমগ্না পত্নী দ্রৌপদীর কাছে অশ্বত্থামাকে সমর্পণ করলেন।

তাৎপর্য

শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে অর্জুনের অপ্রাকৃত সম্পর্ক ছিল পরম বন্ধুত্বের সম্পর্ক। ভগবদ্গীতাতে শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং অর্জুনকে তাঁর প্রিয়তম সখারূপে সম্বোধন করেছেন। এইভাবে প্রতিটি জীবই ভৃত্যরূপে অথবা সখারূপে অথবা পিতা-মাতারূপে অথবা প্রেমিকারূপে ভগবানের সঙ্গে এক অপ্রাকৃত প্রেমের সম্পর্কে সম্পর্কিত। এইভাবে সকলেই চিন্ময় ভগবদ্ধামে ভগবানের সঙ্গ-সুখ উপভোগ করতে পারেন, যদি তিনি সেই বাসনা করেন এবং ঐকান্তিক নিষ্ঠা সহকারে ভক্তিযোগের মাধ্যমে সেই চেষ্টা করেন।

শ্লোক ৪২

তথাহৃতং পশুবৎ পাশবদ্ধ-
মবাঙ্মুখং কর্মজুগুপ্সিতেন।
নিরীক্ষ্য কৃষ্ণাপকৃতং গুরোঃ সুতং
বামস্বভাবা কৃপয়া ননাম চ ॥ ৪২ ॥

তথা—এইভাবে; **আহৃতম্**—আনীত; **পশুবৎ**—পশুর মতো; **পাশ-বদ্ধম্**—রজ্জুবদ্ধ; **অবাক্-মুখম্**—মুখে কোন কথা নেই; **কর্ম**—কর্ম; **জুগুপ্সিতে**—জঘন্য; **নিরীক্ষ্য**—দেখে; **কৃষ্ণা**—দ্রৌপদী; **অপকৃতম্**—অপকারী; **গুরোঃ**—গুরু; **সুতম্**—পুত্র; **বাম**—সুন্দর; **স্বভাবা**—স্বভাব-সম্পন্না; **কৃপয়া**—কৃপা প্রভাবে; **ননাম**—প্রণাম; **চ**—এবং।

অনুবাদ

পশুর মতো রজ্জুবদ্ধ এবং অত্যন্ত জঘন্য কার্য করার ফলে অধোবদন এবং মৌন গুরুপুত্রকে দর্শন করে অত্যন্ত শোভন-চরিতা দ্রৌপদী দয়ার্দ্র চিত্তে সম্ভ্রমে তাকে প্রণাম করলেন।

তাৎপর্য

অশ্বত্থামাকে ভগবান স্বয়ং নিন্দা করেছিলেন এবং অর্জুন তাকে দণ্ডদান করেছিলেন, তিনি তার সঙ্গে ব্রাহ্মণের পুত্র বা আচার্যের পুত্রের মতো আচরণ করেননি। কিন্তু পুত্রশোকে শোকমগ্না দ্রৌপদীর কাছে যখন তাঁর পুত্রদের হত্যাকারী সেই অশ্বত্থামাকে নিয়ে আসা হল, তখন দ্রৌপদী তাঁকে ব্রাহ্মণোচিত সম্মান প্রদর্শন করেছিলেন। তা ছিল তাঁর স্ত্রী-সুলভ কোমল স্বভাবের প্রকাশ। স্ত্রীলোকেরা অপরিণত বয়স্ক বালকের মতো, এবং তাই তাদের প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষদের মতো বিচার করার ক্ষমতা নেই। অশ্বত্থামা নিজেকে দ্রোণাচার্যের অযোগ্য পুত্র বলে প্রমাণ করেছিল এবং সেই জন্য পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাকে নিন্দা করেছিলেন, কিন্তু তবুও কোমল-স্বভাবা স্ত্রী দ্রৌপদী ব্রাহ্মণ বলে তাকে সম্মান না করে পারলেন না।

এখনও হিন্দু পরিবারের মহিলারা ব্রাহ্মণদের উপযুক্ত শ্রদ্ধা প্রদর্শন করেন, তা সেই ব্রহ্ম-বন্ধু যতই অধঃপতিত এবং জঘন্য হোক না কেন। কিন্তু পুরুষেরা এই সমস্ত ব্রহ্ম-বন্ধুদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করতে শুরু করেছেন, যাদের উচ্চ ব্রাহ্মণ পরিবারে জন্ম হলেও প্রকৃতপক্ষে তারা হচ্ছে শূদ্রদের থেকেও অধম।

এই শ্লোকে বামস্বভাবা, অর্থাৎ 'কোমল এবং নম্র স্বভাবা' কথাটি ব্যবহার করা হয়েছে। ভাল মানুষ অথবা মহিলারা সব কিছুই অত্যন্ত সহজভাবে গ্রহণ করেন, কিন্তু উপযুক্ত বুদ্ধিমত্তাসম্পন্ন পুরুষেরা তা করেন না। কেবলমাত্র ভদ্রোচিত আচরণ করার জন্য আমাদের বিচার করার ক্ষমতা কখনই বর্জন করা উচিত নয়। স্ত্রীলোকদের কোমল স্বভাব অনুসরণ করা আমাদের উচিত নয়, কেন না তা হলে যথার্থ বস্তু যথাযথভাবে গ্রহণ করা থেকে আমরা বঞ্চিত হতে পারি। শোভন স্বভাবা মহিলা অশ্বত্থামাকে শ্রদ্ধা প্রদর্শন করতে পারেন, কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে তিনি একজন যথার্থ ব্রাহ্মণের মতো সম্মানীয়।

শ্লোক ৪৩

উবাচ চাসহন্ত্যস্য বন্ধনানয়নং সতী।
মুচ্যতাং মুচ্যতামেষ ব্রাহ্মণো নিতরাং গুরুঃ ॥ ৪৩ ॥

উবাচ—বলেছিলেন; **চ**—এবং; **অসহন্তী**—তার কাছে অসহনীয়; **অস্য**—তার; **বন্ধন**—বন্ধন; **আনয়নং**—আনীত; **সতী**—পতিপরায়ণা; **মুচ্যতাম্ মুচ্যতাম্**—বন্ধন মোচন কর; **এষঃ**—এই; **ব্রাহ্মণঃ**—ব্রাহ্মণ; **নিতরাম্**—আমাদের; **গুরুঃ**—গুরুদেব।

অনুবাদ

এইভাবে অশ্বত্থামাকে রজ্জুবদ্ধ অবস্থায় দেখে সাধ্বী দ্রৌপদী সসম্ভ্রমে বলে উঠলেন ঃ এর বন্ধন মোচন কর, এর বন্ধন মোচন কর, কেন না ব্রাহ্মণ সব সময়ই আমাদের পূজার্হ।

তাৎপর্য

অশ্বত্থামাকে যখন দ্রৌপদীর সামনে নিয়ে আসা হল, তখন একজন ব্রাহ্মণকে এইভাবে একজন কয়েদির মতো রজ্জুবদ্ধ অবস্থায় দেখে সেই দৃশ্য তাঁর কাছে অসহ্য বলে মনে হয়েছিল, বিশেষ করে সেই ব্রাহ্মণটি যখন হচ্ছেন গুরুপুত্র।

অশ্বত্থামা যে দ্রোণাচার্যের পুত্র, সে কথা পূর্ণরূপে অবগত হয়েই অর্জুন তাকে গ্রেপ্তার করেছিলেন। শ্রীকৃষ্ণও তার পিতৃ-পরিচয় জানতেন, কিন্তু তবুও উভয়েই সেই ব্রাহ্মণ-পুত্রকে হত্যাকারী জেনে তাকে দণ্ডদান করতে উদ্যত হয়েছিলেন। গুরু যদি অধঃপতিত হয়, তা হলে শাস্ত্রে তাকে বর্জন করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। গুরুকে আচার্য বলা হয়, অর্থাৎ তিনি শাস্ত্রের সমস্ত তত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করে তাঁর শিষ্যদের সেই পন্থা অবলম্বন করতে সাহায্য করেন। অশ্বত্থামা ব্রাহ্মণ অথবা শিক্ষকের কর্তব্য সম্পাদন করতে অকৃতকার্য হয়েছিল, এবং তাই সে ব্রাহ্মণের অতি উচ্চ পদের উপযুক্ত ছিল না, এবং তাকে ত্যাগ করাই ছিল বিধেয়। এই বিষয়ে শ্রীকৃষ্ণ এবং অর্জুন যথাযথভাবেই অশ্বত্থামাকে নিন্দা করেছিলেন। কিন্তু শোভন-চরিতা দ্রৌপদী শাস্ত্রের পরিপ্রেক্ষিতে তা বিবেচনা করেননি, তিনি তা বিচার করেছিলেন লোকাচারের পরিপ্রেক্ষিতে। লোকাচার অনুসারে অশ্বত্থামা ছিল তাঁর পিতারই মতো শ্রদ্ধার্হ। কেন না, সাধারণত মানুষ ব্রাহ্মণের পুত্রকেও আদর্শ ব্রাহ্মণ মনে করেন, যা ভাবপ্রবণতা ছাড়া আর কিছুই নয়। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ব্রাহ্মণের পুত্র হলেই যে সে ব্রাহ্মণ হবে তার কোন নিশ্চয়তা নেই। ব্রাহ্মণোচিত গুণ অনুসারেই ব্রাহ্মণের ব্রাহ্মণত্ব নিরূপণ করা হয়, জন্ম অনুসারে নয়।

কিন্তু তা সত্ত্বেও দ্রৌপদী চেয়েছিলেন যে অশ্বত্থামাকে যেন তৎক্ষণাৎ বন্ধনমুক্ত করা হয়, এবং তাঁর এই ভাবপ্রবণতা তাঁর শোভন চরিত্রেরই পরিচায়ক। তা থেকে

বোঝা যায় যে ভগবদ্ভক্ত ব্যক্তিগতভাবে সব রকম দুঃখ-দুর্দশা সহ্য করতে পারেন, কিন্তু তিনি কখনও অন্যের প্রতি নির্দয় হন না, এমন কি তাঁর শত্রুর প্রতিও নয়। এগুলি হচ্ছে ভগবানের শুদ্ধ ভক্তের গুণাবলী।

শ্লোক ৪৪

সরহস্যো ধনুর্বেদঃ সবিসর্গোপসংযমঃ।
অস্ত্রগ্রামশ্চ ভবতা শিক্ষিতো যদনুগ্রহাৎ ॥ ৪৪ ॥

স-রহস্যঃ—গোপনীয়; **ধনুঃ-বেদঃ**—ধনুর্বেদ; **স-বিসর্গ**—প্রয়োগ; **উপসংযমঃ**—নিয়ন্ত্রণ; **অস্ত্র**—অস্ত্র; **গ্রামঃ**—সব রকমের; **চ**—এবং; **ভবতা**—আপনার দ্বারা; **শিক্ষিতঃ**—শিক্ষিত; **যৎ**—যাঁর; **অনুগ্রহাৎ**—কৃপার প্রভাবে।

অনুবাদ

দ্রোণাচার্যের কৃপার প্রভাবেই আপনি গোপনীয় মন্ত্র সহ ধনুর্বিদ্যায় এবং প্রয়োগ ও উপসংহার কৌশল সহ সমস্ত অস্ত্রে শিক্ষালাভ করেছেন।

তাৎপর্য

দ্রোণাচার্য ধনুর্বেদ বা সামরিক-বিজ্ঞান শিক্ষাদান করেছিলেন বৈদিক মন্ত্রের মাধ্যমে অস্ত্র প্রয়োগ এবং নিয়ন্ত্রণ করার গোপন রহস্য শিক্ষাদান করে। স্থূল সামরিক বিজ্ঞান কেবল জড় অস্ত্রই নিক্ষেপ করতে পারে, কিন্তু বৈদিক মন্ত্রে নিষ্ণাত বাণ মেসিনগান অথবা অ্যাটম্ বোমা আদি জড় অস্ত্র থেকে অনেক বেশি কার্যকরী। সেই অস্ত্র প্রয়োগ এবং নিয়ন্ত্রণ হত বৈদিক মন্ত্র উচ্চারণের মাধ্যমে। রামায়ণে বর্ণিত হয়েছে যে রামচন্দ্রের পিতা মহারাজ দশরথ কেবল শব্দের দ্বারা বাণ নিয়ন্ত্রণ করতে পারতেন। লক্ষ্যবস্তুকে দর্শন না করে, কেবল শব্দ শুনে তিনি লক্ষ্যভেদ করতে পারতেন। সুতরাং তা ছিল আধুনিক যুগের সমস্ত স্থূল সামরিক অস্ত্র থেকে অনেক উন্নত সূক্ষ্ম সামরিক বিজ্ঞান। অর্জুন সেই শিক্ষা লাভ করেছিলেন তাঁর অস্ত্রগুরু দ্রোণাচার্যের কাছ থেকে, এবং তাই দ্রৌপদী অর্জুনকে সেই দ্রোণাচার্যের প্রতি কৃতজ্ঞতা অনুভব করতে অনুরোধ করেছিলেন। দ্রোণাচার্যের অনুপস্থিতিতে তাঁর পুত্র হচ্ছেন তাঁর প্রতিনিধি। এটি হচ্ছে শোভন-চরিতা দ্রৌপদীর মনোভাব। এখানে প্রশ্ন হতে পারে দ্রোণাচার্যের মতো একজন নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ কেন অস্ত্রবিদ্যা শিক্ষাদান করলেন। তার উত্তর হচ্ছে, ব্রাহ্মণ যে কোন বিষয়ে শিক্ষাদান করতে পারেন। যথার্থ ব্রাহ্মণের কাজ হচ্ছে যজন, যাজন, পঠন এবং পাঠন।

শ্লোক ৪৫

স এষ ভগবান্ দ্রোণঃ প্রজারূপেণ বর্ততে।
তস্যাত্মনোঽর্ধং পত্ন্যাস্তে নান্বগাদ্বীরসূঃ কৃপী ॥ ৪৫ ॥

সঃ—তিনি; **এষঃ**—অবশ্যই; **ভগবান্**—প্রভু; **দ্রোণঃ**—দ্রোণাচার্য; **প্রজা-রূপেণ**—তাঁর পুত্র অশ্বত্থামারূপে; **বর্ততে**—বিরাজ করছেন; **তস্য**—তাঁর; **আত্মনঃ**—দেহের; **অর্ধম্**—অর্ধ; **পত্নী**—পত্নী; **আস্তে**—জীবিত আছেন; **ন**—না; **অন্বগাৎ**—অনুষ্ঠান করা; **বীরসূঃ**—বীর পুত্র বর্তমান থাকায়; **কৃপী**—কৃপাচার্যের ভগ্নী।

অনুবাদ

পূজনীয় দ্রোণাচার্য তাঁর পুত্র এই অশ্বত্থামারূপেই বিদ্যমান। তাঁর অর্ধাঙ্গিনী কৃপীও জীবিতা আছেন, কেন না বীর পুত্র প্রসবিনী বলে তিনি তাঁর মৃত পতির সহমৃতা হননি।

তাৎপর্য

দ্রোণাচার্যের পত্নী কৃপী হচ্ছেন কৃপাচার্যের ভগিনী। পতিব্রতা স্ত্রী হচ্ছেন তাঁর পতির অর্ধাঙ্গিনী। শাস্ত্রমতে অপুত্রক পত্নী পতির মৃত্যুর পর স্বেচ্ছায় পতির চিতায় প্রবেশ করে পতির সহগামিনী হতে পারেন। কিন্তু দ্রোণাচার্যের পত্নী তাঁর মৃত পতির সহমৃতা হননি, কেন না তাঁর পতির প্রতিনিধিরূপে তাঁর পুত্র বর্তমান ছিল। পুত্র বর্তমান থাকলে পতিহীনা স্ত্রী কেবল নামে মাত্রই বিধবা। সুতরাং, উভয় ক্ষেত্রেই অশ্বত্থামা ছিল দ্রোণাচার্যের প্রতিনিধি, এবং তাই অশ্বত্থামাকে হত্যা করা হলে তা দ্রোণাচার্যকে হত্যা করার মতোই হত। সেটিই ছিল অশ্বত্থামাকে হত্যা করার বিরুদ্ধে দ্রৌপদীর যুক্তি।

শ্লোক ৪৬

তদ্ ধর্মজ্ঞ মহাভাগ ভবদ্ভির্গৌরবং কুলম্।
বৃজিনং নার্হতি প্রাপ্তুং পূজ্যং বন্দ্যমভীক্ষ্ণশঃ ॥ ৪৬ ॥

তৎ—সেই হেতু; **ধর্মজ্ঞ**—যিনি ধর্মতত্ত্ব সম্বন্ধে অবগত; **মহা-ভাগ**—মহা ভাগ্যবান; **ভবদ্ভিঃ**—আপনার দ্বারা; **গৌরবম্**—গৌরবান্বিত; **কুলম্**—কুল; **বৃজিনম্**—দুঃখদায়ক; **ন**—না; **অর্হতি**—প্রাপ্য; **প্রাপ্তুম্**—পাওয়ার জন্য; **পূজ্যম্**—পূজনীয়; **বন্দ্যম্**—প্রশংসনীয়; **অভীক্ষ্ণশঃ**—সর্বদা।

অনুবাদ

হে ধর্মবিদ, হে মহাযশস্বী! সর্বদা আপনাদের পূজ্য এবং বন্দনীয় গুরুকুল যেন দুঃখপ্রাপ্ত না হন।

তাৎপর্য

সম্মানীয় কুলে যদি স্বল্প অপবাদও প্রয়োগ করা হয় তা হলে তা দুঃখ উৎপাদনের পক্ষে যথেষ্ট। তাই সংস্কৃতিসম্পন্ন মানুষের কর্তব্য হচ্ছে পরিবারের পূজনীয় সদস্যদের সঙ্গে সর্বদাই সাবধানতার সঙ্গে আচরণ করা।

শ্লোক ৪৭

মা রোদীদস্য জননী গৌতমী পতিদেবতা।
যথাহং মৃতবৎসার্তা রোদিম্যশ্রুমুখী মুহুঃ ॥ ৪৭ ॥

মা—না; **রোদীৎ**—কাঁদানো; **অস্য**—তার; **জননী**—জননী; **গৌতমী**—দ্রোণাচার্যের পত্নী; **পতিদেবতা**—পতিপরায়ণা; **যথা**—যেমন; **অহম্**—আমি; **মৃত-বৎসা**—যার পুত্র মারা গেছে; **আর্তা**—আর্তা; **রোদিমি**—ক্রন্দন করছি; **অশ্রু-মুখী**—অশ্রুপূর্ণ নয়নে; **মুহুঃ**—নিরন্তর।

অনুবাদ

আমি যেমন পুত্রহারা হয়ে অশ্রুপূর্ণ নয়নে নিরন্তর রোদন করছি, এই অশ্বত্থামার মাতা পতিব্রতা গৌতমী যেন সেভাবে রোদন না করেন।

তাৎপর্য

পরদুঃখকাতরা সাধ্বী স্ত্রী শ্রীমতী দ্রৌপদী মাতৃত্বের অনুভূতি নিয়ে এবং দ্রোণাচার্যের পত্নীর সম্মানিত পদের কথা বিবেচনা করে স্থির করেছিলেন যে তিনি তাঁর মতো যেন পুত্রহারা না হন।

শ্লোক ৪৮

যৈঃ কোপিতং ব্রহ্মকুলং রাজন্যৈরজিতাত্মভিঃ।
তৎ কুলং প্রদহত্যাশু সানুবন্ধং শুচার্পিতম্ ॥ ৪৮ ॥

যৈঃ—যাদের; **কোপিতম্**—ক্রুদ্ধ; **ব্রহ্ম-কুলম্**—ব্রাহ্মণকুল; **রাজন্যৈঃ**—ক্ষত্রিয়দের; **অজিত**—অনিয়ন্ত্রিত; **আত্মভিঃ**—নিজের দ্বারা; **তৎ**—তা; **কুলম্**—কুল; **প্রদহতি**—বিনাশপ্রাপ্ত হয়; **আশু**—অচিরেই; **স-অনুবন্ধম্**—পরিবার-পরিজন সহ; **শুচা-অর্পিতম্**—শোকার্তা হয়ে।

অনুবাদ

অসংযতমনা যে সমস্ত ক্ষত্রিয় ব্রাহ্মণকুলের ক্রোধ জন্মায়, সেই ক্রুদ্ধ ব্রহ্মকুল সেই ক্ষত্রিয় বংশকে সপরিবারে শোকে নিমজ্জিত করে শীঘ্র নষ্ট করে।

তাৎপর্য

সমাজে ব্রাহ্মণকুল, অথবা পারমার্থিক বিষয়ে উন্নত মানুষেরা এবং এই ধরনের উন্নত পরিবারের সদস্যরা সর্বদাই নিম্নতর কুলের মানুষদের দ্বারা অর্থাৎ ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং শূদ্রের দ্বারা গভীর শ্রদ্ধা সহকারে পূজিত হতেন।

শ্লোক ৪৯

সূত উবাচ

ধর্ম্যং ন্যায্যং সকরুণং নির্ব্যলীকং সমং মহৎ।
রাজা ধর্মসুতো রাজ্ঞ্যাঃ প্রত্যনন্দদ্বচো দ্বিজাঃ ॥ ৪৯ ॥

সূতঃ উবাচ—সূত গোস্বামী বললেন; **ধর্ম্যম্**—ধর্মনীতি অনুসারে; **ন্যায্যম্**—ন্যায়; **স-করুণম্**—সকরুণ; **নির্ব্যলীকম্**—ধর্ম-বহির্মুখ না হয়ে; **সমম্**—সমতা; **মহৎ**—মহৎ; **রাজা**—রাজা; **ধর্ম-সুতঃ**—ধর্মপুত্র; **রাজ্ঞ্যাঃ**—রানীর দ্বারা; **প্রত্যনন্দৎ**—সমর্থন করলেন; **বচঃ**—বলেছিলেন; **দ্বিজাঃ**—হে ব্রাহ্মণগণ।

অনুবাদ

সূত গোস্বামী বললেন ঃ হে ব্রাহ্মণগণ! ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠির ধর্মনীতি অনুসারে উক্ত রানীর সেই ন্যায়সঙ্গত মহৎ সকরুণ এবং সমতাপূর্ণ উক্তি সমর্থন করেছিলেন।

তাৎপর্য

ধর্মরাজ বা যমরাজের পুত্র, মহারাজ যুধিষ্ঠির অশ্বত্থামাকে ছেড়ে দেওয়ার জন্য অর্জুনের কাছে দ্রৌপদীর আবেদন পূর্ণরূপে সমর্থন করেছিলেন। মহৎ পরিবারের কোন সদস্যের অবমাননা করা উচিত নয়। অর্জুন এবং তাঁর পরিবার দ্রোণাচার্যের পরিবারের কাছে ঋণী ছিলেন, কেন না অর্জুন তাঁর কাছ থেকে অস্ত্রবিদ্যা শিক্ষালাভ করেছিলেন। যদি এই রকম মহৎ পরিবারের প্রতি অকৃতজ্ঞতা প্রদর্শন করা হয়, তা হলে নৈতিক দিক দিয়ে তা হবে অন্যায়। দ্রোণাচার্যের পত্নী, যিনি ছিলেন সেই মহাত্মার অর্ধাঙ্গিনী, তাঁর প্রতি অবশ্যই করুণাপূর্বক আচরণ করা উচিত, এবং তাঁকে যেন তাঁর পুত্রের মৃত্যুজনিত বেদনায় ব্যথিত হতে না হয় সে সম্পর্কে সচেতন থাকা উচিত। সেটিই হচ্ছে যথার্থ করুণা। দ্রৌপদীর এই উক্তি সব রকমের প্রবঞ্চনারহিত, কেন না তাঁর এই উক্তি পূর্ণ জ্ঞানের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত। তাঁর দৃষ্টিতে সমতা ছিল, কেন না দ্রৌপদী তাঁর নিজের অভিজ্ঞতার পরিপ্রেক্ষিতে এই কথাগুলি বলেছিলেন। বন্ধ্যা রমণী মায়ের বেদনা বুঝতে পারে না। দ্রৌপদী তাঁর নিজের পুত্রশোকে শোকার্তা ছিলেন, এবং তাই তিনি অনুমান করতে পেরেছিলেন যে অশ্বত্থামার মৃত্যু হলে কৃপী কি রকম বেদনা অনুভব করবে এবং তাঁর আচরণ ছিল মহৎ, কেন না তিনি এক মহান পরিবারের প্রতি যথাযথ শ্রদ্ধা প্রদর্শন করতে চেয়েছিলেন।

শ্লোক ৫০

নকুলঃ সহদেবশ্চ যুযুধানো ধনঞ্জয়ঃ ।
ভগবান্ দেবকীপুত্রো যে চান্যে যাশ্চ যোষিতঃ ॥ ৫০ ॥

নকুলঃ—নকুল ; **সহদেবঃ**—সহদেব ; **চ**—এবং ; **যুযুধানঃ**—সাত্যকি ; **ধনঞ্জয়ঃ**—অর্জুন ; **ভগবান্**—পরমেশ্বর ভগবান ; **দেবকী-পুত্রঃ**—দেবকীর পুত্র শ্রীকৃষ্ণ ; **যে**—যে সমস্ত ; **চ**—এবং ; **অন্যে**—অন্য ; **যাঃ**—যারা ; **চ**—এবং ; **যোষিতঃ**—মহিলারা ।

অনুবাদ

মহারাজ যুধিষ্ঠিরের কনিষ্ঠ দুই ভ্রাতা নকুল ও সহদেব এবং সাত্যকি, অর্জুন, পরমেশ্বর ভগবান দেবকীপুত্র শ্রীকৃষ্ণ এবং অন্যান্য সমস্ত মহিলারা সকলেই মহারাজের সঙ্গে একমত হলেন ।

শ্লোক ৫১

তত্রাহামর্ষিতো ভীমস্তস্য শ্রেয়ান্ বধঃ স্মৃতঃ ।
ন ভর্তুর্নাত্মনশ্চার্থে যোঽহন্ সুপ্তান্ শিশূন্ বৃথা ॥ ৫১ ॥

তত্র—তখন ; **আহ**—বলেছিলেন ; **অমর্ষিতঃ**—ক্রুদ্ধভাবে ; **ভীমঃ**—ভীম ; **তস্য**—তার ; **শ্রেয়ান্**—চরম মঙ্গলের জন্য ; **বধঃ**—বধ করা ; **স্মৃতঃ**—মনে করেছিলেন ; **ন**—না ; **ভর্তুঃ**—পতির ; **ন**—না ; **আত্মনঃ**—তাঁর স্বীয় পুত্র ; **চ**—এবং ; **অর্থে**—জন্য ; **যঃ**—যে ; **অহন্**—হত্যা করেছে ; **সুপ্তান্**—সুপ্ত ; **শিশূন্**—শিশুদের ; **বৃথা**—অনর্থক ।

অনুবাদ

ভীম কিন্তু তাঁদের সঙ্গে একমত হতে পারলেন না । তিনি ক্রুদ্ধভাবে প্রস্তাব করলেন, যে জঘন্য দুর্বৃত্ত নিদ্রিত শিশুদের অনর্থক হত্যা করেছে, তাকে বধ করাই উচিত ।

শ্লোক ৫২

নিশম্য ভীমগদিতং দ্রৌপদ্যাশ্চ চতুর্ভুজঃ ।
আলোক্য বদনং সখ্যুরিদমাহ হসন্নিব ॥ ৫২ ॥

নিশম্য—তা শোনার পরই ; **ভীম**—ভীম ; **গদিতম্**—উক্ত ; **দ্রৌপদ্যাঃ**—দ্রৌপদীর ; **চ**—এবং ; **চতুঃ-ভুজঃ**—চতুর্ভুজ (পরমেশ্বর ভগবান) ; **আলোক্য**—দর্শন করে ; **বদনম্**—মুখমণ্ডল ; **সখ্যুঃ**—তাঁর বন্ধুর ; **ইদম্**—এই ; **আহ**—বলেছিলেন ; **হসন্**—স্মিতহাস্য ; **ইব**—যেন ।

অনুবাদ

চতুর্ভুজ পরমেশ্বর ভগবান, ভীম, দ্রৌপদী এবং অন্যান্যদের কথা শুনে তাঁর বন্ধু অর্জুনের মুখমণ্ডল দর্শন করলেন এবং মৃদু হেসে বলতে শুরু করলেন।

তাৎপর্য

শ্রীকৃষ্ণ দ্বিভুজ, তা হলে এখানে যে কেন তাঁকে চতুর্ভুজ বলে সম্বোধন করা হল তা শ্রীধর স্বামী বিশ্লেষণ করেছেন। ভীম এবং দ্রৌপদী অশ্বত্থামাকে বধ করা সম্পর্কে সম্পূর্ণ ভিন্ন মত পোষণ করেছিলেন। ভীম চেয়েছিলেন তাকে তৎক্ষণাৎ বধ করতে, কিন্তু দ্রৌপদী তার প্রাণ রক্ষা করতে চেয়েছিলেন। আমরা সহজেই অনুমান করতে পারি যে, ভীম যখন তাকে বধ করতে উদ্যত হয়েছিলেন, তখন দ্রৌপদী কিভাবে তাঁকে বাধা দিচ্ছিলেন। তাঁদের উভয়কে নিরস্ত্র করার জন্য ভগবান তাঁর অপর দুটি অস্ত্র প্রকাশ করেছিলেন। প্রকৃতপক্ষে শ্রীকৃষ্ণ দ্বিভুজ, কিন্তু তাঁর নারায়ণরূপে তিনি চতুর্ভুজ প্রদর্শন করেন। নারায়ণরূপে তিনি তাঁর ভক্ত সহ বৈকুণ্ঠলোকে বিরাজ করেন, কিন্তু তাঁর আদি রূপ শ্রীকৃষ্ণরূপে তিনি কৃষ্ণলোকেই বিরাজ করেন, যা চিদাকাশের বৈকুণ্ঠলোক থেকে অনেক অনেক ঊর্ধ্বে অবস্থিত। তাই শ্রীকৃষ্ণকে যদি চতুর্ভুজ বলে সম্বোধন করা হয় তা হলে তা বিরুদ্ধ উক্তি নয়। যদি প্রয়োজন হয় তা হলে তিনি শত শত হস্ত প্রদর্শন করতে পারেন, তাঁর বিশ্বরূপে যা তিনি অর্জুনকে দেখিয়েছিলেন। তাই, যিনি শত-সহস্র হস্ত প্রদর্শন করতে পারেন, তিনি প্রয়োজন হলে চারটি হস্ত অবশ্যই প্রকাশ করতে পারেন।

অশ্বত্থামাকে নিয়ে যে কি করা উচিত সে সম্বন্ধে অর্জুন যখন হতভম্ব হয়ে পড়েছিলেন, তখন অর্জুনের প্রিয় সখা শ্রীকৃষ্ণ সেই সমস্যার সমাধান করার ভার গ্রহণ করেছিলেন, এবং সেই সময়ে তিনি মৃদু মৃদু হাসছিলেনও।

শ্লোক ৫৩-৫৪

শ্রীভগবানুবাচ

ব্রহ্মবন্ধুর্ন হন্তব্য আততায়ী বধার্হণঃ।
ময়ৈবোভয়মাম্নাতং পরিপাহ্যনুশাসনম্ ॥ ৫৩ ॥
কুরু প্রতিশ্রুতং সত্যং যত্তৎসান্ত্বয়তা প্রিয়াম্।
প্রিয়ং চ ভীমসেনস্য পাঞ্চাল্যা মহ্যমেব চ ॥ ৫৪ ॥

শ্রী-ভগবান উবাচ—পরমেশ্বর ভগবান বললেন; **ব্রহ্ম-বন্ধুঃ**—ব্রাহ্মণের আত্মীয়; **ন হন্তব্য**—হত্যা করা উচিত নয়; **আততায়ী**—আততায়ী; **বধার্হণঃ**—বধ্য; **ময়া**—আমার দ্বারা; **এব**—অবশ্যই; **উভয়ম্**—উভয়; **আম্নাতম্**—মহাজনদের বর্ণনা অনুসারে; **পরিপাহি**—কর্তব্য; **অনুশাসনম্**—অনুশাসন; **কুরু**—পালন করা;

প্রতিশ্রুতম্—প্রতিশ্রুতি অনুসারে ; **সত্যম্**—সত্য ; **যৎ**—যা ; **তৎ**—তা ; **সান্ত্বয়তা**—সান্ত্বনা দেওয়ার সময় ; **প্রিয়াম্**—প্রিয় পত্নীকে ; **প্রিয়ম্**—সন্তুষ্টিবিধান ; **চ**—ও ; **ভীম-সেনস্য**—শ্রীভীমসেনের ; **পাঞ্চাল্যাঃ**—দ্রৌপদীর ; **মহ্যম্**—আমাকেও ; **এব**—অবশ্যই ; **চ**—এবং।

অনুবাদ

পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বললেন ঃ ব্রহ্মবন্ধুকে হত্যা করা উচিত নয়, কিন্তু সে যদি আততায়ী হয়, তা হলে তাকে অবশ্যই হত্যা করতে হবে। এই সমস্ত নির্দেশ শাস্ত্রে রয়েছে, এবং তোমার কর্তব্য হচ্ছে সেই নির্দেশ অনুসারে আচরণ করা। তোমার প্রিয় পত্নীর কাছে তোমার প্রতিজ্ঞাও তোমাকে রক্ষা করতে হবে এবং তোমাকে ভীমসেন এবং আমার সন্তুষ্টিবিধানের জন্য আচরণ করতে হবে।

তাৎপর্য

অর্জুন কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়েছিলেন, কেন না বিভিন্ন মহাজনদের নির্দেশ অনুসারে এবং বিভিন্ন শাস্ত্রের নির্দেশ অনুসারে অশ্বত্থামাকে হত্যা করা উচিত, আবার সেই সঙ্গে তার প্রাণও রক্ষা করা উচিত। ব্রহ্মবন্ধু অথবা ব্রাহ্মণের অপদার্থ পুত্র বলে অশ্বত্থামাকে হত্যা করা উচিত ছিল না, কিন্তু সেই সঙ্গে সে ছিল আততায়ী। মনু-সংহিতা অনুসারে আততায়ী যদি ব্রাহ্মণও হয় (ব্রহ্মবন্ধুর কি কথা), তা হলে তাকে বধ করা উচিত। দ্রোণাচার্য অবশ্যই ছিলেন প্রকৃত ব্রাহ্মণ, কিন্তু যেহেতু তিনি যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হয়েছিলেন, তাই তাঁকে হত্যা করা হয়েছিল। কিন্তু অশ্বত্থামা যদিও ছিল আততায়ী, কিন্তু তার কাছে তখন যুদ্ধ করার মতো কোন অস্ত্র ছিল না। শাস্ত্রে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, আততায়ী যদি নিরস্ত্র হয় এবং রথহীন হয় তা হলে তাকে হত্যা করা উচিত নয়। এই জটিল অবস্থা অবশ্যই ছিল বিভ্রান্তিজনক। আবার সেই সঙ্গে অর্জুনকে দ্রৌপদীর কাছে তাঁর প্রতিজ্ঞাও রক্ষা করার প্রয়োজন ছিল। আবার তাঁকে ভীমসেন এবং শ্রীকৃষ্ণকেও সন্তুষ্ট করার প্রয়োজন ছিল, যাঁরা তাঁকে উপদেশ দিচ্ছিলেন অশ্বত্থামাকে হত্যা করার জন্য। অর্জুন এইভাবে বিভ্রান্ত হয়েছিলেন, এবং তা সমাধান করলেন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং।

শ্লোক ৫৫

সূত উবাচ

অর্জুনঃ সহসাজ্ঞায় হরের্হার্দমথাসিনা।
মণিং জহার মূর্ধন্যং দ্বিজস্য সহমূর্ধজম্ ॥ ৫৫ ॥

সূতঃ উবাচ—সূত গোস্বামী বললেন ; **অর্জুনঃ**—অর্জুন ; **সহসা**—ঠিক সেই সময়ে ; **আজ্ঞায়**—জেনে ; **হরেঃ**—ভগবানের ; **হার্দম্**—উদ্দেশ্য ; **অথ**—এইভাবে ;

অসিনা—তরবারির দ্বারা; **মণিম্**—মণি; **জহার**—বিচ্ছিন্ন করেছিলেন; **মূর্ধন্যম্**—মাথার উপর; **দ্বিজস্য**—দ্বিজের; **সহ**—সহ; **মূর্ধজম্**—কেশরাশি।

অনুবাদ

ঠিক সেই সময়ে অর্জুন ভগবানের নির্দেশ হৃদয়ঙ্গম করলেন এবং তাঁর তরবারির দ্বারা তিনি অশ্বত্থামার মস্তকের কেশরাশি এবং মণি ছেদন করলেন।

তাৎপর্য

বিভিন্ন মানুষের পরস্পরবিরোধী নির্দেশ পালন করা অসম্ভব। তাই অর্জুন তাঁর সূক্ষ্ম বুদ্ধির দ্বারা তার মীমাংসা করার কথা বিবেচনা করলেন, এবং তিনি অশ্বত্থামার মাথার মণি কেটে নিলেন। তা ছিল তার মস্তক ছেদন করারই মতো। অথচ তার ফলে তার প্রাণ রক্ষা হল। এখানে অশ্বত্থামাকে দ্বিজ বলে বর্ণনা করা হয়েছে। অবশ্যই সে ছিল দ্বিজ, কিন্তু তার সেই উচ্চ পদ থেকে সে অধঃপতিত হয়েছিল, এবং তাই তাকে যথাযথভাবে দণ্ড দান করা হয়েছিল।

শ্লোক ৫৬

বিমুচ্য রশনাবদ্ধং বালহত্যাহতপ্রভম্।
তেজসা মণিনা হীনং শিবিরান্নিরয়াপয়ৎ ॥ ৫৬ ॥

বিমুচ্য—তাকে ছেড়ে দেওয়ার পর; **রশনা-বদ্ধম্**—রজ্জুবদ্ধ অবস্থা থেকে; **বাল-হত্যা**—শিশু হত্যাকারী; **হত-প্রভম্**—দেহের ঔজ্জ্বল্যরহিত; **তেজসা**—তেজের; **মণিনা**—মণির দ্বারা; **হীনম্**—বঞ্চিত হয়ে; **শিবিরাৎ**—শিবির থেকে; **নিরয়াপয়ৎ**—তাকে বার করে দেওয়া হল।

অনুবাদ

শিশু হত্যা করার ফলে অশ্বত্থামার দেহের দীপ্তি ইতিমধ্যেই হারিয়ে গিয়েছিল, এবং এখন তার মস্তকের মণি কেটে নেওয়ার ফলে সে সম্পূর্ণভাবে তেজহীন হয়ে পড়ল। এই অবস্থায় তাকে বন্ধনমুক্ত করে শিবির থেকে বার করে দেওয়া হল।

তাৎপর্য

শ্রীকৃষ্ণ এবং অর্জুনের তীক্ষ্ণ বুদ্ধির প্রভাবে এইভাবে অশ্বত্থামাকে অপমানিত করে তাকে হত্যা করা হল এবং সেই সঙ্গে তার প্রাণও রক্ষা করা হল।

শ্লোক ৫৭

বপনং দ্রবিণাদানং স্থানান্নির্যাপণং তথা।
এষ হি ব্রহ্মবন্ধূনাং বধো নান্যোঽস্তি দৈহিকঃ ॥ ৫৭ ॥

বপনম্—মস্তক মুণ্ডন করে দেওয়া; দ্রবিণ—সম্পদ; অদানম্—বঞ্চিত করা; স্থানাৎ—বাসস্থান থেকে; নির্যাপণম্—বহিষ্কার করে দেওয়া; তথা—ও; এষঃ—এই সমস্ত; হি—অবশ্যই; ব্রহ্ম-বন্ধুনাম্—ব্রহ্মবন্ধুর; বধঃ—বধ; ন—না; অন্যঃ—অন্য কোন উপায়; অস্তি—আছে; দৈহিকঃ—দেহ বিষয়ক।

অনুবাদ

মস্তক মুণ্ডন করা, সম্পদ থেকে বঞ্চিত করা এবং বাসস্থান থেকে বহিষ্কার করে দেওয়া হচ্ছে ব্রহ্মবন্ধুর উপযুক্ত শাস্তি। দৈহিকভাবে তাকে হত্যা করার নির্দেশ নেই।

শ্লোক ৫৮

পুত্রশোকাতুরাঃ সর্বে পাণ্ডবাঃ সহ কৃষ্ণয়া।
স্বানাং মৃতানাং যৎকৃত্যং চক্রুর্নির্হরণাদিকম্ ॥ ৫৮ ॥

পুত্র—পুত্র; শোক—শোক; আতুরাঃ—আতুর; সর্বে—তারা সকলে; পাণ্ডবাঃ—পাণ্ডুপুত্ররা; সহ—সহ; কৃষ্ণয়া—দ্রৌপদী; স্বানাম্—আত্মীয়দের; মৃতানাম্—মৃতদের; যৎ—যা; কৃত্যম্—কৃত্য; চক্রুঃ—অনুষ্ঠান করেছিলেন; নির্হরণ-আদিকম্—করণীয়।

অনুবাদ

তারপর পাণ্ডবেরা এবং দ্রৌপদী শোকার্ত চিত্তে তাঁদের মৃত আত্মীয়দের সৎকার অনুষ্ঠান সম্পাদন করেছিলেন।

ইতি—"দ্রোণপুত্র দণ্ডিত" নামক শ্রীমদ্ভাগবতের প্রথম স্কন্ধের সপ্তম অধ্যায়ের ভক্তিবেদান্ত তাৎপর্য।

অষ্টম অধ্যায়

কুন্তীদেবীর প্রার্থনা এবং পরীক্ষিতের প্রাণরক্ষা

শ্লোক ১

সূত উবাচ

অথ তে সম্পরেতানাং স্বানামুদকমিচ্ছতাম্।
দাতুং সকৃষ্ণা গঙ্গায়াং পুরস্কৃত্য যযুঃ স্ত্রিয়ঃ ॥ ১॥

সূতঃ উবাচ—সূত গোস্বামী বললেন; **অথ**—এইভাবে; **তে**—পাণ্ডবেরা; **সম্পরেতানাম্**—মৃতদের; **স্বানাম্**—আত্মীয়দের; **উদকম্**—জল; **ইচ্ছতাম্**—অভিলাষ করে; **দাতুম্**—প্রদানের জন্য; **সকৃষ্ণাঃ**—দ্রৌপদীসহ; **গঙ্গায়াম্**—গঙ্গায়; **পুরস্কৃত্য**—অগ্রে রেখে; **যযুঃ**—গিয়েছিলেন; **স্ত্রিয়ঃ**—স্ত্রীগণ।

অনুবাদ

সূত গোস্বামী বললেন, তারপর পরলোকগত আত্মীয়-স্বজনদের উদ্দেশ্যে জল অর্পণ করার মানসে পাণ্ডবেরা দ্রৌপদীসহ গঙ্গাতীরে গমন করলেন। মহিলারা অগ্রভাগে যাচ্ছিলেন।

তাৎপর্য

যখন পরিবারের কারো মৃত্যু হয়, তখন গঙ্গা বা অন্য কোন পবিত্র নদীতে স্নান করার প্রথা হিন্দু সমাজে আজও প্রচলিত রয়েছে। পরলোকগত আত্মার উদ্দেশ্যে পরিবারের প্রতিটি সদস্য এক ঘটি গঙ্গাজল অর্পণ করেন এবং স্ত্রীলোকদের পুরোভাগে রেখে, তাঁরা সারিবদ্ধভাবে গমন করেন। আজ থেকে পাঁচ হাজার বছর পূর্বে পাণ্ডবেরাও সেই প্রথা অনুসরণ করেছিলেন। পাণ্ডবদের মামাতো ভাই হওয়ার ফলে সেখানে ভগবান শ্রীকৃষ্ণও পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে ছিলেন।

শ্লোক ২

তে নিনীয়োদকং সর্বে বিলপ্য চ ভৃশং পুনঃ ।
আপ্লুতা হরিপাদাব্জরজঃপূতসরিজ্জলে ॥ ২ ॥

তে—তাঁরা সকলে; **নিনীয়**—দান করে; **উদকম্**—জল; **সর্বে**—তাঁরা প্রত্যেকে; **বিলপ্য**—বিলাপ করে; **চ**—এবং; **ভৃশম্**—অতিশয়; **পুনঃ**—পুনরায়; **আপ্লুতাঃ**—স্নান করেছিলেন; **হরিপাদাব্জ**—ভগবানের শ্রীপাদপদ্ম; **রজঃ**—ধূলি; **পূত**—পবিত্র; **সরিৎ**—গঙ্গার; **জলে**—জলে।

অনুবাদ

তাঁদের জন্য বিলাপ করে তাঁরা যথেষ্ট পরিমাণে গঙ্গাজল অর্পণ করলেন এবং গঙ্গায় স্নান করলেন, কেননা সেই জল পরমেশ্বরের শ্রীপাদপদ্মের ধূলিকণা মিশ্রিত হয়ে পবিত্রতা লাভ করেছে।

শ্লোক ৩

তত্রাসীনং কুরুপতিং ধৃতরাষ্ট্রং সহানুজম্ ।
গান্ধারীং পুত্রশোকার্তাং পৃথাং কৃষ্ণাং চ মাধবঃ ॥ ৩ ॥

তত্র—সেখানে; **আসীনম্**—উপবিষ্ট; **কুরুপতিম্**—কুরুরাজ; **ধৃতরাষ্ট্রম্**—ধৃতরাষ্ট্র; **সহ-অনুজম্**—তাঁর অনুজদের সঙ্গে; **গান্ধারীম্**—গান্ধারী; **পুত্র**—পুত্র; **শোকার্তাম্**—শোকে অভিভূত; **পৃথাম্**—কুন্তী; **কৃষ্ণাম্**—দ্রৌপদী; **চ**—ও; **মাধবঃ**—ভগবান শ্রীকৃষ্ণ।

অনুবাদ

সেখানে কৌরব-নৃপতি মহারাজ যুধিষ্ঠির তাঁর অনুজ ভ্রাতৃবর্গ এবং ধৃতরাষ্ট্র, গান্ধারী, কুন্তী ও দ্রৌপদীসহ শোকাভিভূত হয়ে বসেছিলেন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণও সেখানে ছিলেন।

তাৎপর্য

কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ হয়েছিল একই পরিবারের আত্মীয়-স্বজনদের মধ্যে, এবং তাই তার ফলে যাঁরা প্রভাবিত হয়েছিলেন তাঁরা সকলেই ছিলেন আত্মীয়—যেমন মহারাজ

যুধিষ্ঠির এবং তাঁর ভাইয়েরা, কুন্তী, দ্রৌপদী, সুভদ্রা, ধৃতরাষ্ট্র, গান্ধারী এবং তাঁর পুত্রবধূগণ প্রমুখ। সমস্ত মুখ্য মৃতব্যক্তিরা কোন না কোন ভাবে পরস্পরের সঙ্গে সম্পর্কিত ছিলেন, এবং তাই সেই পারিবারিক শোক ছিল সংযুক্ত। কুন্তীর ভ্রাতুষ্পুত্ররূপে পাণ্ডবদের মামাতো ভাই, এবং সুভদ্রার ভ্রাতা ইত্যাদি সম্পর্কে শ্রীকৃষ্ণ ছিলেন সেই পরিবারের একজন সদস্য। তাই ভগবান তাঁদের সকলের প্রতি সমান সহানুভূতিশীল ছিলেন, এবং তাই তিনি যথাযথভাবে তাঁদের সান্ত্বনা দিতে শুরু করলেন।

শ্লোক ৪

সান্ত্বয়ামাস মুনিভির্হতবন্ধূঞ্ শুচার্পিতান্ ।
ভূতেষু কালস্য গতিং দর্শয়ন্নপ্রতিক্রিয়াম্ ॥ ৪ ॥

সান্ত্বয়াম্ আস—সান্ত্বনা দিয়েছিলেন; **মুনিভিঃ**—সেখানে উপস্থিত মুনিগণসহ; **হত-বন্ধূন্**—যাঁরা তাঁদের আত্মীয় এবং বন্ধুদের হারিয়েছিলেন; **শুচার্পিতান্**—শোকে কাতর সকলকে; **ভূতেষু**—প্রাণীদের; **কালস্য**—পরম নিয়ন্তার পরম নিয়ম; **গতিম্**—প্রতিক্রিয়া; **দর্শয়ন্**—প্রদর্শন করেছিলেন; **ন**—না; **প্রতিক্রিয়াম্**—প্রতিকারের উপায়।

অনুবাদ

সর্বশক্তিমানের দুর্বার বিধি-নিয়মাদি এবং জীবের উপরে সেগুলির প্রতিক্রিয়ার কথা উল্লেখ করে পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এবং উপস্থিত মুনিগণ আর্ত ও শোকাভিভূত সকলকেই সান্ত্বনা দিতে লাগলেন।

তাৎপর্য

পরমেশ্বর ভগবানের নির্দেশনায় পরিচালিত হয় যে প্রকৃতির কঠোর নিয়ম, তা কোনও জীব পরিবর্তন করতে পারে না। সমস্ত জীব নিত্যকাল সর্বশক্তিমান ভগবানের অধীন। ভগবান সমস্ত বিধি-নিয়ম সৃষ্টি করেন, এবং এই সমস্ত বিধি-নিয়মকে সাধারণত বলা হয় ধর্ম। কেউই কোন ধর্মের সূত্র সৃষ্টি করতে পারে না। সদ্ধর্ম হচ্ছে ভগবানের নির্দেশ পালন করা। ভগবানের নির্দেশ শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় স্পষ্টভাবে বিঘোষিত হয়েছে। সকলেরই কর্তব্য কেবল তাঁকে অথবা তাঁর আদেশকে অনুসরণ করা, এবং সেটিই তাঁদেরকে ভৌতিক এবং আধ্যাত্মিক উভয় দিক দিয়েই সুখী করবে। আমরা যতক্ষণ জড় জগতে রয়েছি, ততক্ষণ আমাদের কর্তব্য হচ্ছে ভগবানের আদেশ পালন করা;

আর ভগবানের কৃপায় আমরা যদি জড় জগতের বন্ধন থেকে মুক্ত হতে পারি, তা হলে আমাদের মুক্ত অবস্থায়ও আমরা পরমেশ্বর ভগবানের প্রতি আমাদের দিব্য প্রেমময়ী সেবা নিবেদন করতে পারি। আমাদের বদ্ধ অবস্থায়, চিন্ময় দৃষ্টির অভাবে, আমরা ভগবানকে দর্শন করতে পারি না, এমনকি নিজেদেরও দর্শন করতে পারি না। কিন্তু আমরা যখন জড় জগতের বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে আমাদের শাশ্বত চিন্ময় স্বরূপে অধিষ্ঠিত হই তখন আমরা প্রত্যক্ষভাবে ভগবানকে এবং নিজেদেরও দর্শন করতে পারি।

মুক্তি মানে হচ্ছে জাগতিক জীবনের ধারণা ত্যাগ করে চিন্ময় স্বরূপে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হওয়া। তাই মানব জীবনের বিশেষ উদ্দেশ্য হচ্ছে এই চিন্ময় মুক্তি লাভের জন্য যোগ্যতা অর্জন করা। দুর্ভাগ্যবশত, মায়ার মোহময়ী প্রভাবে, আমরা কয়েক বছরের ক্ষণস্থায়ী এই জীবনকে আমাদের শাশ্বত অস্তিত্ব বলে বরণ করি, এবং তার ফলে মায়ার মিথ্যা প্রকাশস্বরূপ তথাকথিত দেশ, গৃহ, ভূমি, সন্তান-সন্ততি, পত্নী, সমাজ, সম্পত্তি ইত্যাদির মোহে আচ্ছন্ন হয়ে পড়ি। এইভাবে আমরা মায়ার নির্দেশে আমাদের এই সমস্ত মিথ্যা কর্তৃত্ব বজায় রাখার জন্য পরস্পরের সঙ্গে সংগ্রাম করি। দিব্য জ্ঞানের অনুশীলনের দ্বারা আমরা উপলব্ধি করতে পারি যে এই সমস্ত জড় বিষয়গুলির সঙ্গে আমাদের কোনই সম্পর্ক নেই, এবং তৎক্ষণাৎ আমরা জড় আসক্তি থেকে মুক্ত হই। বিভ্রান্তচিত্ত ব্যক্তিদের অন্তরের গভীর প্রদেশে চিন্ময় শব্দ-তরঙ্গের সঞ্চার করে সমস্ত শোক এবং মোহ থেকে মানুষকে মুক্ত করতে সক্ষম যে ভগবদ্ভক্ত, তাঁর সঙ্গ প্রভাবে মায়াচ্ছন্ন জীবের ভ্রান্তি তৎক্ষণাৎ দূর হয়ে যায়। এটিই হচ্ছে জন্ম, মৃত্যু, জরা এবং ব্যাধিরূপে প্রকাশিত জড়া প্রকৃতির কঠোর নিয়মের প্রভাবে ক্লিষ্ট জীবের সান্ত্বনা লাভের পরম উপায়। যুদ্ধের প্রভাবে পীড়িত কুরুবংশের সদস্যরা মৃত্যুজনিত সমস্যার কারণে শোক করছিলেন, এবং ভগবান তখন জ্ঞানের ভিত্তিতে তাঁদের সান্ত্বনা দিয়েছিলেন।

শ্লোক ৫

সাধয়িত্বাজাতশত্রোঃ স্বংরাজ্যং কিতবৈর্হৃতম্।
ঘাতয়িত্বাসতো রাজ্ঞঃ কচস্পর্শক্ষতায়ুষঃ ॥ ৫ ॥

সাধয়িত্বা—সাধন করে; **অজাত-শত্রোঃ**—যাঁর কোন শত্রু নেই; **স্বম্ রাজ্যম্**—নিজের রাজ্য; **কিতবৈঃ**—ধূর্তদের (দুর্যোধন এবং তার গোষ্ঠী) দ্বারা; **হৃতম্**—অপহৃত; **ঘাতয়িত্বা**—বিনাশ করে; **অসতঃ**—দুষ্ট; **রাজ্ঞঃ**—রাণীর; **কচ**—কেশগুচ্ছ; **স্পর্শ**—স্পর্শ; **ক্ষত**—হ্রাস; **আয়ুষঃ**—আয়ু।

অনুবাদ

ধূর্ত দুর্যোধন এবং তার দলবল অজাতশত্রু মহারাজ যুধিষ্ঠিরের রাজ্য কপটতাপূর্বক অপহরণ করেছিল। পরমেশ্বরের কৃপায় তার পুনরুদ্ধার কার্য সুসম্পন্ন হয়েছিল এবং দুর্যোধনের সাথে যে সমস্ত অসৎ রাজারা যোগ দিয়েছিল, তাদেরও পরমেশ্বর বধ করেছিলেন। রাণী দ্রৌপদীর কেশাকর্ষণ করার ফলে যাদের আয়ু ক্ষয় হয়েছিল, তাদেরও মৃত্যু হয়েছিল।

তাৎপর্য

কলিযুগের আবির্ভাবের পূর্বে গৌরবময় দিনগুলিতে সমাজে ব্রাহ্মণ, গাভী, স্ত্রী, শিশু এবং বৃদ্ধদের যথাযথভাবে রক্ষা করা হত।

১) ব্রাহ্মণদের রক্ষা করার ফলে আধ্যাত্মিক জীবন লাভের সবচাইতে বিজ্ঞানসম্মত সংস্কৃতি বর্ণ এবং আশ্রম ব্যবস্থা রক্ষিত হয়।

২) গাভীদের রক্ষা করার ফলে অলৌকিক খাদ্য দুধ পাওয়া যায়, যা মনুষ্য জীবনের উচ্চতর উদ্দেশ্য সম্বন্ধে অবগত হওয়ার জন্য মস্তিষ্কের সূক্ষ্ম কোষসমূহ সংরক্ষণ করে।

৩) স্ত্রীলোকদের রক্ষা করার ফলে সমাজের পবিত্রতা সংরক্ষিত হয়, যার ফলে শান্তি, সমৃদ্ধি এবং জীবনের উন্নতি সাধনের জন্য সুসন্তান লাভ হয়।

৪) শিশুদের রক্ষা করার ফলে জড় জগতের বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য মনুষ্য জীবনকে যথাযথভাবে প্রস্তুত করার ক্ষেত্রে সর্বশ্রেষ্ঠ সুযোগ প্রদান করা হয়। শিশুদের রক্ষা করার এই ব্যবস্থার শুরু হয় জন্মের প্রারম্ভেই, গর্ভাধান সংস্কারের মাধ্যমে।

৫) বৃদ্ধদের রক্ষা করার ফলে তাদের মৃত্যুর পর শ্রেষ্ঠতর জীবন লাভের সুযোগ দেওয়া হয়। এই পূর্ণতর দৃষ্টিভঙ্গি মানব জীবনকে সার্থক করার ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত। এই সভ্যতাটি কুকুর-বিড়ালের মতো জীবন যাপন করার পাশবিক সভ্যতার ঠিক বিপরীত। উপরোক্ত নিরীহ ব্যক্তিদের হত্যা করা সর্বতোভাবে নিষিদ্ধ, এমনকি যদি তাদের অপমানও করা হয়, তাহলেও মানুষের আয়ুক্ষয় হয়। কলিযুগে তাদের যথাযথভাবে রক্ষা করা হয় না, এবং তাই এই যুগে মানুষদের আয়ু ব্যাপকভাবে হ্রাস পেয়েছে। *শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায়* উল্লেখ করা হয়েছে যে স্ত্রীলোকদের যথাযথভাবে রক্ষা না করা হলে সমাজে অবাঞ্ছিত সন্তান উৎপন্ন হয়, যাদের বলা হয় বর্ণ-সঙ্কর। সতী রমণীকে অপমান করার ফলে মানুষের আয়ু বিপন্ন হয়। দুর্যোধনের ভাই দুঃশাসন, আদর্শ সতী দ্রৌপদীকে অপমান করেছিল, এবং তার ফলে সেই দুরাত্মাকে অকালে মৃত্যুবরণ করতে হয়েছিল। ভগবানের কঠোর নিয়মের কয়েকটি উল্লেখ এখানে করা হয়েছে।

শ্লোক ৬

যাজয়িত্বাশ্বমেধৈস্তং ত্রিভিরুত্তমকল্পকৈঃ ।
তদ্যশঃ পাবনং দিক্ষু শতমন্যোরিবাতনোৎ ॥ ৬ ॥

যাজয়িত্বা—সম্পাদনের দ্বারা; **অশ্বমেধৈঃ**—অশ্বমেধ যজ্ঞ; **তম্**—তাঁকে (মহারাজ যুধিষ্ঠিরকে); **ত্রিভিঃ**—তিনটি; **উত্তম**—উৎকৃষ্ট; **কল্পকৈঃ**—যথাযথ উপাচার এবং দক্ষ পুরোহিতদের দ্বারা অনুষ্ঠিত; **তৎ**—সেই; **যশঃ**—খ্যাতি; **পাবনম্**—অতি পবিত্র; **দিক্ষু**—সর্বদিক; **শতমন্যোঃ**—শত অশ্বমেধ যজ্ঞ অনুষ্ঠানকারী ইন্দ্র; **ইব**—মতো; **অতনোৎ**—বিস্তার করেছিলেন।

অনুবাদ

পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ মহারাজ যুধিষ্ঠিরের তত্ত্বাবধানে তিনটি সুসম্পন্ন অশ্বমেধ যজ্ঞ অনুষ্ঠানের উদ্যোগ করিয়েছিলেন, এবং তার মাধ্যমেই শত যজ্ঞ অনুষ্ঠানকারী ইন্দ্রের মতো যুধিষ্ঠির মহারাজের ধর্ম-খ্যাতি সর্বদিকে মহিমান্বিত করে তুলতে প্রণোদিত করেছিলেন।

তাৎপর্য

এটি মহারাজ যুধিষ্ঠির কর্তৃক অনুষ্ঠিত অশ্বমেধ যজ্ঞ অনুষ্ঠানের ভূমিকার মতো। দেবরাজ ইন্দ্রের সঙ্গে মহারাজ যুধিষ্ঠিরের তুলনাটি তাৎপর্যপূর্ণ। দেবরাজ ইন্দ্রের ঐশ্বর্য মহারাজ যুধিষ্ঠিরের থেকে হাজার হাজার গুণ বেশি, তবুও মহারাজ যুধিষ্ঠিরের যশ ইন্দ্রের থেকে কোন অংশে কম ছিল না। তার কারণ মহারাজ যুধিষ্ঠির ছিলেন পরমেশ্বর ভগবানের একজন শুদ্ধ ভক্ত, এবং ভগবানের কৃপার প্রভাবেই কেবল মহারাজ যুধিষ্ঠির ইন্দ্রের সমকক্ষ হয়েছিলেন, যদিও তিনি কেবল তিনটি অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেছিলেন, আর ইন্দ্র সেখানে শত শত অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেছিলেন। এটিই ভগবদ্ভক্তের বিশেষ সৌভাগ্য। ভগবান সকলের প্রতি সমদর্শী, কিন্তু ভক্ত অধিক মহিমান্বিত হন কেননা তিনি সর্বদাই শ্রেষ্ঠতমের সঙ্গে যুক্ত। সূর্যকিরণের বিতরণ সর্বত্র সমভাবে হয়, কিন্তু তা সত্ত্বেও কতকগুলি স্থান সর্বদাই অন্ধকারাচ্ছন্ন থাকে। তা সূর্যের জন্য হয় না, পক্ষান্তরে গ্রহণ করার ক্ষমতার ফলে হয়ে থাকে। তেমনই, যাঁরা সম্পূর্ণভাবে ভগবানের শরণাগত ভক্ত, তাঁরা ভগবানের পূর্ণ কৃপা লাভ করেন, যদিও তা সর্বত্রই সমভাবে বিতরিত হয়ে থাকে।

শ্লোক ৭

আমন্ত্র্য পাণ্ডুপুত্রাংশ্চ শৈনেয়োদ্ধবসংযুতঃ ।
দ্বৈপায়নাদিভির্বিপ্রৈঃ পূজিতৈঃ প্রতিপূজিতঃ ॥ ৭ ॥

আমন্ত্র্য—নিমন্ত্রণ করে; **পাণ্ডুপুত্রান্**—সমস্ত পাণ্ডুপুত্রদের; **চ**—ও; **শৈনেয়**—সাত্যকি, **উদ্ধব**—উদ্ধব; **সংযুতঃ**—সহ; **দ্বৈপায়ন-আদিভিঃ**—বেদব্যাসপ্রমুখ ঋষিদের দ্বারা; **বিপ্রৈঃ**—ব্রাহ্মণদের দ্বারা; **পূজিতৈঃ**—পূজিত হয়ে; **প্রতিপূজিতঃ**—ভগবানও তাঁদের সেইভাবে পূজা করেছিলেন।

অনুবাদ

পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তখন প্রস্থানের জন্য প্রস্তুত হয়েছিলেন। শ্রীল ব্যাসদেবপ্রমুখ ব্রাহ্মণগণ কর্তৃক পূজিত হয়ে তিনি সাত্যকি ও উদ্ধবসহ পাণ্ডবদের আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন। তাঁদের দ্বারা পূজিত হয়ে ভগবানও তাঁদের প্রতি পূজা করলেন।

তাৎপর্য

আপাতদৃষ্টিতে শ্রীকৃষ্ণ ছিলেন ক্ষত্রিয়, তাই তিনি ব্রাহ্মণদের পূজনীয় ছিলেন না। কিন্তু সেখানে উপস্থিত শ্রীল ব্যাসদেব প্রমুখ ব্রাহ্মণেরা জানতেন যে তিনি হচ্ছেন পরমেশ্বর ভগবান, এবং তাই তাঁরা তাঁর পূজা করেছিলেন। ক্ষত্রিয়েরা যে ব্রাহ্মণদের অনুগত, সমাজ-ব্যবস্থার সেই নীতির প্রতি সম্মান প্রদর্শন করার জন্য ভগবান তাঁদের প্রত্যভিবাদন করেছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ যদিও সমাজের সমস্ত দায়িত্বপূর্ণ ব্যক্তিদের কাছ থেকে পরমেশ্বর ভগবানরূপে সম্মান লাভ করেছিলেন, তথাপি তিনি কখনো সমাজের চতুরাশ্রম প্রথা লঙ্ঘন করেননি। ভগবান এই সমস্ত সামাজিক প্রথা পালন করেছিলেন, যাতে ভবিষ্যতে অন্যেরা তাঁকে অনুসরণ করে।

শ্লোক ৮

গন্তুং কৃতমতির্ব্রহ্মন্ দ্বারকাং রথমাস্থিতঃ ।
উপলেভেঽভিধাবন্তীমুত্তরাং ভয়বিহ্বলাম্ ॥ ৮ ॥

গন্তুম্—গমনোদ্যত; **কৃতমতিঃ**—স্থির করে; **ব্রহ্মন্**—হে ব্রাহ্মণ; **দ্বারকাম্**—দ্বারকা অভিমুখে; **রথম্**—রথে; **আস্থিতঃ**—আরোহণ করে; **উপলেভে**—দেখলেন; **অভিধাবন্তীম্**—দ্রুতবেগে আসতে; **উত্তরাম্**—উত্তরাকে; **ভয়বিহ্বলাম্**—ভয়ে ব্যাকুল হয়ে।

অনুবাদ

যে মুহূর্তে তিনি রথে আরোহণ করে গমনোদ্যত হয়েছেন, সেই সময় তিনি দেখলেন যে উত্তরা ভয়ে ব্যাকুলা হয়ে তাঁর দিকে দ্রুতবেগে আসছেন।

তাৎপর্য

পাণ্ডব পরিবারের সমস্ত সদস্যরাই তাঁদের নিজেদের রক্ষার জন্য সম্পূর্ণরূপে ভগবানের উপর নির্ভরশীল ছিলেন, এবং তাই ভগবান সর্বাবস্থাতেই তাঁদের সকলকে রক্ষা করেছিলেন। ভগবান সকলকে রক্ষা করেন, কিন্তু কেউ যখন তাঁর উপর সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করেন তখন তিনি তাকে বিশেষভাবে রক্ষণাবেক্ষণ করেন। পিতা তার উপর সম্পূর্ণরূপে নির্ভরশীল তার সবচাইতে ছোট ছেলেটির প্রতি অধিক স্নেহশীল।

শ্লোক ৯

উত্তরোবাচ

পাহি পাহি মহাযোগিন্দেবদেব জগৎপতে।
নান্যং ত্বদভয়ং পশ্যে যত্র মৃত্যুঃপরস্পরম্ ॥ ৯ ॥

উত্তরা উবাচ—উত্তরা বললেন; পাহি পাহি—আমাকে রক্ষা করুন, আমাকে রক্ষা করুন; মহাযোগিন্—হে যোগীশ্রেষ্ঠ; দেব-দেব—দেবতাদের দেবতা; জগৎপতে—হে জগদীশ্বর; ন—না; অন্যম্—অন্য কেউ; ত্বৎ—আপনি ছাড়া; অভয়ম্—ভয়রহিত; পশ্যে—আমি দেখি; যত্র—যেখানে; মৃত্যুঃ—মৃত্যু; পরস্পরম্—দ্বন্দ্বভাবসমন্বিত জগতে।

অনুবাদ

উত্তরা বললেন, হে দেবতাদের দেবতা, হে জগদীশ্বর, হে মহাযোগী! আমাকে রক্ষা করুন; কারণ দ্বন্দ্বভাব সমন্বিত এই জগতে আপনি ছাড়া আর কেউ আমাকে মৃত্যুর করাল গ্রাস থেকে রক্ষা করতে পারবে না।

তাৎপর্য

এই জড় জগৎ অদ্বয়ভাব সমন্বিত চিজ্জগতের বিপরীত দ্বৈতভাব সমন্বিত। দ্বৈতভাব সমন্বিত এই জগৎ জড় পদার্থ এবং চিন্ময় আত্মার দ্বারা গঠিত, কিন্তু চিজ্জগৎ

সম্পূর্ণরূপে চিন্ময় এবং সেখানে জড় গুণের লেশমাত্র নেই। দ্বৈত জগতে সকলেই ভ্রান্তিপূর্বক জগতের প্রভু হবার চেষ্টা করছে, কিন্তু চিজ্জগতে পরমেশ্বর ভগবান হচ্ছেন পরম প্রভু, এবং অন্য সকলেই তাঁর ভৃত্য। দ্বৈতভাব সমন্বিত জড় জগতে সকলেই অন্যদের প্রতি মাৎসর্যপরায়ণ, এবং জড় ও চেতনের দ্বৈত অস্তিত্বের ফলে মৃত্যু সেখানে অনিবার্য। শরণাগত জীবদের জন্য ভগবানই একমাত্র অভয়প্রদ আশ্রয়। পরমেশ্বর ভগবানের শ্রীপাদপদ্মে শরণাগতি ব্যতীত এই জড় জগতে কেউই মৃত্যুর করাল গ্রাস থেকে নিজেকে রক্ষা করতে পারে না।

শ্লোক ১০

অভিদ্রবতি মামীশ শরস্তপ্তায়সো বিভো।
কামং দহতু মাং নাথ মা মে গর্ভো নিপাত্যতাম্ ॥ ১০ ॥

অভিদ্রবতি—অভিমুখে ধাবমান; **মাম্**—আমার; **ঈশ**—হে পরমেশ্বর; **শরঃ**—বাণ; **তপ্ত**—জ্বলন্ত; **অয়সঃ**—লৌহ; **বিভো**—হে মহান; **কামম্**—বাসনা; **দহতু**—দগ্ধ করুক; **মাম্**—আমাকে; **নাথ**—হে রক্ষাকর্তা; **মা**—না; **মে**—আমার; **গর্ভঃ**—গর্ভস্থ সন্তান; **নিপাত্যতাম্**—নষ্ট করে।

অনুবাদ

হে পরমেশ্বর, আপনি সর্বশক্তিমান। একটি জ্বলন্ত লৌহবাণ আমার প্রতি দ্রুতগতিতে ধাবিত হচ্ছে। হে নাথ, যদি আপনার ইচ্ছা হয় তাহলে এটি আমাকে দগ্ধ করুক, কিন্তু এটি যেন আমার গর্ভস্থ সন্তানটিকে দগ্ধ না করে। হে পরমেশ্বর, আমাকে এই কৃপা করুন।

তাৎপর্য

এই ঘটনাটি ঘটেছিল উত্তরার পতি অভিমন্যুর মৃত্যুর পর। অভিমন্যুর বিধবা পত্নী উত্তরা, তাঁর পতির সহগমন করতেন, কিন্তু যেহেতু তিনি তখন গর্ভবতী ছিলেন, এবং ভগবানের এক মহান ভক্ত পরীক্ষিৎ মহারাজ তাঁর গর্ভে অবস্থান করছিলেন, তাই তাঁকে রক্ষা করা ছিল তাঁর একান্ত কর্তব্য। মাতার এক মহান দায়িত্ব হচ্ছে তার শিশু-সন্তানকে সর্বতোভাবে রক্ষা করা, এবং তাই সেই কথা শ্রীকৃষ্ণের কাছে সরলভাবে ব্যক্ত করতে তিনি লজ্জা অনুভব করেননি। উত্তরা ছিলেন এক মহান রাজার কন্যা, এক মহান রাজার পত্নী, এক মহান ভক্তের শিষ্যা, এবং পরবর্তীকালে তিনি একজন মহান রাজার মাতাও হয়েছিলেন। তিনি ছিলেন সর্বতোভাবে সৌভাগ্যশালিনী।

শ্লোক ১১

সূত উবাচ

উপধার্য বচস্তস্যা ভগবান্ ভক্তবৎসলঃ ।
অপাণ্ডবমিদং কর্তুং দ্রৌণেরস্ত্রমবুধ্যত ॥ ১১ ॥

সূতঃ উবাচ—সূত গোস্বামী বললেন; **উপধার্য**—ধৈর্যসহকারে শ্রবণ করে; **বচঃ**—কথা; **তস্যাঃ**—তাঁর; **ভগবান্**—পরমেশ্বর ভগবান; **ভক্ত-বৎসলঃ**—যিনি তাঁর ভক্তদের প্রতি অত্যন্ত স্নেহপরায়ণ; **অপাণ্ডবম্**—পাণ্ডবদের বংশধরশূন্য; **ইদম্**—এই; **কর্তুম্**—করার জন্য; **দ্রৌণেঃ**—দ্রোণাচার্যের পুত্র; **অস্ত্রম্**—অস্ত্র; **অবুধ্যত**—বুঝতে পেরেছিলেন।

অনুবাদ

সূত গোস্বামী বললেন, তাঁর কথা ধৈর্য সহকারে শ্রবণ করে ভক্তবৎসল পরমেশ্বর ভগবান তৎক্ষণাৎ বুঝতে পারলেন যে দ্রোণাচার্যের পুত্র অশ্বত্থামা পাণ্ডব বংশের শেষ বংশধরটিকে বিনষ্ট করার জন্য ব্রহ্মাস্ত্র নিক্ষেপ করেছে।

তাৎপর্য

ভগবান সর্বতোভাবে নিরপেক্ষ, কিন্তু তা সত্ত্বেও তিনি তাঁর ভক্তদের প্রতি অনুরক্ত, কেননা সকলের কল্যাণের জন্য তা নিতান্তই আবশ্যক। পাণ্ডব পরিবার ছিল ভক্ত-পরিবার, এবং তাই ভগবান চেয়েছিলেন যে তারাই যেন পৃথিবী শাসন করে। সেই কারণে তিনি দুর্যোধনের গোষ্ঠীর শাসন সমাপ্ত করে মহারাজ যুধিষ্ঠিরের শাসন প্রবর্তন করেছিলেন। তাই, তিনি গর্ভস্থ মহারাজ পরীক্ষিতকে রক্ষা করতে চেয়েছিলেন। পৃথিবী আদর্শ ভক্ত পরিবার পাণ্ডববিহীন হয়ে যাক, তা তিনি চাননি।

শ্লোক ১২

তর্হ্যেবাথ মুনিশ্রেষ্ঠ পাণ্ডবাঃ পঞ্চ সায়কান্ ।
আত্মনোঽভিমুখান্দীপ্তান্ অলক্ষ্যাস্ত্রাণ্যুপাদদুঃ ॥ ১২ ॥

তর্হি—তখন; **এব**—ও; **অথ**—অতএব; **মুনি-শ্রেষ্ঠ**—হে মুনিশ্রেষ্ঠ; **পাণ্ডবাঃ**—পাণ্ডবেরা; **পঞ্চ**—পাঁচ; **সায়কান্**—অস্ত্রশস্ত্র; **আত্মনঃ**—নিজেদের; **অভিমুখান্**—অভিমুখে; **দীপ্তান্**—জ্বলন্ত; **আলক্ষ্য**—দর্শন করে; **অস্ত্রাণি**—অস্ত্রশস্ত্র; **উপাদদুঃ**—গ্রহণ করেছিলেন।

অনুবাদ

হে মুনিশ্রেষ্ঠ (শৌনক), পাণ্ডবেরা তখন জ্বলন্ত ব্রহ্মাস্ত্র তাঁদের অভিমুখে আসতে দেখে তাঁদের পাঁচটি নিজ নিজ অস্ত্র তুলে নিলেন।

তাৎপর্য

ব্রহ্মাস্ত্র পারমাণবিক অস্ত্রের থেকেও অধিক সূক্ষ্ম। মহারাজ যুধিষ্ঠিরপ্রমুখ পঞ্চপাণ্ডব এবং উত্তরার গর্ভস্থ তাঁদের একমাত্র পৌত্রকে হত্যা করার জন্য অশ্বত্থামা সেই ব্রহ্মাস্ত্র নিক্ষেপ করেছিল। তাই ব্রহ্মাস্ত্র পারমাণবিক অস্ত্রের থেকেও অধিক কার্যকরী এবং সূক্ষ্ম, কেননা ব্রহ্মাস্ত্র পারমাণবিক অস্ত্রের মতো অন্ধ নয়। যখন আণবিক অস্ত্র প্রয়োগ করা হয়, তখন তা লক্ষ্যবস্তু এবং অন্যদের মধ্যে পার্থক্য নিরূপণ করতে পারে না। প্রধানত পারমাণবিক অস্ত্র নিরীহ ব্যক্তিদেরও অনিষ্ট সাধন করে, কেননা পার্থক্য নিরূপণ করার ক্ষমতা তার নেই। ব্রহ্মাস্ত্র কিন্তু তেমন নয়। সর্বপ্রথমে তা লক্ষ্যবস্তু নির্ধারণ করে এবং নিরীহ ব্যক্তিদের অনিষ্ট সাধন না করে সেই উদ্দেশ্যে ধাবিত হয়।

শ্লোক ১৩

ব্যসনং বীক্ষ্য তত্তেষামনন্যবিষয়াত্মনাম্ ।
সুদর্শনেন স্বাস্ত্রেণ স্বানাং রক্ষাং ব্যধাদ্বিভুঃ ॥ ১৩ ॥

ব্যসনম্—মহা বিপদ; **বীক্ষ্য**—দর্শন করে; **তৎ**—তা; **তেষাম্**—তাঁদের; **অনন্য**—অন্য কিছু না; **বিষয়**—উপায়; **আত্মনাম্**—এই প্রকার প্রবণতাবিশিষ্ট; **সুদর্শনেন**—শ্রীকৃষ্ণের সুদর্শন চক্রের দ্বারা; **স্ব-অস্ত্রেণ**—নিজ অস্ত্রের দ্বারা; **স্বানাম্**—তাঁর নিজের ভক্তদের; **রক্ষাম্**—রক্ষা; **ব্যধাৎ**—করেছিলেন; **বিভুঃ**—সর্বশক্তিমান।

অনুবাদ

সর্বশক্তিমান পরম পুরুষ ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যখন দেখলেন যে সর্বতোভাবে তাঁর শরণাগত অনন্য ভক্তদের মহা বিপদ উপস্থিত হয়েছে, তখন তিনি তাঁদের রক্ষা করার জন্য আপন অস্ত্র সুদর্শন চক্র ধারণ করলেন।

তাৎপর্য

অশ্বত্থামা যে ব্রহ্মাস্ত্র নিক্ষেপ করেছিল তা অনেকটা পারমাণবিক অস্ত্রের মতো, তবে তা ছিল অধিক তেজ এবং তাপসম্পন্ন। এই ব্রহ্মাস্ত্র সূক্ষ্মতর বিজ্ঞানের অবদান, যা সূক্ষ্ম

শব্দতরঙ্গরূপ বৈদিক মন্ত্র থেকে উৎপন্ন হয়েছে। এই অস্ত্রের আরেকটি গুণ হচ্ছে যে তা পারমাণবিক অস্ত্রের মতো অন্ধ নয়, কেননা তা কেবল নির্দিষ্ট লক্ষ্যের উদ্দেশ্যেই নিক্ষেপ করা যায় এবং তা লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে অন্যদিকে গমন করে না। অশ্বত্থামা সেই অস্ত্র নিক্ষেপ করেছিল কেবল পাণ্ডব পরিবারের পুরুষদের সংহার করার জন্য, তাই একদিক দিয়ে সেটি পারমাণবিক অস্ত্রের থেকেও ভয়ঙ্কর ছিল, কেননা তা সবচাইতে সুরক্ষিত স্থানেও প্রবেশ করতে পারতো এবং কখনো লক্ষ্যভ্রষ্ট হত না। এই সমস্ত বিষয়ে অবগত হয়ে শ্রীকৃষ্ণ তৎক্ষণাৎ তাঁর নিজের অস্ত্র গ্রহণ করেছিলেন তাঁর সেই সব ভক্তদের রক্ষা করার জন্য যাঁরা শ্রীকৃষ্ণকে ছাড়া অন্য কিছুই জানতেন না। *শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায়* ভগবান স্পষ্টভাবে প্রতিজ্ঞা করেছেন যে তাঁর ভক্তের কখনো বিনাশ হবে না, এবং তিনি তাঁর ভক্তের সেবার গুণ এবং মাত্রা অনুসারে আচরণ করেন। এখানে *অনন্য-বিষয়াত্মনাম্* শব্দটি তাৎপর্যপূর্ণ। পাণ্ডবেরা যদিও ছিলেন এক-একজন মহারথী, তথাপি তাঁরা ভগবানের সংরক্ষণের উপর সর্বতোভাবে নির্ভরশীল ছিলেন। ভগবান সবচাইতে বড় বীরদেরও উপেক্ষা করে নিমেষের মধ্যে তাদের সংহার করতে পারেন। ভগবান যখন দেখলেন যে অশ্বত্থামা কর্তৃক নিক্ষিপ্ত ব্রহ্মাস্ত্র নিবারণ করার সময় পাণ্ডবদের নেই, তখন তিনি তাঁর নিজের প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করেও তাঁর অস্ত্র ধারণ করেছিলেন। যদিও কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ প্রায় শেষ হয়ে গিয়েছিল, তথাপি, নিজের প্রতিজ্ঞা অনুসারে তাঁর অস্ত্র ধারণ করা উচিত ছিল না। কিন্তু তখন সেই সঙ্কট তাঁর কাছে তাঁর প্রতিজ্ঞা থেকেও অধিক গুরুত্বপূর্ণ ছিল। ভগবান ভক্তবৎসল নামে পরিচিত, এবং তাই তিনি প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ না করার জাগতিক নীতিবোধের থেকে তাঁর ভক্তবাৎসল্যকে অধিক গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করেছিলেন।

শ্লোক ১৪

অন্তঃস্থঃ সর্বভূতানামাত্মা যোগেশ্বরো হরিঃ।
স্বমায়য়াবৃণোদ্গর্ভং বৈরাট্যাঃ কুরুতন্তবে ॥ ১৪ ॥

অন্তঃস্থঃ—অন্তরে; **সর্ব**—সমস্ত; **ভূতানাম্**—জীবদের; **আত্মা**—আত্মা; **যোগেশ্বরঃ**—সমস্ত যোগীদের ঈশ্বর; **হরিঃ**—পরমেশ্বর ভগবান; **স্ব-মায়য়া**—তাঁর যোগমায়ার প্রভাবে; **আবৃণোৎ**—আবৃত করেছিলেন; **গর্ভম্**—গর্ভ; **বৈরাট্যাঃ**—উত্তরার; **কুরুতন্তবে**—মহারাজ কুরুর বংশ রক্ষার জন্য।

অনুবাদ

পরম যোগ রহস্যের নিয়ন্তা যোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ সর্ব জীবের হৃদয়ে পরমাত্মারূপে বিরাজ করেন। তাই কুরুবংশ রক্ষা করার জন্য তাঁর যোগমায়ার দ্বারা তিনি উত্তরার গর্ভ আবৃত করলেন।

তাৎপর্য

পরম যোগেশ্বর ভগবান তাঁর অংশ প্রকাশ পরমাত্মারূপে প্রতিটি জীবের হৃদয়ে এমনকি প্রতিটি পরমাণুর অভ্যন্তরেও অবস্থান করতে পারেন। তাই তিনি মহারাজ পাণ্ডুর পূর্বসূরী মহারাজ কুরুর বংশ রক্ষার জন্য পরীক্ষিৎ মহারাজকে রক্ষা করেছিলেন এবং তিনি উত্তরার দেহাভ্যন্তর থেকে তাঁর গর্ভ আবৃত করেছিলেন। ধৃতরাষ্ট্র এবং পাণ্ডু উভয়ের পুত্ররাই ছিলেন মহারাজ কুরুর বংশধর; তাই তাঁরা উভয়েই সাধারণত কৌরব নামে পরিচিত। কিন্তু যখন এই দুই পরিবারের মধ্যে বিবাদ হয়, তখন ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রেরা কৌরব নামে এবং পাণ্ডুর পুত্রেরা পাণ্ডব নামে পরিচিত হন। যেহেতু ধৃতরাষ্ট্রের সমস্ত পুত্র এবং পৌত্রেরা কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে নিহত হয়েছিল, তাই সেই বংশের শেষ সন্তান কুরুতন্তু বা কুরুপুত্র নামে অভিহিত হয়েছিলেন।

শ্লোক ১৫

যদ্যপ্যস্ত্রং ব্রহ্মশিরস্ত্বমোঘং চাপ্রতিক্রিয়ম্ ।
বৈষ্ণবং তেজ আসাদ্য সমশাম্যদ্ভৃগূদ্বহ ॥ ১৫ ॥

যদ্যপি—যদিও; অস্ত্রম্—অস্ত্র; ব্রহ্ম-শিরঃ—ব্রহ্মাস্ত্র; তু—কিন্তু; অমোঘম্—অব্যর্থ; চ—এবং; অপ্রতিক্রিয়ম্—অনিবার্য; বৈষ্ণবম্—বিষ্ণুসম্বন্ধীয়; তেজঃ—শক্তি; আসাদ্য—প্রতিরুদ্ধ হওয়াতে; সমশাম্যৎ—নিষ্ক্রিয় হয়েছিল; ভৃগু-উদ্বহ—হে ভৃগু বংশের গৌরব।

অনুবাদ

হে শৌনক, যদিও অশ্বত্থামা কর্তৃক নিক্ষিপ্ত ব্রহ্মাস্ত্র ছিল অব্যর্থ এবং অনিবার্য, তথাপি শ্রীবিষ্ণুর (শ্রীকৃষ্ণের) তেজের দ্বারা প্রতিরুদ্ধ হওয়াতে তা সম্পূর্ণরূপে নিষ্ক্রিয় এবং ব্যর্থ হল।

তাৎপর্য

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় উল্লেখ করা হয়েছে যে ব্রহ্মজ্যোতি ভগবান শ্রীকৃষ্ণের উপর আশ্রিত। পক্ষান্তরে বলা যায় যে ব্রহ্মতেজ নামক জ্যোতি ভগবানের দেহনির্গত রশ্মিচ্ছটা ছাড়া আর কিছু নয়, ঠিক যেমন সূর্যকিরণ হচ্ছে সূর্যমণ্ডলের রশ্মিচ্ছটা। তাই এই ব্রহ্মাস্ত্র, জড় বিচারে অপ্রতিরুদ্ধ হলেও, পরমেশ্বর ভগবানের পরম শক্তি অতিক্রম করতে অক্ষম ছিল। অশ্বত্থামা কর্তৃক নিক্ষিপ্ত ব্রহ্মাস্ত্র শ্রীকৃষ্ণের স্বীয় শক্তির দ্বারা প্রতিহত হয়েছিল; অর্থাৎ, তাঁকে অন্য কারও সাহায্যের অপেক্ষা করতে হয়নি, কেননা তিনি হচ্ছেন পরম তত্ত্ব।

শ্লোক ১৬

মা মংস্থা হ্যেতদাশ্চর্যং সর্বাশ্চর্যময়েঽচ্যুতে।
য ইদং মায়য়া দেব্যা সৃজত্যবতি হন্ত্যজঃ ॥ ১৬ ॥

মা—কর না; **মংস্থা**—চিন্তা; **হি**—অবশ্যই; **এতৎ**—এই সমস্ত; **আশ্চর্যম্**—অদ্ভুত; **সর্ব**—সমস্ত; **আশ্চর্য-ময়ে**—অতি অদ্ভুত লীলাময়ে; **অচ্যুতে**—শ্রীকৃষ্ণে; **যঃ**—যিনি; **ইদম্**—এই জগতে; **মায়য়া**—তাঁর শক্তির দ্বারা; **দেব্যা**—দিব্য; **সৃজতি**—সৃষ্টি করেন; **অবতি**—পালন করেন; **হন্তি**—সংহার করেন; **অজঃ**—প্রাকৃত জন্মরহিত।

অনুবাদ

হে ব্রাহ্মণগণ, যে আশ্চর্যময় ও অচ্যুত পরমেশ্বর ভগবান তাঁর মায়াশক্তির দ্বারা এই জড় জগতের সৃষ্টি করেন, পালন করেন এবং ধ্বংস করেন, এবং যিনি প্রাকৃত জন্মরহিত, তাঁর পক্ষে এই ব্রহ্মাস্ত্র প্রশমন-কার্য বিশেষ বিস্ময়কর বলে মনে করবেন না।

তাৎপর্য

ভগবানের কার্যকলাপ সর্বদাই জীবের ক্ষুদ্র মস্তিষ্কের কাছে অচিন্ত্য। পরমেশ্বর ভগবানের কাছে কোন কিছুই অসম্ভব নয়, কিন্তু আমাদের কাছে তাঁর সমস্ত কার্যকলাপ আশ্চর্যজনক, এবং তাই তিনি সর্বদাই আমাদের চিন্তার অতীত। ভগবান হচ্ছেন সর্বশক্তিমান, পরম পূর্ণ পরমেশ্বর। ভগবান সর্বতোভাবে পূর্ণ, কিন্তু অন্য সকলে, যথা নারায়ণ, ব্রহ্মা, শিব, দেবতাগণ এবং অন্য সমস্ত জীব, বিভিন্ন মাত্রায় তাঁর পূর্ণতার কেবল কিঞ্চিৎ অংশের অধিকারী। কেউই তাঁর সমকক্ষ নন অথবা তাঁর থেকে শ্রেষ্ঠ নন। তিনি অদ্বিতীয়।

শ্লোক ১৭

ব্রহ্মতেজোবিনির্মুক্তৈরাত্মজৈঃ সহ কৃষ্ণয়া ।
প্রয়াণাভিমুখং কৃষ্ণমিদমাহ পৃথা সতী ॥ ১৭ ॥

ব্রহ্ম-তেজঃ—ব্রহ্মাস্ত্রের তেজ; **বিনির্মুক্তৈঃ**—রক্ষা লাভ করে; **আত্ম-জৈঃ**—তাঁর পুত্রগণ; **সহ**—সহ; **কৃষ্ণয়া**—দ্রৌপদী; **প্রয়াণ**—প্রস্থান; **অভিমুখম্**—অভিমুখে; **কৃষ্ণম্**—পরমেশ্বর শ্রীকৃষ্ণকে; **ইদম্**—এই; **আহ**—বললেন; **পৃথা**—কুন্তী; **সতী**—ভগবানের অনুরক্তা সাধ্বী।

অনুবাদ

এইভাবে ব্রহ্মাস্ত্রের তেজ থেকে মুক্ত হয়ে কৃষ্ণভক্ত সাধ্বী কুন্তী তাঁর পঞ্চপুত্র এবং দ্রৌপদীসহ একযোগে শ্রীকৃষ্ণের স্তব করতে লাগলেন। শ্রীকৃষ্ণ তখন দ্বারকার অভিমুখে গমনোদ্যত হলেন।

তাৎপর্য

এখানে কুন্তীদেবীকে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের প্রতি তাঁর অনন্য ভক্তির জন্য সতী বলে বর্ণনা করা হয়েছে। এখন, ভগবানের প্রতি তাঁর নিম্নলিখিত প্রার্থনাটিতে তাঁর মনোভাব ব্যক্ত হবে। ভগবানের ঐকান্তিক ভক্ত, বিপদ থেকে উদ্ধার লাভের জন্যও অন্য কোন জীব অথবা দেবতার মুখাপেক্ষী হন না। সমস্ত পাণ্ডব পরিবারের মধ্যেই এই বিশেষ বৈশিষ্ট্যটি সব সময় দেখা গেছে। তাঁরা শ্রীকৃষ্ণকে ছাড়া অন্য কিছুই জানতেন না, এবং তাই ভগবানও সর্বদাই সর্ব অবস্থায় সর্বতোভাবে তাঁদের সাহায্য করতে প্রস্তুত ছিলেন। সেটিই ভগবানের দিব্য স্বভাব। তিনি ভক্তের নির্ভরতার প্রতিদান দেন। তাই অপূর্ণ জীব অথবা দেবতাদের সাহায্য প্রার্থনা না করে কেবল শ্রীকৃষ্ণেরই সাহায্য প্রত্যাশা করা উচিত, যিনি তাঁর ভক্তদের রক্ষা করতে সম্পূর্ণরূপে সক্ষম। এই প্রকার শুদ্ধভক্তও কখনো ভগবানের সাহায্য প্রার্থনা করেন না, কিন্তু ভগবান স্বেচ্ছায় তাঁদের সহায়তা করার জন্য সর্বদা উৎসুক থাকেন।

শ্লোক ১৮

কুন্ত্যুবাচ

নমস্যে পুরুষং ত্বাদ্যমীশ্বরং প্রকৃতেঃ পরম্ ।
অলক্ষ্যং সর্বভূতানামন্তর্বহিরবস্থিতম্ ॥ ১৮ ॥

কুন্তী উবাচ—শ্রীমতী কুন্তীদেবী বললেন; নমস্যে—আমি প্রণতি নিবেদন করি; পুরুষম্—পরম পুরুষকে; ত্বা—তুমি; আদ্যম্—আদি; ঈশ্বরম্—পরম নিয়ন্তা; প্রকৃতেঃ—জড়া প্রকৃতির; পরম্—অতীত; অলক্ষম্—অদৃশ্য; সর্ব—সমস্ত; ভূতানাম্—জীবদের; অন্তঃ—অন্তরে; বহিঃ—বাইরে; অবস্থিতম্—বিরাজমান।

অনুবাদ

শ্রীমতী কুন্তীদেবী বললেন, হে কৃষ্ণ, আমি তোমাকে আমার সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি। কারণ তুমি আদি পুরুষ এবং জড়া প্রকৃতির সমস্ত গুণের অতীত। তুমি সকলের অন্তরে ও বাহিরে অবস্থিত, তথাপি তোমাকে কেউ দেখতে পায় না।

তাৎপর্য

শ্রীমতী কুন্তীদেবী ভালভাবেই জানতেন যে শ্রীকৃষ্ণ যদিও তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্ররূপে লীলাবিলাস করছেন, তথাপি তিনি হচ্ছেন আদি পুরুষ ভগবান। এই প্রকার জ্ঞানের আলোকে উদ্ভাসিত রমণী কখনো তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্রকে প্রণাম করে ভুল করতে পারেন না। তাই, তিনি তাঁকে প্রকৃতির অতীত আদি পুরুষ বলে সম্বোধন করেছেন। যদিও জীবেরাও প্রকৃতির অতীত, কিন্তু তারা আদি পুরুষ বা অচ্যুত নয়। জীবেরা জড়া প্রকৃতির বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে অধঃপতিত হতে পারে, কিন্তু ভগবান কখনোই তেমন নন। তাই বেদে তাঁকে সমস্ত জীবের মধ্যে প্রধান বলে বর্ণনা করা হয়েছে (*নিত্যো নিত্যানাং চেতনশ্চেতনানাম্*)। তারপর তাঁকে আবার ঈশ্বর বা পরম নিয়ন্তা বলে সম্বোধন করা হয়েছে। জীবেরা অথবা চন্দ্র, সূর্য আদি দেবতারাও কিছু পরিমাণে ঈশ্বর, কিন্তু তাদের কেউই পরমেশ্বর বা পরম নিয়ন্তা নন। তিনি হচ্ছেন পরমেশ্বর বা পরমাত্মা। তিনি অন্তরে এবং বাইরে উভয় ক্ষেত্রেই বিরাজমান। যদিও তিনি শ্রীমতী কুন্তীদেবীর সম্মুখে তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্ররূপে উপস্থিত ছিলেন, একই সঙ্গে তিনি তাঁর অন্তরে এবং অন্য সকলের অন্তরে বিরাজমান ছিলেন। *শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায়* (১৫/১৫) ভগবান বলেছেন, "আমি সকলের হৃদয়ে বিরাজ করছি, এবং কেবল আমারই প্রভাবে স্মৃতি, বিস্মৃতি এবং জ্ঞান ইত্যাদির প্রকাশ হয়। সমস্ত বেদের মাধ্যমে আমাকে জানা যায়, কেননা আমিই হচ্ছি বেদের প্রণেতা, এবং বেদান্তবেত্তা।" কুন্তীদেবী প্রতিপন্ন করেছেন যে ভগবান যদিও সমস্ত জীবের অন্তরে এবং বাইরে রয়েছেন, তথাপি তিনি অদৃশ্য। তাই বলা যায় যে ভগবান সাধারণ মানুষের কাছে একটি ধাঁধার মতো। কুন্তীদেবী ব্যক্তিগতভাবে অনুভব করেছিলেন যে শ্রীকৃষ্ণ যদিও তাঁর সম্মুখে উপস্থিত ছিলেন, তথাপি তিনি উত্তরার গর্ভে প্রবেশ করে অশ্বত্থামার ব্রহ্মাস্ত্রের আক্রমণ থেকে তাঁর ভ্রূণ রক্ষা করেছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ সর্বব্যাপ্ত না একস্থানে

স্থিত, সে কথা ভেবে কুন্তীদেবী নিজেও বিস্ময়ে হতবাক্ হয়েছিলেন। প্রকৃতপক্ষে, তিনি উভয়ই, কিন্তু যারা তাঁর শরণাগত নয় তাদের কাছে নিজেকে প্রকাশ না করার অধিকার তিনি বজায় রাখেন। এইভাবে তাঁকে আচ্ছাদিত করে রাখে যে যবনিকা, তাকে ভগবানের মায়াশক্তি বলা হয়, এবং এটি বিদ্রোহী আত্মাদের সীমিত দৃষ্টিশক্তিকে নিয়ন্ত্রণ করে। তা নিম্নলিখিত শ্লোকে বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

শ্লোক ১৯

মায়াজবনিকাচ্ছন্নমজ্ঞাধোক্ষজমব্যয়ম্ ।
ন লক্ষ্যসে মূঢ়দৃশা নটো নাট্যধরো যথা ॥ ১৯ ॥

মায়া—মোহজনক; **জবনিকা**—পর্দা; **আচ্ছন্নম্**—আবৃত; **অজ্ঞা**—অজ্ঞ; **অধোক্ষজম্**—জড় ইন্দ্রিয় উপলব্ধির অতীত; **অব্যয়ম্**—অব্যক্ত; **ন**—না; **লক্ষ্যসে**—দেখা; **মূঢ়দৃশা**—মূঢ় দ্রষ্টা; **নটঃ**—অভিনেতা; **নাট্যধরঃ**—অভিনেতার সাজে সজ্জিত; **যথা**—যেমন।

অনুবাদ

তুমি ইন্দ্রিয়জ জ্ঞানের অতীত, তুমি মায়ারূপা যবনিকার দ্বারা আচ্ছাদিত, অব্যক্ত ও অচ্যুত। মূঢ়দ্রষ্টা যেমন অভিনেতার সাজে সজ্জিত শিল্পীকে দেখে সাধারণত চিনতে পারে না, তেমনই অজ্ঞ ব্যক্তিরা তোমাকে দেখতে পায় না।

তাৎপর্য

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ঘোষণা করেছেন যে মূঢ় ব্যক্তিরা তাঁকে আমাদেরই মতো একজন সাধারণ মানুষ বলে মনে করে তাঁকে উপহাস করে। এখানে কুন্তীদেবীও সেই কথাই বলেছেন। মূর্খ মানুষ হচ্ছে তারা যারা ভগবানের প্রভুত্বের প্রতি বিদ্রোহ করে। এই প্রকার ব্যক্তিদের বলা হয় অসুর। অসুরেরা ভগবানের কর্তৃত্ব মানতে চায় না। ভগবান স্বয়ং যখন আমাদের সম্মুখে রাম, নৃসিংহ, বরাহ অথবা তাঁর কৃষ্ণ স্বরূপে আবির্ভূত হন, তখন তিনি বহু আশ্চর্যজনক কার্য সম্পাদন করেন যা মানুষের পক্ষে অসম্ভব। এই মহান গ্রন্থের দশম স্কন্ধে আমরা দেখতে পাব যে শ্রীকৃষ্ণ যখন তাঁর মায়ের কোলে ছিলেন তখন থেকেই তিনি মানুষের পক্ষে অসম্ভব সমস্ত কার্যকলাপ প্রদর্শন করেছিলেন। পুতনা রাক্ষসী যদিও তার স্তনে বিষ মাখিয়ে ভগবানকে হত্যা করতে এসেছিলেন, কিন্তু সেই পুতনাকে তিনি সংহার করেছিলেন।

একটি সাধারণ শিশুর মতো তিনি তার স্তন পান করার মাধ্যমে তার প্রাণবায়ু শুষে নিয়েছিলেন। তেমনই, একটি বালক যেমন অনায়াসে একটি ব্যাঙের ছাতা তুলে ধরে, ঠিক সেইভাবে তিনি গোবর্ধন পর্বত ধারণ করেছিলেন, এবং বৃন্দাবনের অধিবাসীদের রক্ষা করার জন্য তিনি কয়েকদিন ধরে সেটি সেইভাবে ধারণ করেছিলেন। এইগুলি পুরাণ, ইতিহাস, উপনিষদ আদি প্রামাণিক বৈদিক শাস্ত্রে বর্ণিত ভগবানের অলৌকিক কার্যকলাপের কয়েকটি বর্ণনা। *শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার* মাধ্যমে তিনি তাঁর অলৌকিক উপদেশ প্রদান করেছেন। তিনি একজন যোদ্ধারূপে, গৃহস্থরূপে, শিক্ষকরূপে, ত্যাগীরূপে তাঁর অদ্ভুত ক্ষমতা প্রদর্শন করেছেন। ব্যাস, দেবল, অসিত, নারদ, মধ্ব, শংকর, রামানুজ, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু, শ্রীজীব গোস্বামী, বিশ্বনাথ চক্রবর্তী, ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী এবং এই ধারায় সমস্ত মহাজনগণ কর্তৃক তিনি পরমেশ্বর ভগবান বলে স্বীকৃত হয়েছেন। তিনি নিজেও প্রামাণিক শাস্ত্রের বহু জায়গায় সে কথা ঘোষণা করেছেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও একশ্রেণীর আসুরিক মনোভাবাপন্ন মানুষ রয়েছে, যারা সর্বদাই ভগবানকে পরম সত্য বলে স্বীকার না করতে বদ্ধপরিকর। তার একটি কারণ হচ্ছে তাদের জ্ঞানের অভাব এবং অন্য কারণটি হচ্ছে তাদের পূর্বকৃত ও বর্তমান দুষ্কর্মের ফলস্বরূপ অদম্য জেদ। শ্রীকৃষ্ণ যখন তাদের সম্মুখে উপস্থিত ছিলেন তখনও তারা তাঁকে ভগবান বলে চিনতে পারে নি। আরেকটি অসুবিধা হচ্ছে যে যারা তাদের ভ্রান্ত ইন্দ্রিয়ের উপর অধিক নির্ভরশীল তারা কখনোই তাঁকে পরমেশ্বর ভগবান বলে জানতে পারে না। এই প্রকার মানুষেরা আধুনিক বৈজ্ঞানিকদের মতো। তারা সবকিছু তাদের গবেষণাভিত্তিক জ্ঞানের মাধ্যমে জানতে চায়। কিন্তু ভ্রান্ত গবেষণালব্ধ জ্ঞানের দ্বারা পরমেশ্বর ভগবানকে জানা কখনোই সম্ভব নয়। তাঁকে এখানে অধোক্ষজ বলে বর্ণনা করা হয়েছে, অর্থাৎ, তিনি ইন্দ্রিয়ের অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞানের অতীত। আমাদের সবকটি ইন্দ্রিয়ই ভ্রান্ত। আমরা সবকিছু দেখার দাবি করি, কিন্তু তা সত্ত্বেও আমাদের স্বীকার করতেই হবে যে আমাদের এই দর্শন কতকগুলি জাগতিক অবস্থার অধীন, যা আমাদের নিয়ন্ত্রণের অতীত। বদ্ধ জীবদের, বিশেষ করে একজন অল্পবুদ্ধিসম্পন্ন স্ত্রীলোকের এই অক্ষমতা কুন্তীদেবী স্বীকার করেছেন। অল্পবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষদের জন্য তাই মন্দির, মসজিদ অথবা গির্জার অবশ্য প্রয়োজন, যাতে তারা পরমেশ্বর ভগবানকে জানতে পারে এবং এই প্রকার পবিত্র স্থানে তত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তিদের কাছে তাঁর সম্বন্ধে শ্রবণ করতে পারে। অল্পবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষদের জন্য, পারমার্থিক জীবনের শুরুতে এটি অত্যন্ত আবশ্যক। মূর্খ মানুষেরাই কেবল ভগবানের আরাধনার এই সমস্ত স্থানগুলি প্রতিষ্ঠা করার বিরোধিতা করে, যেগুলি জনসাধারণের পারমার্থিক উন্নতি সাধনের

জন্য অত্যন্ত প্রয়োজন। উন্নত ভক্তের পক্ষে সক্রিয় সেবার মাধ্যমে তাঁর ধ্যান করার মতোই অল্পবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষদের পক্ষে মন্দির, মসজিদ অথবা গীর্জায় ভগবানের সম্মুখে ভগবানের প্রভুত্ব স্বীকার করে মস্তক অবনত করা সমান মঙ্গলজনক।

শ্লোক ২০

তথা পরমহংসানাং মুনীনামমলাত্মনাম্ ।
ভক্তিযোগবিধানার্থং কথং পশ্যেমহি স্ত্রিয়ঃ ॥ ২০ ॥

তথা—তা ছাড়া; **পরমহংসানাম্**—উন্নত পরমার্থবাদীদের; **মুনীনাম্**—মহান দার্শনিক অথবা মনোধর্মীদের; **অমলাত্মনাম্**—জড় এবং চেতনের পার্থক্য নিরূপণে অভিজ্ঞদের; **ভক্তিযোগ**—ভগবদ্ভক্তির বিজ্ঞান; **বিধান-অর্থম্**—সম্পাদন করার জন্য; **কথম্**—কিভাবে; **পশ্যেম**—দর্শন করতে পারবো; **হি**—অবশ্যই; **স্ত্রিয়ঃ**—স্ত্রীলোকেরা।

অনুবাদ

পরমার্থের পথে উন্নত পরমহংসদের, মুনিদের এবং জড় ও চেতনের পার্থক্য নিরূপণ করার মাধ্যমে যাঁদের অন্তর নির্মল হয়েছে, তাঁদের অন্তরে অপ্রাকৃত ভক্তিযোগ-বিজ্ঞান বিকশিত করার জন্য তুমি স্বয়ং অবতরণ কর। তাহলে আমার মতো স্ত্রীলোকেরা কিভাবে তোমাকে সম্যক্‌রূপে জানতে পারবে।

তাৎপর্য

সর্বশ্রেষ্ঠ মনোধর্মী দার্শনিকেরাও ভগবানের ধামে প্রবেশ করতে পারে না। উপনিষদে বলা হয়েছে যে পরম সত্য পরমেশ্বর ভগবান শ্রেষ্ঠ দার্শনিকদেরও চিন্তার অতীত। মহান বিদ্যা অথবা সর্বশ্রেষ্ঠ মস্তিষ্কের দ্বারাও তাঁকে জানা যায় না। যিনি তাঁর কৃপা লাভ করেছেন, কেবল তিনিই তাঁকে জানতে পারেন। অন্যেরা বছরের পর বছর ধরে তাঁর সম্বন্ধে চিন্তা করতে পারে, তথাপি তিনি তাদের কাছে অজ্ঞাতই থাকেন। মহারাণী কুন্তীদেবী সেই সত্য দৃঢ়ভাবে সমর্থন করেছেন, যিনি এখানে একজন সরলা নারীর ভূমিকা অবলম্বন করেছেন। স্ত্রীলোকেরা সাধারণত দার্শনিকদের মতো চিন্তা করতে পারেন না, কিন্তু তাঁরা ভগবানের আশীর্বাদ প্রাপ্ত হয়েছেন, কেননা তাঁরা সহজেই ভগবানের শ্রেষ্ঠত্ব এবং সর্বশক্তিমত্তা স্বীকার করেন, এবং তার ফলে তাঁরা নিঃসঙ্কোচে তাঁকে প্রণতি নিবেদন করেন। ভগবান এতই কৃপাময় যে তিনি কেবল মহান দার্শনিকদের প্রতি তাঁর বিশেষ অনুগ্রহ প্রদর্শন করেন না। তিনি সকলের

ঐকান্তিকতা ও নিষ্ঠা সম্বন্ধে অবগত। তাই যে কোন ধর্মীয় অনুষ্ঠানে সাধারণত অধিক সংখ্যায় স্ত্রীলোকদের সমবেত হতে দেখা যায়। প্রতিটি দেশে এবং প্রতিটি ধর্ম সম্প্রদায়ে পুরুষদের থেকে স্ত্রীদের অধিক আগ্রহ প্রদর্শন করতে দেখা যায়। ভগবানের প্রতি এই সরল বিশ্বাস নিষ্ঠারহিত লোক দেখানো ধর্মপরায়ণতা থেকে অনেক বেশি কার্যকরী।

শ্লোক ২১

কৃষ্ণায় বাসুদেবায় দেবকীনন্দনায় চ।
নন্দগোপকুমারায় গোবিন্দায় নমো নমঃ ॥ ২১ ॥

কৃষ্ণায়—পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে; **বাসুদেবায়**—বসুদেব তনয়কে; **দেবকীনন্দনায়**—দেবকীপুত্রকে; **চ**—এবং; **নন্দগোপকুমারায়**—গোপরাজ নন্দের তনয়কে; **গোবিন্দায়**—গাভী এবং ইন্দ্রিয়ের আনন্দ বিধানকারী শ্রীগোবিন্দকে; **নমঃ নমঃ**—বার বার সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি।

অনুবাদ

বসুদেবতনয়, দেবকীনন্দন, গোপরাজ নন্দের পুত্র এবং গাভী ও ইন্দ্রিয়সমূহের আনন্দদাতা পরমেশ্বর শ্রীকৃষ্ণকে আমি বার বার আমার সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি।

তাৎপর্য

জড় প্রচেষ্টার দ্বারা কখনো ভগবানকে পাওয়া যায় না, কিন্তু তাঁর অসীম এবং অহৈতুকী কৃপার প্রভাবে তাঁর অনন্য ভক্তদের প্রতি বিশেষ কৃপা প্রদর্শন করার জন্য এবং আসুরিক ব্যক্তিদের উপদ্রব দমন করার জন্য তিনি তাঁর স্বরূপে এই পৃথিবীতে অবতরণ করেন। কুন্তীদেবী অন্য সমস্ত অবতারদের থেকে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের অবতরণের বিশেষ বন্দনা করেছেন, কেননা এই অবতারে তিনি সহজলভ্য। তাঁর রাম অবতারে তিনি তাঁর শৈশব থেকেই রাজপুত্র ছিলেন, কিন্তু কৃষ্ণরূপে যদিও তিনি একজন রাজার পুত্র, তথাপি তিনি তাঁর প্রকৃত পিতামাতার (মহারাজ বসুদেব এবং মহারাণী দেবকী) আশ্রয় ত্যাগ করেছিলেন। তাঁর আবির্ভাবের ঠিক পরেই তিনি পবিত্র বৃন্দাবনে একজন সাধারণ গোপবালকের মতো লীলাবিলাস করার জন্য যশোদা মায়ের কোলে গিয়েছিলেন। তাই শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরামচন্দ্রের থেকে অধিক কৃপালু। তিনি নিঃসন্দেহে কুন্তীর ভ্রাতা বসুদেব ও তাঁর পরিবারের প্রতি অত্যন্ত কৃপালু ছিলেন।

তিনি যদি বসুদেব ও দেবকীর পুত্ররূপে আবির্ভূত না হতেন, তাহলে কুন্তীদেবী তাঁকে তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র বলে দাবি করে বিশেষ বাৎসল্য স্নেহে তাঁকে এইভাবে সম্বোধন করতে পারতেন না। কিন্তু নন্দ এবং যশোদা অধিক সৌভাগ্যশালী, কেননা তাঁরা ভগবানের বাল্যলীলা আস্বাদন করেছিলেন, যা তাঁর অন্যান্য সমস্ত লীলাবিলাস থেকে অধিক আকর্ষণীয়। ব্রজভূমিতে তিনি যে তাঁর বাল্যলীলা প্রদর্শন করেছিলেন তা অতুলনীয়, কেননা তা *ব্রহ্মসংহিতায়* বর্ণিত চিন্তামণিধাম স্বরূপ মূল কৃষ্ণলোকে অনুষ্ঠিত তাঁর নিত্যলীলার প্রতিরূপ। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাঁর অপ্রাকৃত পার্ষদ এবং উপকরণসহ ব্রজভূমিতে অবতরণ করেছিলেন। তাই শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু প্রতিপন্ন করেছেন যে ব্রজবাসীদের মতো ভাগ্যবান আর কেউ নেই; বিশেষ করে ব্রজবালিকারা, যাঁরা ভগবানের সন্তুষ্টি বিধানের জন্য সবকিছু উৎসর্গ করেছিলেন। নন্দ-যশোদা, গোপ এবং বিশেষ করে গোপবালক এবং গাভীদের সঙ্গে তাঁর লীলাবিলাসের ফলে তিনি গোবিন্দ নামে খ্যাত হয়েছিলেন। গোবিন্দরূপে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ব্রাহ্মণ এবং গাভীদের প্রতি অধিক অনুরক্ত এবং এর মাধ্যমে এটিই সূচিত হয় যে মানুষের সমৃদ্ধি এই দুটি বিষয়ের অর্থাৎ, ব্রহ্মণ্য-সংস্কৃতি এবং গো-রক্ষার উপর নির্ভর করে। যেখানে এই দুটি বিষয়ের অভাব, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ কখনো সেখানে প্রসন্ন হতে পারেন না।

শ্লোক ২২

নমঃ পঙ্কজনাভায় নমঃ পঙ্কজমালিনে।
নমঃ পঙ্কজনেত্রায় নমস্তে পঙ্কজাঙ্ঘ্রয়ে ॥ ২২ ॥

নমঃ—সশ্রদ্ধ প্রণতি; **পঙ্কজনাভায়**—যাঁর উদরের কেন্দ্রে পদ্মসদৃশ বিশেষ আবর্তবিশিষ্ট নাভি আছে, সেই পরমেশ্বর ভগবানকে; **নমঃ**—সশ্রদ্ধ প্রণতি; **পঙ্কজমালিনে**—যাঁর গলদেশে সর্বদা পদ্মফুলের মালা শোভিত; **নমঃ**—সশ্রদ্ধ প্রণতি; **পঙ্কজনেত্রায়**—যাঁর দৃষ্টিপাত পদ্মফুলের মতো স্নিগ্ধ; **নমস্তে**—তোমাকে আমার সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি; **পঙ্কজাঙ্ঘ্রয়ে**—যাঁর পদতল পদ্ম চিহ্নাঙ্কিত (এবং তার ফলে তাঁকে বলা হয় চরণপদ্মধারী)।

অনুবাদ

হে পরমেশ্বর, তোমার উদর-কেন্দ্রের নাভিদেশ পদ্মসদৃশ আবর্তে চিহ্নিত, গলদেশে পদ্মের মালা নিয়ত শোভিত, তোমার দৃষ্টিপাত পদ্মের মতো স্নিগ্ধ এবং পাদদ্বয় পদ্ম চিহ্নাঙ্কিত, তোমাকে আমার সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি।

তাৎপর্য

পরমেশ্বর ভগবানের চিন্ময় শরীরে যে বিশেষ লক্ষণগুলি অন্য সকলের শরীর থেকে তাঁর শরীরের পার্থক্য নির্ণয় করে, তার কয়েকটি লক্ষণের উল্লেখ এখানে করা হয়েছে। সেগুলি ভগবানের শরীরের বিশেষ বৈশিষ্ট্য। ভগবান আমাদের মতো প্রতীত হতে পারেন, কিন্তু তিনি সর্বদাই তাঁর শরীরের বিশেষ চিহ্নগুলির দ্বারা স্বতন্ত্র থাকেন। শ্রীমতী কুন্তীদেবী বলেছেন যে তিনি একজন নারী হওয়ার ফলে ভগবানের দর্শনের অযোগ্য। তিনি সে কথা বলেছেন কেননা স্ত্রী, শূদ্র (শ্রমিক শ্রেণী) এবং দ্বিজবন্ধু, বা উচ্চবর্ণের অযোগ্য বংশধর, এরা বুদ্ধির দ্বারা ভগবানের চিন্ময় নাম, যশ, লক্ষণ, রূপ ইত্যাদি বিষয়ে অবগত হওয়ার অযোগ্য। এই প্রকার ব্যক্তিরা ভগবানের চিন্ময় লীলাবিলাস অবগত হতে অক্ষম হলেও তাঁর অর্চা-বিগ্রহরূপে তাঁকে দর্শন করতে পারেন, যেইরূপে তিনি অধঃপতিত জীবদের, এমনকি উপরেলিখিত স্ত্রী, শূদ্র এবং দ্বিজবন্ধুদেরও কৃপা করার জন্য এই জড় জগতে অবতরণ করেন। যেহেতু এই প্রকার অধঃপতিত জীবেরা জড়ের অতীত কোন কিছুই দর্শন করতে পারে না, তাই ভগবান গর্ভোদকশায়ী বিষ্ণুরূপে অসংখ্য ব্রহ্মাণ্ডের প্রত্যেকটিতে প্রবেশ করেন এবং সেখানে তাঁর অপ্রাকৃত নাভি থেকে উত্থিত একটি কমলে ব্রহ্মাণ্ডের প্রথম সৃষ্ট জীব ব্রহ্মার জন্ম হয়। তাই ভগবান পঙ্কজনাভি নামে পরিচিত। ভগবান পঙ্কজনাভি প্রকৃতির বিভিন্ন উপাদান যথা মন, কাঠ, মাটি, ধাতু, রত্ন, রঙ, বালুকাপৃষ্ঠে অঙ্কিত চিত্র ইত্যাদির দ্বারা প্রকাশিত অর্চা-বিগ্রহের (অপ্রাকৃত) রূপ পরিগ্রহ করেন। ভগবানের এই সমস্ত রূপ সর্বদা পদ্মফুলের মালায় ভূষিত থাকেন, এবং জড় কার্যকলাপে সর্বদা যুক্ত অভক্তদের আকর্ষণ করার জন্য তাঁর মন্দিরের পরিবেশ অত্যন্ত শান্ত এবং স্নিগ্ধ হওয়া উচিত। ধ্যানীরা তাদের মনের মধ্যে ভগবানের রূপের আরাধনা করেন। তাই ভগবান স্ত্রী, শূদ্র এবং দ্বিজবন্ধুদের প্রতিও কৃপাপরায়ণ হন যদি তারা মন্দিরে গিয়ে তাদের জন্য প্রকাশিত ভগবানের বিভিন্ন রূপের আরাধনা করেন। এইভাবে যাঁরা মন্দিরে যান তাঁরা সাধারণ পৌত্তলিক নন, যা অল্পবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষেরা অনেক সময় মনে করে থাকে। সমস্ত মহান আচার্যেরা সর্বত্র অল্পবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষদের কৃপা করার জন্য এই প্রকার মন্দির প্রতিষ্ঠা করেছেন। যারা শূদ্র এবং স্ত্রী বা তার থেকেও নিম্নস্তরে রয়েছে, তাদের এমন ভান করা উচিত নয় যে তারা মন্দিরে ভগবানের পূজা করার স্তর অতিক্রম করেছে।

ভগবানের শ্রীবিগ্রহের দর্শন শুরু করতে হয় তাঁর শ্রীপাদপদ্ম থেকে, তারপর ধীরে ধীরে তাঁর জানুদেশ, কটিদেশ, বক্ষদেশ এবং মুখমণ্ডল দর্শন করতে হয়। ভগবানের শ্রীপাদপদ্ম দর্শন না করে তাঁর মুখমণ্ডল দর্শন করার চেষ্টা করা উচিত নয়। শ্রীমতী

কুন্তীদেবী, ভগবানের পিতৃস্বসা হওয়ার ফলে, তাঁর শ্রীপাদপদ্ম থেকে তাঁকে দর্শন করতে শুরু করেননি, কেননা তাহলে ভগবান হয়তো লজ্জা অনুভব করতেন। এইভাবে ভগবানকে অপ্রস্তুত না করার জন্য তিনি তাঁর শ্রীপাদপদ্মের উপর থেকে, অর্থাৎ তাঁর কোমর থেকে তাঁকে দর্শন করতে শুরু করেছিলেন। এবং ধীরে ধীরে তাঁর উর্ধ্বভাগে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে তাঁর মুখমণ্ডলে এবং পরে তাঁর শ্রীপাদপদ্ম দর্শন করেছিলেন। গোলোকে সবকিছুই শৃঙ্খলাবদ্ধভাবে অবস্থিত।

শ্লোক ২৩

যথা হৃষীকেশ খলেন দেবকী
কংসেন রুদ্ধাতিচিরং শুচার্পিতা।
বিমোচিতাহঞ্চ সহাত্মজা বিভো
ত্বয়ৈব নাথেন মুহুর্বিপদ্‌গণাৎ ॥ ২৩ ॥

যথা—যেমন; **হৃষীকেশ**—ইন্দ্রিয়াধিপতি; **খলেন**—ঈর্ষাপরায়ণ; **দেবকী**—দেবকী (শ্রীকৃষ্ণের জননী); **কংসেন**—অসুররাজ কংসের দ্বারা; **রুদ্ধা**—কারারুদ্ধ; **অতি-চিরম্**—দীর্ঘকাল; **শুচার্পিতা**—শোকাভিভূতা; **বিমোচিতা**—মুক্ত করেছিলেন; **অহম্ চ**—আমিও; **সহাত্মজা**—আমার সন্তানসহ; **বিভো**—হে সর্বশক্তিমান; **ত্বয়া এব**—তোমার দ্বারা; **নাথেন**—রক্ষাকর্তারূপে; **মুহুঃ**—সব সময়; **বিপদ্‌-গণাৎ**—বিপদসমূহ থেকে।

অনুবাদ

হে হৃষীকেশ, সকল ইন্দ্রিয়ের অধিপতি ও সর্বেশ্বরেশ্বর, তোমার জননী দেবকীকে ঈর্ষাপরায়ণ কংসে দীর্ঘকাল যাবৎ কারারুদ্ধ করে রাখাতে তিনি শোকে অভিভূত হলে তুমি তাঁকে কারামুক্ত করেছিলে, তেমনই তুমি আমাকে এবং আমার পুত্রদের বারে বারে বিপদরাশি থেকে মুক্ত করেছ।

তাৎপর্য

কৃষ্ণের মাতা এবং কংসের ভগিনী দেবকীকে তাঁর স্বামী বসুদেবসহ কারাগারে অবরুদ্ধ করা হয়েছিল, কেননা মাৎসর্যপরায়ণ রাজা কংসের ভয় ছিল যে দেবকীর অষ্টম পুত্র (কৃষ্ণ) তাকে বধ করবেন। কৃষ্ণের পূর্বে দেবকীর গর্ভজাত সবকটি পুত্রকে

কংস হত্যা করেছিল, কিন্তু কৃষ্ণ এই বিপদ এড়াতে পেরেছিলেন, কেননা তাঁকে তাঁর পালকপিতা নন্দমহারাজের গৃহে স্থানান্তরিত করা হয়েছিল। কুন্তীদেবীও তাঁর পুত্রসহ ভয়ঙ্কর বিপদরাশি থেকে রক্ষা পেয়েছিলেন। কৃষ্ণ কুন্তীদেবীর প্রতি অধিক অনুগ্রহ প্রদর্শন করেছিলেন, কেননা যদিও তিনি দেবকীর অন্যান্য পুত্রদের রক্ষা করেননি, কিন্তু কুন্তীর পুত্রদের তিনি রক্ষা করেছিলেন। তিনি তা করেছিলেন কেননা দেবকীর পতি বসুদেব জীবিত ছিলেন, কিন্তু কুন্তীদেবী ছিলেন বিধবা এবং কৃষ্ণ ছাড়া তাঁকে সাহায্য করার আর কেউ ছিল না। অতএব সিদ্ধান্ত হচ্ছে যে যারা অধিক বিপদগ্রস্ত কৃষ্ণ তাদের অধিক অনুগ্রহ করেন। কখনো কখনো তিনি তাঁর শুদ্ধভক্তদের এইরকম বিপদে ফেলেন, কেননা সেই অসহায় ভক্ত ভগবানের প্রতি অধিক অনুরক্ত হন। ভক্ত ভগবানের প্রতি যত অনুরক্ত হন, তার সাফল্যও তত বেশি হয়।

শ্লোক ২৪

বিষান্মহাগ্নেঃ পুরুষাদদর্শনা-
দসৎসভায়া বনবাসকৃচ্ছ্রতঃ ।
মৃধে মৃধেঽনেকমহারথাস্ত্রতো
দ্রৌণ্যস্ত্রতশ্চাস্ম হরেঽভিরক্ষিতাঃ ॥ ২৪ ॥

বিষাৎ—বিষ থেকে; **মহাগ্নেঃ**—মহাগ্নি থেকে; **পুরুষাদ**—নরখাদক; **দর্শনাৎ**—সম্মুখীন হয়ে; **অসৎ**—পাপ চক্রান্তময়; **সভায়াঃ**—সভায়; **বন-বাস**—বনবাস; **কৃচ্ছ্রতঃ**—দুঃখ-কষ্ট; **মৃধে মৃধে**—বারংবার সংগ্রামে; **অনেক**—বহু; **মহা-রথ**—মহারথী; **অস্ত্রতঃ**—অস্ত্রশস্ত্র; **দ্রৌণি**—দ্রোণাচার্যের পুত্র; **অস্ত্রতঃ**—অস্ত্রশস্ত্র থেকে; **চ**—এবং; **আস্ম**—অতীতে; **হরে**—হে পরমেশ্বর হরি; **অভিরক্ষিতাঃ**—পূর্ণরূপে রক্ষা করেছিলে।

অনুবাদ

হে কৃষ্ণ, পরমেশ্বর শ্রীহরি! বিষ, মহা অগ্নি, নরখাদক রাক্ষস, পাপচক্রান্তময় সভা, বনবাসের দুঃখ-কষ্ট থেকে, এবং যুদ্ধে বহু মহারথীর প্রাণঘাতী অস্ত্রসমূহ থেকে তুমি আমাদের পরিত্রাণ করেছ। আর এখন অশ্বত্থামার ব্রহ্মাস্ত্র থেকে তুমি আমাদের রক্ষা করলে।

তাৎপর্য

পাণ্ডবেরা যে ধরনের বিপজ্জনক ঘটনাপরম্পরার সম্মুখীন হয়েছিলেন, তার তালিকা এখানে দেওয়া হয়েছে। দেবকী একবার তাঁর ঈর্ষাপরায়ণ ভ্রাতার দ্বারা সন্তাপন্ন হয়েছিলেন, তা না হলে তিনি ভালই ছিলেন। কিন্তু কুন্তীদেবী এবং তাঁর পুত্ররা বছরের পর বছর ধরে একের পর এক দুঃখ-দুর্দশার সম্মুখীন হয়েছিলেন। দুর্যোধন এবং তার দল তাঁদের নানা প্রকার অনিষ্ট সাধনের চেষ্টা করেছিল, এবং প্রতিবারই ভগবান তাঁদের রক্ষা করেছিলেন। একবার ভীমকে বিষ প্রদান করা হয়েছিল, একবার তাঁদের জতুগৃহে পুড়িয়ে মারার চক্রান্ত করা হয়েছিল, এবং দ্রৌপদীকে একবার দুষ্ট কৌরবদের সভায় নিয়ে এসে তাঁর বস্ত্রহরণ করার চেষ্টা করা হয়েছিল। ভগবান অন্তহীনভাবে দ্রৌপদীকে বস্ত্র সরবরাহ করে তাঁর লজ্জা নিবারণ করেছিলেন, এবং দুর্যোধনের দল তাঁকে বিবস্ত্রারূপে দেখতে ব্যর্থ হয়েছিল। তেমনই তাঁরা যখন বনে নির্বাসিত হয়েছিলেন, তখন হিড়িম্ব নামক এক নরখাদক রাক্ষসের সঙ্গে ভীমকে যুদ্ধ করতে হয়েছিল, কিন্তু ভগবান তাঁকে রক্ষা করেছিলেন। এইখানেই শেষ নয়। এত সমস্ত দুঃখ-দুর্দশার পর কুরুক্ষেত্রের রণাঙ্গনে এক মহাযুদ্ধের আয়োজন হয়েছিল, এবং অর্জুনকে দ্রোণ, ভীষ্ম, কর্ণ প্রমুখ সমস্ত মহান শক্তিশালী যোদ্ধাদের সম্মুখীন হতে হয়েছিল। আর অবশেষে, সমস্ত কিছুর সমাপ্তির পরেও উত্তরার গর্ভস্থ সন্তানকে হত্যা করার জন্য দ্রোণাচার্যের পুত্র ব্রহ্মাস্ত্র নিক্ষেপ করেছিল, এবং তখন ভগবান কুরুবংশের একমাত্র জীবিত বংশধর পরীক্ষিৎ মহারাজকে রক্ষা করেছিলেন।

শ্লোক ২৫

বিপদঃ সন্তু তাঃ শশ্বত্তত্র তত্র জগদ্‌গুরো।
ভবতো দর্শনং যৎ স্যাদপুনর্ভবদর্শনম্ ॥ ২৫ ॥

বিপদঃ—সঙ্কট; **সন্তু**—উপস্থিত হোক; **তাঃ**—সমস্ত; **শশ্বৎ**—বারে বারে; **তত্র**—সেখানে; **তত্র**—এবং সেখানে; **জগৎ-গুরো**—হে জগদীশ্বর; **ভবতঃ**—তোমার; **দর্শনম্**—সাক্ষাৎকার; **যৎ**—যা; **স্যাৎ**—হয়; **অপুনঃ**—পুনরায় হয় না; **ভব-দর্শনম্**—জন্ম-মৃত্যুর দর্শন।

অনুবাদ

হে জগদীশ্বর, আমি কামনা করি যেন সেই সমস্ত সঙ্কট বারে বারে উপস্থিত হয়, যাতে বারে বারে আমরা তোমাকে দর্শন করতে পারি। কারণ তোমাকে দর্শন

করলেই আমাদের আর জন্ম-মৃত্যুর চক্রে আবর্তিত হতে হবে না বা এই সংসার চক্র দর্শন করতে হবে না।

তাৎপর্য

সাধারণত আর্ত, অর্থার্থী, জ্ঞানী এবং জিজ্ঞাসু, যাঁরা পুণ্যকর্ম করেছেন, তাঁরা ভগবানের আরাধনা করতে শুরু করেন। আর অন্য যারা দুষ্কর্মে লিপ্ত, তারা তাদের অবস্থা নির্বিশেষে মায়া কর্তৃক বিভ্রান্ত হওয়ার ফলে পরমেশ্বর ভগবানের সমীপবর্তী হতে পারে না। পুণ্যবান ব্যক্তিরা যখন কোন বিপদের সম্মুখীন হন, তখন তাঁদের ভগবানের শ্রীপাদপদ্মের শরণ গ্রহণ করা ছাড়া আর কোন গতি থাকে না। নিরন্তর পরমেশ্বর ভগবানের শ্রীপাদপদ্মের স্মরণ করার অর্থ হচ্ছে জন্ম-মৃত্যুর বন্ধন থেকে মুক্তি লাভ করার জন্য প্রস্তুত হওয়া। তাই তাঁরা তথাকথিত দুঃখ-দুর্দশাকে স্বাগত জানান, কেননা সেগুলি ভগবানকে স্মরণ করার সৌভাগ্য প্রদান করে, যার ফলে মুক্তি লাভ হয়। যিনি ভগবানের চরণকমলে শরণ গ্রহণ করেছেন, যা অবিদ্যার সাগর পার হওয়ার জন্য সবচাইতে উপযুক্ত নৌকার মতো, তিনি গোষ্পদ অতিক্রম করার মতো অতি সহজেই এই ভব সাগর পার হয়ে মুক্তি লাভ লাভ করেন। এই প্রকার ব্যক্তিরা ভগবদ্ধামে বাস করার যোগ্য, এবং যে স্থানে প্রতি পদে বিপদ সে স্থানে তাঁদের থাকার কোন প্রয়োজন হয় না।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় ভগবান এই জড় জগতকে এক ভয়ঙ্কর দুঃখ-দুর্দশাপূর্ণ স্থান বলে বর্ণনা করেছেন। মূর্খ মানুষেরা এই জগতকে চরম দুঃখ-দুর্দশাপূর্ণ একটি স্থান বলে না জেনে এখানকার দুঃখ-দুর্দশা নিরসন করার জন্য নানা রকম পরিকল্পনা করে। দুঃখ-দুর্দশার স্পর্শ থেকে মুক্ত ভগবানের আনন্দময় ধাম সম্বন্ধে তাদের কোন ধারণাই নেই। সুস্থ মস্তিষ্কসম্পন্ন মানুষদের তাই কর্তব্য হচ্ছে এই জড় জগতের দুঃখ-দুর্দশায় অবিচলিত থাকা, কেননা সমস্ত পরিস্থিতিতেই এই সমস্ত দুঃখ-দুর্দশা অবশ্যম্ভাবী। সব রকম দুর্ভাগ্য ভোগ করে পারমার্থিক উপলব্ধির পথে উন্নতি সাধনে চেষ্টা করা উচিত, কেননা সেটিই হচ্ছে মানব জীবনের উদ্দেশ্য। চিন্ময় আত্মা সব রকম জড় দুঃখ-দুর্দশার অতীত; তাই তথাকথিত দুঃখ-দুর্দশাকেও বলা হয় মিথ্যা। মানুষ স্বপ্নে দেখতে পারে যে একটি বাঘ এসে তাকে খাচ্ছে, এবং সেই বিপদের সময় সে ভয়ে আর্তনাদ করতে থাকে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সেখানে কোন বাঘ নেই এবং ব্যথা-বেদনাও নেই; এটি কেবল একটি স্বপ্ন। তেমনই জীবনের সমস্ত দুঃখ-দুর্দশাগুলিকে স্বপ্নও বলা হয়। কেউ যদি ভগবদ্ভক্তির মাধ্যমে পরমেশ্বর ভগবানের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত হওয়ার সৌভাগ্য অর্জন করেন, তাহলে

সেটিকে চরম লাভ বলে মনে করা হয়। নববিধা ভক্ত্যাঙ্গের যে কোন একটি অঙ্গের দ্বারা ভগবানের সাথে সংযুক্ত হওয়া ভগবদ্ধামে ফিরে যাওয়ার পথে সর্বদাই এক অগ্রগামী পদক্ষেপ।

শ্লোক ২৬

জন্মৈশ্বর্যশ্রুতশ্রীভিরেধমানমদঃ পুমান্।
নৈবার্হত্যভিধাতুং বৈ ত্বামকিঞ্চনগোচরম্ ॥ ২৬ ॥

জন্ম—জন্ম; **ঐশ্বর্য**—বৈভব; **শ্রুত**—উচ্চ শিক্ষা; **শ্রীভিঃ**—সৌন্দর্যের দ্বারা; **এধমান**—ক্রমবর্ধমান; **মদঃ**—অহঙ্কার; **পুমান্**—মানুষের; **ন**—না; **এব**—কখনো; **অর্হতি**—সমর্থ হয়; **অভিধাতুম্**—অনুভূতি বা ভাব সহকারে সম্বোধন করা; **বৈ**—অবশ্যই; **ত্বাম্**—তোমাকে; **অকিঞ্চন-গোচরম্**—যিনি জড় অভিমানশূন্য ব্যক্তিদের অনায়াসে গোচরীভূত হন।

অনুবাদ

হে পরমেশ্বর, যারা জড় আসক্তিশূন্য হয়েছে, তুমি সহজেই তাদের গোচরীভূত হও। আর যে ব্যক্তি জড়জাগতিক প্রগতিপন্থী এবং সম্ভ্রান্ত কুলোদ্ভূত হয়ে বিপুল ঐশ্বর্য, উচ্চ শিক্ষা, দৈহিক সৌন্দর্য নিয়ে আপন উন্নতি লাভে সচেষ্ট, সে ঐকান্তিক ভাব সহকারে তোমার কাছে আসতে পারে না।

তাৎপর্য

জড়জাগতিক উন্নতির অর্থই হল কোন সম্ভ্রান্ত পরিবারে জন্মগ্রহণ, প্রচুর ধন-সম্পদ লাভ, উচ্চশিক্ষা অর্জন এবং আকর্ষণীয় দৈহিক সৌন্দর্য লাভ। এই সমস্ত পার্থিব সম্পদ লাভ করার জন্য প্রতিটি জড়বাদী মানুষই উন্মত্তপ্রায়, এবং একেই বলা হয় জাগতিক সভ্যতার প্রগতি। কিন্তু এই সমস্ত পার্থিব সম্পদ লাভ করার ফলে মানুষ বৃথাই গর্বস্ফীত হয়ে ওঠে, অস্থায়ী সেই ধনমদে মত্ত হয়ে ওঠে। এই সমস্ত গর্বস্ফীত জড়বাদী মানুষেরা ঐকান্তিকভাবে 'হে গোবিন্দ', 'হে কৃষ্ণ' বলে তাঁর পবিত্র নাম উচ্চারণ করতে অসমর্থ হয়ে ওঠে। শাস্ত্রে বলা হয়েছে যে, একবার মাত্র পরমেশ্বর ভগবানের নাম উচ্চারণ করার ফলে পাপীর এত পাপ দূরীভূত হয় যে তত পাপ সে করতেই পারে না। পরমেশ্বর ভগবানের দিব্য নামের এমনই বল। এটি মোটেই অত্যুক্তি নয়। প্রকৃতপক্ষে পরমেশ্বর ভগবানের দিব্য নাম এমনই শক্তি সমন্বিত।

কিন্তু এই নাম কীর্তন করতে হলে বিশেষ একটি যোগ্যতার প্রয়োজন, তা নির্ভর করে অন্তরের ভাব বা অনুভূতির মাত্রার উপর। একজন অসহায় মানুষ যতখানি গভীর অনুভূতি সহকারে ভগবানের পবিত্র নাম গ্রহণ করতে পারে, জড় ঐশ্বর্যের প্রভাবে পরিতৃপ্ত ব্যক্তি ততটা ঐকান্তিকতা সহকারে সেই নাম গ্রহণ করতে পারে না। অহঙ্কারে মত্ত ব্যক্তি কখনো কখনো ভগবানের পবিত্র নাম উচ্চারণ করতে পারে, কিন্তু উৎকর্ষতা সহকারে তারা সেই নাম গ্রহণ করতে পারে না। তাই ১) উচ্চকুলে জন্ম, ২) ধন-সম্পদ, ৩) উচ্চশিক্ষা এবং ৪) দৈহিক সৌন্দর্য,—জড় উন্নতির এই চারটি অঙ্গ পারমার্থিক উন্নতি সাধনের পথে বাধাস্বরূপ।

শুদ্ধ আত্মার জড় আবরণটি বাহ্যিক, ঠিক যেমন জ্বর হচ্ছে অসুস্থ শরীরের একটি বাহ্যিক লক্ষণ। যখন কারও জ্বর হয় তখন স্বাভাবিকভাবেই জ্বরের মাত্রা কমানোর চেষ্টা করা হয়, এবং কেউই ভুলভাবে চিকিৎসা করে তা বাড়াতে চায় না। কখনো কখনো দেখা যায় যে পারমার্থিক দৃষ্টিতে উন্নত ব্যক্তি জড়জাগতিক বিচারে দরিদ্র হয়ে যান। সেজন্য নিরুৎসাহিত হওয়া উচিত নয়। পক্ষান্তরে, এই প্রকার দারিদ্র্য শুভ লক্ষণ, ঠিক যেমন জ্বর কমে যাওয়া একটি অনুকূল লক্ষণ। জড় অহঙ্কার বা উন্মত্ততা হ্রাস করাই জীবনের উদ্দেশ্য হওয়া উচিত, কেননা এই ধরনের অহঙ্কারের ফলে মানুষ মোহগ্রস্ত হয়ে তাদের জীবনের প্রকৃত লক্ষ্য থেকে ভ্রষ্ট হয়ে পড়ে। যে সমস্ত ব্যক্তি গভীরভাবে মোহাচ্ছন্ন, তারা ভগবানের ধামে প্রবেশ করার অযোগ্য।

শ্লোক ২৭

নমোঽকিঞ্চনবিত্তায় নিবৃত্তগুণবৃত্তয়ে।
আত্মারামায় শান্তায় কৈবল্যপতয়ে নমঃ ॥ ২৭ ॥

নমঃ—তোমাকে আমার সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি; **অকিঞ্চন-বিত্তায়**—যিনি জড় বিষয়ে নিঃস্ব ব্যক্তিদের বা অকিঞ্চনগণের সম্পদ; **নিবৃত্ত**—সর্বতোভাবে জড়া প্রকৃতির গুণের অতীত; **গুণ**—প্রকৃতির গুণ; **বৃত্তয়ে**—প্রভাব; **আত্মারামায়**—যিনি পূর্ণরূপে আত্মতৃপ্ত; **শান্তায়**—যিনি পূর্ণরূপে কামনা-বাসনা রহিত হয়ে প্রশান্ত; **কৈবল্য-পতয়ে**—মুক্তিদানে সমর্থ; **নমঃ**—আমি নমস্কার করি।

অনুবাদ

জড় বিষয়ে যারা সম্পূর্ণভাবে নিঃস্ব, তুমি সেই অকিঞ্চনগণের সম্পদ। তুমি প্রকৃতির গুণের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার অতীত। তুমি সম্পূর্ণরূপে আত্মতৃপ্ত, এবং তাই তুমি

সর্বপ্রকার কামনা-বাসনা রহিত হয়ে প্রশান্ত এবং মুক্তি দানে সমর্থ। আমি তোমাকে আমার সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি।

তাৎপর্য

জীবের কাছে যখন কোন কিছু না থাকে, তখন সে মনে করে যে তার সব কিছু শেষ হয়ে গেছে। তাই প্রকৃত অর্থে জীব কখনো ত্যাগী হতে পারে না। জীব অধিক মূল্যবান কোন কিছু প্রাপ্তির আশায় নিকৃষ্ট বস্তু ত্যাগ করে। একজন বিদ্যার্থী শিক্ষালাভের জন্য তার শিশুসুলভ চপলতা পরিত্যাগ করে। ভৃত্য ভাল চাকরীর আশায় তার চাকরী ত্যাগ করে। তেমনই একজন ভক্ত বিনা কারণে এই জড় জগৎ ত্যাগ করে না, সে তা করে আধ্যাত্মিক মূল্যায়ণের ভিত্তিতে প্রকৃত লাভের জন্য। শ্রীল রূপ গোস্বামী, শ্রীল সনাতন গোস্বামী এবং শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামী এবং অন্যান্য অনেকে ভগবানের সেবার জন্য জাগতিক ঐশ্বর্য এবং সমৃদ্ধি ত্যাগ করেছিলেন। জাগতিক বিচারে তাঁরা ছিলেন অত্যন্ত বড়। শ্রীল রূপ গোস্বামী ও শ্রীল সনাতন গোস্বামী ছিলেন বাংলার নবাবের মন্ত্রী, এবং শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামী ছিলেন তৎকালীন এক বিখ্যাত জমিদারের পুত্র। কিন্তু উচ্চতর কোন কিছু লাভের জন্য তাঁরা তাঁদের পূর্বের সমস্ত সম্পদ পরিত্যাগ করেছিলেন।

ভক্তেরা সাধারণত অকিঞ্চন, কিন্তু ভগবানের শ্রীপাদপদ্মে তাদের এক অত্যন্ত গুপ্ত কোষাগার রয়েছে। শ্রীল সনাতন গোস্বামীর সম্বন্ধে একটি খুব সুন্দর কাহিনী রয়েছে। তাঁর কাছে একটি পরশমণি ছিল, এবং তিনি সেই পরশমণিটি আবর্জনার একটি স্তূপের মধ্যে ফেলে রেখেছিলেন। এক দরিদ্র ব্যক্তি সেটি প্রাপ্ত হয়, কিন্তু পরে সে ভাবতে শুরু করে কেন সেই মূল্যবান মণিটি একটি আবর্জনার স্তূপের মধ্যে রেখে দেওয়া হয়েছিল। তখন সে শ্রীল সনাতন গোস্বামীর কাছে সবচাইতে মূল্যবান বস্তু সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করে এবং তিনি তাকে ভগবানের পবিত্র নাম দান করেন। অকিঞ্চন মানে হচ্ছে নির্ধন, অর্থাৎ যার কাছে দেওয়ার মতো জড়জাগতিক কিছুই নেই। প্রকৃত ভক্ত বা মহাত্মা কাউকে জড়জাগতিক কোন কিছু দান করেন না, কেননা তিনি সমস্ত জাগতিক ধন-সম্পদ ইতিমধ্যেই ত্যাগ করেছেন। কিন্তু তিনি সবচাইতে শ্রেষ্ঠ সম্পদ পরমেশ্বর ভগবানকে দান করতে পারেন, কেননা ভগবান হচ্ছেন প্রকৃত ভক্তের একমাত্র সম্পত্তি। শ্রীল সনাতন গোস্বামীর পরশমণিটি, যা আবর্জনার মধ্যে ফেলে দেওয়া হয়েছিল, সেটি তাঁর সম্পত্তি ছিল না; তা যদি হত তাহলে তিনি সেটি সেরকম একটি জায়গায় রাখতেন না। নবীন ভক্তদের জন্য এই বিশেষ দৃষ্টান্তটি দেওয়া হয়েছে, যাতে তারা বুঝতে পারে যে জাগতিক ভোগ-বাসনা এবং পারমার্থিক প্রগতি একাধারে সম্ভব নয়। যতক্ষণ পর্যন্ত প্রতিটি বস্তুকে চিন্ময়রূপে

ভগবানের সঙ্গে সম্পর্কিত না দেখা যায়, ততক্ষণ পর্যন্ত চিন্ময় এবং জড়ের মধ্যে পার্থক্য দর্শন করা উচিত। শ্রীল সনাতন গোস্বামীর মতো সদ্‌গুরু যদিও ব্যক্তিগতভাবে সবকিছুই চিন্ময় দৃষ্টিতে দর্শন করতে সক্ষম, তথাপি আমাদের মতো চিন্ময়-দৃষ্টিহীন ব্যক্তিদের জন্য এই প্রকার উদাহরণ প্রদান করেন।

জড় দৃষ্টিভঙ্গি অথবা জড় সভ্যতার উন্নতি পারমার্থিক প্রগতির পথে একটি মস্ত বড় প্রতিবন্ধক। এই প্রকার জাগতিক উন্নতি জীবকে সবরকম দুঃখ-দুর্দশাপূর্ণ জড় শরীরের বন্ধনে আবদ্ধ করে রাখে। এই প্রকার জড় উন্নতিকে বলা হয় অনর্থ, অর্থাৎ যে সমস্ত বস্তুর কোন প্রয়োজন নেই। প্রকৃতপক্ষে সেটি তাই। বর্তমান জড়-জাগতিক উন্নতির এই স্তরে মানুষ কুড়ি টাকা মূল্যের লিপস্টিক ব্যবহার করে, এবং এরকম অনেক অবাঞ্ছিত বস্তু রয়েছে সেগুলি দেহাত্ম-বুদ্ধি প্রসূত। এই প্রকার অবাঞ্ছিত বস্তুর দ্বারা চিত্ত বিক্ষিপ্ত হওয়ার ফলে মানুষের শক্তির অপচয় হচ্ছে এবং মানব জীবনের প্রধান প্রয়োজন পারমার্থিক উপলব্ধি লাভ হচ্ছে না। চন্দ্রে যাওয়ার প্রচেষ্টা শক্তির অনর্থক অপচয়ের আরেকটি দৃষ্টান্ত। কেননা মানুষ যদি চন্দ্রলোকে গমন করেও, তাহলেও তার জীবনের সমস্যাগুলির সমাধান হবে না। ভগবদ্ভক্তদের বলা হয় অকিঞ্চন, কেননা তাদের কোন জাগতিক সম্পদ নেই। এই প্রকার জড় সম্পদগুলি প্রকৃতির তিনটি গুণ থেকে উদ্ভূত হয়েছে। সেগুলি চিন্ময় শক্তিকে ব্যর্থ করে দেয়, এবং তাই আমাদের কাছে জড়া প্রকৃতির এই সমস্ত জিনিসগুলি যত কম থাকে পারমার্থিক প্রগতির পথে ততই ভাল।

পরমেশ্বর ভগবানের সঙ্গে জড়জাগতিক কার্যকলাপের প্রত্যক্ষ কোন সম্পর্ক নেই। তাঁর সমস্ত কার্যকলাপ, যা এই জড় জগতেও প্রদর্শিত হয়, তা চিন্ময় এবং জড়া প্রকৃতির গুণের দ্বারা প্রভাবিত নয়। শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতায় ভগবান বলেছেন যে তাঁর সমস্ত কার্যকলাপ, এমনকি এই জড় জগতে তাঁর আবির্ভাব এবং তিরোভাবও চিন্ময়, এবং যিনি তা তত্ত্বত জানেন তাঁকে আর পুনরায় এই জড় জগতে জন্মগ্রহণ করতে হয় না, তিনি ভগবদ্ধামে ফিরে যান। জড়া প্রকৃতির উপর আধিপত্য করার লালসাই ভবরোগের কারণ। প্রকৃতির তিনটি গুণের পারস্পরিক ক্রিয়ার ফলে এই লালসার উদয় হয়, কিন্তু ভগবান অথবা তাঁর ভক্ত এই প্রকার মিথ্যা ভোগের প্রতি আসক্ত হন না। তাই ভগবান এবং তাঁর ভক্তদের বলা হয় *নিবৃত্ত-গুণ-বৃত্তি* । আদর্শ *নিবৃত্ত-গুণ-বৃত্তি* হচ্ছেন পরমেশ্বর ভগবান, কেননা তিনি কখনো জড়া প্রকৃতির গুণের দ্বারা আকৃষ্ট হন না; কিন্তু জীবের সেই প্রবণতা রয়েছে। তাদের মধ্যে অনেকে জড় জগতের এই মোহময়ী আকর্ষণের দ্বারা আবদ্ধ হয়।

যেহেতু ভগবান হচ্ছেন তাঁর ভক্তের সম্পদ এবং ভক্তও হচ্ছেন ভগবানের সম্পদ, তাই ভক্তগণ অবশ্যই জড়া প্রকৃতির গুণের অতীত। সেটিই হচ্ছে স্বাভাবিক সিদ্ধান্ত। এই প্রকার অনন্য ভক্তগণ কর্মমিশ্রা ভক্ত এবং জ্ঞানমিশ্রা ভক্তদের থেকে ভিন্ন। ভগবান এবং তাঁর অনন্য ভক্ত পরস্পরের প্রতি আসক্ত। অন্যদের কাছ থেকে ভগবানের দেওয়ার বা নেওয়ার কিছুই নেই, এবং তাই তাঁকে বলা হয় আত্মারাম, অর্থাৎ যিনি আত্মতৃপ্ত। আত্মারাম হওয়ার ফলে তিনি অদ্বৈতবাদীদের ঈশ্বর, যারা ভগবানের অস্তিত্বে লীন হয়ে যেতে চায়। এই প্রকার অদ্বৈতবাদীরা ব্রহ্মজ্যোতি নামক ভগবানের অঙ্গজ্যোতিতে লীন হয়ে যায়, কিন্তু ভক্তরা ভগবানের চিন্ময় লীলায় প্রবেশ করেন, যাকে কখনো প্রাকৃত বলে ভুল করা উচিত নয়।

শ্লোক ২৮

মন্যে ত্বাং কালমীশানমনাদিনিধনং বিভুম্ ।
সমং চরন্তং সর্বত্র ভূতানাং যন্মিথঃ কলিঃ ॥ ২৮ ॥

মন্যে—আমি মনে করি; **ত্বাম্**—তুমি; **কালম্**—নিত্যকাল; **ঈশানম্**—পরমেশ্বর ভগবান; **অনাদিনিধনম্**—আদি এবং অন্তহীন; **বিভুম্**—সর্বব্যাপ্ত; **সমম্**—সমভাবে কৃপাশীল; **চরন্তম্**—বিতরণকারী; **সর্বত্র**—সর্বস্থানে; **ভূতানাম্**—জীবদের; **যৎ মিথঃ**—পরস্পর; **কলিঃ**—কলহ।

অনুবাদ

হে পরমেশ্বর, আমি মনে করি যে তুমি নিত্যকালস্বরূপ, পরম নিয়ন্তা, আদি এবং অন্তহীন এবং সর্বব্যাপ্ত। তুমি সমভাবে সকলের প্রতি তোমার করুণা বিতরণ কর। পরস্পরের সঙ্গে সামাজিক যোগাযোগের ফলে জীবের মধ্যে কলহ হয়।

তাৎপর্য

কুন্তীদেবী জানতেন যে, কৃষ্ণ তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র অথবা তাঁর পিতৃকুলের একজন সাধারণ সদস্য ছিলেন না। তিনি ভালভাবেই জানতেন যে, কৃষ্ণ আদিপুরুষ, যিনি পরমাত্মারূপে সকলের হৃদয়ে বিরাজ করেন। ভগবানের পরমাত্মা প্রকাশের আরেকটি নাম কাল। শাশ্বত কাল আমাদের ভাল এবং মন্দ সমস্ত কর্মের সাক্ষী এবং এইভাবে তিনি কর্মের ফল প্রদান করে থাকেন। আমরা যে কেন দুঃখ-দুর্দশা ভোগ করছি তা আমরা জানি না, সে কথা বলে কোন লাভ নেই। যে দুষ্কর্মের ফলে আমরা এখন দুঃখ-দুর্দশা

ভোগ করছি তা আমরা ভুলে যেতে পারি, কিন্তু আমাদের মনে রাখতে হবে যে পরমাত্মা আমাদের নিত্য সঙ্গী এবং তাই তিনি আমাদের অতীত, বর্তমান এবং ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে জানেন। আর যেহেতু শ্রীকৃষ্ণ পরমাত্মা রূপে সমস্ত কর্ম এবং তার ফল নির্ধারণ করেন, তাই তিনি পরম নিয়ন্তাও। তাঁর অনুমোদন ব্যতিরেকে একটি তৃণও নড়তে পারে না। জীবকে তার যোগ্যতা অনুসারে স্বাতন্ত্র্য দেওয়া হয়েছে, এবং সেই স্বাতন্ত্র্যের অপব্যবহার করার ফলে তাকে দুঃখ-দুর্দশা ভোগ করতে হয়। ভগবানের ভক্তেরা কখনো তাঁদের স্বতন্ত্রতার অপব্যবহার করেন না, তাই তাঁরা হচ্ছেন ভগবানের সুসন্তান। কিন্তু যারা তার অপব্যবহার করে, তাদের শাশ্বত কালের প্রভাবে দুঃখ-দুর্দশা ভোগ করতে হয়। কাল বদ্ধজীবদের সুখ এবং দুঃখ উভয়ই দান করে। এ সবই শাশ্বত কালের দ্বারা পূর্ব নির্ধারিত। আমাদের যেমন না চাইতে দুঃখ-দুর্দশা আসে, তেমনই সুখও আসে, কেননা সে সবই কালের দ্বারা পূর্ব নির্ধারিত। তাই কেউই ভগবানের শত্রু অথবা বন্ধু নয়। সকলেই তাদের নিজেদের কর্ম অনুসারে সুখ এবং দুঃখ ভোগ করছে। জীবের এই ভাগ্য নির্ধারিত হয় তার সামাজিক আদানপ্রদানের ফলে। এখানে সকলেই জড়া প্রকৃতির উপর আধিপত্য করতে চায়, এবং তার ফলে পরমেশ্বর ভগবানের তত্ত্বাবধানে সকলেই নিজের নিজের ভাগ্য রচনা করে। তিনি সর্বব্যাপ্ত, এবং তাই তিনি সকলেরই কার্যকলাপ দেখতে পান। আর যেহেতু তাঁর আদি বা অন্ত নেই, তাই তিনি কাল নামেও পরিচিত।

শ্লোক ২৯

ন বেদ কশ্চিদ্ভগবংশ্চিকীর্ষিতং
তবেহমানস্য নৃণাং বিড়ম্বনম্ ।
ন যস্য কশ্চিদ্দয়িতোঽস্তি কর্হিচিদ্
দ্বেষ্যশ্চ যস্মিন্ বিষমা মতির্নৃণাম্ ॥ ২৯ ॥

ন—করে না; **বেদ**—জানা; **কশ্চিৎ**—যে কেউ; **ভগবন্**—হে ভগবান; **চিকীর্ষিতম্**—লীলা; **তব**—তোমার; **ঈহমানস্য**—বিষয়ী মানুষের মতো; **নৃণাম্**—জনসাধারণের; **বিড়ম্বনম্**—বিভ্রান্তিজনক; **ন**—কখনোই না; **যস্য**—যাঁর; **কশ্চিৎ**—কেউ; **দয়িতঃ**—বিশেষ কৃপার পাত্র; **অস্তি**—হয়; **কর্হিচিৎ**—কোথাও; **দ্বেষ্যঃ**—বিদ্বেষের পাত্র; **চ**—এবং; **যস্মিন্**—তাঁকে; **বিষমা**—পক্ষপাতিত্ব; **মতিঃ**—ধারণা; **নৃণাম্**—মানুষের।

অনুবাদ

হে পরমেশ্বর, তোমার অপ্রাকৃত লীলা কেউই বুঝতে পারে না, যা আপাতদৃষ্টিতে সাধারণ মানুষের কার্যকলাপের মতো বলে মনে হয় এবং তাই তা বিভ্রান্তিজনক। কেউই তোমার বিশেষ কৃপার অথবা বিদ্বেষের পাত্র নয়। মানুষ কেবল অজ্ঞতাবশত মনে করে যে তুমি পক্ষপাতিত্বপূর্ণ।

তাৎপর্য

পতিত জীবনের প্রতি ভগবানের করুণা সমভাবে বর্ষিত হয়। কেউই তাঁর শত্রু নয়। ভগবানকে একজন মানুষ বলে মনে করা একটি মস্ত বড় ভুল। তাঁর লীলা ঠিক মানুষের মতো বলে মনে হতে পারে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাতে জড় কলুষের স্পর্শমাত্র নেই এবং তা সম্পূর্ণরূপে চিন্ময়। নিঃসন্দেহে তাঁকে তাঁর শুদ্ধভক্তদের প্রতি পক্ষপাতিত্বপূর্ণ বলে মনে হয়, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তিনি কারও প্রতি পক্ষপাতিত্ব করেন না, ঠিক যেমন সূর্য কখনো কারো প্রতি পক্ষপাতিত্ব করেন না। সূর্যকিরণের সদ্ব্যবহারের ফলে কখনো কখনো পাথরও মূল্যবান হয়ে ওঠে, কিন্তু একজন অন্ধ সেই সূর্যকিরণের মধ্যে থাকা সত্ত্বেও সূর্যকে দেখতে পায় না। আলো এবং অন্ধকার দুটি বিপরীতমুখী ধারণা, কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে সূর্য তার কিরণ বিতরণে পক্ষপাতিত্ব করে। সূর্যকিরণ সকলের কাছেই উন্মুক্ত, কিন্তু ব্যক্তিবিশেষের গ্রহণ করার ক্ষমতার জন্য তার তারতম্য হয়। মূর্খ মানুষেরা মনে করে যে ভগবদ্ভক্তি হচ্ছে বিশেষ কৃপা লাভের জন্য ভগবানের তোষামোদ করা, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ভগবানের দিব্য প্রেমময়ী সেবায় যুক্ত শুদ্ধভক্তেরা ব্যবসায়ী নন। একজন ব্যবসায়ী লাভের আশায় অন্য কারও সেবা করে। কিন্তু ভগবানের শুদ্ধভক্ত এই প্রকার কোন কিছুর প্রত্যাশায় ভগবানের সেবা করেন না, এবং তাই ভগবানের পূর্ণ কৃপা তাঁর উপর বর্ষিত হয়। আর্ত, অর্থার্থী, জিজ্ঞাসু এবং জ্ঞানীরা কোন বিশেষ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য ভগবানের সঙ্গে সাময়িক সম্পর্ক স্থাপন করে। যখন তাদের উদ্দেশ্য সাধিত হয়, তখন আর ভগবানের সঙ্গে কোন সম্পর্ক থাকে না। আর্ত-ব্যক্তি যদি পুণ্যবান হয়, তাহলে সে আরোগ্যের জন্য ভগবানের কাছে প্রার্থনা করে। কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই আরোগ্য লাভের পর সে আর ভগবানের সঙ্গে সম্পর্ক রাখার প্রয়োজন মনে করে না। ভগবান তাকে কৃপা করছেন, কিন্তু সে তা গ্রহণ করতে অনিচ্ছুক। এটিই হচ্ছে শুদ্ধভক্ত এবং মিশ্রভক্তের মধ্যে পার্থক্য। যারা সম্পূর্ণরূপে ভগবানের সেবাবিমুখ, তাদের গভীর তমসাচ্ছন্ন বলে বিবেচনা করা হয়। যারা কেবল প্রয়োজনের সময়ই ভগবানের কৃপা প্রার্থনা করে, তারা আংশিকভাবে ভগবানের কৃপা প্রাপ্ত হয়। আর যারা পূর্ণরূপে ভগবানের

সেবায় যুক্ত, তারা পূর্ণরূপে ভগবানের কৃপাভাজন। ভগবানের কৃপা লাভের ব্যাপারে এই পক্ষপাতিত্ব নির্ভর করে গ্রহীতার উপর, তা কখনোই পরম কৃপাময় ভগবানের পক্ষপাতিত্বের ফলে নয়।

ভগবান যখন তাঁর পূর্ণ কৃপাশক্তির প্রভাবে এই জড় জগতে অবতরণ করেন এবং একজন মানুষের মতো লীলা-বিলাস করেন, তখন মনে হতে পারে যে ভগবান কেবল তাঁর ভক্তদের প্রতি পক্ষপাতিত্বপূর্ণ, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তা সত্য নয়। আপাতদৃষ্টিতে এই পক্ষপাতিত্ব সত্ত্বেও তাঁর করুণা সমভাবে সকলের উপর বর্ষিত হয়। কুরুক্ষেত্রের রণাঙ্গনে যাঁরা ভগবানের সম্মুখে প্রাণত্যাগ করেছিলেন, তাঁরা সকলেই উপযুক্ত যোগ্যতা না থাকা সত্ত্বেও মুক্তিলাভ করেছিলেন; কেননা ভগবানের উপস্থিতিতে মৃত্যু হলে সেই আত্মা তাঁর সমস্ত পাপ থেকে মুক্ত হয়ে যান এবং তার ফলে তিনি ভগবানের ধামে স্থান লাভ করেন। যে কোন প্রকারেই হোক না কেন কেউ যদি সূর্যকিরণের সান্নিধ্যে আসে, তাহলে সে সূর্যকিরণের তাপ এবং অতিবেগুনী-রশ্মির সুফল লাভ করে। তাই চরমে এই সিদ্ধান্ত করা যায় যে, ভগবান কারোরই প্রতি পক্ষপাতিত্ব করেন না। যারা তা মনে করে তাদের সেই ধারণা সম্পূর্ণরূপে ভ্রান্ত।

শ্লোক ৩০

জন্ম কর্ম চ বিশ্বাত্মন্নজস্যাকর্তুরাত্মনঃ।
তির্যঙ্‌নৃষিষু যাদঃসু তদত্যন্তবিড়ম্বনম্ ॥ ৩০ ॥

জন্ম—জন্ম; **কর্ম**—কার্যকলাপ; **চ**—এবং; **বিশ্বাত্মন্**—হে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের আত্মা; **অজস্য**—যিনি জন্মরহিত তাঁর; **অকর্তুঃ**—যিনি প্রাকৃত কর্মরহিত তাঁর; **আত্মনঃ**—প্রাণশক্তিময় আত্মার; **তির্যক্**—পশু; **নৃ**—মানুষ; **ঋষিষু**—ঋষিদের; **যাদঃসু**—জলে; **তৎ**—তা; **অত্যন্ত**—অতি; **বিড়ম্বনম্**—মোহজনক।

অনুবাদ

হে বিশ্বাত্মা, তুমি প্রাকৃত কর্মরহিত হওয়া সত্ত্বেও কর্ম কর, তুমি প্রাকৃত জন্মরহিত এবং সকলের পরমাত্মা হওয়া সত্ত্বেও জন্মগ্রহণ কর। তুমি পশু, মানুষ, ঋষি এবং জলচর কুলে অবতরণ কর। স্পষ্টতই এ সমস্ত অত্যন্ত বিমোহিতকর।

তাৎপর্য

ভগবানের চিন্ময় লীলা কেবল বিমোহিতকরই নয়, তা আপাতদৃষ্টিতে বিরুদ্ধভাবসমন্বিতও। পক্ষান্তরে বলা যায় যে তা মানুষের সীমিত চিন্তাশক্তির অতীত।

ভগবান হচ্ছেন সমস্ত অস্তিত্বের সর্বব্যাপ্ত পরমাত্মা, তথাপি তিনি পশুদের মধ্যে শূকররূপে, মানবকুলের মধ্যে রাম, কৃষ্ণ আদি রূপে, ঋষিদের মধ্যে নরনারায়ণরূপে এবং জলচরদের মধ্যে মীনরূপে অবতীর্ণ হন। তথাপি তাঁকে বলা হয় অজ, এবং এই জগতে তাঁর করণীয় কিছুই নেই। শ্রুতি-মন্ত্রে বলা হয়েছে যে পরম ব্রহ্মের করণীয় কিছুই নেই। কেউই তাঁর সমকক্ষ নয় অথবা তাঁর থেকে শ্রেষ্ঠ নয়। তাঁর বিবিধ শক্তি রয়েছে, এবং তাঁর স্বাভাবিক জ্ঞান, বল এবং ক্রিয়ার দ্বারা সবকিছু সম্পন্ন হয়। এই সমস্ত উক্তি নিঃসন্দেহে প্রমাণ করে যে ভগবানের লীলা, রূপ এবং কার্যকলাপ আমাদের সীমিত চিন্তাশক্তির অতীত, এবং যেহেতু তিনি অচিন্ত্যশক্তি সম্পন্ন তাই তাঁর পক্ষে সবকিছুই সম্ভব। তাই কেউই তাঁকে সঠিকভাবে অনুমান করতে পারে না। ভগবানের প্রতিটি কার্য সাধারণ মানুষের পক্ষে বিমোহিতকর। বৈদিক জ্ঞানের দ্বারা তাঁকে জানা যায় না, কিন্তু শুদ্ধভক্তরা তাঁকে সহজেই জানতে পারেন, কেননা তাঁরা তাঁর সঙ্গে অন্তরঙ্গভাবে সম্পর্কিত। ভক্তেরা তাই জানেন যে যদিও তিনি পশুকুলে আবির্ভূত হন, তথাপি তিনি পশু নন, মানবকুলের মধ্যে আবির্ভূত হলেও তিনি মানুষ নন, ঋষিদের মধ্যে আবির্ভূত হলেও তিনি ঋষি নন এবং জলচরদের মধ্যে আবির্ভূত হলেও তিনি মৎস্য নন। সর্ব অবস্থাতেই তিনি শাশ্বত পরমেশ্বর ভগবান।

শ্লোক ৩১

গোপ্যাদদে ত্বয়ি কৃতাগসি দাম তাবদ্
যা তে দশাশ্রুকলিলাঞ্জনসম্ভ্রমাক্ষম্ ।
বক্ত্রং নিনীয় ভয়ভাবনয়া স্থিতস্য
সা মাং বিমোহয়তি ভীরপি যদ্বিভেতি ॥ ৩১ ॥

গোপী—গোপরমণী (যশোদা); **আদদে**—গ্রহণ করেছিলেন; **ত্বয়ি**—তোমার; **কৃতাগসি**—অপরাধ করেছিলে (দধিভাণ্ডভঙ্গ করে); **দাম**—রজ্জু; **তাবৎ**—তখন; **যা**—যা; **তে**—তোমার; **দশা**—অবস্থা; **অশ্রুকলিল**—অশ্রু-প্লাবিত; **অঞ্জন**—কাজল; **সম্ভ্রম**—উদ্বিগ্ন; **অক্ষম্**—নয়ন; **বক্ত্রম্**—মুখমণ্ডল; **নিনীয়**—নত করে; **ভয়-ভাবনয়া**—ভয়ের ভাবনায়; **স্থিতস্য**—অবস্থার; **সা**—সেই; **মাম্**—আমাকে; **বিমোহয়তি**—বিমোহিত করে; **ভীঃঅপি**—এমন কি স্বয়ং ভয়; **যৎ**—যিনি; **বিভেতি**—ভয় পান।

অনুবাদ

হে কৃষ্ণ, দধিভাণ্ড ভঙ্গ করার অপরাধে যশোদা যখন তোমাকে বন্ধন করার জন্য রজ্জু গ্রহণ করেছিলেন, তখন তোমার নয়ন অশ্রুর দ্বারা প্লাবিত হয়েছিল এবং তা তোমার নয়নের অঞ্জন বিধৌত করেছিল। স্বয়ং ভয়েরও ভয়স্বরূপ তুমি তখন ভয়ে ভীত হয়েছিলে। তোমার সেই অবস্থা আমার কাছে এখনও বিমোহিতকর।

তাৎপর্য

এখানে ভগবানের লীলাজনিত মোহের একটি ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে। পরমেশ্বর ভগবান সর্ব অবস্থাতেই পরম, যা ইতিমধ্যেই বিশ্লেষণ করা হয়েছে। এখানে ভগবানের পরম হওয়া সত্ত্বেও তাঁর শুদ্ধভক্তের কাছে খেলার সামগ্রী হওয়ার একটি বিশেষ দৃষ্টান্ত দেওয়া হয়েছে। ভগবানের শুদ্ধভক্ত তাঁর প্রতি ঐকান্তিক প্রেমের প্রভাবেই তাঁর সেবা করেন, এবং এইভাবে সেবা করার ফলে শুদ্ধভক্ত তাঁর পরমেশ্বরত্বের কথা ভুলে যান। পরমেশ্বর ভগবানও ঐশ্বর্যভাববিহীন এই স্বতঃস্ফূর্ত শুদ্ধপ্রেমের প্রভাবে সম্পাদিত তাঁর ভক্তের সেবা অধিক আনন্দের সঙ্গে গ্রহণ করেন। সাধারণত ভক্তেরা সম্ভ্রম সহকারে ভগবানের আরাধনা করেন, কিন্তু ভক্ত যখন শুদ্ধপ্রেমের বশবর্তী হয়ে ভগবানকে কনিষ্ঠ জ্ঞানে সেবা করেন তখন ভগবান বিশেষভাবে প্রসন্ন হন। ভগবানের নিত্য ধাম গোলোক বৃন্দাবনে তাঁর সমস্ত লীলা এই বিশেষ মনোভাবের দ্বারা সম্পাদিত হয়। তাঁর সখারা তাঁকে তাঁদেরই একজন বলে মনে করেন। তাঁরা তাঁকে সম্মানিত কোন ব্যক্তি বলে মনে করেন না। ভগবানের পিতামাতারা (যাঁরা হচ্ছেন তাঁর শুদ্ধভক্ত) মনে করেন যে তিনি কেবল তাঁদের সন্তান। ভগবানের কাছে তাঁর পিতামাতার শাসন বেদস্তুতির থেকেও অধিক আনন্দদায়ক। তেমনই তাঁর প্রেয়সীদের ভর্ৎসনা তাঁর কাছে অধিক মনোরম। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যখন সাধারণ মানুষদের কাছে অত্যন্ত আকর্ষণীয় তাঁর চিন্ময় গোলোক বৃন্দাবনের নিত্য লীলা প্রকাশ করার জন্য এই জড় জগতে আবির্ভূত হয়েছিলেন, তখন তিনি তাঁর মাতা যশোদার বশ্যতা স্বীকার করে এক অতুলনীয় লীলা প্রদর্শন করেছিলেন। ভগবান তাঁর স্বাভাবিক শিশুসুলভ চপলতায় মা যশোদার সঞ্চিত ননী এবং দধির ভাণ্ড ভঙ্গ করে সেগুলি তাঁর খেলার সাথীদের মধ্যে এবং বৃন্দাবনের প্রসিদ্ধ বানরদের মধ্যে বিতরণ করতেন, যাঁরা তাঁর উদারতার সুযোগ গ্রহণ করত। মা যশোদা তা দেখতে পেয়ে শুদ্ধপ্রেমের প্রভাবে তাঁর দিব্য শিশুটিকে দণ্ড দেওয়ার অভিনয় করেছিলেন। তিনি একটি রজ্জু নিয়ে ভগবানকে বন্ধন করার ভয় দেখিয়েছিলেন, যা একজন সাধারণ শিশুর ক্ষেত্রে করা হয়ে থাকে। মা যশোদার হাতে সেই রজ্জুটি দর্শন করে

ভগবান নত মস্তকে একটি সাধারণ শিশুর মতো অশ্রুবর্ষণ করতে থাকেন, এবং সেই অশ্রু তাঁর সুন্দর নয়নযুগলের অঞ্জন ধৌত করে গাল বেয়ে ঝরে পড়তে থাকে। কুন্তীদেবী এখানে ভগবানের সেই লীলাটির মহিমা কীর্তন করেছেন, কেননা তিনি ভগবানের পরম পদ সম্বন্ধে অবগত। স্বয়ং ভয়ও তাঁকে ভয় করে, তথাপি তিনি তাঁর মায়ের ভয়ে ভীত হয়েছিলেন যিনি তাঁকে একটি সাধারণ শিশুর মতো দণ্ড দিতে চেয়েছিলেন। কুন্তীদেবী শ্রীকৃষ্ণের পরমেশ্বরত্ব সম্বন্ধে সচেতন ছিলেন, কিন্তু মা যশোদা ছিলেন না। তাই মা যশোদার পদ কুন্তীদেবীর থেকে উর্ধ্বে। মা যশোদা ভগবানকে তাঁর পুত্ররূপে লাভ করেছিলেন, এবং ভগবান তাঁকে বুঝতে দেননি যে তাঁর পুত্রটি হচ্ছেন স্বয়ং ভগবান। মা যশোদা যদি ভগবানের ভগবত্তা সম্বন্ধে সচেতন হতেন তাহলে তিনি অবশ্যই তাঁকে দণ্ড দিতেই ইতস্তত করতেন। কিন্তু ভগবান তাঁকে তাঁর সেই অবস্থা সম্বন্ধে ভুলিয়ে দিয়েছিলেন, কেননা তিনি মমতাময়ী মা যশোদার সম্মুখে ঠিক একটি শিশুর মতো আচরণ করতে চেয়েছিলেন। মাতা ও পুত্রের এই স্নেহের বিনিময় স্বাভাবিকভাবেই অনুষ্ঠিত হয়েছিল, এবং কুন্তীদেবী সেই দৃশ্য স্মরণ করে বিস্মিত হয়েছিলেন এবং তিনি সেই দিব্য বাৎসল্য প্রেমের প্রশংসা না করে থাকতে পারেননি। পরোক্ষভাবে মা যশোদার অতুলনীয় প্রেমের প্রশংসা করা হয়েছিল, কেননা তিনি সর্বশক্তিমান ভগবানকেও তাঁর প্রিয় পুত্ররূপে বশীভূত করেছিলেন।

শ্লোক ৩২

কেচিদাহুরজং জাতং পুণ্যশ্লোকস্য কীর্তয়ে।
যদোঃ প্রিয়স্যান্ববায়ে মলয়স্যেব চন্দনম্ ॥ ৩২ ॥

কেচিৎ—কেউ; **আহুঃ**—বলেন; **অজম্**—অজ বা প্রাকৃত জন্মরহিত; **জাতম্**—জন্মগ্রহণ করে; **পুণ্য-শ্লোকস্য**—মহা পুণ্যবান রাজা; **কীর্তয়ে**—মহিমান্বিত করার জন্য; **যদোঃ**—মহারাজ যদুর; **প্রিয়স্য**—প্রিয় পাত্রের; **অন্ববায়ে**—বংশে; **মলয়স্য**—মলয় পর্বতের; **ইব**—যেমন; **চন্দনম্**—চন্দন।

অনুবাদ

কেউ কেউ বলেন পুণ্যবান রাজাদের মহিমান্বিত করার জন্য অজ জন্মগ্রহণ করেছে, এবং কেউ কেউ বলেন তোমার অন্যতম প্রিয়ভক্ত যদুর আনন্দ বিধানের

জন্য তুমি জন্মরহিত হওয়া সত্ত্বেও যদু বংশে জন্মগ্রহণ করেছ। মলয় পর্বতের যশ বৃদ্ধির জন্য যেমন সেখানে চন্দন বৃক্ষের জন্ম হয়, তেমনই তুমি মহারাজ যদুর বংশে জন্মগ্রহণ করেছ।

তাৎপর্য

যেহেতু এই জড় জগতে ভগবানের আবির্ভাব বিমোহিতকর, তাই প্রাকৃত জন্মরহিত ভগবানের জন্ম সম্বন্ধে বিভিন্ন মত রয়েছে। *শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতায়* ভগবান বলেছেন যে, সমগ্র সৃষ্টির ঈশ্বর এবং প্রাকৃত জন্মরহিত হওয়া সত্ত্বেও তিনি জড় জগতে জন্মগ্রহণ করেন। সুতরাং তিনি নিজেই যখন সেই সত্য প্রতিষ্ঠা করেছেন, তখন সেই অজ বা প্রাকৃত জন্মরহিতের জন্ম অস্বীকার করা যায় না। কিন্তু তা সত্ত্বেও তাঁর জন্ম সম্বন্ধে বিভিন্ন মত রয়েছে। তাও *শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতায়* ঘোষণা করা হয়েছে। তিনি ধর্ম সংস্থাপনের জন্য, সাধুদের পরিত্রাণ করার জন্য এবং দুষ্কৃতকারীদের বিনাশ করার জন্য তাঁর অন্তরঙ্গা শক্তির প্রভাবে আবির্ভূত হন। সেটিই হচ্ছে জন্মরহিত ভগবানের আবির্ভাবের উদ্দেশ্য। তথাপি বলা হয়েছে যে পুণ্যাত্মা মহারাজ যুধিষ্ঠিরকে মহিমান্বিত করার জন্য ভগবান অবতীর্ণ হয়েছিলেন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অবশ্যই পৃথিবীর সকলের মঙ্গলের জন্য পাণ্ডবদের রাজ্য স্থাপন করতে চেয়েছিলেন। কোন পুণ্যবান রাজা যখন পৃথিবী শাসন করেন, তখন মানুষ সুখী হয়। কিন্তু রাজা যদি অধার্মিক হয় তা হলে মানুষ অসুখী হয়। কলিযুগে অধিকাংশ শাসকই অধার্মিক, এবং তাই নাগরিকেরা সর্বদাই অসুখী। কিন্তু গণতন্ত্রের ক্ষেত্রে অধার্মিক নাগরিকেরা তাদের শাসন করার জন্য নিজেরাই নেতা নির্বাচন করে, এবং তাই তাদের দুঃখ-দুর্দশার জন্য তারা অন্য কাউকেই দোষ দিতে পারে না। মহারাজ নল ছিলেন একজন বিখ্যাত পুণ্যবান রাজা, কিন্তু ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে তাঁর কোন সম্পর্ক ছিল না। তাই মহারাজ যুধিষ্ঠির ভগবান শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক মহিমান্বিত হওয়ার উপযুক্ত ছিলেন। ভগবান ইতিমধ্যেই মহারাজ যদুকে মহিমান্বিত করেছেন তাঁর বংশে জন্মগ্রহণ করার মাধ্যমে। যদিও তিনি যাদব, যদুবীর, যদুনন্দন ইত্যাদি নামে পরিচিত, কিন্তু তিনি সর্বদাই এই সমস্ত কৃতজ্ঞতাজনিত বাধকতা থেকে সম্পূর্ণভাবে মুক্ত। তিনি ঠিক মলয় পর্বতে উৎপন্ন চন্দনের মতো। বৃক্ষ যে কোন জায়গায় এবং সর্বত্র উৎপন্ন হতে পারে, কিন্তু যেহেতু চন্দন বৃক্ষ সাধারণত মলয় পর্বতে উৎপন্ন হয় তাই চন্দন এবং মলয় পর্বত পারস্পরিক সম্পর্কযুক্ত। অতএব সিদ্ধান্ত হচ্ছে এই যে ভগবান জন্মরহিত, ঠিক যেমন সূর্য সর্বদা বর্তমান থাকা সত্ত্বেও মানুষের দৃষ্টিতে পূর্ব দিগন্তে উদিত হচ্ছে বলে মনে হয়। তেমনই, ভগবান সকলেরই পরম পিতা এবং তিনি কারো পুত্র নন, ঠিক যেমন সূর্য কখনই পূর্ব দিগন্তের সূর্য নয়।

শ্লোক ৩৩

অপরে বসুদেবস্য দেবক্যাং যাচিতোঽভ্যগাৎ ।
অজস্ত্বমস্য ক্ষেমায় বধায় চ সুরদ্বিষাম্ ॥ ৩৩ ॥

অপরে—অন্য কেউ; **বসুদেবস্য**—বসুদেবের; **দেবক্যাং**—দেবকীর; **যাচিতঃ**—প্রার্থিত হয়ে; **অভ্যগাৎ**—জন্মগ্রহণ করেছিলে; **অজঃ**—জন্মরহিত; **ত্বম্**—তুমি; **অস্য**—তাঁর; **ক্ষেমায়**—মঙ্গলের জন্য; **বধায়**—বধ করার জন্য; **চ**—এবং; **সুরদ্বিষাম্**—ভগবদ্বিদ্বেষী অসুরদের।

অনুবাদ

অন্য কেউ কেউ বলেন যে বসুদেব এবং দেবকী তোমার কাছে প্রার্থনা করায় তুমি তাঁদের পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করেছ। নিঃসন্দেহে তুমি প্রাকৃত জন্মরহিত,তথাপি তুমি তাঁদের মঙ্গল সাধনের জন্য এবং দেববিদ্বেষী অসুরদের সংহার করার জন্য জন্মগ্রহণ করেছ।

তাৎপর্য

কথিত হয় যে বসুদেব এবং দেবকী তাঁদের পূর্বজন্মে ছিলেন সুতপা এবং পৃশ্নি, এবং তাঁরা পরমেশ্বর ভগবানকে তাঁদের পুত্ররূপে লাভ করার জন্য কঠোর তপস্যা করেছিলেন এবং তার ফলে ভগবান তাঁদের পুত্ররূপে আবির্ভূত হয়েছিলেন। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় ঘোষণা করা হয়েছে যে ভগবান জগতের সমস্ত জীবদের মঙ্গল সাধনের জন্য এবং অসুর বা জড়বাদী নাস্তিকদের বিনাশ করার জন্য আবির্ভূত হন।

শ্লোক ৩৪

ভারাবতারণায়ান্যে ভুবো নাব ইবোদধৌ ।
সীদন্ত্যা ভূরিভারেণ জাতো হ্যাত্মভুবার্থিতঃ ॥ ৩৪ ॥

ভার-অবতারণায়—ভার হরণ করার জন্য; **অন্যে**—অন্য কেউ; **ভুবঃ**—পৃথিবীর; **নাবঃ**—নৌকা; **ইব**—মতো; **উদধৌ**—সমুদ্রে; **সীদন্ত্যাঃ**—মর্মাহত; **ভূরি**—অত্যন্ত; **ভারেণ**—ভারে; **জাতঃ**—জন্মগ্রহণ করেছিলে; **হি**—অবশ্যই; **আত্ম-ভুবা**—ব্রহ্মার দ্বারা; **অর্থিতঃ**—প্রার্থিত হয়ে।

অনুবাদ

অন্যেরা বলেন যে সমুদ্রের মধ্যে নৌকার মতো পৃথিবী অতি ভারে ভারাক্রান্ত হয়ে দারুণভাবে পীড়িত হলে তোমার পুত্র ব্রহ্মা তোমার কাছে প্রার্থনা জানায়, আর তাই তুমি সেই ভার হরণ করার জন্য অবতীর্ণ হয়েছ।

তাৎপর্য

সৃষ্টির ঠিক পরেই প্রথম সৃষ্ট জীব ব্রহ্মা হচ্ছেন নারায়ণের সাক্ষাৎ পুত্র। গর্ভোদকশায়ী বিষ্ণুরূপে নারায়ণ প্রথমে ব্রহ্মাণ্ডে প্রবিষ্ট হয়েছিলেন। চিন্ময় সংযোগ ব্যতীত জড় পদার্থ কখনো কিছু সৃষ্টি করতে পারে না। সৃষ্টির আদিতেই এই নীতি অনুসরণ করা হয়েছিল। পরম-আত্মা ব্রহ্মাণ্ডে প্রবেশ করেছিলেন, এবং প্রথম জীব ব্রহ্মা তাঁর চিন্ময় নাভি থেকে উদ্ভূত একটি পদ্মফুলে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তাই বিষ্ণুকে বলা হয় পদ্মনাভ । ব্রহ্মাকে বলা হয় আত্মভূ , কেননা তিনি সরাসরিভাবে তাঁর পিতার থেকে মাতা লক্ষ্মীদেবীর সংস্পর্শ ব্যতীতই জন্মগ্রহণ করেছিলেন। লক্ষ্মীদেবী নারায়ণের সন্নিকটে তাঁর সেবায় যুক্ত ছিলেন, তথাপি লক্ষ্মীদেবীর সংস্পর্শ ব্যতীতই নারায়ণ ব্রহ্মাকে সৃষ্টি করেছিলেন। সেটিই ভগবানের সর্বশক্তিমত্তা। যারা মূর্খতাবশত নারায়ণকে অন্য জীবেদের সমতুল্য বলে মনে করে, এই দৃষ্টান্তটি থেকে তাদের শিক্ষা গ্রহণ করা উচিত। নারায়ণ কোন সাধারণ জীব নন। তিনি পরমেশ্বর ভগবান এবং তাঁর চিন্ময় অঙ্গের প্রতিটি প্রত্যঙ্গ অন্যান্য প্রত্যঙ্গ বা ইন্দ্রিয়ের কার্য করতে সক্ষম। একজন সাধারণ জীব মৈথুনের মাধ্যমে সন্তান উৎপন্ন করে, এছাড়া তার সন্তন লাভের আর কোন উপায় নেই। কিন্তু নারায়ণ সর্বশক্তিমান হওয়ার ফলে কোন প্রকার শক্তির বন্ধনে আবদ্ধ নন। তিনি পুর্ণ এবং তাঁর বিভিন্ন শক্তির দ্বারা তিনি যা ইচ্ছা তাই অনায়াসে এবং পূর্ণরূপে সম্পাদন করতে সক্ষম। তাই ব্রহ্মা মাতৃগর্ভে অবস্থান না করেই সরাসরিভাবে তাঁর পিতা থেকে উৎপন্ন হয়েছিলেন। তাই তাঁকে বলা হয় আত্মভূ। এই ব্রহ্মা ব্রহ্মাণ্ডের পরবর্তী সমস্ত সৃষ্টির কর্তা, এবং তিনি হচ্ছেন সর্বশক্তিমানের শক্তির দ্বারা আবিষ্ট। ব্রহ্মাণ্ডের জ্যোতির্মণ্ডলের মধ্যে শ্বেতদ্বীপ নামে একটি চিন্ময় লোক রয়েছে, যা পরমেশ্বর ভগবানের পরমাত্মা রূপ ক্ষীরোদকশায়ী বিষ্ণুর ধাম। ব্রহ্মাণ্ডে যখনই কোন সঙ্কট দেখা দেয় তখনই তা সমাধান করার জন্য বিভিন্ন বিভাগের অধিকর্তা দেবতারা ব্রহ্মার শরণাপন্ন হন, এবং ব্রহ্মা যদি তা সমাধান করতে না পারেন তাহলে তিনি ক্ষীরোদকশায়ী বিষ্ণুর কাছে সেই সমস্যা সমাধানের জন্য এবং তাঁর অবতরণের জন্য প্রার্থনা করেন। এই রকম একটি সঙ্কট দেখা দিয়েছিল যখন কংস এবং অন্যান্য আসুরিক রাজাদের দুষ্কর্মের ফলে পৃথিবী

ভারাক্রান্ত হয়েছিল। ব্রহ্মা তখন অন্যান্য দেবতাদের সঙ্গে ক্ষীর-সমুদ্রের তীরে উপস্থিত হয়ে ভগবানের কাছে প্রার্থনা করেছিলেন, এবং ভগবান তখন তাঁদের জানিয়েছিলেন যে বসুদেব এবং দেবকীর পুত্ররূপে তিনি তাঁর কৃষ্ণ-স্বরূপে অবতরণ করবেন। তাই কেউ কেউ বলেন যে ভগবান ব্রহ্মার প্রার্থনার জন্য অবতরণ করেছিলেন।

শ্লোক ৩৫

ভবেঽস্মিন্ ক্লিশ্যমানানামবিদ্যাকামকর্মভিঃ।
শ্রবণস্মরণার্হাণি করিষ্যন্নিতি কেচন ॥ ৩৫ ॥

ভবে—জড় জগতে; **অস্মিন্**—এই; **ক্লিশ্যমানানাম্**—দুর্দশাক্লিষ্ট ব্যক্তিদের; **অবিদ্যা**—অজ্ঞানতা; **কাম**—কামনা-বাসনা; **কর্মভিঃ**—সকাম কর্ম; **শ্রবণ**—শ্রবণ; **স্মরণ**—স্মরণ; **অর্হাণি**—আরাধনা; **করিষ্যন্**—করতে পারে; **ইতি**—এইভাবে; **কেচন**—অন্য কেউ।

অনুবাদ

আবার অন্য আরও অনেকে বলেন যে অবিদ্যাজনিত কাম এবং কর্মের বন্ধনে আবদ্ধ জড়জাগতিক দুঃখ-দুর্দশাগ্রস্ত বদ্ধজীবেরা যাতে ভক্তিযোগের সুযোগ নিয়ে জড় জগতের বন্ধন থেকে মুক্ত হতে পারে, সেই উদ্দেশ্যেই শ্রবণ, স্মরণ, অর্চন আদি ভক্তিযোগের পন্থাসমূহ পুনঃপ্রবর্তনের জন্য তুমি অবতরণ করেছিলে।

তাৎপর্য

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় ভগবান বলেছেন যে প্রত্যেক যুগে ধর্ম সংস্থাপনের জন্য তিনি অবতরণ করেন। ভগবানই ধর্ম প্রবর্তন করেন। কেউই নতুন ধর্ম তৈরী করতে পারে না, যা আজকাল কিছু উচ্চাকাঙ্ক্ষী মানুষ করছে। প্রকৃত ধর্মের পন্থা হচ্ছে ভগবানকে পরম ঈশ্বররূপে স্বীকার করে স্বতঃস্ফূর্ত প্রেমে তাঁর সেবা করা। সেবা না করে জীব থাকতে পারে না কেননা সেই উদ্দেশ্যেই তাকে সৃষ্টি করা হয়েছে। জীবের একমাত্র কার্য হচ্ছে ভগবানের সেবা করা। ভগবান মহান্, এবং জীব তাঁর অধীন। তাই জীবের কর্তব্য হচ্ছে কেবল তাঁরই সেবা করা। দুর্ভাগ্যবশত মোহাচ্ছন্ন জীবেরা ভ্রান্ত ধারণার বশবর্তী হয়ে জড়-বাসনার প্রভাবে তাদের ইন্দ্রিয়ের দাস হয়ে যায়। এই বাসনাকে বলা হয় অবিদ্যা। আর এই অবিদ্যার ফলে জীব বিকৃত যৌনজীবনের ভিত্তিতে জড় সুখভোগের জন্য বিভিন্ন রকম পরিকল্পনা করে। তাই সে জন্ম-মৃত্যুর বন্ধনে আবদ্ধ

হয়ে পরমেশ্বর ভগবানের পরিচালনায় বিভিন্ন লোকে এক দেহ থেকে আর দেহে দেহান্তরিত হয়। এই অবিদ্যাকে অতিক্রম করতে না পারলে কেউই জড়জাগতিক জীবনের ত্রিতাপ ক্লেশ থেকে মুক্ত হতে পারে না। সেটিই হচ্ছে প্রকৃতির নিয়ম।

পরমেশ্বর ভগবান দুর্দশাক্লিষ্ট জীবেদের প্রতি আশাতীতভাবে কৃপালু হওয়ার ফলে তাঁর অহৈতুকী কৃপার প্রভাবে তাদের সম্মুখে আবির্ভূত হন এবং শ্রবণ, কীর্তন, স্মরণ, সেবন, অর্চন, বন্দন, দাস্য, সখ্য, আত্মনিবেদনসমন্বিত ভগবদ্ভক্তির পন্থা পুনঃ প্রতিষ্ঠা করেন। ভক্তির উপরোক্ত অঙ্গসমূহের সবকটিই বা যে কোন একটি অঙ্গের অনুশীলন বদ্ধজীবকে অবিদ্যার বন্ধন থেকে মুক্ত হতে সাহায্য করে এবং তার ফলে মায়া কর্তৃক মোহাচ্ছন্ন বদ্ধজীবের জড়জাগতিক দুঃখ-দুর্দশার নিবৃত্তি হয়। পরমেশ্বর ভগবান শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুরূপে জীবদের উপর এই বিশেষ কৃপা বর্ষণ করেছেন।

শ্লোক ৩৬

শৃণ্বন্তি গায়ন্তি গৃণন্ত্যভীক্ষ্ণশঃ
স্মরন্তি নন্দন্তি তবেহিতং জনাঃ ।
ত এব পশ্যন্ত্যচিরেণ তাবকং
ভবপ্রবাহোপরমং পদাম্বুজম্ ॥ ৩৬ ॥

শৃণ্বন্তি—শ্রবণ করেন; **গায়ন্তি**—কীর্তন করেন; **গৃণন্তি**—গ্রহণ করেন; **অভীক্ষ্ণশঃ**—নিরন্তর; **স্মরন্তি**—স্মরণ করেন; **নন্দন্তি**—আনন্দিত হন; **তব**—তোমার; **ঈহিতং**—কার্যকলাপ; **জনাঃ**—মানুষেরা; **তে**—তাঁরা; **এব**—অবশ্যই; **পশ্যন্তি**—দেখতে পান; **অচিরেণ**—শীঘ্রই; **তাবকম্**—তোমার; **ভব-প্রবাহ**—জন্ম-মৃত্যুর স্রোত; **উপরমম্**—নিবৃত্তি; **পদাম্বুজম্**—শ্রীপাদপদ্ম।

অনুবাদ

হে শ্রীকৃষ্ণ, যাঁরা তোমার অপ্রাকৃত চরিত-কথা নিরন্তর শ্রবণ করেন, কীর্তন করেন, স্মরণ করেন, এবং অবিরাম উচ্চারণ করেন, অথবা অন্যে তা করলে আনন্দিত হন, তাঁরা অবশ্যই তোমার শ্রীপাদপদ্ম অচিরেই দর্শন করতে পারেন, যা একমাত্র জন্ম-মৃত্যুর প্রবাহকে নিবৃত্ত করতে পারে।

তাৎপর্য

আমাদের বর্তমান বদ্ধদৃষ্টির দ্বারা পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করা সম্ভব নয়। তাঁকে দর্শন করতে হলে স্বতঃস্ফূর্ত ভগবৎ-প্রেম সমন্বিত ভিন্ন প্রকার

জীবনধারা বিকাশের মাধ্যমে আমাদের এই বর্তমান দৃষ্টির পরিবর্তন করতে হবে। শ্রীকৃষ্ণ যখন স্বয়ং এই পৃথিবীতে উপস্থিত ছিলেন, তখন সকলেই তাঁকে পরমেশ্বর ভগবানরূপে দর্শন করতে পারেনি। রাবণ, হিরণ্যকশিপু, কংস, জরাসন্ধ, শিশুপাল আদি জড়বাদীরা জড় সম্পদের পরিপ্রেক্ষিতে অত্যন্ত যোগ্য ব্যক্তি ছিল, কিন্তু তারা ভগবানকে বুঝতে পারেনি। তাই ভগবান আমাদের দৃষ্টির সম্মুখে উপস্থিত থাকলেও উপযুক্ত দৃষ্টিশক্তি লাভ না করা পর্যন্ত তাঁকে দর্শন লাভ করা সম্ভব নয়। এই যোগ্যতার উদয় হয় একমাত্র ভগবদ্ভক্তির দ্বারা, যা শুরু হয় উপযুক্ত সূত্র থেকে ভগবানের কথা শ্রবণ করার মাধ্যমে। *শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা* হচ্ছে অন্যতম একটি জনপ্রিয় শাস্ত্রগ্রন্থ, যা সাধারণ মানুষ শ্রবণ, কীর্তন, পাঠ ইত্যাদি করে থাকে, কিন্তু এই প্রকার শ্রবণাদি সত্ত্বেও অনুশীলনকারী প্রত্যক্ষরূপে ভগবান দর্শন করতে পারে না। শ্রবণ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। যদি উপযুক্ত ব্যক্তির কাছ থেকে শ্রবণ করা হয়, তাহলে তার সুফল অতি শীঘ্র লাভ করা যায়। সাধারণত মানুষ অযোগ্য ব্যক্তিদের কাছে শ্রবণ করে থাকে। এই প্রকার অযোগ্য ব্যক্তিরা জড়বিদ্যার পরিপ্রেক্ষিতে মহাপণ্ডিত হতে পারে, কিন্তু যেহেতু তারা ভগবদ্ভক্তির বিধি-নিয়ম পালন করে না, তাই তাদের কাছে শ্রবণ কেবল সময়ের অপচয় মাত্র। কখনো কখনো তারা তাদের নিজেদের উদ্দেশ্য সাধনের জন্য মূল শ্লোকের অর্থ বিকৃত করে ব্যাখ্যা করে। তাই প্রথমে উপযুক্ত এবং যোগ্য পাঠক খুঁজে তাঁর কাছে শ্রবণ করতে হয়। শ্রবণের বিধি যখন যথাযথ এবং পূর্ণ হয়, তখন অন্যান্য পন্থাগুলিও আপনা থেকেই পূর্ণ হয়ে যায়।

ভগবানের বিভিন্ন প্রকার দিব্য কার্যকলাপ রয়েছে, এবং যদি শ্রবণাঙ্গ বিধি পূর্ণরূপে সম্পাদন করা হয়, তাহলে সেগুলি প্রত্যেকটিই বাঞ্ছিত ফল প্রদানে সমর্থ। শ্রীমদ্ভাগবতে ভগবানের কার্যকলাপ পাণ্ডবদের সঙ্গে তাঁর আচরণের মাধ্যমে শুরু হয়েছে। অসুর এবং অন্যান্যদের সঙ্গে ভগবানের আচরণের ভিত্তিতে তাঁর বহু লীলা রয়েছে। আর দশম স্কন্ধে তাঁর প্রণয়িনী গোপিকাদের সঙ্গে তাঁর অপূর্ব আচরণ এবং দ্বারকায় তাঁর বিবাহিত পত্নীদের সঙ্গে তাঁর আচরণের বর্ণনা করা হয়েছে। ভগবান যেহেতু পরম তত্ত্ব, তাই তাঁর বিভিন্ন আচরণের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। তবুও কখনো কখনো কিছু মানুষ অবৈধ শ্রবণের ফলে গোপিকাদের সঙ্গে তাঁর দিব্য আচরণের বিষয় শ্রবণে অধিক আগ্রহী হয়। এই প্রকার প্রবণতা শ্রোতার কামুক মনোভাবের পরিচায়ক, তাই ভগবানের দিব্য চরিত বর্ণনের আদর্শ বক্তা কখনো এই প্রকার শ্রবণ অনুমোদন করেন না। মানুষের কর্তব্য শ্রীমদ্ভাগবত এবং অন্যান্য শাস্ত্রগ্রন্থে বর্ণিত ভগবানের কথা শুরু থেকে শ্রবণ করা, এবং তা শ্রোতাকে ক্রমোন্নতির মাধ্যমে পূর্ণতা লাভে সহায়তা করবে। তাই কখনোই মনে করা উচিত

নয় যে পাণ্ডবদের সঙ্গে ভগবানের আচরণ গোপিকাদের সঙ্গে তাঁর আচরণ থেকে কম গুরুত্বপূর্ণ। আমাদের সব সময় মনে রাখতে হবে যে ভগবান সব রকম আসক্তি থেকে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত। ভগবানের উপরোক্ত সবকটি আচরণে সর্ব অবস্থাতেই তিনি হচ্ছেন নায়ক, এবং তাঁর সম্বন্ধে অথবা তাঁর ভক্তের সম্বন্ধে অথবা তাঁর প্রতিযোগীদের সম্বন্ধে শ্রবণ করা পারমার্থিক জীবনের ক্ষেত্রে অনুকূল। কথিত হয় যে বেদ, পুরাণ আদি শাস্ত্রসমূহ প্রণয়ন করা হয়েছে তাঁর সঙ্গে আমাদের হারিয়ে যাওয়া সম্পর্কের পুনঃপ্রতিষ্ঠা করার জন্য। এই সমস্ত শাস্ত্র শ্রবণ করা অবশ্য কর্তব্য।

শ্লোক ৩৭

অপ্যদ্য নস্ত্বং স্বকৃতেহিত প্রভো
জিহাসসি স্বিৎ সুহৃদোঽনুজীবিনঃ ।
যেষাং ন চান্যদ্ভবতঃ পদাম্বুজাৎ
পরায়ণং রাজসু যোজিতাংহসাম্ ॥ ৩৭

অপি—যদি; **অদ্য**—আজ; **নঃ**—আমাদের; **ত্বম্**—তোমাকে; **স্বকৃত**—স্বয়ং সম্পাদিত; **ঈহিত**—সমস্ত কর্তব্য; **প্রভো**—হে প্রভু; **জিহাসসি**—ত্যাগ করে; **স্বিৎ**—সম্ভব; **সুহৃদঃ**—অন্তরঙ্গ বন্ধুগণ; **অনুজীবিনঃ**—অনুগ্রহের ফলে জীবিত; **যেষাম্**—যাঁদের; **ন**—না; **চ**—এবং; **অন্যৎ**—অন্য কেউ; **ভবতঃ**—তোমার; **পদ-অম্বুজাৎ**—শ্রীপাদপদ্ম থেকে; **পরায়ণম্**—নির্ভরশীল; **রাজসু**—রাজাদের প্রতি; **যোজিত**—নিয়োজিত; **অংহসাম্**—শত্রুতা।

অনুবাদ

হে প্রভু, তুমি তোমার সমস্ত কর্তব্য স্বয়ং সম্পাদন করেছ। যদিও আমরা সর্বতোভাবে তোমার কৃপার উপর নির্ভরশীল এবং তুমি ছাড়া আমাদের রক্ষা করার আর কেউ নেই, এবং যখন সমস্ত রাজারা আমাদের প্রতি বিদ্বেষপরায়ণ, সেই অবস্থায় তুমি কি আজ আমাদের ছেড়ে চলে যাচ্ছ?

তাৎপর্য

পাণ্ডবেরা সবচাইতে ভাগ্যবান, কেননা তাঁদের সৌভাগ্যের ফলে তাঁরা সম্পূর্ণরূপে ভগবানের কৃপার ওপর নির্ভরশীল ছিলেন। জড় জগতে অন্য কারও কৃপার উপর নির্ভর করা সবচাইতে দুর্ভাগ্যের লক্ষণ, কিন্তু ভগবানের সঙ্গে আমাদের

চিন্ময় সম্পর্কের ভিত্তিতে আমরা যদি সম্পূর্ণরূপে তাঁর উপর নির্ভর করতে পারি তাহলে সেটি হচ্ছে সবচাইতে বড় সৌভাগ্য। সম্পূর্ণরূপে স্বতন্ত্র হওয়ার বাসনাটি হচ্ছে ভবরোগের মূল কারণ। কিন্তু নিষ্ঠুর জড়া প্রকৃতি আমাদের কখনো স্বাধীন হতে দেয় না। প্রকৃতির কঠোর নিয়ম থেকে স্বতন্ত্র হওয়ার ভ্রান্ত প্রচেষ্টাকে জড় বিজ্ঞানের প্রগতি বলে মনে করা হয়। সমগ্র জড় জগৎ প্রকৃতির নিয়ম থেকে স্বতন্ত্র হওয়ার এই ভ্রান্ত প্রচেষ্টার উপর নির্ভর করে এগিয়ে চলেছে। সরাসরিভাবে স্বর্গে যাওয়ার সোপান নির্মাণের অভিলাষী রাবণ থেকে শুরু করে বর্তমান সময় পর্যন্ত সকলেই প্রকৃতির নিয়মকে অতিক্রম করার চেষ্টা করছে। তারা এখন বৈদ্যুতিক ও যান্ত্রিক শক্তির মাধ্যমে দূরবর্তী গ্রহগুলিতে যাওয়ার চেষ্টা করছে। কিন্তু মানব সভ্যতার সর্বোচ্চ লক্ষ্য হচ্ছে ভগবানের নির্দেশ অনুসারে কঠোর শ্রম করা এবং তাঁর উপর সম্পূর্ণরূপে নির্ভরশীল হওয়া। আদর্শ সভ্যতার সর্বোচ্চ প্রাপ্তি হচ্ছে শৌর্যের সঙ্গে কর্ম করা, এবং সেই সঙ্গে পরমেশ্বর ভগবানের উপর সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করা। সভ্যতার এই মান অনুসারে কার্য সম্পাদনে পাণ্ডবেরা আদর্শ দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছিলেন। তাঁরা যে ভগবানের সদিচ্ছার উপর সম্পূর্ণরূপে নির্ভরশীল ছিলেন সে সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নেই, কিন্তু তা বলে তাঁরা অলসভাবে ভগবানের মুখাপেক্ষী ছিলেন না। ব্যক্তিগত চরিত্র এবং দৈহিক সক্রিয়তা উভয় বিচারেই তাঁরা ছিলেন অত্যন্ত যোগ্য। তথাপি তাঁরা সর্বদাই ভগবানের করুণার উপর নির্ভরশীল ছিলেন কেননা তাঁরা জানতেন প্রতিটি জীবই স্বরূপত ভগবানের উপর নির্ভরশীল। তাই জীবনের প্রকৃত পূর্ণতা হচ্ছে ভ্রান্তভাবে জড় জগতে স্বতন্ত্র হওয়ার চেষ্টা না করে ভগবানের ইচ্ছার উপর নির্ভরশীল হওয়া। যারা ভ্রান্তভাবে ভগবান থেকে স্বতন্ত্র হওয়ার চেষ্টা করে তাদের বলা হয় *অনাথ*, অর্থাৎ যাদের কোন অভিভাবক নেই; কিন্তু যারা ভগবানের ইচ্ছার উপর সর্বতোভাবে নির্ভরশীল তাদের বলা হয় *সনাথ*, অর্থাৎ যাদের রক্ষা করার জন্য কেউ রয়েছে। তাই আমাদের অবশ্য কর্তব্য হচ্ছে সনাথ হওয়ার চেষ্টা করা, যাতে জড় অস্তিত্বের প্রতিকূল অবস্থা থেকে আমরা রক্ষা পেতে পারি। ভগবানের বহিরঙ্গা শক্তির বিভ্রান্তিকর প্রভাবের ফলে আমরা ভুলে যাই যে জড় জগতের বদ্ধ জীবন হচ্ছে সবচাইতে অবাঞ্ছনীয় বিভ্রান্তি। তাই *শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায়* (৭/১৯) উল্লেখ করা হয়েছে যে, বহু বহু জন্ম-জন্মান্তরের পর কোন সৌভাগ্যবান ব্যক্তি বাসুদেবকে সর্বেসর্বা বলে জানতে পারেন এবং বুঝতে পারেন যে সর্বতোভাবে তাঁর শরণাগত হয়ে জীবন যাপন করাই হচ্ছে সবচাইতে উৎকৃষ্ট পন্থা। সেটিই মহাত্মার লক্ষণ। পাণ্ডব পরিবারের সমস্ত সদস্যরাই ছিলেন গৃহস্থ আশ্রমে স্থিত মহাত্মা। এই সমস্ত মহাত্মাদের প্রধান ছিলেন মহারাজ যুধিষ্ঠির

এবং কুন্তীদেবী ছিলেন তাঁর মাতা। তাই *শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা* এবং সমস্ত পুরাণ, বিশেষ করে ভাগবত পুরাণের শিক্ষা পাণ্ডব মহাত্মাদের ইতিহাসের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্যভাবে সম্পর্কযুক্ত। তাঁদের কাছে ভগবান থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়া ঠিক জল থেকে মাছের বিচ্ছিন্ন হওয়ার মতো। তাই শ্রীমতী কুন্তীদেবী সেই বিরহকে বজ্রপাতের মতো মনে করেছিলেন, এবং তাই ভগবানের কাছে তাঁর সমগ্র প্রার্থনার উদ্দেশ্য ছিল ভগবানকে তাঁদের সঙ্গে থাকার জন্য রাজি করানো। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে যদিও শত্রুপক্ষের সমস্ত রাজারা নিহত হয়েছিল, কিন্তু তাদের পুত্র এবং পৌত্ররা পাণ্ডবদের সঙ্গে বোঝাপড়া করার জন্য তখনও বর্তমান ছিল। এমন নয় যে কেবল পাণ্ডবদেরই সেই শত্রুতার সম্মুখীন হতে হয়েছিল, আমরা সকলেই সর্বদা সেই রকম পরিস্থিতিতে রয়েছি, এবং তাই জীবন ধারণের সর্বশ্রেষ্ঠ উপায় হচ্ছে পরমেশ্বর ভগবানের ইচ্ছার উপর সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করা এবং সেইভাবে সমস্ত জড় জাগতিক দুঃখ-দুর্দশা থেকে মুক্ত হওয়া।

শ্লোক ৩৮

কে বয়ং নামরূপাভ্যাং যদুভিঃ সহ পাণ্ডবাঃ ।
ভবতোঽদর্শনং যর্হি হৃষীকাণামিবেশিতুঃ ॥ ৩৮ ॥

কে—কারা; **বয়ম্**—আমাদের; **নাম-রূপাভ্যাম্**—খ্যাতি এবং যোগ্যতাবিহীন; **যদুভিঃ**—যদুদের; **সহ**—সঙ্গে; **পাণ্ডবাঃ**—পাণ্ডবেরা; **ভবতঃ**—তোমার; **অদর্শনম্**—অনুপস্থিতি; **যর্হি**—যেন; **হৃষীকাণাম্**—ইন্দ্রিয়সমূহের; **ইব**—মতো; **ঈশিতুঃ**—জীবদের।

অনুবাদ

জীবাত্মার প্রয়াণ ঘটলেই যেমন কোন দেহের নাম ও যশ শেষ হয়ে যায়, তেমনই তুমি যদি আমাদের না দেখ তাহলে আমাদের সমস্ত যশ ও কীর্তি পাণ্ডব এবং যদুদের সঙ্গে তৎক্ষণাৎ শেষ হয়ে যাবে।

তাৎপর্য

কুন্তীদেবী ভালভাবেই জানতেন যে পাণ্ডবদের অস্তিত্ব ছিল কেবল শ্রীকৃষ্ণেরই জন্য। নিঃসন্দেহে পাণ্ডবেরা তাঁদের নাম এবং যশে পূর্ণরূপে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন এবং মূর্তিমান ধর্মরূপ মহারাজ যুধিষ্ঠির তাঁদের পরিচালিত করছিলেন, এবং যদুগণ ছিলেন তাঁদের মহান মিত্রপক্ষ, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের তত্ত্বাবধান ছাড়া তাঁদের কারুরই কোন অস্তিত্ব নেই।

ঠিক যেমন চেতনাবিহীন শরীরের ইন্দ্রিয়গুলি সম্পূর্ণরূপে অর্থহীন। পরমেশ্বর ভগবানের অনুগ্রহের দ্বারা পরিচালিত না হলে কারও প্রতিষ্ঠা, শক্তি এবং যশের গর্বে গর্বিত হওয়া উচিত নয়। জীব সর্বদাই নির্ভরশীল বা আশ্রিত, এবং পরমেশ্বর ভগবান হচ্ছেন তার পরম আশ্রয়। তাই, আমরা হয়তো আমাদের জড় জ্ঞানের প্রগতির দ্বারা সমস্ত প্রকার প্রতিরোধকারী ভৌতিক বিষয়ের আবিষ্কার করতে পারি, কিন্তু এই সমস্ত প্রতিরোধমূলক আবিষ্কারগুলি যতই প্রবল হোক না কেন, ভগবানের পরিচালনা ছাড়া সে সবই ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়।

শ্লোক ৩৯

নেয়ং শোভিষ্যতে তত্র যথেদানীং গদাধর।
ত্বৎপদৈরঙ্কিতা ভাতি স্বলক্ষণবিলক্ষিতৈঃ ॥ ৩৯ ॥

ন—না; **ইয়ম্**—আমাদের রাজ্যের এই ভূমি; **শোভিষ্যতে**—শোভা পাবে; **তত্র**—সেখানে; **যথা**—যেমন; **ইদানীং**—এখন; **গদাধর**—হে কৃষ্ণ; **ত্বৎ**—তোমার; **পদৈঃ**—পাদপদ্মের দ্বারা; **অঙ্কিতা**—চিহ্নিত; **ভাতি**—উজ্জ্বলভাবে শোভা পাচ্ছে; **স্বলক্ষণ**—তোমার নিজ লক্ষণসমূহ; **বিলক্ষিতৈঃ**—চিহ্ন দ্বারা।

অনুবাদ

হে গদাধর (শ্রীকৃষ্ণ), আমাদের রাজ্য এখন তোমার শ্রীপাদপদ্মের সুলক্ষণযুক্ত চিহ্ন দ্বারা অঙ্কিত হয়ে শোভা পাচ্ছে; কিন্তু তুমি চলে গেলে আর তেমন শোভা পাবে না।

তাৎপর্য

ভগবানের চরণে কতকগুলি বিশেষ চিহ্ন রয়েছে, যেগুলি অন্যান্যদের থেকে ভগবানের পার্থক্য নিরূপণ করে। ভগবানের চরণের তলদেশে ধ্বজ, বজ্র, অঙ্কুশ, ছত্র, পদ্ম, চক্র ইত্যাদি চিহ্নসমূহ রয়েছে। যেখানে ভগবান পদচারণ করেন সেখানকার নরম ধূলিতে সেই চিহ্নগুলি অঙ্কিত হয়ে যায়। শ্রীকৃষ্ণ যখন পাণ্ডবদের সঙ্গে হস্তিনাপুরে ছিলেন তখন সেখানকার ভূমি তাঁর পদচিহ্নের দ্বারা এইভাবে অঙ্কিত হয়েছিল, এবং এই সমস্ত শুভ চিহ্নের ফলে পাণ্ডবদের রাজ্য সমৃদ্ধশালী হয়েছিল। কুন্তীদেবী এই বিশেষ লক্ষণগুলির উল্লেখ করেছিলেন এবং তাঁর আশঙ্কা হয়েছিল যে শ্রীকৃষ্ণের অনুপস্থিতিতে হয়ত দুর্ভাগ্য দেখা দেবে।

শ্লোক ৪০

ইমে জনপদাঃ স্বৃদ্ধাঃ সুপক্কৌষধিবীরুধঃ ।
বনাদ্রিনদ্যুদন্বন্তো হ্যেধন্তে তব বীক্ষিতৈঃ ॥ ৪০ ॥

ইমে—এই সমস্ত; **জনপদাঃ**—শহর ও নগরাদি; **স্বৃদ্ধাঃ**—সমৃদ্ধশালী হয়েছে, **সুপক্ক**—পরিপক্ক; **ঔষধি**—ভেষজ; **বীরুধঃ**—বনস্পতি; **বন**—অরণ্য; **অদ্রি**—পর্বত; **নদী**—নদী; **উদন্বন্তঃ**—সমুদ্র; **হি**—অবশ্যই; **এধন্তে**—বর্ধনশীল; **তব**—তোমার; **বীক্ষিতাঃ**—দর্শন প্রভাবে।

অনুবাদ

এই সমস্ত জনপদ সর্বতোভাবে সমৃদ্ধ হয়েছে, কারণ প্রভূত পরিমাণে শস্য ও ঔষধি উৎপন্ন হচ্ছে, বৃক্ষসমূহ পরিপক্ক ফলে পূর্ণ হয়েছে, নদীগুলি প্রবাহিত হচ্ছে, গিরিসমূহ ধাতুতে পূর্ণ হয়েছে এবং সমুদ্র সম্পদে পূর্ণ হয়েছে। আর এ সবই হয়েছে সেগুলির উপর তোমার শুভ দৃষ্টিপাতের ফলে।

তাৎপর্য

মানুষের সমৃদ্ধি আসে প্রকৃতির দান থেকে, বিশাল যান্ত্রিক উদ্যোগ থেকে নয়। বিশাল যান্ত্রিক উদ্যোগগুলি ভগবদ্বিহীন সভ্যতার ফল, এবং সেগুলি মানব জীবনের মহান উদ্দেশ্যের ধ্বংসের কারণ। মানুষের জীবনী-শক্তি নিষ্পেষণ করে এই প্রকার দুর্দশাজনক উদ্যোগগুলি আমরা যতই বৃদ্ধি করব, সাধারণ মানুষের মধ্যে বিক্ষোভ এবং অসন্তোষ ততই বাড়তে থাকবে, যদিও মুষ্টিমেয় কয়েকজন মানুষ সেক্ষেত্রে সমাজকে শোষণ করে ভোগৈশ্বর্যপূর্ণ জীবন যাপন করবে। শস্য, শাক-সবজি, ফল, নদী, রত্ন এবং খনিজ ধাতুসমৃদ্ধ পর্বতসমূহ এবং মুক্তায় পূর্ণ সমুদ্রের মতো প্রকৃতির দানগুলি পরমেশ্বর ভগবানের আদেশ অনুসারে সরবরাহ করা হয়ে থাকে, এবং তাঁর ইচ্ছা অনুসারে জড়া প্রকৃতি সেগুলি উৎপাদন করে অথবা সেগুলির অভাব সৃষ্টি করে। প্রকৃতির নিয়ম হচ্ছে যে মানুষ জড়া প্রকৃতির উপর আধিপত্য বিস্তারপূর্বক শোষণমূলক মনোভাবের দ্বারা প্রভাবিত না হয়ে প্রকৃতি প্রদত্ত এই সমস্ত দৈব দানগুলির সদ্ব্যবহার করে সন্তোষজনকভাবে সমৃদ্ধিশালী হতে পারে। আমরা আমাদের ভোগ-বাসনার দ্বারা প্রভাবিত হয়ে জড়া প্রকৃতিকে যতই শোষণ করার চেষ্টা করি, ততই আমরা শোষণ করার চেষ্টাপ্রসূত কর্মফলের প্রতিক্রিয়ার বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে পড়ি। আমাদের যদি যথেষ্ট শস্য, ফল, শাক-সবজি এবং ওষধি থাকে, তাহলে

কসাইখানায় নিরীহ পশুদের হত্যা করার কি প্রয়োজন? মানুষের যদি খাবার জন্য যথেষ্ট পরিমাণে শস্য এবং শাক-সবজি থাকে, তাহলে তাদের পশু হত্যা করার কোন প্রয়োজন নেই। নদীর জল ক্ষেতকে উর্বর করে এবং তার ফলে আমরা আমাদের প্রয়োজনের অতিরিক্ত শস্য লাভ করি। পর্বত থেকে ধাতু এবং নদী থেকে রত্ন লাভ হয়। মানব সভ্যতায় যদি যথেষ্ট পরিমাণে শস্য, ধাতু, রত্ন, জল, দুধ ইত্যাদি থাকে, তাহলে কিছু হতভাগ্য মানুষের কঠোর পরিশ্রমের বিনিময়ে ভয়ঙ্কর যান্ত্রিক উদ্যোগগুলির কি প্রয়োজন? তবে প্রকৃতির এই দানগুলি ভগবানের করুণার উপর নির্ভরশীল। তাই আমাদের প্রকৃত প্রয়োজন হচ্ছে ভগবানের নিয়মের বাধ্য হয়ে এবং ভগবদ্ভক্তির অনুশীলন করে মানব জীবনের পূর্ণতা লাভ করা। কুন্তীদেবীর ইঙ্গিতগুলি যথাযথ। তিনি কামনা করেছেন যে ভগবানের কৃপা যেন তাঁদের উপর বর্ষিত হয় যাতে প্রাকৃতিক সমৃদ্ধি বজায় থাকে।

শ্লোক ৪১

অথ বিশ্বেশ বিশ্বাত্মন্ বিশ্বমূর্তে স্বকেষু মে।
স্নেহপাশমিমং ছিন্ধি দৃঢ়ং পাণ্ডুষু বৃষ্ণিষু ॥ ৪১ ॥

অথ—তাই; **বিশ্ব-ঈশ**—হে জগদীশ্বর; **বিশ্ব-আত্মন্**—হে সর্বান্তর্যামী; **বিশ্ব-মূর্তে**—হে বিশ্বরূপ; **স্বকেষু**—আত্মীয়-স্বজনদের; **মে**—আমার; **স্নেহ-পাশম্**—স্নেহের বন্ধন; **ইমম্**—এই; **ছিন্ধি**—ছিন্ন কর; **দৃঢ়ম্**—গভীর; **পাণ্ডুষু**—পাণ্ডবদের জন্য; **বৃষ্ণিষু**—বৃষ্ণি বা যাদবদের জন্য।

অনুবাদ

হে জগদীশ্বর, হে সর্বান্তর্যামী, হে বিশ্বরূপ, দয়া করে তুমি আমার আত্মীয়-স্বজন, পাণ্ডব এবং যাদবদের প্রতি গভীর স্নেহের বন্ধন ছিন্ন করে দাও।

তাৎপর্য

ভগবানের শুদ্ধভক্ত ভগবানের কাছে ব্যক্তিগত স্বার্থের পরিপ্রেক্ষিতে কোন কিছু চাইতে লজ্জাবোধ করেন। কিন্তু পারিবারিক স্নেহের বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার ফলে গৃহস্থদের কখনো কখনো ভগবানের কৃপা প্রার্থনা করতে হয়। কুন্তীদেবী এ বিষয়ে সচেতন ছিলেন, এবং তাই তিনি তাঁর আত্মীয়-স্বজন, পাণ্ডব এবং বৃষ্ণিদের সঙ্গে

তাঁর স্নেহের বন্ধন ছিন্ন করার জন্য ভগবানের কাছে প্রার্থনা করেছিলেন। পাণ্ডবেরা ছিলেন তাঁর নিজের পুত্র এবং বৃষ্ণিরা ছিলেন তাঁর পিতৃবংশীয়। শ্রীকৃষ্ণ উভয় পরিবারের সঙ্গেই সমভাবে সম্পর্কিত ছিলেন। উভয় পরিবারেরই ভগবানের সহায়তার প্রয়োজন ছিল, কেননা উভয় পরিবারই ছিলেন ভগবানের শরণাগত ভক্ত। কুন্তীদেবী অভিলাষ করেছিলেন যে শ্রীকৃষ্ণ তাঁর পুত্র পাণ্ডবদের সঙ্গে থাকেন, কিন্তু তাহলে তাঁর পিতৃকুল শ্রীকৃষ্ণের সান্নিধ্য লাভের সৌভাগ্য থেকে বঞ্চিত হত। এই ধরনের পক্ষপাত কুন্তীদেবীর মনকে বিচলিত করেছিল, এবং তাই তিনি স্নেহের বন্ধন ছিন্ন করার বাসনা করেছিলেন।

শুদ্ধভক্ত তাঁর পরিবারের সীমিত স্নেহের বন্ধন ছিন্ন করে সমস্ত বিস্মৃত আত্মাদের জন্য ভক্তিযোগে তাঁর সেবার পরিধি বিস্তার করেন। তার আদর্শ দৃষ্টান্ত হচ্ছেন ষড়্‌গোস্বামীগণ, যাঁরা শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর পথ অনুসরণ করেছিলেন। তাঁরা সকলেই অত্যন্ত জ্ঞানী এবং সংস্কৃতিসম্পন্ন উচ্চবর্ণের সম্ভ্রান্ত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু জনসাধারণের মঙ্গলের জন্য তাঁরা তাঁদের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যপূর্ণ গৃহ পরিত্যাগ করে ভিক্ষা বৃত্তি অবলম্বন করেছিলেন। পারিবারিক স্নেহের বন্ধন ছিন্ন করার অর্থ হচ্ছে কার্যকলাপের পরিধি বিস্তার করা। তা না করে কেউই ব্রাহ্মণ, রাজা, জননেতা অথবা ভগবদ্ভক্ত হওয়ার যোগ্যতা অর্জন করতে পারে না। একজন আদর্শ রাজারূপে পরমেশ্বর ভগবান সেই দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করেছিলেন। শ্রীরামচন্দ্র আদর্শ রাজার গুণাবলী প্রকাশ করার জন্য তাঁর প্রিয়তমা পত্নীর স্নেহের বন্ধন ছিন্ন করেছিলেন।

ব্রাহ্মণ, ভগবদ্ভক্ত, রাজা অথবা জননেতাকে কর্তব্যকর্ম সম্পাদনের জন্য অবশ্যই অত্যন্ত উদার মনোভাবাপন্ন হতে হয়। শ্রীমতী কুন্তীদেবী এই বিষয়ে সচেতন ছিলেন, এবং তাই তিনি দুর্বল হওয়ার ফলে তাঁর পারিবারিক স্নেহের বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য ভগবানের কাছে প্রার্থনা করেছিলেন। ভগবানকে এখানে *বিশ্বেশ* বা *বিশ্বাত্মন্* বলে সম্বোধন করা হয়েছে, এবং তার মাধ্যমে এটিই ইঙ্গিত করা হয়েছে যে পারিবারিক স্নেহের বন্ধনের গ্রন্থি ছিন্ন করার সমস্ত শক্তি তাঁর রয়েছে। তাই কখনো কখনো দেখা যায় যে দুর্বল ভক্তদের প্রতি তাঁর বিশেষ অনুগ্রহের ফলে তিনি তাঁর সর্বশক্তিমত্তার দ্বারা সৃষ্ট বিশেষ পরিস্থিতির চাপের মাধ্যমে তাঁদের পারিবারিক স্নেহের বন্ধন ছিন্ন করেন। সেটি করার মাধ্যমে তিনি ভক্তকে তাঁর উপর সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করতে বাধ্য করে ভগবদ্ধামে ফিরে যাওয়ার পথটি প্রশস্ত করেন।

শ্লোক ৪২

ত্বয়ি মেঽনন্যবিষয়া মতির্মধুপতেঽসকৃৎ।
রতিমুদ্বহতাদদ্ধা গঙ্গেবৌঘমুদন্বতি ॥ ৪২ ॥

ত্বয়ি—তোমাকে; **মে**—আমার; **অনন্য-বিষয়া**—একনিষ্ঠ; **মতিঃ**—মনোনিবেশ; **মধুপতে**—হে মধুপতি; **অসকৃৎ**—নিরবচ্ছিন্নভাবে; **রতিম্**—আকর্ষণ; **উদ্বহতাৎ**—প্রবাহিত হোক; **অদ্ধা**—সরাসরিভাবে; **গঙ্গা**—গঙ্গা; **ইব**—মতো; **ওঘম্**—প্রবাহিত হয়; **উদন্বতি**—সমুদ্রে।

অনুবাদ

হে মধুপতি, গঙ্গা যেমন অপ্রতিহতভাবে সমুদ্র অভিমুখে প্রবাহিত হয়, তেমনই আমার একনিষ্ঠ মতি যেন নিরন্তর তোমাতেই আকৃষ্ট হয়।

তাৎপর্য

শুদ্ধভক্তির পূর্ণতা তখনই লাভ হয় যখন সমস্ত চেতনা ভগবানের দিব্য প্রেমময়ী সেবার প্রতি একাগ্রীভূত হয়। অন্য সমস্ত স্নেহের বন্ধন ছিন্ন করার অর্থ অন্যের প্রতি স্নেহাদি সূক্ষ্ম অনুভূতিগুলির সম্পূর্ণ নিবৃত্তি নয়। সেটি কখনো সম্ভব নয়। একটি জীব, সে যেই হোক না কেন, অন্যের প্রতি তার এই স্নেহের অনুভূতি অবশ্যই থাকবে, কেননা সেটিই হচ্ছে জীবনের লক্ষণ। বাসনা, ক্রোধ, লোভ, আকর্ষণ ইত্যাদি জীবনের লক্ষণগুলিকে বিনাশ করা যায় না। কেবল তার উদ্দেশ্যের পরিবর্তন করতে হয়। বাসনা কখনো ত্যাগ করা যায় না, কিন্তু ভগবদ্ভক্তিতে এই বাসনা ইন্দ্রিয়ের তৃপ্তি-সাধনের পরিবর্তে ভগবানের সেবায় নিযুক্ত করা হয়। পরিবার, সমাজ, দেশ ইত্যাদির প্রতি তথাকথিত প্রীতি হচ্ছে ইন্দ্রিয়-তৃপ্তির বিভিন্ন অবস্থা। যখন এই বাসনা ভগবানের সন্তুষ্টি বিধানের জন্য ব্যবহার করা হয়, তখন তাকে বলা হয় ভগবদ্ভক্তি।

শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতায় আমরা দেখতে পাই যে অর্জুন তাঁর নিজের সন্তুষ্টির জন্য তাঁর ভ্রাতা এবং আত্মীয়-স্বজনদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে চাননি। কিন্তু যখন তিনি ভগবানের বাণী, অর্থাৎ *শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতা* শ্রবণ করলেন, তখন তিনি তাঁর সেই মত পরিবর্তন করেছিলেন এবং ভগবানের সেবা করেছিলেন। আর তা করার ফলে তিনি ভগবানের বিখ্যাত ভক্তে পরিণত হয়েছিলেন, যার জন্য সমস্ত শাস্ত্রে ঘোষণা করা হয়েছে যে তিনি ভগবানের সখারূপে ভগবদ্ভক্তি যাজনের মাধ্যমে পারমার্থিক

সিদ্ধিলাভ করেছিলেন। সেখানে যুদ্ধ ছিল, বন্ধুত্ব ছিল, অর্জুন ছিলেন এবং কৃষ্ণও ছিলেন, কিন্তু ভগবদ্ভক্তির ফলে অর্জুন একজন বিশিষ্ট ব্যক্তিতে পরিণত হয়েছিলেন। তাই কুন্তীদেবীর প্রার্থনাও সেই রকম কার্যকলাপ পরিবর্তনের বিষয়ে ইঙ্গিত করছে। শ্রীমতী কুন্তীদেবী ঐকান্তিকভাবে ভগবানের সেবা করতে চেয়েছিলেন, এবং সেটিই ছিল তাঁর প্রার্থনা। এই অনন্য ভক্তিই হচ্ছে জীবনের অন্তিম লক্ষ্য। আমাদের মনোযোগ সাধারণত এমন সমস্ত বিষয়ের সেবার প্রতি আকৃষ্ট হয় যা অনীশ্বরীয়, বা ভগবানের পরিকল্পনার অন্তর্গত নয়। সেই কার্যসূচী যখন ভগবানের সেবায় পরিবর্তিত হয়, অর্থাৎ ভগবানের সেবায় যুক্ত হওয়ায় যখন ইন্দ্রিয়গুলি শুদ্ধ হয় তখন তাকে বলা হয় বিশুদ্ধ অনন্য ভক্তি। শ্রীমতী কুন্তীদেবী সেই পূর্ণতা লাভ করতে চেয়েছিলেন এবং সেজন্য তিনি ভগবানের কাছে প্রার্থনা করেছিলেন।

পাণ্ডব এবং বৃষ্ণিদের প্রতি তাঁর স্নেহ ভগবদ্ভক্তি-বহির্ভূত ছিল না, কেননা ভগবানের সেবা এবং ভগবদ্ভক্তের সেবা অভিন্ন। কখনো কখনো ভক্তের সেবা ভগবানের সেবা থেকেও অধিক গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু এখানে পাণ্ডব এবং বৃষ্ণিদের প্রতি কুন্তীদেবীর স্নেহ ছিল পারিবারিক সম্পর্কের কারণে। জড় সম্পর্কজনিত এই স্নেহের বন্ধন হচ্ছে মায়ার সম্পর্ক, কেননা দেহ অথবা মনের সম্পর্ক বহিরঙ্গা শক্তির প্রভাব থেকে উদ্ভূত। পরমেশ্বর ভগবানের সঙ্গে সম্পর্কের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত আত্মার যে সম্পর্ক তা হচ্ছে প্রকৃত সম্পর্ক। কুন্তীদেবী যখন তাঁর পারিবারিক বন্ধন ছিন্ন করতে চেয়েছিলেন, তিনি তখন দেহের সম্পর্কে আত্মীয়তার যে বন্ধন, সেই বন্ধন ছিন্ন করতে চেয়েছিলেন। দেহের সম্পর্ক জড় বন্ধনের কারণ, কিন্তু আত্মার ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত সম্পর্ক হচ্ছে মুক্তির কারণ। আত্মার সঙ্গে আত্মার সম্পর্কের প্রতিষ্ঠা হয় পরমাত্মার মাধ্যমে। অন্ধকারের মধ্যে যে দর্শন, তা দর্শন নয়। কিন্তু সূর্যের আলোকে যখন দর্শন হয়, তখন সূর্যকে এবং সেই সঙ্গে অন্য সবকিছুই দেখা যায়, যা অন্ধকারে দেখা যায়নি। সেটিই হচ্ছে ভক্তিযোগের পন্থা।

শ্লোক ৪৩

শ্রীকৃষ্ণ কৃষ্ণসখ বৃষ্ণ্যৃষভাবনিধ্রুগ্
রাজন্যবংশদহনানপবর্গবীর্য।
গোবিন্দ গোদ্বিজসুরার্তিহরাবতার
যোগেশ্বরাখিলগুরো ভগবন্নমস্তে ॥ ৪৩ ॥

শ্রীকৃষ্ণ—হে শ্রীকৃষ্ণ; কৃষ্ণ-সখ—হে অর্জুনের সখা; বৃষ্ণি—বৃষ্ণিকুলের; ঋষভ—হে শ্রেষ্ঠ; অবনী—পৃথিবী; ধ্রুক্—বিদ্রোহী; রাজন্য-বংশ—রাজবংশ; দহন—হে সংহারক; অনপবর্গ—ক্ষয়হীন; বীর্য—বল; গোবিন্দ—হে গোলোকপতি; গো—গাভী; দ্বিজ—ব্রাহ্মণ; সুর—দেবতা; আর্তি-হর—দুঃখ বিনাশকারী; অবতার—হে অবতরণকারী; যোগ-ঈশ্বর—সমস্ত যোগের ঈশ্বর; অখিল—সমগ্র জগতের; গুরো—হে গুরু; ভগবন্—হে সমগ্র ঐশ্বর্যের ঈশ্বর; নমঃ তে—তোমাকে আমার সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি।

অনুবাদ

হে শ্রীকৃষ্ণ, হে অর্জুনের সখা, হে বৃষ্ণিকুলশ্রেষ্ঠ, পৃথিবীতে উৎপাতকারী রাজন্যবর্গের তুমি বিনাশকারী। তুমি অক্ষয় বীর্য, তুমি গোলোকাধিপতি। গাভী, ব্রাহ্মণ এবং ভক্তদের দুঃখ দূর করার জন্য তুমি অবতরণ কর। তুমি যোগেশ্বর, জগদ্গুরু, সর্বশক্তিমান ভগবান, এবং তোমাকে আমি বারবার সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি।

তাৎপর্য

এখানে শ্রীমতী কুন্তীদেবী পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের প্রকৃত পরিচয় সংক্ষেপে প্রদান করেছেন। সর্বশক্তিমান ভগবানের নিত্য চিন্ময় ধাম রয়েছে, যেখানে তিনি সুরভি গাভীদের পালন করেন। সেখানে শত-সহস্র লক্ষ্মীদেবী তাঁর সেবা করেন। সেখান থেকে তিনি এই জড় জগতে অবতরণ করেন তাঁর ভক্তদের উদ্ধার করার জন্য এবং উপদ্রবকারী রাজনৈতিক গোষ্ঠীগুলি ও যারা শাসন করার নামে জনসাধারণকে শোষণ করে সেইসব রাজাদের বিনাশ করার জন্য। তিনি তাঁর অনন্ত শক্তির প্রভাবে সৃষ্টি, পালন এবং বিনাশ কার্য সাধন করেন, এবং তা সত্ত্বেও তিনি সর্বদা পূর্ণশক্তিমান এবং তাঁর শক্তির কখনো ক্ষয় হয় না। গাভী, ব্রাহ্মণ এবং তাঁর ভক্তেরা তাঁর বিশেষ মনোযোগের বিষয়, কেননা জীবের সর্বাঙ্গীণ মঙ্গল সাধনের জন্য তারা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

শ্লোক ৪৪

সূত উবাচ

পৃথয়েত্থং কলপদৈঃ পরিণূতাখিলোদয়ঃ ।
মন্দং জহাস বৈকুণ্ঠো মোহয়ন্নিব মায়য়া ॥ ৪৪ ॥

সূতঃ উবাচ—শ্রীসূত গোস্বামী বললেন; পৃথয়া—পৃথা (কুন্তী) কর্তৃক; ইত্থম্—এই; কলপদৈঃ—সুনির্বাচিত শব্দমালার দ্বারা; পরিণূত—পূজিত হয়ে; অখিল—সমগ্র জগতের; উদয়ঃ—মহিমা; মন্দম্—মৃদুভাবে; জহাস—হেসে; বৈকুণ্ঠঃ—ভগবান; মোহয়ন্—মোহিত করে; ইব—মতো; মায়য়া—মায়াশক্তির প্রভাবে।

অনুবাদ

শ্রীসূত গোস্বামী বললেন, পরমেশ্বর ভগবান তাঁর মহিমা কীর্তনের উদ্দেশ্যে সুনির্বাচিত শব্দমালার দ্বারা রচিত কুন্তীদেবীর প্রার্থনা এইভাবে শ্রবণ করে মৃদু হাসলেন। সেই হাসি তাঁর যোগশক্তির মতোই ছিল মনোমুগ্ধকর।

তাৎপর্য

এই জগতে যা কিছু আকর্ষণীয় বা মনোমুগ্ধকর, তা ভগবানের অভিব্যক্তি বলে কথিত হয়ে থাকে। যে সমস্ত বদ্ধ জীব জড় জগতের উপর আধিপত্য বিস্তারের চেষ্টায় ব্যস্ত, তারাও তাঁর যোগশক্তির প্রভাবে বিমোহিত হয়। কিন্তু তাঁর ভক্তেরা ভিন্নভাবে তাঁর মহিমার দ্বারা মোহিত হন, এবং তাঁর কৃপাপূর্ণ আশীর্বাদ তাঁদের উপর বর্ষিত হয়। বিদ্যুৎশক্তি যেমন বিভিন্নভাবে কার্য করে, তেমনই তাঁর শক্তিও বিভিন্নভাবে প্রদর্শিত হয়। কুন্তীদেবী ভগবানের কাছে প্রার্থনা করেছেন যেন তিনি তাঁর মহিমা আংশিকভাবেও ব্যক্ত করতে পারেন। তাঁর সমস্ত ভক্তরা এইভাবে সুনির্বাচিত শব্দের দ্বারা মহিমা কীর্তনের মাধ্যমে তাঁর আরাধনা করেন, এবং তাই তিনি উত্তমশ্লোক নামে খ্যাত। যতই সুনির্বাচিত শব্দের দ্বারা তাঁর মহিমা কীর্তন করা হোক না কেন, তা যথাযথভাবে তাঁর গুণকীর্তনের জন্য যথেষ্ট নয়। তথাপি, শিশুপুত্রের আধোবুলি শ্রবণ করে পিতা যেমন সন্তুষ্ট হন, ভগবানও তেমন এই ধরনের প্রার্থনায় প্রসন্ন হন। *মায়া* শব্দটি মোহ এবং কৃপা দুটি অর্থেই ব্যবহৃত হয়ে থাকে। এখানে *মায়া* শব্দটি কুন্তীদেবীর প্রতি ভগবানের কৃপার অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

শ্লোক ৪৫

তাং বাঢ়মিত্যুপামন্ত্র্য প্রবিশ্য গজসাহ্বয়ম্।
স্ত্রিয়শ্চ স্বপুরং যাস্যন্ প্রেম্ণা রাজ্ঞা নিবারিতঃ ॥ ৪৫ ॥

তাম্—সেই সমস্ত; বাঢ়ম্—গ্রহণ করে; ইতি—এইভাবে; উপামন্ত্র্য—পরে জানালেন; প্রবিশ্য—প্রবেশ করে; গজসাহ্বয়ম্—হস্তিনাপুরের প্রাসাদ; স্ত্রিয়ঃ চ—অন্য

মহিলাদের; স্ব-পুরম্—নিজ আবাসস্থলে; যাস্যন্—গমনোদ্যত হলে; প্রেম্ণা—প্রেম ভরে; রাজ্ঞা—রাজা কর্তৃক; নিবারিতঃ—নিবারণ করলেন।

অনুবাদ

শ্রীমতী কুন্তীদেবীর প্রার্থনা এইভাবে গ্রহণ করে পরমেশ্বর ভগবান পরে হস্তিনাপুরের প্রাসাদে প্রবেশপূর্বক অন্যান্য মহিলাদের তাঁর বিদায়ের কথা জানালেন। কিন্তু তিনি গমনোদ্যত হলে মহারাজ যুধিষ্ঠির তাঁকে প্রেমভরে অনুনয় করে নিবারণ করলেন।

তাৎপর্য

শ্রীকৃষ্ণ যখন দ্বারকায় ফিরে যেতে মনস্থ করেছিলেন তখন তাঁকে হস্তিনাপুরে থাকতে বাধ্য করা কারও পক্ষে সম্ভব ছিল না, কিন্তু আরও কয়েকদিন সেখানে থাকার জন্য মহারাজ যুধিষ্ঠিরের সরল অনুরোধ তৎক্ষণাৎ কার্যকরী হয়েছিল। এর থেকে বোঝা যায় যে প্রেমপূর্ণ স্নেহই ছিল মহারাজ যুধিষ্ঠিরের শক্তি, যা ভগবান উপেক্ষা করতে পারেননি। এইভাবে সর্বশক্তিমান ভগবান কেবল প্রেমময়ী সেবার দ্বারাই জিত হন, অন্য কোন উপায়ে নয়। তিনি তাঁর সমস্ত কার্যকলাপে সম্পূর্ণরূপে স্বতন্ত্র, কিন্তু তাঁর শুদ্ধ ভক্তের প্রেম পূর্ণ স্নেহের বশবর্তী হয়ে তিনি স্বেচ্ছায় বশ্যতা স্বীকার করেন।

শ্লোক ৪৬

ব্যাসাদ্যৈরীশ্বরেহাজ্ঞৈঃ কৃষ্ণেনাদ্ভুতকর্মণা।
প্রবোধিতোঽপীতিহাসৈর্নাবুধ্যত শুচার্পিতঃ ॥ ৪৬ ॥

ব্যাস-আদ্যৈঃ—ব্যাসদেব প্রমুখ মহর্ষিদের দ্বারা; ঈশ্বর—সর্বশক্তিমান ভগবান; ঈহা—ইচ্ছার দ্বারা; অজ্ঞৈঃ—বিজ্ঞদের দ্বারা; কৃষ্ণেন—স্বয়ং কৃষ্ণের দ্বারা; অদ্ভুত কর্মণা—অলৌকিক কার্য সাধনকারী ব্যক্তি; প্রবোধিতঃ—সান্ত্বনা দান করে; অপি—যদিও; ইতিহাসৈঃ—ঐতিহাসিক প্রমাণাদির দ্বারা; ন—না; অবুধ্যত—তৃপ্ত; শুচা অর্পিতঃ—শোকাভিভূত।

অনুবাদ

ব্যাসদেব প্রমুখ মহর্ষিগণ এবং অদ্ভুতকর্মা স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ ইতিহাস আদি শাস্ত্রসমূহের প্রমাণ উল্লেখপূর্বক উপদেশ দেওয়া সত্ত্বেও শোকসন্তপ্ত মহারাজ যুধিষ্ঠির শান্তি পেলেন না।

তাৎপর্য

কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে যে অসংখ্য গণহত্যা হয়েছিল সেজন্য পুণ্যাত্মা মহারাজ যুধিষ্ঠির ব্যথাতুর ছিলেন, বিশেষ করে যেহেতু তাঁরই জন্য তা হয়েছিল। দুর্যোধন রাজসিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিল এবং সে ভালভাবেই রাজ্যশাসন করছিল, সুতরাং একদিক দিয়ে বিচার করতে গেলে যুদ্ধ করার কোন প্রয়োজন ছিল না। কিন্তু ন্যায়ের বিচারে যুধিষ্ঠির ছিলেন রাজসিংহাসনের অধিকারী। সেই বিষয়টিই কেন্দ্র করে সমস্ত রাজনৈতিক দলাদলির সৃষ্টি হয়েছিল, এবং সারা পৃথিবীর সমস্ত রাজারা এবং অধিবাসীরা প্রতিদ্বন্দ্বী ভ্রাতাদের সেই যুদ্ধে জড়িয়ে পড়েছিল। ভগবান শ্রীকৃষ্ণও সেখানে ছিলেন মহারাজ যুধিষ্ঠিরের পক্ষ অবলম্বন করে। মহাভারতের আদি পর্বে (২০) উল্লেখ করা হয়েছে যে আঠারো দিন ব্যাপী সেই কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে ৬৪০,০০০,০০০ মানুষ নিহত হয়েছিল, এবং এছাড়া আরও লক্ষ লক্ষ মানুষ নিখোঁজ হয়েছিল। প্রকৃতপক্ষে বিগত পাঁচ হাজার বছরে এটিই হচ্ছে পৃথিবীর সবচাইতে বড় যুদ্ধ।

শুধুমাত্র মহারাজ যুধিষ্ঠিরকে সিংহাসনে অধিষ্ঠিত করার জন্যই এই গণহত্যা তাঁর কাছে অত্যন্ত বেদনাদায়ক ছিল, তাই তিনি ব্যাসদেবের মতো মহর্ষিদের কাছ থেকে এবং স্বয়ং ভগবানের কাছ থেকে ঐতিহাসিক প্রমাণের ভিত্তিতে সেই যুদ্ধ যে ন্যায়সঙ্গত ছিল সে বিষয়ে নিশ্চিত হতে চেয়েছিলেন। কিন্তু সেই সময়ের সর্বশ্রেষ্ঠ মহাত্মাদের দ্বারা উপদিষ্ট হওয়া সত্ত্বেও মহারাজ যুধিষ্ঠির সন্তুষ্ট হতে পারেননি। এখানে শ্রীকৃষ্ণকে অদ্ভুতকর্মা বলে বর্ণনা করা হয়েছে, কিন্তু এই বিশেষ বিষয়ে তিনি এবং ব্যাসদেব উভয়েই মহারাজ যুধিষ্ঠিরকে আশ্বস্ত করতে পারেননি। তার অর্থ কি এই যে শ্রীকৃষ্ণ অদ্ভুতকর্মা নন? না, অবশ্যই নয়। তার অর্থ হচ্ছে যে পরমেশ্বর রূপে অথবা মহারাজ যুধিষ্ঠির এবং ব্যাসদেব উভয়েরই হৃদয়ে বিরাজমান পরমাত্মারূপে ভগবান তার থেকেও অদ্ভুত কর্ম সম্পাদন করেছিলেন, কেননা সেটিই ছিল ভগবানের ইচ্ছা। মহারাজ যুধিষ্ঠিরের পরমাত্মারূপে তিনি তাঁকে ব্যাসদেব এবং অন্যান্যদের এমন কি তাঁর নিজের বাণীর দ্বারাও আশ্বস্ত হতে দেননি, কেননা তিনি চেয়েছিলেন যে মহারাজ যুধিষ্ঠির যেন তাঁর আর এক মহান ভক্ত মৃত্যু পথযাত্রী ভীষ্মদেবের উপদেশ শ্রবণ করেন। ভগবান চেয়েছিলেন যে জড় জগতে তাঁর অস্তিত্বের অন্তিম মুহূর্তে মহান যোদ্ধা ভীষ্মদেব যেন স্বয়ং তাঁকে এবং বর্তমানে রাজসিংহাসনে অধিষ্ঠিত মহারাজ যুধিষ্ঠির আদি তাঁর পৌত্রদের দর্শন করে অত্যন্ত শান্তিপূর্ণভাবে দেহত্যাগ করতে পারেন। তাঁর প্রিয় পিতৃহীন পৌত্র পাণ্ডবদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার কোন ইচ্ছা ভীষ্মদেবের ছিল না। কিন্তু ক্ষত্রিয়েরা হচ্ছেন অত্যন্ত

ন্যায়-পরায়ণ, এবং তাই তিনি দুর্যোধনের পক্ষ অবলম্বন করতে বাধ্য হয়েছিলেন, কেননা তিনি দুর্যোধনের অর্থে প্রতিপালিত হচ্ছিলেন। তাছাড়া ভগবান এটিও চেয়েছিলেন যে মহারাজ যুধিষ্ঠির ভীষ্মদেবের বাণীর দ্বারা সান্ত্বনা লাভ করুন, যার ফলে সমস্ত জগৎ দেখতে পাবে যে ভীষ্মদেবের জ্ঞান অন্য সকলের জ্ঞানকে অতিক্রম করেছিল, এমন কি পরমেশ্বর ভগবানেরও।

শ্লোক ৪৭

আহ রাজা ধর্মসুতশ্চিন্তয়ন্ সুহৃদাং বধম্।
প্রাকৃতেনাত্মনা বিপ্রাঃ স্নেহমোহবশং গতঃ ॥ ৪৭ ॥

আহ—বললেন; **রাজা**—মহারাজ যুধিষ্ঠির; **ধর্মসুতঃ**—ধর্ম (যমরাজ) পুত্র; **চিন্তয়ন্**—চিন্তা করে; **সুহৃদাম্**—আত্মীয় ও বন্ধুদের; **বধম্**—হত্যা করে; **প্রাকৃতেন**—কেবল জড় ধারণার দ্বারাই; **আত্মনা**—নিজের দ্বারা; **বিপ্রাঃ**—হে ব্রাহ্মণগণ; **স্নেহ**—স্নেহ; **মোহ**—মোহ; **বশম্**—বশীভূত হয়ে; **গতঃ**—গিয়ে।

অনুবাদ

হে মুনিগণ, ধর্মপুত্র মহারাজ যুধিষ্ঠির তাঁর আত্মীয় ও বন্ধুবর্গের মৃত্যুতে সাধারণ জাগতিক মানুষের মতো শোকাভিভূত হয়েছিলেন, এবং এইভাবে স্নেহ ও মোহের বশীভূত হয়ে তিনি বলতে লাগলেন।

তাৎপর্য

যদিও মহারাজ যুধিষ্ঠির যে একজন সাধারণ মানুষের মতো শোকাভিভূত হবেন এটি আশা করা যায়নি, তথাপি ভগবানের ইচ্ছায় তিনি জাগতিক স্নেহের বশে মোহাচ্ছন্ন হয়েছিলেন (ঠিক যেমন অর্জুনকে আপাতভাবে মোহাচ্ছন্ন বলে মনে হয়েছিল)। দৃষ্টিশক্তিসম্পন্ন মানুষ ভালভাবেই জানেন যে জীব তার দেহ অথবা মন নয়, পক্ষান্তরে সে জড়াতীত। সাধারণ মানুষ শরীরের ভিত্তিতে হিংসা এবং অহিংসার বিচার করে, কিন্তু সেটি হচ্ছে এক প্রকার মোহ। প্রতিটি ব্যক্তি তার বৃত্তি অনুসারে কর্তব্যের বন্ধনে আবদ্ধ। ক্ষত্রিয়ের কর্তব্য হচ্ছে ন্যায্য কারণে যুদ্ধ করা, তা বিরোধী পক্ষ যেই হোক না কেন। এই প্রকার কর্তব্য সম্পাদনে আত্মার বাহ্যিক বসন স্বরূপ জড় দেহের বিনাশে তাদের বিচলিত হওয়া উচিত নয়। মহারাজ যুধিষ্ঠির এই সমস্ত বিষয়ে পূর্ণরূপে অবগত ছিলেন, কিন্তু ভগবানের ইচ্ছায় তিনি একজন সাধারণ

মানুষের মতো মোহগ্রস্ত হয়েছিলেন। তার পিছনে ভগবানের একটি বিশেষ উদ্দেশ্য ছিল : অর্জুনকে যেমন তিনি উপদেশ দিয়েছিলেন, তেমনই ভীষ্মদেবের দ্বারা তিনি মহারাজ যুধিষ্ঠিরকে উপদেশ দেওয়ার আয়োজন করেছিলেন।

শ্লোক ৪৮

অহো মে পশ্যতাজ্ঞানং হৃদিরূঢ়ং দুরাত্মনঃ ।
পারক্যস্যৈব দেহস্য বহ্ব্যো মেঽক্ষৌহিণীর্হতাঃ ॥ ৪৮ ॥

অহো—হায়; **মে**—আমার; **পশ্যত**—দেখ; **অজ্ঞানম্**—অজ্ঞানতা; **হৃদি**—হৃদয়ে; **রূঢ়ম্**—স্থিত; **দুরাত্মনঃ**—পাপিষ্ঠদের; **পারক্যস্য**—অন্যদের জন্য; **এব**—অবশ্যই; **দেহস্য**—দেহের; **বহ্ব্যঃ**—বহু বহু; **মে**—আমার দ্বারা; **অক্ষৌহিণীঃ**—অক্ষৌহিণী সেনাবাহিনী; **হতাঃ**—নিহত হয়েছে।

অনুবাদ

মহারাজ যুধিষ্ঠির বললেন, হায়! আমি অত্যন্ত পাপিষ্ঠ! আমার হৃদয় গভীর অজ্ঞানতায় আচ্ছন্ন! এই দেহ, যা অবশেষে অন্যদের ভক্ষ্য, তারই জন্য আমি বহু বহু অক্ষৌহিণী সেনা বধ করেছি।

তাৎপর্য

২১, ৮৭০টি রথ, ২১,৮৭০টি হস্তী, ১০৯,৩৫০টি পদাতিক এবং ৬৫,৬০০টি অশ্বারোহী সৈনিকদের নিয়ে একটি অক্ষৌহিণী হয়। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে বহু অক্ষৌহিণীর বিনাশ হয়েছিল। পৃথিবীর সবচাইতে পুণ্যবান রাজা মহারাজ যুধিষ্ঠির এই অসংখ্য জীবের হত্যার জন্য নিজেকে দায়ী বলে মনে করেছিলেন, কেননা সেই যুদ্ধ হয়েছিল তাঁকে রাজসিংহাসনে অধিষ্ঠিত করার জন্য। এই শরীরটি প্রকৃতপক্ষে অন্যের উপকারের জন্য। এই শরীরে যতক্ষণ প্রাণ থাকে, ততক্ষণ তার উদ্দেশ্য হচ্ছে পরোপকার করা; আর যখন তার মৃত্যু হয় তখন এই শরীরটি কুকুর, শৃগালের ভক্ষ্য হয়। এই অনিত্য শরীরের জন্য এই বিরাট হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হয়েছিল বলে তিনি বিষাদগ্রস্ত হয়েছিলেন।

শ্লোক ৪৯

বালদ্বিজসুহৃন্মিত্রপিতৃভ্রাতৃগুরুদ্রুহঃ ।
ন মে স্যান্নিরয়ান্মোক্ষো হ্যপি বর্ষাযুতাযুতৈঃ ॥ ৪৯ ॥

বাল—বালকেরা; দ্বিজ—ব্রাহ্মণ; সুহৃৎ—শুভাকাঙ্ক্ষী; মিত্র—বন্ধুগণ; পিতৃ—পিতৃতুল্য; ভ্রাতৃ—ভ্রাতাগণ; গুরু—গুরুজন; দ্রুহঃ—হত্যাকারী; ন—কখনই নয়; মে—আমার; স্যাৎ—হবে; নিরয়াৎ—নরক থেকে; মোক্ষঃ—মুক্তি; হি—অবশ্যই; অপি—যদিও; বর্ষ—বৎসর; অযুত-অযুতৈঃ—লক্ষ লক্ষ।

অনুবাদ

আমি বহু বালক, ব্রাহ্মণ, সুহৃদ, সখা, পিতৃব্য, গুরুজন এবং ভ্রাতাদের বধ করেছি। তাই এই সমস্ত পাপের ফলে আমার জন্য যে নরক বাস আসন্ন, লক্ষ লক্ষ বছর জীবিত থাকলেও তা থেকে আমার মুক্তি হবে না।

তাৎপর্য

যখনই কোন যুদ্ধ হয় তখন বালক, ব্রাহ্মণ এবং স্ত্রীলোকদের মতো বহু নিরীহ জীবের মৃত্যু হয়, যাদের হত্যা মহাপাপ বলে বিবেচনা করা হয়। তাঁরা সকলেই নিরীহ প্রাণী, এবং শাস্ত্রে সর্ব অবস্থাতেই তাঁদের হত্যা করতে নিষেধ করা হয়েছে। মহারাজ যুধিষ্ঠির এই গণহত্যা সম্বন্ধে অবগত ছিলেন। আর তা ছাড়া সেই যুদ্ধে উভয় পক্ষেই বহু বন্ধু, গুরুজন এবং আত্মীয়-স্বজন ছিলেন, এবং তাঁরা সকলেই নিহত হয়েছিলেন। তাঁর কাছে এইভাবে হত্যা করার কথা চিন্তা করাও ছিল ভয়ঙ্কর এবং তাই তিনি মনে করেছিলেন যে তাঁকে কোটি কোটি বছর নরকে থাকতে হবে।

শ্লোক ৫০

নৈনো রাজ্ঞঃ প্রজাভর্তুর্ধর্মযুদ্ধে বধো দ্বিষাম্ ।
ইতি মে ন তু বোধায় কল্পতে শাসনং বচঃ ॥ ৫০ ॥

ন—না; এনঃ—পাপ; রাজ্ঞঃ—রাজার; প্রজা-ভর্তুঃ—প্রজাপালক; ধর্মঃ—ন্যায়-সঙ্গত; যুদ্ধে—সমরে; বধঃ—হত্যা; দ্বিষাম্—শত্রুদের; ইতি—এই সমস্ত; মে—আমাকে; ন—না; তু—কিন্তু; বোধায়—সান্ত্বনার নিমিত্ত; কল্পতে—পরিচালনার জন্য; শাসনম্—নির্দেশ; বচঃ—বাণী।

অনুবাদ

ন্যায়সঙ্গত কারণে প্রজাপালক রাজা শত্রু বধ করলে কোন পাপ হয় না। কিন্তু শাস্ত্রের এই সমস্ত অনুশাসন আমার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়।

তাৎপর্য

মহারাজ যুধিষ্ঠির মনে করেছিলেন যে রাজ্যশাসনের ব্যাপারে তিনি প্রকৃতপক্ষে যুক্ত ছিলেন না; দুর্যোধন সেই কার্য ভালভাবেই সম্পাদন করছিল এবং প্রজারা সুখেই ছিল, কিন্তু তাঁর ব্যক্তিগত লাভের জন্য দুর্যোধনের হাত থেকে রাজ্য ছিনিয়ে নিতে গিয়ে এতগুলি প্রাণীর হত্যা সংঘটিত হয়েছিল। শাসনকার্যের উদ্দেশ্যে এই হত্যাকাণ্ড সম্পাদিত হয়নি, পক্ষান্তরে নিজের অধিকার বৃদ্ধি করার উদ্দেশ্যে তা হয়েছিল, এবং তাই তিনি নিজেকে এই সমস্ত পাপের জন্য দায়ী বলে মনে করেছিলেন।

শ্লোক ৫১

স্ত্রীণাং মদ্ধতবন্ধূনাং দ্রোহো যোহসাবিহোত্থিতঃ।
কর্মভির্গৃহমেধীয়ৈর্নাহং কল্পো ব্যপহিতুম্ ॥ ৫১ ॥

স্ত্রীণাম্—স্ত্রীলোকদের; **মৎ**—আমার দ্বারা; **হত-বন্ধূনাম্**—নিহত বন্ধুদের; **দ্রোহঃ**—শত্রুতা; **যঃ**—যা; **অসৌ**—এই সমস্ত; **ইহ**—এর সঙ্গে; **উত্থিতঃ**—উদ্ভূত; **কর্মভিঃ**—কর্মের দ্বারা; **গৃহমেধীয়ৈঃ**—জড় উন্নতি সাধনে মগ্ন ব্যক্তিদের দ্বারা; **ন**—না; **অহম্**—আমি; **কল্পঃ**—প্রত্যাশা; **ব্যপহিতুম্**—অপনোদন করা।

অনুবাদ

আমি স্ত্রীলোকেদের বহু পতি ও বান্ধবকে বধ করেছি, এবং এইভাবে আমি এতই শত্রুতার সৃষ্টি করেছি যে জড়জাগতিক কল্যাণ সাধনের দ্বারা তা অপনোদন করা সম্ভব নয়।

তাৎপর্য

গৃহমেধী হচ্ছে তারা যারা কেবল জড়জাগতিক উন্নতির জন্য সৎ কর্ম করে। এই প্রকার জড়জাগতিক উন্নতি কখনো কখনো জাগতিক কর্তব্যকর্ম সম্পাদনের সময় অনিচ্ছাকৃতভাবে ঘটে যাওয়া পাপকর্মের ফলে ব্যাহত হয়। এই প্রকার পাপের ফল থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য বেদে বিভিন্ন প্রকার যজ্ঞ অনুষ্ঠান করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। বেদে বলা হয়েছে যে অশ্বমেধ-যজ্ঞ অনুষ্ঠানের ফলে ব্রহ্মহত্যার পাপ থেকেও মুক্ত হওয়া যায়।

যুধিষ্ঠির মহারাজ এই অশ্বমেধ-যজ্ঞ অনুষ্ঠান করেছিলেন। কিন্তু তিনি মনে করেছিলেন যে এই প্রকার যজ্ঞ অনুষ্ঠান করা সত্ত্বেও তাঁর পক্ষে এই মহাপাপ থেকে মুক্ত হওয়া সম্ভব নয়। যুদ্ধে স্ত্রীলোকের পতি, ভ্রাতা, এমনকি কখনো কখনো পিতা এবং পুত্রও অংশগ্রহণ করতে যান। তাদের যখন মৃত্যু হয় তখন নতুন শত্রুতার সৃষ্টি হয়, এবং তার ফলে ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার চক্র বৃদ্ধি পায় যা সহস্র অশ্বমেধ-যজ্ঞ অনুষ্ঠান করার ফলেও নিবারণ করা যায় না।

কর্ম এমনই; একটি কর্ম একই সঙ্গে ক্রিয়া এবং তার প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে কর্মের অনুষ্ঠানকারীকে জড় জগতের বন্ধনে আবদ্ধ করে। *শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতায়* (৯/২৭-২৮) তাঁর নিবৃত্তির উপায় সম্বন্ধে বলা হয়েছে যে, এই কর্ম যখন পরমেশ্বর ভগবানের জন্য সম্পাদিত হয়, তখনই কেবল কর্ম ও কর্মফলের এই পন্থা রোধ করা যায়। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধটি প্রকৃতপক্ষে ঘটেছিল পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের ইচ্ছায়, এটি তাঁর নিজের উক্তি থেকে প্রমাণিত হয়, এবং তাঁর ইচ্ছার প্রভাবেই কেবল যুধিষ্ঠির মহারাজ হস্তিনাপুরের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হয়েছিলেন। তাই প্রকৃতপক্ষে পাণ্ডবদের কোন পাপই স্পর্শ করতে পারেনি, যাঁরা ছিলেন কেবল ভগবানের আজ্ঞা পালনকারী। যারা নিজেদের ব্যক্তিগত স্বার্থের জন্য যুদ্ধ ঘোষণা করে, তাদেরই সেই যুদ্ধের সমস্ত দায়িত্ব বহন করতে হয়।

শ্লোক ৫২

যথা পঙ্কেন পঙ্কাম্ভঃ সুরয়া বা সুরাকৃতম্ ।
ভূতহত্যাং তথৈবৈকাং ন যজ্ঞৈর্মার্ষ্টুমর্হতি ॥ ৫২ ॥

যথা—যেমন; **পঙ্কেন**—কর্দমের দ্বারা; **পঙ্ক-অম্ভঃ**—পঙ্কিল জল; **সুরয়া**—সুরার দ্বারা; **বা**—অথবা; **সুরাকৃতম্**—সুরা স্পর্শজনিত অপবিত্রতা; **ভূতহত্যাম্**—প্রাণী বধ; **তথা**—তেমন; **এব**—অবশ্যই; **একাম্**—এক; **ন**—না; **যজ্ঞৈঃ**—যজ্ঞ অনুষ্ঠানের দ্বারা; **মার্ষ্টুম্**—রোধ করা; **অর্হতি**—সম্ভব।

অনুবাদ

কর্দমের দ্বারা যেমন কর্দমাক্ত জল পরিশ্রুত করা যায় না অথবা সুরার দ্বারা যেমন সুরা-কলঙ্কিত পাত্র পবিত্র করা যায় না, তেমনই যজ্ঞে পশুবধ করে নরহত্যাজনিত পাপও রোধ করা যায় না।

তাৎপর্য

অশ্বমেধ-যজ্ঞ বা গোমেধ-যজ্ঞ অবশ্যই পশুবধের জন্য অনুষ্ঠান করা হত না। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু বলেছেন যে যজ্ঞবেদীতে সেই পশুবলির ফলে পশুদের নতুন জীবন দান করা হত। বৈদিক মন্ত্রের অভীষ্ট ফল প্রদানের ক্ষমতা প্রমাণ করার জন্যই কেবল তা করা হত। যথাযথভাবে বৈদিক মন্ত্র উচ্চারণ করার ফলে অনুষ্ঠানকারী নিশ্চিতভাবে পাপের ফল থেকে মুক্ত হন, কিন্তু কোন অক্ষম ব্যক্তি অনুপযুক্ত বিধিতে এই যজ্ঞ অনুষ্ঠান করলে তাকে অবশ্যই পশুহত্যার জন্য দায়ী হতে হয়। কলহ এবং কপটতার এই যুগে এই প্রকার যজ্ঞ অনুষ্ঠান করার মতো সুদক্ষ কোন ব্রাহ্মণ না থাকায় এই সমস্ত যজ্ঞ অনুষ্ঠান করা সম্ভব নয়। মহারাজ যুধিষ্ঠির তাই কলিযুগের যজ্ঞ অনুষ্ঠানের ইঙ্গিত দিয়েছেন। কলিযুগের একমাত্র যজ্ঞ হচ্ছে ভগবান শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু কর্তৃক প্রবর্তিত হরিনাম-যজ্ঞ। কিন্তু তা বলে পশুহত্যা করে সেই পাপ থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য হরিনাম-যজ্ঞ অনুষ্ঠান করা উচিত নয়। যাঁরা ভগবানের ভক্ত, তাঁরা কখনো নিজেদের স্বার্থে পশুহত্যা করেন না এবং ক্ষত্রিয়ের কর্তব্য সম্পাদনেও তাঁরা অবহেলা করেন না (যে আদেশ ভগবান অর্জুনকে দিয়েছেন)। তাই ভগবানের ইচ্ছা অনুসারে যখন সব কিছু সম্পাদন করা হয়, তখন সমস্ত উদ্দেশ্যই সাধিত হয়। সেটি কেবল ভক্তদের পক্ষেই সম্ভব।

ইতি *"কুন্তীদেবীর প্রার্থনা এবং পরীক্ষিতের প্রাণরক্ষা"* নামক শ্রীমদ্ভাগবতের প্রথম স্কন্ধের অষ্টম অধ্যায়ের ভক্তিবেদান্ত তাৎপর্য।

ভগবান শ্রীকৃষ্ণের উপস্থিতিতে ভীষ্মদেবের প্রয়াণ

শ্লোক ১

সূত উবাচ

ইতি ভীতঃ প্রজাদ্রোহাৎ সর্বধর্মবিবিৎসয়া।
তততো বিনশনং প্রাগাদ্ যত্র দেবব্রতোঽপতৎ ॥ ১ ॥

সূতঃ উবাচ—শ্রীসূত গোস্বামী বললেন; ইতি—এইভাবে; ভীতঃ—ভীত হয়ে; প্রজা-দ্রোহাৎ—প্রজা হত্যা করার জন্য; সর্ব—সব; ধর্ম—ধর্ম; বিবিৎসয়া—জানার জন্য; ততঃ—তারপর; বিনশনম্—যেখানে যুদ্ধ হয়েছিল; প্রাগাৎ—তিনি গেলেন; যত্র—যেখানে; দেবব্রতঃ—ভীষ্মদেব; অপতৎ—প্রয়াণের জন্য শয্যাশায়ী ছিলেন।

অনুবাদ

শ্রীসূত গোস্বামী বললেন, কুরুক্ষেত্রের রণাঙ্গনে বহু প্রজা হত্যা করার জন্য ভীত হয়ে যুধিষ্ঠির মহারাজ অতঃপর ধর্মতত্ত্ব জানার জন্য সেই যুদ্ধক্ষেত্রে গমন করলেন। সেখানে ভীষ্মদেব শরশয্যায় শায়িত হয়ে মৃত্যুর প্রতীক্ষা করছিলেন।

তাৎপর্য

এই নবম অধ্যায়ে, ভগবান শ্রীকৃষ্ণের ইচ্ছা অনুসারে ভীষ্মদেব মহারাজ যুধিষ্ঠিরকে ধর্ম পালন সম্বন্ধে উপদেশ দেবেন। এই মর্তলোক থেকে তাঁর প্রয়াণের সময় ভীষ্মদেব পরমেশ্বর ভগবানের উদ্দেশ্যে তাঁর অন্তিম প্রার্থনাও নিবেদন করবেন, এবং এইভাবে তিনি জড় জগতের সমস্ত বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে যাবেন। ভীষ্মদেব বরপ্রাপ্ত হয়েছিলেন যে তিনি ইচ্ছামৃত্যু বরণ করতে সক্ষম হবেন, এবং তাঁর এই শরশয্যায় শয়ন তাঁর নিজের ইচ্ছা অনুসারেই হয়েছিল। মহান যোদ্ধার এই প্রয়াণ তৎকালীন

সমস্ত শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিদের মনোযোগ আকর্ষণ করেছিল, এবং তাঁরা সকলে সেই মহাত্মার প্রতি তাঁদের প্রেম, শ্রদ্ধা এবং স্নেহ প্রদর্শন করার জন্য সেখানে সমবেত হয়েছিলেন।

শ্লোক ২

তদা তে ভ্রাতরঃ সর্বে সদশ্বৈঃ স্বর্ণভূষিতৈঃ।
অন্বগচ্ছন্ রথৈর্বিপ্রা ব্যাসধৌম্যাদয়স্তথা ॥ ২ ॥

তদা—সেই সময়ে; **তে**—তাঁরা সকলে; **ভ্রাতরঃ**—ভ্রাতারা; **সর্বে**—সকলে একসঙ্গে; **সৎ-অশ্বৈঃ**—উত্তম অশ্বদের দ্বারা চালিত; **স্বর্ণ**—স্বর্ণ; **ভূষিতৈঃ**—ভূষিত হয়ে; **অন্বগচ্ছন্**—একে অপরকে অনুসরণ করে; **রথৈঃ**—রথের উপরে; **বিপ্রাঃ**—হে বিপ্রগণ; **ব্যাস**—ব্যাসমুনি; **ধৌম্য**—ধৌম্য; **আদয়ঃ**—আদি; **তথা**—ও।

অনুবাদ

সেই সময়ে তাঁর সমস্ত ভ্রাতারা স্বর্ণালঙ্কারে সজ্জিত উত্তম অশ্বদের চালিত অত্যন্ত সুন্দর সুন্দর রথে আরোহণ করে তাঁর অনুগমন করলেন। তাঁদের সঙ্গে ব্যাসদেব, পাণ্ডবদের প্রধান পুরোহিত ধৌম্যের মতো ঋষিরা এবং অন্যেরা ছিলেন।

শ্লোক ৩

ভগবানপি বিপ্রর্ষে রথেন সধনঞ্জয়ঃ।
স তৈর্ব্যরোচত নৃপঃ কুবের ইব গুহ্যকৈঃ ॥ ৩ ॥

ভগবান্—পরমেশ্বর ভগবান (শ্রীকৃষ্ণ); **অপি**—ও; **বিপ্র-ঋষে**—হে বিপ্রর্ষি; **রথেন**—রথের উপরে; **সধনঞ্জয়ঃ**—ধনঞ্জয়ের (অর্জুন) সঙ্গে; **সঃ**—তিনি; **তৈঃ**—তাঁদের দ্বারা; **ব্যরোচত**—আভিজাত্যসম্পন্ন; **নৃপঃ**—রাজা (যুধিষ্ঠির); **কুবের**—কুবের, দেবতাদের কোষাধ্যক্ষ; **ইব**—যেমন; **গুহ্যকৈঃ**—গুহ্যক নামক সঙ্গী।

অনুবাদ

হে বিপ্রর্ষি, পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণও অর্জুনের সঙ্গে একটি রথে চড়ে তাঁদের অনুগমন করলেন। এইভাবে যুধিষ্ঠির মহারাজকে অত্যন্ত আভিজাত্যসম্পন্ন বলে মনে হতে লাগল, ঠিক যেমন কুবেরকে গুহ্যক আদি সঙ্গী পরিবৃত অবস্থায় মনে হয়।

তাৎপর্য

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ চেয়েছিলেন যে পাণ্ডবেরা যেন অত্যন্ত আভিজাত্যপূর্ণভাবে ভীষ্মদেবের সম্মুখে উপস্থিত হন যাতে তিনি তাঁর অন্তিম সময়ে তাঁদের সুখী দেখে প্রসন্ন হতে পারেন। কুবের সমস্ত দেবতাদের মধ্যে সবচাইতে ধনবান, এবং এখানে মহারাজ যুধিষ্ঠিরকে কুবেরের মতো মনে হয়েছে, কেননা শ্রীকৃষ্ণ সহ সেই শোভাযাত্রা মহারাজ যুধিষ্ঠিরের রাজপদের উপযুক্ত ছিল।

শ্লোক ৪

দৃষ্ট্বা নিপতিতং ভূমৌ দিবশ্চ্যুতমিবামরম্ ।
প্রণেমুঃ পাণ্ডবা ভীষ্মং সানুগাঃ সহ চক্রিণা ॥ ৪ ॥

দৃষ্ট্বা—এইভাবে দর্শন করে; **নিপতিতম্**—শায়িত; **ভূমৌ**—ভূমিতে; **দিবঃ**—আকাশমার্গ থেকে; **চ্যুতম্**—চ্যুত; **ইব**—মতো; **অমরম্**—দেবতা; **প্রণেমুঃ**—প্রণত হয়েছিলেন; **পাণ্ডবাঃ**—পাণ্ডুপুত্রেরা; **ভীষ্মম্**—ভীষ্মের কাছে; **স-অনুগাঃ**—কনিষ্ঠ ভ্রাতাদের; **সহ**—সঙ্গে; **চক্রিণা**—চক্রধারী ভগবান।

অনুবাদ

আকাশমার্গ থেকে বিচ্যুত এক দেবতার মতো তাঁকে (ভীষ্মদেবকে) ভূমিতে শায়িত দেখে পাণ্ডবরাজ যুধিষ্ঠির তাঁর কনিষ্ঠ ভ্রাতাদের এবং ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে তাঁর উদ্দেশ্যে প্রণতি নিবেদন করলেন।

তাৎপর্য

শ্রীকৃষ্ণ ছিলেন মহারাজ যুধিষ্ঠিরের কনিষ্ঠ (মামাতো) ভ্রাতা এবং অর্জুনের অন্তরঙ্গ সখা। কিন্তু পাণ্ডব পরিবারের সকলেই শ্রীকৃষ্ণকে পরমেশ্বর ভগবান বলে জানতেন। ভগবানও তাঁর পরমেশ্বরত্ব সম্বন্ধে সচেতন থাকা সত্ত্বেও সর্বদা একজন মানুষের মতো আচরণ করতেন, এবং তাই তিনিও মহারাজ যুধিষ্ঠিরের একজন কনিষ্ঠ ভ্রাতার মতো মৃত্যুপথযাত্রী ভীষ্মদেবের সম্মুখে প্রণত হয়েছিলেন।

শ্লোক ৫

তত্র ব্রহ্মর্ষয়ঃ সর্বে দেবর্ষয়শ্চ সত্তম ।
রাজর্ষয়শ্চ তত্রাসন্ দ্রষ্টুং ভরতপুঙ্গবম্ ॥ ৫ ॥

তত্র—সেখানে; ব্রহ্ম-ঋষয়ঃ—ব্রাহ্মণদের মধ্যে যাঁরা ঋষি; সর্বে—সকলে; দেব-ঋষয়ঃ—দেবতাদের মধ্যে যাঁরা ঋষি; চ—এবং; সত্তম—সত্ত্বগুণে স্থিত; রাজ-ঋষয়ঃ—রাজন্যবর্গের মধ্যে যাঁরা ঋষি; চ—এবং; তত্র—সেইস্থানে; আসন্—উপস্থিত ছিলেন; দ্রষ্টুম্—দর্শন করার জন্য; ভরত—ভরত মহারাজের বংশধরেরা; পুঙ্গবম্—প্রধান।

অনুবাদ

ভরত মহারাজের বংশধরগণের মধ্যে যিনি ছিলেন প্রধান, সেই ভীষ্মদেবকে দর্শন করার জন্য ব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত মহাত্মারা, অর্থাৎ সত্ত্বগুণে স্থিত দেবর্ষি, ব্রহ্মর্ষি ও রাজর্ষিরা সেখানে সমবেত হয়েছিলেন।

তাৎপর্য

ঋষি হচ্ছেন তাঁরা যাঁরা পারমার্থিক উপলব্ধির মাধ্যমে সিদ্ধিলাভ করেছেন। এই প্রকার পারমার্থিক উপলব্ধি রাজা অথবা ভিক্ষুক নির্বিশেষে সকলেই লাভ করতে পারে। ভীষ্মদেব নিজেও একজন ব্রহ্মর্ষি ছিলেন এবং মহারাজ ভরতের বংশধরগণের মধ্যে তিনি ছিলেন প্রধান। সমস্ত ঋষিরাই সত্ত্বগুণে অধিষ্ঠিত। সেই মহান যোদ্ধার আসন্ন মৃত্যু সংবাদ শুনে তাঁরা সকলে সেখানে উপস্থিত হয়েছিলেন।

শ্লোক ৬-৭

পর্বতো নারদো ধৌম্যো ভগবান্ বাদরায়ণঃ ।
বৃহদশ্বো ভরদ্বাজঃ সশিষ্যো রেণুকাসুতঃ ॥ ৬ ॥
বশিষ্ঠ ইন্দ্রপ্রমদস্ত্রিতো গৃৎসমদোঽসিতঃ ।
কক্ষীবান্ গৌতমোঽত্রিশ্চ কৌশিকোঽথ সুদর্শনঃ ॥ ৭ ॥

পর্বতঃ—পর্বতমুনি; নারদঃ—নারদমুনি; ধৌম্যঃ—ধৌম্য; ভগবান্—ভগবদাবতার; বাদরায়ণঃ—ব্যাসদেব; বৃহদশ্বঃ—বৃহদশ্ব; ভরদ্বাজঃ—ভরদ্বাজ; সশিষ্যঃ—সশিষ্য; রেণুকা-সুতঃ—পরশুরাম; বশিষ্ঠঃ—বশিষ্ঠ; ইন্দ্রপ্রমদঃ—ইন্দ্রপ্রমদ; ত্রিতঃ—ত্রিত; গৃৎসমদঃ—গৃৎসমদ; অসিতঃ—অসিত; কক্ষীবান্—কক্ষীবান; গৌতমঃ—গৌতম; অত্রিঃ—অত্রি; চ—এবং; কৌশিকঃ—কৌশিক; অথ—এবং; সুদর্শনঃ—সুদর্শন।

অনুবাদ

সেখানে পর্বতমুনি, নারদমুনি, ধৌম্য, ভগবদাবতার ব্যাসদেব, বৃহদশ্ব, ভরদ্বাজ, পরশুরাম ও তাঁর শিষ্যবর্গ, বশিষ্ঠ, ইন্দ্রপ্রমদ, ত্রিত, গৃৎসমদ, অসিত, কক্ষীবান, গৌতম, অত্রি, কৌশিক এবং সুদর্শনের মতো মহান মুনি-ঋষিরা উপস্থিত ছিলেন।

তাৎপর্য

পর্বতমুনি প্রাচীন ঋষিদের মধ্যে অন্যতম বলেই বিবেচিত হন। তিনি প্রায় সর্বদাই নারদ মুনির নিত্যসঙ্গী। তাঁরাও মহাকাশচারী এবং কোন প্রকার জড় যানের সাহায্য ছাড়াই তাঁরা শূন্যে বিচরণ করতে সক্ষম। পর্বত মুনিও নারদ মুনির মতো একজন দেবর্ষি অর্থাৎ দেবগণের মধ্যে এক মহামুনি। মহারাজ পরীক্ষিতের পুত্র মহারাজ জনমেজয়ের যজ্ঞানুষ্ঠানে তিনি নারদ মুনির সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন। পৃথিবীর সমস্ত সর্পসমূহকে বিনাশ করার জন্য এই যজ্ঞের আয়োজন করা হয়েছিল। পর্বত মুনি এবং নারদ মুনিকে গন্ধর্বও বলা হয়, কারণ ভগবানের মহিমা কীর্তন করতে করতে তাঁরা মহাকাশে বিচরণ করেন। শূন্যে বিচরণকালে তাঁরা উপর থেকে দ্রৌপদীর স্বয়ম্বর অনুষ্ঠান প্রত্যক্ষ করেছিলেন। নারদ মুনির মতো পর্বত মুনিও স্বর্গাধিপতি ইন্দ্রের রাজসভায় গমন করতেন। গন্ধর্বরূপে তিনি কখনো কখনো অন্যতম প্রধান দেবতা কুবেরের রাজসভাও পরিদর্শন করতেন। নারদ মুনি এবং পর্বত মুনি উভয়েই একবার মহারাজ সৃঞ্জয়ের কন্যার কাছে বিপদগ্রস্ত হয়েছিলেন। মহারাজ সৃঞ্জয় পর্বত মুনির কাছ থেকে একটি পুত্র সন্তান লাভ করার বরপ্রাপ্ত হয়েছিলেন।

নারদ মুনি পুরাণের বর্ণনাদির সঙ্গে অপরিহার্যভাবে জড়িত। শ্রীমদ্ভাগবতে তাঁর বর্ণনা আছে। তাঁর পূর্ব জন্মে তিনি ছিলেন এক দাসীপুত্র, কিন্তু শুদ্ধ ভক্তদের সৎসঙ্গের প্রভাবে তিনি ভগবদ্ভক্তি লাভ করেন, এবং পরবর্তী জীবনে তিনি একজন অদ্বিতীয় সিদ্ধ ব্যক্তি হন, যাঁর তুলনা ছিলেন তিনি নিজেই। মহাভারতে বহু স্থানে তাঁর নাম উল্লেখ করা হয়েছে। তিনি প্রধান দেবর্ষি, অর্থাৎ দেবতাদের মধ্যে প্রধান ঋষি। তিনি ব্রহ্মার পুত্র ও শিষ্য, এবং ব্রহ্মা থেকে গুরু-পরম্পরা তাঁর মাধ্যমেই বিস্তার লাভ করেছিল। তিনি প্রহ্লাদ মহারাজ, ধ্রুব মহারাজ এবং অনেক প্রসিদ্ধ ভগবদ্ভক্তদের দীক্ষা প্রদান করেছিলেন। তিনি বৈদিক শাস্ত্রাদির প্রণেতা ব্যাসদেবকেও দীক্ষা প্রদান করেছিলেন, এবং ব্যাসদেবের কাছ থেকে মধ্বাচার্য দীক্ষাপ্রাপ্ত হয়েছিলেন এবং এইভাবে মধ্ব-সম্প্রদায়ের প্রবর্তন হয়। সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডে প্রসার লাভ করেছে যে গৌড়ীয় সম্প্রদায় তা এই মধ্ব-সম্প্রদায়েরই অন্তর্ভুক্ত।

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু এই মধ্ব-সম্প্রদায়ের অন্তর্গত; সেইজন্য ব্রহ্মা, নারদ, ব্যাস থেকে শুরু করে মধ্ব, শ্রীচৈতন্য এবং গোস্বামীবর্গের সকলেই গুরু-পরম্পরায় একই ধারার অন্তর্গত।

ধৌম্য ঃ একজন মহান ঋষি, যিনি উৎকোচক তীর্থে কঠোর তপস্যা করেছিলেন এবং পাণ্ডব রাজাদের রাজপুরোহিতরূপে নিযুক্ত হয়েছিলেন। তিনি পাণ্ডবদের বহু সংস্কার অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্য করেছিলেন, এবং দ্রৌপদীকে বাগ্‌দানের সময় তিনি প্রত্যেক পাণ্ডবের সঙ্গে ছিলেন। পাণ্ডবদের বনবাসকালেও তিনি তাঁদের সঙ্গে ছিলেন এবং তাঁরা যখন কোন জটিল সমস্যার সম্মুখীন হতেন তখন তিনি তাঁদের উপদেশ দিতেন। এক বছর অজ্ঞাতবাসকালে কিভাবে বসবাস করতে হবে সে সম্বন্ধে তিনি তাঁদের উপদেশ দিয়েছিলেন, এবং সেই সময় পাণ্ডবেরা তাঁর নির্দেশ নিষ্ঠা সহকারে পালন করেছিলেন। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের পর সাধারণ অন্ত্যেষ্টি-ক্রিয়া সম্পাদনকালেও তাঁর নাম উল্লেখ করা হয়েছে। মহাভারতের অনুশাসন পর্বে (১২৭/১৫-১৬) তিনি মহারাজ যুধিষ্ঠিরকে অত্যন্ত বিশদভাবে ধর্ম সম্বন্ধে উপদেশ দিয়েছেন। তিনি গৃহস্থদের জন্য আদর্শ পুরোহিত, কেননা তিনি পাণ্ডবদের ধর্মের আদর্শ পথে পরিচালিত করেছিলেন। পুরোহিতের কর্তব্য হচ্ছে আশ্রম ধর্মের পথে গৃহস্থদের এগিয়ে যেতে সাহায্য করা। প্রকৃতপক্ষে কুল পুরোহিত এবং গুরুদেবের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। ঋষি, মহাত্মা এবং ব্রাহ্মণদের সেইটিই হচ্ছে বিশেষ কর্তব্য।

বাদরায়ণ (ব্যাসদেব) ঃ তিনি কৃষ্ণ, কৃষ্ণদ্বৈপায়ন, দ্বৈপায়ন, সত্যবতীসুত, পরাশর্য, পরাশরাত্মজ, বাদরায়ণ, বেদব্যাস ইত্যাদি নামে পরিচিত। মহারথী পিতামহ ভীষ্মের পিতৃদেব মহারাজ শান্তনুর সঙ্গে বিবাহের পূর্বে সত্যবতীর গর্ভে মহামুনি পরাশরের পুত্ররূপে তাঁর জন্ম হয়। তিনি নারায়ণের শক্ত্যাবেশ অবতার, এবং তিনি বৈদিক জ্ঞান পৃথিবীতে প্রচার করেন। তাই বৈদিক শাস্ত্র, বিশেষ করে পুরাণ পাঠ করার পূর্বে ব্যাসদেবকে শ্রদ্ধা নিবেদন করা হয়। শুকদেব গোস্বামী ছিলেন তাঁর পুত্র, এবং বৈশম্পায়ন আদি ঋষিরা বেদের বিভিন্ন শাখায় তাঁর শিষ্য। তিনি মহাকাব্য মহাভারত এবং মহান পারমার্থিক গ্রন্থ *শ্রীমদ্ভাগবত* রচনা করেন। *ব্রহ্মসূত্র* — *বেদান্ত-সূত্র* বা *বাদরায়ণ সূত্র* তিনি প্রণয়ন করেন। তাঁর কঠোর তপস্যার প্রভাবে তিনি সমস্ত ঋষিদের মধ্যে সবচাইতে সম্মানিত শাস্ত্র-প্রণেতারূপে পরিচিতি লাভ করেছিলেন। কলিযুগের মানুষদের কল্যাণ সাধনের জন্য তিনি যখন মহাকাব্য মহাভারত লিপিবদ্ধ করার সংকল্প করেন, তখন তিনি একজন দক্ষ লেখকের প্রয়োজন অনুভব করেছিলেন যিনি তাঁর বর্ণনা অনুসারে তা লিখতে সক্ষম হবেন।

তখন ব্রহ্মার নির্দেশে গণেশ সেই কার্যভার গ্রহণ করেছিলেন একটি শর্তে যে ব্যাসদেব মুহূর্তের জন্যও তাঁর বর্ণনা থামাবেন না। এইভাবে ব্যাসদেব এবং গণেশের যৌথ প্রচেষ্টায় মহাভারত রচিত হয়েছিল।

তাঁর মাতা সত্যবতীর, যিনি পরে মহারাজ শান্তনুকে বিবাহ করেছিলেন, তাঁর আদেশ এবং শান্তনুর প্রথমা পত্নী গঙ্গার গর্ভজাত পুত্র ভীষ্মদেবের অনুরোধে তিনি ধৃতরাষ্ট্র, পাণ্ডু এবং বিদুর নামক তিনটি অত্যন্ত উজ্জ্বল সন্তান উৎপাদন করেন। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের পর এবং সেই যুদ্ধে সমস্ত মহান যোদ্ধাদের মৃত্যুর পর ব্যাসদেব মহাভারত রচনা করেন। মহারাজ পরীক্ষিতের পুত্র মহারাজ জনমেজয়ের রাজসভায় তা প্রথম পাঠ করা হয়েছিল।

বৃহদশ্ব : একজন প্রাচীন ঋষি যিনি প্রায়শই মহারাজ যুধিষ্ঠিরের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতেন। মহারাজ যুধিষ্ঠিরের সঙ্গে তাঁর প্রথম সাক্ষাৎ হয় কাম্যবনে। এই ঋষি মহারাজ নলের ইতিহাস বর্ণনা করেছিলেন। আর একজন বৃহদশ্ব রয়েছেন, যিনি হচ্ছেন ইক্ষ্বাকু বংশের সন্তান (মহাভারত বন পর্ব ২০৯/৪-৫)।

ভরদ্বাজ : সপ্তর্ষিদের মধ্যে তিনি হচ্ছেন অন্যতম এবং অর্জুনের জন্মোৎসবের সময় তিনি উপস্থিত ছিলেন। এই মহা শক্তিশালী ঋষি গঙ্গার তটে কঠোর তপস্যা করেছিলেন, এবং প্রয়াগ ধামে তাঁর আশ্রম এখনও রয়েছে। কথিত আছে যে এক সময় গঙ্গাস্নানকালে ঘৃতচী নামক স্বর্গের এক অপ্সরার সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ হয়, এবং তাঁর স্খলিত বীর্য একটি মৃৎপাত্রে রাখা হয় এবং তার থেকে দ্রোণের জন্ম হয়। এইভাবে দ্রোণাচার্য হচ্ছেন ভরদ্বাজ মুনির পুত্র। অন্য অনেকে বলেন যে দ্রোণাচার্যের পিতা ভরদ্বাজ মহর্ষি ভরদ্বাজ থেকে ভিন্ন। তিনি ছিলেন ব্রহ্মার একজন মহান ভক্ত। এক সময় তিনি দ্রোণাচার্যের কাছে গিয়ে তাঁকে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ বন্ধ করতে অনুরোধ করেন।

পরশুরাম বা রেণুকাসুত : ইনি মহর্ষি জমদগ্নি এবং শ্রীমতী রেণুকার পুত্র। সেই সূত্রে তিনি রেণুকাসুত নামেও পরিচিত। তিনি ভগবানের একজন শক্ত্যাবেশ অবতার, এবং তিনি একুশ বার পৃথিবীকে নিঃক্ষত্রিয় করেছিলেন। ক্ষত্রিয়দের রক্তে তিনি তাঁর পূর্বপুরুষদের আত্মার প্রসন্নতা বিধান করেছিলেন। তারপর তিনি মহেন্দ্র পর্বতে কঠোর তপস্যা করেছিলেন। ক্ষত্রিয়দের কাছ থেকে পৃথিবী ছিনিয়ে নিয়ে তিনি তা কশ্যপ মুনিকে দান করেছিলেন। পরশুরাম দ্রোণাচার্যকে ধনুর্বেদ বা সামরিক বিজ্ঞান উপদেশ দিয়েছিলেন, কেননা তিনি ছিলেন একজন ব্রাহ্মণ। মহারাজ যুধিষ্ঠিরের রাজ্যাভিষেকের সময় তিনি উপস্থিত ছিলেন, এবং তিনি অন্যান্য ঋষিদের সঙ্গে সেই উৎসবে অংশগ্রহণ করেছিলেন।

পরশুরাম এতই প্রাচীন যে বিভিন্ন যুগে রাম এবং কৃষ্ণ উভয়ের সঙ্গেই তাঁর সাক্ষাৎ হয়েছিল। তিনি রামের সঙ্গে যুদ্ধ করেছিলেন, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণকে পরমেশ্বর ভগবান বলে স্বীকার করেছিলেন। তিনি যখন অর্জুনকে কৃষ্ণের সঙ্গে দর্শন করেছিলেন, তখন তিনি তাঁর প্রশংসা করেছিলেন। ভীষ্ম যখন অম্বাকে বিবাহ করতে অস্বীকার করেন, তখন ভীষ্মকে পতিরূপে লাভ করতে আকাঙ্ক্ষী অম্বা পরশুরামের সঙ্গে মিলিত হয়েছিলেন এবং তার অনুরোধে তিনি ভীষ্মদেবকে বলেন অম্বাকে তাঁর পত্নীরূপে গ্রহণ করতে। ভীষ্ম তাঁর সেই আদেশ পালন করতে অস্বীকার করেন, যদিও তিনি ছিলেন ভীষ্মদেবের গুরুদেব। তাঁর সতর্কবাণী উপেক্ষা করার জন্য পরশুরাম তখন ভীষ্মদেবের সঙ্গে যুদ্ধ করেছিলেন। তাঁদের মধ্যে প্রবল সংগ্রাম হয়েছিল, এবং অবশেষে পরশুরাম ভীষ্মের প্রতি প্রসন্ন হয়ে তাঁকে বর দিয়ে বলেছিলেন যে তিনি পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ যোদ্ধা হবেন।

বশিষ্ঠ : ব্রাহ্মণদের মধ্যে সবচাইতে বিখ্যাত ঋষি, যিনি ব্রহ্মর্ষি বশিষ্ঠদেব নামে পরিচিত। *রামায়ণ* এবং *মহাভারতের* উভয় কালেই তিনি ছিলেন একজন বিখ্যাত ব্যক্তি। পরমেশ্বর ভগবান শ্রীরামচন্দ্রের অভিষেক উৎসব তিনি অনুষ্ঠান করেছিলেন। তিনি কুরুক্ষেত্রের রণাঙ্গনেও উপস্থিত ছিলেন। তিনি সমস্ত উচ্চলোক এবং অধঃলোকে গমনাগমন করতে পারতেন, এবং তাঁর নাম হিরণ্যকশিপুর ইতিহাসের সঙ্গেও যুক্ত। বিশ্বামিত্র তাঁর কামধেনু বলপূর্বক অধিকার করতে চাইলে তাঁদের মধ্যে বিবাদ হয়। বশিষ্ঠ মুনি তাঁকে কামধেনু দিতে অস্বীকার করেন, এবং তাই বিশ্বামিত্র তাঁর একশত পুত্রকে হত্যা করেন। আদর্শ ব্রাহ্মণরূপে তিনি বিশ্বামিত্রের সমস্ত উপহাস সহ্য করেন। বিশ্বামিত্রের নির্যাতনের ফলে এক সময় তিনি আত্মহত্যা করতে চান, কিন্তু তাঁর সমস্ত চেষ্টা ব্যর্থ হয়। তিনি একটি পাহাড় থেকে লাফ দেন, কিন্তু যে পাথরের উপর তিনি পড়েছিলেন সেগুলি তুলার স্তূপে পরিণত হয় এবং তার ফলে তাঁর প্রাণরক্ষা হয়। তিনি সমুদ্রে ঝাঁপ দেন, কিন্তু ঢেউগুলি তাঁকে তীরে নিয়ে আসে। তিনি নদীতে ডুব দেন, কিন্তু নদীও তাঁকে তীরে নিয়ে আসে। এইভাবে তাঁর আত্মহত্যা করার সমস্ত চেষ্টা ব্যর্থ হয়। তিনিও সপ্তর্ষিদের মধ্যে অন্যতম এবং সুপ্রসিদ্ধ নক্ষত্র অরুন্ধতীর পতি।

ইন্দ্রপ্রমদ : আর একজন বিখ্যাত ঋষি।

ত্রিত : প্রজাপতি গৌতমের তিন পুত্রের অন্যতম। তিনি ছিলেন তৃতীয় পুত্র, এবং তাঁর অন্য দুই ভ্রাতার নাম একৎ এবং দ্বিত। তাঁরা তিন ভ্রাতাই ছিলেন মহর্ষি এবং ধর্মীয় অনুশাসনে নিষ্ঠাপরায়ণ। কঠোর তপস্যার প্রভাবে তাঁরা ব্রহ্মলোকে উন্নীত হয়েছিলেন। এক সময় ত্রিত মুনি একটি কূপে পতিত হন। তিনি বহু যজ্ঞের অনুষ্ঠাতা

ছিলেন, এবং একজন মহর্ষিরূপে তিনিও ভীষ্মজীর অন্তিম সময়ে তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করতে এসেছিলেন। তিনি বরুণলোকের সপ্তর্ষিদের মধ্যে একজন। তিনি পৃথিবীর পাশ্চাত্য দেশ থেকে উদ্ভূত হয়েছিলেন, খুব সম্ভবত তিনি ইউরোপের অধিবাসী ছিলেন। সেই সময় সারা পৃথিবী জুড়ে বৈদিক সংস্কৃতি প্রচলিত ছিল।

গৃৎসমদ ঃ স্বর্গের ঋষিদের অন্যতম। তিনি ছিলেন দেবরাজ ইন্দ্রের ঘনিষ্ঠ বন্ধু এবং বৃহস্পতির মতোই মহান। তিনি মহারাজ যুধিষ্ঠিরের রাজসভায় প্রায়ই যেতেন, এবং যে স্থানে ভীষ্মদেব তাঁর শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছিলেন সেখানেও তিনি গিয়েছিলেন। কোন এক সময়ে তিনি মহারাজ যুধিষ্ঠিরের কাছে দেবাদিদেব মহাদেবের মহিমা বিশ্লেষণ করেছিলেন। তিনি ছিলেন বিতহব্যের পুত্র, এবং তাঁর অবয়ব ঠিক ইন্দ্রের মতো ছিল। এক সময় ইন্দ্রের শত্রুরা তাঁকে ইন্দ্র বলে মনে করে বন্দী করেছিল। তিনি ছিলেন ঋগ্বেদের একজন মহান পণ্ডিত, এবং তার ফলে ব্রাহ্মণ সমাজে তিনি অত্যন্ত সম্মানিত ছিলেন। তিনি ছিলেন ব্রহ্মচারী, এবং তিনি সর্বতোভাবে অত্যন্ত শক্তিশালী ছিলেন।

অসিত ঃ এই নামের একজন রাজাও ছিলেন, কিন্তু এখানে যে অসিতের কথা উল্লেখ করা হয়েছে তিনি হচ্ছেন অসিত দেবল ঋষি, সেই সময়কার একজন অত্যন্ত শক্তিশালী ঋষি। তিনি তাঁর পিতার কাছে মহাভারতের পনের লক্ষ শ্লোকের ব্যাখ্যা করেছিলেন। মহারাজ জনমেজয়ের সর্পনিধন যজ্ঞে তিনি উপস্থিত ছিলেন। মহারাজ যুধিষ্ঠিরের অভিষেকের সময়ও তিনি অন্যান্য মহর্ষিদের সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন। মহারাজ যুধিষ্ঠির যখন অঞ্জন পর্বতে ছিলেন, তখন তিনি তাঁকে উপদেশও দান করেছিলেন। তিনি একজন শিবভক্তও ছিলেন।

কক্ষীবান ঃ গৌতম মুনির পুত্রদের অন্যতম এবং মহর্ষি চন্দ্রকৌশিকের পিতা। তিনি মহারাজ যুধিষ্ঠিরের মন্ত্রিমণ্ডলীর একজন সদস্য ছিলেন।

অত্রি ঃ অত্রি মুনি ছিলেন একজন মহান ব্রহ্মর্ষি এবং ব্রহ্মার মানস-পুত্রদের অন্যতম। ব্রহ্মাজী এতই শক্তিশালী যে তিনি কেবল চিন্তা করার মাধ্যমে পুত্র উৎপন্ন করতে পারেন। ব্রহ্মার এই পুত্রদের বলা হয় মানস-পুত্র। ব্রহ্মার সাতজন মানস-পুত্র এবং সাতজন ব্রহ্মর্ষির মধ্যে অত্রিও হচ্ছেন একজন। তাঁর পরিবারে মহান প্রচেতাদেরও জন্ম হয়েছিল। অত্রি মুনির দুজন ক্ষত্রিয় পুত্র ছিলেন, যাঁরা রাজা হয়েছিলেন। রাজা অর্থমও ছিলেন তাঁদের মধ্যে একজন। একুশজন প্রজাপতির মধ্যে তাঁকে গণনা করা হয়ে থাকে। তাঁর পত্নীর নাম অনসূয়া। মহারাজ পরীক্ষিতের মহাযজ্ঞে তিনি তাঁকে সাহায্য করেছিলেন।

কৌশিক ঃ মহারাজ যুধিষ্ঠিরের রাজসভার স্থায়ী সদস্য ঋষিদের অন্যতম। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ হয়েছিল। এই নামে আরও কয়েকজন ঋষি রয়েছেন।

সুদর্শন ঃ পরমেশ্বর ভগবানের (বিষ্ণু বা কৃষ্ণের) এক মহা শক্তিশালী অস্ত্র। এই সুদর্শন চক্র ব্রহ্মাস্ত্র বা অন্য যে কোন ধ্বংসাত্মক অস্ত্র থেকে অনেক বেশি শক্তিশালী। কোন কোন বৈদিক শাস্ত্রে উল্লেখ করা হয়েছে যে অগ্নিদেব ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে এই অস্ত্রটি দান করেন, কিন্তু বস্তুত ভগবান নিত্যকাল যাবৎ এই অস্ত্রটি ধারণ করে থাকেন। মহারাজ রুক্ম যেভাবে ভগবানের হস্তে রুক্মিণীকে অর্পণ করেছিলেন, তেমনই অগ্নিদেবও শ্রীকৃষ্ণকে এই অস্ত্রটি দান করেছিলেন। ভগবান তাঁর ভক্তদের কাছ থেকে এইভাবে উপহার গ্রহণ করেন, যদিও সেই সমস্ত উপহারগুলি তাঁর নিত্য সম্পত্তি। মহাভারতের আদি-পর্বে এই অস্ত্রটির সম্বন্ধে বিশদ বর্ণনা রয়েছে। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী শিশুপালকে বধ করার সময় এই অস্ত্রটি ব্যবহার করেছিলেন। তিনি শাল্বকেও এই অস্ত্রের দ্বারা সংহার করেন। কখনো কখনো তিনি চেয়েছিলেন যে তাঁর সখা অর্জুনও তাঁর শত্রুদের সংহার করার জন্য তা ব্যবহার করুন (মহাভারত, *বিরাট পর্ব ৫৬/৩*)।

শ্লোক ৮

অন্যে চ মুনয়ো ব্রহ্মন্ ব্রহ্মরাতাদয়োঽমলাঃ।
শিষ্যৈরুপেতা আজগ্মুঃ কশ্যপাঙ্গিরসাদয়ঃ ॥ ৮ ॥

অন্যে—অন্য অনেকে; **চ**—ও; **মুনয়ঃ**—মুনিগণ; **ব্রহ্মন্**—হে ব্রাহ্মণগণ; **ব্রহ্মরাত**—শুকদেব গোস্বামী; **আদয়ঃ**—প্রভৃতি; **অমলাঃ**—সম্পূর্ণভাবে নির্মল; **শিষ্যৈঃ**—শিষ্যগণ কর্তৃক; **উপেতাঃ**—পরিবৃত হয়ে; **আজগ্মুঃ**—এসেছিলেন; **কশ্যপ**—কশ্যপ; **আঙ্গিরস**—আঙ্গিরস; **আদয়ঃ**—এবং অন্য অনেকে।

অনুবাদ

হে ব্রাহ্মণগণ, এছাড়া শুকদেব আদি অমল পরমহংসগণ, এবং কশ্যপ ও আঙ্গিরস প্রমুখ মুনিগণ তাঁদের নিজ নিজ শিষ্য পরিবৃত হয়ে সেখানে উপস্থিত হয়েছিলেন।

তাৎপর্য

শুকদেব গোস্বামী (ব্রহ্মরাত) ঃ শ্রীব্যাসদেবের বিখ্যাত পুত্র এবং শিষ্য, যাঁকে তিনি প্রথমে মহাভারত এবং তারপর শ্রীমদ্ভাগবত শিক্ষা দিয়েছিলেন। শুকদেব গোস্বামী

গন্ধর্ব, যক্ষ এবং রাক্ষসদের সভায় চৌদ্দ লক্ষ শ্লোক সমন্বিত *মহাভারত* শুনিয়েছিলেন, এবং তিনি মহারাজ পরীক্ষিতের কাছে সর্বপ্রথম *শ্রীমদ্ভাগবত* কীর্তন করেছিলেন। তিনি তাঁর মহান পিতার কাছে সমস্ত বৈদিক শাস্ত্র পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে অধ্যয়ন করেছিলেন। এইভাবে ধর্ম সম্বন্ধে তাঁর বিস্তৃত জ্ঞানের প্রভাবে তিনি ছিলেন সম্পূর্ণরূপে পবিত্র আত্মা। *মহাভারতের* সভা-পর্ব (৪/১১) থেকে জানা যায় যে তিনি মহারাজ যুধিষ্ঠিরের রাজসভায় এবং মহারাজ পরীক্ষিতের প্রায়োপবেশনের সময় উপস্থিত ছিলেন। শ্রীব্যাসদেবের প্রকৃত শিষ্যরূপে তিনি তাঁর পিতার কাছ থেকে ধর্ম-তত্ত্ব এবং পারমার্থিক মূল্য সম্বন্ধে বিস্তৃত প্রশ্ন করেছিলেন, এবং তাঁর মহান পিতাও তাঁকে যে যোগ-পদ্ধতির দ্বারা বৈকুণ্ঠলোক প্রাপ্ত হওয়া যায়, সে সম্বন্ধে শিক্ষা দিয়েছিলেন, এবং সকাম কর্ম এবং মনোধর্মী জ্ঞানের পার্থক্য সম্বন্ধে উপদেশ দিয়েছিলেন; পারমার্থিক উপলব্ধির পন্থা, চতুরাশ্রম (যথা ব্রহ্মচর্য, গার্হস্থ্য, বানপ্রস্থ এবং সন্ন্যাস), পরমেশ্বর ভগবানের পরম পদ এবং তাঁকে প্রত্যক্ষভাবে দর্শন করার পন্থা, জ্ঞান লাভের উপযুক্ত পাত্র, পঞ্চ-তত্ত্ব, বুদ্ধির অলৌকিক স্থিতি, জড়া প্রকৃতির চেতনা এবং জীব-তত্ত্ব স্বরূপ-সিদ্ধ ব্যক্তির লক্ষণ, জড় শরীরের ধর্ম, প্রকৃতির গুণের লক্ষণ, নিরন্তর বাসনার বৃক্ষ এবং মনের কার্যকলাপ আদি বিষয়েও তিনি তাঁকে শিক্ষা দেন। এক সময় তাঁর পিতা এবং নারদ মুনির অনুমতি নিয়ে তিনি সূর্যলোকে গমন করেছিলেন। *মহাভারতের* শান্তি পর্বে (৩৩২) তাঁর অন্তরীক্ষে ভ্রমণের বর্ণনা রয়েছে। অবশেষে তিনি ভগবানের চিন্ময় ধাম প্রাপ্ত হয়েছিলেন। তিনি অরণেয়, অরুণিসুত, বৈয়াসকি, ব্যাসাত্মজ প্রভৃতি বিভিন্ন নামে পরিচিত।

কশ্যপ ঃ একজন প্রজাপতি, মরীচির পুত্র এবং দক্ষের জামাতা। হাতি এবং কচ্ছপ যাঁর খাদ্য হিসাবে দেওয়া হয়েছিল সেই বিশাল পক্ষী গরুড়ের তিনি পিতা। তিনি প্রজাপতি দক্ষের তেরজন কন্যাকে বিবাহ করেছিলেন, এবং তাঁদের নাম হচ্ছে অদিতি, দিতি, দনু, কাষ্ঠা, অরিষ্টা, সুরসা, ইলা, মুনি, ক্রোধবশা, তাম্রা, সুরভি, সরমা এবং তিমি। সেই সমস্ত পত্নীদের মাধ্যমে তিনি দেব, অসুর আদি বহু সন্তানের জন্ম দেন। তাঁর প্রথম পত্নী অদিতি থেকে দ্বাদশ আদিত্যের জন্ম হয়; তাঁদের মধ্যে অন্যতম হচ্ছেন ভগবানের অবতার বামন। এই মহর্ষি কশ্যপ অর্জুনের জন্মের সময়ও উপস্থিত ছিলেন। তিনি পরশুরামের কাছ থেকে উপহারস্বরূপ সমগ্র বিশ্ব প্রাপ্ত হন এবং পরে তিনি পরশুরামকে এই বিশ্ব থেকে চলে যেতে বলেন। তাঁর অন্য আর একটি নাম হচ্ছে অরিষ্টনেমি। তিনি ব্রহ্মাণ্ডের উত্তরভাগে বাস করেন।

আঙ্গিরস ঃ মহর্ষি অঙ্গিরার পুত্র, এবং তিনি দেবগুরু বৃহস্পতি নামে পরিচিত। কথিত হয় যে দ্রোণাচার্য তাঁর অংশ অবতার। বৃহস্পতি এক সময় দৈত্যগুরু শুক্রাচার্যকে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় আহ্বান করেছিলেন। কচ হচ্ছে তাঁর পুত্র, এবং তিনি ভরদ্বাজ মুনিকে প্রথম আগ্নেয়াস্ত্র দান করেন। তিনি তাঁর পত্নী বিখ্যাত নক্ষত্রদের মধ্যে অন্যতমা চন্দ্রমাসীর গর্ভে (অগ্নিদেবের মতো) ছয় পুত্র উৎপাদন করেন। তিনি অন্তরীক্ষে ভ্রমণ করতে পারতেন, এবং তাই তিনি ব্রহ্মলোক এবং ইন্দ্রলোকেও গমন করতে পারতেন। তিনি দেবরাজ ইন্দ্রকে অসুরদের পরাভূত করার বিষয়ে উপদেশ দেন। এক সময় তিনি ইন্দ্রকে অভিশাপ দিয়েছিলেন, যার ফলে ইন্দ্র এই পৃথিবীতে শূকর যোনি প্রাপ্ত হয় এবং স্বর্গলোকে ফিরে যেতে অনিচ্ছা প্রকাশ করে। মায়ার আকর্ষণের এমনই প্রভাব যে একটি শূকর পর্যন্ত স্বর্গলোকের বিনিময়েও এই পৃথিবীর আসক্তি ত্যাগ করতে চায় না। তিনি বিভিন্ন লোকের অধিবাসীদের ধর্মগুরু।

শ্লোক ৯

তান্ সমেতান্মহাভাগানুপলভ্য বসূত্তমঃ ।
পূজয়ামাস ধর্মজ্ঞো দেশকালবিভাগবিৎ ॥ ৯ ॥

তান্—তাঁরা সকলে; **সমেতান্**—সমবেত হয়েছিলেন; **মহা-ভাগান্**—মহাপ্রভাবশালী ব্যক্তিগণ; **উপলভ্য**—প্রাপ্ত হয়ে; **বসু-উত্তমঃ**—বসুদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ (ভীষ্মদেব); **পূজয়াম্-আস**—অভিবাদন করেছিলেন; **ধর্মজ্ঞঃ**—ধর্মতত্ত্ববেত্তা; **দেশ**—স্থান; **কাল**—সময়; **বিভাগ-বিৎ**—স্থান ও কালের বিভাগ অনুসারে কার্য সম্পাদনে দক্ষ।

অনুবাদ

ধর্মতত্ত্ববেত্তা, দেশ-কাল-পাত্র অনুসারে কার্য সম্পাদনে দক্ষ, অষ্টবসুশ্রেষ্ঠ ভীষ্মদেব সেই সমস্ত মহাপ্রভাবশালী ঋষিদের সেখানে উপস্থিত দেখে যথাযথভাবে তাঁদের স্বাগত অভ্যর্থনা জানালেন।

তাৎপর্য

সুদক্ষ ধর্মতত্ত্ববিদেরা জানেন কিভাবে দেশ এবং কাল অনুসারে ধর্মনীতির সমন্বয় সাধন করতে হয়। পৃথিবীর সমস্ত মহান আচার্য অথবা ধর্ম-প্রচারক বা ধর্ম-সংস্কারকেরা স্থান এবং কাল অনুসারে ধর্মনীতির সামঞ্জস্য বিধানের মাধ্যমে তাঁদের উদ্দেশ্য সম্পাদন করেছিলেন। পৃথিবীর বিভিন্ন অংশে বিভিন্ন প্রকার জলবায়ু ও পরিস্থিতি রয়েছে, এবং কাউকে যদি ভগবানের বাণী প্রচার করতে হয়, তাহলে

তাকে অবশ্যই দেশ এবং কাল অনুসারে সবকিছুর মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করতে অত্যন্ত দক্ষ হতে হবে। ভগবদ্ভক্তির প্রচারকারী এই সম্প্রদায়ের দ্বাদশ মহাজনদের মধ্যে ভীষ্মদেব হচ্ছেন অন্যতম, এবং তাই তাঁর মৃত্যুশয্যায় ব্রহ্মাণ্ডের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আগত সমস্ত মহাশক্তিশালী ঋষিদের তিনি স্বাগত জানাতে এবং অভ্যর্থনা করতে পেরেছিলেন। তাঁদের স্বাগত সম্ভাষণ জানাতে এবং আপ্যায়ন করতে তিনি দৈহিক ভাবে অবশ্যই অক্ষম ছিলেন, কেননা তিনি তখন তাঁর গৃহে ছিলেন না, অথবা স্বাভাবিক সুস্থ অবস্থায় ছিলেন না। কিন্তু তাঁর দৃঢ় মনের কার্যকলাপ ছিল সম্পূর্ণ সুস্থ, এবং তাই তিনি আন্তরিক ভাব প্রকাশের মাধ্যমে তাঁদের মধুর সম্ভাষণ করতে সক্ষম হয়েছিলেন এবং তাঁরা সকলেই সাদরে অভ্যর্থিত হয়েছিলেন। মানুষ তাঁর মন, বাণী এবং কর্মের দ্বারা তার কর্তব্য সম্পাদন করতে পারে। তিনি ভালভাবেই জানতেন উপযুক্ত স্থানে কিভাবে তাদের সদ্ব্যবহার করতে হয়। তাই শারীরিক দিক দিয়ে অসমর্থ হলেও তাঁদের সৎকার করতে তাঁর কোন অসুবিধা হয়নি।

শ্লোক ১০

কৃষ্ণঞ্চ তৎপ্রভাবজ্ঞ আসীনং জগদীশ্বরম্।
হৃদিস্থং পূজয়ামাস মায়য়োপাত্তবিগ্রহম্ ॥ ১০ ॥

কৃষ্ণম্—পরমেশ্বর শ্রীকৃষ্ণকে; **চ**—ও; **তৎ**—তাঁর; **প্রভাবজ্ঞঃ**—মহিমা সম্বন্ধে অবগত (ভীষ্ম); **আসীনম্**—উপবিষ্ট; **জগৎ-ঈশ্বরম্**—জগৎপতি; **হৃদি-স্থম্**—হৃদয়ে অবস্থিত; **পূজয়াম্-আস**—পূজা করেছিলেন; **মায়য়া**—অন্তরঙ্গা শক্তির প্রভাবে; **উপাত্ত**—প্রকাশ করেছিলেন; **বিগ্রহম্**—রূপ।

অনুবাদ

পরমেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ প্রত্যেকেরই হৃদয়ে অধিষ্ঠিত রয়েছেন, তবুও তিনি তাঁর অন্তরঙ্গা শক্তিবলে নিজ অপ্রাকৃত স্বরূপ প্রকাশিত করে থাকেন। সেই পরমেশ্বরই ভীষ্মদেবের সম্মুখে উপবিষ্ট ছিলেন, এবং যেহেতু ভীষ্মদেব তাঁর মহিমা সম্বন্ধে অবগত তাই তিনি যথাযোগ্যভাবে শ্রীকৃষ্ণের পূজা করলেন।

তাৎপর্য

ভগবানের সর্বশক্তিমত্তা প্রদর্শিত হয় সর্বস্থানে তাঁর উপস্থিতির দ্বারা। তিনি সর্বদাই তাঁর নিত্য ধাম গোলোক বৃন্দাবনে বিরাজ করেন, আবার একই সঙ্গে তিনি প্রতিটি

জীবের হৃদয়ে বিরাজ করেন, এমনকি অদৃশ্য পরমাণুর মধ্যেও তিনি বিরাজ করেন। এই জড় জগতে যখন তিনি তাঁর নিত্য চিন্ময় রূপ প্রকাশ করেন তখন তিনি তা করেন তাঁর অন্তরঙ্গা শক্তির দ্বারা। তাঁর নিত্য রূপের সঙ্গে বহিরঙ্গা শক্তি বা জড়া প্রকৃতির কোন সম্পর্ক নেই। সেই সমস্ত তত্ত্ব ভীষ্মদেব জানতেন, তাই তিনি যথাযথভাবে তাঁর পূজা করেছিলেন।

শ্লোক ১১

পাণ্ডুপুত্রানুপাসীনান্ প্রশ্রয়প্রেমসঙ্গতান্ ।
অভ্যাচষ্টানুরাগাশ্রৈরন্ধীভূতেন চক্ষুষা ॥ ১১ ॥

পাণ্ডু-পুত্রান্—পাণ্ডবদের; **উপাসীনান্**—নিকটে নিঃশব্দে উপবিষ্ট; **প্রশ্রয়**—অভিভূত; **প্রেম**—প্রেমানুভূতি; **সঙ্গতান্**—সমবেত হয়ে; **অভ্যাচষ্ট**—অভিনন্দিত; **অনুরাগ**—অনুভূতি সহকারে; **অশ্রৈঃ**—প্রেমাশ্রুর দ্বারা; **অন্ধীভূতেন**—আচ্ছন্ন হয়েছিলেন; **চক্ষুষা** —চক্ষু দ্বারা।

অনুবাদ

মহারাজ পাণ্ডুর পুত্রেরা তাঁদের মরণোন্মুখ পিতামহের প্রতি প্রীতিবশত অভিভূত হয়ে নিঃশব্দে কাছেই বসে ছিলেন। তাই দেখে ভীষ্মদেব ভাবাবেগে তাঁদের অভিনন্দন জানালেন। তাঁদের প্রতি প্রীতি এবং স্নেহের বশে তিনি অভিভূত হয়েছিলেন বলে তাঁর চোখে ভাবোচ্ছ্বাসের অশ্রু দেখা দিল।

তাৎপর্য

মহারাজ পাণ্ডুর যখন মৃত্যু হয়, তখন তাঁর সমস্ত পুত্রেরা ছিলেন শিশু, এবং তাই তাঁরা স্বাভাবিকভাবেই রাজপরিবারের প্রবীণ সদস্যদের বিশেষ করে ভীষ্মদেবের স্নেহে পালিত হয়েছিলেন। পরে পাণ্ডবেরা যখন বড় হয়েছিলেন, তখন ধূর্ত দুর্যোধন এবং তার গোষ্ঠী তাঁদের প্রতারণা করে। পাণ্ডবেরা যে নির্দোষ ও অন্যায়ভাবে তাঁদের কষ্ট দেওয়া হচ্ছে তা জানা সত্ত্বেও রাজনৈতিক কারণে ভীষ্মদেব পাণ্ডবদের পক্ষ অবলম্বন করতে পারেননি। তাঁর জীবনের অন্তিম সময়ে ভীষ্মদেব যখন মহারাজ যুধিষ্ঠির প্রমুখ তাঁর অত্যন্ত যশস্বী পৌত্রদের তাঁর পার্শ্বে উপবিষ্ট অবস্থায় দেখেছিলেন, তখন সেই মহান যোদ্ধা পিতামহ তাঁর প্রেমাশ্রু সংবরণ করতে পারেননি। তাঁর চোখ থেকে অবিশ্রান্ত ধারায় অশ্রু ঝরে পড়ছিল। তাঁর অতি

পুণ্যবান পৌত্রদের মহা দুঃখ-দুর্দশার কথা তাঁর স্মরণ হয়েছিল। দুর্যোধনের পরিবর্তে যুধিষ্ঠিরকে রাজসিংহাসনে অধিষ্ঠিত দেখে তিনি অবশ্যই অত্যন্ত সন্তুষ্ট হয়েছিলেন, এবং তাই তিনি তাঁদের অভিনন্দন জানিয়েছিলেন।

শ্লোক ১২

অহো কষ্টমহোঽন্যায্যং যদ্যূয়ং ধর্মনন্দনাঃ ।
জীবিতুং নার্হথ ক্লিষ্টং বিপ্রধর্মাচ্যুতাশ্রয়াঃ ॥ ১২ ॥

অহো—হায়; **কষ্টম্**—কী ভীষণ দুঃখ-কষ্ট; **অহো**—আহা; **অন্যায্যম্**—কী ভীষণ অন্যায়; **যৎ**—তার ফলে; **যূয়ম্**—তোমরা পুণ্যাত্মারা; **ধর্ম-নন্দনাঃ**—ধর্ম-পুত্রেরা; **জীবিতুম্**—জীবন ধারণের জন্য; **ন**—না; **অর্হথ**—যোগ্য; **ক্লিষ্টম্**—দুঃখে জর্জরিত; **বিপ্র**—ব্রাহ্মণগণ; **ধর্ম**—পুণ্য; **অচ্যুত**—ভগবান; **আশ্রয়াঃ**—রক্ষিত হয়ে।

অনুবাদ

ভীষ্মদেব বললেন—হায়, সাক্ষাৎ ধর্মের পুত্র হওয়ার ফলে তোমরা কী ভীষণ দুঃখ-কষ্ট এবং কী ভীষণ অন্যায় আচরণ ভোগ করেছ। সেই ভয়ঙ্কর অবস্থার মধ্যে তোমাদের জীবিত থাকার কথা নয়, তবুও ব্রাহ্মণ, ভগবান এবং ধর্মের দ্বারাই তোমরা সুরক্ষিত হয়েছিলে।

তাৎপর্য

কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে যে ব্যাপক নরহত্যা হয়েছিল, সেজন্য মহারাজ যুধিষ্ঠির অত্যন্ত বিচলিত হয়েছিলেন। ভীষ্মদেব তা বুঝতে পেরেছিলেন, এবং তাই তিনি প্রথমে মহারাজ যুধিষ্ঠিরের ভয়ঙ্কর দুঃখ-দুর্দশার কথা উল্লেখ করেছিলেন। অন্যায়ভাবে তাঁকে এই সমস্ত বিপদে ফেলা হয়েছিল, এবং সেই অন্যায়ের প্রতিকারের জন্যই কুরুক্ষেত্রের রণাঙ্গনে যুদ্ধ হয়েছিল। তাই সেই ব্যাপক হত্যার জন্য তাঁর অনুতাপ করার কোন কারণ ছিল না। তিনি পাণ্ডবদের বিশেষভাবে বোঝাতে চেয়েছিলেন যে তাঁরা সর্বদা ব্রাহ্মণ, ভগবান এবং ধর্মনীতির দ্বারা রক্ষিত ছিলেন। যতক্ষণ তাঁরা এই গুরুত্বপূর্ণ তিনটি বিষয় দ্বারা রক্ষিত, ততক্ষণ তাঁদের নিরাশ হওয়ার কোন কারণ নেই। এইভাবে ভীষ্মদেব মহারাজ যুধিষ্ঠিরের নৈরাশ্য দূর করার জন্য তাঁকে অনুপ্রাণিত করেছিলেন। যতক্ষণ মানুষ সদ্-ব্রাহ্মণ এবং বৈষ্ণবদের দ্বারা পরিচালিত হয়ে, ধর্মনীতির অনুসরণ করে, ভগবানের ইচ্ছার সঙ্গে পূর্ণরূপে যুক্ত থাকে, ততক্ষণ

যত দুর্দশাই আসুক না কেন তাদের নিরাশ হওয়ার কোন কারণ নেই। এই সম্প্রদায়ের একজন মহাজনরূপে ভীষ্মদেব পাণ্ডবদের সে কথাই বোঝাতে চেয়েছিলেন।

শ্লোক ১৩

সংস্থিতেঽতিরথে পাণ্ডৌ পৃথা বালপ্রজা বধূঃ।
যুষ্মৎকৃতে বহূন্ ক্লেশান্ প্রাপ্তা তোকবতী মুহুঃ ॥ ১৩ ॥

সংস্থিতে—মৃত্যুর পর; **অতি-রথে**—মহারথী; **পাণ্ডৌ**—পাণ্ডুর; **পৃথা**—কুন্তী; **বাল-প্রজা**—শিশু সন্তানগণ; **বধূঃ**—আমার পুত্রবধূ; **যুষ্মৎকৃতে**—তোমাদের জন্য; **বহূন্**—বহুবিধ; **ক্লেশান্**—দুঃখ-কষ্ট; **প্রাপ্তা**—ভোগ করেছে; **তোক-বতী**—সাবালক পুত্রেরা থাকা সত্ত্বেও; **মুহুঃ**—নিরন্তর।

অনুবাদ

মহারথী পাণ্ডুর মৃত্যুর পর আমার পুত্রবধূ কুন্তী বহু শিশু-সন্তানাদিসহ বিধবা হন, এবং সেইজন্য বহু দুঃখ-কষ্ট তিনি ভোগ করেন। আর যখন তোমরা বড় হয়ে উঠলে, তখনও তোমাদের কার্যকলাপের জন্য তাঁকে প্রভূত দুঃখ-কষ্ট ভোগ করতে হয়েছে।

তাৎপর্য

কুন্তীদেবীর দুঃখ-দুর্দশার জন্য দ্বিগুণ শোক প্রকাশ করা হয়েছে। অল্প বয়সে বিধবা হওয়ার ফলে এবং রাজপরিবারে তাঁর শিশুপুত্রদের লালন-পালন করতে গিয়ে তাঁকে ভীষণ কষ্ট ভোগ করতে হয়েছিল। তাঁর পুত্ররা যখন বড় হয়, তখনও তাঁর পুত্রদের কার্যকলাপের জন্য তাঁকে কষ্ট ভোগ করতে হয়। তার অর্থ হচ্ছে যে কষ্ট ভোগ করাই তাঁর ভাগ্যে ছিল। মানুষের কর্তব্য হচ্ছে বিচলিত না হয়ে সমস্ত দুঃখ-কষ্ট সহ্য করা।

শ্লোক ১৪

সর্বং কালকৃতং মন্যে ভবতাঞ্চ যদপ্রিয়ম্।
সপালো যদ্বশে লোকো বায়োরিব ঘনাবলিঃ ॥ ১৪ ॥

সর্বম্—এই সমস্ত; **কাল-কৃতম্**—অনিবার্য কালের প্রভাবে সংঘটিত; **মন্যে**—আমি মনে করি; **ভবতাম্ চ**—তোমাদের জন্যও; **যৎ**—যা; **অপ্রিয়ম্**—অপ্রিয়; **স-পালঃ**—

লোকপালগণসহ; **যৎ-বশে**—সেই কালের বশবর্তী; **লোকঃ**—প্রতিটি গ্রহের প্রতিটি জীব; **বায়োঃ**—বায়ুর দ্বারা; **ইব**—মতো; **ঘন-আবলিঃ**—মেঘরাশি।

অনুবাদ

আমার মতে, এই সবই ঘটেছে অনিবার্য কালের প্রভাবে, যার দ্বারা প্রতিটি গ্রহের প্রতিটি জীব নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে, ঠিক যেমন মেঘরাশি বায়ুর দ্বারা বাহিত হয়ে থাকে।

তাৎপর্য

সমস্ত গ্রহগুলি যেমন কালের প্রভাবে নিয়ন্ত্রিত হয়ে থাকে, ঠিক তেমনই ব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত দেশও কালের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। বড় বড় সমস্ত গ্রহগুলি এমনকি সূর্য পর্যন্ত বায়ুর শক্তি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়, ঠিক যেমন বায়ু মেঘকে বহন করে নিয়ে যায়। তেমনই কাল বায়ু এবং অন্যান্য উপাদানগুলির কার্যকলাপ নিয়ন্ত্রণ করে থাকে। তাই সবকিছুই মহাকালের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়, যা হচ্ছে এই জড় জগতে ভগবানের শক্তিশালী এক প্রতিনিধি। তাই কালের অচিন্ত্য ক্রিয়ার প্রভাবে যা ঘটেছে তার জন্য যুধিষ্ঠির মহারাজের দুঃখিত হওয়া উচিত ছিল না। জড় জগতের বন্ধনে জীব যতক্ষণ আবদ্ধ থাকে, ততক্ষণ তাকে কালের ক্রিয়া এবং প্রতিক্রিয়া সহ্য করতে হয়। যুধিষ্ঠির মহারাজের এমন মনে করা উচিত ছিল না যে পূর্ব জন্মে পাপ করার জন্য তাঁকে এই জন্মে তার ফল ভোগ করতে হয়েছিল। এমনকি সবচাইতে পুণ্যবান ব্যক্তিকেও পর্যন্ত জড়া-প্রকৃতির এই অবস্থা ভোগ করতে হয়। তবে পুণ্যবান ব্যক্তি ভগবানের প্রতি শ্রদ্ধাপরায়ণ, কেননা, তিনি ধর্মনীতি-পরায়ণ সদ্ ব্রাহ্মণ এবং বৈষ্ণবদের দ্বারা পরিচালিত হন। এই তিনটি পথ-প্রদর্শক নীতিই জীবনের লক্ষ্য হওয়া উচিত। শাশ্বত কালের মোহময়ী ক্রিয়ার দ্বারা কখনো বিচলিত হওয়া উচিত নয়। এমনকি ব্রহ্মার মতো ব্রহ্মাণ্ডের মহান নিয়ন্তা পর্যন্ত কালের নিয়ন্ত্রণাধীন; তাই ধর্মনীতির আদর্শ অনুসরণকারী হওয়া সত্ত্বেও এইভাবে কাল কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত হওয়ার জন্য ক্ষুব্ধ হওয়া উচিত নয়।

শ্লোক ১৫

যত্র ধর্মসুতো রাজা গদাপাণির্বৃকোদরঃ।
কৃষ্ণোঽস্ত্রী গাণ্ডিবং চাপং সুহৃৎকৃষ্ণস্ততো বিপৎ ॥ ১৫ ॥

যত্র—যেখানে; **ধর্ম-সুতঃ**—ধর্মরাজের পুত্র; **রাজা**—নৃপতি; **গদা-পাণিঃ**—গদাধারী; **বৃকোদরঃ**—ভীম; **কৃষ্ণঃ**—অর্জুন; **অস্ত্রী**—অস্ত্রধারী; **গাণ্ডিবম্**—গাণ্ডিব; **চাপম্**—ধনুক; **সুহৃৎ**—শুভাকাঙ্ক্ষী; **কৃষ্ণঃ**—পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ; **ততঃ**—সেখানে; **বিপৎ**—বিপদ।

অনুবাদ

অনিবার্য কালের প্রভাব কি অদ্ভুত। এই প্রভাব অপরিবর্তনীয়—তা না হলে, ধর্মপুত্র রাজা যুধিষ্ঠির যেখানে, গদাধারী মহাযোদ্ধা ভীমসেন ও শক্তিশালী অস্ত্র গাণ্ডীবধারী মহাধনুর্ধর অর্জুন যেখানে, এবং সর্বোপরি পাণ্ডবদের সাক্ষাৎ সুহৃদ পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যেখানে, সেখানে প্রতিকূলতা হয় কি করে?

তাৎপর্য

পাণ্ডবদের জাগতিক এবং পারমার্থিক সম্পদের কোন অভাব ছিল না। জাগতিক দিক দিয়ে তাঁরা সুসজ্জিত ছিলেন, কেননা তাঁদের মধ্যে ভীম এবং অর্জুনের মতো দুজন মহান যোদ্ধা ছিলেন। আর পারমার্থিক দিক দিয়ে মহারাজ যুধিষ্ঠির স্বয়ং ছিলেন ধর্মের মূর্তিমান প্রতীক এবং সর্বোপরি পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাঁদের শুভাকাঙ্ক্ষীরূপে স্বয়ং তাঁদের জন্য চিন্তা করতেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও পাণ্ডবদের বহু বিপদের সম্মুখীন হতে হয়েছিল। পুণ্যবল, লোকবল, সুদক্ষ পরিচালনার বল এবং শ্রীকৃষ্ণের প্রত্যক্ষ অধ্যক্ষতায় অস্ত্রবল থাকা সত্ত্বেও পাণ্ডবদের বহু দুঃখ-দুর্দশা ভোগ করতে হয়েছিল, যা একমাত্র কালের প্রভাব বলে বিশ্লেষণ করা যায়। কাল ভগবান থেকে অভিন্ন, এবং তাই কালের প্রভাব হচ্ছে ভগবানেরই অহৈতুকী ইচ্ছা। যা মানুষের নিয়ন্ত্রণের অতীত, তা নিয়ে শোক করার কিছুই নেই।

শ্লোক ১৬

ন হ্যস্য কর্হিচিদ্রাজন্ পুমান্ বেদ বিধিৎসিতম্ ।
যদ্বিজিজ্ঞাসয়া যুক্তা মুহ্যন্তি কবয়োঽপি হি ॥ ১৬ ॥

ন—না; হি—অবশ্যই; অস্য—তাঁর; কর্হিচিৎ—কোন; রাজন্—হে রাজন্; পুমান্—যে কেউ; বেদ—জানে; বিধিৎসিতম্—পরিকল্পনা; যৎ—যা; বিজিজ্ঞাসয়া—বিশদ অনুসন্ধিৎসা সহকারে; যুক্তাঃ—নিয়োজিত; মুহ্যন্তি—বিভ্রান্ত হন; কবয়ঃ—মহান্ দার্শনিকগণ; অপি—এমনকি; হি—অবশ্যই।

অনুবাদ

হে রাজন্, পরমেশ্বরের (শ্রীকৃষ্ণের) পরিকল্পনা কেউই জানতে পারে না। এমনকি, মহান্ দার্শনিকেরাও বিশদ অনুসন্ধিৎসা সহকারে নিয়োজিত থেকেও কেবলই বিভ্রান্ত হন।

তাৎপর্য

তাঁর পূর্বকৃত পাপকর্ম এবং তার ফলজনিত দুঃখ-দুর্দশা ভোগ ইত্যাদি সম্বন্ধে মহারাজ যুধিষ্ঠিরের বিভ্রান্তি দ্বাদশ মহাজনের অন্যতম ভীষ্মদেব কর্তৃক অনুমোদিত হয় নি। ভীষ্মদেব মহারাজ যুধিষ্ঠিরকে বোঝাতে চেয়েছিলেন যে অনাদিকাল ধরে কেউই, এমনকি শিব এবং ব্রহ্মার মতো দেবতারাও ভগবানের প্রকৃত পরিকল্পনা নির্ণয় করতে পারেন নি। সুতরাং আমাদের পক্ষে তা বোঝা কি করে সম্ভব? সে সম্বন্ধে অনুসন্ধান করাও নিরর্থক। এমনকি গভীর দার্শনিক অনুসন্ধানের মাধ্যমেও ঋষিগণ ভগবানের পরিকল্পনা নিশ্চিত রূপে নির্ণয় করতে পারেন না। তাই সর্বশ্রেষ্ঠ পন্থা হচ্ছে কোনরকম যুক্তি-তর্ক না করে কেবল ভগবানের নির্দেশ পালন করে যাওয়া। পাণ্ডবদের দুঃখ-দুর্দশা কখনই তাঁদের পূর্বকৃত কর্মের জন্য হয় নি। ভগবানের পরিকল্পনা ছিল পৃথিবীতে ধর্মের সংস্থাপন করা, এবং তাই ধর্মের জয় প্রতিষ্ঠা করার জন্য তাঁর ভক্তদের সাময়িকভাবে দুঃখ-কষ্ট ভোগ করতে হয়েছিল। ধর্মের জয় দর্শন করে ভীষ্মদেব অবশ্যই অত্যন্ত প্রসন্ন হয়েছিলেন, এবং তিনি নিজে যদিও যুধিষ্ঠির মহারাজের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিলেন, তথাপি তাঁকে রাজসিংহাসনে অধিষ্ঠিত দেখে তিনি অত্যন্ত আনন্দিত হয়েছিলেন। ভীষ্মদেবের মতো মহান্ যোদ্ধাও কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে জয়লাভ করতে পারেন নি, কেননা ভগবান দেখাতে চেয়েছিলেন যে অধর্ম কখনো ধর্মকে পরাস্ত করতে পারে না, তা যেই সে চেষ্টা করুক না কেন। ভীষ্মদেব ছিলেন ভগবানের একজন মহান ভক্ত, কিন্তু ভগবানের ইচ্ছায় তিনি পাণ্ডবদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিলেন, কেননা ভগবান দেখাতে চেয়েছিলেন যে ভীষ্মদেবের মতো যোদ্ধাও ভুল পক্ষ অবলম্বন করলে জয়লাভ করতে পারেন না।

শ্লোক ১৭

তস্মাদিদং দৈবতন্ত্রং ব্যবস্য ভরতর্ষভ ।
তস্যানুবিহিতোঽনাথা নাথ পাহি প্রজাঃ প্রভো ॥ ১৭ ॥

তস্মাৎ—অতএব; **ইদম্**—এই; **দৈব-তন্ত্রম্**—দৈব কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত; **ব্যবস্য**—নিশ্চিতভাবে; **ভরত-ঋষভ**—হে ভরতকুলতিলক; **তস্য**—তাঁর দ্বারা; **অনুবিহিতঃ**—ইচ্ছা অনুসারে; **অনাথাঃ**—অসহায়; **নাথ**—হে প্রভু; **পাহি**—পালন কর; **প্রজাঃ**—প্রজাদের; **প্রভো**—হে প্রভু।

অনুবাদ

হে ভরতকুলতিলক (যুধিষ্ঠির), আমি তাই মনে করি যে এ সবই পরমেশ্বর ভগবানের সঙ্কল্পের অন্তর্গত। পরমেশ্বর ভগবানের অবিচিন্ত্য সঙ্কল্পকে স্বীকার করে নিয়ে তোমাকে তা অবশ্যই মেনে চলতে হবে। তুমি এখন সর্বোচ্চ প্রশাসনিক পদে অধিষ্ঠিত হয়েছ হে নাথ, এখন যারা অনাথ হয়েছে, সেই সব প্রজাদের যত্ন এবার তোমাকে নিতে হবে।

তাৎপর্য

একটি জনপ্রিয় প্রবাদে বলা হয় যে, শাশুড়ী নিজের কন্যাকে শেখানোর মাধ্যমে পুত্রবধূকে শিক্ষা দেন। তেমনই ভগবান তাঁর ভক্তকে শিক্ষা দেওয়ার মাধ্যমে সমগ্র জগতকে শিক্ষা দিয়ে থাকেন। ভক্তকে ভগবানের কাছ থেকে নতুন করে কোনকিছু শিখতে হয় না, কেননা ভগবান তাঁর ঐকান্তিক ভক্তকে সর্বদা হৃদয় থেকে শিক্ষা দিয়ে থাকেন। তাই যখনই ভক্তকে শিক্ষা দেওয়ার অভিনয় করা হয়, যেমন *শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা* শিক্ষা দেওয়ার ব্যাপারে করা হয়েছিল, তা অল্পবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষদের শিক্ষা দেওয়ার জন্যই করা হয়ে থাকে। তাই ভক্তের কর্তব্য হচ্ছে ভগবানের দেওয়া সমস্ত দুঃখ-দুর্দশাকে আশীর্বাদ বলে মনে করে অকুণ্ঠ চিত্তে তা গ্রহণ করা। ভীষ্মদেব পাণ্ডবদের উপদেশ দিয়েছিলেন যে তাঁরা যেন নির্দ্বিধায় শাসনভার গ্রহণ করেন। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের ফলে দীন-হীন প্রজারা অরক্ষিত ছিল, এবং তারা মহারাজ যুধিষ্ঠিরের রাজ্য গ্রহণের প্রতীক্ষা করছিল। ভগবানের শুদ্ধ ভক্ত সমস্ত দুঃখ-দুর্দশাকে ভগবানের কৃপা বলে গ্রহণ করেন। যেহেতু পরমেশ্বর ভগবান হচ্ছেন পরম, তাই ভক্ত এবং ভগবানের মধ্যে কোনরকম লৌকিক ভেদ নেই।

শ্লোক ১৮

এষ বৈ ভগবান্ সাক্ষাদাদ্যো নারায়ণঃ পুমান্ ।
মোহয়ন্মায়য়া লোকং গূঢ়শ্চরতি বৃষ্ণিষু ॥ ১৮ ॥

এষঃ—এই; **বৈ**—নিশ্চিতভাবে; **ভগবান্**—পরমেশ্বর ভগবান; **সাক্ষাৎ**—স্বয়ং; **আদ্যঃ**—আদি; **নারায়ণঃ**—পরমেশ্বর ভগবান (যিনি জলে শয়ন করেন); **পুমান্**—পরম ভোক্তা পুরুষ; **মোহয়ন্**—বিমুগ্ধকর; **মায়য়া**—তাঁর নিজের সৃষ্ট মায়াশক্তির দ্বারা; **লোকম্**—বিশ্বচরাচর; **গূঢ়ঃ**—যাঁর মহিমা অবগত হওয়া সম্ভব নয়; **চরতি**—বিচরণ করেন; **বৃষ্ণিষু**—বৃষ্ণিকুলে।

অনুবাদ

এই শ্রীকৃষ্ণ সাক্ষাৎ অচিন্ত্য, আদি পুরুষ। তিনি আদি নারায়ণ, পরম ভোক্তা। কিন্তু তিনি তাঁর নিজের সৃষ্ট মায়াশক্তির প্রভাবে আমাদের মুগ্ধ করে বৃষ্ণিকুলেরই একজনের মতো হয়ে তাঁদের মাঝে বিচরণ করছেন।

তাৎপর্য

বৈদিক জ্ঞান অবরোহ পন্থায় আহরণ করা হয়। আচার্যদের কাছ থেকে গুরু-শিষ্য-পরম্পরা ধারায় বৈদিক জ্ঞান এক আদর্শ পন্থায় আহরণ করা হয়। এই জ্ঞান কখনই কোন মতবাদ নয়, যা মূর্খ মানুষেরা অনেক সময় ভ্রান্তিবশত মনে করে থাকে। পিতার পরিচয় মাতাই সবচাইতে ভালভাবে দিতে পারেন। এই প্রকার গুহ্য জ্ঞানের তিনিই প্রকৃত অধিকারিণী। অতএব যথাযথ সূত্রে যে জ্ঞান লাভ হয় তা মতবাদ-মূলক নয়। *শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার* চতুর্থ অধ্যায়ে (৪/২) সেই তত্ত্ব প্রতিপন্ন হয়েছে। জ্ঞান আহরণের আদর্শ পন্থা হচ্ছে গুরু-পরম্পরা ধারায় তত্ত্বজ্ঞানী গুরুদেবের কাছ থেকে সেই জ্ঞান লাভ করা। সেই পদ্ধতি বিশ্বের সর্বত্রই স্বীকৃত হয়েছে, কেবল মূর্খ তার্কিকেরাই তার বিরুদ্ধে বলে। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায় যে আধুনিক অন্তরীক্ষ-যান আকাশে উড়তে পারে, এবং বৈজ্ঞানিকেরা যখন বলে যে তারা চাঁদের অপর পৃষ্ঠে ভ্রমণ করেছে তখন মানুষেরা তাদের সেই কাহিনী অন্ধের মতো বিশ্বাস করে, কেননা তারা আধুনিক বৈজ্ঞানিকদের এই বিষয়ে অধিকারী বলে স্বীকার করেছে। অধিকারীরা বলে, আর সাধারণ মানুষ তা বিশ্বাস করে। কিন্তু বৈদিক সত্যের বিষয়ে, তাদের তা বিশ্বাস না করার শিক্ষা দেওয়া হয়েছে। আবার যদি বা তারা স্বীকারও করে, তাহলেও তার ভিন্ন প্রকার ব্যাখ্যা করে থাকে। প্রতিটি মানুষই প্রত্যক্ষভাবে বৈদিক জ্ঞান অনুভব করতে চায়, কিন্তু মূর্খতাবশত তারা তা অস্বীকার করে। তার অর্থ হচ্ছে যে বিপথে পরিচালিত মানুষেরা এক অধিকারীকে বিশ্বাস করে, এবং তারা হচ্ছে বৈজ্ঞানিক; কিন্তু তারা বৈদিক প্রমাণ স্বীকার করতে চায় না। তার ফলে মানুষ অধঃপতিত হয়েছে।

এখানে একজন তত্ত্ববেত্তা মহাজন শ্রীকৃষ্ণের সম্বন্ধে বলতে গিয়ে তাঁকে পরমেশ্বর ভগবান এবং আদি নারায়ণ বলে নির্দেশ করছেন। শঙ্করাচার্যের মতো একজন নির্বিশেষবাদীও *শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার* ভাষ্য রচনা করতে গিয়ে শুরুতে বলেছেন যে নারায়ণ, পরমেশ্বর ভগবান, জড় সৃষ্টি অতীত।

নারায়ণঃ পরোঽব্যক্তাদ্ অণ্ডমব্যক্ত-সম্ভবম্ ।
অণ্ডস্যান্তস্ত্বিমে লোকাঃ সপ্তদ্বীপা চ মেদিনী ॥

(শঙ্কর-ভাষ্য-ভঃ গীঃ)

এই ব্রহ্মাণ্ড একটি জড় সৃষ্টি, কিন্তু নারায়ণ এই প্রকার ভৌতিক সৃষ্টির অতীত।

ভীষ্মদেব হচ্ছেন দিব্য জ্ঞানের তত্ত্ব সম্বন্ধে অবগত দ্বাদশ মহাজনদের অন্যতম। তিনি যে শ্রীকৃষ্ণকে আদি পরমেশ্বর ভগবান বলে প্রতিপন্ন করেছেন, তা নির্বিশেষবাদী শঙ্করাচার্য কর্তৃকও সমর্থিত হয়েছে। অন্য সমস্ত আচার্যেরাও এই উক্তি সমর্থন করেছেন, এবং তার ফলে ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে আদিপুরুষ পরমেশ্বর ভগবান বলে স্বীকার না করার কোন অবকাশ নেই। ভীষ্মদেব বলেছেন যে তিনি হচ্ছেন আদি নারায়ণ। সে কথা ব্রহ্মাজীও *শ্রীমদ্ভাগবতে* (১০/১৪/১৪) প্রতিপন্ন করেছেন। শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন আদি নারায়ণ। বৈকুণ্ঠলোকে অসংখ্য নারায়ণ রয়েছেন, যাঁরা সকলেই এক এবং অভিন্ন ভগবান, এবং তাঁরা আদিপুরুষ শ্রীকৃষ্ণের অংশ। শ্রীকৃষ্ণের প্রথম বিস্তার হচ্ছেন বলদেব, এবং বলদেব থেকে সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন, অনিরুদ্ধ, বাসুদেব, নারায়ণ, পুরুষ, রাম, নৃসিংহ আদি বহু রূপ প্রকাশিত হয়। এই সমস্ত অংশ-প্রকাশই *বিষ্ণু-তত্ত্ব*, এবং শ্রীকৃষ্ণ এই সমস্ত অংশ-প্রকাশের আদি উৎস। তাই তিনি হচ্ছেন সাক্ষাৎ পরমেশ্বর ভগবান। তিনি জড় জগতের স্রষ্টা এবং সমস্ত বৈকুণ্ঠলোকের অধিষ্ঠাতৃ বিগ্রহস্বরূপ নারায়ণ। তাই মনুষ্য সমাজে তাঁর লীলা মোহজনক। তাই *শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায়* ভগবান বলেছেন যে, মূর্খ মানুষেরা তাঁর পরম ভাব না জেনে তাঁকে একজন সাধারণ মানুষ বলে মনে করে।

শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধে মোহের কারণ হচ্ছে তাঁর তটস্থা নামক তৃতীয় শক্তির উপর অন্তরঙ্গা এবং বহিরঙ্গা—এই দুই শক্তির ক্রিয়া। জীবেরা হচ্ছে তাঁর তটস্থা শক্তির প্রকাশ, এবং তার ফলে তারা কখনো তাঁর অন্তরঙ্গা শক্তির দ্বারা এবং কখনো বহিরঙ্গা শক্তির দ্বারা মোহাচ্ছন্ন হয়। তাঁর অন্তরঙ্গা শক্তিজনিত মোহের ফলে শ্রীকৃষ্ণ নিজেকে অসংখ্য নারায়ণরূপে প্রকাশ করে চিজ্জগতে জীবের অপ্রাকৃত প্রেমময়ী সেবা স্বীকার করেন অথবা ভাব বিনিময় করেন। আর তাঁর বহিরঙ্গা শক্তি বিস্তারের মাধ্যমে তিনি তাঁর সঙ্গে বিভিন্ন যোনিসম্ভূত জীবদের হারিয়ে যাওয়া সম্পর্কের পুনঃপ্রতিষ্ঠা করার জন্য মনুষ্য, পশু অথবা দেবতাদের মধ্যে অবতরণ করেন। ভীষ্মদেবের মতো মহাজনেরা কিন্তু ভগবানের কৃপায় তাঁর এই মোহময়ী প্রভাব থেকে নিষ্কৃতি পান।

শ্লোক ১৯

অস্যানুভাবং ভগবান্ বেদ গুহ্যতমং শিবঃ।
দেবর্ষির্নারদঃ সাক্ষাদ্ভগবান্ কপিলো নৃপ ॥ ১৯ ॥

অস্য—তাঁর; **অনুভাবম্**—মহিমারাজি; **ভগবান্**—পরম শক্তিমান; **বেদ**—জানেন; **গুহ্য-তমম্**—অতি নিগূঢ়; **শিবঃ**—শিব; **দেব-ঋষিঃ**—দেবতাদের মধ্যে যিনি ঋষি; **নারদঃ**—নারদ; **সাক্ষাৎ**—স্বয়ং; **ভগবান্**—পরম পুরুষ ভগবান; **কপিলঃ**—কপিল; **নৃপ**—হে রাজন্।

অনুবাদ

হে রাজন্, শিব, দেবর্ষি নারদ এবং ভগবদাবতার কপিলদেব আদি সকলেই সাক্ষাৎ সংস্পর্শের মাধ্যমে তাঁর অতি নিগূঢ় মহিমারাজি সম্বন্ধে অবগত।

তাৎপর্য

ভগবানের শুদ্ধ ভক্তেরা সকলেই হচ্ছেন ভাব, অর্থাৎ যাঁরা বিভিন্ন প্রকার দিব্য প্রেমময়ী সেবার মাধ্যমে ভগবানের মহিমা সম্বন্ধে অবগত। ভগবানের যেমন অসংখ্য অংশ-বিস্তার রয়েছেন, তেমনই তাঁর অসংখ্য শুদ্ধভক্তও রয়েছেন, যাঁরা বিভিন্ন রসে তাঁর সেবায় যুক্ত। ভগবানের বারোজন মহান্ ভক্ত রয়েছেন, এবং তাঁরা হলেন ব্রহ্মা, নারদ, শিব, কুমার, কপিল, মনু, প্রহ্লাদ, ভীষ্ম, জনক, শুকদেব গোস্বামী, বলি মহারাজ এবং যমরাজ। ভীষ্মদেব যদিও তাঁদের মধ্যে অন্যতম, কিন্তু তিনি বারোজনের মধ্যে এখানে কেবল তিনটি মুখ্য নামের উল্লেখ করেছেন, যাঁরা ভগবানের মহিমা সম্বন্ধে অবগত। আধুনিক যুগের মহান আচার্যদের অন্যতম শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর অনুভাবের বিশ্লেষণ করে বলেছেন যে, ভগবানের মহিমা সর্বপ্রথম আনন্দ-বিভোর ভক্ত অনুভব করেন, যা স্বেদ, কম্প, অশ্রু, পুলক আদি লক্ষণের মাধ্যমে প্রকাশিত হয়। ভগবানের মহিমা অবিচলিতভাবে উপলব্ধি করার মাধ্যমে সেই অনুভাব ক্রমশ বর্ধিত হয়। ভাবের এই বিনিময় যশোদা এবং ভগবানের মধ্যে হয়েছিল রজ্জু দ্বারা ভগবানকে বন্ধন করার লীলায়, এবং ভগবানের সঙ্গে অর্জুনের সারথ্য লীলায়। ভগবানের এই মহিমা প্রদর্শিত হয় তাঁর ভক্তের অধীন হওয়ার মাধ্যমে, এবং সেটিও ভগবানের মহিমার আরেকটি বৈশিষ্ট্য। শুকদেব গোস্বামী এবং কুমারগণ দিব্য পদে স্থিত হওয়া সত্ত্বেও আর এক প্রকার ভাবের প্রভাবে পরিবর্তিত হয়ে ভগবানের শুদ্ধ ভক্তে পরিণত হয়েছিলেন। ভগবান যখন তাঁর ভক্তদের বিপদে ফেলেন, সে সময়েও ভক্ত এবং ভগবানের মধ্যে দিব্য ভাবের বিনিময় হয়। ভগবান বলেছেন, "আমি আমার ভক্তকে বিপদে ফেলি, যাতে সে আমার সঙ্গে দিব্য ভাবের প্রভাবে আরও শুদ্ধ হয়।" ভক্তকে জড়জাগতিক দুঃখ-দুর্দশায় ফেলার ফলে ভগবানকে মোহময়ী জড়জাগতিক সম্বন্ধ থেকে তাঁকে উদ্ধার করতে হয়। জড় সম্পর্ক গড়ে ওঠে প্রধানত জড় বিষয়ের উপর নির্ভরশীল

জড় আনন্দকে কেন্দ্র করে। তাই ভগবান যখন জড় বিষয়গুলি প্রত্যাহার করে নেন, তখন ভক্ত সর্বতোভাবে তাঁর প্রেমময়ী সেবার প্রতি আকৃষ্ট হন। এইভাবে ভগবান পতিত জীবকে জড় অস্তিত্বের কলুষ থেকে জোরপূর্বক উদ্ধার করেন। ভগবান কর্তৃক প্রদত্ত ভক্তের দুঃখ পাপময় কার্যকলাপজনিত দুঃখ-দুর্দশা থেকে ভিন্ন। ভগবানের এই সমস্ত মহিমা সম্বন্ধে ব্রহ্মা, শিব, নারদ, কপিল, কুমার এবং ভীষ্ম আদি উল্লিখিত মহাজনেরা অবগত ছিলেন, এবং তাঁদের করুণার প্রভাবেই তা আয়ত্ত করা যায়।

শ্লোক ২০

যং মন্যসে মাতুলেয়ং প্রিয়ং মিত্রং সুহৃত্তমম্ ।
অকরোঃ সচিবং দূতং সৌহৃদাদথ সারথিম্ ॥ ২০ ॥

যম্—যিনি; **মন্যসে**—মনে কর; **মাতুলেয়ম্**—মাতুল-পুত্র; **প্রিয়ম্**—অতি প্রিয়; **মিত্রম্**—সখা; **সুহৃৎ-তমম্**—অতি শুভাকাঙ্ক্ষী; **অকরোঃ**—সম্পাদন করেছেন; **সচিবম্**—মন্ত্রণাদাতা; **দূতম্**—বার্তাবাহক; **সৌহৃদাৎ**—শুভেচ্ছার প্রভাবে; **অথ**—তার ফলে; **সারথিম্**—রথ চালক।

অনুবাদ

হে রাজন্, নিতান্তই মোহের বশে যাঁকে তোমরা তোমাদের মাতুল-পুত্র, অতি ঘনিষ্ঠ বন্ধু, শুভাকাঙ্ক্ষী, মন্ত্রণাদাতা, দূত, হিতকারী, সারথি ইত্যাদি বলে মনে করেছ, তিনিই হচ্ছেন সেই পরম পুরুষ ভগবান শ্রীকৃষ্ণ।

তাৎপর্য

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যদিও পাণ্ডবদের মাতুল-পুত্র, ভ্রাতা, সখা, শুভাকাঙ্ক্ষী, মন্ত্রণাদাতা, দূত, হিতকারীরূপে লীলাবিলাস করছিলেন, তবুও তিনি ছিলেন স্বয়ং পরমেশ্বর ভগবান। তাঁর অহৈতুকী কৃপার প্রভাবে এবং তাঁর অনন্য ভক্তদের প্রতি অনুগ্রহ প্রদর্শন করে তিনি বিভিন্ন প্রকার সেবা সম্পাদন করে থাকেন, কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে, তিনি পরম পুরুষ রূপে তাঁর পরম পদের পরিবর্তন করেছেন। তাঁকে সাধারণ মানুষ বলে চিন্তা করা হচ্ছে অজ্ঞানতার স্থূলতম প্রকাশ।

শ্লোক ২১

সর্বাত্মনঃ সমদৃশো হ্যদ্বয়স্যানহঙ্কৃতেঃ ।
তৎকৃতং মতিবৈষম্যং নিরবদ্যস্য ন ক্বচিৎ ॥ ২১ ॥

সর্বাত্মনঃ—যিনি সকলের হৃদয়ে বিরাজমান; **সম-দৃশঃ**—যিনি সকলের প্রতি সমভাবে কৃপালু; **হি**—অবশ্যই; **অদ্বয়স্য**—অদ্বয় তত্ত্বের; **অনহঙ্কৃতেঃ**—যিনি জড় অভিমানশূন্য; **তৎ-কৃতম্**—তিনি যা কিছু করেন; **মতি**—চেতনা; **বৈষম্যম্**—ভেদবুদ্ধি; **নিরবদ্যস্য**—সর্ব প্রকার আসক্তিরহিত; **ন**—না; **ক্বচিৎ**—কখনো।

অনুবাদ

অদ্বয়-তত্ত্ব পরমেশ্বর ভগবান হওয়ার জন্য তিনি প্রত্যেকের হৃদয়ে বিরাজমান। তিনি সকলের প্রতি সমভাবে করুণাশীল, ভেদবুদ্ধিজনিত অভিমানশূন্য এবং সকল প্রকার আসক্তিরহিত। তাই তিনি যা করেন, তা সবই জড় বিকারশূন্য। তিনি সমভাবাপন্ন পুরুষ।

তাৎপর্য

তিনি যেহেতু পরম তত্ত্ব, তাই কোন কিছুই তাঁর থেকে স্বতন্ত্র নয়। তিনি কৈবল্য; তিনি ব্যতীত কোনকিছুরই অস্তিত্ব নেই। সবকিছুই এবং সকলেই তাঁর শক্তির প্রকাশ, এবং এইভাবে তিনি এই সমস্ত কিছু থেকে অভিন্নভাবে তাঁর শক্তির মাধ্যমে সর্বত্র বিরাজমান। সূর্যকে জানা যায় তার প্রতিটি রশ্মি এবং রশ্মির কণাসমূহের মাধ্যমে। সেইরকম ভগবানও তাঁর বিভিন্ন শক্তির মাধ্যমে পরিব্যাপ্ত হয়ে থাকেন। তিনি পরমাত্মা, পরম অভিভাবকরূপে সকলের মধ্যেই বর্তমান; তাই তিনি প্রতিটি জীবেরই সারথি এবং মন্ত্রণাদাতা। তাই তিনি অর্জুনের সারথিরূপে নিজেকে প্রকাশ করলেও তাঁর পরম পদের কোন পরিবর্তন হয় না। কেবল ভক্তিযোগের ফলেই তিনি সারথি বা দূতরূপে প্রকাশিত হন। যেহেতু তিনি পরমাত্মা এবং তাঁর জড় জাগতিক জীবনে করার কিছুই নেই, তাই তাঁর ক্ষেত্রে উৎকৃষ্ট বা নিকৃষ্ট কার্য বলেও কিছু নেই। পরম পুরুষ হওয়ার ফলে তিনি সর্বপ্রকার মিথ্যা অভিমান থেকে মুক্ত এবং নিজেকে কোনকিছু থেকে ভিন্ন বলে মনে করেন না। এই ধরনের মিথ্যা অভিমান না থাকার জন্য তিনি সমভাবাপন্ন। তাই তিনি তাঁর শুদ্ধ ভক্তের সারথি হওয়ার জন্য নিজেকে নিকৃষ্ট বা হেয় বলে মনে করেন না। করুণাময় ভগবানের কাছ থেকে যে এই ধরনের সেবালাভ করেন, সেটি শুদ্ধ ভক্তেরই মহিমা।

শ্লোক ২২

তথাপ্যেকান্তভক্তেষু পশ্য ভূপানুকম্পিতম্ ।
যন্মেঽসূংস্ত্যজতঃ সাক্ষাৎ কৃষ্ণো দর্শনমাগতঃ ॥ ২২ ॥

তথাপি—তবুও; **একান্ত**—ঐকান্তিক; **ভক্তেষু**—ভক্তদের প্রতি; **পশ্য**—দেখ; **ভূপ**—হে রাজন্; **অনুকম্পিতম্**—কত সহানুভূতিসম্পন্ন; **যৎ**—যার জন্য; **মে**—আমার; **অসূন্**—জীবন; **ত্যজতঃ**—ত্যাগের সময়ে; **সাক্ষাৎ**—স্বয়ং; **কৃষ্ণঃ**—পরমেশ্বর ভগবান; **দর্শনম্**—আমার গোচরীভূত; **আগতঃ**—দয়া করে এসেছেন।

অনুবাদ

সকলের প্রতি সমদর্শী হওয়া সত্ত্বেও তিনি আমার জীবনের অন্তিম সময়ে কৃপা করে আমাকে দর্শন দিতে এসেছেন, কারণ আমি তাঁর ঐকান্তিক সেবক।

তাৎপর্য

পরম তত্ত্ব, পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সকলের প্রতি সমদর্শী হওয়া সত্ত্বেও তাঁর যে ঐকান্তিক ভক্ত সম্পূর্ণভাবে তাঁর শরণাগত হয়েছেন এবং যিনি অন্য কাউকে তাঁর রক্ষাকর্তা এবং প্রভু বলে জানেন না, তাঁর প্রতি অধিক অনুরক্ত। পরমেশ্বর ভগবানকে পালক, সখা এবং প্রভুরূপে স্বীকার করে তাঁর প্রতি অবিচলিত শ্রদ্ধাপরায়ণ হওয়া শাশ্বত জীবনের স্বাভাবিক অবস্থা। সর্বশক্তিমান ভগবানের ইচ্ছাক্রমে জীবকে এমনইভাবে সৃষ্টি করা হয়েছে যে সে যখন সম্পূর্ণরূপে তাঁর আশ্রিত হয় তখনই সে সবচাইতে সুখী হয়।

তার বিপরীত অবস্থাই জীবের অধঃপতনের কারণ। জীবের অধঃপতনের এই প্রবণতা নিজেকে সম্পূর্ণরূপে স্বতন্ত্র বলে মনে করে জড় জগতের উপর প্রভুত্ব করার ফলে দেখা দেয়। তার সমস্ত দুঃখ-দুর্দশার মূল কারণ হচ্ছে তার মিথ্যা অহঙ্কার। মানুষের কর্তব্য সমস্ত অবস্থাতেই ভগবানের প্রতি আকৃষ্ট হওয়া।

ভীষ্মদেব ভগবানের একজন অনন্য ভক্ত ছিলেন বলেই তাঁর মৃত্যুশয্যায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব ঘটেছিল। শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে অর্জুনের দেহগত সম্পর্ক ছিল, কেননা ভগবান ছিলেন তাঁর মাতুল-পুত্র। কিন্তু ভীষ্মের তাঁর সঙ্গে সেরকম কোন সম্পর্ক ছিল না। তাই এই আকর্ষণের কারণ ছিল আত্মার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক। তথাপি দেহের সম্পর্ক যেহেতু অত্যন্ত আনন্দদায়ক এবং স্বাভাবিক, তাই ভগবানকে যখন নন্দনন্দন, যশোদানন্দন, রাধাবল্লভ ইত্যাদি নামে সম্বোধন করা হয় তখন তিনি অধিক প্রসন্ন হন। ভগবানের সঙ্গে এই প্রকার দৈহিক সম্পর্ক ভগবানের সঙ্গে প্রেম-বিনিময়ের আর একটি বৈশিষ্ট্য। ভীষ্মদেব এই দিব্য রসের মাধুর্য সম্বন্ধে অবগত ছিলেন, এবং তাই তিনি ভগবানকে নন্দনন্দন বা যশোদানন্দনেরই মতো বিজয়সখে, পার্থসখে ইত্যাদি নামে সম্বোধন করেছেন। অপ্রাকৃত মাধুর্যে তাঁর সঙ্গে

সম্পর্ক স্থাপন করার সর্বশ্রেষ্ঠ পন্থা হচ্ছে তাঁর সুবিদিত ভক্তদের মাধ্যমে তাঁর সমীপবর্তী হওয়া। কখনো সরাসরিভাবে ভগবানের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপনের চেষ্টা করা উচিত নয়; আমাদের অবশ্যই সঠিক পথে পরিচালিত করতে পারে এমন কোন সুযোগ্য এবং স্বচ্ছ মাধ্যমের সহায়তায় তাঁর সমীপবর্তী হওয়া উচিত।

শ্লোক ২৩

ভক্ত্যাবেশ্য মনো যস্মিন্ বাচা যন্নাম কীর্তয়ন্ ।
ত্যজন্ কলেবরং যোগী মুচ্যতে কামকর্মভিঃ ॥ ২৩ ॥

ভক্ত্যা—ভক্তিযোগের দ্বারা; **আবেশ্য**—আবিষ্ট; **মনঃ**—মন; **যস্মিন্**—যাঁর; **বাচা**—বাক্যের দ্বারা; **যৎ**—শ্রীকৃষ্ণ; **নাম**—দিব্য নাম; **কীর্তয়ন্**—উচ্চারণ করতে করতে; **ত্যজন্**—ত্যাগ করেন; **কলেবরম্**—এই জড়দেহ; **যোগী**—ভক্ত; **মুচ্যতে**—মুক্ত হন; **কাম-কর্মভিঃ**—সকাম কর্মের বন্ধন থেকে।

অনুবাদ

ভক্তিসমাহিত চিত্তে যে ভক্তেরা তাঁর ভাবে আবিষ্ট হয়ে তাঁর মহিমা কীর্তন করেন, তিনি তাঁদের জড়দেহ ত্যাগের সময় সকাম কর্মের বন্ধন থেকে মুক্ত করেন।

তাৎপর্য

যোগের অর্থ হচ্ছে অন্য সমস্ত বিষয় থেকে মনকে মুক্ত করে একাগ্র করা। প্রকৃতপক্ষে এই একাগ্রতাই হচ্ছে সমাধি, বা সম্পূর্ণরূপে ভগবানের সেবায় যুক্ত হওয়া। যিনি এইভাবে তাঁর চিত্তকে একাগ্র করেন, তিনিই হচ্ছেন যোগী। ভগবানের এই প্রকার যোগীভক্ত ভগবানের সেবায় দিনের মধ্যে চব্বিশ ঘণ্টাই যুক্ত থাকেন, যাতে শ্রবণ, কীর্তন, স্মরণ, অর্চন, বন্দন, দাস্য, সখ্য এবং তাঁর সবকিছু ভগবানকে নিবেদন করার মাধ্যমে আত্মসমর্পণ আদি নবধা ভক্তি যাজনের মাধ্যমে তাঁর সমস্ত চেতনা সর্বদা ভগবানে আবিষ্ট থাকে। এইভাবে যোগ অনুশীলনের ফলে অথবা ভগবানের সঙ্গে যুক্ত হওয়ার ফলে ভগবানের কাছ থেকে স্বীকৃতি লাভ করা যায়, যে কথা *শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায়* সমাধির সর্বোচ্চ সিদ্ধির বিষয়ে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। এই প্রকার দুর্লভ ভক্তকে ভগবান সমস্ত যোগীদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ বলে বর্ণনা করেছেন। ভগবৎ-কৃপা প্রাপ্ত এই প্রকার সিদ্ধযোগী পূর্ণ চেতনায় তাঁর মনকে ভগবানে একাগ্রীভূত করে, এবং এইভাবে তাঁর দেহ ত্যাগ করার সময় ভগবানের

দিব্য নাম কীর্তন করার ফলে তিনি তৎক্ষণাৎ ভগবানের অন্তরঙ্গা-শক্তির দ্বারা ভগবানের নিত্য ধামে স্থানান্তরিত হন, যেখানে জড় জাগতিক বদ্ধ জীবনের কোন প্রশ্ন ওঠেই না। জড় জগতে জীবকে জন্ম-জন্মান্তর ধরে তার কর্মের ফল অনুসারে ত্রিতাপ ক্লেশ ভোগ করতে হয়। বিষয় বাসনার ফলে জীবের ভব বন্ধন হয়। ভগবদ্ভক্তি জীবের স্বাভাবিক বাসনা বিনষ্ট করে না, পক্ষান্তরে তা ভগবানের প্রেমময়ী সেবায় যথাযথভাবে নিয়োজিত করে। তারফলে জীবের বাসনা চিন্ময় স্তরে উন্নীত হয়। মহারথী ভীষ্মদেব ভক্তিযোগ নামক একটি বিশেষ যোগের উল্লেখ করেছিলেন, এবং তিনি তাঁর জড়দেহ ত্যাগের পূর্বে ভগবানের প্রত্যক্ষ উপস্থিতি লাভের পরম সৌভাগ্য অর্জন করেছিলেন। তাই তিনি পরবর্তী শ্লোকে ভগবানকে তাঁর নয়নপথের সম্মুখে উপস্থিত থাকার বাসনা ব্যক্ত করেছেন।

শ্লোক ২৪

স দেবদেবো ভগবান্ প্রতীক্ষতাং
কলেবরং যাবদিদং হিনোম্যহম্ ।
প্রসন্নহাসারুণলোচনোল্লস-
ন্মুখাম্বুজো ধ্যানপথশ্চতুর্ভুজঃ ॥ ২৪ ॥

সঃ—তিনি; **দেব-দেবঃ**—দেবতাদের দেবতা; **ভগবান্**—পরমেশ্বর ভগবান; **প্রতীক্ষতাম্**—কৃপা করে প্রতীক্ষা করুন; **কলেবরম্**—দেহ; **যাবৎ**—যতক্ষণ পর্যন্ত; **ইদম্**—এই (জড়দেহ); **হিনোমি**—ত্যাগ করি; **অহম্**—আমি; **প্রসন্ন**—প্রফুল্ল; **হাস**—হাসি; **অরুণ-লোচন**—প্রভাতের সূর্যের মতো রক্তিম যাঁর চক্ষু; **উল্লসৎ**—সুন্দরভাবে অলঙ্কৃত; **মুখ-অম্বুজঃ**—যাঁর মুখমণ্ডল পদ্মের মতো; **ধ্যান-পথঃ**—আমার ধ্যানের পথে; **চতুর্ভুজঃ**—চতুর্ভুজ নারায়ণ (ভীষ্মদেবের আরাধ্য রূপ)।

অনুবাদ

আমার প্রভু, যিনি চতুর্ভুজ এবং যাঁর বদনকমল নবোদিত সূর্যের মতো রক্তিম নেত্র ও প্রফুল্ল হাস্যের দ্বারা সুশোভিত, তিনি কৃপা করে আমার এই জড়দেহ পরিত্যাগের মুহূর্তে আমার জন্য প্রতীক্ষা করুন।

তাৎপর্য

ভীষ্মদেব ভালভাবেই জানতেন যে শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন আদি নারায়ণ। তাঁর আরাধ্য বিগ্রহ ছিলেন চতুর্ভুজ নারায়ণ বিগ্রহ, কিন্তু তিনি জানতেন যে চতুর্ভুজ নারায়ণ

হচ্ছেন শ্রীকৃষ্ণের অংশ। পরোক্ষভাবে তিনি চেয়েছিলেন যে শ্রীকৃষ্ণ যেন তাঁর চতুর্ভুজ নারায়ণ রূপ প্রকাশ করেন। বৈষ্ণব তাঁর ব্যবহারে সর্বদাই অত্যন্ত বিনীত। ভীষ্মদেব যে তাঁর দেহত্যাগের পর বৈকুণ্ঠধাম প্রাপ্ত হবেন তা সুনিশ্চিত ছিল, তথাপি একজন বিনীত বৈষ্ণবরূপে তিনি মনে করেছিলেন যে তাঁর বর্তমান দেহত্যাগের পর তিনি ভগবানকে আর দর্শন নাও করতে পারেন; তাই ভগবানের সুন্দর মুখমণ্ডল তাঁর দেহত্যাগের সময় দর্শন করতে অভিলাষ করেছিলেন। ভগবান যদিও স্থির নিশ্চিতভাবে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন যে তাঁর শুদ্ধ ভক্ত তাঁর ধামে প্রবেশ করবেন, তথাপি বৈষ্ণব কখনো গর্ববোধ করেন না। এখানে ভীষ্মদেব বলেছেন, "যতক্ষণ পর্যন্ত না আমি এই দেহত্যাগ করি।" তার অর্থ হচ্ছে যে সেই মহারথী তাঁর ইচ্ছা অনুসারে দেহত্যাগ করার জন্য প্রস্তুত হচ্ছিলেন; তিনি প্রকৃতির নিয়মের দ্বারা বাধ্য ছিলেন না। তিনি এতই শক্তিশালী ছিলেন যে যতদিন ইচ্ছা তিনি তাঁর সেই শরীরে থাকতে পারতেন। তিনি তাঁর পিতার কাছ থেকে এই বরপ্রাপ্ত হয়েছিলেন। তিনি চেয়েছিলেন যে ভগবান যেন তাঁর চতুর্ভুজ নারায়ণ রূপে তাঁর সম্মুখে থাকেন যাতে তিনি তাঁর ধ্যান করে সমাধিস্থ হতে পারেন। তখন তাঁর মন ভগবানের চিন্তা করে পবিত্র হয়ে যাবে। এইভাবে, তিনি কোথায় যাবেন সে সম্বন্ধে তাঁর কোন দুশ্চিন্তা ছিল না। শুদ্ধ ভক্ত কখনোই ভগবদ্ধামে ফিরে যাওয়ার জন্য উৎকণ্ঠিত নন। তিনি কেবল ভগবানের শুভ ইচ্ছার উপরই সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করেন। ভগবান যদি তাঁকে নরকেও প্রেরণ করেন, তাহলেও তিনি একইভাবে তৃপ্ত থাকেন। ভগবানের শুদ্ধ ভক্ত কেবল একটি বাসনাই পোষণ করেন এবং তা হল তিনি যে অবস্থাতেই থাকেন না কেন তিনি যেন সর্বদা ভগবানের শ্রীপাদপদ্মের ধ্যানে গভীরভাবে মগ্ন থাকতে পারেন। ভীষ্মদেব কেবল সেটিই চেয়েছিলেন; অর্থাৎ ভগবানের ধ্যানে মগ্ন হয়ে তিনি যেন তাঁর দেহত্যাগ করতে পারেন। এটিই হচ্ছে শুদ্ধ ভক্তের সর্বোচ্চ অভিলাষ।

শ্লোক ২৫

সূত উবাচ

যুধিষ্ঠিরস্তদাকর্ণ্য শয়ানং শরপঞ্জরে।
অপৃচ্ছদ্বিবিধান্ধর্মানৃষীণাং চানুশৃণ্বতাম্ ॥ ২৫ ॥

সূতঃ উবাচ—শ্রীসূত গোস্বামী বললেন; **যুধিষ্ঠিরঃ**—মহারাজ যুধিষ্ঠির; **তৎ**—তা; **আকর্ণ্য**—শ্রবণ করে; **শয়ানম্**—শায়িত; **শর-পঞ্জরে**—শরশয্যায়; **অপৃচ্ছৎ**—জিজ্ঞাসা করেছিলেন; **বিবিধান্**—বিবিধ; **ধর্মান্**—কর্তব্যাদি; **ঋষীণাম্**—ঋষিদের; **চ**—এবং; **অনুশৃণ্বতাম্**—শোনার পর।

অনুবাদ

সূত গোস্বামী বললেন, ভীষ্মদেবের সেই মর্মস্পর্শী বাক্য শ্রবণ করে, মহারাজ যুধিষ্ঠির সমস্ত মহান ঋষিবর্গের সমক্ষে শরশয্যাশায়ী ভীষ্মদেবের কাছে ধর্ম-বিষয়ক বিভিন্ন কর্তব্যকর্মাদির অত্যাবশ্যক নীতি-নিয়মাদি সংক্রান্ত প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করতে লাগলেন।

তাৎপর্য

ভীষ্মদেবকে এইভাবে মর্মস্পর্শী স্বরে কথা বলতে দেখে মহারাজ যুধিষ্ঠির বুঝতে পেরেছিলেন যে তিনি শীঘ্রই দেহত্যাগ করবেন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তখন মহারাজ যুধিষ্ঠিরকে অনুপ্রাণিত করেছিলেন তিনি যেন ধর্ম-তত্ত্ব সম্বন্ধে তাঁকে প্রশ্ন করেন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বহু মহর্ষিদের উপস্থিতিতে যুধিষ্ঠির মহারাজকে ভীষ্মদেবের কাছে প্রশ্ন করার জন্য অনুপ্রাণিত করার মাধ্যমে বুঝিয়েছিলেন যে ভীষ্মদেবের মতো মহান ভগবদ্ভক্ত আপাতদৃষ্টিতে একজন বৈষয়িক মানুষের মতো জীবন-যাপন করলেও মহর্ষিদের থেকে, এমনকি ব্যাসদেবের থেকেও শ্রেষ্ঠ। আর একটি বিষয় হচ্ছে যে ভীষ্মদেব তখন কেবল শরশয্যাতেই শায়িত ছিলেন না, অধিকন্তু সেই অবস্থায় তিনি অত্যন্ত বেদনাও অনুভব করছিলেন এরকম অবস্থায় তাঁকে কোন প্রশ্ন করা উচিত ছিল না, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ প্রমাণ করতে চেয়েছিলেন যে তাঁর শুদ্ধ ভক্ত দিব্য জ্ঞানের প্রভাবে দেহ এবং মনে পূর্ণরূপে সুস্থ থাকেন; অতএব ভগবদ্ভক্ত যে কোন অবস্থাতেই জীবনের আদর্শ মার্গ সম্বন্ধে উপদেশ দিতে সম্পূর্ণরূপে সমর্থ। যুধিষ্ঠির মহারাজও চেয়েছিলেন যে সেখানে উপস্থিত ব্যক্তিরা, যাঁদের ভীষ্মদেবের থেকে অধিক বিজ্ঞ বলে মনে হয়েছিল, তাঁদের প্রশ্ন না করে ভীষ্মদেবের দ্বারাই তাঁর জটিল প্রশ্নগুলির সমাধান করেন। সে সবই হয়েছিল মহান চক্রধারী ভগবান শ্রীকৃষ্ণের ব্যবস্থাপনায়, যিনি সর্বদাই তাঁর ভক্তের মহিমা স্থাপন করেন। পিতা চান যে তাঁর পুত্র যেন তাঁর থেকেও অধিক খ্যাতি লাভ করে। ভগবান বিশেষ দৃঢ়তা সহকারে ঘোষণা করেছেন যে তাঁর ভক্তের পূজা তাঁর পূজার থেকেও অধিক গুরুত্বপূর্ণ।

শ্লোক ২৬

পুরুষস্বভাববিহিতান্ যথাবর্ণং যথাশ্রমম্ ।
বৈরাগ্যরাগোপাধিভ্যামাম্নাতোভয়লক্ষণান্ ॥ ২৬ ॥

পুরুষ—মানুষ; স্ব-ভাব—গুণ অনুসারে জাত প্রকৃতি; বিহিতান্—নির্দিষ্ট; যথা—অনুসারে; বর্ণম্—বর্ণ-বিভাগ; যথা—অনুসারে; আশ্রমম্—আশ্রম-বিভাগ; বৈরাগ্য—ত্যাগ; রাগ—আসক্তি; উপাধিভ্যাম্—উপাধিসমূহ থেকে; আম্নাত—বিধিবদ্ধভাবে; উভয়—উভয়; লক্ষণান্—লক্ষণাদি থেকে।

অনুবাদ

মহারাজ যুধিষ্ঠিরের অনুসন্ধিৎসায় ভীষ্মদেব প্রথম মানুষের জীবনের স্বভাব ও যোগ্যতা অনুসারে সমস্ত বর্ণ এবং আশ্রম বিভাগের সংজ্ঞা বিবৃত করলেন। তারপর তিনি যথাক্রমে দুই শ্রেণীবিভাগের মাধ্যমে অনাসক্তির প্রতিরোধী ক্রিয়া এবং আসক্তির অন্তঃক্রিয়ার বর্ণনা করলেন।

তাৎপর্য

স্বয়ং ভগবান কর্তৃক *শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায়* (৪/১৩) প্রদত্ত চতুর্বর্ণ এবং চতুরাশ্রমের ধারণা মানুষের দিব্য গুণাবলী বৃদ্ধি করার জন্য, যাতে তারা তাদের চিন্ময় স্বরূপ অবগত হতে পারে এবং তারফলে ভব-বন্ধন বা বদ্ধ জীবন থেকে মুক্ত হতে পারে। প্রায় সব কটি পুরাণেই এই বিষয়টি একইভাবে বর্ণিত হয়েছে, এবং মহাভারতের শান্তি-পর্বেও ষষ্টিতম অধ্যায় থেকে ভীষ্মদেব কর্তৃক তা বিস্তারিতভাবে বর্ণিত হয়েছে।

সভ্য মানুষদের জন্য বর্ণাশ্রম-ধর্মের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, যাতে তারা সার্থকভাবে মানব জীবনে পূর্ণতা লাভের শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে। আত্ম-উপলব্ধি আহার, নিদ্রা, ভয় এবং মৈথুনে রত নিম্নস্তরের পশুজীবন থেকে ভিন্ন। ভীষ্মদেব সমস্ত মানুষের জন্য নটি গুণের উপদেশ দিয়েছেন—(১) ক্রোধ না করা, (২) মিথ্যা কথা না বলা, (৩) সম্পদ সমানভাবে বিতরণ করা, (৪) ক্ষমা করা, (৫) বিবাহিত পত্নীর মাধ্যমেই কেবল সন্তান উৎপাদন করা, (৬) মন এবং শরীরে শুদ্ধ থাকা, (৭) কারও প্রতি শত্রুভাব পোষণ না করা, (৮) সরল হওয়া, এবং (৯) ভৃত্য ও আশ্রিতদের পালন করা। যদি কারও উপরোক্ত প্রাথমিক গুণগুলি না থাকে, তাহলে তাকে সভ্য বলা যায় না। আর তা ছাড়া, ব্রাহ্মণ (বুদ্ধিমান মানুষ), ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং শূদ্রের অবশ্য কর্তব্য হচ্ছে বৈদিক শাস্ত্রে বর্ণিত তাদের বৃত্তি অনুসারে বিশেষ গুণাবলী অর্জন করা। বুদ্ধিমান শ্রেণী বা ব্রাহ্মণদের সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ গুণ হচ্ছে ইন্দ্রিয় সংযম করা। এটি নৈতিক জীবনের ভিত্তি। বিবাহিত পত্নীর সঙ্গেও যৌন-সংযোগ সুনিয়ন্ত্রিতভাবে সম্পাদিত হওয়া আবশ্যক, এবং তারফলে আপনা থেকেই পরিবার নিয়ন্ত্রণ করা হবে। বুদ্ধিমান মানুষ যদি বৈদিক জীবন-যাত্রার ধারা অনুসরণ না করে, তাহলে তার মহান যোগ্যতার অপব্যবহার হয়। অর্থাৎ তার কর্তব্য

হচ্ছে নিষ্ঠা সহকারে বৈদিক শাস্ত্র অধ্যয়ন করা, বিশেষ করে *শ্রীমদ্ভাগবত* এবং *শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতা* । বৈদিক জ্ঞান লাভ করার জন্য এমন কোন ব্যক্তির শরণাগত হওয়া উচিত যিনি সম্পূর্ণরূপে ভগবদ্ভক্তিতে যুক্ত। শাস্ত্রে যে সমস্ত কর্ম করতে নিষেধ করা হয়েছে, সেগুলি তার কোনমতেই আচরণ করা উচিত নয়। কোন ব্যক্তি যদি মদ্যপান করে অথবা ধূমপান করে, তাহলে সে শিক্ষক হতে পারে না। আধুনিক শিক্ষা-ব্যবস্থায় শিক্ষকের পুঁথিগত বিদ্যারই বিচার করা হয়, তার নৈতিক জীবনের কথা বিবেচনা করা হয় না। তাই শিক্ষার ফলস্বরূপ উন্নত বুদ্ধিমত্তার নানারকম অপব্যবহার হচ্ছে।

ক্ষত্রিয় বা শাসক শ্রেণীর সদস্যদের দান করার জন্য এবং কোন পরিস্থিতিতেই দান গ্রহণ না করার জন্য বিশেষভাবে উপদেশ দেওয়া হয়েছে। আধুনিক প্রশাসকেরা রাজনৈতিক কার্যের জন্য দান গ্রহণ করে থাকে, কিন্তু কোন রাষ্ট্রীয় উৎসবে নাগরিকদের কোনকিছু দান করে না। এটি বৈদিক শাস্ত্র-নির্দেশের ঠিক বিপরীত অবস্থা। শাসকবর্গকে শাস্ত্রজ্ঞানসম্পন্ন হতে হয়, কিন্তু তাদের কখনো শিক্ষকের বৃত্তি অবলম্বন করা উচিত নয়। শাসকদের কখনো অহিংস হওয়ার অভিনয় করা উচিত নয়, যার ফলে তারা নরকগামী হয়। অর্জুন যখন কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধক্ষেত্রে অহিংস কাপুরুষ হতে চেয়েছিলেন, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তখন তাঁকে কঠোরভাবে তিরস্কার করেছিলেন। এইভাবে অহিংসার বৃত্তি গ্রহণ করার জন্য ভগবান অর্জুনকে অনার্য বা অসভ্য বলে অভিহিত করেছিলেন। শাসকবর্গকে অবশ্যই সামরিক শিক্ষায় শিক্ষিত হতে হয়। কাপুরুষদের কখনো কেবল জনসাধারণের ভোটের ভিত্তিতে রাষ্ট্রপতির পদে অধিষ্ঠিত করা উচিত নয়। প্রাচীনকালে রাজারা সকলেই ছিলেন বীরপুরুষ, এবং তাই ক্ষত্রিয় রাজার বৃত্তিগত কর্তব্য সম্বন্ধে যদি যথাযথভাবে শিক্ষা দেওয়া যায় তাহলে রাজতন্ত্রের মাধ্যমে রাষ্ট্রশাসন করা যেতে পারে। যুদ্ধে রাজা অথবা রাষ্ট্রপতির শত্রুর দ্বারা আঘাতপ্রাপ্ত না হয়ে গৃহে প্রত্যাবর্তন করা উচিত নয়। এখনকার তথাকথিত সমস্ত রাজারা যুদ্ধক্ষেত্রে পর্যন্ত যায় না। মিথ্যা রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠার আশায় তারা সামরিক শক্তিকে কৃত্রিমভাবে অনুপ্রাণিত করতে অত্যন্ত দক্ষ। শাসকশ্রেণী যখনই বৈশ্য এবং শূদ্রে পরিণত হয়, তখন সমগ্র রাষ্ট্র-ব্যবস্থা দূষিত হয়ে যায়।

বৈশ্য বা ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের সদস্যদের বিশেষভাবে উপদেশ দেওয়া হয়েছে গাভীদের রক্ষা করার জন্য। গো-রক্ষা মানে হচ্ছে দুগ্ধজাত পদার্থ, অর্থাৎ দধি এবং মাখন উৎপাদন বৃদ্ধি করা। বৈদিক জ্ঞানে শিক্ষাপ্রাপ্ত হয়ে তার ভিত্তিতে কৃষিকার্য এবং খাদ্যদ্রব্যের বিতরণ, এবং সেই সঙ্গে দান করা হচ্ছে ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের

প্রধান কর্তব্য। ক্ষত্রিয়দের যেমন নাগরিকদের রক্ষা করার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে, তেমনই বৈশ্যদের পশুদের রক্ষা করার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। পশুদের কখনও হত্যা করা উচিত নয়। এই প্রকার পশুহত্যা বর্বর সমাজের লক্ষণ। মানুষদের জন্য কৃষিজাত দ্রব্য, ফল এবং দুধ হচ্ছে আদর্শ খাদ্য এবং তা পর্যাপ্তরূপে পাওয়া যায়। মানব সমাজের কর্তব্য গৃহপালিত পশুদের রক্ষার ব্যাপারে অধিক মনোযোগ দেওয়া। শ্রমিক সম্প্রদায়ের উৎপাদন শক্তি যখন কলকারখানায় ব্যবহার করা হয় তখন তার অপব্যবহার হয়। বিভিন্ন প্রকার কলকারখানাগুলি কখনও মানুষের অপরিহার্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যগুলি, যথা চাল, গম, শস্য, দুধ, ফল এবং শাকসবজি উৎপাদন করতে পারে না। যন্ত্রপাতি এবং অস্ত্রশস্ত্র উৎপাদনের ফলে এক শ্রেণীর স্বার্থপর ব্যক্তিদের কৃত্রিম জীবনযাত্রার মান বর্ধিত হয়, আর হাজার হাজার মানুষ অনাহারে থাকে এবং অশান্তি ভোগ করে। এটি কখনও মানব সভ্যতার আদর্শ হওয়া উচিত নয়।

শূদ্র বা অল্পবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষদের স্বতন্ত্রতা থাকা উচিত নয়। তাদের কর্তব্য হচ্ছে ঐকান্তিকভাবে সমাজের তিনটি উচ্চ বর্ণের সেবা করা। উচ্চ বর্ণের সেবা করার মাধ্যমে শূদ্রেরা জীবনের সবরকম সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য লাভ করতে পারে। শাস্ত্রে বিশেষভাবে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে শূদ্রের কখনও ধন সঞ্চয় করা উচিত নয়। শূদ্র যখনই ধন সঞ্চয় করে, তখনই সে আসব পান, স্ত্রীসঙ্গ এবং দ্যূতক্রীড়া আদি পাপ কর্মে লিপ্ত হয়ে সেই ধনের অপব্যবহার করবে। আসব পান, স্ত্রীসঙ্গ এবং দ্যূতক্রীড়া সূচিত করে যে জনসাধারণ শূদ্রের থেকেও অধঃপতিত হয়ে গেছে। উচ্চ বর্ণের কর্তব্য হচ্ছে সর্বদা শূদ্রদের পালন করা, এবং তাদের পুরাতন এবং ব্যবহৃত বস্ত্র সরবরাহ করা। প্রভু বৃদ্ধ এবং অক্ষম হলে শূদ্রের তাকে ত্যাগ করে যাওয়া উচিত নয়, এবং প্রভুর কর্তব্য হচ্ছে ভৃত্যকে সর্বতোভাবে সন্তুষ্ট রাখা। কোন যজ্ঞের পূর্বে সর্বপ্রথমে শূদ্রদের প্রচুর ভোজন এবং বস্ত্রের দ্বারা সন্তুষ্ট করা উচিত। এই যুগে লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করে বহু উৎসবের আয়োজন করা হয় কিন্তু দরিদ্র শ্রমিকদের ভোজন করানো হয় না, দান দেওয়া হয় না বা বস্ত্র ইত্যাদি দেওয়া হয় না। তারফলে শ্রমিকেরা অসন্তুষ্ট হয় এবং আন্দোলন করে।

এক কথায় বর্ণ হচ্ছে ভিন্ন ভিন্ন বৃত্তির বিভাগ, এবং আশ্রম ধর্ম হচ্ছে আত্ম-উপলব্ধির পথে প্রগতির ক্রম। তারা উভয়েই পরস্পরের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত এবং পরস্পরের উপর নির্ভরশীল। আশ্রম ধর্মের প্রধান উদ্দেশ্য হচ্ছে জ্ঞান এবং বৈরাগ্য জাগ্রত করা। ব্রহ্মচারী আশ্রম ভবিষ্যৎ জীবনের জন্য প্রশিক্ষণ স্থল। এই আশ্রমে শিক্ষা দেওয়া হয় যে এই জড় জগৎ জীবের প্রকৃত আবাস নয়। বদ্ধ জীবেরা জড়া

প্রকৃতির বন্ধনে বন্দী হয়ে আছে, এবং তাই আত্ম-উপলব্ধি হচ্ছে জীবনের পরম লক্ষ্য। সমগ্র আশ্রম ধর্মের উদ্দেশ্য হচ্ছে বৈরাগ্য সাধন। যিনি বৈরাগ্যের এই মূল ভাবনা গ্রহণে অক্ষম, তাকে বৈরাগ্যের ভাব নিয়ে গৃহস্থ আশ্রমে প্রবেশ করার অনুমতি দেওয়া হয়। তাই যে বৈরাগ্যের ভাব প্রাপ্ত হয়েছে, সে তৎক্ষণাৎ চতুর্থ আশ্রম বা সন্ন্যাস আশ্রম সরাসরিভাবে গ্রহণ করতে পারে, এবং ধন সঞ্চয় না করে তাকে কেবল দান গ্রহণের মাধ্যমে চরম উপলব্ধির জন্য দেহ ধারণ করতে হয়। গৃহস্থ আশ্রম আসক্তদের জন্য এবং বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাস আশ্রম তাদেরই জন্য, যারা জড় জাগতিক জীবনের প্রতি বিরক্ত হয়েছে। ব্রহ্মচর্য আশ্রম আসক্ত এবং বিরক্ত উভয়েরই প্রশিক্ষণের জন্য।

শ্লোক ২৭

দানধর্মান্ রাজধর্মান্ মোক্ষধর্মান্ বিভাগশঃ।
স্ত্রীধর্মান্ ভগবদ্ধর্মান্ সমাসব্যাসযোগতঃ ॥ ২৭ ॥

দান-ধর্মান্—দান করার পন্থা; **রাজ-ধর্মান্**—রাজার কর্তব্য; **মোক্ষ-ধর্মান্**—মুক্তিলাভের উপায়; **বিভাগশঃ**—বিভাগ অনুসারে; **স্ত্রী-ধর্মান্**—স্ত্রীলোকেদের কর্তব্য; **ভগবৎ-ধর্মান্**—ভগবদ্ভক্তির পন্থা; **সমাস**—সাধারণভাবে; **ব্যাস**—বিশদভাবে; **যোগতঃ**—উপায়।

অনুবাদ

তারপর তিনি বিভাগ অনুসারে দানধর্ম, রাজধর্ম, এবং মোক্ষধর্মসমূহ ব্যাখ্যা করলেন। তারপর তিনি স্ত্রীলোক এবং ভক্তদের কর্তব্যকর্মাদি সংক্ষিপ্ত এবং বিস্তারিত দুভাবেই বর্ণনা করলেন।

তাৎপর্য

দান করা গৃহস্থদের প্রধান কর্তব্য, এবং তার কষ্টার্জিত ধনের অন্তত শতকরা পঞ্চাশভাগ দান করার জন্য তার প্রস্তুত থাকা উচিত। ব্রহ্মচারী বা শিক্ষার্থীর কর্তব্য হচ্ছে আত্মত্যাগ, গৃহস্থের কর্তব্য দান করা, এবং বানপ্রস্থী ও সন্ন্যাসীর কর্তব্য হচ্ছে কৃচ্ছ্রসাধন ও তপশ্চর্যা অনুশীলন করা। আশ্রম জীবনে বা আত্ম-উপলব্ধির পথে জীবনের বিভাগসমূহে এগুলি হচ্ছে সাধারণ কর্তব্য। ব্রহ্মচর্য জীবনে যথেষ্ট শিক্ষা দেওয়া হয় যার ফলে হৃদয়ঙ্গম করা যায় যে জগতের সবকিছুই পরমেশ্বর ভগবানের

সম্পদ। তাই কেউই এই পৃথিবীর কোন কিছুই নিজের সম্পত্তি বলে দাবি করতে পারে না। তাই গৃহস্থ আশ্রমের মানুষদের, যাদের মৈথুন-সুখ উপভোগের এক প্রকার অনুমতি দেওয়া হয়েছে, তাদের ভগবানের সেবায় দান করা অবশ্য কর্তব্য। ভগবানের শক্তি থেকেই সকলে শক্তিপ্রাপ্ত হয়; তাই সেই শক্তির ফলস্বরূপ সমস্ত ক্রিয়া ভগবানের দিব্য প্রেমময়ী সেবারূপে ভগবানকে অর্পণ করা উচিত। নদী যেমন মেঘের মাধ্যমে সমুদ্র থেকে জল সংগ্রহ করে পুনরায় সমুদ্রে গিয়ে মিলিত হয়, তেমনই পরমেশ্বর ভগবানের শক্তির উৎস থেকে লব্ধ আমাদের শক্তি ভগবানকেই ফিরিয়ে দিতে হবে। সেটিই হচ্ছে আমাদের শক্তির সার্থকতা। তাই ভগবান *শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায়* (৯/২৭) বলেছেন যে আমরা যা কিছু কার্য করি, যে কোন তপস্যা করি, যে কোন যজ্ঞ অনুষ্ঠান করি, যা কিছু খাই এবং যা কিছু দান করি, তা সবই তাঁকে (ভগবানকে) নিবেদন করা অবশ্য কর্তব্য। সেটিই আমাদের ধার করা শক্তির যথার্থ সদ্ব্যবহারের পন্থা। যখন আমাদের শক্তি এইভাবে আমরা ব্যবহার করি, তখন আমাদের শক্তি জড় জাগতিক কলুষ থেকে মুক্ত হয়, এইভাবে আমরা ভগবানের সেবা করার স্বাভাবিক জীবন লাভ করার যোগ্য হই। রাজধর্ম রাজনৈতিক কর্তৃত্ব লাভের জন্য আধুনিক কূটনীতি থেকে ভিন্ন এক মহান বিজ্ঞান। এই পন্থার মাধ্যমে রাজাদের শিক্ষা দেওয়া হত একজন সাধারণ কর সংগ্রাহক না হয়ে একজন দানবীর হওয়ার। তাদের শিক্ষা দেওয়া হত প্রজাদের সমৃদ্ধির জন্যই কেবল বিভিন্ন প্রকার যজ্ঞ অনুষ্ঠান করার। প্রজাদের মুক্তিলাভের পথে পরিচালিত করা ছিল রাজার সবচাইতে বড় কর্তব্য। পিতা, গুরু এবং রাজাকে কখনই তাদের উপর নির্ভরশীল ব্যক্তিদের জন্ম, মৃত্যু, জরা, ব্যাধির বন্ধন থেকে মুক্তির পথে পরিচালিত করার বিষয়ে উদাসীন বা দায়িত্বহীন হওয়া উচিত নয়। যখন এই প্রাথমিক কর্তব্য যথাযথভাবে সম্পাদিত হয়, তখন আর জনসাধারণের দ্বারা রচিত গণতান্ত্রিক সরকারের প্রয়োজন হয় না। আধুনিক যুগে ভোট আদায় করার মাধ্যমে সাধারণ মানুষ প্রশাসনিক পদ অধিকার করে। কিন্তু রাজাদের প্রাথমিক কর্তব্য সম্বন্ধে তারা কখনও কোনরকম শিক্ষালাভ করে না, এবং সকলের পক্ষে সেই শিক্ষালাভ করা সম্ভবও নয়। এই পরিস্থিতিতে অনভিজ্ঞ প্রশাসকেরা প্রজাদের সর্বতোভাবে সুখী করার পরিবর্তে এক ভয়ঙ্কর বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি করে। এই সমস্ত অনভিজ্ঞ প্রশাসকেরা ধীরে ধীরে চোর এবং প্রবঞ্চকে পরিণত হয় এবং সর্বতোভাবে অকেজো এক ভারাক্রান্ত সরকার পরিচালনার জন্য ক্রমাগত কর বৃদ্ধি করতে থাকে। প্রকৃতপক্ষে যোগ্য ব্রাহ্মণদের কর্তব্য হচ্ছে *মনু-সংহিতা* এবং পরাশর মুনির ধর্মশাস্ত্র আদি শাস্ত্রের ভিত্তিতে রাজাদের যথাযথভাবে রাজ্যশাসন করার জন্য উপদেশ দেওয়া।

একজন যথার্থ রাজা সাধারণ জনগণের আদর্শ; এবং রাজা যদি পুণ্যবান, ধর্মপরায়ণ, বীর্যবান, এবং উদার হন, তাহলে নাগরিকেরা তাঁকে অনুসরণ করে। এই প্রকার রাজা কখনই প্রজাদের অর্থে প্রতিপালিত একজন অলস কামুক ব্যক্তি নয়, পক্ষান্তরে তিনি সর্বদা চোর এবং দস্যুদের হত্যা করতে প্রস্তুত থাকেন। পুণ্যাত্মা রাজারা কখনই অর্থহীন অহিংসার নামে দস্যু এবং চোরদের প্রতি কৃপাপরায়ণ হন না। তাঁরা তাদের এমনভাবে দণ্ড দান করতেন যাতে ভবিষ্যতে কেউ সেরকম অপকর্ম করতে সাহস না করে। আজকাল যেমন চোর এবং ডাকাতেরা রাজ্য পরিচালনা করে, তখন তা মোটেই হত না।

কর সংগ্রহের পন্থা ছিল অত্যন্ত সরল। কাউকে কখনও জোর করা হত না এবং পরের সম্পত্তিতে অবৈধভাবে হস্তক্ষেপ করা হত না। প্রজাদের উৎপাদনের এক-চতুর্থাংশ গ্রহণ করার অধিকার রাজার ছিল। রাজা প্রজাদের সম্পত্তির এক-চতুর্থাংশ দাবি করতে পারতেন। প্রজারাও তা দিতে নারাজ হত না, কেননা পুণ্যাত্মা রাজা এবং ধর্মীয় ঐক্যের ফলে শস্য, ফল, ফুল, রেশম, সুতা, দুধ, মণিরত্ন, ধাতু ইত্যাদি প্রাকৃত সম্পদ যথেষ্ট পরিমাণে উৎপাদন হত; তাই জড় জাগতিক দিক দিয়ে কেউই অসুখী ছিল না। প্রজারা কৃষি এবং পশুধনে সমৃদ্ধ ছিল। তাই তাদের যথেষ্ট শস্য, ফল এবং দুধ ছিল, এবং তাদের সাবান, প্রসাধন, সিনেমা এবং মদিরালয়ের কোন রকম কৃত্রিম প্রয়োজন ছিল না।

রাজাকে দেখতে হত যে মানুষের সঞ্চিত শক্তি যাতে যথাযথভাবে ব্যবহার হয়। মানব শক্তির উদ্দেশ্য হচ্ছে আত্ম-উপলব্ধি; পশুপ্রবৃত্তিগুলির চরিতার্থতা নয়। সরকারের সমস্ত পরিকল্পনা এই বিশেষ উদ্দেশ্য সাধনের জন্যই ছিল। সেইজন্য রাজা যথাযথভাবে মন্ত্রীদের মনোনয়ন করতেন, ভোটের ভিত্তিতে নয়। মন্ত্রীদের, সেনাপতিদের এমনকি সাধারণ সৈন্যদেরও মনোনয়ন করা হত ব্যক্তিগত যোগ্যতার ভিত্তিতে, এবং তাদের পদে নিযুক্ত হওয়ার পূর্বে রাজা তাদের পর্যবেক্ষণ করতেন। রাজা বিশেষভাবে সতর্ক থাকতেন যাতে তপস্বীদের, বা পারমার্থিক জ্ঞান অর্জনের জন্য যারা সবকিছু ত্যাগ করেছেন, তাঁদের যেন কখনো কোনরকম অশ্রদ্ধা না করা হয়। রাজা ভালভাবে জানতেন যে পরমেশ্বর ভগবান কখনও তাঁর অনন্য ভক্তের অপমান সহ্য করতে পারেন না। এই প্রকার তপস্বীরা দুর্বৃত্ত এবং চোরদের কাছেও বিশ্বস্ত ও শ্রদ্ধার পাত্র ছিলেন, যারা কখনো তাঁদের আদেশ অমান্য করত না। রাজা অশিক্ষিত, অসহায় এবং বিধবাদের বিশেষ সুরক্ষা প্রদান করতেন। শত্রুর আক্রমণের পূর্বে প্রতিরক্ষার বিশেষ ব্যবস্থা অবলম্বন করা হত। কর গ্রহণের প্রথা ছিল অত্যন্ত সরল, এবং তার অপব্যয় করা হত না, পক্ষান্তরে তার দ্বারা রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক ভিত্তি

সুদৃঢ় করা হত। পৃথিবীর সমস্ত প্রান্ত থেকে সৈন্য সংগ্রহ করা হত, এবং বিশেষ কর্তব্য সম্পাদনের জন্য তাদের শিক্ষা দেওয়া হত।

মুক্তি লাভের উদ্দেশ্যে কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ এবং মাৎসর্য জয় করতে হত। ক্রোধ জয় করার জন্য ক্ষমা করতে শিখতে হয়। অবৈধ বাসনার থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য ভবিষ্যতের পরিকল্পনা করার প্রবণতা ত্যাগ করতে হয়। আধ্যাত্মিক অনুশীলনের দ্বারা নিদ্রা জয় করা যায়। সহিষ্ণুতার দ্বারা লোভ জয় করা যায়। বিভিন্ন রোগের উৎপাত প্রতিহত করা যায় নিয়ন্ত্রিত আহারের দ্বারা। আত্ম-সংযমের দ্বারা মিথ্যা আশা থেকে মুক্ত হওয়া যায় এবং অসৎ সঙ্গ ত্যাগ করার ফলে অর্থের অপব্যয় বন্ধ করা যায়। যোগ অনুশীলনের ফলে ক্ষুধা এবং তৃষ্ণা নিয়ন্ত্রণ করা যায়। জগতের অনিত্যতা সম্বন্ধে জ্ঞান আহরণের ফলে বিষয়-তৃষ্ণা নিবারণ করা যায়। বিহ্বলতা জয় করা যায় খুব ভোরে শয্যা ত্যাগ করার দ্বারা এবং তথ্য নির্ধারণ করার মাধ্যমে মিথ্যা তর্ক জয় করা যায়। মৌনতা এবং গাম্ভীর্যের দ্বারা বাচালতা বর্জন করা যায় এবং শৌর্যের দ্বারা ভয় জয় করা যায়। আত্ম-অনুশীলনের দ্বারা পূর্ণ জ্ঞান লাভ করা যায়। প্রকৃতপক্ষে মুক্তিলাভের জন্য কাম, লোভ, ক্রোধ, স্বপ্ন ইত্যাদি থেকে মুক্ত হওয়া অবশ্য কর্তব্য।

স্ত্রীদের পুরুষের অনুপ্রেরণার উৎস বলে মনে করা হত। প্রকৃতপক্ষে স্ত্রীলোকেরা পুরুষদের থেকে অধিক শক্তিশালী। শক্তিশালী জুলিয়াস সিজার ক্লীওপেট্রার বশীভূত ছিল। এই প্রকার শক্তিশালী স্ত্রীলোকেরা লজ্জার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। তাই লজ্জা স্ত্রীলোকেদের ভূষণ। একবার এই নিয়ন্ত্রণ শিথিল হয়ে গেলে স্ত্রীলোকেরা ব্যভিচারের দ্বারা সমাজে মহা উৎপাতের সৃষ্টি করে। ব্যভিচারের অর্থ হচ্ছে বর্ণসঙ্কর নামক অবাঞ্ছিত সন্তান উৎপাদন, যা পৃথিবীতে বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি করে।

ভীষ্মদেবের উপদেশের শেষ বিষয়টি ছিল ভগবানকে প্রসন্ন করার পন্থা। প্রতিটি জীবই ভগবানের নিত্য দাস, এবং জীব যখন সে কথা ভুলে যায় তখন সে ভবসাগরে পতিত হয়। ভগবানের প্রসন্নতা বিধানের সরল পন্থা (বিশেষ করে গৃহস্থদের পক্ষে) গৃহে ভগবানের শ্রীবিগ্রহের প্রতিষ্ঠা করা। শ্রীবিগ্রহে মনকে একাগ্রীভূত করে দৈনন্দিন কার্য সম্পাদন করা যায়। গৃহে অর্চা-বিগ্রহের পূজা, ভক্তের সেবা, শ্রীমদ্ভাগবত শ্রবণ, পবিত্র স্থানে বাস এবং ভগবানের নাম কীর্তন—এই সমস্ত কার্যগুলি সম্পাদন করতে বহু অর্থ ব্যয় করতে হয় না, অথচ তার দ্বারা ভগবানের প্রসন্নতা বিধান করা যায়। এইভাবে এই বিষয়ে পিতামহ তাঁর পৌত্রদের উপদেশ দিয়েছিলেন।

শ্লোক ২৮

ধর্মার্থকামমোক্ষাংশ্চ সহোপায়ান্ যথা মুনে ।
নানাখ্যানেতিহাসেষু বর্ণয়ামাস তত্ত্ববিৎ ॥ ২৮ ॥

ধর্ম—বৃত্তিগত কর্তব্য-কর্ম; **অর্থ**—অর্থনৈতিক উন্নতি; **কাম**—বাসনার চরিতার্থতা; **মোক্ষান্**—চরম মুক্তি; **চ**—এবং; **সহ**—সহ; **উপায়ান্**—উপায়াদি; **যথা**—যেমন; **মুনে**—হে ঋষি; **নানা**—বিভিন্ন; **আখ্যান**—ঐতিহাসিক বর্ণনাদি; **ইতিহাসেষু**—ইতিহাসে; **বর্ণয়াম্ আস**—বর্ণনা করেছিলেন; **তত্ত্ব-বিৎ**—তত্ত্বজ্ঞ।

অনুবাদ

হে ঋষি, তারপর ধর্ম, অর্থ, কাম এবং মোক্ষলাভের উপায়াদি যথাপূর্বক বর্ণনা প্রসঙ্গে তত্ত্বজ্ঞ ভীষ্মদেব ইতিহাস থেকে দৃষ্টান্ত উল্লেখ করে বিভিন্ন বর্ণ এবং আশ্রমের কর্তব্য কর্ম সম্বন্ধে বিবৃত করেছিলেন।

তাৎপর্য

পুরাণ, মহাভারত, রামায়ণ আদি বৈদিক শাস্ত্রে যে সমস্ত ঘটনা উল্লেখ করা হয়েছে, সে সমস্তই ঐতিহাসিক তথ্য, যা পুরাকালে ঘটেছিল। এই সমস্ত তথ্যগুলি অনেক সময় কালের ক্রম অনুসারে বর্ণিত নাও হয়ে থাকতে পারে, কিন্তু তথাপি সেগুলি বাস্তব তথ্য ছাড়া আর কিছু নয়। সাধারণ মানুষের জন্য উপদেশমূলক হওয়ার ফলে, এই সমস্ত তথ্যগুলি কালের পরিপ্রেক্ষিতে ধারাবাহিকরূপে না করে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। আর তা ছাড়া সেগুলি ঘটেছিল বিভিন্ন লোকে, এমনকি বিভিন্ন ব্রহ্মাণ্ডে, এবং তাই সেই সমস্ত বর্ণনাগুলি কখনও কখনও তিনটি মাত্রায় মাপা হয়েছে। সেই সমস্ত ঘটনার উপদেশমূলক শিক্ষাই আমাদের গ্রহণীয় বিষয়, যদিও তা আমাদের সীমিত উপলব্ধিতে ধারাবাহিকভাবে মনে নাও হতে পারে। যুধিষ্ঠির মহারাজের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তরে ভীষ্মদেব সেই প্রকার ঘটনাই বর্ণনা করেছেন।

শ্লোক ২৯

ধর্মং প্রবদতস্তস্য স কালঃ প্রত্যুপস্থিতঃ ।
যো যোগিনশ্ছন্দমৃত্যোর্বাঞ্ছিতস্তূত্তরায়ণঃ ॥ ২৯ ॥

ধর্মম্—বৃত্তি অনুসারে কর্তব্য-কর্মাদি; **প্রবদতঃ**—বর্ণনা করার সময়ে; **তস্য**—তাঁর; **সঃ**—সেই; **কালঃ**—সময়; **প্রত্যুপস্থিতঃ**—যথাযথভাবে এসে উপস্থিত হল; **যঃ**—যা;

যোগিনঃ—যোগীদের; **ছন্দ-মৃত্যোঃ**—নিজের ইচ্ছায় যাঁর মৃত্যু হয় তাঁর; **বাঞ্ছিতঃ**—অভিলষিত; **তু**—কিন্তু; **উত্তরায়ণঃ**—সূর্যের উত্তরায়ণ কাল, যখন সূর্য উত্তর দিগন্ত অভিমুখী হয়ে থাকে।

অনুবাদ

যখন বৃত্তি অনুযায়ী কর্তব্য-কর্মের বিষয়ে ভীষ্মদেব উপদেশ দিচ্ছিলেন, তখন সূর্যের গতিপথ উত্তর গোলার্ধের অভিমুখী হয়। সিদ্ধযোগীরা যাঁরা তাঁদের ইচ্ছানুযায়ী মৃত্যুবরণ করতে চান, তাঁরা এই বিশেষ সময়টির অভিলাষ করে থাকেন।

তাৎপর্য

সিদ্ধ যোগীরা তাঁদের ইচ্ছানুসারে উপযুক্ত সময়ে জড় শরীর ত্যাগ করে তাঁদের ঈপ্সিত লোকে যেতে পারেন। *শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায়* (৮/২৪) বলা হয়েছে যে স্বরূপসিদ্ধ ব্যক্তি, যিনি পরমেশ্বর ভগবানের স্বার্থের অনুকূলে নিজেকে সম্পূর্ণরূপে নিয়োজিত করেছেন, তিনি অগ্নিদেবের জ্যোতি বিকিরণের সময় এবং উত্তরায়ণের সময় সাধারণত তাঁর দেহত্যাগ করে চিজ্জগতে গমন করেন। বেদে এই প্রকার সময়কে দেহত্যাগ করার পক্ষে শুভ বলে বিবেচনা করা হয়েছে, এবং সিদ্ধ যোগীরা সেই সুযোগ গ্রহণ করে থাকেন। যোগসিদ্ধির অর্থ হচ্ছে এই প্রকার উচ্চতর মানসিক অবস্থা প্রাপ্ত হওয়া, যার ফলে ইচ্ছানুসারে শরীর ত্যাগ করা যায়। যোগীরা কোনরকম ভৌতিক যানের সাহায্য ব্যতীতই পলকের মধ্যে যে কোন লোকে পৌঁছতে পারেন। তাঁরা অতি অল্প সময়ের মধ্যে সর্বোচ্চ লোকে পৌঁছাতে পারেন, যা জড়বাদীদের পক্ষে অসম্ভব। ঘণ্টায় লক্ষ লক্ষ মাইল গতিতে ভ্রমণ করলেও সর্বোচ্চ লোকে পৌঁছতে লক্ষ লক্ষ বৎসর লাগবে। এটি একটি ভিন্ন ধরনের বিজ্ঞান, এবং ভীষ্মদেব ভালভাবেই তার সদ্ব্যবহার করতে জানতেন। তিনি তাঁর জড়দেহ ত্যাগ করার জন্য উপযুক্ত সময়ের প্রতীক্ষা করছিলেন, এবং তিনি যখন তাঁর মহান পৌত্র পাণ্ডবদের উপদেশ দিচ্ছিলেন, তখন সেই সুবর্ণ সুযোগটি উপস্থিত হয়েছিল। তিনি এইভাবে পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ, পুণ্যাত্মা পাণ্ডবগণ, ভগবান ব্যাসদেব প্রমুখ মহর্ষিগণ আদি সমস্ত মহাত্মাদের সমক্ষে তাঁর দেহত্যাগ করার জন্য প্রস্তুত হয়েছিলেন।

শ্লোক ৩০

তদোপসংহৃত্য গিরঃ সহস্রণী-
র্বিমুক্তসঙ্গং মন আদিপুরুষে।
কৃষ্ণে লসৎপীতপটে চতুর্ভুজে
পুরঃস্থিতেঽমীলিতদৃগ্‌ব্যধারয়ৎ ॥ ৩০ ॥

তদা—তখন; উপসংহৃত্য—প্রত্যাহার করে; গিরঃ—বাক্য; সহস্রণীঃ—ভীষ্মদেব (যিনি শত সহস্র বিজ্ঞান এবং কলা-কৌশলে নিপুণ ছিলেন); বিমুক্ত-সঙ্গম্—সবকিছু থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত হয়ে; মনঃ—মন; আদি-পুরুষে—পরমেশ্বর ভগবানে; কৃষ্ণে—শ্রীকৃষ্ণে; লসৎ-পীত-পটে—পীতবসন শোভিত; চতুর্ভুজে—চতুর্ভুজ নারায়ণে; পুরঃ—সমক্ষে; স্থিতে—দণ্ডায়মান; অমীলিত—অনিমেষ; দৃক্—নয়নে; ব্যধারয়ৎ—নিবিষ্ট করেছিলেন।

অনুবাদ

অবিলম্বে সেই ব্যক্তিটি, যিনি সহস্র অর্থ সমন্বয়ে বিভিন্ন বিষয়ে উপদেশ দিতেন, যিনি সহস্র সহস্র রণাঙ্গনে সংগ্রাম করেছিলেন এবং সহস্র সহস্র মানুষকে রক্ষা করেছিলেন, তিনি বাক্য রোধ করলেন এবং সমস্ত বন্ধন থেকে সম্পূর্ণভাবে মুক্ত হয়ে সমস্ত বিষয় থেকে তাঁর মন প্রত্যাহার করে নিলেন; তাঁর নয়ন-সমক্ষে যে দীপ্তিময় উজ্জ্বল পীতবসনধারী চতুর্ভুজ আদি পরম পুরুষ ভগবান শ্রীকৃষ্ণ দাঁড়িয়ে ছিলেন, তাঁর দিকে তখন প্রসারিত নির্নিমেষ দৃষ্টি নিবদ্ধ করে রইলেন।

তাৎপর্য

তাঁর জড় শরীর ত্যাগ করার গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্তে ভীষ্মদেব মনুষ্য জীবনের গুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্যের এক মহান দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। মৃত্যুর সময় যে বিষয় মানুষকে আকৃষ্ট করে, সেই অনুসারে তাঁর পরবর্তী জীবন শুরু হয়। তাই কেউ যদি পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের চিন্তায় মগ্ন হন, তাহলে তিনি যে নিশ্চিতভাবে ভগবানের ধামে ফিরে যাবেন সে সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নেই। সে কথা *শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায়* প্রতিপন্ন হয়েছে (৮/৫-১৫)—

৫) মৃত্যুর সময়ে যিনি আমাকে স্মরণ করে দেহত্যাগ করেন, তিনি তৎক্ষণাৎ আমার ভাবই প্রাপ্ত হন। এ বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই।

৬) মৃত্যুর সময় যিনি যে ভাব স্মরণ করে দেহত্যাগ করেন, তিনি সেইভাবে ভাবিত তত্ত্বকেই লাভ করেন।

৭) অতএব, হে অর্জুন, সর্বদা আমাকে স্মরণ করে তোমার স্বভাব বিহিত যুদ্ধ কর, তাহলে আমাতে তোমার মন ও বুদ্ধি অর্পিত হবে এবং নিঃসন্দেহে তুমি আমাকেই লাভ করবে।

৮) হে পার্থ, অভ্যাস যোগে যুক্ত হয়ে অনন্যগামী চিত্তে যিনি আমার ধ্যান করেন, তিনি অবশ্যই আমাকেই প্রাপ্ত হবেন।

৯) সর্বজ্ঞ, সনাতন, নিয়ন্তা, সূক্ষ্ম থেকে সূক্ষ্মতর, সকলের বিধাতা, জড় বুদ্ধির অতীত, অচিন্ত্য পুরুষরূপে পরমেশ্বর ভগবানের ধ্যান করা উচিত। তিনি সূর্যের মতো জ্যোতির্ময় এবং এই জড়া-প্রকৃতির অতীত।

১০) যিনি মৃত্যুর সময় অচঞ্চল চিত্তে ভক্তি সহকারে পূর্ব যোগাভ্যাস বশত ভ্রূযুগলের মধ্যে প্রাণকে স্থিত করে পরমেশ্বর ভগবানকে স্মরণ করেন, তিনি অবশ্যই সেই দিব্য পরম পুরুষকে প্রাপ্ত হন।

১১) বেদবিদ্ পণ্ডিতেরা যাঁকে 'অক্ষর' বলে অভিহিত করেন, বিষয়াসক্তিশূন্য সন্ন্যাসীরা যাঁকে লাভ করেন, ব্রহ্মচারীরা যাঁকে লাভ করার ইচ্ছায় ব্রহ্মচর্য পালন করেন, তাঁর কথা আমি তোমাকে বলব।

১২) ইন্দ্রিয়ের সব কটি দ্বার সংযত করে, মনকে হৃদয়ে নিরুদ্ধ করে ভ্রূ-দ্বয়ের মধ্যে প্রাণ স্থাপন করে যোগে স্থিত হতে হয়।

১৩) যোগাভ্যাসে প্রবৃত্ত হয়ে পবিত্র ওঙ্কার উচ্চারণ করতে করতে কেউ যদি পরমেশ্বর ভগবানকে স্মরণ করে দেহত্যাগ করেন, তিনি অবশ্যই পরমা গতি লাভ করবেন।

১৪) যিনি একাগ্র চিত্তে কেবল আমাকেই নিরন্তর স্মরণ করেন, আমি সেই নিত্যযুক্ত ভক্তযোগীদের কাছে সুলভ হই।

১৫) মহাত্মাগণ, ভক্তিপরায়ণ যোগীগণ, আমাকে লাভ করে আর এই দুঃখপূর্ণ নশ্বর সংসারে পুনরায় জন্মগ্রহণ করেন না, কেননা তাঁরা সর্বোচ্চ সিদ্ধি লাভ করেছেন।

শ্রীভীষ্মদেব তাঁর ইচ্ছানুসারে শরীর ত্যাগ করার সিদ্ধি লাভ করেছিলেন, এবং মৃত্যুর সময় তাঁর সম্মুখে তাঁর অভীষ্ট শ্রীকৃষ্ণকে স্বয়ং উপস্থিত থাকার মহা সৌভাগ্য লাভ করেছিলেন। তাই তিনি তাঁর উন্মীলিত নেত্র তাঁর উপর নিবদ্ধ করেছিলেন। তাঁর স্বতঃস্ফূর্ত প্রেমের প্রভাবে তিনি দীর্ঘকাল ধরে শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করতে চেয়েছিলেন। যেহেতু তিনি ছিলেন ভগবানের শুদ্ধ ভক্ত, তাই যোগের বিশদ ক্রিয়াকলাপের আবশ্যকতা তাঁর ছিল না। সরল ভক্তিযোগই সিদ্ধি লাভের জন্য যথেষ্ট। তাই প্রেমাস্পদ পরম পুরুষ শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করাই ছিল ভীষ্মদেবের ঐকান্তিক বাসনা, এবং ভগবানের কৃপায় শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করার মুহূর্তে ভীষ্মদেবের সেই সৌভাগ্য হয়েছিল।

শ্লোক ৩১

বিশুদ্ধয়া ধারণয়া হতাশুভ-
স্তদীক্ষয়ৈবাশু গতায়ুধশ্রমঃ ।
নিবৃত্তসর্বেন্দ্রিয়বৃত্তিবিভ্রম-
স্তুষ্টাব জন্যং বিসৃজন্ জনার্দনম্ ॥ ৩১ ॥

বিশুদ্ধয়া—নির্মল; **ধারণয়া**—ভাবনার দ্বারা; **হত-অশুভঃ**—জড় অস্তিত্বের অশুভ বিষয়সমূহ যিনি হ্রাস করেছেন; **তৎ**—তাঁকে; **ঈক্ষয়া**—দর্শনের দ্বারা; **এব**—সহজেই; **আশু**—শীঘ্র; **গতা**—দূর হয়ে যাওয়ায়; **যুধ**—বাণসমূহ থেকে; **শ্রমঃ**—ক্লান্তি; **নিবৃত্ত**—নিরস্ত; **সর্ব**—সমস্ত; **ইন্দ্রিয়**—ইন্দ্রিয়াদি; **বৃত্তি**—কার্যকলাপ; **বিভ্রমঃ**—বিবিধভাবে যুক্ত হয়ে; **তুষ্টাব**—স্তব করেছিলেন; **জন্যম্**—জড় পিঞ্জর; **বিসৃজন্**—ত্যাগ করার সময়; **জনার্দনম্**—সমস্ত জীবের নিয়ন্তাকে।

অনুবাদ

বিশুদ্ধ ধ্যানে মগ্ন হয়ে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের দর্শন লাভ করার ফলে তিনি জড় জাগতিক সমস্ত অশুভ বিষয় থেকে তৎক্ষণাৎ মুক্ত হলেন, এবং শরাঘাতে প্রাপ্ত সমস্ত দৈহিক বেদনার উপশম হল। এইভাবে তাঁর ইন্দ্রিয়াদির বাহ্যিক কার্যকলাপ তৎক্ষণাৎ রুদ্ধ হয়ে গিয়েছিল, এবং তিনি তাঁর জড়দেহ পরিত্যাগের সময় সমস্ত জীবের নিয়ন্তার উদ্দেশ্যে অপ্রাকৃতভাবে স্তব করতে লাগলেন।

তাৎপর্য

জড় দেহ হচ্ছে জড়া-প্রকৃতির একটি দান, যাকে তত্ত্বগতভাবে বলা হয় মায়া। ভগবানের সঙ্গে আমাদের নিত্য সম্পর্কের কথা ভুলে যাওয়ার জন্য আমরা এই জড় দেহের সঙ্গে একাত্মবোধ করি। ভগবান উপস্থিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ভীষ্মদেবের মতো শুদ্ধ ভক্তের এই মায়া অবিলম্বেই অপসারিত হয়েছিল। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন সূর্যের মতো, এবং মায়া বা বহিরঙ্গা জড়া প্রকৃতি অন্ধকারের মতো। সূর্যের প্রকাশ হলে অন্ধকারের আর কোন সম্ভাবনাই থাকে না। তাই ভগবান শ্রীকৃষ্ণ পৌঁছোবার সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত জড় কলুষ দূরীভূত হয়েছিল এবং এইভাবে ভীষ্মদেব জড়ের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত ইন্দ্রিয়সমূহের কার্যকলাপ স্তব্ধ করে দিব্য স্তরে অধিষ্ঠিত হতে সমর্থ হয়েছিলেন। আত্মা শুদ্ধ এবং ইন্দ্রিয়গুলিও শুদ্ধ। জড় কলুষের দ্বারা কলুষিত হয়ে ইন্দ্রিয়গুলি অপূর্ণ ও অশুদ্ধরূপে প্রতিভাত হয়। পরম শুদ্ধ ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে পুনরায় সংযুক্ত হওয়ার ফলে ইন্দ্রিয়গুলি জড় কলুষ থেকে মুক্ত হয়। ভীষ্মদেব ভগবানের উপস্থিতির ফলে তাঁর জড় শরীর ত্যাগ করার পূর্বেই এই সমস্ত দিব্য অবস্থা লাভ করেছিলেন। ভগবান সমস্ত জীবের নিয়ন্তা এবং হিতকারী। সেটিই সমগ্র বেদের সিদ্ধান্ত। সমস্ত নিত্য জীবসমূহের মধ্যে তিনি হচ্ছেন পরম নিত্য এবং পরম চেতন—*নিত্যো নিত্যানাং চেতনশ্চেতনানামেকো বহূনাং যো বিদধাতি কামান্* । আর তিনিই সমস্ত জীবের সকল প্রকার প্রয়োজনসমূহ সরবরাহ করে থাকেন। এইভাবে তিনি তাঁর পরম ভক্ত ভীষ্মদেবের দিব্য অভিলাষ পূর্ণ করার জন্য সমস্ত প্রকার সুযোগ প্রদান করেছিলেন। তাঁর উদ্দেশ্যে ভীষ্মদেবের প্রার্থনা নিম্নে দেওয়া হয়েছে।

শ্লোক ৩২

শ্রীভীষ্ম উবাচ

ইতি মতিরুপকল্পিতা বিতৃষ্ণা
ভগবতি সাত্বতপুঙ্গবে বিভূম্নি ।
স্বসুখমুপগতে ক্বচিদ্বিহর্তুং
প্রকৃতিমুপেয়ুষি যদ্ভবপ্রবাহঃ ॥ ৩২ ॥

শ্রীভীষ্মঃ উবাচ—শ্রীভীষ্মদেব বললেন; **ইতি**—এইভাবে; **মতিঃ**—চিন্তা, অনুভূতি এবং ইচ্ছা; **উপকল্পিতা**—সমর্পিত; **বিতৃষ্ণা**—সমস্ত ইন্দ্রিয়-সুখ-বাসনা থেকে মুক্ত; **ভগবতি**—পরমেশ্বর ভগবানে; **সাত্বত-পুঙ্গবে**—ভক্তশ্রেষ্ঠ; **বিভূম্নি**—মহান; **স্ব-সুখম্**—আত্মতৃপ্তি; **উপগতে**—যিনি প্রাপ্ত হয়েছেন; **ক্বচিৎ**—কখনো; **বিহর্তুম্**—অপ্রাকৃত আনন্দজনিত; **প্রকৃতিম্**—জড় জগতে; **উপেয়ুষি**—স্বীকার করেন; **যৎ-ভব**—যাঁর থেকে সৃষ্টি; **প্রবাহঃ**—সৃষ্টি, স্থিতি এবং প্রলয়।

অনুবাদ

ভীষ্মদেব বললেন আমার চিন্তা, অনুভূতি এবং ইচ্ছা, যা এতদিন বিভিন্ন বিষয় এবং বৃত্তিগত কর্তব্যে নিয়োজিত ছিল, তা এখন সর্বশক্তিমান ভগবান শ্রীকৃষ্ণে বিনিযুক্ত হোক। তিনি সর্বদা আত্মতৃপ্ত, কিন্তু কখনো কখনো ভক্তকুলশ্রেষ্ঠ-রূপে তিনি এই জড় জগতে অবতরণ করে অপ্রাকৃত আনন্দ উপভোগ করেন, যদিও এই জড় জগৎ তাঁর থেকেই সৃষ্টি হয়েছে।

তাৎপর্য

যেহেতু ভীষ্মদেব ছিলেন একজন রাষ্ট্রনেতা, কুরুবংশের প্রধান, মহারথী এবং ক্ষত্রিয় কুলের নায়ক, তাই তাঁর মন বিভিন্ন বিষয়ে পরিব্যাপ্ত ছিল; তাঁর চিন্তা, অনুভূতি এবং ইচ্ছা বিভিন্ন ব্যাপারে নিযুক্ত ছিল। এখন শুদ্ধ ভগবদ্ভক্তি লাভ করার জন্য তাঁর চিন্তা, অনুভূতি এবং ইচ্ছা তিনি ভগবান শ্রীকৃষ্ণের পরম সত্তায় নিবদ্ধ করতে চেয়েছিলেন। এখানে তাঁকে ভক্তশ্রেষ্ঠ ও সর্বশক্তিমান বলে বর্ণনা করা হয়েছে। যদিও ভগবান শ্রীকৃষ্ণ আদি পুরুষ, তবুও তিনি স্বয়ং এই মর্তলোকে অবতরণ করেন তাঁর শুদ্ধ ভক্তকে ভক্তিযোগরূপ বর প্রদান করার জন্য। কখনও তিনি ভগবান শ্রীকৃষ্ণরূপে অবতরণ করেন, আবার কখনও শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুরূপে। উভয় রূপেই তিনি ভক্তশ্রেষ্ঠ। ভগবানের শুদ্ধভক্তদের তাঁর সেবা ছাড়া অন্য কোন বাসনা নেই,

এবং তাই তাঁদের বলা হয় সাত্বত। ভগবান হচ্ছেন এই সমস্ত সাত্বতদের মধ্যে প্রধান। ভীষ্মদেবের তাই অন্য কোন বাসনা ছিল না। যতক্ষণ পর্যন্ত না কেউ সমস্ত প্রকার জড় বাসনা থেকে মুক্ত হচ্ছে, ভগবান তাঁর পতি বা প্রভু হন না। বাসনাকে ত্যাগ করা যায় না, তাকে কেবল শুদ্ধ করতে হয়। *শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায়* (১০/১০) ভগবান স্বয়ং প্রতিপন্ন করেছেন যে, তিনি তাঁর সেবায় নিরন্তরভাবে নিয়োজিত তাঁর শুদ্ধ ভক্তের হৃদয় থেকে উপদেশ প্রদান করে থাকেন। এই প্রকার উপদেশ জড় উদ্দেশ্য সাধনের জন্য প্রদান করা হয় না, কেবল ভগবদ্ধামে প্রত্যাবর্তন করার জন্যই তা করা হয়ে থাকে। যে সমস্ত সাধারণ মানুষ জড়া-প্রকৃতির উপর প্রভুত্ব করতে চায়, তাদের ভগবান যে কেবল সেই কার্যের অনুমোদন ও পর্যবেক্ষণ করেন তাই নয়, তাদের ভগবদ্ধামে প্রত্যাবর্তনের জন্যও কোন প্রকার উপদেশ প্রদান করেন না। সেটিই হচ্ছে ভক্ত এবং অভক্ত উভয় প্রকার জীবের সঙ্গে ভগবানের ব্যবহারের তারতম্য। রাজ্যের রাজা যেমন বন্দী এবং মুক্ত উভয় প্রজারই শাসক, তেমনই ভগবানও সমস্ত জীবের নায়ক। কিন্তু ভক্ত এবং অভক্তের পার্থক্য অনুসারে তিনি তাদের সঙ্গে আচরণ করেন। অভক্তেরা কখনও ভগবানের কাছ থেকে উপদেশ গ্রহণের প্রয়োজন বোধ করে না, এবং তাই ভগবানও তাদের ক্ষেত্রে নীরব থাকেন; যদিও তিনি তাদের সমস্ত কার্যকলাপ পর্যবেক্ষণ করেন এবং কার্য অনুসারে ভাল বা মন্দ ফল প্রদান করে থাকেন। ভক্ত এই প্রকার জড় জাগতিক ভাল-মন্দের ঊর্ধ্বে। তারা মুক্তির পথে প্রগতিশীল, এবং তাই তাদের কোন প্রকার জড়-বাসনা নেই। ভক্ত জানেন যে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন আদি নারায়ণ, কেননা ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাঁর অংশ-প্রকাশের মাধ্যমে সমগ্র জড় সৃষ্টির মূল উৎসস্বরূপ কারণোদকশায়ী বিষ্ণুরূপে আবির্ভূত হন। ভগবানও তাঁর শুদ্ধ ভক্তদের সঙ্গ লাভ করার বাসনা করেন, এবং তাঁদের জন্যই কেবল তিনি এই জগতে অবতরণ করেন এবং তাদের অনুপ্রাণিত করেন। ভগবান স্বেচ্ছায় অবতীর্ণ হন। তিনি জড়া-প্রকৃতির বাধ্য নন। তাই তাঁকে এখানে বিভু বা সর্বশক্তিমান বলে বর্ণনা করা হয়েছে, কেননা তিনি জড়া-প্রকৃতির নিয়মের দ্বারা আবদ্ধ নন।

শ্লোক ৩৩

ত্রিভুবনকমনং তমালবর্ণং
রবিকরগৌরবরাম্বরং দধানে।
বপুরলককুলাবৃতাননাব্জং
বিজয়সখে রতিরস্তু মেঽনবদ্যা ॥ ৩৩ ॥

ত্রি-ভুবন—ত্রিলোক; **কমনম্**—সর্বাপেক্ষা কমনীয়; **তমাল-বর্ণম্**—তমাল বৃক্ষের মতো নীলাভ বর্ণ; **রবি-কর**—সূর্যকিরণ; **গৌর**—স্বর্ণাভ বর্ণ; **বরাম্বরম্**—উজ্জ্বল বসন; **দধানে**—পরিহিত; **বপুঃ**—দেহ; **অলক-কুল-আবৃত**—কুঞ্চিত কেশরাশির দ্বারা আবৃত; **অনন-অব্জম্**—মুখপদ্ম; **বিজয়-সখে**—অর্জুনের সখা; **রতিঃঅস্তু**—তাঁর প্রতি আসক্তি হোক; **মে**—আমার; **অনবদ্যা**—কর্মফলের বাসনারহিত।

অনুবাদ

ত্রিলোকের (স্বর্গ, মর্ত এবং পাতাল) মধ্যে সবচেয়ে সুন্দর, তমালের মতো নীলাভ বর্ণযুক্ত, সূর্যকিরণের মতো নির্মল দীপ্ত বসনে বিভূষিত এবং কুঞ্চিত কেশদামে আবৃত মুখপদ্ম সমন্বিত দিব্য শরীরধারী এই অর্জুন-সখা শ্রীকৃষ্ণের প্রতি আমার কর্মফল-বাসনারহিত চিত্তবৃত্তি আসক্তি লাভ করুক।

তাৎপর্য

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যখন তাঁর নিজ অন্তরঙ্গ আনন্দ-সুখে ধরাধামে আবির্ভূত হন, তিনি তা করে থাকেন তাঁর অন্তরঙ্গা-শক্তির সহায়তায়। তাঁর অপ্রাকৃত দেহের আকর্ষণীয় বৈশিষ্ট্যসমূহ সমগ্র ত্রিভুবনে, যথা স্বর্গ, মর্ত এবং পাতালে অত্যন্ত আকাঙ্ক্ষিত বস্তু। ব্রহ্মাণ্ডের আর কোথাও ভগবান শ্রীকৃষ্ণের মতো এমন সুন্দর অঙ্গশ্রী নেই। তাই তাঁর অপ্রাকৃত দেহের সঙ্গে জড়ের দ্বারা সৃষ্ট বস্তুর কোন সম্পর্ক নেই। এখানে অর্জুনকে বিজয়ীরূপে বর্ণনা করা হয়েছে, এবং কৃষ্ণকে তাঁর অন্তরঙ্গ সখারূপে বর্ণনা করা হয়েছে। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের পরে শরশয্যায় শায়িত অবস্থায় ভীষ্মদেব অর্জুনের রথের সারথিরূপে পরিহিত শ্রীকৃষ্ণের বিশেষ বসনের কথা স্মরণ করছেন। যখন অর্জুন এবং ভীষ্মের মধ্যে যুদ্ধ হচ্ছিল, সেই সময় কৃষ্ণের উজ্জ্বল বসনের প্রতি ভীষ্মদেবের দৃষ্টি আকর্ষিত হয়েছিল, এবং পরোক্ষভাবে তিনি তাঁর তথাকথিত প্রতিদ্বন্দ্বী অর্জুনের প্রশংসা করেছিলেন ভগবানকে তাঁর সখারূপে লাভ করার জন্য। অর্জুন সকল সময়েই বিজয়ী ছিলেন, কেননা ভগবান ছিলেন তাঁর সখা। এই সুযোগ গ্রহণ করে ভীষ্মদেব ভগবানকে বিজয়সখে বলে সম্বোধন করেছেন, কেননা ভগবানকে যখন তাঁর সঙ্গে বিভিন্ন রসে সম্পর্কিত ভক্তের নামের সঙ্গে সংযুক্তভাবে সম্বোধন করা হয় তখন তিনি প্রীত হন। যখন শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনের সারথিরূপে বিলাস করছিলেন তখন তাঁর বসনে সূর্যরশ্মি বিচ্ছুরিত হচ্ছিল এবং এই প্রকার রশ্মি-বিচ্ছুরণের ফলে যে অপূর্ব বর্ণের সৃষ্টি হয়েছিল তা ভীষ্মদেব কখনও ভুলতে পারেন নি। মহারথীরূপে তিনি শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে এই বীর রস উপভোগ করেছিলেন। ভগবানের সঙ্গে যে কোন একটি রসের দিব্য সম্পর্কে

সম্পর্কিত হয়ে বিশেষ বিশেষ ভক্ত সর্বোচ্চ আনন্দ উপভোগ করে থাকেন। অল্পবুদ্ধিসম্পন্ন জড় জাগতিক মানুষেরা, যারা ভগবানের সঙ্গে এই প্রকার দিব্য সম্পর্কের ভাব কৃত্রিমভাবে প্রদর্শন করে থাকে, তারা ব্রজধামের গোপিকাদের অনুকরণ করে সরাসরি মাধুর্য রসে প্রবেশ করতে চায়। ভগবানের সঙ্গে এই প্রকার লঘু সম্পর্ক প্রদর্শন জড়বাদীদের হীন মনোবৃত্তিরই প্রকাশ করে থাকে, কেননা যারা ভগবানের সঙ্গে মাধুর্য রসের সম্পর্কের স্বাদ আস্বাদন করেছে তারা জড়-জাগতিক মিথুন সম্পর্কে কখনো আসক্ত হতে পারে না, যা এমনকি জড়বাদী নীতিবাদীদের দ্বারাও নিন্দিত হয়ে থকে। কোন বিশেষ জীবের সঙ্গে পরমেশ্বর ভগবানের নিত্য সম্পর্ক বিবর্তিত হয়ে থাকে। পরমেশ্বর ভগবানের সঙ্গে জীবের প্রকৃত সম্পর্ক পাঁচটি মুখ্য রসের যে কোন একটিকে ভিত্তি করে গড়ে ওঠে, এবং প্রকৃত ভক্তের কাছে তাঁর অপ্রাকৃত তারতম্যের কোন পার্থক্য অনুভূত হয় না। ভীষ্মদেব তাঁর প্রকৃষ্ট উদাহরণ, এবং এটি অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে লক্ষ্য করা উচিত যে কেমনভাবে সেই মহারথী ভগবানের সঙ্গে অপ্রাকৃত সম্পর্কে সম্পর্কিত ছিলেন।

শ্লোক ৩৪

যুধি তুরগরজোবিধূম্রবিষ্বক্-
কচলুলিতশ্রমবার্যলঙ্কৃতাস্যে।
মম নিশিতশরৈর্বিভিদ্যমান-
ত্বচি বিলসৎকবচেঽস্তুকৃষ্ণ আত্মা ॥ ৩৪ ॥

যুধি—রণক্ষেত্রে; **তুরগ**—অশ্ব; **রজঃ**—ধূলি; **বিধূম্র**—ধূসরিত; **বিষ্বক্**—কুঞ্চিত; **কচ**—কেশ; **লুলিত**—অবিন্যস্ত; **শ্রমবারি**—স্বেদ; **অলঙ্কৃত**—শোভিত; **আস্যে**—মুখমণ্ডলে; **মম**—আমার; **নিশিত**—তীক্ষ্ণ; **শরৈঃ**—বাণের দ্বারা; **বিভিদ্যমান**—বিদ্ধ; **ত্বচি**—ত্বকে; **বিলসৎ**—উপভোগ্য; **কবচে**—বর্ম; **অস্তু**—হোক; **কৃষ্ণে**—শ্রীকৃষ্ণে; **আত্মা**—মন।

অনুবাদ

যুদ্ধক্ষেত্রে (যেখানে শ্রীকৃষ্ণ সখ্য বশত অর্জুনের রথের সারথি হয়েছিলেন) শ্রীকৃষ্ণের আলুলায়িত কেশরাশি অশ্ব খুরোত্থিত ধূলির দ্বারা ধূসর বর্ণ ধারণ করেছিল, এবং পরিশ্রমের ফলে তাঁর মুখমণ্ডল ঘর্মবিন্দুর দ্বারা সিক্ত হয়েছিল। তাঁর এই সমস্ত শোভা আমার তীক্ষ্ণ শরাঘাতের ক্ষতচিহ্নাদি দ্বারা প্রকটিত হয়ে তাঁর উপভোগ্য হয়েছিল। সেই শ্রীকৃষ্ণের প্রতি আমার চিত্ত ধাবিত হোক।

তাৎপর্য

ভগবান সচ্চিদানন্দ স্বরূপ। যখন শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য এবং মাধুর্য এই পাঁচটি মুখ্য রসের যে কোন একটি রসে বাস্তবিক প্রেম এবং অনুরাগ সহকারে ভগবানের চিন্ময় প্রেমময়ী সেবা সম্পাদন করা হয় ভগবান তখন তা গ্রহণ করেন। শ্রীভীষ্মদেব ছিলেন দাস্য রসে ভগবানের একজন মহান ভক্ত। তাই ভগবানের চিন্ময় শরীরের প্রতি তাঁর তীক্ষ্ণ শর নিক্ষেপ অন্য ভক্তের দ্বারা তাঁর প্রতি কোমল পুষ্প নিবেদনেরই সমান।

এখানে মনে হয় যে ভগবানের প্রতি ভীষ্মদেব যে আচরণ করেছিলেন সেজন্য তিনি অনুতপ্ত। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ভগবানের সত্তা চিন্ময় হওয়ার ফলে তাঁর শ্রীঅঙ্গ কোনরকম বেদনা অনুভব করেনি। তাঁর দেহ জড় নয়। তিনি স্বয়ং এবং তাঁর দেহ উভয়ই সম্পূর্ণরূপে চিন্ময়। চেতন আত্মাকে কখনও কাটা যায় না, পোড়ানো যায় না, শুকানো যায়না, ভিজানো যায় না ইত্যাদি। সে কথা স্পষ্টভাবে *শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায়* বিশ্লেষণ করা হয়েছে। স্কন্দ পুরাণেও সেকথা উল্লেখ করা হয়েছে। সেখানে বলা হয়েছে যে আত্মা সর্বদাই নিষ্কলুষ এবং অবিনাশী। তাকে কখনও ক্লেশ দেওয়া যায় না, এবং তাকে কখনও শুকানো যায় না। ভগবান শ্রীবিষ্ণু যখন অবতাররূপে আমাদের সম্মুখে প্রকট হন তখন তাঁকে জড় বিষয়ে লিপ্ত একটি বদ্ধজীবের মতো মনে হয়। যারা ভগবানকে হত্যা করার জন্য সর্বদা তৎপর, এমনকি যারা তাঁকে আবির্ভাবের মুহূর্ত থেকে হত্যা করতে চায়, সেই অসুর বা নাস্তিকদের বিমোহিত করার জন্য তিনি এইভাবে লীলা-বিলাস করেন। কংস কৃষ্ণকে হত্যা করতে চেয়েছিল, এবং রাবণ রামচন্দ্রকে হত্যা করতে চেয়েছিল, মূর্খতাবশত তারা জানতো না যে ভগবানকে কখনও হত্যা করা যায় না, কেননা চিন্ময় বস্তু অবিনাশী।

তাই অভক্ত নাস্তিকদের কাছে ভীষ্মদেব কর্তৃক ভগবান শ্রীকৃষ্ণের দেহ বাণের দ্বারা বিদ্ধ হওয়া এক বিভ্রান্তিকর সমস্যা, কিন্তু ভক্ত বা মুক্ত আত্মাগণ তাতে বিভ্রান্ত হন না।

ভীষ্মদেব ভগবানের পরম করুণাময় ভাবের প্রশংসা করেছেন, কেননা তিনি ভীষ্মদেবের তীক্ষ্ণ বাণের দ্বারা বিদ্ধ হয়ে বিচলিত হওয়া সত্ত্বেও অর্জুনকে একলা ছেড়ে যাননি। আবার তিনি ভীষ্মদেবের মৃত্যুশয্যার নিকটে আসতেও নারাজ হননি, যদিও কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের সময় ভীষ্মদেব তাঁর প্রতি দুর্ব্যবহার করেছিলেন। এখানে ভীষ্মদেবের অনুতাপ এবং ভগবানের করুণাময় ভাবের দৃশ্যটি অতুলনীয়।

একজন মহান আচার্য এবং মাধুর্য রসে ভগবানের ভক্ত শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর এই সম্পর্কে এক অত্যন্ত মহত্বপূর্ণ মন্তব্য করেছেন। তিনি বলেছেন যে

ভীষ্মদেবের তীক্ষ্ণ বাণের দ্বারা ভগবানের দেহ যে আহত হয়েছিল, তা ভগবানের কাছে সম্ভোগেচ্ছার প্রবল আবেগের ফলে প্রেমিকার দংশনের মতো আনন্দদায়ক। প্রেমিকার দ্বারা এই প্রকার দংশন শত্রুতার লক্ষণ বলে মনে হয় না, যদিও তার ফলে দেহ ক্ষত হয়। তাই ভগবান এবং তাঁর শুদ্ধ ভক্ত শ্রীভীষ্মদেবের মধ্যে যে যুদ্ধ হয়েছিল তা ছিল দিব্য আনন্দের আদান-প্রদান। আর তা ছাড়া, যেহেতু ভগবানের শরীর এবং ভগবান অভিন্ন, তাই তাঁর সেই চিন্ময় শরীরে আঘাতের কোন সম্ভাবনা ছিল না। আপাতদৃষ্টিতে তীক্ষ্ণ বাণের দ্বারা যে ক্ষত তা সাধারণ মানুষের পক্ষে ভ্রান্তিজনক, কিন্তু পরম তত্ত্ব সম্বন্ধে যাঁর সামান্য জ্ঞানও আছে, তিনি বুঝতে পারেন যে সেটি হচ্ছে বীর রসের চিন্ময় আদান-প্রদান। ভীষ্মদেবের তীক্ষ্ণ বাণের দ্বারা যে ক্ষত উৎপন্ন হয়েছিল তার ফলে ভগবান পূর্ণরূপে প্রসন্ন হয়েছিলেন। *বিভিদ্যমান* শব্দটি তাৎপর্যপূর্ণ, কেননা ভগবানের ত্বক ভগবান থেকে ভিন্ন নয়। যেহেতু আমাদের ত্বক আমাদের আত্মা থেকে ভিন্ন, তাই আমাদের বেলায় *বিভিদ্যমান* বা আহত হওয়া বা কাটা অত্যন্ত উপযুক্ত শব্দ হত। চিন্ময় আনন্দ বিভিন্ন প্রকার বৈচিত্র্য সমন্বিত এবং জড়-জাগতিক কার্যকলাপের বৈচিত্র্য চিন্ময় আনন্দের বিকৃত প্রতিফলন মাত্র। যেহেতু জড় জগতে সবকিছুই গুণগতভাবে জড়, তাই তা ভ্রান্তিপূর্ণ। কিন্তু চিন্ময় স্তরে যেহেতু সবকিছুই চিন্ময়, সেখানে বিভিন্ন প্রকার আনন্দ রয়েছে যাতে কোন প্রকার উন্মত্ততা নেই। ভগবানের মহান ভক্ত ভীষ্মদেবের দ্বারা আহত হয়ে ভগবান আনন্দ উপভোগ করেছেন, এবং যেহেতু ভীষ্মদেব হচ্ছেন বীর রসের ভক্ত, তাই ক্ষত-বিক্ষত অবস্থায় শ্রীকৃষ্ণের রূপের প্রতি তিনি তাঁর মনকে একাগ্রীভূত করেছেন।

শ্লোক ৩৫

সপদি সখিবচো নিশম্য মধ্যে
নিজপরয়োর্বলয়ো রথং নিবেশ্য ।
স্থিতবতি পরসৈনিকায়ুরক্ষ্ণা
হৃতবতি পার্থসখে রতির্মমাস্তু ॥ ৩৫ ॥

সপদি—রণাঙ্গনে; **সখি-বচঃ**—সখার আদেশে; **নিশম্য**—শ্রবণ করে; **মধ্যে**—মধ্যস্থলে; **নিজ**—তাঁর নিজের; **পরয়োঃ**—বিপক্ষের; **বলয়োঃ**—শক্তি; **রথম্**—রথ; **নিবেশ্য**—প্রবেশ করে; **স্থিতবতি**—অবস্থান করার সময়; **পর-সৈনিক**—বিপক্ষ সৈনিকদের; **আয়ুঃ**—আয়ু; **অক্ষ্ণা**—দৃষ্টিপাতের দ্বারা; **হৃতবতি**—হরণ করেছিলেন; **পার্থ**—পৃথাপুত্র (কুন্তীপুত্র) অর্জুনের; **সখে**—সখাকে; **রতিঃ**—অন্তরঙ্গ সম্পর্ক; **মম**—আমার; **অস্তু**—হোক্।

অনুবাদ

অর্জুনের আদেশ পালনার্থে তাঁর সখা ভগবান শ্রীকৃষ্ণ কুরুক্ষেত্রের রণাঙ্গনে অর্জুন এবং দুর্যোধনের সৈন্যদের মাঝখানে তাঁর রথটি নিয়ে গিয়েছিলেন, এবং তখন সেখানে তাঁর কৃপা-কটাক্ষের দ্বারাই বিপক্ষ দলের আয়ু হরণ করে নিলেন। শত্রুর দিকে শুধুমাত্র তাঁর দৃষ্টিপাতের ফলেই তা সাধিত হল। আমার চিত্ত সেই শ্রীকৃষ্ণে নিবদ্ধ হোক।

তাৎপর্য

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় (১/২১-২৫) অর্জুন অচ্যুত ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে আদেশ দিয়েছেন তাঁর রথ দুই পক্ষের সৈন্যদের মাঝখানে স্থাপন করতে। তিনি তাঁকে বলেছিলেন, যুদ্ধে যে সমস্ত শত্রুদের সঙ্গে তাঁকে বোঝাপড়া করতে হবে তাদের নিরীক্ষণ শেষ না করা পর্যন্ত রথটি যেন তিনি সেখানেই রাখেন। ভগবানকে সে কথা বলা হলে তিনি তৎক্ষণাৎ তা করেছিলেন, ঠিক একজন আজ্ঞাবাহকের মতো। ভগবান বিরোধী পক্ষের সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিদের দেখিয়ে বলেছিলেন, "এখানে ভীষ্ম, এখানে দ্রোণ," ইত্যাদি। পরম আত্মা হওয়ার ফলে ভগবান কারোরই আজ্ঞাবাহক অথবা আদেশপালক নন, তা তিনি যেই হোন না কেন। কিন্তু তাঁর স্নেহের বশবর্তী হয়ে তিনি কখনো কখনো একজন প্রতীক্ষমান ভৃত্যের মতো তাঁর ভক্তের আদেশ পালন করেন। ভক্তের আদেশ পালন করে ভগবান প্রসন্ন হন, ঠিক যেন পিতা তার শিশুপুত্রের আদেশ পালন করে তৃপ্তি লাভ করে। ভগবান এবং তাঁর ভক্তের মধ্যে শুদ্ধ চিন্ময় প্রেমের ফলে তা সম্ভব, এবং ভীষ্মদেব সে কথা ভালভাবেই জানতেন। তাই তিনি ভগবানকে পার্থসখে বলে সম্বোধন করেছেন।

ভগবান তাঁর কৃপাপূর্ণ দৃষ্টিপাতের দ্বারা বিরোধী পক্ষের আয়ু হ্রাস করেছিলেন। কথিত হয় যে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধক্ষেত্রে সমবেত সমস্ত যোদ্ধারা তাঁদের মৃত্যুর সময়ে সাক্ষাৎভাবে ভগবানকে দর্শন করার ফলে মুক্তি লাভ করেছিলেন। তাই অর্জুনের শত্রুদের আয়ু হ্রাস করার অর্থ এই নয় যে ভগবান অর্জুনের পক্ষ অবলম্বন করেছিলেন। প্রকৃতপক্ষে তিনি বিরোধী দলের প্রতি কৃপাপরায়ণ ছিলেন, কেননা তাঁরা যদি সাধারণভাবে তাঁদের গৃহে দেহত্যাগ করতেন, তাহলে তাঁরা মুক্তি লাভ করতেন না। এখানে মৃত্যুর সময় ভগবানকে দর্শন করার সুযোগ হয়েছিল এবং তার ফলে তাঁরা সংসার বন্ধন থেকে মুক্তি লাভ করেছিলেন। তাই ভগবান হচ্ছেন সর্বমঙ্গলময়, এবং তিনি যা করেন তা সকলের মঙ্গলের জন্যই। আপাতদৃষ্টিতে সেই আয়োজন হয়েছিল তাঁর অন্তরঙ্গ সখা অর্জুনের বিজয়ের জন্য, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তা ছিল

অর্জুনের শত্রুদের মঙ্গলের জন্য। ভগবানের দিব্য কার্যকলাপ এমনই, এবং তা যিনি হৃদয়ঙ্গম করতে পারেন তিনিও তাঁর দেহত্যাগের পর মুক্তি লাভ করেন। ভগবান কোন অবস্থাতেই ভুল করেন না, কেননা তিনি পরম তত্ত্ব হওয়ার ফলে সর্বদাই সর্বমঙ্গলময়।

শ্লোক ৩৬

ব্যবহিতপৃতনামুখং নিরীক্ষ্য
স্বজনবধাদ্বিমুখস্য দোষবুদ্ধ্যা।
কুমতিমহরদাত্মবিদ্যয়া য-
শ্চরণরতিঃ পরমস্য তস্য মেহস্তু ॥ ৩৬ ॥

ব্যবহিত—দূরে অবস্থিত হয়ে; **পৃতনা**—সৈন্যগণ; **মুখম্**—মুখগুলি; **নিরীক্ষ্য**—দর্শন করে; **স্ব-জন**—আত্মীয়-স্বজনদের; **বধাৎ**—বধজনিত; **বিমুখস্য**—বিমুখ; **দোষ-বুদ্ধ্যা**—কলুষিত বুদ্ধিবৃত্তি; **কুমতিম্**—কুবুদ্ধি; **অহরৎ**—দূর করেছিলেন; **আত্ম-বিদ্যয়া**—অপ্রাকৃত জ্ঞানের প্রভাবে; **যঃ**—যিনি; **চরণ**—চরণে; **রতিঃ**—আকর্ষণ; **পরমস্য**—পরমেশ্বরের; **তস্য**—তাঁর; **মে**—আমার; **অস্তু**—হোক।

অনুবাদ

দূরস্থিত বৃহৎ সেনাবাহিনীর মুখগুলি এবং সেই সেনাবাহিনীর অগ্রভাগস্থিত স্বজন বীরপুরুষদের দর্শন করে আপাত অজ্ঞানের ফলে কলুষিত বুদ্ধির প্রভাবে অর্জুন যখন মনে করেছিলেন যে আত্মীয়-স্বজনের বিনাশের ফলে তাঁর পাপ হবে, তখন অপ্রাকৃত জ্ঞান দান করে যিনি সেই অজ্ঞানতা দূর করেছিলেন, সেই শ্রীকৃষ্ণের শ্রীপাদপদ্ম আমার আসক্তির বিষয় হোক।

তাৎপর্য

রাজা এবং সেনাপতিদের যুদ্ধের সময় সৈন্যদের সম্মুখে থাকতে হত। সেটি প্রকৃত যুদ্ধের প্রথা। রাজা এবং সেনাপতিরা এখনকার মতো তথাকথিত রাষ্ট্রপতি বা প্রতিরক্ষা মন্ত্রী ছিলেন না। সাধারণ সৈনিক এবং ভাড়াটে সৈনিকেরা যখন শত্রুর সঙ্গে সম্মুখ-সমরে প্রবৃত্ত হত, তখন তাঁরা বাড়িতে বসে থাকতেন না। সেটি আধুনিক গণতন্ত্রের রীতি হতে পারে, কিন্তু যখন প্রকৃত রাজতন্ত্র প্রচলিত ছিল, তখন যোগ্যতার বিচার না করে কতকগুলি কাপুরুষকে ভোট দিয়ে রাজপদে অভিষিক্ত করা হত না। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে স্পষ্টভাবেই দেখা গিয়েছিল যে দ্রোণ, ভীষ্ম, অর্জুন,

দুর্যোধন আদি উভয় পক্ষের নেতারা কেউই ঘুমোচ্ছিলেন না; তাঁরা সকলেই সক্রিয়ভাবে সেই যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন, এবং সেই যুদ্ধক্ষেত্রটি মনোনয়ন করা হয়েছিল লোকালয় থেকে বহু দূরে। তা থেকে বোঝা যায় যে নির্দোষ নাগরিকেরা প্রতিদ্বন্দ্বী রাজাদের মধ্যে যুদ্ধের সমস্ত প্রভাব থেকে নিরাপদ থাকতেন। সেই যুদ্ধে যে কি হবে তা দেখার আবশ্যকতা নাগরিকদের ছিল না। তাদের কর্তব্য ছিল উপার্জনের এক-চতুর্থাংশ শাসককে দেওয়া, তা তিনি অর্জুনই হন বা দুর্যোধন হন। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে উভয় পক্ষের সেনাপতিরাই সামনা-সামনি দাঁড়িয়েছিলেন, এবং গভীর সহানুভূতি সহকারে অর্জুন তাঁদের দেখেছিলেন এবং অনুতাপ করেছিলেন যে সাম্রাজ্যলাভের জন্য তিনি সেই যুদ্ধে তাঁর সমস্ত আত্মীয়-স্বজনদের হত্যা করতে উদ্যত হয়েছিলেন। দুর্যোধনের বিশাল সেনাবাহিনীর ভয়ে তিনি ভীত হননি, পক্ষান্তরে ভগবানের একজন কৃপাপরায়ণ ভক্তরূপে, জড়-জাগতিক বিষয়সমূহ পরিত্যাগ যাঁর কাছে স্বাভাবিক, তিনি জাগতিক বিষয় লাভের জন্য যুদ্ধ না করতে মনস্থ করেছিলেন। কিন্তু জ্ঞানের অভাবের ফলে তিনি এইভাবে বিবেচনা করেছিলেন, এবং তাই এখানে বলা হয়েছে যে তাঁর বুদ্ধি কলুষিত হয়েছিল। তাঁর বুদ্ধি অবশ্য কখনোই কলুষিত হতে পারে না, কেননা তিনি ছিলেন ভগবানের ভক্ত এবং ভগবানের নিত্য সঙ্গী, যা *শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার* চতুর্থ অধ্যায়ে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। অর্জুনের বুদ্ধি আপাতদৃষ্টিতে কলুষিত হয়েছে, কেননা তা না হলে দেহাত্মবুদ্ধির দ্বারা জড় জগতের বন্ধনে আবদ্ধ কলুষিত বদ্ধ জীবদের কল্যাণের জন্য *শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার* উপদেশ দেওয়ার সুযোগ হত না। এই জগতের বদ্ধজীবদের জন্য *শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা* দান করা হয়েছিল যাতে তারা দেহাত্মবুদ্ধির ভ্রান্ত ধারণা থেকে মুক্ত হয়ে পরমেশ্বর ভগবানের সঙ্গে তাদের নিত্য সম্পর্ক স্থাপন করতে পারে। ভগবান *আত্মবিদ্যা* দান করেছিলেন ব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত স্থানের সমস্ত জীবের মঙ্গলের জন্য।

শ্লোক ৩৭

স্বনিগমমপহায় মৎপ্রতিজ্ঞা-
মৃতমধিকর্তুমবপ্লুতো রথস্থঃ ।
ধৃতরথচরণোঽভ্যয়াচ্চলদ্গু-
র্হরিরিব হন্তুমিভং গতোত্তরীয়ঃ ॥ ৩৭ ॥

স্ব-নিগমম্—নিজের সত্য নিষ্ঠা; **অপহায়**—পরিত্যাগ করে; **মৎ-প্রতিজ্ঞাম্**—আমার প্রতিজ্ঞা; **ঋতম্**—বাস্তব; **অধি**—অধিক; **কর্তুম্**—করার জন্য; **অবপ্লুতঃ**—নেমে এসে;

রথস্থঃ—রথ থেকে; **ধৃত**—গ্রহণ করে; **রথ**—রথের; **চরণঃ**—চাকা; **অভ্যয়াৎ**—ছুটে গিয়েছিলেন; **চলদ্গুঃ**—পৃথিবী কম্পিত করে; **হরিঃ**—সিংহ; **ইব**—মতো; **হন্তুম্**—হত্যা করার জন্য; **ইভম্**—হস্তী; **গত**—পতিত; **উত্তরীয়ঃ**—উত্তরীয়।

অনুবাদ

আমার অভিলাষ পূর্ণ করার জন্য তিনি তাঁর নিজের প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করেও রথ থেকে নেমে এসে রথের চাকা তুলে নিয়েছিলেন এবং হস্তিকে বধ করার জন্য প্রবল বেগে ধাবমান সিংহের মতো পৃথিবী কম্পিত করে তিনি আমার দিকে ধাবিত হয়েছিলেন। তখন তাঁর উত্তরীয়খানিও তাঁর শরীর থেকে পথে পড়ে গিয়েছিল।

তাৎপর্য

কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ সামরিক নীতির ভিত্তিতে সংঘটিত হলেও তা বন্ধুদের মধ্যে লড়াইয়ের মতো খেলোয়াড়ী মনোভাব নিয়ে হয়েছিল। দুর্যোধন ভীষ্মদেবের সমালোচনা করে তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ করেছিল যে অর্জুনের প্রতি বাৎসল্য স্নেহের বশে তিনি তাঁকে হত্যা করতে চাইছেন না। যুদ্ধ করার ব্যাপারে ক্ষত্রিয় কখনো কোনরকম অপমান সহ্য করতে পারে না। ভীষ্মদেব তাই প্রতিজ্ঞা করেছিলেন যে তার পরের দিন বিশেষ অস্ত্রের দ্বারা পঞ্চপাণ্ডবদের বধ করবেন। দুর্যোধন তা শুনে অত্যন্ত খুশি হয়েছিল, এবং সে সেই বাণগুলি পরের দিন যুদ্ধের সময় তাঁকে দেওয়ার জন্য নিজের কাছে রেখে দিয়েছিল। অর্জুন কৌশলে সেই বাণগুলি দুর্যোধনের কাছ থেকে নিয়ে নিয়েছিল, এবং ভীষ্মদেব বুঝতে পেরেছিলেন যে সেটি ছিল শ্রীকৃষ্ণের ছলনা। তাই তিনি প্রতিজ্ঞা করেছিলেন যে পরের দিন কৃষ্ণকে অস্ত্র ধারণ করতে হবে, নতুবা তাঁর সখা অর্জুনের মৃত্যু হবে। পরের দিন ভীষ্মদেব এমন প্রচণ্ডভাবে যুদ্ধ করেছিলেন যে অর্জুন এবং কৃষ্ণ উভয়েই সঙ্কটে পড়েছিলেন। অর্জুন প্রায় পরাজিত হয়েছিলেন; পরিস্থিতি এমনই সঙ্কটজনক হয়েছিল যে পরমুহূর্তেই অর্জুন ভীষ্মদেব কর্তৃক নিহত হতেন। তখন শ্রীকৃষ্ণ তাঁর ভক্ত ভীষ্মের প্রতিজ্ঞা রক্ষা করে তাঁকে সন্তুষ্ট করতে চেয়েছিলেন, যা ছিল তাঁর নিজের প্রতিজ্ঞা থেকে অধিক গুরুত্বপূর্ণ। তখন মনে হয়েছিল যে তিনি তাঁর নিজের প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করেছেন। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের পূর্বে তিনি প্রতিজ্ঞা করেছিলেন যে তিনি অস্ত্র ধারণ করবেন না এবং কোন পক্ষের হয়েই তাঁর শক্তি ব্যবহার করবেন না। কিন্তু অর্জুনকে রক্ষা করার জন্য তিনি রথ থেকে নেমে এসেছিলেন এবং রথের চাকা তুলে নিয়ে হস্তিকে বধ করার জন্য একটি ধাবমান সিংহের মতো ক্রোধান্বিতভাবে দ্রুতবেগে ভীষ্মদেবের প্রতি ধাবিত হয়েছিলেন।

সেইভাবে ধাবিত হওয়ার ফলে তাঁর উত্তরীয় পড়ে গিয়েছিল, এবং ক্রোধের আবেশে তিনি তা বুঝতে পারেননি। ভীষ্মদেব তৎক্ষণাৎ অস্ত্র পরিত্যাগ করে তাঁর প্রিয় প্রভু শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক নিহত হওয়ার জন্য তাঁর রথের উপর দাঁড়িয়েছিলেন। সেদিনকার মতো সেখানেই যুদ্ধের সমাপ্তি হয়, এবং অর্জুন রক্ষা পান। অবশ্য অর্জুনের নিহত হওয়ার কোন সম্ভাবনা ছিল না, কেননা ভগবান স্বয়ং তাঁর রথে ছিলেন। কিন্তু যেহেতু ভীষ্মদেব দেখতে চেয়েছিলেন যে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাঁর সখাকে রক্ষা করার জন্য অস্ত্র ধারণ করুন, তাই ভগবান সেই পরিস্থিতির সৃষ্টি করেছিলেন যাতে মনে হয়েছিল যে অর্জুনের মৃত্যু আসন্ন। ভগবান ভীষ্মদেবের সামনে দাঁড়িয়ে তাঁকে দেখাতে চেয়েছিলেন যে তাঁর প্রতিজ্ঞা রক্ষার জন্য তিনি চক্র ধারণ করেছেন।

শ্লোক ৩৮

শিতবিশিখহতো বিশীর্ণদংশঃ
ক্ষতজপরিপ্লুত আততায়িনো মে ।
প্রসভমভিসসার মদ্বধার্থং
স ভবতু মে ভগবান্ গতির্মুকুন্দঃ ॥ ৩৮ ॥

শিত—তীক্ষ্ণ; **বিশিখ**—বাণ; **হতঃ**—আহত হয়ে; **বিশীর্ণ-দংশঃ**—বিধ্বস্ত বর্ম; **ক্ষতজ**—ক্ষত থেকে; **পরিপ্লুতঃ**—রক্তাক্ত; **আততায়িনঃ**—প্রচণ্ডভাবে আক্রমণকারী; **মে**—আমার; **প্রসভম্**—বিক্ষুব্ধভাবে; **অভিসসার**—অভিমুখে আসতে লাগলেন; **মৎ-বধ-অর্থম্**—আমাকে হত্যা করার জন্য; **সঃ**—তিনি; **ভবতু**—হোক্; **মে**—আমার; **ভগবান্**—পরমেশ্বর ভগবান; **গতিঃ**—চরম লক্ষ্য; **মুকুন্দঃ**—মুক্তিদাতা।

অনুবাদ

রণক্ষেত্রে আমার তীক্ষ্ণ শরে ক্ষত-বিক্ষত হয়ে তাঁর বিধ্বস্ত বর্ম নিয়ে রক্তাক্ত কলেবরে যেন রাগান্বিত হয়ে আমাকে বধ করার জন্য প্রবল বেগে আমার দিকে ছুটে এলেন, সেই মুক্তিদাতা ভগবান মুকুন্দ পরমেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ আমার পরম গতি হোন।

তাৎপর্য

কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধক্ষেত্রে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এবং ভীষ্মদেবের আচরণ অত্যন্ত আকর্ষণীয়, কেননা তখন মনে হয়েছিল যে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যেন অর্জুনের প্রতি পক্ষপাতিত্ব করছেন এবং ভীষ্মের প্রতি বৈরীভাব প্রদর্শন করছেন; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাঁর মহান

ভক্ত ভীষ্মদেবের প্রতি বিশেষ অনুগ্রহ প্রদর্শনের জন্যই তিনি সেইভাবে আচরণ করেছিলেন। এই আচরণের সবচাইতে বড় বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এই যে, ভক্ত ভগবানের প্রসন্নতা বিধানের জন্য তাঁর শত্রুতা করারও অভিনয় করে। ভগবান পরম তত্ত্ব হওয়ার ফলে তাঁর শত্রুর ভূমিকায় অভিনয়কারী শুদ্ধ ভক্তের সেবা গ্রহণ করতে পারেন। পরমেশ্বর ভগবানের কোন শত্রু থাকতে পারে না, এবং তথাকথিত শত্রু কখনো তাঁর অনিষ্টও করতে পারে না, কেননা তিনি হচ্ছেন অজিত। কিন্তু তবুও তাঁর শুদ্ধ ভক্ত যখন একজন শত্রুর মতো তাঁকে প্রহার করে অথবা উচ্চপদ থেকে তাঁকে তিরস্কার করে, তখন তিনি সেই আচরণের ফলে আনন্দ উপভোগ করেন, যদিও ভগবানের থেকে উচ্চতর আর কেউ হতে পারে না। এইগুলি হচ্ছে ভক্তের সঙ্গে ভগবানের অপ্রাকৃত আচরণের আদান-প্রদান। আর যাদের শুদ্ধ ভক্তি সম্বন্ধে কোন ধারণা নেই, তারা এই আচরণের রহস্য ভেদ করতে পারে না। ভীষ্মদেব একজন বীর যোদ্ধার ভূমিকায় অভিনয় করছিলেন, এবং তিনি জ্ঞাতসারে ভগবানের শরীর বাণের দ্বারা বিদ্ধ করেছিলেন, যাতে সাধারণ দৃষ্টিতে মনে হয় যেন ভগবান আহত হয়েছেন; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তা কেবল অভক্তদের বিভ্রান্ত করার জন্য। ভগবানের পূর্ণ চিন্ময় দেহ কখনো আহত হতে পারে না, এবং ভক্তও কখনো ভগবানের শত্রু হতে পারেন না। তা যদি হত তাহলে ভীষ্মদেব কখনো সেই ভগবানকে তাঁর জীবনের পরম গতি বলে আকাঙ্ক্ষা করতেন না। ভীষ্মদেব যদি ভগবানের শত্রু হতেন, তাহলে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বিনা প্রয়াসে তাঁকে হত্যা করতে পারতেন। তাঁকে রক্তাক্ত ও আহত অবস্থায় ভীষ্মদেবের সম্মুখে আসার কোন প্রয়োজন ছিল না। কিন্তু তা তিনি করেছিলেন কারণ শুদ্ধ ভক্ত কর্তৃক উৎপন্ন আঘাতের দ্বারা অলঙ্কৃত ভগবানের চিন্ময় সৌন্দর্য তাঁর যোদ্ধাভক্ত দর্শন করতে চেয়েছিলেন। এটিই হচ্ছে ভগবান এবং তাঁর সেবকের মধ্যে চিন্ময় রস বিনিময়ের পন্থা। এই প্রকার বিনিময়ের ফলে ভগবান এবং তাঁর ভক্ত তাঁদের নিজ নিজ স্থানে মহিমামণ্ডিত হন। ভগবান এত ক্রুদ্ধ হয়েছিলেন যে ভীষ্মদেবের প্রতি ধাবিত হওয়ার সময়ে অর্জুন তাঁকে বাধা দান করা সত্ত্বেও তিনি ভীষ্মদেবের প্রতি ধাবিত হন, ঠিক যেভাবে একজন প্রেমিক সমস্ত বাধা-বিপত্তি উপেক্ষা করে তার প্রেমিকার প্রতি ধাবিত হয়। আপাতদৃষ্টিতে মনে হয়েছিল তিনি যেন ভীষ্মদেবকে হত্যা করতে বদ্ধপরিকর, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাঁর সেই আচরণ ছিল তাঁর মহান ভক্তকে প্রসন্ন করার জন্যই। ভগবান নিঃসন্দেহে সমস্ত বদ্ধজীবনের পরিত্রাণকারী। নির্বিশেষবাদীরা তাঁর কাছে মুক্তি চায়, এবং তিনি তাদের বাসনা অনুসারে তাদের পুরস্কৃত করেন, কিন্তু এখানে ভীষ্মদেব ভগবানকে তাঁর স্বরূপে দর্শন করার অভিলাষ করেছেন। ভগবানের সমস্ত শুদ্ধ ভক্তরাই এই অভিলাষ করেন।

শ্লোক ৩৯

বিজয়রথকুটুম্ব আত্ততোত্রে
ধৃতহয়রশ্মিনি তচ্ছ্রিয়েক্ষণীয়ে ।
ভগবতি রতিরস্তু মে মুমূর্ষো-
র্যমিহ নিরীক্ষ্য হতা গতাঃ স্বরূপম্ ॥ ৩৯ ॥

বিজয়—অর্জুন; **রথ**—রথ; **কুটুম্ব**—সর্বতোভাবে রক্ষণীয়; **আত্ত-তোত্রে**—ডান হাতে চাবুক নিয়ে; **ধৃত-হয়-রশ্মিনি**—বল্গার দ্বারা অশ্বদের নিয়ন্ত্রণকারী; **তৎ-শ্রিয়া**—সুন্দরভাবে দণ্ডায়মান; **ঈক্ষণীয়ে**—শোভা পাচ্ছেন যিনি, তাঁকে; **ভগবতি**—পরমেশ্বর ভগবানকে; **রতিঃ অস্তু মে**—আমি যেন আকৃষ্ট হই; **মুমূর্ষোঃ**—মৃত্যুপথযাত্রী; **যম্**—যাঁকে; **ইহ**—এই জগতে; **নিরীক্ষ্য**—দর্শন করে; **হতাঃ**—যাদের মৃত্যু হয়েছে; **গতাঃ**—লাভ করেছে; **স্বরূপম্**—স্বরূপ।

অনুবাদ

মৃত্যুর সময় পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের প্রতি আমার চেতনা সম্পূর্ণরূপে আকৃষ্ট হোক। দক্ষিণ হস্তে চাবুক এবং বাম হস্তে অশ্ব-বল্গাধারী সর্ব উপায়ে অর্জুনের রথের রক্ষাকারী সারথিরূপে শোভমান শ্রীকৃষ্ণে আমি আমার চিত্ত একাগ্র করছি। কুরুক্ষেত্রের রণাঙ্গনে তাঁকে যাঁরা দর্শন করে মৃত্যুবরণ করেছিলেন, তাঁরা সকলেই তাঁদের স্বরূপ প্রাপ্ত হয়েছেন।

তাৎপর্য

ভগবানের শুদ্ধ ভক্ত প্রেমময়ী সেবায় ভগবানের সঙ্গে অপ্রাকৃত সম্পর্কে সম্পর্কিত হওয়ার ফলে তাঁর অন্তরে নিরন্তর ভগবানের উপস্থিতি দর্শন করেন। এই প্রকার শুদ্ধ ভক্ত এক পলকের জন্যও ভগবানকে বিস্মৃত হন না। একে বলা হয় *সমাধি*। যোগী তাঁর ইন্দ্রিয়গুলিকে অন্য সমস্ত বিষয় থেকে নিয়ন্ত্রিত করে পরমাত্মায় একাগ্রীভূত করার প্রয়াস করেন, এবং তার ফলে তিনি চরমে সমাধি লাভ করেন। কিন্তু ভগবদ্ভক্ত ভগবানের দিব্য নাম, যশ, লীলা ইত্যাদি সহ তাঁর সবিশেষ রূপ নিরন্তর স্মরণ করার মাধ্যমে অনেক সহজে এই সমাধি লাভ করেন। তাই, যোগীর ধ্যান এবং ভক্তের ধ্যান এক স্তরের নয়। যোগীর ধ্যান যান্ত্রিক, কিন্তু স্বতঃস্ফূর্ত অনুরাগের ফলে শুদ্ধ ভক্তের ভগবৎ-প্রেম স্বাভাবিক। ভীষ্মদেব ছিলেন একজন শুদ্ধ ভক্ত, এবং

একজন সেনানায়করূপে তিনি নিরন্তর যুদ্ধক্ষেত্রে অর্জুনের রথের সারথি বা পার্থসারথিরূপে ভগবানকে স্মরণ করেছিলেন। তাই ভগবানের পার্থসারথি লীলাও নিত্য। কংসের কারাগারে তাঁর জন্ম-লীলা থেকে অন্তিমে মৌশল-লীলা পর্যন্ত ভগবানের সমস্ত লীলাই একে একে সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডে আবর্তিত হয়, ঠিক যেমন ঘড়ির কাঁটা এক বিন্দু থেকে আরেক বিন্দুতে ঘুরে চলে। আর এই সমস্ত লীলায় পাণ্ডব এবং ভীষ্মদেবের মতো ভগবানের সমস্ত পার্ষদেরা তাঁর নিত্যসঙ্গী। তাই ভীষ্মদেব পার্থসারথিরূপে ভগবানের সুন্দর স্বরূপ কখনও ভুলতে পারেননি, যা এমনকি অর্জুন পর্যন্ত দর্শন করতে পারেননি। অর্জুনের অবস্থান ছিল ভগবানের সুন্দর পার্থসারথি রূপের পিছনে, কিন্তু ভীষ্মদেব ছিলেন ঠিক ভগবানের সম্মুখেই। ভগবানের সেনাবেশী রূপ ভীষ্মদেব অর্জুনের থেকেও অধিক আনন্দ সহকারে দর্শন করেছিলেন।

কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে সমস্ত সৈনিক এবং ব্যক্তিরা তাঁদের মৃত্যুর পর ভগবানের মতো তাঁদের চিন্ময় স্বরূপ লাভ করেছিলেন, কেননা তাঁরা তখন প্রত্যক্ষভাবে ভগবানকে দর্শন করতে পেরেছিলেন। জলচর থেকে শুরু করে ব্রহ্মা পর্যন্ত বিবর্তনের চক্রে আবর্তিত বদ্ধজীবের সমস্ত রূপ হচ্ছে *মায়া*, অর্থাৎ কর্মের ফলে লব্ধ জড়া-প্রকৃতির দান। বদ্ধজীবের জড় দেহগুলি কৃত্রিম বহিরাগত আবরণের মতো, এবং বদ্ধজীব যখন জড়া-প্রকৃতির বন্ধন থেকে মুক্ত হয়, তখন সে তার প্রকৃত স্বরূপ প্রাপ্ত হয়। নির্বিশেষবাদীরা ভগবানের নিরাকার ব্রহ্মজ্যোতি প্রাপ্ত হতে চায়, কিন্তু ভগবানের অংশ-স্বরূপ চিৎ স্ফুলিঙ্গের পক্ষে তা মোটেই স্বাভাবিক নয়। তাই নির্বিশেষবাদীরা পুনরায় অধঃপতিত হয়ে জড় রূপ প্রাপ্ত হয়, যা চিন্ময় আত্মার পক্ষে অর্থহীন। ভগবদ্ভক্ত তাঁর আত্মার স্বরূপ অনুসারে বৈকুণ্ঠলোকে অথবা গোলোকে ভগবানের মতো চতুর্ভুজ অথবা দ্বিভুজ চিন্ময় স্বরূপ প্রাপ্ত হন। সম্পূর্ণ চিন্ময় এই রূপই হচ্ছে জীবের স্বরূপ, এবং কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে উভয় পক্ষেই যাঁরা যোগদান করেছিলেন তাঁরা তাঁদের স্বরূপ প্রাপ্ত হয়েছিলেন, যা ভীষ্মদেব এখানে প্রতিপন্ন করেছেন। তাই ভগবান কেবল পাণ্ডবদের প্রতি কৃপাপরায়ণ ছিলেন না, তিনি অপরপক্ষের প্রতিও কৃপাপরায়ণ ছিলেন, কেননা তাঁরা সকলেই একই ফল লাভ করেছিলেন। ভীষ্মদেবও সেই সুযোগ চেয়েছিলেন, এবং যদিও ভগবানের পার্ষদরূপে তাঁর স্থিতি সর্ব অবস্থাতেই নিশ্চিত হয়েছে, তথাপি সেটিই ছিল ভগবানের কাছে তাঁর প্রার্থনা। অতএব সিদ্ধান্ত হচ্ছে এই যে, অন্তরে অথবা বাইরে ভগবানকে দর্শন করে যিনি দেহত্যাগ করেন তিনি তাঁর স্বরূপ প্রাপ্ত হন, যা হচ্ছে জীবনের সর্বোচ্চ সিদ্ধি।

শ্লোক ৪০

ললিতগতিবিলাসবল্গুহাস-
প্রণয়নিরীক্ষণকল্পিতোরুমানাঃ ।
কৃতমনুকৃতবত্য উন্মদান্ধাঃ
প্রকৃতিমগন্ কিল যস্য গোপবধ্বঃ ॥ ৪০ ॥

ললিত—সুন্দর; গতি—গমনভঙ্গি; বিলাস—মনোমুগ্ধকর; বল্গুহাস—মধুর হাস্য; প্রণয়—প্রেমপূর্ণ; নিরীক্ষণ—দৃষ্টিপাত; কল্পিত—মনোভাব; উরুমানাঃ—মহা মহিমান্বিত; কৃত-মনু-কৃতবত্যঃ—গমনের অনুকরণ করে; উন্মদান্ধাঃ—আনন্দের আতিশয্যে উন্মত্ত; প্রকৃতিম্—স্বরূপ; অগন্—প্রাপ্ত হয়েছিলেন; কিল—অবশ্যই; যস্য—যাঁর; গোপ-বধ্বঃ—গোপকন্যাগণ।

অনুবাদ

আমার চিত্ত শ্রীকৃষ্ণে নিবদ্ধ হোক, যাঁর সুন্দর গমনভঙ্গি, মধুর হাস্য এবং প্রেমপূর্ণ ঈক্ষণ ব্রজগোপিকাদের আকর্ষণ করেছিল। (রাসনৃত্য থেকে তাঁর অন্তর্হিত হওয়ার পর) ব্রজগোপিকারা তাঁর বিরহে উন্মত্তবৎ হয়ে তাঁর গমনভঙ্গি ও বিবিধ কার্যকলাপের অনুকরণ করেছিলেন।

তাৎপর্য

ব্রজভূমির বালিকারা সম স্তরে তাঁর সঙ্গে নৃত্য করে, দাম্পত্য প্রেমে তাঁকে আলিঙ্গন করে, রসিকতাপূর্বক তাঁর সঙ্গে হাস্য-পরিহাস করে এবং প্রেমপূর্ণ নয়নে তাঁর প্রতি দৃষ্টিপাত করে প্রেমময়ী সেবার গভীর আনন্দে তাঁর সঙ্গে একাত্ম হয়েছিলেন। অর্জুনের সঙ্গে ভগবানের সম্পর্ক ভীষ্মদেবের মতো ভক্তের কাছে নিঃসন্দেহে প্রশংসনীয়, কিন্তু ব্রজগোপিকাদের সঙ্গে ভগবানের সম্পর্ক অধিক শুদ্ধ প্রেমময়ী সেবার ফলে অধিক প্রশংসনীয়। ভগবানের কৃপায় অর্জুন সারথিরূপে ভগবানের সখ্যপূর্ণ সেবা লাভের সৌভাগ্য অর্জন করেছিলেন, কিন্তু ভগবান অর্জুনকে সমান শক্তি প্রদান করেননি। কিন্তু গোপিকারা ভগবানের সমান পদ প্রাপ্ত হয়ে প্রায় ভগবানের সঙ্গে একাত্ম হয়ে গিয়েছিলেন। ভীষ্মদেবের গোপীদের স্মরণ করার অভিলাষ, তাঁর জীবনের অন্তিম সময়ে তাঁদের কৃপা লাভের জন্য প্রার্থনা। ভগবানের শুদ্ধ ভক্তেরা যখন মহিমামণ্ডিত হন, তখন ভগবান অধিক প্রসন্ন হন, এবং তাই ভীষ্মদেব কেবল তাঁর স্নেহাস্পদ অর্জুনেরই প্রশংসা করেননি, ভগবানের প্রেমময়ী

সেবায় যাঁরা অতুলনীয় সৌভাগ্য অর্জন করেছিলেন সেই গোপিকাদেরও স্মরণ করেছিলেন। ভগবানের সঙ্গে গোপীদের সমতা কখনো নির্বিশেষবাদীর সাযুজ্য মুক্তির মতো মনে করে ভুল করা উচিত নয়। সেই সমতা এক পূর্ণ আনন্দের অনুভূতি, যেখানে ভিন্ন হওয়ার ধারণা সম্পূর্ণরূপে লুপ্ত হয়ে যায়, কেননা গভীর প্রেমে প্রেমিক এবং প্রেমিকার আকাঙ্ক্ষা এক।

শ্লোক ৪১

মুনিগণনৃপবর্যসঙ্কুলেঽন্তঃ-
সদসি যুধিষ্ঠিররাজসূয় এষাম্।
অর্হণমুপপেদ ঈক্ষণীয়ো
মম দৃশিগোচর এষ আবিরাত্মা ॥ ৪১ ॥

মুনি-গণ—মুনিগণ; **নৃপ-বর্য**—শ্রেষ্ঠ নরপতিগণ; **সঙ্কুলে**—মহান সমাবেশে; **অন্তঃ-সদসি**—সভায়; **যুধিষ্ঠির**—মহারাজ যুধিষ্ঠিরের; **রাজ-সূয়ে**—রাজসূয় যজ্ঞে; **এষাম্**—সর্বোৎকৃষ্ট ব্যক্তিদের মধ্যে; **অর্হণম**—পূজা; **উপপেদ**—গ্রহণ করেছিলেন; **ঈক্ষণীয়ঃ**—আকর্ষণীয় বস্তু; **মম**—আমার; **দৃশি**—দৃষ্টি; **গোচরঃ**—অন্তর্ভুক্ত; **এষঃআবিঃ**—প্রত্যক্ষভাবে বিরাজমান; **আত্মা**—আত্মা।

অনুবাদ

মহারাজ যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞে সমস্ত মুনি, ঋষি এবং শ্রেষ্ঠ নরপতিদের মহান সমাবেশ হয়েছিল, এবং সেই সভায় শ্রীকৃষ্ণ পরমেশ্বর ভগবানরূপে সকলের দ্বারা পূজিত হয়েছিলেন। আমি তা প্রত্যক্ষভাবে দর্শন করেছিলাম, এবং তাঁর চরণে আমার চিত্ত নিবদ্ধ করার জন্য আমি সেই ঘটনা স্মরণ করছি।

তাৎপর্য

কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের পর, পৃথিবীর একচ্ছত্র সম্রাট মহারাজ যুধিষ্ঠির রাজসূয় যজ্ঞ অনুষ্ঠান করেছিলেন। তখনকার দিনে, সিংহাসনে আরোহণ করার পর রাজা তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণা করার উদ্দেশ্যে একটি অশ্ব পৃথিবীর সর্বত্র বিচরণ করার জন্য ছেড়ে দিতেন, এবং কোন রাজা অথবা রাজকুমারের স্বতন্ত্রতা ছিল সেই বিশেষ সম্রাটের আধিপত্য মেনে নেওয়ার অথবা প্রতিবাদ করার। যিনি তাঁর বিরোধিতা করতেন, তাঁকে সম্রাটের সঙ্গে যুদ্ধ করতে হত, এবং যুদ্ধ জয়ের মাধ্যমে তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব স্থাপন

করতে হত। পরাজিত প্রতিদ্বন্দ্বীকে তাঁর নিজের জীবন উৎসর্গ করে তাঁর জায়গায় অন্য রাজার আসন পেতে দিতে হত। মহারাজ যুধিষ্ঠির এই প্রকার প্রতিদ্বন্দ্বিতা ঘোষণা করে পৃথিবীর সর্বত্র বিচরণ করার জন্য অশ্ব ছেড়েছিলেন, এবং পৃথিবীর সমস্ত শাসনকারী রাজা এবং রাজকুমারেরা পৃথিবীর একচ্ছত্র সম্রাটরূপে মহারাজ যুধিষ্ঠিরের নেতৃত্ব বরণ করে নিয়েছিলেন। তারপর মহারাজ যুধিষ্ঠিরের অধীনস্থ পৃথিবীর এই সমস্ত শাসকেরা এক মহান রাজসূয় যজ্ঞে অংশগ্রহণ করার জন্য নিমন্ত্রিত হয়েছিলেন। এই প্রকার যজ্ঞ অনুষ্ঠানে কোটি কোটি টাকার প্রয়োজন হত, তাই কোন ক্ষুদ্র রাজার পক্ষে তা করা সম্ভব ছিল না। এই প্রকার যজ্ঞ অত্যন্ত ব্যয় বহুল এবং বর্তমান পরিস্থিতিতে অনুষ্ঠান করা কঠিন বলে, এই কলিযুগে তা অনুষ্ঠান করা সম্ভব নয়। আর তা ছাড়া এই যজ্ঞের দায়িত্বভার গ্রহণ করার মতো সুদক্ষ পুরোহিতও পাওয়া সম্ভব নয়।

পৃথিবীর সমস্ত রাজা এবং মহাজ্ঞানী ঋষিরা এইভাবে নিমন্ত্রিত হয়ে মহারাজ যুধিষ্ঠিরের রাজধানীতে সমবেত হয়েছিলেন। মহান দার্শনিক, ধর্মবিদ্, চিকিৎসক, বৈজ্ঞানিক এবং মহর্ষি সমন্বিত সমগ্র বিদ্বৎ সমাজ নিমন্ত্রিত হয়েছিলেন। অর্থাৎ, ব্রাহ্মণ এবং ক্ষত্রিয়েরা ছিলেন সমাজের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি, এবং সেই সভায় তাঁরা সকলেই নিমন্ত্রিত হয়েছিলেন। বৈশ্য এবং শূদ্রেরা সমাজের নগণ্য সদস্য বলে এখানে তাদের উল্লেখ করা হয়নি। আধুনিক যুগে সামাজিক কার্যকলাপের পরিবর্তন হওয়ার ফলে বৃত্তির ভিত্তিতে মানুষের গুরুত্বেরও পরিবর্তন হয়েছে।

সেই মহতী সভায় শ্রীকৃষ্ণ ছিলেন সকলের নয়নের মণি। সকলেই শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করতে চেয়েছিলেন, এবং তাঁরা সকলে তাঁকে তাঁদের শ্রদ্ধা নিবেদন করতে চেয়েছিলেন। ভীষ্মদেবের সেই সমস্ত কথা মনে পড়েছিল, এবং তাঁর আরাধ্য ভগবান যে তাঁর সম্মুখে স্বয়ং উপস্থিত ছিলেন, সেজন্য তিনি আনন্দিত হয়েছিলেন। সুতরাং পরমেশ্বর ভগবানের ধ্যান হচ্ছে তাঁর কার্যকলাপ, রূপ, লীলা, নাম এবং যশের ধ্যান। পরমেশ্বরের নির্বিশেষ রূপের ধ্যান বলে যা কল্পনা করা হয়, তার চেয়ে এই পন্থা অনেক সহজ। *শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায়* (১২/৫) স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে যে ভগবানের নির্বিশেষ রূপের ধ্যান অত্যন্ত কঠিন। প্রকৃতপক্ষে তা কোন ধ্যানই নয়, তা কেবল সময়ের অপচয় মাত্র, কেননা তাতে বাঞ্ছিত ফল লাভ করা অত্যন্ত কঠিন। ভগবদ্ভক্তেরা কিন্তু ভগবানের বাস্তব রূপ এবং লীলার ধ্যান করেন, এবং তাই ভক্তেরা ভগবানকে সহজে লাভ করতে পারেন। সে কথা *শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায়ও* (১২/৯) উল্লেখ করা হয়েছে। ভগবান তাঁর চিন্ময় কার্যকলাপ থেকে অভিন্ন। এই শ্লোকেও ইঙ্গিত করা হয়েছে যে ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে পরমেশ্বর ভগবান রূপে স্বীকার না করা

হলেও, তিনি যখন প্রকৃতপক্ষে মানবসমাজে উপস্থিত ছিলেন, বিশেষ করে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে, তখন তাঁকে সেই সময়কার সবচাইতে মহান পুরুষ বলে স্বীকার করা হয়েছিল। একজন অত্যন্ত মহান ব্যক্তি তাঁর মৃত্যুর পর ভগবান বলে পূজিত হন বলে যে অপপ্রচার করা হয়, তা অত্যন্ত ভ্রান্তিজনক, কেননা মৃত্যুর পর কেউই ভগবান হতে পারে না। তেমনই আবার পরমেশ্বর ভগবান কখনও মানুষ হতে পারেন না, এমনকি যখন তিনি স্বয়ং উপস্থিত থাকেন, তখনও নয়। এই দুটি ধারণাই ভ্রান্ত। মানুষের ভগবান হওয়ার যে মতবাদ (এ্যানথ্রোপোমরফিজম) তা কখনও ভগবান শ্রীকৃষ্ণের বেলায় প্রয়োগ করা যেতে পারে না।

শ্লোক ৪২

তমিমমহমজং শরীরভাজাং
হৃদি হৃদি ধিষ্ঠিতমাত্মকল্পিতানাম্।
প্রতিদৃশমিব নৈকধার্কমেকং
সমধিগতোঽস্মি বিধূতভেদমোহঃ ॥ ৪২ ॥

তম্—সেই পরমেশ্বর ভগবান; **ইমম্**—এখন আমার সম্মুখে উপস্থিত; **অহম্**—আমি; **অজম্**—প্রাকৃত জন্মরহিত; **শরীর-ভাজাম্**—বদ্ধ জীবদের; **হৃদি**—হৃদয়ে; **ধিষ্ঠিতম্**—অধিষ্ঠিত; **আত্ম**—পরমাত্মা; **কল্পিতানাম্**—মনোধর্মীদের; **প্রতিদৃশম্**—সমস্ত দিকে; **ইব**—মতো; **ন একধা**—অনেক; **অর্কম্**—সূর্য; **একম্**—একমাত্র; **সমধি-গতঃ অস্মি**—আমি সমাধি লাভ করেছি; **বিধূত**—মুক্ত হয়ে; **ভেদ-মোহঃ**—দ্বৈতভাবের মোহমুক্ত হয়ে।

অনুবাদ

এখন আমি পূর্ণ একাগ্রতা সহকারে আমার সম্মুখে উপস্থিত ভগবান শ্রীকৃষ্ণের ধ্যান করতে পারি, কারণ তাঁর সম্বন্ধে আমার দ্বৈতভাবের সমস্ত মোহ এখন দূর হয়ে গেছে। তিনি এক এবং অদ্বিতীয় হওয়া সত্ত্বেও সকলের হৃদয়ে, এমনকি মনোধর্মীদের হৃদয়ে পর্যন্ত বিরাজ করেন। সূর্য ভিন্ন ভিন্নভাবে প্রতিভাত হলেও সূর্য একটিই।

তাৎপর্য

শ্রীকৃষ্ণ এক এবং অদ্বিতীয় পরমেশ্বর ভগবান, কিন্তু তিনি তাঁর অচিন্ত্য শক্তির প্রভাবে নিজেকে বহু অংশে বিস্তার করেছেন। তাঁর অচিন্ত্য শক্তি সম্বন্ধে অজ্ঞতার ফলেই

দ্বৈত ধারণার উদয় হয়। *শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায়* (৯/১১) ভগবান বলেছেন যে মূর্খরাই কেবল তাঁকে একজন সাধারণ মানুষ বলে মনে করে। এই প্রকার মূর্খ মানুষেরা তাঁর অচিন্ত্য শক্তি সম্বন্ধে অবগত নয়। তাঁর অচিন্ত্য শক্তির প্রভাবে তিনি সকলের হৃদয়ে বিরাজমান, ঠিক যেমন সূর্য পৃথিবীর সর্বত্র সকলের সম্মুখে বিরাজমান। ভগবানের পরমাত্মারূপে তাঁর অংশের বিস্তার। তাঁর অচিন্ত্য শক্তির দ্বারা তিনি সকলের হৃদয়ে পরমাত্মারূপে নিজেকে বিস্তার করেন, এবং তাঁর অঙ্গজ্যোতির দ্বারা তিনি নিজেকে ব্রহ্মজ্যোতি রূপেও বিস্তার করেন। ব্রহ্ম-সংহিতায় উল্লেখ করা হয়েছে যে ব্রহ্মজ্যোতি হচ্ছে তাঁর অঙ্গজ্যোতি। তাই তিনি এবং তাঁর দেহনির্গত রশ্মিচ্ছটা ব্রহ্মজ্যোতি, অথবা তাঁর অংশ পরমাত্মার মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। যে সমস্ত নির্বোধ মানুষেরা সেই তত্ত্ব অবগত নয়, তারাই কেবল মনে করে যে ব্রহ্মজ্যোতি এবং পরমাত্মা হচ্ছে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ থেকে ভিন্ন। এই ভ্রান্ত দ্বৈত ধারণা ভীষ্মদেবের মন থেকে সম্পূর্ণরূপে অপসারিত হয়েছিল, এবং ভগবান শ্রীকৃষ্ণই যে কেবল সবকিছুর সর্বস্ব, তা জেনে তিনি প্রসন্ন হয়েছিলেন। এই জ্ঞান মহাত্মা বা ভগবদ্ভক্তেরা লাভ করেন, যে সম্বন্ধে *শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায়* (৭/১৯) উল্লেখ করা হয়েছে যে, বাসুদেবই সব কিছু এবং বাসুদেব ব্যতীত কোন কিছুরই অস্তিত্ব নেই। বাসুদেব বা ভগবান শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন আদি পুরুষ, যা এখানে একজন মহাজন কর্তৃক প্রতিপাদিত হয়েছে, এবং তাই একজন সাধক ভক্ত এবং শুদ্ধ ভক্ত উভয়েরই কর্তব্য হচ্ছে তাঁর পদাঙ্ক অনুসরণ করা। সেটিই হচ্ছে ভগবদ্ভক্তির মার্গ।

ভীষ্মদেবের আরাধ্য হচ্ছেন পার্থসারথিরূপে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ, এবং সেই কৃষ্ণই বৃন্দাবনে গোপিকাদের পরম আকর্ষণীয় শ্যামসুন্দর। কখনও কখনও নির্বোধ পণ্ডিতেরা ভ্রান্তিবশত মনে করে যে বৃন্দাবনের শ্রীকৃষ্ণ এবং কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের শ্রীকৃষ্ণ ভিন্ন ব্যক্তি। কিন্তু ভীষ্মদেবের মন থেকে সেরকম ধারণা সম্পূর্ণরূপে অপসারিত হয়েছিল। এমনকি নির্বিশেষবাদীদের পরম লক্ষ্যবস্তু নির্বিশেষ ব্রহ্মজ্যোতিও শ্রীকৃষ্ণ, এবং যোগীদের পরম লক্ষ্য পরমাত্মাও শ্রীকৃষ্ণ। ব্রহ্মজ্যোতি এবং অন্তর্যামী পরমাত্মা উভয়েই শ্রীকৃষ্ণ, কিন্তু কৃষ্ণের সঙ্গে যে মধুর সম্পর্ক স্থাপন করা যায় তা ব্রহ্মজ্যোতি অথবা পরমাত্মার সঙ্গে করা যায় না। তাঁর সবিশেষরূপে তিনি পার্থসারথি এবং বৃন্দাবনের শ্যামসুন্দর উভয়ই, কিন্তু তাঁর নির্বিশেষরূপে তিনি ব্রহ্মজ্যোতিতে নেই এবং পরমাত্মাতেও নেই। ভীষ্মদেবের মতো মহাত্মাগণ শ্রীকৃষ্ণকে সমস্ত স্বরূপের উৎস বলে জেনে, উপলব্ধি করেন যে এই সমস্ত বিভিন্ন রূপ ভগবান শ্রীকৃষ্ণেরই।

শ্লোক ৪৩

সূত উবাচ

কৃষ্ণ এবং ভগবতি মনোবাগ্‌দৃষ্টিবৃত্তিভিঃ ।
আত্মন্যাত্মানমাবেশ্য সোহন্তঃশ্বাস উপারমৎ ॥ ৪৩ ॥

সূতঃ উবাচ—সূত গোস্বামী বললেন; **কৃষ্ণে**—পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণে; **এবম্**—কেবল; **ভগবতি**—পরমেশ্বর ভগবানে; **মনঃ**—মনের দ্বারা; **বাক্**—বাক্য; **দৃষ্টি**—দৃষ্টি; **বৃত্তিভিঃ**—ইন্দ্রিয়ের বৃত্তি; **আত্মনি**—পরমাত্মায়; **আত্মানম্**—জীবাত্মাকে; **আবেশ্য**—আবিষ্ট করে; **সঃ**—তিনি; **অন্তঃ-শ্বাসঃ**—শেষ নিশ্বাস; **উপারমৎ**—ত্যাগ করলেন।

অনুবাদ

সূত গোস্বামী বললেন, এইভাবে ভীষ্মদেব তাঁর মন, বাক্য ও চক্ষু প্রভৃতি ইন্দ্রিয়-বৃত্তি দ্বারা তাঁর চেতনাকে পরমাত্মা ভগবান শ্রীকৃষ্ণে আবিষ্ট করে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন।

তাৎপর্য

তাঁর জড় দেহ ত্যাগ করার সময় ভীষ্মদেব যে অবস্থা প্রাপ্ত হয়েছিলেন তাকে বলা হয় *নির্বিকল্প সমাধি*, কেননা তিনি তখন ভগবানের চিন্তায় সমাহিত হয়েছিলেন এবং তাঁর চিত্ত ভগবানের লীলা স্মরণে সম্পূর্ণরূপে মগ্ন হয়েছিল। তিনি তখন ভগবানের মহিমা কীর্তন করেছিলেন এবং তাঁর দৃষ্টির দ্বারা তিনি ভগবানকে সাক্ষাৎভাবে দর্শন করেছিলেন। এইভাবে তাঁর সমস্ত কার্যকলাপ অবিচলিতভাবে ভগবানে একাগ্রীভূত হয়েছিল। এটিই হচ্ছে সর্বোচ্চ সিদ্ধির স্তর, এবং ভগবদ্ভক্তির অনুশীলনের ফলে সকলের পক্ষেই এই স্তর লাভ করা সম্ভব। ভগবদ্ভক্তির নটি মুখ্য অঙ্গ হচ্ছে—(১) *শ্রবণ*, (২) *কীর্তন*, (৩) *স্মরণ*, (৪) *পাদসেবন*, (৫) *অর্চন*, (৬) *বন্দন*, (৭) *দাস্য*, (৮) *সখ্য*, এবং (৯) *আত্মনিবেদন* । এই অঙ্গগুলির সবকটি কিংবা যে কোন একটি অভীষ্ট ফল প্রদানে সম্পূর্ণরূপে সমর্থ, তবে তা সুদক্ষ ভগবদ্ভক্তের তত্ত্বাবধানে নিরন্তর অনুশীলন করতে হয়। প্রথম অঙ্গ শ্রবণ, সব কটি অঙ্গের মধ্যে সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ, এবং তাই চরমে যারা ভীষ্মদেবের মতো অবস্থা প্রাপ্ত হতে চান, সেই সমস্ত ঐকান্তিক সাধকদের পক্ষে *শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতা* এবং তারপর *শ্রীমদ্ভাগবত* শ্রবণ করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। শ্রীকৃষ্ণ সাক্ষাৎভাবে উপস্থিত না থাকলেও মৃত্যুর সময় ভীষ্মদেবের মতো অপূর্ব অবস্থা লাভ করা যেতে পারে।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা অথবা *শ্রীমদ্ভাগবতে* লিপিবদ্ধ ভগবানের বাণী ভগবান থেকে অভিন্ন। তা হচ্ছে শব্দরূপে ভগবানের অবতার, এবং তার পূর্ণ সদ্ব্যবহার করে যে কোন মানুষ অষ্টবসুর অন্যতম শ্রীভীষ্মদেবের অবস্থা প্রাপ্ত হতে পারেন। কোন না কোন সময়ে প্রতিটি মানুষ অথবা পশুকে অবধারিতভাবে মৃত্যুবরণ করতে হয়, কিন্তু ভীষ্মদেবের মতো যাঁর মৃত্যু হয়, তিনি সিদ্ধিলাভ করেন, আর যারা প্রকৃতির নিয়মে বাধ্য হয়ে মৃত্যুবরণ করে, তাদের মৃত্যু হয় পশুর মতো। এটিই হচ্ছে মানুষ এবং পশুর মধ্যে পার্থক্য। মনুষ্য জীবনের বিশেষ উদ্দেশ্য হচ্ছে ভীষ্মদেবের মতো মৃত্যুবরণ করা।

শ্লোক ৪৪

সম্পদ্যমানমাজ্ঞায় ভীষ্মং ব্রহ্মণি নিষ্কলে।
সর্বে বভূবুস্তে তূষ্ণীং বয়াংসীব দিনাত্যয়ে ॥ ৪৪ ॥

সম্পদ্যমানম্—মিলিত হয়ে; **আজ্ঞায়**—জানার পর; **ভীষ্মম্**—শ্রীভীষ্মদেবকে; **ব্রহ্মণি**—পরব্রহ্মে; **নিষ্কলে**—অসীম; **সর্বে**—উপস্থিত সকলে; **বভূবুঃ তে**—তাঁরা সকলে হয়েছিলেন; **তূষ্ণীম্**—মৌন; **বয়াংসি ইব**—পক্ষীর মতো; **দিন-আত্যয়ে**—দিনান্তে।

অনুবাদ

অন্তহীন পরব্রহ্মে শ্রীভীষ্মদেব মিলিত হয়েছেন জেনে সেখানে উপস্থিত সকলে দিবাবসানে পাখিদের মতো মৌনভাবে অবস্থান করতে লাগলেন।

তাৎপর্য

পরম তত্ত্বের অনন্ত সত্তায় প্রবেশ করা অথবা লীন হয়ে যাওয়ার অর্থ হচ্ছে জীবের প্রকৃত আলয়ে প্রবিষ্ট হওয়া। সমস্ত জীবেরা হচ্ছে অদ্বয় তত্ত্ব পরমেশ্বর ভগবানের বিভিন্ন অংশ, এবং তাই সেবক এবং সেব্যরূপে তারা ভগবানের সঙ্গে নিত্য সম্পর্কিত। একটি যন্ত্রের বিভিন্ন অংশগুলি যেমন পূর্ণ যন্ত্রটির সেবা করে, ঠিক তেমনই ভগবান তাঁর বিভিন্ন অংশের দ্বারা সেবিত হন। কোন যন্ত্রের একটি অংশ যখন যন্ত্রটি থেকে আলাদা করে দেওয়া হয়, তখন তার আর কোন গুরুত্ব থাকে না। তেমনই ভগবানের সেবা থেকে যখন কোন অংশ বিচ্যুত হয়ে, যায় তখন তা সম্পূর্ণরূপে

অর্থহীন হয়ে পড়ে। জড় জগতে সমস্ত জীবই পরম পূর্ণের বিচ্ছিন্ন অংশ, এবং মূল অংশের যেমন গুরুত্ব থাকে, তাদের আর তেমন কোন গুরুত্ব নেই। কিন্তু আরও সংযুক্ত জীব রয়েছেন, যাঁরা হচ্ছেন নিত্যমুক্ত। দুর্গা-শক্তি বা কারাগারের রক্ষয়িত্রী ভগবানের জড়া শক্তি, বিচ্ছিন্ন বিভিন্ন অংশের তত্ত্বাবধান করেন, এবং এইভাবে তারা জড়া প্রকৃতির নিয়মের অধীনে বদ্ধ অবস্থায় জীবন যাপন করে। জীব যখন সে কথা উপলব্ধি করতে পারে, তখন সে তার প্রকৃত আলয় ভগবদ্ধামে ফিরে যাওয়ার চেষ্টা করে, এবং এইভাবে জীবের পারমার্থিক অনুপ্রেরণার সূচনা হয়। এই পারমার্থিক অনুপ্রেরণাকে বলা হয় *ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসা* । মুখ্যত এই *ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসা* জ্ঞান, বৈরাগ্য এবং ভগবদ্ভক্তির দ্বারা সফল হয়। জ্ঞানের অর্থ হচ্ছে ব্রহ্ম বিষয়ক প্রত্যেক বস্তুর জ্ঞান; বৈরাগ্যের অর্থ হচ্ছে জড় বিষয়ের প্রতি অনাসক্তি, এবং ভক্তি হচ্ছে অভ্যাসের দ্বারা জীবের স্বরূপের পুনরুদয়। যে সমস্ত সফল জীব চিজ্জগতে প্রবেশের যোগ্য, তাঁদের বলা হয় জ্ঞানী, যোগী এবং ভক্ত। জ্ঞানী এবং যোগীরা ব্রহ্মের নির্বিশেষ রশ্মিচ্ছটায় প্রবেশ করেন, কিন্তু ভক্তরা বৈকুণ্ঠ নামক চিন্ময়লোকে প্রবেশ করেন। সেই সমস্ত চিন্ময়লোকে নারায়ণরূপে পরমেশ্বর ভগবান আধিপত্য করেন, এবং সুস্থ, বন্ধনমুক্ত জীবেরা সেখানে শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য এবং মধুর রসে পরমেশ্বর ভগবানের প্রেমময়ী সেবা সম্পাদনপূর্বক সেখানে বাস করেন। মুক্ত জীবেরা সেখানে ভগবানের সঙ্গে পূর্ণ মুক্তির স্বাদ আস্বাদন করেন, কিন্তু নির্বিশেষবাদী জ্ঞানী এবং যোগীরা বৈকুণ্ঠলোকের নির্বিশেষ জ্যোতিতে প্রবেশ করেন। বৈকুণ্ঠের সব কটি লোক সূর্যের মতো জ্যোতির্ময়, এবং বৈকুণ্ঠলোকের রশ্মিচ্ছটাকে বলা হয় ব্রহ্মজ্যোতি। এই ব্রহ্মজ্যোতি অন্তহীনভাবে বিস্তৃত এবং এই জড় জগৎ হচ্ছে সেই ব্রহ্মজ্যোতির একটি নগণ্য আচ্ছাদিত অংশ মাত্র। এই আবরণ অনিত্য, এবং তাই এটি এক প্রকার মায়া।

ভগবানের শুদ্ধ ভক্ত হওয়ার ফলে ভীষ্মদেব চিজ্জগতের একটি বৈকুণ্ঠলোকে প্রবিষ্ট হয়েছিলেন, যেখানে ভগবান তাঁর নিত্য পার্থসারথি রূপে তাঁর নিরন্তর সেবায় যুক্ত নিত্য-মুক্ত জীবদের আরাধ্য ভগবানরূপে বিরাজ করেন। যে প্রেম এবং অনুরাগ ভগবান এবং ভক্তকে বেঁধে রাখে, তা ভীষ্মদেবের বেলায় প্রদর্শিত হয়েছিল। ভীষ্মদেব পার্থসারথি রূপে ভগবানের চিন্ময় স্বরূপ কখনও বিস্মৃত হননি, এবং ভীষ্মদেব যখন চিন্ময়লোকে ফিরে যাচ্ছিলেন, তখন ভগবান স্বয়ং তাঁর সম্মুখে উপস্থিত ছিলেন। সেটিই হচ্ছে জীবনের সর্বোচ্চ সিদ্ধি।

শ্লোক ৪৫

**তত্র দুন্দুভয়ো নেদুর্দেবমানববাদিতাঃ ।
শশংসুঃ সাধবো রাজ্ঞাং খাৎ পেতুঃ পুষ্পবৃষ্টয়ঃ ॥ ৪৫ ॥**

তত্র—তখন; **দুন্দুভয়ঃ**—দুন্দুভিসমূহ; **নেদুঃ**—ধ্বনিত হয়েছিল; **দেব**—দেবতাগণ; **মানব**—মানব; **বাদিতাঃ**—বাজিয়েছিল; **শশংসুঃ**—প্রশংসা ধ্বনি; **সাধবঃ**—সাধুজন; **রাজ্ঞাম্**—রাজাদের মধ্যে; **খাৎ**—আকাশ থেকে; **পেতুঃ**—পতিত হতে লাগল; **পুষ্প-বৃষ্টয়ঃ**—পুষ্পবৃষ্টি।

অনুবাদ

অতঃপর স্বর্গের দেবতাবৃন্দ এবং মর্ত্যের মানবেরা তাঁর প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে দুন্দুভি ধ্বনি করলেন। সৎ প্রকৃতির রাজন্যবর্গ সম্মান ও শ্রদ্ধা প্রদর্শন শুরু করলেন এবং আকাশ থেকে পুষ্পবৃষ্টি হতে লাগল।

তাৎপর্য

মানুষ এবং দেবতা উভয়েই ভীষ্মদেবকে শ্রদ্ধা করতেন। মানুষেরা পৃথিবীর মতো ভূর্লোক এবং ভুবর্লোকের অন্যান্য গ্রহে বাস করে। কিন্তু দেবতারা স্বর্গলোকে বাস করেন, এবং তাঁরা সকলেই ভীষ্মদেবকে একজন মহান যোদ্ধা এবং ভগবদ্ভক্তরূপে জানতেন। একজন মহাজনরূপে তিনি মানুষ হওয়া সত্ত্বেও ব্রহ্মা, নারদ এবং শিবের সমপর্যায়ভুক্ত ছিলেন। পারমার্থিক সিদ্ধিলাভের ফলেই মহান দেবতাদের তুল্য যোগ্যতা লাভ করা সম্ভব। এইভাবে ভীষ্মদেব ব্রহ্মাণ্ডের সর্বত্র বিখ্যাত ছিলেন, এবং তাঁর সময়ে যান্ত্রিক অন্তরীক্ষযানের ব্যর্থ প্রচেষ্টা না করে অত্যন্ত সূক্ষ্ম উপায়ে এক গ্রহ থেকে আর এক গ্রহে ভ্রমণ করা হত। অনেক দূরের গ্রহগুলিতে যখন ভীষ্মদেবের দেহত্যাগের সংবাদ পৌঁছে ছিল, তখন উচ্চতর লোকের এবং পৃথিবীর অধিবাসীরাও সেই মহাপুরুষের মহাপ্রয়াণের উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধা নিবেদন করে পুষ্পবৃষ্টি করেছিলেন। স্বর্গ থেকে এই পুষ্পবৃষ্টি মহান দেবতাদের স্বীকৃতির ইঙ্গিত, এবং ফুল দিয়ে মৃতদেহ সাজানোর সঙ্গে কখনও তার তুলনা করা উচিত নয়। আত্ম-উপলব্ধির ফলে মুক্ত ভীষ্মদেবের শরীর ভৌতিক প্রভাব থেকে মুক্ত হয়েছিল, এবং তার ফলে তাঁর দেহ চিন্ময়ত্ব লাভ করেছিল, ঠিক যেমন আগুনের সংযোগে লোহাও উত্তপ্ত হয়ে আগুনের মতো লাল হয়ে যায়। তাই পূর্ণরূপে উপলব্ধ আত্মার দেহকে কখনও জড় বলে মনে করা হয় না। এই প্রকার চিন্ময় শরীরের জন্য বিশেষ উৎসব পালন

করা হয়। ভীষ্মদেবের প্রতি যে শ্রদ্ধা এবং স্বীকৃতি প্রদর্শন করা হয়েছিল, কখনও কৃত্রিমভাবে তার অনুকরণ করা উচিত নয়, যা আজকাল যে কোন সাধারণ মানুষের ক্ষেত্রে তথাকথিত জয়ন্তী উৎসব পালন করার মতো একটা কায়দা হয়ে দাঁড়িয়েছে। প্রামাণিক শাস্ত্রের মতে এই প্রকার জয়ন্তী উৎসব সাধারণ মানুষের জন্য নয়, তা তিনি জড়জাগতিক বিচারে যতই মহৎ হেন না কেন। সেটি ভগবানের প্রতি একটি অপরাধ, কেননা জয়ন্তী কেবল ভগবানের এই ধরাধামে আবির্ভাবের দিবসটি উদ্‌যাপন করার জন্যই নির্দিষ্ট। ভীষ্মদেবের কার্যকলাপ ছিল অলৌকিক, এবং ভগবদ্ধামে তাঁর প্রয়াণও অলৌকিক।

শ্লোক ৪৬

তস্য নির্হরণাদীনি সম্পরেতস্য ভার্গব।
যুধিষ্ঠিরঃ কারয়িত্বা মুহূর্তং দুঃখিতোঽভবৎ ॥ ৪৬ ॥

তস্য—তাঁর; **নির্হরণ-আদীনি**—অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া; **সম্পরেতস্য**—মৃতদেহের; **ভার্গব**—হে ভৃগু-বংশতিলক; **যুধিষ্ঠিরঃ**—মহারাজ যুধিষ্ঠির; **কারয়িত্বা**—সম্পাদন করে; **মুহূর্তম্**—ক্ষণিকের জন্য; **দুঃখিতঃ**—দুঃখিত; **অভবৎ**—হয়েছিলেন।

অনুবাদ

হে ভৃগুবংশতিলক (শৌনক), ভীষ্মদেবের মৃতদেহের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পাদন করে মহারাজ যুধিষ্ঠির ক্ষণিকের জন্য দুঃখে অভিভূত হলেন।

তাৎপর্য

ভীষ্মদেব মহারাজ যুধিষ্ঠিরের পরিবারে কেবল একজন মহান নেতাই ছিলেন না, তিনি ছিলেন তাঁর, তাঁর ভাইদের এবং তাঁর মায়ের কাছে এক মহান দার্শনিক এবং বন্ধু। মহারাজ যুধিষ্ঠির প্রমুখ পঞ্চপাণ্ডবদের পিতা মহারাজ পাণ্ডুর মৃত্যুর পর ভীষ্মদেব ছিলেন পাণ্ডবদের সবচাইতে স্নেহপরায়ণ পিতামহ এবং তাঁর বিধবা পুত্রবধূ কুন্তী-দেবীর তত্ত্বাবধায়ক। যদিও মহারাজ যুধিষ্ঠিরের জ্যেষ্ঠতাত মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র তাঁদের দেখাশোনা করার জন্য ছিলেন, কিন্তু তাঁর স্নেহ দুর্যোধন প্রমুখ তাঁর শতপুত্রের প্রতি অধিক ছিল। অবশেষে পিতৃহীন পাঁচ ভাইকে হস্তিনাপুরের প্রাপ্য রাজ্যের অধিকার থেকে বঞ্চিত করার জন্য এক প্রচণ্ড দলাদলির সৃষ্টি হয়েছিল। রাজপ্রাসাদে সাধারণত যা হয়ে থাকে, এক বিরাট ষড়যন্ত্রে পাঁচ ভাইকে গৃহ থেকে

নির্বাসিত হয়ে বনবাসী হতে হয়। কিন্তু ভীষ্মদেব তাঁর জীবনের অন্তিম সময় পর্যন্ত সর্বদাই মহারাজ যুধিষ্ঠিরের দরদী শুভাকাঙ্ক্ষী, পিতামহ, বন্ধু এবং উপদেষ্টা ছিলেন। মহারাজ যুধিষ্ঠিরকে রাজসিংহাসনে অধিষ্ঠিত দেখে তিনি মহাসুখে দেহত্যাগ করেছিলেন, তা না হলে পাণ্ডবদের অসঙ্গতভাবে দুঃখ-কষ্ট ভোগ করার বেদনা সহ্য করার পরিবর্তে বহু পূর্বেই তিনি তাঁর জড় দেহ পরিত্যাগ করতেন। তিনি কেবল উপযুক্ত অবসরের প্রতীক্ষা করছিলেন, কেননা তাঁর বিশ্বাস ছিল যে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে পাণ্ডবদের অবশ্যই জয় হবে, কারণ শ্রীকৃষ্ণ ছিলেন তাদের রক্ষক। ভগবানের একজন ভক্তরূপে তিনি জানতেন যে ভগবানের ভক্তকে কখনো পরাজিত করা যায় না। মহারাজ যুধিষ্ঠির ভীষ্মদেবের এই সমস্ত শুভেচ্ছার কথা ভালভাবেই জানতেন, এবং তাই তিনি গভীর বিরহ বেদনা অনুভব করেছিলেন। ভীষ্মদেব যে জড় শরীর ত্যাগ করেছিলেন, তার বিচ্ছেদে তিনি দুঃখ অনুভব করেননি; তিনি দুঃখ অনুভব করেছিলেন একজন মহান আত্মার সঙ্গ থেকে বঞ্চিত হওয়ায়। ভীষ্মদেব যদিও ছিলেন একজন মুক্ত পুরুষ, তথাপি অন্ত্যেষ্টি-ক্রিয়া সম্পাদন করা ছিল একটি অবশ্য কর্তব্য। যেহেতু ভীষ্মদেব নিঃসন্তান ছিলেন, তাই তাঁর জ্যেষ্ঠপৌত্র মহারাজ যুধিষ্ঠির ছিলেন সেই অন্ত্যেষ্টি-ক্রিয়া সম্পাদনের অধিকারী। ভীষ্মদেবের কাছে এটি ছিল একটি বরস্বরূপ, যেহেতু তাঁর মতো একজন মহাপুরুষের শেষকৃত্য সম্পাদন করেছিলেন তাঁরই মতো মহান একজন বংশধর।

শ্লোক ৪৭

তুষ্টুবুর্মুনয়ো হৃষ্টাঃ কৃষ্ণং তদ্‌গুহ্যনামভিঃ ।
ততস্তে কৃষ্ণহৃদয়াঃ স্বাশ্রমান্ প্রযযুঃ পুনঃ ॥ ৪৭ ॥

তুষ্টুবুঃ—সন্তুষ্ট; **মুনয়ঃ**—ব্যাসদেব প্রমুখ মুনিগণ; **হৃষ্টাঃ**—আনন্দিত চিত্তে; **কৃষ্ণম্**—পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে; **তৎ**—তাঁর; **গুহ্য**—গূঢ়তত্ত্ব সমন্বিত; **নামভিঃ**—তাঁর দিব্য নামের দ্বারা; **ততঃ**—তারপর; **তে**—তাঁরা; **কৃষ্ণ-হৃদয়াঃ**—শ্রীকৃষ্ণকে যাঁরা সর্বদা হৃদয়ে ধারণ করেন; **স্ব-আশ্রমান্**—তাঁদের নিজ নিজ আশ্রমে; **প্রযযুঃ**—প্রত্যাবর্তন করেছিলেন; **পুনঃ**—পুনরায়।

অনুবাদ

সমস্ত মহর্ষিগণ গূঢ় বৈদিক মন্ত্রের দ্বারা সেখানে উপস্থিত ভগবান শ্রীকৃষ্ণের গুণ কীর্তন করলেন। তারপর শ্রীকৃষ্ণকে হৃদয়ে ধারণ করে তাঁরা তাঁদের নিজ নিজ আশ্রমে প্রত্যাবর্তন করলেন।

তাৎপর্য

ভগবানের ভক্ত সর্বদাই ভগবানের হৃদয়ে থাকেন, আর ভগবানও সর্বদা ভক্তের হৃদয়ে থাকেন। সেটিই হচ্ছে ভগবানের সঙ্গে তাঁর ভক্তের মধুর সম্পর্ক। ভগবানের প্রতি অনন্য প্রেম এবং ভক্তির ফলে ভক্তেরা সর্বদাই তাঁদের অন্তরে তাঁকে দর্শন করেন, এবং ভগবানও, যদিও তাঁর কোনকিছু করার নেই বা কোন কিছু চাওয়ার নেই, তথাপি তিনি সর্বদা তাঁর ভক্তের কল্যাণ সাধনে তৎপর থাকেন। সাধারণ জীবের সমস্ত কর্ম এবং তার ফলের জন্য প্রকৃতির নিয়ম রয়েছে, কিন্তু তিনি সর্বদাই তাঁর ভক্তদের সৎ পথে নিয়ে যাওয়ার জন্য উদ্‌গ্রীব থাকেন। ভক্তেরা তাই সরাসরিভাবে ভগবানের তত্ত্বাবধানে থাকেন। আর ভগবানও স্বেচ্ছায় তাঁর ভক্তের তত্ত্বাবধানে নিজেকে সমর্পণ করেন। তাই ব্যাসদেব প্রমুখ সমস্ত ভগবদ্ভক্ত ঋষিরা সেখানে সাক্ষাৎভাবে উপস্থিত পরমেশ্বর ভগবানের প্রসন্নতা বিধানের জন্য অন্ত্যেষ্টি-ক্রিয়ার পর বৈদিক মন্ত্র উচ্চারণ করেছিলেন। সমস্ত বৈদিক মন্ত্র কীর্তন করা হয় ভগবান শ্রীকৃষ্ণের প্রসন্নতা বিধানের জন্য। সে কথা *শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায়* (১৫/১৫) প্রতিপন্ন হয়েছে। সমস্ত বেদ, উপনিষদ, বেদান্ত ইত্যাদি কেবল তাঁকেই অন্বেষণ করছে, এবং সমস্ত মন্ত্র কেবল তাঁরই মহিমা কীর্তনের জন্য। তাই সমস্ত ঋষিরা সেই উদ্দেশ্যে উপযুক্ত সমস্ত কার্য যথাযথভাবে সম্পাদন করেছিলেন, এবং তাঁরা আনন্দিত চিত্তে তাঁদের নিজ নিজ আশ্রমের উদ্দেশ্যে প্রস্থান করেছিলেন।

শ্লোক ৪৮

ততো যুধিষ্ঠিরো গত্বা সহকৃষ্ণো গজাহ্বয়ম্ ।
পিতরং সান্ত্বয়ামাস গান্ধারীঞ্চ তপস্বিনীম্ ॥ ৪৮ ॥

ততঃ—তারপর; যুধিষ্ঠিরঃ—মহারাজ যুধিষ্ঠির; গত্বা—গমন করে; সহ—সহিত; কৃষ্ণঃ—শ্রীকৃষ্ণ; গজাহ্বয়ম্—গজাহ্বয় নামে রাজধানী (হস্তিনাপুর) ; পিতরম্—তাঁর পিতৃব্য (ধৃতরাষ্ট্রকে); সান্ত্বয়াম্ আস—সান্ত্বনা দিয়েছিলেন; গান্ধারীম্—ধৃতরাষ্ট্রের পত্নী গান্ধারীকে; চ—এবং; তপস্বিনীম্—তপস্বিনী।

অনুবাদ

অতঃপর মহারাজ যুধিষ্ঠির অচিরেই পরমেশ্বর শ্রীকৃষ্ণসহ তাঁর রাজধানী হস্তিনাপুরে গমন করে তাঁর জ্যেষ্ঠতাত ধৃতরাষ্ট্র ও তাতপত্নী তপস্বিনী গান্ধারীকে সান্ত্বনা দিয়েছিলেন।

তাৎপর্য

দুর্যোধন প্রমুখ ভাইদের পিতা-মাতা ধৃতরাষ্ট্র এবং গান্ধারী ছিলেন মহারাজ যুধিষ্ঠিরের জ্যাঠামশায় এবং জ্যাঠাইমা। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের পর সেই বিখ্যাত দম্পতি, তাঁদের সমস্ত পুত্র এবং পৌত্রদের হারিয়ে মহারাজ যুধিষ্ঠিরের তত্ত্বাবধানে ছিলেন। তাই অপার ক্ষতিতে গভীর বেদনায় তাঁরা তপস্বীর মতো দিন যাপন করছিলেন। ধৃতরাষ্ট্রের জ্যেষ্ঠতাত ভীষ্মদেবের মৃত্যু-সংবাদ সেই রাজা এবং রানীর কাছে আরেকটি গভীর শোকের কারণ হয়েছিল, এবং তাই মহারাজ যুধিষ্ঠিরের কাছ থেকে তাঁদের সান্ত্বনার আবশ্যকতা ছিল। মহারাজ যুধিষ্ঠির তাঁর কর্তব্য সম্বন্ধে সচেতন ছিলেন, এবং তিনি তৎক্ষণাৎ শ্রীকৃষ্ণসহ দ্রুত সেখানে গিয়েছিলেন এবং তাঁরা শোকাকুল ধৃতরাষ্ট্রকে মধুর বাক্যে সান্ত্বনা দিয়েছিলেন।

গান্ধারী যদিও একজন বিশ্বস্ত পত্নী এবং স্নেহশীলা মাতার জীবন যাপন করেছিলেন, তথাপি তিনি ছিলেন একজন মহান তপস্বিনী। তাঁর পতি অন্ধ ছিলেন বলে তিনি স্বেচ্ছায় তাঁর চক্ষু আবৃত করে অন্ধত্ব বরণ করেছিলেন। পত্নীর কর্তব্য হচ্ছে সম্পূর্ণরূপে পতির অনুগমন করা। গান্ধারী তাঁর পতির প্রতি এতই অনুগত ছিলেন যে তিনি তাঁর মতো নিরন্তর অন্ধত্ব বরণ করে নিয়ে তাঁর অনুগমন করেছিলেন। তাই তাঁর আচরণে তিনি ছিলেন একজন মহান তপস্বিনী। আর তা ছাড়া তাঁর শত পুত্র এবং পৌত্রদের একসঙ্গে হারানোর শোক অবশ্যই একজন নারীর পক্ষে অত্যন্ত বেদনাদায়ক ছিল। কিন্তু একজন তপস্বিনীর মতো তিনি সেই বেদনা সহ্য করেছিলেন। গান্ধারী একজন নারী হলেও তাঁর চরিত্র ভীষ্মদেবের থেকে কোন অংশে কম ছিল না। তাঁরা দুজনেই মহাভারতের দুটি অসাধারণ ব্যক্তিত্ব।

শ্লোক ৪৯

পিত্রা চানুমতো রাজা বাসুদেবানুমোদিতঃ।
চকার রাজ্যং ধর্মেণ পিতৃপৈতামহং বিভুঃ ॥ ৪৯ ॥

পিত্রা—তাঁর পিতৃব্য ধৃতরাষ্ট্র কর্তৃক; **চ**—এবং; **অনুমতঃ**—অনুমতিতে; **রাজা**—মহারাজ যুধিষ্ঠির; **বাসুদেব-অনুমোদিতঃ**—শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক অনুমোদিত; **চকার**—সম্পাদন করেছিলেন; **রাজ্যম্**—রাজ্য; **ধর্মেণ**—ধর্মীয় বিধান অনুসারে; **পিতৃ**—পিতা; **পৈতামহম্**—পিতামহ; **বিভুঃ**—মহান।

অনুবাদ

তারপর মহান ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির জ্যেষ্ঠতাত ধৃতরাষ্ট্রের অনুজ্ঞা এবং পরমেশ্বর শ্রীকৃষ্ণের সম্মতি অনুসারে ধর্মের বিধান ও রাজকীয় নীতি-নিয়মাদি কঠোরভাবে পালন করে তাঁর পিতৃ-পিতামহের পদাঙ্ক অনুসরণে রাজ্যশাসন করতে লাগলেন।

তাৎপর্য

মহারাজ যুধিষ্ঠির একজন সাধারণ কর-সংগ্রাহক ছিলেন না। একজন রাজারূপে তাঁর কর্তব্য সম্বন্ধে তিনি সর্বদাই সচেতন ছিলেন, যে দায়িত্বটি পিতা অথবা গুরুদেবের থেকে কোন অংশে কম নয়। রাজাকে প্রজাদের সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক এবং পারমার্থিক প্রগতির ব্যাপারে সব সময় সচেতন থাকতে হয়। রাজার জানা উচিত যে মনুষ্য জীবন বদ্ধ-আত্মাকে জড় জগতের বন্ধন থেকে মুক্ত করার জন্য, এবং তাই তাঁর কর্তব্য হচ্ছে এই সর্বোচ্চ সিদ্ধিলাভের জন্য প্রজাদের যথাযথভাবে পরিচালিত করা।

মহারাজ যুধিষ্ঠির নিষ্ঠা সহকারে এই কর্তব্য সম্পাদন করেছিলেন, যা পরবর্তী অধ্যায়ে দেখা যাবে। তিনি কেবল নিয়মই পালন করেননি, অধিকন্তু তিনি তাঁর বৃদ্ধ জ্যেষ্ঠতাতের অনুমতিও গ্রহণ করেছিলেন, যিনি ছিলেন একজন বিজ্ঞ রাজনীতিবিদ্, এবং তা *শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার* দর্শনের বক্তা শ্রীকৃষ্ণের দ্বারাও অনুমোদিত হয়েছিল।

মহারাজ যুধিষ্ঠির হলেন একজন আদর্শ সম্রাট, এবং মহারাজ যুধিষ্ঠিরের মতো একজন সুশিক্ষিত রাজার অধীনে রাজতন্ত্র হচ্ছে সর্বশ্রেষ্ঠ শাসন-ব্যবস্থা। তা জনসাধারণের দ্বারা নির্বাচিত আধুনিক জনগণের সরকার থেকে অনেক শ্রেষ্ঠ। জনসাধারণ, বিশেষ করে এই কলিযুগে, প্রায় সকলেই শূদ্র; সাধারণত তাদের জন্ম হয়েছে নীচকুলে, তাদের কোনরকম শিক্ষা নেই, তারা হতভাগ্য এবং সঙ্গ প্রভাবে অসৎ। তারা নিজেরাই জানে না যে জীবনের চরম লক্ষ্য কি। তাই তাদের ভোটের কোন মূল্য নেই, এবং এই প্রকার দায়িত্বজ্ঞানহীন ভোটদাতাদের দ্বারা নির্বাচিত ব্যক্তিরা কখনও মহারাজ যুধিষ্ঠিরের মতো দায়িত্বশীল প্রতিনিধি হতে পারে না।

ইতি "শ্রীকৃষ্ণের উপস্থিতিতে ভীষ্মদেবের প্রয়াণ" নামক শ্রীমদ্ভাগবতের প্রথম স্কন্ধের নবম অধ্যায়ের ভক্তিবেদান্ত তাৎপর্য।

দশম অধ্যায়

ভগবান শ্রীকৃষ্ণের দ্বারকা যাত্রা

শ্লোক ১

শৌনক উবাচ

হত্বা স্বরিক্থস্পৃধ আততায়িনো
যুধিষ্ঠিরো ধর্মভৃতাং বরিষ্ঠঃ।
সহানুজৈঃ প্রত্যবরুদ্ধভোজনঃ
কথং প্রবৃত্তঃ কিমকারষীত্ততঃ ॥ ১ ॥

শৌনকঃ উবাচ—শৌনক জিজ্ঞাসা করলেন; হত্বা—হত্যা করার পর; স্ব-রিক্থ—ন্যায্য উত্তরাধিকার; স্পৃধঃ—অপহরণকারী; আততায়িনঃ—আক্রমণকারী; যুধিষ্ঠিরঃ—মহারাজ যুধিষ্ঠির; ধর্ম-ভৃতাম্—নিষ্ঠা সহকারে ধর্মের অনুশাসন পালনকারী; বরিষ্ঠঃ—সর্বশ্রেষ্ঠ; সহ-অনুজৈঃ—তাঁর কনিষ্ঠ ভ্রাতাগণসহ; প্রত্যবরুদ্ধ—সীমিত; ভোজনঃ—ভোগ; কথম্—কিভাবে; প্রবৃত্ত—প্রবৃত্ত হয়েছিলেন; কিম্—কি; অকারষীৎ—সম্পাদন করেছিলেন; ততঃ—তারপর।

অনুবাদ

শৌনক মুনি জিজ্ঞাসা করলেন—তাঁর ন্যায্য উত্তরাধিকার অপহরণকারী এবং নানাপ্রকার অনিষ্ট সাধনকারী শত্রুদিগকে অনুজগণের সহায়তায় বধ করে ধার্মিকাগ্রগণ্য রাজা যুধিষ্ঠির কিভাবে তাঁর রাজ্য শাসন করেছিলেন? অবশ্যই তিনি কুণ্ঠাশূন্য চিত্তে তাঁর রাজ্য ভোগ করতে পারেননি।

তাৎপর্য

সমস্ত ধর্মপরায়ণ ব্যক্তিদের মধ্যে মহারাজ যুধিষ্ঠির সর্বশ্রেষ্ঠ। তাই সাম্রাজ্য ভোগ করার জন্য তিনি তাঁর জ্ঞাতি ভ্রাতাদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে মোটেই ইচ্ছুক ছিলেন না। তিনি ন্যায়সঙ্গত কারণে যুদ্ধ করেছিলেন, কেননা উত্তরাধিকার সূত্রে হস্তিনাপুরের রাজ্য

ছিল তাঁর ন্যায্য প্রাপ্য, এবং তাঁর জ্ঞাতিভ্রাতারা তা অন্যায়ভাবে অধিকার করার চেষ্টা করেছিল। তাই তিনি ন্যায়সঙ্গত কারণে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের পরিচালনায় যুদ্ধ করেছিলেন, কিন্তু তিনি তাঁর বিজয়ের ফল উপভোগ করতে পারেননি, কেননা তাঁর জ্ঞাতিভ্রাতারা সকলেই সেই যুদ্ধে নিহত হয়েছিল। তিনি কর্তব্য পালনের উদ্দেশ্যে কনিষ্ঠ ভ্রাতাদের সহায়তায় রাজ্য শাসন করেছিলেন। শৌনক ঋষির এই পরিপ্রশ্নটি গুরুত্বপূর্ণ, কেননা তিনি জানতে চেয়েছিলেন যে মহারাজ যুধিষ্ঠিরের যখন সাম্রাজ্য ভোগ করার সুযোগ এসেছিল তখন তিনি কিভাবে আচরণ করেছিলেন।

শ্লোক ২

সূত উবাচ

বংশং কুরোর্বংশদবাগ্নিনির্হৃতং
সংরোহয়িত্বা ভবভাবনো হরিঃ।
নিবেশয়িত্বা নিজরাজ্য ঈশ্বরো
যুধিষ্ঠিরং প্রীতমনা বভূব হ ॥ ২ ॥

সূতঃ উবাচ—সূত গোস্বামী উত্তর দিলেন; **বংশম্**—বংশ; **কুরোঃ**—মহারাজ কুরুর; **বংশ-দব-অগ্নি**—বংশের ঘর্ষণে প্রজ্বলিত দাবানল; **নির্হৃতম্**—দগ্ধ; **সংরোহয়িত্বা**—বংশের অঙ্কুর; **ভব-ভাবনঃ**—ভুবনপালক; **হরিঃ**—পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ; **নিবেশয়িত্বা**—পুনরায় সংস্থাপন করে; **নিজ-রাজ্যে**—তাঁর নিজের রাজ্যে; **ঈশ্বরঃ**—পরমেশ্বর ভগবান; **যুধিষ্ঠিরম্**—মহারাজ যুধিষ্ঠিরকে; **প্রীত-মনাঃ**—প্রসন্ন চিত্ত; **বভূব হ**—হয়েছিলেন।

অনুবাদ

সূত গোস্বামী বললেন, পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ, যিনি সমস্ত জগতের পালনকর্তা, ক্রোধাগ্নিরূপ দাবানলে নিঃশেষিত কুরুবংশকে পুনঃস্থাপিত করে এবং যুধিষ্ঠিরকে তাঁর রাজ্যে স্থাপন করে প্রসন্ন চিত্ত হয়েছিলেন।

তাৎপর্য

এই সংসারকে বংশ বা বাঁশের ঘর্ষণের ফলে উৎপন্ন দাবানলের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। এই দাবানল আপনা থেকেই জ্বলে ওঠে, কেননা কোন রকম বাহ্যিক কারণ ব্যতীতই বাঁশের ঘর্ষণ হয়। তেমনই এই জড় জগতে যারা প্রকৃতির উপর প্রভুত্ব

করতে চায়, তাদের ক্রোধের ফলে যুদ্ধের আগুন জ্বলে ওঠে, এবং অবাঞ্ছিত জনগণ তাতে বিনষ্ট হয়ে যায়। এই প্রকার দাবানলে অথবা যুদ্ধে ভগবানের কিছু করার থাকে না। কিন্তু যেহেতু তিনি তাঁর সৃষ্টি পালন করতে চান, তাই তিনি ইচ্ছা করেন যে জনসাধারণ যেন আত্ম-উপলব্ধির আদর্শ পন্থা অনুসরণ করে, যার মাধ্যমে জীব ভগবদ্ধামে প্রবেশ করতে পারে। ভগবান চান যে দুর্দশাগ্রস্ত মানুষেরা যেন জড় জগতের ত্রিতাপ দুঃখ থেকে মুক্ত হয়ে তাদের প্রকৃত আলয় ভগবদ্ধামে ফিরে যেতে পারে। সেই উদ্দেশ্যে এই জড় জগৎ সৃষ্টি হয়েছে, এবং যারা তাঁর সেই পরিকল্পনা বুঝতে পারে না, তারা ভগবানের মায়াশক্তির প্রভাবে জড় জগতে দুঃখ-দুর্দশা ভোগ করে। তাই ভগবান চান যেন তাঁর আদর্শ প্রতিনিধি পৃথিবী শাসন করেন। এই প্রকার শাসন-ব্যবস্থা স্থাপন করার জন্য এবং তাঁর পরিকল্পনার বিরোধী অবাঞ্ছিত ব্যক্তিদের সংহার করার জন্য ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অবতরণ করেছিলেন। ভগবানের পরিকল্পনা অনুসারে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল যাতে অবাঞ্ছিত ব্যক্তিদের এই পৃথিবী থেকে বহিষ্কৃত করে তাঁর ভক্তের অধীনে শান্তিপূর্ণ সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়। তাই মহারাজ যুধিষ্ঠির যখন সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন এবং কুরুবংশের অঙ্কুর মহারাজ পরীক্ষিৎ রক্ষা পান, তখন ভগবান পরম সন্তুষ্ট হয়েছিলেন।

শ্লোক ৩

নিশম্য ভীষ্মোক্তমথাচ্যুতোক্তং
প্রবৃত্তবিজ্ঞানবিধূতবিভ্রমঃ।
শশাস গামিন্দ্র ইবাজিতাশ্রয়ঃ
পরিধ্যুপান্তামনুজানুবর্তিতঃ ॥ ৩ ॥

নিশম্য—শ্রবণ করে; **ভীষ্ম-উক্তম্**—ভীষ্মদেবের উপদেশ; **অথ**—এবং; **অচ্যুত-উক্তম্**—অচ্যুত শ্রীকৃষ্ণের বাণী; **প্রবৃত্ত**—প্রবৃত্ত হয়ে; **বিজ্ঞান**—পূর্ণ জ্ঞান; **বিধূত**—বিধৌত; **বিভ্রমঃ**—সমস্ত ভ্রান্ত ধারণা; **শশাস**—শাসন করেছিলেন; **গাম্**—পৃথিবী; **ইন্দ্র ইব**—দেবরাজ ইন্দ্রের মতো; **অজিত-আশ্রয়ঃ**—অজিত শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক রক্ষিত; **পরিধি-উপান্তাম্**—সাগর সমন্বিত; **অনুজ**—কনিষ্ঠ ভ্রাতাগণ; **অনুবর্তিতঃ**—তাঁরা তাঁর অনুগামী হয়েছিলেন।

অনুবাদ

ভীষ্মদেব এবং ভগবান শ্রীকৃষ্ণের উপদেশ শ্রবণ করে মহারাজ যুধিষ্ঠির মোহমুক্ত হয়ে পূর্ণজ্ঞান লাভ করেছিলেন, এবং শ্রীকৃষ্ণের আশ্রয়ে তাঁর অনুগামী অনুজগণসহ ইন্দ্রের মতো সসাগরা পৃথিবী পালন করেছিলেন।

তাৎপর্য

আধুনিক ইংরেজ আইনে জ্যেষ্ঠ সন্তানের যে পৈতৃক সম্পত্তিতে উত্তরাধিকারের প্রথা রয়েছে তা সসাগরা পৃথিবী শাসনকালে মহারাজ যুধিষ্ঠিরের সময়েও প্রচলিত ছিল। সেই সময় এমনকি মহারাজ যুধিষ্ঠিরের পৌত্র মহারাজ পরীক্ষিতের সময় পর্যন্ত, হস্তিনাপুরের (আধুনিক দিল্লী) রাজারা সসাগরা পৃথিবীর সম্রাট ছিলেন। মহারাজ যুধিষ্ঠিরের কনিষ্ঠ ভ্রাতারা তাঁর মন্ত্রী এবং রাজ্যের সেনাপতি রূপে রাজকার্য সম্পাদন করছিলেন, এবং রাজা এবং তাঁর ধর্মাত্মা ভ্রাতাদের মধ্যে পূর্ণ সহযোগিতা ছিল। মহারাজ যুধিষ্ঠির ছিলেন একজন আদর্শ রাজা অর্থাৎ পৃথিবী শাসন করার জন্য ভগবান শ্রীকৃষ্ণের প্রতিনিধি। স্বর্গলোকে ভগবানের প্রতিনিধি দেবরাজ ইন্দ্রের সঙ্গে তাঁর তুলনা করা যায়। ইন্দ্র, চন্দ্র, সূর্য, বরুণ, বায়ু আদি দেবতারা হচ্ছেন ব্রহ্মাণ্ডের বিভিন্ন লোকে ভগবানের প্রতিনিধি। তেমনই মহারাজ যুধিষ্ঠিরও ছিলেন পৃথিবীর শাসন-কার্যে রত ভগবানের প্রতিনিধি। মহারাজ যুধিষ্ঠির আধুনিক প্রজাতন্ত্রের তমসাচ্ছন্ন রাজনৈতিক নেতাদের মতো ছিলেন না। তিনি ভীষ্মদেব এবং অচ্যুত ভগবানের কাছ থেকে শিক্ষাপ্রাপ্ত হয়েছিলেন, তাই তাঁর সমস্ত বিষয়ে পূর্ণ জ্ঞান ছিল।

আধুনিক যুগের ভোটের দ্বারা নির্বাচিত রাষ্ট্রপ্রধানেরা কাঠের পুতুলের মতো, কেননা তাদের কোন রাজকীয় শক্তি নেই। তারা যদি মহারাজ যুধিষ্ঠিরের মতো আত্মতত্ত্ববেত্তা হয়ও, তবুও তারা তাদের সাংবিধানিক পদের জন্য তাদের সদিচ্ছা অনুসারে কোনকিছু করতে পারে না। তাই পৃথিবীর সমস্ত রাষ্ট্রগুলি তাদের আদর্শের পার্থক্যের জন্য অথবা অন্যান্য স্বার্থপর উদ্দেশ্যের জন্য পরস্পরের সঙ্গে বিবদমান। কিন্তু মহারাজ যুধিষ্ঠিরের মতো একজন রাজার নিজস্ব কোন বিচার-ধারা ছিল না। তিনি কেবল অচ্যুত ভগবান এবং ভগবানের আদর্শ প্রতিনিধি ভীষ্মদেবের উপদেশ পালন করতেন। শাস্ত্রে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে কোনরকম ব্যক্তিগত উদ্দেশ্য এবং নিজের মনগড়া মতবাদের দ্বারা প্রভাবিত না হয়ে মহাজন এবং অচ্যুত ভগবানের অনুসরণ করা উচিত। তাই মহারাজ যুধিষ্ঠিরের পক্ষে সমগ্র পৃথিবী শাসন করা সম্ভব ছিল, কেননা যে নীতি তিনি অনুসরণ করছিলেন তা ছিল অভ্রান্ত এবং বিশ্বের সকলের প্রতি প্রযোজ্য। সারা পৃথিবী জুড়ে একটি রাষ্ট্রের ধারণা কেবল তখনই

সফল হতে পারে যখন আমরা অভ্রান্ত মহাজনদের অনুগমন করি। একজন ত্রুটি-বিচ্যুতিপূর্ণ মানুষ কখনও এমন কোন মতবাদ সৃষ্টি করতে পারে না যা সকলের পক্ষে গ্রহণীয়। কেবল একজন পূর্ণ এবং অচ্যুত পুরুষই এমন কার্যক্রম তৈরী করতে পারেন যা পৃথিবীর প্রতিটি স্থানে প্রযোজ্য এবং সকলেই যা পালন করতে পারে। নির্বিশেষ সরকার কখনও শাসন করে না, শাসন যে করে সে একজন ব্যক্তি। সেই ব্যক্তিটি যদি আদর্শ এবং অভ্রান্ত হয়, তা হলে সরকার আদর্শ হবে। সেই ব্যক্তিটি যদি মূর্খ হয়, তা হলে সরকার হবে একটি মূর্খের স্বর্গ। সেটিই হচ্ছে প্রকৃতির নিয়ম। অযোগ্য রাজা এবং প্রশাসকদের সম্বন্ধে অনেক কাহিনী রয়েছে। তাই রাষ্ট্রপ্রধানকে মহারাজ যুধিষ্ঠিরের মতো আদর্শ শিক্ষায় শিক্ষিত হওয়া উচিত, এবং সারা পৃথিবী শাসন করার পূর্ণ ক্ষমতা তার থাকা উচিত। মহারাজ যুধিষ্ঠিরের মতো আদর্শ রাজার অধীনেই কেবল সারা পৃথিবী জুড়ে একটি রাষ্ট্রের ধারণা বাস্তবে রূপায়িত হতে পারে। তখনকার দিনে সারা পৃথিবী সুখী ছিল, কেননা তখন মহারাজ যুধিষ্ঠিরের মতো রাজা সারা পৃথিবী শাসন করতেন।

শ্লোক ৪

কামং ববর্ষ পর্জন্যঃ সর্বকামদুঘা মহী।
সিষিচুঃ স্ম ব্রজান্ গাবঃ পয়সোধস্বতীর্মুদা ॥ ৪ ॥

কামম্—প্রয়োজনীয় বস্তুসমূহ; **ববর্ষ**—বর্ষিত হয়েছিল; **পর্জন্যঃ**—বৃষ্টি; **সর্ব**—সব কিছু; **কাম-দুঘা**—অভীষ্ট প্রদায়িনী; **মহী**—পৃথিবী; **সিষিচুঃ স্ম**—সিক্ত হয়েছিল; **ব্রজান্**—গো-চারণ ভূমি; **গাবঃ**—গাভী; **পয়সা উধস্বতীঃ**—স্ফীত স্তন থেকে; **মুদা**—আনন্দিত হওয়ার ফলে।

অনুবাদ

মহারাজ যুধিষ্ঠিরের রাজত্বকালে মেঘরাজি মানুষের প্রয়োজন মতো যথেষ্ট বারিবর্ষণ করত, এবং পৃথিবী মানুষের সমস্ত প্রয়োজনই পর্যাপ্তভাবে পূর্ণ করত। দুগ্ধবতী প্রফুল্লমনা গাভীদের স্ফীত স্তন থেকে ক্ষরিত দুগ্ধে গোচারণভূমি সিক্ত হত।

তাৎপর্য

অর্থনৈতিক বিকাশের মৌলিক নীতি ভূমি এবং গাভীর উপর কেন্দ্রীভূত। মানব সমাজের আবশ্যকতাগুলি হচ্ছে খাদ্যশস্য, ফল, দুধ, খনিজ পদার্থ, বস্ত্র, কাঠ ইত্যাদি।

শরীরের জড় আবশ্যকতাগুলি পূর্তির জন্য এই সমস্ত বস্তুর প্রয়োজন। মানুষের অবশ্যই মাছ-মাংস অথবা লৌহ যন্ত্রপাতির আবশ্যকতা নেই। মহারাজ যুধিষ্ঠিরের রাজত্বকালে পৃথিবীর সর্বত্র নিয়মিভাবে বৃষ্টি হত। বৃষ্টিবাদল মানুষ নিয়ন্ত্রণ করতে পারে না। স্বর্গের রাজা ইন্দ্র বৃষ্টি নিয়ন্ত্রণ করেন, এবং তিনি হচ্ছেন ভগবানের একজন সেবক। রাজা এবং রাজার অধীনস্থ প্রজারা যখন ভগবানের অনুগামী হন, তখন আকাশ থেকে নিয়মিতভাবে বৃষ্টি হয় এবং সেই বৃষ্টির ফলে জমিতে নানারকম খাদ্যদ্রব্য উৎপন্ন হয়। নিয়মিতভাবে বৃষ্টি কেবল শস্য এবং ফলই যথেষ্ট পরিমাণে উৎপাদনে সাহায্য করে না, যখন নক্ষত্রের প্রভাবের সঙ্গে তা যুক্ত হয় তখন মূল্যবান মণিরত্ন এবং মুক্তার সৃষ্টি হয়। শস্য এবং শাকসবজি মানুষ ও গৃহপালিত পশুদের যথেষ্ট পরিমাণে পুষ্টি সাধন করতে পারে, এবং সুস্থ গাভী প্রচুর পরিমাণে দুধ দিতে পারে যা মানুষকে যথেষ্ট পরিমাণে বল ও জীবনীশক্তি দান করতে পারে। যথেষ্ট দুধ, যথেষ্ট শস্য, যথেষ্ট ফল, যথেষ্ট তুলা, যথেষ্ট রেশম এবং যথেষ্ট পরিমাণে রত্ন যদি থাকে, তাহলে মানুষের আর চলচ্চিত্র, বেশ্যালয়, কসাইখানা ইত্যাদির কি প্রয়োজন? তখন চলচ্চিত্র, গাড়ি, বেতার, মাংস, হোটেল, ইত্যাদির কৃত্রিম বিলাসময় জীবনেরই বা কি প্রয়োজন? এই সভ্যতা কি মানুষের সঙ্গে মানুষের এবং রাষ্ট্রের সঙ্গে রাষ্ট্রের বিবাদ ব্যতীত আর কিছু দিতে পেরেছে? কোন এক বিশেষ ব্যক্তির খামখেয়ালির বশে হাজার হাজার মানুষকে নারকীয় কলকারখানায় এবং যুদ্ধক্ষেত্রে পাঠিয়ে এই সভ্যতা কি সমতা এবং ভ্রাতৃত্ব স্থাপন করতে পেরেছে?

এখানে বলা হয়েছে যে গাভীরা তাদের দুধের দ্বারা গোচারণ-ভূমি সিক্ত করত, কেননা তাদের স্তন ছিল দুধে পূর্ণ এবং তারা ছিল আনন্দিত। গোচারণ-ভূমিতে পর্যাপ্ত পরিমাণে ঘাস খাইয়ে প্রসন্ন জীবন-যাপনের জন্য উপযুক্ত সংরক্ষণের আবশ্যকতা কি তাদের নেই? তাহলে মানুষ কেন নিজেদের স্বার্থের জন্য তাদের হত্যা করে? মানুষ কেন শস্য, ফল, এবং দুধ নিয়ে সন্তুষ্ট থাকে না, যা দিয়ে হাজার রকমের সুস্বাদু খাবার তৈরী করা যায়। অসহায় পশুদের হত্যা করার জন্য সারা পৃথিবী জুড়ে কেন কসাইখানা খোলা হয়েছে? মহারাজ যুধিষ্ঠিরের পৌত্র মহারাজ পরীক্ষিৎ যখন তাঁর বিশাল রাজ্য পরিভ্রমণ করছিলেন, তখন তিনি দেখেছিলেন যে একজন কৃষ্ণাঙ্গ ব্যক্তি একটি গাভীকে হত্যা করতে উদ্যত হয়েছে। রাজা তৎক্ষণাৎ সেই কসাইকে বন্দী করে তাকে যথাযথভাবে দণ্ড দিয়েছিলেন। আত্মরক্ষায় অসমর্থ অসহায় পশুদের জীবন রক্ষা করা কি রাজা অথবা রাষ্ট্রপ্রধানদের কর্তব্য নয়? এটি কি মানবিকতা? পশুরাও কি দেশের প্রজা নয়? তাহলে কেন সংগঠিত কসাইখানায় তাদের হত্যা করার অনুমতি দেওয়া হচ্ছে? এগুলি কি সমতা, ভ্রাতৃত্ব এবং অহিংসার লক্ষণ?

তাই আধুনিক, প্রগতিশীল, সভ্য সরকারের তুলনায় মহারাজ যুধিষ্ঠিরের মতো রাজার রাজতন্ত্র অনেক শ্রেষ্ঠ। তথাকথিত যে গণতন্ত্রে নিরীহ পশুদের হত্যা করা হয়, এবং পশুর থেকেও অধম মানুষেরা ভোট দিয়ে আরেকটি পশুর থেকে ইতর মানুষকে তাদের নেতারূপে নির্বাচন করে, তার তুলনায় আদর্শ রাজার দ্বারা পরিচালিত রাজতন্ত্র অনেক শ্রেষ্ঠ।

আমরা সকলেই জড়াপ্রকৃতির জীব। *শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায়* ভগবান নিজেই বলেছেন যে তিনি হচ্ছেন বীজ প্রদানকারী পিতা এবং জড়াপ্রকৃতি হচ্ছে সমস্ত আকৃতির সমস্ত জীবের মাতা। তাই মাতৃরূপিণী জড়াপ্রকৃতি সর্বশক্তিমান পরম পিতা শ্রীকৃষ্ণের কৃপায় পশু এবং মানুষ উভয়েরই জন্য যথেষ্ট পরিমাণে খাদ্য দিয়েছেন। মানুষ হচ্ছে অন্য সমস্ত প্রাণীদের জ্যেষ্ঠভ্রাতা। প্রকৃতির মার্গ এবং পরম পিতার ইঙ্গিত বোঝার জন্য তাকে পশুদের থেকে উন্নততর বুদ্ধি প্রদান করা হয়েছে। কেবলমাত্র কৃত্রিম বিলাসিতা এবং ইন্দ্রিয় তর্পণের উদ্দেশ্যে কৃত্রিমভাবে অর্থনৈতিক বিকাশের চেষ্টার মাধ্যমে পৃথিবীকে মিথ্যা লোভ আর ক্ষমতার বিশৃঙ্খলায় না ফেলে জড়াপ্রকৃতির উৎপাদনের উপরেই মানব সভ্যতার নির্ভর করা উচিত।

শ্লোক ৫

নদ্যঃ সমুদ্রা গিরয়ঃ সবনস্পতিবীরুধঃ।
ফলন্ত্যোষধয়ঃ সর্বাঃ কামমন্বৃতু তস্য বৈ ॥ ৫ ॥

নদ্যঃ—নদীসমূহ; **সমুদ্রাঃ**—সাগরসমূহ; **গিরয়ঃ**—পাহাড় এবং পর্বত; **সবনস্পতি**—বৃক্ষ সমন্বিত; **বীরুধঃ**—লতাদি; **ফলন্তি**—ফল প্রদান করত; **ওষধয়ঃ**—ওষধি; **সর্বাঃ**—সমস্ত; **কামম্**—প্রয়োজনাদি; **অন্বৃতু**—ঋতু অনুসারে; **তস্য**—মহারাজ যুধিষ্ঠিরের; **বৈ**—অবশ্যই।

অনুবাদ

নদী, সাগর, বৃক্ষ ও লতা সমন্বিত পর্বতসমূহ, শস্য, ওষধি যুধিষ্ঠির মহারাজের রাজ্যে প্রতি ঋতুতে প্রচুর পরিমাণে ফল প্রদান করত।

তাৎপর্য

যেহেতু মহারাজ যুধিষ্ঠির অজিত ভগবানের সংরক্ষণে ছিলেন, যা পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে, তাই নদী, সমুদ্র, পর্বত, অরণ্য, ইত্যাদি ভগবানের সমস্ত সম্পত্তি

প্রসন্ন ছিল, এবং তারা রাজাকে করস্বরূপ তাদের নিজেদের বরাদ্দ সরবরাহ করত। সাফল্য লাভের রহস্য হচ্ছে পরমেশ্বর ভগবানের শরণ গ্রহণ করা। তাঁর অনুমোদন ব্যতীত কোনকিছুই সম্ভব নয়। যন্ত্রপাতি এবং কলকব্জার দ্বারা আমাদের নিজেদের চেষ্টায় অর্থনৈতিক উন্নতি সাধন সম্ভব নয়। সেজন্য পরমেশ্বর ভগবানের অনুমোদন প্রয়োজন, তা না হলে সমস্ত যান্ত্রিক ব্যবস্থা সত্ত্বেও সবকিছু ব্যর্থ হবে। সাফল্যের চরম কারণ হচ্ছে দৈব বা পরমেশ্বর ভগবান। মহারাজ যুধিষ্ঠিরের মতো রাজারা ভালভাবেই জানতেন যে রাজা হচ্ছেন জনসাধারণের কল্যাণের তত্ত্বাবধায়ক ভগবানের প্রতিনিধি। প্রকৃতপক্ষে রাজ্য হচ্ছে পরমেশ্বর ভগবানের সম্পত্তি। নদী, সমুদ্র, অরণ্য, পর্বত, ওষধি ইত্যাদি মানুষের সৃষ্টি নয়। সে সবই ভগবানের সৃষ্টি এবং ভগবানের সেবার জন্য সেগুলি ব্যবহার করার অনুমতি জীবকে দেওয়া হয়েছে। আজকের শ্লোগান বা ধ্বনি হচ্ছে যে সবকিছুই জনগণের, এবং তাই সরকার হচ্ছে জনগণের দ্বারা নির্বাচিত জনগণের জন্য। কিন্তু এই সময়ে ভগবৎ-চেতনা এবং মানব জীবনের পূর্ণতার ভিত্তিতে ভগবৎ-কেন্দ্রিক সাম্যবাদের আদর্শে নতুন ধরনের মানবতা সৃষ্টি করতে হলে পৃথিবীকে পুনরায় মহারাজ যুধিষ্ঠির অথবা পরীক্ষিতের মতো রাজাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করতে হবে। ভগবানের ইচ্ছায় সবকিছুই প্রচুর পরিমাণে রয়েছে, এবং মানুষের সঙ্গে অথবা পশুর সঙ্গে অথবা প্রকৃতির সঙ্গে শত্রুতার সৃষ্টি না করে আমরা সেগুলির যথাযথ সদ্ব্যবহার করে সুখে জীবন যাপন করতে পারি। ভগবানের নিয়ন্ত্রণ সর্বত্রই রয়েছে, এবং ভগবান যদি প্রসন্ন হন, তা হলে প্রকৃতির প্রতিটি প্রান্ত প্রসন্ন হবে। তখন স্থলভাগকে উর্বর করার জন্য প্রচুর জলরাশি নিয়ে নদী প্রবাহিত হবে; সমুদ্র যথেষ্ট পরিমাণে মণিমুক্তা এবং খনিজ সরবরাহ করবে; অরণ্য যথেষ্ট পরিমাণে কাষ্ঠ, ওষধি এবং শাক-সবজি সরবরাহ করবে, এবং ঋতুর পরিবর্তনের ফলে অপর্যাপ্ত পরিমাণে ফল এবং ফুল উৎপন্ন হবে। কলকারখানা এবং যন্ত্রপাতির উপর নির্ভর করে যে কৃত্রিম জীবন-যাপনের পন্থা, তার ফলে লক্ষ লক্ষ ব্যক্তির কঠোর পরিশ্রমে কেবল কয়েকজন মাত্র মানুষ তথাকথিত সুখ ভোগ করতে পারে। যেহেতু জনসাধারণের শক্তি কলকারখানায় উৎপাদনে নিযুক্ত হয়েছে, তাই প্রাকৃতিক উৎপাদন ব্যাহত হচ্ছে এবং তার ফলে জনসাধারণ অসুখী। যথাযথভাবে শিক্ষালাভ না করার ফলে জনসাধারণ স্বার্থান্বেষীদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে প্রকৃতির সম্ভার শোষণ করছে, এবং তার ফলে মানুষের সঙ্গে মানুষের এবং রাষ্ট্রের সঙ্গে রাষ্ট্রের তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা হচ্ছে। সেক্ষেত্রে ভগবানের প্রশিক্ষিত প্রতিনিধির কোন নিয়ন্ত্রণ নেই। এখানে আমাদের তুলনামূলকভাবে আধুনিক সভ্যতার দোষগুলি বিচার করতে হবে, এবং মানুষদের শুদ্ধ করার জন্য ও কালের অসঙ্গতি দূর করার জন্য মহারাজ যুধিষ্ঠিরের পদাঙ্ক অনুসরণ করতে হবে।

শ্লোক ৬

নাধয়ো ব্যাধয়ঃ ক্লেশা দৈবভূতাত্মহেতবঃ ।
অজাতশত্রাবভবন্ জন্তূনাং রাজ্ঞি কর্হিচিৎ ॥ ৬ ॥

ন—না; আধয়ঃ—উৎকণ্ঠা; ব্যাধয়ঃ—ব্যাধি; ক্লেশাঃ—অত্যধিক শীত ও উষ্ণতা-জনিত কষ্ট; দৈব-ভূত-আত্ম—দেহ, দৈব এবং অন্যান্য জীব; হেতবঃ—জনিত; অজাত-শত্রৌ—যার কোন শত্রু নেই; অভবন্—হয়েছিল; জন্তূনাম্—জীবদের; রাজ্ঞি—রাজাকে; কর্হিচিৎ—কখনো।

অনুবাদ

অজাতশত্রু যুধিষ্ঠিরের রাজত্বকালে কখনো কোন প্রাণীদের আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক এবং আধিদৈবিক ক্লেশ, কোনরকম মনঃকষ্ট, রোগ- যন্ত্রণা এবং শীতোষ্ণাদিজনিত কষ্ট ছিল না।

তাৎপর্য

মানুষের প্রতি অহিংসক এবং নিরীহ পশুদের সংহারক ও শত্রু হওয়ার দর্শন হচ্ছে শয়তানের দর্শন। এই যুগে নিরীহ পশুদের প্রতি শত্রুতা করা হচ্ছে, এবং তাই নিরীহ প্রাণীরা সর্বদাই শঙ্কিত। নিরীহ পশুদের প্রতিক্রিয়া মানব সমাজের উপর সঞ্চারিত হচ্ছে। তার ফলে ব্যক্তিগতভাবে মানুষদের মধ্যে এবং সমষ্টিগতভাবে রাষ্ট্রের মধ্যে ঠাণ্ডা অথবা উষ্ণ লড়াইয়ের তাপ সর্বদা অনুভূত হচ্ছে। মহারাজ যুধিষ্ঠিরের সময় বিভিন্ন অধীন রাজা ছিল, কিন্তু পৃথক পৃথক রাষ্ট্র ছিল না। সারা পৃথিবী ঐক্যবদ্ধ ছিল এবং যুধিষ্ঠিরের মতো একজন প্রশিক্ষিত রাজা সর্বোচ্চ নেতা হওয়ার ফলে সমস্ত প্রজারা উৎকণ্ঠা, রোগ, অত্যধিক গরম এবং ঠাণ্ডা আবহাওয়া থেকে মুক্ত ছিল। তারা কেবল অর্থনৈতিক দিক দিয়েই সচ্ছল ছিল না, তারা দৈহিক দিক দিয়েও সুস্থ ছিল এবং দৈবশক্তি, অন্যান্য জীবদের শত্রুতা এবং দেহ ও মনের কষ্ট থেকে মুক্ত ছিল। বাংলায় একটি প্রবাদ রয়েছে যে, *রাজার দোষে রাজ্য নষ্ট, গৃহ নষ্ট গৃহিণীর দোষে* । সেই সত্যটি এখানেও প্রযোজ্য। যেহেতু রাজা ছিলেন পুণ্যবান এবং ভগবান ও ঋষিদের বাধ্য, যেহেতু তিনি কারও প্রতি বৈরীভাবাপন্ন ছিলেন না, এবং যেহেতু তিনি ছিলেন ভগবানের একজন আদর্শ প্রতিনিধি, তাই ভগবান তাঁকে রক্ষা করতেন, এবং তাঁর অধীনস্থ সমস্ত প্রজারা প্রত্যক্ষভাবে ভগবান এবং তাঁর প্রতিনিধিদের দ্বারা সুরক্ষিত ছিলেন। পুণ্যবান না

হলে এবং ভগবানের স্বীকৃতি লাভ না করলে কেউই তাঁর অধীনস্থ ব্যক্তিদের সুখী করতে পারে না। যখন মানুষ এবং ভগবানের মধ্যে ও মানুষ এবং প্রকৃতির মধ্যে পূর্ণ সহযোগিতা হয়, তখন সেই সহযোগিতার ফলে পৃথিবীতে সুখ, শান্তি ও সমৃদ্ধির উদয় হয়, যা যুধিষ্ঠির মহারাজের রাজত্বকালে দেখা গিয়েছিল। পরস্পরকে শোষণ করার প্রবৃত্তি, যা এখনকার রীতি হয়ে দাঁড়িয়েছে, তা কেবল দুঃখকষ্টই নিয়ে আসবে।

শ্লোক ৭

উষিত্বা হাস্তিনপুরে মাসান্ কতিপয়ান্ হরিঃ ।
সুহৃদাঞ্চ বিশোকায় স্বসুশ্চ প্রিয়কাম্যয়া ॥ ৭ ॥

উষিত্বা—বাস করে; **হাস্তিনপুরে**—হস্তিনাপুর নগরীতে; **মাসান্ কতিপয়ান্**—কয়েক মাস; **হরিঃ**—ভগবান শ্রীকৃষ্ণ; **সুহৃদাম্**—আত্মীয়-স্বজনদের; **চ**—ও; **বিশোকায়**—শোক অপনোদনের জন্য; **স্বসুঃ**—ভগিনী; **চ**—এবং; **প্রিয়-কাম্যয়া**—প্রীতি কামনায়।

অনুবাদ

পাণ্ডবদের শোক অপনোদনের জন্য এবং ভগিনী সুভদ্রার প্রীতি কামনায় শ্রীহরি, পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ কয়েক মাস হস্তিনাপুরে অবস্থান করেছিলেন।

তাৎপর্য

কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের শেষে যুধিষ্ঠির মহারাজকে রাজসিংহাসনে অধিষ্ঠিত করার পর শ্রীকৃষ্ণ তাঁর রাজ্য দ্বারকার উদ্দেশ্যে প্রস্থান করছিলেন, কিন্তু মহারাজ যুধিষ্ঠিরের অনুরোধে এবং ভীষ্মদেবের প্রতি বিশেষ কৃপা প্রদর্শন করার জন্য তিনি পাণ্ডবদের রাজধানী হস্তিনাপুরে অবস্থান করেছিলেন। বিশেষ করে শোকসন্তপ্ত রাজাকে সান্ত্বনা দেওয়ার জন্য এবং তাঁর ভগিনী সুভদ্রাকে প্রসন্ন করার জন্য ভগবান সেখানে থাকতে মনস্থ করেছিলেন। সুভদ্রাকে বিশেষ করে সান্ত্বনা দেওয়ার প্রয়োজন ছিল, কেননা তিনি তাঁর একমাত্র পুত্র সদ্য বিবাহিত অভিমন্যুকে হারিয়েছিলেন। সেই বালক তাঁর পত্নী, মহারাজ পরীক্ষিতের মাতা উত্তরাকে রেখে গিয়েছিল। ভগবান সর্বদাই যেভাবেই হোক না, কেন তাঁর ভক্তকে সন্তুষ্ট করে আনন্দ উপভোগ করেন। তাঁর ভক্তরাই কেবল তাঁর আত্মীয়ের ভূমিকা অবলম্বন করতে পারেন। ভগবান হচ্ছেন পরম তত্ত্ব।

শ্লোক ৮

আমন্ত্র্য চাভ্যনুজ্ঞাতঃ পরিষজ্যাভিবাদ্য তম্ ।
আরুরোহ রথং কৈশ্চিৎ পরিষক্তোঽভিবাদিতঃ ॥ ৮ ॥

আমন্ত্র্য—অনুমতি গ্রহণ করে; **চ**—এবং; **অভ্যনুজ্ঞাতঃ**—অনুজ্ঞাপ্রাপ্ত হয়ে; **পরিষজ্য**—আলিঙ্গন করে; **অভিবাদ্য**—অভিবাদন করে; **তম্**—মহারাজ যুধিষ্ঠিরকে; **আরুরোহ**—আরোহণ করেছিলেন; **রথম্**—রথে; **কৈশ্চিৎ**—কারো দ্বারা; **পরিষক্তঃ**—আলিঙ্গনাবদ্ধ হয়ে; **অভিবাদিতঃ**—অভিবাদিত হয়ে।

অনুবাদ

পরে, পরমেশ্বর ভগবান যাত্রার অনুমতি চাইলেন এবং মহারাজ অনুমতি দিলেন, তখন পরমেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ মহারাজ যুধিষ্ঠিরের চরণে প্রণত হয়ে শ্রদ্ধা নিবেদন করলেন এবং মহারাজ তাঁকে আলিঙ্গনাবদ্ধ করলেন। তারপর পরমেশ্বর অন্যান্য সকলেরও আলিঙ্গনাবদ্ধ হয়ে এবং তাদের অভিবাদন গ্রহণ করে তাঁর রথে আরোহণ করলেন।

তাৎপর্য

মহারাজ যুধিষ্ঠির ছিলেন শ্রীকৃষ্ণের জ্যেষ্ঠ জ্ঞাতি (পিসতুতো) ভ্রাতা এবং তাই তাঁর থেকে বিদায় নেওয়ার সময় তিনি রাজার পায়ে প্রণত হয়েছিলেন। রাজা তাঁকে কনিষ্ঠ ভ্রাতার মতো আলিঙ্গন করেছিলেন, যদিও তিনি পূর্ণরূপে অবগত ছিলেন যে শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন পরমেশ্বর ভগবান। ভক্ত যখন প্রেমের বশে ভগবানকে তাঁর থেকে ছোট বলে মনে করেন, তখন ভগবান অত্যন্ত প্রসন্ন হন। কেউই ভগবানের সমকক্ষ অথবা তাঁর থেকে মহৎ নন, কিন্তু তাঁর ভক্ত যখন তাঁর প্রতি গুরুজনের মতো আচরণ করে তখন তিনি আনন্দিত হন। এ সবই ভগবানের অপ্রাকৃত লীলা-বিলাস। নির্বিশেষবাদীরা কখনো ভগবদ্ভক্তের মতো এই প্রকার অলৌকিক ভূমিকা অবলম্বন করতে পারে না। তারপর ভীম এবং অর্জুন ভগবানকে আলিঙ্গন করেছিলেন, কেননা তাঁরা ছিলেন তাঁর সমবয়সী। কিন্তু নকুল এবং সহদেব ভগবানের সম্মুখে প্রণত হয়েছিলেন, কেননা তাঁরা ছিলেন তাঁর কনিষ্ঠ।

শ্লোক ৯-১০

সুভদ্রা দ্রৌপদী কুন্তী বিরাটতনয়া তথা ।
গান্ধারী ধৃতরাষ্ট্রশ্চ যুযুৎসুর্গৌতমো যমৌ ॥ ৯ ॥
বৃকোদরশ্চ ধৌম্যশ্চ স্ত্রিয়ো মৎস্যসুতাদয়ঃ ।
ন সেহিরে বিমুহ্যন্তো বিরহং শার্ঙ্গধন্বনঃ ॥ ১০ ॥

সুভদ্রা—শ্রীকৃষ্ণের ভগিনী; **দ্রৌপদী**—পাণ্ডবদের পত্নী; **কুন্তী**—পাণ্ডবদের মাতা; **বিরাট-তনয়া**—বিরাট রাজার কন্যা উত্তরা; **তথা**—ও; **গান্ধারী**—দুর্যোধনের মাতা; **ধৃতরাষ্ট্র**—দুর্যোধনের পিতা, **চ**—এবং, **যুযুৎসুঃ**—ধৃতরাষ্ট্রের বৈশ্য-পত্নীর পুত্র; **গৌতমঃ**—কৃপাচার্য; **যমৌ**—যমজভ্রাতা নকুল এবং সহদেব; **বৃকোদরঃ**—ভীম; **চ**—এবং; **ধৌম্যঃ**—ঋষি ধৌম্য; **চ**—এবং; **স্ত্রিয়ঃ**—প্রাসাদের অন্য মহিলারা; **মৎস্য-সুতা-আদয়ঃ**—ধীবর কন্যা (ভীষ্মদেবের বিমাতা সত্যবতী); **ন**—পারল না; **সেহিরে** —সহ্য করতে; **বিমুহ্যন্তঃ**—মুহ্যমান হয়ে; **বিরহম্**—বিরহে; **শার্ঙ্গ-ধন্বনঃ**—শ্রীকৃষ্ণের, যিনি তাঁর হস্তে শার্ঙ্গধনু ধারণ করেন।

অনুবাদ

তখন সুভদ্রা, দ্রৌপদী, কুন্তী, উত্তরা, গান্ধারী, ধৃতরাষ্ট্র, যুযুৎসু, কৃপাচার্য, নকুল সহদেব, ভীমসেন, ধৌম্য, এবং সত্যবতী সকলেই শার্ঙ্গধর পরমেশ্বর শ্রীকৃষ্ণের বিরহ সহ্য করতে না পেরে শোকে মুহ্যমান হয়ে পড়েন।

তাৎপর্য

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ জীবেদের কাছে, বিশেষ করে তাঁর ভক্তদের কাছে এতই আকর্ষণীয় যে তাঁদের পক্ষে তাঁর বিরহ সহ্য করা অসহনীয় হয়ে ওঠে। মায়ার প্রভাবে বদ্ধজীবেরা ভগবানকে ভুলে যায়, তা না হলে তাদের পক্ষে তাঁর বিরহ সহ্য করা সম্ভব নয়। এই বিরহের অনুভূতি বর্ণনা করা যায় না, কিন্তু ভক্তরাই কেবল তা অনুভব করতে পারেন। বৃন্দাবন এবং সেখানকার সরল গ্রাম্য গোপবালক, বালিকা, মহিলা এবং অন্যান্য সকলে তাঁর বিরহে সারা জীবন গভীর বেদনা অনুভব করেছিলেন, এবং শ্রীকৃষ্ণের সবচাইতে প্রিয়তমা শ্রীমতী রাধারাণীর বিরহ-বেদনা বর্ণনার অতীত। একবার সূর্যগ্রহণের সময় কুরুক্ষেত্রে তাঁদের মিলন হয়েছিল, এবং তখন তাঁরা যেভাবে তাঁদের হৃদয়ের অনুভূতি ব্যক্ত করেছিলেন তা হৃদয়বিদারক। ভগবানের চিন্ময় ভক্তদের গুণগত পার্থক্য রয়েছে ঠিকই, কিন্তু

একবার যাঁর সরাসরিভাবে অথবা অন্য কোনভাবে ভগবানের সান্নিধ্য লাভ হয়েছে, তিনি কখনই ক্ষণিকের জন্য তাঁকে ছেড়ে থাকতে পারে না। সেটিই হচ্ছে শুদ্ধ ভক্তের মনোভাব।

শ্লোক ১১-১২

সৎসঙ্গান্মুক্তদুঃসঙ্গো হাতুং নোৎসহতে বুধঃ ।
কীর্ত্যমানং যশো যস্য সকৃদাকর্ণ্য রোচনম্ ॥ ১১ ॥
তস্মিন্ন্যস্তধিয়ঃ পার্থাঃ সহেরন্ বিরহং কথম্ ।
দর্শনস্পর্শসংলাপশয়নাসনভোজনৈঃ ॥ ১২ ॥

সৎ-সঙ্গাৎ—শুদ্ধ ভক্তের সঙ্গ প্রভাবে; **মুক্ত-দুঃসঙ্গঃ**—বিষয়ীদের অসৎ সঙ্গ থেকে মুক্ত; **হাতুম্**—ত্যাগ করে; **ন উৎসহতে**—চেষ্টা করেন না; **বুধঃ**—যিনি ভগবানকে জানতে পেরেছেন; **কীর্ত্যমানম্**—মহিমা কীর্তন করে; **যশঃ**—যশ; **যস্য**—যাঁর; **সকৃৎ**—একবার মাত্র; **আকর্ণ্য**—শুনে; **রোচনম্**—মনোহর; **তস্মিন্**—তাঁকে; **ন্যস্ত-ধিয়ঃ**—যিনি তাঁর মন তাঁকে অর্পণ করেছেন; **পার্থাঃ**—পৃথাপুত্র; **সহেরন্**—সহ্য করতে পারেন; **বিরহম্**—বিরহ; **কথম্**—কিভাবে; **দর্শন**—প্রত্যক্ষভাবে দর্শন করে; **স্পর্শ**—স্পর্শ; **সংলাপ**—বাক্যালাপ; **শয়ন**—শয়ন; **আসন**—উপবেশন; **ভোজনৈঃ**—একত্রে আহার করে।

অনুবাদ

সাধুসঙ্গ প্রভাবে বুদ্ধিমান ব্যক্তিরা একবার মাত্র ভগবানের মহিমা শ্রবণ করে থাকলেও পরমেশ্বর ভগবানকে উপলব্ধি করার ফলে বিষয়ীর অসৎ সঙ্গ ত্যাগ করে ভগবানের মহিমা শ্রবণ করা থেকে মুহূর্তের জন্যও নিরস্ত হতে পারেন না; তাহলে পাণ্ডবেরা, যাঁরা ঘনিষ্ঠভাবে সর্বদা ভগবানের দর্শন, স্পর্শন, আলাপ, শয়ন, অবস্থান ও একত্রে আহার করেছিলেন, কি করে তাঁদের পক্ষে তাঁর বিরহ সহ্য করা সম্ভব?

তাৎপর্য

জীবের স্বরূপগত অবস্থা হচ্ছে বরিষ্ঠের সেবা করা। ইন্দ্রিয়-তৃপ্তির বিভিন্ন স্তরে মোহময়ী জড়া-প্রকৃতির পরিচালনায় তাকে কারো না কারো সেবা করতে বাধ্য হতে হয়। এই ইন্দ্রিয়ের দাসত্বে সে কখনই শ্রান্ত হয় না। সে যদি শ্রান্ত হয়ও, মায়া তাকে নিরন্তর অতৃপ্তভাবে সেবা করতে বাধ্য করে। ইন্দ্রিয়-তৃপ্তির এই প্রয়াসের শেষ হয় না,

এবং বদ্ধ জীব মুক্তির আশা ব্যতিরেকে এইভাবে সেবার বন্ধনে জড়িয়ে পড়ে। মুক্তি তখনই সম্ভব হয় যখন শুদ্ধ ভক্তের সঙ্গ লাভ হয়। এই প্রকার সঙ্গ প্রভাবে ধীরে ধীরে দিব্য চেতনা লাভ হয়। এইভাবে সে জানতে পারে যে তার শাশ্বত বৃত্তি হচ্ছে ভগবানের সেবা করা; কাম, ক্রোধ বা প্রভুত্ব করার বাসনা ইত্যাদির বশবর্তী হয়ে বিকৃত ইন্দ্রিয়ের সেবা করা নয়। জাগতিক সমাজ, বন্ধুত্ব এবং প্রেম এই সবই কামের বিভিন্ন অবস্থা। গৃহ, দেশ, পরিবার, সমাজ, ধন এবং অন্য সমস্ত বস্তু জড় জগতের বন্ধনের কারণ, যেখানে ত্রিতাপ-ক্লেশ অবশ্যম্ভাবীরূপে সহবিদ্যমান। শুদ্ধ ভক্তের সঙ্গ করার ফলে এবং বিনীতভাবে তাঁদের কাছ থেকে শ্রবণ করার ফলে জড় সুখভোগের আসক্তি শিথিল হয়, এবং ভগবানের চিন্ময় কার্যকলাপের কথা শ্রবণ করার স্পৃহা বর্ধিত হয়। একবার এই আকর্ষণ উৎপন্ন হলে অবিরতভাবে তা বর্ধিত হতে থাকে, ঠিক বারুদে অগ্নি সংযোগের মতো। কথিত হয়, পরমেশ্বর ভগবান শ্রীহরি এতই আকর্ষণীয় যে আত্ম-উপলব্ধির ফলে যাঁরা আত্মারাম হয়েছেন এবং যাঁরা প্রকৃতপক্ষে সমস্ত জড়-বন্ধন থেকে মুক্ত, তাঁরাও ভগবানের ভক্তে পরিণত হন। এইভাবে সহজেই বোঝা যায় ভগবানের নিত্য সহচর পাণ্ডবদের স্থিতি কিরকম ছিল। নিরন্তর ভগবানের ব্যক্তিগত সংস্পর্শের ফলে ভগবানের প্রতি তাঁদের আকর্ষণ এতই গভীর ছিল যে তাঁরা ভগবানের বিচ্ছেদের কথা কল্পনা পর্যন্ত করতে পারতেন না। শুদ্ধ ভক্তের কাছে ভগবানের রূপ, গুণ, নাম, যশ, কার্যকলাপ আদি স্মরণ এতই আকর্ষণীয় যে তিনি জড় জগতের সমস্ত রূপ, গুণ, নাম, যশ, কার্যকলাপের কথা সম্পূর্ণরূপে ভুলে যান, এবং শুদ্ধ ভক্তের পরিণত সঙ্গ প্রভাবে তিনি এক মুহূর্তের জন্যও ভগবানের সঙ্গচ্যুত হন না।

শ্লোক ১৩

সর্বে তেঽনিমিষৈরক্ষৈস্তমনুদ্রুতচেতসঃ।
বীক্ষন্তঃ স্নেহসংবদ্ধা বিচেলুস্তত্র তত্র হ ॥ ১৩ ॥

সর্বে—সকলে; **তে**—তারা; **অনিমিষৈঃ**—পলকহীন; **অক্ষৈঃ**—নেত্রে; **তম্ অনু**—তাঁর জন্য; **দ্রুত-চেতসঃ**—বিগলিত হৃদয়; **বীক্ষন্তঃ**—দর্শন করে; **স্নেহ-সম্বদ্ধাঃ**—শুদ্ধ স্নেহের বন্ধনে আবদ্ধ; **বিচেলুঃ**—গমন করতে লাগলেন; **তত্র তত্র**—সেই সেই স্থানে; **হ**—যথার্থই।

অনুবাদ

তাঁদের সকলের হৃদয় স্নেহপাশে আবদ্ধ হয়ে বিগলিত হচ্ছিল। তাঁরা অপলক নেত্রে শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করছিলেন, এবং হতবুদ্ধি হয়ে ইতস্তত ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন।

তাৎপর্য

শ্রীকৃষ্ণ স্বাভাবিকভাবেই সমস্ত জীবের পক্ষে আকর্ষণীয়, কেননা তিনি সমস্ত নিত্য বস্তুর মধ্যে পরম নিত্য। একমাত্র তিনিই সমস্ত নিত্যদের পালনকর্তা। সে কথা *কঠোপনিষদে* উল্লেখ করা হয়েছে। এইভাবে ভগবানের মায়ার প্রভাবে তাঁর সঙ্গে শাশ্বত সম্পর্কের কথা ভুলে গেছে যে জীব সে পুনরায় নিত্য সম্পর্কে যুক্ত হয়ে শাশ্বত শান্তি এবং সমৃদ্ধি লাভ করতে পারে। একবার এই সম্পর্ক যদি অল্পমাত্রায়ও জাগরিত হয়, তা হলে জীব তৎক্ষণাৎ মায়ার বন্ধন থেকে মুক্ত হয় এবং ভগবানের সঙ্গ লাভের জন্য উন্মত্ত হয়ে ওঠে। এই সম্পর্ক কেবল ভগবানের ব্যক্তিগত সঙ্গ প্রভাবেই হয় না, উপরন্তু তাঁর নাম, যশ, রূপ এবং গুণের সঙ্গ প্রভাবেও সম্ভব হয়। *শ্রীমদ্ভাগবত* বদ্ধজীবদের শুদ্ধ ভক্তের কাছে বিনীতভাবে শ্রবণ করার মাধ্যমে এই সিদ্ধ অবস্থা প্রাপ্ত হওয়ার শিক্ষা দেয়।

শ্লোক ১৪

ন্যরুন্ধন্নুদ্‌গলদ্বাষ্পমৌৎকণ্ঠ্যাদ্দেবকীসুতে।
নির্যাত্যগারান্নোঽভদ্রমিতি স্যাদ্বান্ধবস্ত্রিয়ঃ ॥ ১৪ ॥

ন্যরুন্ধন্—বহু কষ্টে সংযত করে; **উদ্‌গলৎ**—প্লাবিত; **বাষ্পম্**—অশ্রু; **ঔৎকণ্ঠ্যাৎ**—অতিশয় উদ্বেগের ফলে; **দেবকী-সুতে**—দেবকীর পুত্রের প্রতি; **নির্যাতি**—নির্গত হলেন; **অগারাৎ**—প্রাসাদ থেকে; **নঃ**—না; **অভদ্রম্**—অমঙ্গল; **ইতি**—এইভাবে; **স্যাৎ**—হতে পারে; **বান্ধব**—আত্মীয়-স্বজন; **স্ত্রিয়ঃ**—স্ত্রীগণ।

অনুবাদ

দেবকীনন্দন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ প্রাসাদ থেকে যখন বেরিয়ে এলেন, তখন অতিশয় উৎকণ্ঠা হেতু আত্মীয় রমণীগণের নয়ন অশ্রুপ্লাবিত হয়েছিল; কিন্তু যাত্রার সময় শ্রীকৃষ্ণের যাতে কোনরকম অমঙ্গল না হয়, সেইজন্য তাঁরা বহু কষ্টে তাঁদের বিগলিত অশ্রু সংবরণ করেছিলেন।

তাৎপর্য

হস্তিনাপুরের রাজপ্রাসাদে শত শত মহিলা ছিলেন. তাঁরা সকলেই ছিলেন শ্রীকৃষ্ণের প্রতি অনুরক্ত। তাঁরা সকলে তাঁর আত্মীয়ও ছিলেন। তাঁরা যখন দেখলেন যে শ্রীকৃষ্ণ তাঁর নিজের দেশে ফিরে যাওয়ার জন্য প্রাসাদ ত্যাগ করে চলে যাচ্ছেন, তখন তাঁরা তাঁর জন্য অত্যন্ত শোকাকুল হয়েছিলেন, এবং স্বাভাবিকভাবেই তাঁদের গাল বেয়ে অশ্রু ঝরে পড়ছিল। তাঁরা তখন মনে করেছিলেন যে তাঁদের সেই অশ্রু শ্রীকৃষ্ণের পক্ষে অমঙ্গলসূচক হতে পারে, তাই তাঁরা তাঁদের অশ্রু সংবরণ করার চেষ্টা করেছিলেন। সেই অবিরল অশ্রুধারা সংবরণ করা তাঁদের পক্ষে তখন কঠিন হয়েছিল। তাই তাঁরা তাঁদের চোখের জল মুছেছিলেন এবং তাঁদের হৃদয় দ্রুতবেগে স্পন্দিত হয়েছিল। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে যাঁদের মৃত্যু হয়েছিল, তাঁদের স্ত্রী এবং পুত্রবধূরা সরাসরি শ্রীকৃষ্ণের সান্নিধ্যে আসতে পারেননি, কিন্তু তাঁরা সকলে তাঁর মহান কার্যকলাপের বিষয়ে শুনেছিলেন এবং তার ফলে তাঁরা তাঁর বিষয়ে চিন্তা করতেন, তাঁর নাম, যশ ইত্যাদির কথা বলতেন এবং এইভাবে তাঁরা শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে সম্পর্কযুক্ত ব্যক্তিদেরই মতো তাঁর প্রতি অনুরক্ত হয়েছিলেন। তাই যিনি প্রত্যক্ষভাবে অথবা পরোক্ষভাবে শ্রীকৃষ্ণের কথা চিন্তা করেন, শ্রীকৃষ্ণের কথা বলেন অথবা শ্রীকৃষ্ণের আরাধনা করেন, তিনি তাঁর প্রতি আসক্ত হন। যেহেতু শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন পরম তত্ত্ব, তাই তাঁর নাম, রূপ, গুণ ইত্যাদির মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। শ্রীকৃষ্ণের কথা কীর্তন করার ফলে, শ্রবণ করার ফলে অথবা তাঁকে স্মরণ করার ফলে তাঁর সঙ্গে আমাদের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক পুনরুজ্জীবিত করা যায়। চিন্ময় শক্তির প্রভাবেই তা সম্ভব।

শ্লোক ১৫

মৃদঙ্গশঙ্খভের্যশ্চ বীণাপণবগোমুখাঃ ।
ধুন্ধুর্যানকঘণ্টাদ্যা নেদুর্দুন্দুভয়স্তথা ॥ ১৫ ॥

মৃদঙ্গ—মৃদঙ্গ; **শঙ্খ**—শঙ্খ; **ভের্যঃ**—ভেরী; **চ**—এবং; **বীণা**—বীণা; **পণব**—একপ্রকার বংশী; **গোমুখাঃ**—আরেক প্রকার বংশী; **ধুন্ধুরী**—ঢোল; **আনক**—বড় ঢাক; **ঘণ্টা**—ঘণ্টা; **আদ্যাঃ**—ইত্যাদি; **নেদুঃ**—বাজাতে লাগল; **দুন্দুভয়ঃ**—ছোট ঢাক; **তথা**—তখন।

অনুবাদ

শ্রীকৃষ্ণ যখন হস্তিনাপুর থেকে বিদায় নিচ্ছিলেন, তখন তাঁকে সম্মান প্রদর্শন করার জন্য বিভিন্ন ধরনের ঢাক-ঢোল, মৃদঙ্গ, নাগড়া, ধুন্ধুরী, আনক, দুন্দুভি এবং নানা রকমের বাঁশি, বীণা, গোমুখ ও ভেরী আদি সমস্ত বাদ্যযন্ত্র এক সাথে বাজতে লাগল।

শ্লোক ১৬

প্রাসাদশিখরারূঢ়াঃ কুরুনার্যো দিদৃক্ষয়া ।
ববৃষুঃ কুসুমৈঃ কৃষ্ণং প্রেমব্রীড়াস্মিতেক্ষণাঃ ॥ ১৬ ॥

প্রাসাদ—রাজপ্রাসাদ; শিখর—চূড়া; আরূঢ়া—আরোহণ করে; কুরু-নার্যঃ—কুরুরাজবংশীয় রমণীগণ; দিদৃক্ষয়া—দর্শন করার জন্য; ববৃষুঃ—বর্ষণ করেছিলেন; কুসুমৈঃ—পুষ্পরাজি; কৃষ্ণম্—শ্রীকৃষ্ণের উপর; প্রেম—অনুরাগ; ব্রীড়া-স্মিত-ঈক্ষণ—লজ্জাভরে ঈষৎ হাস্যযুক্ত নয়নে।

অনুবাদ

ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করার বাসনায় কুরুরাজবংশীয় ললনাগণ প্রাসাদ-শীর্ষে আরোহণ করে অনুরাগ ও লজ্জাভরে স্মিতহাস্যযুক্ত নয়নে তাঁকে দর্শন করতে করতে তাঁর উপর পুষ্পবর্ষণ করতে লাগলেন।

তাৎপর্য

লজ্জা স্ত্রীলোকদের পক্ষে একটি বিশেষ চারিত্রিক সৌন্দর্য, এবং তার ফলে তারা পুরুষদের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করে। মহাভারতের সময়ও, অর্থাৎ পাঁচ হাজার বছর পূর্বে সেই প্রথা প্রচলিত ছিল। যে সমস্ত নির্বোধ ব্যক্তি পৃথিবীর ইতিহাসের সঙ্গে পরিচিত নয়, তারাই বলে যে পুরুষদের থেকে স্ত্রীলোকদের পৃথক রাখার প্রথা ভারতে মুসলমানদের আগমনের সময় থেকে প্রচলিত হয়েছে। মহাভারতের এই ঘটনা নিশ্চিতরূপে প্রমাণ করে যে রাজপ্রাসাদের রমণীরা কঠোরভাবে পর্দাপ্রথা (পুরুষের সঙ্গ থেকে দূরে থাকা) অবলম্বন করে চলতেন, এবং উন্মুক্ত স্থানে যেখানে শ্রীকৃষ্ণ এবং অন্য সকলে সমবেত হয়েছিলেন, সেখানে না এসে তাঁরা প্রাসাদের ছাদে গিয়ে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করার জন্য তাঁর উপর পুষ্পবৃষ্টি করেছিলেন। এখানে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে যে, রমণীরা প্রাসাদের ছাদের উপর, দাঁড়িয়ে হাসছিলেন এবং লজ্জিতভাবে সেই হাসি সংবরণ করার চেষ্টা

করছিলেন। এই লজ্জা স্ত্রীলোকদের কাছে প্রকৃতির দান, উচ্চ কুলোদ্ভূত বা সুন্দর না হলেও এই লজ্জা তাদের সৌন্দর্য এবং সম্মান বৃদ্ধি করে থাকে। এই বিষয়ে আমাদের ব্যবহারিক অভিজ্ঞতা রয়েছে। একজন মেথরানী স্ত্রীসুলভ লজ্জার ফলে বহু সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির শ্রদ্ধাভাজন হয়েছেন। রাস্তায় বিচরণশীল অর্ধনগ্ন মহিলারা মানুষের শ্রদ্ধাভাজন হয় না, কিন্তু একজন মেথরের লজ্জাশীলা পত্নী সকলের সম্মান লাভ করে।

ভারতের ঋষিগণ প্রবর্তিত মানব সভ্যতার উদ্দেশ্য হচ্ছে মানুষকে মায়ার বন্ধন থেকে মুক্ত করা। স্ত্রীর জড় দেহের সৌন্দর্য মায়িক, কেননা সেই দেহটি প্রকৃতপক্ষে মাটি, জল, আগুন, বায়ু ইত্যাদি দিয়ে রচিত। কিন্তু যেহেতু জড় পদার্থের সঙ্গে চিৎ-স্ফুলিঙ্গের সংযোগ রয়েছে, তাই তা সুন্দর বলে মনে হয়। মানুষকে আকৃষ্ট করার জন্য একটি মাটির পুতুলকে যত সুন্দরভাবেই তৈরী করা হোক না কেন, তার প্রতি কেউই আকৃষ্ট হয় না। মৃতদেহের কোন সৌন্দর্য নেই, এবং তথাকথিত সুন্দরী রমণীর মৃতদেহও কেউ গ্রহণ করবে না। তা থেকে বোঝা যায় যে চিৎ-স্ফুলিঙ্গটি হচ্ছে সুন্দর, এবং আত্মার এই সৌন্দর্যের জন্যই মানুষ দেহের সৌন্দর্যের প্রতি আকৃষ্ট হয়। তাই বৈদিক জ্ঞান মিথ্যা সৌন্দর্যের প্রতি আকৃষ্ট হতে নিষেধ করে। কিন্তু যেহেতু আমরা অবিদ্যার অন্ধকারে এখন আচ্ছন্ন, তাই বৈদিক সভ্যতা অত্যন্ত কঠোরতার মাধ্যমে স্ত্রী-পুরুষের মধ্যে মেলামেশা অনুমোদন করে। বৈদিক শাস্ত্রে বলা হয়েছে যে স্ত্রী হচ্ছে আগুনের মতো, এবং পুরুষ হচ্ছে মাখনের মতো। আগুনের সান্নিধ্যে এলে মাখন গলতে বাধ্য, এবং তাই যখন প্রয়োজন কেবল তখনই তারা একত্রিত হতে পারে। লজ্জা এই অনিয়ন্ত্রিত মেলামেশা নিবৃত্ত করে। এটি প্রকৃতির একটি দান এবং তার যথার্থ সদ্ব্যবহার করা অবশ্য কর্তব্য।

শ্লোক ১৭

সিতাতপত্রং জগ্রাহ মুক্তাদামবিভূষিতম্ ।
রত্নদণ্ডং গুড়াকেশঃ প্রিয়ঃ প্রিয়তমস্য হ ॥ ১৭ ॥

সিত-আতপত্রম্—শ্বেতছত্র; জগ্রাহ—গ্রহণ করে; মুক্তাদাম—মুক্তাবলী; বিভূষিতম্—বিভূষিত; রত্ন-দণ্ডম্—রত্ন নির্মিত দণ্ডযুক্ত; গুড়াকেশঃ—সুদক্ষ যোদ্ধা বা জিতনিদ্র অর্জুন; প্রিয়ঃ—প্রিয়সখা অর্জুন; প্রিয়তমস্য—প্রিয়তমের; হ—যথাযথভাবে।

অনুবাদ

সেই সময়ে পরমেশ্বর ভগবানের অন্তরঙ্গ সখা মহাযোদ্ধা এবং জিতনিদ্র অর্জুন প্রিয়তম পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের মস্তকে মুক্তামালামণ্ডিত ও রত্ননির্মিত দণ্ডযুক্ত শ্বেতছত্র ধারণ করলেন।

তাৎপর্য

প্রাচুর্যপূর্ণ রাজসিক উৎসবগুলিতে সোনা, রত্ন, মুক্তা এবং মূল্যবান পাথর ব্যবহার করা হত। সে সবই হচ্ছে প্রকৃতির দান, এবং মানুষ যখন প্রয়োজনের নামে অবাঞ্ছিত বস্তু উৎপাদনে তাদের মূল্যবান সময়ের অপচয় করে না, তখন ভগবানের আদেশে পর্বত, সমুদ্র ইত্যাদি সেগুলি উৎপাদন করে। কলকারখানার মাধ্যমে তথাকথিত উন্নতির দ্বারা তারা এখন সোনা, রূপা, পিতল, তামা ইত্যাদি ধাতুর পরিবর্তে কৃত্রিম পদার্থের তৈরী বাসন ব্যবহার করছে। তারা মাখনের পরিবর্তে মার্গারিন ব্যবহার করছে, শহরের এক-চতুর্থাংশ মানুষ আশ্রয়বিহীন হয়ে জীবন যাপন করছে।

শ্লোক ১৮

উদ্ধবঃ সাত্যকিশ্চৈব ব্যজনে পরমাদ্ভুতে।
বিকীর্যমাণঃ কুসুমৈ রেজে মধুপতিঃ পথি ॥ ১৮ ॥

উদ্ধবঃ—শ্রীকৃষ্ণের পিতৃব্য দেবভাগের পুত্র; সাত্যকিঃ—যদুবংশীয় সত্যকের পুত্র এবং তাঁর সারথি; চ—এবং; এব—অবশ্যই; ব্যজনে—চামর ব্যজন করছিলেন; পরম-অদ্ভুতে—অত্যন্ত আশ্চর্যজনক; বিকীর্যমাণঃ—পরিবৃত; কুসুমৈঃ—পুষ্পসমূহ; রেজে—অত্যন্ত সুন্দরভাবে শোভা পেতে লাগলেন; মধু-পতি—মধুপতি শ্রীকৃষ্ণ; পথি—পথে।

অনুবাদ

উদ্ধব ও সাত্যকি অতি চমকপ্রদ চামর দ্বারা পরমেশ্বর ভগবানকে ব্যজন করতে লাগলেন, এবং মধুপতিরূপে পরমেশ্বর ভগবান কুসুমাকীর্ণ আসনে উপবিষ্ট হয়ে পথ চলতে চলতে তাঁদের নির্দেশ দিতে লাগলেন।

শ্লোক ১৯

অশ্রূয়ন্তাশিষঃ সত্যাস্তত্র তত্র দ্বিজেরিতাঃ।
নানুরূপানুরূপাশ্চ নির্গুণস্য গুণাত্মনঃ ॥ ১৯ ॥

অশ্রূয়ন্ত—শোনা যেতে লাগল; **আশিষঃ**—আশীর্বাদ; **সত্যাঃ**—সত্য; **তত্র তত্র**—সর্বত্র; **দ্বিজ-ঈরিতাঃ**—বিদ্বান ব্রাহ্মণগণ কর্তৃক উচ্চারিত; **ন অনুরূপ**—অনুপযুক্ত; **অনুরূপাঃ**—উপযুক্ত; **চ**—ও; **নির্গুণস্য**—নির্গুণ ভগবানের; **গুণ-আত্মনঃ**—নররূপে লীলা অভিনয়কারী।

অনুবাদ

ব্রাহ্মণগণ কর্তৃক উচ্চারিত আশীর্বাদ-ধ্বনি সর্বত্র শোনা যেতে লাগল। ত্রিগুণাতীত পরমানন্দস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণের প্রতি এই প্রকার আশীর্বাদ যদিও অনুপযুক্ত, কিন্তু নররূপে লীলা অভিনয়কারী ভগবানের প্রতি ব্রাহ্মণদের এই আশীর্বাদ উপযুক্তই হয়েছিল।

তাৎপর্য

স্থানে স্থানে পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের উদ্দেশ্যে আশীর্বাদসূচক বৈদিক মন্ত্র উচ্চারিত হচ্ছিল। একদিক দিয়ে এই আশীর্বাদ উপযুক্ত ছিল, কেননা ভগবান মহারাজ যুধিষ্ঠিরের জ্ঞাতিভ্রাতা (মামাতো ভাই) রূপে একজন সাধারণ মানুষের মতো লীলাবিলাস করছিলেন। কিন্তু আরেক দিক দিয়ে সেটি অনুপযুক্ত ছিল, কেননা ভগবান হচ্ছেন পরমেশ্বর এবং কোন রকম জড়জাগতিক সম্পর্কের সঙ্গে তাঁর কোন সম্পর্ক নেই। তিনি নির্গুণ, অর্থাৎ তাঁর মধ্যে কোন জড় গুণ নেই, কিন্তু তিনি চিন্ময় গুণে পূর্ণ। চিজ্জগতে কোন বিরুদ্ধ ভাব নেই, কিন্তু এই আপেক্ষিক জগতে সব কিছুরই বিপরীত ভাব রয়েছে। আপেক্ষিক জগতে সাদা হচ্ছে কালো ধারণার বিপরীত, কিন্তু চিজ্জগতে সাদা এবং কালোর মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। তাই পরম পুরুষের উদ্দেশ্যে বিদ্বান ব্রাহ্মণেরা যে আশীর্বাণী উচ্চারণ করছিলেন তা বিসদৃশ বলে মনে হচ্ছিল, কিন্তু যখন পরম পুরুষের উদ্দেশ্যে তার প্রয়োগ হয় তখন তা সমস্ত বিরোধ থেকে মুক্ত হয়ে চিন্ময়ত্বে পর্যবসিত হয়। একটি উদাহরণের দ্বারা এই ধারণাটি আরও স্পষ্ট করা যায়। কখনো কখনো শ্রীকৃষ্ণকে চোর বলা হয়। তাঁর শুদ্ধ ভক্তদের কাছে তিনি একজন মাখন চোররূপে অত্যন্ত প্রসিদ্ধ। তাঁর বাল্যলীলায় তিনি বৃন্দাবনের প্রতিবেশীদের গৃহ থেকে মাখন চুরি করতেন। তখন থেকে তিনি একজন চোর বলে প্রসিদ্ধ হয়েছিলেন। কিন্তু একজন চোররূপে

প্রসিদ্ধ হওয়া সত্ত্বেও, তিনি সেই চোররূপেই পূজিত হন; কিন্তু জড় জগতে কখনও কোন চোরের প্রশংসা করা হয় না, পক্ষান্তরে তাকে দণ্ড দেওয়া হয়। যেহেতু তিনি হচ্ছেন পরমেশ্বর ভগবান, তাঁর বেলায় সব কিছুই প্রযোজ্য, এবং সমস্ত বিরুদ্ধ ভাব সত্ত্বেও তিনি হচ্ছেন পরমেশ্বর ভগবান।

শ্লোক ২০

অন্যোন্যমাসীৎসংজল্প উত্তমশ্লোকচেতসাম্ ।
কৌরবেন্দ্রপুরস্ত্রীণাং সর্বশ্রুতিমনোহরঃ ॥ ২০ ॥

অন্যোন্যম্—পরস্পরের মধ্যে; **আসীৎ**—ছিল; **সঞ্জল্পঃ**—আলোচনা; **উত্তম-শ্লোক**—উত্তমশ্লোকের দ্বারা বন্দিত পরমেশ্বর ভগবান; **চেতসাম্**—মগ্নচিত্ত; **কৌরব-ইন্দ্র**—কুরুবংশীয় রাজা; **পুর**—রাজধানী; **স্ত্রীণাম্**—রমণীগণ; **সর্ব**—সকলে; **শ্রুতি**—বেদ; **মনঃ-হরঃ**—মনোরম।

অনুবাদ

উত্তমশ্লোকের দ্বারা বন্দিত ভগবানের অপ্রাকৃত গুণাবলীর চিন্তায় মগ্ন হয়ে কুরু-কুলরমণীরা পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের কথা আলোচনা করতে লাগলেন। তাঁদের এই আলোচনা বৈদিক মন্ত্রের চেয়েও অধিক আকর্ষণীয় হয়েছিল।

তাৎপর্য

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় বলা হয়েছে যে সমস্ত বৈদিক শাস্ত্রের লক্ষ্য হচ্ছেন পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ। প্রকৃতপক্ষে বেদ, *রামায়ণ, মহাভারত* আদি শাস্ত্রে ভগবানের মহিমা বর্ণিত হয়েছে। তাই কুরুবংশীয় রাজাদের রাজধানীর প্রাসাদের ছাদে কুলরমণীরা ভগবানের সম্বন্ধে যে আলোচনা করছিলেন তা বৈদিক মন্ত্রের থেকেও শ্রুতিমধুর ছিল। ভগবানের মহিমা কীর্তন করে যা কিছুই গাওয়া হয়, সে সবই শ্রুতিমন্ত্র। গৌড়ীয় সম্প্রদায়ের একজন আচার্য নরোত্তম দাস ঠাকুর সরল বাংলা ভাষায় যে সমস্ত সঙ্গীত রচনা করেছেন, সে সম্বন্ধে সেই সম্প্রদায়ের আরেকজন আচার্য শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর বলেছেন যে সেগুলি হচ্ছে বৈদিক মন্ত্র। তার কারণ হচ্ছে তার বিষয়বস্তু। বিষয়টি হচ্ছে গুরুত্বপূর্ণ, কোন্ ভাষায় রচিত তা দিয়ে কিছু যায় আসে না। ভগবানের কার্যকলাপের চিন্তায় মগ্ন সেই সমস্ত পুরনারীরা ভগবানের কৃপায় বৈদিক বাণীর চেতনায় বিকশিত হয়েছিলেন। তাই যদিও সেই

সমস্ত রমণীরা সংস্কৃত ভাষায় অথবা অন্যান্য দিক দিয়ে মহাপণ্ডিত ছিলেন না, তবুও তাঁরা যে সমস্ত কথা বলেছিলেন তা ছিল বৈদিক মন্ত্রের থেকেও অধিক আকর্ষণীয়। উপনিষদের মন্ত্র কখনো কখনো পরোক্ষভাবে ভগবানকে ইঙ্গিত করে, কিন্তু সেই মহিলারা প্রত্যক্ষভাবে ভগবানের কথা আলোচনা করছিলেন, এবং তাই তা অধিক হৃদয়গ্রাহী ছিল। অভিজ্ঞ ব্রাহ্মণদের আশীর্বাণী থেকেও সেই সমস্ত রমণীদের আলোচনা অধিক মহত্ত্বপূর্ণ ছিল।

শ্লোক ২১

স বৈ কিলায়ং পুরুষঃ পুরাতনো
য এক আসীদবিশেষ আত্মনি।
অগ্রে গুণেভ্যো জগদাত্মনীশ্বরে
নিমীলিতাত্মন্নিশি সুপ্তশক্তিষু ॥ ২১ ॥

সঃ—তিনি (শ্রীকৃষ্ণ); **বৈ**—স্মরণে; **কিল**—নিশ্চিতভাবে; **অয়ম্**—এই; **পুরুষঃ**—পরমেশ্বর ভগবান; **পুরাতনঃ**—আদি; **যঃ**—যিনি; **একঃ**—একক; **আসীৎ**—ছিলেন; **অবিশেষঃ**—অব্যক্ত; **আত্মনি**—নিজরূপে; **অগ্রে**—সৃষ্টির পূর্বে; **গুণেভ্যঃ**—প্রকৃতির গুণ থেকে; **জগৎ-আত্মনি**—পরমাত্মায়; **ঈশ্বরে**—পরমেশ্বর ভগবানে; **নিমীলিত**—লীন হয়েছিল; **আত্মন্**—জীব; **নিশি সুপ্ত**—রাত্রে নিষ্ক্রিয়; **শক্তিষু**—শক্তিসমূহ।

অনুবাদ

তাঁরা বলেছিলেন—ইনিই সেই আদি পুরুষোত্তম ভগবান, যাঁর কথা আমরা স্মরণ করে থাকি। প্রকৃতির গুণসমূহ সৃষ্টি হওয়ার পূর্বে তিনিই কেবলমাত্র বিরাজমান ছিলেন, এবং যেহেতু তিনিই পরমেশ্বর ভগবান, তাই কেবলমাত্র তাঁরই মধ্যে নিশাকালে নিদ্রা যাওয়ার মতো সমস্ত জীব শক্তিরহিত হয়ে লীন হয়ে যায়।

তাৎপর্য

নিখিল সৃষ্টিতে দুই প্রকার প্রলয় হয়। ৪৩২,০০,০০,০০০ সৌর বৎসরের পর কোন বিশেষ ব্রহ্মাণ্ডের নিয়ন্তা ব্রহ্মা যখন নিদ্রা যান তখন এক প্রকার প্রলয় হয়। আর ব্রহ্মার শতবর্ষ পূর্ণ হলে, তাঁর জীবনের অন্তে সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডের পূর্ণ প্রলয় হয়। আমাদের গণনায় ব্রহ্মার শত বর্ষ হচ্ছে ৮৬৪,০০,০০,০০০, x ৩০x ১২x ১০০ সৌর বৎসর। উভয় প্রলয়ের সময়েই মহত্তত্ত্ব নামক জড়া শক্তি এবং জীব-তত্ত্ব

নামক তটস্থা শক্তি পরমেশ্বর ভগবানের অঙ্গে লীন হয়ে যায়। পুনরায় জড় জগৎ সৃষ্টি হওয়া পর্যন্ত জীবেরা ভগবানের শরীরে সুপ্ত অবস্থায় থাকে। এইভাবে জড় জগতের সৃষ্টি, স্থিতি এবং প্রলয় কার্য চলতে থাকে।

ভগবানের দ্বারা সক্রিয় হওয়ার পর প্রকৃতি তিনটি গুণের প্রতিক্রিয়ার প্রভাবে ক্রিয়াশীল হয়, এবং তাই এখানে বলা হয়েছে যে প্রকৃতির গুণ সক্রিয় হওয়ার পূর্বে ভগবান বিরাজমান ছিলেন। *শ্রুতি-মন্ত্রে* বলা হয়েছে যে পরমেশ্বর ভগবান শ্রীবিষ্ণুই কেবল সৃষ্টির পূর্বে ছিলেন, এবং তখন ব্রহ্মা, শিব এবং অন্যান্য দেবতারা ছিলেন না। বিষ্ণু বলতে এখানে কারণ-সমুদ্রে শায়িত মহাবিষ্ণুকে বোঝানো হয়েছে। তাঁর নিঃশ্বাসের ফলে বীজরূপে সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডের উৎপত্তি হয়, এবং ধীরে ধীরে তা অসংখ্য গ্রহ সমন্বিত বিরাট রূপ ধারণ করে। অশ্বত্থ বৃক্ষের বীজ থেকে যেমন অসংখ্য বৃক্ষের বিকাশ হয়, ঠিক তেমনই ব্রহ্মাণ্ডের বীজ থেকে বিশাল ব্রহ্মাণ্ড বিকশিত হয়।

এই মহাবিষ্ণু হচ্ছেন ভগবান শ্রীকৃষ্ণের অংশ, যাঁর সম্বন্ধে বর্ণনা করে *ব্রহ্ম-সংহিতায়* বলা হয়েছে যে—"আমি আদি পুরুষ গোবিন্দকে আমার সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি, যাঁর অংশ হচ্ছেন মহাবিষ্ণু। যাঁর অপ্রাকৃত শরীরের রোমকূপ থেকে সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডের উৎপত্তি হয়, এবং সেই ব্রহ্মাণ্ডের পরিচালক ব্রহ্মাগণ কেবল তাঁর নিঃশ্বাসের কাল অবধি জীবিত থাকেন।" *(ব্রহ্ম-সংহিতা ৫/৫৮)*

এইভাবে গোবিন্দ বা কৃষ্ণ হচ্ছেন মহাবিষ্ণুরও কারণস্বরূপ। সেই বৈদিক তত্ত্ব আলোচনারত সমস্ত কুলরমণীরা অবশ্যই মহাজনদের কাছ থেকে সে কথা শুনেছিলেন। মহাজনদের কাছে শ্রবণ করাই হচ্ছে চিন্ময় বিষয়ে যথাযথভাবে অবগত হওয়ার একমাত্র উপায়। এর কোন বিকল্প নেই।

ব্রহ্মার শতবর্ষের সমাপ্তিতে জীবেরা আপনা থেকেই মহাবিষ্ণুর শরীরে লীন হয়ে যায়। কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে জীবেরা তাদের সত্তা হারিয়ে ফেলে। তাদের সত্তা বর্তমান থাকে, এবং ভগবানের ইচ্ছায় যখন আবার সৃষ্টি হয় তখন সমস্ত সুপ্ত নিষ্ক্রিয় জীবেরা বিভিন্ন ক্ষেত্রে তাদের পূর্ব জীবনের কার্যকলাপ অনুসারে পুনরায় সক্রিয় হওয়ার জন্য ছাড়া পায়। একে বলা হয় *সুপ্তোত্থিত ন্যায়*, অর্থাৎ ঘুম থেকে জেগে উঠে পুনরায় তাদের স্ব-স্ব কর্তব্যকর্মে নিযুক্ত হয়। মানুষ যখন রাত্রিবেলায় নিদ্রা যায় তখন সে ভুলে যায় সে কে, তার কর্তব্য কি; কিন্তু ঘুম থেকে জেগে ওঠার পরই তার মনে পড়ে যায় তাকে কি করতে হবে এবং এইভাবে সে তার কার্যকলাপে লিপ্ত হয়। জীবেরাও প্রলয়ের সময় মহাবিষ্ণুর শরীরে লীন হয়ে যায়,

কিন্তু অন্য আরেকটি সৃষ্টিতে জেগে ওঠা মাত্রই তারা তাদের অসমাপ্ত কার্য শুরু করে। সে কথাও শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় (৮/১৮-২০) প্রতিপন্ন হয়েছে।

সৃজনাত্মক শক্তি সক্রিয় হওয়ার পূর্বে ভগবান বর্তমান ছিলেন। ভগবান জড়া প্রকৃতি থেকে উৎপন্ন হননি। তাঁর শরীর পূর্ণরূপে চিন্ময়, এবং তাঁর শরীর এবং তাঁর মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। সৃষ্টির পূর্বে ভগবান তাঁর এক এবং অদ্বিতীয় পরম ধামে ছিলেন।

শ্লোক ২২

স এব ভূয়ো নিজবীর্যচোদিতাং
স্বজীবমায়াং প্রকৃতিং সিসৃক্ষতীম্ ।
অনামরূপাত্মনি রূপনামনী
বিধিৎসমানোঽনুসসার শাস্ত্রকৃৎ ॥ ২২ ॥

সঃ—তিনি; **এব**—এইভাবে; **ভূয়ঃ**—পুনরায়; **নিজ**—নিজের; **বীর্য**—শক্তি; **চোদিতাম্**—অনুষ্ঠান; **স্ব**—নিজের; **জীব**—জীব; **মায়াম্**—বহিরঙ্গা শক্তি; **প্রকৃতিম্**—জড়া প্রকৃতিকে; **সিসৃক্ষতীম্**—পুনরায় সৃষ্টি করার সময়; **অনাম**—জড় উপাধিশূন্য; **রূপ-আত্মনি**—আত্মার রূপ; **রূপ-নামনী**—নাম এবং রূপ; **বিধিৎসমানঃ**—দান করতে ইচ্ছা করে; **অনুসসার**—অর্পণ করেন; **শাস্ত্র-কৃৎ**—শাস্ত্রপ্রণেতা।

অনুবাদ

পরমেশ্বর ভগবান পুনরায় তাঁর বিভিন্ন অংশস্বরূপ জীবদের নাম এবং রূপ প্রদান করার বাসনায়, জড়া প্রকৃতির তত্ত্বাবধানে তাদের ন্যস্ত করেন। তাঁরই শক্তির প্রভাবে, জড়া প্রকৃতি পুনরায় সৃষ্টি করার শক্তি অর্জন করেন। জীবকুলের কর্তব্য-কর্মাদি বিধান করবার উদ্দেশ্যে তিনিই শাস্ত্রাদি প্রণয়ন করেন।

তাৎপর্য

জীবেরা হচ্ছে ভগবানের বিভিন্ন অংশ। তারা দুই প্রকার—নিত্যমুক্ত এবং নিত্যবদ্ধ। নিত্যমুক্ত জীবেরা শাশ্বত মুক্ত-আত্মা, এবং তাঁরা নিত্যকাল জড় জগতের অতীত ভগবানের দিব্য ধামে ভগবানের অপ্রাকৃত প্রেমময়ী সেবার মাধ্যমে ভগবানের সঙ্গে প্রেমের আদান-প্রদানে মগ্ন। কিন্তু নিত্যবদ্ধ জীবেরা তাদের পরম পিতা ভগবানের প্রতি তাদের বিদ্রোহী মনোভাব সংশোধন করার জন্য ভগবানের

বহিরঙ্গা প্রকৃতি মায়ার হস্তে অর্পিত হয়েছে। নিত্যবদ্ধ জীবেরা ভগবানের বিভিন্ন অংশরূপে ভগবানের সঙ্গে তাদের সম্পর্কের কথা নিত্যকাল ধরে ভুলে আছে। তারা মায়ার প্রভাবে মোহাচ্ছন্ন হয়ে নিজেদের জড় পদার্থ থেকে উৎপন্ন বলে মনে করছে, এবং তার ফলে তারা জড় জগতে সুখী হওয়ার নানারকম পরিকল্পনায় অত্যন্ত ব্যস্ত। তারা মহাসুখে পরিকল্পনা করে চলে, কিন্তু ভগবানের ইচ্ছায় উপরোক্ত বিশেষ সময়ের অন্তে পরিকল্পনা সমেত সমস্ত পরিকল্পনাকারীরা লয় হয়ে যায়। সে কথা প্রতিপন্ন করে *শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতায়* বলা হয়েছে—"হে কৌন্তেয়! কল্পান্তে সমস্ত জীবেরা আমার প্রকৃতিতে লীন হয়ে যায়, এবং যখন পুনরায় সৃষ্টি করার সময় আসে, তখন আমি আমার বহিরঙ্গা শক্তির মাধ্যমে সৃষ্টিকার্য শুরু করি।" (ভঃ গীঃ ৯/৭)

ভূয়ঃ শব্দটির অর্থ হচ্ছে বারবার, অর্থাৎ ভগবানের বহিরঙ্গা শক্তির প্রভাবে সৃষ্টি, স্থিতি এবং প্রলয়ের পন্থা নিরন্তর চলছে। তিনিই সব কিছুর পরম কারণ। কিন্তু ভগবানের সঙ্গে তাদের মধুর সম্পর্কের কথা বিস্মৃত হয়ে ভগবানের যে সমস্ত বিভিন্ন অংশস্বরূপ জীবেরা রয়েছে, তাদের পুনরায় বহিরঙ্গা প্রকৃতির বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়ার সুযোগ দেওয়া হয়। তাদের (জীবদের) চেতনা জাগ্রত করার জন্য ভগবান প্রামাণিক শাস্ত্রও সৃষ্টি করেন। বৈদিক শাস্ত্র বদ্ধ জীবদের পথ প্রদর্শন করে যাতে তারা জড় জগৎ এবং জড় শরীরের সৃষ্টি এবং প্রলয়ের চক্র থেকে মুক্ত হতে পারে।

শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতায় বলা হয়েছে, "এই সৃষ্ট জগৎ এবং জড় শক্তি আমার নিয়ন্ত্রণাধীন। প্রকৃতির প্রভাবে আপনা থেকেই পুনঃ পুনঃ তার সৃষ্টি হয়, এবং তা সম্পাদিত হয় আমার বহিরঙ্গা শক্তির মাধ্যমে।"

প্রকৃতপক্ষে চিৎ-স্ফুলিঙ্গরূপে জীবদের কোন জড় নাম বা রূপ নেই। কিন্তু জড় রূপ ও নাম সমন্বিত জড়া প্রকৃতির উপর আধিপত্যের বাসনা চরিতার্থ করার জন্য তাদের একটি সুযোগ দেওয়া হয়, সেই সঙ্গে শাস্ত্রের মাধ্যমে তাদের প্রকৃত স্থিতি অবগত হওয়ারও সুযোগ দেওয়া হয়। আত্ম-বিস্মৃত মূর্খ জীবেরা সর্বদাই ভ্রান্ত রূপ এবং নাম নিয়ে ব্যস্ত। আধুনিক জাতীয়তাবাদ এই প্রকার ভ্রান্ত নাম এবং ভ্রান্ত রূপের চরম পরিণতি। মানুষেরা ভ্রান্ত নাম এবং রূপের জন্য মত্ত। কোন বিশেষ অবস্থায় লব্ধ শরীর এবং নামের প্রভাবে মোহাচ্ছন্ন হয়ে বদ্ধ জীবেরা নানা রকম মতবাদ সৃষ্টি করে তাদের শক্তির অপচয় করছে। শাস্ত্র কিন্তু তাদের প্রকৃত অবস্থা হৃদয়ঙ্গম করার জন্য সমস্ত তথ্য সরবরাহ করছে, কিন্তু বিভিন্ন স্থান এবং সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে ভগবানের দ্বারা সৃষ্ট সেই সমস্ত শাস্ত্রের শিক্ষা গ্রহণ করতে তারা অনিচ্ছুক। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে *শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতা* হচ্ছে

সমস্ত জীবের পথ-প্রদর্শক, কিন্তু মায়ার প্রভাবে মোহাচ্ছন্ন হয়ে মানুষ *শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার* নির্দেশ অনুসারে জীবন যাপন করতে চায় না। যাঁরা *শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার* সিদ্ধান্ত পূর্ণরূপে হৃদয়ঙ্গম করেছেন, তাঁদের জন্য *শ্রীমদ্ভাগবত* হচ্ছে স্নাতকোত্তর অধ্যয়নের বিষয়। দুর্ভাগ্যবশত মানুষের এই সমস্ত শাস্ত্রের প্রতি রুচি নেই, এবং তাই তারা জন্ম-মৃত্যুর চক্রে আবর্তিত হওয়ার জন্য মায়ার প্রভাবে মোহাচ্ছন্ন হয়ে রয়েছে।

শ্লোক ২৩

স বা অয়ং যৎপদমত্র সূরয়ো
জিতেন্দ্রিয়া নির্জিতমাতরিশ্বনঃ।
পশ্যন্তি ভক্ত্যুৎকলিতামলাত্মনা
নন্বেষ সত্ত্বং পরিমার্ষ্টুমর্হতি ॥ ২৩ ॥

সঃ—তিনি; **বা**—অথবা; **অয়ম্**—এই; **যৎ**—যা; **পদম্-অত্র**—ইনিই সেই পরমেশ্বর ভগবান, শ্রীকৃষ্ণ; **সূরয়ঃ**—মহান ভক্তগণ; **জিত-ইন্দ্রিয়াঃ**—যাঁরা তাঁদের ইন্দ্রিয়গুলি জয় করেছেন; **নির্জিত**—সম্পূর্ণরূপে সংযত; **মাতরিশ্বনঃ**—জীবন; **পশ্যন্তি**—দর্শন করতে পারেন; **ভক্তি**—ভক্তির দ্বারা; **উৎকলিত**—বিকশিত; **অমল-আত্মনা**—নির্মল চিত্ত; **ননু এষঃ**—কেবল এইভাবেই; **সত্ত্বম্**—অস্তিত্ব; **পরিমার্ষ্টুম্**—মন সম্পূর্ণরূপে পবিত্র করার জন্য; **অর্হতি**—যোগ্য।

অনুবাদ

ইনিই সেই পরমেশ্বর ভগবান, যাঁর অপ্রাকৃত রূপ জিতেন্দ্রিয় সংযত-চিত্ত অমলাত্মা মহান ভক্তগণ ঐকান্তিক ভক্তিযোগের মাধ্যমে দর্শন করে থাকেন। জীবের অস্তিত্ব নির্মল ও শুদ্ধ করার সেটিই হল একমাত্র পন্থা।

তাৎপর্য

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় উল্লেখ করা হয়েছে যে শুদ্ধ ভক্তির দ্বারাই কেবল যথাযথভাবে ভগবানকে জানা যায়। তাই এখানেও উল্লেখ করা হয়েছে যে জড় কলুষ থেকে তাঁদের মনকে নির্মল করতে সক্ষম হয়েছেন যে সমস্ত মহান ভক্ত, তাঁরাই কেবল ঐকান্তিক ভক্তির দ্বারা ভগবানকে যথাযথভাবে উপলব্ধি করতে পারেন। *জিতেন্দ্রিয়* শব্দটির অর্থ হচ্ছে যিনি পূর্ণরূপে তাঁর ইন্দ্রিয়গুলিকে সংযত করেছেন।

ইন্দ্রিয়গুলি হচ্ছে দেহের সক্রিয় অংশ, এবং তাদের কার্যকলাপ কখনই বন্ধ করা যায় না। ইন্দ্রিয়গুলিকে নিষ্ক্রিয় করার জন্য যোগের কৃত্রিম পন্থা বিশ্বামিত্র মুনির মতো মহান যোগীর বেলায়ও সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থ বলে প্রমাণিত হয়েছে। বিশ্বামিত্র মুনি যৌগিক সমাধির দ্বারা তাঁর ইন্দ্রিয়গুলিকে বশীভূত করেছিলেন, কিন্তু স্বর্গের অপ্সরা মেনকার সঙ্গে সাক্ষাৎ হওয়ায় তিনি যৌন বাসনার শিকার হন, এবং কৃত্রিমভাবে ইন্দ্রিয় দমন করার সাধনা ব্যর্থ হয়। শুদ্ধ ভক্তরা কিন্তু এইভাবে কৃত্রিম উপায়ে ইন্দ্রিয়ের কার্যকলাপ বন্ধ করার চেষ্টা করেন না, পক্ষান্তরে তাঁরা সৎ কার্যকলাপে সেগুলিকে নিযুক্ত করেন। ইন্দ্রিয়গুলি যখন অধিকতর আকর্ষণীয় কার্যকলাপে যুক্ত হয়, তখন নিকৃষ্ট কার্যকলাপের প্রতি আকৃষ্ট হওয়ার আর কোন সম্ভাবনা থাকে না। *শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায়* উল্লেখ করা হয়েছে যে শ্রেষ্ঠ কার্যকলাপে যুক্ত করার মাধ্যমেই কেবল ইন্দ্রিয়গুলিকে সংযত করা যায়। ভগবদ্ভক্তিতে অপরিহার্যরূপে ইন্দ্রিয়গুলিকে নির্মল করতে হয় অথবা ভগবানের সেবায় যুক্ত করতে হয়। ভগবদ্ভক্তি কোন নিষ্ক্রিয় হওয়ার পন্থা নয়। ভগবানের সেবার জন্য যা কিছুই করা হয়, তা তৎক্ষণাৎ জড় কলুষ থেকে মুক্ত হয়ে পবিত্র হয়। অজ্ঞানতার ফলেই জড় ধারণার প্রকাশ হয়। বাসুদেবের অতীত আর কিছু নেই। দীর্ঘকাল জ্ঞানের মাধ্যমে ইন্দ্রিয় সংযম করার পর জ্ঞানীদের হৃদয়ে ধীরে ধীরে বাসুদেবের অনুভূতি জাগরিত হয়। কিন্তু এই প্রথার শেষ হয় বাসুদেবকে সব কিছু বলে জানার মাধ্যমে। ভগবদ্ভক্তির শুরুতেই সে কথা স্বীকার করা হয়, এবং ভগবান কৃপাপূর্বক ভক্তের হৃদয় থেকে নির্দেশ দেওয়ার ফলে সমস্ত তত্ত্বজ্ঞান তার কাছে প্রকাশিত হয়। তাই ভক্তির দ্বারা ইন্দ্রিয়গুলিকে বশীভূত করাই সরলতম এবং একমাত্র পন্থা।

শ্লোক ২৪

স বা অয়ং সখ্যনুগীতসৎকথো
বেদেষু গুহ্যেষু চ গুহ্যবাদিভিঃ ।
য এক ঈশো জগদাত্মলীলয়া
সৃজত্যবত্যত্তি ন তত্র সজ্জতে ॥ ২৪ ॥

সঃ—তিনি; **বা**—অথবা; **অয়ম্**—এই; **সখি**—হে সখি; **অনুগীত**—বর্ণিত; **সৎ-কথঃ**—অপূর্ব লীলা; **বেদেষু**—বৈদিক শাস্ত্রে; **গুহ্যেষু**—গূঢ়ভাবে; **চ**—ও; **গুহ্যবাদিভি**—অন্তরঙ্গ ভক্তদের দ্বারা; **যঃ**—যিনি; **একঃ**—একমাত্র; **ঈশঃ**—পরম

নিয়ন্তা; জগৎ—সমগ্র সৃষ্টির; আত্ম—পরমাত্মা; লীলয়া—তাঁর লীলা প্রকট করে; সৃজতি—সৃষ্টি করেন; অবতি-অত্তি—পালন করেন এবং বিনাশ করেন; ন—না; তত্র—সেখানে; সজ্জতে—লিপ্ত হন।

অনুবাদ

হে সখি, ইনিই সেই পরমেশ্বর ভগবান, যাঁর আকর্ষণীয় ও গুহ্য লীলাসমূহ বৈদিক শাস্ত্রের অতি প্রচ্ছন্ন অংশগুলিতে তাঁর মহান্ ভক্তগণের দ্বারা বর্ণিত হয়েছে। ইনিই সেই একমাত্র পুরুষ যিনি এই জড় জগতের সৃষ্টি, স্থিতি, এবং প্রলয়কার্য সাধন করে থাকেন, এবং তা সত্ত্বেও তিনি তার দ্বারা প্রভাবিত হন না।

তাৎপর্য

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় উল্লেখ করা হয়েছে যে সমস্ত বৈদিক শাস্ত্র ভগবান শ্রীকৃষ্ণের মহিমা কীর্তন করছে। এখানে, *শ্রীমদ্ভাগবতেও* তা প্রতিপন্ন হয়েছে। ব্যাস, নারদ, শুকদেব গোস্বামী, কুমার, কপিল, প্রহ্লাদ, জনক, বলি এবং যমরাজের মতো ভগবানের বহু মহান্ ভক্ত এবং শক্ত্যাবিষ্ট অবতারদের দ্বারা বহু শাখা এবং উপশাখায় বেদের বিস্তার হয়েছে, কিন্তু ভগবানের কার্যকলাপের গুহ্যতম অংশগুলি তাঁর অন্তরঙ্গ ভক্ত শুকদেব গোস্বামীর দ্বারা *শ্রীমদ্ভাগবতে* বিশেষভাবে বর্ণিত হয়েছে। *বেদান্ত-সূত্র* অথবা *উপনিষদে* তাঁর লীলার গোপনীয় অংশগুলির ইঙ্গিত মাত্র কেবল দেওয়া হয়েছে। *উপনিষদ* আদি বৈদিক শাস্ত্রে বর্ণনা করা হয়েছে যে ভগবান জড়াতীত। তিনি সম্পূর্ণরূপে চিন্ময় হওয়ার ফলে তাঁর রূপ, নাম, গুণ, পরিকর, ইত্যাদি সব কিছুই জড় থেকে ভিন্ন, তাই অল্পবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষেরা কখনও কখনও তাঁকে নির্বিশেষ বলে ভুল করে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তিনি হচ্ছেন পরম পুরুষ ভগবান, এবং তাঁর আংশিক প্রকাশ হচ্ছে পরমাত্মা বা নির্বিশেষ ব্রহ্ম।

শ্লোক ২৫

যদা হ্যধর্মেণ তমোধিয়ো নৃপা
জীবন্তি তত্রৈষ হি সত্ত্বতঃ কিল।
ধত্তে ভগং সত্যমৃতং দয়াং যশো
ভবায় রূপাণি দধদ্যুগে যুগে ॥ ২৫ ॥

যদা—যখন; **হি**—নিশ্চিতভাবে; **অধর্মেণ**—অধর্মের দ্বারা; **তমোঃ-ধিয়ঃ**—তমোগুণে আচ্ছন্ন মানুষদের; **নৃপাঃ**—নরপতিগণ; **জীবন্তি**—পশুর মতো জীবন-যাপন করে; **তত্র**—সেখানে; **এষঃ**—তিনি; **হি**—কেবল; **সত্ত্বতঃ**—অপ্রাকৃত; **কিল**—অবশ্যই; **ধত্তে**—প্রকাশ করেন; **ভগম্**—পরম ঐশ্বর্য; **সত্যম্**—সত্য; **ঋতম্**—যথার্থতা; **দয়াম্**—কৃপা; **যশঃ**—অদ্ভুত কর্ম; **ভবায়**—পালন করার জন্য; **রূপাণি**—বিভিন্ন রূপে; **দধৎ**—অবতরণ করেন; **যুগে যুগে**—বিভিন্ন যুগে।

অনুবাদ

যখনই রাজা ও শাসকবৃন্দ তমোগুণের দ্বারা আচ্ছাদিত হয়ে অধর্ম আচরণপূর্বক পশুর মতো জীবন যাপন করে, তখন এই ভগবান শ্রীকৃষ্ণই তাঁর অপ্রাকৃত রূপে বিভিন্ন যুগে প্রকটিত হয়ে তাঁর সর্বশক্তিমত্তা পরমসত্যতা বিশ্বস্তজনের প্রতি বিশেষ কৃপা এবং অদ্ভুত ক্রিয়াকলাপ সম্পাদন আদি লীলা-বিক্রম প্রকাশ করে থাকেন।

তাৎপর্য

পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে নিখিল সৃষ্টি হচ্ছে পরমেশ্বর ভগবানের সম্পত্তি। এটিই *ঈশোপনিষদের* মূল দর্শন—সবকিছুই পরমেশ্বর ভগবানের সম্পত্তি। অতএব অবৈধভাবে সেই সম্পত্তিতে হস্তক্ষেপ করা কারোরই উচিত নয়। কৃপাপূর্বক ভগবান যা কিছু দিয়েছেন তাই কেবল গ্রহণ করা উচিত। অতএব, এই পৃথিবী কিংবা অন্যান্য গ্রহ বা ব্রহ্মাণ্ড একমাত্র ভগবানেরই সম্পত্তি। সমস্ত জীবেরা অবশ্যই তাঁর বিভিন্ন অংশ বা সন্তান, এবং তার ফলে তাদের সকলেরই তাদের নির্ধারিত কার্য সম্পাদন করার জন্য তাঁর কৃপার উপর নির্ভর করে জীবন যাপন করার অধিকার রয়েছে। তাই ভগবানের অনুমোদন ব্যতীত কখনই অন্য কোন ব্যক্তির অথবা অন্য কোন প্রাণীর অধিকারে অবৈধভাবে হস্তক্ষেপ করা উচিত নয়। ভগবানের ইচ্ছা অনুসারে সব কিছু যাতে পরিচালিত হয়, তা দেখাশোনা করার জন্য রাজা বা প্রশাসক হচ্ছেন ভগবানের প্রতিনিধি। তাই তার মহারাজ যুধিষ্ঠির অথবা পরীক্ষিতের মতো মাননীয় ব্যক্তি হওয়া অবশ্য কর্তব্য। এই প্রকার রাজারা মহাজনদের কাছ থেকে পৃথিবী শাসন করার জ্ঞান এবং অধিকার প্রাপ্ত হন। কিন্তু কখনও কখনও, জড়া প্রকৃতির সবচাইতে নিকৃষ্ট তমোগুণের প্রভাবে দায়িত্বজ্ঞানহীন ব্যক্তিরাই রাজা অথবা প্রশাসকের ক্ষমতা প্রাপ্ত হয়, এবং এই প্রকার মূর্খ প্রশাসকেরা ব্যক্তিগত স্বার্থে পশুদের মতো জীবন যাপন করে। তার ফলে সমস্ত পরিবেশ অরাজকতা এবং জঘন্য কার্যকলাপে পূর্ণ হয়ে দূষিত হয়। স্বজনপোষণ, ঘুষ,

প্রতারণা, কলহ ইত্যাদিতে পরিবেশ পূর্ণ হয়ে ওঠে; এবং তাই দুর্ভিক্ষ, মহামারী, যুদ্ধ ইত্যাদি দুর্যোগে মানব সমাজ পূর্ণ হয়ে ওঠে। তখন ভগবদ্ভক্ত এবং শ্রদ্ধালু ব্যক্তিদের সর্বতোভাবে নির্যাতন করা হয়। এই সমস্ত লক্ষণগুলি ধর্ম সংস্থাপনের জন্য এবং কুশাসকদের বিনাশ করার জন্য ভগবানের অবতরণের কাল সূচিত করে। সে কথা শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায়ও প্রতিপন্ন হয়েছে।

তখন ভগবান সম্পূর্ণরূপে জড় গুণের অতীত তাঁর চিন্ময় রূপে আবির্ভূত হন। তাঁর সৃষ্টিকে স্বাভাবিক অবস্থায় রাখার জন্য তিনি অবতরণ করেন। স্বাভাবিক অবস্থা হচ্ছে এই যে, প্রতিটি গ্রহলোকের সমস্ত প্রাণীকে ভগবান প্রয়োজনীয় সব কিছু প্রদান করেছেন। তারা শাস্ত্রোল্লিখিত বিধিনিষেধগুলি অনুসরণ করে এবং পূর্বনির্ধারিত বৃত্তি সম্পাদন করে অবশেষে মুক্তি লাভ করতে পারে। নিত্যবদ্ধ জীবদের ভ্রান্ত বাসনা চরিতার্থ করার জন্য জড় জগৎ সৃষ্টি হয়েছে, ঠিক যেমন একটি দুরন্ত বালককে খেলনা নিয়ে খেলতে দেওয়া হয়। তা না হলে এই জড় জগতের কোন প্রয়োজন ছিল না। কিন্তু যখন তারা জড় বিজ্ঞানের প্রভাবে লব্ধ ক্ষমতার দ্বারা উন্মত্ত হয়ে ভগবানের অনুমোদন ব্যতীত অবৈধভাবে এই জগতকে কেবল তাদের ইন্দ্রিয়-তৃপ্তি সাধনের জন্য শোষণ করে, তখন সেই সমস্ত বিদ্রোহী মানুষদের দণ্ড দান করার জন্য এবং শ্রদ্ধাবান ব্যক্তিদের রক্ষা করার জন্য ভগবানের অবতরণের প্রয়োজন হয়।

ভগবান যখন অবতরণ করেন, তখন তিনি তাঁর পরম অধিকার প্রমাণ করার জন্য তাঁর অলৌকিক কার্যকলাপ প্রদর্শন করেন এবং রাবণ, হিরণ্যকশিপু, কংস আদি জড়বাদীরা যথেষ্টভাবে দণ্ডিত হয়। তিনি এমনভাবে আচরণ করেন যা কেউ কখনও অনুকরণ করতে পারে না। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায় যে, ভগবান যখন রামরূপে অবতরণ করেছিলেন, তখন তিনি সাগরের বুকে সেতু বন্ধন করেছিলেন। তিনি যখন কৃষ্ণরূপে অবতরণ করেছিলেন, তখন তাঁর শৈশব থেকেই পুতনা, অঘাসুর, শকটাসুর, কালিয় ইত্যাদি অসুর এবং অবশেষে তাঁর মাতুল কংসকে বধ করে তাঁর অলৌকিক কার্যকলাপ প্রদর্শন করেছিলেন। তিনি যখন দ্বারকায় ছিলেন, তখন তিনি ষোল হাজার একশ' আটজন মহিষীকে বিবাহ করেছিলেন। যদুবংশ নামে পরিচিত তাঁর পরিবারের সদস্য সংখ্যা ছিল প্রায় এক লক্ষ, এবং তিনি জীবিত থাকাকালেই তাঁদের সকলকে তিনি বিনাশ করেছিলেন। তিনি গোবর্ধনধারী হরি নামে পরিচিত, কেননা সাত বছর বয়সেই তিনি গোবর্ধন নামক পর্বত ধারণ করেছিলেন। তিনি তখনকার দিনের বহু অবাঞ্ছিত রাজাদের সংহার করেছিলেন, এবং একজন ক্ষত্রিয়রূপে বীরত্বপূর্বক যুদ্ধ করেছিলেন। তিনি অসমোর্ধ্ব নামে বিখ্যাত; কেননা কেউই তাঁর সমকক্ষ নয় অথবা তাঁর থেকে শ্রেষ্ঠ নয়।

শ্লোক ২৬

অহো অলং শ্লাঘ্যতমং যদোঃ কুল-
মহো অলং পুণ্যতমং মধোর্বনম্ ।
যদেষ পুংসামৃষভঃ শ্রিয়ঃ পতিঃ
স্বজন্মনা চঙ্ক্রমণেন চাঞ্চতি ॥ ২৬ ॥

অহো—হায়; **অলম্**—নিশ্চয়ই; **শ্লাঘ্য-তমম্**—পরম গৌরবান্বিত; **যদোঃ**—যদুরাজার; **কুলম্**—কুল বা বংশ; **অহো**—আহা; **অলম্**—নিশ্চিতভাবে; **পুণ্য-তমম্**—সবচাইতে পবিত্র; **মধোঃ বনম্**—মথুরা; **যৎ**—যেহেতু; **এষঃ**—এই; **পুংসাম্ ঋষভঃ**—পুরুষোত্তম; **শ্রিয়ঃ**—লক্ষ্মীদেবীর; **পতিঃ**—পতি; **স্ব-জন্মনা**—তাঁর আবির্ভাবের দ্বারা; **চঙ্ক্রমণেন**—পদচারণা করেছিলেন; **চ-অঞ্চতি**—মহিমান্বিত করেছিলেন।

অনুবাদ

আহা, যদুবংশ পরম মহিমায় মহিমান্বিত এবং মথুরা সবচাইতে পুণ্যময় কেননা এই পুরুষোত্তম লক্ষ্মীপতি শ্রীহরি স্বয়ং যদুবংশে জন্মগ্রহণ করেছেন এবং শৈশবে মথুরায় বিহার করেছেন।

তাৎপর্য

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাঁর দিব্য আবির্ভাব, তিরোভাব এবং কার্যকলাপের বিশদ বর্ণনা প্রদান করেছেন। ভগবান কোন বিশেষ পরিবারে অথবা বিশেষ স্থানে তাঁর অচিন্ত্য শক্তির প্রভাবে আবির্ভূত হন। তিনি বদ্ধ জীবের মতো এক শরীর ত্যাগ করে আর এক শরীরে জন্মগ্রহণ করেন না। তাঁর জন্ম সূর্যের উদয় এবং অস্তের মতো। সূর্য পূর্ব দিগন্তে উদিত হয়, কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে পূর্ব দিগন্ত হচ্ছে সূর্যের জনক। সৌরমণ্ডলের সর্বত্র সূর্য বিরাজমান, কিন্তু তা একটি নির্দিষ্ট সময়ে দৃষ্টিগোচর হয় এবং তেমনই আর একটি নির্দিষ্ট সময়ে অদৃশ্য হয়ে যায়। ভগবানও ঠিক তেমনি এই ব্রহ্মাণ্ডে সূর্যের মতো আবির্ভূত হয়ে আর একটি সময়ে আমাদের দৃষ্টির অগোচর হয়ে যান। তিনি সর্বত্র সর্বদা বিরাজমান, কিন্তু তাঁর অহৈতুকী কৃপার প্রভাবে তিনি যখন আমাদের সম্মুখে আবির্ভূত হন, তখন আমরা বিনা বিচারে মনে করে থাকি যে তিনি জন্মগ্রহণ করেছেন। কেউ যখন শাস্ত্রের বর্ণনার

ভিত্তিতে ভগবানের আবির্ভাব ও তিরোভাবের তত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করতে পারেন, তিনি তাঁর বর্তমান শরীর ত্যাগের পর অবশ্যই মুক্তিলাভ করবেন। বহু জন্ম ধরে ধৈর্য ও অধ্যবসায় সহকারে জ্ঞান এবং বৈরাগ্যের অনুশীলনের ফলে মুক্তি লাভ হয়। কিন্তু ভগবানের দিব্য জন্ম এবং কার্যকলাপের তত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করার মাধ্যমেই কেবল তৎক্ষণাৎ মুক্তিলাভ করা যায়। সে কথা *শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায়* ঘোষণা করা হয়েছে। কিন্তু যারা অজ্ঞানের অন্ধকারে রয়েছে, তারা মনে করে যে জড় জগতে ভগবানের জন্ম ও কার্যকলাপ সাধারণ জীবের জন্ম ও কর্মের মতো। যারা এই প্রকার ভ্রান্ত সিদ্ধান্তের দ্বারা প্রভাবিত, তারা কখনই মুক্তিলাভ করতে পারে না। তাই রাজা বসুদেবের পুত্ররূপে যদুরাজবংশে তাঁর জন্ম ও মথুরামণ্ডলে নন্দ মহারাজের গৃহে তাঁর স্থানান্তর, সবই ভগবানের অন্তরঙ্গা শক্তির অপ্রাকৃত আয়োজন। যদুবংশের এবং মথুরামণ্ডলের অধিবাসীদের সৌভাগ্য কারও পক্ষে অনুমান করা সম্ভব নয়। যদি কেবল ভগবানের জন্ম এবং কর্মের দিব্য প্রকৃতি তত্ত্বত জানার ফলেই অনায়াসে মুক্তিলাভ করা যায়, তা হলে আমরা কল্পনা করতে পারি যারা ভগবানের পরিবারের সদস্য অথবা প্রতিবেশীরূপে বাস্তবিকভাবে তাঁর সঙ্গ উপভোগ করেছিলেন তাঁদের সৌভাগ্য কি রকম ছিল। যাঁরা লক্ষ্মীপতি ভগবানের সঙ্গ লাভের সৌভাগ্য লাভ করেছিলেন, তাঁরা নিশ্চয়ই এমন কিছু লাভ করেছিলেন যা মুক্তিরও অতীত। তাই সেই বংশ এবং সেই ভূমি ভগবানের কৃপায় অবশ্যই নিত্য মহিমান্বিত।

শ্লোক ২৭

অহো বত স্বর্যশসস্তিরস্করী
কুশস্থলী পুণ্যযশস্করী ভুবঃ।
পশ্যন্তি নিত্যং যদনুগ্রহেষিতং
স্মিতাবলোকং স্বপতিং স্ম যৎপ্রজাঃ ॥ ২৭ ॥

অহো বত—কী আশ্চর্য; **স্ব-যশসঃ**—স্বর্গের মহিমা; **তিরস্করী**—তিরস্কার বা পরাভূতকারী; **কুশস্থলী**—দ্বারকা; **পুণ্য**—পুণ্য; **যশস্করী**—প্রসিদ্ধ; **ভুবঃ**—পৃথিবীতে; **পশ্যন্তি**—দেখে; **নিত্যম্**—নিরন্তর; **যৎ**—যা; **অনুগ্রহ-ইষিতম্**—অনুগ্রহ দান করার জন্য; **স্মিত-অবলোকম্**—মধুর হাস্য সমন্বিত কৃপাদৃষ্টি; **স্ব-পতিম্**—জীবাত্মার আত্মা (শ্রীকৃষ্ণ); **স্ম**—করতেন; **যৎ-প্রজাঃ**—সেই স্থানের অধিবাসীরা।

অনুবাদ

নিঃসন্দেহে এটি পরম আশ্চর্যের বিষয় যে দ্বারকা স্বর্গের মহিমাকেও লাঞ্ছিত করেছে এবং পৃথিবীর পুণ্য প্রসিদ্ধি বৃদ্ধি করেছে। দ্বারকাবাসীরা সর্বদাই সমস্ত জীবাত্মার আত্মা শ্রীকৃষ্ণকে তাঁর প্রেমময় রূপ-বৈশিষ্ট্যে দর্শন করছেন। তিনি মধুর হাস্যময় কৃপাদৃষ্টি দ্বারা তাঁদের অনুগৃহীত করছেন।

তাৎপর্য

স্বর্গলোকে ইন্দ্র, চন্দ্র, বরুণ, বায়ু আদি দেবতারা বাস করেন, এবং পুণ্যবান ব্যক্তিরা পৃথিবীতে বহু পুণ্য কর্ম করার পর সেখানে যেতে পারেন। আধুনিক বৈজ্ঞানিকেরা স্বীকার করে যে উচ্চতর লোকে সময়ের বিচার এই পৃথিবী থেকে ভিন্ন। তেমনই শাস্ত্র থেকে আমরা জানতে পারি যে সেখানে মানুষের আয়ু দশ হাজার বছর (আমাদের গণনা অনুসারে)। পৃথিবীর ছয় মাস স্বর্গের একদিনের সমান। তেমনই সেখানে সুখ উপভোগের সুযোগ-সুবিধাও অনেক উন্নত এবং সেখানকার অধিবাসীদের সৌন্দর্য অতুলনীয়। পৃথিবীর সাধারণ মানুষেরা স্বর্গলোকে যাওয়ার জন্য অত্যন্ত আগ্রহী, কেননা তারা শুনেছে যে সেখানকার সুখ-সুবিধা পৃথিবীর থেকে অনেক অনেক বেশি। তারা এখন অন্তরীক্ষ যানে চড়ে চন্দ্রলোকে যাওয়ার চেষ্টা করছে। এই সমস্ত কিছু বিচার করে বোঝা যায় যে স্বর্গলোক পৃথিবী থেকে অনেক বেশি বিখ্যাত। কিন্তু দ্বারকায় শ্রীকৃষ্ণ একজন রাজারূপে রাজ্য শাসন করার জন্য সেই স্বর্গের খ্যাতি পৃথিবীর কাছে নিষ্প্রভ হয়ে গেছে। তিনটি স্থান, যথা বৃন্দাবন, মথুরা এবং দ্বারকা এই ব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত প্রসিদ্ধ স্থানগুলি থেকে অধিক মহত্ত্বপূর্ণ। এই সমস্ত স্থানগুলি সর্বদা পবিত্র, কেননা যখনই ভগবান অবতরণ করেন তখন তিনি এই তিনটি স্থানে দিব্যলীলা প্রদর্শন করেন। এগুলি হচ্ছে ভগবানের নিত্য ধাম, এবং যদিও ভগবান এখন অপ্রকট হয়েছেন, তথাপি পৃথিবীর অধিবাসীরা এই ধামগুলির উপস্থিতির সুযোগ গ্রহণ করেন। ভগবান সমস্ত জীবের আত্মা, এবং তিনি সব সময় চান যে, সমস্ত জীব যেন তাদের স্বরূপে অবস্থিত হয়ে তাঁর অপ্রাকৃত লীলায় অংশগ্রহণ করে তাঁর সান্নিধ্যে থাকে। তাঁর আকর্ষণীয় রূপ এবং মধুর হাস্য সকলের হৃদয়কে এমনই গভীরভাবে প্রভাবিত করে যে, একবার তা হৃদয়ঙ্গম করার পর জীব ভগবানের ধামে প্রবেশ করে এবং সেখান থেকে সে আর কখনও এখানে ফিরে আসে না। এই তত্ত্ব *শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায়* প্রতিপন্ন হয়েছে।

জড় সুখভোগের উন্নততর সুযোগ-সুবিধার জন্য স্বর্গলোক প্রসিদ্ধ হতে পারে, কিন্তু *শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা* (৯/২০-২১) থেকে আমরা জানতে পারি যে, অর্জিত পুণ্য

শেষ হয়ে গেলে মানুষকে আবার এই পৃথিবীতে ফিরে আসতে হয়। দ্বারকা নিশ্চিতভাবে স্বর্গ থেকে অধিক মহত্বপূর্ণ, কেননা ভগবানের হাস্যোজ্জ্বল দৃষ্টিপাতের দ্বারা যাঁরা একবার অনুগৃহীত হয়েছেন, তাঁরা আর কখনো এই দূষিত পৃথিবীতে ফিরে আসেন না, যার সম্বন্ধে ভগবান নিজেই বলেছেন যে এটি হচ্ছে দুঃখভোগের স্থান। কেবল এই পৃথিবীই নয়, ব্রহ্মাণ্ডের সব কটি লোকই হচ্ছে দুঃখের আলয়, কেননা এই ব্রহ্মাণ্ডের কোন লোকেই নিত্য, জ্ঞানময় এবং আনন্দময় জীবন লাভ করা যায় না। যাঁরা ভগবানের সেবায় যুক্ত হয়েছেন, তাঁদের উপরোক্ত এই তিনটি স্থানে যথা দ্বারকা, মথুরা এবং বৃন্দাবনে বাস করার উপদেশ দেওয়া হয়েছে। যেহেতু এই তিনটি স্থানে ভগবদ্ভক্তি অনুশীলনের ফল বিবর্ধিত হয়, তাই যাঁরা সেখানে শাস্ত্র নির্দিষ্ট বিধি-বিধান অনুসরণ করতে যান, তাঁরা অবশ্যই সেই ফলই লাভ করেন যা স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ সেখানে উপস্থিত থাকার সময় লাভ হত। তাঁর ধাম এবং তিনি স্বয়ং অভিন্ন, এবং এখনও কোন শুদ্ধ ভক্ত অন্য কোন শুদ্ধ ভক্তের নির্দেশনায় সেই সমস্ত ফল লাভ করতে পারেন।

শ্লোক ২৮

নূনং ব্রতস্নানহুতাদিনেশ্বরঃ
সমর্চিতো হ্যস্য গৃহীতপাণিভিঃ।
পিবন্তি যাঃ সখ্যধরামৃতং মুহু-
র্ব্রজস্ত্রিয়ঃ সম্মুমুহুর্যদাশয়াঃ ॥ ২৮ ॥

নূনম্—নিশ্চিতভাবে পূর্বজন্মে; ব্রত—ব্রত; স্নান—পবিত্র তীর্থে স্নান; হুত—হোম; আদিনা—ইত্যাদির দ্বারা; ঈশ্বরঃ—পরমেশ্বর ভগবান; সমর্চিতঃ—পূর্ণরূপে আরাধিত; হি—অবশ্য; অস্য—তাঁর; গৃহীত-পাণিভিঃ—বিবাহিতা পত্নীগণ; পিবন্তি—পান করেন; যাঃ—যাঁরা; সখি—হে সখিগণ; অধর-অমৃতম্—অধর সুধা; মুহুঃ—বার বার; ব্রজ-স্ত্রিয়ঃ—ব্রজাঙ্গনাগণ; সম্মুমুহুঃ—মুহুর্মুহু মূর্চ্ছাপ্রাপ্ত হতেন; যৎ-আসয়াঃ—সেইভাবে অনুকম্পা লাভের আশায়।

অনুবাদ

হে সখিগণ, তিনি যাঁদের পাণিগ্রহণ করেছেন, সেই সমস্ত গৃহিণীদের কথা একবার চিন্তা কর! তাঁর অধরোষ্ঠ থেকে এখন অহরহ (চুম্বনের মাধ্যমে) সুধা

আস্বাদনের জন্য নিশ্চিতভাবে পূর্বজন্মে তাঁরা কতই না ব্রত পালন, পূত স্নান, যজ্ঞহোমাদি, আর পরমেশ্বরের সম্যক্ আরাধনা করেছেন। ব্রজভূমির ললনাগণ শুধু তেমনই অনুকম্পার আশায় মুহুর্মুহু মূর্ছাপ্রাপ্ত হতেন।

তাৎপর্য

শাস্ত্রে যে ধর্ম অনুষ্ঠানের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, তার উদ্দেশ্য হচ্ছে বদ্ধজীবের জড় গুণাবলী পবিত্র করে তাদের ধীরে ধীরে পরমেশ্বর ভগবানের চিন্ময় সেবা সম্পাদনের স্তরে উন্নীত করা। শুদ্ধ পারমার্থিক জীবনের এই অবস্থা লাভ করাই হচ্ছে সর্বোচ্চ সিদ্ধি, এবং এই অবস্থাকে বলা হয় *স্বরূপ* অথবা জীবের প্রকৃত পরিচয়। মুক্তির অর্থ হচ্ছে নতুন করে এই স্বরূপকে ফিরে পাওয়া। এই স্বরূপ-সিদ্ধিতে জীব প্রেমময়ী সেবার পাঁচটি স্তর প্রাপ্ত হয়, যার মধ্যে একটি হচ্ছে মাধুর্য রস। ভগবান সর্বদাই পূর্ণ, তাই তাঁর নিজের জন্য কোন বাসনা নেই। কিন্তু তা সত্ত্বেও তিনি প্রগাঢ় প্রেমকে সার্থক করার জন্য তাঁদের প্রভু, সখা, পুত্র অথবা পতিতে পরিণত হন। এখানে মাধুর্য রসের দুই প্রকার ভক্তের উল্লেখ করা হয়েছে। তাদের একটি হচ্ছে *স্বকীয়*, এবং অন্যটি *পরকীয়*। তাঁরা উভয়েই পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে মাধুর্য প্রেমে সম্পর্কিত। দ্বারকার মহিষীরা হচ্ছেন *স্বকীয়* অর্থাৎ বিবাহিতা পত্নী, কিন্তু ব্রজবালিকারা হচ্ছেন তাঁর অবিবাহিত অবস্থার বান্ধবী। ভগবান ষোল বছর বয়স পর্যন্ত বৃন্দাবনে ছিলেন এবং প্রতিবেশী বালিকাদের সঙ্গে তাঁর বন্ধুত্ব ছিল পরকীয় রসে। এই সমস্ত বালিকারা এবং মহিষীরা শাস্ত্রের নির্দেশ অনুসারে ব্রত, স্নান এবং অগ্নিহোত্র যজ্ঞ করার মাধ্যমে কঠোর তপস্যা করেছিলেন। এই সমস্ত অনুষ্ঠানগুলিই মানুষের লক্ষ্য নয়; এমনকি সকাম কর্ম, জ্ঞানের অনুশীলন অথবা যোগসিদ্ধি মানুষের উদ্দেশ্য নয়। সেগুলি হচ্ছে ভগবানের প্রতি স্বতঃস্ফূর্ত সেবা করার সর্বোচ্চ স্তর বা স্বরূপ প্রাপ্ত হওয়ার উপায়। প্রতিটি জীবই এই পাঁচটি রসের যে কোন একটিতে ভগবানের সঙ্গে সম্পর্কিত, এবং স্বরূপের শুদ্ধ চিন্ময় স্তরে সেই সম্পর্ক সব রকম ভৌতিক প্রবণতা থেকে মুক্ত হয়ে প্রকাশিত হয়। তাঁর পত্নীরা অথবা যুবতী প্রণয়িনীরা যে তাঁকে চুম্বন করেছিলেন, তাতে কোন রকম জড় জগতের বিকৃত গুণ নেই। তা যদি জড়জাগতিক হত, তা হলে শুকদেব গোস্বামীর মতো মুক্ত পুরুষেরা তা আস্বাদন করার চেষ্টা করতেন না, অথবা জড়জাগতিক জীবন ত্যাগ করার পর শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু এই সমস্ত বিষয়ের প্রতি আকৃষ্ট হতেন না। বহু জন্মের তপস্যার পর এই স্তর প্রাপ্ত হওয়া যায়।

শ্লোক ২৯

যা বীর্যশুল্কেন হৃতাঃ স্বয়ংবরে
প্রমথ্য চৈদ্যপ্রমুখান্ হি শুষ্মিণঃ ।
প্রদ্যুম্নসাম্বাম্বসুতাদয়োঽপরা
যাশ্চাহৃতা ভৌমবধে সহস্রশঃ ॥ ২৯ ॥

যা—রমণী; **বীর্য**—শক্তি; **শুল্কেন**—মূল্য প্রদান করার মাধ্যমে; **হৃতাঃ**—বলপূর্বক হরণ করেছিলেন; **স্বয়ংবরে**—স্বয়ংবর সভায়; **প্রমথ্য**—পরাভূত করেছিলেন; **চৈদ্য**—চেদিরাজ শিশুপাল; **প্রমুখান্**—প্রমুখ; **হি**—নিশ্চিতভাবে; **শুষ্মিণঃ**—অত্যন্ত শক্তিশালী; **প্রদ্যুম্ন**—প্রদ্যুম্ন (শ্রীকৃষ্ণের পুত্র); **সাম্ব**—সাম্ব; **অম্ব**—অম্ব; **সুত-আদয়ঃ**—পুত্রগণ; **অপরাঃ**—অন্য রমণীগণ; **যাঃ**—যাঁরা; **চ**—ও; **আহৃতাঃ**—আহরণ করেছিলেন; **ভৌম-বধে**—ভৌমাসুরকে বধ করে; **সহস্রশঃ**—সহস্র-সহস্র।

অনুবাদ

প্রদ্যুম্ন, সাম্ব, অম্ব, প্রমুখ সন্তানের জননী, রুক্মিণী, সত্যভামা এবং জাম্ববতীর মতো রমণীদের তিনি বলপূর্বক তাঁদের স্বয়ংবরসভা থেকে হরণ করেন এবং ভৌমাসুর ও তাঁর সহস্র-সহস্র সহচরকে নিহত করে পরে তিনি অন্যান্য মহিলাদেরও বলপূর্বক হরণ করেন। এই সব মহিলারা সকলেই মহিমান্বিত।

তাৎপর্য

পরাক্রমশালী রাজাদের অত্যন্ত গুণবতী কন্যাদের এক মুক্ত প্রতিযোগিতায় তাদের পতি মনোনয়ন করার স্বীকৃতি দেওয়া হত, এবং সেই অনুষ্ঠানকে বলা হত স্বয়ংবর সভা। যেহেতু স্বয়ংবর অনুষ্ঠানে প্রতিদ্বন্দ্বী বীর রাজকুমারদের মধ্যে প্রতিযোগিতা হত, তাই রাজকুমারীর পিতা সেই সমস্ত রাজকুমারদের নিমন্ত্রণ করতেন, এবং তাদের মধ্যে খেলোয়াড়ী মনোবৃত্তি নিয়ে রীতিমতো যুদ্ধ হত। এই প্রকার যুদ্ধে কখনও কখনও যুদ্ধরত প্রতিদ্বন্দ্বীর মৃত্যু হত এবং বিজয়ী রাজকুমার পুরস্কারস্বরূপ সেই রাজকন্যাকে লাভ করতেন, যার জন্য বহু রাজকুমার মৃত্যুবরণ করতেন। শ্রীকৃষ্ণের পাটরাণী রুক্মিণীদেবী ছিলেন বিদর্ভের রাজার কন্যা। বিদর্ভরাজ ভগবান শ্রীকৃষ্ণের হস্তে তাঁর অত্যন্ত গুণবতী এবং রূপবতী কন্যাকে সম্প্রদান করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু তাঁর জ্যেষ্ঠপুত্র চেয়েছিল যে শ্রীকৃষ্ণের জ্ঞাতিভ্রাতা রাজা শিশুপালের সঙ্গে যেন তাঁর পরিণয় হয়। অতএব, রুক্মিণীর স্বয়ংবর-সভায় মুক্ত

প্রতিযোগিতা হয়েছিল, এবং স্বাভাবিকভাবেই ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাঁর অতুলনীয় শক্তির দ্বারা শিশুপাল এবং অন্যান্য রাজকুমারদের পরাভূত করে বিজয়ী হয়েছিলেন। রুক্মিণীর প্রদ্যুম্ন আদি দশটি পুত্র ছিল। এইভাবেই ভগবান তাঁর অন্যান্য সমস্ত রানীদের জয় করেছিলেন। শ্রীকৃষ্ণের এই প্রতিযোগিতায় জয়লাভের ফলে অর্জিত সুন্দর পুরস্কারের বর্ণনা দশম স্কন্ধে পূর্ণরূপে বর্ণিত হবে। ভৌমাসুর তার কামনা-বাসনা চরিতার্থ করার জন্য বিভিন্ন রাজার ষোল হাজার একশ' জন সুন্দরী কন্যাকে বলপূর্বক অপহরণ করে বন্দী করে রেখেছিল। এই সমস্ত বালিকারা মুক্তির জন্য ভগবান শ্রীকৃষ্ণের কাছে কাতরভাবে প্রার্থনা করেছিলেন, এবং করুণাময় ভগবান তাঁদের ঐকান্তিক প্রার্থনার ফলে ভৌমাসুরকে যুদ্ধে বধ করে তাঁদের মুক্ত করেছিলেন। এই সমস্ত রাজকন্যাদের ভগবান তাঁর পত্নীরূপে গ্রহণ করেছিলেন, যদিও সামাজিক বিচারে তাঁরা সকলেই ছিলেন পতিতা। সর্বশক্তিমান ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এই সমস্ত বালিকাদের বিনীত প্রার্থনা শুনেছিলেন এবং রানীর মর্যাদা প্রদান করে তাঁদের বিবাহ করেছিলেন। এইভাবে দ্বারকায় ভগবানের ষোল হাজার একশ'আট জন মহিষী ছিলেন, এবং তাঁদের প্রত্যেকের মাধ্যমে তিনি দশটি সন্তান উৎপাদন করেছিলেন। এই সমস্ত সন্তানেরা প্রাপ্তবয়স্ক হয়েছিলেন, এবং তাঁদের পিতার মতো তাঁদেরও সম সংখ্যক সন্তান হয়েছিল। সর্বসমেত ভগবানের পরিবারের সদস্য সংখ্যা ছিল এক কোটি।

শ্লোক ৩০

এতাঃ পরং স্ত্রীত্বমপাস্তপেশলং
নিরস্তশৌচং বত সাধু কুর্বতে ।
যাসাং গৃহাৎপুষ্করলোচনঃ পতি-
র্ন জাত্বপৈত্যাহৃতিভির্হৃদি স্পৃশন্ ॥ ৩০ ॥

এতাঃ—এই সমস্ত রমণীগণ; **পরম্**—শ্রেষ্ঠ; **স্ত্রীত্বম্**—নারীত্ব; **অপাস্তপেশলম্**—স্বাতন্ত্র্যহীন; **নিরস্ত**—বিহীন; **শৌচম্**—পবিত্রতা; **বত সাধু**—পবিত্রভাবে মহিমান্বিত হয়েছেন; **কুর্বতে**—করেন ; **যাসাম্**—যাদের; **গৃহাৎ**—গৃহ থেকে; **পুষ্কর-লোচনঃ**—কমল নয়ন; **পতিঃ**—পতি; **ন**—না; **জাতু**—কখনো; **অপৈতি**—নির্গমন করেন; **আহৃতিভিঃ**—আহরণ করে উপহার দিয়েছিলেন; **হৃদি**—হৃদয়ে; **স্পৃশন্**—আনন্দ দেওয়ার জন্য।

অনুবাদ

সেই সমস্ত নারীগণ নিতান্ত অপবিত্র ও স্বাতন্ত্র্যহীন হওয়া সত্ত্বেও পবিত্রভাবে মহিমান্বিত হয়েছেন। তাঁদের পতি কমললোচন পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বহুমূল্য সামগ্রী আহরণ করে উপহারস্বরূপ প্রদানপূর্বক তাঁদের হৃদয়ের আনন্দ বর্ধন করেছেন এবং তাঁদের নিঃসঙ্গ রেখে কখনো তিনি গৃহ থেকে নির্গমন করেন না।

তাৎপর্য

ভগবানের ভক্ত হচ্ছেন শুদ্ধ আত্মা। যখনই ভক্ত ঐকান্তিকভাবে ভগবানের শ্রীপাদপদ্মের শরণাগত হন, ভগবান তখন তাঁকে গ্রহণ করেন, এবং তার ফলে তিনি তৎক্ষণাৎ সমস্ত জড় কলুষ থেকে মুক্ত হয়ে যান। এই প্রকার ভক্তেরা জড়া প্রকৃতির তিনটি গুণের অতীত। ভক্তের কোন শারীরিক অযোগ্যতা থাকে না, ঠিক যেমন নোংরা নর্দমার জল যখন গঙ্গায় এসে মেলে তখন গঙ্গার জলের সঙ্গে তার কোন গুণগত পার্থক্য থাকে না। স্ত্রী, বৈশ্য এবং শূদ্রেরা খুব একটা বুদ্ধিমান হয় না, এবং তাই তাদের পক্ষে ভগবত্তত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করা অথবা ভগবানের প্রেমময়ী সেবায় যুক্ত হওয়া কঠিন। তারা সাধারণত জড় বিষয়ের প্রতি অধিক আসক্ত। কিন্তু তাদের থেকেও নিকৃষ্ট হচ্ছে কিরাত, হূণ, অন্ধ্র, পুলিন্দ, পুক্কশ, আভীর, কঙ্ক, যবন, খস ইত্যাদি। কিন্তু তারাও যদি যথাযথভাবে ভগবদ্ভক্তিতে যুক্ত হয়, তা হলে তারাও উদ্ধার লাভ করে। ভগবানের সেবায় যুক্ত হওয়ার ফলে উপাধিজনিত অযোগ্যতাগুলি দূর হয়ে যায়, এবং বিশুদ্ধ আত্মারূপে তারা ভগবদ্ধামে প্রবেশ করার যোগ্যতা লাভ করে।

ভৌমাসুর কর্তৃক অপহৃতা পতিতা কন্যারা ঐকান্তিকভাবে উদ্ধারের জন্য ভগবান শ্রীকৃষ্ণের কাছে প্রার্থনা করেছিলেন, এবং তাঁদের ঐকান্তিক ভক্তির গুণে তাঁরা তৎক্ষণাৎ পবিত্র হয়েছিলেন। তাই ভগবান তাঁদেরকে পত্নীরূপে গ্রহণ করেছিলেন, এবং তাঁদের জীবন এইভাবে ধন্য হয়েছিল। এই প্রকার পবিত্র মহিমা আরও অধিক মহিমান্বিত হয়েছিল, যখন ভগবান তাঁদের প্রতি অত্যন্ত অনুরক্ত পতির মতো আচরণ করেছিলেন।

ভগবান নিরন্তর তাঁর ষোল হাজার একশ' আটজন পত্নীর সঙ্গে বাস করতেন। তিনি নিজেকে ষোল হাজার একশ' আট রূপে বিস্তার করেছিলেন, এবং তাঁরা সকলেই ছিলেন আদিপুরুষ থেকে অভিন্ন পরমেশ্বর ভগবান স্বয়ং। শ্রুতিমন্ত্রে প্রতিপন্ন হয়েছে যে ভগবান বহুরূপে নিজেকে বিস্তার করতে পারেন। বহু পত্নীর পতিরূপে তিনি তাঁদের বহু মূল্যবান উপহারের দ্বারা প্রসন্ন করেছিলেন, এমন কি কখনও কখনও

তিনি অত্যন্ত কঠোর প্রচেষ্টার মাধ্যমে সেই সমস্ত উপহার আহরণ করেছিলেন। তিনি স্বর্গ থেকে পারিজাত বৃক্ষ নিয়ে এসে তাঁর প্রধানা মহিষীদের অন্যতম সত্যভামার প্রাসাদে তা রোপণ করেছিলেন। অতএব কেউ যদি ভগবানকে তাঁর পতিরূপে পাওয়ার বাসনা করেন, তা হলে ভগবান তাঁর সেই বাসনা পূর্ণ করেন।

শ্লোক ৩১

এবংবিধা গদন্তীনাং স গিরঃ পুরযোষিতাম্ ।
নিরীক্ষণেনাভিনন্দন্ সস্মিতেন যযৌ হরিঃ ॥ ৩১ ॥

এবংবিধাঃ—এইভাবে; **গদন্তীনাম্**—এইভাবে তাঁর সম্বন্ধে কথোপকথনরতা; **সঃ**—তিনি (ভগবান); **গিরঃ**—বাক্য; **পুরযোষিতাম্**—পুরনারীদের; **নিরীক্ষণেন**—নিরীক্ষণ দ্বারা; **অভিনন্দন্**—অভিনন্দন জানিয়ে; **স-স্মিতেন**—সহাস্য বদনে; **যযৌ**—প্রস্থান করেছিলেন; **হরিঃ**—পরমেশ্বর ভগবান।

অনুবাদ

রাজধানী হস্তিনাপুরের পুরনারীগণ যখন এইভাবে বাক্যালাপ করছিলেন এবং তাঁকে অভিনন্দন জানাচ্ছিলেন, তখন পরমেশ্বর ভগবান শ্রীহরি স্মিতহাস্যে তাঁদের শুভ অভিনন্দন গ্রহণ করলেন এবং তাঁদের উপরে কৃপাদৃষ্টি নিক্ষেপপূর্বক নগর পরিত্যাগ করে চলে গেলেন।

শ্লোক ৩২

অজাতশত্রুঃ পৃতনাং গোপীথায় মধুদ্বিষঃ ।
পরেভ্যঃ শঙ্কিতঃ স্নেহাৎপ্রাযুঙ্ক্ত চতুরঙ্গিণীম্ ॥ ৩২ ॥

অজাত-শত্রুঃ—মহারাজ যুধিষ্ঠির, যাঁর কোন শত্রু ছিল না; **পৃতনাম্**—সৈন্য; **গোপীথায়**—রক্ষা করার জন্য; **মধু-দ্বিষঃ**—মধু নামক দৈত্যের শত্রু (শ্রীকৃষ্ণ); **পরেভ্যঃ**—অন্য শত্রুদের থেকে; **শঙ্কিতঃ**—আশঙ্কায়; **স্নেহাৎ**—স্নেহের বশে; **প্রাযুঙ্ক্ত**—নিয়োজিত করেছিলেন; **চতুঃ-অঙ্গিণীম্**—হস্তী, অশ্ব, রথ ও পদাতিক সৈন্য সমন্বিত চার প্রকার রক্ষীবাহিনী।

অনুবাদ

মহারাজ যুধিষ্ঠির অজাতশত্রু হলেও, অন্যান্য শত্রুদের হাতে মধু আদি অসুরদের শত্রু ভগবান শ্রীকৃষ্ণের কোনও অনিষ্টের আশঙ্কায় তাঁর প্রতিরক্ষার জন্য এবং স্নেহবশেও তাঁর সাথে হস্তী, অশ্ব, রথ এবং পদাতিক সৈন্য সমন্বিত এক বিরাট চতুরঙ্গ-বাহিনী প্রেরণ করেছিলেন।

তাৎপর্য

মানুষের প্রতিরক্ষার স্বাভাবিক উপায় হচ্ছে রথ এবং মনুষ্যসহ অশ্ব এবং হস্তী। অশ্ব এবং হস্তীদের পর্বত অথবা অরণ্য অথবা সমতল ভূমির যে কোন স্থানে যাওয়ার শিক্ষা দেওয়া হত। রথীরা তাদের শক্তিশালী বাণের দ্বারা, এমনকি আধুনিক যুগের আণবিক অস্ত্রের মতো শক্তিশালী ব্রহ্মাস্ত্রের দ্বারাও বহু ঘোড়া এবং হাতির সঙ্গে যুদ্ধ করতে পারত। মহারাজ যুধিষ্ঠির ভালভাবেই জানতেন যে শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন সকলেরই সুহৃদ্ এবং শুভাকাঙ্ক্ষী, কিন্তু তা সত্ত্বেও অসুরেরা স্বাভাবিকভাবে ভগবানের প্রতি ঈর্ষাপরায়ণ। তাই তারা তাঁকে আক্রমণ করতে পারে এই আশঙ্কায় এবং সেই সঙ্গে তাঁর প্রতি স্নেহের বশবর্তী হয়ে তিনি ভগবান শ্রীকৃষ্ণের দেহরক্ষীরূপে সর্ব প্রকার সৈন্যদের নিয়োগ করেছিলেন। প্রয়োজন হলে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাঁর প্রতি শত্রুভাবাপন্ন অসুরদের আক্রমণ থেকে নিজেকে রক্ষা করতে পারতেন, কিন্তু তা সত্ত্বেও মহারাজ যুধিষ্ঠিরের সমস্ত আয়োজন তিনি স্বীকার করেছিলেন, কেননা তিনি তাঁর জ্যেষ্ঠভ্রাতা মহারাজ যুধিষ্ঠিরের আদেশ অমান্য করতে পারতেন না। ভগবান তাঁর দিব্য লীলায় তাঁর ভক্তের অধীন হওয়ার ভূমিকা অবলম্বন করেন, এবং তাই কখনো কখনো তিনি তাঁর তথাকথিত অসহায় বাল্যাবস্থায় যশোদা মায়ের রক্ষণাবেক্ষণ স্বীকার করেন। সেটি হচ্ছে ভগবানের অপ্রাকৃত লীলা। ভগবান এবং ভক্তের মধ্যে যে দিব্য আদান-প্রদান হয় তা কেবল দিব্য আনন্দ আস্বাদন করার জন্য, যার সঙ্গে ব্রহ্মানন্দের পর্যন্ত তুলনা হয় না।

শ্লোক ৩৩

অথ দূরাগতান্ শৌরিঃ কৌরবান্ বিরহাতুরান্ ।
সংনিবর্ত্য দৃঢ়ং স্নিগ্ধান্ প্রায়াৎস্বনগরীং প্রিয়ৈঃ ॥ ৩৩ ॥

অথ—তারপর; **দূরাগতান্**—বহুদূর অবধি সহগমনকারী; **শৌরিঃ**—শ্রীকৃষ্ণ; **কৌরবান্**—কুরুবংশীয় পাণ্ডবেরা; **বিরহাতুরান্**—বিরহকাতর; **সন্নিবর্ত্য**—প্রত্যাবর্তন

করার জন্য বিনম্রভাবে প্ররোচিত করেছিলেন; দৃঢ়ম্—দৃঢ়; স্নিগ্ধান্—স্নেহপূর্ণ; প্রায়াৎ—অগ্রসর হয়েছিলেন; স্বনগরীম্—তাঁর নগরী (দ্বারকা) অভিমুখে; প্রিয়ৈঃ—অন্তরঙ্গ অনুগামীদের সঙ্গে।

অনুবাদ

শ্রীকৃষ্ণের প্রতি গভীর স্নেহের বশে বিচ্ছেদ-ব্যাকুল কুরুবংশীয় পাণ্ডবেরা বহুদূর পর্যন্ত শ্রীকৃষ্ণের সহগমন করেছিলেন। তখন তাঁদের ফিরে যেতে রাজী করিয়ে পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাঁর অন্তরঙ্গ অনুগামীদের সঙ্গে স্বীয় দ্বারকাপুরীতে গমন করলেন।

শ্লোক ৩৪-৩৫

কুরুজাঙ্গলপাঞ্চালান্ শূরসেনান্ সযামুনান্ ।
ব্রহ্মাবর্তং কুরুক্ষেত্রং মৎস্যান্ সারস্বতানথ ॥ ৩৪ ॥
মরুধন্বমতিক্রম্য সৌবীরাভীরয়োঃ পরান্ ।
আনর্তান্ ভার্গবোপাগাচ্ছ্রান্তবাহো মনাগ্বিভুঃ ॥ ৩৫ ॥

কুরু-জাঙ্গল—বর্তমান দিল্লীপ্রদেশ; **পাঞ্চালান্**—বর্তমান পাঞ্জাব প্রদেশের কিয়দংশ; **শূরসেনান্**—উত্তর প্রদেশের কিয়দংশ; **স**—সহ; **যামুনান্**—যমুনা তীরবর্তী প্রদেশ; **ব্রহ্মাবর্তম্**—উত্তর প্রদেশের উত্তরাঞ্চল; **কুরুক্ষেত্রম্**—যেখানে যুদ্ধ হয়েছিল; **মৎস্যান্**—মৎস্য প্রদেশ; **সারস্বতান্**—পাঞ্জাবের অংশ; **অথ**—ইত্যাদি; **মরু**—মরুভূমি রাজস্থান; **ধন্বম্**—মধ্যপ্রদেশ, যেখানে জল খুব কম; **অতিক্রম্য**—অতিক্রম করে; **সৌবীর**—সৌরাষ্ট্র; **আভীরয়োঃ**—গুজরাটের অংশ; **পরান্**—পশ্চিম দিক; **আনর্তান্**—দ্বারকাপ্রদেশ; **ভার্গব**—হে শৌনক; **উপাগাৎ**—প্রাপ্ত হয়ে; **শ্রান্ত**—ক্লান্তি; **বাহঃ**—অশ্ব; **মনাক্**—ঈষৎ; **বিভুঃ**—শ্রীকৃষ্ণ।

অনুবাদ

হে ভৃগুনন্দন শৌনক, তারপর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যমুনা তটবর্তী কুরুজাঙ্গল, পাঞ্চাল, শূরসেনা, ব্রহ্মাবর্ত, কুরুক্ষেত্র, মৎস্য, সারস্বত প্রদেশ এবং বারিহীন ও অল্প জলবিশিষ্ট মরুপ্রদেশ সমূহ ধীরে ধীরে অতিক্রম করে ঈষৎ পরিশ্রান্ত অবস্থায় অশ্ববাহিত হয়ে সৌভীর ও আভীর দেশের পশ্চিমবর্তী প্রদেশ দ্বারকায় অবশেষে উপস্থিত হলেন।

তাৎপর্য

ভগবান যে সমস্ত প্রদেশ অতিক্রম করেছিলেন তখনকার দিনে সেই সমস্ত প্রদেশ ভিন্ন নামে পরিচিত ছিল। কিন্তু এখানে যে দিঙ্‌নির্ণয় করা হয়েছে তা থেকে সহজেই সূচিত হয় যে তিনি দিল্লী, পাঞ্জাব, রাজস্থান, মধ্যপ্রদেশ, সৌরাষ্ট্র এবং গুজরাট হয়ে অবশেষে তাঁর নিবাসস্থান দ্বারকায় উপস্থিত হয়েছিলেন। তখনকার সেই সমস্ত প্রদেশগুলির নাম এখন কি নাম হয়েছে সেই নিয়ে গবেষণা করে কোন লাভ নেই, কিন্তু এই বর্ণনা থেকে বোঝা যায় যে রাজস্থানের মরুভূমি এবং মধ্যপ্রদেশের মতো অল্প জলবিশিষ্ট স্থান পাঁচ হাজার বছর আগেও ছিল। নৃতত্ত্ববিদেরা যে বলে মরুভূমিগুলির বিকাশ সম্প্রতি হয়েছে তা *শ্রীমদ্ভাগবতের* বর্ণনায় স্বীকৃত হয়নি। আমরা এই বিষয়টি ভূতত্ত্ববিদ্‌দের গবেষণার জন্য ছেড়ে দিতে পারি, কেননা পরিবর্তনশীল ব্রহ্মাণ্ডের ভূমির বিকাশের বিভিন্ন অবস্থা রয়েছে। ভগবান যে কুরুপ্রদেশ থেকে তাঁর নিজের রাজ্য দ্বারকাধামে পৌঁছেছেন সেজন্য আমরা অত্যন্ত প্রসন্নতা অনুভব করছি। কুরুক্ষেত্র বৈদিক যুগ থেকে বর্তমান, তাই যখন ভাষ্যকারেরা কুরুক্ষেত্রের অস্তিত্ব অস্বীকার করে, তখন বোঝা যায় যে তারা এক-একটি মহামূর্খ।

শ্লোক ৩৬

তত্র তত্র হ তত্রত্যৈর্হরিঃ প্রত্যুদ্যতার্হণঃ।
সায়ং ভেজে দিশং পশ্চাদ্গবিষ্ঠো গাং গতস্তদা ॥ ৩৬ ॥

তত্র তত্র—বিভিন্ন স্থানে; **হ**—হয়েছিল; **তত্রত্যৈঃ**—সেখানকার স্থানীয় অধিবাসীদের দ্বারা; **হরিঃ**—পরমেশ্বর ভগবান শ্রীহরি; **প্রত্যুদ্যত-অর্হণঃ**—নিবেদিত উপহার-সামগ্রী এবং শ্রদ্ধার্ঘ্য; **সায়ম্**—সন্ধ্যাবেলায়; **ভেজে**—সেবা নিবেদন করে; **দিশম্**—দিক; **পশ্চাৎ**—পশ্চিমে; **গবিষ্ঠঃ**—আকাশের সূর্য; **গাম্**—সমুদ্রে; **গতঃ**—গত; **তদা**—তখন।

অনুবাদ

এই সমস্ত প্রদেশগুলির মধ্য দিয়ে পরিভ্রমণকালে সেখানকার স্থানীয় অধিবাসীরা পরমেশ্বর ভগবান শ্রীহরিকে অভ্যর্থনা জানিয়েছিল, আরাধনা করেছিল এবং বিভিন্ন উপহার-সামগ্রী নিবেদন করেছিল। সন্ধ্যাবেলায় সকল স্থানেই পরমেশ্বর ভগবান সান্ধ্যকালীন ধর্মীয় কৃত্যসমূহ আচরণের জন্য তাঁর ভ্রমণ স্থগিত রাখতেন। পশ্চিম দিগন্তে সমুদ্রবক্ষে সূর্য অস্তমিত হলে নিয়মিতভাবেই তিনি এই বিধি পালন করতেন।

তাৎপর্য

এখানে বলা হয়েছে যে ভগবান যখন ভ্রমণ করছিলেন, তখন তিনি নিয়মিতভাবে ধর্মীয় বিধি পালন করছিলেন। এক প্রকার দার্শনিক অনুমান রয়েছে যে, ভগবানও সকাম কর্মের বাধ্য। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তা সত্য নয়। তিনি কোন ভাল অথবা মন্দ কর্মের উপর নির্ভরশীল নন। যেহেতু ভগবান হচ্ছেন পরম তত্ত্ব, তাই তিনি যা করেন তা সবই সকলের মঙ্গলের জন্য। কিন্তু যখন তিনি পৃথিবীতে অবতরণ করেন, তখন তিনি ভক্তদের রক্ষা করার জন্য এবং পাপী অভক্তদের বিনাশ করার জন্য আচরণ করেন। যদিও তাঁর কোন কর্তব্যকর্ম নেই, তথাপি তিনি এমনভাবে আচরণ করেন যাতে অন্যরা তাঁকে অনুসরণ করে। প্রকৃতপক্ষে এটিই হচ্ছে শিক্ষা দেওয়ার পন্থা; নিজে আচরণ করে অন্যদের শিক্ষা দিতে হয়; তা না হলে অন্ধের মতো কেউই কারও শিক্ষা গ্রহণ করবে না। তিনি নিজেই হচ্ছেন কর্মফলদাতা। তিনি স্বয়ংসম্পূর্ণ, কিন্তু তা সত্ত্বেও আমাদের শিক্ষা দেওয়ার জন্য শাস্ত্রের নির্দেশ অনুসারে আচরণ করেন। তিনি যদি তা না করতেন, তা হলে সাধারণ মানুষ বিপথগামী হত। কিন্তু উন্নত স্তরে, ভক্ত যখন ভগবানের দিব্য প্রকৃতি উপলব্ধি করতে পারেন, তখন তিনি তাঁকে অনুকরণ করার চেষ্টা করেন না। ভগবানকে অনুকরণ করা কখনই সম্ভব নয়।

মানব সমাজে ভগবান সকলের করণীয় কর্তব্য সম্পাদন করেন, কিন্তু কখনও কখনও তিনি অসাধারণ কার্যও সম্পাদন করেন যা জীবের পক্ষে অনুকরণীয় নয়। এখানে যে তাঁর সান্ধ্য-বন্দনার বর্ণনা করা হয়েছে তা জীবের পক্ষে অনুসরণ করা অবশ্য কর্তব্য, কিন্তু তিনি যে গিরি-গোবর্ধন ধারণ করেছিলেন অথবা গোপিকাদের সঙ্গে নৃত্য করেছিলেন, তা অনুকরণ করা সম্ভব নয়। কেউই সূর্যের অনুকরণ করতে পারে না, যা নোংরা স্থান থেকেও জল শোষণ করে নেয়। অত্যন্ত শক্তিশালী ব্যক্তিরা এমন কিছু করতে পারেন যা সকলের জন্য কল্যাণপ্রদ, কিন্তু আমরা যদি তা অনুকরণ করার চেষ্টা করি, তা হলে আমাদের অন্তহীন বিপদে পড়তে হবে। অতএব, সমস্ত কর্ম আচরণে অভিজ্ঞ পথ-প্রদর্শকের প্রয়োজন, যিনি হচ্ছেন ভগবানের করুণার প্রকাশস্বরূপ সদ্ গুরুদেব। সর্বদা তাঁর পরামর্শ গ্রহণ করা প্রয়োজন, এবং তা হলেই নিশ্চিতরূপে পারমার্থিক মার্গে অগ্রসর হওয়া যাবে।

ইতি "ভগবান শ্রীকৃষ্ণের দ্বারকা যাত্রা" নামক শ্রীমদ্ভাগবতের প্রথম স্কন্ধের দশম অধ্যায়ের ভক্তিবেদান্ত তাৎপর্য।

একাদশ অধ্যায়

ভগবান শ্রীকৃষ্ণের দ্বারকায় প্রবেশ

শ্লোক ১

সূত উবাচ

আনর্তান্ স উপব্রজ্য স্বৃদ্ধাঞ্জনপদান্ স্বকান্ ।
দধ্মৌ দরবরং তেষাং বিষাদং শময়ন্নিব ॥ ১ ॥

সূতঃ উবাচ—সূত গোস্বামী বললেন; আনর্তান্—আনর্তদের দেশ (দ্বারকা) থেকে; সঃ—তিনি; উপব্রজ্য—সমীপবর্তী হয়ে; স্বৃদ্ধান্—অত্যন্ত সমৃদ্ধশালী; জন-পদান্—নগরী; স্বকান্—তাঁর নিজের; দধ্মৌ—ধ্বনিত হয়েছিল; দরবরম্—মঙ্গল শঙ্খ (পাঞ্চজন্য); তেষাম্—তাদের; বিষাদম্—বিষণ্ণতা; শময়ন্—প্রশমিত করার জন্য; ইব—যেন।

অনুবাদ

সূত গোস্বামী বললেন : তিনি (শ্রীকৃষ্ণ) আনর্তদের দেশে (দ্বারকা) তাঁর অতি সমৃদ্ধশালী মহানগরীর প্রান্তে উপস্থিত হয়ে তাঁর আগমন-বার্তা ঘোষণা করে যেন সেই দেশবাসীর বিষণ্ণতা প্রশমনের জন্যই তাঁর মঙ্গল-শঙ্খটি (পাঞ্চজন্য) ধ্বনিত করলেন।

তাৎপর্য

প্রিয়তম ভগবান কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের কারণে তাঁর সমৃদ্ধিশালী রাজধানী দ্বারকা থেকে দীর্ঘকাল অনুপস্থিত ছিলেন, এবং তার ফলে সেখানকার সমস্ত অধিবাসীরা তাঁর বিরহে বিষাদাচ্ছন্ন ছিল। ভগবান যখন পৃথিবীতে অবতরণ করেন, তখন তাঁর নিত্য পার্ষদেরাও তাঁর সঙ্গে আসেন, ঠিক যেমন রাজার অনুচরেরা সব সময় রাজার সঙ্গে থাকেন। ভগবানের এই সমস্ত পার্ষদেরা হচ্ছেন নিত্যমুক্ত আত্মা, এবং ভগবানের প্রতি তাঁদের গভীর অনুরাগের ফলে তাঁরা এক পলকের জন্যও ভগবানের

বিরহ সহ্য করতে পারেন না। তাই দ্বারকা নগরীর অধিবাসীরা বিষাদাচ্ছন্ন ছিলেন এবং তাঁরা যে কোন মুহূর্তে ভগবানের আগমনের প্রত্যাশা করছিলেন। তাই মঙ্গল-শঙ্খের আগমন-সূচক ধ্বনি বিষাদ প্রশমিত করে তাঁদের হৃদয়ে উৎসাহের সঞ্চার করেছিল। তাঁরা সকলে তাঁদের মাঝখানে ভগবানকে দর্শন করতে উৎসুক হয়েছিলেন, এবং তাঁরা সকলে তাঁকে যথাযথভাবে স্বাগত জানাবার জন্য তৎপর হয়েছিলেন। এইগুলি ভগবানের প্রতি স্বতঃস্ফূর্ত প্রেমের লক্ষণ।

শ্লোক ২

স উচ্চকাশে ধবলোদরো দরো-
ঽপ্যুরুক্রমস্যাধরশোণশোণিমা ।
দাধ্মায়মানঃ করকঞ্জসম্পুটে
যথাব্জখণ্ডে কলহংস উৎস্বনঃ ॥২॥

সঃ—সেই; **উচ্চকাশে**—অতিশয় শোভমান; **ধবল-উদরঃ**—শুভ্র উদর; **দরঃ**—শঙ্খ; **অপি**—যদিও; **উরুক্রমস্য**—মহাবিক্রমশালী; **অধরশোণ**—অপ্রাকৃত অধরের গুণে; **শোণিমা**—রক্তাভ; **দাধ্মায়মানঃ**—ধ্বনিত হয়েছিল; **কর-কঞ্জ-সম্পুটে**—তাঁর করকমলে ধৃত; **যথা**—যেমন; **অব্জ-খণ্ডে**—পদ্মনালে; **কলহংসঃ**—রাজহংস; **উৎস্বনঃ**—উচ্চনাদ।

অনুবাদ

শুভ্র স্ফীতোদর শঙ্খটি পরমেশ্বর ভগবানের করকমলে বিধৃত হয়ে তাঁর দ্বারা ধ্বনিত হলে, তাঁর অপ্রাকৃত অধরোষ্ঠের স্পর্শে সেটি রক্তিমাভ হয়ে উঠেছিল। তখন মনে হচ্ছিল, একটি শুভ্র রাজহংস যেন রক্তিমাভ কমলদলের মৃণাল মধ্যে উচ্চরবে খেলা করছে।

তাৎপর্য

ভগবানের অধর স্পর্শে শ্বেত-শঙ্খের রক্তিমা পারমার্থিক মাহাত্ম্যব্যঞ্জক। ভগবান পূর্ণ চিন্ময়, এবং জড় হচ্ছে সেই চিন্ময় অস্তিত্ব সমন্ধে অজ্ঞানতা। প্রকৃতপক্ষে চিন্ময় জ্ঞানের আলোকে জড় বলে কোন বস্তু নেই, এবং পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সান্নিধ্য লাভের ফলে তৎক্ষণাৎ এই চিন্ময় জ্ঞানের আলোক প্রকাশিত হয়। সমস্ত অস্তিত্বের প্রতিটি অণু-পরমাণুতে ভগবান রয়েছেন, এবং তিনি যে

কোন ব্যক্তির কাছে তাঁর উপস্থিতি প্রকাশ করতে পারেন। ভগবানের প্রতি প্রগাঢ় প্রেম এবং ভক্তির দ্বারা, অর্থাৎ ভগবানের চিন্ময় সান্নিধ্যের ফলে সব কিছুই ভগবানের হস্তধৃত শঙ্খের মতো চিন্ময় রক্তিমা প্রাপ্ত হয়; এবং পরমহংস বা পরম বুদ্ধিমান ব্যক্তিরা, চিন্ময় আনন্দরূপ জলে, ভগবানের পাদপদ্মরূপ পদ্মের দ্বারা নিত্য অলংকৃত হয়ে কলহংসের মতো ক্রীড়া করেন।

শ্লোক ৩

তমুপশ্রুত্য নিনদং জগদ্ভয়ভয়াবহম্ ।
প্রত্যুদ্যয়ুঃ প্রজাঃ সর্বা ভর্তৃদর্শনলালসাঃ ॥৩॥

তম্—তা; **উপশ্রুত্য**—শ্রবণ করে; **নিনদম্**—ধ্বনি; **জগৎ-ভয়**—জড় জগতের ভয়; **ভয়াবহম্**—ভয়জনক; **প্রতি**—তাঁর প্রতি; **উদ্যয়ুঃ**—দ্রুতবেগে গমন করেছিলেন; **প্রজাঃ**—নাগরিকেরা; **সর্বাঃ**—সকলে; **ভর্তৃ**—রক্ষাকর্তা; **দর্শন**—দর্শনে; **লালসাঃ**—বাসনায়।

অনুবাদ

সংসারের মহাভয় বিনাশক সেই শঙ্খ-নিনাদ শুনে, সকল ভক্তবৃন্দের রক্ষাকর্তা পরমেশ্বর ভগবানকে দর্শনের বহুপ্রতীক্ষিত বাসনায় দ্বারকাবাসী সকলেই তাঁর প্রতি দ্রুত ধাবিত হলেন।

তাৎপর্য

যে কথা পূর্বে বলা হয়েছে, ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সময় দ্বারকার নাগরিকেরা সকলেই ছিলেন মুক্তজীব, এবং তাঁরা ভগবানের পার্ষদরূপে ভগবানের সঙ্গে সেখানে অবতরণ করেছিলেন। যদিও চিন্ময় সান্নিধ্যের ফলে তাঁরা কখনও ভগবানের থেকে বিচ্ছিন্ন ছিলেন না, তবুও তাঁরা সকলে ভগবানকে দর্শন করার জন্য অত্যন্ত ব্যাকুল ছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ গোচারণে গেলে বৃন্দাবনের গোপবালিকারা যেভাবে শ্রীকৃষ্ণের কথা চিন্তা করতেন, ঠিক তেমনই কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে যোগদান করার জন্য শ্রীকৃষ্ণ যখন দ্বারকা থেকে দূরে ছিলেন, তখন দ্বারকাবাসীরাও সর্বদা শ্রীকৃষ্ণের চিন্তায় মগ্ন থাকতেন। বাংলার একজন বিখ্যাত ঔপন্যাসিক তাঁর কল্পনার ভিত্তিতে স্থির করেছেন যে, বৃন্দাবনের কৃষ্ণ, মথুরার কৃষ্ণ এবং দ্বারকার কৃষ্ণ হচ্ছেন ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তি। এই সিদ্ধান্তের কোন ঐতিহাসিক ভিত্তি নেই। কুরুক্ষেত্রের কৃষ্ণ এবং দ্বারকার কৃষ্ণ একই ব্যক্তি।

সূর্যের অনুপস্থিতিতে রাত্রিবেলা আমরা যেমন বিষাদগ্রস্ত হই, ঠিক তেমনই দিব্য দ্বারকা নগরী থেকে শ্রীকৃষ্ণের অনুপস্থিতির ফলে দ্বারকাবাসীরা শোকাকুল হয়েছিলেন। শ্রীকৃষ্ণের আগমনসূচক ধ্বনি প্রভাতে সূর্যের উদয়ের মতো মনে হয়েছিল। কৃষ্ণ-সূর্যের উদয়ের ফলে সমস্ত দ্বারকাবাসীরা নিদ্রা থেকে উত্থিত হয়েছিলেন, এবং ভগবানকে দর্শন করার জন্য দ্রুতবেগে তাঁর প্রতি ধাবিত হয়েছিলেন। ভগবদ্ভক্তেরা ভগবানকে ছাড়া আর কাউকে তাঁদের রক্ষক বলে মনে করেন না।

ভগবানের এই ধ্বনি ভগবান থেকে অভিন্ন, যা আমরা ভগবানের অদ্বয় স্থিতি বিশ্লেষণ করার মাধ্যমে বোঝাবার চেষ্টা করেছি। আমাদের জড় অস্তিত্বের বর্তমান স্থিতি ভীতিপূর্ণ। আহারের সমস্যা, বাসস্থানের সমস্যা, ভয় থেকে আত্মরক্ষা করার সমস্যা এবং মৈথুনের সমস্যা, জড় অস্তিত্বের এই চারটি সমস্যার ফলে জীব অধিক থেকে অধিকতর কষ্টভোগ করে। পরবর্তী সমস্যা সম্বন্ধে অজ্ঞতার ফলে আমরা সর্বদা ভয়ে ভীত থাকি। মায়া নামক ভগবানের বহিরঙ্গা শক্তির সান্নিধ্যের ফলে সেটি হয়, কিন্তু ভগবানের ধ্বনি শ্রবণ করা মাত্রই আমাদের সমস্ত ভয় দূর হয়ে যায়। ভগবানের এই ধ্বনির প্রতিনিধিত্ব করে তাঁর দিব্য নাম, যা শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু নিম্নলিখিত ষোলটি শব্দের মাধ্যমে প্রদান করেছেন—

হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে

এই ধ্বনির আশ্রয় গ্রহণ করে আমরা জড় অস্তিত্বের সমস্ত ভয়াবহ সমস্যা থেকে মুক্ত হতে পারি।

শ্লোক ৪-৫

তত্রোপনীতবলয়ো রবের্দীপমিবাদৃতাঃ ।
আত্মারামং পূর্ণকামং নিজলাভেন নিত্যদা ॥৪॥
প্রীত্যুৎফুল্লমুখাঃ প্রোচুর্হর্ষগদ্‌গদয়া গিরা ।
পিতরং সর্বসুহৃদমবিতারমিবার্ভকাঃ ॥৫॥

তত্র—সেখানে; **উপনীত**—নিবেদন করে; **বলয়ঃ**—উপহারসমূহ; **রবেঃ**—সূর্যকে; **দীপম্**—প্রদীপ; **ইব**—মতো; **আদৃতাঃ**—সমাদরে; **আত্ম-আরামম্**—আত্মানন্দে; **পূর্ণ-কামম্**—পূর্ণরূপে পরিতৃপ্ত; **নিজ-লাভেন**—তাঁর স্বীয় শক্তির দ্বারা; **নিত্য-দা**—নিরন্তর যিনি দান করেন; **প্রীতি**—অনুরাগ; **উৎফুল্ল-মুখাঃ**—প্রসন্ন বদনে; **প্রোচুঃ**—বলতে

লাগলেন; **হর্ষ**—আনন্দিত; **গদ্‌গদয়া**—গদগদ উচ্ছ্বাসে; **গিরা**—স্বরে; **পিতরম্**—পিতাকে; **সর্ব**—সমস্ত; **সুহৃদম্**—সুহৃদবর্গ; **অবিতারম্**—অভিভাবককে; **ইব**—মতো; **অর্ভকাঃ**—সন্তানেরা।

অনুবাদ

নগরবাসীরা তাঁদের উপহার-সামগ্রী নিয়ে পরমেশ্বর ভগবানের সমক্ষে উপস্থিত হলেন এবং যিনি পূর্ণ পরিতৃপ্ত ও স্বয়ংসম্পূর্ণ, যিনি তাঁর আপন শক্তির দ্বারা সকলকে নিরন্তর সব কিছু দিয়ে থাকেন, তাঁকে সেই অর্ঘগুলি নিবেদন করলেন। এই সকল উপহার সামগ্রী যেন সূর্যের কাছে প্রদীপ নিবেদনের মতোই হয়েছিল। তবুও সন্তানেরা যেভাবে তাদের পিতা, বন্ধুবান্ধব এবং অভিভাবককে সমাদর করে থাকে, সেইভাবেই নগরবাসীরা পরমেশ্বর ভগবানকে অভ্যর্থনা জানাবার মানসে, দিব্য আনন্দে উচ্ছ্বসিত স্বরে কথা বলতে লাগলেন।

তাৎপর্য

পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে এখানে আত্মারাম বলে বর্ণনা করা হয়েছে। তিনি আত্মতৃপ্ত, এবং তাঁকে অন্যত্র সুখের অন্বেষণ করতে হয় না। তিনি স্বয়ংসম্পূর্ণ, কেননা তাঁর অস্তিত্ব পূর্ণ আনন্দময়। তিনি নিত্য, পূর্ণ জ্ঞানময় এবং পূর্ণ আনন্দময়। তাই কোন উপহার, তা যত মূল্যবানই হোক না কেন, তাঁর তাতে কোন প্রয়োজন নেই। কিন্তু তা সত্ত্বেও, যেহেতু তিনি সকলের শুভাকাঙ্ক্ষী, তাই শুদ্ধ ভক্তি সহকারে যে কেউ তাঁকে যা কিছু নিবেদন করেন, তাই তিনি গ্রহণ করেন। এমন নয় যে তাঁর সেই সমস্ত বস্তুর প্রয়োজন আছে, কেননা সবকিছুই তাঁর থেকে উৎপন্ন হয়েছে। এখানে ভগবানকে কোন কিছু নিবেদন করার সঙ্গে সূর্যদেবকে দীপ নিবেদন করার তুলনা করা হয়েছে। তাপ এবং আলোক সমন্বিত সমস্ত বস্তুই সূর্যদেবের শক্তির প্রকাশ, কিন্তু তা সত্ত্বেও সূর্যদেবকে পূজা করার সময় দীপ নিবেদন করতে হয়। সূর্যপূজক কোন কিছু পাওয়ার আশা নিয়ে সূর্যদেবের পূজা করে, কিন্তু ভগবানের প্রেমময়ী সেবায় ভক্ত বা ভগবান উভয়েরই কোন কিছু চাওয়ার প্রশ্ন থাকে না। সেটি কেবল ভগবান এবং ভক্তের মধ্যে শুদ্ধ প্রেম ও অনুরাগের লক্ষণ।

ভগবান হচ্ছেন সমস্ত জীবের পরম পিতা, এবং তাই যাঁরা ভগবানের সঙ্গে এই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সম্পর্ক সম্বন্ধে সচেতন, তাঁরা সেই পরম পিতার কাছে পুত্রের মতো আবেদন করতে পারেন এবং পরম পিতাও উদারভাবে তাঁর অনুগত পুত্রের

প্রার্থনা পূর্ণ করতে পারেন। ভগবান ঠিক কল্পবৃক্ষের মতো, এবং ভগবানের অহৈতুকী কৃপার ফলে সকলেই সব কিছু পেতে পারে। কিন্তু পরম পিতা হওয়ার ফলে ভগবান তাঁর শুদ্ধ ভক্তকে এমন কোন কিছু দেন না যা ভক্তিমার্গে প্রতিবন্ধক হতে পারে। যাঁরা ভগবানের প্রেমময়ী সেবায় যুক্ত, তাঁরা তাঁর দিব্য আকর্ষণের দ্বারা অনন্য ভক্তির স্তরে উন্নীত হতে পারেন।

শ্লোক ৬

নতাঃ স্ম তে নাথ সদাঙ্ঘ্রিপঙ্কজং
বিরিঞ্চবৈরিঞ্চ্যসুরেন্দ্রবন্দিতম্ ।
পরায়ণং ক্ষেমমিহেচ্ছতাং পরং
ন যত্র কালঃ প্রভবেৎ পরঃ প্রভুঃ ॥৬॥

নতাঃ—অবনত হয়ে; **স্ম**—আমরা করেছি; **তে**—আপনাকে; **নাথ**—হে প্রভু; **সদা**—সর্বদা; **অঙ্ঘ্রি-পঙ্কজম্**—শ্রীপাদপদ্ম; **বিরিঞ্চ**—ব্রহ্মা, প্রথম সৃষ্ট জীব; **বৈরিঞ্চ্য**—সনক, সনাতন আদি ব্রহ্মার পুত্রগণ; **সুর-ইন্দ্র**—দেবরাজ ইন্দ্র; **বন্দিতম্**—পূজিত; **পরায়ণম্**—পরম শরণ; **ক্ষেমম্**—মঙ্গল; **ইহ**—এই জীবনে; **ইচ্ছতাম্**—আকাঙ্ক্ষী; **পরম**—সর্বোত্তম; **ন**—না; **যত্র**—যেখানে; **কালঃ**—অপ্রতিহত সময়; **প্রভবেৎ**—প্রভাব বিস্তার করতে পারে; **পরঃ**—জড়াতীত; **প্রভুঃ**—পরমেশ্বর ভগবান।

অনুবাদ

প্রজারা বললেন ঃ হে প্রভু, আপনি ব্রহ্মা, চতুঃসন এবং ইন্দ্রাদি দেবতাদেরও পূজিত। যারা জীবনের পরম কল্যাণ লাভ করতে চায়, আপনি তাদের পরম গতি। আপনি জড়াতীত পরমেশ্বর ভগবান, এবং অপ্রতিহত কালও আপনার উপর তার প্রভাব বিস্তার করতে পারে না।

তাৎপর্য

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, *ব্রহ্ম-সংহিতা* এবং অন্যান্য বৈদিক শাস্ত্রে প্রতিপন্ন হয়েছে যে, শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন পরমেশ্বর ভগবান। কেউই তাঁর সমকক্ষ নন অথবা তাঁর থেকে শ্রেষ্ঠ নন, এবং সেটিই হচ্ছে সমস্ত শাস্ত্রের নির্দেশ। পরমেশ্বর ভগবানের বিভিন্ন অংশ জীবদের উপর কাল ও স্থানের প্রভাব প্রয়োগ করা হয়। জীব হচ্ছে আশ্রিত ব্রহ্ম, কিন্তু পরমেশ্বর ভগবান হচ্ছেন আশ্রয়স্বরূপ পরম ব্রহ্ম। সেই সরল সত্যটি

যখন আমরা ভুলে যাই, তখনই আমরা মায়াচ্ছন্ন হয়ে পড়ি, এবং তার ফলে আমরা ত্রিতাপ দুঃখের কবলীভূত হই, ঠিক যেভাবে মানুষ ঘন অন্ধকারে আবৃত হয়। অভিজ্ঞ জীবের শুদ্ধ চেতনা হচ্ছে ভগবদ্-চেতনা, যার ফলে সে সর্ব অবস্থাতেই ভগবানকে প্রণতি নিবেদন করে।

শ্লোক ৭

ভবায় নস্ত্বং ভব বিশ্বভাবন
ত্বমেব মাতাথ সুহৃৎপতিঃ পিতা ।
ত্বং সদ্‌গুরুর্নঃ পরমং চ দৈবতং
যস্যানুবৃত্ত্যা কৃতিনো বভূবিম ॥৭॥

ভবায়—মঙ্গলের জন্য; **নঃ**—আমাদের; **ত্বম্**—আপনি; **ভব**—হন; **বিশ্ব-ভাবন**—ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টিকর্তা; **ত্বম্**—আপনার; **এব**—অবশ্যই; **মাতা**—মাতা; **অথ**—ও; **সুহৃৎ**—শুভাকাঙ্ক্ষী; **পতিঃ**—স্বামী; **পিতা**—পিতা; **ত্বম্**—আপনার; **সৎ-গুরুঃ**—সদ্‌গুরু; **নঃ**—আমাদের ; **পরমম্**—পরম; **চ**—এবং; **দৈবতম্**—আরাধ্য ভগবান; **যস্য**—যাঁর; **অনুবৃত্ত্যা**—পদাঙ্ক অনুসরণ করে; **কৃতিনঃ**—সফল; **বভূবিম**—আমরা হয়েছি।

অনুবাদ

হে জগতের সৃষ্টিকর্তা, আপনি আমাদের মাতা, শুভাকাঙ্ক্ষী, প্রভু, পতি, পিতা, গুরু এবং আরাধ্য ভগবান। আপনার পদাঙ্ক অনুসরণ করে আমরা সর্বতোভাবে সার্থক হয়েছি। তাই আমরা প্রার্থনা করি যেন আপনি সর্বদাই আমাদের উপর আপনার কৃপা বর্ষণ করেন।

তাৎপর্য

সর্বমঙ্গলময় পরমেশ্বর ভগবান ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টিকর্তা হওয়ার ফলে, সমস্ত সৎ জীবনের মঙ্গলের পরিকল্পনা করেন। সৎ জীবেরা তাঁর সদুপদেশ অনুসরণ করার জন্য ভগবান কর্তৃক উপদিষ্ট হয়ে থাকে, এবং তা করার ফলে তারা জীবনের সর্বস্তরে সাফল্যমণ্ডিত হয়। ভগবান ব্যতীত অন্য কোন দেবদেবীর পূজা করার কোন প্রয়োজন হয় না। ভগবান সর্বশক্তিমান, এবং তাঁর শ্রীপাদপদ্মে আমাদের শরণাগতির ফলে তিনি যদি প্রসন্ন হন, তা হলে আমাদের জাগতিক এবং পারমার্থিক উভয়

জীবনই সাফল্যমণ্ডিত করার জন্য তিনি আমাদের সর্বতোভাবে আশীর্বাদ করতে পারেন। মনুষ্য জীবন হচ্ছে ভগবানের সঙ্গে আমাদের নিত্য সম্পর্কের কথা অবগত হয়ে পারমার্থিক জীবন লাভের একটি সুযোগ। ভগবানের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক নিত্য। সেই সম্পর্ক কখনও ছিন্ন করা যায় না অথবা বিনষ্ট করা যায় না। সাময়িকভাবে তা ভুলে যাওয়া যায়, কিন্তু আমরা যদি তাঁর নির্দেশ অনুসরণ করি, যা সর্বদা এবং সর্বত্র শাস্ত্রে প্রকাশিত হয়েছে, তা হলে তাঁর কৃপায় সেই সম্পর্ক পুনর্জাগরিত করা যেতে পারে।

শ্লোক ৮

অহো সনাথা ভবতা স্ম যদ্বয়ং
ত্রৈবিষ্টপানামপি দূরদর্শনম্ ।
প্রেমস্মিতস্নিগ্ধনিরীক্ষণাননং
পশ্যেম রূপং তব সর্বসৌভগম্ ॥৮॥

অহো—আহা, পরম সৌভাগ্য; **স-নাথাঃ**—প্রভুর আশ্রয়ে স্থিত; **ভবতা**—আপনার দ্বারা; **স্ম**—হয়েছি; **যৎ-বয়ম্**—আমরা যেমন; **ত্রৈবিষ্টপানাম্**—দেবতাদের; **অপি**—ও; **দূর-দর্শনম্**—দুর্লভ দর্শন; **প্রেম-স্মিত**—প্রেমপূর্ণ হাস্যযুক্ত; **স্নিগ্ধ**—স্নেহপূর্ণ; **নিরীক্ষণ-আননম্**—সেই ভাবযুক্ত মুখমণ্ডল; **পশ্যেম**—আমরা যেন দেখতে পাই; **রূপম্**—সৌন্দর্য; **তব**—আপনার; **সর্ব**—সমস্ত; **সৌভগম্**—মঙ্গল।

অনুবাদ

আহা, এটি আমাদের পরম সৌভাগ্য যে, পুনরায় আপনার কৃপায় অনাথ আমরা সনাথ হয়েছি। আপনি স্বর্গের দেবতাদের দুর্লভ দর্শন। আপনি ফিরে আসায়, আপনার ঈষৎ হাস্যযুক্ত স্নেহদৃষ্টিময় বদনমণ্ডল এবং সর্বমঙ্গলময় এই অপ্রাকৃত রূপ আমরা দর্শন করতে পারছি।

তাৎপর্য

ভগবানের শুদ্ধ ভক্তরাই কেবল তাঁর শাশ্বত সবিশেষ স্বরূপ দর্শন করতে পারেন। ভগবান কখনই নির্বিশেষ নন, পক্ষান্তরে তিনি হচ্ছেন পরম ব্রহ্ম পরমেশ্বর, যাঁকে ভগবদ্ভক্তির দ্বারা প্রত্যক্ষভাবে দর্শন করা যায়, যা স্বর্গলোকের অধিবাসীদের পক্ষেও দুর্লভ। ব্রহ্মা এবং অন্যান্য দেবতারা যখন ভগবান শ্রীকৃষ্ণের অংশস্বরূপ বিষ্ণুর

উপদেশ গ্রহণ করতে গিয়েছিলেন, তখন তাঁদের ক্ষীর সমুদ্রের তীরে অপেক্ষা করতে হয়েছিল, যেখানে শ্বেতদ্বীপ নামক স্থানে শ্রীবিষ্ণু শয়ন করেন। এই ক্ষীর সমুদ্র এবং শ্বেতদ্বীপ এই ব্রহ্মাণ্ডে বৈকুণ্ঠলোকের প্রতিকৃতি। ব্রহ্মাজী এবং ইন্দ্র আদি দেবতারাও এই শ্বেতদ্বীপে প্রবেশ করতে পারেন না; তাঁরা কেবল ক্ষীর সমুদ্রের তীরে দাঁড়িয়ে ক্ষীরোদকশায়ী বিষ্ণুর কাছে তাঁদের বার্তা প্রেরণ করতে পারেন। অতএব ভগবানকে দর্শন করা তাঁদের পক্ষেও দুর্লভ, কিন্তু দ্বারকার অধিবাসীরা, সকাম কর্ম এবং মনোধর্মী জ্ঞানের জড় কলুষ থেকে মুক্ত শুদ্ধ ভক্ত হওয়ার ফলে, ভগবানের কৃপায় প্রত্যক্ষভাবে তাঁকে দর্শন করতে পারেন। সেটিই হচ্ছে জীবের আদি স্থিতি, এবং আমাদের স্বাভাবিক স্বরূপ পুনর্জাগরিত করার মাধ্যমে তা লাভ করা যায়, যা কেবল ভগবদ্ভক্তির দ্বারাই সম্ভব।

শ্লোক ৯

যর্হ্যম্বুজাক্ষাপসসার ভো ভবান্
কুরূন্ মধূন্ বাথ সুহৃদ্দিদৃক্ষয়া ।
তত্রাব্দকোটিপ্রতিমঃ ক্ষণো ভবেদ্
রবিং বিনাক্ষ্ণোরিব নস্তবাচ্যুত ॥৯॥

যর্হি—যখনই; **অম্বুজ-অক্ষ**—হে কমললোচন; **অপসসার**—আপনি চলে যান; **ভো**—হে; **ভবান্**—আপনি; **কুরূন্**—কৌরবগণ; **মধূন্**—মথুরার (ব্রজভূমির) অধিবাসীগণ; **বা**—অথবা; **অথ**—তাই; **সুহৃৎ-দিদৃক্ষয়া**—বন্ধুদের সাক্ষাৎ করার জন্য; **তত্র**—তখন; **অব্দ-কোটি**—কোটি বছর; **প্রতিমঃ**—মতো; **ক্ষণঃ**—কাল; **ভবেৎ**—হয়; **রবিম্**—সূর্য; **বিনা**—বিহীন; **অক্ষ্ণোঃ**—চক্ষুর; **ইব**—মতো; **নঃ**—আমাদের; **তব**—আপনার; **অচ্যুত**—হে অচ্যুত।

অনুবাদ

হে কমললোচন শ্রীহরি, যখন আপনি আপনার বন্ধুদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করার জন্য আমাদের পরিত্যাগ করে মথুরা, বৃন্দাবন বা হস্তিনাপুরে গমন করেন, তখন আপনার বিচ্ছেদ-বিরহে এক মুহূর্ত সময়ও আমাদের কাছে কোটি কোটি বছরের মতো মনে হয়। হে অচ্যুত, তখন আমাদের অবস্থা সূর্যের কিরণ থেকে বঞ্চিত চক্ষুর মতো হয়।

তাৎপর্য

আমরা আমাদের জড় ইন্দ্রিয়ের গর্বে গর্বিত হয়ে ভগবানের অস্তিত্ব নিরূপণ করার জন্য তা প্রয়োগ করি। কিন্তু আমরা ভুলে যাই যে আমাদের ইন্দ্রিয়গুলি পূর্ণ নয়। কয়েকটি বিশেষ অবস্থাতেই কেবল তা কার্য করতে পারে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, যখন সূর্যের আলো থাকে তখনই কেবল চক্ষু কিছু মাত্রায় কার্যকরী হয়, কিন্তু সূর্য না থাকলে চক্ষু সম্পূর্ণ অকেজো হয়ে যায়। শ্রীকৃষ্ণ আদি পুরুষ ভগবান, পরম তত্ত্ব হওয়ার ফলে তাঁকে সূর্যের সঙ্গে তুলনা করা হয়। তাঁকে ছাড়া আমাদের সমস্ত জ্ঞান হয় ভ্রান্ত, নয় আংশিক। সূর্যের বিপরীত হচ্ছে অন্ধকার, এবং তেমনই কৃষ্ণের বিপরীত হচ্ছে মায়া। শ্রীকৃষ্ণের দ্বারা বিচ্ছুরিত আলোকের প্রভাবে ভগবানের ভক্তরা সব কিছু যথাযথভাবে দর্শন করতে পারেন। ভগবানের কৃপায় শুদ্ধ ভক্ত অজ্ঞানের অন্ধকারে থাকতে পারেন না। তাই আমাদের সর্বদা শ্রীকৃষ্ণের দৃষ্টির সমক্ষে থাকা প্রয়োজন, যাতে আমরা নিজেদের এবং বিভিন্ন শক্তিসমন্বিত ভগবানকে দর্শন করতে পারি। আমরা যেমন সূর্যের অনুপস্থিতিতে কোন কিছু দেখতে পাই না, তেমনই ভগবানের উপস্থিতি ব্যতিরেকেও আমরা কোন কিছু দেখতে পাই না, এমন কি আমরা নিজেদের পর্যন্ত দেখতে পাই না। তাঁকে ছাড়া আমাদের সমস্ত জ্ঞান মায়ার দ্বারা আবৃত হয়ে যায়।

শ্লোক ১০

কথং বয়ং নাথ চিরোষিতে ত্বয়ি প্রসন্নদৃষ্ট্যাখিলতাপশোষণম্ ।
জীবেম তে সুন্দরহাসশোভিতমপশ্যমানা বদনং মনোহরম্ ॥
ইতি চোদীরিতা বাচঃ প্রজানাং ভক্তবৎসলঃ ।
শৃণ্বানোঽনুগ্রহং দৃষ্ট্যা বিতন্বন্ প্রাবিশৎ পুরম্ ॥১০॥

কথম্—কিভাবে; **বয়ম্**—আমরা; **নাথ**—হে প্রভু; **চিরোষিতে**—প্রায় চিরকালই প্রবাসে থাকায়; **ত্বয়ি**—আপনি; **প্রসন্ন**—তৃপ্ত; **দৃষ্ট্যা**—দৃষ্টিপাতের দ্বারা; **অখিল**—সমস্ত; **তাপ**—ক্লেশ; **শোষণম্**—নাশক; **জীবেম**—বেঁচে থাকতে সক্ষম হব; **তে**—আপনার; **সুন্দর**—সুন্দর; **হাস**—হাস্য; **শোভিতম্**—শোভিত; **অপশ্যমানাঃ**—না দেখে; **বদনম্**—মুখ; **মনোহরম্**—আকর্ষণীয়; **ইতি**—এইভাবে; **চ**—এবং; **উদীরিতাঃ**—বলে; **বাচঃ**—বাক্য; **প্রজানাম্**—প্রজাদের; **ভক্ত-বৎসলঃ**—ভক্তদের প্রতি কৃপাপরায়ণ; **শৃণ্বানঃ**—শ্রবণ করে; **অনুগ্রহম্**—কৃপা; **দৃষ্ট্যা**—দৃষ্টিপাতের দ্বারা; **বিতন্বন্**—বিতরণ করেছিলেন; **প্রাবিশৎ**—প্রবেশ করেছিলেন; **পুরম্**—দ্বারকাপুরীতে।

অনুবাদ

হে প্রভু, আপনি যদি এইভাবে সব সময় প্রবাসে থাকেন, তা হলে সমস্ত তাপ মোচনকারী সুন্দর হাস্য শোভিত আপনার মুখমণ্ডল দর্শন না করতে পেরে কিভাবে আমরা জীবন ধারণ করতে পারি?

তখন ভক্তবৎসল ভগবান প্রজাদের এই প্রকার অভিনন্দনবাক্যসমূহ শ্রবণ করে সহর্ষে তাঁর চিন্ময় দৃষ্টিপাতের দ্বারা কৃপা বিস্তার করতে করতে দ্বারকা নগরীতে প্রবেশ করলেন।

তাৎপর্য

শ্রীকৃষ্ণের আকর্ষণ এতই প্রবল যে তাঁর প্রতি একবার আকৃষ্ট হলে তাঁর বিরহ আর সহ্য করা যায় না। কেন এমন হয়? কারণ আমরা সকলে তাঁর সঙ্গে শাশ্বত সম্পর্কে সম্পর্কিত, ঠিক যেমন সূর্যকিরণ সূর্যমণ্ডলের সঙ্গে নিত্য সম্পর্কযুক্ত। সূর্যকিরণ সূর্যের বিকিরণের অণুসদৃশ অংশ। তাই সূর্যকিরণকে সূর্য থেকে বিচ্ছিন্ন করা যায় না। মেঘের দ্বারা তার বিচ্ছেদ সাময়িক ও কৃত্রিম, এবং মেঘ সরে গেলে সূর্যের উপস্থিতিতে সূর্যকিরণ পুনরায় তার স্বাভাবিক জ্যোতি প্রকাশ করে। তেমনই পূর্ণ পরম আত্মার অণুসদৃশ অংশ জীবেরা মায়ার কৃত্রিম আবরণের দ্বারা ভগবান থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। এই মোহময়ী শক্তি বা মায়ার যবনিকা যখন উত্তোলন করা হয় তখন জীব ভগবানকে সাক্ষাৎভাবে দর্শন করতে পারে, এবং তখন তার সমস্ত দুঃখ দুর্দশা দূর হয়ে যায়। আমরা সকলেই আমাদের জীবনের দুঃখ দুর্দশা দূর করতে চাই, কিন্তু তা কিভাবে সম্ভব তা আমরা জানি না। এখানে সেই সমস্যার সমাধান দেওয়া হয়েছে, এবং তা নির্ভর করছে আমরা তা গ্রহণ করব কি না তার উপর।

শ্লোক ১১

মধুভোজদশার্হার্হকুকুরান্ধকবৃষ্ণিভিঃ ।
আত্মতুল্যবলৈর্গুপ্তাং নাগৈর্ভোগবতীমিব ॥১১॥

মধু—মধু; ভোজ—ভোজ; দশার্হ—দশার্হ; অর্হ—অর্হ; কুকুর—কুকুর; অন্ধক—অন্ধক; বৃষ্ণিভিঃ—বৃষ্ণিদের দ্বারা; আত্ম-তুল্য—নিজের মতো; বলৈঃ—শক্তিশালী; গুপ্তাম্—সুরক্ষিত; নাগৈঃ—নাগদের দ্বারা; ভোগবতীম্—ভোগবতী নামক নাগলোকের রাজধানী; ইব—মতো।

অনুবাদ

নাগলোকের রাজধানী ভোগবতী যেমন নাগদের দ্বারা সুরক্ষিত, তেমনই দ্বারকা নগরী শ্রীকৃষ্ণেরই মতো বলশালী মধু, ভোজ, দশার্হ, অর্হ, কুকুর, অন্ধক ও বৃষ্ণিদের দ্বারা সুরক্ষিত ছিল।

তাৎপর্য

নাগলোক পৃথিবীর নীচে অবস্থিত, এবং সূর্যকিরণ সেখানে প্রবেশ করতে পারে না। তবে সেখানকার অন্ধকার দূর হয় নাগদের (স্বর্গীয় সর্পের) মাথার মণির জ্যোতির দ্বারা; এবং বলা হয় যে নাগদের উপভোগের জন্য সেখানে অনেক সুন্দর সুন্দর বাগান, নদী ইত্যাদি রয়েছে। এখানকার বর্ণনা থেকেও বোঝা যায় যে সেই স্থানটি সেখানকার অধিবাসীদের দ্বারা সুরক্ষিত। দ্বারকা নগরীও তেমন বৃষ্ণি বংশীয়দের দ্বারা সুরক্ষিত ছিল; এই বৃষ্ণি বংশীয়েরা ছিলেন ভগবানেরই মতো শক্তিশালী, যে প্রকার শক্তি ভগবান এই জগতে প্রকাশ করেছিলেন।

শ্লোক ১২

সর্বর্তুসর্ববিভবপুণ্যবৃক্ষলতাশ্রমৈঃ ।
উদ্যানোপবনারামৈর্বৃতপদ্মাকরশ্রিয়ম্ ॥১২॥

সর্ব—সমস্ত; ঋতু—ঋতু; সর্ব—সমস্ত; বিভব—ঐশ্বর্য; পুণ্য—পুণ্যবন্ত; বৃক্ষ—বৃক্ষ; লতা—লতা; আশ্রমৈঃ—আশ্রম দ্বারা; উদ্যান—উদ্যান; উপবন—উপবন; আরামৈঃ—বিলাসকুঞ্জ; বৃত—পরিবৃত; পদ্ম-আকর—পদ্মের জন্মস্থান বা সুন্দর সরোবর; শ্রিয়ম্—সৌন্দর্য বর্ধনকারী।

অনুবাদ

দ্বারকা নগরী সমস্ত ঋতুর সর্ববিধ ঐশ্বর্য ও সম্পদে পরিপূর্ণ ছিল। সেখানে সর্বত্র পবিত্র বৃক্ষ ও লতা, আশ্রম, উদ্যান, উপবন, বিলাসকুঞ্জ এবং বিকশিত পদ্মে পূর্ণ সরোবর ছিল।

তাৎপর্য

মানব সভ্যতার পূর্ণতা প্রকৃতির দানগুলি যথাযথভাবে ব্যবহার করার মাধ্যমেই লাভ করা সম্ভব, যা এখানে দ্বারকার ঐশ্বর্য বর্ণনায় প্রকট হয়েছে। দ্বারকা নগরী পুষ্প

এবং ফলের উদ্যানে পরিবৃত ছিল, আর ছিল পদ্মফুলে পরিপূর্ণ বহু সরোবর। সেখানে কোন কলকারখানা বা সেগুলিকে সাহায্য করার জন্য কসাইখানার উল্লেখ নেই, যা হচ্ছে আধুনিক নগরীর অপরিহার্য অঙ্গ। প্রকৃতির উপহারগুলির সদ্ব্যবহার করার প্রবণতা আধুনিক যুগের সভ্য মানুষদের হৃদয়েও রয়েছে। আধুনিক সভ্যতার নেতারা তাদের বাসস্থান নির্মাণের জন্য এমন স্থান মনোনয়ন করে, যেখানে এই প্রকার সুন্দর উদ্যান এবং সরোবরের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য রয়েছে, কিন্তু সাধারণ মানুষদের তারা উদ্যান এবং বাগানবিহীন সংকীর্ণ এলাকায় থাকতে দেয়। দ্বারকাপুরীর যে বর্ণনা এখানে আমরা পাই তা কিন্তু সম্পূর্ণ ভিন্ন। আমরা দেখতে পাই যে সেই ধাম পদ্মশোভিত সরোবর সমন্বিত উদ্যান এবং বাগানে পরিবৃত ছিল। আমরা জানতে পারি যে সেখানকার সমস্ত মানুষ প্রকৃতির দানরূপ ফল এবং ফুলের উপর নির্ভর করতেন। সেখানে কোন যান্ত্রিক উদ্যোগ ছিল না, যার ফলে মানুষের বাসস্থান নোংরা কুঁড়ে ঘরে পূর্ণ বস্তিতে পরিণত হয়। সভ্যতার প্রগতির মাপকাঠি মানুষের সূক্ষ্ম প্রবৃত্তিগুলির বিনাশকারী মিল এবং কলকারখানার বৃদ্ধি নয়, পক্ষান্তরে তা হয় মানুষের আধ্যাত্মিক প্রবৃত্তির বিকাশের মাধ্যমে, যার ফলে তারা ভগবদ্ধামে ফিরে যাওয়ার সুযোগ পায়। কলকারখানা এবং মিলের বিকাশকে বলা হয় উগ্রকর্ম, এবং এই প্রকার কর্মের ফলে মানুষের কোমল মনোবৃত্তি বিনষ্ট হয়ে যায় এবং সমাজ অসুরদের অন্ধকার কারাগারে পরিণত হয়।

এখানে আমরা পুণ্যবান বৃক্ষের উল্লেখ দেখতে পাই, যা ঋতু অনুসারে ফুল এবং ফল উৎপাদন করে। জঙ্গলের অকেজো বৃক্ষগুলি পুণ্যহীন, এবং তাদের কেবল জ্বালানী কাঠ হিসাবেই ব্যবহার করা যায়। আধুনিক সভ্যতায় এই প্রকার পুণ্যহীন গাছগুলিকে রাস্তার পাশে লাগানো হয়। পারমার্থিক উপলব্ধির জন্য সূক্ষ্ম অনুভূতিগুলি বিকশিত করার উদ্দেশ্যে মানুষের শক্তির যথাযথ সদ্ব্যবহার করা উচিত, কেননা এই পারমার্থিক উপলব্ধির মধ্যেই নিহিত রয়েছে জীবনের সমস্যাগুলির প্রকৃত সমাধান। মনুষ্য শরীরের সূক্ষ্ম কোষগুলি বিকশিত করার জন্য ফল, ফুল, সুন্দর বাগান, উদ্যান, পদ্মফুলের মাঝে ক্রীড়ারত হংস সমন্বিত সরোবর, এবং যথেষ্ট পরিমাণে দুধ ও মাখন প্রদানকারী গাভীর অত্যন্ত প্রয়োজন। এগুলির বিপরীত, কলকারখানা এবং খনি সেখানকার শ্রমিকদের আসুরিক প্রবৃত্তি বৃদ্ধি করে। শ্রমিকশ্রেণীর কঠোর পরিশ্রমে স্বার্থান্বেষী মালিক সম্প্রদায় পুষ্ট হয় এবং তার ফলে তাদের মধ্যে নানাভাবে কঠোর সংঘর্ষ হয়। দ্বারকাধামের এই বর্ণনা মানব সভ্যতার আদর্শ।

শ্লোক ১৩

গোপুরদ্বারমার্গেষু কৃতকৌতুকতোরণাম্ ।
চিত্রধ্বজপতাকাগ্রৈরন্তঃ প্রতিহতাতপাম্ ॥১৩॥

গোপুর—নগরীর প্রধান ফটক; **দ্বার**—দরজা; **মার্গেষু**—বিভিন্ন পথে; **কৃত**—নির্মিত; **কৌতুক**—উৎসব; **তোরণাম্**—তোরণ; **চিত্র**—চিত্রিত; **ধ্বজ**—ধ্বজা; **পতাকা-অগ্রৈঃ**—পতাকাদির অগ্রভাগে; **অন্তঃ**—মধ্যে; **প্রতিহতা**—প্রতিহত, **তপাম্**—সূর্যকিরণ।

অনুবাদ

পরমেশ্বর ভগবানকে স্বাগত জানাবার জন্য পুরদ্বার, গৃহদ্বার এবং পথিপার্শ্বে নির্মিত তোরণসমূহ উৎসবের চিহ্নস্বরূপ ধ্বজ, পতাকা, কদলীবৃক্ষ, আম্রপল্লব, পুষ্পমাল্যের দ্বারা সুন্দরভাবে সাজানো হয়েছিল, এবং সেগুলি সমবেতভাবে সূর্যকিরণকে রুদ্ধ করে ছায়া সৃষ্টি করেছিল।

তাৎপর্য

বিশেষ উৎসবে সাজসজ্জা বা অলঙ্করণের উপকরণসমূহও সংগ্রহ করা হত কদলী বৃক্ষ, আম্রপল্লব, ফুল এবং ফল আদি প্রকৃতির দান থেকে। আম্র বৃক্ষ, নারিকেল বৃক্ষ এবং কদলী বৃক্ষ আজও মাঙ্গলিক প্রতীক বলে মনে করা হয়। উপরে যে পতাকার উল্লেখ করা হয়েছে তাতে ভগবানের দুজন মহান ভক্ত গরুড় বা হনুমানের চিত্র অঙ্কিত ছিল। এখন এই প্রকার চিত্র এবং অলঙ্করণ ভক্তদের দ্বারা পূজিত হয়, এবং ভগবানের সন্তুষ্টি বিধানের জন্য সেবককে অধিক সম্মান প্রদান করা হয়।

শ্লোক ১৪

সম্মার্জিতমহামার্গরথ্যাপণকচত্বরাম্ ।
সিক্তাং গন্ধজলৈরুপ্তাং ফলপুষ্পাক্ষতাঙ্কুরৈঃ ॥১৪॥

সম্মার্জিত—পূর্ণরূপে পরিষ্কৃত; **মহা-মার্গ**—রাজপথ; **রথ্যা**—বীথি বা ক্ষুদ্র পথসমূহ; **আপনক**—পণ্যবিপণী; **চত্বরাম্**—জনসম্মিলনের অঙ্গন; **সিক্তাম্**—পরিসিক্ত; **গন্ধ-জলৈঃ**—সুবাসিত বারি; **উপ্তাম্**—ছড়ানো হয়েছিল; **ফল**—ফল; **পুষ্প**—ফুল; **অক্ষত**—অভগ্ন; **অঙ্কুরৈঃ**—বীজসমূহ।

অনুবাদ

রাজপথ, সঙ্কীর্ণ পথ, পণ্যবিপণি এবং অঙ্গনসমূহ অত্যন্ত সুন্দরভাবে পরিষ্কার করা হয়েছিল এবং তারপর সুবাসিত বারিতে পরিসিক্ত হয়েছিল। ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে স্বাগত জানাবার জন্য ফল, ফুল এবং অভগ্ন শস্যাদির অঙ্কুরসমূহ সর্বত্র ছড়ানো হয়েছিল।

তাৎপর্য

দ্বারকাধামের রাজপথ এবং রাস্তাঘাট গোলাপ, কেওড়া আদি ফুলের নির্যাস থেকে তৈরী সুগন্ধিত জলের দ্বারা সিক্ত হয়েছিল। বাজার এবং জনসাধারণের মিলনস্থলগুলি খুব ভালভাবে পরিষ্কার করা হয়েছিল। উপরোক্ত বর্ণনা থেকে বোঝা যায় যে দ্বারকাধাম ছিল বহু রাজপথ, বড় রাস্তা, জনসাধারণের মিলনস্থল, উদ্যান, বাগিচা, সরোবর সমন্বিত এক বিশাল নগরী, এবং সেখানকার সমস্ত স্থানগুলি ফুল ও ফলে সুসজ্জিত ছিল। ভগবানকে স্বাগত জানাবার জন্য সার্বজনীন স্থানগুলিতে ফল, ফুল এবং শস্যের অঙ্কুর ছড়ানো হয়েছিল। শস্য এবং ফলের অক্ষত অঙ্কুর মঙ্গলজনক বলে বিবেচনা করা হয়, এবং হিন্দুরা উৎসবের দিনে আজও তা ব্যবহার করে।

শ্লোক ১৫

দ্বারি দ্বারি গৃহাণাং চ দধ্যক্ষতফলেক্ষুভিঃ ।
অলঙ্কৃতাং পূর্ণকুম্ভৈর্বলিভির্ধূপদীপকৈঃ ॥১৫॥

দ্বারি দ্বারি—দ্বারে দ্বারে; **গৃহাণাম্**—সমস্ত গৃহের; **চ**—এবং; **দধি**—দই; **অক্ষত**—অভগ্ন; **ফল**—ফল; **ইক্ষুভিঃ**—আখ; **অলঙ্কৃতাম্**—সজ্জিত; **পূর্ণ-কুম্ভৈঃ**—জলপূর্ণ কলসী; **বলিভিঃ**—পূজার উপকরণ; **ধূপ**—ধূপ; **দীপকৈঃ**—দীপ।

অনুবাদ

প্রতিটি আবাসগৃহের দ্বারে দ্বারে দধি, অভগ্ন ফল, ইক্ষু এবং জলপূর্ণ কলস প্রভৃতি মাঙ্গলিক সামগ্রী রাখা হয়েছিল, এবং পূজার উপকরণ, ধূপ এবং দীপ প্রভৃতির দ্বারা সুশোভিত করা হয়েছিল।

তাৎপর্য

বৈদিক প্রথা অনুসারে স্বাগত-বিধি মোটেই শুষ্ক ছিল না। উপরে যা উল্লেখ করা হয়েছে, সেভাবে কেবল রাস্তাঘাট সাজিয়েই স্বাগত জানানো হয়নি, উপরন্তু প্রত্যেকের নিজ নিজ সামর্থ্য অনুসারে ধূপ, দীপ, ফুল, মিষ্টি, ফল, সুস্বাদু আহার্য ইত্যাদি উপকরণের দ্বারা ভগবানের পূজাও করা হয়েছিল। সবকিছু ভগবানকে নিবেদন করা হয়েছিল এবং তাঁর ভুক্তাবশেষ নাগরিকদের মধ্যে বিতরণ করা হয়েছিল। অতএব সেটি আজকালকার মতো শুষ্ক স্বাগত-সম্ভাষণের মতো ছিল না। প্রতিটি গৃহই এইভাবে ভগবানকে স্বাগত জানাবার জন্য প্রস্তুত ছিল, এবং এইভাবে রাজপথের ও প্রতিটি রাস্তার প্রতিটি গৃহ থেকে নাগরিকদের প্রসাদ বিতরণ করা হয়েছিল, এবং তাই সেই উৎসব সাফল্যমণ্ডিত হয়েছিল। প্রসাদ বিতরণ না করা হলে কোন উৎসব পূর্ণ হয় না; সেটিই হচ্ছে বৈদিক সংস্কৃতির পন্থা।

শ্লোক ১৬-১৭

নিশম্য প্রেষ্ঠমায়ান্তং বসুদেবো মহামনাঃ ।
অক্রূরশ্চোগ্রসেনশ্চ রামশ্চাদ্ভুতবিক্রমঃ ॥১৬॥
প্রদ্যুম্নশ্চারুদেষ্ণশ্চ সাম্বো জাম্ববতীসুতঃ ।
প্রহর্ষবেগোচ্ছ্বশিতশয়নাসনভোজনাঃ ॥১৭॥

নিশম্য—শ্রবণ করে; **প্রেষ্ঠম্**—প্রিয়তম; **আয়ান্তম্**—আসছেন; **বসুদেবঃ**—বসুদেব (শ্রীকৃষ্ণের পিতা); **মহা-মনাঃ**—মহাত্মা; **অক্রূরঃ**—অক্রূর; **চ**—এবং; **উগ্রসেনঃ**—উগ্রসেন; **চ**—এবং; **রামঃ**—বলরাম (শ্রীকৃষ্ণের জ্যেষ্ঠভ্রাতা); **চ**—এবং; **অদ্ভুত**—অলৌকিক; **বিক্রমঃ**—বলবান; **প্রদ্যুম্নঃ**—প্রদ্যুম্ন; **চারুদেষ্ণঃ**—চারুদেষ্ণ; **চ**—এবং; **সাম্বঃ**—সাম্ব; **জাম্ববতী-সুতঃ**—জাম্ববতীর পুত্র; **প্রহর্ষ**—অত্যন্ত আনন্দিত হয়ে; **বেগ**—আতিশয্যে; **উচ্ছ্বশিত**—উচ্ছ্বসিত হয়ে; **শয়ন**—শয়ন; **আসন**—আসন; **ভোজনাঃ**—ভোজন।

অনুবাদ

প্রিয়তম শ্রীকৃষ্ণ দ্বারকাধামে আসছেন শুনে মহাত্মা বসুদেব, অক্রূর, উগ্রসেন, অদ্ভুত বলশালী বলদেব, প্রদ্যুম্ন, চারুদেষ্ণ ও জাম্ববতী-নন্দন সাম্ব, সকলেই আনন্দের আতিশয্যে উচ্ছ্বসিত হয়ে শয়ন, আসন, ভোজন পরিত্যাগ করেছিলেন।

তাৎপর্য

বসুদেব ঃ রাজা সুরসেনের পুত্র, দেবকীর পতি এবং ভগবান শ্রীকৃষ্ণের পিতা। তিনি ছিলেন কুন্তীর ভ্রাতা এবং সুভদ্রার পিতা। সুভদ্রা তাঁর পিসতুতো ভাই অর্জুনকে বিবাহ করেছিলেন, এবং এই প্রথা ভারতের কোন কোন প্রদেশে এখনও প্রচলিত। উগ্রসেন বসুদেবকে তাঁর মন্ত্রীর পদে নিযুক্ত করেছিলেন, এবং পরে বসুদেব উগ্রসেনের ভ্রাতা দেবকের আট কন্যাকে বিবাহ করেন। দেবকী ছিলেন তাঁদের মধ্যে একজন। কংস ছিলেন তাঁর শ্যালক, এবং বসুদেব স্বেচ্ছায় কংসের বন্দীত্ব স্বীকার করেন এবং দেবকীর গর্ভজাত অষ্টম পুত্রকে তার হাতে তুলে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেন। শ্রীকৃষ্ণের ইচ্ছায় সেই প্রতিশ্রুতি প্রতিহত হয়েছিল। পাণ্ডবদের মাতুলরূপে বসুদেব পাণ্ডবদের সংস্কার-কার্যে সক্রিয়ভাবে অংশ গ্রহণ করেছিলেন। তিনি শতশৃঙ্গ পর্বত থেকে কশ্যপ মুনিকে আনিয়ে তাঁর দ্বারা সমস্ত অনুষ্ঠান সম্পাদন করেছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ যখন কংসের কারাগারে আবির্ভূত হন, তখন তিনি বসুদেবের দ্বারা গোকুলে তাঁর পালক-পিতা নন্দমহারাজের গৃহে স্থানান্তরিত হন। বসুদেবের তিরোভাবের পূর্বেই বলদেবসহ শ্রীকৃষ্ণ অপ্রকট হন, এবং অর্জুন (বসুদেবের ভাগিনেয়) বসুদেবের তিরোধানের পর তাঁর অন্ত্যেষ্টি-ক্রিয়া সম্পাদন করার দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলেন।

অক্রূর ঃ বৃষ্ণি বংশের প্রধান সেনাপতি এবং একজন মহান কৃষ্ণভক্ত। ভগবদ্ভক্তির একটি অঙ্গ, বন্দনার অনুশীলন দ্বারা তিনি ভগবদ্ভক্তিতে সাফল্য লাভ করেছিলেন। তিনি ছিলেন অহুকের কন্যা সুতনীর পতি। শ্রীকৃষ্ণের ইচ্ছায় অর্জুন যখন সুভদ্রাকে বলপূর্বক হরণ করেছিলেন তখন তিনি অর্জুনকে সমর্থন করেছিলেন। সুভদ্রা হরণের পর কৃষ্ণ এবং অক্রূর উভয়ে অর্জুনকে দেখতে গিয়েছিলেন, এবং তাঁরা উভয়েই অর্জুনকে যৌতুকস্বরূপ নানা উপহার প্রদান করেছিলেন। মহারাজ পরীক্ষিতের মাতা উত্তরার সঙ্গে যখন সুভদ্রার পুত্র অভিমন্যুর বিবাহ হয় তখন অক্রূরও উপস্থিত ছিলেন। অক্রূরের শ্বশুর অহুকের সঙ্গে অক্রূরের সম্পর্ক ভাল ছিল না। কিন্তু তাঁরা উভয়েই ছিলেন ভগবানের ভক্ত।

উগ্রসেন ঃ বৃষ্ণি বংশের একজন শক্তিশালী রাজা এবং মহারাজ কুন্তীভোজের খুড়তুতো ভাই। তাঁর আরেকটি পরিচয় ছিল অহুক। বসুদেব ছিলেন তাঁর মন্ত্রী, এবং তাঁর পুত্র ছিল শক্তিশালী কংস। এই কংস তার পিতাকে কারাগারে বন্দী করে মথুরার রাজা হয়েছিল। শ্রীকৃষ্ণ এবং তাঁর ভ্রাতা শ্রীবলরামের কৃপায় কংস নিহত হয় এবং উগ্রসেন সিংহাসনে পুনপ্রতিষ্ঠিত হন। শাল্ব যখন দ্বারকা নগরী আক্রমণ করে, তখন উগ্রসেন বীরত্বের সঙ্গে যুদ্ধ করে সেই শত্রুকে প্রতিহত

করেন। উগ্রসেন নারদমুনির কাছে শ্রীকৃষ্ণের ভগবত্তা সম্বন্ধে প্রশ্ন করেন। যদু বংশ ধ্বংসের সময় সাম্বর গর্ভপ্রসূত লৌহমুষলটি উগ্রসেনকে দেওয়া হয়। তিনি সেটি চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দ্বারকার উপকূলে সমুদ্রের জলে মিশিয়ে দেন। তারপর তিনি দ্বারকা নগরীতে এবং তাঁর সমগ্র রাজ্যে মাদক দ্রব্য নিষিদ্ধ করেন। তাঁর মৃত্যুর পর তিনি ভগবদ্ধামে ফিরে যান।

বলদেব ঃ বসুদেব এবং তাঁর পত্নী রোহিণীর দিব্য পুত্র। তিনি রোহিণীনন্দন বা রোহিণীর প্রিয় পুত্র নামেও পরিচিত। বসুদেব যখন স্বেচ্ছায় কংসের কারাবাস স্বীকার করেন, তখন তিনিও তাঁর মাতা রোহিণীসহ নন্দমহারাজের আশ্রয়ে ছিলেন। সেই সূত্রে নন্দমহারাজ শ্রীকৃষ্ণসহ বলরামেরও পালক-পিতা। বৈমাত্রেয় ভাই হওয়া সত্ত্বেও শ্রীকৃষ্ণ এবং বলদেব শৈশব থেকেই ছিলেন সব সময়ের সাথী। তিনি ছিলেন পরমেশ্বর ভগবানের অংশ প্রকাশ, এবং তাই তিনি শ্রীকৃষ্ণেরই মতো শক্তিশালী। তিনি বিষ্ণুতত্ত্ব। দ্রৌপদীর স্বয়ংবর-সভায় শ্রীকৃষ্ণসহ তিনিও যোগদান করেছিলেন। শ্রীকৃষ্ণের পরিকল্পনা অনুসারে অর্জুন যখন সুভদ্রাকে হরণ করেন, তখন বলরাম অর্জুনের প্রতি অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে তাঁকে তৎক্ষণাৎ বধ করতে চেয়েছিলেন। সখাকে রক্ষা করার জন্য শ্রীকৃষ্ণ তখন বলরামের পায়ে পড়ে তাঁকে সনির্বন্ধ অনুরোধ করেছিলেন অত ক্রুদ্ধ না হতে। তার ফলে বলরামের ক্রোধ প্রশমিত হয়। তেমনি এক সময় কৌরবদের প্রতি অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে তিনি তাদের রাজধানী হস্তিনাপুরকে যমুনার জলে ফেলে দিতে চেয়েছিলেন। তখন কৌরবেরা তাঁর শ্রীপাদপদ্মের শরণাগত হলে তাঁর ক্রোধ প্রশমিত হয়। প্রকৃতপক্ষে, শ্রীকৃষ্ণের জন্মের পূর্বে তিনি ছিলেন দেবকীর গর্ভজাত সপ্তম পুত্র, কিন্তু কংসের ক্রোধ এড়াবার জন্য ভগবানের ইচ্ছায় তিনি রোহিণীর গর্ভে স্থানান্তরিত হন। তাই তাঁর আর একটি নাম সঙ্কর্ষণ, যিনি হচ্ছেন শ্রীবলদেবেরই অংশ। যেহেতু তিনি শ্রীকৃষ্ণেরই মতো শক্তিশালী এবং ভক্তদের আধ্যাত্মিক বল দান করতে পারেন, তাই তিনি বলদেব নামে পরিচিত। বেদেও নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে বলরামের কৃপা ব্যতীত কেউই পরমেশ্বর ভগবানকে জানতে পারে না। বল মানে হচ্ছে আধ্যাত্মিক শক্তি, দৈহিক শক্তি নয়। দৈহিক শক্তির দ্বারা কেউই আধ্যাত্মিক উপলব্ধি লাভ করতে পারে না। জড় দেহের বিনাশের সঙ্গে সঙ্গে দৈহিক শক্তিরও বিনাশ হয়, কিন্তু আধ্যাত্মিক শক্তি আত্মার সঙ্গে পরবর্তী দেহেও অনুগমন করে, এবং তাই বলদেবের কৃপালব্ধ বলের কখনও অবক্ষয় হয় না। সেই বল নিত্য, এবং তাই বলদেব হচ্ছেন সমস্ত ভক্তদের আদি গুরু।

সান্দীপনি মুনির পাঠশালায় বলদেব ছিলেন শ্রীকৃষ্ণের সহপাঠী। তাঁর শৈশবে তিনি শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে বহু অসুরকে সংহার করেছিলেন। বিশেষ করে তিনি তালবনে ধেনুকাসুরকে সংহার করেছিলেন। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে তিনি ছিলেন নিরপেক্ষ, এবং সেই যুদ্ধ যাতে না হয় সেজন্য তিনি যথাসাধ্য চেষ্টা করেছিলেন। তিনি দুর্যোধনের পক্ষপাতী ছিলেন, কিন্তু তা সত্ত্বেও তিনি নিরপেক্ষ ছিলেন। দুর্যোধন এবং ভীমসেনের মধ্যে যখন গদাযুদ্ধ হয়, তখন তিনি সেখানে উপস্থিত ছিলেন। ভীম যখন দুর্যোধনের উরুতে গদাঘাত করেন, তখন তিনি ভীমসেনের প্রতি ক্রুদ্ধ হন এবং তাঁকে দণ্ড দিতে উদ্যত হন। তাঁর ক্রোধ থেকে শ্রীকৃষ্ণ ভীমকে রক্ষা করেন। ভীমের প্রতি বিরক্ত হয়ে তিনি তৎক্ষণাৎ সেই স্থান পরিত্যাগ করেন, এবং তাঁর প্রস্থানের পর দুর্যোধন ভূপতিত হয়ে মৃত্যুমুখী হন। মাতুলরূপে তিনি অর্জুনের পুত্র অভিমন্যুর অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পাদন করেন। সেই সময় পাণ্ডবেরা এত শোকসন্তপ্ত ছিলেন যে তখন তাঁদের তা অনুষ্ঠান করা অসম্ভব ছিল। তাঁর লীলার সমাপ্তি কালে তিনি তাঁর মুখ থেকে এক বিশাল শ্বেতসর্প উৎপন্ন করে এই জগৎ থেকে বিদায় নেন, এবং এইভাবে শেষনাগ দ্বারা বাহিত হন।

প্রদ্যুম্ন ঃ পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এবং দ্বারকায় তাঁর প্রধানা মহিষী মহালক্ষ্মী শ্রীমতী রুক্মিণীদেবীর পুত্র, যিনি ছিলেন কামদেবের অবতার অথবা অন্য মতে সনৎকুমারের অবতার। অর্জুনের সঙ্গে সুভদ্রার বিবাহের পর যাঁরা তাঁকে অভিনন্দন জানাতে গিয়েছিলেন, তিনি ছিলেন তাঁদের মধ্যে একজন। যে সমস্ত প্রধান সেনাপতিরা শাল্বের সঙ্গে যুদ্ধ করেছিল, তিনি ছিলেন তাঁদের মধ্যে অন্যতম, এবং সেই যুদ্ধে তিনি যুদ্ধক্ষেত্রে অচেতন হয়ে পড়েন। তাঁর সারথি তখন তাঁকে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে শিবিরে নিয়ে আসেন; সেই কার্যের জন্য তিনি অত্যন্ত দুঃখিত হন, এবং সারথিকে তিরস্কার করেন। তিনি পুনরায় শাল্বের সঙ্গে যুদ্ধ করেন এবং বিজয়ী হন। তিনি নারদের কাছ থেকে বিভিন্ন দেবতাদের সম্বন্ধে শ্রবণ করেছিলেন। তিনি ভগবান শ্রীকৃষ্ণের চতুর্ব্যূহের অন্যতম। চতুর্ব্যূহে তাঁর স্থান তৃতীয়। তিনি ব্রাহ্মণের মহিমা সম্বন্ধে তাঁর পিতা শ্রীকৃষ্ণকে প্রশ্ন করেছিলেন। যদু বংশীয়দের মধ্যে ভ্রাতৃঘাতী যুদ্ধে তিনি বৃষ্ণি বংশের আর একজন রাজা ভোজের হস্তে নিহত হন। তাঁর মৃত্যুর পর তিনি তাঁর স্বরূপে অধিষ্ঠিত হন।

চারুদেষ্ণ ঃ শ্রীকৃষ্ণ এবং রুক্মিণীদেবীর অন্য আর এক পুত্র। দ্রৌপদীর স্বয়ংবর সভায় তিনিও উপস্থিত ছিলেন। তাঁর পিতা এবং অন্যান্য ভাইদের মতো তিনিও একজন মহান যোদ্ধা ছিলেন। তিনি বিবিনিধকের সঙ্গে যুদ্ধ করে তাকে বধ করেছিলেন।

সাম্ব ঃ জাম্ববতীর গর্ভজাত শ্রীকৃষ্ণের পুত্র, যিনি ছিলেন যদু বংশের অন্যতম এক মহান বীর। তিনি অর্জুনের কাছে ধনুর্বিদ্যা সম্বন্ধে শিক্ষালাভ করেছিলেন, এবং মহারাজ যুধিষ্ঠিরের সভায় তিনি ছিলেন একজন সদস্য। মহারাজ যুধিষ্ঠিরের রাজসূয়-যজ্ঞে তিনি উপস্থিত ছিলেন। প্রভাস-যজ্ঞে যখন সমস্ত বৃষ্ণিরা একত্রিত হয়েছিলেন, তখন সাত্যকি বলদেবের সমক্ষে তাঁর মহিমান্বিত কার্যকলাপের বর্ণনা করেছিলেন। যুধিষ্ঠিরের অশ্বমেধ-যজ্ঞে তিনিও তাঁর পিতা শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন। তাঁর ভাইয়েরা তাঁকে একজন গর্ভবতী রমণীরূপে সাজিয়ে কয়েকজন ঋষির কাছে নিয়ে গিয়েছিলেন, এবং তিনি পরিহাস করে তাঁদের জিজ্ঞাসা করেছিলেন যে তিনি কি প্রসব করবেন। ঋষিরা উত্তর দিয়েছিলেন যে তিনি একটি লৌহমুষল প্রসব করবেন, যা যদু বংশ ধ্বংসের কারণ হবে। পরের দিন সকাল বেলা সাম্ব একটি বিশাল লৌহমুষল প্রসব করেন, যা উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য উগ্রসেনের কাছে অর্পণ করা হয়। প্রকৃতপক্ষে ঋষিদের ভবিষ্যদ্বাণী অনুসারে পরবর্তীকালে এক ভ্রাতৃঘাতী যুদ্ধ হয়, এবং সেই যুদ্ধে সাম্বর মৃত্যু হয়।

শ্রীকৃষ্ণের আগমনী-বার্তা শ্রবণ করে তাঁর সমস্ত পুত্রেরা তাঁদের স্বীয় প্রাসাদ পরিত্যাগ করেছিলেন, এবং শয়ন, আসন, ভোজন, ইত্যাদি সমস্ত কার্যকলাপ পরিত্যাগ করে তাঁদের মহান পিতার সঙ্গে মিলিত হওয়ার জন্য দ্রুত অগ্রবর্তী হয়েছিলেন।

শ্লোক ১৮

বারণেন্দ্রং পুরস্কৃত্য ব্রাহ্মণৈঃ সসুমঙ্গলৈঃ ।
শঙ্খতূর্যনিনাদেন ব্রহ্মঘোষেণ চাদৃতাঃ ।
প্রত্যুজ্জগ্মূ রথৈর্হৃষ্টাঃ প্রণয়াগতসাধ্বসাঃ ॥১৮॥

বারণ-ইন্দ্রম্—শ্রেষ্ঠ হস্তী; **পুরস্কৃত্য**—অগ্রে করে; **ব্রাহ্মণৈঃ**—ব্রাহ্মণদের দ্বারা; **স-সুমঙ্গলৈঃ**—মঙ্গলসূচক চিহ্নাদিসহ; **শঙ্খ**—শঙ্খ; **তূর্য**—শিঙা; **নিনাদেন**—ধ্বনিত করে; **ব্রহ্ম-ঘোষেণ**—বৈদিক মন্ত্র পাঠ করে; **চ**—এবং; **আদৃতাঃ**—আদরান্বিত; **প্রতি**—অভিমুখে; **উজ্জগ্মুঃ**—দ্রুতবেগে গমন করেছিলেন; **রথৈঃ**—রথে; **হৃষ্টাঃ**—হৃষ্ট হয়ে; **প্রণয়াগত**—প্রণয়বশত; **সাধ্বসাঃ**—সম্ভ্রমযুক্ত।

অনুবাদ

পুষ্পাদি মাঙ্গলিক দ্রব্যসহ ব্রাহ্মণদের সঙ্গে নিয়ে তাঁরা রথে চড়ে দ্রুতবেগে শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে মিলিত হওয়ার জন্য গমন করলেন। তাঁদের অগ্রে ছিল

সৌভাগ্যের প্রতীকস্বরূপ রাজহস্তী। তখন শঙ্খ এবং তূর্য ধ্বনিত হচ্ছিল এবং বৈদিক মন্ত্র উচ্চারিত হচ্ছিল। এইভাবে তাঁরা তাঁদের প্রণয়পূর্ণ শ্রদ্ধা নিবেদন করেছিলেন।

তাৎপর্য

বৈদিক প্রথায় কোন মহান ব্যক্তিকে স্বাগত জানাবার বিধি সেই ব্যক্তির প্রতি প্রীতি এবং শ্রদ্ধায় পূর্ণ এক পরিবেশের সৃষ্টি করে। এই স্বাগত জানাবার পবিত্র পরিবেশ নির্ভর করে শঙ্খ, পুষ্প, ধূপ, সুসজ্জিত হস্তী এবং বৈদিক স্তোত্র পাঠরত সুযোগ্য ব্রাহ্মণসহ উপরোক্ত সাজ-সরঞ্জামগুলির উপর। স্বাগত জানাবার এই প্রকার অনুষ্ঠান স্বাগতকারী এবং স্বাগত ব্যক্তি উভয়েরই ঐকান্তিকতায় পূর্ণ থাকে।

শ্লোক ১৯

বারমুখ্যাশ্চ শতশো যানৈস্তদ্দর্শনোৎসুকাঃ ।
লসৎকুণ্ডলনির্ভাতকপোলবদনশ্রিয়ঃ ॥১৯॥

বারমুখ্যাঃ—বিখ্যাত বারবনিতাগণ; **চ**—এবং; **শতশঃ**—শত শত; **যানৈঃ**—যানে করে; **তৎ-দর্শন**—তাঁকে (শ্রীকৃষ্ণকে) দর্শন করার জন্য; **উৎসুকাঃ**—অত্যন্ত কৌতূহলাক্রান্ত হয়ে; **লসৎ**—দোদুল্যমান; **কুণ্ডল**—কানের দুল; **নির্ভাত**—উজ্জ্বল; **কপোল**—গণ্ডদেশ; **বদন**—মুখমণ্ডল; **শ্রিয়ঃ**—সৌন্দর্য।

অনুবাদ

তখন শত শত বিখ্যাত বারবনিতাগণ শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করার জন্য অত্যন্ত উৎসুক হয়ে বিবিধ যানসমূহে আরোহণ করে তাঁর প্রতি ধাবিত হয়েছিল। তাদের সুন্দর মুখ-মণ্ডলে দোদুল্যমান বর্ণোজ্জ্বল কুণ্ডল শোভা পাচ্ছিল, যার ফলে তাদের কপোলদেশের সৌন্দর্য বৃদ্ধি পেয়েছিল।

তাৎপর্য

কোন বারবনিতা বা বেশ্যাও যদি ভগবানের ভক্ত হয়, তা হলে তাকে ঘৃণা করা উচিত নয়। ভারতের মহা-নগরীগুলিতে এখনও বহু বেশ্যা রয়েছে, যারা ভগবানের ঐকান্তিক ভক্ত। ঘটনাচক্রে কাউকে এমন কোন বৃত্তি গ্রহণ করতে হতে পারে, যা সমাজে সম্মানিত নয়, কিন্তু তা ভগবদ্ভক্তি সম্পাদনের প্রতিবন্ধক নয়।

ভগবদ্ভক্তি সমস্ত পরিস্থিতিতেই অপ্রতিহত। এই বর্ণনা থেকে বোঝা যায় যে আজ থেকে পাঁচ হাজার বছর পূর্বেও দ্বারকার মতো নগরীতে, যেখানে শ্রীকৃষ্ণ বাস করতেন, সেখানেও বেশ্যা ছিল। তার অর্থ হচ্ছে যে সমাজ-ব্যবস্থার যথাযথ সংরক্ষণের জন্য বেশ্যারাও হচ্ছে প্রয়োজনীয় নাগরিক। সরকার মদের দোকান খোলে, তার অর্থ এই নয় যে সরকার সুরা পান করতে নাগরিকদের অনুপ্রাণিত করে। এর প্রকৃত উদ্দেশ্য হচ্ছে যে এক শ্রেণীর মানুষ মদ্যপান করবেই, সুতরাং তাদের জন্য সুনিয়ন্ত্রিতভাবে মদ সরবরাহ করা সমীচীন। প্রায়ই দেখা যায় যে মহানগরীগুলিতে মাদক দ্রব্য নিষিদ্ধ করা হলে সেখানে মদের চোরাই চালান শুরু হয়। তেমনই যে সমস্ত মানুষ ঘরে সন্তুষ্ট নয়, তাদের জন্য এই প্রকার সুবিধা প্রদানের প্রয়োজন; এবং বেশ্যা যদি না থাকে, তা হলে এই প্রকার নীচ মনোভাবাপন্ন ব্যক্তিরা অন্য সব মেয়েদের বেশ্যায় পরিণত করবে। সমাজের পবিত্রতা বজায় রাখার জন্য বাজারে বেশ্যা থাকা অনেক ভাল। সমাজের ভিতর বেশ্যাবৃত্তি অনুমোদন করার থেকে এক শ্রেণীর বেশ্যার মাধ্যমে বেশ্যা প্রথা প্রচলিত রাখা অনেক ভাল। প্রকৃত সংস্কার হচ্ছে সমস্ত মানুষকে ভগবদ্ভক্তে পরিণত হওয়ার শিক্ষা দান করা, এবং তার ফলে জীবনের অধঃপতনের সমস্ত সম্ভাবনা প্রতিহত হবে।

বিষ্ণুস্বামী সম্প্রদায়ের একজন মহান আচার্য শ্রীবিল্বমঙ্গল ঠাকুর তাঁর গার্হস্থ্য জীবনে একজন বেশ্যার প্রতি অত্যন্ত আসক্ত ছিলেন, যিনি ছিলেন একজন ভগবদ্ভক্ত। এক প্রচণ্ড ঝড়-বৃষ্টির রাত্রে বিল্বমঙ্গল ঠাকুর যখন চিন্তামণির গৃহে এসেছিলেন, তখন চিন্তামণি তাঁকে সেই ভয়ঙ্কর রাত্রে জলপ্লাবিত দুরন্ত নদী অতিক্রম করে তাঁর কাছে তাঁকে আসতে দেখে অত্যন্ত আশ্চর্যান্বিত হয়েছিলেন। তিনি বিল্বমঙ্গল ঠাকুরকে বলেছিলেন যে তাঁর মতো একজন হাড়-মাংসের তৈরী নগণ্য স্ত্রীলোকের প্রতি আকৃষ্ট না হয়ে তিনি যদি ভগবদ্ভক্তির মাধ্যমে পরমেশ্বর ভগবানের অপ্রাকৃত সৌন্দর্যের প্রতি আকৃষ্ট হতেন, তা হলে তাঁর জন্ম সার্থক হত। সেটি ছিল বিল্বমঙ্গল ঠাকুরের জীবনে এক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ক্ষণ, এবং সেই বেশ্যার উপদেশে তাঁর জীবনের গতি পারমার্থিক উপলব্ধি লাভের পথে মোড় নিয়েছিল। পরবর্তীকালে ঠাকুর সেই বেশ্যাকে তাঁর গুরু বলে স্বীকৃতি দিয়েছিলেন, এবং তাঁর রচনার বিভিন্ন স্থানে তিনি প্রকৃত পথ প্রদর্শনকারীরূপে চিন্তামণির উল্লেখ করেছেন।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় (৯/৩২) ভগবান বলেছেন, নিম্ন কুলোদ্ভূত চণ্ডাল, নাস্তিক কুলোদ্ভূত ব্যক্তি এবং বেশ্যারাও যদি তাঁর প্রতি অনন্য ভক্তিপরায়ণ হয়, তা হলে

তারা জীবনের পরম সিদ্ধি লাভ করবে। কারণ ভগবদ্ভক্তির পথে নীচ জন্ম এবং নীচ বৃত্তি কোন প্রতিবন্ধক নয়। এই পথ যেই অনুসরণ করতে চায় তারই জন্য উন্মুক্ত।

এখানে বোঝা যায় যে, দ্বারকার যে সমস্ত বেশ্যারা ভগবানের সঙ্গে মিলিত হওয়ার জন্য অত্যন্ত উৎসুক ছিলেন, তাঁরা সকলেই ছিলেন ভগবানের অনন্য ভক্ত, এবং *শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতার* উপরোক্ত বাণী অনুসারে তাঁরা সকলেই ছিলেন মুক্তি পথগামী। তাই, সমাজে যে সংস্কারের প্রয়োজন তা হচ্ছে সমস্ত নাগরিকদের ভগবদ্ভক্তে পরিণত করার এক সুসংবদ্ধ প্রচেষ্টা, যার ফলে স্বর্গের দেবতাদের সমস্ত সদ্‌গুণগুলির দ্বারা তারা আপনা থেকেই বিভূষিত হবে। পক্ষান্তরে জড়জাগতিক বিচারে যত উন্নত বলেই মনে হোক না কেন, অভক্তদের মধ্যে কোন সদ্‌গুণ থাকে না। পার্থক্যটি হচ্ছে এই যে ভগবদ্ভক্তরা মুক্তির পথে অগ্রসর হচ্ছেন, কিন্তু অভক্তরা জড় জগতের বন্ধনে দৃঢ় থেকে দৃঢ়তররূপে আবদ্ধ হয়ে পড়ছে। সভ্যতার প্রগতির মানদণ্ড হচ্ছে মুক্তির পথে অগ্রসর হওয়ার জন্য মানুষকে শিক্ষিত করা।

শ্লোক ২০

নটনর্তকগন্ধর্বাঃ সূতমাগধবন্দিনঃ ।
গায়ন্তি চোত্তমশ্লোকচরিতান্যদ্ভুতানি চ ॥ ২০ ॥

নট—অভিনেতাগণ; **নর্তক**—নর্তকগণ; **গন্ধর্বাঃ**—স্বর্গলোকের গায়কগণ; **সূত**—পেশাদার পৌরাণিকগণ; **মাগধ**—পেশাদার স্তুতিগায়ক ভাটগণ; **বন্দিনঃ**—পেশাদার শিক্ষিত স্তাবকগণ; **গায়ন্তি**—কীর্তন করেন; **চ**—যথাক্রমে; **উত্তমশ্লোক**—পরমেশ্বর ভগবান; **চরিতানি**—চরিতকথাসমূহ; **অদ্ভুতানি**—অলৌকিক; **চ**—এবং।

অনুবাদ

সুদক্ষ অভিনেতাগণ, শিল্পীবৃন্দ, নর্তকগণ, গায়কগণ, পৌরাণিকগণ, ভাটগণ এবং স্তাবকগণ সকলেই শ্রীকৃষ্ণের অলৌকিক লীলা চরিতকথাসমূহের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে তাঁকে যে যার মতো অভ্যর্থনা করতে লাগলেন।

তাৎপর্য

এখানে আমরা দেখতে পাই যে পাঁচ হাজার বছর পূর্বেও মানব সমাজে নট, শিল্পী, নর্তক, গায়ক, ঐতিহাসিক, বংশাবলী বিশারদ, বক্তা, প্রভৃতির আবশ্যকতা ছিল। নর্তক, গায়ক এবং নাট্যশিল্পী এরা সকলেই সাধারণত শূদ্র কুলোদ্ভূত ছিল, কিন্তু

অভিজ্ঞ ঐতিহাসিক (সূত), বংশাবলী বিশারদ (মাগধ) এবং বক্তারা (বন্দী) ছিলেন ব্রাহ্মণ কুলোদ্ভূত। এরা সকলেই বিশেষ বর্ণের অন্তর্ভুক্ত ছিল, এবং তারা তাদের নিজেদের পরিবারে যথাযথভাবে শিক্ষা লাভ করত। এই সমস্ত নট, নর্তক এবং গায়ক, সূত, মাগধ এবং বন্দীরা বিভিন্ন যুগে এবং বিভিন্ন কল্পে ভগবানের অদ্ভুত কার্যকলাপের বর্ণনা করত। তারা কোন সাধারণ ঘটনাবলীর বর্ণনা করত না, এবং তাদের এই বর্ণনা কালের ক্রমানুসারে হত না। সমস্ত পুরাণ হচ্ছে বিভিন্ন যুগে এবং বিভিন্ন সময়ে, এমন কি বিভিন্ন লোকে, পরমেশ্বর ভগবানের সম্বন্ধে ঐতিহাসিক তথ্যের বর্ণনা। তাই সেই বর্ণনায় কালের ধারাবাহিকতা দেখা যায় না, এবং তাই আধুনিক ঐতিহাসিকেরা তার সূত্র ধরতে পারে না, এবং তার ফলে তারা নির্বোধের মতো মন্তব্য করে যে পুরাণগুলি হচ্ছে কেবল কতকগুলি কাল্পনিক গল্পকথা।

এমন কি একশ' বছর আগেও ভারতবর্ষে সমস্ত নাটকগুলি পরমেশ্বর ভগবানের অলৌকিক কার্যকলাপকে কেন্দ্র করে অনুষ্ঠিত হত। এই সমস্ত নাটক সাধারণ মানুষদেরও মনোরঞ্জন করত। যাত্রার দল ভগবানের অলৌকিক কার্যকলাপের ভিত্তিতে অপূর্ব সুন্দরভাবে যাত্রা অভিনয় করত, এবং তার ফলে অশিক্ষিত কৃষকেরাও তা দেখে বৈদিক শাস্ত্রের তত্ত্বজ্ঞান লাভ করতে পারতো। তাই সাধারণ মানুষের পারমার্থিক উন্নতি সাধনের জন্য সুদক্ষ নট, নর্তক, গায়ক, বন্দী প্রভৃতির প্রয়োজন রয়েছে। মাগধ বা বংশাবলী বিশারদেরা কোন বিশেষ বংশের বংশধরদের পূর্ণ তালিকা প্রদান করত। এমন কি আজও ভারতবর্ষের তীর্থস্থানগুলিতে পাণ্ডারা নবাগতদের পূর্ণ বংশতালিকা প্রদান করে থাকে। এই অদ্ভুত কার্য অনেক সময় এই প্রকার গুরুত্বপূর্ণ তথ্য সংগ্রহ করবার জন্য বহু খরিদ্দারকে আকৃষ্ট করে।

শ্লোক ২১

ভগবাংস্তত্র বন্ধূনাং পৌরাণামনুবর্তিনাম্ ।
যথাবিধ্যুপসঙ্গম্য সর্বেষাং মানমাদধে ॥ ২১ ॥

ভগবান্—পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ; **তত্র**—সেখানে; **বন্ধূনাম্**—বন্ধুদের; **পৌরাণাম্**—পুরবাসীদের; **অনুবর্তিনাম্**—যারা তাঁকে অভ্যর্থনা এবং অভিনন্দন জানাবার জন্য তাঁর কাছে উপস্থিত হয়েছিল; **যথা-বিধি**—যথোচিত; **উপসঙ্গম্য**—সমীপবর্তী হয়ে; **সর্বেষাম্**—সকলকে; **মানম্**—শ্রদ্ধা এবং সম্মান; **আদধে**—প্রদান করেছিলেন।

অনুবাদ

পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয়-স্বজন, পুরবাসী এবং আর যারা তাঁকে স্বাগত জানাতে এসেছিল, তাদের সঙ্গে মিলিত হয়ে তাদের সকলকে যথোচিত সম্মান এবং শ্রদ্ধা প্রদর্শন করলেন।

তাৎপর্য

পরমেশ্বর ভগবান নিরাকার নন অথবা তাঁর ভক্তদের সঙ্গে ভাব বিনিময়ে অক্ষম কোন জড় পদার্থ নন। এখানে *যথাবিধি* শব্দটি তাৎপর্যপূর্ণ। তিনি তাঁর প্রশংসক এবং ভক্তদের সঙ্গে যথাযথভাবে ভাবের আদান-প্রদান করেন। ভগবানের শুদ্ধ ভক্তগণ অবশ্যই একই প্রকার, কারণ ভগবানের সেবা ছাড়া তাঁদের আর অন্য কোন লক্ষ্য নেই। তাই ভগবানও তাঁর এই প্রকার শুদ্ধ ভক্তদের সঙ্গে যথাযথভাবে ভাবের আদান-প্রদান করেন, যেমন তিনি সর্বদাই তাঁর শুদ্ধ ভক্তদের সমস্ত ব্যাপারে অত্যন্ত সতর্ক থাকেন। যারা ভগবানকে নিরাকার বলে, ভগবানও তাদের ব্যাপারে কোন উৎসাহ প্রদান করেন না। জীবের পারমার্থিক চেতনার বিকাশের মাত্রা অনুসারে ভগবান তাদের সঙ্গে আচরণ করেন এবং তাদের সন্তুষ্টি বিধান করেন। এখানে বিভিন্ন স্বাগতকারীর সঙ্গে তিনি যেভাবে আচরণ করেছেন, তার মাধ্যমে তা বোঝা যায়।

শ্লোক ২২

প্রহ্বাভিবাদনাশ্লেষকরস্পর্শস্মিতেক্ষণৈঃ ।
আশ্বাস্য চাশ্বপাকেভ্যো বরৈশ্চাভিমতৈর্বিভুঃ ॥ ২২ ॥

প্রহ্ব—মস্তক অবনত করে নমস্কার; **অভিবাদন**—বাক্যের দ্বারা অভিনন্দন; **আশ্লেষ**—আলিঙ্গন; **কর-স্পর্শ**—হস্ত দ্বারা স্পর্শ, **স্মিত-ঈক্ষণৈঃ**—ঈষৎ হাস্য সহকারে দর্শন দান; **আশ্বাস্য**—অভয় দান করে; **চ**—এবং; **আশ্বপাকেভ্যঃ**—চণ্ডালকে পর্যন্ত; **বরৈঃ**—বরদান করে; **চ**—ও; **অভিমতৈঃ**—ইচ্ছা অনুসারে; **বিভুঃ**—সর্বশক্তিমান।

অনুবাদ

সর্বশক্তিমান ভগবান শ্রীকৃষ্ণ কাউকে মস্তক অবনত করে নমস্কার, কাউকে অভিবাদন করে, কাউকে আলিঙ্গন, কাউকে হস্ত দ্বারা স্পর্শ, কাউকে ঈষৎ হাস্যযুক্ত দর্শন দানে এবং কাউকে বা অভীষ্ট বর এবং অভয় প্রদান করে, আচণ্ডাল সকলকেই যথোচিত সম্মান করেছিলেন।

তাৎপর্য

ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে স্বাগত জানাবার জন্য সমস্ত স্তরের মানুষ সেখানে উপস্থিত হয়েছিলেন—পিতা বসুদেব, পিতামহ উগ্রসেন, গুরু গর্গমুনি থেকে শুরু করে বেশ্যা এবং কুকুরভোজী চণ্ডালেরা পর্যন্ত সেখানে উপস্থিত হয়েছিলেন, এবং ভগবান পদ ও প্রতিষ্ঠা অনুসারে সকলকে সম্ভাষণ করেছিলেন। শুদ্ধ জীবরূপে সকলেই ভগবানের বিভিন্ন অংশ এবং তাই ভগবানের সঙ্গে নিত্য সম্পর্ক থেকে কেউই বঞ্চিত নয়। এই প্রকার শুদ্ধ জীবেরা জড়া প্রকৃতির গুণের কলুষের মাত্রা অনুসারে বিভিন্ন স্তরে বিভক্ত হয়েছে, কিন্তু জড়া প্রকৃতির স্তর নির্বিশেষে ভগবান তাঁর সমস্ত বিভিন্ন অংশের প্রতি সমানভাবে স্নেহপরায়ণ। তিনি এই সমস্ত বদ্ধ জীবদের ভগবদ্ধামে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য এখানে অবতরণ করেন, এবং বুদ্ধিমান মানুষেরা জীবের প্রতি ভগবানের এই করুণার যথাযথ সদ্ব্যবহার করে। ভগবান তাঁর ধাম থেকে কাউকেই অযোগ্য বলে পরিত্যাগ করেন না, তবে জীবের ইচ্ছার উপর নির্ভর করে যে, সে ভগবানের এই করুণা গ্রহণ করবে কি না।

শ্লোক ২৩

স্বয়ং চ গুরুভির্বিপ্রৈঃ সদারৈঃ স্থবিরৈরপি ।
আশীর্ভির্যুজ্যমানোঽন্যৈর্বন্দিভিশ্চাবিশৎপুরম্ ॥ ২৩ ॥

স্বয়ম্—তিনি নিজে; **চ**—ও; **গুরুভিঃ**—গুরুজনদের দ্বারা; **বিপ্রৈঃ**—ব্রাহ্মণদের দ্বারা; **সদারৈঃ**—সস্ত্রীক; **স্থবিরৈঃ**—অথর্ব; **অপি**—ও; **আশীর্ভিঃ**—আশীর্বাদের দ্বারা; **যুজ্যমানঃ**—যুক্ত হয়ে; **অন্যৈঃ**—অন্যদের দ্বারা; **বন্দিভিঃ**—বন্দনাকারীদের দ্বারা; **চ**—এবং; **অবিশৎ**—প্রবেশ করেছিলেন; **পুরম্**—নগরীতে।

অনুবাদ

তারপর সপত্নীক বৃদ্ধ গুরুজনগণ ও ব্রাহ্মণগণ সমভিব্যাহারে ভগবান দ্বারকাপুরীতে প্রবেশ করলেন। সকলেই তাঁকে আশীর্বাদ করলেন এবং তাঁর মহিমা কীর্তন করলেন।

তাৎপর্য

বৈদিক সমাজে ব্রাহ্মণেরা কখনও ভবিষ্যতের অবসর জীবন-যাপনের জন্য ধন সঞ্চয়ে আগ্রহী ছিলেন না। তাঁরা যখন বৃদ্ধদশা প্রাপ্ত হতেন তখন তাঁরা তাঁদের

পত্নীসহ রাজদরবারে রাজার কাছে গিয়ে রাজার মহিমান্বিত কার্যকলাপের প্রশংসা করতেন, এবং রাজা তাঁদের জীবনের সমস্ত আবশ্যকতা প্রদান করতেন। এই সমস্ত ব্রাহ্মণেরা রাজার তোষামোদকারী ছিলেন না, পক্ষান্তরে তাঁরা রাজাদের বাস্তবিক কার্যকলাপের বর্ণনার দ্বারা তাঁদের মহিমা কীর্তন করতেন, এবং তাঁরাও এই সমস্ত ব্রাহ্মণদের পুণ্য কর্মের দ্বারা অধিকতর অনুপ্রাণিত হতেন। শ্রীকৃষ্ণ সমস্ত মহিমা কীর্তনের যোগ্য, এবং বন্দনাকারী ব্রাহ্মণেরা ভগবানের মহিমা কীর্তন করার মাধ্যমে স্বয়ং মহিমান্বিত হয়েছিলেন।

শ্লোক ২৪

রাজমার্গং গতে কৃষ্ণে দ্বারকায়াঃ কুলস্ত্রিয়ঃ ।
হর্ম্যাণ্যারুরুহুর্বিপ্র তদীক্ষণমহোৎসবাঃ ॥ ২৪ ॥

রাজ-মার্গম্—রাজপথে; **গতে**—যাবার সময়; **কৃষ্ণে**—শ্রীকৃষ্ণ; **দ্বারকায়াঃ**—দ্বারকা নগরীর; **কুল-স্ত্রিয়ঃ**—কুলরমণীগণ; **হর্ম্যাণি**—প্রাসাদে; **আরুরুহুঃ**—আরোহণ করলেন; **বিপ্র**—হে ব্রাহ্মণগণ; **তৎ-ঈক্ষণ**—তাঁকে (শ্রীকৃষ্ণকে) দর্শন করার জন্য; **মহা-উৎসবাঃ**—মহোৎসবরূপে বিবেচিত।

অনুবাদ

হে বিপ্রগণ, শ্রীকৃষ্ণ যখন রাজপথ দিয়ে যাচ্ছিলেন, তখন দ্বারকার কুলরমণীগণ তাঁকে দর্শন করার জন্য প্রাসাদসমূহের শীর্ষে আরোহণ করেছিলেন। তাঁদের কাছে তা এক মহোৎসবের মতো মনে হয়েছিল।

তাৎপর্য

ভগবানকে দর্শন করা নিঃসন্দেহে এক মহোৎসব, যা দ্বারকার পুরনারীরা মনে করেছিলেন। আজও ভারতের শ্রদ্ধাশীল রমণীরা তা অনুসরণ করে থাকেন। বিশেষ করে ঝুলন এবং জন্মাষ্টমী মহোৎসবে অসংখ্য ভারতীয় রমণীরা ভগবানের মন্দিরে সমবেত হন, যেখানে তাঁর শাশ্বত চিন্ময় বিগ্রহ আরাধিত হয়। মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত ভগবানের চিন্ময় রূপ ভগবান থেকে ভিন্ন নয়। ভগবানের এই রূপকে বলা হয় অর্চা-বিগ্রহ বা অর্চা-অবতার, এবং তা হচ্ছে এই জড় জগতে তাঁর অগণিত ভক্তদের তাঁকে সেবা করার সুযোগ দেবার উদ্দেশ্যে তাঁর অন্তরঙ্গা শক্তি থেকে প্রকাশিত রূপ। জড় ইন্দ্রিয়গুলির দ্বারা ভগবানের চিন্ময় প্রকৃতি দর্শন করা যায়

না, এবং তাই ভগবান তাঁর অর্চা-বিগ্রহ ধারণ করেন, যা আপাতদৃষ্টিতে মাটি, কাঠ, পাথর আদি জড় উপাদান থেকে প্রস্তুত বলে মনে হলেও তাতে কোন জড় কলুষ নেই। ভগবান কৈবল্য বা অদ্বয়-তত্ত্ব হওয়ার ফলে সম্পূর্ণরূপে জড়াতীত। তিনি এক এবং অদ্বিতীয়, এবং তাই ভৌতিক ধারণার দ্বারা কলুষিত না হয়ে তিনি যে কোন রূপে প্রকট হতে পারেন। তাই ভগবানের মন্দিরে অনুষ্ঠিত সমস্ত মহোৎসব যেভাবে সম্পাদন করা হয়, তা সবই আজ থেকে প্রায় পাঁচ হাজার বছর পূর্বে দ্বারকায় অনুষ্ঠিত মহোৎসবেরই মতো। ভগবত্তত্ত্ব পূর্ণরূপে অবগত মহান আচার্যগণ সাধারণ মানুষদের সুবিধার জন্য ভগবানের এই প্রকার মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন, কিন্তু সেই তত্ত্ব সম্বন্ধে অনভিজ্ঞ বুদ্ধিহীন মানুষেরা সেই মহান প্রয়াসকে মূর্তি-পূজা বলে মনে করে অনধিকার চর্চা করে থাকে। তাই, যে সমস্ত স্ত্রী এবং পুরুষেরা ভগবানের চিন্ময় রূপ দর্শন করার জন্য ভগবানের মন্দিরে উৎসব অনুষ্ঠান করেন, তাঁরা ভগবানের চিন্ময় স্বরূপে অবিশ্বাসী ব্যক্তিদের থেকে সহস্র গুণে ধন্য।

এই শ্লোক থেকে প্রতীত হয় যে সমস্ত দ্বারকাবাসীরা বড় বড় প্রাসাদের মালিক ছিলেন। তা থেকে সেই শহরের সমৃদ্ধি সূচিত হয়। শোভাযাত্রা এবং ভগবানকে দর্শন করার জন্য রমণীরা ছাদের উপর উঠেছিলেন। মহিলারা রাস্তায় মানুষের ভিড়ে যাননি, এবং তার ফলে তাঁদের সম্মান অটুট ছিল। সেখানে পুরুষদের সঙ্গে তাদের কৃত্রিম সমানাধিকার ছিল না। স্ত্রীলোকদের পুরুষদের থেকে পৃথক রাখার ফলে তাঁদের মর্যাদা অধিক সুন্দরভাবে রক্ষা করা হয়। স্ত্রী-পুরুষের অবাধ মেলামেশা করা উচিত নয়।

শ্লোক ২৫

নিত্যং নিরীক্ষমাণানাং যদপি দ্বারকৌকসাম্ ।
ন বিতৃপ্যন্তি হি দৃশঃ শ্রিয়োধামাঙ্গমচ্যুতম্ ॥ ২৫ ॥

নিত্যম্—সর্বদা; **নিরীক্ষমাণানাম্**—দর্শনকারীদের; **যৎ**—যদিও; **অপি**—সত্ত্বেও, **দ্বারকা-ওকসাম্**—দ্বারকাবাসীদের; **ন**—না; **বিতৃপ্যন্তি**—তৃপ্তি; **হি**—প্রকৃতপক্ষে; **দৃশঃ**—দর্শন; **শ্রিয়ঃ**—সৌন্দর্য; **ধাম-অঙ্গম্**—আধারস্বরূপ; **অচ্যুতম্**—অচ্যুত শ্রীকৃষ্ণ।

অনুবাদ

দ্বারকাবাসীরা সর্বদা সমস্ত সৌন্দর্যের আধারস্বরূপ অচ্যুত ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করেও তৃপ্তি লাভ করতেন না।

তাৎপর্য

দ্বারকা নগরীর রমণীরা যখন তাঁদের প্রাসাদের ছাদের উপর থেকে ভগবানকে দর্শন করছিলেন, তখন তাঁদের মনে হয়নি যে পূর্বে তাঁরা বহুবার অচ্যুত ভগবানের সুন্দর অঙ্গ দর্শন করেছিলেন। তা থেকে সূচিত হয় যে তাঁদের ভগবানকে দর্শন করার বাসনা কখনই তৃপ্ত হয়নি। যদি কোন জড় বস্তু বার বার দেখা হয়, তা হলে তৃপ্তির স্বাভাবিক নিয়ম অনুসারে তার প্রতি আর কোন আকর্ষণ থাকে না। তৃপ্তির এই নিয়ম জড় বস্তুর বেলায় কার্যকরী হলেও চিজ্জগতে কিন্তু তার কোন অবকাশ নেই। এখানে অচ্যুত শব্দটি তাৎপর্যপূর্ণ, কেননা ভগবান যদিও কৃপাপূর্বক এই জড় জগতে অবতরণ করেছেন, তথাপি তিনি হচ্ছেন অচ্যুত। সমস্ত জীবেরা চ্যুত, কেননা তারা যখন জড় জগতের সংস্পর্শে আসে, তখন তারা তাদের চিন্ময় পরিচয় হারিয়ে ফেলে। আর তার ফলে দেহাত্ম-বুদ্ধির দ্বারা প্রভাবিত হয়ে, জড়া প্রকৃতির নিয়মে জন্ম, বৃদ্ধি, বিকার, স্থিতি, ক্ষয় এবং বিনাশের অধীনস্থ হয়। ভগবানের অঙ্গ কিন্তু তেমন নয়। তিনি তাঁর স্বরূপে অবতরণ করেন এবং তিনি কখনও জড়া প্রকৃতির গুণের অধীন হন না। তাঁর দেহ সব কিছুর উৎস, এবং আমাদের ধারণার অতীত সমস্ত সৌন্দর্যের আধারস্বরূপ। তাই ভগবানের চিন্ময় রূপ দর্শন করে কেউই কখনও তৃপ্ত হন না, কেননা তাতে নিত্য নব নবায়মান সৌন্দর্য প্রকাশিত হয়। ভগবানের দিব্য নাম, রূপ, গুণ, পরিকর, ইত্যাদি সবই চিন্ময়, এবং তাই ভগবানের দিব্য নাম কীর্তন করে অথবা তাঁর গুণ আলোচনা করে কখনোই তৃপ্ত হওয়া যায় না, এবং তাঁর পরিকরের সংখ্যাও কখনও গণনা করে শেষ করা যায় না। তিনি হচ্ছেন সব কিছুর উৎস এবং তিনি অসীম।

শ্লোক ২৬

শ্রিয়ো নিবাসো যস্যোরঃ পানপাত্রং মুখং দৃশাম্ ।
বাহবো লোকপালানাং সারঙ্গাণাং পদাম্বুজম্ ॥ ২৬ ॥

শ্রিয়ঃ—লক্ষ্মীদেবী; **নিবাসঃ**—আবাসস্থল; **যস্য**—যাঁর; **উরঃ**—বক্ষ; **পান-পাত্রম্**—পানপাত্র; **মুখম্**—মুখ; **দৃশাম্**—চক্ষুর; **বাহবঃ**—বাহু; **লোক-পালানাম্**—লোকপাল দেবতাদের; **সারঙ্গাণাম্**—গুণকীর্তনকারী ভক্তদের; **পদ-অম্বুজম্**—শ্রীপাদপদ্ম।

অনুবাদ

শ্রীকৃষ্ণের বক্ষস্থল লক্ষ্মীদেবীর বিলাসস্থান। তাঁর মুখচন্দ্র সৌন্দর্যরূপ অমৃত পানের আকাঙ্ক্ষীদের পানপাত্রস্বরূপ। তাঁর বাহু লোকপালদের আশ্রয় এবং তাঁর শ্রীপাদপদ্ম তাঁর মহিমা কীর্তনকারী শুদ্ধ ভক্তদের ধাম।

তাৎপর্য

বিভিন্ন স্তরের মানুষ রয়েছে, এবং তারা সকলেই ভিন্ন ভিন্ন বস্তুর মাধ্যমে ভিন্ন ভিন্ন প্রকার আনন্দের অন্বেষণ করছে। কিছু মানুষ রয়েছে যারা লক্ষ্মীদেবীর কৃপার অভিলাষী, এবং বৈদিক শাস্ত্র তাদের জানিয়ে দেয় যে চিন্তামণি ধামে ভগবান শত-সহস্র লক্ষ্মীদেবীর দ্বারা সেবিত হন। ভগবানের এই চিন্ময় ধামে সমস্ত বৃক্ষগুলি হচ্ছে কল্পবৃক্ষ এবং সেখানকার গৃহগুলি স্পর্শমণির দ্বারা নির্মিত। সেখানে ভগবান গোবিন্দ তাঁর স্বাভাবিক বৃত্তিরূপে সুরভি গাভীদের পালন করেন। যদি আমরা ভগবানের শ্রীঅঙ্গের সৌন্দর্যের প্রতি আকৃষ্ট হই, তা হলে আপনা থেকেই আমরা এই সমস্ত লক্ষ্মীদেবীর দর্শন করতে পারি। নির্বিশেষবাদীরা তাদের শুষ্ক মনোধর্মপ্রসূত জ্ঞানের প্রভাবে এই সমস্ত লক্ষ্মীদেবীদের দর্শন করতে পারে না। আর শিল্পী, যারা সুন্দর সৃষ্টির দ্বারা অভিভূত থাকে, তাদের কর্তব্য হচ্ছে পূর্ণ তৃপ্তি লাভের জন্য ভগবানের সুন্দর মুখমণ্ডল দর্শন করা। ভগবানের মুখমণ্ডল সমস্ত সৌন্দর্যের আধারস্বরূপ। তারা যাকে সুন্দর প্রকৃতি বলে বর্ণনা করে, তা হচ্ছে তাঁর হাস্য; আর তারা যাকে পাখির সুন্দর কূজন বলে, তা হচ্ছে ভগবানের মৃদু কণ্ঠস্বরের প্রকাশ। ব্রহ্মাণ্ডের পরিচালনার জন্য প্রশাসনিক অধিকারী দেবতা রয়েছে এবং রাজ্যের স্তরে ছোট ছোট দেবতা রয়েছে। তারা সর্বদাই অন্যান্য প্রতিযোগীদের ভয়ে ভীত থাকে, কিন্তু তারা যদি ভগবানের বাহুযুগলের আশ্রয় অবলম্বন করে, তা হলে ভগবান তাদের শত্রুদের আক্রমণ থেকে সর্বদা রক্ষা করেন। প্রশাসনিক সেবায় যুক্ত ভগবানের বিশ্বস্ত সেবক হচ্ছেন আর্দশ নেতা, এবং তিনিই জনসাধারণের স্বার্থ যথাযথভাবে রক্ষা করতে পারেন। অন্য তথাকথিত প্রশাসকেরা কালের অসঙ্গতিসূচক প্রতীকস্বরূপ, যাদের শাসনে মানুষদের কেবল দুঃসহ দুঃখ ভোগ করতে হয়। প্রশাসকগণ ভগবানের বাহুযুগলের আশ্রয়ে সুরক্ষিত থাকতে পারে। পরমেশ্বর ভগবান হচ্ছেন সব কিছুর সার, তাই তাঁকে বলা হয় সারম্। আর যারা তাঁর মহিমা কীর্তন করেন এবং তাঁর কথা বলেন, তাঁদের বলা হয় সারঙ্গ বা শুদ্ধ ভক্ত। শুদ্ধ ভক্তেরা সর্বদাই ভগবানের শ্রীপাদপদ্ম লাভের জন্য লালায়িত

থাকেন। পদ্মে এক প্রকার মধু হয়, যার অপ্রাকৃত স্বাদ ভক্তগণ আস্বাদন করেন। ভক্তগণ সর্বদাই মধুলোলুপ ভ্রমরের মতো। গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের আচার্য মহাভাগবত শ্রীল রূপ গোস্বামী নিজেকে একজন ভ্রমরের সঙ্গে তুলনা করে সেই পদ্ম-মধুর সম্বন্ধে একটি গান গেয়েছেন—

দেব ভবন্তং বন্দে ।
মন্মানস-মধুকরমর্পয় নিজপদ-পঙ্কজ-মকরন্দে ॥
যদপি সমাধিষু বিধিরপি পশ্যতি
ন তব নখাগ্রমরীচিম্ ।
ইদমিচ্ছামি নিশম্য তবাচ্যুত
তদপি কৃপাদ্ভুত-বীচিম্ ॥
ভক্তিরুদঞ্চতি যদ্যপি মাধব
ন ত্বয়ি মম তিলমাত্রী ॥
পরমেশ্বরতা তদপি তবাধিক-
দুর্ঘটঘটন-বিধাত্রী ॥
অয়মবিলোলতয়াদ্য সনাতন
কলিতাদ্ভুত-রসভারম্ ।
নিবসতু নিত্যমিহামৃতনিন্দিনি
বিন্দন্ মধুরিমসারম্ ॥ ৩ ॥

"হে দেব! (কৃষ্ণ) তোমাকে বন্দনা করি। আমার মানস-মধুকরকে নিজ পাদপদ্মের মকরন্দে (মধুতে) অর্পণ কর। যদিও ব্রহ্মা সমাধিযোগে তোমার নখাগ্রকিরণ পর্যন্ত দর্শনে অক্ষম, তথাপি হে অচ্যুত! তোমার অদ্ভুত কৃপাতরঙ্গ শ্রবণ করে এই ইচ্ছা করছি। হে মাধব! যদিও তোমাতে আমার তিলমাত্রও ভক্তির উদয় হয়নি, তথাপি তোমাতে অঘটনঘটনকারিণী পরমেশ্বরতা বিদ্যমান বলে কৃপা পাবার আশা করি। হে সনাতন! তোমার পাদপদ্ম অমৃতকেও নিন্দা করছে, অতএব আমার মানস-মধুকর মকরন্দ-পানে লুব্ধ হয়ে মাধুর্যসার প্রাপ্তির জন্য তোমার পাদপদ্মে নিশ্চলরূপে বাস করুক; এটিই আমার প্রার্থনা।" ভক্তেরা ভগবানের শ্রীপাদপদ্মে অবস্থিত হয়েই পূর্ণরূপে তৃপ্ত হন, ভগবানের সর্ব সৌন্দর্যমণ্ডিত মুখমণ্ডল দর্শন করার উচ্চাভিলাষ অথবা ভগবানের বলিষ্ঠ বাহুযুগলের দ্বারা সুরক্ষিত হওয়ার বাসনা তাঁরা করেন না। তাঁরা স্বাভাবিকভাবেই বিনম্র, এবং ভগবান সর্বদাই এই প্রকার বিনীত ভক্তদের প্রতি অনুরক্ত।

শ্লোক ২৭

সিতাতপত্রব্যজনৈরুপস্কৃতঃ
প্রসূনবর্ষৈরভিবর্ষিতঃ পথি ।
পিশঙ্গবাসা বনমালয়া বভৌ
ঘনো যথার্কোডুপচাপবৈদ্যুতৈঃ ॥২৭॥

সিত-আতপত্র—শুভ্র ছত্র; ব্যজনৈঃ—চামর; উপস্কৃতঃ—সেবিত; প্রসূন—পুষ্প; বর্ষৈঃ—বৃষ্টি; অভিবর্ষিতঃ—আচ্ছাদিত; পথি—পথে; পিশঙ্গ-বাসাঃ—পীতবাস; বন-মালয়া—বনফুলের মালার দ্বারা; বভৌ—হয়েছিল; ঘনঃ—মেঘ; যথা—যেমন; অর্ক—সূর্য; উডুপ—চন্দ্র; চাপ—ইন্দ্রধনু; বৈদ্যুতৈঃ—বিদ্যুতের দ্বারা।

অনুবাদ

শ্রীকৃষ্ণ যখন দ্বারকার রাজপথ দিয়ে যাচ্ছিলেন, তখন তাঁর মাথার উপর শ্বেত ছত্র শোভা পাচ্ছিল, শ্বেত চামর ব্যজন করা হচ্ছিল এবং পুষ্প বৃষ্টির ফলে সারা পথ পুষ্পাচ্ছাদিত হয়েছিল। তখন পীতবাস ও বনমালা শোভিত শ্রীকৃষ্ণকে একসঙ্গে সূর্য, চন্দ্র, ইন্দ্রধনু ও বিদ্যুৎ শোভিত ঘন মেঘের মতো মনে হচ্ছিল।

তাৎপর্য

সূর্য, চন্দ্র, ইন্দ্রধনু এবং বিদ্যুৎ একসঙ্গে আকাশে প্রকট হয় না। যখন সূর্য থাকে তখন চন্দ্রকিরণ নিষ্প্রভ হয়ে যায়, এবং যখন ইন্দ্রধনু দেখা দেয় তখন আর বিদ্যুৎ চমকায় না। ভগবানের অঙ্গকান্তি ঠিক বর্ষার জলভরা মেঘের মতো। এখানে তাঁকে মেঘের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। তাঁর মস্তকোপরি শ্বেত ছত্রকে সূর্যের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। চামরের আন্দোলনকে চন্দ্রের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। পুষ্পবর্ষণকে তারকারাজির সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। তাঁর পরনে পীত বসনকে ইন্দ্রধনুর সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। গগনমণ্ডলের এই সমস্ত কার্যকলাপ একসঙ্গে প্রকাশিত হতে পারে না বলে তুলনার দ্বারাও তাদের সামঞ্জস্য নির্ণয় করা যায় না। এই সামঞ্জস্য তখনই সম্ভব যখন আমরা ভগবানের অচিন্ত্য শক্তির কথা চিন্তা করি। ভগবান সর্বশক্তিমান, এবং তাঁর উপস্থিতিতে, তাঁর অচিন্ত্য শক্তির দ্বারা অসম্ভবও সম্ভব হয়। কিন্তু দ্বারকার পথ দিয়ে তিনি যাওয়ার সময় যে পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছিল তা এতই সুন্দর ছিল যে তার তুলনা প্রাকৃতিক ঘটনার বর্ণনা ব্যতীত অন্য কোন বস্তুর দ্বারা দেওয়া সম্ভব ছিল না।

শ্লোক ২৮

প্রবিষ্টস্তু গৃহং পিত্রোঃ পরিষ্বক্তঃ স্বমাতৃভিঃ ।
ববন্দে শিরসা সপ্ত দেবকীপ্রমুখা মুদা ॥ ২৮ ॥

প্রবিষ্টঃ—প্রবেশ করে; **তু**—কিন্তু; **গৃহম্**—গৃহে; **পিত্রোঃ**—পিতার; **পরিষ্বক্তঃ**—আলিঙ্গিত; **স্ব-মাতৃভিঃ**—তাঁর মাতাদের দ্বারা; **ববন্দে**—প্রণতি নিবেদন করেছিলেন; **শিরসা**—মস্তক দ্বারা; **সপ্ত**—সাত; **দেবকী**—দেবকী; **প্রমুখা**—আদি; **মুদা**—আনন্দ সহকারে।

অনুবাদ

তারপর তাঁর পিতার আলয়ে প্রবেশ করে তিনি দেবকী আদি তাঁর মাতাদের দ্বারা আলিঙ্গিত হলেন এবং তিনি মস্তক অবনত করে তাঁদের প্রণতি নিবেদন করলেন।

তাৎপর্য

এই বর্ণনা থেকে বোঝা যায় যে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের পিতা বসুদেবের আলাদা বাসস্থান ছিল, যেখানে তিনি তাঁর আঠার জন পত্নীসহ বাস করতেন, তাঁদের মধ্যে শ্রীমতী দেবকী হচ্ছেন শ্রীকৃষ্ণের প্রকৃত মাতা। কিন্তু তা সত্ত্বেও অন্য সমস্ত বিমাতারা তাঁর প্রতি সমান স্নেহশীলা ছিলেন, যা পরবর্তী শ্লোকে স্পষ্টভাবে বোঝা যাবে। শ্রীকৃষ্ণ তাঁর প্রকৃত মাতা এবং বিমাতাদের মধ্যে কোন ভেদভাব রাখতেন না, এবং তিনি সেখানে উপস্থিত বসুদেবের সমস্ত পত্নীদের প্রতি সমান শ্রদ্ধা সহকারে প্রণতি নিবেদন করেছিলেন। শাস্ত্রের বর্ণনা অনুসারে সাত প্রকার মাতা রয়েছেন— ১) প্রকৃত মাতা, ২) গুরু-পত্নী, ৩) ব্রাহ্মণ-পত্নী, ৪) রাজার পত্নী, ৫) গাভী, ৬) ধাত্রী, এবং ৭) পৃথিবী। এঁরা সকলেই মাতা। শাস্ত্রের এই নির্দেশ অনুসারে, পিতার পত্নী হওয়ার ফলে বিমাতাও মাতারই মতো, কেননা পিতা হচ্ছেন গুরু। ব্রহ্মাণ্ড-পতি ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বিমাতার প্রতি কিভাবে আচরণ করতে হয় সেই শিক্ষা দেওয়ার জন্য একজন আদর্শ পুত্রের ভূমিকায় লীলা বিলাস করেছেন।

শ্লোক ২৯

তাঃ পুত্রমঙ্কমারোপ্য স্নেহস্নুতপয়োধরাঃ ।
হর্ষবিহ্বলিতাত্মানঃ সিষিচুর্নেত্রজৈর্জলৈঃ ॥ ২৯ ॥

তাঃ—তাঁরা সকলে; **পুত্রম্**—পুত্রকে; **অঙ্কম্**—কোলে; **আরোপ্য**—স্থাপন করে; **স্নেহ-স্নুত**—স্নেহসিক্ত; **পয়োধরাঃ**—দুগ্ধবতী হন; **হর্ষ**—আনন্দ; **বিহ্বলিত-আত্মানঃ**—উদ্বেলিত চিত্ত; **সিষিচুঃ**—সিক্ত করেছিলেন; **নেত্রজৈঃ**—অক্ষির; **জলৈঃ**—জলে।

অনুবাদ

তাঁদের পুত্রকে আলিঙ্গন করে মাতারা তাঁকে তাঁদের কোলে বসালেন। তখন স্নেহবশত তাঁদের স্তন থেকে দুগ্ধ ক্ষরিত হতে লাগল, এবং আনন্দাশ্রুর দ্বারা তাঁরা তখন শ্রীকৃষ্ণকে অভিষিক্ত করেছিলেন।

তাৎপর্য

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যখন বৃন্দাবনে ছিলেন, তখন সেখানকার গাভীরা পর্যন্ত তাঁর প্রতি স্নেহসিক্ত ছিল, এবং তিনি সমস্ত স্নেহশীলা গাভীর স্তন থেকে দুগ্ধ দোহন করতেন। অতএব তাঁর বিমাতাদের কি কথা, যাঁরা ছিলেন তাঁর নিজের মায়েরই মতো।

শ্লোক ৩০

অথাবিশৎ স্বভবনং সর্বকামমনুত্তমম্ ।
প্রাসাদা যত্র পত্নীনাং সহস্রাণি চ ষোড়শ ॥ ৩০ ॥

অথ—তারপর; **অবিশৎ**—প্রবেশ করে; **স্ব-ভবনম্**—তাঁর নিজের প্রাসাদে; **সর্ব**—সকল; **কামম্**—বাসনা; **অনুত্তমম্**—সর্বতোভাবে শ্রেষ্ঠ; **প্রাসাদাঃ**—প্রাসাদসমূহ; **যত্র**—যেখানে; **পত্নীনাম্**—পত্নীদের; **সহস্রাণি**—সহস্র সহস্র; **চ**—অধিকন্তু; **ষোড়শ**—ষোল।

অনুবাদ

তারপর যেখানে তাঁর ষোল হাজারেরও অধিক পত্নী বাস করতেন, সেই সর্ব অভীষ্টপ্রদ সর্বোৎকৃষ্ট তাঁর প্রাসাদসমূহে ভগবান প্রবেশ করলেন।

তাৎপর্য

ভগবান শ্রীকৃষ্ণের ষোল হাজার একশ' আটজন পত্নী ছিলেন, এবং তাঁদের প্রত্যেকের জন্য বিস্তীর্ণ অঙ্গন, উদ্যান এবং সম্পূর্ণরূপে সুসজ্জিত এক-একটি প্রাসাদ

ছিল। দশম স্কন্ধে এই সমস্ত প্রাসাদের পূর্ণ বিবরণ দেওয়া হয়েছে। সেই প্রাসাদগুলি সর্বশ্রেষ্ঠ মর্মর প্রস্তর দিয়ে তৈরী হয়েছিল। সেগুলি মণিরত্নের দ্বারা প্রকাশিত ছিল, সোনার জরি এবং সূচীকার্যের দ্বারা ভূষিত মখমল, রেশমের পর্দা ও গালিচার দ্বারা সেগুলি সুন্দরভাবে সজ্জিত ছিল। ভগবান হচ্ছেন তিনি—যিনি সমগ্র ঐশ্বর্য, সমগ্র বীর্য, সমগ্র সৌন্দর্য, সমগ্র যশ, সমগ্র জ্ঞান এবং সমগ্র বৈরাগ্য সমন্বিত। অতএব ভগবানের সমস্ত প্রাসাদে তাঁর সমস্ত বাসনা চরিতার্থ করার জন্য কোন বস্তুর অভাব ছিল না। ভগবান অসীম, অতএব তাঁর বাসনাও অসীম, এবং তার সরবরাহও অসীম। সব কিছুই অসীম হওয়ার ফলে এখানে সংক্ষেপে সর্ব-কামম্ বলে বর্ণনা করা হয়েছে, অর্থাৎ সমস্ত কাম্য বস্তুর দ্বারা এই সমস্ত প্রাসাদগুলি পূর্ণ ছিল।

শ্লোক ৩১

পত্ন্যঃ পতিং প্রোষ্য গৃহানুপাগতং
বিলোক্য সংযাতমনোমহোৎসবাঃ ।
উত্তস্থুরারাৎ সহসাসনাশয়াৎ
সাকং ব্রতৈর্ব্রীড়িতলোচনাননাঃ ॥ ৩১ ॥

পত্ন্যঃ—শ্রীকৃষ্ণের মহিষীগণ; **পতিম্**—পতিকে; **প্রোষ্য**—প্রবাসী; **গৃহ-অনুপাগতম্**—গৃহে প্রত্যাবর্তন করেছেন; **বিলোক্য**—দেখে; **সঞ্জাত**—বর্ধিত; **মনঃ-মহা-উৎসবাঃ**—হৃদয়ে আনন্দোৎসবের অনুভূতি; **উত্তস্থুঃ**—উঠলেন; **আরাৎ**—দূর থেকে; **সহসা**—হঠাৎ; **আসনা**—আসন থেকে; **আশয়াৎ**—ধ্যানস্থ অবস্থা থেকে; **সাকম্**—সহ; **ব্রতৈঃ**—ব্রত; **ব্রীড়িত**—সলজ্জ; **লোচন**—চক্ষু; **আননাঃ**—মুখমণ্ডল।

অনুবাদ

দীর্ঘ প্রবাসের পর পতিকে গৃহে প্রত্যাবর্তন করতে দেখে শ্রীকৃষ্ণের পত্নীদের হৃদয় পরমানন্দে পূর্ণ হল, তাঁদের চক্ষু ও বদন লজ্জাবনত হল, এবং তাঁরা তাঁদের আসন এবং চিন্তামগ্ন অবস্থা থেকে তৎক্ষণাৎ উত্থিত হলেন।

তাৎপর্য

পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে ভগবান তাঁর ষোল হাজার একশ আটজন মহিষীর প্রাসাদে প্রবেশ করেছিলেন। তার অর্থ হচ্ছে যে ভগবান তৎক্ষণাৎ যতজন মহিষী

এবং প্রাসাদ ছিল তত সংখ্যায় নিজেকে বিস্তার করে সেই সমস্ত প্রাসাদে একই সময়ে প্রবেশ করেছিলেন। এটি তাঁর অন্তরঙ্গা শক্তির আর একটি প্রকাশ। যদিও তিনি এক এবং অদ্বিতীয়, তথাপি তিনি তাঁর ইচ্ছা অনুসারে নিজেকে অসংখ্য চিন্ময় রূপে বিস্তার করতে পারেন। শ্রুতি-মন্ত্রে প্রতিপন্ন হয়েছে যে পরম তত্ত্ব এক, তথাপি যখনই তিনি বাসনা করেন তৎক্ষণাৎ তিনি বহু হতে পারেন। ভগবানের এই বিস্তার অংশ এবং বিভিন্নাংশ রূপে প্রকাশিত হয়। তাঁর বিভিন্নাংশ তাঁর শক্তির দ্যোতক, এবং তাঁর অংশ তাঁর স্বরূপের অভিব্যক্তি। এইভাবে পরমেশ্বর ভগবান নিজেকে ষোল হাজার একশ' আট অংশে বিস্তার করে তাঁর প্রতিটি মহিষীর প্রাসাদে একই সঙ্গে প্রবেশ করেছিলেন। এটি ভগবানের বৈভব বা চিন্ময় শক্তি। আর যেহেতু তিনি তা করতে পারেন, তাই তাঁকে বলা হয় যোগেশ্বর। সাধারণত যোগী বা অলৌকিক ক্ষমতাসম্পন্ন জীবেরা বড় জোর তাদের দেহকে দশটি দেহে বিস্তার করতে পারে, কিন্তু ভগবান তাঁর ইচ্ছা অনুসারে কয়েক হাজার গুণ এমন কি অনন্ত গুণে নিজেকে বিস্তার করতে পারেন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ষোল হাজার মহিষীকে বিবাহ করেছিলেন শুনে অবিশ্বাসী ব্যক্তিরা আশ্চর্য হয়, কেননা তারা মনে করে যে শ্রীকৃষ্ণ তাদেরই মতো একজন এবং তারা তাদের সীমিত ক্ষমতার দ্বারা ভগবানের শক্তি মাপতে চায়। সকলেরই এটি জেনে রাখা উচিত যে ভগবান কখনই জীবের সমতুল্য নন। জীবেরা হচ্ছে তাঁর তটস্থা শক্তির বিস্তার, এবং যদিও গুণগতভাবে শক্তি এবং শক্তিমানের মধ্যে পার্থক্য অত্যন্ত অল্প, তথাপি শক্তি ও শক্তিমান কখনোই সমতুল্য নয়। ভগবানের মহিষীরা ছিলেন তাঁর অন্তরঙ্গা শক্তির বিস্তার, এবং এইভাবে শক্তি এবং শক্তিমান নিরন্তর দিব্য আনন্দের আদান-প্রদান করেন। তাকে বলা হয় ভগবানের লীলা। অতএব ভগবান যে এতজন পত্নীকে বিবাহ করেছিলেন সে কথা শুনে আশ্চর্য হওয়া উচিত নয়। পক্ষান্তরে এই বিশ্বাস রাখা উচিত যে ভগবান যদি ষোল কোটি পত্নীকেও বিবাহ করতেন, তা হলেও তাঁর অচিন্ত্য এবং অব্যয় শক্তির পূর্ণ প্রকাশ হত না। সাধারণ মানুষ, তা সে যতই শক্তিশালী হোক না কেন, ভগবান যে তাদের সমকক্ষ বা তাদের থেকে নিকৃষ্ট নন সে কথা পৃথিবীপৃষ্ঠে মানুষের ইতিহাসে লিপিবদ্ধ করে যাবার জন্যই তিনি কেবলমাত্র ষোল হাজার পত্নীকে বিবাহ করেছিলেন এবং তাঁদের প্রত্যেকের প্রাসাদে এক সঙ্গে প্রবেশ করেছিলেন। অতএব কেউই ভগবানের সমকক্ষ নয় অথবা ভগবান থেকে শ্রেষ্ঠ নয়। ভগবান সর্বদাই সর্বতোভাবে শ্রেষ্ঠ। "ভগবান সর্বশ্রেষ্ঠ"—এটি হচ্ছে শাশ্বত সত্য।

অতএব, মহিষীরা দূর থেকে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের কারণে গৃহে দীর্ঘকাল অনুপস্থিত পতিকে দর্শন করে তাঁদের ধ্যাননিদ্রা থেকে উত্থিত হয়ে তাঁদের পরম প্রিয়তমকে অভ্যর্থনা করতে প্রস্তুত হয়েছিলেন। যাজ্ঞবল্ক্যের ধর্মনীতি অনুসারে, যে রমণীর পতি প্রবাসে রয়েছেন তাঁর কোন সামাজিক অনুষ্ঠানে যোগদান করা উচিত নয়, তাঁর দেহ অলঙ্কৃত করা উচিত নয়, হাসা উচিত নয় এবং কোনও অবস্থাতেই কোনও আত্মীয়ের গৃহে গমন করা উচিত নয়। যে রমণীর পতি প্রবাসে তিনি এই ব্রত অবলম্বন করেন। সেই সঙ্গে এই নির্দেশও দেওয়া হয়েছে যে, পত্নী কখনও তাঁর পতির সমক্ষে মলিন অবস্থায় উপস্থিত হবেন না। তাঁকে অলঙ্কারে বিভূষিত হয়ে, সুন্দর বস্ত্রে সজ্জিত হয়ে, প্রসন্ন এবং হরষিত অন্তরে পতির সমীপবর্তী হওয়া কর্তব্য। শ্রীকৃষ্ণের অনুপস্থিতির ফলে তাঁর সমস্ত মহিষীরা সর্বদাই তাঁর চিন্তায় মগ্ন থাকতেন, এবং এইভাবে তাঁরা সর্বদা তাঁর ধ্যান করতেন। ভগবানের ভক্তেরা নিমেষের জন্যও ভগবানের ধ্যান না করে থাকতে পারেন না, অতএব তাঁর মহিষীদের কী কথা, যাঁরা ছিলেন স্বয়ং লক্ষ্মীদেবী। ভগবানের দ্বারকা লীলায় তাঁরা মহিষীরূপে অবতীর্ণ হয়েছিলেন। ভগবান থেকে কখনই তাঁদের বিচ্ছিন্ন করা যায় না। ভগবানের উপস্থিতির দ্বারা অথবা ধ্যানের দ্বারা সর্বদাই তাঁরা ভগবানের সঙ্গে যুক্ত। ভগবান যখন গোচারণ করার জন্য বৃন্দাবনের বনে চলে যেতেন, তখন ব্রজ-গোপিকারা নিমেষের জন্যও ভগবানকে ভুলতে পারতেন না। বাল্যাবস্থায় শ্রীকৃষ্ণ যখন গ্রামে অনুপস্থিত থাকতেন, তখন গৃহে বসে গোপিকারা কিভাবে ভগবান তাঁর কোমল পদকমলের দ্বারা কর্কশ ভূমিতে বিচরণ করছেন সে কথা ভেবে উদ্বিগ্ন হতেন। এইভাবে চিন্তা করতে করতে তাঁরা সমাধিমগ্ন হয়ে অত্যন্ত মর্মাহত হতেন। ভগবানের শুদ্ধ পার্ষদদের এই রকমই অবস্থা হয়। তাঁরা সর্বদাই সমাধিমগ্ন থাকেন। অতএব শ্রীকৃষ্ণের অনুপস্থিতিতে তাঁর মহিষীরাও সমাধিস্থ ছিলেন। কিন্তু এখন দূর থেকে ভগবানকে দর্শন করে তাঁরা তাঁদের সমস্ত কার্য ত্যাগ করেছিলেন, এমন কি স্ত্রীলোকদের যে ব্রতের বর্ণনা পূর্বে করা হয়েছে তাও তাঁরা পরিত্যাগ করেছিলেন। শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুরের মতে, তখন তাঁদের মনে এক স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া হয়েছিল। প্রথমে তাঁরা তাঁদের আসন থেকে উত্থিত হয়েছিলেন, কেননা তাঁরা তাঁদের পতিকে দর্শন করতে চেয়েছিলেন; কিন্তু স্ত্রীসুলভ লজ্জার ফলে তাঁরা নিরস্ত হয়েছিলেন। প্রবল উৎকণ্ঠার ফলে তাঁরা সেই দুর্বল অবস্থা দমন করে ভগবানকে আলিঙ্গন করার ভাবনায় অভিভূত হয়েছিলেন, এবং সেই চিন্তা তাঁদের পারিপার্শ্বিক অবস্থা সম্বন্ধে অচেতন করেছিল। এই আনন্দময় অবস্থা তাঁদের সমস্ত লৌকিকতা ও সামাজিক

রীতি-নীতির অবসান ঘটিয়েছিল। তার ফলে তাঁরা ভগবানের সঙ্গে মিলিত হওয়ার পথে সমস্ত বাধা-বিপত্তি অতিক্রম করেছিলেন। আত্মার ঈশ্বর শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে মিলনের এটিই হচ্ছে চরম অবস্থা।

শ্লোক ৩২

তমাত্মজৈর্দৃষ্টিভিরন্তরাত্মনা
দুরন্তভাবাঃ পরিরেভিরে পতিম্ ।
নিরুদ্ধমপ্যাস্রবদম্বু নেত্রয়ো-
র্বিলজ্জতীনাং ভৃগুবর্য বৈক্লবাৎ ॥ ৩২ ॥

তম্—তাঁকে (শ্রীকৃষ্ণকে); আত্ম-জৈঃ—পুত্রদের দ্বারা; দৃষ্টিভিঃ—দৃষ্টির দ্বারা; অন্তর-আত্মনা—অন্তরাত্মার দ্বারা; দুরন্ত-ভাবাঃ—গম্ভীরভাব সমন্বিত; পরিরেভিরে—আলিঙ্গন করেছিলেন; পতিম্—পতিকে; নিরুদ্ধম্—রুদ্ধ; অপি—সত্ত্বেও; আস্রবৎ—বিগলিত; অম্বু—বারিবিন্দু; নেত্রয়োঃ—চক্ষু থেকে; বিলজ্জতীনাম্—যাঁরা লজ্জিত হয়েছিলেন তাঁদের; ভৃগু-বর্য—হে ভৃগুকুলতিলক; বৈক্লবাৎ—বিহ্বলতা হেতু।

অনুবাদ

তাঁদের দুরন্ত ভাব ছিল এতই প্রবল যে লজ্জাশীলা মহিষীরা প্রথমে ভগবানকে তাঁদের অন্তরের অন্তঃস্থলে আলিঙ্গন করলেন। তারপর তাঁরা তাঁকে চোখ দিয়ে আলিঙ্গন করলেন। তারপর তাঁকে আলিঙ্গন করার জন্য তাঁরা তাঁদের পুত্রদের পাঠালেন (এবং তা ছিল নিজেরই আলিঙ্গন করার মতো)। কিন্তু হে ভৃগুশ্রেষ্ঠ! যদিও তাঁরা তাঁদের অনুভূতিকে চেপে রাখার চেষ্টা করেছিলেন, তা সত্ত্বেও, অনিচ্ছাকৃতভাবেই তাঁরা অশ্রু বর্ষণ করেছিলেন।

তাৎপর্য

যদিও স্ত্রীসুলভ লজ্জার ফলে মহিষীরা তাঁদের প্রিয় পতি ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে আলিঙ্গন করতে পারেননি, তথাপি তাঁরা তাঁকে দর্শন করে, তাঁদের হৃদয়ের অন্তঃস্থলে তাঁকে স্থাপন করে, এবং তাঁদের পুত্রদের দ্বারা তাঁকে আলিঙ্গন করতে পাঠিয়ে তাঁরা সেই কার্যটি সম্পাদন করেছিলেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও সেই কার্যটি অসমাপ্ত রয়ে গিয়েছিল, অশ্রু সংবরণ করার বহু চেষ্টা করা সত্ত্বেও তাঁদের গাল বেয়ে অশ্রু ঝরে পড়েছিল। পতিকে আলিঙ্গন করার জন্য পুত্রকে পাঠিয়ে মাতা পরোক্ষভাবে

পতিকে আলিঙ্গন করেন, কেননা পুত্র মাতার শরীর থেকেই বিকশিত হয়। পুত্রের আলিঙ্গন পতি-পত্নীর আলিঙ্গন থেকে ভিন্ন, কেননা তাতে কামভাব নেই, সেই আলিঙ্গনে রয়েছে স্নেহের পরিতৃপ্তি। প্রেমের সম্পর্কে চক্ষুর দ্বারা আলিঙ্গন অধিক প্রভাবপূর্ণ, এবং তাই শ্রীল জীব গোস্বামীর মতে, পতি-পত্নীর মধ্যে এই প্রকার ভাব বিনিময় অসমীচীন নয়।

শ্লোক ৩৩

যদ্যপ্যসৌ পার্শ্বগতো রহোগত-
স্তথাপি তস্যাঙ্ঘ্রিযুগং নবং নবম্ ।
পদে পদে কা বিরমেত তৎপদা-
চ্চলাপি যচ্ছ্রীর্ন জহাতি কর্হিচিৎ ॥ ৩৩ ॥

যদ্যপি—যদিও; **অসৌ**—তিনি (শ্রীকৃষ্ণ); **পার্শ্ব-গতঃ**—ঠিক তাঁর পাশে; **রহঃ-গতঃ**—সম্পূর্ণভাবে একাকী; **তথাপি**—তবুও; **তস্য**—তাঁর; **অঙ্ঘ্রি-যুগম্**—চরণযুগল; **নবম্ নবম্**—নব নব; **পদে পদে**—প্রতি পদে; **কা**—কে; **বিরমেত**—বিরত হতে পারে; **তৎ-পদাৎ**—তাঁর চরণ থেকে; **চলাপি**—চঞ্চলস্বভাবা হওয়া সত্ত্বেও; **যৎ**—যাঁকে; **শ্রীঃ**—লক্ষ্মীদেবী; **ন**—না; **জহাতি**—ত্যাগ করতে পারে; **কর্হিচিৎ**—কখনো।

অনুবাদ

শ্রীকৃষ্ণ যদিও সর্বদা একান্তভাবে তাঁদের পাশে অবস্থান করতেন, তবুও তাঁর শ্রীপাদপদ্মযুগল প্রতিক্ষণ তাঁদের কাছে নব নবায়মান বলে মনে হত। শ্রীলক্ষ্মীদেবী যদিও চঞ্চলস্বভাবা, কিন্তু তিনি ভগবানের পাদপদ্ম কখনো পরিত্যাগ করতে পারেন না। অতএব কোন্ নারী একবার সেই পদযুগলের আশ্রয় গ্রহণ করে তাঁর সেবা থেকে বিরত হতে পারে?

তাৎপর্য

বদ্ধ জীবেরা সর্বদাই লক্ষ্মীদেবীর কৃপা আকাঙ্ক্ষা করে, যদিও প্রকৃতপক্ষে তাঁর প্রকৃতি হচ্ছে চঞ্চলা। জড় জগতে কেউই, তা তিনি যতই চতুর হোন না কেন, চিরস্থায়ী সৌভাগ্য লাভ করতে পারেন না। পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে কত বড় বড় সাম্রাজ্য হয়েছে, পৃথিবীর সর্বত্র কত শক্তিশালী রাজারা রাজত্ব করেছে, এবং কত সৌভাগ্যশালী মানুষের আবির্ভাব হয়েছে, কিন্তু কালক্রমে তারা সকলেই বিনষ্ট

হয়ে গেছে। এটিই হচ্ছে জড়া প্রকৃতির নিয়ম। কিন্তু পারমার্থিক বিচার অন্য রকম। *ব্রহ্ম-সংহিতায়* বর্ণনা করা হয়েছে যে ভগবান নিরন্তর শত-সহস্র লক্ষ্মীদেবীর দ্বারা সম্ভ্রম সহকারে সেবিত হন। তাঁরা সর্বদা নির্জন স্থানে ভগবানের সঙ্গে থাকেন। কিন্তু ভগবানের সান্নিধ্য এমনই নব নবায়মান অনুপ্রেরণাপ্রদ যে তাঁদের প্রকৃতি চঞ্চলা হলেও তাঁরা ক্ষণিকের জন্যও ভগবানকে ছাড়তে পারেন না। ভগবানের সঙ্গে চিন্ময় সম্পর্ক এতই আনন্দদায়ক ও সম্পদশালী যে, একবার তাঁর শরণ গ্রহণ করা হলে আর তাঁর সঙ্গ ত্যাগ করা যায় না।

জীব তার স্বরূপে স্ত্রীরূপা। ভগবান হচ্ছেন পুরুষ বা ভোক্তা, এবং তাঁর বিভিন্ন শক্তির সমস্ত প্রকাশ হচ্ছে প্রকৃতি। *শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায়* জীবদের পরা প্রকৃতি বা উৎকৃষ্টা শক্তি বলে সম্বোধন করা হয়েছে। জড় উপাদানগুলি হচ্ছে অপরা প্রকৃতি বা নিকৃষ্টা শক্তি। এই প্রকার শক্তি ভোক্তার সন্তুষ্টি বিধানের জন্য সর্বদা নিয়োজিত হয়। পরম ভোক্তা হচ্ছেন স্বয়ং ভগবান, যে কথা *শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায়* (৫/২৯) উল্লেখ করা হয়েছে। তাই শক্তি যখন সরাসরিভাবে ভগবানের সেবায় নিয়োজিত হয়, তখন তাঁর প্রকৃত রূপ পুনঃপ্রকাশিত হয়, তখন আর শক্তি এবং শক্তিমানের সম্পর্কে কোন ভেদ থাকে না।

সাধারণত মানুষ যখন কারও চাকরি করে, তখন সে সর্বদাই সরকার অথবা রাজ্যের পরম ভোক্তার অধীনে কোন পদ আকাঙ্ক্ষা করে। যেহেতু ভগবান হচ্ছেন এই ব্রহ্মাণ্ডের ভিতরের এবং বাইরের সব কিছুরই পরম ভোক্তা, তাই তাঁর চাকরিতে নিয়োজিত হতে পারলে পরম সুখী হওয়া যায়। একবার ভগবানের সেবায় যুক্ত হলে জীব আর সেই পদ থেকে মুক্ত হতে চায় না। মানব জীবনের সর্বোচ্চ সিদ্ধি হচ্ছে ভগবানের পরম সেবা প্রাপ্ত হওয়া। তার ফলে মানুষ চরম সুখ লাভ করতে পারে। তখন আর তাঁকে ভগবানের সম্পর্ক ব্যতীত চঞ্চলা লক্ষ্মীর কৃপা অন্বেষণ করতে হয় না।

শ্লোক ৩৪

এবং নৃপাণাং ক্ষিতিভারজন্মনা-
মক্ষৌহিণীভিঃ পরিবৃত্ততেজসাম্ ।
বিধায় বৈরং শ্বসনো যথানলং
মিথো বধেনোপরতো নিরায়ুধঃ ॥ ৩৪ ॥

এবম্—এইভাবে; **নৃপানাম্**—নরপতিদের; **ক্ষিতি-ভার**—পৃথিবীর ভারস্বরূপ; **জন্মনাম্**—এইভাবে জন্ম হয়েছিল; **অক্ষৌহিণীভিঃ**—অশ্ব, গজ, রথ এবং পদাতিক সৈন্যবল; **পরিবৃত**—পরিবৃত হওয়ার ফলে গর্বিত; **তেজসাম্**—বল; **বিধায়**—সৃষ্টি করে; **বৈরম্**—শত্রুতা; **শ্বসনঃ**—বায়ু কর্তৃক বাঁশের ঘর্ষণ; **যথা**—যেমন; **অনলম্**—অগ্নি; **মিথঃ**—পরস্পর; **বধেন**—তাদের বধ করে; **উপরতঃ**—উপশম; **নিরায়ুধঃ**—স্বয়ং নিরস্ত্র থেকে।

অনুবাদ

বায়ু যেমন বাঁশে বাঁশে পরস্পর সংঘর্ষণের দ্বারা অগ্নি উৎপন্ন করে বাঁশ বনকে দগ্ধ করে, ঠিক তেমনই পৃথিবীর ভারস্বরূপ অশ্ব, গজ, রথ পদাতিক সমন্বিত বহু অক্ষৌহিণী সেনাযুক্ত দাম্ভিক রাজাদের পরস্পরের মধ্যে শত্রুতা উৎপাদনপূর্বক ভগবান শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং তাদের বধ করেছিলেন।

তাৎপর্য

পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে, ভগবানের সৃষ্টিরূপে প্রকাশিত হয়েছে যে সমস্ত বস্তু, সেগুলির প্রকৃত ভোক্তা জীব নয়। ভগবানই তাঁর সৃষ্টিতে প্রকাশিত সব কিছুর ঈশ্বর এবং ভোক্তা। দুর্ভাগ্যবশত মায়াশক্তির প্রভাবে, প্রকৃতির গুণের দ্বারা পরিচালিত হয়ে জীব মিথ্যা ভোক্তায় পরিণত হয়। ভগবান হওয়ার এই ভ্রান্ত ভাবনার গর্বে গর্বিত হয়ে মায়াচ্ছন্ন জীব নানা কার্যের দ্বারা তার জড় শক্তি বৃদ্ধি করে এবং তার ফলে পৃথিবীর ভার এমনভাবে বর্ধিত করে যে তখন এই পৃথিবী প্রকৃতিস্থ মানুষদের পক্ষে বসবাসের সম্পূর্ণ অযোগ্য হয়ে যায়। সেই অবস্থাকে বলা হয় *ধর্মস্য গ্লানি* বা মানুষের শক্তির অসদ্ব্যবহার। এই প্রকার ধর্মের গ্লানি যখন অত্যন্ত প্রবল হয়ে ওঠে, তখন পৃথিবীর ভারস্বরূপ সেই নিষ্ঠুর প্রশাসকদের প্রভাবে এমন এক দুর্দশাগ্রস্ত পরিস্থিতির সৃষ্টি হয় যে সৎ প্রবৃত্তিসম্পন্ন মানুষেরা তখন অত্যন্ত বিচলিত হয়ে পড়েন। সেই সমস্ত সাধুদের পরিত্রাণের জন্য এবং বিশ্বের বিভিন্ন স্থানে আসুরিক প্রশাসকদের দ্বারা উৎপন্ন ভূ-ভার হরণ করার জন্য ভগবান তাঁর অন্তরঙ্গা শক্তির প্রভাবে আবির্ভূত হন। তিনি সেই অবাঞ্ছিত প্রশাসকদের প্রতি দয়া প্রদর্শন করেন না। পক্ষান্তরে তিনি তাঁর শক্তির প্রভাবে তাদের মধ্যে শত্রুতা উৎপাদন করেন, ঠিক যেমন বায়ুর প্রভাবে বাঁশের ঘর্ষণের ফলে অরণ্যে দাবানল জ্বলে ওঠে। অরণ্যে বায়ুর প্রভাবে আপনা থেকেই দাবানল

জ্বলে ওঠে, সেই রকম ভগবানের অদৃশ্য পরিকল্পনায় বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের মধ্যে শত্রুতার সৃষ্টি হয়। অবাঞ্ছিত শাসকেরা, তাদের ভ্রান্ত ক্ষমতা এবং রাজনৈতিক শক্তির গর্বে গর্বিত হয়ে আদর্শগত বিরোধের ফলে পরস্পরের সঙ্গে সংগ্রামে লিপ্ত হয় এবং তার ফলে তাদের সমস্ত ক্ষমতা ক্ষয় হয়ে যায়। পৃথিবীর ইতিহাস ভগবানের এই ইচ্ছাশক্তিকে প্রতিফলিত করে, এবং জীব যতক্ষণ পর্যন্ত না ভগবানের সেবায় যুক্ত হয় ততক্ষণ তা ঘটতে থাকবে। *শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় (৭/১৪)* সেই তথ্যটি অত্যন্ত প্রাঞ্জলভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। সেখানে বলা হয়েছে—"মায়া আমার শক্তি, এবং সেই গুণময়ী মায়ার প্রভাব থেকে মুক্ত হওয়া আশ্রিত জীবের পক্ষে সম্ভব নয়। কিন্তু যারা আমার (পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের) শরণাগত হয়, তারা অনায়াসে এই মায়ার সমুদ্র অতিক্রম করতে পারে।" তার অর্থ হচ্ছে যে কেউই সকাম কর্মের দ্বারা অথবা জল্পনা-কল্পনা প্রসূত দর্শনের দ্বারা অথবা আদর্শের দ্বারা এই জগতে শান্তি এবং সমৃদ্ধি প্রতিষ্ঠা করতে পারে না। একমাত্র উপায় হচ্ছে পরমেশ্বর ভগবানের শরণাগত হওয়া এবং তার ফলেই কেবল মায়ার মোহময়ী প্রভাব থেকে মুক্ত হওয়া যায়।

দুর্ভাগ্যবশত যে সমস্ত মানুষেরা ধ্বংসাত্মক কার্যকলাপে লিপ্ত, তারা পরমেশ্বর ভগবানের শরণাগত হতে পারে না। তারা সকলেই হচ্ছে মহামূর্খ, তারা নরাধম; আপাতদৃষ্টিতে যদিও তাদের শিক্ষিত বলে মনে হয়, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাদের জ্ঞান অপহৃত হয়েছে। তারা সকলেই আসুরিক মনোভাবাপন্ন, এবং তাই তারা সর্বদা ভগবানের পরম শক্তির সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে। যারা অত্যন্ত জড়বাদী, তারা সর্বদা জড় ক্ষমতা এবং শক্তির জন্য লালায়িত। নিঃসন্দেহে তারা হচ্ছে সব চাইতে বড় মূর্খ, কেননা তাদের জীবনীশক্তি সম্বন্ধে কোন ধারণা নেই। পারমার্থিক বিজ্ঞান সম্বন্ধে অজ্ঞতার ফলে তারা জড় বিজ্ঞানে মগ্ন থাকে, যা জড় দেহের সঙ্গে সঙ্গে বিনাশপ্রাপ্ত হয়। তারা হচ্ছে নরাধম, কেননা মনুষ্য জীবনের বিশেষ উদ্দেশ্য হচ্ছে ভগবানের সঙ্গে হারিয়ে যাওয়া সম্পর্কের পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা; আর জড়জাগতিক কার্যকলাপে যুক্ত থেকে তারা সেই সুযোগটি হারায়। তাদের জ্ঞান অপহৃত হয়েছে, কেননা দীর্ঘ জল্পনা-কল্পনার পরেও তারা পরমেশ্বর ভগবানকে জানতে পারে না, যিনি হচ্ছেন সবকিছুর সারাতিসার। আর তারা সকলেই আসুরিক ভাবাপন্ন; এবং তাই তাদের রাবণ, হিরণ্যকশিপু, কংস আদি জড়বাদী অসুরদের পরিণতি ভোগ করতে হয়।

শ্লোক ৩৫

স এষ নরলোকেঽস্মিন্নবতীর্ণঃ স্বমায়য়া ।
রেমে স্ত্রীরত্নকূটস্থো ভগবান্ প্রাকৃতো যথা ॥ ৩৫ ॥

সঃ—তিনি (পরমেশ্বর ভগবান); **এষঃ**—এই সমস্ত; **নর-লোকে**—এই পৃথিবীতে; **অস্মিন্**—এই; **অবতীর্ণঃ**—অবতীর্ণ হয়ে; **স্ব**—স্বয়ং; **মায়য়া**—অহৈতুকী কৃপার প্রভাবে; **রেমে**—উপভোগ করেছিলেন; **স্ত্রী-রত্ন**—ভগবানের পত্নী হওয়ার যোগ্য রমণী; **কূটস্থঃ**—মধ্যে; **ভগবান্**—পরমেশ্বর ভগবান; **প্রাকৃতঃ**—ভৌতিক; **যথা**—যেন।

অনুবাদ

সেই পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অহৈতুকী কৃপার প্রভাবে তাঁর অন্তরঙ্গা শক্তিকে আশ্রয় করে এই পৃথিবীতে অবতীর্ণ হয়ে প্রাকৃত লোকের মতো সর্বশ্রেষ্ঠ রমণীদের মধ্যে অবস্থান করে আনন্দ উপভোগ করেছিলেন।

তাৎপর্য

ভগবান বিবাহ করে একজন গৃহস্থের মতো জীবন-যাপন করেছিলেন। এটি অবশ্য একটি জড়জাগতিক কার্যের মতো, কিন্তু যখন আমরা জানতে পারি যে তিনি ষোল হাজার একশ' আটজন পত্নীকে বিবাহ করেছিলেন, এবং তাঁদের প্রত্যেকের সঙ্গে আলাদা আলাদা প্রাসাদে স্বতন্ত্রভাবে বাস করেছিলেন, তখন অবশ্যই বোঝা যায় যে তাঁর সেই কার্য জড়জাগতিক ছিল না। তাই তাঁর যোগ্য পত্নীদের সঙ্গে গৃহস্থের মতো বসবাস কখনোই জড়জাগতিক ছিল না, এবং তাঁদের সঙ্গে তাঁর আচরণ জড়জাগতিক যৌন সম্পর্ক বলে কখনও মনে করা উচিত নয়। যে সমস্ত রমণীরা ভগবানের পত্নী হয়েছিলেন তাঁরা অবশ্যই কোন সাধারণ রমণী ছিলেন না, কেননা কোটি কোটি জন্মের তপস্যার ফলেই কেবল পরমেশ্বর ভগবানকে পতিরূপে লাভ করা যায়। ভগবান যখন বিভিন্ন লোকে অথবা এই ভূলোকে আবির্ভূত হন, তখন তিনি তাঁর অপ্রাকৃত লীলা প্রদর্শন করার মাধ্যমে বদ্ধ জীবদের তাঁর সঙ্গে নিত্য দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য এবং মধুর রসের চিন্ময় সম্পর্কে যুক্ত হওয়ার জন্য আকর্ষণ করেন। ভগবানের সঙ্গে এই যে সেবার সম্পর্ক তা জড় জগতে বিকৃতরূপে প্রদর্শিত হয়, এবং সেই সম্পর্ক অসময়ে ছিন্ন হয়ে দুঃখ ও বেদনার অনুভূতিতে

পর্যবসিত হয়। জড়া প্রকৃতির দ্বারা আবদ্ধ হওয়ার ফলে মায়াগ্রস্ত জীব বুঝতে পারে না যে এই জড় জগতে তাদের সমস্ত সম্পর্ক অনিত্য এবং উন্মত্ততায় পূর্ণ। এই সমস্ত সম্পর্ক জীবকে কখনও নিত্য সুখ লাভে সাহায্য করতে পারে না। কিন্তু সেই সম্পর্ক যদি ভগবানের সঙ্গে প্রতিষ্ঠিত হয় তা হলে এই জড় দেহ পরিত্যাগ করার পর আমরা ভগবানের সঙ্গে আমাদের বাসনা অনুসারে নিত্য সম্পর্কে যুক্ত হয়ে চিজ্জগতে ফিরে যেতে পারি। তাই যে সমস্ত রমণীর সঙ্গে ভগবান তাঁদের পতিরূপে বাস করেছিলেন, তাঁরা এই জড় জগতের রমণী ছিলেন না। পক্ষান্তরে, তাঁরা ছিলেন ভগবানের সঙ্গে নিত্য সম্পর্কে যুক্ত তাঁর চিন্ময় পত্নী। সেটি এমনই একটি স্থিতি যা তাঁরা তাঁদের ভগবদ্ভক্তির পূর্ণতার মাধ্যমে লাভ করেছিলেন। সেটি তাঁদের যোগ্যতা। ভগবান হচ্ছেন পরম ব্রহ্ম বা পরমেশ্বর। বদ্ধ জীবেরা কেবল এই পৃথিবীতেই নয়, ব্রহ্মাণ্ডের অন্য সমস্ত লোকেও নিত্য সুখের অন্বেষণ করছে। কেননা তাদের স্বরূপে তারা হচ্ছে চিৎ-স্ফুলিঙ্গ এবং তাই তারা ভগবানের সৃষ্টির যে কোনও অংশে ভ্রমণ করতে পারে। কিন্তু জড়া প্রকৃতির গুণের দ্বারা আবদ্ধ হয়ে পড়ার ফলে তারা অন্তরীক্ষ-যানের দ্বারা গগনমার্গে বিচরণ করতে চায় এবং তাই তাদের গন্তব্যস্থলে পৌঁছাতে অক্ষম হয়। মাধ্যাকর্ষণ শক্তি তাদের একটি কারাগারের কয়েদীর মতো শৃঙ্খলের দ্বারা বেঁধে রাখে। অন্যান্য প্রক্রিয়ার দ্বারা তারা অন্যান্য স্থানে পৌঁছাতে পারে, কিন্তু তারা যদি ব্রহ্মাণ্ডের সর্বোচ্চ লোকেও যায়, সেখানেও জন্ম-জন্মান্তরে যে নিত্য সুখের অন্বেষণ তারা করছে তা লাভ করতে পারে না। কিন্তু তারা যখন প্রকৃতিস্থ হয়, তখন নিশ্চিতভাবে জানতে পারে যে, জন্ম-জন্মান্তর ধরে তারা যে অন্তহীন সুখের অন্বেষণ করছে তা তারা এই জড় জগতে কখনোই লাভ করতে পারবে না। সে কথা বুঝতে পেরে তারা তখন ব্রহ্মানন্দের অন্বেষণ করে। প্রকৃতপক্ষে পরম পুরুষ, পরব্রহ্ম, এই জড় জগতের কোথাও কখনো সুখের অন্বেষণ করেন না। এমন কি তাঁর সুখের সামগ্রী এই জড় জগতের কোথাও পাওয়া যায় না। তিনি নির্বিশেষ নন। যেহেতু তিনি অসংখ্য জীবের নায়ক এবং পরম পুরুষ, তাই তিনি কখনও নির্বিশেষ বা নিরাকার হতে পারেন না। তাঁর রূপ ঠিক আমাদের মতো, এবং সমস্ত জীবের যে-সমস্ত প্রবণতা রয়েছে তা পূর্ণরূপে তাঁর মধ্যে রয়েছে। তিনি ঠিক আমাদের মতোই বিবাহ করেন, কিন্তু তাঁর বিবাহ জড়জাগতিক নয় অথবা আমাদের বদ্ধ অবস্থার অভিজ্ঞতার দ্বারা সীমিত নয়। তাই তাঁর পত্নীদের জড়জাগতিক রমণীদের মতো মনে হলেও প্রকৃতপক্ষে তাঁরা সকলেই দিব্য মুক্ত আত্মা, যাঁরা হচ্ছেন ভগবানের অন্তরঙ্গা শক্তির পূর্ণ প্রকাশ।

শ্লোক ৩৬

উদ্দামভাবপিশুনামলবল্গুহাস-
ব্রীড়াবলোকনিহতো মদনোঽপি যাসাম্ ।
সম্মুহ্য চাপমজহাৎপ্রমদোত্তমাস্তা
যস্যেন্দ্রিয়ং বিমথিতুং কুহকৈর্ন শেকুঃ ॥ ৩৬ ॥

উদ্দাম—অতি গম্ভীর; ভাব—ভঙ্গি; পিশুন—উত্তেজক; অমল—নির্মল; বল্গু-হাস—মধুর হাস্যযুক্ত; ব্রীড়—চোখের কোণ থেকে; অবলোক—দৃষ্টিপাত; নিহতঃ—পরাজিত ; মদনঃ—কামদেব (অথবা অমদন—মহাধৈর্যশালী মহাদেব); অপি—ও; যাসাম্—যাঁর; সম্মুহ্য—পরাভূত হয়ে; চাপম্—ধনুক; অজহাৎ—পরিত্যাগ করেছিলেন; প্রমদ—রমণী, যে প্রমত্ত করে; উত্তমাঃ—উত্তম; তা—সকলে; যস্য—যার; ইন্দ্রিয়ম্—ইন্দ্রিয়সমূহ; বিমথিতুম্—বিচলিত করা; কুহকৈঃ—মোহিনী বিদ্যার দ্বারা; ন—না; শেকুঃ—সক্ষম হয়েছিলেন।

অনুবাদ

যদিও পরমাসুন্দরী মহিষীদের গূঢ় ভঙ্গিসূচক নির্মল মনোহর হাস্য এবং সলজ্জ দৃষ্টিপাতে স্বয়ং কন্দর্পও পরাভূত হয়ে হতাশায় তাঁর পুষ্পধনু পরিত্যাগ করেন এবং মহাধৈর্যশালী সাক্ষাৎ মহাদেবও সম্মোহপ্রাপ্ত হন, কিন্তু তবুও তাঁদের মোহিনী বিদ্যা এবং আকর্ষণী শক্তির দ্বারা তাঁরা ভগবান শ্রীকৃষ্ণের ইন্দ্রিয় বিচলিত করতে পারেননি।

তাৎপর্য

মুক্তির পথ বা ভগবদ্ধামে ফিরে যাওয়ার পথ সর্বদা স্ত্রীসঙ্গ করতে নিষেধ করে, এবং পূর্ণ সনাতন ধর্ম বা বর্ণাশ্রম ধর্ম স্ত্রীলোকদের সঙ্গ করতে নিষেধ করে বা তা নিয়ন্ত্রণ করে। তা হলে যে ব্যক্তি ষোল হাজারেরও অধিক পত্নীর প্রতি আসক্ত ছিলেন, তাঁকে কিভাবে পরমেশ্বর ভগবান বলে স্বীকার করা যায়? এই প্রশ্ন পরমেশ্বর ভগবানের দিব্য প্রকৃতি সম্বন্ধে জানতে উৎসুক ব্যক্তি প্রসঙ্গক্রমে উত্থাপন করতে পারেন। আর তার সেই প্রকার প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার জন্যই নৈমিষারণ্যের ঋষিরা এই শ্লোকে এবং পরবর্তী শ্লোকে ভগবানের দিব্য প্রকৃতি সম্বন্ধে আলোচনা করেছেন। এখানে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে যে, কামদেব অথবা সব চাইতে সংযত মহাদেবকেও জয় করতে পারে যে রমণীদের আকর্ষণীয় রূপ, তা

ভগবানের ইন্দ্রিয়কে বিচলিত করতে পারেনি। কামদেবের কাজ হচ্ছে জড় কাম উদ্দীপ্ত করা। কামদেবের বাণের আঘাতে জর্জরিত হয়ে সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড চালিত হচ্ছে। স্ত্রী এবং পুরুষের পরস্পরের প্রতি আকর্ষণই হচ্ছে জগতের সমস্ত কার্যকলাপের প্রকৃত প্রেরণা। পুরুষ তার মনোমতো সঙ্গিনীর অন্বেষণ করছে, এবং স্ত্রী তার যোগ্য পুরুষের অন্বেষণ করছে। সেটি হচ্ছে জড় জগতের উদ্দীপনা, এবং যখনই একজন পুরুষ একজন স্ত্রীর সঙ্গে মিলিত হয়, তখনই যৌন সম্পর্কের দ্বারা জীব দৃঢ় বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে পড়ে। তার ফলে গৃহ, মাতৃভূমি, সন্তান, সমাজ, মৈত্রী এবং সম্পত্তি সংগ্রহের প্রতি স্ত্রী ও পুরুষ উভয়েই আকৃষ্ট হয়। সেটি তখন তাদের মায়িক কার্যক্ষেত্রে পরিণত হয়। এইভাবে দুঃখ-দুর্দশাপূর্ণ অনিত্য জড় অস্তিত্বের প্রতি মিথ্যা অথচ অপরিহার্য আকর্ষণ প্রকট হয়। তাই যারা ভগবদ্ধামে ফিরে যাওয়ার জন্য মুক্তির পথে বিচরণ করছেন, সমস্ত শাস্ত্রে তাদের জড় জগতের এই সমস্ত আকর্ষণ থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য উপদেশ দেওয়া হয়েছে। মহাত্মা বা ভগবদ্ভক্তের সঙ্গ প্রভাবেই কেবল তা সম্ভব। কামদেব জীবদের উপর তার শর নিক্ষেপ করে তাদের বিপরীত লিঙ্গের প্রতি উন্মাদ করে তুলছে, তা সে সুন্দর হোক বা অসুন্দর হোক। কামদেব এইভাবে সকলকে প্ররোচিত করছে, এমন কি সভ্য মানুষদের বিচারে অত্যন্ত কুৎসিত পশুদেরও। এইভাবে কামদেব সব চাইতে কুৎসিতদের উপরেও তার প্রভাব বিস্তার করছে, অতএব যারা সর্বতোভাবে সুন্দর, তাদের আর কী কথা। ভগবান শিব, যাঁকে পরম সহিষ্ণু বলে মনে করা হয়, তিনিও কামদেবের বাণের আঘাতে মোহিনীরূপী ভগবানের অবতারের প্রতি উন্মত্ত হয়েছিলেন। এইভাবে শিবও কন্দর্পের কাছে পরাজিত হয়েছিলেন। কিন্তু কামদেব স্বয়ং লক্ষ্মীদেবীর গম্ভীর ও উত্তেজনাপ্রদ আচরণে বিমোহিত হয়েছিলেন এবং নিরাশ হয়ে স্বেচ্ছায় তাঁর ধনুর্বাণ পরিত্যাগ করেছিলেন। শ্রীকৃষ্ণের মহিষীরা ছিলেন এমনই সুন্দরী। তথাপি তাঁরা ভগবানের দিব্য ইন্দ্রিয়সমূহকে বিচলিত করতে পারেননি। তার কারণ হচ্ছে যে তিনি পূর্ণ আত্মারাম। তাঁর আনন্দের জন্য কোন বাহ্যিক সাহায্যের আবশ্যকতা হয় না। তাই তাঁদের রমণীসুলভ আকর্ষণের দ্বারা ভগবানকে সন্তুষ্ট করতে না পেরে মহিষীরা তাঁদের ঐকান্তিক প্রেম ও সেবার দ্বারা তাঁকে সন্তুষ্ট করেছিলেন। অনন্য দিব্য প্রেমের দ্বারাই তাঁরা ভগবানকে প্রসন্ন করতে পেরেছিলেন, এবং ভগবানও তাঁদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে পতিরূপে তাঁদের সঙ্গে ভাবের আদান-প্রদান করেছিলেন। এইভাবে তাঁদের ঐকান্তিক সেবায় তুষ্ট হয়েই কেবল তিনি তাঁদের অনুরক্ত পতির মতো তাঁদের সেবার প্রতিদান দিয়েছিলেন। তা না হলে তাঁর এতজন পত্নীর পতি হওয়ার

কোন প্রয়োজন ছিল না। তিনি সকলেরই পতি, কিন্তু যিনি তাঁকে এইভাবে গ্রহণ করেন, তিনি সেইভাবেই তাঁদের প্রতিদান দেন। ভগবানের প্রতি অনন্য প্রেমকে কখনও জড় কামের সঙ্গে তুলনা করা উচিত নয়। তা সম্পূর্ণরূপে বিশুদ্ধ চিন্ময়। মহিষীরা যে স্বাভাবিক রমণীসুলভ ভাব নিয়ে ভগবানের সঙ্গে আচরণ করেছিলেন তাও ছিল দিব্য, কেননা চিন্ময় আনন্দের অনুভূতিতে তা ব্যক্ত হয়েছিল। পূর্ববর্তী শ্লোকে ইতিমধ্যেই বিশ্লেষণ করা হয়েছে যে ভগবানকে একজন সাধারণ পতির মতো মনে হলেও প্রকৃতপক্ষে তাঁর পত্নীদের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক ছিল চিন্ময়, বিশুদ্ধ, এবং জড়া প্রকৃতির গুণের প্রভাব থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত।

শ্লোক ৩৭

তময়ং মন্যতে লোকো হ্যসঙ্গমপি সঙ্গিনম্ ।
আত্মৌপম্যেন মনুজং ব্যাপৃণ্বানং যতোহবুধঃ ॥ ৩৭ ॥

তম্—শ্রীকৃষ্ণকে; **অয়ম্**—এই সমস্ত (সাধারণ মানুষেরা); **মন্যতে**—মনে করে; **লোকঃ**—মায়ামুগ্ধ জীবেরা; **হি**—অবশ্যই; **অসঙ্গম্**—অনাসক্ত; **অপি**—সত্ত্বেও; **সঙ্গিনম্**—আসক্তিযুক্ত; **আত্ম-উপম্যেন**—নিজেদের মতো; **মনুজম্**—সাধারণ মানুষ; **ব্যাপৃণ্বানম্**—ব্যাপৃত; **যতঃ**—যেহেতু; **অবুধঃ**—অতত্ত্বজ্ঞ।

অনুবাদ

মায়ামুগ্ধ বিষয়াসক্ত মানুষেরা শ্রীকৃষ্ণকে তাদেরই মতো একজন সাধারণ মানুষ বলে মনে করে। তত্ত্বজ্ঞানের অভাবে তারা নিরাসক্ত, প্রাকৃত সঙ্গাতীত শ্রীকৃষ্ণকে জড়ের দ্বারা প্রভাবিত প্রকৃতির সঙ্গী বলে মনে করে।

তাৎপর্য

এখানে *অবুধঃ* শব্দটি তাৎপর্যপূর্ণ। অজ্ঞানতাবশতই কেবল মূর্খ জড়বাদী তার্কিকেরা পরমেশ্বর ভগবানকে বুঝতে না পেরে তাদের প্রচার কার্যের দ্বারা নির্বোধ মানুষদের মধ্যে তাদের মূর্খতাপূর্ণ বিচারের প্রসার করে থাকে। পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন আদি পরম পুরুষ ভগবান, এবং তিনি যখন স্বয়ং সকলের সমক্ষে বিদ্যমান ছিলেন, তখন তিনি জীবনের প্রত্যেক ক্ষেত্রে তাঁর পূর্ণ দিব্য শক্তি প্রদর্শন করেছিলেন। *শ্রীমদ্ভাগবতের* প্রথম শ্লোকে আমরা বিশ্লেষণ করেছি যে তিনি হচ্ছেন সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র, এবং তাঁর ইচ্ছা অনুসারে তিনি যা খুশি তাই করতে পারেন, কিন্তু

তাঁর সমস্ত কার্যকলাপই সচ্চিদানন্দময়। মূর্খ জড়বাদীরাই কেবল *শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা* এবং উপনিষদে প্রতিপাদিত তাঁর সৎ, চিৎ, আনন্দময় স্বরূপ সম্বন্ধে অবগত না হওয়ার ফলে তাঁকে ভুল বোঝে। তাঁর বিভিন্ন শক্তি প্রাকৃতিক ক্রম অনুসারে এক পূর্ণ পরিকল্পনায় কার্য করে, এবং তাঁর বিভিন্ন শক্তির দ্বারা সমস্ত কার্য সম্পাদন করে তিনি নিত্য পরম স্বতন্ত্ররূপে বিরাজ করেন। তিনি যখন জীবের প্রতি তাঁর অহৈতুকী কৃপার প্রভাবে এই জড় জগতে অবতরণ করেন, তখন তিনি নিজের শক্তির দ্বারাই তা করে থাকেন। তিনি কখনই জড়া প্রকৃতির গুণের অধীন নন, এবং তিনি তাঁর স্বরূপেই অবতরণ করেন। তাঁকে পরম পুরুষরূপে চিনতে না পেরে মনোধর্মী জ্ঞানীরা তাঁর নির্বিশেষ ব্রহ্মজ্যোতিকেই সব কিছু বলে মনে করে। এই প্রকার ধারণা বদ্ধ জীবনেরই পরিণাম, কেননা তারা তাদের ব্যক্তিগত ক্ষমতার ঊর্ধ্বে যেতে পারে না। তাই যারা ভগবানকে তাদেরই মতো একজন সীমিত শক্তিসম্পন্ন জীব বলে মনে করে, তারা হচ্ছে কেবল সাধারণ মানুষ। এই প্রকার মানুষদের কখনই বোঝানো যাবে না যে, পরমেশ্বর ভগবান জড়া প্রকৃতির গুণের প্রভাব থেকে সর্বদাই মুক্ত। সেই সমস্ত মানুষেরা বুঝতে পারে না যে, সূর্য দূষিত পদার্থের দ্বারা কখনো প্রভাবিত হয় না। মনোধর্মী জ্ঞানীরা সর্বদা তাদের অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞানের ভিত্তিতে সব কিছুর তুলনা করে। তাই যখন তারা দেখে যে ভগবান বৈবাহিক বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে একজন সাধারণ মানুষের মতো আচরণ করছেন, তখন তারা মনে করে যে তিনিও তাদেরই মতো একজন। তারা বিবেচনা করে দেখে না যে ভগবান একসঙ্গে ষোল হাজারেরও অধিক পত্নীকে বিবাহ করতে পারেন। অজ্ঞানতাবশত তারা তাঁর লীলার একটি অংশ স্বীকার করে, কিন্তু অন্য অংশটিকে করে না। অর্থাৎ অজ্ঞানতার ফলেই তারা সর্বদা শ্রীকৃষ্ণকে তাদেরই মতো বলে মনে করে তাদের মনগড়া সিদ্ধান্ত তৈরি করে, যা *শ্রীমদ্ভাগবতের* বর্ণনা অনুসারে সম্পূর্ণ অসম্ভব এবং অপ্রামাণিক।

শ্লোক ৩৮

এতদীশনমীশস্য প্রকৃতিস্থোঽপি তদ্গুণৈঃ ।
ন যুজ্যতে সদাত্মস্থৈর্যথা বুদ্ধিস্তদাশ্রয়া ॥ ৩৮ ॥

এতৎ—এই; **ঈশনম্**—ঐশী; **ঈশস্য**—পরমেশ্বর ভগবানের; **প্রকৃতি-স্থঃ**—জড়া প্রকৃতির সংস্পর্শে থেকে; **অপি**—সত্ত্বেও; **তৎ-গুণৈঃ**—প্রকৃতির গুণের দ্বারা; **ন**—

না; যুজ্যতে—প্রভাবিত হয়; সদা আত্ম-স্থৈঃ—যারা নিত্য চিন্ময় স্তরে অধিষ্ঠিত; যথা—যেমন; বুদ্ধিঃ—বুদ্ধি; তৎ—ভগবান; আশ্রয়া—আশ্রিত।

অনুবাদ

পরমেশ্বর ভগবানের এমনই ঐশী প্রভাব—প্রকৃতির অন্তর্ভুক্ত মায়া-প্রপঞ্চে অবস্থিত হয়েও তিনি প্রকৃতির গুণের দ্বারা প্রভাবিত হন না। তেমনই তাঁর চরণাশ্রয় গ্রহণ করেছেন যে সকল ভক্ত, তাঁরাও জড়া প্রকৃতির গুণের দ্বারা প্রভাবিত হন না।

তাৎপর্য

বেদ এবং বৈদিক শাস্ত্রে (শ্রুতি এবং স্মৃতি) প্রতিপন্ন হয়েছে যে ভগবানের দিব্য প্রকৃতিতে জড়ের লেশমাত্র নেই। তিনি পূর্ণ চিন্ময়, (নির্গুণ), পরম অভিজ্ঞ। পরমেশ্বর ভগবান শ্রীহরি, জড় প্রভাবের সীমার অতীত পরম দিব্য পুরুষ। শাস্ত্রের এই উক্তি আচার্য শংকরও স্বীকার করেছেন। কেউ তর্ক করে বলতে পারে যে, লক্ষ্মীদেবীর সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক দিব্য হতে পারে, কিন্তু যদু বংশে জন্মগ্রহণ করার ফলে সেই বংশের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক, অথবা তাঁর দ্বারা জরাসন্ধ আদি নাস্তিক অসুরদের হত্যা, যা সরাসরিভাবে জড়া প্রকৃতির গুণের সঙ্গে যুক্ত, সে বিষয়ে কি বলা যাবে! তার উত্তরে বলা হয়েছে যে পরমেশ্বর ভগবানের চিন্ময়ত্ব কখনোই জড়া প্রকৃতির গুণের সংস্পর্শে আসে না। প্রকৃতপক্ষে তিনি এই সমস্ত গুণের সঙ্গে যুক্ত, কারণ তিনি হচ্ছেন সব কিছুর পরম উৎস; তথাপি তিনি এই সমস্ত গুণের কার্যকলাপের অতীত। তাই তাঁকে বলা হয় যোগেশ্বর, অথবা সর্বশক্তিমান। তাঁর জ্ঞানবান ভক্তরা পর্যন্ত জড়া প্রকৃতির গুণের দ্বারা প্রভাবিত হন না। বৃন্দাবনের মহান ষড় গোস্বামীগণ সকলেই ছিলেন অত্যন্ত ধনী এবং সম্ভ্রান্ত বংশোদ্ভূত, কিন্তু তাঁরা যখন বৃন্দাবনে ভিক্ষু জীবন অবলম্বন করেছিলেন, তখন আপাতদৃষ্টিতে তাঁদের অত্যন্ত দারিদ্র্যগ্রস্ত বলে মনে হলেও প্রকৃতপক্ষে তাঁরা ছিলেন পারমার্থিক সম্পদে সব চাইতে ধনী। এই প্রকার মহাভাগবত বা সর্বশ্রেষ্ঠ স্তরের ভক্তরা সাধারণ মানুষের মধ্যে বিচরণ করলেও কখনও মান অথবা অপমান, ক্ষুধা অথবা তৃপ্তি, নিদ্রা অথবা জাগরণের দ্বারা কলুষিত হন না, যা হচ্ছে জড়া প্রকৃতির তিনটি গুণের ক্রিয়া। তেমনই, তাঁদের কেউ কেউ জড় জাগতিক কার্যকলাপে লিপ্ত রয়েছে বলে মনে হলেও তাঁরা কখনও তার দ্বারা প্রভাবিত হন না। জীবনের এই শান্তভাব প্রাপ্ত না হওয়া পর্যন্ত চিন্ময় স্তরে প্রতিষ্ঠিত হওয়া যায় না। ভগবান এবং তাঁর পার্ষদেরা একই চিন্ময় স্তরে অধিষ্ঠিত, এবং তাঁদের মহিমা সর্বদা যোগমায়া বা

ভগবানের অন্তরঙ্গা শক্তির দ্বারা পবিত্রতা লাভ করে। এমন কি ভগবানের ভক্তরা যদি কখনো অধঃপতিতের মতোও আচরণ করেন, তথাপি তাঁরা সর্বদাই চিন্ময় স্তরে অধিষ্ঠিত। ভগবান *শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায়* (৯/৩০) দীপ্ত কণ্ঠে ঘোষণা করেছেন যে, তাঁর অনন্য ভক্ত যদি তাঁর পূর্বকৃত জড় কলুষের প্রভাবে অধঃপতিতও হয়, তথাপি তাঁকে মহাত্মা বলেই মনে করতে হবে, কেননা তিনি সর্বতোভাবে তাঁর সেবায় যুক্ত হয়েছেন। যেহেতু তিনি ভগবানের সেবা করছেন, তাই ভগবান সর্বদা তাঁকে রক্ষা করেন। এই প্রকার ভক্তদের অধঃপতন আকস্মিক এবং সাময়িক বলে মনে করতে হবে। তাঁদের সেই অবস্থা অচিরেই দূর হয়ে যাবে।

শ্লোক ৩৯

তং মেনিরেঽবলা মূঢ়াঃ স্ত্রৈণং চানুব্রতং রহঃ ।
অপ্রমাণবিদো ভর্তুরীশ্বরং মতয়ো যথা ॥ ৩৯ ॥

তম্—শ্রীকৃষ্ণকে; **মেনিরে**—মনে করেছিল; **অবলাঃ**—অবলা; **মূঢ়াঃ**—মোহবশত; **স্ত্রৈণম্**—স্ত্রৈণ; **চ**—ও; **অনুব্রতম্**—অনুগামী; **রহঃ**—নির্জন স্থানে; **অপ্রমাণ-বিদঃ**—মহিমার অবধি সম্বন্ধে অজ্ঞ; **ভর্তুঃ**—পতির; **ঈশ্বরম্**—পরমেশ্বর, পরম নিয়ন্তা; **মতয়ঃ**—অভিমত; **যথা**—যেমন।

অনুবাদ

সেই সরলা ও অবলা স্ত্রীগণ তাঁদের প্রিয়তম পতি শ্রীকৃষ্ণের মহিমা না জেনে মোহবশত তাঁকে তাঁদের বশীভূত ও একান্ত অনুগত বলে মনে করতেন। নাস্তিকেরা যেমন ভগবানের পরমেশ্বরত্ব উপলব্ধি করতে পারে না, তেমনই তাঁরা তাঁদের পতির মহিমারাজির পরিসীমা সম্বন্ধে অবগত ছিলেন না।

তাৎপর্য

ভগবান শ্রীকৃষ্ণের দিব্য পত্নীরাও তাঁর অন্তহীন মহিমা সম্বন্ধে পূর্ণরূপে অবগত ছিলেন না। তাঁদের এই অজ্ঞতা জড়জাগতিক ছিল না, কেননা ভগবান এবং তাঁর নিত্য পার্ষদদের মধ্যে ভাবের আদান-প্রদানের জন্য ভগবানের অন্তরঙ্গা শক্তি বা যোগমায়ার কিছু কারসাজি থাকে। ভগবান পাঁচটি দিব্য ভাবে তাঁর ভক্তদের সঙ্গে আদান-প্রদান করেন—ঈশ্বর রূপে, প্রভু রূপে, সখা রূপে, পুত্র রূপে এবং প্রেমিক রূপে, এবং এই সমস্ত লীলা-বিলাসের প্রত্যেকটিই তিনি সাধন করেন তাঁর

অন্তরঙ্গা শক্তি যোগমায়ার প্রভাবে। তিনি গোপবালকদের সঙ্গে অথবা তাঁর সখা অর্জুনের সঙ্গে ঠিক একজন সমকক্ষ বন্ধুর মতো আচরণ করেন। মা যশোদার সমক্ষে তিনি একটি পুত্রের মতো আচরণ করেন, গোপবালিকাদের সঙ্গে তিনি ঠিক একজন প্রেমিকের মতো আচরণ করেন, এবং দ্বারকার মহিষীদের সমক্ষে তিনি ঠিক একজন পতির মতো আচরণ করেন। ভগবানের এই সমস্ত ভক্তরা কখনও তাঁকে পরমেশ্বর ভগবান বলে মনে করেন না, পক্ষান্তরে তাঁরা তাঁকে প্রাণের প্রিয় একজন বন্ধু, পুত্র, প্রেমিক অথবা পতি বলে মনে করেন। চিদাকাশে, যেখানে অসংখ্য বৈকুণ্ঠলোক রয়েছে, সেখানে চিন্ময় ভক্তদের সঙ্গে ভগবানের এমনই সম্পর্ক। ভগবান যখন অবতরণ করেন, তখন চিন্ময় জগতের পূর্ণ রূপ প্রকাশ করার জন্য তিনি তাঁর পার্ষদগণসহ অবতরণ করেন, যেখানে ভগবানের সৃষ্টির উপর প্রভুত্ব করার কোন রকম জড় বাসনার লেশমাত্র নেই, রয়েছে কেবল ভগবানের প্রতি শুদ্ধ প্রেম এবং ভক্তি। ভগবানের এই সমস্ত ভক্তেরা সকলেই নিত্যমুক্ত আত্মা, যাঁরা হচ্ছেন বহিরঙ্গা শক্তির প্রভাব থেকে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত ভগবানের তটস্থা শক্তি অথবা অন্তরঙ্গা শক্তির পূর্ণ প্রকাশ। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের মহিষীরা যোগমায়ার প্রভাবে ভগবানের অন্তহীন মহিমা বিস্মৃত হয়েছিলেন, যাতে ভগবানের সঙ্গে তাঁদের ভাবের আদান-প্রদানে কোন প্রকার ত্রুটি না থাকে, এবং তাঁরা যাতে মনে করতে পারেন যে ভগবান নির্জনে তাঁদের সঙ্গ লাভের অভিলাষী তাঁদের বশীভূত পতি। পক্ষান্তরে বলা যায় যে, ভগবানের পার্ষদেরাও পর্যন্ত পূর্ণরূপে ভগবানকে জানতে পারেন না, তা হলে গবেষণামূলক প্রবন্ধ রচনাকারী অথবা মনোধর্মী জ্ঞানীরা তাঁর অপ্রাকৃত মহিমা জানবে কি করে? মনোধর্মী জ্ঞানীরা তাঁকে সৃষ্টির কারণরূপে, সৃষ্টির উপাদানরূপে, অথবা সৃষ্টির কার্য-কারণ ইত্যাদি রূপে নানা প্রকার মতবাদ সৃষ্টি করে, কিন্তু সেগুলি ভগবান সম্বন্ধীয় আংশিক জ্ঞান মাত্র। প্রকৃতপক্ষে তারা সাধারণ মানুষের মতোই অজ্ঞ। ভগবানের কৃপার প্রভাবেই কেবল ভগবানকে জানা যায়, অন্য কোন উপায়ে নয়। কিন্তু যেহেতু তাঁর পত্নীদের সঙ্গে ভগবানের সমস্ত আচরণ বিশুদ্ধ চিন্ময় প্রেম এবং ভক্তির ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত, তাই তাঁর সমস্ত পত্নীরা জড় কলুষ থেকে মুক্ত চিন্ময় স্তরে অধিষ্ঠিত।

ইতি "ভগবান শ্রীকৃষ্ণের দ্বারকায় প্রবেশ" নামক শ্রীমদ্ভাগবতের প্রথম স্কন্ধের একাদশ অধ্যায়ের ভক্তিবেদান্ত তাৎপর্য।

দ্বাদশ অধ্যায়

মহারাজ পরীক্ষিতের জন্ম

শ্লোক ১

শ্রীশৌনক উবাচ

অশ্বত্থাম্নোপসৃষ্টেন ব্রহ্মশীর্ষ্ণোরুতেজসা ।
উত্তরায়া হতো গর্ভ ঈশেনাজীবিতঃ পুনঃ ॥ ১ ॥

শৌনকঃ উবাচ—শৌনকমুনি বললেন; **অশ্বত্থাম্ন**—দ্রোণপুত্র অশ্বত্থামার; **উপসৃষ্টেন**—উপসৃষ্টির দ্বারা; **ব্রহ্ম-শীর্ষ্ণা**—অপরাজেয় ব্রহ্মাস্ত্র; **উরু-তেজসা**—প্রচণ্ড তেজসম্পন্ন; **উত্তরায়াঃ**—পরীক্ষিতের জননী উত্তরাদেবীর; **হতঃ**—বিনষ্ট; **গর্ভঃ**—গর্ভ; **ঈশেন**—পরমেশ্বর ভগবানের দ্বারা; **আজীবিতঃ**—উজ্জীবিত হন; **পুনঃ**—পুনরায়।

অনুবাদ

শৌনকমুনি বললেন, অশ্বত্থামার দ্বারা উপসৃষ্ট ভয়ঙ্কর এবং অপরাজেয় ব্রহ্মাস্ত্রের দ্বারা মহারাজ পরীক্ষিতের জননী উত্তরাদেবীর গর্ভ বিনষ্ট হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু পরমেশ্বর ভগবানের দ্বারা মহারাজ পরীক্ষিৎ রক্ষা পান।

তাৎপর্য

নৈমিষারণ্যে সমবেত ঋষিরা সূত গোস্বামীর কাছে মহারাজ পরীক্ষিতের জন্ম সম্বন্ধে প্রশ্ন করেছিলেন, কিন্তু তা বর্ণনা করার সময় দ্রোণপুত্র দ্বারা ব্রহ্মাস্ত্র নিক্ষেপ, অর্জুনের দ্বারা তাঁর দণ্ড, মহারাণী কুন্তীদেবীর প্রার্থনা, ভীষ্মদেবের শরশয্যাপার্শ্বে পাণ্ডবদের গমন, তাঁর প্রার্থনা এবং তারপর দ্বারকার উদ্দেশ্যে ভগবানের প্রস্থান ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে। ভগবানের দ্বারকায় আগমন এবং ষোল সহস্র মহিষীর সঙ্গে বসবাস ইত্যাদি বিষয়েরও বর্ণনা করা হয়েছে। ঋষিরা সেই বর্ণনা শ্রবণে মগ্ন ছিলেন, কিন্তু এখন তাঁরা মূল বিষয়ে ফিরে আসতে চেয়েছিলেন। তাই শৌনক

ঋষি এইরকম প্রশ্ন করেছিলেন। এইভাবে অশ্বত্থামার দ্বারা ব্রহ্মাস্ত্র নিক্ষেপের বিষয়টির পুনরুত্থাপন করা হয়েছে।

শ্লোক ২

তস্য জন্ম মহাবুদ্ধেঃ কর্মাণি চ মহাত্মনঃ ।
নিধনং চ যথৈবাসীৎস প্রেত্য গতবান্ যথা ॥ ২ ॥

তস্য—তাঁর (মহারাজ পরীক্ষিতের); **জন্ম**—জন্ম; **মহা-বুদ্ধেঃ**—মহাবুদ্ধিসম্পন্ন; **কর্মাণি**—কার্যকলাপ; **চ**—ও; **মহা-আত্মনঃ**—মহাত্মা ভক্তের; **নিধনম্**—মৃত্যু; **চ**—ও; **যথা**—যেমন; **এব**—অবশ্য; **আসীৎ**—ঘটেছিল; **সঃ**—তিনি; **প্রেত্য**—মৃত্যুর পরে গতি; **গতবান্**—লাভ করেছিলেন; **যথা**—যেমন।

অনুবাদ

অতীব বুদ্ধিসম্পন্ন এবং পরম ভক্ত, মহান সম্রাট পরীক্ষিৎ কেমন করে সেই গর্ভে জন্ম নিয়েছিলেন? কেমন করেই বা তাঁর মৃত্যু হল, এবং তাঁর মৃত্যুর পরে তিনি কোন্ গতি লাভ করলেন?

তাৎপর্য

অন্ততপক্ষে পরীক্ষিৎ মহারাজের পুত্রের সময় পর্যন্ত হস্তিনাপুরের (আধুনিক দিল্লী) রাজা সারা পৃথিবী শাসন করতেন। মহারাজ পরীক্ষিৎ যখন তাঁর মাতৃগর্ভে ছিলেন, তখন ভগবান তাঁকে রক্ষা করেছিলেন; তাই একজন ব্রাহ্মণ বালকের শাপের ফলে অকাল মৃত্যু থেকে তিনি অবশ্যই রক্ষা পেতে পারতেন। কিন্তু যেহেতু মহারাজ পরীক্ষিতের রাজ্যভার গ্রহণ করার সময় থেকে কলিযুগের শুরু হয়, তাই তার প্রথম কুলক্ষণ প্রকট হয় পরীক্ষিৎ মহারাজের মতো একজন মহামতি এবং মহাভাগবত রাজাকে অভিশাপ দেওয়ার মাধ্যমে। রাজা হচ্ছেন অসহায় প্রজাদের রক্ষক তাদের কল্যাণ এবং শান্তি ও সমৃদ্ধি তাঁরই উপর নির্ভর করে। দুর্ভাগ্যবশত, অধঃপতিত কলিযুগের প্ররোচনায়, এক দুর্ভাগা ব্রাহ্মণপুত্র নির্দোষ পরীক্ষিৎ মহারাজকে অভিশাপ দিয়েছিল, এবং তার ফলে রাজাকে সাতদিনের মধ্যে মৃত্যুবরণ করার জন্য প্রস্তুত হতে হয়। শ্রীবিষ্ণু তাঁকে রক্ষা করেছিলেন বলে মহারাজ পরীক্ষিৎ *বিষ্ণুরাত* নামে বিখ্যাত। তাই একজন ব্রাহ্মণের পুত্র যখন তাঁকে অন্যায়ভাবে অভিশাপ দেয়, তখন তিনি ইচ্ছা করলে রক্ষা পাবার জন্য ভগবানের

কৃপা ভিক্ষা করতে পারতেন। কিন্তু তিনি তা করেননি, কেননা তিনি ছিলেন ভগবানের একজন শুদ্ধ ভক্ত। ভগবানের শুদ্ধ ভক্ত কখনোই ভগবানের কাছে অনুগ্রহ লাভ করার জন্য অনাবশ্যক প্রার্থনা করেন না। অন্য সকলের মতো মহারাজ পরীক্ষিতও জানতেন যে তাঁর প্রতি ব্রাহ্মণপুত্রের অভিশাপ ছিল সম্পূর্ণরূপে অসঙ্গত, কিন্তু তিনি তাঁর প্রতিকার করতে চাননি। কেননা তিনি জানতেন যে কলিযুগের আবির্ভাব হয়েছে এবং সেই সঙ্গে সেই যুগের লক্ষণ, অত্যন্ত প্রতিভা-সম্পন্ন ব্রাহ্মণ সমাজের অধঃপতনও শুরু হয়ে গেছে। তিনি কালের প্রবাহে হস্তক্ষেপ করতে চাননি, পক্ষান্তরে তিনি হরষিত অন্তরে এবং যথাযথভাবে মৃত্যুকে বরণ করার জন্য প্রস্তুত হয়েছিলেন। তিনি ছিলেন ভাগ্যবান, তাই মৃত্যুকে বরণ করতে প্রস্তুত হওয়ার জন্য তিনি অন্তত সাতদিন সময় পেয়েছিলেন, এবং ভগবানের মহান ভক্ত মহাত্মা শুকদেব গোস্বামীর সান্নিধ্যে তিনি সেই সময়ের যথাযথ সদ্ব্যবহার করেছিলেন।

শ্লোক ৩

তদিদং শ্রোতুমিচ্ছামো গদিতুং যদি মন্যসে ।
ব্রূহি নঃ শ্রদ্দধানানাং যস্য জ্ঞানমদাচ্ছুকঃ ॥ ৩ ॥

তৎ—সকলে; **ইদম্**—এই; **শ্রোতুম্**—শুনে; **ইচ্ছামঃ**—সকলের ইচ্ছায়; **গদিতুম্**—বর্ণনা করা; **যদি**—যদি; **মন্যসে**—আপনি মনে করেন; **ব্রূহি**—অনুগ্রহ করে বলুন; **নঃ**—আমরা; **শ্রদ্দধানানাম্**—যাঁরা অতীব শ্রদ্ধাভাজন; **যস্য**—যাঁর; **জ্ঞানম্**—অপ্রাকৃত তত্ত্ব; **অদাৎ**—উপস্থাপন; **শুকঃ**—শ্রীশুকদেব গোস্বামী।

অনুবাদ

যে মহারাজ পরীক্ষিতের কাছে শ্রীশুকদেব গোস্বামী অপ্রাকৃত তত্ত্বজ্ঞান প্রদান করেন, আমরা সকলে শ্রদ্ধা সহকারে তাঁর কথা শুনতে চাই। দয়া করে এই বিষয়ে কিছু বলুন।

তাৎপর্য

শুকদেব গোস্বামী মহারাজ পরীক্ষিতকে তাঁর জীবনের শেষ সাত দিনে দিব্য জ্ঞান প্রদান করেছিলেন, এবং মহারাজ পরীক্ষিৎ একজন শ্রদ্ধাবান শিষ্যের মতো যথাযথভাবে তা শ্রবণ করেছিলেন। শ্রীমদ্ভাগবতের এই প্রকার আদর্শ শ্রবণ এবং

কীর্তন শ্রোতা এবং বক্তা উভয়েই সমানভাবে আস্বাদন করেছিলেন। তাঁরা উভয়েই লাভবান হয়েছিলেন। *শ্রীমদ্ভাগবতে* ভক্তির যে ন'টি চিন্ময় পন্থা বর্ণনা করা হয়েছে, তার মধ্যে সব কটি অথবা কয়েকটি, এমন কি একটিও যদি যথাযথভাবে সাধন করা হয়, তা হলে তার ফল সমানভাবে লাভপ্রদ হয়। মহারাজ পরীক্ষিৎ এবং শুকদেব গোস্বামী ছিলেন প্রথম দুটি সাধনের, অর্থাৎ শ্রবণ এবং কীর্তনের সাধক, তাই তাঁরা উভয়েই তাঁদের প্রশংসনীয় প্রচেষ্টায় সফল হয়েছিলেন। এই প্রকার ঐকান্তিক শ্রবণ এবং কীর্তনের ফলে দিব্য জ্ঞান লাভ হয়, এছাড়া অন্য কোন উপায়ে তা সম্ভব নয়। এই কলিযুগে গুরু এবং শিষ্য সম্বন্ধে এক বিশেষ বিজ্ঞাপন করা হচ্ছে। সেখানে বলা হয় যে গুরু বৈদ্যুতিক প্রবাহের মতো শিষ্যের মধ্যে চিন্ময় শক্তি সঞ্চার করে, এবং শিষ্য তার আঘাত অনুভব করে। তার ফলে শিষ্য অচেতন হয়ে যায়, এবং গুরু তার সঞ্চিত তথাকথিত পারমার্থিক সম্পদ হারিয়ে কাঁদতে থাকে। এই যুগে এই প্রকার কপটতার বহু প্রচার হচ্ছে এবং তার ফলে নিরীহ জনসাধারণ এই সমস্ত ভণ্ডামির শিকার হচ্ছে। কিন্তু শুকদেব গোস্বামী এবং তাঁর মহান শিষ্য পরীক্ষিৎ মহারাজের আচরণে আমরা এই ধরনের গল্পকথা দেখতে পাই না। মহর্ষি শুকদেব গোস্বামী ভক্তিপূর্বক *শ্রীমদ্ভাগবত* পাঠ করেছিলেন এবং মহারাজ পরীক্ষিৎ অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে তা শ্রবণ করেছিলেন। মহারাজ পরীক্ষিৎ তাঁর গুরুর কাছ থেকে কোন রকম বৈদ্যুতিক প্রবাহের বেগ বা আঘাত অনুভব করেননি, অথবা তাঁর গুরুদেবের কাছ থেকে জ্ঞান প্রাপ্ত হওয়ার সময় অচেতনও হয়ে যাননি। বৈদিক জ্ঞানের নামে যারা ভণ্ডামি করে, তাদের অপ্রামাণিক বিজ্ঞাপনের শিকার হওয়া কখনোই উচিত নয়। নৈমিষারণ্যের ঋষিরা মহারাজ পরীক্ষিতের বিষয়ে অত্যন্ত শ্রদ্ধা সহকারে শ্রবণ করেছিলেন, কেননা তিনি ঐকান্তিক শ্রবণের দ্বারা শুকদেব গোস্বামীর কাছে জ্ঞান প্রাপ্ত হয়েছিলেন। দিব্য জ্ঞান লাভ করার একমাত্র উপায় হচ্ছে সদ্‌গুরুর কাছে নিষ্ঠাপূর্বক শ্রবণ করা। সেজন্য কোনরকম অলৌকিক ফল লাভ করার জন্য কোন চিকিৎসা সংক্রান্ত অথবা গুহ্য কার্যকলাপের প্রয়োজন নেই। সেই পন্থাটি সরল, তবে একনিষ্ঠ ব্যক্তিরাই কেবল তার ঈপ্সিত ফল লাভ করতে পারে।

শ্লোক ৪

সূত উবাচ

অপীপলদ্ধর্মরাজঃ পিতৃবদ্ রঞ্জয়ন্ প্রজাঃ ।
নিঃস্পৃহঃ সর্বকামেভ্যঃ কৃষ্ণপাদানুসেবয়া ॥ ৪ ॥

সূতঃ উবাচ—শ্রীসূত গোস্বামী বললেন; **অপীপলৎ**—সুখ-সমৃদ্ধি প্রদান করেছিলেন; **ধর্মরাজঃ**—মহারাজ যুধিষ্ঠির; **পিতৃবৎ**—তাঁর পিতার মতো; **রঞ্জয়ন্**—সুখদায়ী; **প্রজাঃ**—যারা জন্মগ্রহণ করেছিল তাদের সকলের; **নিঃস্পৃহঃ**—ব্যক্তিগত উচ্চাকাঙ্ক্ষা বর্জিত; **সর্ব**—সকল; **কামেভ্যঃ**—ইন্দ্রিয় পরিতৃপ্তি থেকে; **কৃষ্ণপাদ**—ভগবান শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্ম; **অনুসেবয়া**—নিরন্তরভাবে সেবা সম্পাদনের ফলে।

অনুবাদ

শ্রীসূত গোস্বামী বললেন, মহারাজ যুধিষ্ঠির তাঁর রাজত্বকালে সকলকে সুখ-সমৃদ্ধি প্রদান করেছিলেন। তিনি ছিলেন ঠিক তাঁর পিতার মতো। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্মে নিরন্তরভাবে সেবা সম্পাদনের ফলে তিনি ব্যক্তিগত উচ্চাকাঙ্ক্ষা এবং সকল প্রকার ইন্দ্রিয় পরিতৃপ্তির বিষয় থেকে মুক্ত ছিলেন।

তাৎপর্য

এই গ্রন্থের ভূমিকায় উল্লেখ করা হয়েছে, "বিশ্বের দুর্দশাক্লিষ্ট সমস্ত মানুষদের জন্য মানব সমাজে কৃষ্ণতত্ত্ব-বিজ্ঞানের আবশ্যকতা রয়েছে, এবং আমরা সমস্ত রাষ্ট্রের নেতাদের কাছে অনুরোধ করছি তাঁরা যেন নিজেদের মঙ্গলের জন্য, সমাজের মঙ্গলের জন্য এবং বিশ্বের সমস্ত মানুষদের মঙ্গলের জন্য এই কৃষ্ণতত্ত্ব-বিজ্ঞান গ্রহণ করেন।" এখানে সততার প্রতিমূর্তি মহারাজ যুধিষ্ঠিরের দৃষ্টান্তের মাধ্যমে সে কথা প্রতিপন্ন হয়েছে। ভারতবর্ষের মানুষ রামরাজ্যের আকাঙ্ক্ষা করে, কেননা পরমেশ্বর ভগবান স্বয়ং ছিলেন আদর্শ রাজা, এবং ভারতবর্ষের অন্য সমস্ত রাজা অথবা সম্রাটেরা পৃথিবীতে জাত সমস্ত প্রাণীদের সমৃদ্ধির জন্য পৃথিবী পরিচালনা করতেন। এখানে *প্রজাঃ* শব্দটি তাৎপর্যপূর্ণ। এই শব্দটির ভাষাগত অর্থ হচ্ছে, "প্রকৃষ্টরূপে যার জন্ম হয়েছে।" পৃথিবীতে জলচর থেকে শুরু করে পূর্ণতাপ্রাপ্ত মানুষ পর্যন্ত বহু প্রকার প্রাণী রয়েছে, এবং তাঁরা সকলেই হচ্ছে *প্রজা*। এই ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মাকে বলা হয় *প্রজাপতি*, কেননা তিনি হচ্ছেন জন্মগ্রহণকারী সমস্ত জীবের পিতামহ। এইভাবে *প্রজা* শব্দটি আজকাল যে অর্থে ব্যবহৃত হয়, তা থেকে অনেক ব্যাপক অর্থে প্রযুক্ত হয়েছে। রাজা জলচর, উদ্ভিদ, সরীসৃপ, পক্ষী, পশু এবং মানুষ আদি সমস্ত জীবেরই প্রতিনিধি। তারা সকলেই হচ্ছে পরমেশ্বর ভগবানের বিভিন্ন অংশ *(ভঃ গীঃ ১৪/৪)*, এবং ভগবানের প্রতিনিধিরূপে রাজার কর্তব্য হচ্ছে তাদের সকলকে যথাযথভাবে রক্ষা করা। কিন্তু আজকের নৈতিক আদর্শবিহীন প্রশাসন-ব্যবস্থায় রাষ্ট্রপতি এবং সার্বভৌম ক্ষমতাপ্রাপ্ত একনায়কদের

বেলায় তা হচ্ছে না। সেখানে নিম্নতর পশুদের সুরক্ষা প্রদান করা হচ্ছে না, আর উচ্চতর পশুদের তথাকথিত সুরক্ষা প্রদান করা হচ্ছে। কিন্তু এটি একটি মহান বিজ্ঞান, যা কৃষ্ণতত্ত্ববেত্তা ব্যক্তিই কেবল শিখতে পারেন। কৃষ্ণতত্ত্ব-বিজ্ঞান জানার ফলে মানুষ এই পৃথিবীর সবচাইতে সার্থক ব্যক্তি হতে পারে, এবং এই জ্ঞান না থাকলে শিক্ষার দ্বারা অর্জিত যোগ্যতা এবং ডক্টরেট আদি সমস্ত উপাধিগুলি সম্পূর্ণরূপে অর্থহীন হয়ে যায়। মহারাজ যুধিষ্ঠির কৃষ্ণতত্ত্ব-বিজ্ঞান খুব ভালভাবে জানতেন। এখানে উল্লেখ করা হয়েছে যে সেই বিজ্ঞানের নিরন্তর অনুশীলনের ফলে, অথবা নিরন্তর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের প্রতি প্রেমময়ী সেবা সম্পাদন করার ফলে তিনি রাজ্যশাসন করার যোগ্যতা অর্জন করেছিলেন। কখনও কখনও পিতাকে পুত্রের প্রতি আপাতদৃষ্টিতে নির্দয় হতে দেখা যায়, কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে তিনি পিতার যোগ্যতা হারিয়ে ফেলেছেন। পিতা সর্ব অবস্থাতেই পিতা, কেননা তিনি তাঁর অন্তরে সর্বদা তাঁর পুত্রের শুভ কামনা করেন। পিতা চান যে তাঁর প্রতিটি পুত্র যেন তাঁর থেকেও শ্রেষ্ঠ হতে পারে। তাই সততার প্রতিমূর্তি মহারাজ যুধিষ্ঠিরের মতো রাজা চেয়েছিলেন যে তাঁর শাসন-ব্যবস্থায় সকলে, বিশেষ করে উন্নত চেতনাসম্পন্ন মানুষেরা যেন ভগবান শ্রীকৃষ্ণের ভক্ত হয়, যাতে সকলেই জড় জগতের তুচ্ছ আকর্ষণ থেকে মুক্ত হতে পারে। তাঁর শাসনের মূল উদ্দেশ্য ছিল সমস্ত নাগরিকদের মঙ্গল সাধন করা, কেননা সততার প্রতিমূর্তিরূপে তিনি তাদের প্রকৃত মঙ্গল সাধনের উপায় সম্বন্ধে পূর্ণরূপে অবগত ছিলেন। সেই আদর্শের ভিত্তিতেই তিনি রাজ্যশাসন করতেন, ইন্দ্রিয় তৃপ্তির রাক্ষসী বা আসুরিক নীতির ভিত্তিতে নয়। একজন আদর্শ রাজারূপে তাঁর কোন ব্যক্তিগত আকাঙ্ক্ষা ছিল না এবং ইন্দ্রিয়-তৃপ্তির জন্য কোন স্থান ছিল না, কেননা তাঁর সমস্ত ইন্দ্রিয়গুলি সর্বদাই ভগবানের প্রেমময়ী সেবায় যুক্ত ছিল। ভগবান যেহেতু পরম পূর্ণ, তাই তাঁর সেবা করা হলে তাঁর বিভিন্ন অংশ জীবদেরও সেবা হয়ে যায়। যারা পূর্ণকে বাদ দিয়ে বিভিন্ন অংশের সেবায় ব্যস্ত, তারা কেবল তাদের সময় এবং শক্তিরই অপচয় করছে। তাদের সেই প্রচেষ্টাটি ঠিক গাছের গোড়ায় জল না দিয়ে পাতায় জল দেওয়ার মতো। যদি গাছের গোড়ায় জল দেওয়া হয়, তাহলে আপনা থেকেই পাতাগুলি প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে; কিন্তু জল যদি কেবল গাছের পাতাতে ঢালা হয়, তাহলে প্রচেষ্টাটি সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থ হয়। মহারাজ যুধিষ্ঠির তাই ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সেবায় নিরন্তর যুক্ত ছিলেন, এবং তার ফলে তাঁর সুদক্ষ পরিচালনায় ভগবানের বিভিন্ন অংশ জীবেরা সেই জীবনে সমস্ত সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য প্রাপ্ত হত এবং পরবর্তী জীবনে উন্নতি লাভ করত। রাজ্য পরিচালনার সেটিই হচ্ছে আদর্শ ব্যবস্থা।

শ্লোক ৫

সম্পদঃ ক্রতবো লোকা মহিষী ভ্রাতরো মহী ।
জম্বুদ্বীপাধিপত্যং চ যশশ্চ ত্রিদিবং গতম্ ॥ ৫ ॥

সম্পদঃ—ঐশ্বর্য; **ক্রতবঃ**—যজ্ঞ; **লোকাঃ**—ভবিষ্যৎ গন্তব্যস্থল; **মহিষী**—মহিষীগণ; **ভ্রাতরঃ**—ভ্রাতাগণ; **মহী**—পৃথিবী; **জম্বু-দ্বীপ**—আমাদের আবাসস্থল এই পৃথিবী; **অধিপত্যম্**—আধিপত্য; **চ**—ও; **যশঃ**—যশ; **চ**—এবং; **ত্রি-দিবম্**—স্বর্গলোক; **গতম্**—বিস্তৃত।

অনুবাদ

যুধিষ্ঠির মহারাজের পার্থিব ঐশ্বর্যের কথা, অর্থাৎ যে সমস্ত যজ্ঞ অনুষ্ঠানের দ্বারা তিনি উচ্চতর গন্তব্যস্থল প্রাপ্ত হয়েছিলেন তার কথা, তাঁর মহিষীদের কথা, তাঁর পরাক্রমশালী ভ্রাতাদের কথা, তাঁর বিস্তৃত রাজ্যের কথা, এই পৃথিবীর উপর তাঁর আধিপত্যের কথা এবং তাঁর যশ ইত্যাদির কথা স্বর্গলোকে পর্যন্ত পৌঁছে গিয়েছিল।

তাৎপর্য

কেবল ধনী এবং মহান ব্যক্তির নাম ও যশ সারা পৃথিবী জুড়ে ঘোষিত হয়। আর মহারাজ যুধিষ্ঠিরের উত্তম শাসন-ব্যবস্থা, জাগতিক সম্পদ, মহীয়সী পত্নী দ্রৌপদী, ভীম ও অর্জুনের মতো ভাইদের পরাক্রম এবং সমগ্র পৃথিবী বা জম্বুদ্বীপ জুড়ে তাঁর সার্বভৌম ক্ষমতার জন্য তাঁর নাম এবং যশ স্বর্গলোকে পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়েছিল। জড় এবং চিৎ, উভয় আকাশেই বিভিন্ন লোক রয়েছে। এই জীবনের কর্ম অনুসারে মানুষ সেই সমস্ত লোকে যেতে পারে, যে কথা *শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় (৯/২৫)* বর্ণিত হয়েছে। সেখানে বলপূর্বক প্রবেশ করা যায় না। ক্ষুদ্র জড় বৈজ্ঞানিক এবং যন্ত্রবিদেরা যে যান আবিষ্কার করেছে, তার দ্বারা তারা অন্তরীক্ষে কয়েক হাজার মাইল ভ্রমণ করতে সক্ষম, কিন্তু তারা উপরোক্ত লোকে প্রবেশ করতে পারবে না। এইভাবে উচ্চতর লোকে যাওয়া যায় না। যজ্ঞ এবং সেবার দ্বারা এই সমস্ত আনন্দময় লোকে প্রবেশ করার যোগ্যতা অর্জন করতে হয়। যারা প্রতি পদক্ষেপে পাপ আচরণ করছে, তারা কেবল পশুজীবনে অধঃপতিত হয়ে অধিক থেকে অধিকতর দুঃখ ভোগ করারই প্রত্যাশা করতে পারে, এবং সে কথা *শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায়* (১৬/১৯) বর্ণিত হয়েছে। মহারাজ যুধিষ্ঠিরের উত্তম যজ্ঞ এবং গুণাবলী এতই মহান এবং যশপূর্ণ ছিল যে স্বর্গলোকের অধিবাসীরা পর্যন্ত তাঁকে তাঁদের একজন বলে স্বাগত জানাতে প্রস্তুত ছিলেন।

শ্লোক ৬

কিং তে কামাঃ সুরস্পার্হা মুকুন্দমনসো দ্বিজাঃ ।
অধিজহ্রুর্মুদং রাজ্ঞঃ ক্ষুধিতস্য যথেতরে ॥ ৬ ॥

কিম্—কি জন্য; **তে**—সেই সমস্ত; **কামাঃ**—ইন্দ্রিয় সুখভোগের বস্তুসমূহ; **সুর**—স্বর্গের দেবতাদের; **স্পার্হাঃ**—বাসনা; **মুকুন্দ-মনসঃ**—ভগবৎ-ভাবনাময় ভক্তের; **দ্বিজাঃ**—হে ব্রাহ্মণগণ; **অধিজহ্রুঃ**—সন্তুষ্টি বিধান করতে পারতেন; **মুদম্**—সুখভোগ; **রাজ্ঞঃ**—রাজার; **ক্ষুধিতস্য**—ক্ষুধিতের; **যথা**—যেমন; **ইতরে**—অন্য বস্তুতে।

অনুবাদ

হে ব্রাহ্মণগণ, মহারাজ যুধিষ্ঠিরের ঐশ্বর্য এমনই মনোমুগ্ধকর ছিল যে স্বর্গের অধিবাসীরাও তা লাভ করার বাসনা করতেন। কিন্তু যেহেতু তিনি ভগবানের সেবায় মগ্ন ছিলেন, তাই ভগবদ্-সেবা ভিন্ন অন্য কিছুই তাঁকে সন্তুষ্ট করতে পারত না।

তাৎপর্য

জগতে দুটি বস্তু রয়েছে যা জীবকে সন্তুষ্ট করতে পারে। কেউ যখন জড় বিষয়ে মগ্ন থাকে, তখন সে তার ইন্দ্রিয়-তৃপ্তির মাধ্যমে সন্তুষ্ট হয়; কিন্তু কেউ যখন জড় জগতের প্রভাব থেকে মুক্ত হয়, তখন সে প্রেমময়ী সেবা সম্পাদনের দ্বারা তৃপ্ত হয়। তার অর্থ হচ্ছে যে জীব তার স্বরূপে সেবক, সেব্য নয়। বহিরঙ্গা শক্তির প্রভাবে মোহাচ্ছন্ন হয়ে পড়ার ফলে জীব ভ্রান্তভাবে নিজেকে সেব্য বলে মনে করে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সে সেব্য নয়; সে কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ এবং মাৎসর্যের সেবক। দিব্য জ্ঞান লাভ করার ফলে কেউ যখন প্রকৃতিস্থ হয়, তখন সে বুঝতে পারে যে, সে জড় জগতের প্রভু নয়, সে কেবল তার ইন্দ্রিয়ের দাসত্ব করছে। তখন সে ভগবানের সেবা ভিক্ষা করে, এবং তার ফলে তথাকথিত জড় সুখের মোহে আচ্ছন্ন না হয়ে যথাযথভাবে সুখী হয়। মহারাজ যুধিষ্ঠির ছিলেন একজন মুক্ত পুরুষ, এবং তাই তাঁর বিশাল সাম্রাজ্য, উত্তম পত্নী, অনুগত ভ্রাতা, সুখী প্রজা এবং সমৃদ্ধিশালী জগতেও তিনি আনন্দ অনুভব করেননি। শুদ্ধ ভক্ত যদিও এগুলির আকাঙ্ক্ষা করেন না, তথাপি আপনা থেকেই তিনি এই সমস্ত আশীর্বাদ লাভ করেন। এখানে যে দৃষ্টান্ত দেওয়া হয়েছে তা অত্যন্ত উপযুক্ত। বলা হয়েছে যে, ক্ষুধার্ত ব্যক্তি কখনো আহার ব্যতীত অন্য কিছুর দ্বারা সন্তুষ্ট হতে পারে না।

সমগ্র জড় জগৎ ক্ষুধার্ত জীবে পূর্ণ। এই ক্ষুধা উত্তম আহার, বাসস্থান অথবা ইন্দ্রিয়-তৃপ্তির জন্য নয়; এই ক্ষুধা চিন্ময় পরিবেশের জন্য। অজ্ঞানতার বশেই মানুষ মনে করে যে যথেষ্ট আহার, বাসস্থান, প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা এবং ইন্দ্রিয়ের তৃপ্তি বিধানকারী বিষয়সমূহের অভাবের ফলেই পৃথিবী জুড়ে এই অসন্তোষ। তাকে বলা হয় মায়া। জীব যখন আত্মার সন্তুষ্টির অভাবে ক্ষুধার্ত, তখন তার সেই ক্ষুধাকে জড় ক্ষুধা বলে ভুল করা হচ্ছে। কিন্তু মূর্খ নেতারা দেখে না যে এমন কি জড়জাগতিক দৃষ্টিতে সম্পূর্ণরূপে তৃপ্ত মানুষও ক্ষুধার্ত। তা হলে তাদের সেই ক্ষুধা এবং দারিদ্র্য কি? প্রকৃতপক্ষে এই ক্ষুধা আধ্যাত্মিক ক্ষুধা, আধ্যাত্মিক আশ্রয়, আধ্যাত্মিক প্রতিরক্ষা এবং আধ্যাত্মিক ইন্দ্রিয়-তৃপ্তির জন্য। সেগুলি পরম আত্মা ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সান্নিধ্যের ফলে অনায়াসে লাভ করা যায়। আর তাই যিনি তা লাভ করেছেন, তিনি আর জড় জগতের তথাকথিত আহার, আশ্রয়, প্রতিরক্ষা এবং ইন্দ্রিয়-তৃপ্তির দ্বারা আকৃষ্ট হন না, যদিও স্বর্গলোকের অধিবাসীরা পর্যন্ত তা আস্বাদন করে থাকেন। তাই *শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায়* (৮/১৫) ভগবান বলেছেন যে ব্রহ্মাণ্ডের সর্বোচ্চ লোক ব্রহ্মলোকেও, যেখানে জীবের আয়ু পৃথিবীর গণনা অনুসারে লক্ষ লক্ষ গুণ অধিক, সেখানেও ক্ষুধার তৃপ্তি হয় না। অমৃতত্ব লাভের ফলেই এই ক্ষুধার তৃপ্তি সাধন হতে পারে, যা ব্রহ্মলোক থেকে বহু বহু দূরে বৈকুণ্ঠলোকে, ভক্তদের মুক্তির দিব্য আনন্দ প্রদানকারী মুকুন্দের সান্নিধ্যে লাভ করা যায়।

শ্লোক ৭

মাতুর্গর্ভগতো বীরঃ স তদা ভৃগুনন্দন।
দদর্শ পুরুষং কঞ্চিদ্দহ্যমানোঽস্ত্রতেজসা ॥ ৭ ॥

মাতুঃ—মাতা; **গর্ভ**—গর্ভ; **গতঃ**—সেখানে অবস্থিত হয়ে; **বীরঃ**—মহান যোদ্ধা; **সঃ**—শিশু পরীক্ষিৎ; **তদা**—সেই সময়ে; **ভৃগু-নন্দন**—হে ভৃগুপুত্র; **দদর্শ**—দেখতে পেয়েছিলেন; **পুরুষম্**—পরমেশ্বর ভগবানকে; **কঞ্চিৎ**—অন্য কেউ; **দহ্যমানঃ**—দগ্ধ হবার যন্ত্রণা; **অস্ত্র**—ব্রহ্মাস্ত্র; **তেজসা**—তাপ।

অনুবাদ

হে ভৃগুনন্দন (শৌনক), মাতা উত্তরার গর্ভে অবস্থানকালে মহাবীর পরীক্ষিৎ (অশ্বত্থামা কর্তৃক নিক্ষিপ্ত) ব্রহ্মাস্ত্রের তাপে যখন দগ্ধ হচ্ছিলেন, তখন তিনি পরমেশ্বর ভগবানকে দর্শন করেছিলেন।

তাৎপর্য

মৃত্যুর পর জীব সাধারণত সাত মাস ধরে সমাধিস্থ অবস্থায় থাকে। জীব তার কর্ম অনুসারে পিতার বীর্যের দ্বারা মাতার গর্ভে প্রবেশ করে, এবং এইভাবে সে তার বাঞ্ছিত দেহ প্রাপ্ত হয়। এটি জীবের পূর্বকৃত কর্ম অনুসারে জন্ম-গ্রহণের নিয়ম। সে যখন তার সমাধি থেকে জেগে ওঠে, তখন গর্ভের ভিতর আবদ্ধ থাকার ফলে সে অত্যন্ত অসুবিধা অনুভব করে এবং সেখান থেকে বেরিয়ে আসতে চায়। কখনও কখনও সৌভাগ্যক্রমে সে সেই অবস্থা থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য ভগবানের কাছে প্রার্থনা করে। মহারাজ পরীক্ষিৎ যখন তাঁর মাতার গর্ভে ছিলেন, তখন অশ্বত্থামার দ্বারা নিক্ষিপ্ত ব্রহ্মাস্ত্রের দ্বারা তিনি আহত হন এবং তার ফলে তিনি প্রচণ্ড তাপ অনুভব করেছিলেন। কিন্তু যেহেতু তিনি ছিলেন ভগবানের ভক্ত, তাই ভগবান তাঁর সর্বশক্তিমত্তার প্রভাবে সেই গর্ভে আবির্ভূত হন, এবং শিশু পরীক্ষিৎ তখন দেখতে পেয়েছিলেন যে, কেউ তাঁকে রক্ষা করতে এসেছেন। সেই অসহায় অবস্থাতেও শিশু পরীক্ষিৎ সেই অসহ্য তাপ সহ্য করেছিলেন, কেননা তাঁর প্রকৃতিতে তিনি ছিলেন একজন মহান যোদ্ধা। আর তাই এখানে *বীরঃ* শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে।

শ্লোক ৮

অঙ্গুষ্ঠমাত্রমমলং স্ফুরৎপুরটমৌলিনম্ ।
অপীব্যদর্শনং শ্যামং তড়িদ্বাসসমচ্যুতম্ ॥ ৮ ॥

অঙ্গুষ্ঠ—বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ পরিমাণ; **মাত্রম্**—কেবল; **অমলম্**—জড়াতীত; **স্ফুরৎ**—জ্বলন্ত; **পুরট**—স্বর্ণ; **মৌলিনম্**—মুকুট; **অপীব্য**—অত্যন্ত সুন্দর; **দর্শনম্**—দর্শন; **শ্যামম্**—শ্যামবর্ণ; **তড়িৎ**—বিদ্যুৎ; **বাসসম্**—বসন; **অচ্যুতম্**—অচ্যুত ভগবান।

অনুবাদ

তিনি (ভগবান) ছিলেন মাত্র অঙ্গুষ্ঠ পরিমাণ দীর্ঘ, কিন্তু সম্পূর্ণরূপে জড়াতীত। তাঁর অচ্যুত এবং অপূর্ব সুন্দর দেহটি ছিল ঘনশ্যাম বর্ণ। তাঁর পরনে তড়িৎ বর্ণ পীতবসন এবং মস্তকে উজ্জ্বল স্বর্ণমুকুট ছিল। এইভাবে শিশু পরীক্ষিৎ তাঁকে দর্শন করেছিলেন।

শ্লোক ৯

শ্রীমদ্দীর্ঘচতুর্বাহুং তপ্তকাঞ্চনকুণ্ডলম্ ।
ক্ষতজাক্ষং গদাপাণিমাত্মনঃ সর্বতোদিশম্ ।
পরিভ্রমন্তমুল্কাভাং ভ্রাময়ন্তং গদাং মুহুঃ ॥ ৯ ॥

শ্রীমৎ—শ্রীসম্পন্ন; **দীর্ঘ**—দীর্ঘ; **চতুঃ বাহুম্**—চতুর্ভুজ; **তপ্ত-কাঞ্চন**—গলিত স্বর্ণ; **কুণ্ডলম্**—কর্ণকুণ্ডল; **ক্ষতজ-অক্ষম্**—রক্তবর্ণ চক্ষু; **গদা-পাণিম্**—গদাধারী হস্ত; **আত্মনঃ**—নিজের; **সর্বতঃ**—সমস্ত; **দিশম্**—চতুর্দিক; **পরিভ্রমন্তম্**—পরিভ্রমণশীল; **উল্কাভাম্**—উল্কার মতো; **ভ্রাময়ন্তম্**—ঘূর্ণায়মান; **গদাম্**—গদা; **মুহুঃ**—নিরন্তর।

অনুবাদ

ভগবান ছিলেন চতুর্ভুজসম্পন্ন, তাঁর কর্ণে ছিল তপ্তকাঞ্চনের কুণ্ডল, এবং ক্রোধবশত তাঁর চক্ষু হয়েছিল আরক্তিম। তিনি যখন পরিভ্রমণ করছিলেন, তখন তাঁর গদা উল্কার মতো নিরন্তর তাঁর চতুর্দিকে ঘুরছিল।

তাৎপর্য

ব্রহ্ম-সংহিতায় (পঞ্চম অধ্যায়) বলা হয়েছে যে পরমেশ্বর ভগবান গোবিন্দ, তাঁর এক অংশের দ্বারা ব্রহ্মাণ্ডমণ্ডলে প্রবেশ করে পরমাত্মারূপে কেবল প্রতিটি জীবের হৃদয়েই নয়, অধিকন্তু জড় তত্ত্বের প্রতিটি পরমাণুতে পর্যন্ত প্রবিষ্ট হন। এইভাবে ভগবান তাঁর অচিন্ত্য শক্তির দ্বারা সর্বব্যাপ্ত, এবং এইভাবে তিনি তাঁর প্রিয়ভক্ত মহারাজ পরীক্ষিতকে রক্ষা করার জন্য উত্তরার গর্ভে প্রবেশ করেছিলেন। *শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় (৯/৩১)* ভগবান আশ্বাস দিয়েছেন যে, তাঁর ভক্তের কখনও বিনাশ হবে না। ভগবদ্ভক্তকে কেউ হত্যা করতে পারে না, কেননা ভগবান তাঁকে রক্ষা করেন। আর ভগবান যখন কাউকে হত্যা করতে চান, তখন কেউই তাকে রক্ষা করতে পারে না। ভগবান সর্বশক্তিমান, এবং তাই তাঁর ইচ্ছা অনুসারে তিনি রক্ষা করতে পারেন, আবার হত্যাও করতে পারেন। তিনি তাঁর ভক্ত মহারাজ পরীক্ষিতের সম্মুখে এক কঠিন পরিস্থিতিতে (তাঁর মাতৃজঠরে) তাঁর দৃষ্টিশক্তির উপযুক্ত রূপে প্রকট হয়েছিলেন। ভগবান হাজার হাজার ব্রহ্মাণ্ডের থেকে বড় হতে পারেন, আবার সেইসঙ্গে পরমাণুর থেকেও ক্ষুদ্র হতে পারেন। তিনি কৃপাময়, তাই তিনি সীমিত জীবের দৃষ্টিশক্তির উপযুক্ত রূপ ধারণ করেন। তিনি অসীম। আমাদের কোন গণনার দ্বারা তাঁকে মাপা যায় না। তিনি আমাদের কল্পনার থেকেও অধিক বৃহৎ হতে পারেন, আবার আমাদের ক্ষুদ্রতম ধারণার থেকেও ক্ষুদ্রতর হতে

পারেন। কিন্তু সর্ব অবস্থাতেই তিনি সেই সর্বশক্তিমান ভগবান। উত্তরার গর্ভে অঙ্গুষ্ঠ পরিমাণ বিষ্ণু এবং বৈকুণ্ঠ ধামবাসী পূর্ণ নারায়ণের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। তিনি তাঁর অক্ষম ভক্তদের সেবা গ্রহণ করার জন্য অর্চা-বিগ্রহ রূপ ধারণ করেন। অর্চা-বিগ্রহের কৃপায় জড় জগতের সমস্ত ভক্ত অনায়াসেই ভগবানের সমীপবর্তী হতে পারেন, যদিও তিনি জড় ইন্দ্রিয়ের অগোচর। অতএব প্রাকৃত ভক্তদের গোচরীভূত হওয়ার জন্য অর্চা-বিগ্রহ হচ্ছেন ভগবানের পূর্ণ চিন্ময় স্বরূপ। ভগবানের এই অর্চা-বিগ্রহকে কখনও জড় বলে মনে করা উচিত নয়। যদিও বদ্ধ-জীবের কাছে জড় এবং চেতনের মধ্যে বিশাল পার্থক্য রয়েছে, তথাপি ভগবানের কাছে তার কোন পার্থক্য নেই। ভগবানের কাছে সবকিছুই চিন্ময়, এবং তেমনই ভগবানের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে যুক্ত শুদ্ধ ভক্তের কাছেও সবকিছুই চিন্ময়।

শ্লোক ১০

অস্ত্রতেজঃ স্বগদয়া নীহারমিব গোপতিঃ ।
বিধমন্তং সন্নিকর্ষে পর্যৈক্ষত ক ইত্যসৌ ॥ ১০ ॥

অস্ত্রতেজঃ—ব্রহ্মাস্ত্রের তেজ; **স্ব-গদয়া**—তাঁর স্বীয় গদার প্রভাবে; **নীহারম্**—শিশিরবিন্দু; **ইব**—মতো; **গোপতিঃ**—সূর্য; **বিধমন্তম্**—বিনাশকার্য; **সন্নিকর্ষে**—নিকটবর্তী; **পর্যৈক্ষত**—দর্শন করে; **কঃ**—কে; **ইতি অসৌ**—এই শরীর।

অনুবাদ

সূর্য যেমন হিমরাশি বাষ্পীভূত করে, তেমনই ভগবান তাঁর গদার প্রভাবে অশ্বত্থামা নিক্ষিপ্ত সেই ব্রহ্মাস্ত্রের তেজ বিনাশ করেছিলেন। গর্ভস্থিত শিশু তাঁকে দর্শন করেছিলেন, এবং তিনি কে ছিলেন, সে সম্বন্ধে মনে মনে চিন্তা করেছিলেন।

শ্লোক ১১

বিধূয় তদমেয়াত্মা ভগবান্ধর্মগুব্ বিভুঃ ।
মিষতো দশমাসস্য তত্রৈবান্তর্দধে হরিঃ ॥ ১১ ॥

বিধূয়—সম্পূর্ণরূপে ধৌত করে; **তৎ**—তা; **অমেয়াত্মা**—সর্বব্যাপ্ত পরমাত্মা; **ভগবান্**—পরমেশ্বর ভগবান; **ধর্ম-গুপ্**—ধর্মরক্ষক; **বিভুঃ**—পরম; **মিষতঃ**—দর্শনকালে; **দশমাসস্য**—দশদিক যাঁর আবরণ; **তত্র-এব**—তৎক্ষণাৎ; **অন্ত**—দৃষ্টির অগোচর; **দধে**—হয়েছিলেন; **হরিঃ**—ভগবান শ্রীহরি।

অনুবাদ

এইভাবে শিশু পরীক্ষিৎকে দর্শন দান করে, স্থান ও কালের অতীত, সর্বদিক ব্যাপ্ত, সর্বশক্তিমান, ধর্মরক্ষক পরমেশ্বর ভগবান শ্রীহরি অন্তর্হিত হলেন।

তাৎপর্য

শিশু পরীক্ষিৎ কাল ও স্থানের দ্বারা সীমিত কোন জীবকে দর্শন করছিলেন না। ভগবান এবং জীবের মধ্যে বিরাট পার্থক্য রয়েছে। এখানে ভগবানকে কাল ও স্থানের সীমার অতীত পরম আত্মা বলে উল্লেখ করা হয়েছে। প্রতিটি জীবই কাল ও স্থানের দ্বারা সীমিত। জীব যদিও গুণগতভাবে ভগবানের সঙ্গে এক, তথাপি পরম আত্মা এবং সাধারণ জীবাত্মার মধ্যে আয়তনগতভাবে এক বিরাট পার্থক্য রয়েছে। *শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায়* জীবাত্মা এবং পরম পুরুষ ভগবান উভয়কেই সর্বব্যাপ্ত বলা হয়েছে (*যেন সর্বমিদং ততম্*), তবুও এই দুই প্রকার সর্বব্যাপকত্বের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। সাধারণ জীব বা আত্মা তার সীমিত দেহের মধ্যে সর্বব্যাপ্ত হতে পারে, কিন্তু পরমাত্মা সমস্ত স্থানে এবং সমস্ত কালে সর্বব্যাপ্ত। একটি সাধারণ জীব কখনও অন্য আরেকটি জীবের উপর তার সর্বব্যাপকত্ব বিস্তার করতে পারে না, কিন্তু পরমাত্মা পরমেশ্বর ভগবান সমস্ত স্থানে, সমস্ত সময়ে এবং সমস্ত জীবের উপর অন্তহীনভাবে তাঁর প্রভাব বিস্তার করতে পারেন। যেহেতু তিনি সর্বব্যাপ্ত, কাল ও স্থানের সীমার অতীত, তাই তিনি শিশু পরীক্ষিতের মাতার গর্ভের ভিতরেও আবির্ভূত হতে পারেন। এখানে তাঁকে *ধর্মগুপ্* বা ধর্মের রক্ষক বলে বর্ণনা করা হয়েছে। যিনি পরমেশ্বর ভগবানের শরণাগত তিনিই ধর্মাত্মা, এবং ভগবান সর্ব অবস্থাতেই তাঁকে বিশেষভাবে রক্ষা করেন। ভগবান পরোক্ষভাবে অধার্মিকদের রক্ষক, কেননা তিনি তাঁর বহিরঙ্গা শক্তির দ্বারা তাদের পাপ সংশোধন করেন। এখানে ভগবানকে *দশমাস* বা দশদিকের দ্বারা সজ্জিত বলে বর্ণনা করা হয়েছে। তার অর্থ হচ্ছে তিনি দশদিকের দ্বারা আচ্ছাদিত। তিনি সর্বত্রই বিরাজমান, এবং তাঁর ইচ্ছা অনুসারে তিনি যে কোন স্থানে আবির্ভূত হতে পারেন এবং অন্তর্হিত হতে পারেন। তিনি যে শিশু পরীক্ষিতের দৃষ্টির অন্তরালে চলে গিয়েছিলেন তার অর্থ এই নয় যে তিনি অন্য কোন স্থান থেকে সেখানে আবির্ভূত হয়েছিলেন। তিনি সেখানে উপস্থিত ছিলেন এবং তাঁর অদৃশ্য হয়ে যাওয়ার পরেও তিনি সেখানে ছিলেন, যদিও তিনি শিশু পরীক্ষিতের দৃষ্টির অগোচর হয়েছিলেন। এই জড়া প্রকৃতির জ্যোতির্ময় আবরণ প্রকৃতি মাতার গর্ভের মতো এবং সমস্ত জীবের পরম পিতা আমাদের সেই গর্ভে স্থাপন করেছেন। তিনি সর্বত্রই বিরাজমান, এমন কি মা দুর্গার গর্ভেও, এবং যাঁরা যোগ্যতা অর্জন করেছেন তাঁরা তাঁকে দেখতে পারেন।

শ্লোক ১২

ততঃ সর্বগুণোদর্কে সানুকূলগ্রহোদয়ে ।
জজ্ঞে বংশধরঃ পাণ্ডোর্ভূয়ঃ পাণ্ডুরিবৌজসা ॥ ১২ ॥

ততঃ—তারপর; সর্ব—সমস্ত; গুণ—শুভ লক্ষণ; উদর্কে—ধীরে ধীরে উদয় হল; সানুকূল—সর্বতোভাবে অনুকূল; গ্রহোদয়ে—গ্রহের প্রভাব; জজ্ঞে—জন্মগ্রহণ করেছিলেন; বংশ-ধরঃ—বংশধর; পাণ্ডোঃ—পাণ্ডুর; ভূয়ঃ—হয়ে; পাণ্ডুঃ ইব—পাণ্ডুর মতো; ওজসা—শক্তিশালী।

অনুবাদ

তারপর শুভ গ্রহসমূহ অন্যান্য অনুকূল গ্রহগণের সঙ্গে সম্মিলিত হলে, পাণ্ডু সদৃশ তেজস্বী পাণ্ডুর বংশধর জন্মগ্রহণ করলেন।

তাৎপর্য

জীবের উপর গ্রহ-নক্ষত্রের প্রভাবের জ্যোতিষ গণনা কোন কল্পনা নয়, তা বাস্তব সত্য, যা *শ্রীমদ্ভাগবতে* প্রতিপন্ন হয়েছে। প্রতিটি জীবই প্রতিক্ষণ প্রকৃতির নিয়মের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে, ঠিক যেমন একজন নাগরিক রাষ্ট্রের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। রাজ্যের আইন স্থূলরূপে পালন করা হয়, কিন্তু জড়া প্রকৃতির আইন আমাদের স্থূল বুদ্ধির এবং অনুভূতির তুলনায় সূক্ষ্ম হওয়ার ফলে তা প্রত্যক্ষভাবে উপলব্ধি করা যায় না। *শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায়* (৩/৯) উল্লেখ করা হয়েছে যে, জীবনের প্রতিটি ক্রিয়া অপর একটি প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে, যা আমাদের বন্ধনের কারণ হয়। আর যাঁরা যজ্ঞ বা বিষ্ণুর উদ্দেশ্যে কর্ম করছেন, তাঁরাই কেবল সেই কর্মফলের দ্বারা আবদ্ধ হন না। উচ্চতর অধিকারী, ভগবানের প্রতিনিধিরা আমাদের কর্ম বিচার করেন, এবং তাই আমাদের পূর্বকৃত কর্ম অনুসারে দেহ প্রদান করা হয়। জড়া প্রকৃতির নিয়ম এতই সূক্ষ্ম যে দেহের প্রতিটি অঙ্গ বিভিন্ন গ্রহ-নক্ষত্রের দ্বারা প্রভাবিত, এবং জীব তার কারাগারের মেয়াদ পূর্ণ করার জন্য গ্রহ-নক্ষত্রের প্রভাবের দ্বারা পরিচালিত হয়ে তার দেহ প্রাপ্ত হয়। তাই মানুষের জন্মকালে গ্রহ-নক্ষত্রের অবস্থানের দ্বারা তার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে অবগত হওয়া যায়, এবং অভিজ্ঞ জ্যোতিষীরা তার সঠিক ঠিকুজি তৈরি করতে পারেন। এটি একটি মহান বিজ্ঞান, এবং তার যদি অপব্যবহার করা হয়, তার ফলে সেই বিজ্ঞানটি কিন্তু নিরর্থক হয়ে যায় না। মহারাজ পরীক্ষিতের মতো মহাপুরুষ, এমন কি ভগবান যখন জন্মগ্রহণ করেন,

তখন সমস্ত শুভ নক্ষত্রের সমাবেশ হয়, এবং সেই সমস্ত শুভ গ্রহ-নক্ষত্র তাঁদের শরীরের উপর প্রভাব বিস্তার করে। গ্রহ-নক্ষত্রের সব চাইতে শুভ সমাবেশ তখন হয় যখন ভগবান এই জড় জগতে আবির্ভূত হন, এবং সেই সময়টিকে বিশেষ করে বলা হয় জয়ন্তী। অন্য কোন উদ্দেশ্যে এই শব্দটির অপব্যবহার করা উচিত নয়। মহারাজ পরীক্ষিৎ কেবল একজন মহান ক্ষত্রিয় সম্রাটই ছিলেন না, তিনি ছিলেন একজন মহান ভগবদ্ভক্তও। তাই তিনি কোন অশুভ ক্ষণে জন্মগ্রহণ করতে পারেন না। কোন সম্মানিত ব্যক্তিকে স্বাগত জানাবার জন্য যেমন উপযুক্ত স্থান এবং কাল নির্ধারণ করা হয়, তেমনই পরমেশ্বর ভগবানের দ্বারা বিশেষরূপে সুরক্ষিত মহারাজ পরীক্ষিতের মতো ব্যক্তিকে স্বাগত জানাবার জন্য এক উপযুক্ত ক্ষণ মনোনয়ন করা হয়েছিল, যে সময়ে সমস্ত শুভ গ্রহ-নক্ষত্র একত্রে সমবেত হয়ে মহারাজের উপর প্রভাব বিস্তার করেছিল। এইভাবে তিনি *শ্রীমদ্ভাগবতের* একজন মহান নায়করূপে পরিচিত হওয়ার জন্য জন্মগ্রহণ করেছিলেন। গ্রহ-নক্ষত্রের এই প্রভাব মানুষের ইচ্ছার দ্বারা কখনও আয়োজন করা যায় না, পক্ষান্তরে ভগবানের উন্নত ব্যবস্থাপনার দ্বারা তা নির্ধারিত হয়। নিঃসন্দেহে জীবের সৎ ও অসৎ কর্ম অনুসারে সেই আয়োজন হয়, এবং তা থেকে জীবের শুভ কর্মের গুরুত্ব বোঝা যায়। পুণ্য কর্মের প্রভাবে জীব কেবল সম্পদ, সুশিক্ষা এবং সুন্দর রূপ প্রাপ্ত হয়। সনাতন ধর্মব্যবস্থায় যে সমস্ত সংস্কার রয়েছে তা গ্রহ-নক্ষত্রের প্রভাবের সুযোগ গ্রহণ করার পক্ষে অত্যন্ত উপযুক্ত। তাই উচ্চবর্ণের মানুষদের জন্য গর্ভাধান সংস্কারের মাধ্যমে সমস্ত পুণ্য কর্মের সূচনা হয়, যার ফলে মানব সমাজে পুণ্যবান ও বুদ্ধিমান মানুষের আবির্ভাব হয়। উত্তম ও সুমতিসম্পন্ন জনসাধারণের প্রভাবেই কেবল জগতে শান্তি ও সমৃদ্ধির প্রতিষ্ঠা হয়; অবাঞ্ছিত এবং যৌনজীবনে আসক্ত উন্মত্ত জনসাধারণ সর্বত্র উৎপাত সৃষ্টি করে সমাজকে নরকে পরিণত করে।

শ্লোক ১৩

তস্য প্রীতমনা রাজা বিপ্রৈর্ধৌম্যকৃপাদিভিঃ ।
জাতকং কারয়ামাস বাচয়িত্বা চ মঙ্গলম্ ॥ ১৩ ॥

তস্য—তাঁর; প্রীত-মনাঃ—সন্তুষ্টচিত্ত; রাজা—মহারাজ যুধিষ্ঠির; বিপ্রৈঃ—তত্ত্বজ্ঞ ব্রাহ্মণদের দ্বারা; ধৌম্য—ধৌম্য; কৃপ—কৃপ; আদিভিঃ—এবং অন্যরাও; জাতকম্—শিশুর জন্মের অব্যবহিত পরেই আচরণীয় একটি সংস্কার বা শুদ্ধিকরণ পদ্ধতি; কারয়াম্ আস—সম্পাদন করেছিলেন; বাচয়িত্বা—পাঠ করে; চ—ও; মঙ্গলম্—শুভ।

অনুবাদ

সেই সময়ে ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির প্রফুল্লচিত্তে সেই নবজাত বালকের জাতকর্ম সম্পাদন করিয়েছিলেন। ধৌম্য, কৃপাচার্য প্রমুখ তত্ত্বজ্ঞ ব্রাহ্মণেরা মঙ্গলজনক স্বস্তিবাচন পাঠ করেছিলেন।

তাৎপর্য

বর্ণাশ্রম ধর্ম ব্যবস্থায় বর্ণিত সংস্কার অনুষ্ঠান করার জন্য সৎ এবং বুদ্ধিমান ব্রাহ্মণদের প্রয়োজন রয়েছে। এই প্রকার সংস্কার অনুষ্ঠান না হলে সুসন্তান লাভ করা সম্ভব নয়, এবং এই কলিযুগে এই সংস্কারের অভাবে পৃথিবী জুড়ে মানুষ শূদ্র অথবা শূদ্রাধমে পরিণত হয়েছে। এই যুগে যথাযথ সুযোগ-সুবিধা ও সৎ ব্রাহ্মণের অভাবে বৈদিক সংস্কারের পুনরুদ্ধার করা সম্ভব নয়, কিন্তু এই যুগের জন্য *পাঞ্চরাত্রিক* বিধি অনুসরণের পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। এই পাঞ্চরাত্রিক পদ্ধতি শূদ্রশ্রেণীর মানুষদের জন্য। কলিযুগের মানুষেরা প্রায় সকলেই শূদ্রবৎ এবং তাই এই যুগের জন্য এই সংস্কারের পন্থা অনুমোদন করা হয়েছে। এই সংস্কারের বিধি কেবল পারমার্থিক বিকাশের জন্য, অন্য কোন উদ্দেশ্য সাধনের জন্য নয়। পারমার্থিক বিকাশে কোনরকম উচ্চ বা নিম্নকুলের বিচার নেই।

গর্ভাধান সংস্কারের পর অন্য কতকগুলি সংস্কারও রয়েছে, যেমন গর্ভাবস্থায় সীমন্তোন্নয়ন, সাধভক্ষণ আদি সংস্কার, এবং শিশুর জন্মের পর প্রথম সংস্কার হচ্ছে জাতকর্ম। ধৌম্য এবং মহান সেনাপতি কৃপাচার্য প্রমুখ সৎ ও অভিজ্ঞ রাজ পুরোহিতদের সহযোগিতায় মহারাজ যুধিষ্ঠির পরীক্ষিৎ মহারাজের জাতকর্ম সম্পাদন করেছিলেন। এই সমস্ত সংস্কার কেবল কতকগুলি বিধিগত অনুষ্ঠান বা সামাজিক উৎসবই কেবল নয়, পক্ষান্তরে সেগুলির ব্যবহারিক উদ্দেশ্য রয়েছে। ধৌম্য ও কৃপাচার্যের মতো সুদক্ষ ব্রাহ্মণেরা সার্থকভাবে এগুলি সম্পাদন করতে পারেন। এই যুগে এই প্রকার ব্রাহ্মণেরা কেবল বিরলই নন, তাঁরা নেই বললেই চলে, এবং তাই এই অধঃপতিত যুগে মানুষদের পারমার্থিক উন্নতি সাধনের জন্য গোস্বামীগণ বৈদিক অনুষ্ঠানের থেকে পাঞ্চরাত্রিক বিধির অধিকতর গুরুত্ব দিয়েছেন।

কৃপাচার্য হচ্ছেন গৌতম বংশোদ্ভূত মহর্ষি সরদ্বানের পুত্র। ঘটনাক্রমে মহর্ষি সরদ্বানের সঙ্গে জনপদী নামক এক অপ্সরার সাক্ষাৎ হয়, এবং তার ফলে সরদ্বানের বীর্য স্খলিত হয়ে দুই ভাগে পতিত হয়। তা থেকে তৎক্ষণাৎ একটি বালক এবং একটি বালিকার জন্ম হয়। পরবর্তীকালে পুত্রটি কৃপ নামে এবং কন্যাটি কৃপী নামে পরিচিত হন। মহারাজ শান্তনু বনে মৃগয়া করার সময় সেই শিশু দুটিকে

প্রাপ্ত হন এবং ঘরে নিয়ে এসে যথাযথ সংস্কারের দ্বারা ব্রাহ্মণত্ব প্রদান করেন। পরবর্তীকালে কৃপাচার্য দ্রোণাচার্যের মতো একজন মহান সেনাপতিতে পরিণত হন। তাঁর ভগিনী কৃপীর সঙ্গে দ্রোণাচার্যের বিবাহ হয়। কৃপাচার্য কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে দুর্যোধনের পক্ষে অংশগ্রহণ করেছিলেন। মহারাজ পরীক্ষিতের পিতা অভিমন্যুকে বধ করার সময় কৃপাচার্য সাহায্য করেছিলেন, কিন্তু তা সত্ত্বেও দ্রোণাচার্যের মতো একজন মহান ব্রাহ্মণ হওয়ার ফলে পাণ্ডব পরিবার তাঁকে সম্মানের আসন প্রদান করেছিলেন। দুর্যোধনের কাছে পাশা খেলায় হেরে গিয়ে পাণ্ডবেরা যখন বনবাসী হন, তখন ধৃতরাষ্ট্র পাণ্ডবদের কৃপাচার্যের তত্ত্বাবধানে সমর্পণ করেন। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের পর কৃপাচার্য পুনরায় রাজসভার সদস্য হয়েছিলেন, এবং মহারাজ পরীক্ষিতের জাতকর্ম অনুষ্ঠানের সময় সেই অনুষ্ঠানকে সাফল্যমণ্ডিত করতে বৈদিক মন্ত্র উচ্চারণ করার জন্য তাঁকে নিমন্ত্রণ করা হয়েছিল। মহারাজ যুধিষ্ঠির যখন হিমালয় অভিমুখে মহাপ্রস্থান করার জন্য প্রাসাদ ত্যাগ করেছিলেন, তখন তিনি মহারাজ পরীক্ষিৎকে কৃপাচার্যের হস্তে শিষ্যরূপে সমর্পণ করেছিলেন, এবং কৃপাচার্য মহারাজ পরীক্ষিতের দায়িত্বভার গ্রহণ করার ফলে তিনি সন্তুষ্ট চিত্তে গৃহত্যাগ করেছিলেন। মহান শাসক রাজা এবং সম্রাটেরা সর্বদা কৃপাচার্যের মতো বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণদের পরিচালনাধীনে থাকতেন, এবং তার ফলে তাঁরা তাঁদের রাজনৈতিক দায়িত্ব যথাযথভাবে সম্পাদন করতে পারতেন।

শ্লোক ১৪

হিরণ্যং গাং মহীং গ্রামান্ হস্ত্যশ্বান্নৃপতির্বরান্ ।
প্রাদাৎস্বন্নং চ বিপ্রেভ্যঃ প্রজাতীর্থে স তীর্থবিৎ ॥ ১৪ ॥

হিরণ্যম্—স্বর্ণ; **গাম্**—গাভী; **মহীম্**—ভূমি; **গ্রামান্**—গ্রাম; **হস্তি**—হাতি; **অশ্বান্**—ঘোড়া; **নৃপতিঃ**—রাজা; **বরান্**—পুরস্কার; **প্রাদাৎ**—দান করেছিলেন; **স্বন্নম্**—সুস্বাদু অন্ন; **চ**—এবং; **বিপ্রেভ্যঃ**—ব্রাহ্মণদের; **প্রজা-তীর্থে**—পুত্রের শুভ জন্মদিন উপলক্ষ্যে দান অনুষ্ঠান; **সঃ**—তিনি; **তীর্থ-বিৎ**—যিনি জানেন কিভাবে, কখন এবং কোথায় দান করতে হয়।

অনুবাদ

কিভাবে, কখন ও কোথায় দান করতে হয়, সে বিষয়ে অভিজ্ঞ মহারাজ যুধিষ্ঠির পুত্রসন্তানের জন্ম উপলক্ষ্যে ব্রাহ্মণদের স্বর্ণ, গাভী, ভূমি, গ্রাম, হস্তী অশ্ব ও উত্তম অন্ন-শস্যাদি দান করেছিলেন।

তাৎপর্য

ব্রাহ্মণ এবং সন্ন্যাসীদেরই কেবল গৃহস্থদের থেকে দান গ্রহণ করার অধিকার রয়েছে। বিভিন্ন সংস্কার অনুষ্ঠানে, বিশেষ করে জন্ম, বিবাহ এবং মৃত্যুর সময়, ব্রাহ্মণদের ধন বিতরণ করা হয়, কেননা ব্রাহ্মণেরা সমাজের সর্বশ্রেষ্ঠ সেবা করেন। স্বর্ণ, ভূমি, গাভী, গ্রাম, ঘোড়া, হাতি, শস্যসহ খাদ্য রন্ধনের সমস্ত সরঞ্জাম ইত্যাদি বিষয়সমূহ তাঁদের পর্যাপ্ত পরিমাণে দান করা হত। তাই ব্রাহ্মণেরা দরিদ্র ছিলেন না। পক্ষান্তরে যেহেতু তাঁদের স্বর্ণ, ভূমি, গ্রাম, ঘোড়া, হাতি এবং যথেষ্ট পরিমাণে শস্য ছিল, তাই তাঁদের জীবিকা-নির্বাহের জন্য উপার্জন করতে হত না। তাঁরা কেবল সমগ্র সমাজের কল্যাণের জন্য নিজেদের নিয়োজিত করতেন।

তীর্থবিৎ শব্দটি তাৎপর্যপূর্ণ, কেননা রাজা ভালভাবেই জানতেন কোথায় এবং কখন দান করতে হবে। দান কখনও অন্ধভাবে দেওয়া হত না, এবং তা ব্যর্থ হত না। শাস্ত্রের নির্দেশ অনুসারে দান এমন ব্যক্তিদের দেওয়া উচিত যাঁরা তাঁদের আধ্যাত্মিক বিকাশের বলে দান গ্রহণের যোগ্য। তথাকথিত দরিদ্র-নারায়ণেরা ভগবান সম্বন্ধে অনধিকারী ব্যক্তিদের এক ভ্রান্ত ধারণামাত্র। শাস্ত্রে কখনোই দান নিবেদনের পাত্র হিসাবে এই দরিদ্র-নারায়ণের উল্লেখ পাওয়া যায় না। কোন দরিদ্র ব্যক্তি কখনো ঘোড়া, হাতি, ভূমি, গ্রামরূপে এইভাবে মুক্ত হস্তে দান প্রাপ্ত হয় না। অর্থাৎ সিদ্ধান্ত হচ্ছে যে, বুদ্ধিমান ব্যক্তি বা ভগবানের সেবায় যুক্ত ব্রাহ্মণদের পালন করা হত, যার ফলে তাঁদের দেহের আবশ্যকতা সম্বন্ধে কোন চিন্তা করতে হত না, রাজা ও অন্যান্য গৃহস্থেরা হরষিত অন্তরে তাঁদের সমস্ত সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের ব্যবস্থা করতেন।

শাস্ত্রে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে শিশু যতক্ষণ নাড়ীর দ্বারা মায়ের সঙ্গে যুক্ত থাকে, ততক্ষণ শিশু এবং মাকে এক দেহ বলে মনে করা হয়; কিন্তু যখনই নাড়ী ছিন্ন করা হয়, তখন শিশুটি মা থেকে ভিন্ন হয়ে যায়, এবং তখন জাতকর্ম সংস্কার সম্পাদন করা হয়। নবজাত শিশুকে দেখার জন্য প্রশাসক দেবতারা ও পিতৃপুরুষেরা আসেন, এবং সেই উপলক্ষ্যে সমাজে পারমার্থিক বিকাশের জন্য উপযুক্ত ব্যক্তিদের ধন বিতরণ করা হয়।

শ্লোক ১৫

তমূচুর্ব্রাহ্মণাস্তুষ্টা রাজানং প্রশ্রয়ান্বিতম্ ।
এষ হ্যস্মিন্ প্রজাতন্তৌ পুরূণাং পৌরবর্ষভ ॥ ১৫ ॥

তম্—তাঁকে; ঊচুঃ—সম্বোধন করলেন; ব্রাহ্মণাঃ—ব্রাহ্মণেরা; তুষ্টাঃ—অত্যন্ত সন্তুষ্ট হয়ে; রাজানম্—রাজাকে; প্রশ্রয়াম্বিতম্—অত্যন্ত কৃতজ্ঞতা সহকারে; এষঃ—এই; হি—অবশ্যই; অস্মিন্—ধারায়; প্রজা-তন্তৌ—বংশে; পুরূণাম্—পুরুদের; পৌরব-ঋষভ—পুরুকুলশ্রেষ্ঠ।

অনুবাদ

বিদ্বান ব্রাহ্মণেরা দান লাভে অত্যন্ত সন্তুষ্ট হয়ে মহারাজ যুধিষ্ঠিরকে পুরুকুলশ্রেষ্ঠ বলে সম্বোধন করে বললেন যে, তাঁর পুত্রটি অবশ্যই পুরু বংশের উপযুক্ত।

শ্লোক ১৬

দৈবেনাপ্রতিঘাতেন শুক্লে সংস্থামুপেয়ুষি ।
রাতো বোঽনুগ্রহার্থায় বিষ্ণুনা প্রভবিষ্ণুনা ॥ ১৬ ॥

দৈবেন—দৈববশত; অপ্রতিঘাতেন—অপ্রতিহত; শুক্লে—নির্মল; সংস্থাম্—বিনাশ; উপেয়ুষি—কার্যকরী করা হয়; রাতঃ—প্রত্যর্পণ করা হয়েছে; বঃ—আপনাদের জন্য; অনুগ্রহ-অর্থায়—অনুগ্রহ করার জন্য; বিষ্ণুনা—সর্বব্যাপ্ত ভগবান কর্তৃক; প্রভবিষ্ণুনা—মহাপ্রভাবশালী কর্তৃক।

অনুবাদ

ব্রাহ্মণেরা বললেন, মহাপ্রভাবশালী এবং সর্বব্যাপ্ত পরমেশ্বর ভগবান শ্রীবিষ্ণু আপনাদের প্রতি অনুগ্রহ করে এই নির্মল সন্তানটিকে পুনরুদ্ধার করেছেন। এক অব্যর্থ অতি প্রাকৃত ব্রহ্মাস্ত্রের প্রভাবে যখন তাঁর বিনাশ অনিবার্য হয়েছিল, তখন তাঁকে রক্ষা করা হয়েছিল।

তাৎপর্য

সর্বশক্তিমান এবং সর্বব্যাপ্ত বিষ্ণু (ভগবান শ্রীকৃষ্ণ) দুটি কারণে শিশু পরীক্ষিতকে রক্ষা করেছিলেন। প্রথম কারণটি হচ্ছে ভগবানের শুদ্ধ ভক্ত হওয়ার ফলে সেই শিশুটি তাঁর মাতৃগর্ভে অবস্থানকালেই নিষ্কলুষ ছিলেন। দ্বিতীয় কারণটি হচ্ছে শিশুটি ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরের পুণ্যবান পূর্বপুরুষ পুরুর একমাত্র উত্তরাধিকারী পুত্র সন্তান ছিলেন। ভগবান চান যে শান্তি ও সমৃদ্ধিসম্পন্ন জীবনের বাস্তবিক প্রগতির জন্য তাঁর প্রতিনিধিরূপে পুণ্যবান রাজারা যেন বংশ পরম্পরায় পৃথিবী শাসন করেন। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে মহারাজ যুধিষ্ঠিরের পরবর্তী পর্যায়ের বংশধরেরা পর্যন্ত নিহত

হয়েছিলেন, এবং সেই মহান রাজপরিবারে আরেকটি পুত্রসন্তান উৎপাদন করার মতো আর কেউ ছিলেন না। অভিমন্যুর পুত্র মহারাজ পরীক্ষিৎ ছিলেন সেই বংশের একমাত্র জীবিত উত্তরাধিকারী, এবং অশ্বত্থামার অপ্রতিহত অলৌকিক ব্রহ্মাস্ত্র তাঁকে সংহার করবার জন্য নিক্ষিপ্ত হয়েছিল। ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে এখানে বিষ্ণু বলে বর্ণনা করা হয়েছে, এবং সেটিও তাৎপর্যপূর্ণ। আদি পুরুষ ভগবান শ্রীকৃষ্ণ, সংরক্ষণ এবং সংহার কার্য সম্পাদন করেন বিষ্ণুরূপে। শ্রীবিষ্ণু হচ্ছেন ভগবান শ্রীকৃষ্ণের অংশ। ভগবানের সর্বব্যাপ্ত কার্যকলাপ তাঁর বিষ্ণুরূপের দ্বারা সম্পাদিত হয়। শিশু পরীক্ষিতকে এখানে নিষ্কলঙ্ক শুক্ল বলে বর্ণনা করা হয়েছে, কেননা তিনি হচ্ছেন ভগবানের একজন অনন্য ভক্ত। ভগবানের এই প্রকার অনন্য ভক্তেরা পৃথিবীতে আসেন ভগবানের বিশেষ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য। ভগবান চান যে জড় জগতে ভ্রাম্যমান বদ্ধ জীবেরা যেন উদ্ধার লাভ করে এবং তাদের প্রকৃত আলয় ভগবদ্ধামে ফিরে যায়। তাই তিনি বেদের মতো অপ্রাকৃত শাস্ত্র রচনা করে, সাধু-মহাত্মাদের দূতরূপে প্রেরণ করে, এবং তাঁর প্রতিনিধিকে গুরুরূপে নিযুক্ত করে তাদের সহায়তা করেন। এই প্রকার পারমার্থিক শাস্ত্র, ভগবানের দূত এবং প্রতিনিধিরা নিষ্কলঙ্ক শুভ্র, কেননা জড়া প্রকৃতির কলুষ তাঁদের স্পর্শ পর্যন্ত করতে পারে না। যখন তাঁদের বিনাশের ভয় দেখানো হয়, তখন ভগবান তাঁদের রক্ষা করেন। স্থূল জড়বাদীরা মূর্খের মতো এই প্রকার ভয় দেখায়। শিশু পরীক্ষিতের প্রতি অশ্বত্থামা যে ব্রহ্মাস্ত্র নিক্ষেপ করেছিল, তা অবশ্যই অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন ছিল, এবং এই জড় জগতের কোন কিছুর দ্বারাই সেই শক্তি প্রতিহত করা সম্ভব ছিল না। কিন্তু সর্বশক্তিমান ভগবান, যিনি সর্বত্র সমস্ত বস্তুর ভিতরে এবং বাইরে বিরাজমান, তিনি তাঁর সর্বশক্তিমত্তার দ্বারা তাঁর আদর্শ সেবক এবং তাঁর অহৈতুকী কৃপাপ্রাপ্ত ভক্ত মহারাজ যুধিষ্ঠিরের বংশধরকে রক্ষা করার জন্য তা প্রতিহত করতে সক্ষম ছিলেন।

শ্লোক ১৭

তস্মান্নাম্না বিষ্ণুরাত ইতি লোকে ভবিষ্যতি।
ন সন্দেহো মহাভাগ মহাভাগবতো মহান্ ॥ ১৭ ॥

তস্মাৎ—তাই; **নাম্না**—নামে; **বিষ্ণু-রাতঃ**—বিষ্ণু কর্তৃক রক্ষিত; **ইতি**—এইভাবে; **লোকে**—সকল গ্রহলোকে; **ভবিষ্যতি**—প্রসিদ্ধ হবেন; **ন**—না; **সন্দেহঃ**—সন্দেহ; **মহা-ভাগ**—মহাভাগ্যবান; **মহা-ভাগবতঃ**—ভগবানের শ্রেষ্ঠ ভক্ত; **মহান্**—সমস্ত সদ্‌গুণে গুণান্বিত।

অনুবাদ

পরমেশ্বর ভগবান বিষ্ণু কর্তৃক যেহেতু রক্ষিত হয়েছিলেন, তাই এই শিশুটি জগতে বিষ্ণুরাত নামে সুপ্রসিদ্ধ হবেন। হে মহাভাগ্যবান, এই শিশুটি যে ভগবানের উত্তম ভক্ত হবেন এবং সমস্ত সদ্‌গুণে ভূষিত হবেন, সে সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নেই।

তাৎপর্য

ভগবান সমস্ত জীবদের সুরক্ষা প্রদান করেন, কেননা তিনি হচ্ছেন তাদের পরম নেতা। বৈদিক মন্ত্র প্রতিপন্ন করে যে ভগবান হচ্ছেন সমস্ত পুরুষদের মধ্যে পরম পুরুষ। এই দুই চেতনের মধ্যে পার্থক্য হচ্ছে যে পরমেশ্বর ভগবান অন্য সমস্ত চেতন জীবদের পালন করেন, এবং তাঁকে জানার ফলে শাশ্বত শান্তি লাভ করা যায় (*কঠোপনিষদ*)। এই প্রকার সুরক্ষা তিনি তাঁর বিভিন্ন শক্তির দ্বারা বিভিন্ন স্তরের জীবদের প্রদান করেন। কিন্তু তাঁর অনন্য ভক্তের বেলায় তিনি ব্যক্তিগতভাবে তাঁদের রক্ষা করেন। তাই পরীক্ষিৎ মহারাজকে তাঁর জীবনের শুরু থেকেই, যখন তিনি তাঁর মাতৃজঠরে ছিলেন, ভগবান তাঁকে রক্ষা করেছিলেন। আর যেহেতু তিনি বিশেষভাবে ভগবান কর্তৃক সুরক্ষিত ছিলেন, তা থেকে নিশ্চিতভাবে বোঝা গিয়েছিল যে সেই শিশুটি সমস্ত সদ্‌গুণ সমন্বিত ভগবানের সর্বোত্তম ভক্ত হবেন। তিন প্রকার ভক্ত রয়েছেন, যথা মহাভাগবত বা উত্তম অধিকারী, মধ্যম অধিকারী এবং কনিষ্ঠ অধিকারী। যাঁরা ভগবানের মন্দিরে গিয়ে শ্রদ্ধা সহকারে ভগবানের শ্রীবিগ্রহের পূজা করেন, অথচ পারমার্থিক বিজ্ঞান সম্বন্ধে যথেষ্ট জ্ঞান না থাকার ফলে ভগবদ্ভক্তদের প্রতি শ্রদ্ধা-পরায়ণ নন, তাঁদের বলা হয় প্রাকৃত ভক্ত বা কনিষ্ঠ অধিকারী। দ্বিতীয় স্তরের ভক্ত হচ্ছেন তাঁরা, যাঁরা ঐকান্তিকভাবে ভগবানকে সেবা করেন, সম স্তরের ভক্তদের প্রতি মৈত্রীভাব পোষণ করেন, অজ্ঞজনের প্রতি অনুগ্রহ করেন এবং ভগবদ্বিদ্বেষী নাস্তিকদের উপেক্ষা করেন; এগুলি হচ্ছে মধ্যম অধিকারী ভক্তের লক্ষণ। কিন্তু যাঁরা সব কিছু ভগবানের সম্বন্ধে দর্শন করেন অথবা সব কিছুই শাশ্বতভাবে ভগবানের সঙ্গে সম্পর্কযুক্তরূপে দর্শন করেন অর্থাৎ ভগবান ছাড়া আর কিছুই দর্শন করেন না, তাঁদের বলা হয় মহাভাগবত বা সর্বোচ্চ স্তরের ভগবদ্ভক্ত। এই প্রকার মহাভাগবতেরা সর্বতোভাবে পূর্ণ। ভগবদ্ভক্ত এই স্তরগুলির যে কোনটিতেই অবস্থান করুন না কেন, তিনি আপনা থেকেই সমস্ত সদ্‌গুণের দ্বারা গুণান্বিত হন, এবং তাই পরীক্ষিৎ মহারাজের মতো একজন মহাভাগবত অবশ্যই সর্বতোভাবে পূর্ণ। যেহেতু পরীক্ষিৎ মহারাজের

জন্ম হয়েছিল মহারাজ যুধিষ্ঠিরের বংশে, তাই তাঁকে এখানে মহাভাগবত বলে সম্বোধন করা হয়েছে। যে বংশে মহাভাগবতের জন্ম হয়, সেই বংশ অত্যন্ত ভাগ্যশালী; কেননা একজন মহাভাগবতের জন্ম হওয়ার ফলে পরিবারের বিগত, বর্তমান এবং ভবিষ্যতের বংশধরগণ ভগবানের কৃপায় উদ্ধার লাভ করেন। তাই ভগবানের অনন্য ভক্ত হওয়ার দ্বারাই কেবল বংশের সর্বশ্রেষ্ঠ উপকার সাধন করা যায়।

শ্লোক ১৮

শ্রীরাজোবাচ

অপ্যেষ বংশ্যান্ রাজর্ষীন্ পুণ্যশ্লোকান্ মহাত্মনঃ ।
অনুবর্তিতা স্বিদ্যশসা সাধুবাদেন সত্তমাঃ ॥ ১৮ ॥

শ্রী-রাজা—সর্বগুণসম্পন্ন রাজা (মহারাজ যুধিষ্ঠির); **উবাচ**—বললেন; **অপি**—হলেও; **এষঃ**—এই; **বংশ্যান্**—বংশে; **রাজা-ঋষীন্**—রাজর্ষিদের; **পুণ্য-শ্লোকান্**—পবিত্র চরিত; **মহা-আত্মনঃ**—মহাত্মাগণ; **অনুবর্তিতা**—অনুগামী; **স্বিৎ**—হবে কি; **যশসা**—সৎ কীর্তির দ্বারা; **সাধু-বাদেন**—মহিমার দ্বারা; **সৎ-তমাঃ**—হে মহাত্মাগণ।

অনুবাদ

ধর্মরাজ (যুধিষ্ঠির) জিজ্ঞাসা করলেন, হে মহাত্মাগণ, এই নবজাত কুমার কি প্রশংসা ও সৎ কীর্তির দ্বারা আমাদের বংশের পবিত্রকীর্তি মহামান্য রাজর্ষিদের অনুসরণ করতে পারবে?

তাৎপর্য

মহারাজ যুধিষ্ঠিরের পূর্বপুরুষরা তাঁদের মহান কার্যকলাপের প্রভাবে সকলেই ছিলেন যশস্বী এবং পুণ্যবান রাজর্ষি। তাঁরা সকলেই ছিলেন রাজসিংহাসনে অধিষ্ঠিত ঋষি, এবং তাই রাজ্যের সমস্ত সদস্যরা ছিলেন সুখী, পুণ্যবান, সদাচারী, সমৃদ্ধিশালী এবং পারমার্থিক জ্ঞানের আলোকে উদ্ভাসিত। এই প্রকার মহান রাজর্ষিগণ মহাত্মাদের কঠোর তত্ত্বাবধানে ও শাস্ত্রের নির্দেশ অনুসারে প্রশিক্ষিত হতেন, এবং তার ফলে তাঁদের রাজ্য ছিল সাধুপুরুষে পূর্ণ পারমার্থিক জীবন-যাপনের এক সুখকর স্থান। মহারাজ যুধিষ্ঠির স্বয়ং তাঁর পূর্বপুরুষদের প্রতিমূর্তি ছিলেন, এবং তাঁর অভিলাষ ছিল যে তাঁর পরবর্তী রাজাও যেন তাঁর মহান পূর্বপুরুষদের অনুরূপ

হন। পণ্ডিত ব্রাহ্মণদের কাছে তিনি এটি জেনে অত্যন্ত প্রসন্ন হয়েছিলেন যে জ্যোতিষ গণনা অনুসারে নবজাত শিশুটি মহাভাগবত হবেন। তিনি ব্যক্তিগতভাবে জানতে চেয়েছিলেন বালকটি তাঁর মহান পূর্বপুরুষদের পদাঙ্ক অনুসরণ করবেন কি না। এটি রাজতন্ত্রের ধারা। রাজাকে পুণ্যবান, বীর ভগবদ্ভক্ত হতে হয়, এবং দুষ্কৃতকারীদের কাছে তাঁকে মূর্তিমান ভয়ের মতো হওয়া উচিত। নিরীহ জনসাধারণের শাসনের জন্য সমান যোগ্যতাসম্পন্ন উত্তরাধিকারীকে রেখে যাওয়া তাঁর অবশ্য কর্তব্য। আধুনিক গণতান্ত্রিক রাজ্যগুলিতে জনসাধারণ শূদ্র বা শূদ্রাধমে পরিণত হয়েছে, এবং তাদের যে প্রতিনিধি রাষ্ট্র পরিচালনা করছে, তাদের কারোরই রাজ্য শাসনের ব্যাপারে কোনরকম শাস্ত্রজ্ঞান নেই। তার ফলে সমস্ত পরিবেশ কাম এবং লোভে পূর্ণ শূদ্রোচিত মনোভাবের দ্বারা পরিব্যাপ্ত। এই প্রকার নেতারা প্রতিদিন নিজেদের মধ্যে ঝগড়া করে, দলের অথবা গোষ্ঠীর স্বার্থে প্রায়ই মন্ত্রীমণ্ডলীর পরিবর্তন হয়। সকলেই মৃত্যু পর্যন্ত রাজ্যের সম্পদ শোষণ করতে চায়। জোর করে গদিচ্যুত না করা পর্যন্ত কেউই রাজনৈতিক জীবন থেকে অবসর গ্রহণ করতে চায় না। এই প্রকার নিম্ন স্তরের মানুষেরা কিভাবে জনসাধারণের কল্যাণ সাধন করতে পারে? তার ফলে যাদের হাতে ক্ষমতা রয়েছে তারা ঘুষ নেয়, ষড়যন্ত্র করে এবং মিথ্যাচার করে। তাদের বিভিন্ন পদে দায়িত্বভার প্রদান করার পূর্বে *শ্রীমদ্ভাগবত* থেকে শিক্ষা দেওয়া উচিত কিভাবে আদর্শ প্রশাসক হতে হয়।

শ্লোক ১৯

শ্রীব্রাহ্মণা ঊচুঃ

পার্থ প্রজাবিতা সাক্ষাদিক্ষ্বাকুরিব মানবঃ ।
ব্রহ্মণ্যঃ সত্যসন্ধশ্চ রামো দাশরথির্যথা ॥ ১৯ ॥

ব্রাহ্মণাঃ—সদ্ ব্রাহ্মণেরা; **ঊচুঃ**—বললেন; **পার্থ**—হে পৃথা (কুন্তী) নন্দন যুধিষ্ঠির; **প্রজা**—যাদের জন্ম হয়েছে; **অবিতা**—রক্ষক; **সাক্ষাৎ**—সাক্ষাৎ; **ইক্ষ্বাকুঃ ইব**—মহারাজ ইক্ষ্বাকুর মতো; **মানবঃ**—মনুর পুত্র; **ব্রহ্মণ্যঃ**—ব্রাহ্মণদের অনুগামী এবং তাঁদের প্রতি শ্রদ্ধাশীল; **সত্য-সন্ধঃ**—সত্যপ্রতিজ্ঞ; **চ**—ও; **রামঃ**—ভগবান শ্রীরামচন্দ্র; **দাশরথিঃ**—মহারাজ দশরথের পুত্র; **যথা**—তাঁর মতো।

অনুবাদ

ব্রাহ্মণেরা বললেন, হে কুন্তীনন্দন যুধিষ্ঠির, এই বালক সাক্ষাৎ মনুপুত্র ইক্ষ্বাকুর মতো প্রজারক্ষক এবং দশরথনন্দন শ্রীরামচন্দ্রের মতো ব্রাহ্মণের হিতকারী ও ব্রহ্মণ্য নীতিপরায়ণ, বিশেষত সত্যপ্রতিজ্ঞ হবেন।

তাৎপর্য

প্রজা শব্দটির অর্থ হচ্ছে এই জড় জগতে যে জন্মগ্রহণ করেছে। প্রকৃতপক্ষে জীবের কোন জন্ম এবং মৃত্যু নেই, কিন্তু ভগবানের সেবা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়ার ফলে এবং জড়া প্রকৃতির উপর তার আধিপত্য করার বাসনা চরিতার্থ করার জন্য তাকে উপযুক্ত শরীর প্রদান করা হয়। তার ফলে সেই জীব প্রকৃতির নিয়মের দ্বারা বদ্ধ হয়ে যায়, এবং তার কর্ম অনুসারে তার জড় দেহ পরিবর্তিত হতে থাকে। এইভাবে জীব চুরাশি লক্ষ বিভিন্ন যোনিতে এক দেহ থেকে আর এক দেহে দেহান্তরিত হয়। কিন্তু ভগবানের বিভিন্ন অংশ হওয়ার ফলে, ভগবান কেবল তার জীবনের সমস্ত আবশ্যকতাগুলি পূর্ণ করে তাকে পালনই করেন না, অধিকন্তু তিনি স্বয়ং এবং তাঁর প্রতিনিধি রাজর্ষিদের দ্বারা তাদের রক্ষাও করেন। এই রাজর্ষিরা সমস্ত প্রজা বা জীবদের রক্ষা করেন, যাতে তারা জীবিত থাকে এবং তাদের কারাগারের মেয়াদ পূর্ণ করতে পারে। মহারাজ পরীক্ষিত ছিলেন একজন আদর্শ রাজর্ষি, কেননা তিনি যখন তাঁর রাজ্যে ভ্রমণ করছিলেন তখন তিনি দেখেন যে মূর্তিমান কলি একটি গাভীকে হত্যা করতে উদ্যত হয়েছে। তিনি তৎক্ষণাৎ কলিকে একজন হত্যাকারী সাব্যস্ত করে দণ্ডদান করেছিলেন। তা থেকে বোঝা যায় যে ঋষিসদৃশ প্রশাসকেরা পশুদের পর্যন্ত সুরক্ষা প্রদান করতেন, এবং তাঁরা তা ভাবপ্রবণতার ফলে করতেন না, পক্ষান্তরে যারা জড় জগতে জন্মগ্রহণ করেছে তাদের বেঁচে থাকার অধিকার আছে বলে। সূর্যলোকের রাজা থেকে শুরু করে এই পৃথিবীর রাজা পর্যন্ত সমস্ত রাজর্ষিরাই বৈদিক শাস্ত্রের দ্বারা অত্যন্ত প্রভাবিত ছিলেন। উচ্চতর লোকেও বৈদিক শাস্ত্রের শিক্ষা দেওয়া হয়, যার বর্ণনা *শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় (৪/১)* রয়েছে। সেখানে বলা হয়েছে যে সূর্যদেব বিবস্বানকে ভগবান সেই জ্ঞান দান করেছিলেন, এবং গুরুপরম্পরার ধারায় সেই জ্ঞান প্রবাহিত হয়। যেমন, সূর্যদেব তাঁর পুত্র মনুকে সেই জ্ঞান দান করেছিলেন এবং মনু মহারাজ ইক্ষ্বাকুকে তা দান করেছিলেন। ব্রহ্মার একদিনে চর্তুদশ মনুর আবির্ভাব হয়, এবং এখানে যে মনুর উল্লেখ করা হয়েছে তিনি হচ্ছেন সপ্তম মনু, যিনি একজন প্রজাপতি, এবং তিনি সূর্যদেবের পুত্র। তাঁর নাম বৈবস্বত মনু। তাঁর দশ পুত্র, এবং

মহারাজ ইক্ষ্বাকু তাঁদের অন্যতম। পরবর্তীকালে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার জ্ঞান মহারাজ ইক্ষ্বাকুর পরম্পরায় প্রবাহিত হয়েছে, কিন্তু কালের প্রভাবে দুষ্কৃতকারীদের দ্বারা এই পরম্পরা ছিন্ন হয়, এবং তাই ভগবানকে কুরুক্ষেত্রের রণাঙ্গনে অর্জুনকে সেই শিক্ষা দিতে হয়েছিল। অতএব সমস্ত বৈদিক শাস্ত্র জড় জগতের সৃষ্টির শুরু থেকেই বর্তমান, এবং তাই বৈদিক শাস্ত্রসমূহ অপৌরুষেয় নামে পরিচিত, যার অর্থ হচ্ছে যে তা কোন মনুষ্য কর্তৃক রচিত নয়। বৈদিক জ্ঞান ভগবান সর্বপ্রথমে এই ব্রহ্মাণ্ডের প্রথম সৃষ্ট জীব ব্রহ্মাকে শুনিয়েছিলেন।

মহারাজ ইক্ষ্বাকু ঃ বৈবস্বত মনুর পুত্রদের অন্যতম। তাঁর একশত পুত্র ছিল। তিনি আমিষাহার নিষিদ্ধ করেছিলেন। তাঁর পুত্র শশাদ তাঁর মৃত্যুর পর রাজা হন।

মনু ঃ এই শ্লোকে ইক্ষ্বাকুর পিতারূপে যে মনুর উল্লেখ করা হয়েছে তিনি হচ্ছেন সূর্যদেব বিবস্বানের পুত্র বৈবস্বত মনু নামক সপ্তম মনু। অর্জুনকে *শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা* শিক্ষা দেওয়ার পূর্বে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সেই শিক্ষা দান করেন সূর্যদেব বিবস্বানকে, যাঁর কাছে মনু এই জ্ঞান প্রাপ্ত হয়েছিলেন। মানব জাতি হচ্ছে মনুর বংশধর। এই বৈবস্বত মনুর ইক্ষ্বাকু, নভগ, ধৃষ্ট, শর্যাতি, নরিষ্যন্ত, নাভাগ, দিষ্ট, করূষ, পৃষধ্র এবং বসুমান নামক দশটি পুত্র ছিল। বৈবস্বত মনুর রাজত্বকালের শুরুতে ভগবান মৎস্যরূপে অবতরণ করেছিলেন। তিনি *শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার* তত্ত্ব সম্বন্ধীয় শিক্ষা তাঁর পিতা সূর্যদেব বিবস্বানের কাছে লাভ করে সেই জ্ঞান তাঁর পুত্র মহারাজ ইক্ষ্বাকুকে দান করেন। ত্রেতা যুগের শুরুতে সূর্যদেব মনুকে ভগবদ্ভক্তি সম্বন্ধে উপদেশ দান করেন, এবং সমগ্র মানব জাতির কল্যাণের জন্য মনু সেই জ্ঞান ইক্ষ্বাকুকে দান করেন।

শ্রীরামচন্দ্র ঃ পরমেশ্বর ভগবান তাঁর শুদ্ধ ভক্ত অযোধ্যার রাজা মহারাজ দশরথের পুত্র শ্রীরামচন্দ্ররূপে অবতরণ করেছিলেন। শ্রীরামচন্দ্র তাঁর অংশপ্রকাশসহ অবতরণ করেছিলেন, এবং সেই অংশপ্রকাশসমূহ তাঁর কনিষ্ঠ ভ্রাতারূপে আবির্ভূত হয়েছিলেন। ভগবান ত্রেতাযুগে চৈত্র মাসের শুক্ল পক্ষে নবমী তিথিতে ধর্ম সংস্থাপন করার জন্য এবং দুষ্কৃতকারীদের সংহার করার জন্য অবতীর্ণ হয়েছিলেন। তিনি বালক অবস্থাতেই সুবাহু এবং মারীচ নামক রাক্ষসীকে সংহার করে মহর্ষি বিশ্বামিত্রকে সাহায্য করেছিলেন, কেননা তারা ঋষিদের দৈনন্দিন কর্তব্য সম্পাদনে উৎপাত সৃষ্টি করছিল। জনসাধারণের মঙ্গলের জন্য ব্রাহ্মণ এবং ক্ষত্রিয়ের পারস্পরিক সহযোগিতা করা কর্তব্য। ব্রাহ্মণ ঋষিরা পূর্ণ জ্ঞান প্রদান করার মাধ্যমে মানুষকে জ্ঞানের আলোকে উদ্ভাসিত করার প্রয়াস করেন, এবং ক্ষত্রিয়ের কর্তব্য হচ্ছে তাদের রক্ষা করা। ভগবান শ্রীরামচন্দ্র মানুষের সর্বশ্রেষ্ঠ সংস্কৃতি, যাকে

ব্রহ্মণ্য ধর্ম বলা হয়, তার পালন এবং সংরক্ষণের জন্য একজন আদর্শ রাজা ছিলেন। তিনি বিশেষভাবে গাভী এবং ব্রাহ্মণদের রক্ষক ছিলেন, তার ফলে তিনি জগতের সমৃদ্ধি বৃদ্ধি করেছিলেন। তিনি বিশ্বামিত্রের মাধ্যমে অসুরদের জয় করার জন্য দেবতাদের অস্ত্রশস্ত্র প্রদান করেছিলেন। মহারাজ জনকের ধনুর্যজ্ঞে তিনি উপস্থিত ছিলেন, এবং অজেয় হরধনু ভঙ্গ করে তিনি মহারাজ জনকের কন্যা সীতাদেবীকে বিবাহ করেছিলেন।

তাঁর বিবাহের পর তিনি তাঁর পিতা মহারাজ দশরথের আদেশে চতুর্দশ বর্ষব্যাপী বনবাস স্বীকার করেছিলেন। দেবতাদের শাসনব্যবস্থায় সাহায্য করার জন্য তিনি চৌদ্দ হাজার অসুর সংহার করেছিলেন, এবং অসুরদের প্ররোচনায় রাবণ তাঁর পত্নী সীতাদেবীকে অপহরণ করেছিল। তিনি সুগ্রীবের সঙ্গে সখ্য স্থাপন করেন, এবং তাঁর সহায়তায় সুগ্রীব তাঁর ভ্রাতা বালিকে বধ করেন। শ্রীরামচন্দ্রের সহায়তায় সুগ্রীব বানরদের রাজা হন। ভগবান তারপর সীতাকে অপহরণকারী রাবণের রাজ্য লঙ্কায় যাওয়ার জন্য ভারত মহাসাগরের উপর পাথর নিয়ে একটি ভাসমান সেতু নির্মাণ করেন। রাবণকে সংহার করে তাঁর ভ্রাতা বিভীষণকে লঙ্কার সিংহাসনে অধিষ্ঠিত করেন। বিভীষণ ছিলেন রাক্ষস রাবণের ভ্রাতা, কিন্তু শ্রীরামচন্দ্র তাঁকে অমরত্ব লাভের বর প্রদান করেন। চতুর্দশ বৎসর অতিবাহিত হওয়ার পর, লঙ্কার সমস্ত কার্য সম্পন্ন করে তিনি পুষ্পক বিমানে তাঁর রাজ্য অযোধ্যায় প্রত্যাবর্তন করেন। তিনি তাঁর ভ্রাতা শত্রুঘ্নকে আদেশ দিয়েছিলেন মথুরায় রাজ্যশাসনকারী লবণাসুরকে আক্রমণ করতে, এবং শত্রুঘ্ন সেই অসুরটিকে সংহার করেছিলেন। তিনি দশটি অশ্বমেধ যজ্ঞ অনুষ্ঠান করেন, এবং তারপর একদিন সরযূ নদীতে স্নান করার সময় অন্তর্হিত হয়ে তিনি তাঁর লীলা সংবরণ করেন। রামায়ণ নামক মহাকাব্য হচ্ছে এই পৃথিবীতে ভগবান শ্রীরামচন্দ্রের কার্যকলাপের ইতিহাস। প্রামাণিক রামায়ণ মহাকবি বাল্মীকির দ্বারা রচিত।

শ্লোক ২০

এষ দাতা শরণ্যশ্চ যথা হ্যৌশীনরঃ শিবিঃ ।
যশো বিতনিতা স্বানাং দৌষ্মন্তিরিব যজ্বনাম্ ॥ ২০ ॥

এষঃ—এই শিশু; **দাতা**—দানশীল; **শরণ্যঃ**—শরণাগতের পালক ; **চ**—এবং; **যথা**—যেমন; **হি**—অবশ্যই; **ঔশীনরঃ**—উশীনর নামক দেশ; **শিবিঃ**—শিবি রাজা; **যশঃ**—কীর্তি; **বিতনিতা**—বিস্তারকারী; **স্বানাম্**—আত্মীয়-স্বজনদের; **দৌষ্মন্তিঃ ইব**—দুষ্মন্তের পুত্র ভরতের মতো; **যজ্বনাম্**—যাজ্ঞিকদের।

অনুবাদ

এই শিশুটি উশীনর রাজ্যের রাজা যশস্বী শিবির মতো বদান্য দাতা ও শরণাগতের পালক হবেন, ও মহারাজা দুষ্যন্তের পুত্র ভরতের মতো জ্ঞাতিবর্গ ও যাজ্ঞিকসহ তাঁর বংশের যশ বিস্তার করবেন।

তাৎপর্য

রাজা তাঁর দান, যজ্ঞানুষ্ঠান, শরণাগতের রক্ষা ইত্যাদি কর্মের দ্বারা বিখ্যাত হন। ক্ষত্রিয় রাজা শরণাগতকে সুরক্ষা প্রদান করে গর্ববোধ করেন। রাজার এই মনোভাবকে বলা হয় *ঈশ্বরভাব*, অর্থাৎ সৎ উদ্দেশ্যে সুরক্ষা প্রদান করার শক্তি। *শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায়* ভগবান জীবদের উপদেশ দিয়েছেন তাঁর শরণাগত হওয়ার, এবং তিনি প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন যে, তা হলে তিনি তাদের সর্বতোভাবে রক্ষা করবেন। ভগবান সর্বশক্তিমান এবং তাঁর বাণী অভ্রান্ত। তাই তিনি কখনও তাঁর ভক্তদের সুরক্ষা প্রদানে অবহেলা করেন না। ভগবানের প্রতিনিধি হওয়ার ফলে রাজারও সমস্ত বিপদের ঝুঁকি নিয়ে শরণাগত আত্মাদের রক্ষা করার এই গুণটি অর্জন করা অবশ্য কর্তব্য। উশীনরের রাজা মহারাজ শিবি মহারাজ যযাতির ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলেন। মহারাজ যযাতি মহারাজ শিবিসহ স্বর্গে যেতে সমর্থ হয়েছিলেন। মহারাজ শিবি জানতেন যে তাঁর মৃত্যুর পর তিনি স্বর্গলোকে যাবেন। এই স্বর্গলোকের বর্ণনা মহাভারতে (আদি পর্ব ৯৬/৬-৯) রয়েছে। মহারাজ শিবি এমন দানশীল ছিলেন যে তিনি স্বর্গলোকে প্রাপ্ত তাঁর স্থান যযাতিকে দিতে চেয়েছিলেন, কিন্তু যযাতি তা গ্রহণ করেননি। যযাতি অষ্টক আদি অন্যান্য মহর্ষিদের সঙ্গে স্বর্গলোকে গিয়েছিলেন। তাঁরা যখন স্বর্গ অভিমুখে গমন করছিলেন, তখন ঋষিদের প্রশ্নের উত্তরে যযাতি শিবির পুণ্যকর্মের বর্ণনা করেন। তিনি বলেন যে শিবি যমরাজের সভায় তাঁর পার্ষদত্ব প্রাপ্ত হয়েছেন, যাঁকে তিনি তাঁর আরাধ্য দেবতারূপে বরণ করেছেন। *শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায়* প্রতিপন্ন হয়েছে যে দেবতাদের পূজকেরা দেবলোকে গমন করেন (*যান্তি দেবব্রতা দেবান্*); তাই মহারাজ শিবি বৈষ্ণব মহাজন যমরাজের বিশেষ লোকে তাঁর পার্ষদত্ব প্রাপ্ত হন। তিনি যখন পৃথিবীতে ছিলেন, তখন তিনি শরণাগতের রক্ষক এবং দানবীররূপে বিখ্যাত হয়েছিলেন। এক সময় দেবরাজ ইন্দ্র একটি বাজপক্ষীর রূপ ধারণ করেন এবং অগ্নিদেব একটি কপোতের রূপ ধারণ করেন। বাজপক্ষীর দ্বারা আক্রান্ত হয়ে কপোতটি মহারাজ শিবির কোলে এসে আশ্রয় গ্রহণ করে। বাজপক্ষীটি তখন রাজাকে এসে বলে যে তিনি যেন সেই কপোতটিকে তাঁকে ফিরিয়ে দেন। রাজা তখন তাঁকে অনুরোধ

করেন যে সে যেন কপোতটির পরিবর্তে অন্য কোন মাংস আহারের জন্য গ্রহণ করে, এবং কপোতটিকে হত্যা না করে। বাজপক্ষীটি রাজার সেই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে, কিন্তু অবশেষে সম্মত হয় যে যদি রাজা নিজে তাঁর শরীর থেকে কপোতটির দেহের ওজনের সমান মাংস কেটে দেন, তা হলে সে তা গ্রহণ করতে প্রস্তুত। রাজা একটি মানদণ্ডে কপোতটির দেহের সমান ওজনের মাংস তাঁর দেহ থেকে কেটে রাখতে শুরু করেন, কিন্তু সেই রহস্যময় কপোতটি সর্বদাই ভারী থেকে যায়। তখন রাজা স্বয়ং সেই মানদণ্ডে ওঠেন, এবং দেখা যায় যে মানদণ্ডের দুই পক্ষের ওজন সমান হয়েছে। এইভাবে মহারাজ শিবি শরণার্থীকে রক্ষা করার জন্য নিজেকে পর্যন্ত উৎসর্গ করতে প্রস্তুত ছিলেন। তার ফলে দেবতারা তাঁর প্রতি অত্যন্ত প্রসন্ন হন। তখন দেবরাজ ইন্দ্র এবং অগ্নিদেব তাদের পরিচয় প্রকাশ করেন, এবং রাজাকে আশীর্বাদ করেন। দেবর্ষি নারদও মহারাজ শিবির মহিমামণ্ডিত কার্যকলাপের প্রশংসা করেছেন, বিশেষ করে তাঁর দান এবং শরণাগতের রক্ষার কার্যকলাপ। মহারাজ শিবি তাঁর রাজ্যের সমস্ত মানুষদের সন্তুষ্টি বিধানের জন্য তাঁর পুত্রকে বলি দিয়েছিলেন। এইভাবে শিশু পরীক্ষিতের সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছিল যে দান এবং শরণাগতের রক্ষার ব্যাপারে তিনি দ্বিতীয় শিবি হবেন।

দৌষ্মন্তি ভরত ঃ ইতিহাসে অনেক ভরতের উল্লেখ রয়েছে, তাঁদের মধ্যে রামচন্দ্রের ভ্রাতা ভরত, ঋষভদেবের পুত্র ভরত এবং মহারাজ দুষ্মন্তের পুত্র ভরত অত্যন্ত বিখ্যাত। এই সমস্ত ভরতেরাই বিশ্বের ইতিহাসে প্রসিদ্ধ। ঋষভদেবের পুত্র মহারাজ ভরতের নাম অনুসারে পৃথিবী ভারতবর্ষ নামে পরিচিত, কিন্তু অন্য অনেকের মতে দুষ্মন্তের পুত্র ভরতের রাজা ছিল বলে এই স্থান ভারতবর্ষ নামে পরিচিত। কিন্তু আমাদের সিদ্ধান্ত, ঋষভদেবের পুত্র ভরতের নাম অনুসারেই এদেশের নাম ভারতবর্ষ হয়েছে। তার পূর্বে এই স্থানটির নাম ছিল ইলাবৃতবর্ষ, কিন্তু ঋষভদেবের পুত্র ভরতের রাজ্যাভিষেকের পর এই স্থান ভারতবর্ষ নামে বিখ্যাত হয়।

কিন্তু তা হলেও মহারাজ দুষ্মন্তের পুত্র ভরতের গুরুত্ব কোন অংশে কম ছিল না। তিনি ছিলেন বিখ্যাত সুন্দরী শকুন্তলার পুত্র। মহারাজ দুষ্মন্ত অরণ্যে শকুন্তলার প্রতি প্রণয়াসক্ত হন, এবং তার ফলে ভরতের জন্ম হয়। তারপর দুর্বাসা মুনির অভিশাপে মহারাজ দুষ্মন্ত তাঁর পত্নী শকুন্তলাকে ভুলে যান, এবং শিশু ভরতকে তাঁর মা সেই অরণ্যে লালন-পালন করেন। তাঁর বাল্যাবস্থাতেই তিনি এত শক্তিশালী ছিলেন যে শিশুরা যেমন কুকুর-বিড়ালের সঙ্গে খেলা করে, ঠিক সেইভাবে তিনিও বনের সিংহ এবং হাতিদের সঙ্গে লড়াই করতেন। শিশুটি এত

শক্তিশালী ছিল যে বনের ঋষিরা তাঁকে সর্বদমন নাম দিয়েছিলেন, অর্থাৎ যিনি সকলকে দমন করতে সক্ষম। মহারাজ ভরতের পূর্ণ বর্ণনা মহাভারতে আদি-পর্বে দেওয়া হয়েছে। মহারাজ দুষ্মন্তের পুত্র বিখ্যাত মহারাজ ভরতের বংশে জন্মগ্রহণ করার ফলে পাণ্ডবদের বা কুরুদেরও কখনও কখনও ভারত বলে সম্বোধন করা হয়।

শ্লোক ২১

ধন্বিনামগ্রণীরেষ তুল্যশ্চার্জুনয়োর্দ্বয়োঃ ।
হুতাশ ইব দুর্ধর্ষঃ সমুদ্র ইব দুস্তরঃ ॥ ২১ ॥

ধন্বিনাম্—মহান ধনুর্ধারীদের মধ্যে; **অগ্রণীঃ**—শ্রেষ্ঠ; **এষঃ**—এই শিশু; **তুল্যঃ**—সমতুল্য; **চ**—এবং; **অর্জুনয়োঃ**—অর্জুনদের মধ্যে; **দ্বয়োঃ**—দুইজনের মধ্যে; **হুতাশঃ**—অগ্নি; **ইব**—মতো; **দুর্ধর্ষঃ**—দুর্বার; **সমুদ্রঃ**—সমুদ্র; **ইব**—মতো; **দুস্তরঃ**—দুরতিক্রম্য।

অনুবাদ

ধনুর্ধারীদের মধ্যে এই শিশু অর্জুনের মতো শ্রেষ্ঠ হবেন। তিনি অগ্নির মতো দুর্ধর্ষ এবং সমুদ্রের মতো দুস্তর হবেন।

তাৎপর্য

ইতিহাসে দুজন অর্জুন রয়েছেন। একজন কার্তবীর্য অর্জুন, যিনি ছিলেন হৈহয়ের রাজা এবং অপরজন এই শিশুটির পিতামহ। উভয় অর্জুনই ধনুর্বিদ্যায় তাঁদের পারদর্শিতার জন্য প্রসিদ্ধ ছিলেন, এবং শিশু পরীক্ষিতের সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছিল যে তিনি তাঁদের দুজনেরই সমকক্ষ হবেন, বিশেষ করে যুদ্ধবিদ্যায়। পাণ্ডব অর্জুনের সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নে দেওয়া হল।

পাণ্ডব অর্জুন ঃ তিনি হচ্ছেন শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার মহান নায়ক। তিনি মহারাজ পাণ্ডুর ক্ষত্রিয় পুত্র। মহারাণী কুন্তী যে কোন দেবতাকে আহ্বান করতে পারতেন, এবং এইভাবে তিনি যখন ইন্দ্রকে আহ্বান করেন তখন তাঁর দ্বারা অর্জুনের জন্ম হয়। অতএব অর্জুন হচ্ছেন দেবরাজ ইন্দ্রের পূর্ণ অংশ । যেহেতু ফাল্গুন মাসে তাঁর জন্ম হয়েছিল, তাই তিনি ফাল্গুনি নামেও পরিচিত। যখন কুন্তীর পুত্ররূপে তাঁর জন্ম হয়, তখন তাঁর ভবিষ্যৎ মহিমা ঘোষণা করে আকাশবাণী হয়েছিল।

তাঁর জন্মোৎসবে দেবতা, গন্ধর্ব, আদিত্য, রুদ্র, বসু, নাগ, মহত্বপূর্ণ ঋষিগণ, অপ্সরা আদি ব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত মহান ব্যক্তিরা যোগদান করেছিলেন। অপ্সরাগণ তাঁদের নৃত্যগীতের দ্বারা সকলকে আনন্দ দান করেছিলেন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের পিতা এবং অর্জুনের মামা বসুদেব তাঁর পুরোহিত কশ্যপকে সমস্ত সংস্কারের দ্বারা অর্জুনকে শুদ্ধ করার জন্য প্রেরণ করেছিলেন। তাঁর নামকরণ সংস্কার শতশৃঙ্গ পর্বত নিবাসী ঋষিদের উপস্থিতিতে সম্পন্ন হয়েছিল। তিনি চারজন পত্নীকে বিবাহ করেছিলেন। তাঁরা হচ্ছেন দ্রৌপদী, সুভদ্রা, চিত্রাঙ্গদা এবং উলুপী। তাঁদের মাধ্যমে তাঁর যথাক্রমে শ্রুতকীর্তি, অভিমন্যু, বভ্রুবাহন ও ইরাবান নামক চারটি পুত্র হয়েছিল।

বিদ্যার্থী জীবনে তাঁকে অন্যান্য পাণ্ডব এবং কৌরবদের সঙ্গে মহান আচার্য দ্রোণাচার্যের তত্ত্বাবধানে অধ্যয়নের জন্য রাখা হয়েছিল। অধ্যয়নের বিষয়ে তাঁর একাগ্রতার বলে তিনি সকলকে অতিক্রম করেছিলেন, এবং দ্রোণাচার্যও শিষ্যস্নেহে তাঁর প্রতি বিশেষভাবে আকৃষ্ট ছিলেন। দ্রোণাচার্য তাঁকে প্রথম শ্রেণীর শিষ্যরূপে গ্রহণ করেছিলেন এবং আন্তরিক স্নেহবশত তাঁকে সামরিক বিজ্ঞানের সমস্ত শিক্ষা বরস্বরূপ দান করেছিলেন। তিনি এতই নিষ্ঠাপরায়ণ শিক্ষার্থী ছিলেন যে তিনি রাত্রেও ধনুর্বিদ্যা অনুশীলন করতেন, এবং এই সমস্ত কারণে দ্রোণাচার্য তাঁকে পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ ধনুর্ধর করে গড়ে তুলতে কৃতসঙ্কল্প হয়েছিলেন। তিনি লক্ষ্যভেদ করে সমস্ত পরীক্ষায় অত্যন্ত সাফল্যের সঙ্গে উত্তীর্ণ হয়েছিলেন, এবং তার ফলে দ্রোণাচার্য তাঁর প্রতি অত্যন্ত প্রসন্ন হয়েছিলেন। মণিপুর এবং ত্রিপুরার রাজবংশ অর্জুনের পুত্র বভ্রুবাহনের বংশধর। অর্জুন দ্রোণাচার্যকে একটি কুমীরের আক্রমণ থেকে রক্ষা করেন, এবং তাঁর প্রতি প্রসন্ন হয়ে দ্রোণাচার্য তাঁকে *ব্রহ্মশির* নামক অস্ত্র উপহার দেন। মহারাজ দ্রুপদ দ্রোণাচার্যের প্রতি বৈরীভাবাপন্ন ছিলেন, এবং তার ফলে তিনি যখন আচার্যকে আক্রমণ করেন, তখন অর্জুন তাঁকে বন্দী করে দ্রোণাচার্যের কাছে নিয়ে আসেন। ,তিনি মহারাজ দ্রুপদের অহিচ্ছত্র নামক নগরী অবরোধ করেন এবং তা জয় করে তিনি দ্রোণাচার্যকে দান করেন। দ্রোণাচার্য অর্জুনকে *ব্রহ্মশির* অস্ত্র প্রয়োগের বিধি বিশ্লেষণ করেন, এবং দ্রোণাচার্য অর্জুনকে দিয়ে প্রতিজ্ঞা করিয়েছিলেন যে তিনি স্বয়ং যখন অর্জুনের শত্রু হবেন তখনই যেন অর্জুন তা প্রয়োগ করেন। এইভাবে আচার্য কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন যে যুদ্ধে দ্রোণাচার্য অর্জুনের বিপক্ষে অংশগ্রহণ করেছিলেন। তাঁর গুরু দ্রোণাচার্যের পক্ষ অবলম্বন করে অর্জুন যদিও মহারাজ দ্রুপদকে পরাজিত করেছিলেন, তথাপি দ্রুপদ তাঁর কন্যা দ্রৌপদীকে সেই নবীন যোদ্ধার হস্তে অর্পণ করতে মনস্থ করেছিলেন, কিন্তু দুর্যোধনের চক্রান্তে জতুগৃহে দাহ হয়ে অর্জুনের মৃত্যুর ভ্রান্ত

সংবাদ পেয়ে তিনি অত্যন্ত মর্মাহত হন। তিনি তাই দ্রৌপদীর স্বয়ংবর-সভার আয়োজন করেন, এবং ঘোষণা করেন যে যিনি ছাদ থেকে ঝোলানো একটি মাছের চক্ষু বিদ্ধ করতে সক্ষম হবেন, তিনিই দ্রৌপদীর পাণিগ্রহণ করতে পারবেন। এই কৌশলটি বিশেষভাবে অবলম্বন করা হয়েছিল, কেননা অর্জুনই কেবল সেই লক্ষ্য ভেদ করতে সক্ষম ছিলেন, এবং তাঁর বাসনা অনুসারে তাঁর সুযোগ্য কন্যাকে অর্জুনের হস্তে সমর্পণ করতে তিনি সফল হয়েছিলেন। দুর্যোধনের চক্রান্ত ব্যর্থ করে অর্জুন এবং তাঁর অন্যান্য ভাইয়েরা ব্রাহ্মণের ছদ্মবেশে দ্রৌপদীর সেই স্বয়ংবর-সভায় যোগদান করেছিলেন। সভায় উপস্থিত সমস্ত ক্ষত্রিয় রাজারা যখন দেখল যে দ্রৌপদী একজন দরিদ্র ব্রাহ্মণের গলায় বরমাল্য দান করছেন, তখন তাঁরা ঈর্ষাপরায়ণ হয়ে সমবেতভাবে অর্জুনকে আক্রমণ করে। শ্রীকৃষ্ণ তখন বলরামের কাছে অর্জুনের পরিচয় প্রকাশ করেন।

তাঁর সঙ্গে উলূপীর সাক্ষাৎ হয় হরিদ্বারে, এবং নাগলোকের সেই কন্যার প্রতি তিনি আকৃষ্ট হন। তার ফলে ইরাবানের জন্ম হয়। ঠিক তেমনই মণিপুরের রাজার কন্যা চিত্রাঙ্গদার সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ হয়, এবং তার ফলে বভ্রুবাহনের জন্ম হয়। তাঁর ভগিনী সুভদ্রাকে হরণ করার ব্যাপারে অর্জুনকে সাহায্য করার জন্য ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এক পরিকল্পনা করেন, কেননা বলদেব চেয়েছিলেন তাঁকে দুর্যোধনের হস্তে সমর্পণ করতে। যুধিষ্ঠিরও শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে একমত ছিলেন, এবং এইভাবে অর্জুন বলপূর্বক সুভদ্রাকে অপহরণ করে তাঁকে বিবাহ করেন। সুভদ্রার পুত্র ছিলেন অভিমন্যু, যাঁর মৃত্যুর পর তাঁর পুত্ররূপে পরীক্ষিৎ মহারাজের জন্ম হয়। খাণ্ডব বন দহনে অগ্নিদেবকে সাহায্য করে অর্জুন তাঁকে প্রসন্ন করেছিলেন, এবং তার ফলে অগ্নিদেব তাঁকে একটি অস্ত্র দান করেছিলেন। খাণ্ডব বন দহনের ফলে ইন্দ্র ক্রুদ্ধ হন, এবং অন্যান্য দেবতাদের সহায়তায় তিনি অর্জুনের সঙ্গে যুদ্ধ করতে শুরু করেন। তাঁরা অর্জুন কর্তৃক পরাজিত হন, এবং ইন্দ্রদেব স্বর্গরাজ্যে ফিরে যান। অর্জুন ময়াসুরকে সর্বতোভাবে রক্ষা করার প্রতিজ্ঞা করেন, এবং ময়াসুর তখন তাঁকে দেবদত্ত নামক এক মূল্যবান শঙ্খ প্রদান করেন। তেমনই তাঁর বীরত্বে প্রসন্ন হয়ে ইন্দ্রদেবও তাঁকে বহু মূল্যবান অস্ত্র দান করেছিলেন।

মহারাজ যুধিষ্ঠির যখন মগধের রাজা জরাসন্ধকে হারাতে না পেরে নিরাশ হয়েছিলেন, তখন অর্জুন মহারাজ যুধিষ্ঠিরকে নানা প্রকার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, এবং তারপর অর্জুন, ভীম ও শ্রীকৃষ্ণ জরাসন্ধকে বধ করার জন্য মগধ অভিমুখে যাত্রা করেন। পৃথিবীর সমস্ত রাজাদের যখন তিনি পাণ্ডবদের অধীনস্থ করার উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন, যা অভিষেকের পর সমস্ত রাজাদেরই করতে হত, তখন

তিনি কেলিন্দ দেশের রাজা ভগদত্তকে অধীনস্থ করেছিলেন। তারপর তিনি অন্তগিরি, উলুকপুর, মোদাপুর আদি রাজ্যে ভ্রমণ করে সেখানকার শাসকদের অধীনস্থ করেছিলেন।

কখনো কখনো তিনি কঠোর তপস্যা করেছিলেন, এবং পরে তিনি ইন্দ্র কর্তৃক পুরস্কৃত হয়েছিলেন। দেবাদিদেব মহাদেবও অর্জুনকে পরীক্ষা করতে চেয়েছিলেন, এবং একজন কিরাতরূপে তিনি অর্জুনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছিলেন। তাঁদের দুজনের মধ্যে ভীষণ যুদ্ধ হয় এবং অবশেষে মহাদেব তাঁর প্রতি প্রসন্ন হয়ে তাঁর স্বরূপ প্রকাশ করেন। অর্জুন তখন অত্যন্ত বিনীতভাবে তাঁর কাছে প্রার্থনা করেছিলেন এবং মহাদেব তাঁর প্রতি প্রসন্ন হয়ে তাঁকে পশুপাত অস্ত্র উপহার দিয়েছিলেন। তিনি অন্যান্য দেবতাদের থেকেও অনেক অস্ত্র লাভ করেছিলেন, যথা যমরাজের থেকে দণ্ডাস্ত্র, বরুণের থেকে পাশাস্ত্র, এবং স্বর্গের কোষাধ্যক্ষ কুবেরের থেকে অন্তর্ধান-অস্ত্র। ইন্দ্র চেয়েছিলেন যে তিনি যেন চন্দ্রলোকের ঊর্ধ্বে স্বর্গরাজ্য ইন্দ্রলোকে আসেন। সেই লোকের অধিবাসীরা তাঁকে আন্তরিকভাবে স্বাগত জানিয়েছিলেন, এবং ইন্দ্রদেবের স্বর্গীয় সভায় তাঁকে অভ্যর্থনা জানানো হয়েছিল। তারপর তিনি ইন্দ্রদেবের সঙ্গে মিলিত হন, যিনি কেবল তাঁকে বজ্রাস্ত্রই দান করেননি, অধিকন্তু তাঁকে তিনি স্বর্গলোকের সঙ্গীতকলা এবং সামরিক শিক্ষা দান করেন। এক অর্থে ইন্দ্র হচ্ছেন অর্জুনের প্রকৃত পিতা, এবং তাই তিনি পরোক্ষভাবে স্বর্গের বিখ্যাত সুন্দরী অপ্সরা উর্বশীর দ্বারা তাঁর মনোরঞ্জন করাতে চেয়েছিলেন। স্বর্গের অপ্সরারা অত্যন্ত কামুক, এবং উর্বশী মানুষদের মধ্যে সব চাইতে বলবান অর্জুনের সঙ্গলাভের জন্য অত্যন্ত ব্যগ্র ছিলেন। তিনি অর্জুনের কক্ষে তাঁর সঙ্গে মিলিত হয়ে তাঁর কাছে নিজের মনোবাসনা ব্যক্ত করেন, কিন্তু অর্জুন তাঁর চক্ষু মুদ্রিত করে তাঁর নিষ্কলুষ চরিত্রের পরিচয় প্রদান করেন। তিনি উর্বশীকে কুরুবংশের মাতা বলে সম্বোধন করে তাঁকে তাঁর মাতা কুন্তী, মাদ্রী এবং ইন্দ্রপত্নী শচীদেবীর স্তরে স্থাপন করেন। বিফল মনোরথ হয়ে উর্বশী অর্জুনকে অভিশাপ দিয়ে সেই স্থান ত্যাগ করেন। স্বর্গে বিখ্যাত তপস্বী লোমশ মুনির সঙ্গেও অর্জুনের সাক্ষাৎ হয় এবং তিনি মুনির কাছে মহারাজ যুধিষ্ঠিরের রক্ষার জন্য প্রার্থনা করেন।

যখন তাঁর বৈরীভাবাপন্ন জ্ঞাতিভ্রাতা দুর্যোধন গন্ধর্বদের দ্বারা বন্দী হয়, তখন তিনি তাঁকে রক্ষা করতে চেয়েছিলেন এবং গন্ধর্বদের অনুরোধ করেছিলেন যে তারা যেন তাকে ছেড়ে দেয়। কিন্তু গন্ধর্বেরা তাঁর সেই অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করে, এবং তিনি তখন তাদের সঙ্গে যুদ্ধ করে দুর্যোধনকে মুক্ত করেন। পাণ্ডবদের

অজ্ঞাতবাসের সময় বৃহন্নলা নাম ধারণ করে তিনি এক নপুংসক রূপে তাঁর ভাবী পুত্রবধূ উত্তরার নৃত্য ও সঙ্গীত-শিক্ষকরূপে নিযুক্ত হয়েছিলেন। বৃহন্নলারূপে তিনি বিরাটরাজের পুত্র উত্তরের পক্ষে যুদ্ধ করে কুরুদের পরাজিত করেন। তাঁর অস্ত্রগুলি তিনি একটি সোমি বৃক্ষে লুকিয়ে রেখেছিলেন, এবং তিনি উত্তরকে আদেশ দেন সেগুলি নিয়ে আসার জন্য। পরবর্তীকালে তাঁর এবং তাঁর ভ্রাতাদের পরিচয় উত্তরের কাছে প্রকাশ পেয়ে যায়। কুরু এবং বিরাটদের মধ্যে যুদ্ধে অর্জুনের উপস্থিতির কথা দ্রোণাচার্যকে জানানো হয়। পরে অর্জুন কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে কর্ণ এবং অন্যান্য বহু মহান সেনাপতিদের বধ করেছিলেন। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের পর দ্রৌপদীর পঞ্চপুত্রকে হত্যাকারী অশ্বত্থামাকে তিনি দণ্ডদান করেছিলেন। তারপর সমস্ত ভাইয়েরা ভীষ্মদেবের কাছে গিয়েছিলেন।

অর্জুনের জন্যই কুরুক্ষেত্রের রণাঙ্গনে ভগবান *শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার* মহান দর্শন পুনরায় উপদেশ দিয়েছিলেন। কুরুক্ষেত্রের রণাঙ্গনে তাঁর আশ্চর্যজনক কার্যকলাপ মহাভারতে বিশদভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। কিন্তু মণিপুরে তাঁর পুত্র বভ্রুবাহনের সঙ্গে যুদ্ধে তিনি আহত হয়ে অচেতন হয়ে পড়েন এবং উলূপী তখন তাঁকে রক্ষা করেন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের তিরোধানের সংবাদ অর্জুন মহারাজ যুধিষ্ঠিরকে দিয়েছিলেন। পুনরায় অর্জুন দ্বারকায় গিয়েছিলেন, এবং শ্রীকৃষ্ণের বিধবা পত্নীরা তাঁর সমক্ষে বিলাপ করেছিলেন। তিনি তাঁদের সকলকে বসুদেবের কাছে নিয়ে গিয়েছিলেন এবং সান্ত্বনা দিয়েছিলেন। পরে বসুদেব যখন পরলোক গমন করেন, তখন শ্রীকৃষ্ণের অনুপস্থিতিতে তিনি তাঁর অন্ত্যেষ্টি-ক্রিয়া সম্পাদন করেছিলেন। অর্জুন যখন শ্রীকৃষ্ণের পত্নীদের ইন্দ্রপ্রস্থে নিয়ে যাচ্ছিলেন, তখন তিনি আক্রান্ত হন এবং সেই রমণীদের রক্ষা করতে অক্ষম হন। অবশেষে ব্যাসদেবের উপদেশে তিনি তাঁর ভাইদের সঙ্গে মহাপ্রস্থান করেন। পথে তাঁর জ্যেষ্ঠভ্রাতার অনুরোধে তিনি তাঁর সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ অস্ত্রশস্ত্র তুচ্ছ বলে মনে করে জলে ফেলে দেন।

শ্লোক ২২

মৃগেন্দ্র ইব বিক্রান্তো নিষেব্যো হিমবানিব ।
তিতিক্ষুর্বসুধেবাসৌ সহিষ্ণুঃ পিতরাবিব ॥ ২২ ॥

মৃগেন্দ্রঃ—সিংহ; **ইব**—মতো; **বিক্রান্তঃ**—পরাক্রমশালী; **নিষেব্যঃ**—আশ্রয়; **হিমবান্**—হিমালয় পর্বত; **ইব**—মতো; **তিতিক্ষুঃ**—ধৈর্যশীল; **বসুধা ইব**—পৃথিবীর মতো; **অসৌ**—এই শিশু; **সহিষ্ণুঃ**—সহনশীল; **পিতরৌ**—পিতামাতা; **ইব**—মতো।

অনুবাদ

এই শিশুটি সিংহের মতো বিক্রমশালী, হিমালয়ের মতো সুমহান আশ্রয়, ধরিত্রীর মতো ধৈর্যশীল এবং তাঁর পিতামাতার মতোই সহনশীল হবেন।

তাৎপর্য

শত্রুর পশ্চাদ্ধাবনে যখন কেউ অত্যন্ত বিক্রমশালী হন, তখন তাঁকে সিংহের সঙ্গে তুলনা করা হয়। মানুষকে গৃহে মেষশাবকের মতো নিরীহ হওয়া উচিত, কিন্তু শত্রুর পশ্চাদ্ধাবনের সময় সিংহের মতো হওয়া উচিত। সিংহ যখন কোন পশুর পশ্চাদ্ধাবন করে, তখন সে কখনো অকৃতকার্য হয় না; তেমনই রাষ্ট্রপ্রধানদের কখনো শত্রুর পশ্চাদ্ধাবনে অকৃতকার্য হওয়া উচিত নয়। হিমালয় পর্বত তার সমৃদ্ধির জন্য বিখ্যাত। সেখানে বাস করার জন্য অসংখ্য গুহা রয়েছে, আহারের জন্য সুমিষ্ট ফল সমন্বিত অসংখ্য বৃক্ষ রয়েছে, পানের জন্য সুমিষ্ট জল সমন্বিত ঝরণা রয়েছে, এবং রোগ নিরাময়ের জন্য অপর্যাপ্ত ওষধি এবং খনিজ পদার্থ রয়েছে। জড়জাগতিক বিচারে যারা অভাবগ্রস্ত, তারা এই মহান পর্বতের আশ্রয় গ্রহণ করতে পারে, এবং তা হলে তাদের সমস্ত অভাব মোচন হবে। জড়বাদী এবং অধ্যাত্মবাদী উভয়েই এই মহান হিমালয় পর্বতের শরণ গ্রহণ করতে পারে। পৃথিবীপৃষ্ঠে পৃথিবীর অধিবাসীরা নানা রকম উৎপাত সৃষ্টি করে। আধুনিক যুগে মানুষ পৃথিবীপৃষ্ঠে আণবিক অস্ত্রের বিস্ফোরণ করতে শুরু করেছে, কিন্তু তা সত্ত্বেও পৃথিবী মানুষদের সমস্ত উৎপাত সহ্য করছেন, ঠিক যেমন জননী তাঁর শিশুসন্তানের সমস্ত উৎপাত সহ্য করেন। পিতামাতা তাঁদের শিশুসন্তানদের দুষ্টুমি সর্বদা সহ্য করেন। আদর্শ রাজার মধ্যে এই সমস্ত সদ্‌গুণগুলি থাকা উচিত, এবং শিশু পরীক্ষিৎ সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী করতে গিয়ে বলা হয়েছিল যে এই সমস্ত সদ্‌গুণগুলি তাঁর মধ্যে পূর্ণরূপে প্রকাশিত হবে।

শ্লোক ২৩

পিতামহসমঃ সাম্যে প্রসাদে গিরিশোপমঃ ।
আশ্রয়ঃ সর্বভূতানাং যথা দেবো রমাশ্রয়ঃ ॥ ২৩ ॥

পিতামহ—পিতামহ বা ব্রহ্মা; **সমঃ**—তুল্য; **সাম্যে**—সাম্যতায়; **প্রসাদে**—দানে বা বদান্যতায় ; **গিরিশ**—শিব; **উপমঃ**—সমতুল্য; **আশ্রয়ঃ**—আশ্রয়; **সর্ব**—সমস্ত; **ভূতানাম্**—জীবদের; **যথা**—যেমন; **দেবঃ**—পরমেশ্বর ভগবান; **রমা-আশ্রয়**—পরমেশ্বর ভগবান শ্রীহরি, যিনি লক্ষ্মীদেবীর আশ্রয়।

অনুবাদ

এই শিশুটি মানসিক সাম্যতায় তাঁর পিতামহ যুধিষ্ঠির অথবা ব্রহ্মার সমতুল্য হবেন, কৈলাস পর্বতের অধিপতি শিবের মতো তিনি মহাবদান্য হবেন এবং লক্ষ্মীদেবীরও আশ্রয়স্থল পরমেশ্বর ভগবান শ্রীনারায়ণের মতোই তিনি প্রত্যেকের আশ্রয় হবেন।

তাৎপর্য

মহারাজ যুধিষ্ঠির এবং জীবসমূহের পিতামহ ব্রহ্মা উভয়েই তাঁদের মনের সাম্যতার জন্য আদর্শ। শ্রীধর স্বামীর মতে এখানে পিতামহ বলতে ব্রহ্মাকে ইঙ্গিত করা হয়েছে, কিন্তু শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুরের মতে পিতামহ হচ্ছেন মহারাজ যুধিষ্ঠির স্বয়ং। এই দুটি দৃষ্টান্তই সমান উত্তম, কেননা উভয়েই পরমেশ্বর ভগবানের প্রতিনিধি বলে স্বীকৃত এবং তাই জীবের কল্যাণে যুক্ত হওয়ার ফলে তাঁদের উভয়কেই মানসিক সাম্যতা বজায় রাখতে হয়। শাসন-ব্যবস্থায় সর্বোচ্চ দায়িত্বসম্পন্ন ব্যক্তিকে যাদের জন্য তিনি কার্য করে থাকেন তাদেরই কাছ থেকে নানা প্রকার সমালোচনা এবং আঘাত সহ্য করতে হয়। ভগবানের সর্বশ্রেষ্ঠ ভক্ত গোপীরা পর্যন্ত ব্রহ্মার সমালোচনা করেছিলেন। গোপিকারা ব্রহ্মাজীর কার্যে অসন্তুষ্ট হয়েছিলেন, কেননা এই বিশেষ ব্রহ্মাণ্ডে সৃষ্টিকর্তারূপে তিনি তাঁদের চোখের পলক সৃষ্টি করেছিলেন, যার ফলে তাঁরা শ্রীকৃষ্ণের দর্শনে বাধাপ্রাপ্ত হয়েছিলেন। তাঁরা এক পলকের জন্যও তাঁদের প্রিয়তম শ্রীকৃষ্ণের অদর্শন সহ্য করতে পারেননি। আর দায়িত্বশীল ব্যক্তিদের সমস্ত কার্যেই যাদের সমালোচনা করা স্বভাব, তাদের সম্বন্ধে আর কি বলার আছে? তেমনই মহারাজ যুধিষ্ঠিরকে তাঁর শত্রুদের দ্বারা সৃষ্ট বহু কষ্টদায়ক পরিস্থিতি অতিক্রম করতে হয়েছিল, এবং সমস্ত পরিস্থিতিতেই তিনি তাঁর মানসিক সাম্যতা পূর্ণরূপে বজায় রেখেছিলেন। তাই মানসিক সাম্যতার ব্যাপারে উভয় পিতামহের দৃষ্টান্তই উপযুক্ত হয়েছে।

দেবাদিদেব মহাদেব যাচকদের ঈপ্সিত বরদানের জন্য বিখ্যাত। তাই তাঁর আর এক নাম আশুতোষ, অর্থাৎ যিনি অতি সহজেই সন্তুষ্ট হন। তাঁকে ভূতনাথও বলা হয়, অর্থাৎ তিনি হচ্ছেন সাধারণ মানুষের প্রভু, যারা তাঁর প্রতি প্রধানত তাঁর উদার দানের জন্যই আকৃষ্ট। মহাদেব ফলাফলের বিবেচনা না করেই বর দান করেন। রাবণ মহাদেবের প্রতি অত্যন্ত আসক্ত ছিল, এবং অনায়াসে তাঁকে সন্তুষ্ট করে রাবণ এত শক্তিশালী হয়ে উঠেছিল যে সে ভগবান শ্রীরামচন্দ্রের বিরোধিতা পর্যন্ত করেছিল। অবশ্য রাবণ যখন দেবাদিদেব মহাদেবের প্রভু, পরমেশ্বর ভগবান শ্রীরামচন্দ্রের সঙ্গে যুদ্ধ করেছিল, তখন মহাদেব তাকে সাহায্য করেননি। মহাদেব

বৃকাসুরকে এমন একটি বর দান করেছিলেন যা কেবল বিপজ্জনকই ছিল না, তা ছিল অত্যন্ত উৎপাতজনকও। মহাদেবের কৃপায় বৃকাসুর এমন শক্তি লাভ করেছিল যে সে কারো মাথায় হাত দিয়ে স্পর্শ করলেই ব্যক্তিটি তৎক্ষণাৎ ভস্ম হয়ে যেত। যদিও মহাদেব তাকে এই বরটি দেন, তথাপি সেই চতুর অসুর মহাদেবের মস্তক স্পর্শ করে তার সেই শক্তির পরীক্ষা করে দেখতে চেয়েছিল। সেই বিপদ থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য তখন মহাদেবকে শ্রীবিষ্ণুর শরণাগত হতে হয়, এবং শ্রীবিষ্ণু তাঁর মায়াশক্তির দ্বারা বৃকাসুরকে বিমোহিত করে তার নিজের মস্তক স্পর্শপূর্বক তা পরীক্ষা করে দেখতে বলেছিলেন। সে তা করেছিল এবং তৎক্ষণাৎ বিনাশপ্রাপ্ত হয়েছিল। এইভাবে দেবতাদের কাছে বরপ্রার্থী এক চতুর যাচকের উপদ্রব থেকে পৃথিবী রক্ষা পেয়েছিল। আসল কথা হচ্ছে যে শিব কখনও কাউকে বরদান করতে অস্বীকার করেন না। তাই তিনি হচ্ছেন সব চাইতে উদার, যদিও তার ফলে কখনো কখনো তিনি ভুলও করে থাকেন।

রমা মানে হচ্ছে লক্ষ্মীদেবী। আর তাঁর আশ্রয় হচ্ছেন ভগবান শ্রীবিষ্ণু। ভগবান বিষ্ণু সমস্ত জীবের পালক। অসংখ্য জীব রয়েছে, কেবল এই পৃথিবীপৃষ্ঠেই নয়, অন্যান্য শত-সহস্র লোকেও। আত্মজ্ঞান লাভের পথে অগ্রসর হওয়ার জন্য তাদের সমস্ত সুযোগ-সুবিধা প্রদান করা হয়। কিন্তু তারা যদি ইন্দ্রিয়-তৃপ্তি সাধনের পথে চলতে চায়, তা হলে তাদের নানা রকম দুঃখ-দুর্দশার সম্মুখীন হতে হয়। এই সমস্ত দুঃখ-দুর্দশার সৃষ্টি করেন ভগবানের মায়াশক্তি, এবং তখন তারা অর্থনৈতিক উন্নতি সাধনের ভ্রান্ত পরিকল্পনার মার্গে বিচরণ করে। এই সমস্ত অর্থনৈতিক উন্নতি কখনই সফল হয় না, কেননা তা মায়িক। এই সমস্ত মানুষেরা সর্বদাই মায়ালক্ষ্মীর কৃপার প্রত্যাশী, কিন্তু তারা জানে না যে, লক্ষ্মীদেবী কেবল বিষ্ণুর আশ্রয়েই থাকেন। বিষ্ণু ব্যতীত লক্ষ্মীদেবী হচ্ছেন মায়া। তাই সরাসরিভাবে লক্ষ্মীদেবীর কৃপার প্রত্যাশা না করে কেবল বিষ্ণুর আশ্রয় গ্রহণ করাই উচিত। শ্রীবিষ্ণু এবং বৈষ্ণবেরাই কেবল সকলকে আশ্রয় প্রদান করতে পারেন; এবং যেহেতু ভগবান শ্রীবিষ্ণু মহারাজ পরীক্ষিতকে রক্ষা করেছিলেন, তাই যারা তাঁর শাসনের অধীনে থাকতে চেয়েছিল তাদের সর্বতোভাবে রক্ষা করা তাঁর পক্ষে সম্ভব ছিল।

শ্লোক ২৪

সর্বসদ্‌গুণমাহাত্ম্যে এষ কৃষ্ণমনুব্রতঃ ।
রন্তিদেব ইবোদারো যযাতিরিব ধার্মিকঃ ॥ ২৪ ॥

সর্ব-সৎ-গুণ-মাহাত্ম্যো—সমস্ত দিব্য গুণের দ্বারা যিনি মহিমান্বিত; **এষঃ**—এই শিশু; **কৃষ্ণম্**—শ্রীকৃষ্ণের মতো; **অনুব্রতঃ**—তাঁর পদাঙ্ক অনুসরণকারী; **রন্তিদেব**—রন্তিদেব; **ইব**—মতো; **উদারঃ**—ঔদার্য; **যযাতিঃ**—যযাতি; **ইব**—মতো; **ধার্মিকঃ**—ধর্মপরায়ণ।

অনুবাদ

এই শিশুটি শ্রীকৃষ্ণের পদাঙ্ক অনুসরণ করে সমস্ত দিব্যগুণজনিত মহিমায় তাঁরই মতো হবেন। তিনি উদারতায় মহারাজ রন্তিদেব এবং ধর্মযাজনে মহারাজ যযাতির মতো হবেন।

তাৎপর্য

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণের অন্তিম উপদেশ হচ্ছে যে, সকলে যেন তাদের সমস্ত তথাকথিত ধর্ম পরিত্যাগ করে কেবল তাঁরই শরণাগত হয়। দুর্ভাগ্যবশত অল্পবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষেরা ভগবানের এই মহান উপদেশ গ্রহণ করতে চায় না। কিন্তু যারা প্রকৃত বুদ্ধিমান, তারা এই অনুপম উপদেশটি গ্রহণ করে অসীম সৌভাগ্য লাভ করে। মূর্খ মানুষেরা জানে না যে, সঙ্গের মাধ্যমে গুণ অর্জন হয়। জড়জাগতিক বিচারে আমরা দেখতে পাই যে অগ্নির সান্নিধ্যে আসার ফলে যে কোন বস্তু উত্তপ্ত হয়। তেমনই পরমেশ্বর ভগবানের সঙ্গ প্রভাবে মানুষ ভগবানেরই মতো গুণান্বিত হয়ে ওঠে। পূর্বে আমরা আলোচনা করেছি যে ভগবানের ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যের ফলে জীব ভগবানের গুণাবলীর শতকরা আটাত্তর ভাগ অর্জন করতে পারে। ভগবানের নির্দেশ পালন করার অর্থ হচ্ছে ভগবানের সঙ্গ করা। ভগবান কোন জড় বস্তু নন, যাঁর উপস্থিতি এই সঙ্গ করার জন্য আবশ্যক। ভগবান সর্বত্র সর্বদা বিরাজমান। কেবল তাঁর আদেশ পালন করার মাধ্যমেই তাঁর সঙ্গ করা সম্ভব, কেননা তিনি পরম তত্ত্ব হওয়ার ফলে তাঁর উপদেশ, তাঁর নাম, যশ, গুণ এবং সামগ্রী সব কিছুই তাঁর থেকে অভিন্ন। মহারাজ পরীক্ষিৎ তাঁর মাতার গর্ভ থেকে শুরু করে তাঁর জীবনের অন্তিম সময় পর্যন্ত ভগবানের সঙ্গ করেছিলেন, এবং এইভাবে তিনি সম্পূর্ণরূপে ভগবানের প্রধান সদ্‌গুণগুলি অর্জন করেছিলেন।

রন্তিদেব ঃ প্রাক্ মহাভারত যুগের একজন বিখ্যাত রাজা, মহাভারতে (দ্রোণ-পর্ব ৬৭) সঞ্জয়কে উপদেশ দেওয়ার সময় নারদমুনি যাঁর উল্লেখ করেছিলেন। আতিথ্য প্রদান এবং আহার্য বিতরণের জন্য তিনি ছিলেন বিখ্যাত এক মহান রাজা। এমন কি ভগবান শ্রীকৃষ্ণও তাঁর দান এবং আতিথ্যের জন্য তাঁর প্রশংসা করেছেন।

বশিষ্ঠমুনিকে শীতল জল প্রদান করার জন্য তিনি তাঁর কাছ থেকে বরলাভ করেছিলেন, এবং তার ফলে স্বর্গলোক প্রাপ্ত হয়েছিলেন। তিনি ঋষিদের ফল, মূল ও পত্র সরবরাহ করতেন, এবং তার ফলে তিনি তাঁদের কাছে তাঁর সমস্ত বাসনা পূর্তির আশীর্বাদ লাভ করেছিলেন। যদিও তিনি ছিলেন ক্ষত্রিয়, তথাপি তিনি কখনও মাংস ভক্ষণ করেননি। তিনি বিশেষভাবে বশিষ্ঠমুনির পরিচর্যা করেছিলেন, এবং তাঁর আশীর্বাদের ফলেই কেবল তিনি স্বর্গলোকে স্থান লাভ করেছিলেন। তিনি হচ্ছেন সেই সমস্ত পুণ্যবান রাজাদের অন্যতম, যাঁদের নাম প্রাতে এবং সন্ধ্যায় স্মরণীয়।

যযাতি : এই পৃথিবীর একজন মহান রাজা, এবং বিশ্বের সমস্ত মহান আর্য ও ভারতীয়-ইউরোপীয় গোষ্ঠীর সমস্ত মহান রাষ্ট্রগুলির আদি পূর্বপুরুষ। তিনি ছিলেন মহারাজ নহুষের পুত্র, এবং তাঁর জ্যেষ্ঠভ্রাতা মুক্ত মহাত্মায় পরিণত হওয়ার ফলে যযাতি পৃথিবীর সম্রাট হয়েছিলেন। তিনি কয়েক হাজার বছর ধরে পৃথিবী শাসন করেছিলেন এবং বহু যজ্ঞ ও পুণ্যকর্ম সম্পাদন করেছিলেন, যার বর্ণনা ইতিহাসে রয়েছে, যদিও তাঁর প্রথম যৌবন অত্যন্ত কামাসক্ত এবং ভাবপ্রবণতার কাহিনীতে পূর্ণ ছিল। তিনি শুক্রাচার্যের অত্যন্ত প্রিয় কন্যা দেবযানীর প্রতি প্রণয়াসক্ত হন। দেবযানী তাঁকে বিবাহ করতে চান, কিন্তু ব্রাহ্মণকন্যা বলে তিনি প্রথমে তাঁকে প্রত্যাখ্যান করেন। শাস্ত্রের নির্দেশ অনুসারে ব্রাহ্মণই কেবল ব্রাহ্মণকন্যাকে বিবাহ করতে পারে। সেই যুগে মানুষ বর্ণ-সঙ্করের ব্যাপারে বিশেষ সতর্ক ছিল। কিন্তু শুক্রাচার্য এই অবৈধ বিবাহের নিয়মটি সংশোধন করে রাজা যযাতিকে দেবযানীর পাণিগ্রহণ করতে প্ররোচিত করেন। শর্মিষ্ঠা নামক দেবযানীর এক সখিও সম্রাটের প্রতি প্রণয়াসক্ত হন। তিনি দেবযানীর সঙ্গে রাজগৃহে গমন করেছিলেন। শুক্রাচার্য সম্রাট যযাতিকে নিষেধ করেছিলেন যে তিনি যেন কখনও শর্মিষ্ঠাকে তাঁর শয়নকক্ষে না ডাকেন। কিন্তু যযাতি তাঁর সেই নির্দেশ পালন করতে পারেননি। গোপনে তিনি শর্মিষ্ঠাকে বিবাহ করেছিলেন এবং তাঁর মাধ্যমে কয়েকটি পুত্রের জন্ম হয়েছিল। দেবযানী যখন সেই কথা জানতে পারেন, তখন তিনি তাঁর পিতার কাছে ফিরে গিয়ে এ বিষয়ে অভিযোগ করেন। যযাতি দেবযানীর প্রতি অত্যন্ত আসক্ত ছিলেন, এবং যখন তিনি তাঁকে ফিরিয়ে আনবার জন্য তাঁর শ্বশুরালয়ে যান, তখন শুক্রাচার্য তাঁর প্রতি ক্রুদ্ধ হয়ে তাঁকে জরাগ্রস্ত হওয়ার অভিশাপ দেন । যযাতি সেই অভিশাপ ফিরিয়ে নেওয়ার জন্য তাঁর শ্বশুরের কাছে বিনীতভাবে প্রার্থনা করেন। শুক্রাচার্য তখন তাঁকে বলেন যে তাঁর কোন

পুত্র যদি তাঁর সেই জরা গ্রহণ করে তাঁর যৌবন তাঁকে দান করেন, তা হলেই কেবল তিনি তাঁর যৌবন ফিরে পেতে পারেন। যযাতির পাঁচটি পুত্র ছিল—দেবযানীর দুটি এবং শর্মিষ্ঠার তিনটি। তাঁর পাঁচ পুত্রেরা হলেন—(১) যদু, (২) তুর্বসু, (৩) দ্রুহ্যু, (৪) অনু এবং (৫) পুরু। এই পাঁচটি পুত্র থেকে পাঁচটি বিখ্যাত রাজবংশের উদ্ভব হয়েছে। যথা—(১) যদু বংশ, (২) যবন (তুরস্ক) বংশ, (৩) ভোজ বংশ, (৪) ম্লেচ্ছ (গ্রীক) বংশ এবং (৫) পৌরব বংশ। এই পাঁচটি বংশ সারা পৃথিবী জুড়ে ছড়িয়ে পড়েছিল। তাঁর পুণ্যকর্মের প্রভাবে তিনি স্বর্গলোক প্রাপ্ত হয়েছিলেন, কিন্তু আত্মশ্লাঘা এবং অন্যান্য মহাত্মাদের সমালোচনা করার জন্য তিনি সেখান থেকে পতিত হন। তাঁর পতনের পর তাঁর কন্যা এবং দৌহিত্র তাঁদের সঞ্চিত পুণ্য তাঁকে দান করেন, এবং তাঁর দৌহিত্র এবং সখা শিবির সাহায্যে তিনি পুনরায় স্বর্গলোকে উন্নীত হন, যেখানে তিনি যমরাজের সভার সদস্য এবং ভক্তরূপে বাস করছেন। তিনি এক হাজারেরও অধিক যজ্ঞ করেছিলেন। তিনি অত্যন্ত পরাক্রমশালী রাজা ছিলেন। তাঁর রাজকীয় ক্ষমতা সারা পৃথিবী জুড়ে বিস্তার লাভ করেছিল। অত্যন্ত কামাসক্ত হওয়ার ফলে তিনি যখন শুক্রাচার্যের শাপে জরাগ্রস্ত হন, তখন তাঁর সর্বকনিষ্ঠ পুত্র পুরু এক হাজার বছরের জন্য তাঁকে তাঁর যৌবন দান করেছিলেন। অবশেষে তিনি সংসার জীবনের প্রতি বিরক্ত হন এবং তাঁর পুত্র পুরুকে তাঁর যৌবন ফিরিয়ে দেন। তিনি যখন তাঁর রাজ্য পুরুকে দান করতে চান, তখন তাঁর সভাসদ এবং প্রজারা অসম্মতি প্রকাশ করেছিলেন। কিন্তু তিনি যখন তাঁর প্রজাদের কাছে পুরুর মহিমা বিশ্লেষণ করেন, তখন তাঁরা পুরুকে তাঁদের রাজারূপে গ্রহণ করতে স্বীকৃত হন। তারপর সম্রাট যযাতি গৃহস্থ জীবন থেকে অবসর গ্রহণ করে বনবাসী হয়েছিলেন।

শ্লোক ২৫

ধৃত্যা বলিসমঃ কৃষ্ণে প্রহ্লাদ ইব সদ্গ্রহঃ ।
আহর্তৈষোঽশ্বমেধানাং বৃদ্ধানাং পর্যুপাসকঃ ॥ ২৫ ॥

ধৃত্যা—ধৈর্যে; **বলি-সমঃ**—বলি মহারাজের মতো; **কৃষ্ণে**—শ্রীকৃষ্ণের প্রতি; **প্রহ্লাদ**—প্রহ্লাদ মহারাজ; **ইব**—মতো; **সৎ-গ্রহ**—ভক্ত; **আহর্তা**—অনুষ্ঠানকারী; **এষঃ**—এই শিশু; **অশ্বমেধানাম্**—অশ্বমেধ যজ্ঞের; **বৃদ্ধানাম্**—বৃদ্ধ এবং অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের; **পর্যুপাসকঃ**—অনুগামী।

অনুবাদ

এই শিশুটি ধৈর্যে বলি মহারাজের মতো হবেন, প্রহ্লাদ মহারাজের মতো নৈষ্ঠিক কৃষ্ণভক্ত হবেন, বহু অশ্বমেধ যজ্ঞ অনুষ্ঠান করবেন এবং বৃদ্ধ ও অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের অনুগমন করবেন।

তাৎপর্য

বলি মহারাজ ঃ ভগবদ্ভক্তির ক্ষেত্রে দ্বাদশ মহাজনের অন্যতম। বলি মহারাজ একজন মহাজন, কেননা তিনি ভগবানের প্রসন্নতা বিধানের জন্য সব কিছু উৎসর্গ করেছিলেন, এবং ভগবানের সেবার জন্য তাঁর সেই উৎসর্গ করার পথে বাধা দিয়েছিলেন বলে তিনি তাঁর তথাকথিত গুরুর সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন করেছিলেন। সব রকম জাগতিক দায়-দায়িত্বের বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে ভগবানের প্রতি অহৈতুকী ভক্তি লাভ করাই হচ্ছে ধর্মজীবনের সর্বোচ্চ সিদ্ধি। ভগবানের সন্তুষ্টি বিধানের জন্য বলি মহারাজ সব কিছু ত্যাগ করতে বদ্ধপরিকর ছিলেন, এবং তিনি কোনরকম বাধা-বিপত্তি গ্রাহ্য করেননি। তিনি ছিলেন আর একজন মহাজন প্রহ্লাদ মহারাজের পৌত্র। বলি মহারাজ এবং বামনদেবের কাহিনী *শ্রীমদ্ভাগবতের* অষ্টম স্কন্ধে (অধ্যায় ১১-২৪) বর্ণিত হয়েছে।

প্রহ্লাদ মহারাজ ঃ শ্রীকৃষ্ণের (বিষ্ণুর) একজন পরম ভক্ত। তাঁর বয়স যখন পাঁচ বছর, তখন ভগবানের ঐকান্তিক ভক্ত হয়েছিলেন বলে তাঁকে তাঁর পিতা হিরণ্যকশিপু কঠোরভাবে নির্যাতন করেছিল। তিনি ছিলেন হিরণ্যকশিপুর জ্যেষ্ঠপুত্র, এবং তাঁর মায়ের নাম ছিল কয়াধু। প্রহ্লাদ মহারাজ ছিলেন ভগবদ্ভক্তির একজন মহাজন, কেননা তাঁর জন্যই ভগবান নৃসিংহদেব তাঁর পিতাকে সংহার করেছিলেন এই দৃষ্টান্ত স্থাপন করার জন্য যে, পিতা যদি ভগবদ্ভক্তির পথে প্রতিবন্ধক হয়, তা হলে তাকেও সরিয়ে দিতে হবে। তাঁর চার পুত্র ছিল এবং তাঁদের মধ্যে সর্বজ্যেষ্ঠ বিরোচন হচ্ছেন উপরোক্ত বলি মহারাজের পিতা। প্রহ্লাদ মহারাজের কার্যকলাপের ইতিহাস *শ্রীমদ্ভাগবতের* সপ্তম স্কন্ধে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে।

শ্লোক ২৬

রাজর্ষীণাং জনয়িতা শাস্তা চোৎপথগামিনাম্ ।
নিগ্রহীতা কলেরেষ ভুবো ধর্মস্য কারণাৎ ॥ ২৬ ॥

রাজ-ঋষীণাম্—ঋষিসদৃশ রাজাদের মধ্যে; জনয়িতা—জনক; শাস্তা—দণ্ডদাতা; চ—এবং; উৎপথ-গামিনাম্—উচ্ছৃঙ্খলদের; নিগ্রহীতা—দণ্ডদাতা; কলেঃ—কলহকারীদের; এষঃ—এই; ভুবঃ—পৃথিবীর; ধর্মস্য—ধর্মের; কারণাৎ—জন্য।

অনুবাদ

এই শিশুটি রাজর্ষিদের জন্মদাতা হবেন। বিশ্বশান্তি ও ধর্মের স্বার্থে, তিনি উচ্ছৃঙ্খল ও কলহপ্রিয় সকলেরই দণ্ডদাতা হবেন।

তাৎপর্য

জগতে সব চাইতে জ্ঞানী হচ্ছেন ভগবদ্ভক্ত। ঋষিদের জ্ঞানী বলা হয়, এবং জ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় বিভিন্ন প্রকার জ্ঞানী ব্যক্তি রয়েছেন। অতএব রাজা বা রাষ্ট্রনেতারা যদি জ্ঞানী না হন, তা হলে রাজ্যের অন্যান্য জ্ঞানী ব্যক্তিদের তিনি নিয়ন্ত্রণ করতে পারেন না। মহারাজ যুধিষ্ঠিরের রাজবংশে সমস্ত রাজারা ব্যতিক্রমহীনভাবে তখনকার দিনের সব চাইতে জ্ঞানী ব্যক্তি ছিলেন। মহারাজ পরীক্ষিৎ এবং ভবিষ্যতে জন্মগ্রহণ করবে তাঁর যে পুত্র জনমেজয়, তাঁদের সম্বন্ধেও সেই ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছিল। এই প্রকার জ্ঞানী রাজারাই দুষ্কৃতকারীদের দণ্ডদান করতে পারেন এবং কলিযুগের কলহপূর্ণ প্রভাবকে সমূলে উৎপাটিত করতে পারেন। পরবর্তী অধ্যায়গুলিতে এটি স্পষ্টভাবে প্রকাশ পাবে যে মহারাজ পরীক্ষিৎ শান্তি ও ধর্মের প্রতীক গাভীকে হত্যা করতে চেষ্টা করার ফলে মূর্তিমান কলিকে বধ করতে উদ্যত হয়েছিলেন। কলির চারটি লক্ষণ হচ্ছে —(১) মাদক দ্রব্য, (২) অবৈধ স্ত্রীসঙ্গ, (৩) দ্যূতক্রীড়া এবং (৪) কসাইখানা। আসব পান, অবৈধ স্ত্রীসঙ্গ, দ্যূতক্রীড়া এবং কসাইখানা থেকে নিয়মিতভাবে সরবরাহ করা মাংস আহারে লিপ্ত কলহপ্রিয় দুর্বৃত্তদের কিভাবে দমন করে শান্তি এবং নৈতিকতার প্রতিষ্ঠা করতে হয়, সেই শিক্ষা সমস্ত রাষ্ট্রের জ্ঞানবান শাসকদের মহারাজ পরীক্ষিতের কাছে লাভ করা কর্তব্য। এই কলিযুগে কলহের এই সমস্ত বিভাগগুলি চালাবার জন্য ন্যায়সঙ্গতভাবে অনুমতি প্রদান করা হচ্ছে। অতএব রাজ্যে শান্তি এবং নৈতিকতা আশা করা যায় কিভাবে? তাই রাজ্যের জনকদের ভগবদ্ভক্তির অনুশীলনের মাধ্যমে, নিয়ম-শৃঙ্খলা ভঙ্গকারীদের দণ্ডদান করে এবং উপরোক্ত কলহের লক্ষণগুলি নির্মূল করে অধিকতর জ্ঞানী হওয়ার আদর্শ অবশ্যই অনুসরণ করতে হবে। আমরা যদি প্রজ্জ্বলিত অগ্নি চাই, তা হলে আমাদের শুকনো কাঠ ব্যবহার করতে হবে। ভিজা কাঠ থেকে প্রজ্জ্বলিত অগ্নি পাওয়া যায় না। মহারাজ পরীক্ষিৎ এবং তাঁর অনুগামীদের নীতি অনুশীলনের ফলেই কেবল শান্তি এবং নৈতিকতার উন্নতিবিধান করা সম্ভব।

শ্লোক ২৭

তক্ষকাদাত্মনো মৃত্যুং দ্বিজপুত্রোপসর্জিতাৎ ।
প্রপৎস্যত উপশ্রুত্য মুক্তসঙ্গঃ পদং হরেঃ ॥

তক্ষকাৎ—তক্ষক থেকে; আত্মনঃ—তাঁর নিজের; মৃত্যুম্—মৃত্যু; দ্বিজ-পুত্র—ব্রাহ্মণ সন্তান; উপসর্জিতাৎ—প্রেরিত; প্রপৎস্যতে—আশ্রয় গ্রহণ করে; উপশ্রুত্য—শ্রবণ করে; মুক্ত-সঙ্গঃ—সমস্ত আসক্তি থেকে মুক্ত; পদম্—শ্রীপাদপদ্ম; হরেঃ—শ্রীহরির।

অনুবাদ

এক ব্রাহ্মণতনয় কর্তৃক প্রেরিত এক তক্ষক নাগের দংশনে তাঁর মৃত্যু হবে, তা শোনার পরে, তিনি সমস্ত জড়জাগতিক আসক্তি থেকে মুক্ত হবেন এবং তিনি পরমেশ্বর ভগবান শ্রীহরির শ্রীপাদপদ্মে আশ্রয় গ্রহণ করবেন।

তাৎপর্য

জড় আসক্তি এবং ভগবানের শ্রীপাদপদ্মে শরণাগতি একসঙ্গে হতে পারে না। জড় আসক্তি মানে হচ্ছে ভগবানের আশ্রয়ে চিন্ময় আনন্দ সম্বন্ধে অজ্ঞতা। এই জড় জগতে অবস্থানকালে যে ভগবদ্ভক্তি, তা হচ্ছে ভগবানের সঙ্গে অপ্রাকৃত সম্পর্কে সম্পর্কিত হওয়ার অনুশীলন, এবং যখন তা সিদ্ধ হয় তখন ভগবদ্ভক্ত সম্পূর্ণরূপে জড় জগতের বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে তাঁর প্রকৃত আলয় ভগবদ্ধামে ফিরে যাওয়ার যোগ্য হন। তাঁর মাতৃজঠরে অবস্থানকালেই, তাঁর জীবনের শুরু থেকেই মহারাজ পরীক্ষিৎ নিরন্তর ভগবানের আশ্রয়ে ছিলেন, এবং ব্রাহ্মণ বালকের অভিশাপের ফলে সাতদিনের মধ্যে তাঁর মৃত্যু হওয়ার তথাকথিত যে সতর্কবাণী, তা ছিল ভগবদ্ধামে ফিরে যাওয়ার প্রস্তুতিসূচক একটি আশীর্বাদ। যেহেতু তিনি সর্বদাই ভগবানের দ্বারা সুরক্ষিত ছিলেন, তাই ভগবানের কৃপায় তিনি এই প্রতিকূল অবস্থার সর্বশ্রেষ্ঠ সদ্ব্যবহার করেছিলেন। তিনি নিরন্তর সাতদিন ধরে যথার্থ সূত্র থেকে *শ্রীমদ্ভাগবত* শ্রবণ করেছিলেন এবং তার ফলে ভগবানের শ্রীপাদপদ্মের আশ্রয় লাভ করার সুযোগ পেয়েছিলেন।

শ্লোক ২৮

জিজ্ঞাসিতাত্মযাথার্থ্যো মুনের্ব্যাসসুতাদসৌ ।
হিত্বেদং নৃপ গঙ্গায়াং যাস্যত্যদ্ধাকুতোভয়ম্ ॥ ২৮ ॥

জিজ্ঞাসিত—জিজ্ঞাসা করা হল; **আত্ম-যাথার্থ্যঃ**—আত্মপরিচয় সম্বন্ধে যথাযথ জ্ঞান; **মুনেঃ**—বিজ্ঞ দার্শনিকদের কাছ থেকে; **ব্যাস-সুতাৎ**—ব্যাসনন্দন; **অসৌ**—তাঁর; **হিত্বা**—পরিত্যাগ করে; **ইদম্**—এই জড় আসক্তি; **নৃপ**—হে রাজন্; **গঙ্গায়াম্**—গঙ্গার তীরে; **যাস্যতি**—যাবেন; **অদ্ধা**—সরাসরিভাবে; **অকুতঃ-ভয়ম্**—ভয়লেশহীন জীবন।

অনুবাদ

হে রাজন্! এই বালকটি বেদব্যাসের পুত্র ব্রহ্মর্ষি শুকদেবের মুখ থেকে যথার্থ আত্মজ্ঞান জানতে ইচ্ছুক হবেন এবং সমস্ত জড় আসক্তি পরিত্যাগ করে ভয়লেশহীন হবেন।

তাৎপর্য

জড় জ্ঞান মানে হচ্ছে নিজের স্বরূপ সম্বন্ধীয় জ্ঞান সম্বন্ধে অজ্ঞতা। দর্শন মানে হচ্ছে প্রকৃত আত্মজ্ঞানের অন্বেষণ, অথবা আত্ম-উপলব্ধির জ্ঞান। আত্ম-উপলব্ধি ব্যতীত দর্শন হচ্ছে শুধু জল্পনা-কল্পনা, অথবা অনর্থক শক্তি এবং সময়ের অপচয়। জীবের প্রকৃত স্বরূপ সম্বন্ধে *শ্রীমদ্ভাগবত* যথার্থ জ্ঞান প্রদান করে, এবং *শ্রীমদ্ভাগবত* শ্রবণ করার মাধ্যমে মানুষ জড় আসক্তির বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে বৈকুণ্ঠলোকে প্রবেশ করতে পারে। এই জড় জগৎ ভয় এবং কুণ্ঠায় পূর্ণ। এখানকার কয়েদীরা কারাগারে বন্দী থাকার মতো সব সময় ভয়ে ভীত। কারাগারে কেউই সেখানকার নিয়ম এবং আইন ভঙ্গ করতে পারে না, তা ভঙ্গ করার অর্থ হচ্ছে বন্দী জীবনের মেয়াদ বৃদ্ধি। তেমনই এই জড় জগতে আমরা সর্বদাই ভয়ে ভীত। এই ভীতিকে বলা হয় কুণ্ঠা। বদ্ধ জীবনে, সমস্ত যোনিতে প্রতিটি জীবই, প্রকৃতির নিয়ম লঙ্ঘন করেই হোক অথবা না করেই হোক—সর্বদাই দুশ্চিন্তাগ্রস্ত। মুক্তি মানে হচ্ছে এই নিরন্তর উৎকণ্ঠা থেকে মুক্ত হওয়া। এই কুণ্ঠা যখন ভগবানের প্রেমময়ী সেবায় রূপান্তরিত হয়, তখনই কেবল তা সম্ভব। *শ্রীমদ্ভাগবত* আমাদের সুযোগ প্রদান করছে কিভাবে আমরা এই উৎকণ্ঠাকে জড় থেকে চেতনে রূপান্তরিত করতে পারি। শ্রীব্যাসদেবের মহান পুত্র আত্মতত্ত্ববেত্তা শুকদেব গোস্বামীর মতো অভিজ্ঞ দার্শনিকদের সঙ্গ প্রভাবেই তা সম্ভব। মহারাজ পরীক্ষিৎ তাঁর মৃত্যুর সতর্কবাণী পাওয়া মাত্রই শ্রীল শুকদেব গোস্বামীর সঙ্গ লাভের মহাসৌভাগ্যের পূর্ণ সদ্ব্যবহার করে বাঞ্ছিত ফল প্রাপ্ত হয়েছিলেন।

কিছু পেশাদারী পাঠক *শ্রীমদ্ভাগবতের* এই কীর্তন এবং শ্রবণের এক প্রকার অনুকরণ করে থাকে, এবং তাঁদের মূর্খ শ্রোতারা মনে করে যে *শ্রীমদ্ভাগবত* পাঠ শ্রবণ করার ফলে তারা জড় আসক্তির বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে অভয় জীবন লাভ

করবে। শ্রীমদ্ভাগবত শ্রবণের এই প্রকার অনুকরণ এক প্রকার তামাশা মাত্র। কতগুলি জঘন্য লোভী ব্যক্তির জড় ভোগের জন্য অর্থ উপার্জনের উদ্দেশ্যে এই প্রকার ভাগবত সপ্তাহের অনুষ্ঠানের দ্বারা কখনও প্রতারিত হওয়া উচিত নয়।

শ্লোক ২৯

ইতি রাজ্ঞ উপাদিশ্য বিপ্রা জাতককোবিদাঃ ।
লব্ধাপচিতয়ঃ সর্বে প্রতিজগ্মুঃ স্বকান্ গৃহান্ ॥ ২৯ ॥

ইতি—এইভাবে; **রাজ্ঞে**—রাজাকে; **উপাদিশ্য**—উপদেশ দান করে; **বিপ্রাঃ**—বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণেরা; **জাতক-কোবিদাঃ**—নবজাত শিশুর ভাগ্য গণনায় দক্ষ; **লব্ধ-অপচিতয়ঃ**—প্রভূত দান প্রাপ্ত হয়ে; **সর্বে**—তাঁরা সকলে; **প্রতিজগ্মুঃ**—ফিরে গেলেন; **স্বকান্**—তাঁদের নিজেদের; **গৃহান্**—গৃহে।

অনুবাদ

জ্যোতিষ-শাস্ত্রে পারদর্শী এবং নবজাত শিশুর ভাগ্য গণনায় দক্ষ সেই বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণেরা এইভাবে মহারাজ যুধিষ্ঠিরকে নবজাত শিশুর ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে উপদেশ দিয়ে, প্রচুর পরিমাণে পারিতোষিক লাভ করে স্বগৃহে প্রত্যাবর্তন করলেন।

তাৎপর্য

বেদ জাগতিক এবং পারমার্থিক উভয় জ্ঞানেরই ভাণ্ডার। কিন্তু আত্ম-উপলব্ধির পূর্ণতা প্রাপ্ত হওয়াই হচ্ছে এই জ্ঞানের উদ্দেশ্য। পক্ষান্তরে বলা যায় যে, বেদ সভ্য মানুষদের জন্য সর্বতোভাবে পথিকৃৎস্বরূপ। যেহেতু মনুষ্য জীবন জড় জগতের দুঃখ-দুর্দশা থেকে মুক্ত হওয়ার একটি সুযোগ, তাই জড়জাগতিক প্রয়োজন এবং পারমার্থিক মুক্তি উভয় উদ্দেশ্য সাধনের জন্যই বৈদিক জ্ঞান যথাযথভাবে মানুষকে পথ প্রদর্শন করে। বিশেষ বুদ্ধিমত্তাসম্পন্ন যে মানুষেরা বিশেষভাবে বৈদিক জ্ঞানের প্রতি অনুরক্ত, তাদের বলা হয় বিপ্র, বা বৈদিক জ্ঞানের স্নাতক। বেদে বিভিন্ন জ্ঞানের বিভাগ রয়েছে, যার মধ্যে জ্যোতিষ এবং চিকিৎসা হচ্ছে দুটি গুরুত্বপূর্ণ শাখা, যা সাধারণ মানুষের জন্য আবশ্যক। তাই বুদ্ধিমান মানুষেরা, যাঁরা সাধারণত ব্রাহ্মণ বলে পরিচিত, সমাজকে পথ প্রদর্শন করার জন্য বৈদিক জ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় পারদর্শী হন। এমন কি সামরিক-বিদ্যা বা ধনুর্বেদ ও বুদ্ধিমান ব্রাহ্মণেরা অধ্যয়ন করতেন, এবং সেই জ্ঞান দান করার শিক্ষকতা করতেন, যেমন দ্রোণাচার্য, কৃপাচার্য প্রমুখ।

এখানে যে *বিপ্র* শব্দটির উল্লেখ করা হয়েছে, তা তাৎপর্যপূর্ণ। বিপ্র এবং ব্রাহ্মণদের মধ্যে কিছু পার্থক্য রয়েছে। বিপ্র হচ্ছেন তাঁরা, যাঁরা বৈদিক কর্মকাণ্ডে বা সকাম কর্ম বিষয়ক শাখায় পারদর্শী, এবং তাঁরা সমাজকে জীবনের জড়জাগতিক আবশ্যকতাগুলি চরিতার্থ করার উদ্দেশ্যে পথ প্রদর্শন করেন। কিন্তু ব্রাহ্মণেরা পারমার্থিক চিন্ময় জ্ঞানের বিষয়ে পারদর্শী; জ্ঞানের এই বিভাগকে বলা হয় জ্ঞানকাণ্ড, এবং তার ঊর্ধ্বে রয়েছে উপাসনাকাণ্ড। উপাসনাকাণ্ডের চরম পরিণতি হচ্ছে বিষ্ণুভক্তি, এবং ব্রাহ্মণেরা যখন এই বিষয়ে পূর্ণতা প্রাপ্ত হন, তখন তাঁদের বলা হয় বৈষ্ণব। বিষ্ণুর আরাধনা হচ্ছে সর্বশ্রেষ্ঠ আরাধনা। উন্নত ব্রাহ্মণেরা হচ্ছেন ভগবানের প্রেমময়ী সেবায় যুক্ত বৈষ্ণব। তাই শ্রীমদ্ভাগবত, যা হচ্ছে ভগবদ্ভক্তির বিজ্ঞান, তা বৈষ্ণবদের প্রিয়। *শ্রীমদ্ভাগবতের* শুরুতেই বিশ্লেষণ করা হয়েছে যে *শ্রীমদ্ভাগবত* হচ্ছে সুপক্ক ফল, এবং তার বিষয়বস্তু কর্ম, জ্ঞান এবং উপাসনা, এই তিনটি কাণ্ডেরই অতীত।

কর্মকাণ্ডে পারদর্শীদের মধ্যে, জাতক-কর্মে দক্ষ বিপ্রেরা জ্যোতিষ-শাস্ত্রে অত্যন্ত পারদর্শী হতেন, এবং তাঁরা নবজাত শিশুর ভবিষ্যৎ কেবল লগ্ন গণনা করার মাধ্যমেই বলতে পারতেন। এই প্রকার সুদক্ষ জাতক-বিপ্রেরা মহারাজ পরীক্ষিতের জন্মের সময় উপস্থিত ছিলেন, এবং তাঁর পিতামহ মহারাজ যুধিষ্ঠির সেই সমস্ত বিপ্রদের যথেষ্ট পরিমাণে স্বর্ণ, ভূমি, গ্রাম, শস্য ও গাভীসমেত জীবনের অন্যান্য আবশ্যক বস্তুসমূহ উপহার দিয়েছিলেন। সমাজ ব্যবস্থায় এই প্রকার বিপ্রদের আবশ্যকতা রয়েছে, এবং রাষ্ট্রের কর্তব্য হচ্ছে তাঁদের সমস্ত সুযোগ-সুবিধা প্রদানের মাধ্যমে তাঁদের পালন করা, যা বৈদিক সমাজ ব্যবস্থায় প্রচলিত ছিল। এই প্রকার সুদক্ষ বিপ্রেরা রাজ্যের কাছে পর্যাপ্ত পরিমাণে পারিতোষিক লাভ করার ফলে বিনামূল্যে জনসাধারণের সেবা করতে পারতেন, এবং তার ফলে বৈদিক জ্ঞানের এই শাখা সকলের কাছেই সুলভ হতে পেরেছিল।

শ্লোক ৩০

স এষ লোকে বিখ্যাতঃ পরীক্ষিদিতি যৎপ্রভুঃ ।
পূর্বং দৃষ্টমনুধ্যায়ন্ পরীক্ষেত নরেষ্বিহ ॥ ৩০ ॥

সঃ—তিনি; **এষঃ**—এই; **লোকে**—জগতে; **বিখ্যাতঃ**—প্রসিদ্ধ; **পরীক্ষিৎ**—যিনি পরীক্ষা করেন; **ইতি**—এইভাবে; **যৎ**—যা; **প্রভুঃ**—হে রাজন্; **পূর্বম্**—পূর্বে; **দৃষ্টম্**—দর্শন করে; **অনুধ্যায়ন্**—অনুক্ষণ চিন্তা করে; **পরীক্ষেত**—পরীক্ষা করবেন; **নরেষু**—প্রত্যেক মানুষকে; **ইহ**—এখানে।

অনুবাদ

সুতরাং এই বালক জগতে পরীক্ষিৎ নামে (যিনি পরীক্ষা করেন) প্রসিদ্ধ হবেন, কেননা তিনি তাঁর জন্মের পূর্বে যে পুরুষকে দর্শন করেছিলেন, তাঁরই অনুসন্ধানে সমস্ত মানুষদের পরীক্ষা করতে থাকবেন। এইভাবে তিনি নিরন্তর তাঁরই কথা চিন্তা করবেন।

তাৎপর্য

মহারাজ পরীক্ষিৎ অত্যন্ত ভাগ্যবান ছিলেন, কেননা মাতৃগর্ভে অবস্থান-কালেই তিনি ভগবানকে দর্শন করেছিলেন, এবং তার ফলে তিনি নিরন্তর ভগবানের কথা চিন্তা করতেন। একবার যখন ভগবানের চিন্ময় রূপের ধারণা মনের মধ্যে গেঁথে যায়, তখন আর তাঁকে কোন অবস্থাতেই ভোলা যায় না। শিশু পরীক্ষিৎ ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর কাউকে দেখলেই পরীক্ষা করতেন যে তিনি সেই ব্যক্তিই কি না, যাঁকে তিনি তাঁর মাতৃগর্ভে অবস্থানকালে দর্শন করেছিলেন। কিন্তু কেউই ভগবানের সমান অথবা তাঁর থেকে অধিক আকর্ষণীয় হতে পারে না, অতএব তিনি কাউকেই গ্রহণ করতে পারেননি। কিন্তু এই প্রকার পরীক্ষার দ্বারা ভগবান সর্বদা তাঁর সঙ্গে ছিলেন, এবং এইভাবে মহারাজ পরীক্ষিৎ স্মরণের মাধ্যমে সর্বক্ষণ ভগবানের সেবায় যুক্ত ছিলেন।

এই প্রসঙ্গে শ্রীল জীব গোস্বামী মন্তব্য করেছেন যে, প্রত্যেক শিশুকে তার শৈশব থেকেই যদি ভগবানের ধারণা প্রদান করা যায়, তা হলে তিনি অবশ্যই মহারাজ পরীক্ষিতের মতো একজন মহান ভগবদ্ভক্ত হতে পারেন। কেউ মহারাজ পরীক্ষিতের মতো মাতৃগর্ভে অবস্থানকালে ভগবানকে দর্শন করার সুযোগ পাওয়ার মতো সৌভাগ্য অর্জন না-ও করে থাকতে পারে, কিন্তু তার মাতাপিতা যদি চান তা হলে তাকে সেই সৌভাগ্য প্রদান করতে পারেন। এই সম্পর্কে আমার ব্যক্তিগত জীবনে একটি ব্যবহারিক দৃষ্টান্ত রয়েছে। আমার পিতা ছিলেন ভগবানের শুদ্ধ ভক্ত, এবং আমার বয়স যখন মাত্র চার পাঁচ বছর, তখন আমার পিতৃদেব আমাকে শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের যুগলমূর্তি দান করেছিলেন। আমি খেলার ছলে আমার ভগিনীর সঙ্গে তাঁদের পূজা করতাম, এবং গৃহের নিকটস্থ রাধাগোবিন্দ মন্দিরের অনুষ্ঠানগুলির অনুকরণ করতাম। সব সময় সেই মন্দিরে গিয়ে এবং খেলার ছলে আমার বিগ্রহদের নিয়ে সেই সমস্ত অনুষ্ঠানের অনুকরণ করার ফলে, ভগবানের প্রতি আমার এক সহজ অনুরাগ বিকশিত হয়েছিল। আমার পিতা আমার অবস্থা বিচার করে সেই অনুসারে সমস্ত অনুষ্ঠানগুলি পালন করতেন। পরবর্তীকালে স্কুলে এবং

কলেজে যাওয়ার ফলে এই সমস্ত কার্যকলাপ স্থগিত ছিল, এবং আমি সম্পূর্ণরূপে আমার সেই অভ্যাস হারিয়ে ফেলেছিলাম। কিন্তু যৌবনে যখন আমার গুরুদেব শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী মহারাজের সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হয়, তখন আমার সেই পুরান অভ্যাস পুনরায় জাগরিত হয়েছিল, এবং আমার সেই খেলার বিগ্রহ যথাযথ বিধির মাধ্যমে আমার আরাধ্য অর্চা-বিগ্রহে পরিণত হয়েছিলেন। সংসার ত্যাগ করা পর্যন্ত আমি সেই অনুষ্ঠানগুলি নিয়মিতভাবে পালন করেছি, এবং আজ আমি অত্যন্ত প্রসন্নতা অনুভব করি যে আমার উদার পিতৃদেব আমার প্রথম জীবনে আমার মনের মধ্যে যে প্রভাব ফেলেছিলেন তা পরবর্তীকালে আমার পরমারাধ্য গুরুদেবের কৃপায় বৈধী-ভগবদ্ভক্তিতে পরিণত হয়েছিল। মহারাজ প্রহ্লাদও উপদেশ দিয়েছেন যে, ভগবানের সঙ্গে সম্পর্কের ধারণা জীবনের শুরুতে শৈশব অবস্থাতেই মনের মধ্যে গেঁথে দেওয়া উচিত; তা না হলে মনুষ্য জীবনের সুন্দর সুযোগটি হারিয়ে যেতে পারে, যে জীবন অন্যান্য জীবনের মতো নশ্বর হলেও অত্যন্ত মূল্যবান।

শ্লোক ৩১

স রাজপুত্রো ববৃধে আশু শুক্ল ইবোডুপঃ ।
আপূর্যমাণঃ পিতৃভিঃ কাষ্ঠাভিরিব সোঽন্বহম্ ॥ ৩১ ॥

সঃ—সেই; রাজ-পুত্রঃ—রাজপুত্র; ববৃধে—বর্ধিত হয়েছিল; আশু—শীঘ্র; শুক্লে—শুক্লপক্ষের চন্দ্র; ইব—মতো; উডুপঃ—চন্দ্র; আপূর্যমাণঃ—সুন্দরভাবে বর্ধনশীল; পিতৃভিঃ—পিতাসদৃশ অভিভাবকদের দ্বারা; কাষ্ঠাভিঃ—চন্দ্রকলার মতো বর্ধিত; ইব—মতো; সঃ—তিনি; অন্বহম্—দিনের পর দিন।

অনুবাদ

রাজপুত্র (পরীক্ষিৎ) তাঁর পিতামহদের অভিভাবকত্বে সস্নেহে প্রতিপালিত হয়ে শুক্লপক্ষের চন্দ্রের মতো দিনে দিনে বর্ধিত হতে লাগলেন।

শ্লোক ৩২

বাল এব স ধর্মাত্মা কৃষ্ণভক্তো নিসর্গতঃ ।
প্রীতিদঃ সর্বলোকস্য মহাভাগবতঃ সুধীঃ ॥ ৩২ ॥

বাল এব—শৈশব অবস্থাতেই; সঃ—তিনি; ধর্মাত্মা—ধার্মিক; কৃষ্ণভক্তঃ—ভগবদ্ভক্ত; নিসর্গতঃ—স্বভাবত; প্রীতিদঃ—প্রীতিপ্রদ; সর্বলোকস্য—সমস্ত জীবের; মহা-ভাগবতঃ—ভক্তশ্রেষ্ঠ; সুধীঃ—বুদ্ধিমান।

অনুবাদ

সেই পরীক্ষিৎ বালক অবস্থাতেই স্বভাবত ধার্মিক, সকলের প্রিয়ভাজন, মহাভক্ত এবং বুদ্ধিমান হয়েছিলেন।

শ্লোক ৩৩

যক্ষ্যমাণোঽশ্বমেধেন জ্ঞাতিদ্রোহজিহাসয়া ।
রাজালব্ধধনো দধ্যৌনান্যত্র করদণ্ডয়োঃ ॥ ৩৩ ॥

যক্ষ্যমাণঃ—অনুষ্ঠান করতে অভিলাষী; অশ্বমেধেন—অশ্বমেধ যজ্ঞের দ্বারা; জ্ঞাতি-দ্রোহ—আত্মীয়দের সঙ্গে যুদ্ধ; জিহাসয়া—মুক্ত হওয়ার জন্য; রাজা—যুধিষ্ঠির মহারাজ; লব্ধ-ধনঃ—ধনলাভের জন্য; দধ্যৌ—চিন্তা করেছিলেন; ন-অন্যত্র—অন্য উপায় ছাড়া; কর-দণ্ডয়োঃ—করগ্রহণ এবং জরিমানা।

অনুবাদ

ঠিক এই সময় মহারাজ যুধিষ্ঠির জ্ঞাতিবধজনিত পাপ থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য এক অশ্বমেধ যজ্ঞ অনুষ্ঠান করার কথা বিবেচনা করছিলেন। কিন্তু কিছু অর্থ সংগ্রহের কথা ভেবে তিনি উদ্বিগ্ন হয়েছিলেন, কেননা উদ্বৃত্ত তহবিল না থাকায় কর এবং জরিমানা আদায় করা ছাড়া অর্থ সংগ্রহের আর কোনও উপায় ছিল না।

তাৎপর্য

ব্রাহ্মণ এবং বিপ্রদের যেমন রাষ্ট্র থেকে আর্থিক সাহায্য লাভের অধিকার ছিল, তেমনই রাষ্ট্রপ্রধানদের অধিকার ছিল নাগরিকদের কাছ থেকে কর এবং জরিমানা সংগ্রহ করার। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের পর রাজকোষ শূন্য হয়ে গিয়েছিল, তাই কর এবং জরিমানা সংগ্রহের অতিরিক্ত আর কোন সঞ্চয় ছিল না। রাজকোষের এই সঞ্চিত ধন কেবল রাজ্যের আয়-ব্যয়ের জন্যই পর্যাপ্ত ছিল, এবং কোন অতিরিক্ত সঞ্চয় না থাকার ফলে অশ্বমেধ যজ্ঞ করার উদ্দেশ্যে মহারাজ যুধিষ্ঠির আরও ধন সংগ্রহ করার বিষয়ে উদ্বিগ্ন ছিলেন। ভীষ্মদেবের উপদেশ অনুসারে মহারাজ যুধিষ্ঠির এই যজ্ঞ অনুষ্ঠান করতে চেয়েছিলেন।

শ্লোক ৩৪

তদভিপ্রেতমালক্ষ্য ভ্রাতরোঽচ্যুতচোদিতাঃ ।
ধনং প্রহীণমাজহ্রুরুদীচ্যাং দিশি ভূরিশঃ ॥ ৩৪ ॥

তৎ—তাঁর; **অভিপ্রেতম্**—মনোভিলাষ; **আলক্ষ্য**—লক্ষ্য করে; **ভ্রাতরঃ**—তাঁর ভ্রাতারা; **অচ্যুত**—অচ্যুত শ্রীকৃষ্ণ; **চোদিতাঃ**—উপবিষ্ট হয়ে; **ধনম্**—ধন; **প্রহীণম্**—সংগ্রহের জন্য; **আজহ্রুঃ**—আহরণ করেছিলেন; **উদীচ্যাম্**—উত্তর; **দিশি**—দিক; **ভূরিশঃ**—প্রচুর।

অনুবাদ

মহারাজের ঐকান্তিক অভিলাষ সম্বন্ধে অবগত হয়ে তাঁর ভাইয়েরা শ্রীকৃষ্ণের উপদেশ অনুসারে উত্তর দিকে গমনপূর্বক (মহারাজ মরুত্তের পরিত্যক্ত) প্রচুর ধনরত্ন সংগ্রহ করে এনেছিলেন।

তাৎপর্য

মহারাজ মরুত্ত : পৃথিবীর অন্যতম একজন মহান সম্রাট। তিনি মহারাজ যুধিষ্ঠিরের রাজত্বকালের বহু পূর্বে পৃথিবীতে রাজত্ব করেছিলেন। তিনি ছিলেন মহারাজ অবিক্ষিতের পুত্র এবং সূর্যতনয় যমরাজের এক মহান ভক্ত। তাঁর ভ্রাতা সম্বর্ত দেবগুরু বৃহস্পতির প্রতিদ্বন্দ্বী পুরোহিত ছিলেন। তিনি সংকর-যজ্ঞ নামক এক যজ্ঞ অনুষ্ঠান করেন, যার ফলে ভগবান তাঁর প্রতি এত প্রসন্ন হন যে, তাঁকে এক স্বর্ণপর্বতশৃঙ্গের অধিকার দান করেন। সেই স্বর্ণপর্বতশৃঙ্গটি হিমালয় পর্বতের কোন এক স্থানে রয়েছে, এবং আধুনিক দুঃসাহসী অভিযাত্রীরা সেখানে সেটির অন্বেষণ করতে পারেন। তিনি এত শক্তিশালী সম্রাট ছিলেন যে দিনের বেলা যজ্ঞ সমাপ্তির পর ইন্দ্র, চন্দ্র, বৃহস্পতি আদি দেবতারা তাঁর প্রাসাদে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করার জন্য আসতেন। যেহেতু সেই স্বর্ণশৃঙ্গটি তাঁর অধিকারে ছিল, তাই তাঁর কাছে পর্যাপ্ত পরিমাণে স্বর্ণ ছিল। সেই যজ্ঞমণ্ডপের চাঁদোয়া সম্পূর্ণ সোনা দিয়ে তৈরি হয়েছিল। তাঁর দৈনন্দিন যজ্ঞ অনুষ্ঠানে রন্ধনকার্য ত্বরান্বিত করার জন্য বায়ুলোকের কিছু অধিবাসীদের নিমন্ত্রণ করে নিয়ে আসা হয়েছিল, এবং সেই অনুষ্ঠানে সমবেত দেবতাদের নেতৃত্ব করেছিলেন বিশ্বদেব।

তাঁর নিরন্তর পুণ্যকর্মের দ্বারা তিনি তাঁর রাজ্য থেকে সমস্ত রোগ দূর করতে সক্ষম হয়েছিলেন। তাঁর মহান যজ্ঞ অনুষ্ঠানের ফলে দেবলোক, পিতৃলোক আদি উচ্চলোকের সমস্ত অধিবাসীরা তাঁর প্রতি প্রসন্ন হয়েছিলেন। প্রতিদিন তিনি পণ্ডিত ব্রাহ্মণদের শয্যা, আসন, যান এবং যথেষ্ট পরিমাণে স্বর্ণ দান করতেন। তাঁর উদার

দান এবং অসংখ্য যজ্ঞ অনুষ্ঠানের ফলে স্বর্গের রাজা ইন্দ্রদেব তাঁর প্রতি অত্যন্ত প্রসন্ন ছিলেন এবং সর্বদা তাঁর মঙ্গল কামনা করতেন। তাঁর পুণ্যকর্মের ফলে তিনি আজীবন যুবক ছিলেন, এবং পরিতুষ্ট প্রজা, মন্ত্রীমণ্ডলী, পত্নী, পুত্র এবং ভ্রাতৃগণ পরিবৃত হয়ে এক হাজার বছর পৃথিবীর উপর রাজত্ব করেছিলেন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণও তাঁর পুণ্যকর্মের প্রশংসা করেছিলেন। তিনি তাঁর একমাত্র কন্যাকে মহর্ষি অঙ্গিরার হস্তে অর্পণ করেন, এবং তাঁর শুভ আশীর্বাদের ফলে তিনি স্বর্গলোকে উন্নীত হয়েছিলেন। তিনি প্রথমে বিদ্বান্ বৃহস্পতিকে তাঁর যজ্ঞে পৌরোহিত্য করার জন্য চেয়েছিলেন, কিন্তু তিনি এই পৃথিবীর একজন মানুষ বলে দেবতাদের গুরু বৃহস্পতি সেই পদ গ্রহণে অস্বীকার করেন। তাতে তিনি অত্যন্ত দুঃখিত হন, কিন্তু নারদমুনির উপদেশে তিনি সম্বর্তকে সেই পদে নিযুক্ত করেন, এবং তাঁর উদ্দেশ্য সাধনে কৃতকার্য হন।

কোন বিশেষ যজ্ঞের সাফল্য নির্ভর করে প্রধান পুরোহিতের উপর। এই যুগে সর্ব প্রকার যজ্ঞ বর্জিত হয়েছে, কেননা তথাকথিত ব্রাহ্মণদের মধ্যে পৌরোহিত্য করার মতো যোগ্যতা কারোরই নেই। তাদের ব্রাহ্মণোচিত গুণাবলী না থাকলেও কেবল ব্রাহ্মণসন্তান হওয়ার জন্য তারা ভ্রান্তভাবে নিজেদের ব্রাহ্মণ বলে মনে করে। তাই এই কলিযুগে কেবল এক প্রকার যজ্ঞেরই অনুমোদন করা হয়েছে, তা হচ্ছে ভগবান শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর প্রবর্তিত সংকীর্তন যজ্ঞ।

শ্লোক ৩৫

তেন সম্ভৃতসম্ভারো ধর্মপুত্রো যুধিষ্ঠিরঃ ।
বাজিমেধৈস্ত্রিভির্ভীতো যজ্ঞৈঃ সময়জদ্ধরিম্ ॥ ৩৫ ॥

তেন—সেই সম্পদের দ্বারা; **সম্ভৃত**—সংগৃহীত; **সম্ভারঃ**—উপকরণাদি; **ধর্ম-পুত্রঃ**—পুণ্যবান রাজা; **যুধিষ্ঠিরঃ**—যুধিষ্ঠির; **বাজিমেধৈঃ**—অশ্বমেধ যজ্ঞের দ্বারা; **ত্রিভিঃ**—তিনবার; **ভীতঃ**—কুরুক্ষেত্র যুদ্ধজনিত পাপের ভয়ে ভীত; **যজ্ঞৈঃ**—যজ্ঞাদি; **সময়জৎ**—পূর্ণরূপে আরাধনা করেছিলেন; **হরিম্**—পরমেশ্বর ভগবানকে।

অনুবাদ

সেই সম্পদের দ্বারা মহারাজ যুধিষ্ঠির যজ্ঞের উপকরণ সংগ্রহ করে তিনটি অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করতে পেরেছিলেন। এইভাবে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে আত্মীয়-স্বজন বধজনিত পাপের ভয়ে ভীত ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির পরমেশ্বর ভগবান শ্রীহরির সন্তুষ্টি বিধান করেছিলেন।

তাৎপর্য

মহারাজ যুধিষ্ঠির ছিলেন পৃথিবীর একজন আর্দশ এবং বিখ্যাত পুণ্যাত্মা রাজা, কিন্তু তা সত্ত্বেও কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে ব্যাপকভাবে নরহত্যা হওয়ার ফলে তিনি ভয়ে অত্যন্ত ভীত হয়েছিলেন, কেননা সেই যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল তাঁকে রাজসিংহাসনে অধিষ্ঠিত করার জন্য। তাই তিনি সেই যুদ্ধে যত পাপ হয়েছিল তার সমস্ত দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলেন, এবং সেই পাপ থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য তিনি তিনটি অশ্বমেধ যজ্ঞ করার সঙ্কল্প করেছিলেন। এই প্রকার যজ্ঞ অত্যন্ত ব্যয়বহুল। সেইজন্য মহারাজ যুধিষ্ঠিরকে মহারাজ মরুত্তের স্বর্ণ এবং তাঁর প্রদত্ত ব্রাহ্মণদের পরিত্যক্ত স্বর্ণ সংগ্রহ করতে হয়েছিল। মহারাজ মরুত্তের দেওয়া সমস্ত স্বর্ণ ব্রাহ্মণেরা নিয়ে যেতে পারেননি, তাই দানের অধিকাংশে স্বর্ণই তাঁরা রেখে গিয়েছিলেন। আর মহারাজ মরুত্তও নিজের দান করা স্বর্ণ পুনরায় সংগ্রহ করতে চাননি। আর তা ছাড়া যে সমস্ত সোনার পাত্রগুলি যজ্ঞে ব্যবহার করা হয়েছিল, সেগুলি আবর্জনার স্তূপে ফেলে দেওয়া হয়েছিল, এবং মহারাজ যুধিষ্ঠির তাঁর নিজের উদ্দেশ্য সাধনের জন্য সেগুলি সংগ্রহ করা অবধি পাত্রগুলি দীর্ঘকাল সেখানেই পড়েছিল। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ মহারাজ যুধিষ্ঠিরের ভ্রাতাদের উপদেশ দিয়েছিলেন সেই দাবিদারহীন সম্পদ সংগ্রহ করতে, কেননা তা ছিল রাজার সম্পত্তি। সব চাইতে আশ্চর্যের বিষয় হচ্ছে যে সেই রাজ্যের প্রজারাও কোন রকম যান্ত্রিক উদ্যোগ বা সেই ধরনের কিছু করার উদ্দেশ্যে সেই অনধিকৃত স্বর্ণ সংগ্রহ করেননি। তার অর্থ হচ্ছে যে রাজ্যের প্রজারা অত্যন্ত সন্তুষ্ট ছিলেন, তাই ইন্দ্রিয়-তৃপ্তির উদ্দেশ্যে অনর্থক উৎপাদনের উদ্যোগ করার কোনরকম প্রবণতা তাঁদের ছিল না। মহারাজ যুধিষ্ঠির সেই স্বর্ণরাশি ভগবান শ্রীহরির সন্তুষ্টি বিধানের উদ্দেশ্যে যজ্ঞ অনুষ্ঠান করার জন্য সংগ্রহ করেছিলেন। তা না হলে রাজকোষের জন্য এই সম্পদ সংগ্রহ করার কোন বাসনা তাঁর ছিল না।

মহারাজ যুধিষ্ঠিরের আচরণ থেকে সকলের শিক্ষালাভ করা উচিত। তিনি যুদ্ধস্থলে সংঘটিত পাপের ভয়ে ভীত ছিলেন, এবং তাই তিনি পরমেশ্বরকে সন্তুষ্ট করতে চেয়েছিলেন। তা থেকে বোঝা যায় যে আমাদের দৈনন্দিন কর্তব্য সম্পাদনে অনিচ্ছা সত্ত্বেও অনেক পাপ হয়ে যায়, এবং সেই অনিচ্ছাকৃত অপরাধের নিরসনের জন্য শাস্ত্রের নির্দেশ অনুসারে যজ্ঞ অনুষ্ঠান করা অবশ্য কর্তব্য। *শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায়* ভগবান বলেছেন *(যজ্ঞার্থাৎ কর্মণোঽন্যত্র লোকোঽয়ং কর্মবন্ধনঃ)* সমস্ত অবৈধ কর্ম, অথবা অনিচ্ছাকৃত অপরাধের ফল থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য শাস্ত্রের নির্দেশ অনুসারে যজ্ঞ অনুষ্ঠান করা অবশ্য কর্তব্য। তার ফলে মানুষ সমস্ত পাপ থেকে

মুক্ত হতে পারে। আর যারা তা না করে নিজের স্বার্থে অথবা ইন্দ্রিয়-তৃপ্তির জন্য কর্ম করে, তাদের কৃত পুঞ্জীভূত পাপরাশির জন্য তাদেরকে সব রকম দুঃখ-দুর্দশা ভোগ করতে হয়। অতএব যজ্ঞ করার মুখ্য উদ্দেশ্য হচ্ছে পরমেশ্বর ভগবান শ্রীহরির সন্তুষ্টি বিধান করা। যজ্ঞ অনুষ্ঠানের বিধি কাল, স্থান এবং পাত্র অনুসারে বিভিন্ন হতে পারে, কিন্তু সর্বকালে এবং সমস্ত পরিস্থিতিতে তার উদ্দেশ্য হচ্ছে একটিই—পরমেশ্বর শ্রীহরির সন্তুষ্টি বিধান করা। এটিই পুণ্য জীবনের পন্থা এবং এই জগতে শান্তি ও সমৃদ্ধি লাভের উপায়। এই পৃথিবীর একজন আদর্শ রাজারূপে মহারাজ যুধিষ্ঠির এইভাবে আচরণ করেছিলেন।

রাজ্য শাসনের ব্যাপারে যেখানে মানুষ এবং পশুবধকে একটি স্বীকৃত কলা বলে বিবেচনা করা হয়েছে, সেক্ষেত্রে যুধিষ্ঠির মহারাজ রাজকার্য পরিচালনার জন্য তাঁর দৈনন্দিন কর্তব্য সম্পাদন করতে গিয়ে নিজেকে যদি একজন পাপী বলে মনে করেন, তা হলে ভগবানের সন্তুষ্টি বিধানের উদ্দেশ্যে যজ্ঞ সম্পাদন করার সব রকম সাধন বর্জিত এই কলিযুগের অশিক্ষিত জনসাধারণ জ্ঞাতসারে অথবা অজ্ঞাতসারে কত যে পাপ করছে তা আমরা সহজেই অনুমান করতে পারি। তাই *শ্রীমদ্ভাগবতে* বলা হয়েছে যে, মানুষের প্রধান কর্তব্য হচ্ছে তার স্বধর্ম অনুষ্ঠানের দ্বারা পরমেশ্বর ভগবানের সন্তুষ্টি বিধান করা। (ভাঃ ১/২/১৩)

যে কোন স্থান বা সম্প্রদায় কিংবা জাতি অথবা বর্ণের যে কোন ব্যক্তি যে কোন বৃত্তিতে নিযুক্ত থাকতে পারে, কিন্তু তাকে বিশেষ স্থান, কাল এবং পাত্র অনুসারে শাস্ত্রের নির্দেশ অনুসারে যজ্ঞ অনুষ্ঠান সম্পাদন করতে সম্মত হতে হবে। বৈদিক শাস্ত্রে কলিযুগের জনসাধারণকে নিরপরাধে ভগবানের দিব্য নাম কীর্তনের দ্বারা ভগবানের মহিমা প্রচার করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে (*কীর্তনাদেব কৃষ্ণস্য মুক্তসঙ্গঃ পরং ব্রজেৎ*)। তা করার ফলে মানুষ তার সমস্ত পাপ থেকে মুক্ত হতে পারে এবং তার ফলে জীবনের পরম সিদ্ধি লাভ করে তার প্রকৃত আলয় ভগবদ্ধামে ফিরে যেতে পারে। এই মহান গ্রন্থের বিভিন্ন স্থানে একাধিক বার আমরা সে কথা আলোচনা করেছি, বিশেষ করে এই গ্রন্থের ভূমিকায় ভগবান শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর জীবনীতে; কিন্তু সমাজের শান্তি এবং সমৃদ্ধি স্থাপনের উদ্দেশ্যে বারবার সে কথার পুনরাবৃত্তি করা হচ্ছে।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় ভগবান মুক্ত কণ্ঠে ঘোষণা করেছেন, কি করলে তিনি আমাদের প্রতি প্রসন্ন হন, এবং ভগবান শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর জীবনী এবং শিক্ষায় সেই পন্থাই ব্যবহারিকভাবে প্রদর্শিত হয়েছে। কলহ এবং বৈরীতার এই অন্ধকারাচ্ছন্ন যুগে পরমেশ্বর ভগবান শ্রীহরিকে সন্তুষ্ট করার সম্যক যজ্ঞ হচ্ছে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর প্রদর্শিত পন্থা অনুসরণ করা।

সেই সমৃদ্ধির দিনেও মহারাজ যুধিষ্ঠিরকে অশ্বমেধ যজ্ঞ অনুষ্ঠান করার উদ্দেশ্যে সমস্ত সামগ্রী সংগ্রহ করার জন্য স্তূপীকৃত স্বর্ণ আহরণ করতে হয়েছিল। অতএব বর্তমান সময়ে যখন সকলেই অভাবগ্রস্ত এবং যখন স্বর্ণ প্রায় নেই বললেই চলে, তখন এই ধরনের যজ্ঞ অনুষ্ঠান করার কথা চিন্তাও করা যায় না। এই যুগে আমাদের কাছে একগাদা কাগজ রয়েছে, এবং প্রতিশ্রুতি রয়েছে যে আধুনিক সভ্যতার অর্থনৈতিক উন্নতির মাধ্যমে সেগুলিকে স্বর্ণে রূপান্তরিত করা যাবে, তথাপি ব্যক্তিগতভাবে অথবা রাষ্ট্রের পৃষ্ঠপোষকতায় সমষ্টিগতভাবে মহারাজ যুধিষ্ঠিরের মতো ধন ব্যয় করার কোন রকম সম্ভাবনা নেই। তাই এই যুগের জন্য উপযুক্ত পন্থা হচ্ছে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর প্রদর্শিত শাস্ত্রসম্মত পন্থা অনুসরণ করা। এই পন্থায় কোন প্রকার অর্থ ব্যয় করতে হয় না, কিন্তু তার ফলে অন্য সমস্ত ব্যয়সাপেক্ষ যজ্ঞ অনুষ্ঠান থেকে অধিক লাভ হয়।

বৈদিক বিধান অনুসারে অনুষ্ঠিত অশ্বমেধ অথবা গোমেধ যজ্ঞকে পশুহত্যার বিধি বলে মনে করে ভুল করা উচিত নয়। পক্ষান্তরে এই যজ্ঞে উৎসর্গীকৃত পশু বৈদিক মন্ত্র উচ্চারণের দিব্যশক্তির প্রভাবে নতুন জীবন লাভ করত। যথাযথভাবে উচ্চারিত বৈদিক মন্ত্র সাধারণ অনভিজ্ঞ মানুষের ধারণা থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। সমস্ত বৈদিক মন্ত্র সর্বতোভাবে ব্যবহারিক এবং তার প্রমাণ হচ্ছে যজ্ঞে নিবেদিত পশুর নবজীবন প্রাপ্তি।

আধুনিক যুগের তথাকথিত ব্রাহ্মণ অথবা পুরোহিতদের যথাযথভাবে বৈদিক মন্ত্র উচ্চারণ করার কোন সম্ভাবনা নেই। বর্তমানে দ্বিজকুলের অশিক্ষিত বংশধরেরা তাদের পূর্বপুরুষদের মতো নয়, এবং তাই তাদের শূদ্র বলে গণনা করা হয়, যাদের কেবল দেহেরই জন্ম হয়েছে, আত্মার সংস্কারসূচক দ্বিতীয় জন্ম হয়নি। যারা দ্বিজত্ব প্রাপ্ত হয়নি, অর্থাৎ যাদের আত্মার জন্ম হয়নি, তারা বৈদিক মন্ত্র উচ্চারণের অযোগ্য, এবং তাই মূল বৈদিক মন্ত্র উচ্চারণের কোন ব্যবহারিক উপযোগিতা নেই।

তাদের সকলকে রক্ষা করার জন্য ভগবান শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু সমস্ত ব্যবহারিক উদ্দেশ্য সাধন করে সংকীর্তন আন্দোলন যজ্ঞের প্রবর্তন করেছেন, এবং আধুনিক যুগের মানুষদের সুনিশ্চিত ও সুসংগঠিত এই পন্থা অনুসরণ করার জন্য বিশেষভাবে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

শ্লোক ৩৬

আহূতো ভগবান্ রাজ্ঞা যাজয়িত্বা দ্বিজৈর্নৃপম্ ।
উবাস কতিচিন্মাসান্ সুহৃদাং প্রিয়কাম্যয়া ॥ ৩৬ ॥

আহূতঃ—আমন্ত্রিত হয়ে; **ভগবান্**—পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ; **রাজ্ঞা**—রাজা কর্তৃক; **যাজয়িত্বা**—অনুষ্ঠান করার জন্য; **দ্বিজৈঃ**—পণ্ডিত ব্রাহ্মণদের দ্বারা; **নৃপম্**—রাজার পক্ষে; **উবাস**—বাস করেছিলেন; **কতিচিৎ**—কয়েক; **মাসান্**—মাস; **সুহৃদাম্**—আত্মীয়-স্বজনদের; **প্রিয়-কাম্যয়া**—আনন্দ বিধানের জন্য।

অনুবাদ

মহারাজ যুধিষ্ঠির কর্তৃক সেই যজ্ঞে আহূত হয়ে পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সেখানে আগমনপূর্বক (দ্বিজ) ব্রাহ্মণদের দ্বারা যজ্ঞ সম্পাদন করিয়ে আত্মীয়-স্বজনদের আনন্দ বিধানের জন্য কয়েক মাস সেখানে অবস্থান করেছিলেন।

তাৎপর্য

মহারাজ যুধিষ্ঠির ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে যজ্ঞ অনুষ্ঠানের তত্ত্বাবধান করার জন্য নিমন্ত্রণ করেছিলেন, এবং ভগবান তাঁর অগ্রজের আদেশ পালন করার জন্য অভিজ্ঞ দ্বিজ ব্রাহ্মণদের দ্বারা যজ্ঞ সম্পাদন করেছিলেন। কেবল ব্রাহ্মণ বংশে জন্মগ্রহণ করার ফলেই যজ্ঞ অনুষ্ঠান করার যোগ্যতা অর্জন করা যায় না। প্রামাণিক আচার্যের কাছে উপযুক্ত শিক্ষা এবং দীক্ষার দ্বারা দ্বিজত্ব লাভ করতে হয়। ব্রাহ্মণকুলে জাত সন্তান শূদ্রেরই সমতুল্য, এবং এই প্রকার ব্রহ্মবন্ধু বা অযোগ্য ব্রাহ্মণ সন্তানদের কখনও বৈদিক অনুষ্ঠান বা ধর্ম অনুষ্ঠান করতে দেওয়া উচিত নয়। শ্রীকৃষ্ণকে যজ্ঞের সমস্ত আয়োজনের তত্ত্বাবধান করার ভার দেওয়া হয়েছিল, এবং যেহেতু তিনি হচ্ছেন পরম পূর্ণ, তাই সফলভাবে তা সম্পাদন করার জন্য তিনি আদর্শ দ্বিজ ব্রাহ্মণদের দ্বারা সেই যজ্ঞ অনুষ্ঠান করিয়েছিলেন।

শ্লোক ৩৭

ততো রাজ্ঞাভ্যনুজ্ঞাতঃ কৃষ্ণয়া সহ বন্ধুভিঃ ।
যযৌ দ্বারবতীং ব্রহ্মন্ সার্জুনো যদুভির্বৃতঃ ॥ ৩৭ ॥

ততঃ—তারপর; **রাজ্ঞা**—মহারাজ কর্তৃক; **অভ্যনুজ্ঞাতঃ**—অনুমতি লাভ করে; **কৃষ্ণয়া**—এবং দ্রৌপদী কর্তৃক; **সহ বন্ধুভিঃ**—অন্যান্য আত্মীয় ও বন্ধুবান্ধবসহ; **যযৌ**—গিয়েছিলেন; **দ্বারবতীম্**—দ্বারকাধামে; **ব্রহ্মণ্**—হে ব্রাহ্মণগণ; **স-অর্জুনঃ**—অর্জুনসহ; **যদুভিঃ**—যদুবংশীয়দের দ্বারা; **বৃতঃ**—পরিবৃত হয়ে।

অনুবাদ

হে শৌনক, তারপর দ্রৌপদীসহ মহারাজ যুধিষ্ঠির এবং বন্ধুবান্ধবদের বিদায় জানিয়ে অর্জুনসহ ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যাদবগণ পরিবেষ্টিত হয়ে দ্বারকা নগরীর উদ্দেশ্যে যাত্রা করলেন।

ইতি "মহারাজ পরীক্ষিতের জন্ম" নামক শ্রীমদ্ভাগবতের প্রথম স্কন্ধের দ্বাদশ পরিচ্ছেদের ভক্তিবেদান্ত তাৎপর্য।

ত্রয়োদশ অধ্যায়

ধৃতরাষ্ট্র গৃহত্যাগ করলেন

শ্লোক ১

সূত উবাচ

বিদুরস্তীর্থযাত্রায়াং মৈত্রেয়াদাত্মনো গতিম্ ।
জ্ঞাত্বাগাদ্ধাস্তিনপুরং তয়াবাপ্তবিবিৎসিতঃ ॥ ১ ॥

সূতঃ উবাচ—শ্রীসূত গোস্বামী বললেন; **বিদুরঃ**—বিদুর; **তীর্থ-যাত্রায়াম্**—তীর্থ পর্যটন কালে; **মৈত্রেয়াৎ**—মহর্ষি মৈত্রেয়ের কাছে; **আত্মনঃ**—আত্মার; **গতিম্**—গতি; **জ্ঞাত্বা**—জেনে; **আগাৎ**—ফিরে গিয়েছিলেন; **হস্তিনপুরম্**—হস্তিনাপুর নগরে; **তয়া**—সেই জ্ঞানের দ্বারা; **অবাপ্ত**—যথেষ্টভাবে লাভ করে; **বিবিৎসিতঃ**—জ্ঞাতব্য সমস্ত বিষয়ে যথাযথভাবে অবগত হয়ে।

অনুবাদ

শ্রীসূত গোস্বামী বললেন, তীর্থ পর্যটন কালে মহর্ষি মৈত্রেয়ের কাছে জীবের পরম গতি সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করে বিদুর হস্তিনাপুর নগরে ফিরে গেলেন। তিনি ইষ্টবিষয়ক সমস্ত জ্ঞান লাভ করেছিলেন।

তাৎপর্য

বিদুর হচ্ছেন মহাভারতের ইতিহাসে এক বিশিষ্ট চরিত্র। তিনি মহারাজ পাণ্ডুর মাতা অম্বিকার এক দাসীর গর্ভে ব্যাসদেবের ঔরসে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি হচ্ছেন যমরাজের অবতার। মণ্ডুক মুনির অভিশাপে তাঁকে শূদ্ররূপে জন্মগ্রহণ করতে হয়। সেই কাহিনীটি হচ্ছে—

এক সময় রাজার সিপাহী মণ্ডুক মুনির আশ্রমে আত্মগোপনকারী কয়েকজন চোরকে ধরে। সিপাহীরা যথারীতি সেই চোরদের গ্রেপ্তার করে এবং সেই সঙ্গে মণ্ডুক মুনিকেও গ্রেপ্তার করে। বিচারক মুনিকে চোর সাব্যস্ত করে তাঁকে শূলে চড়িয়ে মৃত্যুদণ্ডের আদেশ দেন। মুনিকে যখন শূলে চড়ান হচ্ছিল, তখন সেই

সংবাদ রাজার কাছে পৌঁছায়, এবং রাজা তাঁকে একজন মহান্ মুনি বলে জানতে পেরে তৎক্ষণাৎ সেই দণ্ড প্রত্যাহার করেন। রাজা ব্যক্তিগতভাবে তাঁর কর্মচারীর এই ত্রুটির জন্য মুনির কাছে ক্ষমা ভিক্ষা করেন।

মুনি তৎক্ষণাৎ জীবের ভাগ্য-নিয়ন্ত্রণকারী যমরাজের কাছে যান। মুনির প্রশ্নের উত্তরে যমরাজ বলেন যে, মুনি তাঁর শৈশবে তীক্ষ্ণ তৃণের দ্বারা একটি পতঙ্গকে বিদীর্ণ করেছিলেন এবং তার ফলে এই দণ্ড ভোগ করার উপক্রম হয়েছিল।

মুনি সে কথা শুনে মনে করেছিলেন, শৈশবের অজ্ঞানতাবশত এই স্বল্প অপরাধের ফলে এই গুরুদণ্ড দেওয়া যমরাজের পক্ষে অন্যায় হয়েছে, এবং তাই তিনি যমরাজকে অভিশাপ দেন যে, তাঁকে শূদ্র হয়ে জন্মগ্রহণ করতে হবে।

ধৃতরাষ্ট্র এবং পাণ্ডুর শূদ্র-ভ্রাতা বিদুর হচ্ছেন যমরাজের এই শূদ্ররূপী অবতার। ভীষ্মদেব কুরুবংশের এই শূদ্র-সন্তানটিকে তাঁর অন্যান্য ভ্রাতুষ্পুত্রদের সঙ্গে সমভাবে প্রতিপালন করেন। যথাসময়ে বিদুর এক কন্যার পাণিগ্রহণ করেন, সেই কন্যাটিও শূদ্রাণীর গর্ভে ব্রাহ্মণের ঔরসে জন্মগ্রহণ করেছিলেন।

বিদুর যদিও তাঁর পিতার (ভীষ্মদেবের ভ্রাতার) রাজ্য লাভ করেননি, কিন্তু তবুও তাঁর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ধৃতরাষ্ট্র তাঁকে যথেষ্ট ধন-সম্পত্তি দান করেছিলেন। বিদুর তাঁর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার প্রতি বিশেষ অনুরক্ত ছিলেন, এবং সব সময় তিনি তাঁকে সৎপথে পরিচালিত করতে চেষ্টা করতেন।

ভ্রাতৃঘাতী কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের প্রাক্কালে বিদুর পাণ্ডু-পুত্রদের প্রতি ন্যায্য বিচার করার জন্য তাঁর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে বারবার অনুরোধ করেছিলেন, কিন্তু দুর্যোধন তাঁর পিতৃব্যের এই ধরনের চেষ্টা মোটেই পছন্দ করেনি এবং তাই সে বিদুরকে কার্যত অপমান করেছিল। তার ফলে, বিদুর গৃহত্যাগ করে তীর্থ-পর্যটনে যান এবং মহর্ষি মৈত্রেয়ের কাছে পরমার্থ বিষয়ক উপদেশ লাভ করেন।

শ্লোক ২

যাবতঃ কৃতবান্ প্রশ্নান্ ক্ষত্তা কৌষারবাগ্রতঃ ।
জাতৈকভক্তির্গোবিন্দে তেভ্যশ্চোপররাম হ ॥২॥

যাবতঃ—সেই সমস্ত; **কৃতবান্**—তিনি করেছিলেন; **প্রশ্নান্**—প্রশ্নসমূহ; **ক্ষত্তা**—বিদুরের আর একটি নাম; **কৌষারব**—মৈত্রেয়ের আর একটি নাম; **অগ্রতঃ**—উপস্থিতিতে; **জাত**—জাত; **এক**—এক; **ভক্তিঃ**—ভগবদ্ভক্তি; **গোবিন্দে**—শ্রীকৃষ্ণের প্রতি; **তেভ্য**—সেই সমস্ত প্রশ্ন বিষয়ক; **চ**—এবং; **উপররাম**—বিরত; **হ**—হয়েছিলেন।

অনুবাদ

মৈত্রেয় মুনির কাছে নানা রকম প্রশ্ন করে শ্রীকৃষ্ণের প্রতি ঐকান্তিক ভক্তি লাভ করার পর আরও প্রশ্ন করা থেকে বিদুর বিরত হলেন।

তাৎপর্য

মৈত্রেয় ঋষিকে প্রশ্ন করার মাধ্যমে বিদুর যখন হৃদয়ঙ্গম করতে পেরেছিলেন যে, পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ, যিনি হলেন গোবিন্দ, অর্থাৎ যিনি সকল বিষয়ে তাঁর ভক্তসমূহের সন্তুষ্টিবিধান করে থাকেন, তাঁরই অপ্রাকৃত সেবায় অবশেষে যুক্ত হওয়াই জীবনের পরম উদ্দেশ্য, তখন তিনি প্রশ্ন করা থেকে বিরত হয়েছিলেন। জড় জগতের বন্ধনে আবদ্ধ জীবসত্তা, বদ্ধ জীবমাত্রেই জড়জাগতিক মানসিকতা নিয়ে, ইন্দ্রিয়াদির মাধ্যমে সুখের সন্ধান করে থাকে, কিন্তু তাতে সে সন্তুষ্টি লাভ করতে পারে না। সে তখন প্রয়োগলব্ধ দার্শনিক মনোধর্মপ্রসূত পদ্ধতি এবং জল্পনা-কল্পনার মাধ্যমে পরম সত্যের অনুসন্ধান করতে থাকে। কিন্তু চরম লক্ষ্য খুঁজে না পেলে, সে আবার জড়জাগতিক কার্যকলাপের মধ্যে নেমে যায়, এবং নানা ধরনের জনকল্যাণকর এবং পরহিতব্রতী কর্মকাণ্ডে প্রবৃত্ত হয়, সেই সব কিছুই তার সন্তুষ্টিবিধানে ব্যর্থই হয়।

সুতরাং, সকাম কর্ম অথবা শুষ্ক দার্শনিক জ্ঞানের জল্পনা কখনই জীবকে পূর্ণ তৃপ্তি দিতে পারে না, কারণ গুণগতভাবে প্রতিটি জীবসত্তাই পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের নিত্যসেবক এবং সমস্ত বৈদিক শাস্ত্র তাকে সেই চরম লক্ষ্যের দিকেই পরিচালিত করে থাকে। *শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা (১৫/১৫)* এই উক্তিটি প্রতিপন্ন করেছেন।

বিদুরের মতোই মৈত্রেয় ঋষির অনুরূপ আদর্শ সদ্গুরুর শরণাগত হওয়া এবং বুদ্ধিদীপ্ত প্রশ্নের মাধ্যমে কর্ম (ফলাশ্রয়ী সকাম কর্ম), জ্ঞান (পরম সত্য উপলব্ধির উদ্দেশ্যে তত্ত্বগত গবেষণা) এবং যোগ (পারমার্থিক উপলব্ধির পথে সংযোগ সাধনের প্রক্রিয়া) সম্বন্ধে অবগত হওয়ার চেষ্টা করা, জিজ্ঞাসু বদ্ধ জীবাত্মার অবশ্যই কর্তব্য। গুরুদেবের কাছে প্রশ্নাদি উত্থাপন করতে ঐকান্তিকভাবে যারা আগ্রহী নয়, তাদের লোক দেখানো গুরু গ্রহণের কোন প্রয়োজন নেই। তেমনই, কোনও গুরু যদি তার শিষ্যকে শেষ অবধি পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সেবা-চর্চায় নিযুক্ত করতে না পারে, তাকেও গুরুর ভূমিকা পালন করতে দেওয়ার কোনও সার্থকতা নেই। মৈত্রেয় ঋষির মতো একজন আদর্শ সদ্গুরুর শরণাগত হতে পেরেছিলেন বিদুর এবং জীবনের চরম উদ্দেশ্য, অর্থাৎ গোবিন্দের প্রতি ভক্তি লাভ করেছিলেন। তাই তাঁর পক্ষে পারমার্থিক বিষয়ে জানার আর কিছু ছিল না।

শ্লোক ৩-৪

তং বন্ধুমাগতং দৃষ্ট্বা ধর্মপুত্রঃ সহানুজঃ ।
ধৃতরাষ্ট্রো যুযুৎসুশ্চ সূতঃ শারদ্বতঃ পৃথা ॥ ৩ ॥
গান্ধারী দ্রৌপদী ব্রহ্মন্ সুভদ্রা চোত্তরা কৃপী ।
অন্যাশ্চ জাময়ঃ পাণ্ডোর্জ্ঞাতয়ঃ সসুতাঃ স্ত্রিয়ঃ ॥ ৪ ॥

তম্—তাকে; **বন্ধুম্**—আত্মীয়-স্বজন; **আগতম্**—সেখানে এসে; **দৃষ্ট্বা**—তা দেখে; **ধর্ম-পুত্রঃ**—যুধিষ্ঠির; **সহ-অনুজঃ**—তাঁর কনিষ্ঠ ভ্রাতাদের সঙ্গে; **ধৃতরাষ্ট্র**—ধৃতরাষ্ট্র; **যুযুৎসুঃ**—সাত্যকি; **চ**—এবং; **সূতঃ**—সঞ্জয়; **শারদ্বতঃ**—কৃপাচার্য; **পৃথা**—কুন্তী; **গান্ধারী**—গান্ধারী; **দ্রৌপদী**—দ্রৌপদী; **ব্রহ্মন্**—হে ব্রাহ্মণগণ; **সুভদ্রা**—সুভদ্রা; **চ**—এবং; **উত্তরা**—উত্তরা; **কৃপী**—কৃপী; **অন্যাঃ**—অন্য সকলে; **চ**—এবং; **জাময়ঃ**—পরিবারের অন্য সমস্ত সদস্যদের পত্নীরা; **পাণ্ডোঃ**—পাণ্ডবদের; **জ্ঞাতয়ঃ**—আত্মীয়-স্বজনেরা; **স-সুতাঃ**—তাদের পুত্রগণসহ; **স্ত্রিয়ঃ**—মহিলারা।

অনুবাদ

যখন বিদুরকে প্রাসাদে ফিরে আসতে দেখলেন, তখন সমস্ত গৃহবাসী—মহারাজ যুধিষ্ঠির, তাঁর কনিষ্ঠ ভ্রাতারা, ধৃতরাষ্ট্র, সাত্যকি, সঞ্জয়, কৃপাচার্য, কুন্তী, গান্ধারী, দ্রৌপদী, সুভদ্রা, উত্তরা, কৃপী, কৌরবদের আরও অনেক পত্নীগণ এবং সন্তানাদিসহ অন্যান্য মহিলারা সবাই মহানন্দে দ্রুত সেখানে এলেন। মনে হচ্ছিল যেন দীর্ঘকাল পর তাঁরা আবার তাদের চেতনা ফিরে পেলেন।

তাৎপর্য

গান্ধারী : পৃথিবীর ইতিহাসে আদর্শ সতীসাধ্বী নারী। তিনি ছিলেন গান্ধারের (বর্তমান আফ্‌গানিস্তানের কান্দাহার প্রদেশের) রাজা সুবলের কন্যা। কুমারী অবস্থায় তিনি শিবের পূজা করেছিলেন। হিন্দু পরিবারের কুমারী কন্যারা ভাল স্বামী পাবার উদ্দেশ্যে সাধারণত শিবের পূজা করে। গান্ধারী শিবকে সন্তুষ্ট করেন, এবং শিবের বরে একশত পুত্রলাভের উদ্দেশ্যে, ধৃতরাষ্ট্র জন্মান্ধ হলেও তাঁর সঙ্গেই গান্ধারীর বিবাহ স্থির হয়েছিল।

যখন গান্ধারী জানতে পারলেন যে, তাঁর ভাবী পতি অন্ধ, তখন তাঁর জীবন-সহচরের অনুগমন করার মানসে তিনি স্বেচ্ছায় অন্ধত্ব বরণ করার সঙ্কল্প গ্রহণ করেন। তাই তিনি অনেকগুলি পট্টবস্ত্রের দ্বারা তাঁর চক্ষু আবৃত করেন, এবং তাঁর

জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা শকুনির তত্ত্বাবধানে ধৃতরাষ্ট্রের সঙ্গে তাঁর বিবাহ হয়। তিনি ছিলেন সেই সময়কার সব চেয়ে সুন্দরী রমণী এবং নারীসুলভ সমস্ত গুণাবলীতে তিনি ভূষিতা ছিলেন, তাই তিনি কৌরব সভার প্রতিটি সদস্যের প্রীতিভাজন হয়েছিলেন।

কিন্তু সমস্ত সদ্‌গুণাবলী থাকা সত্ত্বেও স্ত্রীসুলভ দুর্বলতা তাঁর ছিল এবং তাই কুন্তী যখন এক পুত্রসন্তান প্রসব করেন, তখন কুন্তীর প্রতি তিনি ঈর্ষাপরায়ণ হন। কুন্তী এবং গান্ধারী উভয় মহিষীই গর্ভবতী হন, কিন্তু কুন্তী প্রথমে পুত্র-সন্তান প্রসব করেন। তাই ক্রুদ্ধ হয়ে গান্ধারী তাঁর নিজের গর্ভে এক আঘাত করেন। ফলে, তিনি শুধুই এক মাংস-পিণ্ড প্রসব করেন। কিন্তু যেহেতু তিনি ছিলেন ব্যাসদেবের ভক্ত, তাই ব্যাসদেবের নির্দেশে, সেই মাংস-পিণ্ডটিকে একশত খণ্ডে বিভক্ত করা হয় এবং প্রতিটি খণ্ড ক্রমেই বর্ধিত হয়ে এক-একটি পুত্র-সন্তানে পরিণত হয়। এইভাবে তাঁর শত-পুত্রের জননী হওয়ার বাসনা পূর্ণ হয়েছিল, এবং তাঁর সমুন্নত মর্যাদা অনুসারে তিনি সেই সমস্ত শিশুদের প্রতিপালন করতে থাকেন।

যখন কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের ষড়যন্ত্র চলছিল, তখন তিনি পাণ্ডবদের সঙ্গে যুদ্ধ করার পক্ষপাতী ছিলেন না; বরং তিনি তাঁর স্বামী ধৃতরাষ্ট্রকে সেই ভ্রাতৃঘাতী যুদ্ধের জন্য দোষারোপ করেছিলেন। তিনি চেয়েছিলেন যে, রাজ্য দু'ভাগে ভাগ করে পাণ্ডুপুত্রদের এবং তাঁর পুত্রদের দেওয়া হোক।

কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে তাঁর সমস্ত সন্তানদের মৃত্যু হওয়ায় তিনি অত্যন্ত শোকাতুরা হয়েছিলেন, এবং তিনি ভীমসেন এবং যুধিষ্ঠিরকে অভিশাপ দিতে চেয়েছিলেন। কিন্তু ব্যাসদেব তাঁকে নিরস্ত করেন।

শ্রীকৃষ্ণের সম্মুখে তিনি যখন দুর্যোধন এবং দুঃশাসনের মৃত্যুর জন্য করুণভাবে বিলাপ করছিলেন, তখন শ্রীকৃষ্ণ তাঁকে দিব্যজ্ঞান প্রদান করার মাধ্যমে সান্ত্বনা দিয়েছিলেন। কর্ণের মৃত্যুতেও তিনি অত্যন্ত মর্মাহত হয়েছিলেন, এবং শ্রীকৃষ্ণের কাছে কর্ণের পত্নীর শোকবিলাপ বর্ণনা করেছিলেন।

শ্রীল ব্যাসদেব যখন তাঁকে দেখান যে, তাঁর মৃত পুত্ররা স্বর্গ-লোকে উন্নীত হয়েছেন, তখন তিনি শান্ত হন। গঙ্গার উৎস-মুখের সন্নিকটে হিমালয় পর্বতের অরণ্যে দাবানলে দগ্ধ হয়ে তিনি তাঁর পতির সঙ্গে মৃত্যুবরণ করেন। যুধিষ্ঠির মহারাজ তাদের শ্রাদ্ধানুষ্ঠানাদি সম্পাদন করেছিলেন।

পৃথা ঃ মহারাজ সুরসেনের কন্যা এবং শ্রীকৃষ্ণের পিতা বসুদেবের ভগ্নী। পরবর্তীকালে মহারাজ কুন্তিভোজ তাঁকে তাঁর পালিতা কন্যারূপে গ্রহণ করেন, এবং তার ফলে তাঁর নাম হয় কুন্তী। তিনি পরমেশ্বর ভগবানের সাফল্য শক্তির প্রকাশ।

স্বর্গের দেবতারা মহারাজ কুন্তিভোজের প্রাসাদে আসতেন, এবং কুন্তী তাঁদের অভ্যর্থনা-আপ্যায়নে নিযুক্ত থাকতেন।

তিনি মহা যোগীপুরুষ দুর্বাসা মুনিরও সেবা করেছিলেন এবং তাঁর একান্ত সেবায় সন্তুষ্ট হয়ে দুর্বাসা মুনি তাঁকে একটি মন্ত্র দান করেন, যার সাহায্যে তিনি যে কোন দেবতাকে তাঁর খুশিমতো আহ্বান করতে পারতেন। কৌতূহলের বশে, তিনি তৎক্ষণাৎ সূর্যদেবকে আহ্বান করেন। সূর্যদেব তৎক্ষণাৎ সেখানে এসে উপস্থিত হন এবং কুন্তীদেবীর সঙ্গ কামনা করেন। কিন্তু কুন্তী তাঁকে প্রত্যাখ্যান করেন। তখন সূর্যদেব তাঁকে আশ্বাস দেন যে, তাঁর কুমারীত্ব অক্ষুণ্ণ থাকবে, এবং তাই কুন্তী তাঁর প্রস্তাবে সম্মত হন। এই মিলনের ফলে তিনি গর্ভবতী হন, এবং কর্ণের জন্ম হয়। সূর্যের কৃপায় তিনি পুনরায় তাঁর কুমারীত্ব ফিরে পান, কিন্তু পিতামাতার ভয়ে তিনি নবজাত শিশু কর্ণকে পরিত্যাগ করেন।

পরে যখন তিনি বাস্তবিক তাঁর পতি নির্বাচন করেন, তখন পাণ্ডুকেই তাঁর পতিরূপে মনোনয়ন করেন। মহারাজ পাণ্ডু পরে সংসার আশ্রম থেকে অবসর গ্রহণ করে সন্ন্যাস আশ্রম অবলম্বন করতে মনস্থ করেন। কুন্তী তাঁর পতির এই সঙ্কল্প মেনে নিতে রাজী হননি, কিন্তু অবশেষে মহারাজ তাঁকে অন্য কোনও উপযুক্ত পুরুষকে আহ্বান করে পুত্রসন্তানাদির জননী হতে অনুমতি দিয়েছিলেন।

প্রথমে কুন্তী সেই প্রস্তাবে সম্মত হননি। কিন্তু পাণ্ডু যখন তাঁকে জাজ্বল্যমান দৃষ্টান্তাদি দেখালেন, তখন তিনি সম্মত হয়েছিলেন। তাই দুর্বাসা মুনি প্রদত্ত মন্ত্রের সাহায্যে তিনি ধর্মরাজকে আহ্বান করেন, এবং তার ফলে যুধিষ্ঠিরের জন্ম হয়। তিনি বায়ুর দেবতা পবনদেবকে আহ্বান করেন, এবং তার ফলে ভীমের জন্ম হয়। তিনি স্বর্গের রাজা ইন্দ্রকে আহ্বান করেন, এবং তার ফলে অর্জুনের জন্ম হয়। নকুল ও সহদেব নামে অন্য দুটি পুত্র পাণ্ডুর নিজের ঔরসে মাদ্রীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন।

পরে, অল্প বয়সে মহারাজ পাণ্ডুর মৃত্যু হলে, কুন্তী এতই মর্মাহত হন যে, তিনি মূর্ছিত হয়ে পড়েন। কুন্তী এবং মাদ্রী, পাণ্ডুর উভয় পত্নী স্থির করেন যে, পাণ্ডুর পাঁচটি নাবালক পুত্রের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য কুন্তীর জীবিত থাকা উচিত এবং মাদ্রী সতী প্রথা অবলম্বন করে স্বেচ্ছায় তাঁর পতির সাথে সহমরণ বরণ করবেন। সেই উপলক্ষ্যে উপস্থিত শতসৃঙ্গ প্রমুখ মহর্ষিরা তাদের এই সিদ্ধান্তটি অনুমোদন করেছিলেন।

পরে, দুর্যোধনের চক্রান্তে যখন পাণ্ডবেরা রাজ্য থেকে নির্বাসিত হল, তখন কুন্তী তাঁর পুত্রদের সঙ্গেই ছিলেন, এবং তাদের সঙ্গে সমানভাবে সকল রকমের

দুঃখ-দুর্দশার সম্মুখীন হন। বনবাসকালে হিড়িম্বা নামে এক রাক্ষসী ভীমকে পতিরূপে বরণ করতে চায়। ভীম তা প্রত্যাখ্যান করেন, কিন্তু হিড়িম্বা যখন কুন্তী এবং যুধিষ্ঠিরের কাছে গিয়ে প্রস্তাব রাখে, তখন তার মনোবাসনা পূর্ণ করে তাকে একটি পুত্র সন্তান দান করার জন্য ভীমকে তাঁরা আদেশ দেন। এই মিলনের ফলে ঘটোৎকচের জন্ম হয় এবং সে অতি বীরত্ব সহকারে তার পিতার সাথে থেকে কৌরবদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিল।

তাঁদের বনবাসকালে তাঁরা এক ব্রাহ্মণ পরিবারের সঙ্গে থাকতেন; সেই পরিবারটি তখন বকাসুর নামে এক রাক্ষসের অত্যাচারে বিব্রত হয়েছিল, এবং কুন্তী সেই বকাসুরকে বধ করে ব্রাহ্মণ পরিবারটিকে রক্ষা করার জন্য ভীমকে আদেশ দেন। তিনি যুধিষ্ঠিরকে পাঞ্চালদেশে যেতে পরামর্শ দেন। দ্রৌপদীকে এই পাঞ্চালদেশেই অর্জুন লাভ করেন, কিন্তু কুন্তীর আদেশে পাণ্ডব ভ্রাতারা পাঁচজনেই সমভাবে পাঞ্চালী অর্থাৎ দ্রৌপদীর স্বামী হন। ব্যাসদেবের উপস্থিতিতে তিনি পঞ্চ-পাণ্ডবের সাথে বিবাহিতা হন।

কুন্তীদেবী তাঁর প্রথম সন্তান কর্ণকে কখনও ভোলেননি, এবং কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে কর্ণের মৃত্যুর পর তিনি আকুলভাবে বিলাপ করেছিলেন এবং তাঁর অন্যান্য পুত্রদের সমক্ষেই স্বীকার করেছিলেন যে, মহারাজ পাণ্ডুর সঙ্গে তাঁর বিবাহ হওয়ার পূর্বে তাঁর জ্যেষ্ঠপুত্র ছিলেন কর্ণ।

কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের পরে শ্রীকৃষ্ণ যখন বাড়ি ফিরে যাচ্ছিলেন, তখন পরমেশ্বরের প্রতি তাঁর প্রার্থনাবলী মনোরমভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। পরে তিনি গান্ধারীর সঙ্গে কঠোর তপশ্চর্যা পালনের জন্য বনে গমন করেন। তিনি ত্রিশ দিন অন্তর একবার আহার গ্রহণ করতেন।

অবশেষে তিনি গভীর ধ্যানে উপবেশন করেন এবং পরে দাবানলে তাঁর দেহ ভস্মীভূত হয়।

দ্রৌপদী ঃ মহারাজ দ্রুপদের অতীব সতীসাধ্বী কন্যা এবং ইন্দ্র-পত্নী শচীদেবীর অংশপ্রকাশ। যজমুনির তত্ত্বাবধানে মহারাজ দ্রুপদ এক মহান যজ্ঞ অনুষ্ঠান করেছিলেন। তাঁর প্রথম যজ্ঞাহুতির সাহায্যে ধৃষ্টদ্যুম্নের জন্ম হয়, এবং দ্বিতীয় যজ্ঞাহুতির দ্বারা দ্রৌপদীর জন্ম হয়। সেই হেতু তিনি ধৃষ্টদ্যুম্নের ভগিনী এবং তাঁর আর এক নাম পাঞ্চালী। পঞ্চপাণ্ডব তাঁকে সাধারণভাবে প্রত্যেকেরই স্ত্রীরূপে বিবাহ করেন, এবং তাঁরা প্রত্যেকেই তাঁর গর্ভে এক-একটি পুত্র সন্তান লাভ করেন। যুধিষ্ঠির মহারাজ প্রতিভিৎ নামে এক পুত্র লাভ করেন, ভীমসেন

লাভ করেন সুতসোম নামে এক পুত্র, অর্জুনের পুত্র হল শ্রুতকীর্তি, নকুলের পুত্র হল শতানীক এবং সহদেবের পুত্র হল শ্রুতকর্মা।

দ্রৌপদীকে অতি সুন্দরী রমণীরূপে তাঁকে তাঁর শ্বশ্রূমাতা কুন্তীর সমতুল্য বর্ণনা করা হয়েছে। তাঁর জন্মের সময় দৈববাণী হয় যে, তাঁর নাম হবে কৃষ্ণা। সেই দৈববাণীতে আরও ঘোষিত হয় যে, বহু ক্ষত্রিয় সংহার করার জন্য তাঁর জন্ম হয়েছে। শঙ্করের আশীর্বাদে তিনি সমযোগ্যতাসম্পন্ন পাঁচজন পতি লাভ করেছিলেন। তিনি যখন নিজ পতি মনোনয়ন করতে চান, তখন তাঁর স্বয়ংবর সভায়, পৃথিবীর সমস্ত দেশের রাজা এবং রাজপুত্রদের আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল। পাণ্ডবদের বনবাসকালে তাঁদের সঙ্গে তাঁর বিবাহ হয়। কিন্তু তাঁরা যখন তাঁদের রাজ্যে ফিরে যান, তখন মহারাজ দ্রুপদ তাঁদের যৌতুকস্বরূপ প্রচুর সম্পদ দান করেছিলেন। ধৃতরাষ্ট্রের অন্য সমস্ত পুত্রবধূরা তাঁকে পরম সমাদরে গ্রহণ করেছিলেন। কপট দ্যূতক্রীড়ায় যুধিষ্ঠির যখন তাঁকে হারায়, তখন তাঁকে বলপূর্বক সভায় টেনে নিয়ে আসা হয়েছিল এবং সেখানে ভীষ্ম আর দ্রোণের মতো প্রবীণ ব্যক্তিবর্গের উপস্থিতি সত্ত্বেও, তাঁর নগ্ন সৌন্দর্য দর্শনের জন্য দুঃশাসন চেষ্টা করেছিল।

দ্রৌপদী ছিলেন শ্রীকৃষ্ণের মহান ভক্ত এবং তাঁর প্রার্থনায় ভগবান স্বয়ং এক অন্তহীন বসনে পরিণত হয়ে তাঁকে সেই অপমান থেকে রক্ষা করেছিলেন। জটাসুর নামে এক অসুর তাঁকে অপহরণ করেছিল, কিন্তু তাঁর দ্বিতীয় পাণ্ডব স্বামী ভীমসেন সেই অসুরকে সংহার করে তাঁকে রক্ষা করেন।

শ্রীকৃষ্ণের কৃপায় তিনি মহর্ষি দুর্বাসার অভিশাপ থেকে পাণ্ডবদের রক্ষা করেন। পাণ্ডবরা যখন বিরাট রাজার প্রাসাদে অজ্ঞাতবাস করছিলেন, তখন কীচক তাঁর অপরূপ সৌন্দর্যে আকৃষ্ট হয়েছিল এবং ভীমসেনের হাতে সেই শয়তানেরও মৃত্যু হয় আর তিনি রক্ষা পান। অশ্বত্থামা যখন তাঁর পঞ্চপুত্রকে হত্যা করে, তখন তিনি অত্যন্ত মর্মাহত হয়েছিলেন। অবশেষে পাণ্ডবদের মহাপ্রস্থানের সময় তিনিও তাঁর স্বামী যুধিষ্ঠির এবং অন্যান্য সকলের সঙ্গে গিয়েছিলেন এবং পথে তিনি দেহ-ত্যাগ করেছিলেন। যুধিষ্ঠির মহারাজ তাঁর দেহত্যাগের কারণ বিশ্লেষণ করেছিলেন, কিন্তু যুধিষ্ঠির মহারাজ যখন স্বর্গলোকে প্রবেশ করেন তখন তিনি দেখেন যে, দ্রৌপদী সেখানে লক্ষ্মীদেবী রূপে স্বমহিমায় বিরাজ করছেন।

সুভদ্রা ঃ বসুদেবের কন্যা এবং শ্রীকৃষ্ণের ভগিনী। তিনি কেবল বসুদেবেরই প্রিয় কন্যা ছিলেন না, শ্রীকৃষ্ণ এবং বলরামেরও অত্যন্ত প্রিয় ভগিনী ছিলেন। পুরীর প্রসিদ্ধ জগন্নাথ মন্দিরে তিনি তাঁর দুই ভাইয়ের সঙ্গে একত্রে অধিষ্ঠিতা

আছেন। সেই মন্দিরে আজও প্রতিদিন হাজার হাজার মানুষ তাঁদের দর্শন করতে যান। সূর্যগ্রহণ উপলক্ষ্যে কুরুক্ষেত্রে শ্রীকৃষ্ণের আগমন এবং পরে বৃন্দাবনবাসীদের সঙ্গে তাঁর মিলনের স্মৃতি বহন করছে এই মন্দিরটি। সেই সময় শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে শ্রীমতী রাধারানীর মিলন এক অতি করুণ কাহিনী, এবং শ্রীমতী রাধারানীর ভাবে ভাবিত শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু জগন্নাথ পুরীতে সর্বদা শ্রীকৃষ্ণের জন্য আকুল হয়ে থাকতেন।

দ্বারকায় অবস্থানকালে অর্জুন সুভদ্রাকে মহিষীরূপে লাভের আকাঙ্ক্ষা করেন এবং তাঁর সেই বাসনা তিনি শ্রীকৃষ্ণের কাছে ব্যক্ত করেন। শ্রীকৃষ্ণ জানতেন যে, তাঁর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীবলদেব অন্যত্র সুভদ্রার বিবাহের আয়োজন করছিলেন। বলদেবের সেই প্রচেষ্টার বিরুদ্ধাচরণ করার সাহস তাঁর ছিল না বলে তিনি সুভদ্রাকে হরণ করার জন্য অর্জুনকে পরামর্শ দেন। তাই তাঁরা যখন রৈবত পর্বতে এক প্রমোদ-ভ্রমণে গিয়েছিলেন, সেই সময়ে অর্জুন শ্রীকৃষ্ণের পরিকল্পনা অনুসারে সুভদ্রাকে হরণ করেন। শ্রীবলদেব অর্জুনের প্রতি অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হন এবং তাঁকে সংহার করতে চেয়েছিলেন, কিন্তু অর্জুনকে ক্ষমা করার জন্য শ্রীকৃষ্ণ তাঁর ভ্রাতাকে অনুনয় করেন। তখন যথাযথভাবে অর্জুনের সঙ্গে সুভদ্রার বিবাহ হয় এবং অভিমন্যু সুভদ্রার পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করে। অভিমন্যুর অকাল মৃত্যুতে সুভদ্রা অত্যন্ত মর্মাহত হন, কিন্তু পরীক্ষিতের জন্ম হলে তিনি খুশি হন এবং সান্ত্বনা লাভ করেন।

শ্লোক ৫

প্রত্যুজ্জগ্মুঃ প্রহর্ষেণ প্রাণং তন্ব ইবাগতম্ ।
অভিসঙ্গম্য বিধিবৎ পরিষ্বঙ্গাভিবাদনৈঃ ॥ ৫ ॥

প্রতি—অভিমুখে; **উজ্জগ্মুঃ**—গিয়েছিলেন; **প্রহর্ষেণ**—আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে; **প্রাণম্**—জীবন; **তন্বঃ**—দেহের; **ইব**—মতো; **আগতম্**—ফিরে এসেছিলেন; **অভিসঙ্গম্য**—সমীপবর্তী হয়ে; **বিধিবৎ**—বিধি-অনুসারে; **পরিষ্বঙ্গ**—আলিঙ্গন করে; **অভিবাদনৈঃ**—অভিবাদনের দ্বারা।

অনুবাদ

যেন তাঁদের দেহে পুনরায় প্রাণ ফিরে এসেছে, এইভাবে পরম আকুলতার সঙ্গে তাঁরা সকলে মহানন্দে তাঁর কাছে ছুটে গিয়েছিলেন। তাঁরা পরস্পর বিধিবৎ প্রণতি বিনিময় করেছিলেন এবং পরস্পরকে আলিঙ্গন করে অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করেছিলেন।

তাৎপর্য

চেতনার অভাবে, দেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলি নিষ্ক্রিয় হয়ে থাকে। কিন্তু যখন চেতনা ফিরে আসে, তখন দেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ এবং ইন্দ্রিয়গুলি সক্রিয় হয়ে ওঠে এবং সমগ্র অস্তিত্ব তখন আনন্দময় হয়ে ওঠে। কৌরব পরিবারের সকলের কাছে বিদুর এতই প্রিয় ছিলেন যে, রাজপ্রাসাদ থেকে তাঁর দীর্ঘ অনুপস্থিতির ফলে তাঁরা নিষ্ক্রিয়ের মতোই হয়ে গিয়েছিলেন। তাঁরা সকলেই গভীরভাবে বিদুরের বিরহ অনুভব করছিলেন, এবং তাই রাজপ্রাসাদে তাঁর প্রত্যাগমন সকলকেই উৎফুল্ল করে তুলেছিল।

শ্লোক ৬

মুমুচুঃ প্রেমবাষ্পৌঘং বিরহৌৎকণ্ঠ্যকাতরাঃ ।
রাজা তমর্হয়াঞ্চক্রে কৃতাসনপরিগ্রহম্ ॥ ৬ ॥

মুমুচুঃ—উদ্ভূত হয়েছিল; **প্রেম**—অনুরাগ; **বাষ্প-ওঘম্**—অশ্রু; **বিরহ**—বিচ্ছেদ; **ঔৎকণ্ঠ্য**—উৎকণ্ঠা; **কাতরাঃ**—মর্মাহত হয়ে; **রাজা**—মহারাজ যুধিষ্ঠির; **তম্**—তাকে (বিদুরকে); **অর্হয়াম্ চক্রে**—নিবেদন করেছিলেন; **কৃত**—করেছিলেন; **আসন**—আসন; **পরিগ্রহম্**—আয়োজন।

অনুবাদ

উৎকণ্ঠা এবং দীর্ঘ বিচ্ছেদের ফলে, তাঁরা সকলে স্নেহের বশে কাঁদতে লাগলেন। মহারাজ যুধিষ্ঠির তখন উপবেশনের আসন প্রদানের আয়োজন করলেন এবং অভ্যর্থনা জানালেন।

শ্লোক ৭

তং ভুক্তবন্তং বিশ্রান্তমাসীনং সুখমাসনে ।
প্রশ্রয়াবনতো রাজা প্রাহ তেষাং চ শৃণ্বতাম্ ॥ ৭ ॥

তম্—তাঁকে (বিদুরকে); **ভুক্তবন্তম্**—তাঁকে বিপুলভাবে ভোজন করিয়ে; **বিশ্রান্তম্**—বিশ্রামান্তে; **আসীনম্**—উপবেশন করে; **সুখম্ আসনে**—আরামদায়ক আসনে; **প্রশ্রয়-অবনতঃ**—স্বভাবত অত্যন্ত নম্র এবং বিনীত; **রাজা**—মহারাজ যুধিষ্ঠির; **প্রাহ**—বলতে লাগলেন; **তেষাং চ**—এবং তাঁরা; **শৃণ্বতাম্**—শুনতে লাগলেন।

অনুবাদ

বিপুলভাবে ভোজনান্তে বিশ্রাম করে বিদুর আরামদায়ক একটি আসনে উপবেশন করলেন। তখন মহারাজ যুধিষ্ঠির স্বভাবসিদ্ধ বিনয় ও নম্রতা সহকারে তাঁর সঙ্গে কথা বলতে লাগলেন এবং উপস্থিত সকলে তা শুনতে লাগলেন।

তাৎপর্য

মহারাজ যুধিষ্ঠির অভ্যার্থনাতেও দক্ষ ছিলেন, এমন কি তাঁর পরিবারের লোকেদের ক্ষেত্রেও। পরিবারের সকলেই বিদুরকে প্রণতি নিবেদন করে এবং আলিঙ্গন করে সাদর অভ্যর্থনা জানিয়েছিলেন। তার পরে, স্নান এবং ভুরিভোজনের আয়োজন করা হয়েছিল এবং তারপর তাঁর যথেষ্ট বিশ্রাম নেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছিল।

বিশ্রামান্তে তাঁকে আরামদায়ক আসনে বসতে দেওয়া হল এবং তখন মহারাজ পারিবারিক এবং অন্যান্য বিষয়ে তাঁর সঙ্গে কথা বলা শুরু করলেন। প্রিয়বন্ধু, এমন কি শত্রুকেও অভ্যর্থনা জানাবার এটাই হল যথার্থ রীতি। ভারতীয় নীতিগত প্রথায় শত্রুও যদি গৃহে আসে, তাকে এমনভাবে অভ্যর্থনা করা উচিত যে, তার মনে যেন কোন রকম উৎকণ্ঠা বা ভয় না থাকে। শত্রু সর্বদাই তার শত্রুর ভয়ে ভীত হয়ে থাকে, কিন্তু শত্রুকে যদি শত্রু তার গৃহে অভ্যর্থনা জানায়, তা হলে তখন আর সেই ভাব তার থাকে না। অর্থাৎ কেউ যখন গৃহে আসে, তখন তার সঙ্গে আত্মীয়ের মতো আচরণ করা উচিত। সুতরাং পরিবারের সকলের শুভাকাঙ্ক্ষী বিদুরের মতো আত্মীয়ের সম্পর্কে আর বিশেষ কি বলা যেতে পারে!

এইভাবে যুধিষ্ঠির মহারাজ পরিবারের সকলের উপস্থিতিতে আলোচনা শুরু করেছিলেন।

শ্লোক ৮

যুধিষ্ঠির উবাচ

অপি স্মরথ নো যুষ্মৎ পক্ষচ্ছায়াসমেধিতান্ ।
বিপদ্গণদ্বিষাগ্ন্যাদের্মোচিতা যৎ সমাতৃকাঃ ॥ ৮ ॥

যুধিষ্ঠিরঃ উবাচ—মহারাজ যুধিষ্ঠির বললেন; **অপি**—যদি; **স্মরথ**—আপনার মনে থাকে; **নঃ**—আমাদের; **যুষ্মৎ**—আপনার কাছ থেকে; **পক্ষ**—পাখির ডানার মতো আমাদের প্রতি পক্ষপাতিত্ব; **ছায়া**—আশ্রয়; **সমেধিতান্**—আপনি আমাদের পালন

করেছিলেন; **বিপৎ-গণাৎ**—বিবিধ প্রকার বিপদ থেকে; **বিষ**—বিষ প্রয়োগে; **অগ্নি-আদেঃ**—অগ্নি সংযোগ; **মোচিতাঃ**—মুক্ত করেছিলেন; **যৎ**—আপনি যা করেছিলেন; **স**—সহ; **মাতৃকাঃ**—আমাদের মাতা।

অনুবাদ

মহারাজ যুধিষ্ঠির বললেন ঃ হে পিতৃব্য, আপনার কি মনে আছে, কিভাবে আপনি আমাদের জননী সহ সকলকে সর্বপ্রকার দুর্যোগ থেকে নিরন্তর রক্ষা করেছিলেন? পাখির ডানার মতো আপনার পক্ষপাতরূপ ছায়া বিষ প্রয়োগ এবং অগ্নিসংযোগ থেকে আমাদের বাঁচিয়ে রেখেছিল।

তাৎপর্য

পাণ্ডুর অকাল মৃত্যুর ফলে তাঁর নাবালক পুত্রগণ এবং বিধবা পত্নী পরিবারের প্রবীণ সদস্যদের, বিশেষ করে ভীষ্মদেব এবং মহাত্মা বিদুরের, বিশেষ যত্নের পাত্র হয়েছিলেন। পাণ্ডবদের রাজনৈতিক মর্যাদার পরিপ্রেক্ষিতে বিদুর তাদের প্রতি অল্পবিস্তর পক্ষপাতিত্ব করতেন। ধৃতরাষ্ট্র যদিও মহারাজ পাণ্ডুর নাবালক পুত্রদের প্রতি সমভাবে যত্নশীল ছিলেন, তবুও পাণ্ডবদের নিশ্চিহ্ন করে দিয়ে ধৃতরাষ্ট্রের নিজপুত্রদের রাজ্যের শাসকরূপে অধিষ্ঠিত করার উদ্যোগে লিপ্ত ষড়যন্ত্রকারী গোষ্ঠীর মধ্যে ধৃতরাষ্ট্র ছিলেন অন্যতম। মহাত্মা বিদুর ধৃতরাষ্ট্র এবং তার সাঙ্গোপাঙ্গদের এই চক্রান্ত অনুধাবন করতে পেরেছিলেন, এবং তাই তাঁর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ধৃতরাষ্ট্রের বিশ্বস্ত সেবক হওয়া সত্ত্বেও তিনি ধৃতরাষ্ট্রের নিজ পুত্রদের স্বার্থে পরিকল্পিত তাঁর রাজনৈতিক উচ্চাশা পছন্দ করেননি। তাই তিনি পাণ্ডবদের এবং তাদের বিধবা মাতাকে রক্ষা করার ব্যাপারে অত্যন্ত যত্নবান হয়েছিলেন।

সেই সূত্রে বলতে গেলে, ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রদের চেয়ে তিনি পাণ্ডবদেরই পক্ষপাতিত্ব করতেন, যদিও তাঁর সাধারণ দৃষ্টিতে তারা উভয়েই ছিল সমানভাবে স্নেহের পাত্র। তিনি উভয় পক্ষের ভ্রাতুষ্পুত্রদের প্রতিই সমানভাবে স্নেহশীল ছিলেন, যেহেতু তিনি দুর্যোধনকে তার জ্ঞাতি ভ্রাতাদের প্রতি চক্রান্ত করার জন্য সব সময় তিরস্কার করতেন। ধৃতরাষ্ট্র তাঁর পুত্রদের উৎসাহ প্রদান করতেন বলে বিদুর সর্বদাই, তাঁর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা হওয়া সত্ত্বেও, তাঁর সমালোচনা করতেন, এবং সেই সঙ্গে পাণ্ডবদেরও বিশেষভাবে রক্ষা করার জন্য সব সময় সতর্ক থাকতেন। রাজপ্রাসাদের রাজনীতির মধ্যে বিদুরের এই সমস্ত কার্যকলাপের জন্য তাঁকে পাণ্ডবদের প্রতি পক্ষপাতমূলক

দীর্ঘকাল তীর্থপর্যটনের উদ্দেশ্যে বিদুরের গৃহত্যাগ করার পূর্বের ইতিহাস মহারাজ যুধিষ্ঠির এখানে উল্লেখ করেছেন। মহারাজ যুধিষ্ঠির তাঁকে স্মরণ করিয়ে দিলেন যে, কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে এক বিপুল পারিবারিক বিপর্যয়ের পরেও তাঁর প্রাপ্তবয়স্ক ভ্রাতুষ্পুত্রদের প্রতি তিনি তেমনি করুণাময় এবং স্নেহপরায়ণ হয়েই ছিলেন।

কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের পূর্বে, ধৃতরাষ্ট্র পরিকল্পনা করেছিলেন শান্তিপূর্ণভাবে তিনি তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্রদের বিনষ্ট করবেন, তাই তিনি পুরোচনকে আদেশ দিয়েছিলেন বারণাবতে একটি গৃহ নির্মাণ করতে, এবং যখন সেই গৃহ নির্মাণ সম্পূর্ণ হল, তখন ধৃতরাষ্ট্র অভিলাষ করেন যে, তাঁর ভ্রাতার পরিবারবর্গ সেখানে কিছুদিন থাকবে। যখন পাণ্ডবেরা রাজপরিবারের অন্য সমস্ত সদস্যদের উপস্থিতিতে সেখানে যাত্রা করছিলেন, তখন বিদুর কৌশলে ধৃতরাষ্ট্রের দুরভিসন্ধির কথা জানিয়ে পাণ্ডবদের পরামর্শ দিয়ে দেন।

এই ঘটনা মহাভারতে *(আদি পর্ব ১১৪)* বিশেষভাবে বর্ণিত হয়েছে। তিনি পরোক্ষভাবে তাদের ইঙ্গিত দিয়েছিলেন, 'ইস্পাত বা অন্য কোন জড় উপাদানে তৈরি না হলেও কোন কোন অস্ত্র শত্রু সংহারে অনেক বেশি তীক্ষ্ণ হতে পারে, এবং এ কথা যে জানে, তার কখনও মৃত্যু হয় না।' অর্থাৎ এইভাবে তিনি পাণ্ডবদের জানিয়ে দিলেন যে, তাঁদের বারণাবতে পাঠান হচ্ছে তাঁদের বধ করবার জন্য, এবং যুধিষ্ঠিরকে সতর্ক করে দিলেন যে, তাঁরা যেন তাঁদের নতুন প্রাসাদভবনে খুব সাবধানে থাকেন। আগুনের ইঙ্গিত দিয়েও তিনি বলেছিলেন যে, আগুন আত্মাকে ধ্বংস করতে পারে না, কিন্তু জড় দেহকে সংহার করতে পারে। কিন্তু যিনি আত্মাকে রক্ষা করতে পারেন, তিনিই জীবিত থাকেন।

যুধিষ্ঠির মহারাজের সঙ্গে বিদুরের যেভাবে পরোক্ষ আলোচনা হচ্ছিল, তা কুন্তী বুঝতে পারেননি, এবং তাই তিনি যখন তাঁর পুত্রকে সেই আলোচনার তাৎপর্য সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করেন, তখন যুধিষ্ঠির উত্তর দিয়েছিলেন যে, বিদুরের কথা থেকে বোঝা গেল যে, তাঁরা যে গৃহে বাস করতে যাচ্ছেন, সেখানে আগুনের সম্ভাবনা রয়েছে।

পরে, বিদুর গোপনে পাণ্ডবদের কাছে এসেছিলেন এবং তাঁদের জানিয়ে দিয়েছিলেন যে, কৃষ্ণপক্ষের চতুর্দশীর রাত্রে গৃহরক্ষী সেই গৃহে অগ্নি সংযোগ করতে চলেছে। এটাই ছিল ধৃতরাষ্ট্রের চক্রান্ত, যাতে পাণ্ডবেরা একসঙ্গে তাঁদের মায়ের সাথে মারা যেতে পারে।

তবে, বিদুরের সতর্কতায় পাণ্ডবেরা মাটির তলায় এক সুড়ঙ্গের মধ্যে দিয়ে সেখান থেকে এমনভাবে বেরিয়ে গিয়েছিলেন যে, ধৃতরাষ্ট্রও তাঁদের অভিপ্রস্থান

সম্বন্ধে কিছুই জানতে পারেননি, এবং অগ্নি সংযোগের পরে, কৌরবেরা পাণ্ডবদের মৃত্যু সম্বন্ধে এমনই নিশ্চিত হয়েছিল যে, ধৃতরাষ্ট্র মহা উল্লাসে মৃত্যুর অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া সম্পন্ন করেছিলেন। আর, শোকপালন পর্বে প্রাসাদের সমস্ত লোক শোকে মুহ্যমান হয়ে পড়েছিল, কিন্তু বিদুর তা হননি, তাঁর জানা ছিল যে, পাণ্ডবরা অন্যত্র জীবিতই রয়েছেন।

এই রকম বহু দুর্বিপাকের ঘটনা আছে, এবং প্রত্যেকটিতেই বিদুর একদিকে পাণ্ডবদের রক্ষা করেছিলেন, আর অন্যদিকে তিনি তাঁর ভ্রাতা ধৃতরাষ্ট্রকে এই ধরনের চক্রান্ত করা থেকে বিরত করতে চেষ্টা করেছিলেন। তাই, পাখি যেমন তার পক্ষছায়ার দ্বারা তার ডিমগুলিকে আগলে রাখে, বিদুর ঠিক তেমন-ভাবেই সর্বদা পাণ্ডবদের প্রতি পক্ষপাতপূর্ণ হয়েই ছিলেন।

শ্লোক ৯

কয়া বৃত্ত্যা বর্তিতং বশ্চরদ্ভিঃ ক্ষিতিমণ্ডলম্ ।
তীর্থানি ক্ষেত্রমুখ্যানি সেবিতানীহ ভূতলে ॥ ৯ ॥

কয়া—কিসের দ্বারা; **বৃত্ত্যা**—উপায়; **বর্তিতম্**—দেহ ধারণ; **বঃ**—আপনি; **চরদ্ভিঃ**—ভ্রমণকালে; **ক্ষিতিমণ্ডলম্**—পৃথিবীমণ্ডলে; **তীর্থানি**—তীর্থস্থানে; **ক্ষেত্রমুখ্যানি**—প্রধান প্রধান তীর্থক্ষেত্রে; **সেবিতানি**—আপনি সেবা করেছেন; **ইহ**—এই পৃথিবীতে; **ভূতলে**—এই ভূমণ্ডলে।

অনুবাদ

আপনি ভূমণ্ডল পরিভ্রমণকালে কোন্ বৃত্তির দ্বারা দেহযাত্রা নির্বাহ করতেন? কোন্ কোন্ প্রধান পবিত্রধাম এবং তীর্থের সেবা আপনি করেছেন?

তাৎপর্য

পারিবারিক বিষয়াদি থেকে, বিশেষ করে রাজনৈতিক জটিলতা থেকে নিজেকে নিরাসক্ত করার উদ্দেশ্যে বিদুর প্রাসাদ থেকে চলে গিয়েছিলেন। পূর্বে বর্ণিত হয়েছে, দুর্যোধন তাঁকে শূদ্রাণীর পুত্র বলায় তিনি যথার্থই অপমানিত হয়েছিলেন, অবশ্য নিজের মাতামহী সম্পর্কে লঘুভাবে মন্তব্য করা আচারবিরোধী নয়। বিদুরের মাতা শূদ্রাণী হলেও দুর্যোধনের মাতামহী ছিলেন, এবং পৌত্র ও মাতামহীর মধ্যে কখনো কখনো পরিহাসাত্মক বাক্যালাপ স্বীকৃত হয়েই থাকে। কিন্তু যেহেতু ঐ

মন্তব্যটি ছিল বাস্তব সত্য, তাই সেই কথাটি বিদুরের কাছে শ্রুতিকটু মনে হয়েছিল, এবং সেটিকে প্রত্যক্ষ অপমান বলেই গ্রহণ করা হয়েছিল। তাই তিনি তাঁর পৈতৃক বাসভবন ত্যাগ করে সংসার ত্যাগের জীবন-যাপনের জন্য প্রস্তুত হয়েছিলেন।

এই প্রস্তুতি পর্বকে বলা হয় বানপ্রস্থ আশ্রম অর্থাৎ অবসরপ্রাপ্ত জীবনে পৃথিবীর পবিত্রধামগুলিতে পরিভ্রমণ ও দর্শন করে বেড়ানো। বৃন্দাবন, হরিদ্বার, জগন্নাথপুরী এবং প্রয়াগ প্রভৃতি ভারতের পবিত্র ধামগুলিতে বহু মহান্ ভক্ত থাকেন, এবং এখনও সেখানে পারমার্থিক জীবনে অগ্রসর হতে ইচ্ছুক মানুষদের সুবিধার জন্য বিনামূল্যের অন্নসত্র আছে। মহারাজ যুধিষ্ঠির জানতে চেয়েছিলেন, বিনামূল্যের অন্নসত্রে কৃপালাভ করে বিদুর দেহযাত্রা নির্বাহ করেছিলেন কিনা।

শ্লোক ১০

ভবদ্বিধা ভাগবতাস্তীর্থভূতাঃ স্বয়ং বিভো।
তীর্থীকুর্বন্তি তীর্থানি স্বান্তঃস্থেন গদাভৃতা ॥ ১০ ॥

ভবৎ—আপনার; **বিধাঃ**—মতো; **ভাগবতাঃ**—ভগবদ্ভক্তেরা; **তীর্থ**—পবিত্র তীর্থস্থানাদি; **ভূতাঃ**—পরিণত করা; **স্বয়ম্**—স্বয়ং; **বিভো**—হে শক্তিমান; **তীর্থী-কুর্বন্তি**—পবিত্র তীর্থধামে পরিণত করতে পারেন; **তীর্থানি**—পবিত্র তীর্থস্থানগুলিকে; **স্ব-অন্তঃ-স্থেন**—নিজের অন্তরে স্থিত; **গদাভৃতা**—পরমেশ্বর ভগবান।

অনুবাদ

হে প্রভু, আপনার মতো মহান্ ভগবদ্ভক্তরাই স্বয়ং পবিত্র তীর্থধাম স্বরূপ। কারণ আপনাদের হৃদয়ে অবস্থিত গদাধারী পরম পুরুষোত্তম ভগবানের পবিত্রতা বহন করে সমস্ত স্থানকেই তীর্থে পরিণত করে থাকেন।

তাৎপর্য

পুরুষোত্তম ভগবান তাঁর বহুবিধ শক্তির প্রভাবে সর্বত্রই বিরাজমান, ঠিক যেমন বিদ্যুৎ-শক্তি মহাশূন্যে সর্বব্যাপ্ত। তেমনই, পরমেশ্বরের সর্বব্যাপকতা উপলব্ধি করা যায় এবং প্রকটিত হয়ে থাকে বিদুরের মতো তাঁর অমলিন শুদ্ধভক্তমণ্ডলীর সাহায্যেই, ঠিক যেমন বিজলীবাতির মধ্যেই বিদ্যুৎশক্তি প্রকটিত হয়। বিদুরের মতো শুদ্ধভক্ত সর্বদাই পরমেশ্বরের উপস্থিতি সর্বত্র অনুভব করে থাকেন। তিনি পরমেশ্বরের শক্তির মধ্যে সব কিছুই দেখতে পান এবং সব কিছুর মাঝেও

পরমেশ্বরকেই দেখেন। পরমেশ্বরের অকৃত্রিম শুদ্ধভক্তমণ্ডলীর উপস্থিতির দ্বারা প্রভাবিত এক পরিবেশে মানুষের কলুষিত চেতনাকে নির্মল করে তোলার উদ্দেশ্যেই সারা পৃথিবীতে পবিত্র তীর্থস্থানগুলি রয়েছে।

যদি কেউ পবিত্র তীর্থধামে যান, তিনি অবশ্যই সেই পবিত্রধামে বসবাসকারী শুদ্ধভক্তমণ্ডলীর অন্বেষণ করবেন, তাঁদের কাছ থেকে উপদেশ গ্রহণ করবেন, সেই উপদেশগুলি ব্যবহারিক জীবনে প্রয়োগ করতে চেষ্টা করবেন, এবং সেইভাবে ক্রমশই চরম মোক্ষলাভের জন্য, ভগবদ্ধামে ফিরে যাবার জন্য নিজেকে প্রস্তুত করতে থাকবেন।

কোনও পবিত্র তীর্থস্থানে যাওয়ার উদ্দেশ্য কেবল গঙ্গা অথবা যমুনায় স্নান করা বা ঐসব জায়গায় অবস্থিত মন্দিরাদি দর্শন করা নয়। সেখানে বিদুরের প্রতিভূদেরও অন্বেষণ করতে হয়, যাঁরা পরমেশ্বর ভগবানের সেবা ছাড়া আর কোন কিছুই বাসনা করেন না। এই ধরনের শুদ্ধ ভক্তদের সঙ্গে ভগবান সর্বদাই অবস্থান করেন, কারণ তাঁদের অকৃত্রিম সেবার মধ্যে ফলাশ্রয়ী সকাম কাজকর্ম বা আকাশকুসুম জল্পনা-কল্পনার লেশমাত্র থাকে না। প্রকৃতপক্ষে তাঁরা পরমেশ্বরের প্রকৃত সেবায়, বিশেষ করে শ্রবণ এবং কীর্তনাদি প্রক্রিয়ার মাধ্যমে যুক্ত হয়েই থাকেন। শুদ্ধ ভক্তেরা প্রামাণ্য সূত্র থেকে পরমেশ্বরের মহিমা শ্রবণ করেন, কীর্তন করেন, ভজন করেন এবং নিবন্ধাদি রচনাও করেন।

মহামুনি ব্যাসদেব নারদ মুনির কাছে শ্রবণ করেছিলেন এবং তারপরে লিপি-রচনার মাধ্যমে তা কীর্তন করেছিলেন; শুকদেব গোস্বামী তাঁর পিতার কাছে অধ্যয়ন করেছিলেন এবং তিনি পরীক্ষিতের কাছে তা বর্ণনা করেন; এটাই হচ্ছে শ্রীমদ্ভাগবতের পন্থা।

সুতরাং পরমেশ্বরের শুদ্ধভক্তমণ্ডলী তাঁদের কার্যকলাপের দ্বারা যে কোন স্থানকে তীর্থস্থানে পরিণত করতে পারেন, এবং তাঁদেরই জন্য পবিত্রধামগুলি তীর্থনামে যোগ্যতা অর্জন করে থাকে। এই ধরনের শুদ্ধ ভক্তমণ্ডলী যে কোনও স্থানের কলুষময় পরিবেশ পরিশুদ্ধ করে তুলতে সক্ষম, এবং পবিত্র ধামের সুনাম নষ্ট করে যারা পেশাদারী জীবন-যাপন করতে চেষ্টা করে থাকে, সেই সমস্ত স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট লোকেদের সন্দেহজনক কার্যকলাপের দ্বারা কোনও পবিত্র ধাম অপবিত্র হয়ে গেলেও এই শুদ্ধভক্তগণই যে আবার তা পবিত্র করেন, সে সম্বন্ধে কোন সন্দেহই নেই।

শ্লোক ১১

অপি নঃ সুহৃদস্তাত বান্ধবাঃ কৃষ্ণদেবতাঃ ।
দৃষ্টাঃ শ্রুতা বা যদবঃ স্বপুর্যাং সুখমাসতে ॥

অপি—কি না; **নঃ**—আমাদের; **সুহৃদঃ**—সুহৃদবর্গ; **তাত**—হে পিতৃব্য; **বান্ধবাঃ**—বন্ধু-বান্ধব; **কৃষ্ণ-দেবতা**—পরমেশ্বর শ্রীকৃষ্ণের সেবায় যাঁরা সর্বদা নিমগ্ন; **দৃষ্টাঃ**—তাঁদের দেখে; **শ্রুতাঃ**—অথবা তাঁদের কথা শুনে; **বা**—অথবা; **যদবঃ**—যদু বংশীয়; **স্ব-পুর্যাম্**—তাঁদের বাসস্থানে; **সুখম্ আসতে**—সুখে আছে কি না।

অনুবাদ

হে পিতৃব্য, আপনি নিশ্চয়ই দ্বারকায় গিয়েছিলেন। সেই পবিত্রধামে আমাদের বন্ধুবান্ধব এবং সুহৃদবর্গ যাদবেরা রয়েছেন, যাঁরা পরমেশ্বর শ্রীকৃষ্ণের সেবায় সদামগ্ন থাকেন। আপনি নিশ্চয়ই তাঁদের দেখেছেন বা তাঁদের কথা শুনে থাকবেন। তাঁরা সকলে তাঁদের স্ব স্ব গৃহে সুখে আছেন তো?

তাৎপর্য

বিশেষ শব্দ '*কৃষ্ণদেবতা*' , অর্থাৎ, যাঁরা পরমেশ্বর শ্রীকৃষ্ণের সেবায় সদামগ্ন রয়েছেন, কথাটি তাৎপর্যপূর্ণ। যাদবেরা এবং পাণ্ডবেরা, যাঁরা সর্বদা শ্রীকৃষ্ণের চিন্তায় এবং তাঁর বিভিন্ন অপ্রাকৃত কার্যকলাপ স্মরণে মগ্ন থাকতেন, তাঁরা সকলেই ছিলেন বিদুরের মতো পরমেশ্বরের শুদ্ধ ভক্ত। বিদুর গৃহত্যাগ করেছিলেন পরমেশ্বরের সেবায় সর্বতোভাবে নিজেকে উৎসর্গ করার জন্য, কিন্তু পাণ্ডবেরা এবং যাদবেরা সর্বদাই শ্রীকৃষ্ণের চিন্তায় মগ্ন থাকতেন। তাই তাদের শুদ্ধ ভক্তি বৈশিষ্ট্যে কোন পার্থক্য ছিল না। গৃহেই থাকুন অথবা গৃহত্যাগ করুণ, শুদ্ধ ভক্তের প্রকৃত গুণ হচ্ছে যে, তিনি সর্বদাই শ্রীকৃষ্ণের অনুকূল চিন্তায় মগ্ন থাকেন, অর্থাৎ, তিনি সর্বদাই শ্রীকৃষ্ণকে পরম পুরুষোত্তম ভগবান বলে যথার্থভাবে অবগত থাকেন।

কংস, জরাসন্ধ, শিশুপাল এবং তাদের মতো অন্যান্য অসুরেরাও সর্বক্ষণ পরমেশ্বর শ্রীকৃষ্ণের চিন্তায় মগ্ন থাকত, কিন্তু তাদের সেই মগ্নতা ছিল অন্য রকমের, অর্থাৎ তারা প্রতিকূলভাবে শ্রীকৃষ্ণের কথা চিন্তা করত, অথবা, তাঁকে শুধুমাত্রই একজন শক্তিশালী পুরুষ বলে মনে করত। সুতরাং, বিদুর, পাণ্ডবগণ এবং যাদবদের মতো শুদ্ধ ভক্তের সমস্তরের ভক্তি চর্চার পর্যায়ে কংস আর শিশুপাল ছিল না।

মহারাজ যুধিষ্ঠিরও সর্বদাই শ্রীকৃষ্ণ এবং দ্বারকায় তাঁর পার্ষদদের চিন্তায় মগ্ন থাকতেন। তা না হলে তিনি বিদুরকে তাঁদের সকলের কথা জিজ্ঞাসা করতেন না। তাই মহারাজ যুধিষ্ঠির, রাজ্য শাসনের অত্যন্ত দায়িত্বপূর্ণ জাগতিক কার্যে লিপ্ত থাকা সত্ত্বেও, বিদুরেরই মতো সমস্তরের ভক্তিচর্চার পর্যায়ে অবস্থান করতেন।

শ্লোক ১২

ইত্যুক্তো ধর্মরাজেন সর্বং তৎ সমবর্ণয়ৎ ।
যথানুভূতং ক্রমশো বিনা যদুকুলক্ষয়ম্ ॥ ১২ ॥

ইতি—এইভাবে; **উক্তঃ**—জিজ্ঞাসিত হয়ে; **ধর্মরাজেন**—যুধিষ্ঠির মহারাজের দ্বারা; **সর্বম্**—সমস্ত; **তৎ**—তা; **সমবর্ণয়ৎ**—যথাযথভাবে বর্ণনা করেছিলেন; **যথা-অনুভূতম্**—তাঁর অভিজ্ঞতা অনুসারে; **ক্রমশঃ**—একে একে; **বিনা**—ব্যতীত; **যদু-কুল-ক্ষয়ম্**—যদুবংশের বিনাশ।

অনুবাদ

এইভাবে ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির প্রশ্ন করলে, মহাত্মা বিদুর যদুবংশ ধ্বংসের সমাচার ব্যতীত, ব্যক্তিগতভাবে যেসব অভিজ্ঞতা তিনি লাভ করেছিলেন, তা ক্রমশ বর্ণনা করলেন।

শ্লোক ১৩

নন্বপ্রিয়ং দুর্বিষহং নৃণাং স্বয়মুপস্থিতম্ ।
নাবেদয়ৎ সকরুণো দুঃখিতান্ দ্রষ্টুমক্ষমঃ ॥ ১৩ ॥

ননু—প্রকৃতপক্ষে; **অপ্রিয়ম্**—অপ্রিয়; **দুর্বিষহম্**—অসহনীয়; **নৃণাম্**—মানুষদের; **স্বয়ম্**—আপনা থেকে; **উপস্থিতম্**—উপস্থিত; **ন**—না; **আবেদয়ৎ**—বলা উচিত; **স-করুণো**—করুণাময়; **দুঃখিতান্**—দুঃখিতদের; **দ্রষ্টুম্**—দেখতে; **অক্ষমঃ**—অক্ষম।

অনুবাদ

করুণাময় মহাত্মা বিদুর কোন সময়ই পাণ্ডবদের দুর্দশা দেখতে পারতেন না। তাই তিনি অপ্রিয় আর অসহনীয় এই ঘটনার কথা প্রকাশ করলেন না। কারণ দুর্যোগাদি আপনা হতেই আসে।

তাৎপর্য

নীতি শাস্ত্র অনুসারে, অন্যের দুঃখ হতে পারে এমন অপ্রিয় সত্য বলা উচিত নয়। প্রকৃতির নিয়মে আপনা থেকেই দুঃখ-দুর্দশা আমাদের ওপরে নেমে আসে, সুতরাং তা নিয়ে প্রচার করে তার তীব্রতা বৃদ্ধি করা কারও উচিত নয়। বিদুরের মতো কোমলাত্মা ব্যক্তির পক্ষে, বিশেষ করে তাঁর প্রিয় পাণ্ডবদের কাছে, যদুকুল ধ্বংসের মতো দুর্বিষহ সংবাদ বিষয়টি শোনানো অসম্ভব ছিল। তাই তিনি ইচ্ছা করেই নিরস্ত হয়েছিলেন।

শ্লোক ১৪

কঞ্চিৎ কালমথাবাৎসীৎ সৎকৃতো দেববৎ সুখম্ ।
ভ্রাতুর্জ্যেষ্ঠস্য শ্রেয়স্কৃৎ সর্বেষাং সুখমাবহন্ ॥ ১৪ ॥

কালম্—সময়; **অথ**—এইভাবে; **অবাৎসীৎ**—বাস করেছিলেন; **সৎ-কৃতঃ**—অত্যন্ত সমাদৃত হয়ে; **দেব-বৎ**—দেবতাদের মতো; **সুখম্**—সুখে; **ভ্রাতুঃ**—ভ্রাতার; **জ্যেষ্ঠস্য**—জ্যেষ্ঠ; **শ্রেয়ঃ-কৃৎ**—তাঁর মঙ্গল বিধানের জন্য; **সর্বেষাম্**—অন্য সকলের; **সুখম্**—সুখে; **আবহন্**—সম্পাদন করেছিলেন।

অনুবাদ

এই মহাত্মা বিদুর তাঁর জ্ঞাতি-সম্প্রদায়ের সকলের কাছে ঠিক দেবতুল্য মানুষের মতোই সমাদৃত হয়ে কিছুদিন সেখানে রইলেন যাতে তাঁর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ধৃতরাষ্ট্রের মনোবৃত্তির মঙ্গলসাধন করতে পারেন এবং তার দ্বারা অন্য সকলেরও প্রীতিবিধান করা যায়।

তাৎপর্য

বিদুরের মতো ঋষিতুল্য মানুষদের স্বর্গ থেকে আগত দেবতাদের মতোই সমাদর করতে হয়। তখনকার দিনে স্বর্গলোকের দেবতারা যুধিষ্ঠির মহারাজের মতো মানুষদের গৃহে আসতেন, এবং কখনও কখনও অর্জুনের মতো ব্যক্তিরা উচ্চতর গ্রহলোকে যেতেন। নারদমুনি হলেন এক মহাকাশচারী যিনি অপ্রতিহতভাবে সর্বত্র বিচরণ করতে পারেন, কেবল এই জড় ব্রহ্মাণ্ডেই নয়, চিন্ময় ব্রহ্মাণ্ডমণ্ডলীতেও। এমন কি নারদমুনি পর্যন্ত যুধিষ্ঠির মহারাজের প্রাসাদ পরিদর্শন করতে আসতেন, আর তা হলে স্বর্গলোকের অন্যান্য দেবদেবীদের কথা আর কীই বা বলা যায়?

শুধুমাত্র পারমার্থিক চর্চার ফলেই মানুষ সশরীরে গ্রহান্তরে ভ্রমণ করতে পারেন। তাই দেবদেবীদের যেভাবে অভ্যর্থনা জানান হয়, সেইভাবেই মহারাজ যুধিষ্ঠির বিদুরের অভ্যর্থনা করেছিলেন।

মহাত্মা বিদুর ইতিপূর্বেই সংসার ত্যাগের ব্রত গ্রহণ করেছিলেন, এবং তাই তিনি খানিক জড়সুখ ভোগ করার জন্য তাঁর পৈতৃক প্রাসাদভবনে প্রত্যাবর্তন করেননি। কৃপাপরবশ হয়েই তিনি যুধিষ্ঠির মহারাজের অভ্যর্থনা গ্রহণ করেছিলেন। আসলে তাঁর প্রাসাদে অবস্থান করার প্রকৃত উদ্দেশ্য ছিল তাঁর অত্যন্ত বিষয়াসক্ত জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ধৃতরাষ্ট্রকে উদ্ধার করা। মহারাজ যুধিষ্ঠিরের সঙ্গে যুদ্ধে ধৃতরাষ্ট্র তাঁর সমগ্র রাজ্য এবং বংশধরদের হারিয়েছিলেন, কিন্তু তবুও, অসহায় হয়ে, মহারাজ যুধিষ্ঠিরের দয়াদাক্ষিণ্য এবং আতিথেয়তা গ্রহণ করতে তিনি লজ্জিতবোধ করেননি। যুধিষ্ঠির মহারাজের পক্ষে তাঁর পিতৃব্যের প্রতিপালন করা যথাযথই হয়েছিল, কিন্তু ধৃতরাষ্ট্রের পক্ষে এই ধরনের উদার আতিথেয়তা গ্রহণ করা মোটেই উচিত হয়নি। তিনি তা গ্রহণ করেছিলেন, কারণ তিনি মনে করেছিলেন যে, তা ছাড়া আর কোন উপায় ছিল না। বিদুর বিশেষত এসেছিলেন ধৃতরাষ্ট্রকে তত্ত্বজ্ঞান দান করে পরমার্থের উচ্চতর স্তরে উন্নীত করার জন্য। যাঁরা তত্ত্ব-দ্রষ্টা, তাঁদের কর্তব্য হচ্ছে অধঃপতিত মানুষদের উদ্ধার করা, এবং সেই উদ্দেশ্যেই বিদুর এসেছিলেন। তবে পারমার্থিক তত্ত্ব-জ্ঞানের আলোচনা এতই মনোরম যে, বিদুর যখন ধৃতরাষ্ট্রকে উপদেশ দিচ্ছিলেন, তখন পরিবারের অন্য সকলেও ধৈর্য্য সহকারে তাঁর কথা শুনেছিলেন। এটিই পারমার্থিক উপলব্ধির পন্থা। একাগ্রচিত্তে সেই বাণী শ্রবণ করতে হয়, এবং তত্ত্বদ্রষ্টা মহাপুরুষ যখন সেই কথা বলেন, তখন তা বদ্ধ জীবের সুপ্ত হৃদয়ে তত্ত্বজ্ঞানের সঞ্চার করে। নিরন্তর শ্রবণ করার ফলে, মানুষ আত্ম-উপলব্ধির শুদ্ধ স্তরে উপনীত হতে পারে।

শ্লোক ১৫

অবিভ্রদর্যমা দণ্ডং যথাবদঘকারিষু ।
যাবদ্দধার শূদ্রত্বং শাপাদ্বর্ষশতং যমঃ ॥ ১৫ ॥

অবিভ্রৎ—ধারণ করেছিলেন; **অর্যমা**—অর্যমা; **দণ্ডম্**—দণ্ড; **যথাবৎ**—যথোপযুক্তভাবে; **অঘ-কারিষু**—পাপীদের; **যাবৎ**—যতদিন পর্যন্ত; **দধার**—প্রাপ্ত হয়েছিলেন; **শূদ্রত্বম্**—শূদ্রত্ব; **শাপাৎ**—শাপের ফলে; **বর্ষ-শতম্**—একশ বছর; **যমঃ**—যমরাজ।

অনুবাদ

মণ্ডূক মুনির দ্বারা অভিশপ্ত হয়ে বিদুর যতদিন শূদ্রত্ব ধারণ করে ছিলেন, সেই শতবর্ষব্যাপী অর্যমা পাপীদের পাপকর্ম অনুসারে যথাযথ দণ্ড বিধানের জন্য যমরাজের পদাভিষিক্ত হয়েছিলেন।

তাৎপর্য

এক শূদ্রাণীর গর্ভে জন্ম হওয়ার ফলে, বিদুর তাঁর ভাই ধৃতরাষ্ট্র এবং পাণ্ডুর সাথে রাজবংশানুক্রমের অংশীদার হওয়া থেকেও প্রত্যাখ্যাত হন। তা হলে তিনি ধৃতরাষ্ট্র এবং মহারাজা যুধিষ্ঠিরের মতো অমন জ্ঞানবান নৃপতি এবং ক্ষত্রিয়দের তত্ত্বকথা উপদেশ দেবার পদ অধিকার করলেন কিভাবে?

তার প্রথম উত্তর হচ্ছে যে, জন্মগতভাবে তিনি একজন শূদ্র, তা স্বীকার করলেও, যেহেতু তিনি মৈত্রেয় ঋষির প্রামাণ্য-সূত্রে পারমার্থিক তত্ত্বজ্ঞান লাভ করবার উদ্দেশ্যে সংসার ত্যাগ করেছিলেন এবং তাঁর কাছে অপ্রাকৃত জ্ঞানসম্পদে আদ্যোপান্তভাবে শিক্ষিত হয়েছিলেন, তাই তিনি আচার্য অর্থাৎ পারমার্থিক শিক্ষাগুরুর পদমর্যাদা অধিকারের সম্পূর্ণ যোগ্য হয়ে ওঠেন।

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর নির্দেশ অনুসারে ঃ

'কিবা বিপ্র, কিবা ন্যাসী, শূদ্র কেনে নয় ।
যেই কৃষ্ণতত্ত্ববেত্তা সেই গুরু হয় ॥'

'ব্রাহ্মণ, কিংবা শূদ্র, গৃহস্থ কিংবা সন্ন্যাসী, যিনিই হন, তিনি যদি পারমার্থিক তত্ত্বজ্ঞান অর্থাৎ ভগবৎ-বিজ্ঞানে পারদর্শী হন, তিনি আচার্য বা গুরু হওয়ার যোগ্য।' এমন কি সাধারণ নীতি শাস্ত্রাদিতেও (যা মহান্ রাজনীতিবিদ্ এবং নীতিশাস্ত্রবিদ্ চাণক্য পণ্ডিত সমর্থন করে গেছেন) বলা হয়েছে যে, কেউ শূদ্রেরও অধম জাতিকুলে জন্মগ্রহণ করলেও তাঁর কাছ থেকে শিক্ষাগ্রহণ করলে কোন ক্ষতি হয় না। এই হল উত্তরের একটি অংশ।

উত্তরের অন্য অংশটি এই যে, বিদুর প্রকৃতপক্ষে শূদ্র ছিলেন না। মণ্ডূক মুনির অভিশাপে তাঁকে একশত বছর তথাকথিত শূদ্রত্ব ধারণ করতে হয়েছিল। তিনি ছিলেন দ্বাদশ মহাজনের অন্যতম যমরাজের অবতার। সেই সূত্রে তাঁর মর্যাদা ব্রহ্মা, নারদ, শিব, কপিল, ভীষ্ম, প্রহ্লাদ প্রমুখ মহাজনদের সমপর্যায়েই অবস্থিত। এক মহাজন বলেই যমরাজের কর্তব্য হল ঃ নারদ, ব্রহ্মা আদি অন্যান্য মহাজনদের মতো ভগবদ্ভক্তির বাণী পৃথিবীর মানুষদের মধ্যে প্রচার করা।

কিন্তু যমরাজ সর্বক্ষণ তাঁর অগ্নিগর্ভ যমলোকে পাপীদের দণ্ডবিধানের কাজে ব্যস্ত থাকেন। এই পৃথিবী থেকে শত-সহস্র যোজন দূরে এক বিশেষ গ্রহে মৃত্যুর পরে পাপজর্জরিত জীবাত্মাদের নিয়ে গিয়ে, তাদের নিজ নিজ পাপকর্ম অনুসারে দণ্ডবিধান করার দায়িত্বভার যমরাজের ওপর পরমেশ্বর ন্যস্ত করেছেন। তাই অন্যায়কারীদের শাস্তি দেওয়ার দায়িত্বপূর্ণ কার্যভার থেকে যমরাজের অবসর গ্রহণের সামান্যই অবকাশ হয়। সদাচারী মানুষদের চেয়ে দুষ্কৃতকারীদের সংখ্যাই বেশি। তাই পরমেশ্বর ভগবানেরই কর্তৃত্বাধীনে নিযুক্ত প্রতিনিধিরূপে অন্যান্য সমস্ত দেবতাদের চেয়ে অধিক কাজ করতে হয়। কিন্তু তিনি পরমেশ্বরের মহিমা প্রচার করতে চেয়েছিলেন, এবং তাই পরমেশ্বরের ইচ্ছায় তিনি মণ্ডূক মুনির দ্বারা অভিশপ্ত হয়ে পৃথিবীতে বিদুর রূপে জন্মগ্রহণ করেছিলেন এবং মহান ভক্তের মতো কঠিন কাজ করেছিলেন।

এই ধরনের ভগবদ্ভক্ত শূদ্রও নন বা ব্রাহ্মণও নন। তিনি এই জড়জাগতিক সমাজ ব্যবস্থায় ঐ ধরনের বর্ণ বিভাগের অনেক অনেক ঊর্ধ্বে অবস্থান করেন, ঠিক যেমন পরমেশ্বর ভগবান শূকর রূপে অবতারত্ব গ্রহণ করলেও তিনি শূকর নন, অথবা ব্রহ্মাও নন। তিনি সমস্ত জড়জাগতিক প্রাণীদেরও ঊর্ধ্বে অবস্থিত।

বদ্ধ জীবদের উদ্ধার করার জন্য পরমেশ্বর এবং তাঁর বিভিন্ন প্রামাণ্য ভক্তদের কখনও কখনও বহু নিম্নস্তরের প্রাণীদের ভূমিকা অবলম্বন করতে হয়, কিন্তু পরমেশ্বর এবং তাঁর শুদ্ধ ভক্তেরা সর্বদাই চিন্ময় মর্যাদার স্তরে অধিষ্ঠিত থাকেন।

যমরাজ যখন সেই মতো বিদুর রূপে আবির্ভূত হয়েছিলেন, তখন কশ্যপ এবং অদিতির বহু পুত্রের অন্যতম পুত্র অর্যমা তাঁর পদে অধিষ্ঠিত হয়েছিলেন। আদিত্যরা হচ্ছেন অদিতির পুত্র, এবং দ্বাদশজন আদিত্য আছেন। অর্যমা হচ্ছেন দ্বাদশ আদিত্যের অন্যতম, এবং তাই বিদুর রূপে যমরাজ যখন একশত বছর অনুপস্থিত ছিলেন, তখন অর্যমার পক্ষে তাঁর কার্যভার গ্রহণ করা খুবই সম্ভব ছিল। সিদ্ধান্ত হচ্ছে এই যে, বিদুর কখনই শূদ্র ছিলেন না, বরং তিনি ছিলেন বিশুদ্ধতম শ্রেণীর ব্রাহ্মণের চেয়েও মহত্তর।

শ্লোক ১৬

যুধিষ্ঠিরো লব্ধরাজ্যো দৃষ্ট্বা পৌত্রং কুলন্ধরম্ ।
ভ্রাতৃভির্লোকপালাভৈর্মুমুদে পরয়া শ্রিয়া ॥ ১৬ ॥

যুধিষ্ঠিরঃ—যুধিষ্ঠির; **লব্ধ-রাজ্যঃ**—তাঁর পিতৃরাজ্য লাভ করে; **দৃষ্ট্বা**—দেখে; **পৌত্রম্**—পৌত্র; **কুলম্-ধরম্**—উপযুক্ত বংশধর; **ভ্রাতৃভিঃ**—ভায়েদের সঙ্গে; **লোক-পালাভৈঃ**—যাঁরা সকলেই ছিলেন দক্ষ প্রশাসক বা লোকপালের মতো; **মুমুদে**—জীবন উপভোগ করেছিলেন; **পরয়া**—অসাধারণ; **শ্রিয়াঃ**—ঐশ্বর্য।

অনুবাদ

মহারাজা যুধিষ্ঠির তাঁর রাজ্য জয় করে এবং তাঁর বংশের মহান্ ঐতিহ্য অক্ষুণ্ণ রাখবার উপযুক্ত এক পৌত্রের জন্মের দর্শন লাভ করার পরে, শান্তিতে রাজত্ব করেছিলেন এবং তাঁর কনিষ্ঠ ভ্রাতারা, যাঁরা ছিলেন জনসাধারণের কাছে সকলেই দক্ষ প্রশাসক, তাঁদের সহযোগিতা নিয়ে তিনি অসামান্য ঐশ্বর্য ভোগ করেছিলেন।

তাৎপর্য

কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের শুরু থেকেই মহারাজ যুধিষ্ঠির এবং অর্জুন উভয়েই বিমর্ষ হয়ে ছিলেন, কিন্তু তাঁদের আত্মীয়-স্বজনদের যুদ্ধে হত্যা করতে তাঁরা অনিচ্ছুক হলেও, কর্তব্য রূপেই তাঁদের তা করতে হয়েছিল, কারণ পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের পরম অভিলাষ মতেই তা পরিকল্পিত হয়েছিল। যুদ্ধের পরে, ঐ ধরনের গণহত্যার কথা ভেবে যুধিষ্ঠির মহারাজ অত্যন্ত বিষাদগ্রস্ত হয়েছিলেন। প্রকৃতপক্ষে পাণ্ডবদের পরে কুরুবংশের ধারা অব্যাহত রাখার মতো আর কেউ ছিল না। একমাত্র শেষ আশা ছিল তাঁদের পুত্রবধূ উত্তরার গর্ভস্থ শিশু এবং তাঁকেও অশ্বত্থামা আক্রমণ করেছিল, তবে পরমেশ্বরের কৃপায় শিশুটি রক্ষা পেয়েছিল।

তাই বিশৃঙ্খল অবস্থা আয়ত্তে আনার পর এবং রাজ্যে শান্তি ও শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা করার পর, এবং জীবিত সন্তান পরীক্ষিতকে দেখার পরে, যথেষ্ট সন্তোষ লাভ করে মহারাজ যুধিষ্ঠিরের মানব-সত্তা কিছুটা স্বস্তি বোধ করে, যদিও জড়জাগতিক সুখ যা নিয়তই মায়াময় এবং অনিত্য অস্থায়ী, তার প্রতি তাঁর লেশমাত্র আসক্তিও ছিল না।

শ্লোক ১৭

এবং গৃহেষু সক্তানাং প্রমত্তানাং তদীহয়া ।
অত্যক্রামদবিজ্ঞাতঃ কালঃ পরমদুস্তরঃ ॥ ১৭ ॥

এবম্—এইভাবে; গৃহেষু—পারিবারিক বিষয়ে; সক্তানাম্—যারা অত্যন্ত আসক্ত; প্রমত্তানাম্—উন্মাদের মতো আসক্ত; তৎ-ঈহয়া—সেই প্রকার চিন্তায় মগ্ন; অত্যক্রামৎ—অতিক্রম করেছিল; অবিজ্ঞাত—অজ্ঞাতসারে; কালঃ—অনন্তকাল; পরম—পরম; দুস্তরঃ—অনতিক্রমণীয়।

অনুবাদ

যাঁরা গৃহ-পরিবার বিষয়ে অত্যন্ত আসক্ত এবং সর্বদাই সেই চিন্তায় মগ্ন থাকে, পরম দুস্তর অনন্ত কাল অজ্ঞাতসারে তাদের অতিক্রম করে যায়।

তাৎপর্য

'আমি এখন সুখী; আমার সব কিছুই ঠিকভাবে চলছে; ব্যাঙ্কে আমার যথেষ্ট টাকা; আমার সন্তান-সন্ততিদের আমি এখন অনেক সম্পত্তি দিতে পারি; আমি এখন সফল হয়েছি; গরিব ভিখারি সন্ন্যাসীরা ভগবানের ওপর ভরসা করে, কিন্তু তারা আমার কাছে ভিক্ষা করতে আসে; অতএব আমি পরমেশ্বর ভগবানের চেয়েও বড়।' বহমান অনন্ত কালের প্রতি অন্ধ হয়ে থাকে যে বিকারগ্রস্ত আসক্ত গৃহস্থ, তাকে যেসব চিন্তাভাবনা আবিষ্ট করে রাখে, এগুলি তারই মধ্যে কয়েকটি।

আমাদের আয়ুষ্কাল পরিমিত, এবং বিধির বিধানের অতিরিক্ত একটি পলকও তাতে কেউ বাড়াতে পারে না। বিশেষ করে, মানব সত্তার পক্ষে এমন অমূল্য সময়ের সতর্ক ব্যবহার করা উচিত, কারণ একটি পলকও যদি অজ্ঞাতসারে বয়ে যায়, তা হলে অতি কষ্টে অর্জিত হাজার হাজার স্বর্ণমুদ্রার বিনিময়েও তা আবার পূরণ করা যাবে না।

মানব জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত জীবনের চরম সমস্যা সমাধানের উদ্দেশ্যে নির্ধারিত হয়েছে, অর্থাৎ ৮৪ লক্ষ বিভিন্ন যোনিতে জন্ম এবং মৃত্যু চক্রে আবর্তিত হওয়ার সমস্যা থেকে মুক্ত হওয়ার চেষ্টা করার জন্যই এই জীবন। জন্ম, মৃত্যু, জরা এবং ব্যাধির দ্বারা প্রভাবিত জড় দেহটাই জীবের সমস্ত দুঃখ-দুর্দশার মূল কারণ। তা না হলে, জীব নিত্য; তার জন্ম নেই, তার কখনও মৃত্যু নেই। মূর্খ লোকেরা এই সমস্যার কথা ভুলে যায়। জীবনের এই সমস্যার সমাধান কিভাবে করা যায়, তারা তা আদপেই জানে না, কিন্তু তারা অনিত্য সংসার-পরিবার বিষয়ে মগ্ন হয়ে থাকে, আর তারা জানে না যে, অজ্ঞাতসারে অনন্তকাল এগিয়ে চলেছে এবং প্রতি মুহূর্তে তাদের পরিমিত আয়ুষ্কাল হ্রাস পেয়ে যাচ্ছে, জন্ম এবং মৃত্যু, জরা এবং ব্যাধির বিপুল সমস্যার কোনও সমাধানই করা হচ্ছে না। একেই বলা হয় মায়া।

কিন্তু পরমেশ্বরের ভক্তি-সেবা চর্চায় যিনি সদা জাগ্রত, মায়া তাঁর ওপর প্রভাব বিস্তার করতে পারে না। যুধিষ্ঠির মহারাজ এবং তাঁর ভাই পাণ্ডবেরা সকলেই পরমেশ্বর শ্রীকৃষ্ণের সেবায় যুক্ত ছিলেন, এবং এই জড়জাগতিক মায়াময় সুখের প্রতি তাঁদের লেশমাত্রও আকর্ষণ ছিল না। পূর্বে আমরা আলোচনা করেছি, মহারাজ যুধিষ্ঠির সর্বদাই মুক্তিদাতা পরমেশ্বর মুকুন্দের সেবায় যুক্ত ছিলেন, এবং তাই স্বর্গ সুখের প্রতিও তাঁর কোনরকম আকর্ষণ ছিল না, কারণ ব্রহ্মলোকের সুখও অনিত্য এবং মায়াময়। জীব যেহেতু নিত্য, তাই সে পরমেশ্বর ভগবানের নিত্যধাম পরব্যোমেই কেবল সুখী হতে পারে, যেখানে একবার গেলে আর এই জন্ম, মৃত্যু, জরা-ব্যাধির রাজ্যে কাউকে ফিরে আসতে হয় না।

সুতরাং নিত্য, শাশ্বত জীবের পক্ষে জড় জগতের যে কোন সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য যা নিত্য জীবনের নিশ্চয়তা দেয় না, তা সম্পূর্ণ মায়াময়। তত্ত্বগতভাবে যিনি এই সত্য উপলব্ধি করেছেন, তিনিই যথার্থ জ্ঞানী, এবং এই ধরনের জ্ঞানী ব্যক্তি জীবনের চরম লক্ষ্য ব্রহ্ম সুখ বা পরম আনন্দ লাভ করার জন্য যে কোন জড় সুখ পরিত্যাগ করতে পারেন। প্রকৃত পরমার্থবাদীরা এই আনন্দ আস্বাদনের জন্য বুভুক্ষু হয়ে থাকেন এবং বুভুক্ষু মানুষ খাদ্য ছাড়া জীবনের আর কোন সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের মাধ্যমে তৃপ্ত হতে পারে না, তেমনই যিনি নিত্য শাশ্বত আনন্দের জন্য বুভুক্ষু হয়ে আছেন, তিনি কখনই কোন প্রকার জড় সুখের মাধ্যমে তৃপ্ত হতে পারেন না। তাই, এই শ্লোকে যে উপদেশ দেওয়া হয়েছে, তা মহারাজা যুধিষ্ঠির অথবা তাঁর ভ্রাতা বা মাতার প্রতি প্রযোজ্য নয়। ধৃতরাষ্ট্রের মতো ব্যক্তির পক্ষেই এগুলি প্রযোজ্য, কারণ তাঁকে উপদেশ দানের জন্যই বিদুর বিশেষভাবে এসেছিলেন।

শ্লোক ১৮

বিদুরস্তদভিপ্রেত্য ধৃতরাষ্ট্রমভাষত ।
রাজন্ নির্গম্যতাং শীঘ্রং পশ্যেদং ভয়মাগতম্ ॥ ১৮ ॥

বিদুরঃ—মহাত্মা বিদুর; **তৎ**—তা; **অভিপ্রেত্য**—ভালভাবে জেনে; **ধৃতরাষ্ট্রম্**—ধৃতরাষ্ট্রকে; **অভাষত**—বলেছিলেন; **রাজন্**—হে রাজন্; **নির্গম্যতাম্**—দয়া করে এখনি বেরিয়ে পড়ুন; **শীঘ্রম্**—কোন বিলম্ব না করে; **পশ্য**—দেখুন; **ইদম্**—এই; **ভয়ম্**—ভয়; **আগতম্**—সমাগত।

অনুবাদ

মহাত্মা বিদুর এই সমস্ত বিষয়ে অবগত ছিলেন, এবং তাই তিনি ধৃতরাষ্ট্রকে বললেন, হে রাজন্, শীঘ্র আপনি এখান থেকে বেরিয়ে পড়ুন। আর বিলম্ব করবেন না। দেখুন, মহাভয় কিভাবে আপনাকে আচ্ছন্ন করছে।

তাৎপর্য

নিষ্ঠুর মৃত্যু কাউকেই গ্রাহ্য করে না, তা তিনি ধৃতরাষ্ট্রই হোন, অথবা যুধিষ্ঠির মহারাজই হোন; তাই, যে পারমার্থিক উপদেশ বয়োবৃদ্ধ ধৃতরাষ্ট্রকে দেওয়া হয়েছিল, যুবক যুধিষ্ঠির মহারাজের পক্ষেও তা ছিল সমভাবেই প্রযোজ্য। প্রকৃতপক্ষে রাজা এবং তাঁর ভ্রাতৃ বর্গ ও মাতা সহ রাজপ্রাসাদের প্রত্যেকেই একাগ্র চিত্তে বিদুরের সেই উপদেশ অনুধাবন করছিলেন। তবে বিদুর জানতেন যে, তাঁর উপদেশগুলি বিশেষ করে ধৃতরাষ্ট্র, যিনি অত্যধিক জড়জাগতিক ভাবাপন্ন ছিলেন, তাঁর উদ্দেশ্যেই দিচ্ছিলেন।

ধৃতরাষ্ট্রের উদ্দেশ্যে *রাজন্* শব্দটির বিশেষ ব্যবহার অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। ধৃতরাষ্ট্র ছিলেন তাঁর পিতার জ্যেষ্ঠ পুত্র, তাই নিয়মানুযায়ী হস্তিনাপুরের রাজসিংহাসনে তাঁরই অধিষ্ঠিত হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু তিনি জন্মান্ধ হওয়ার ফলে সেই ন্যায়সঙ্গত অধিকারের অযোগ্য হয়ে গিয়েছিলেন। তাঁর এই দুর্ভাগ্যের কথা তিনি ভুলতে পারেননি, এবং তাঁর কনিষ্ঠ ভ্রাতা পাণ্ডুর মৃত্যুর পর তাঁর এই নৈরাশ্যের কিছুটা উপশম হয়েছিল। তাঁর কনিষ্ঠ ভ্রাতা কয়েকটি নাবালক সন্তান রেখে গিয়েছিলেন, এবং ধৃতরাষ্ট্র স্বাভাবিক ভাবেই তাদের অভিভাবক হয়েছিলেন, কিন্তু অন্তরে তিনি বাস্তবিকই রাজা হতে চেয়েছিলেন এবং তাঁর রাজ্য দুর্যোধনের নেতৃত্বে তাঁর পুত্রদের হস্তান্তরিত করতে চেয়েছিলেন।

এই সমস্ত সাম্রাজ্যবাদী উচ্চাকাঙ্ক্ষা নিয়ে ধৃতরাষ্ট্র রাজা হতে চেয়েছিলেন, এবং তাঁর শ্যালক শকুনির সঙ্গে পরামর্শ করে তিনি সকল প্রকার চক্রান্ত গড়ে তুলেছিলেন।

কিন্তু পরমেশ্বরের ইচ্ছায় সমস্তই ব্যর্থ হয়েছিল, এবং শেষ পর্বে, তাঁর লোকবল এবং ধনবল সব কিছু হারিয়েও, তিনি মহারাজ যুধিষ্ঠিরের জ্যেষ্ঠতাত রূপে রাজা হয়ে থাকতে চেয়েছিলেন। যুধিষ্ঠির মহারাজ কর্তব্যবশে রাজকীয় সম্মানে ধৃতরাষ্ট্রের প্রতিপালন করেছিলেন, এবং ধৃতরাষ্ট্র রাজা হওয়ার অলীক ধারণা পোষণ করে অথবা রাজা যুধিষ্ঠিরের রাজকীয় পিতৃব্যরূপে তাঁর জীবনের সীমিত দিনগুলি সুখে অতিবাহিত করছিলেন।

ধৃতরাষ্ট্রের ধর্মপরায়ণ এবং কর্তব্যপরায়ণ স্নেহশীল কনিষ্ঠ ভ্রাতারূপে বিদুর ধৃতরাষ্ট্রকে তাঁর জরা ও ব্যাধিজনিত এই মোহনিদ্রা থেকে জাগ্রত করতে চেয়েছিলেন। তাই বিদুর বক্রোক্তি করে ধৃতরাষ্ট্রকে 'রাজা' বলে সম্বোধন করেছিলেন, যদিও প্রকৃতপক্ষে তিনি রাজা ছিলেন না।

প্রত্যেকেই মহাকালের দাস, এবং তাই এই জড় জগতে কেউই রাজা হতে পারে না। রাজা মানে হচ্ছে, যে মানুষ আদেশ দিতে পারেন। এক বিখ্যাত ইংরেজ রাজা মহাকাল এবং সমুদ্রতরঙ্গকে আদেশ দিতে গিয়েছিলেন, কিন্তু মহাকাল এবং সমুদ্র তাঁর সেই আদেশ মানতে অস্বীকার করেছিল। তাই এই জড় জগতে মানুষ বৃথাই রাজা হয়ে থাকে, এবং ধৃতরাষ্ট্রকে বিশেষত তাঁর সেই অলীক পদমর্যাদা এবং তৎকালীন বাস্তব ভয়াবহ ঘটনাদি, ইতিমধ্যেই তিনি যেগুলির সম্মুখীন হয়েছিলেন, তা তিনি তাঁকে স্মরণ করিয়েছিলেন। বিদুর তাঁকে বলেছিলেন, যে ভয়াবহ পরিস্থিতি দ্রুতগতিতে তাঁর দিকে এগিয়ে আসছে, তা থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য তিনি যেন তৎক্ষণাৎ সেখান থেকে চলে যান।

বিদুর যুধিষ্ঠির মহারাজকে সে সম্বন্ধে কিছুই বলেননি, কারণ তিনি জানতেন যে, তাঁর মতো একজন নৃপতি এই তুচ্ছ ক্ষণস্থায়ী জগতের সমস্ত ভয়াবহ পরিস্থিতির বিষয়েই অবগত আছেন এবং বিদুর উপস্থিত না থাকলেও তিনি যথাকালে নিজেকে রক্ষা করতে পারবেন।

শ্লোক ১৯

প্রতিক্রিয়া ন যস্যেহ কুতশ্চিৎ কর্হিচিৎ প্রভো ।
স এষ ভগবান্ কালঃ সর্বেষাং নঃ সমাগতঃ ॥ ১৯ ॥

প্রতিক্রিয়া—প্রতিকার; **ন**—নেই; **যস্য**—যার; **ইহ**—এই জড় জগতে; **কুতশ্চিৎ**—কোন উপায়ে; **কর্হিচিৎ**—কারোর দ্বারা; **প্রভো**—হে প্রভু; **সঃ**—সেই; **এষঃ**—অবশ্যই; **ভগবান্**—পরমেশ্বর ভগবান; **কালঃ**—অনন্তকাল; **সর্বেষাম্**—সকলের; **নঃ**—আমাদের; **সমাগতঃ**—সমুপস্থিত।

অনুবাদ

এই জড় জগতের কোনও মানুষের দ্বারা এই ভয়াবহ পরিস্থিতির প্রতিকার হতে পারে না। হে প্রভু, পরম পুরুষোত্তম ভগবানই মহাকালরূপে আমাদের সকলের সম্মুখে উপস্থিত হয়েছেন।

তাৎপর্য

কোন মহান শক্তিই মৃত্যুর নির্মম কবল প্রতিরোধ করতে পারে না। মানুষের শারীরিক দুর্দশার কারণ যতই উৎকট হোক্ না কেন, মরতে কেউই চায় না। এমন কি, জ্ঞান চর্চার তথাকথিত বৈজ্ঞানিক প্রগতির যুগেও, বার্ধক্য অথবা মৃত্যুর কোনও প্রতিকার পন্থাই নেই. নির্মম কালের হুকুমনামায় মৃত্যুর আগমন হলে তারই বিজ্ঞপ্তি হল বার্ধক্য, এবং মহাকালের হুকুমনামা কিংবা চরম বিচার গ্রহণ না করে প্রত্যাখ্যান করতে কেউই পারে না।

এই কথাই বিদুর ধৃতরাষ্ট্রকে বুঝিয়ে দিয়েছিলেন, কারণ আসন্ন ভয়াবহ পরিস্থিতির কোন রকম প্রতিকার পন্থা খুঁজে বার করবার জন্য তিনি হয়ত বিদুরকে বলতে পারতেন, এবং সেই রকম আদেশ তিনি পূর্বেও বহুবার করেছিলেন। তাই আদেশ দেওয়ার পূর্বেই অবশ্য বিদুর ধৃতরাষ্ট্রকে জানিয়ে দিলেন যে, এই জড় জগতের কোনও ব্যক্তির দ্বারা অথবা কোনও উপায়ে তার প্রতিকার পন্থা নেই। আর যেহেতু জড় জগতে সেই রকম কোনও পন্থাই নেই, তাই পরম পুরুষোত্তম ভগবানই হলেন মৃত্যুর অভিন্ন রূপ এই কথা পরমেশ্বর স্বয়ং ভগবদ্‌*গীতায়* (১০/৩৪) ব্যক্ত করেছেন।

এই জড় জগতের মধ্যে কোন ব্যক্তির বা কোনও উপায়ের দ্বারা মৃত্যুকে প্রতিহত করা যায় না। হিরণ্যকশিপু অমর হতে চেয়েছিল এবং এমন কঠোর তপস্যা করেছিল যাতে, সারা ব্রহ্মাণ্ড প্রকম্পিত হয়ে উঠেছিল, এবং সেই কঠোর তপস্যা থেকে হিরণ্যকশিপুকে নিরস্ত করার জন্য ব্রহ্মা নিজে তার কাছে এসেছিলেন। হিরণ্যকশিপু ব্রহ্মার কাছে অমরত্ব লাভের বর প্রার্থনা করেছিল, কিন্তু ব্রহ্মা তাকে বলেছিলেন যে, তিনি নিজেও, ব্রহ্মাণ্ডের সর্বোচ্চ-লোকে অধিষ্ঠিত থাকা সত্ত্বেও অমর নন, সুতরাং তিনি কিভাবে তাকে অমরত্ব লাভের বরদান করতে পারেন? তাই এই ব্রহ্মাণ্ডের সর্বোচ্চ লোকেও মৃত্যু বর্তমান, সুতরাং ব্রহ্মার আবাসস্থল ব্রহ্মলোকের থেকে অনেক অনেক নিকৃষ্ট অন্য সমস্ত লোকের অধিবাসীদের কথা সহজেই অনুমান করা যায়। যেখানেই মহাকালের প্রভাব বর্তমান, সেখানেই জন্ম, মৃত্যু, জরা এবং ব্যাধির ক্লেশদায়ক প্রভাব অবশ্যম্ভাবী এবং এগুলি সবই অপরাজেয়।

শ্লোক ২০

যেন চৈবাভিপন্নোঽয়ং প্রাণৈঃ প্রিয়তমৈরপি ।
জনঃ সদ্যো বিযুজ্যেত কিমুতান্যৈর্ধনাদিভিঃ ॥ ২০ ॥

যেন—কালের প্রভাবে; চ—এবং; এব—অবশ্যই; **অভিপন্নঃ**—প্রভাবগ্রস্ত হয়ে, **অয়ম্**—এই; **প্রাণৈঃ**—প্রাণ থেকেও; **প্রিয়-তমৈঃ**—সব চেয়ে প্রিয়; **অপি**—যদিও; **জনঃ**—মানুষ; **সদ্যঃ**—সহসা; **বিযুজ্যেত**—বিযুক্ত হয়; **কিম্ উত অন্যৈঃ**—অন্য বিষয়ে আর কি বলার আছে; **ধন-আদিভিঃ**—ধন, সম্পদ, যশ, সন্তান-সন্ততি, গৃহ ইত্যাদি।

অনুবাদ

যে-ই মহাকালের দ্বারা প্রভাবগ্রস্ত হয়, তাকে অবশ্যই তার সর্বাপেক্ষা প্রিয় প্রাণই সমর্পণ করতে হয়, এবং ধন-সম্পদ, মান মর্যাদা, সন্তান-সন্ততি, জমি বাড়ি এই সবের মতো অন্যান্য জিনিসের কথা আর বলার কী আছে।

তাৎপর্য

এক বিরাট ভারতীয় বৈজ্ঞানিক, যিনি পরিকল্পনা রচনার ব্যাপারে ব্যস্ত থাকতেন, তিনি পরিকল্পনা কমিশনেরই এক দরকারি সভায় যোগদান করতে যাওয়ার সময়, অকস্মাৎ অপ্রতিহত অনন্ত মহাকালের আহ্বানে তাঁকে জীবন, স্ত্রী, পুত্র, ধন-সম্পদ, জমি বাড়ি ইত্যাদি সব কিছু সমর্পণ করে চলে যেতে হয়।

ভারতবর্ষে রাজনৈতিক অভ্যুত্থানের সময় এবং পাকিস্তান ও হিন্দুস্থানরূপে দেশ বিভাগ হওয়ার সময়, কত ধনী এবং প্রভাবশালী ভারতবাসীকে কালের প্রভাবে ধন, মান ও প্রাণ সমর্পণ করতে হয়েছিল এবং সারা ব্রহ্মাণ্ড জুড়ে, এই রকম শতসহস্র দৃষ্টান্ত রয়েছে যা সবই হচ্ছে কালের প্রভাবগত পরিণাম।

সুতরাং সিদ্ধান্ত হচ্ছে এই যে, কালের প্রভাব অতিক্রম করতে পারে, এমন কোনও শক্তিমান জীবসত্তা ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে নেই। বহু কবি কালের প্রভাব নিয়ে আক্ষেপ করে কবিতা লিখেছেন। ব্রহ্মাণ্ডমণ্ডলীতে অনেক প্রলয় ঘটে গেছে, এবং কেউ তা কোনভাবেই প্রতিহত করতে পারেনি। এমন কি, আমাদের দৈনন্দিন জীবনেও কত কিছুই আসছে আর যাচ্ছে, যার মধ্যে আমাদের কোনই হাত নেই, কিন্তু কোনও প্রতিকার পন্থা ছাড়াই সেগুলি থেকে আমাদের দুর্ভোগ পেতে হয় কিংবা সইতে হয়। সেটাই হল কালের পরিণাম।

শ্লোক ২১

পিতৃভ্রাতৃসুহৃৎপুত্রা হতাস্তে বিগতং বয়ম্ ।
আত্মা চ জরয়া গ্রস্তঃ পরগেহমুপাসসে ॥ ২১ ॥

পিতৃ—পিতা; ভ্রাতৃ—ভ্রাতা; সুহৃৎ—শুভাকাঙ্ক্ষী; পুত্রাঃ—পুত্রগণ; হতাঃ—মৃতেরা; তে—আপনার; বিগতম্—বিগত; বয়ম্—বয়স; আত্মা—দেহ; চ—ও; জরয়া—জরা; গ্রস্তঃ—গ্রস্ত; পর-গেহম্—অন্যের গৃহে; উপাসসে—আপনি বাস করছেন।

অনুবাদ

আপনার পিতা, ভ্রাতা, বন্ধু, পুত্রবর্গ সকলেই মৃত এবং প্রয়াত। আপনি নিজেও আপনার জীবনের বেশির ভাগ সময় অতিবাহিত করেছেন, আপনার দেহ এখন জরাগ্রস্ত, এবং আপনি অন্যের গৃহে বাস করছেন।

তাৎপর্য

রাজাকে নিষ্ঠুর কালের প্রভাবে তাঁর শোচনীয় অবস্থার কথা মনে করিয়ে দেওয়া হচ্ছে, এবং তাঁর পূর্বের অভিজ্ঞতা থেকে আরও বুদ্ধিমানের মতো তাঁর বিবেচনা করে দেখা উচিত যে, তাঁর নিজের জীবনে কি ঘটতে চলেছে। তাঁর পিতা বিচিত্রবীর্য বহুকাল পূর্বে প্রয়াত হন, তখন তিনি এবং তাঁর কনিষ্ঠ ভ্রাতারা সকলেই ছিলেন ছোট্ট শিশু, এবং ভীষ্মদেবেরই স্নেহ এবং করুণার ফলে তাঁরা যথাযথভাবে বড় হয়ে উঠতে পেরেছিলেন। তারপর তাঁর কনিষ্ঠ ভ্রাতা পাণ্ডুরও মৃত্যু হয়। তারপর কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে তাঁর শতপুত্র এবং তাঁর সমস্ত পৌত্র, ভীষ্মদেব, দ্রোণাচার্য, কর্ণ এবং অন্যান্য অনেক রাজা ও বন্ধু সহ তাঁর সমস্ত শুভাকাঙ্ক্ষীদেরও মৃত্যু হয়। সুতরাং তাঁর সমস্ত লোকবল আর ধনবল বিনষ্ট হয়ে গেছে, এবং তিনি তাঁর যে সমস্ত ভ্রাতুষ্পুত্রদের নানাভাবে দুঃখ-কষ্ট দিয়েছিলেন, এখন তাঁদেরই কৃপায় জীবন ধারণ করে আছেন। আর এই সমস্ত প্রতিকূলতা সত্ত্বেও, তিনি ভেবেছিলেন যে, তিনি আরও অনেক দিন বেঁচে থাকবেন। বিদুর ধৃতরাষ্ট্রকে বোঝাতে চেয়েছিলেন যে, প্রত্যেককেই তার ব্যক্তিগত কার্যকলাপ এবং পরমেশ্বরের কৃপার সাহায্যে আত্মরক্ষা করতে হয়। ফলাফলের জন্য পরম নিয়ন্তার ওপর ভরসা রেখে, বিশ্বস্তভাবে নিষ্ঠা সহকারে কর্তব্যকর্ম করে যেতে হয়। পরমেশ্বর ভগবান রক্ষা না করলে কোনও বন্ধু, কোনও সন্তান-সন্ততি, কোনও পিতা, কোনও ভাই, কোনও রাষ্ট্র এবং অন্য কেউই মানুষকে রক্ষা করতে পারে না। তাই পরমেশ্বর ভগবানের কাছে প্রার্থনা করতে হয় তিনি যেন আমাদের রক্ষা করেন, কারণ সেই আত্মরক্ষার অনুসন্ধানই হচ্ছে মানব জীবনের উদ্দেশ্য। ধৃতরাষ্ট্রের শোচনীয় অবস্থা সম্পর্কে পরবর্তী কথাগুলির মাধ্যমে তাঁকে আরও ব্যাপকভাবে সতর্ক করে দেওয়া হয়েছে।

শ্লোক ২২

অন্ধঃ পুরৈব বধিরো মন্দপ্রজ্ঞাশ্চ সাম্প্রতং ।
বিশীর্ণদন্তো মন্দাগ্নিঃ সরাগঃ কফমুদ্বহন্ ॥ ২২ ॥

অন্ধঃ—অন্ধ; **পুরা**—প্রথম থেকে; **এব**—অবশ্যই; **বধিরঃ**—বধির; **মন্দ-প্রজ্ঞাঃ**—দুর্বল স্মৃতি; **চ**—এবং; **সাম্প্রতম্**—সম্প্রতি; **বিশীর্ণ**—জীর্ণ; **দন্তঃ**—দাঁত; **মন্দ-অগ্নি**—অগ্নি মান্দ্য; **সরাগঃ**—সশব্দে; **কফম্**—কফসহ কাশি; **উদ্বহন্**—বাইরে আসছে।

অনুবাদ

আপনি জন্মকাল থেকেই অন্ধ, এবং সম্প্রতি আপনার শ্রবণশক্তিও হ্রাস পেয়েছে। আপনার স্মৃতিশক্তি দুর্বল হয়ে পড়েছে, এবং বুদ্ধিভ্রংশ হচ্ছে। আপনার দন্তরাজি জীর্ণ হয়েছে, আপনার যকৃতের ত্রুটি ঘটেছে এবং আপনার কাশির সঙ্গে সশব্দে কফ নির্গত হচ্ছে।

তাৎপর্য

ধৃতরাষ্ট্রের দেহে বার্ধক্যের যে সমস্ত লক্ষণগুলি দেখা দিয়েছিল, সেগুলি সবই একে একে সতর্কতার ইঙ্গিত জানাচ্ছিল যে, তাঁর মৃত্যু আসন্ন, এবং তবুও তিনি নির্বোধের মতো তাঁর ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে সম্পূর্ণ নির্বিকার হয়েই ছিলেন। ধৃতরাষ্ট্রের শরীরে বিদুর যে সমস্ত লক্ষণগুলি দেখেছিলেন, সেগুলি হচ্ছে অবক্ষয় বা মৃত্যুর চরম আঘাত আসার পূর্বে জড় দেহের ক্রমশ ক্ষয়ের চিহ্ন। দেহের জন্ম হয়, বৃদ্ধি হয়, কিছুকাল তার স্থিতি হয়, অন্য আরও দেহ সৃষ্টি করে, হ্রাস পায়, এবং তারপর ক্রমশ ক্ষয়প্রাপ্ত হয়ে বিলীন হয়ে যায়।

কিন্তু মূর্খ মানুষেরা এই নশ্বর দেহটিকে নিয়ে স্থায়ী বন্দোবস্ত করতে চায়, এবং মনে করে যে, তাদের ধন-সম্পদ, সন্তান-সন্ততি, সমাজ, দেশ ইত্যাদি তাদের রক্ষা করবে। এই ধরনের বুদ্ধিভ্রষ্ট ধারণা নিয়ে, তারা সমস্ত অনিত্য আয়োজনে এত ব্যস্ত হয়ে পড়ে যে, তারা সম্পূর্ণভাবে ভুলে যায়, একদিন তাদের এই নশ্বর দেহটিকে ত্যাগ করে আর একটি নতুন দেহ ধারণ করতে হবে, এবং তখন এই দেহটিকে নিয়ে আর একটি সমাজ, বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয়-স্বজনের আয়োজন করতে হবে, এবং অবশেষে আবার বিনষ্ট হয়ে যেতে হবে। তারা তাদের নিত্য পরিচয়ের কথা ভুলে গিয়ে, তাদের প্রধান কর্তব্যের কথা সম্পূর্ণভাবে বিস্মৃত হয়ে, নির্বোধের

মতো অনিত্য সমস্ত কার্যকলাপে ব্যস্ত হয়। বিদুরের মতো সাধু এবং মহাত্মারা এই ধরনের মূর্খ-মানুষদের জ্ঞানচক্ষু উন্মীলিত করে প্রকৃত পরিস্থিতির মাঝে জাগরিত করার চেষ্টা করেন, কিন্তু তারা এই ধরনের সাধু এবং মহাত্মাদের সমাজের বোঝা বলে মনে করে, এবং তাদের প্রায় কেউই এই ধরনের সাধু মহাত্মাদের উপদেশ শ্রবণ্ করতে চায় না, যদিও যে সমস্ত তথাকথিত সাধু এবং মহাত্মারা তাদের জড়-ইন্দ্রিয়ের তৃপ্তি যোগাবার প্রতিশ্রুতি দেয়, তাদেরই তারা সাদরে অভ্যর্থনা করে থাকে। বিদুর সেই ধরনের কোন সাধু ছিলেন না যে, ধৃতরাষ্ট্রের ভ্রান্ত আবেগানুভূতির সন্তোষবিধান করবেন। তিনি শুধুই যথাযথভাবে জীবনের প্রকৃত অবস্থা, এবং কিভাবে মানুষ সেই ভয়ঙ্কর বিপদ থেকে নিজেকে রক্ষা করতে পারে, সেই কথাই বুঝিয়ে দিয়েছেন।

শ্লোক ২৩

অহো মহীয়সী জন্তোর্জীবিতাশা যথা ভবান্ ।
ভীমাপবর্জিতং পিণ্ডমাদত্তে গৃহপালবৎ ॥ ২৩ ॥

অহো—আহা; **মহীয়সী**—বলবতী; **জন্তোঃ**—প্রাণীদের; **জীবিত-আশা**—বেঁচে থাকার বাসনা; **যথা**—যেমন; **ভবান্**—আপনি; **ভীমা**—দ্বিতীয় পাণ্ডব ভীমসেনের (যুধিষ্ঠিরের ভ্রাতা); **অপবর্জিতম্**—উচ্ছিষ্ট; **পিণ্ডম্**—অন্ন; **আদত্তে**—গ্রহণ করছ; **গৃহ-পাল-বৎ**—গৃহপালিত কুকুরের মতো।

অনুবাদ

আহা, কোনও জীবের বেঁচে থাকার আশা কী বলবতী! যথার্থই, আপনি ঠিক একটা পোষা কুকুরের মতেই বেঁচে রয়েছেন আর ভীমের দেওয়া উচ্ছিষ্ট অন্ন গ্রহণ করছেন।

তাৎপর্য

রাজাদের কিংবা বিত্তশালী লোকেদের অনুগ্রহে সুখে-স্বাচ্ছন্দ্যে বেঁচে থাকার উদ্দেশ্যে কোনও সাধু ব্যক্তির পক্ষে কখনই তাদের তোষামোদ করা উচিত নয়। গৃহস্থদের কাছে জীবনের নগ্ন সত্য ব্যক্ত করাই কোন সাধুর কাজ, যাতে তারা জড় অস্তিত্বের মাঝে শোচনীয় জীবনধারা সম্পর্কে কাণ্ড জ্ঞান অর্জন করতে পারে।

গার্হস্থ্য জীবনে আসক্ত কোনও বৃদ্ধ মানুষের এক অতি জাজ্বল্যমান যথার্থ দৃষ্টান্ত হলেন ধৃতরাষ্ট্র। প্রকৃত অর্থেই তিনি কপর্দকশূন্য নিঃস্ব ভিখারি হয়ে গিয়েছিলেন,

তবুও তিনি সুখে-স্বাচ্ছন্দ্যে পাণ্ডবদের বাড়িতেই থাকতে চেয়েছিলেন, যে পাণ্ডবদের মধ্যে ভীমের কথা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। কারণ সেই ভীম নিজে ধৃতরাষ্ট্রের দুই বিশিষ্ট পুত্র দুর্যোধন আর দুঃশাসনকে বধ করেছিলেন। এই দুটি ছেলে তাদের নীচতা আর নৃশংসতার জন্য ধৃতরাষ্ট্রের কাছে বড়ই প্রিয় ছিল, এবং ভীমের কথা বিশেষ করে উল্লেখ করা হয়েছে, তার কারণ, তিনি এই দুই আদুরে ছেলেকেই বধ করেছিলেন।

ধৃতরাষ্ট্র কেন সেই পাণ্ডবদের বাড়িতেই বাস করছিলেন? কারণ তিনি সকল রকমের লাঞ্ছনা অবমাননা সত্ত্বেও সুখে-স্বাচ্ছন্দ্যে তাঁর জীবনটা কাটাতে চেয়েছিলেন। জীবনধারা অক্ষুণ্ণ রাখার তাগিদ যে কত প্রবল, তা লক্ষ্য করে বিদুর তাই বিস্মিত হয়ে গিয়েছিলেন। জীবন ধারণ করে থাকার এই প্রবণতা থেকে বোঝা যায় যে, কোনও প্রাণী নিত্যকালই এক জীবসত্তা এবং তার শারীরিক আবাসন কখনই সে বদলাতে চায় না।

নির্বোধ মূর্খ মানুষ জানে না যে, একটা কারাদণ্ডের বিশেষ মেয়াদ কাটানোর জন্যই তাকে শারীরিক অস্তিত্বের একটা বিশেষ মেয়াদ বরাদ্দ করা হয়েছে, এবং মানব-শরীরটা বরাদ্দ করা হয়েছে বহু বহু জন্ম-মৃত্যুর পরে, একটা সুযোগের মতো, যাতে আত্ম-উপলব্ধির মাধ্যমে আপন আলয় ভগবদ্ধামে ফিরে যেতে পারা যায়। কিন্তু ধৃতরাষ্ট্রের মতো মানুষেরা কিছু লাভ আর আগ্রহের আসক্তি নিয়ে এক স্বাচ্ছন্দ্যময় মর্যাদার মাঝে সেখানেই বেঁচে থাকার মতলব করে থাকে, কারণ সব কিছু তারা যথাযথভাবে দেখে না, বোঝে না।

ধৃতরাষ্ট্র অন্ধ আর তাই তিনি জীবনের সব রকমের প্রতিকূলতার মাঝেও সুখে-স্বাচ্ছন্দ্যে বেঁচে থাকবার আশা পোষণ করতেই থাকেন।

বিদুরের মতো কোন সাধুর কাজই হচ্ছে ঐ ধরনের অন্ধ মানুষদের জাগিয়ে তোলা এবং সেইভাবে তাদের ভগবদ্ধামে ফিরে যেতে সহায়তা করা—যে-ধামে জীবন হল নিত্য শাশ্বত। সেখানে একবার গেলে, দুঃখ-দুর্দশাপূর্ণ এই জড় জগতে কেউ আর ফিরে আসতে চায় না। আমরা তাই ঠিকই বুঝতে পারি, মহাত্মা বিদুরের মতো এক সাধু-জনের ওপর যে-কাজের ভার অর্পণ করা হয়েছে, তা কতখানি দায়িত্বপূর্ণ।

শ্লোক ২৪

অগ্নির্নিসৃষ্টো দত্তশ্চ গরো দারাশ্চ দূষিতাঃ ।
হৃতং ক্ষেত্রং ধনং যেষাং তদ্দত্তৈরসুভিঃ কিয়ৎ ॥ ২৪ ॥

অগ্নি—আগুন; নিসৃষ্টঃ—প্রক্ষিপ্ত; দত্তঃ—দেওয়া হয়েছিল; চ—এবং; গরঃ—বিষ; দারা—ধর্মপত্নী; চ—এবং; দূষিতাঃ—অপমানিতা; হৃতম্—অপহৃত; ক্ষেত্রম্—রাজ্য; ধনম্—ধন সম্পদ; যেষাম্—যাদের; তৎ—তাদের; দত্তৈঃ—দেওয়া; অসুভিঃ—প্রাণ ধারণ করা; কিয়ৎ—অপ্রয়োজনীয়।

অনুবাদ

যাদের আপনি অগ্নিতে নিক্ষেপ করে এবং বিষ প্রয়োগে হত্যা করতে চেষ্টা করেছিলেন, তাদের দাক্ষিণ্যে নির্ভর করে অধঃপতিত জীবন যাপন করবার কোনও প্রয়োজন নেই। আপনি তাদের স্ত্রীদেরও একজনকে অপমানিতা করেছিলেন এবং তাদের রাজ্য ও ধন-সম্পদ অপহরণ করে নিয়েছিলেন।

তাৎপর্য

বর্ণাশ্রম ধর্ম ব্যবস্থায় মনুষ্য জীবনের একটি অংশ আত্ম-উপলব্ধির জন্য এবং মুক্তি অর্জনের উদ্দেশ্যে সম্পূর্ণভাবে নির্দিষ্ট করে রাখা হয়েছে। তা হল জীবনের পর্যায়ক্রমিক শ্রেণীবিভাগ, কিন্তু ধৃতরাষ্ট্রের মতো মানুষেরা, তাদের জরাজীর্ণ পরিণত বয়সেও, শত্রুদের কাছ থেকে দাক্ষিণ্য গ্রহণ করার মতো অধঃপতিত পরিস্থিতির মাঝেও গৃহবাসী হয়ে থাকতে চায়।

বিদুর এই বিষয়টি নির্দেশ করতে চেয়েছিলেন এবং সেই ধরনের অবমাননাকর দাক্ষিণ্য গ্রহণ করার থেকে তাঁর পুত্রদের মতোই মৃত্যুবরণ করা আরও ভাল হত, একথাটি তাঁকে বোঝাতে চেয়েছিলেন।

পাঁচ হাজার বছর আগে একজন ধৃতরাষ্ট্রই ছিলেন, কিন্তু এই মুহূর্তে প্রত্যেক ঘরেই ধৃতরাষ্ট্ররা রয়েছে। রাজনীতিবিদেরা বিশেষত রাজনৈতিক কার্যকলাপ থেকে অবসর গ্রহণ করেন না, যতক্ষণ না মৃত্যুর করাল হাত তাঁদের জোর করে টেনে নিয়ে যায় কিংবা কোন বিরোধী জনের দ্বারা নিহত হন।

কারও পক্ষে মানব জীবনের শেষ পর্যন্ত পারিবারিক গার্হস্থ্য জীবন ধারায় লিপ্ত হয়ে থাকা অধঃপতনের জঘন্যতম দৃষ্টান্ত এবং এই মুহূর্তেও ঐ ধরনের ধৃতরাষ্ট্রদের শিক্ষিত করে তোলার উদ্দেশ্যে বিদুরদের একান্ত প্রয়োজন রয়েছে।

শ্লোক ২৫

তস্যাপি তব দেহোঽয়ং কৃপণস্য জিজীবিষোঃ।
পরৈত্যনিচ্ছতো জীর্ণো জরয়া বাসসী ইব ॥ ২৫ ॥

তস্য—তার; **অপি**—সত্ত্বেও; **তব**—আপনার; **দেহঃ**—দেহ; **অয়ম্**—এই; **কৃপণস্য**—কৃপণের; **জিজীবিষোঃ**—বেঁচে থাকতে ইচ্ছুক আপনার; **পরৈতি**—ক্ষয়প্রাপ্ত হবে; **অনিচ্ছতো**—অনিচ্ছা সত্ত্বেও; **জীর্ণঃ**—জীর্ণ; **জরয়া**—জরার প্রভাবে; **বাসসী**—বস্ত্রাদি; **ইব**—মতো।

অনুবাদ

মৃত্যুবরণে আপনার অনিচ্ছা সত্ত্বেও এবং মান-মর্যাদা নষ্ট করে বেঁচে থাকার জন্য আপনার আকাঙ্ক্ষা থাকলেও, আপনার কার্পণ্যদুষ্ট দেহটি অবশ্যই একটা পুরনো পোশাকের মতো জরাগ্রস্ত এবং ক্ষয়প্রাপ্ত হবে।

তাৎপর্য

কৃপণস্য জিজীবিষোঃ কথাগুলি তাৎপর্যপূর্ণ। দুই শ্রেণীর মানুষ আছে। একজনকে বলা হয় *কৃপণ*, আর অন্যজনকে বলা হয় *ব্রাহ্মণ*। কৃপণ তার জড় দেহটির যথার্থ মূল্যই বোঝে না, কিন্তু প্রকৃত ব্রাহ্মণের তাঁর নিজের আত্মসত্তার এবং জড় দেহটির যথার্থ মূল্যবোধ আছে। কৃপণ তার জড় দেহটির ভ্রান্ত মূল্যবোধ নিয়ে প্রাণপণ শক্তি দিয়ে ইন্দ্রিয়সুখ উপভোগ করতে চায়, এবং বৃদ্ধ বয়সেও ডাক্তারী চিকিৎসা বা অন্য কিছুর সাহায্যে যুবক হয়ে থাকতে ইচ্ছা করে।

ধৃতরাষ্ট্রকে এখানে *কৃপণ* বলে সম্বোধন করা হয়েছে, কারণ তাঁর জড় দেহের যথার্থ মূল্যায়ন না করেই তিনি যে কোনও উপায়ে বেঁচে থাকতে চান। বিদুর তাঁর জ্ঞানচক্ষু উন্মীলিত করে তাঁকে দেখাতে চাইছেন যে, তাঁর আয়ুষ্কালের বেশি মেয়াদ তিনি বেঁচে থাকতে পারবেন না এবং মৃত্যুর জন্য তাঁকে অবশ্যই প্রস্তুত হতে হবে। যেহেতু মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী, তবে কেন তিনি এই রকম অবমাননাকর অবস্থা মেনে নিয়ে বেঁচে থাকতে চাইবেন? তার চেয়ে বরং সঠিক পথ অবলম্বন করাই উচিত, তাতে মৃত্যুর সম্ভাবনা থাকলেও ভাল।

মানব জীবনের উদ্দেশ্য হল, জড় অস্তিত্বের সকল প্রকার দুঃখ-দুর্দশার নিবৃত্তি সাধন করা, এবং জীবনকে এমনভাবে নিয়ন্ত্রিত করা যাতে জীবনের ঈপ্সিত লক্ষ্যে উপনীত হওয়া যায়।

জীবন সম্বন্ধে ভ্রান্ত ধারণার ফলেই ধৃতরাষ্ট্র তাঁর অর্জিত শক্তির আশী শতাংশই অপচয় করে ফেলেছিলেন, তাই তাঁর কার্পণ্যদুষ্ট জীবনের বাকি দিন কটা পরম মঙ্গল সাধনের উদ্দেশ্যে কাজে লাগানোর দায়িত্ব তাঁর ওপর নেমে এসেছিল।

এই ধরনের জীবনকে কার্পণ্যদুষ্ট বলা হয়, কারণ মনুষ্য জীবনের সম্পদের সদ্ব্যবহার সে করতে পারে না। শুধুই সৌভাগ্যবলে এই ধরনের কার্পণ্যদুষ্ট মানুষ বিদুরের মতো কোনও এক আত্মতত্ত্বজ্ঞানী মহাত্মার সাক্ষাৎ লাভ করতে পারে, এবং তাঁর উপদেশে জড়-অস্তিত্বের অজ্ঞানতা থেকে তখন সে অব্যাহতি লাভ করে।

শ্লোক ২৬

গতস্বার্থমিমং দেহং বিরক্তো মুক্তবন্ধনঃ ।
অবিজ্ঞাতগতির্জহ্যাৎ স বৈ ধীর উদাহৃতঃ ॥ ২৬ ॥

গত-স্ব-অর্থম্—যথাযথ সদ্ব্যবহার না করে; **ইমম্**—এই; **দেহম্**—জড় দেহ; **বিরক্তঃ**—আসক্তিশূন্য; **মুক্ত**—মুক্ত; **বন্ধনঃ**—সকল দায়দায়িত্ব থেকে; **অবিজ্ঞাত-গতিঃ**—অজ্ঞাত পরিণাম; **জহ্যাৎ**—দেহত্যাগ করে; **সঃ**—সেই ব্যক্তি; **ধীরঃ**—অবিচলিত; **উদাহৃতঃ**—বলা হয়।

অনুবাদ

তাঁকেই ধীর বলা হয় যিনি কোন অজ্ঞাত দূরদেশে চলে যান, এবং সমস্ত দায়িত্ব থেকে মুক্ত হয়ে, জড় দেহটি যখন অব্যবহার্য হয়ে পড়ে তখন তা ত্যাগ করেন।

তাৎপর্য

মহান্ ভক্ত এবং গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের আচার্য শ্রীল নরোত্তম দাস ঠাকুর গেয়েছেন ঃ

'হরি হরি! বিফলে জনম গোঙাইনু।
মনুষ্য জনম পাইয়া রাধাকৃষ্ণ না ভজিয়া,
জানিয়া শুনিয়া বিষ খাইনু ॥'

অর্থাৎ, পরমেশ্বর ভগবানের উদ্দেশ্যে ভক্তিমূলক সেবা নিবেদনের উপযোগী জ্ঞানচর্চা করার উদ্দেশ্যেই মানবদেহটি বিশেষভাবে নির্দিষ্ট হয়েছে, সেই উদ্দেশ্যে এটি নিয়োজিত না হলে জীবন মাত্রই উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা এবং নানা প্রকার দুঃখ-দুর্দশায় পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে।

অতএব, এই ধরনের সংস্কৃতিপূর্ণ কার্যকলাপের চর্চা অনুশীলন না করে জীবনটাকে যে নষ্ট করে ফেলেছে, তাকে বন্ধু-বান্ধব এবং আত্মীয়-স্বজনের অজ্ঞাতসারে গৃহত্যাগ করতে পরামর্শ দেওয়া হয়েছে এবং সেইভাবে সংসার

পরিবারবর্গ, সমাজ, দেশ প্রভৃতির সব কিছু দায়দায়িত্ব থেকে মুক্ত হয়ে কোনও এক অজ্ঞাতস্থানে দেহত্যাগ করতে তাকে উপদেশ দেওয়া হয়েছে, যাতে অন্যেরা কেউ জানতে না পারে কোথায় এবং কিভাবে সে মৃত্যুবরণ করেছে।

'*ধীর*' মানে অবিচলিত; যথেষ্ট প্ররোচনা সত্ত্বেও যিনি বিচলিত হন না। স্ত্রী-সন্তানাদির সাথে স্নেহ-ভালবাসার সম্পর্ক থাকার ফলে মানুষ তার সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যময় পারিবারিক জীবনধারা ত্যাগ করতে পারে না। সংসার-পরিবারের প্রতি এই ধরনের অহেতুক স্নেহ-মমতার দ্বারা আত্ম উপলব্ধির প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হয়ে থাকে, এবং যদি কেউ ঐ ধরনের সম্পর্ক একেবারেই ভুলে যেতে পারে, তবে তাকে বলা হয় অবিচল, অর্থাৎ *ধীর*।

এটা অবশ্য হতাশাগ্রস্ত জীবনধারা থেকে উদ্ভূত ত্যাগ-বৈরাগ্যের পথ, তবে ঐ ধরনের ত্যাগ-বৈরাগ্যের স্থিতিশীলতা সম্ভবপর হয় একমাত্র যথার্থ সাধুসন্ত এবং আত্মজ্ঞানসম্পন্ন মহাত্মাদের সঙ্গ-সান্নিধ্যেরই মাধ্যমে, যার ফলে মানুষ পরমেশ্বর ভগবানের প্রেমময়ী ভক্তিসেবার চর্চায় নিয়োজিত হয়ে যেতে পারে।

সেবাভাবের অপ্রাকৃত পারমার্থিক অনুভূতি জাগিয়ে তোলার সাহায্যেই পরমেশ্বর ভগবানের শ্রীচরণপদ্মে আন্তরিক আত্মসমর্পণ সম্ভব হয়। পরমেশ্বর ভগবানের শুদ্ধ ভক্তদের সাথে সঙ্গ-সান্নিধ্যের মাধ্যমেই তা সার্থক হয়ে ওঠে।

ধৃতরাষ্ট্র ছিলেন যথেষ্ট ভাগ্যবান যে, এমন একটি ভাইকে তিনি পেয়েছিলেন, যাঁর সঙ্গ-সান্নিধ্যই এই হতাশাচ্ছন্ন জীবনে হয়ে উঠেছিল মুক্তি পথের সন্ধান।

শ্লোক ২৭

যঃ স্বকাৎ পরতো বেহ জাতনির্বেদ আত্মবান্ ।
হৃদি কৃত্বা হরিং গেহাৎ প্রব্রজেৎ স নরোত্তমঃ ॥ ২৭ ॥

যঃ—যিনি; **স্বকাৎ**—স্বকীয় উদ্যোগে; **পরতঃ বা**—অথবা অন্যের কাছ থেকে শুনে; **ইহ**—এখানে এই জগতে; **জাত**—হন; **নির্বেদঃ**—জড় আসক্তি থেকে নিস্পৃহ; **আত্মবান্**—আত্মজ্ঞানসম্পন্ন; **হৃদি**—হৃদয়ে; **কৃত্বা**—গ্রহণ করে; **হরিম্**—পরম পুরুষ ভগবান; **গেহাৎ**—গৃহ থেকে; **প্রব্রজেৎ**—চলে যান; **সঃ**—তিনি হলেন; **নর-উত্তমঃ**—সর্বোত্তম মানবসত্তা।

অনুবাদ

যিনি নিজের উদ্যোগে বা অন্যের কাছ থেকে শুনে আত্মজ্ঞানসম্পন্ন হয়ে ওঠেন এবং এই জড় জগতের অলীক মায়া আর দুঃখ-দুর্দশা উপলব্ধি করেন, এবং তাই

গৃহত্যাগ করে পরিপূর্ণভাবে তাঁর হৃদিস্থিত পরম পুরুষ ভগবান শ্রীহরিতে ভরসা রাখেন, সুনিশ্চিতভাবে তিনিই সর্বোত্তম মানবসত্তা।

তাৎপর্য

তিন শ্রেণীর পরমার্থবাদী আছেন, তাঁরা হলেন, (১) *ধীর,* অর্থাৎ যিনি পরিবার পরিজনদের সঙ্গ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়েও বিচলিত নন, (২) হতাশাচ্ছন্ন ভাবাবেগ নিয়ে কোনও *সন্ন্যাসী* , এবং (৩) পরমেশ্বর ভগবানের নিষ্ঠাবান ভক্ত , যিনি শ্রবণ ও কীর্তনের মাধ্যমে ভগবদ্-চেতনা জাগিয়ে তোলেন এবং হৃদিস্থিত পরম পুরুষ ভগবানে সম্পূর্ণ ভরসা রেখে গৃহত্যাগ করেন।

ভাবধারাটি এই যে, জড় জগতে হতাশাচ্ছন্ন জীবনের অনুভূতি অর্জনের পরে, ত্যাগ-বৈরাগ্যের সন্ন্যাস জীবন গ্রহণ করলে সেটা আত্ম-উপলব্ধির পথে অগ্রগতির সোপান হতে পারে, *তবে মুক্তিপথের সার্থক সিদ্ধিলাভ ঘটে থাকে তখনই* , যখন *মানুষ প্রত্যেকের হৃদয়ে বিরাজমান পরমাত্মারূপে পরম পুরুষোত্তম ভগবানের ওপরে সম্পূর্ণ ভরসা রাখতে অভ্যস্ত হয়ে ওঠে।*

কোনও মানুষ বাড়ি থেকে বেরিয়ে গিয়ে নিঃসঙ্গভাবে গভীর অন্ধকারাচ্ছন্ন জঙ্গলে বাস করতে পারে, কিন্তু দৃঢ়মতি নিষ্ঠাবান ভগবদ্ভক্ত ভালভাবেই জানেন যে, তিনি নিঃসঙ্গ নন। পরম পুরুষোত্তম ভগবান তাঁর সাথেই আছেন, এবং যে কোনও সঙ্কটময় পরিস্থিতির মাঝেই তিনি তাঁর নিষ্ঠাবান ভক্তকে নিরাপদে রাখতে পারেন।

অতএব শুদ্ধ ভক্তের সান্নিধ্যেই ভগবানের দিব্য নাম, গুণ, লীলা, পরিকর, বৈশিষ্ট্য ইত্যাদি সম্বন্ধে শ্রবণ ও কীর্তন করে ভগবদ্ভক্তির অনুশীলন করা উচিত, এবং এই অনুশীলন ভক্তের লক্ষ্য লাভের ঐকান্তিকতার অনুপাত অনুসারে তার ভগবৎ-চেতনাকে জাগ্রত করতে সাহায্য করবে।

এই ধরনের ভক্তিমূলক কার্যকলাপের মাধ্যমে জড়জাগতিক বিষয়লাভের বাসনা যে করে, সে কখনই পরম পুরুষোত্তম ভগবানে ভরসা রাখতে পারে না, যদিও তিনি প্রত্যেকেরই হৃদয়ে বিরাজ করছেন। যে সব মানুষ জড়জাগতিক সুবিধাদি লাভের উদ্দেশ্যে তাঁর পূজা করে, পরমেশ্বর ভগবানও তাদের কোন রকম পথ নির্দেশ করেন না। ঐ ধরনের জড়-বিষয়াসক্ত ভক্তেরা পরমেশ্বর ভগবানের আশীর্বাদে জড় সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যাদি পেতে পারে। কিন্তু উপরে বর্ণিত সর্বোত্তম মানবসত্তার পর্যায়ে পৌঁছতে পারে না, নরোত্তম হতে পারে না।

পৃথিবীর ইতিহাসে, বিশেষ করে ভারতবর্ষে, ঐ ধরনের নিষ্ঠাবান ভক্তমণ্ডলীর বহু দৃষ্টান্ত রয়েছে, এবং আত্ম-উপলব্ধি অর্জনের পথে তাঁরাই আমাদের পথ-প্রদর্শক। মহাত্মা বিদুর হলেন পরমেশ্বর ভগবানের সেই ধরনেরই এক মহান্ ভক্ত, এবং আত্মতত্ত্বজ্ঞান লাভের উদ্দেশ্যে তাঁর শ্রীপাদপদ্মাঙ্ক অনুসরণ করে চলতে চেষ্টা করাই আমাদের সকলের উচিত।

শ্লোক ২৮

অথোদীচীং দিশং যাতু স্বৈরজ্ঞাতগতির্ভবান্ ।
ইতোঽর্বাক্ প্রায়শঃ কালঃ পুংসাং গুণবিকর্ষণঃ ॥ ২৮ ॥

অথ—অতএব; **উদীচীম্**—উত্তর; **দিশম্**—দিক; **যাতু**—গমন করুন; **স্বৈঃ**—আত্মীয়-স্বজনের দ্বারা; **অজ্ঞাত**—অজ্ঞাতসারে; **গতিঃ**—গতিবিধি; **ভবান্**—আপনার নিজের; **ইতঃ**—এরপর; **অর্বাক্**—আসছে; **প্রায়শঃ**—প্রায়ই; **কালঃ**—সময়; **পুংসাম্**—মানুষদের; **গুণ**—গুণাবলী; **বিকর্ষণঃ**—বিকর্ষণ করে বা নষ্ট করে।

অনুবাদ

অতএব আপনি অনুগ্রহ করে আপনার আত্মীয়-স্বজনদের অজ্ঞাতসারে উত্তর দিকে গমন করুন, কারণ শীঘ্র এমন একটি সময় আসছে, যার প্রভাবে মানুষদের সদ্‌গুণাবলী নষ্ট হয়ে যাবে।

তাৎপর্য

মানুষ তার নৈরাশ্যপূর্ণ জীবনের ক্ষতিপূরণ করতে পারে *ধীর* হওয়ার মাধ্যমে; অর্থাৎ আত্মীয়-স্বজনদের সঙ্গে কোন রকম যোগাযোগ না রেখে চিরকালের জন্য গৃহত্যাগ করার মাধ্যমে। বিদুর তাঁর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে উপদেশ দিয়েছিলেন অচিরেই সেই পন্থা অবলম্বন করতে, কারণ কলিকাল অতি দ্রুতগতিতে এগিয়ে আসছিল। জড় জগতের সান্নিধ্যের প্রভাবে বদ্ধ জীব এমনিতেই অধঃপতিত, তার উপর কলিযুগে মানুষের সমস্ত সদ্‌গুণাবলী হ্রাস পেতে পেতে সব চেয়ে নিকৃষ্ট পর্যায়ে অধঃপতিত হবে। কলিযুগের আগমনের পূর্বেই তাঁকে গৃহত্যাগ করার উপদেশ দেওয়া হয়েছিল, কারণ বিদুরের অমূল্য উপদেশের প্রভাবে যে পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছিল, তা অতি দ্রুত আসন্ন কলিযুগের প্রভাবে নষ্ট হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা ছিল।

সাধারণ মানুষের পক্ষে নরোত্তম হওয়া, বা সর্বতোভাবে শ্রীকৃষ্ণের শরণাগত হওয়া সম্ভব নয়। *ভগবদ্গীতায়* (৭/২৮) বলা হয়েছে, যে মানুষ সম্পূর্ণরূপে পাপমুক্ত হয়েছেন, তিনিই কেবল সর্বতোভাবে পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের শরণাগত হতে পারেন।

বিদুর ধৃতরাষ্ট্রকে উপদেশ দিয়েছিলেন, তাঁর পক্ষে যদি প্রথমেই সন্ন্যাসী বা নরোত্তম হওয়া সম্ভব না হয়, তা হলে তিনি যেন অন্তত *ধীর* হন। নিরন্তর পরমার্থ লাভের প্রয়াস করার ফলে মানুষ *ধীর* স্তর থেকে নরোত্তম স্তরে উন্নীত হতে পারেন। দীর্ঘকাল যোগ অনুশীলনের ফলে *ধীর* স্তরে উন্নীত হওয়া যায়, কিন্তু বিদুরের মতো মহাত্মার কৃপায়, কেবলমাত্র সেই স্তর অবলম্বন করার বাসনা করার মাধ্যমেই তৎক্ষণাৎ সেই স্তরে উন্নীত হওয়া যায়, সেটাই হল সন্ন্যাস আশ্রমের প্রস্তুতি পর্যায়। সন্ন্যাস স্তর হচ্ছে পরমহংস স্তরের প্রস্তুতি, বা ভগবানের উত্তম ভক্তে পরিণত হওয়ার প্রস্তুতি।

শ্লোক ২৯

এবং রাজা বিদুরেণানুজেন
প্রজ্ঞাচক্ষুর্বোধিত আজমীঢ়ঃ ।
ছিত্ত্বা স্বেষু স্নেহপাশান্ দ্রঢ়িম্নো
নিশ্চক্রাম ভ্রাতৃসন্দর্শিতাধ্বা ॥ ২৯ ॥

এবম্—এইভাবে; **রাজা**—মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র; **বিদুরেণ অনুজেন**—তাঁর কনিষ্ঠ ভ্রাতা বিদুরের দ্বারা; **প্রজ্ঞা**—জ্ঞান; **চক্ষুঃ**—চক্ষু; **বোধিতঃ**—বুঝতে পেরে; **আজমীঢ়ঃ**—আজমীঢ় বংশজ ধৃতরাষ্ট্র; **ছিত্ত্বা**—ছিন্ন করে; **স্বেষু**—আত্মীয়বর্গের; **স্নেহপাশান্**—স্নেহপাশ; **দ্রঢ়িম্নঃ**—চিত্তের দৃঢ়তা; **নিশ্চক্রাম্**—বেরিয়ে পড়লেন; **ভ্রাতৃ**—তাঁর ভাই বিদুর কর্তৃক; **সন্দর্শিত**—প্রদর্শিত; **অধ্বা**—মুক্তির পথ।

অনুবাদ

এইভাবে তাঁর কনিষ্ঠ ভ্রাতা বিদুর কর্তৃক উপদিষ্ট হয়ে আজমীঢ় বংশজ মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র আধ্যাত্মিক জ্ঞান (প্রজ্ঞা) লাভ করে চিত্তের দৃঢ়তার দ্বারা আত্মীয়বর্গের নিবিড় স্নেহপাশ ছিন্ন করে গৃহ থেকে মুক্তিলাভের পথে বহির্গত হলেন।

তাৎপর্য

শ্রীমদ্ভাগবতের বাণীর মহান্ প্রচারক শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু সাধুসঙ্গ এবং ভগবানের শুদ্ধ ভক্ত-সঙ্গের মহিমা বিশ্লেষণ করে বলেছেন—"*লব মাত্র সাধুসঙ্গে সর্ব সিদ্ধি হয়*"। আমাদের ব্যবহারিক জীবনের অভিজ্ঞতা থেকে আমরা নিঃসঙ্কোচে বলতে পারি যে, কৃষ্ণকৃপাশ্রীমূর্তি শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের সাথে মাত্র কয়েক মিনিটের প্রথম সঙ্গ প্রভাব না পেলে আমাদের পক্ষে ইংরেজি ভাষায় শ্রীমদ্ভাগবতের বর্ণনা দেওয়ার মতো সুবিপুল কার্যভার গ্রহণ করা সম্ভব হত না। সেই বিশেষ সময়ে তাঁর সঙ্গে যদি সাক্ষাৎকার না হত, তা হলে হয়ত আজ আমরা বিপুল ব্যবসায়ীতে পরিণত হতে পারতাম, কিন্তু সেই মহাপুরুষের নির্দেশ অনুসারে ভগবানের সেবায় যুক্ত হওয়ার মাধ্যমে প্রকৃত মুক্তির পথে অগ্রসর হতে পারতাম না।

বিদুরের সঙ্গ প্রভাবে ধৃতরাষ্ট্রের পরিবর্তন তার একটি বাস্তব দৃষ্টান্ত। মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক এবং পারিবারিক বন্ধনের জালে নিবিড়ভাবে আবদ্ধ ছিলেন, এবং তাঁর পরিকল্পনা অনুসারে তথাকথিত সাফল্য লাভের সব রকম চেষ্টা তিনি করেছিলেন, কিন্তু তা সত্ত্বেও সর্বদাই জড়জাগতিক কার্যকলাপে তাঁকে নিরাশ হতে হয়েছে। কিন্তু তবুও তাঁর ব্যর্থতার জীবন সত্ত্বেও সর্বোত্তম সাধু, ভগবানের শুদ্ধভক্তের সঙ্গ প্রভাবে তিনি অধ্যাত্মজ্ঞান লাভ করে জীবনের চরম সাফল্য অর্জন করেছিলেন।

তাই শাস্ত্রে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, অন্য সমস্ত সঙ্গ পরিত্যাগ করে কেবলমাত্র সাধুর সঙ্গ করা উচিত, এবং তার ফলে সাধুর শ্রীমুখনিঃসৃত বাণী শ্রবণ করে জড় জগতের মায়ার বন্ধন ছিন্ন করা যায়।

প্রকৃতপক্ষে এই জড় জগৎ হচ্ছে একটি মহামায়া, কারণ এখানে সব কিছুই বাস্তব সত্য বলে মনে হলেও পর মুহূর্তেই তা সমুদ্রের বুদ্‌বুদের মতো মিলিয়ে যায়। আকাশের মেঘকে নিঃসন্দেহে বাস্তব বলে মনে হয়, কারণ তার থেকে বৃষ্টি হয়, এবং সেই বৃষ্টির ফলে কত অস্থায়ী সবুজ গাছপালার জন্ম হয়, কিন্তু চরমে সব কিছুই অন্তর্হিত হয়ে যায়—মেঘ, বৃষ্টি এবং উদ্ভিদ, সবই যথাসময়ে লুপ্ত হয়ে যায়। কিন্তু আকাশ থাকে, এবং আকাশের বুকে বিভিন্ন রকমের জ্যোতিষ্কমণ্ডলী চিরকাল বিরাজমান থাকে।

তেমনই, পরম সত্য আকাশের মতো চিরকাল বিরাজমান থাকে, কিন্তু অনিত্য মেঘের মতো, মায়া আসে এবং মিলিয়ে যায়। মূর্খ জীবসত্তারা অনিত্য মেঘের দ্বারা আকৃষ্ট হয়, কিন্তু বুদ্ধিমান মানুষেরা বৈচিত্র্যমণ্ডিত নিত্য শাশ্বত আকাশের প্রতি অনুরক্ত থাকে।

শ্লোক ৩০

পতিং প্রয়ান্তং সুবলস্য পুত্রী
পতিব্রতা চানুজগাম সাধ্বী ।
হিমালয়ং ন্যস্তদণ্ডপ্রহর্ষং
মনস্বিনামিব সৎ সম্প্রহারঃ ॥ ৩০ ॥

পতিম্—তাঁর পতি; **প্রয়ান্তম্**—যখন গৃহ ত্যাগ করে চলে যাচ্ছিলেন; **সুবলস্য**—মহারাজ সুবলের; **পুত্রী**—সুযোগ্য কন্যা; **পতিব্রতা**—পতিপরায়ণা; **চ**—ও; **অনুজগাম**—অনুগমন করেছিলেন; **সাধ্বী**—সুশীলা; **হিমালয়ম্**—হিমালয় পর্বতমালা অভিমুখে; **ন্যস্ত-দণ্ড**—সন্ন্যাস দণ্ড যিনি গ্রহণ করেছেন; **প্রহর্ষম্**—হর্ষপ্রদ; **মনস্বিনাম্**—মনস্বীদের; **ইব**—মতো; **সৎ**—উপযুক্ত; **সম্প্রহারঃ**—তীব্র আঘাত।

অনুবাদ

যুদ্ধে তীব্র আঘাত পাওয়া সত্ত্বেও প্রশান্তচিত্ত যোদ্ধার মতো সন্ন্যাসদণ্ড অবলম্বনকারী সন্ন্যাসীদের আনন্দদায়ক যে হিমালয় পর্বতমালা, সেই অভিমুখে তাঁর পতিকে গমন করতে দেখে গান্ধাররাজ সুবলের কন্যা পতিব্রতা সাধ্বী গান্ধারী তাঁর অনুগামিনী হলেন।

তাৎপর্য

মহারাজ সুবলের কন্যা এবং ধৃতরাষ্ট্রের পত্নী গান্ধারী ছিলেন আদর্শ পতিব্রতা রমণী। বৈদিক সভ্যতায় রমণীদের বিশেষ করে পতিব্রতা সতী হওয়ার শিক্ষা দেওয়া হয়ে থাকে। ইতিহাসে যে সমস্ত সতী নারীর উল্লেখ করা হয়েছে, গান্ধারী তাঁদের অন্যতমা। লক্ষ্মী সীতাদেবীও ছিলেন এক মহান্ রাজার কন্যা, কিন্তু তিনিও তাঁর পতি শ্রীরামচন্দ্রের অনুগামিনী হয়ে বনে গিয়েছিলেন।

তেমনই, একজন মহিলা হিসাবে গান্ধারী ইচ্ছা করলে তাঁর গৃহে অথবা তাঁর পিতৃগৃহে থাকতে পারতেন, কিন্তু সাধ্বী পতিব্রতা স্ত্রীরূপে তিনি কোনও রকম সুবিধা-অসুবিধার কথা বিবেচনা না করেই তাঁর পতির অনুগামিনী হয়েছিলেন। বিদুর ধৃতরাষ্ট্রকে ত্যাগ-বৈরাগ্যের আশ্রম অবলম্বন করার উপদেশ দিয়েছিলেন, এবং গান্ধারী সেই সময় তাঁর পতির পাশে ছিলেন। কিন্তু ধৃতরাষ্ট্র তাঁকে তাঁর অনুগামিনী হতে বলেননি, কারণ তখন যুদ্ধক্ষেত্রে সব রকম বিপদের সম্মুখীন হওয়া সত্ত্বেও অবিচলিত যোদ্ধার মতো তিনি সম্পূর্ণরূপে দৃঢ়সঙ্কল্প হয়েই ছিলেন। তিনি আর

তখন তথাকথিত পত্নী অথবা আত্মীয়-স্বজনদের প্রতি আকৃষ্ট ছিলেন না, এবং তিনি স্থির করেছিলেন একাকী গৃহত্যাগ করতে, কিন্তু পতিব্রতা সতী গান্ধারী তাঁর জীবনের অন্তিম সময় পর্যন্ত তাঁর পতির অনুগামিনী হওয়ার সঙ্কল্প করেছিলেন।

মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র বানপ্রস্থ আশ্রম গ্রহণ করেছিলেন, এবং সেই আশ্রমে পত্নী পতির স্বেচ্ছাসেবী সহগামিনী হতে পারেন, কিন্তু সন্ন্যাস আশ্রমে পত্নী আর পূর্বাশ্রমের পতির সঙ্গে থাকতে পারেন না। সন্ন্যাসীকে সামাজিক ভাবনায় মৃত বলেই ধরে নেওয়া হয়, এবং তাই সন্ন্যাসীর পত্নী সামাজিক দৃষ্টিতে বিধবা হয়ে যান এবং তাঁর পূর্বতন স্বামীর সাথে কোনও সংযোগ থাকে না। মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র তাঁর সতী স্ত্রীকে প্রত্যাখ্যান করেননি, এবং তাই সমস্ত বিপদের ঝুঁকি নিয়ে গান্ধারী তাঁর পতির অনুগামিনী হয়েছিলেন।

সন্ন্যাস আশ্রমের প্রতীক স্বরূপ সন্ন্যাসীরা একটি দণ্ড গ্রহণ করেন। যাঁরা শ্রীপাদ শঙ্করাচার্যের নেতৃত্বে মায়াবাদী দর্শন অনুসরণ করেন, তাঁরা একদণ্ড গ্রহণ করেন, কিন্তু যাঁরা বৈষ্ণব দর্শন অনুসরণ করেন, তাঁরা ত্রিদণ্ড গ্রহণ করেন। মায়াবাদী সন্ন্যাসীদের বলা হয় একদণ্ডী স্বামী, আর বৈষ্ণব সন্ন্যাসীদের বলা হয় ত্রিদণ্ডী স্বামী, অথবা মায়াবাদীদের সঙ্গে পার্থক্য বিশেষভাবে নিরূপণ করে তাঁদের বলা হয় ত্রিদণ্ডী গোস্বামী। একদণ্ডী স্বামীরা সাধারণত হিমালয়ের প্রতি আসক্ত, কিন্তু বৈষ্ণব সন্ন্যাসীরা বৃন্দাবন অথবা জগন্নাথপুরীর প্রতি আকৃষ্ট হন। বৈষ্ণব সন্ন্যাসীরা হচ্ছেন *নরোত্তম*, আর মায়াবাদী সন্ন্যাসীরা হচ্ছেন *ধীর*। মহারাজ ধৃতরাষ্ট্রকে *ধীর* হতে উপদেশ দেওয়া হয়েছিল, কারণ তাঁর পক্ষে কখনো *নরোত্তম* হওয়া সম্ভব ছিল না।

শ্লোক ৩১

অজাতশত্রুঃ কৃতমৈত্রো হুতাগ্নি-
র্বিপ্রান্ নত্বা তিলগোভূমিরুক্মৈঃ ।
গৃহং প্রবিষ্টো গুরুবন্দনায়
ন চাপশ্যৎ পিতরৌ সৌবলীঞ্চ ॥ ৩১ ॥

অজাতশত্রুঃ—যাঁর শত্রু জন্মগ্রহণ করেনি অর্থাৎ যাঁর কোন শত্রু নেই; **কৃত**—অনুষ্ঠান করে; **মৈত্রঃ**—দেবতাদের বন্দনা করে; **হুত অগ্নিঃ**—যজ্ঞাগ্নিতে আহুতি নিবেদন করে; **বিপ্রান্**—ব্রাহ্মণদের; **নত্বা**—প্রণতি নিবেদন করে; **তিল-গো-ভূমি-রুক্মৈঃ**—শস্য, গাভী, ভূমি এবং সোনা দিয়ে; **গৃহম্**—প্রাসাদে; **প্রবিষ্টঃ**—

প্রবেশ করে; গুরু-বন্দনায়—গুরুজনদের বন্দনা করার জন্য; ন—না; চ—ও; অপশ্যৎ—দেখে; পিতরৌ—তাঁর পিতৃব্য ধৃতরাষ্ট্র এবং বিদুরকে; সৌবলীম্—গান্ধারীকে; চ—ও।

অনুবাদ

অজাতশত্রু যুধিষ্ঠির মহারাজ সন্ধ্যা-বন্দনাদি ক্রিয়া এবং হোমাদি কার্য সমাপন করে তিল, গাভী, ভূমি ও রত্নাদির দ্বারা ব্রাহ্মণদের প্রণতি নিবেদন করে ও গুরুজনদের বন্দনা করার জন্য প্রাসাদে প্রবেশ করে সেখানে পিতৃব্য বিদুর ও ধৃতরাষ্ট্র এবং সুবল-তনয়া গান্ধারীকে দেখতে পেলেন না।

তাৎপর্য

মহারাজ যুধিষ্ঠির ছিলেন শ্রেষ্ঠ ধার্মিক রাজা, কারণ তিনি নিজে প্রতিদিন গার্হস্থ্য আশ্রমের পবিত্র কর্তব্যকর্মাদি অনুষ্ঠান করতেন। গৃহস্থের কর্তব্য হচ্ছে উষাকালে ঘুম থেকে উঠে স্নান করে বন্দনা সহকারে শ্রীবিগ্রহের আরাধনা করা, যজ্ঞাগ্নিতে আহুতি নিবেদন করা, ব্রাহ্মণদের শস্য, গাভী, ভূমি, স্বর্ণ ইত্যাদি দান করা, এবং অবশেষে গুরুজনদের যথাযথ শ্রদ্ধা প্রণাম নিবেদন করা। শাস্ত্রের নির্দেশ অনুশীলন না করে কেবলমাত্র পুঁথিগত জ্ঞান নিয়েই সজ্জন হওয়া যায় না। আধুনিক যুগের গৃহস্থদের জীবনধারা অন্য রকম, তারা অনেক বেলায় ঘুম থেকে ওঠে এবং তারপর স্নানাদি শৌচক্রিয়া এবং উল্লিখিত ধর্মাচরণগুলি না করেই বিছানায় বসে চা খায়। গৃহস্থ শিশুরাও তাদের পিতামাতার আচরণেরই অনুকরণ করে, এবং তাই সমস্ত সমাজ নরকগামী অধঃপতনের পথে দ্রুত নেমে চলে। যদি তারা সাধু সঙ্গ না করে, তা হলে তাদের কাছ থেকে ভাল কিছু আশা করা যায় না। ধৃতরাষ্ট্রের মতো বিষয়াসক্ত মানুষেরা বিদুরের মতো সাধুর কাছ থেকে শিক্ষাগ্রহণ করতে পারেন, এবং তার ফলে আধুনিক যুগের কলুষিত প্রভাব থেকে মুক্ত হতে পারেন।

মহারাজ যুধিষ্ঠির তাঁর দুই পিতৃব্য ধৃতরাষ্ট্র ও বিদুরকে রাজা সুবলের কন্যা গান্ধারীর সাথে রাজপ্রাসাদে না দেখতে পেয়ে অত্যন্ত ব্যাকুল হয়েছিলেন এবং তাই তিনি ধৃতরাষ্ট্রের একান্ত সচিব সঞ্জয়ের কাছে গিয়ে তাঁদের সম্বন্ধে অনুসন্ধান করেছিলেন।

শ্লোক ৩২

তত্র সঞ্জয়মাসীনং পপ্রচ্ছোদ্বিগ্নমানসঃ।
গাবল্গণে ক্ব নস্তাতো বৃদ্ধো হীনশ্চ নেত্রয়োঃ ॥ ৩২ ॥

তত্র—সেখানে; সঞ্জয়ম্—সঞ্জয়ের কাছে; আসীনম্—উপবিষ্ট; পপ্রচ্ছ—জিজ্ঞাসা করলেন; উদ্বিগ্ন মানসঃ—উদ্বিগ্নচিত্ত; গাবল্গণে—গবল্গণ-পুত্র সঞ্জয়কে; ক—কোথায়; নঃ—আমাদের; তাতঃ—খুল্লতাত; বৃদ্ধ—স্থবির; হীন চ নেত্রয়োঃ—নেত্রহীন।

অনুবাদ

উদ্বিগ্নচিত্ত যুধিষ্ঠির সেখানে সঞ্জয়কে সমুপবিষ্ট দেখে জিজ্ঞাসা করলেন—হে সঞ্জয়, আমাদের বৃদ্ধ এবং অন্ধ পিতৃব্য কোথায়?

শ্লোক ৩৩

অম্বা চ হতপুত্রার্তা পিতৃব্যঃ ক্ব গতঃ সুহৃৎ।
অপি ময্যকৃতপ্রজ্ঞে হতবন্ধুঃ স ভার্যয়া।
আশংসমানঃ শমলং গঙ্গায়াং দুঃখিতোহপতৎ ॥ ৩৩ ॥

অম্বা—মাতা; চ—এবং; হত-পুত্রা—যিনি তাঁর সমস্ত পুত্রদের হারিয়েছেন; আর্তা—শোককাতরা; পিতৃব্য—খুল্লতাত বিদুর; ক্ব—কোথায়; গতঃ—গিয়েছেন; সুহৃৎ—শুভাকাঙ্ক্ষী; অপি—কি; ময়ি—আমার প্রতি; অকৃত-প্রজ্ঞে—অকৃতজ্ঞ; হত-বন্ধু—যিনি তাঁর আত্মীয়-স্বজনদের হারিয়েছেন; সঃ—ধৃতরাষ্ট্র; ভার্যয়া—তাঁর পত্নীসহ; আশংসমানঃ—আশঙ্কিত চিত্তে; শমলম্—অপরাধ; গঙ্গায়াম্—গঙ্গার জলে; দুঃখিত—দুঃখিত চিত্তে; অপতৎ—পতিত হয়েছেন।

অনুবাদ

আমাদের পরম আত্মীয় খুল্লতাত বিদুর এবং হত-পুত্র শোককাতরা মাতা গান্ধারীই বা কোথায় গিয়েছেন? আমার জ্যেষ্ঠতাত ধৃতরাষ্ট্র তাঁর পুত্র এবং পৌত্রদের মৃত্যুতে অত্যন্ত বিরহকাতর। নিঃসন্দেহে আমি অত্যন্ত অকৃতজ্ঞ। তিনি কি আমার সেই অপরাধে নিদারুণ ক্ষুব্ধ হয়ে তাঁর পত্নীসহ গঙ্গায় আত্মবিসর্জন দিলেন?

তাৎপর্য

পাণ্ডবেরা, বিশেষ করে মহারাজ যুধিষ্ঠির এবং অর্জুন কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের পরিণতি পূর্বেই উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন, এবং তাই অর্জুন যুদ্ধ করতে চাননি। ভগবানের ইচ্ছায় সেই যুদ্ধ হয়েছিল, কিন্তু পরিবারে তার মর্মান্তিক পরিণতি, যা

তাঁরা পূর্বেই অনুমান করেছিলেন, তা বাস্তবায়িত হয়েছিল। মহারাজ যুধিষ্ঠির সব সময় তাঁর পিতৃব্য ধৃতরাষ্ট্র এবং গান্ধারীর শোচনীয় অবস্থা সম্বন্ধে সচেতন ছিলেন, এবং তাই তাঁদের শোকগ্রস্ত এবং বৃদ্ধ অবস্থায় তিনি সর্বতোভাবে তাঁদের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য বিধানের চেষ্টা করেছিলেন। তাই প্রাসাদে তাঁদের দেখতে না পেয়ে স্বাভাবিকভাবেই তাঁর চিত্তে আশঙ্কার উদয় হয়েছিল, এবং তিনি অনুমান করেছিলেন যে, তাঁরা হয়ত গঙ্গার জলে নিমগ্ন হয়েছেন।

তিনি নিজেকে অকৃতজ্ঞ বলে মনে করেছিলেন, কারণ তাঁরা যখন পিতৃহীন হয়েছিলেন, তখন মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র তাঁদের জীবন ধারণের উপযোগী সমস্ত রাজকীয় সুযোগ-সুবিধা দিয়েছিলেন, কিন্তু তার বিনিময়ে তিনি কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে তাঁর সমস্ত পুত্রদের হত্যা করেছেন। পুণ্যাত্মা যুধিষ্ঠির মহারাজ তাঁর নিজের সমস্ত অপরিহার্য দুষ্কর্মের কথা বিবেচনা করেছিলেন, এবং তিনি কখনোই তাঁর জ্যেষ্ঠতাত এবং তাঁর সাঙ্গোপাঙ্গদের দুষ্কর্মের কথা মনে রাখেননি। ভগবানের ইচ্ছায় ধৃতরাষ্ট্র তাঁর দুষ্কর্মের ফল ভোগ করেছিলেন, কিন্তু মহারাজ যুধিষ্ঠির কেবল তাঁর নিজেরই অপরিহার্য দুষ্কর্মগুলির কথা মনে করে অনুতপ্ত হয়েছিলেন। এইটিই সজ্জন ভগবদ্ভক্তের প্রকৃতি। কোন ভগবদ্ভক্ত কখনো অন্যের দোষ খোঁজেন না, কেবল নিজের দোষ-ত্রুটিগুলিই খোঁজেন এবং এইভাবে যতদূর সম্ভব নিজেকে সংশোধন করেন।

শ্লোক ৩৪

পিতর্যুপরতে পাণ্ডৌ সর্বান্নঃ সুহৃদঃ শিশূন্ ।
অরক্ষতাং ব্যসনতঃ পিতৃব্যৌ ক্ব গতাবিতঃ ॥ ৩৪ ॥

পিতরি—আমাদের পিতার; **উপরতে**—শয্যাগত হলে; **পাণ্ডৌ**—মহারাজ পাণ্ডু; **সর্বান্**—সকলের; **নঃ**—আমাদের; **সুহৃদঃ**—সুহৃদ্‌বর্গ; **শিশুন্**—শিশুরা; **অরক্ষতাম্**—রক্ষণাবেক্ষণ করেছিলেন; **ব্যসনতঃ**—সব রকম বিপদ থেকে; **পিতৃব্যৌ**—পিতৃব্য দুজন; **ক্ব**—কোথায়; **গতৌ**—গেছেন; **ইতঃ**—এখান থেকে।

অনুবাদ

যখন আমাদের পিতা পাণ্ডু শয্যাগত হলেন, এবং আমরা সকলে নিতান্ত শিশু, তখন এই দুই পিতৃব্য আমাদের সকল প্রকার দুর্যোগ থেকে রক্ষা করেছিলেন। তাঁরা সকল সময়ে ছিলেন আমাদের মঙ্গলময় শুভাকাঙ্ক্ষী। হায়, তাঁরা এখান থেকে কোথায় গেলেন?

শ্লোক ৩৫

সূত উবাচ

কৃপয়া স্নেহবৈক্লব্যাৎ সূতো বিরহকর্শিতঃ ।
আত্মেশ্বরমচক্ষাণো ন প্রত্যাহাতিপীড়িতঃ ॥ ৩৫ ॥

সূত উবাচ—সূত গোস্বামী বললেন; **কৃপয়া**—করুণার বশে; **স্নেহ-বৈক্লব্যাৎ**—গভীর স্নেহজনিত মানসিক বিকার; **সূতঃ**—সঞ্জয়; **বিরহ-কর্শিতঃ**—বিরহজনিত কাতরতা; **আত্ম-ঈশ্বরম্**—তাঁর প্রভু ধৃতরাষ্ট্রকে; **অচক্ষণঃ**—না দেখে; **ন**—করলেন না; **প্রত্যাহ**—প্রত্যুত্তর; **অতি-পীড়িত**—অত্যন্ত কাতর হয়ে।

অনুবাদ

সূত গোস্বামী বললেন—তাঁর প্রভু ধৃতরাষ্ট্রকে না দেখে বিরহকাতর সঞ্জয় দয়া এবং স্নেহজনিত বিকলতা হেতু অত্যন্ত কাতর হওয়ায় মহারাজ যুধিষ্ঠিরের সেই প্রশ্নের যথাযথ প্রত্যুত্তর প্রদান করতে পারলেন না।

তাৎপর্য

সঞ্জয় দীর্ঘকাল ধরে মহারাজ ধৃতরাষ্ট্রের একান্ত সহকারী ছিলেন, এবং সেই হেতু তিনি ধৃতরাষ্ট্রের জীবন পর্যবেক্ষণ করার সুযোগ পেয়েছিলেন। আর তিনি যখন দেখলেন যে, অবশেষে ধৃতরাষ্ট্র কাউকে না জানিয়ে গৃহত্যাগ করেছেন, তখন তাঁর দুঃখের সীমা রইল না। তিনি ধৃতরাষ্ট্রের প্রতি পূর্ণ সহানুভূতিসম্পন্ন হলেন, কারণ কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের জয়-পরাজয়ের খেলায় রাজা ধৃতরাষ্ট্র তাঁর লোকবল ও অর্থবল সব কিছুই হারিয়ে ছিলেন, এবং অবশেষে গভীর নৈরাশ্যে রাজা এবং রানীকে গৃহত্যাগ করতে হয়েছিল। সঞ্জয় তাঁর নিজের দৃষ্টিভঙ্গিতে পরিস্থিতি অনুধাবন করেছিলেন, কারণ তিনি জানতেন না যে, বিদুরের সঙ্গপ্রভাবে ধৃতরাষ্ট্রের জ্ঞানচক্ষু উন্মীলিত হয়েছিল এবং তাই তিনি এক শ্রেয় জীবনধারা লাভ করার উদ্দেশ্যে হর্ষোৎফুল্ল উদ্দীপনায় গৃহের অন্ধকূপ ত্যাগ করেছেন। বর্তমান জীবনধারা ত্যাগ করে উন্নততর এক জীবনচর্যা সম্বন্ধে সম্পূর্ণরূপে নিশ্চিত না হলে, বর্তমান জীবন ত্যাগ করে নিছক কৃত্রিম বেশ ধারণ করলে বা গৃহ থেকে বাইরে বসবাস করলেই কেউ সন্ন্যাস আশ্রমে টিকে থাকতে পারে না।

শ্লোক ৩৬

বিমৃজ্যাশ্রূণি পাণিভ্যাং বিষ্টভ্যাত্মানমাত্মনা ।
অজাতশত্রুং প্রত্যূচে প্রভোঃ পাদাবনুস্মরন্ ॥ ৩৬ ॥

বিমৃজ্য—মুছে; **অশ্রূণি**—চোখের জল; **পাণিভ্যাম্**—দুই হস্তের দ্বারা; **বিষ্টভ্য**—ধৈর্যযুক্ত হয়ে; **আত্মানম্**—মনকে; **আত্মনা**—বুদ্ধির দ্বারা; **অজাত শত্রুম্**—মহারাজ যুধিষ্ঠিরকে; **প্রত্যূচে**—প্রত্যুত্তর দিলেন; **প্রভোঃ**—তাঁর প্রভুর; **পাদৌ**—পদযুগল; **অনুস্মরন্**—স্মরণ করে।

অনুবাদ

প্রথমে তিনি ধীরে ধীরে তাঁর বুদ্ধির দ্বারা মনকে সংযত করে, তারপর তাঁর দুই হাত দিয়ে চোখের জল মুছে এবং তাঁর প্রভু ধৃতরাষ্ট্রের চরণযুগল ধ্যান করতে করতে, অজাতশত্রু মহারাজা যুধিষ্ঠিরকে প্রত্যুত্তর দিতে শুরু করলেন।

শ্লোক ৩৭

সঞ্জয় উবাচ

নাহং বেদ ব্যবসিতং পিত্রোর্বঃ কুলনন্দন ।
গান্ধার্যা বা মহাবাহো মুষিতোঽস্মি মহাত্মভিঃ ॥ ৩৭ ॥

সঞ্জয় উবাচ—সঞ্জয় বললেন; **ন**—না; **অহম্**—আমি; **বেদ**—জানা; **ব্যবসিতং**—অভিপ্রায়; **পিত্রোঃ**—আপনার পিতৃব্য; **বঃ**—আপনার; **কুলনন্দন**—হে কুরুবংশের বংশধর; **গান্ধার্যা**—গান্ধারীর; **বা**—অথবা; **মহাবাহো**—হে মহারাজ; **মুষিতঃ**—বঞ্চিত; **অস্মি**—হয়েছি; **মহা-আত্মভিঃ**—সেই মহাত্মাদের দ্বারা।

অনুবাদ

সঞ্জয় বললেন—হে কুরুবংশের বংশধর, আপনার দুই পিতৃব্য এবং গান্ধারীর অভিপ্রায় কিছুই আমি জানি না। হে মহাবাহো, আমি সেই মহাত্মাগণ কর্তৃক বঞ্চিত হয়েছি।

তাৎপর্য

মহাত্মারা যে প্রবঞ্চনা করতে পারেন, সেকথা শুনতে যেন কেমন আশ্চর্য লাগে, কিন্তু মহৎ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য মহাত্মারা অন্যদের কখনো প্রবঞ্চনা করে থাকেন। এক মহৎ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য শ্রীকৃষ্ণও যুধিষ্ঠিরকে দ্রোণাচার্যের কাছে মিথ্যা কথা বলতে উপদেশ দিয়েছিলেন, এবং সেটা একটা মহৎ উদ্দেশ্যেই করা হয়েছিল। পরমেশ্বর ভগবান তা চেয়েছিলেন, এবং তাই সেই উদ্দেশ্যটি নিঃসন্দেহে মহান্। ভগবানের সন্তুষ্টি বিধানই হচ্ছে চরম উদ্দেশ্য, এবং জীবনের পরম পূর্ণতা হচ্ছে স্বীয় বৃত্তির দ্বারা ভগবানের সন্তুষ্টি বিধান করা। সেইটিই *ভগবদ্গীতা* এবং *শ্রীমদ্ভাগবতের* সিদ্ধান্ত।* গান্ধারী সহ ধৃতরাষ্ট্র যখন বিদুরের সঙ্গে গৃহত্যাগ করেন, তখন তিনি সঞ্জয়কেও তাঁদের অভিপ্রায় জানাননি, যদিও তাঁর একান্ত সহকারী রূপে সঞ্জয় সব সময়ই তাঁর সঙ্গে থাকতেন। সঞ্জয় কখনও ভাবেননি যে, তাঁর সঙ্গে আলোচনা না করে ধৃতরাষ্ট্র কখনও কোন কিছু করতে পারেন। কিন্তু ধৃতরাষ্ট্র এত গোপনে গৃহত্যাগ করেছিলেন যে, তা তিনি সঞ্জয়কেও পর্যন্ত জানাতে পারেননি।

শ্রীসনাতন গোস্বামীও যখন শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর কাছে যাচ্ছিলেন, তখন কারাধ্যক্ষকে প্রবঞ্চনা করেছিলেন, এবং তেমনি রঘুনাথ দাস গোস্বামীও শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর কাছে যাওয়ার জন্য তাঁদের কুলপুরোহিতকে প্রবঞ্চনা করেছিলেন। ভগবানের সন্তুষ্টি বিধানের জন্য যা করা হয় তা সবই শুভ, কারণ সেই কার্য পরম তত্ত্বের সাথে সম্পর্কযুক্ত। আমরাও শ্রীমদ্ভাগবতের সেবায় যুক্ত হওয়ার জন্য পরিবারের সকলকে প্রতারণা করার সুযোগ নিয়ে গৃহত্যাগ করেছিলাম। এক মহৎ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য এই ধরনের প্রতারণার প্রয়োজন ছিল, এবং এই ধরনের অপ্রাকৃত প্রতারণার ফলে কারোরই ক্ষতি হয় না।

শ্লোক ৩৮

অথাজগাম ভগবান্ নারদঃ সহতুম্বুরুঃ ।
প্রত্যুত্থায়াভিবাদ্যাহ সানুজোঽভ্যর্চয়ন্মুনিম্ ॥ ৩৮ ॥

---

*যতঃ প্রবৃত্তির্ভূতানাং যেন সর্বমিদং ততম্ । স্বকর্মণা তমভ্যর্চ্য সিদ্ধিং বিন্দতি মানবঃ ॥ (গীতাঃ ১৮/৪৬)
অতঃ পুম্ভির্দ্বিজশ্রেষ্ঠা বর্ণাশ্রমবিভাগশঃ । স্বনুষ্ঠিতস্য ধর্মস্য সংসিদ্ধির্হরিতোষণম্ ॥ (ভাঃ ১/২/১৩)

অথ—তারপর; **আজগাম**—উপস্থিত হলেন; **ভগবান্**—মহা ভাগবত; **নারদঃ**—নারদ মুনি; **সহ-তুম্বুরুঃ**—তাঁর বীণা বাদ্যযন্ত্র হস্তে; **প্রত্যুত্থায়**—তাঁদের আসন থেকে উঠে; **অভিবাদ্য**—তাঁদের যথাযোগ্য অভিবাদন জানিয়ে; **আহ**—বললেন; **স-অনুজঃ**—কনিষ্ঠ ভ্রাতাদের সহ; **অভ্যর্চয়ন্**—যথাযোগ্য পূজা অভ্যর্থনা জানিয়ে; **মুনিম্**—দেবর্ষিকে।

অনুবাদ

সঞ্জয় যখন এইভাবে বলছিলেন, তখন বীণা হস্তে মহাভাগবত নারদ সেইখানে আবির্ভূত হলেন। মহারাজ যুধিষ্ঠির তখন তাঁর ভাইদের সঙ্গে নিজ আসন ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে নারদ মুনিকে অভিবাদনপূর্বক পূজা করে অভ্যর্থনা জানালেন।

তাৎপর্য

ভগবানের বিশেষ অন্তরঙ্গ ভক্ত বলে নারদ মুনিকে এখানে ভগবান বলে সম্বোধন করা হয়েছে। যাঁরা ভগবানের প্রেমময়ী সেবায় যুক্ত, তাঁরা ভগবান এবং ভগবানের অন্তরঙ্গ ভক্তদের সমপর্যায়ে বিবেচনা করেন।

ভগবানের অন্তরঙ্গ ভক্তরা ভগবানের অত্যন্ত প্রিয়, কারণ তাঁদের ক্ষমতা অনুসারে তাঁরা সর্বত্র ভ্রমণ করে ভগবানের মহিমা প্রচার করেন এবং মায়াবদ্ধ উন্মাদ জীবদের ভগবদ্ভক্তে পরিণত করে তাদের মানসিক সুস্থিরতার স্তরে উন্নীত করার যথাসাধ্য চেষ্টা করেন। প্রকৃতপক্ষে জীব কখনই পরমেশ্বর ভগবানের ভক্ত না হয়ে পারে না, কারণ ভগবানের ভক্ত হওয়াই তার স্বরূপসিদ্ধ মর্যাদা, কিন্তু কেউ যখন অভক্ত বা নাস্তিক হয়ে যায়, তখন বুঝতে হবে যে, সেই ব্যক্তির জীবনধারা সুস্থ অবস্থায় নেই। ভগবানের অন্তরঙ্গ ভক্তরা এই ধরনের মোহাচ্ছন্ন জীবদের পরিচর্যা করেন, এবং তাই তাঁরা ভগবানের চোখে অত্যন্ত প্রিয়।

ভগবদ্গীতায় ভগবান বলেছেন যে, যাঁরা অবিশ্বাসী অভক্তদের ভগবদ্ভক্ত করে তোলার প্রয়াসে তাদের মধ্যে যথার্থই তাঁর মহিমা প্রচার করেন, তাঁর কাছে তাঁদের চেয়ে প্রিয় আর কেউ নয়। স্বয়ং পরম পুরুষোত্তম ভগবানকে যেভাবে শ্রদ্ধার্ঘ জানানো হয়, নারদ মুনির মতো এই ধরনের বিশিষ্ট মহাপুরুষদের উদ্দেশ্যে সেই ভাবেই উপযুক্ত শ্রদ্ধা নিবেদন করা কর্তব্য এবং নারদ মুনির মতো এক শুদ্ধ ভগবদ্ভক্ত যে তাঁর বীণা নিয়ে পরমেশ্বর ভগবানের মহিমা কীর্তন ছাড়া আর কোনও কাজ করতেন না, তাঁকে মহারাজ যুধিষ্ঠির, তাঁর মহান্ ভ্রাতারা সহ, যেভাবে অভ্যর্থনা জানিয়ে শ্রদ্ধা নিবেদন করেছিলেন, তা অন্যের কাছে দৃষ্টান্ত-স্বরূপ।

শ্লোক ৩৯

যুধিষ্ঠির উবাচ

নাহং বেদ গতিং পিত্রোর্ভগবন্ ক্ক গতাবিতঃ ।
অম্বা বা হতপুত্রার্তা ক্ক গতা চ তপস্বিনী ॥ ৩৯ ॥

যুধিষ্ঠির উবাচ—যুধিষ্ঠির মহারাজ বললেন; **ন**—না; **অহম্**—আমি; **বেদ**—জানা; **গতিম্**—গমন করেছেন; **পিত্রোঃ**—পিতৃব্যদের; **ভগবন্**—হে ভগবান; **ক্ক**—কোথায়; **গতৌ**—গিয়েছেন; **ইতঃ**—এখান থেকে; **অম্বা**—মাতা; **বা**—অথবা; **হত-পুত্রা**—যাঁর পুত্রেরা মারা গেছেন; **আর্তা**—শোকার্তা; **ক্ক**—কোথায়; **গতা**—গিয়েছেন; **চ**—ও; **তপস্বিনী**—তপশ্চর্যা পরায়ণা।

অনুবাদ

মহারাজ যুধিষ্ঠির বললেন—হে ভাগবত, আমার দুই পিতৃব্য কোথায় গেছেন তা আমি জানি না, এবং সমস্ত পুত্রহীনা, শোক-কাতরা আমার মাতৃসম তপস্বিনী গান্ধারীকেও আমি দেখতে পাচ্ছি না।

তাৎপর্য

ভগবদ্ভক্ত মহাত্মা যুধিষ্ঠির সর্বদাই তাঁর জ্যেষ্ঠমাতা গান্ধারীর বিপুল ক্ষতি এবং এক তপস্বিনী স্বরূপ তাঁর গভীর দুঃখের কথা মনে রেখে ছিলেন। তপস্বিনী কখনো দুঃখ-দুর্দশায় বিচলিত হন না, এবং তার ফলে তিনি পরমার্থের পথে দৃঢ়সঙ্কল্প হন এবং আধ্যাত্মিক শক্তি লাভ করেন। রানী গান্ধারী তাঁর অনবদ্য চরিত্রবলে ছিলেন বিশেষ দৃষ্টান্তস্বরূপ এক তপস্বিনী, কারণ নানা রকম দুঃখ-দুর্দশার মাঝেও তিনি ছিলেন অবিচলিত। মাতা, পত্নী এবং তপস্বিনী রূপে তিনি ছিলেন এক আদর্শ রমণী এবং পৃথিবীর ইতিহাসে তাঁর মতো চরিত্র বিরল।

শ্লোক ৪০

কর্ণধার ইবাপারে ভগবান্ পারদর্শকঃ ।
অথাবভাষে ভগবান্ নারদো মুনিসত্তমঃ ॥ ৪০ ॥

কর্ণ-ধারঃ—কাণ্ডারী; **ইব**—মতো; **অপারে**—দুস্তর সমুদ্রে; **ভগবান্**—ভগবানের প্রতিনিধি; **পার-দর্শকঃ**—যিনি অপর পারে নিয়ে যেতে পারেন; **অথ**—এইভাবে;

অবভাষে—বলতে শুরু করলেন; ভগবান্—দেবতুল্য ব্যক্তি; নারদঃ—দেবর্ষি নারদ; মুনি-সৎ-তমঃ—মুনি শ্রেষ্ঠ।

অনুবাদ

আপনি মহাসাগরে কর্ণধারের মতো আমাদের লক্ষ্যপথ দেখাতে পারেন। এইভাবে যুধিষ্ঠিরের কথা শুনে মহাভাগবত, দার্শনিক ভক্তশ্রেষ্ঠ দেবর্ষি নারদ বলতে লাগলেন।

তাৎপর্য

দর্শনতত্ত্বজ্ঞ নানা প্রকার মুনি আছেন, এবং তাঁদের মধ্যে যিনি পরমেশ্বর ভগবানকে দর্শন করে তাঁর প্রেমময়ী সেবায় নিজেকে সর্বতোভাবে উৎসর্গ করেছেন, তিনিই সর্বশ্রেষ্ঠ। এই রকম শুদ্ধ ভক্তদের মধ্যে দেবর্ষি নারদ হচ্ছেন সর্বশ্রেষ্ঠ, এবং তাই এখানে তাঁকে 'মুনি-সত্তম' বলে সম্বোধন করা হয়েছে।

সদ্‌গুরুর কাছ থেকে বেদান্ত দর্শন-তত্ত্ব শ্রবণ করার মাধ্যমে তত্ত্বজ্ঞান লাভ না করলে মুনিশ্রেষ্ঠ ভগবদ্ভক্ত হওয়া যায় না। অবিচলিত শ্রদ্ধা, জ্ঞান এবং বৈরাগ্য না থাকলে কেউ শুদ্ধ ভক্ত হতে পারে না। ভগবানের শুদ্ধ ভক্ত আমাদের অজ্ঞানতার পরপারে নিয়ে যেতে পারেন।

দেবর্ষি নারদ মহারাজ যুধিষ্ঠিরের প্রাসাদে যেতেন, কারণ পাণ্ডবেরা সকলেই ছিলেন ভগবানের শুদ্ধভক্ত, এবং দেবর্ষি নারদ সব সময় তাঁদের সৎ-উপদেশ দিতে প্রস্তুত থাকতেন।

শ্লোক ৪১

নারদ উবাচ

মা কঞ্চন শুচো রাজন্ যদীশ্বরবশং জগৎ।
লোকাঃ সপালা যস্যেমে বহন্তি বলিমীশিতুঃ।
স সংযুনক্তি ভূতানি স এব বিযুনক্তি চ ॥ ৪১ ॥

নারদঃ উবাচ—নারদ বললেন; **মা**—কখনই নয়; **কঞ্চন**—যে কোন ভাবে; **শুচঃ**—শোককর; **রাজন্**—হে রাজন্; **যৎ**—যেহেতু; **ঈশ্বর-বশম্**—পরমেশ্বর ভগবানের নিয়ন্ত্রণাধীন; **জগৎ**—জগৎ; **লোকাঃ**—সমস্ত জীবেরা; **স-পালাঃ**—তাদের

নেতাসহ; যস্য—যার; ইমে—এই সমস্ত; বহন্তি—বহন করে; বলিম্—পূজার নৈবেদ্য; ঈশিতুঃ—সংযুক্ত; ভূতানি—সমস্ত জীবদের; সঃ—তিনি; এব—ও; বিযুনক্তি—বিযুক্ত; চ—এবং।

অনুবাদ

শ্রীনারদ মুনি বললেন—হে ধার্মিক রাজন্, কারও জন্য শোক করো না, কারণ প্রত্যেকেই পরমেশ্বর ভগবানের অধীন। তাই সমস্ত জীব এবং তাদের পালকবর্গ প্রার্থনা করে থাকেন যেন নির্বিঘ্নে থাকতে পারেন। ভগবানই তাদের মিলিত করেন এবং বিচ্ছিন্নও করেন।

তাৎপর্য

এই জড় জগৎ অথবা চিৎ জগৎ, উভয় জগতেই প্রতিটি জীবসত্তাই পরমেশ্বর ভগবানের নিয়ন্ত্রণাধীন। ব্রহ্মা থেকে একটি পিপীলিকা পর্যন্ত সকলেই পরমেশ্বর ভগবানের আদেশ পালন করছে। এইভাবে ভগবানের নিয়ন্ত্রণাধীন হওয়াই জীবের স্বরূপ। মূর্খ জীব, বিশেষ করে মানুষ, বৃথাই ভগবানের আইনের বিরোধিতা করে থাকে এবং তার ফলে তারা অসুর রূপে বা আইন-ভঙ্গকারীরূপে দণ্ড ভোগ করে।

ভগবানের নির্দেশ অনুসারে, জীব কোন বিশেষ মর্যাদায় অধিষ্ঠিত হয়, এবং ভগবানের আদেশে অথবা তাঁর প্রতিনিধির আদেশে সেই মর্যাদা থেকে আবার স্থানান্তরিত হয়। ব্রহ্মা, শিব, ইন্দ্র, চন্দ্র, মহারাজ যুধিষ্ঠির অথবা আধুনিক যুগের ইতিহাসে নেপোলিয়ন, আকবর, আলেকজাণ্ডার, গান্ধী, সুভাষ এবং নেহেরু সকলেই ভগবানের দাস, এবং ভগবানের পরম ইচ্ছায় তাঁদের বিশেষ বিশেষ মর্যাদায় তাঁরা অধিষ্ঠিত হয়েছেন আবার অপসারিত হয়েছেন। তাঁদের কেউই স্বাধীন স্বতন্ত্র নন।

ঐ সব মানুষ বা নেতারা যদিও ভগবানের পরমেশ্বরত্ব অস্বীকার করে বিদ্রোহের ভাব পোষণ করে, তা হলেও তাদের জড় জগতের আরও কঠোর আইনের সাহায্যে নানা প্রকার দুঃখ-দুর্দশা ভোগ করতে হয়। তাই মূর্খ লোকেই কেবল বলে ভগবান নেই।

মহারাজ যুধিষ্ঠির এই নগ্ন সত্য সার্থকভাবে হৃদয়ঙ্গম করেছিলেন, কারণ তাঁর দুই বয়োবৃদ্ধ পিতৃব্য এবং গান্ধারীর আকস্মিক অন্তর্ধানে তিনি দারুণ মুহ্যমান হয়ে পড়েছিলেন। মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র তাঁর পূর্বকৃত কর্মাদি অনুসারেই সেই অবস্থায় অধিষ্ঠিত হয়েছিলেন; ইতিপূর্বেই তাঁর প্রারব্ধ কর্মফলের পরিণাম স্বরূপ সুখভোগ

বা দুর্ভোগ অর্জন করেছেন, কিন্তু তাঁর সুকৃতির ফলে তিনি বিদুরের মতো সজ্জন এক কনিষ্ঠ ভ্রাতা পেয়েছিলেন, এবং তাঁর উপদেশেই তিনি জড় জগতের সমস্ত হিসাব-নিকাশের সমাধা করে মুক্তি লাভের উদ্দেশ্যে গৃহত্যাগ করেছিলেন।

সাধারণত কেউই পরিকল্পনার মাধ্যমে নিজের সুখ-দুঃখের গতি পরিমাণ বদলাতে পারে না। মহাকালের সুনিপুণ ব্যবস্থাক্রমে সেগুলি যেভাবে আসে, সেইভাবেই তা প্রত্যেককেই মেনে নিতে হয়। সেগুলিকে প্রতিহত করার চেষ্টা নিরর্থক। তাই জড় জগতের বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়ার চেষ্টা করাই সর্বশ্রেষ্ঠ পন্থা, এবং সেই সুযোগ কেবল উন্নত বুদ্ধিমত্তা এবং চেতনা সমন্বিত মানুষকেই দেওয়া হয়েছে। কেবলমাত্র মানুষের জন্যই মুক্তির উপায় স্বরূপ বিভিন্ন বৈদিক নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, যাতে তারা মানব জীবনের যথার্থ উদ্দেশ্য সাধন করে এই জড় জগতের বন্ধন থেকে মুক্ত হতে পারে। যারা উন্নত বুদ্ধিমত্তার এই সুযোগের অপব্যবহার করে, তারা এই জন্মে অথবা ভবিষ্যতে নানা রকম দুঃখ-দুর্দশা ভোগ করার মাধ্যমে দণ্ডভোগ করে। এইভাবে ভগবান সকলকেই নিয়ন্ত্রণ করেন।

শ্লোক ৪২

যথা গাবো নসি প্রোতাস্তন্ত্যাং বদ্ধাশ্চ দামভিঃ ।
বাক্তন্ত্যাং নামভির্বদ্ধা বহন্তি বলিমীশিতুঃ ॥ ৪২ ॥

যথা—যেমন; **গাবঃ**—গাভী; **নসি**—নাসিকার দ্বারা; **প্রোতাঃ**—আবদ্ধ; **তন্ত্যাম্**—রজ্জুর দ্বারা; **বদ্ধাঃ**—আবদ্ধ; **চ**—ও; **দামভিঃ**—রজ্জুর দ্বারা; **বাক্-তন্ত্যাম্**—বৈদিক মন্ত্রজালে; **নামভিঃ**—নাম মালায়; **বদ্ধাঃ**—আবদ্ধ হয়ে; **বহন্তি**—বহন করে; **বলিম্**—আদেশাবলী; **ঈশিতুঃ**—পরমেশ্বর ভগবানের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়ে।

অনুবাদ

গাভী যেমন নাসিকায় রজ্জুর দ্বারা আবদ্ধ হয়ে থাকে, তেমনি মানুষেরাও বিভিন্ন অনুশাসনাদির দ্বারা আবদ্ধ হয়ে পরমেশ্বর ভগবানের আদেশ পালন করতে বাধ্য হয়।

তাৎপর্য

প্রতিটি জীব, তা সে মানুষই হোক অথবা পশু বা পক্ষী হোক, মনে করে সে স্বাধীন, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ভগবানের কঠোর আইন থেকে কেউই মুক্ত নয়।

ভগবানের আইন কঠোর, কারণ কোন অবস্থাতেই কেউ তা অমান্য করতে পারে না। ধূর্ত প্রবঞ্চকেরা কখনও কখনও মনুষ্যকৃত আইন ফাঁকি দিতে পারে, কিন্তু পরমেশ্বর ভগবানের আইন অমান্য করা কারও পক্ষেই বিন্দুমাত্রও সম্ভব নয়। ভগবানের আইনের সামান্য পরিবর্তন করা হলেও আইন অমান্যকারীর চরম বিপদ হতে পারে।

ভগবানের এই আইনকেই বলে ধর্ম, তবে বিভিন্ন অবস্থায় এই ধর্মীয় অনুশাসনের কিছু তারতম্য হতে পারে, কিন্তু সর্বত্রই ধর্মের মূলনীতি এক এবং অভিন্ন, এবং তা হচ্ছে পরমেশ্বর ভগবানের আদেশ মেনে চলা। সেইটিই জড় অস্তিত্বের শর্ত। জড় জগতে প্রতিটি জীবই স্বেচ্ছায় মায়ার বন্ধন স্বীকার করেছে বলে জড়া প্রকৃতির নিয়মের বন্ধনে আবদ্ধ। সেই বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়ার একমাত্র উপায় হচ্ছে পরমেশ্বর ভগবানের বশ্যতা স্বীকার করা।

তবে মায়ার কবল থেকে মুক্ত হওয়ার পরিবর্তে, মূর্খ মানুষেরা ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র, হিন্দু, মুসলমান, ভারতীয়, ইউরোপীয়ান, আমেরিকান, চীনা ইত্যাদি উপাধিতে ভূষিত হয়ে, বিভিন্ন শাস্ত্রনীতি অথবা ধর্মীয় অনুশাসনের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে পরমেশ্বর ভগবানের আদেশ পালন করে।

রাষ্ট্রের বিধিবদ্ধ আইন হচ্ছে ভগবানের দেওয়া ধর্মীয় অনুশাসনের অপূর্ণ অনুকরণ। ধর্মীয় শাসনমুক্ত, ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র বা ভগবৎ-চেতনা বিহীন রাষ্ট্র নাগরিকদের ভগবানের আইন ভঙ্গ করার অধিকার দেয়, কিন্তু রাষ্ট্রের আইন-অমান্য করতে দেয় না; তার ফলে জনসাধারণ মনুষ্যকৃত আইন অনুসরণ করলেও ভগবানের আইন অমান্য করার ফলে দণ্ডভোগ করে।

এই জড় জগতে প্রতিটি মানুষই অপূর্ণ, এবং জড়জাগতিক বিচারে সব চেয়ে উন্নত মানুষও অভ্রান্ত আইন প্রণয়ন করতে পারে না। অন্য দিকে, ভগবানের আইনে ঐ ধরনের যে কোন রকম ভ্রান্তি বা অপূর্ণতা নেই। সমাজের নেতারা যদি ভগবানের আইন অবলম্বন করেন, তা হলে আর নতুন করে কোন রকম আইন তৈরি করার প্রয়োজন থাকে না। মনুষ্যকৃত আইনের পরিবর্তন করার প্রয়োজন হয়, কিন্তু ভগবানের আইনের কোনরকম পরিবর্তন করার প্রয়োজন কখনও হয় না। কারণ সেগুলি অভ্রান্ত, অচ্যুত, পরমেশ্বর ভগবান কর্তৃক প্রণীত।

ভগবানের প্রতিনিধি মুক্ত পুরুষেরা ধর্মীয় অনুশাসনাদি এবং শাস্ত্রীয় নির্দেশগুলি বদ্ধ জীবদের জন্য তৈরি করে গেছেন, যাতে তারা সেগুলির অনুশীলন করার মাধ্যমে ধীরে ধীরে জড় জগতের বন্ধন থেকে মুক্ত হতে পারে।

জীব তার প্রকৃত স্বরূপে ভগবানের নিত্য দাস। মুক্ত অবস্থায় সে অপ্রাকৃত প্রেমে ভগবানের সেবা করে এবং তার ফলে দিব্য আনন্দ আস্বাদন করে, এমন কি পরমেশ্বর ভগবানের সম পর্যায়ে অধিষ্ঠিত হতে পারেন, আবার কখনও ভগবানের থেকে বেশি স্বাতন্ত্র্যও উপভোগ করতে পারেন। কিন্তু এই জড় জগতে প্রতিটি জীবই ভগবানের দাসত্ব করার পরিবর্তে অন্য সমস্ত জীবদের উপর প্রভুত্ব করতে চায়, এবং তার ফলে মায়ার বন্ধনে আরও বেশি করে আবদ্ধ হয়ে পড়ে।

যতক্ষণ পর্যন্ত জীব ভগবানের শরণাগত হয়ে তাঁর নিত্য দাসত্ব বরণ না করে, ততক্ষণ তাকে জড় জগতের বন্ধনে আরও সুদৃঢ়ভাবে আবদ্ধ হয়ে যেতে হয়। ভগবানের শরণাগতিই জড় জগতের বন্ধন মুক্তির একমাত্র উপায়। *ভগবদ্গীতা* এবং অন্যান্য সমস্ত প্রামাণিক শাস্ত্রে সেই চরম নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

শ্লোক ৪৩

যথা ক্রীড়োপস্করাণাং সংযোগবিগমাবিহ ।
ইচ্ছয়া ক্রীড়িতুঃ স্যাতাং তথৈবেশেচ্ছয়া নৃণাম্ ॥ ৪৩ ॥

যথা—যেমন; **ক্রীড়-উপস্করাণাম্**—খেলার জিনিসপত্র; **সংযোগ**—মিলন; **বিগমৌ**—বিচ্ছেদ; **ইহ**—এই জগতে; **ইচ্ছয়া**—ইচ্ছাক্রমে; **ক্রীড়িতুঃ**—ক্রীড়াশীল; **স্যাতাম্**—হয়; **তথা**—তেমনি; **এব**—অবশ্যই; **ঈশ**—পরমেশ্বর ভগবানের; **ইচ্ছয়া**—ইচ্ছায়; **নৃণাম্**—মানুষদের।

অনুবাদ

কোনও খেলোয়াড় যেমন তার নিজের ইচ্ছামতো তার খেলার জিনিসপত্র সাজায় আর ছত্রাকার করে ফেলে, তেমনই ভগবানের পরম ইচ্ছায় মানুষের মিলন ও বিচ্ছেদ ঘটে থাকে।

তাৎপর্য

আমাদের সুনিশ্চিতভাবে জানা কর্তব্য যে, বর্তমান যে বিশেষ অবস্থায় আমরা রয়েছি, তা আমাদের পূর্বকৃত কর্ম অনুসারে ভগবানের ইচ্ছাক্রমে আয়োজিত হয়েছে। পরমেশ্বর ভগবান পরমাত্মারূপে প্রতিটি জীবের হৃদয়ে বিরাজমান। সে কথা *ভগবদ্গীতায়* (১৩/২৩) বর্ণিত হয়েছে, এবং তাই তিনি আমাদের জীবনের প্রতি

মুহূর্তের প্রতিটি কার্যকলাপ সম্বন্ধে অবগত। কোন বিশেষ অবস্থায় আমাদের অধিষ্ঠিত করে তিনি আমাদের কার্যকলাপের প্রতিক্রিয়া অনুসারে ফলপ্রদান করেন।

ধনী ব্যক্তির পুত্র জন্মসূত্রে ঐশ্বর্যের অধিকারী হয়, তবে ধনীপুত্র হয়ে যে শিশু এসেছে, তারে সেখানে থাকবার মতো যোগ্যতা রয়েছে, এবং তাই পরমেশ্বরের ইচ্ছায় তাকে সেখানে আনা হয়েছে। আর, কোনও এক বিশেষ মুহূর্তে যখন শিশুটিকে সেখান থেকে সরিয়ে দেওয়ার প্রয়োজন হয়, তখন পিতা এবং পুত্রের সুখের সম্পর্ক থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার ইচ্ছা না থাকলেও পরমেশ্বর ভগবানের ইচ্ছার প্রভাবে তাদের বিচ্ছেদ ঘটে।

দরিদ্র ব্যক্তির ক্ষেত্রেও একই ভাবে সব কিছু ঘটে। ধনী অথবা দরিদ্র কারোরই এই ধরনের মিলন এবং বিচ্ছেদের ব্যাপারে কোন কিছু করার ক্ষমতা নেই।

এখানে উল্লিখিত খেলোয়াড় আর তার খেলার সামগ্রীর দৃষ্টান্তটি ভুল বোঝা উচিত নয়। কেউ যুক্তি দিয়ে দেখাতে পারে যে, আমাদের নিজেদের কর্মের প্রতিক্রিয়া স্বরূপ তার কর্মফল অর্পণ করতে যখন পরমেশ্বর বদ্ধপরিকর, তখন খেলোয়াড়ের উপমা প্রযোজ্য হতে পারে না। কিন্তু সেই যুক্তি ঠিক নয়। আমাদের সর্বদা মনে রাখতে হবে যে, পরমেশ্বর ভগবানের ইচ্ছাই চরম, এবং তিনি কোনও আইনের দ্বারা আবদ্ধ নন।

সাধারণত সকলকেই তাঁর কর্মের ফল ভোগ করতে হয়, কিন্তু বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে, ভগবানের ইচ্ছায়, কর্মফলের পরিবর্তনও সাধিত হয়। তবে তা কেবল পরমেশ্বর ভগবানের ইচ্ছার প্রভাবেই সাধিত হতে পারে, অন্য আর কোন উপায়ে নয়।

তাই, এই শ্লোকে খেলোয়াড়ের দৃষ্টান্তটি যথাযথ, কারণ পরমেশ্বর ভগবান তাঁর ইচ্ছা অনুসারে যা কিছু করতে পারেন, এবং যেহেতু তিনি হচ্ছেন পরম পূর্ণ, তাই তাঁর কার্যকলাপে কখনোই কোন রকম ভুল ত্রুটি থাকে না।

শুদ্ধ ভক্তের ক্ষেত্রেই ভগবান কর্মের প্রতিক্রিয়ার পরিবর্তন করেন। ভগবদ্গীতায় (৯/৩০-৩১) প্রতিপন্ন হয়েছে যে, ভগবান তাঁর শরণাগত ভক্তকে সমস্ত পাপ থেকে মুক্ত করেন, এবং সেই সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নেই। পৃথিবীর ইতিহাসে পরমেশ্বর ভগবানের দ্বারা প্রতিক্রিয়ার পরিবর্তন সাধন করার শত শত দৃষ্টান্ত রয়েছে। ভগবান যদি কারোর পূর্বকৃত কর্মফলের পরিবর্তন সাধন করতে সক্ষম হন, তা হলে তিনি স্বয়ং অবশ্যই তাঁর নিজের কর্মের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার দ্বারা আবদ্ধ নন। তিনি পরম পূর্ণ, এবং সমস্ত নিয়মের ঊর্ধ্বে।

শ্লোক ৪৪

যন্মন্যসে ধ্রুবং লোকমধ্রুবং বা ন চোভয়ম্ ।
সর্বথা ন হি শোচ্যাস্তে স্নেহাদন্যত্র মোহজাৎ ॥ ৪৪ ॥

যৎ—যদিও; মন্যসে—তুমি মনে কর; ধ্রুবম্—পরম সত্য; লোকম্—মানুষ; অধ্রুবম্—অনিত্য; বা—অথবা; ন—না; চ—ও; উভয়ম্—অথবা তারা উভয়ে; সর্বথা—সর্ব অবস্থায়; ন—না; হি—অবশ্যই; শোচ্যাঃ—অনুশোচনার বিষয়; তে—তারা; স্নেহাৎ—স্নেহের বশে; অন্যত্র—অন্যথায়; মোহজাৎ—মোহজাত।

অনুবাদ

হে রাজন্, যদিও মানুষকে জীব রূপে নিত্য ও দেহরূপে অনিত্য, অথবা অনির্বচনীয় হেতু নিত্য ও অনিত্য উভয় রূপেই আপনি মনে করেন, তবে যে কোন অবস্থা থেকে বিচার করলে তারা আপনার শোকের পাত্র নয়। মোহজনিত স্নেহ ব্যতীত শোকের আর অন্য কোন কারণ নেই।

তাৎপর্য

প্রকৃতপক্ষে প্রতিটি জীবই পরমেশ্বর ভগবানের বিভিন্ন অবিচ্ছেদ্য অংশ, এবং তাই তার কর্তব্য হচ্ছে ভগবানের সেবা করা। জড় জগতের বদ্ধ অবস্থায় অথবা নিত্য জ্ঞানময় মুক্ত অবস্থায়, জীব নিরতই পরমেশ্বর ভগবানের নিয়ন্ত্রণাধীন। কিন্তু যাদের প্রকৃত জ্ঞান নেই, তারা জীবের প্রকৃত অবস্থা সম্বন্ধে নানা রকম মনগড়া সিদ্ধান্ত উপস্থাপন করে। তবে প্রতিটি দার্শনিক মতবাদই স্বীকার করে যে, জীব নিত্য এবং পঞ্চভূতাত্মক তার জড় দেহটি অনিত্য। নিত্য জীব তার কর্মের ফল অনুসারে এক জড় দেহ থেকে আর এক জড় দেহে দেহান্তরিত হয়, এবং প্রতিটি জড় দেহই তার মূল আকৃতির দ্বারাই নশ্বরতা প্রাপ্ত হয়। তাই আত্মার এক দেহ থেকে আর এক দেহে দেহান্তরিত হওয়ার ব্যাপারে কিংবা কোন বিশেষ অবস্থায় জড় দেহের বিনাশের ব্যাপারে কোন অনুশোচনা করার কারণ নেই।

অন্য আর এক শ্রেণীর মানুষ রয়েছে, যারা বিশ্বাস করে যে, আত্মা যখন জড়জাগতিক কারাবন্ধন থেকে মুক্ত হয়, তখন সেই আত্মা ব্রহ্মে লীন হয়ে যায়; এবং আর এক শ্রেণীর মানুষ রয়েছে, যারা আত্মার অস্তিত্বে বিশ্বাস করে না, কিন্তু ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জড় পদার্থে বিশ্বাস করে। আমাদের দৈনন্দিন জীবনের অভিজ্ঞতায় আমরা দেখতে পাই যে, প্রতিনিয়ত জড়ের পরিবর্তন হচ্ছে, কিন্তু সেই পরিবর্তনের

জন্য আমরা শোক করি না। পূর্বোল্লিখিত উভয় ক্ষেত্রেই ভগবানের দিব্য শক্তি অপ্রতিহত থাকে; তার উপর হস্তক্ষেপ করার কোন রকম ক্ষমতা কারোরই নেই, এবং তাই শোক করার কোন কারণ নেই।

শ্লোক ৪৫

তস্মাজ্জহ্যঙ্গ বৈক্লব্যমজ্ঞানকৃতমাত্মনঃ ।
কথং ত্বনাথাঃ কৃপণা বর্তেরংস্তে চ মাং বিনা ॥ ৪৫ ॥

তস্মাৎ—অতএব; **জহি**—ত্যাগ করে; **অঙ্গ**—হে রাজন্; **বৈক্লব্যম্**—মানসিক ব্যাকুলতা; **অজ্ঞান**—অজ্ঞানতা; **কৃতম্**—জনিত; **আত্মনঃ**—আপনার নিজের; **কথম্**—কিভাবে; **তু**—কিন্তু; **অনাথাঃ**—নিঃসহায়; **কৃপণাঃ**—কাতর জীবেরা; **বর্তেরন্**—বেঁচে থাকতে সক্ষম; **তে**—তারা; **চ**—ও; **মাম্**—আমাকে; **বিনা**—ব্যতীত।

অনুবাদ

অতএব আত্মস্বরূপে অজ্ঞানতাজনিত আপনার এই উৎকণ্ঠা পরিত্যাগ করুন। আপনি এখন ভাবছেন, যারা অনাথ অসহায়, সেই সব জীবেরা আপনাকে ছাড়া কিভাবে প্রাণ ধারণ করবে।

তাৎপর্য

যখন আমরা মনে করি, আমাদের আত্মীয়-স্বজনেরা অসহায় এবং আমাদের উপর নির্ভরশীল, তখন সেটা সবটাই আমাদের অজ্ঞানতার ফল। প্রতিটি জীব এই জগতে তার আয়ু অনুসারে, পরমেশ্বর ভগবান কর্তৃক সর্বতোভাবে সুরক্ষিত হয়ে থাকে। ভগবানের একটি নাম ভূতভৃৎ, অর্থাৎ যিনি সমস্ত জীবকে রক্ষা করেন। সকলেরই উচিত তার কর্তব্যকর্মই কেবল সম্পাদন করা, কারণ পরমেশ্বর ভগবান ছাড়া অন্য আর কেউই কাউকে রক্ষা করতে পারে না। পরবর্তী শ্লোকে সেই কথা স্পষ্টভাবে বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

শ্লোক ৪৬

কালকর্মগুণাধীনো দেহোঽয়ং পাঞ্চভৌতিকঃ ।
কথমন্যাংস্তু গোপায়েৎ সর্পগ্রস্তো যথা পরম্ ॥ ৪৬ ॥

কাল—অন্তহীন সময়; কর্ম—কর্ম; গুণ—প্রকৃতির গুণ; অধীনঃ—নিয়ন্ত্রণাধীন; দেহঃ—জড় দেহ এবং মন; অয়ম্—এই; পাঞ্চ-ভৌতিকঃ—পঞ্চমহাভূত দ্বারা রচিত; কথম্—কিভাবে; অন্যান্—অন্যেরা; তু—কিন্তু; গোপায়েৎ—রক্ষা করতে পারেন; সর্প-গ্রস্তঃ—সর্পের দ্বারা আক্রান্ত; যথা—যেমন; পরম্—অন্যেরা।

অনুবাদ

এই পাঞ্চভৌতিক শরীরটি কাল, কর্ম, ও গুণের বশবর্তী। তার ফলে সর্পগ্রস্ত হয়ে থাকার মতো সেই শরীর কিভাবে অন্যদের রক্ষা করবে?

তাৎপর্য

রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক প্রচারাদির মাধ্যমে স্বাধীনতা লাভের জন্য জগতের কোনও আন্দোলনই কারও কোন রকম মঙ্গল সাধন করতে পারে না, কারণ ঐগুলি সমস্তই পরা শক্তির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। প্রকৃতির বিভিন্ন গুণবৈশিষ্ট্যের নির্দেশানুযায়ী মহাকাল এবং কর্মের অভিব্যক্তির দ্বারা বদ্ধ জীব সর্বতোভাবে জড়া প্রকৃতির নিয়ন্ত্রণাধীন।

প্রকৃতির তিনটি গুণবৈশিষ্ট্য রয়েছে—সত্ত্ব, রজঃ এবং তমঃ। সত্ত্বগুণে অধিষ্ঠিত না হলে কেউ যথাযথভাবে সব কিছু দর্শন করতে পারে না। তাই রজো এবং তমোগুণের দ্বারা যে মানুষ প্রভাবিত, সে তার কার্যকলাপ সঠিক পথে পরিচালিত করতে পারে না। কেবল সত্ত্ব গুণে অধিষ্ঠিত মানুষই এই বিষয়ে কিছুটা সহায়ক হতে পারে।

অধিকাংশ মানুষই রজো এবং তমোগুণাশ্রিত, এবং তাই তাদের পরিকল্পনা এবং প্রকল্পগুলি বলতে গেলে কারোরই কোন মঙ্গল সাধন করতে পারে না। প্রকৃতির গুণের ঊর্ধ্বে অন্তহীন মহাকাল রয়েছে, যার প্রভাবে জড় জগতের প্রতিটি বস্তুরই পরিবর্তন সাধিত হয়। আমরা যদিও বা সাময়িকভাবে কারও কোন রকম মঙ্গ ল সাধন করতে পারি, কিন্তু কালক্রমে মহাকালের প্রভাবে সব কিছুই ব্যর্থ হয়ে যায়।

একটিমাত্র কাজই কেবল এক্ষেত্রে করা সম্ভব, তা হল, যে-মহাকালকে কালসর্প অর্থাৎ গোখরো সাপের সাথে তুলনা করা হয়, যার দংশনে সর্বদাই নিশ্চিত মৃত্যু হয়, তার কবল থেকে মুক্ত থাকা। গোখরো সাপের দংশন থেকে কাউকেই বাঁচানো যায় না। গোখরো সাপের মতো সেই মহাকালের কবল থেকে, অর্থাৎ

তার সম্যক্ অভিব্যক্তি যে প্রকৃতির গুণবৈশিষ্ট্যাদি, তার কবল থেকে মুক্ত হওয়ার সর্বোত্তম উপায় হল *ভগবদ্গীতার* (১৪/২৬) অনুমোদন অনুসারে ভক্তিযোগের চর্চা করা।

লোকহিতকর কার্যকলাপের সর্বোত্তম প্রকল্প হচ্ছে সারা পৃথিবী জুড়ে ভগবদ্ভক্তির প্রচারে সকলকে নিয়োজিত করা, কারণ ভগবদ্ভক্তিই কেবল কাল, কর্ম এবং গুণ সমন্বিত জড়া প্রকৃতি অর্থাৎ মায়ার নিয়ন্ত্রণ থেকে মানুষকে রক্ষা করতে পারে। *ভগবদ্গীতা* (১৪/২৬) সুনিশ্চিতভাবে এই কথা সমর্থন করেছে।

শ্লোক ৪৭

অহস্তানি সহস্তানামপদানি চতুষ্পদাম্ ।
ফল্গূনি তত্র মহতাং জীবো জীবস্য জীবনম্ ॥ ৪৭ ॥

অহস্তানি—হস্তহীন; **সহস্তানাম্**—যাদের হাত রয়েছে; **অপদানি**—যাদের পা নেই; **চতুঃ-পদাম্**—চতুষ্পদ প্রাণী; **ফল্গূনি**—যারা দুর্বল; **তত্র**—সেখানে; **মহতাম্**—শক্তিশালী; **জীবঃ**—জীব; **জীবস্য**—জীবেদের; **জীবনম্**—জীবন ধারণের উপায়।

অনুবাদ

হস্তরহিত প্রাণীরা হস্তযুক্ত প্রাণীদের শিকার, পদরহিত যারা, তারা চতুষ্পদ প্রাণীদের শিকার। দুর্বল জীবেরা বলবান জীবেদের জীবন ধারণের ভরসা, এবং এক জীব অন্য জীবের খাদ্য—এটাই সাধারণ রীতি হয়ে দাঁড়িয়েছে।

তাৎপর্য

পরমেশ্বর ভগবানের ইচ্ছায় জীবন সংগ্রামের এক সুসংবদ্ধ আইন রয়েছে, এবং শত পরিকল্পনা করেও তার থেকে উদ্ধার পাওয়া যায় না। যে সমস্ত জীব পরম সত্তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে এই জড় জগতে এসেছে, তারা পরমেশ্বর ভগবানের প্রতিভূ মায়াশক্তি নামে এক পরম শক্তির অধীন হয়ে থাকে, এবং এই দৈবী মায়ার কাজ হচ্ছে ত্রিতাপ দুঃখ দান করে জীবেদের নির্যাতন করা, যার একটি ক্রিয়া এই শ্লোকে বর্ণনা করা হয়েছে—*দুর্বল জীবেরা বলবান জীবেদের জীবন ধারণের ভরসা।* বলবানের আক্রমণ থেকে নিজেকে রক্ষা করার শক্তি কারোরই নেই, এবং পরমেশ্বর ভগবানের ইচ্ছায় দুর্বল, অধিকতর বলবান এবং সব চেয়ে বলবানের সুসংবদ্ধ ক্রমবিভাগ রয়েছে। বাঘ যদি কোন দুর্বল প্রাণীকে, কোন মানুষকেও খায়, তা হলে দুঃখ করার কিছু নেই, কারণ সেটাই পরমেশ্বর ভগবানের আইন।

যদিও এই আইনবিধি অনুসারে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে, অন্য প্রাণীদের ভরসাতেই মানুষ জীবন ধারণ করবে, তবু নীতিবোধের বিধিও একটা আছে, কারণ মানুষকে শাস্ত্রের অনুশাসন মেনে চলতে হয়। অন্য কোন পশুর পক্ষে এটা অসম্ভব।

মানব সত্তার উদ্দেশ্য হচ্ছে আত্মজ্ঞান উপলব্ধি, এবং সেই উদ্দেশ্যে ভগবানকে যা প্রথমে নিবেদন করা হয়নি, সেটা সে আহার করতে পারে না। ভক্তের নিবেদিত শাক-সব্‌জি, ফল-মূল, এবং শস্য থেকে প্রস্তুত সব রকমের খাদ্যদ্রব্য ভগবান গ্রহণ করেন। ফল, পাতা, এবং দুধ থেকে তৈরি বিভিন্ন প্রকার খাদ্য ভগবানকে নিবেদন করা যায়, এবং ভগবান সেই আহার্য গ্রহণ করার পর, ভক্ত সেই প্রসাদ গ্রহণ করতে পারে, যার ফলে জীবন সংগ্রামের সমস্ত দুঃখ-দুর্দশা ধীরে ধীরে লাঘব হয়ে যায়। এই কথা *ভগবদ্গীতায় (৯/২৬)* সমর্থিত হয়েছে।

যারা পশু-মাংস আহার করে, তারাও তাদের খাদ্য নিবেদন করতে পারে, তবে সরাসরিভাবে পরমেশ্বর ভগবানকে নয়; ধর্মীয় পূজা-অর্চনার বিশেষ কতকগুলি শর্তাধীনে তা পরমেশ্বর ভগবানের কোনও প্রতিনিধিকে নিবেদন করা চলে। শাস্ত্রাদির অনুশাসনগুলি মাংসাহারীদের পশু-মাংস আহারে অনুপ্রাণিত করার জন্য নয়, পক্ষান্তরে সুসংবদ্ধ নিয়মের মাধ্যমে তাদের এই প্রবৃত্তি দমন করার জন্যই সেগুলি নির্দেশিত হয়েছে। কোন জীব তার থেকে বলবান জীবেদের জীবন ধারণের ভরসা জুগিয়ে থাকে। কোনও অবস্থাতেই জীবন ধারণের জন্য বেশি উদ্বিগ্ন হওয়া কারও উচিত নয়, কারণ সর্বত্রই জীব রয়েছে এবং কোথাও কোন প্রাণী খাদ্যাভাবে অনাহারে থাকে না। নারদ মুনি যুধিষ্ঠির মহারাজকে তাঁর পিতৃব্যদের খাদ্যাভাবে কষ্ট পেতে হবে সেই চিন্তায় উদ্বিগ্ন না হতে উপদেশ দিয়েছেন, কারণ জঙ্গলে যা শাক-সব্‌জি পাওয়া যায়, তা ভগবানকে নিবেদন করে সেই প্রসাদ গ্রহণ করে তাঁরা জীবন ধারণ করতে পারেন এবং সেইভাবেই মুক্তিলাভের পন্থা উপলব্ধি করতে পারেন।

সবলের দ্বারা দুর্বলের আত্মসাৎ হল অস্তিত্ব রক্ষার প্রাকৃতিক আইনবিধি। বিভিন্ন জীবজগতে দুর্বলদের গ্রাস করার একটা প্রচেষ্টা সর্বদাই রয়েছে। জড়জাগতিক পরিস্থিতিতে কোনও রকম কৃত্রিম উপায়ে এই প্রবণতা প্রতিহত করা সম্ভব নয়, কেবল পারমার্থিক বিধিনিয়মাদি চর্চার মাধ্যমে মানবসত্তার পারমার্থিক চেতনা জাগিয়ে তুলেই এই প্রবণতা প্রতিহত করা যেতে পারে।

মানুষ দুর্বল পশুকে হত্যা করবে আর সেই সঙ্গে অন্যদের শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের পরামর্শ দেবে, তা অবশ্যই পারমার্থিক বিধিনিয়মের নীতিসূত্রাবলী অনুসারে

অনুমোদন করা চলে না। মানুষ যদি পশুদের শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানে বেঁচে থাকতে না দেয়, তা হলে মানব সমাজে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের প্রত্যাশা সে করে কি করে? তাই সমস্ত অন্ধ নেতাদের অবশ্য কর্তব্য হচ্ছে, পরমেশ্বর ভগবান সম্বন্ধে অবগত হয়ে, তারপর ভগবানের রাজ্য প্রতিষ্ঠা করা। পৃথিবীর জনগণের অন্তরে ভগবৎ-চেতনার বিকাশ না করে ভগবানের রাজ্য বা রামরাজ্য প্রতিষ্ঠা করা অসম্ভব।

শ্লোক ৪৮

তদিদং ভগবান্ রাজন্নেক আত্মাত্মনাং স্বদৃক্ ।
অন্তরোহনন্তরো ভাতি পশ্য তং মায়য়োরুধা ॥ ৪৮ ॥

তৎ—অতএব; **ইদম্**—এই জগৎ-প্রকাশ; **ভগবান্**—পরমেশ্বর ভগবান; **রাজন্**—হে মহারাজ; **একঃ**—এক এবং অদ্বিতীয়; **আত্মা**—পরমাত্মা; **আত্মনাম্**—তাঁর শক্তির দ্বারা; **স্বদৃক্**—গুণগতভাবে তাঁর থেকে অভিন্ন; **অন্তরঃ**—অন্তরে; **অনন্তরঃ**—বাইরে; **ভাতি**—প্রকাশিত; **পশ্য**—দেখ; **তম্**—তাঁকেই কেবল; **মায়য়া**—তাঁর বিভিন্ন শক্তির দ্বারা; **উরুধা**—বহু বলে মনে হয়।

অনুবাদ

অতএব হে রাজন্, আপনি কেবলমাত্র সেই পরমেশ্বর ভগবানকেই অবলোকন করুন—যিনি এক এবং অদ্বিতীয়, যিনি বিভিন্ন শক্তির মাধ্যমে নিজেকে প্রকটিত করেন, এবং যিনি অন্তরে ও বাইরে দু'ভাবেই প্রকাশিত হন।

তাৎপর্য

পরমেশ্বর ভগবান এক এবং অদ্বিতীয়, কিন্তু তিনি তাঁর বিভিন্ন শক্তির প্রভাবে নিজেকে প্রকাশিত করেন, কারণ তিনি আনন্দময়। তাঁর তটস্থা শক্তি-সম্ভূত জীব গুণগতভাবে তাঁর থেকে অভিন্ন। তাঁর অন্তরঙ্গা এবং বহিরঙ্গা উভয় শক্তিতে অসংখ্য জীব রয়েছে। চিদ্জগৎ যেহেতু ভগবানের অন্তরঙ্গা শক্তি, সেই শক্তির অন্তর্গত জীবেরা বহিরঙ্গা শক্তির কলুষ থেকে মুক্ত এবং গুণগতভাবে ভগবান থেকে অভিন্ন।

গুণগতভাবে ভগবান থেকে অভিন্ন হলেও, জড় জগতের প্রভাবে কলুষিত জীবেরা তাদের স্বরূপ বিস্মৃত হয়ে বিকৃতভাবে প্রকাশিত, এবং তাই তারা এই জড় জগতে তথাকথিত সুখ এবং দুঃখ ভোগ করে।

জড় জগতে জীবের এই সুখ-দুঃখের অনুভূতি ক্ষণস্থায়ী এবং তা আত্মাকে প্রভাবিত করতে পারে না। জীব যে গুণগতভাবে ভগবানের থেকে অভিন্ন, সে কথা ভুলে যাওয়ার ফলেই সে এই ক্ষণস্থায়ী সুখ এবং দুঃখ অনুভব করে।

অবশ্য অন্তরে ও বাইরে ভগবানের করুণা নিরন্তর প্রবাহিত হচ্ছে, যার প্রভাবে বদ্ধ জীবেরা তাদের অধঃপতিত অবস্থার সংশোধন করতে পারে। অন্তরে পরমাত্মা রূপে অধিষ্ঠিত থেকে তিনি ঐকান্তিকভাবে যারা নিজেদের সংশোধন করতে আগ্রহী, সেই সকল জীবেদের সংশোধন করেন, এবং বাইরে সদ্‌গুরু এবং দিব্য শাস্ত্রাদিরূপে প্রকাশিত হয়ে তিনি তাদের সংশোধন করেন।

তথাকথিত সুখ এবং দুঃখের দ্বারা বিচলিত না হয়ে ভগবদ্-মুখী হওয়া উচিত, এবং পরমেশ্বরের বহিরঙ্গা ক্রিয়ায় পতিত জীবদের সংশোধন করার কাজে তাঁকে সাহায্য করা উচিত। তাঁর আদেশেই কেবল গুরু হয়ে তাঁর সাথে সহযোগিতা করা উচিত।

কখনই কোন ব্যক্তিগত লাভের উদ্দেশ্যে, জাগতিক লাভের উদ্দেশ্যে অথবা জীবিকা নির্বাহের জন্য অর্থ উপার্জনের উদ্দেশ্যে গুরুগিরি করা উচিত নয়। পরমেশ্বর ভগবানের কাজে সাহায্যকারী ভগবদ্-ভাবনাময় সদ্-গুরু গুণগতভাবে ভগবানের থেকে অভিন্ন, আর যারা আত্ম-বিস্মৃত, তারা কেবল বিকৃত প্রতিফলন মাত্র।

তাই, তথাকথিত সুখ এবং দুঃখের দ্বারা বিচলিত না হয়ে, যে উদ্দেশ্যে ভগবান অবতরণ করেছেন, সেই উদ্দেশ্য সাধনে উন্মুখ হতে যুধিষ্ঠির মহারাজকে নারদ মুনি উপদেশ দেন। সেটাই ছিল তাঁর প্রাথমিক কর্তব্য।

শ্লোক ৪৯

সোঽয়মদ্য মহারাজ ভগবান্ ভূতভাবনঃ ।
কালরূপোঽবতীর্ণোঽস্যামভাবায় সুরদ্বিষাম্ ॥ ৪৯ ॥

সঃ—সেই পরমেশ্বর ভগবান; **অয়ম্**—পরমেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ; **অদ্য**—ইদানীং; **মহারাজ**—হে রাজন্; **ভগবান্**—পরমেশ্বর ভগবান; **ভূত-ভাবনঃ**—সব কিছুর সৃষ্টিকর্তা বা পিতা; **কাল-রূপঃ**—সর্বগ্রাসী কালরূপে; **অবতীর্ণঃ**—অবতীর্ণ হয়েছেন; **অস্যাম্**—এই পৃথিবীতে; **অভাবায়**—বিনাশ করার জন্য; **সুর-দ্বিষাম্**—ভগবদ্-বিদ্বেষীদের।

অনুবাদ

হে মহারাজ, সেই ভূতভাবন পরম পুরুষোত্তম ভগবান শ্রীকৃষ্ণ, ভগবদ্‌-বিদ্বেষীদের বিনাশ করার জন্য সর্বগ্রাসী কালরূপে পৃথিবীতে অবতীর্ণ হয়েছেন।

তাৎপর্য

মানুষ দুই প্রকার, ঈর্ষাপরায়ণ এবং অনুগত। ভগবান যেহেতু সমস্ত জীবের পিতা, তাই ঈর্ষাপরায়ণ জীবেরাও তাঁর সন্তান, কিন্তু তারা অসুর নামে পরিচিত। কিন্তু যারা পরম পিতার অনুগত, তাদের বলা হয় সুর বা দেবতা, কারণ তারা জড় জগতের কলুষের দ্বারা প্রভাবিত নয়।

অসুরেরা যে কেবল ঈর্ষার বশবর্তী হয়ে ভগবানের অস্তিত্বই অস্বীকার করে, তাই নয়, তারা অন্য সমস্ত জীবেদের প্রতিও ঈর্ষাপরায়ণ। এই পৃথিবীতে যখন অসুরদের প্রাধান্য বৃদ্ধি পায়, তখন মাঝে মাঝে ভগবান তাদের বিনাশ করে পাণ্ডবদের মতো দেবতাদের শাসন প্রতিষ্ঠা করেন।

কালরূপে তাঁর প্রকাশ অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। তিনি মোটেই ভয়ঙ্কর নন, পক্ষান্তরে তিনি সৎ, চিৎ এবং আনন্দময়। ভক্তদের কাছে তিনি তাঁর স্বরূপ প্রকাশ করেন, কিন্তু যারা অভক্ত, তাদের কাছে তিনি কালরূপে প্রকাশিত হন। কালরূপী ভগবানের তাঁর এই করাল রূপ অসুরদের কাছে মোটেই সুখকর নয়, তাই তাঁর হস্তে বিনাশ প্রাপ্ত হওয়ার ভয় থেকে স্বস্তি অনুভব করার জন্য তারা তাঁকে নিরাকার বলে কল্পনা করে।

শ্লোক ৫০

নিষ্পাদিতং দেবকৃত্যমবশেষং প্রতীক্ষতে ।
তাবদ্ যূয়মবেক্ষধ্বং ভবেদ্ যাবদিহেশ্বরঃ ॥ ৫০ ॥

নিষ্পাদিতম্—সম্পাদিত; **দেব-কৃত্যম্**—দেবতাদের সাহায্যার্থে করণীয়; **অবশেষম্**—অবশিষ্ট; **প্রতীক্ষতে**—প্রতীক্ষা করছেন; **তাবৎ**—সেই সময় পর্যন্ত; **যূয়ম্**—তোমরা সমস্ত পাণ্ডবেরা; **অবেক্ষধ্বম্**—প্রতীক্ষা করা; **ভবেৎ**—হোক; **যাবৎ**—যতক্ষণ পর্যন্ত; **ইহ**—এই পৃথিবীতে; **ঈশ্বরঃ**—পরমেশ্বর ভগবান।

অনুবাদ

পরমেশ্বর ভগবান দেবতাদের সাহায্য করার উদ্দেশ্যে ইতিমধ্যেই তাঁর কর্তব্যকর্ম সম্পন্ন করেছেন, এবং এখন তিনি অবশিষ্ট কার্যের প্রতীক্ষা করছেন। যতক্ষণ

পর্যন্ত ভগবান এই পৃথিবীতে আছেন, সেই পর্যন্ত আপনারা পাণ্ডবেরা অপেক্ষা করে থাকতে পারেন।

তাৎপর্য

এই জড় জগতের বিভিন্ন বিভাগের অধ্যক্ষ দেবতারা যখন কেবল ভগবদ্-বিদ্বেষী নয়, ভক্তবিদ্বেষী অসুরদের দ্বারা অত্যন্ত বিপর্যস্ত হন, তখন তাঁদের সাহায্য করার জন্য পরমেশ্বর ভগবান চিৎজগতের সর্বোচ্চ গ্রহলোক, তাঁর নিজ ধাম (কৃষ্ণলোক) থেকে অবতরণ করেন।

পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে, বদ্ধ জীবেরা ভগবানের অনুকরণে এই জড় জগতের মধ্যে যা কিছু দেখছে, সব কিছুর উপরেই আধিপত্য করার প্রবল বাসনার দ্বারা প্রভাবিত হয়ে স্বেচ্ছায় জড় জগতের বন্ধনে আবদ্ধ হয়। সকলেই নকল ভগবান সাজার চেষ্টা করছে, এই ধরনের নকল ভগবানদের মধ্যে প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলেছে, এবং এই ধরনের প্রতিদ্বন্দ্বীদের সাধারণত বলা হয় অসুর।

এই পৃথিবীতেও অসুরদের সংখ্যা যখন অত্যন্ত বেড়ে যায়, তখন ভগবদ্ভক্তদের কাছে এই পৃথিবী নরক হয়ে ওঠে। অসুরদের সংখ্যা বৃদ্ধির ফলে, স্বাভাবিকভাবে ভগবদ্ভক্তিপরায়ণ মানুষেরা, উচ্চতর গ্রহলোকের দেবতারা এবং ভগবানের শুদ্ধ ভক্তরা সাধারণত পরিত্রাণের জন্য ভগবানের কাছে প্রার্থনা করেন, এবং তখন ভগবান তাঁর ধাম থেকে স্বয়ং অবতরণ করেন অথবা তাঁর ভক্তদের নিযুক্ত করেন মানব সমাজের, এমন কি পশু সমাজেরও, অধঃপতিত পরিস্থিতির সংস্কার সাধন করার জন্য।

অসুরদের প্রভাবে এই ধরনের বিপর্যয় কেবল মানব সমাজেই নয়, অসুর সমাজে, পক্ষী সমাজে, অন্যান্য প্রাণী সমাজে, এমন কি স্বর্গের দেবতাদের সমাজেও উপস্থিত হয়। কংস, জরাসন্ধ, শিশুপাল প্রমুখ অসুরদের সংহার করার জন্য পরমেশ্বর ভগবান স্বয়ং অবতরণ করেছিলেন, এবং যুধিষ্ঠির মহারাজের রাজত্বকালে প্রায় সমস্ত অসুরেরাই ভগবানের হাতে নিহত হয়েছিল।

এখন তিনি তাঁর স্বীয় বংশ, যদুবংশ, যা তাঁরই ইচ্ছায় এই পৃথিবীতে আবির্ভূত হয়েছিল, তা ধ্বংসের প্রতীক্ষা করছিলেন। তাঁর নিত্য ধামে প্রত্যাবর্তন করার পূর্বে তিনি তাদের সঙ্গে নিয়ে যেতে চেয়েছিলেন। বিদুরের মতো, নারদ মুনিও আসন্ন যদুবংশ ধ্বংসের কথা প্রকাশ করেননি, কিন্তু পরোক্ষভাবে মহারাজ যুধিষ্ঠির এবং তাঁর ভায়েদের কাছে ইঙ্গিত করেছিলেন, যাতে সেই ঘটনা সংঘটিত হওয়া পর্যন্ত এবং ভগবানের অপ্রকট লীলা-বিলাস পর্যন্ত তাঁরা যেন অপেক্ষা করেন।

শ্লোক ৫১

**ধৃতরাষ্ট্রঃ সহ ভ্রাত্রা গান্ধার্যা চ স্বভার্যয়া ।
দক্ষিণেন হিমবত ঋষিণামাশ্রমং গতঃ ॥ ৫১ ॥**

ধৃতরাষ্ট্রঃ—ধৃতরাষ্ট্র; **সহ**—সঙ্গে; **ভ্রাত্রা**—তাঁর ভ্রাতা বিদুর; **গান্ধার্যা**—গান্ধারীও; **চ**—এবং; **স্ব-ভার্যয়া**—তাঁর নিজ পত্নী; **দক্ষিণেন**—দক্ষিণ দিকে; **হিমবতঃ**—হিমালয় পর্বতের; **ঋষিণাম্**—ঋষিদের; **আশ্রমম্**—আশ্রয়ে; **গতঃ**—গিয়েছেন।

অনুবাদ

হে রাজন্, আপনার পিতৃব্য ধৃতরাষ্ট্র, তাঁর ভ্রাতা বিদুর এবং তাঁর পত্নী গান্ধারী সহ হিমালয়ের দক্ষিণ দিকে গিয়েছেন, যেখানে ঋষিদের আশ্রম আছে।

তাৎপর্য

শোকগ্রস্ত মহারাজ যুধিষ্ঠিরকে সান্ত্বনা দেওয়ার জন্য নারদ মুনি প্রথমে দার্শনিক তত্ত্ব বিশ্লেষণ করেন, এবং তারপর তিনি তাঁর পিতৃব্য ধৃতরাষ্ট্রের ভবিষ্যৎ গতিবিধি বর্ণনা করতে শুরু করেন, যা তিনি তাঁর দিব্য দৃষ্টিতে দর্শন করতে পেরেছিলেন এবং সেই অনুসারে তিনি নিম্নোক্তভাবে বর্ণনা করতে শুরু করেন।

শ্লোক ৫২

**স্রোতোভিঃ সপ্তভির্যা বৈ স্বর্ধুনী সপ্তধা ব্যধাৎ ।
সপ্তানাং প্রীতয়ে নানা সপ্তস্রোতঃ প্রচক্ষতে ॥ ৫২ ॥**

স্রোতোভিঃ—স্রোতের দ্বারা; **সপ্তভিঃ**—সপ্তভাগে; **যা**—যে নদী; **বৈ**—অবশ্যই; **স্বর্ধুনী**—পবিত্র গঙ্গা নদী; **সপ্তধা**—সপ্তধারা; **ব্যধাৎ**—সৃষ্টি হয়েছে; **সপ্তানাম্**—সপ্তর্ষিদের; **প্রীতয়ে**—সন্তুষ্টি বিধানের জন্য; **নানা**—বিবিধ প্রকার; **সপ্ত-স্রোতঃ**—সপ্তপ্রবাহ; **প্রচক্ষতে**—নামধেয় হয়েছে।

অনুবাদ

সেই স্থানে পবিত্র গঙ্গানদী সপ্তঋষির প্রীতি সম্পাদনের জন্য নিজেকে সপ্তধারায় বিভক্ত করেছেন, সেই জন্য এই স্থানকে লোকে সপ্তস্রোত তীর্থ বলে।

শ্লোক ৫৩

স্নাত্বানুসবনং তস্মিন্ হুত্বা চাগ্নিন্ যথাবিধি ।
অব্ভক্ষ উপশান্তাত্মা স আস্তে বিগতৈষণঃ ॥ ৫৩ ॥

স্নাত্বা—স্নান করে; **অনুসবনম্**—নিয়মিতভাবে তিনবার (সকালে, দুপুরে এবং সন্ধ্যায়); **তস্মিন্**—সেই সপ্তধারায় বিভক্ত গঙ্গায়; **হুত্বা**—অগ্নিহোত্র যজ্ঞ সম্পাদন করে; **চ**—ও; **অগ্নীন্**—অগ্নিতে; **যথা-বিধি**—শাস্ত্রবিধি অনুসারে; **অপ্-ভক্ষঃ**—কেবলমাত্র জলপান করে; **উপশান্ত**—সম্পূর্ণরূপে সংযত; **আত্মা**—ইন্দ্রিয় এবং মন; **সঃ**—ধৃতরাষ্ট্র; **আস্তে**—অবস্থান করবেন; **বিগত**—বিরত; **এষণঃ**—পরিবারের মঙ্গল সাধনে চিন্তা।

অনুবাদ

সেই সপ্তস্রোতা নদীর তীরে, ধৃতরাষ্ট্র প্রতিদিন সকাল, দুপুর এবং সন্ধ্যায় স্নান করে, অগ্নিহোত্র যজ্ঞ সম্পাদনপূর্বক কেবলমাত্র জলপান করে অষ্টাঙ্গ-যোগ অনুশীলন শুরু করেছেন। এই অনুশীলন মন এবং ইন্দ্রিয় সংযমে সহায়ক এবং মানুষকে পুত্র-কলত্রের আসক্তি থেকে সম্পূর্ণ রূপে মুক্ত করে।

তাৎপর্য

মন এবং ইন্দ্রিয়-সমূহকে বিষয়াসক্তি থেকে মুক্ত করে অধ্যাত্ম চেতনায় নিযুক্ত করার মাধ্যমে সংযত করার গতানুগতিক পন্থা হল যোগ প্রক্রিয়া। যোগের প্রাথমিক প্রক্রিয়াগুলি হচ্ছে আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধ্যান, ধারণা এবং অবশেষে পরমাত্মা উপলব্ধির মাধ্যমে সমাধি। এইভাবে গতানুগতিক পন্থায় আধ্যাত্মিক স্তরে উন্নীত হওয়ার জন্য প্রতিদিন ত্রিসন্ধ্যায় স্নান, যতদূর সম্ভব উপবাস করা, আসনে উপবিষ্ট হয়ে মনকে অধ্যাত্ম চিন্তায় একাগ্র করা এবং সেই ভাবে ধীরে ধীরে জড় বিষয় থেকে মুক্ত হওয়া ইত্যাদি বিধি অনুশীলন করার ব্যবস্থা রয়েছে।

জড় অস্তিত্ব মানে মায়িক জড় বিষয়ে মগ্ন হওয়া। ঘরবাড়ি, দেশভূমি, পরিবার-পরিজন, সমাজ-সম্প্রদায়, সন্তান-সন্ততি, বিষয়-সম্পত্তি এবং ব্যবসা-বাণিজ্য হল আত্মার কয়েকটি আবরণ, এবং যোগ প্রক্রিয়া এই সমস্ত মায়িক চিন্তা থেকে মুক্ত হতে সাহায্য করে এবং ধীরে ধীরে পরমাত্মার প্রতি আত্মাকে উন্মুখ করে।

জড় বিষয়ের সান্নিধ্য এবং শিক্ষার প্রভাবে আমরা কেবল অনিত্য বিষয়ে মনোনিবেশ করার শিক্ষা লাভ করি, কিন্তু যোগ হচ্ছে সেই সমস্ত বিষয় বিস্মৃত হওয়ার পন্থা।

আধুনিক যুগের তথাকথিত যোগী এবং যোগ পদ্ধতি কেবল কতকগুলি যাদু কৌশল প্রদর্শন করে, এবং মূর্খ মানুষেরা তাদের সেই কপটতার প্রতি আকৃষ্ট হয়, অথবা তারা স্থূল জাগতিক শরীরটাকে রোগমুক্ত করবার সস্তা পন্থা বলে যোগ পদ্ধতিকে মনে করে।

কিন্তু প্রকৃতপক্ষে যোগ পদ্ধতি হচ্ছে জীবন সংগ্রামে আহরিত হয়েছে যে সমস্ত বিষয়-বাসনা, সেগুলি থেকে মুক্ত হওয়ার পন্থা। ধৃতরাষ্ট্র বরাবর পাণ্ডবদের প্রতারণা করে তাঁর নিজের পুত্রদের রাজসিংহাসনে অধিষ্ঠিত করার চিন্তায় মগ্ন ছিলেন। আধ্যাত্মিক জ্ঞানরহিত বিষয়াসক্ত মানুষ এইভাবেই সচরাচর আচরণ করে থাকে। সে বুঝতে পারে না কিভাবে এই ধরনের মনোবৃত্তি তাকে স্বর্গ থেকে নরকের দিকে টেনে নিয়ে যেতে পারে।

ধৃতরাষ্ট্র তাঁর কনিষ্ঠ ভ্রাতা বিদুরের কৃপায় দিব্য জ্ঞান লাভ করেছিলেন এবং তাঁর স্থূল মায়ার বন্ধন সম্বন্ধে অবগত হয়েছিলেন, এবং এইভাবে দিব্য জ্ঞান লাভ করার ফলেই তিনি পরমার্থ সাধনের উদ্দেশ্যে গৃহত্যাগ করতে সক্ষম হয়েছিলেন। আকাশ গঙ্গার ধারায় পবিত্র স্থানে তাঁর পারমার্থিক প্রগতির কথা নারদ মুনি ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন।

কোন কিছু আহার না করে কেবল জলপান করে থাকলে তাকেও উপবাস বলে বিবেচনা করা হয়। পারমার্থিক প্রগতির পথে এই ধরনের উপবাস অত্যন্ত প্রয়োজনীয়।

মূর্খ মানুষ কোন রকম বিধি-নিয়মাদি অনুশীলন না করেই যোগী হতে চায়। যে মানুষ তার জিহ্বাকে দমন করতে পারে না, সে কখনই যোগী হতে পারে না। যোগী এবং ভোগী সম্পূর্ণ বিপরীত অর্থবোধক শব্দ। আহার ও পানাসক্ত ভোগীরা কখনই যোগী হতে পারে না, কারণ অনিয়ন্ত্রিতভাবে আহার এবং পান করা যোগীদের পক্ষে অনুচিত।

আমরা এখানে দেখতে পাই ধৃতরাষ্ট্র কিভাবে কেবলমাত্র জল গ্রহণ করে, এবং সমাহিত চিত্তে এক পবিত্র পারমার্থিক পরিবেশে উপবেশন করে যোগ অনুশীলন শুরু করেছিলেন, এবং পরমেশ্বর ভগবান শ্রীহরির চিন্তায় গভীরভাবে মগ্ন হয়েছিলেন।

শ্লোক ৫৪

জিতাসনো জিতশ্বাসঃ প্রত্যাহৃতষড়িন্দ্রিয়ঃ ।
হরিভাবনয়া ধ্বস্ত-রজঃসত্ত্বতমোমলঃ ॥ ৫৪ ॥

জিত-আসনঃ—যিনি আসনের পন্থা আয়ত্ত করেছেন; **জিত-শ্বাসঃ**—যিনি শ্বাস গ্রহণের পন্থা আয়ত্ত করেছেন; **প্রত্যাহৃত**—প্রত্যাহার করেছেন; **ষট্**—ছয়; **ইন্দ্রিয়ঃ**—ইন্দ্রিয়; **হরি**—পরমেশ্বর ভগবান; **ভাবনয়া**—ভাবনায় মগ্ন; **ধ্বস্ত**—জয় করেছেন; **রজঃ**—রজোগুণ; **সত্ত্ব**—সত্ত্বগুণ; **তমঃ**—তমোগুণ; **মলঃ**—কলুষ।

অনুবাদ

যিনি যৌগিক আসনের পদ্ধতি এবং শ্বাস-প্রক্রিয়াদি আয়ত্ত করেছেন, তিনি জড় বিষয় থেকে ছয় ইন্দ্রিয় প্রত্যাহার করে পরমেশ্বর ভগবান শ্রীহরির ভাবনায় মগ্ন হতে পারেন এবং সেইভাবে জড়া প্রকৃতির সত্ত্ব, রজো এবং তমোগুণজনিত কলুষ থেকে মুক্ত থাকতে পারেন।

তাৎপর্য

যোগের প্রাথমিক অনুশীলন হচ্ছে আসন, প্রাণায়াম, ধ্যান, ধারণা ইত্যাদি। যোগের এই সমস্ত অঙ্গের অনুশীলনে মহারাজ ধৃতরাষ্ট্রকে কৃতকার্য হতে হয়েছিল, কারণ তিনি এক পবিত্র স্থানে উপবেশন করে পরমেশ্বর ভগবান শ্রীহরির ধ্যানে একাগ্র চিত্ত হয়েছিলেন। এই ভাবে তাঁর সমস্ত ইন্দ্রিয়গুলি ভগবানের সেবায় নিযুক্ত হয়েছিল।

এই পদ্ধতির অনুশীলন ভক্তদের সরাসরিভাবে জড়া প্রকৃতির তিনটি গুণের কলুষ থেকে মুক্ত হতে সাহায্য করে। জড়া প্রকৃতির সর্বোচ্চ গুণ যে সত্ত্বগুণ, তাও জড় বন্ধনের কারণ, সুতরাং রজো এবং তমোগুণের কথা বলে আর কী হবে! রজো এবং তমোগুণ জড় সুখ ভোগের আসক্তি বৃদ্ধি করে, এবং এক তীব্র কাম-বাসনার অনুভূতি তখন ধন-সম্পদ এবং শক্তি সঞ্চয়ে মানুষকে প্ররোচিত করে।

যিনি এই দু'টি জঘন্য বৃত্তি জয় করে সত্ত্ব গুণের স্তরে উন্নীত হয়েছেন, তিনি জ্ঞান এবং নীতিবোধের এই অতি উন্নত স্তরে উন্নীত হওয়া সত্ত্বেও তাঁর চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা এবং ত্বকের ইন্দ্রিয়ানুভূতি দমন করতে পারেন না।

কিন্তু যিনি উল্লিখিতভাবে পরমেশ্বর ভগবান শ্রীহরির শ্রীপাদপদ্মের শরণাগত হয়েছেন, তিনি জড়া প্রকৃতির সমস্ত প্রভাব থেকে মুক্ত হতে পারেন এবং পরমেশ্বর ভগবানের সেবায় যুক্ত হতে পারেন।

ভক্তিযোগের পন্থায়, তাই সরাসরিভাবে ইন্দ্রিয়গুলিকে ভগবানের প্রেমময়ী সেবায় যুক্ত করা হয়। তার ফলে যোগাভ্যাসকারী আর জড়জাগতিক কার্যকলাপে যুক্ত হন না।

ইন্দ্রিয়গুলিকে জড় বিষয় থেকে সংবরণ করে ভগবানের প্রেমময়ী সেবায় যুক্ত করার এই পদ্ধতিকে বলা হয় *প্রত্যাহার* এবং এই পন্থাকেই বলা হয় *প্রাণায়াম*, যা চরমে *সমাধি* বা সর্বতোভাবে পরমেশ্বর ভগবান শ্রীহরির সন্তুষ্টি বিধানের চেষ্টায় পর্যবসিত হয়।

শ্লোক ৫৫

বিজ্ঞানাত্মনি সংযোজ্য ক্ষেত্রজ্ঞে প্রবিলাপ্য তম্ ।
ব্রহ্মণ্যাত্মানমাধারে ঘটাম্বরমিবাম্বরে ॥ ৫৫ ॥

বিজ্ঞান—পবিত্র সত্তা; **আত্মনি**—বুদ্ধিতে; **সংযোজ্য**—যথাযথভাবে সংস্থাপন করে; **ক্ষেত্রজ্ঞে**—জীবে; **প্রবিলাপ্য**—সংযুক্ত হয়ে; **তম্**—তাকে; **ব্রহ্মণি**—পরব্রহ্মে; **আত্মানম্**—শুদ্ধ আত্মা; **আধারে**—আশ্রয়ে; **ঘট-অম্বরম্**—ঘটাকাশ; **ইব**—মতো; **অম্বরে**—মহাকাশে।

অনুবাদ

ধৃতরাষ্ট্রকে আত্মজ্ঞান-স্বরূপ বুদ্ধির সাথে আপন শুদ্ধ পরিচয়ের সংযোগ সাধন করতে হবে এবং তারপরে পরম ব্রহ্মের সাথে এক জীবসত্তারূপে তাঁর গুণগত একাত্মতার জ্ঞান অর্জন করে পরম সত্তার মাঝে সাযুজ্য লাভ করতে হবে। জড়জাগতিক আবদ্ধ আকাশ থেকে মুক্ত হয়ে, তাঁকে চিদাকাশে উন্নীত হতে হবে।

তাৎপর্য

জড়া প্রকৃতির উপর আধিপত্য করার বাসনায় পরমেশ্বর ভগবানের উদ্দেশ্যে সেবা সহযোগিতায় বিমুখ হয়ে জীব মহত্তত্ত্ব নামক জড়া প্রকৃতির উপাদানের সংস্পর্শে আসে, এবং মহত্তত্ত্ব থেকে অহংকার, বুদ্ধি, মন এবং ইন্দ্রিয় সমূহের বিকাশের মাধ্যমে তার মিথ্যা ভ্রান্ত আত্মপরিচয় সৃষ্টি হয়। এর ফলে তার চিন্ময় সত্তা আচ্ছাদিত হয়ে পড়ে। যৌগিক প্রক্রিয়ায় যখন মানুষের শুদ্ধ আত্ম পরিচয় উপলব্ধি হয়, তখন পুনরায় পঞ্চ স্থূল উপাদানগুলি এবং মন, বুদ্ধির মতো সূক্ষ্ম উপাদানগুলি মহত্তত্ত্বে অর্পণ করে আদি মর্যাদায় পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হওয়া যায়।

এইভাবে মানুষকে মহত্তত্ত্বের কবল থেকে মুক্ত হয়ে পরমাত্মায় সমাহিত হতে হয়। ভাষান্তরে, তাকে উপলব্ধি করতে হয় যে, সে গুণগতভাবে পরমাত্মা থেকে অভিন্ন, এবং এইভাবে তার বিশুদ্ধ আত্ম পরিচয়গত বুদ্ধির দ্বারা সে জড় জগতের স্তর অতিক্রম করে এবং পরমেশ্বর ভগবানের অপ্রাকৃত প্রেমময়ী সেবায় যুক্ত হয়।

এইটিই পারমার্থিক আত্ম-পরিচয় উপলব্ধির সর্বোচ্চ সার্থকময় স্তর, যা বিদুর এবং পরমেশ্বর ভগবানের অনুগ্রহে ধৃতরাষ্ট্র লাভ করেছিলেন। বিদুরের সাথে ব্যক্তিগত সঙ্গ প্রভাবে পরমেশ্বর ভগবানের কৃপা তাঁর উপরে বর্ষিত হয়েছিল এবং যখন তিনি বিদুরের নির্দেশ অনুসারে বাস্তবিকই অনুশীলনাদি করতে শুরু করেন, তখন পরমেশ্বর ভগবান তাঁকে সর্বোচ্চ সার্থক সিদ্ধিলাভের পর্যায় স্তর অর্জনে সাহায্য করেন।

পরমেশ্বর ভগবানের শুদ্ধ ভক্ত জড়জাগতিক আকাশের কোনও গ্রহলোকে বাস করেন না, এমন কি জড়া প্রকৃতির উপাদানগুলির সঙ্গে কোন রকম সংযোগও তিনি অনুভব করেন না। পরমেশ্বর ভগবানের স্বরূপগত সমভাবাপন্ন আগ্রহ-অনুরাগের পারমার্থিক স্রোতধারায় সঞ্জীবিত হয়ে, তাঁর তথাকথিত জড় শরীরটির অস্তিত্ব থাকে না, এবং তাই তিনি মহত্তত্ত্ব প্রসূত সামগ্রিক কলুষ থেকে চিরতরে মুক্ত হন। ভগবদ্ভক্তির প্রভাবে জড়া প্রকৃতির সপ্ত আবরণের অতীত হয়ে, তিনি চিদাকাশে সর্বদা বিরাজ করেন। বদ্ধ জীবাত্মারা জড় জগতের আবরণের অন্তর্ভুক্ত রয়েছে, সেক্ষেত্রে মুক্ত জীবাত্মারা সেই আবরণের অনেক অনেক ঊর্ধ্বে বিরাজ করেন।

শ্লোক ৫৬

ধ্বস্তমায়াগুণোদর্কো নিরুদ্ধকরণাশয়ঃ ।
নিবর্তিতাখিলাহার আস্তে স্থাণুরিবাচলঃ ।
তস্যান্তরায়ো মৈবাভূঃ সন্ন্যস্তাখিলকর্মণঃ ॥ ৫৬ ॥

ধ্বস্ত—ধ্বংস হয়ে; **মায়া-গুণ**—জড়া প্রকৃতির তিন গুণ; **উদর্কঃ**—প্রতিক্রিয়া; **নিরুদ্ধ**—সংযত হয়ে; **করণ-আশয়ঃ**—মন এবং ইন্দ্রিয়সমূহ; **নিবর্তিত**—নিবৃত্ত; **অখিল**—সমস্ত; **আহারঃ**—ইন্দ্রিয়াদির গ্রহণীয় বিষয়সমূহ; **আস্তে**—আসনে; **স্থাণুঃ**—নিশ্চল; **ইব**—মতো; **অচলঃ**—স্থির; **তস্য**—তাঁর; **অন্তরায়ঃ**—বিঘ্ন; **মা এব**—কখনই সেই রকম নয়; **অভূঃ**—হওয়া; **সন্ন্যস্ত**—পরিত্যাগ করে; **অখিল**—সর্বপ্রকার; **কর্মণঃ**—জাগতিক কর্তব্যসমূহ।

অনুবাদ

ইন্দ্রিয়ের সমস্ত কার্যকলাপ বাইরে থেকেও সংযত করে এবং ভোক্তার বুদ্ধিতে বাহ্য বিষয় আহরণ রূপ জড়া প্রকৃতির গুণবৈশিষ্ট্যাদির দ্বারা প্রভাবিত সর্ব প্রকার

ক্রিয়া থেকে নিবৃত্ত হয়ে স্থানুর মতো নিশ্চলভাবে তাঁকে অবস্থান করতে হবে। সব রকম জড়জাগতিক কর্তব্য পরিত্যাগ করবার পরে, সেই পথের সমস্ত বিঘ্ন অতিক্রম করে, তাঁকে অবিচল হয়ে অধিষ্ঠিত হতে হবে।

তাৎপর্য

যৌগিক প্রক্রিয়ায় ধৃতরাষ্ট্র সব রকম জড় প্রভাব থেকে নিবৃত্ত হওয়ার স্তর লাভ করেছিলেন। জড়া প্রকৃতির গুণের প্রভাব জীবকে জড় বিষয় ভোগের অক্লান্ত বাসনার অভিমুখী করে। কিন্তু যৌগিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে এই ভ্রান্ত সুখ-ভোগের বাসনা থেকে মানুষ মুক্ত হতে পারে।

প্রতিটি ইন্দ্রিয় সর্বদাই বিষয় আহরণের অন্বেষণ করে, এবং তার ফলে বদ্ধ জীবাত্মা চতুর্দিক থেকে পর্যুদস্ত হয় এবং কোন প্রচেষ্টাতেই স্থির হওয়ার সুযোগ পায় না।

যুধিষ্ঠির মহারাজকে নারদ মুনি উপদেশ দিয়েছিলেন তিনি যেন তাঁর পিতৃব্যকে গৃহে আনার চেষ্টা করে তাঁর পিতৃব্যের পারমার্থিক প্রগতির পথে বিঘ্ন সৃষ্টি না করেন। তিনি এখন সব রকম জড় আসক্তির অতীত।

জড়া প্রকৃতির গুণসমূহের বিভিন্ন ধরনের ক্রিয়া-প্রক্রিয়া থাকে, কিন্তু এই সব জড় গুণের ঊর্ধ্বে এক চিন্ময় গুণ বিরাজ করে, যা চিরন্তন শাশ্বত সম্যক্। *নির্গুণ* মানে প্রতিক্রিয়ারহিত। পরা প্রকৃতির চিন্ময় গুণ এবং তার প্রতিক্রিয়া অভিন্ন; তাই সেই চিন্ময় গুণকে জড়া প্রকৃতির বিপরীত বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন গুণের থেকে ভিন্ন বলে প্রতিপন্ন করার জন্য *নির্গুণ* শব্দটির ব্যবহার করা হয়।

জড়া প্রকৃতির গুণগুলিকে সর্বতোভাবে নিরুদ্ধ করার পরে, মানুষ চিন্ময় মণ্ডলে প্রবেশাধিকার পায়, এবং চিন্ময় গুণাবলীর দ্বারা নির্দেশিত কার্যকলাপকে বলা হয় ভক্তি। তাই ভক্তি হচ্ছে পরম তত্ত্বের সাথে প্রত্যক্ষ সংস্পর্শের মাধ্যমে অর্জিত নির্গুণ ক্রিয়া।

শ্লোক ৫৭

স বা অদ্যতনাদ্ রাজন্ পরতঃ পঞ্চমেঽহনি।
কলেবরং হাস্যতি স্বং তচ্চ ভস্মীভবিষ্যতি ॥ ৫৭ ॥

সঃ—তিনি; **বা**—খুব সম্ভবত; **অদ্য**—আজ; **তনাৎ**—থেকে; **রাজন্**—হে রাজন্; **পরতঃ**—পরে; **পঞ্চমে**—পঞ্চম; **অহনি**—দিনে; **কলেবরম্**—দেহ; **হাস্যতি**—ত্যাগ করবেন; **স্বম্**—তাঁর নিজস্ব; **তৎ**—তা; **চ**—ও; **ভস্মী**—ভস্মে; **ভবিষ্যতি**—পরিণত হবে।

অনুবাদ

হে রাজন্, আজ থেকে খুব সম্ভবত পঞ্চম দিনে তিনি দেহত্যাগ করবেন, এবং তাঁর সেই দেহ ভস্মে পরিণত হবে।

তাৎপর্য

নারদমুনির ভবিষ্যদ্বাণী যুধিষ্ঠির মহারাজকে, তাঁর পিতৃব্য ধৃতরাষ্ট্র যেখানে ছিলেন, সেখানে যাওয়া থেকে নিরস্ত করেছিল, কারণ যোগবলে স্বেচ্ছায় দেহত্যাগ করার পরেও ধৃতরাষ্ট্রের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার কোন প্রয়োজন হবে না। নারদমুনি তাঁকে জানিয়েছিলেন যে, তাঁর দেহ আপনা থেকেই ভস্মে পরিণত হবে। যোগবলে এই ধরনের সিদ্ধি লাভ করা যায়। যোগী স্বেচ্ছায় তাঁর দেহত্যাগ করতে পারেন, এবং তাঁর বর্তমান দেহটিকে স্বতঃ প্রজ্বলিত অগ্নিতে ভস্মীভূত করে তাঁর ঈপ্সিত যে কোন গ্রহলোকে চলে যেতে পারেন।

শ্লোক ৫৮

দহ্যমানেঽগ্নিভির্দেহে পত্যুঃ পত্নী সহোটজে ।
বহিঃ স্থিতা পতিং সাধ্বী তমগ্নিমনু বেক্ষ্যতি ॥ ৫৮ ॥

দহ্যমানে—জ্বলন্ত; **অগ্নিভিঃ**—অগ্নির দ্বারা; **দেহে**—শরীর; **পত্যুঃ**—পতির; **পত্নী**—পত্নী; **সহ-উটজে**—পর্ণকুটির সহ; **বহিঃ**—বাইরে; **স্থিতা**—অবস্থিত; **পতিম্**—পতির; **সাধ্বী**—সতী; **তম্**—সেই; **অগ্নিম্**—অগ্নিতে; **অনু বেক্ষ্যতি**—গভীর মনোযোগে দর্শন করতে করতে প্রবিষ্ট হবেন।

অনুবাদ

বাইরে থেকে পর্ণকুটিরসহ তাঁর পতির দেহ যোগাগ্নিতে দগ্ধ হতে দেখে পতিব্রতা পত্নী গান্ধারীও সেই অগ্নিতে প্রবেশ করে একাগ্রচিত্তে তাঁর পতির অনুবর্তিনী হবেন।

তাৎপর্য

গান্ধারী ছিলেন এক আদর্শ সাধ্বী নারী, তাঁর পতির নিত্য সহচরী, এবং তাই তিনি যখন দেখলেন যে, যোগাগ্নিতে পর্ণকুটিরসহ তাঁর পতির দেহ দগ্ধ হচ্ছে, তখন তিনি হতাশ হয়েছিলেন। তাঁর শতপুত্র হারিয়ে তিনি গৃহত্যাগ করেছিলেন, এবং

অরণ্যে তিনি দেখলেন যে, তাঁর পরম প্রেমাস্পদ পতিও দগ্ধ হচ্ছেন। এবার তিনি একেবারেই নিঃসঙ্গ বোধ করলেন, এবং তাই তিনি তাঁর পতির অগ্নিকুণ্ডে প্রবেশ করে মৃত্যুপথে তাঁর পতির অনুবর্তিনী হলেন।

পতিব্রতা সাধ্বী রমণীর এইভাবে মৃত পতির চিতাগ্নিতে প্রবেশ করাকে বলা হয় সতীপ্রথা, এবং কোন রমণীর পক্ষে এটি অতীব গৌরবময় কার্য বলে বিবেচনা করা হয়। পরবর্তীকালে এই সতীপ্রথা এক জঘন্য অপরাধমূলক ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছিল, কারণ অনিচ্ছুক রমণীকেও জোর করে এই পবিত্র অনুষ্ঠান পালনে বাধ্য করা হত। অধঃপতিত যুগে কোন রমণীর পক্ষে গান্ধারীর এবং পুরাকালের অন্যান্য রমণীর মতো পাতিব্রত্য অবলম্বন করে সতীপ্রথা অনুসরণ করা সম্ভব নয়।

গান্ধারীর মতো সতী নারীর কাছে তাঁর পতির বিরহ-বেদনা অগ্নিতে প্রজ্বলিত হওয়ার থেকেও অধিক দুঃখদায়ক। এই ধরনের কোনও মহিলা স্বেচ্ছায় সতীপ্রথা অবলম্বন করতে পারেন, এবং তাতে কারও দণ্ডনীয় বলপ্রয়োগ থাকে না। এই প্রথাটি যখন একটি গতানুগতিক সংস্কারে পরিণত হল এবং এই প্রথা অনুসরণে কোনও মহিলার ওপরে বলপ্রয়োগ করা হত, বাস্তবিকই এটা তখন দণ্ডনীয় অপরাধে পরিণত হল, এবং তাই রাষ্ট্রীয় আইনের মাধ্যমে এই প্রথা বন্ধ করা হয়।

নারদ মুনির এই ভবিষ্যদ্বাণী মহারাজ যুধিষ্ঠিরকে তাঁর বিধবা পিতৃব্য-পত্নীর কাছে যেতে নিরস্ত করেছিল।

শ্লোক ৫৯

বিদুরস্তু তদাশ্চর্যং নিশাম্য কুরুনন্দন ।
হর্ষশোকযুতস্তস্মাদ্ গন্তা তীর্থনিষেবকঃ ॥ ৫৯ ॥

বিদুরঃ—বিদুরও; **তু**—কিন্তু; **তৎ**—সেই ঘটনা; **আশ্চর্যম্**—অতি অদ্ভুত; **নিশাম্য**—দর্শন করে; **কুরুনন্দন**—হে কুরুকুল সন্তান; **হর্ষ**—আনন্দ; **শোক**—বিষাদ; **যুতঃ**—প্রভাবিত হয়ে; **তস্মাৎ**—সেই স্থান থেকে; **গন্তা**—চলে যাবেন; **তীর্থ**—তীর্থস্থান; **নিষেবকঃ**—সেবার্থে।

অনুবাদ

হে কুরুনন্দন, তখন বিদুরও সেই আশ্চর্য ঘটনা দর্শন করে হর্ষ এবং বিষাদে অভিভূত হয়ে তীর্থসেবার জন্য সেই পুণ্য পবিত্র তীর্থস্থান পরিত্যাগ করবেন।

তাৎপর্য

সিদ্ধ যোগীর মতো তাঁর ভ্রাতা ধৃতরাষ্ট্রের অনির্বচনীয় দেহত্যাগ দেখে বিদুর আশ্চর্য হয়ে গিয়েছিলেন, কারণ পূর্ব জীবনে ধৃতরাষ্ট্র ছিলেন অত্যন্ত বিষয়াসক্ত। অবশ্য বিদুরের কৃপার প্রভাবেই তাঁর ভ্রাতা ধৃতরাষ্ট্র এইভাবে জীবনের আকাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য অর্জন করেছিলেন। তাই এই কথা জেনে বিদুরের আনন্দ হয়েছিল, কিন্তু তাঁর ভ্রাতাকে শুদ্ধ ভক্তে পরিণত করতে না পারায় তিনি দুঃখ পেয়েছিলেন।

বিদুরের পক্ষে তা সম্ভব হয়নি কারণ ধৃতরাষ্ট্র ছিলেন ভগবদ্ভক্ত পাণ্ডবদের প্রতি শত্রুভাবাপন্ন। বৈষ্ণবের চরণে অপরাধ, ভগবানের চরণে অপরাধের থেকেও অধিক ভয়ঙ্কর। বিদুর অবশ্য তাঁর ভ্রাতা ধৃতরাষ্ট্রকে কৃপা করতে খুবই উদার মনোভাবাপন্ন ছিলেন, যে ধৃতরাষ্ট্রের পূর্বজীবন ছিল অত্যন্ত বিষয়াসক্ত। কিন্তু শেষ পর্যন্ত এই ধরনের কৃপার ফল অবশ্য নির্ভর করে বর্তমান জীবনে ভগবানের উপর; তাই ধৃতরাষ্ট্র কেবল মুক্তি লাভ করেছিলেন, ভগবদ্ভক্তি লাভ করতে পারেননি, যা বহু জন্মের মুক্তির পর লাভ করা যায়।

বিদুর অবশ্যই তাঁর ভ্রাতা এবং ভ্রাতৃবধূর মৃত্যুতে অত্যন্ত বিষাদগ্রস্ত হয়েছিলেন, এবং সেই বিষাদ থেকে মুক্ত হওয়ার একমাত্র উপায় ছিল তীর্থভ্রমণে বের হওয়া। তাই মহারাজ যুধিষ্ঠিরের পক্ষে তাঁর জীবিত পিতৃব্য বিদুরকে ফিরিয়ে আনারও কোনও সম্ভাবনা ছিল না।

শ্লোক ৬০

ইত্যুক্ত্বাথারুহৎ স্বর্গং নারদঃ সহতুম্বুরুঃ ।
যুধিষ্ঠিরো বচস্তস্য হৃদি কৃত্বাজহাচ্ছুচঃ ॥ ৬০ ॥

ইতি—এইভাবে; **উক্ত্বা**—বলে; **অথ**—তারপর; **আরুহৎ**—আরোহণ করেছিলেন; **স্বর্গম্**—স্বর্গলোকে; **নারদঃ**—দেবর্ষি নারদ; **সহ**—সহিত; **তুম্বুরু**—বীণা; **যুধিষ্ঠিরঃ**—যুধিষ্ঠির মহারাজ; **বচঃ**—বাণী; **তস্য**—তাঁর; **হৃদি-কৃত্বা**—হৃদয়ে ধারণ করে; **অজহাৎ**—ত্যাগ করেছিলেন; **শুচঃ**—সমস্ত শোক।

অনুবাদ

এই বলে দেবর্ষি নারদ তাঁর বীণা হস্তে স্বর্গে আরোহণ করলেন, এবং যুধিষ্ঠির মহারাজও নারদের বাণী হৃদয়ে ধারণ করে শোক পরিত্যাগ করলেন।

তাৎপর্য

পরমেশ্বর ভগবানের কৃপায় এক চিন্ময় দেহ লাভ করার ফলে শ্রীনারদ মুনি এক চিরন্তন মহাকাশচারী। তিনি জড় জগৎ এবং চিদ্‌জগতের যে কোনও স্থানে অবাধে ভ্রমণ করতে পারেন এবং নিমেষের মধ্যে অনন্ত মহাশূন্যে যে কোন গ্রহে যেতে পারেন।

দাসী পুত্ররূপে তাঁর পূর্ব জীবনের কথা আমরা ইতিমধ্যেই আলোচনা করেছি। শুদ্ধ ভক্তের সঙ্গ প্রভাবে তিনি নিত্য মহাকাশচারীর মর্যাদায় উন্নীত হয়েছিলেন এবং সর্বত্র বিচরণের স্বাধীনতা তাঁর ছিল। তাই যৌগিক প্রক্রিয়ায় অন্যান্য গ্রহে যাওয়ার অর্থহীন প্রচেষ্টা না করে, নারদ মুনির পদাঙ্ক অনুসরণের চেষ্টা করা সকলেরই কর্তব্য।

মহারাজ যুধিষ্ঠির ছিলেন অতি পুণ্যবান নৃপতি, এবং তাই তিনি প্রায়ই নারদ মুনির দর্শন পেতেন। যাঁরা নারদ মুনিকে দর্শন করতে চান, তাঁদের সর্ব প্রথমে পুণ্যবান হতে হবে এবং নারদ মুনির পদাঙ্ক অনুসরণ করতে হবে।

ইতিঃ "ধৃতরাষ্ট্রের গৃহত্যাগ" নামক শ্রীমদ্ভাগবতের প্রথম স্কন্ধের ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদের শ্রীল ভক্তিবেদান্ত তাৎপর্য।

চতুর্দশ অধ্যায়

শ্রীকৃষ্ণের তিরোধান লীলা

শ্লোক ১

সূত উবাচ

সম্প্রস্থিতে দ্বারকায়াং জিষ্ণৌ বন্ধুদিদৃক্ষয়া ।
জ্ঞাতুঞ্চ পুণ্যশ্লোকস্য কৃষ্ণস্য চ বিচেষ্টিতম্ ॥ ১ ॥

সূতঃ উবাচ—শ্রীসূত গোস্বামী বললেন; **সম্প্রস্থিতে**—যাওয়ার পর; **দ্বারকায়াম্**—দ্বারকাপুরীতে; **জিষ্ণৌ**—অর্জুন; **বন্ধু**—বন্ধুদের এবং আত্মীয়-স্বজনদের; **দিদৃক্ষয়া**—দর্শন করার জন্য; **জ্ঞাতুম্**—জানার জন্য; **চ**—ও; **পুণ্য-শ্লোকস্য**—বৈদিক মন্ত্রে যাঁর মহিমা কীর্তিত হয়; **কৃষ্ণস্য**—শ্রীকৃষ্ণের; **চ**—এবং; **বিচেষ্টিতম্**—অভিপ্রায়।

অনুবাদ

শ্রীসূত গোস্বামী বললেন—শ্রীকৃষ্ণ এবং অন্যান্য বন্ধুদের দর্শন করার জন্য এবং পুণ্যশ্লোক শ্রীকৃষ্ণের চরিত্র ও পরবর্তী অভিপ্রায় জানবার জন্য অর্জুন দ্বারকায় গিয়েছিলেন।

তাৎপর্য

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় বর্ণনা করা হয়েছে যে, সাধুদের পরিত্রাণ করার জন্য এবং দুষ্কৃতকারীদের বিনাশ করার জন্য ভগবান এই পৃথিবীতে অবতরণ করেন, সুতরাং কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের পর এবং যুধিষ্ঠির মহারাজকে সিংহাসনে অধিষ্ঠিত করার পর ভগবানের উদ্দেশ্য সম্পূর্ণ হয়েছিল। পাণ্ডবেরা, বিশেষ করে অর্জুন ছিলেন ভগবানের নিত্য পার্ষদ, এবং তাই ভগবানের পরবর্তী অভিপ্রায় জানার জন্য অর্জুন দ্বারকায় গিয়েছিলেন।

শ্লোক ২

ব্যতীতাঃ কতিচিন্মাসাস্তদা নায়াৎ ততোঽর্জুনঃ ।
দদর্শ ঘোররূপাণি নিমিত্তানি কুরূদ্বহঃ ॥ ২ ॥

ব্যতীতাঃ—অতিবাহিত হলে; কতিচিৎ—কয়েকটি; মাসাঃ—মাস; তদা—সেই সময়; ন আয়াৎ—ফিরে না আসায়; ততঃ—সেখান থেকে; অর্জুনঃ—অর্জুন; দদর্শ—দেখেছিলেন; ঘোর—ভয়ঙ্কর; রূপাণি—রূপসকল, নিমিত্তানি—বিভিন্ন কারণে; কুরু-উদ্বহঃ—যুধিষ্ঠির মহারাজ।

অনুবাদ

কয়েক মাস গত হলেও অর্জুন ফিরে এলেন না। মহারাজ যুধিষ্ঠির তখন ভয়ঙ্কর অনিষ্টসূচক অমঙ্গল চিহ্নাদি দর্শন করতে লাগলেন।

তাৎপর্য

পরম পুরুষোত্তম ভগবান অনন্ত, তিনি সব চেয়ে শক্তিমান সূর্যের থেকেও অধিক শক্তিশালী। তাঁর এক নিঃশ্বাসে অনন্ত কোটি সূর্যের সৃষ্টি হয় এবং বিনাশ হয়। জড় জগতে সূর্যকে সমস্ত জড় শক্তি এবং সৃষ্টির উৎস বলে গণ্য করা হয়, এবং সূর্যের প্রভাবেই আমরা জীবনে যা কিছু প্রয়োজন সব পেতে পারি। তাই, এই পৃথিবীতে ভগবানের অবস্থান কালে, আমাদের শান্তি এবং সমৃদ্ধির, বিশেষ করে ধর্ম এবং জ্ঞানের সমস্ত উপাদানগুলি পূর্ণরূপে প্রকাশিত হয়েছিল, ঠিক যেমন দ্যুতিময় সূর্যের উপস্থিতির প্রভাবে চতুর্দিকে আলোর বন্যা বয়। মহারাজ যুধিষ্ঠির তাঁর রাজ্যে কয়েকটি অশুভ ইঙ্গিত দর্শন করেছিলেন, এবং তাই তিনি দীর্ঘকাল অনুপস্থিত অর্জুনের জন্য উৎকণ্ঠিত হয়ে উঠেছিলেন, এবং দীর্ঘকাল তিনি দ্বারকার শুভ সংবাদও পাননি। তিনি শ্রীকৃষ্ণের অপ্রকটের আশঙ্কা করেছিলেন, তা না হলে ভয়ঙ্কর অশুভ ইঙ্গিতের কোন সম্ভাবনা ছিল না।

শ্লোক ৩

কালস্য চ গতিং রৌদ্রাং বিপর্যস্তর্তুধর্মিণঃ ।
পাপীয়সীং নৃণাং বার্তাং ক্রোধলোভানৃতাত্মনাম্ ॥ ৩ ॥

কালস্য—অনন্ত কালের; চ—ও; গতিম্—গতি; রৌদ্রাম্—ভয়ঙ্কর; বিপর্যস্ত—বিপর্যস্ত; ঋতু—ঋতু; ধর্মিণঃ—স্বাভাবিক ধারা অনুসারে; পাপীয়সীম্—পাপবহুল; নৃণাম্—মানুষদের; বার্তাম্—জীবন ধারণের বৃত্তি; ক্রোধ—ক্রোধ; লোভ—লোভ; অনৃত—মিথ্যাচার; আত্মনাম্—মানুষদের।

অনুবাদ

তিনি দেখলেন যে, কালের গতি অত্যন্ত ভয়াবহ হয়ে উঠেছে, ঋতুগুলির ধর্ম বিপর্যস্ত হয়েছে। ক্রোধ, লোভ ও মিথ্যা সমস্ত মানুষদের প্রবৃত্তি হয়ে উঠেছে, এবং সেই জন্য তারা পাপের পথ অনুসরণ করে জীবিকা নির্বাহ করতে আরম্ভ করেছে।

তাৎপর্য

সভ্যতা যখন পরম পুরুষোত্তম ভগবানের প্রীতির সম্পর্ক থেকে বিচ্ছিন্ন হয়, তখন ঋতুর বিপর্যয়, পাপপথে জীবিকা নির্বাহ, লোভ, ক্রোধ এবং মিথ্যাচার প্রবল ভাবে প্রকট হয়ে ওঠে।

ঋতুর বিপর্যয় বলতে এক ঋতুতে অন্য ঋতুর প্রকাশ বোঝান হয়েছে—যেমন শরৎ কালে বর্ষা, অথবা এক ঋতুর ফুল এবং ফল অন্য ঋতুতে ফলতে দেখা।

ভগবৎ-চেতনাবিহীন মানুষ অবশ্যই লোভী, ক্রোধী এবং মিথ্যাচারী হয়। এই ধরনের মানুষেরা যে কোন উপায়ে চোরাপথে বা সৎপথে তাদের জীবিকা নির্বাহ করতে পারে। মহারাজ যুধিষ্ঠিরের রাজত্বকালে, উপরোক্ত সমস্ত লক্ষণগুলির অনুপস্থিতি বেশ বোঝা যেত। তাই যুধিষ্ঠির মহারাজ তাঁর রাজ্যে ভগবৎ-চেতনাময় পরিবেশের স্বল্প পরিবর্তন অনুভব করে বিস্মিত হলেন এবং তৎক্ষণাৎ সন্দেহ পোষণ করেছিলেন যে, শ্রীকৃষ্ণ অপ্রকট হয়েছেন।

পাপ পথের অনুসরণে জীবিকা-নির্বাহ বলতে বোঝায় বর্ণাশ্রম ধর্ম থেকে বিচ্যুতি। প্রত্যেকেরই নির্দিষ্ট কর্তব্যকর্ম রয়েছে, যেমন ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং শূদ্র; কিন্তু কেউ যখন তার নির্দিষ্ট কর্তব্যকর্ম থেকে বিচ্যুত হয়ে অপরের কর্তব্যকর্মগুলিকে নিজের বলে জাহির করে, তখন সে অধর্ম আচরণ বা পাপাচরণ করতে থাকে।

জীবনে কোন উচ্চতর উদ্দেশ্য না থাকলে এবং এই পৃথিবীতে স্বল্প কয়েক বৎসরের আয়ু সমন্বিত জীবনটিকে যথাসর্বস্ব বলে মনে করলে, মানুষ ধন-সম্পদ এবং ক্ষমতা লাভের জন্য অত্যন্ত লোভী হয়ে ওঠে। অজ্ঞানতা হচ্ছে মানব সমাজের এই সমস্ত বিশৃঙ্খলার কারণ, এবং বিশেষ করে অধঃপতনের এই যুগে, এই অজ্ঞানতা দূর করার জন্য আলোক বিতরণের উদ্দেশ্যে শ্রীমদ্ভাগবত রূপে শক্তিমান মহাদ্যুতিময় সূর্যের উদয় হয়েছে।

শ্লোক ৪

জিহ্মপ্রায়ং ব্যবহৃতং শাঠ্যমিশ্রঞ্চ সৌহৃদম্ ।
পিতৃমাতৃসুহৃদ্ভ্রাতৃদম্পতীনাঞ্চ কল্কনম্ ॥ ৪ ॥

জিহ্ম-প্রায়ম্—কপটতা; **ব্যবহৃতম্**—সব রকম স্বাভাবিক আদান-প্রদান এবং আচরণে; **শাঠ্য**—শঠতা; **মিশ্রম**—কলুষিত; **চ**—এবং; **সৌহৃদম্**—শুভাকাঙ্ক্ষী বন্ধুদের; **পিতৃ**—পিতা; **মাতৃ**—মাতা; **সুহৃৎ**—শুভাকাঙ্ক্ষী; **ভ্রাতৃ**—ভ্রাতা; **দম্পতিনাম্**—পতি-পত্নীদের; **চ**—ও; **কল্কনম্**—কলহ।

অনুবাদ

বন্ধুদের মধ্যেও সমস্ত স্বাভাবিক আদান-প্রদান এবং আচরণাদি কপটতাপূর্ণ এবং শঠতায় কলুষিত হয়ে উঠল। আর পারিবারিক ব্যাপারাদির মধ্যেও পিতামাতা, পুত্রকন্যা, সুহৃদ্‌বর্গ, এমন কি ভ্রাতৃবর্গের মধ্যেও নিয়ত মতান্তর ঘটতে লাগল। পতি-পত্নীর মধ্যেও সর্বদা উৎকণ্ঠা আর কলহ বিবাদ ঘটছিল।

তাৎপর্য

দুষ্কর্মের চারটি নীতি, যেমন ভুলভ্রান্তি (ভ্রম), প্রমত্ততা (প্রমাদ), অপটুতা (করণাপটব) এবং প্রতারণা (বিপ্রলিপ্সা)—এগুলির দ্বারা বদ্ধ জীবমাত্রই আজন্ম দোষান্বিত। এগুলি অপূর্ণতার লক্ষণ এবং এই চারটি প্রবণতার মধ্যে বিপ্রলিপ্সা বা অন্যকে প্রতারণা করার প্রবণতা সব চেয়ে প্রবল। আর বদ্ধ জীব মূলত এই জড় জগতের উপর আধিপত্য করার অস্বাভাবিক বাসনা করে বলেই তার মধ্যে প্রতারণা করার এই প্রবণতা থাকে।

জীব যখন শুদ্ধ অবস্থায় থাকে, তখন সে এই জড় জগতের নিয়মের দ্বারা প্রভাবিত হয় না, কারণ শুদ্ধ অবস্থায় সে সচেতন থাকে যে, জীবসত্তা পরমেশ্বর ভগবানের নিত্য সেবক, এবং তাই পরমেশ্বর ভগবানের প্রকৃতির উপর আধিপত্য করার ভ্রান্ত চেষ্টা করার পরিবর্তে তাঁর অনুগত হয়ে থাকাই জীবের পক্ষে সর্বদা মঙ্গলজনক।

বদ্ধ অবস্থায় জীব সব কিছুর উপর কার্যত প্রভুত্ব করেও সন্তুষ্ট হতে পারে না, অবশ্য কোন অবস্থাতেই সে প্রভু হতে পারে না, এবং তাই সে তার সব চেয়ে নিকট আত্মীয়দেরও প্রতারণা করে বা তাদের দ্বারা প্রতারিত হয়। এই ধরনের অপ্রীতিকর অবস্থায় পিতা-পুত্র অথবা পতি-পত্নীর মধ্যেও কোনও সামঞ্জস্যবোধ বা ঐকমত্য থাকতে পারে না।

কিন্তু একটি উপায়ে এই সমস্ত সমস্যার সমাধান করা যায়, এবং তা হচ্ছে ভক্তিযোগে ভগবানের প্রেমময়ী সেবা। ভগবদ্ভক্তির দ্বারা পাল্টা প্রতিরোধের মাধ্যমেই কেবল কপটতা, ছলনা এবং প্রবঞ্চনার জগতকে প্রতিহত করা যায়, অন্য আর কোন উপায়ে তা সম্ভব নয়।

এই সমস্ত বৈষম্য দর্শন করে যুধিষ্ঠির মহারাজ অনুমান করেছিলেন যে, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এই পৃথিবী থেকে অপ্রকট হয়েছেন।

শ্লোক ৫

নিমিত্তান্যত্যরিষ্টানি কালে ত্বনুগতে নৃণাম্ ।
লোভাদ্যধর্মপ্রকৃতিং দৃষ্ট্বোবাচানুজং নৃপঃ ॥ ৫ ॥

নিমিত্তানি—কারণসমূহ; **অতি**—অত্যন্ত; **অরিষ্টানি**—অশুভ লক্ষণ; **কালে**—যথাসময়ে; **তু**—কিন্তু; **অনুগতে**—গত হওয়ায়; **নৃণাম্**—জনসাধারণের; **লোভ-আদি**—লোভ ইত্যাদি; **অধর্ম**—অধর্ম; **প্রকৃতিম্**—স্বভাব-প্রকৃতি; **দৃষ্ট্বা**—দর্শন করে; **উবাচ**—বলেছিলেন; **অনুজম্**—ছোট ভাই; **নৃপঃ**—রাজা।

অনুবাদ

কালক্রমে, এমন হয়ে উঠল যে, লোকেরা মোটামুটি লোভ, ক্রোধ আর দম্ভে রপ্ত হয়ে পড়েছিল। এই সব অশুভ লক্ষণাদি দেখে যুধিষ্ঠির মহারাজ তাঁর ছোট ভাইকে বললেন।

তাৎপর্য

এমন পুণ্যবান রাজা যুধিষ্ঠির সমাজে লোভ, ক্রোধ, প্রতারণা-আদি অমানবিক লক্ষণাদির প্রাদুর্ভাব হতে দেখে তৎক্ষণাৎ বিচলিত বোধ করলেন। এই বিবরণ থেকে বোঝা যায় যে, অধঃপতিত সমাজের এই সমস্ত দুর্লক্ষণাদি সেই সময়ে মানুষের কাছে ছিল অজানা এবং কলহের যুগ, কলিযুগের অভ্যুত্থানের সঙ্গে সঙ্গে এগুলির অভিজ্ঞতা তাদের কাছে বিস্ময়কর বোধ হয়েছিল।

শ্লোক ৬

যুধিষ্ঠির উবাচ
সম্প্রেষিতো দ্বারকায়াং জিষ্ণুর্বন্ধুদিদৃক্ষয়া ।
জ্ঞাতুঞ্চ পুণ্যশ্লোকস্য কৃষ্ণস্য চ বিচেষ্টিতম্ ॥ ৬ ॥

যুধিষ্ঠির উবাচ—মহারাজ যুধিষ্ঠির বললেন; সম্প্রেষিতঃ—প্রেরিত হয়েছে; দ্বারকায়াম্—দ্বারকায়; জিষ্ণুঃ—অর্জুন; বন্ধু—সখাদের; দিদৃক্ষয়া—দর্শন করার জন্য; জ্ঞাতুম্—জানবার জন্য; চ—ও; পুণ্য-শ্লোকস্য—পরমেশ্বর ভগবানের; কৃষ্ণস্য—শ্রীকৃষ্ণের; চ—এবং; বিচেষ্টিতম্—কর্মসূচী।

অনুবাদ

মহারাজ যুধিষ্ঠির তাঁর ছোট ভাই ভীমসেনকে বললেন, আমি অর্জুনকে তার বন্ধুদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করার জন্য এবং পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের কর্মসূচী জানবার জন্য দ্বারকায় পাঠিয়েছিলাম।

শ্লোক ৭

গতাঃ সপ্তাধুনা মাসা ভীমসেন তবানুজঃ ।
নায়াতি কস্য বা হেতোর্নাহং বেদেদমঞ্জসা ॥ ৭ ॥

গতাঃ—গিয়েছে; সপ্ত—সাত; অধুনাঃ—আজ অবধি; মাসাঃ—মাস; ভীমসেন—হে ভীমসেন; তব—তোমার; অনুজঃ—ছোট ভাই; ন—না; আয়াতি—প্রত্যাবর্তন; কস্য—কি জন্য; বা—অথবা; হেতোঃ—কারণে; ন—না; অহম্—আমি; বেদ—জানা; ইদম্—এই; অঞ্জসা—সম্যক্‌রূপে।

অনুবাদ

সাত মাস হয়ে গেল সে গেছে, তবু এখনও সে ফিরে এল না। সেখানে কি হচ্ছে, তা আমি কিছুই জানতে পারছি না।

শ্লোক ৮

অপি দেবর্ষিণাদিষ্টঃ স কালোঽয়মুপস্থিতঃ ।
যদাত্মনোঽঙ্গমাক্রীড়ং ভগবানুৎসিসৃক্ষতি ॥ ৮ ॥

অপি—যদিও; দেব-ঋষিণাঃ—দেবর্ষি নারদের দ্বারা; আদিষ্টঃ—উপদিষ্ট হয়ে; সঃ—সেই; কালঃ—মহাকাল; অয়ম্—এই; উপস্থিতঃ—উপস্থিত হয়েছে; যদা—যখন; আত্মনঃ—তাঁর নিজের; অঙ্গম্—অঙ্গ; আক্রীড়ম্—প্রকটলীলা সাধনের জন্য; ভগবান্—পরমেশ্বর ভগবান; উৎসিসৃক্ষতি—ত্যাগ করবেন।

অনুবাদ

দেবর্ষি নারদ যে বলেছিলেন, পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাঁর জড়জাগতিক লীলা সংবরণ করবেন, সেই সময় কি এখনই উপস্থিত হয়েছে? ভগবান কি পৃথিবী থেকে অপ্রকট হতে চলেছেন?

তাৎপর্য

আমরা পূর্বে যে বহুবার আলোচনা করেছি, পরম পুরুষোত্তম ভগবান শ্রীকৃষ্ণের বহু অবতার রয়েছেন, এবং তাঁরা প্রত্যেকেই যদিও সমশক্তিসম্পন্ন, তথাপি তাঁরা বিভিন্ন ক্রিয়া সম্পাদন করে থাকেন। ভগবদ্গীতায় ভগবানের বিভিন্ন বিভূতি রয়েছে, এবং এই বিভূতিগুলির প্রত্যেকটি তাঁর বিভিন্ন অংশ এবং অংশাংশের বর্ণনার জন্য রচিত। যেমন *ভগবদ্গীতা* য় পরমেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন—"যখন ধর্মের গ্লানি হয়, এবং অধর্মের অভ্যুত্থান হয়, হে ভারত, তখন আমি অবতরণ করি।" (ভঃ গীঃ ৪/৭)

"সাধুদের পরিত্রাণের জন্য, দুষ্কৃতকারীদের বিনাশ করার জন্য এবং ধর্মের পুনঃ প্রতিষ্ঠা করার জন্য, আমি যুগে যুগে আবির্ভূত হই।" (ভঃ গীঃ ৪/৮)

"আমি যদি কর্মে বিরত হই, তা হলে সমগ্র মানব সমাজ বিপথগামী হবে। আমি অবাঞ্ছিত জনগণ সৃষ্টি অর্থাৎ বর্ণসঙ্করেরও কারণ হব, এবং তার দ্বারা আমি সমস্ত শান্তিপূর্ণ সদাচারী জীবের শান্তি নষ্ট করে ফেলব।" (ভঃ গীঃ ৩/২৪)

"কোন মহাপুরুষ যা কিছু আচরণ করেন, সাধারণ লোকে তাই অনুসরণ করে। আর আদর্শ কর্মের মাধ্যমে তিনি যে আচরণ-মান উপস্থাপন করবেন, সারা জগৎ তাই মেনে চলে।" (ভঃ গীঃ ৩/২১)

ভগবানের এই সমস্ত উক্তি তাঁর বিভিন্ন অবতারের প্রসঙ্গে প্রযোজ্য, যথা— সঙ্কর্ষণ, বাসুদেব, প্রদ্যুম্ন, অনিরুদ্ধ এবং নারায়ণ। এঁরা সকলেই হচ্ছেন স্বয়ং ভগবানের চিন্ময় প্রকাশ, এবং তা সত্ত্বেও স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বিভিন্ন স্তরে তাঁর বিভিন্ন ভক্তের সঙ্গে দিব্য প্রেম বিনিময়ের লীলা-বিলাস করেন। আর, তা সত্ত্বেও তিনি ব্রহ্মার এক দিনে (অথবা ৮,৬৪,০০,০০,০০০ সৌর বৎসরে) একবার প্রতি ব্রহ্মাণ্ডে আবির্ভূত হন, এবং প্রতিটি ব্রহ্মাণ্ডে তাঁর অপ্রাকৃত লীলা ধারাবাহিকভাবে প্রদর্শন করেন। কিন্তু সেই ধারাবাহিক লীলা প্রদর্শনে শ্রীকৃষ্ণ, বাসুদেব ইত্যাদির কার্যাবলী সাধারণ মানুষের কাছে জটিল সমস্যা বলে প্রতিভাত হয়।

ভগবানের স্বীয় সত্তা এবং তাঁর অপ্রাকৃত দেহের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। তাঁর বিভিন্ন প্রকাশ, বিভিন্ন কার্যকলাপ সম্পাদন করেন। কিন্তু ভগবান যখন শ্রীকৃষ্ণ

রূপে স্বয়ং অবতরণ করেন, তখন তাঁর অন্যান্য অবতারেরাও তাঁর অচিন্ত্য শক্তি যোগমায়ার প্রভাবে তাঁর সঙ্গে যুক্ত হন, এবং তাই বৃন্দাবনের শ্রীকৃষ্ণ মথুরা অথবা দ্বারকার শ্রীকৃষ্ণ থেকে ভিন্ন।

ভগবানের *বিরাট রূপ* ও তাঁর অচিন্ত্য শক্তির প্রভাবে, তাঁর থেকে ভিন্ন। কুরুক্ষেত্রের রণাঙ্গনে তিনি যে *বিরাট রূপ* প্রদর্শন করেছিলেন, সেটি তাঁর রূপের জড় ধারণা। তাই বুঝতে হবে, যখন ব্যাধের শরাঘাতে শ্রীকৃষ্ণের আপাতদৃষ্টিতে মৃত্যু হল, তখন এই জড় জগতে তাঁর তথাকথিত জড় দেহটি ত্যাগ করলেন মাত্র।

ভগবান হলেন *কৈবল্য*, এবং তাঁর কাছে জড় এবং চিন্ময়ের কোন পার্থক্য নেই, কারণ প্রতিটি জিনিসই তাঁর থেকে সৃষ্টি হয়েছে। তাই তাঁর এক ধরনের দেহত্যাগ কিংবা অন্য আর একটি শরীর গ্রহণের বিষয়টি থেকে বোঝায় না যে, তিনি কোন সাধারণ জীবসত্তারই মতো। তাঁর ঐ সমস্ত কার্যকলাপই তাঁর অচিন্ত্য শক্তির প্রভাবে একাধারে ভেদ এবং অভেদ ভাব সমন্বিত।

যুধিষ্ঠির মহারাজ যখন তাঁর তিরোভাবের সম্ভাবনা বিবেচনা করে অনুতাপ করছিলেন, সেটি ছিল অতি প্রিয় বন্ধুর বিচ্ছেদের অনুশোচনার একটা প্রচলিত রীতি মাত্র, কিন্তু বাস্তবিকই ভগবান কখনও তাঁর চিন্ময় দেহ ত্যাগ করেন না। কিন্তু অল্পবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষেরা তা জানে না। ভগবান স্বয়ং এই ধরনের মূঢ়দের *ভগবদ্গীতায়* তিরস্কার করেছেন।

ভগবানের তথাকথিত দেহত্যাগের অর্থ হচ্ছে যে, তিনি কোন বিশেষ অপ্রাকৃত ধামে তাঁর লীলা সংবরণ করলেন, ঠিক যেভাবে তিনি এই জড় জগতে তাঁর *বিরাট রূপটি* পরিত্যাগ করেছিলেন।

শ্লোক ৯

যস্মান্নঃ সম্পদো রাজ্যং দারাঃ প্রাণাঃ কুলং প্রজাঃ ।
আসন্ সপত্নবিজয়ো লোকাশ্চ যদনুগ্রহাৎ ॥ ৯ ॥

যস্মাৎ—যার থেকে; **নঃ**—আমাদের; **সম্পদঃ**—ঐশ্বর্য; **রাজ্যম্**—রাজ্য; **দারাঃ**—গুণবতী পত্নীসমূহ; **প্রাণাঃ**—জীবনের অস্তিত্ব; **কুলম্**—বংশ; **প্রজাঃ**—প্রজা; **আসন্**—সম্ভব হয়েছে; **সপত্ন**—প্রতিযোগীরা; **বিজয়ঃ**—বিজিত হয়েছে; **লোকাঃ**—উচ্চতর গ্রহলোকে বাস করার সম্ভাবনা; **চ**—এবং; **যৎ**—যাঁর; **অনুগ্রহাৎ**—অনুগ্রহ থেকে।

অনুবাদ

তাঁর কাছ থেকেই আমাদের যাবতীয় রাজকীয় ঐশ্বর্য সমৃদ্ধি সম্পদ, রাজ্যপাট, গুণবতী স্ত্রী, জীবকুল, বংশানুক্রম, প্রজাপালন, শত্রুজয়, এবং উচ্চতর গ্রহলোকাদির মধ্যে ভবিষ্যৎ সংস্থান লাভের সম্ভাবনা সব কিছুই অর্জন করেছি। এই সবই আমাদের প্রতি তাঁর অহৈতুকী কৃপার ফলেই হয়েছে।

তাৎপর্য

জড়জাগতিক সমৃদ্ধির মধ্যে থাকে ভাল স্ত্রী, ভাল গৃহ-পরিবার, যথেষ্ট ভূ-সম্পত্তি, সুসন্তানাদি, সম্ভ্রান্ত পারিবারিক আত্মীয় পরিজন, প্রতিদ্বন্দ্বী বিজয়, এবং পুণ্যকর্মের মাধ্যমে উচ্চতর গ্রহলোকে স্বর্গ সুখ ভোগের আরও সুযোগ লাভ। কেবলমাত্র কঠোর পরিশ্রম অথবা অসৎ উপায়ের দ্বারা এই সমস্ত সুখ-সুবিধাগুলি অর্জন করা যায় না, এই সব লাভ হয় কেবল পরমেশ্বর ভগবানের অনুগ্রহের ফলে। মানুষের আপন প্রচেষ্টার ফলে যে সমৃদ্ধি লাভ হয়, তাও নির্ভর করে ভগবানের অনুগ্রহের উপর।

ভগবানের আশীর্বাদের সঙ্গে নিজের প্রচেষ্টারও অবশ্য প্রয়োজন, কিন্তু ভগবানের কৃপা ছাড়া কেবলমাত্র নিজের প্রচেষ্টার দ্বারাই কখনও কেউ সফল হতে পারে না। কলিযুগের আধুনিকতাসম্পন্ন মানুষ নিজের চেষ্টাতেই বিশ্বাস রাখে এবং পরমেশ্বর ভগবানের অনুগ্রহ অগ্রাহ্য করে। এমন কি ভারতবর্ষের একজন প্রখ্যাত সন্ন্যাসী শিকাগোর একটি ধর্মসভায় পরমেশ্বর ভগবানের করুণার প্রতিবাদ করে ভাষণ দিয়েছিলেন।

কিন্তু বৈদিক শাস্ত্রাদিতে, বিশেষ করে শ্রীমদ্ভাগবতের, পৃষ্ঠায় পৃষ্ঠায় আমরা দেখতে পাই যে, চরমে সমস্ত প্রচেষ্টার সাফল্যের চাবিকাঠি থাকে পরমেশ্বর ভগবানেরই হাতে।

মহারাজ যুধিষ্ঠির এই সত্য তাঁর নিজের সাফল্যের ক্ষেত্রে স্বীকার করেছেন, এবং তাই তাঁর মতো মহান্ রাজা এবং ভগবদ্ভক্তের পদাঙ্ক অনুসরণ করার মাধ্যমেই জীবনে পরিপূর্ণ সাফল্য লাভ করা সম্ভব।

ভগবানের অনুমোদন ব্যতিরেকে যদি সাফল্য লাভ করা যেত, তা হলে কোন ডাক্তারই রোগীর রোগ নিরাময়ে ব্যর্থ হতেন না। সব চেয়ে সুদক্ষ চিকিৎসকেরা কেন তা হলে সব চেয়ে উন্নত চিকিৎসা ব্যবস্থার দ্বারাও রোগীদের মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা করতে পারছেন না, আবার কোন ক্ষেত্রে, বিনা চিকিৎসায় ভয়ঙ্কর রোগাক্রান্ত মানুষ সুনিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা পাচ্ছেন?

সুতরাং সিদ্ধান্ত হচ্ছে এই যে, শুভ বা অশুভ, উভয় পরিণতিই নির্ভর করে ভগবানের অনুমোদনের উপর। প্রতিটি সফল মানুষেরই কর্তব্য হচ্ছে, সে যা কিছু অর্জন করেছে, তার জন্য পরমেশ্বর ভগবানের প্রতি কৃতজ্ঞতা বোধ করা।

শ্লোক ১০

পশ্যোৎপাতান্নরব্যাঘ্র দিব্যান্ ভৌমান্ সদৈহিকান্ ।
দারুণান্ শংসতোঽদূরাদ্ভয়ং নো বুদ্ধিমোহনম্ ॥ ১০ ॥

পশ্য—দেখ; **উৎপাতান্**—অমঙ্গল সমূহ; **নর-ব্যাঘ্র**—হে ব্যাঘ্রবৎ শক্তিসম্পন্ন মানুষ; **দিব্যান্**—গগনমণ্ডলের ঘটনাবলী অথবা নক্ষত্রের দ্বারা প্রভাবিত ঘটনাবলী; **ভৌমান্**—পৃথিবীর ঘটনাবলী; **স-দৈহিকান্**—দেহ এবং মনের ঘটনাবলী; **দারুণান্**—ভয়ঙ্কর বিপজ্জনক; **শংসতঃ**—ইঙ্গিত করছে; **অদূরাৎ**—অদূর ভবিষ্যতে; **ভয়ম্**—বিপদ; **নঃ**—আমাদের; **বুদ্ধি**—বুদ্ধি; **মোহনম্**—ভ্রান্তিকর।

অনুবাদ

দেখ দেখ, হে নরব্যাঘ্র, গ্রহনক্ষত্রাদির প্রভাবজনিত (আধিদৈবিক), জাগতিক প্রতিক্রিয়া সম্ভূত (আধিভৌতিক), এবং দৈহিক যন্ত্রণাদি থেকে উদ্ভূত (আধ্যাত্মিক) কত রকমের ভয়ঙ্কর উৎপাত উপস্থিত হয়েছে, যা আমাদের বুদ্ধিকে আচ্ছন্ন করে অদূর ভবিষ্যতের বিপদাশঙ্কার ইঙ্গিত দিচ্ছে।

তাৎপর্য

সভ্যতার জড়জাগতিক উন্নতি মানে হচ্ছে, আধিদৈবিক, আধিভৌতিক এবং আধ্যাত্মিক প্রভাবজনিত ত্রিতাপ দুঃখেরই প্রগতি। গ্রহ-নক্ষত্রাদির আধিদৈবিক প্রভাবজনিত বহু প্রকার দুঃখ-দুর্দশা রয়েছে, যেমন, অত্যধিক তাপ, শীত, অতিবৃষ্টি অথবা অনাবৃষ্টি এবং তার পরিণামে দুর্ভিক্ষ, রোগব্যাধি এবং মহামারী। তার চরম পরিণামে দেহ এবং মনের বিষম যন্ত্রণা মানুষ ভোগ করে।

মানুষের জড় বিজ্ঞানের প্রগতি এই ত্রিতাপ দুঃখ দূরীভূত করার ব্যাপারে কিছুই করতে পারে না। এগুলি হচ্ছে পরমেশ্বর ভগবানের নির্দেশে মায়ার প্রভাবে জীবের দণ্ডভোগ। তাই ভগবদ্ভক্তির প্রভাবে নিরন্তর ভগবানের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত হওয়ার ফলেই কেবল আমরা এই সমস্ত দুঃখ-দুর্দশার হাত থেকে মুক্ত হয়ে নির্বিঘ্নে আমাদের মানবিক কর্তব্যকর্ম সম্পাদন করতে পারি।

অসুরেরা অবশ্য ভগবানের অস্তিত্বে বিশ্বাস করে না। তাই, ভগবানকে অস্বীকার করে তারা এই ত্রিতাপ দুঃখ থেকে মুক্ত হওয়ার উদ্দেশ্যে নিজেরাই নানা রকম পরিকল্পনা করে, এবং প্রতি পদক্ষেপে তারা অকৃতকার্য হয়। *ভগবদ্গীতায়* (৭/১৪) ভগবান স্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছেন যে, ত্রিগুণময়ী জড়া প্রকৃতির প্রভাব অতিক্রম করা অসম্ভব। কেবল ভক্তিভাবের মাধ্যমে ভগবানের শ্রীপাদপদ্মের শরণাগত হওয়ার দ্বারা সেই প্রভাব থেকে সহজেই মুক্ত হওয়া যায়।

শ্লোক ১১

উর্বক্ষিবাহবো মহ্যং স্ফুরন্ত্যঙ্গ পুনঃ পুনঃ ।
বেপথুশ্চাপি হৃদয়ে আরাদ্দাস্যন্তি বিপ্রিয়ম্ ॥ ১১ ॥

উরু—উরু; **অক্ষি**—চক্ষু; **বাহবঃ**—বাহুদ্বয়; **মহ্যম্**—আমার; **স্ফুরন্তি**—কম্পিত হচ্ছে; **অঙ্গ**—শরীরের বাম অঙ্গ; **পুনঃ পুনঃ**—বারবার; **বেপথুঃ**—কম্পিত হচ্ছে; **চ**—ও; **অপি**—অবশ্যই; **হৃদয়ে**—হৃদয়ে; **আরাৎ**—ভয়ে; **দাস্যন্তি**—ইঙ্গিত করছে; **বিপ্রিয়ম্**—অবাঞ্ছিত অমঙ্গল।

অনুবাদ

আমার বাম উরু, বাম নয়ন ও বাম বাহু সবই বারংবার স্পন্দিত হচ্ছে। আশঙ্কায় আমার হৃদয়ও বারংবার কম্পিত হচ্ছে। এই সমস্তই অবাঞ্ছিত অমঙ্গলের সূচনা ইঙ্গিত করছে।

তাৎপর্য

জড়জাগতিক অস্তিত্ব অবাঞ্ছিত বিষয়ে পরিপূর্ণ। যে সব জিনিস আমরা কামনা করি না, কোন না কোন উচ্চতর শক্তির প্রভাবে সেগুলি জোর করে আমাদের জীবনে আরোপিত হয়, এবং আমরা দেখতে পাই না যে, এই সমস্ত অবাঞ্ছিত ব্যাপারগুলি সবই জড়া প্রকৃতির তিনটি গুণের অধীন। যখন মানুষের চোখ, হাত আর উরু বার বার কম্পিত হয়, তখন বুঝতে হবে যে, কোন অমঙ্গলজনক ঘটনা ঘটতে যাচ্ছে। এই সমস্ত অবাঞ্ছিত ঘটনাগুলিকে দাবানলের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। কেউই বনে আগুন লাগাতে যায় না, কিন্তু আপনা থেকেই বনে আগুন জ্বলে ওঠে এবং বনের সমস্ত প্রাণীদের অচিন্তনীয় দুঃখ-দুর্দশার সৃষ্টি করে। মানুষের কোন চেষ্টাই এই অগ্নি নির্বাপণ করতে পারে না। ভগবানের কৃপার প্রভাবেই কেবল সেই অগ্নি নির্বাপণ করা যেতে পারে, তিনি মেঘ পাঠিয়ে দেন অরণ্যে জল ঢালবার জন্যে।

তেমনই, কোন রকম পরিকল্পনার দ্বারা মানুষ তার অবাঞ্ছিত ঘটনাপ্রসূত ত্রিতাপ দুঃখের নিবৃত্তি সাধন করতে পারে না। ভগবানের কৃপার প্রভাবেই কেবল সেই সমস্ত দুঃখ-দুর্দশা দূরীভূত হতে পারে, যিনি তাঁর প্রতিনিধিকে পাঠান মানুষদের দিব্য জ্ঞান প্রদান করার জন্য এবং তার ফলে তাদের সমস্ত দুঃখ-দুর্দশা থেকে তারা মুক্ত হতে পারে।

শ্লোক ১২

শিবৈষোদ্যন্তমাদিত্যমভিরৌত্যনলাননা ।
মামঙ্গ সারমেয়োঽয়মভিরেভত্যভীরুবৎ ॥ ১২ ॥

শিবা—শৃগাল; **এষা**—এই; **উদ্যন্তম্**—উদিত হচ্ছে; **আদিত্যম্**—সূর্য; **অভি**—অভিমুখে; **রৌতি**—ক্রন্দন করছে; **অনল**—অগ্নি; **আননা**—মুখ; **মাম্**—আমার প্রতি; **অঙ্গ**—হে ভীম; **সারমেয়ঃ**—কুকুর; **অয়ম্**—এই; **অভিরেভতি**—ডাকছে; **অভিরুবৎ**—ভয়শূন্য হয়ে।

অনুবাদ

হে ভীম, ঐ দেখ, এই শৃগালী মুখ থেকে অনল উদ্গার করতে করতে উদীয়মান সূর্যের দিকে তাকিয়ে বিকট আর্তনাদ করছে আর এই কুকুরটা নির্ভয় চিত্তে আমার দিকে তাকিয়ে বিকট ভাবে শব্দ করছে।

তাৎপর্য

অদূর ভবিষ্যতে অবাঞ্ছিত কিছু ঘটনা ঘটার অশুভ ইঙ্গিত এগুলি।

শ্লোক ১৩

শস্তাঃ কুর্বন্তি মাং সব্যং দক্ষিণং পশবোঽপরে ।
বাহাংশ্চ পুরুষব্যাঘ্র লক্ষয়ে রুদতো মম ॥ ১৩ ॥

শস্তাঃ—গাভী আদি উপকারী জন্তু; **কুর্বন্তি**—রেখে; **মাম্**—আমাকে; **সব্যম্**—বাম দিকে; **দক্ষিণম্**—প্রদক্ষিণরত; **পশবঃ অপরে**—গর্দভ আদি নিম্নযোনির অশুভ পশুরা; **বাহান্**—অশ্বগণ (বহনকারী); **চ**—ও; **পুরুষ-ব্যাঘ্র**—হে পুরুষ শ্রেষ্ঠ; **লক্ষয়ে**—আমি দেখছি; **রুদতঃ**—রোদন করছে; **মম**—আমার।

অনুবাদ

হে ভীমসেন, পুরুষব্যাঘ্র, এখন গাভীদের মতো উপকারী পশুরা আমার বাম দিক দিয়ে চলে যাচ্ছে, এবং গর্দভদের মতো, নিম্নযোনির অশুভ পশুরা আমাকে প্রদক্ষিণ করছে। আমার অশ্বগণ যেন আমাকে দেখে রোদন করছে বলে মনে হচ্ছে।

শ্লোক ১৪

মৃত্যুদূতঃ কপোতোহয়মুলূকঃ কম্পয়ন্ মনঃ ।
প্রত্যুলূকশ্চ কুহ্বানৈর্বিশ্বং বৈশূন্যমিচ্ছতঃ ॥ ১৪ ॥

মৃত্যুদূত—যমদূত; কপোতঃ—পায়রা; অয়ম্—এই; উলূকঃ—পেঁচা; কম্পয়ন্—কম্পিত; মনঃ—মন; প্রত্যুলূকঃ—পেঁচার প্রতিদ্বন্দ্বী (কাক); চ—এবং; কুহ্বানৈঃ—কুৎসিত চিৎকার; বিশ্বম্—বিশ্ব; বৈ—উভয়েই; শূন্যম্—শূন্য; ইচ্ছতঃ—ইচ্ছা করছে।

অনুবাদ

দেখ! এই পায়রাটিকে যেন যমদূত বলে মনে হচ্ছে। পেঁচা এবং তার প্রতিদ্বন্দ্বী কাকের কর্কশ স্বরে আমার হৃদয় কম্পিত হচ্ছে। মনে হচ্ছে, তারা যেন সারা বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডকে শূন্য করে ফেলতে চাইছে।

শ্লোক ১৫

ধূম্রা দিশঃ পরিধয়ঃ কম্পতে ভূঃ সহাদ্রিভিঃ ।
নির্ঘাতশ্চ মহাংস্তাত সাকঞ্চ স্তনয়িত্নুভিঃ ॥ ১৫ ॥

ধূম্রাঃ—ধূমায়িত; দিশঃ—সমস্ত দিক; পরিধয়ঃ—আবৃত; কম্পতে—কম্পিত হচ্ছে; ভূঃ—পৃথিবী; সহ অদ্রিভিঃ—পাহাড়-পর্বতাদি সহ; নির্ঘাত—বিনা মেঘে বজ্রপাত; চ—ও; মহান্—বিপুল; তাত—হে ভীম; সাকম্—সহ; চ—ও; স্তনয়িত্নুভিঃ—বিনা মেঘে বজ্র গর্জন।

অনুবাদ

দেখ, ধূম্র কিভাবে আকাশে ঘুরে বেড়াচ্ছে। মনে হচ্ছে যেন পৃথিবী আর পাহাড়-পর্বত কাঁপছে। শোন, বিনা মেঘে বজ্রপাত হচ্ছে এবং দেখ, নীল আকাশ থেকে বিদ্যুৎ নেমে আসছে।

শ্লোক ১৬

বায়ুর্বাতি খরস্পর্শো রজসা বিসৃজংস্তমঃ ।
অসৃগ্‌বর্ষন্তি জলদা বীভৎসমিব সর্বতঃ ॥ ১৬ ॥

বায়ুঃ—বায়ু; বাতি—প্রবাহিত হচ্ছে ; খর-স্পর্শঃ—প্রচণ্ড; রজসা—ধূলির দ্বারা; বিসৃজন্—সৃষ্টি করে; তমঃ—অন্ধকার; অসৃক্—রক্ত; বর্ষন্তি—বর্ষণ করছে; জলদা—মেঘ সমূহ; বীভৎসম্—বীভৎস, ইব—রূপে; সর্বতঃ—সর্বত্র।

অনুবাদ

ধূলিরাশিতে দিগন্ত অন্ধকার করে প্রচণ্ড বেগে বায়ু প্রবাহিত হচ্ছে। মেঘসমূহ অতি বীভৎসরূপে চতুর্দিকে রক্ত বর্ষণ করছে।

শ্লোক ১৭

সূর্যং হতপ্রভং পশ্য গ্রহমর্দং মিথো দিবি ।
সসঙ্কুলৈর্ভূতগণৈর্জ্বলিতে ইব রোদসী ॥ ১৭ ॥

সূর্যম্—সূর্য; হত-প্রভম্—নিষ্প্রভ; পশ্য—দেখ; গ্রহ-মর্দম্—গ্রহগণের সংঘর্ষ; মিথঃ—পরস্পর; দিবি—আকাশে; স-সঙ্কুলৈঃ—মিশ্রিত হয়ে; ভূত-গণৈঃ—প্রাণীগণ; জ্বলিতে—জ্বলন্ত ; ইব—যেন; রোদসী—ক্রন্দন করছে।

অনুবাদ

সূর্যকিরণ নিষ্প্রভ হয়ে যাচ্ছে, এবং আকাশে গ্রহ-নক্ষত্রগুলি পরস্পর যুদ্ধ করছে বলে মনে হচ্ছে। বিভ্রান্ত প্রাণীরা যেন অগ্নিতে প্রজ্বলিত হয়ে ক্রন্দন করছে।

শ্লোক ১৮

নদ্যো নদাশ্চ ক্ষুভিতাঃ সরাংসি চ মনাংসি চ ।
ন জ্বলত্যগ্নিরাজ্যেন কালোঽয়ং কিং বিধাস্যতি ॥ ১৮ ॥

নদ্যঃ—নদীসমূহ; নদাঃ চ—এবং শাখানদীসমূহ; ক্ষুভিতাঃ—ক্ষুব্ধ; সরাংসি—সরোবরগুলি; চ—এবং; মনাংসি—মন; চ—ও; ন—করে না; জ্বলতি—প্রজ্বলিত; অগ্নিঃ—অগ্নি; আজ্যেন—ঘি ঢালা সত্ত্বেও; কালঃ—কাল; অয়ম্—এই অসাধারণ; কিম্—কি; বিধাস্যতি—বিধান করবে।

অনুবাদ

নদ, নদী, সরোবর, জলাশয়াদি এবং মন সবই বিক্ষুব্ধ হচ্ছে। ঘৃতাহুতি প্রদানেও অগ্নি আর প্রজ্বলিত হচ্ছে না। এ কি দুঃসময়? জানি না, কি ঘটতে চলেছে?

শ্লোক ১৯

ন পিবন্তি স্তনং বৎসা ন দুহ্যন্তি চ মাতরঃ ।
রুদন্ত্যশ্রুমুখা গাবো ন হৃষ্যন্ত্যৃষভা ব্রজে ॥ ১৯ ॥

ন—করে না; পিবন্তি—পান; স্তনম্—স্তন; বৎসাঃ—বৎসগণ; দুহ্যন্তি—দুগ্ধক্ষরণ; চ—ও; মাতরঃ—গাভীগণ; রুদন্তি—ক্রন্দন করছে; অশ্রুমুখাঃ—অশ্রুমুখী হয়ে; গাবঃ—গাভীগণ; ন—করে না; হৃষ্যন্তি—আনন্দিত হয়ে; ঋষভাঃ—বৃষগণ; ব্রজে—গোচারণ ভূমিতে।

অনুবাদ

গোবৎসগণ আর গোমাতার স্তন পান করছে না; গাভীদের স্তন থেকেও আর দুগ্ধধারা বিগলিত হচ্ছে না। তারা অশ্রুমুখী হয়ে দাঁড়িয়ে থেকে রোদন করছে, এবং গোচারণ ভূমিতে বৃষগণও আর আনন্দ প্রকাশ করছে না।

শ্লোক ২০

দৈবতানি রুদন্তীব স্বিদ্যন্তি হ্যুচ্চলন্তি চ ।
ইমে জনপদা গ্রামাঃ পুরোদ্যানাকরাশ্রমাঃ ।
ভ্রষ্টশ্রিয়ো নিরানন্দাঃ কিমঘং দর্শয়ন্তি নঃ ॥ ২০ ॥

দৈবতানি—মন্দিরের দেবপ্রতিমাগুলি; রুদন্তি—মনে হচ্ছে ক্রন্দন করছেন; ইব—যেন; স্বিদ্যন্তি—ঘর্মাক্ত কলেবর হয়ে; হি—অবশ্যই; উচ্চলন্তি—যেন স্থান ত্যাগ করে চলে যাচ্ছেন; চ—ও; ইমে—এই সমস্ত; জনপদাঃ—নগরীগুলি; গ্রামাঃ—গ্রামসমূহ; পুর—শহরাদি; উদ্যান—উদ্যানাদি; আকর—খনিগুলি; আশ্রমাঃ—আশ্রমসমূহ; ভ্রষ্ট—রহিত; শ্রিয়ঃ—সৌন্দর্য, নিরানন্দাঃ—আনন্দহীন; কিম্—কত রকম; অঘম্—দুঃখ-দুর্দশা; দর্শয়ন্তি—দর্শন করাবে; নঃ—আমাদের।

অনুবাদ

মন্দিরে দেবপ্রতিমাগুলি যেন ঘর্মাক্ত কলেবরে রোদন করছেন। তাঁরা যেন স্থান ত্যাগ করে চলে যেতে উদ্যত হয়েছেন। এই সমস্ত শহর, জনপদ, গ্রামগঞ্জ, খনিখামার, উদ্যান-আশ্রমাদি সবই যেন এখন শ্রী-ভ্রষ্ট এবং নিরানন্দ হয়েছে। জানি না, আরও কত বিপর্যয় আমাদের জন্যে প্রতীক্ষা করে আছে।

শ্লোক ২১

মন্য এতৈর্মহোৎপাতৈর্নূনং ভগবতঃ পদৈঃ ।
অনন্যপুরুষশ্রীভির্হীনা ভূর্হতসৌভগা ॥ ২১ ॥

মন্যে—আমি নিশ্চিতভাবে মনে করি; এতৈঃ—এই সমস্ত; মহা—ভীষণ; উৎপাতৈঃ—উৎপাত; নূনম্—অভাবে; ভগবতঃ—পরমেশ্বর ভগবানের; পদৈঃ—শ্রীপাদপদ্মের শুভ চিহ্নসমূহ; অনন্য—অসাধারণ; পুরুষ—পরমেশ্বর ভগবানের; শ্রীভিঃ—শুভ চিহ্ন দ্বারা; হীনা—বিহীন; ভূ—পৃথিবী; হতসৌভগা—সৌভাগ্যহীনা।

অনুবাদ

এই সমস্ত অশুভ লক্ষণ দর্শন করে আমার মনে হচ্ছে যে, আজ পৃথিবীর সৌভাগ্য বিনষ্ট হয়েছে। পরমেশ্বর ভগবানের পাদপদ্মের চরণচিহ্নে চিহ্নিত হওয়ার সৌভাগ্য অর্জন করেছিল ধরিত্রী। এই সব লক্ষণাদি নির্দেশ করছে যে, তা আর থাকবে না।

শ্লোক ২২

ইতি চিন্তয়তস্তস্য দৃষ্টারিষ্টেন চেতসা ।
রাজ্ঞঃ প্রত্যাগমদ্ ব্রহ্মন্ যদুপুর্যাঃ কপিধ্বজঃ ॥ ২২ ॥

ইতি—এইভাবে; চিন্তয়তঃ—চিন্তা করছিলেন; তস্য—তাঁর; দৃষ্টা—দর্শন করে; অরিষ্টেন—অশুভ লক্ষণসমূহ; চেতসা—মনের দ্বারা; রাজ্ঞঃ—রাজা; প্রত্যাগমদ্—প্রত্যাগমন করলেন; ব্রহ্মন্—হে ব্রাহ্মণ; যদুপুর্যাঃ—যদুপুরী দ্বারকা থেকে; কপিধ্বজঃ—অর্জুন।

অনুবাদ

হে ব্রাহ্মণ শৌনক, পৃথিবীতে সেই সময়ে এই সমস্ত অশুভ লক্ষণ দর্শন করে মহারাজ যুধিষ্ঠির যখন অত্যন্ত দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়েছিলেন, তখন অর্জুন দ্বারকাপুরী থেকে ফিরে এলেন।

শ্লোক ২৩

তং পাদয়োর্নিপতিতমযথাপূর্বমাতুরম্ ।
অধোবদনমব্বিন্দূন্ সৃজন্তং নয়নাব্জয়োঃ ॥ ২৩ ॥

তম্—তাঁকে (অর্জুনকে); পাদয়োঃ—চরণতলে; নিপতিতম্—প্রণত; অযথাপূর্বম্—পূর্বরীতির ব্যতিক্রমে; আতুরম্—কাতর; অধোবদনম্—অধোমুখ; অপ্-বিন্দূন্—অশ্রুবিন্দু; সৃজন্তম্—সৃষ্টি করে; নয়নাব্জয়োঃ—কমলসদৃশ চক্ষু থেকে।

অনুবাদ

অর্জুন যখন তাঁর চরণতলে নিপতিত হলেন, তখন মহারাজ যুধিষ্ঠির লক্ষ্য করলেন যে, তাঁর কাতরভাব যেন অভূতপূর্ব। তাঁর মুখ ছিল অবনত ও নয়নকমল থেকে বিন্দু বিন্দু অশ্রু নেমে আসছিল।

শ্লোক ২৪

বিলোক্যোদ্বিগ্নহৃদয়ো বিচ্ছায়মনুজং নৃপঃ ।
পৃচ্ছতি স্ম সুহৃন্মধ্যে সংস্মরন্নারদেরিতম্ ॥ ২৪ ॥

বিলোক্য—দর্শন করে; উদ্বিগ্ন—আশঙ্কাগ্রস্ত; হৃদয়ো—হৃদয়; বিচ্ছায়ম্—কান্তিহীন; অনুজম্—ছোটভাই অর্জুন; নৃপঃ—রাজা; পৃচ্ছতি স্ম—জিজ্ঞাসা করেছিলেন; সুহৃৎ—বন্ধুদের; মধ্যে—মধ্যে; সংস্মরণ—স্মরণ করে; নারদঃ—নারদ মুনি; ইরিতম্—ইঙ্গিত।

অনুবাদ

অর্জুনকে এইভাবে হৃদয়স্পর্শী উদ্বেগ-উৎকণ্ঠায় কান্তিহীন অবস্থায় দেখে, মহারাজ যুধিষ্ঠির নারদ মুনির ইঙ্গিত স্মরণ করে সুহৃদ্‌বর্গের সমক্ষে অর্জুনকে জিজ্ঞাসা করলেন।

শ্লোক ২৫

যুধিষ্ঠির উবাচ

কচ্চিদানর্তপুর্যাং নঃ স্বজনাঃ সুখমাসতে ।
মধুভোজদশার্হার্হ সাত্বতান্ধকবৃষ্ণয়ঃ ॥ ২৫ ॥

যুধিষ্ঠিরঃ উবাচ—যুধিষ্ঠির বললেন; **কচ্চিৎ**—কিনা; **আনর্তপুর্যাম্**—দ্বারকায়; **নঃ**—আমাদের; **স্বজনাঃ**—আত্মীয়-স্বজন; **সুখম্**—সুখে; **আসতে**—বর্তমান আছেন; **মধু**—মধু; **ভোজ**—ভোজ; **দশার্হ**—দশার্হ; **আর্হ**—আর্হ; **সাত্বত**—সাত্বত; **অন্ধক**—অন্ধক; **বৃষ্ণয়ঃ**—বৃষ্ণিবংশীয় ।

অনুবাদ

মহারাজ যুধিষ্ঠির জিজ্ঞাসা করলেন—ভাই, আমাকে বল, আমাদের বন্ধুবান্ধব আর আত্মীয়-স্বজনেরা—মধু, ভোজ, দশার্হ, আর্হ, সাত্বত, অন্ধক ও বৃষ্ণিরা অর্থাৎ যদুবংশের সকলে কুশলে আছেন ত?

শ্লোক ২৬

শূরো মাতামহঃ কচ্চিৎস্বস্ত্যাস্তে বাথ মারিষঃ ।
মাতুলঃ সানুজঃ কচ্চিৎকুশল্যানকদুন্দুভিঃ ॥ ২৬ ॥

শূরঃ—শূরসেন; **মাতামহঃ**—মাতামহ; **কচ্চিৎ**—কিনা; **স্বস্তি**—মঙ্গল; **আস্তে**—আছেন; **বা**—অথবা; **অথঃ**—সুতরাং; **মারিষঃ**—মাননীয়; **মাতুলঃ**—মাতুল; **স-অনুজঃ**—কনিষ্ঠ ভ্রাতাসহ; **কচ্চিৎ**—কিনা; **কুশলী**—কুশলে; **আনক-দুন্দুভিঃ**—বসুদেব ।

অনুবাদ

আমার শ্রদ্ধেয় মাতামহ শূরসেন মঙ্গলে আছেন ত? আর, আমার মাতুল বসুদেব এবং তাঁর কনিষ্ঠ ভ্রাতারা কুশলে আছেন ত?

শ্লোক ২৭

সপ্ত স্বসারস্তৎপত্ন্যো মাতুলান্যঃ সহাত্মজাঃ ।
আসতে সস্নুষাঃ ক্ষেমং দেবকীপ্রমুখাঃ স্বয়ম্ ॥ ২৭ ॥

সপ্ত—সাত; স্ব-সারঃ—স্বীয় ভগ্নীগণ; তৎ-পত্ন্য—তাঁর পত্নীগণ; মাতুলান্যঃ—মাতুলানীরা; সহ—সহ; আত্মজাঃ—পুত্র এবং পৌত্রগণ; আসতে—আছেন; সস্নুষাঃ—পুত্রবধূগণসহ; ক্ষেমম্—সুখে; দেবকী—দেবকী; প্রমুখাঃ—প্রমুখ; স্বয়ম্—স্বয়ং।

অনুবাদ

দেবকী প্রমুখ বসুদেবের সাত পত্নী পরস্পরের প্রতি ভগ্নীভাবাপন্ন। তাঁরা সকলেই তাঁদের পুত্র ও পুত্রবধূগণসহ সুখে আছেন ত?

শ্লোক ২৮-২৯

কচ্চিদ্রাজাহুকো জীবত্যসৎপুত্রোঽস্য চানুজঃ।
হৃদীকঃ সসুতোঽক্রুরো জয়ন্তগদসারণাঃ ॥ ২৮ ॥
আসতে কুশলং কচ্চিদ্ যে চ শত্রুজিদাদয়ঃ।
কচ্চিদাস্তে সুখং রামো ভগবান্ সাত্বতাং প্রভুঃ ॥ ২৯ ॥

কচ্চিৎ—কিনা; রাজা—রাজা; আহুকঃ—উগ্রসেনের আর একটি নাম; জীবতি—বেঁচে আছেন; অসৎ—দুরাচারী; পুত্রঃ—পুত্র; অস্য—তার; চ—ও; অনুজঃ—কনিষ্ঠ ভ্রাতা; হৃদীকঃ—হৃদীক; স-সুতঃ—পুত্র কৃতবর্মাসহ; অক্রুরঃ—অক্রুর; জয়ন্তঃ—জয়ন্ত ; গদ—গদ; সারণাঃ—সারণ; আসতে—আছে; কুশলম্—সুখে; কচ্চিৎ—কিনা; যে—তারা; চ—ও; শত্রুজিৎ—শত্রুজিৎ; আদয়ঃ—প্রমুখ; কচ্চিৎ—কিনা; আস্তে—আছেন; সুখম্—সুখে; রামঃ—বলরাম; ভগবান্—পরমেশ্বর ভগবান; সাত্বতাম্—ভক্তদের; প্রভুঃ—প্রভু।

অনুবাদ

যাঁর পুত্র অত্যন্ত দুরাচারী, সেই উগ্রসেন রাজা এবং তাঁর কনিষ্ঠ সহোদর দেবক এখনও জীবিত আছেন ত? উগ্রসেন সুখে আছেন ত? হৃদীক এবং তাঁর পুত্র কৃতবর্মা, অক্রুর, জয়ন্ত, গদ, সারণ ও শত্রুজিৎ এঁরা সকলে ভাল আছেন ত? ভক্তদের প্রভু বলরাম কুশলে আছেন ত?

তাৎপর্য

পাণ্ডবদের রাজধানী হস্তিনাপুর বর্তমান দিল্লীর নিকটেই অবস্থিত ছিল, আর উগ্রসেনের রাজধানী ছিল মথুরায়। দ্বারকা থেকে দিল্লীতে (হস্তিনাপুরে) ফেরার

সময় অর্জুন নিশ্চয়ই মথুরায় গিয়েছিলেন, এবং তাই মহারাজ যুধিষ্ঠিরের পক্ষে মথুরার রাজার কুশল সংবাদ নেওয়া স্বাভাবিক। তাঁর আত্মীয়-স্বজনদের নামের মধ্যে, শ্রীকৃষ্ণের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রাম অথবা বলরামের নামের সঙ্গে 'ভগবান' শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে, কারণ শ্রীবলরাম হচ্ছেন বিষ্ণুতত্ত্ব শ্রীকৃষ্ণের প্রকাশ বিগ্রহ।

পরমেশ্বর ভগবান এক এবং অদ্বিতীয় হলেও, তিনি বহু রূপে জীবসত্তার মাঝে নিজেকে বিস্তার করেন। তার মধ্যে বিষ্ণুতত্ত্বগণ তাঁরই বিস্তার, এবং তাঁরা সকলেই গুণগতভাবে এবং আয়তনগতভাবে পরমেশ্বর ভগবানের সমান। কিন্তু তাঁর জীবশক্তির বিস্তার, সাধারণ জীবেরা, কখনই তাঁর সমকক্ষ নয়। যারা মনে করে যে, জীবশক্তি এবং বিষ্ণুতত্ত্ব সমপর্যায়ভুক্ত, তাদের পাষণ্ডী বলে বিবেচনা করা হয়।

শ্রীরাম বা বলরাম হচ্ছেন ভক্তদের প্রভু। শ্রীবলরাম সমস্ত ভক্তদের পারমার্থিক দীক্ষাগুরু এবং তাঁরই অহৈতুকী কৃপার ফলে অধঃপতিত জীবেরা উদ্ধার লাভ করে। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর লীলায় শ্রীবলরাম শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুরূপে আবির্ভূত হয়েছিলেন, এবং নিত্যানন্দ প্রভু অত্যন্ত অধঃপতিত জগাই এবং মাধাইকে উদ্ধার করে তাঁর অহৈতুকী কৃপা প্রদর্শন করেছিলেন। তাই এখানে বলরামকে বিশেষভাবে ভক্তদের প্রভু বলে উল্লেখ করা হয়েছে। তাঁর দিব্য কৃপাতেই কেবল পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের কাছে যাওয়া যায়, এবং তাই শ্রীবলরাম হচ্ছেন ভগবানের করুণার অবতার, গুরুতত্ত্ব, শুদ্ধ ভক্তদের আশ্রয়।

শ্লোক ৩০

প্রদ্যুম্নঃ সর্ববৃষ্ণীনাং সুখমাস্তে মহারথঃ ।
গম্ভীররয়োঽনিরুদ্ধো বর্ধতে ভগবানুত ॥ ৩০ ॥

প্রদ্যুম্নঃ—প্রদ্যুম্ন (শ্রীকৃষ্ণের এক পুত্র); **সর্ব**—সমস্ত; **বৃষ্ণীনাম্**—বৃষ্ণীদের মধ্যে; **সুখম্**—সুখ; **আস্তে**—আছে; **মহারথঃ**—মহান্ সেনাপতি; **গম্ভীর**—গম্ভীর; **রয়ঃ**—বীরত্ব; **অনিরুদ্ধঃ**—অনিরুদ্ধ (শ্রীকৃষ্ণের এক পৌত্র); **বর্ধতে**—বর্ধন করে; **ভগবান্**—পরমেশ্বর ভগবান; **উত**—অবশ্যই।

অনুবাদ

বৃষ্ণি বংশের মহান্ সেনাপতি প্রদ্যুম্ন কেমন আছে? আর, যুদ্ধে অতিশয় পরাক্রমশালী, ভগবানের অংশ প্রকাশ, অনিরুদ্ধ আনন্দে আছেন ত?

তাৎপর্য

প্রদ্যুম্ন এবং অনিরুদ্ধও পরমেশ্বর ভগবানের অংশ প্রকাশ, এবং তাই তাঁরাও বিষ্ণুতত্ত্ব। দ্বারকায় ভগবান বাসুদেব তাঁর অংশ প্রকাশ সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন এবং অনিরুদ্ধসহ তাঁর অপ্রাকৃত লীলাবিলাস করেন, এবং তাই তাঁদের প্রত্যেককেই পরমেশ্বর ভগবান বলে সম্বোধন করা যায়, যা এখানে অনিরুদ্ধ সম্বন্ধে করা হয়েছে।

শ্লোক ৩১

সুষেণশ্চারুদেষ্ণশ্চ সাম্বো জাম্ববতীসুতঃ ।
অন্যে চ কার্ষ্ণিপ্রবরাঃ সপুত্রা ঋষভাদয়ঃ ॥ ৩১ ॥

সুষেণঃ—সুষেণ; **চারুদেষ্ণঃ**—চারুদেষ্ণ; **চ**—এবং; **সাম্বঃ**—সাম্ব; **জাম্ববতীসুতঃ**—জাম্ববতীর পুত্র; **অন্যে**—অন্যেরা; **চ**—ও; **কার্ষ্ণি**—শ্রীকৃষ্ণের পুত্রগণ; **প্রবরাঃ**—প্রধান প্রধান; **স-পুত্রাঃ**—তাঁদের পুত্রগণসহ; **ঋষভ**—ঋষভ; **আদয়ঃ**—ইত্যাদি।

অনুবাদ

সুষেণ, চারুদেষ্ণ, জাম্ববতীর পুত্র সাম্ব এবং শ্রীকৃষ্ণের অন্যান্য প্রধান প্রধান পুত্রগণ, ঋষভাদি তাঁদের পুত্রসহ ভাল আছেন ত?

তাৎপর্য

পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে ষোল হাজার একশ আট জন মহিষীর সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের বিবাহ হয়েছিল, এবং তাঁদের প্রত্যেকের দশজন করে পুত্র ছিল। সুতরাং শ্রীকৃষ্ণের ১৬১০৮ X ১০=১,৬১,০৮০ জন পুত্র ছিল। তাঁরা সকলেই প্রাপ্তবয়স্ক হয়েছিলেন, এবং তাঁদেরও বহু সন্তান-সন্ততি ছিল। এইভাবে শ্রীকৃষ্ণের পরিবারের সদস্য সংখ্যা ছিল প্রায় ১৬,১০,৮০০।

ভগবান হচ্ছেন সমস্ত জীবের পিতা, সেই জীবসত্তার সংখ্যা অগণিত; তাই তাদের মধ্যে কেবল অল্প কয়েকজনই এই পৃথিবীতে ভগবানের অপ্রাকৃত দ্বারকা লীলায় অংশ গ্রহণ করতে পেরেছিলেন। ভগবান যে এত সদস্য সমন্বিত তাঁর বিশাল পরিবার প্রতিপালন করেছিলেন, তাতে আশ্চর্য হওয়ার কিছুই নেই।

আমাদের অবস্থার সঙ্গে ভগবানের অবস্থার তুলনা না করাই শ্রেয়। আমরা যখন ভগবানের অপ্রাকৃত মহিমা আংশিক ভাবেও হৃদয়ঙ্গম করতে পারি, তখন তাঁর লীলার সত্যতা সহজেই হৃদয়ঙ্গম করতে পারি।

মহারাজ যুধিষ্ঠির যখন দ্বারকায় শ্রীকৃষ্ণের পুত্রাদি এবং পৌত্রদের কথা জিজ্ঞাসা করছিলেন, তখন তিনি তাঁদের মধ্যে যাঁরা মুখ্য, তাঁদেরই নাম উল্লেখ করেছিলেন; কারণ ভগবানের পরিবারের সমস্ত সদস্যদের নাম স্মরণ রাখা তাঁর পক্ষে অসম্ভব ছিল।

শ্লোক ৩২-৩৩

তথৈবানুচরাঃ শৌরেঃ শ্রুতদেবোদ্ধবাদয়ঃ ।
সুনন্দনন্দশীর্ষণ্যা যে চান্যে সাত্বতর্ষভাঃ ॥ ৩২ ॥
অপি স্বস্ত্যাসতে সর্বে রামকৃষ্ণভুজাশ্রয়াঃ ।
অপি স্মরন্তি কুশলমস্মাকং বদ্ধসৌহৃদাঃ ॥ ৩৩ ॥

তথা এব—তেমনই; **অনুচরাঃ**—নিত্য পার্ষদগণ; **শৌরেঃ**—শ্রীকৃষ্ণের; **শ্রুতদেব**—শ্রুতদেব; **উদ্ধবাদয়ঃ**—উদ্ধবাদি; **সুনন্দ**—সুনন্দ; **নন্দ**—নন্দ; **শীর্ষণ্যাঃ**—শীর্ষস্থানীয় সদস্যগণ; **যে**—তাঁরা সকলে; **চ**—এবং; **অন্যে**—অন্যরা; **সাত্বত**—মুক্ত আত্মাগণ; **ঋষভাঃ**—নরশ্রেষ্ঠগণ; **অপি**—যদি; **স্বস্তি**—কুশল; **আসতে**—আছেন; **সর্বে**—তাঁরা সকলে; **রাম**—বলরাম; **কৃষ্ণ**—শ্রীকৃষ্ণ; **ভুজাশ্রয়াঃ**—বাহুবলে সুরক্ষিত; **অপি**—যদিও; **স্মরন্তি**—স্মরণ করেন; **কুশলম্**—কুশল; **অস্মাকম্**—আমাদের; **বদ্ধসৌহৃদাঃ**—নিত্য বন্ধুত্বের বন্ধনে আবদ্ধ।

অনুবাদ

শ্রুতদেব, উদ্ধব প্রভৃতি শ্রীকৃষ্ণের অনুচরগণ এবং শ্রীবলরাম ও শ্রীকৃষ্ণের বাহুবলে সুরক্ষিত সুনন্দ, নন্দ প্রভৃতি আমাদের অন্যান্য পরম সুহৃদ সাত্বত শ্রেষ্ঠগণ কুশলে আছেন ত? তাঁরা আমাদের কুশল চিন্তা করেন ত?

তাৎপর্য

উদ্ধবাদি শ্রীকৃষ্ণের নিত্য পার্ষদেরা সকলেই মুক্ত জীব, এবং শ্রীকৃষ্ণ যখন এই জড় জগতে অবতরণ করেন, তখন তাঁরাও তাঁর সেই ব্রতসাধনে সাহায্য করার জন্য তাঁর সঙ্গে অবতরণ করেন। পাণ্ডবেরাও মুক্ত জীব, যাঁরা এই পৃথিবীতে শ্রীকৃষ্ণের অপ্রাকৃত লীলায় তাঁকে সাহায্য করার জন্য তাঁর সঙ্গে অবতরণ করেছিলেন। ভগবদ্গীতায় (৪/৮) উল্লেখ করা হয়েছে যে, ভগবান এবং তাঁর নিত্য পার্ষদেরা, যাঁরা ভগবানেরই মতো মুক্ত, যুগে যুগে এই পৃথিবীতে অবতরণ

করেন। ভগবানের তা সবই মনে থাকে, কিন্তু তাঁর পার্ষদেরা, মুক্ত হওয়া সত্ত্বেও, ভগবানের তটস্থা শক্তি হওয়ার ফলে তাঁদের পূর্বজন্মের কথা ভুলে যান। সেটাই বিষ্ণুতত্ত্ব এবং জীবতত্ত্বের পার্থক্য।

জীবতত্ত্ব হচ্ছে ভগবানের শক্তির অতি ক্ষুদ্র কণা, এবং তাই সর্ব অবস্থাতেই তাদের ভগবান কর্তৃক সংরক্ষিত হওয়ার প্রয়োজন থাকে, আর ভগবানও তাঁর নিত্য সেবকদের সর্বতোভাবে রক্ষা করে আনন্দিত হন। তাই মুক্ত আত্মারা কখনই ভগবানের মতো মুক্ত বা শক্তিমান বলে নিজেদের মনে করেন না, পক্ষান্তরে, তাঁরা সর্বদাই এই জড় জগতে এবং চিৎ-জগতে, সর্বতোভাবে ভগবানের আশ্রয় আকাঙ্ক্ষা করেন। ভগবানের উপর মুক্ত জীবের এই নির্ভরশীলতা তাঁদের স্বাভাবিক বৃত্তি, কারণ মুক্ত আত্মারা হচ্ছেন অগ্নি স্ফুলিঙ্গের মতো, যার দীপ্তি অগ্নির সান্নিধ্যে থাকার ফলে প্রকাশ পায়, স্বতন্ত্রভাবে নয়। অগ্নি থেকে বিচ্ছিন্ন এবং স্বতন্ত্র হয়ে গেলে স্ফুলিঙ্গ নির্বাপিত হয়ে যায়, যদিও তার মধ্যে আগুনের গুণাবলী অথবা দীপ্তি সুপ্তভাবে বর্তমান থাকে।

তাই যারা ভগবানের আশ্রয় ত্যাগ করে তথাকথিত প্রভু হওয়ার চেষ্টা করে, তারা দীর্ঘকালব্যাপী কঠোর তপস্যা করা সত্ত্বেও, পারমার্থিক অজ্ঞতার ফলে, পুনরায় এই জড় জগতে অধঃপতিত হয়। সেটাই সমস্ত বৈদিক শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত।

শ্লোক ৩৪

ভগবানপি গোবিন্দো ব্রহ্মণ্যো ভক্তবৎসলঃ ।
কচ্চিৎ পুরে সুধর্মায়াং সুখমাস্তে সুহৃদ্বৃতঃ ॥ ৩৪ ॥

ভগবান—পরমেশ্বর ভগবান, শ্রীকৃষ্ণ; **অপি**—ও; **গোবিন্দঃ**—যিনি গাভী এবং ইন্দ্রিয়ের আনন্দ বিধান করেন; **ব্রহ্মণ্যঃ**—ব্রাহ্মণদের, ভগবদ্ভক্তদের হিতসাধনকারী; **ভক্তবৎসল**—ভক্তদের প্রতি স্নেহপরায়ণ; **কচ্চিৎ**—কি না; **পুরে**—দ্বারকাপুরীতে; **সুধর্মায়াম্**—সুধর্ম সভায়; **সুখম্**—সুখ; **আস্তে**—আছেন ত ; **সুহৃদ্-বৃতঃ**ঃবন্ধুগণ কর্তৃক পরিবৃত।

অনুবাদ

সেই ব্রাহ্মণদের হিতকারী ভক্তবৎসল গোবিন্দ, পরম পুরুষোত্তম ভগবান শ্রীকৃষ্ণ দ্বারকা পুরীতে সুধর্মা নামক সভায় সুহৃদবর্গ পরিবেশিত হয়ে সুখে আছেন ত?

তাৎপর্য

এই বিশেষ শ্লোকটিতে শ্রীকৃষ্ণকে ভগবান, গোবিন্দ, ব্রহ্মণ্য এবং ভক্তবৎসল বলে বর্ণনা করা হয়েছে। তিনি হচ্ছেন ভগবান স্বয়ং, অর্থাৎ সর্বৈশ্বর্যপূর্ণ স্বয়ং পরম পুরুষোত্তম ভগবান। তাঁর মধ্যে সমগ্র ঐশ্বর্য, সমগ্র বীর্য, সমগ্র জ্ঞান, সমগ্র সৌন্দর্য, সমগ্র যশ এবং সমগ্র বৈরাগ্য পূর্ণরূপে বিরাজমান। কেউই তাঁর সমান বা তাঁর থেকে অধিক ক্ষমতাসম্পন্ন নয়।

তিনি গোবিন্দ, কারণ তিনি গাভী এবং ইন্দ্রিয়সমূহের আনন্দ বিধান করেন। ভগবদ্ভক্তির প্রভাবে যাঁদের ইন্দ্রিয় পরিশুদ্ধ হয়েছে, তাঁরা যথাযথভাবে ভগবানের সেবা করতে পারেন এবং তার ফলে তাঁদের পরিশুদ্ধ ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে অপ্রাকৃত আনন্দ আস্বাদন করতে পারেন। জড় জগতের বন্ধনে আবদ্ধ কলুষিত জীবেরা কখনই তাদের ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে আনন্দ আস্বাদন করতে পারে না, কিন্তু ইন্দ্রিয় সুখ ভোগের ভ্রান্ত বাসনায় তারা তাদের ইন্দ্রিয়ের দাসত্ব বরণ করে।

তাই, আমাদের নিজেদের স্বার্থে ভগবানের আশ্রয় অবলম্বন করা প্রয়োজন। ভগবান গাভী এবং ব্রহ্মণ্য সংস্কৃতির সংরক্ষক। যে সমাজে গো-রক্ষা হয় না এবং ব্রহ্মণ্য সংস্কৃতির অনুশীলন হয় না, সেই সমাজ প্রত্যক্ষভাবে ভগবানের সুরক্ষা ভোগ করতে পারে না। ঠিক যেমন কারাগারের কয়েদীরা প্রত্যক্ষভাবে রাজার সুরক্ষা লাভ করে না, পক্ষান্তরে, রাজার সুকঠোর প্রতিনিধির দ্বারা শাসিত হয়। মানব সমাজের অন্তত এক শ্রেণীর সদস্যরা যদি গো-রক্ষা না করেন এবং ব্রহ্মণ্য সংস্কৃতির অনুশীলন না করেন, তা হলে সেই সমাজের কোন রকম সমৃদ্ধি লাভ হতে পারে না। ব্রহ্মণ্য সংস্কৃতির ফলে, সত্য, শম, দম, তিতিক্ষা, সরলতা, জ্ঞান, বিজ্ঞান এবং বৈদিক জ্ঞানের প্রতি দৃঢ় শ্রদ্ধা ইত্যাদি সদ্‌গুণগুলির বিকাশ হয়, এবং তার ফলে যথাযথ ব্রাহ্মণে পরিণত হয়ে তত্ত্বত ভগবানকে জানা যায়।

তারপর ব্রাহ্মণের শুদ্ধতার স্তর অতিক্রম করে, ভগবদ্ভক্তে পরিণত হতে হয় যাতে অপ্রাকৃত ভাবে ঈশ্বররূপে, প্রভুরূপে, সখারূপে, পুত্ররূপে এবং প্রেমিকরূপে ভগবানের প্রেম লাভ করা যায়। ব্রাহ্মণোচিত গুণাবলীর বিকাশ না হলে ভগবানের অপ্রাকৃত প্রেম লাভ করা যায় না। ব্রাহ্মণোচিত গুণাবলী যার মধ্যে বিকশিত হয়েছে, ভগবান তারই প্রতি আকৃষ্ট হন, জাত্যাভিমানী ব্রাহ্মণের প্রতি ভগবান কখনই অনুরক্ত নন। ব্রাহ্মণোচিত গুণাবলী যাদের মধ্যে প্রকাশিত হয়নি, তারা ভগবানের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত হতে পারে না, ঠিক যেমন, যদি কাঠ না থাকে তা হলে মাটিতে আগুন জ্বালানো যায় না, যদিও কাঠের সঙ্গে মাটির সম্পর্ক রয়েছে।

ভগবান যেহেতু সর্বতোভাবে পূর্ণ, তাই তাঁর অমঙ্গলের কোন প্রশ্নই ওঠে না, সেজন্যই মহারাজ যুধিষ্ঠির সে প্রশ্ন করেননি। তিনি কেবল তাঁর বাসস্থান দ্বারকাপুরীর সম্বন্ধে প্রশ্ন করেছিলেন, যেখানে পুণ্যবান মানুষেরা সমবেত হয়েছিলেন। ভগবান সেখানেই থাকেন যেখানে পুণ্যবান মানুষেরা সমবেত হন এবং ভগবানের মহিমা কীর্তনকারী সেই সমস্ত পুণ্যবান মানুষের সান্নিধ্যে ভগবান আনন্দ লাভ করেন। দ্বারকাপুরীতে পুণ্যকর্মরত সেই সমস্ত পুণ্যবান মানুষদের সম্বন্ধে জানতে যুধিষ্ঠির মহারাজ উৎসুক ছিলেন।

শ্লোক ৩৫-৩৬

মঙ্গলায় চ লোকানাং ক্ষেমায় চ ভবায় চ ।
আস্তে যদুকুলাম্ভোধাবাদ্যোহনন্তসখঃ পুমান্ ॥ ৩৫ ॥
যদ্বাহুদণ্ডগুপ্তায়াং স্বপুর্যাং যদবোহর্চিতাঃ ।
ক্রীড়ন্তি পরমানন্দং মহাপৌরুষিকা ইব ॥ ৩৬ ॥

মঙ্গলায়—সর্বাঙ্গীণ মঙ্গল সাধনের জন্য; **চ**—ও; **লোকানাম্**—সকল গ্রহলোকাদির; **ক্ষেমায়**—প্রতিপালনের জন্য; **চ**—এবং; **ভবায়**—উন্নতি সাধনের জন্য; **চ**—ও; **আস্তে**—রয়েছেন; **যদু-কুল-অম্ভোধৌ**—যদুকুলরূপ সমুদ্রের মধ্যে; **আদ্যঃ**—আদি; **অনন্তসখঃ**—অনন্তের (বলরামের) সঙ্গে; **পুমান্**—পরমেশ্বর ভগবান; **যৎ**—যাঁর; **বাহুদণ্ডগুপ্তায়াম্**—বাহুবলের দ্বারা সংরক্ষিত; **স্বপুর্যাম্**—তাঁর নিজ নগরী দ্বারকায়; **যদবঃ**—যদুবংশের সদস্যরা; **অর্চিতাঃ**—পূজিত হয়ে; **ক্রীড়ন্তি**—আস্বাদন করছেন; **পরমানন্দম্**—অপ্রাকৃত আনন্দ; **মহাপৌরুষিকাঃ**—চিৎ জগতের অধিবাসীগণ; **ইব**—মতো।

অনুবাদ

আদি পুরুষ ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সারা জগতের মঙ্গল সাধন, প্রতিপালন এবং উন্নতি সাধনের উদ্দেশ্যে যদুকুলরূপ সমুদ্রের মধ্যে অনন্তদেব বলরামসহ অবস্থান করছেন। আর যদুবংশীয়রা, শ্রীকৃষ্ণের বাহুবলের দ্বারা সংরক্ষিত আর নিজনগরী দ্বারকাপুরীতে বৈকুণ্ঠনাথের অনুচরবর্গের মতো ত্রিলোক পূজিত হয়ে পরম আনন্দে বিহার করছেন।

তাৎপর্য

পূর্বে আমরা বহুবার আলোচনা করেছি যে, পরমেশ্বর ভগবান শ্রীবিষ্ণু দুই রূপে প্রতিটি ব্রহ্মাণ্ডে বিরাজ করেন, যথা—গর্ভোদকশায়ী বিষ্ণু এবং ক্ষীরোদকশায়ী বিষ্ণু। ব্রহ্মাণ্ডের উত্তর ভাগের শিখরে ক্ষীরসমুদ্রে শ্রীবলদেবের অবতার অনন্তদেবের শয্যায় ক্ষীরোদকশায়ী বিষ্ণু বিরাজ করেন। তাই মহারাজ যুধিষ্ঠির যদুবংশকে ক্ষীর সমুদ্রের সঙ্গে তুলনা করেছেন এবং শ্রীকৃষ্ণের শয্যা অনন্তদেবকে শ্রীবলরামের সঙ্গে তুলনা করেছেন। তিনি দ্বারকা নগরীর অধিবাসীদের বৈকুণ্ঠলোকের নিত্যমুক্ত জীবদের সঙ্গে তুলনা করেছেন।

জড় আকাশের অতীত, আমাদের দৃষ্টির অগোচর এবং ব্রহ্মাণ্ডের সপ্ত আবরণের পরপারে কারণ-সমুদ্র রয়েছে, সেখানে বুদবুদের মতো অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড ভাসছে, এবং কারণসমুদ্রের ঊর্ধ্বে রয়েছে চিদাকাশের অসীম বিস্তার যা সাধারণত ব্রহ্মজ্যোতি বলে পরিচিত। সেই ব্রহ্মজ্যোতিতে বৈকুণ্ঠ নামক অনন্ত চিন্ময় গ্রহ রয়েছে। প্রতিটি বৈকুণ্ঠলোক জড় জগতের সব চেয়ে বড় ব্রহ্মাণ্ড থেকেও বহু গুণে বড়, এবং প্রতিটি বৈকুণ্ঠে অসংখ্য বৈকুণ্ঠবাসী রয়েছেন যাঁদের রূপ ঠিক শ্রীবিষ্ণুর মতো।

এই সমস্ত বৈকুণ্ঠবাসীদের বলা হয় মহাপৌরুষিক, অর্থাৎ তাঁরা প্রত্যক্ষভাবে ভগবানের সেবায় যুক্ত। তাঁরা সকলেই আনন্দময় এবং সেখানে কোন রকম ক্লেশ বা দুঃখ-দুর্দশা নেই। তাঁরা চিরকাল পূর্ণযৌবন সমন্বিত, এবং কালের প্রভাব কখনই তাঁদের কোনভাবে স্পর্শ করতে পারে না। সেখানে তাঁরা জন্ম, মৃত্যু, জরা এবং ব্যাধির প্রভাব থেকে সর্বতোভাবে মুক্ত অবস্থায় পূর্ণ জ্ঞান এবং নিত্য আনন্দময় জীবন উপভোগ করেন।

মহারাজ যুধিষ্ঠির দ্বারকার অধিবাসীদের বৈকুণ্ঠলোকের মহাপৌরুষিকদের সঙ্গে তুলনা করেছেন, কারণ তাঁরা সকলে ভগবানের সঙ্গ প্রভাবে নিত্য আনন্দ আস্বাদন করছেন। ভগবদ্গীতায় বৈকুণ্ঠলোকের বহু উল্লেখ রয়েছে, এবং ভগবান তাদের মদ্-ধাম বা আমার নিজধাম বলে উল্লেখ করেছেন।

শ্লোক ৩৭

যৎপাদশুশ্রূষণ মুখ্যকর্মণা সত্যাদয়ো দ্ব্যষ্টসহস্রযোষিতঃ ।
নির্জিত্য সংখ্যে ত্রিদশাংস্তদাশিষো হরন্তি বজ্রায়ুধবল্লভোচিতাঃ ॥৩৭॥

যৎ—যাঁর; **পাদ**—পাদপদ্ম; **শুশ্রূষণ**—সেবা সম্পাদন; **মুখ্য**—সব চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ; **কর্মণা**—কর্মের দ্বারা; **সত্য-আদয়ঃ**—সত্যভামা প্রমুখ মহিষীগণ; **দ্বি-অষ্ট**—ষোল;

সহস্র—হাজার; **যোষিতঃ**—রমণী; **নির্জিত্য**—পরাভূত করে; **সংখ্যে**—যুদ্ধে; **ত্রিদশান্**—স্বর্গের দেবতাদের; **তদাশিষো**—দেবতাদের উপভোগ্য; **হরন্তি**—নিয়েছিলেন; **বজ্র-আয়ুধ-বল্লভা**—বজ্রপাণি ইন্দ্রের পত্নীদের; **উচিতাঃ**—উপযুক্ত।

অনুবাদ

সত্যভামা প্রমুখ দ্বারকার মহিষীগণ ভগবানের চরণ-সেবারূপ মুখ্য কর্ম সম্পাদন করে ভগবানকে দেবতাদের পরাভূত করতে প্ররোচিত করেছিলেন। এইভাবে তাঁর মহিষীরা ইন্দ্রপত্নী শচীদেবীর ভোগযোগ্য (পারিজাত পুষ্প) উপভোগ করেন।

তাৎপর্য

সত্যভামা ঃ দ্বারকায় শ্রীকৃষ্ণের প্রধানা মহিষীদের অন্যতমা। নরকাসুর বধের পর, শ্রীকৃষ্ণ যখন নরকাসুরের প্রাসাদে গিয়েছিলেন, তখন সত্যভামা তাঁর সঙ্গে ছিলেন। তিনি যখন ইন্দ্রলোকে যান, তখনও তিনি সত্যভামাকে নিয়ে গিয়েছিলেন, এবং শচীদেবী তাঁকে অভ্যর্থনা করেছিলেন। শচীদেবী তাঁকে দেবমাতা অদিতির সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেন, এবং অদিতি তাঁর প্রতি অত্যন্ত প্রসন্ন হয়ে তাঁকে বরদান করেছিলেন যে, যতদিন শ্রীকৃষ্ণ এই পৃথিবীতে থাকবেন, ততদিন তাঁর যৌবন অক্ষুণ্ণ থাকবে।

অদিতি তাঁকে স্বর্গের দেবতাদের বিশেষ উপভোগের বস্তুসমূহ প্রদর্শন করেন। আর স্বর্গের পারিজাত পুষ্প দর্শন করে সত্যভামা দ্বারকায় তাঁর প্রাসাদে তা পাওয়ার বাসনা করেন। তারপর, তিনি যখন দ্বারকায় ফিরে আসেন, তখন তিনি তাঁর পতির কাছে সেই বাসনা ব্যক্ত করেন। সত্যভামা দেবীর প্রাসাদ নানা রকম দুষ্প্রাপ্য মণিমাণিক্যে বিশেষভাবে শোভিত ছিল, এবং প্রচণ্ড গরমের সময়ও শীতাতপ নিয়ন্ত্রণের মতো তাঁর প্রাসাদ শীতল থাকত। তাঁর প্রাসাদ নানা রকম পতাকায় শোভিত হয়ে সেখানে তাঁর পতির উপস্থিতির বার্তা ঘোষণা করত।

একবার তাঁর পতির সাথে তিনি দ্রৌপদীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন এবং দ্রৌপদীর কাছে তাঁর পতির মনোরঞ্জনের উপায় সম্বন্ধে উপদেশ লাভ করতে উৎসুক হন। এই বিষয়ে দ্রৌপদী বিশেষ পারদর্শী ছিলেন, কারণ তাঁর পঞ্চপতি, পঞ্চপাণ্ডবেরা, তাঁর সেবায় অত্যন্ত প্রসন্ন ছিলেন। দ্রৌপদী কর্তৃক উপদিষ্ট হয়ে তিনি অত্যন্ত প্রসন্ন হয়ে তাঁর সর্বাঙ্গীণ মঙ্গল কামনা করেন এবং দ্বারকায় ফিরে আসেন। তিনি ছিলেন মহারাজ সত্রাজিতের কন্যা। শ্রীকৃষ্ণের অপ্রকটের পর অর্জুন যখন দ্বারকায় আসেন, তখন সত্যভামা এবং রুক্মিণী প্রমুখ সমস্ত মহিষীরা গভীর দুঃখে করুণভাবে

বিলাপ করেছিলেন। তাঁর জীবনের শেষভাগে, তিনি কঠোর তপস্যা করার জন্য বনবাসিনী হয়েছিলেন।

সত্যভামা তাঁর পতিকে প্ররোচিত করেন স্বর্গ থেকে পারিজাত পুষ্প নিয়ে আসার জন্য, এবং শ্রীকৃষ্ণ দেবতাদের পরাভূত করে সেই পুষ্প হরণ করে নিয়ে এসেছিলেন, ঠিক যেভাবে কোনও সাধারণ পতি তার পত্নীর মনোরঞ্জনের জন্য আচরণ করে থাকেন, সেইভাবে। পূর্বেই বিশ্লেষণ করা হয়েছে যে, সাধারণ মানুষের মতো তাঁর বহু পত্নীর অভিলাষ পূর্ণ করার ব্যাপারে ভগবানের বিশেষ কিছু করণীয় ছিল না। কিন্তু যেহেতু তাঁর মহিষীরা গভীর ভক্তি সহকারে তাঁর সেবা পরিচর্যা করেছিলেন, তাই ভগবান তাঁদের সঙ্গে এক আদর্শ পতির মতো লীলা বিলাস করেছিলেন। এই পৃথিবীর কোন প্রাণী স্বর্গের কোন বস্তু পাওয়ার আশা করতে পারে না, বিশেষ করে পারিজাত পুষ্প, যা কেবল দেবতাদেরই উপভোগ্য। কিন্তু ভগবানের পতিব্রতা পত্নী হওয়ার ফলে, তাঁরা সকলেই স্বর্গের দেবতাদের পত্নীদের উপভোগ্য বস্তুসমূহ উপভোগ করেছিলেন।

পক্ষান্তরে বলা যায়, যেহেতু ভগবান হচ্ছেন তাঁর সমস্ত সৃষ্টির অধীশ্বর, তাই এই জগতের যে কোন স্থানের যে কোন বস্তু উপভোগ করার পূর্ণ অধিকার দ্বারকার মহিষীদের ছিল।

শ্লোক ৩৮

যদ্বাহুদণ্ডাভ্যুদয়ানুজীবিনো যদুপ্রবীরা হ্যকুতোভয়া মুহুঃ ।
অধিক্রমন্ত্যঙ্ঘ্রিভিরাহৃতাং বলাৎ সভাং সুধর্মাং সুরসত্তমোচিতাম্ ॥৩৮॥

যৎ—যাঁর; **বাহুদণ্ড**—বাহুবল; **অভ্যুদয়**—প্রভাবিত হয়ে; **অনুজীবিনঃ**—প্রতিপালিত; **যদু**—যদুবংশীয়গণ; **প্রবীরাঃ**—প্রবল পরাক্রমশালী বীরগণ; **হি-অকুতোভয়াঃ**—সর্বতোভাবে ভয়হীন; **মুহুঃ**—নিরন্তর; **অধিক্রমন্তি**—বিচরণ করেন; **অঙ্ঘ্রিভিঃ**—চরণের দ্বারা; **আহৃতাম্**—আহরিত; **বলাৎ**—বলপূর্বক; **সভাম্**—সভাগৃহ; **সুধর্মাম্**—সুধর্মা; **সুরসত্তম্**—দেবশ্রেষ্ঠ; **উচিতাম্**—উপযোগ্য।

অনুবাদ

যদুবীরগণ পরমেশ্বর ভগবানের বাহুবলের প্রভাবে প্রতিপালিত হয়ে সর্বতোভাবে ভয়হীন হয়ে থাকেন, আর তাই শ্রেষ্ঠ দেবতাদের যোগ্য এবং বলপূর্বক অধিকৃত সুধর্মা নামে সভাগৃহটিতে তাঁরা তাঁদের চরণ দ্বারা পদদলিত করে বিচরণ করেন।

তাৎপর্য

যাঁরা ভগবানের সেবক, তাঁদের ভগবান সব রকম ভয় থেকে রক্ষা করেন, এবং তাঁরা সব কিছুর শ্রেষ্ঠ জিনিসটি, তা বলপূর্বক সংগৃহীত হয়ে থাকলেও, তা উপভোগ করেন।

ভগবান সমস্ত জীবের প্রতি সমদৃষ্টিসম্পন্ন, কিন্তু তিনি তাঁর শুদ্ধ ভক্তদের প্রতি বিশেষভাবে স্নেহশীল হওয়ার ফলে, পক্ষপাতপরায়ণ।

জড় জগতের সর্বশ্রেষ্ঠ সম্পদে দ্বারকাপুরী ঐশ্বর্যমণ্ডিত হয়েছিল। রাষ্ট্রের বিশেষ মর্যাদা অনুসারে সেখানকার সভাগৃহটি ছিল শ্রেষ্ঠ দেবতাদের মর্যাদার যোগ্য।

এই ধরনের সভাগৃহ পৃথিবীর কোনও রাষ্ট্রের জন্য নয়, কারণ একটা রাষ্ট্র জড়জাগতিক দিক দিয়ে যতই উন্নত হোক, কোনও মানুষই এ জিনিস তৈরি করতে পারে না। কিন্তু এই পৃথিবীতে শ্রীকৃষ্ণের অবস্থানকালে, যাদবেরা বলপূর্বক সুধর্মা সভাকে স্বর্গলোক থেকে পৃথিবীতে নিয়ে এসেছিলেন এবং তা দ্বারকায় প্রতিষ্ঠা করেন।

তাঁরা এই রকম করতে পেরেছিলেন, কারণ তাঁরা সুনিশ্চিত ছিলেন যে, পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাঁদের প্রশ্রয় দেবেন এবং রক্ষা করবেন। অন্যভাবে বলতে গেলে, ভগবানের শুদ্ধ ভক্তেরা তাঁর সেবার জন্য ব্রহ্মাণ্ডের সর্বশ্রেষ্ঠ বস্তুগুলিই সংগ্রহ করে এনে দেন। যাদবেরা পরমেশ্বর শ্রীকৃষ্ণের জন্য এই ব্রহ্মাণ্ডের সব রকম সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য এবং সুযোগ-সুবিধাগুলির আয়োজন করেছিলেন, এবং তার বিনিময়ে ভগবান তাঁর এই ধরনের সেবকদের সর্বতোভাবে রক্ষা করেছিলেন এবং তাঁরা তাই ছিলেন সুরক্ষিত, নিরাপদ এবং নির্ভীক।

ভগবানকে ভুলে যাওয়ার ফলেই বদ্ধ জীবেরা ভয়াক্রান্ত হয়। কিন্তু মুক্তাত্মা জীবসত্তা কখনই ভীত হন না, ঠিক যেমন পিতার উপর নির্ভরশীল শিশু-সন্তান কাউকে ভয় করে না।

ভয় হচ্ছে ভগবানের সঙ্গে নিত্যকালের সম্পর্ক বিস্মৃত হওয়ার ফলে নিদ্রাচ্ছন্ন জীবের একপ্রকার মোহ। ভগবদ্‌গীতায় (২/২০) বলা হয়েছে যে, জীবের যে স্বরূপ, তার যেহেতু কখনই মৃত্যু হয় না, তাই ভয়ের কি কারণ থাকতে পারে?

স্বপ্নে বাঘ দেখে মানুষ ভয় পেতে পারে, কিন্তু তার পাশেই যে মানুষটি জেগে রয়েছে, সে কোন বাঘ দেখতে পায় না। নিদ্রিত এবং জাগ্রত, উভয় ব্যক্তির কাছেই বাঘ একটি অলীক বস্তু, কারণ বাস্তবিকই সেখানে কোন বাঘ নেই; কিন্তু যে মানুষ তার জাগ্রত অবস্থার কথা বিস্মৃত হয়েছে, সে-ই ভয়াক্রান্ত হয়, সেক্ষেত্রে যে মানুষ তার প্রকৃত অবস্থার কথা বিস্মৃত হয়নি, তার মনে ভয়ের লেশমাত্র থাকে না।

যদুবংশের মানুষেরা ভগবানের সেবায় সম্পূর্ণরূপে অবহিত ছিলেন, এবং তাই কোন অবস্থাতেই তাঁরা বাঘের ভয় দেখেননি। আর যদিও-বা প্রকৃত বাঘ থাকত, সেক্ষেত্রে পরমেশ্বর ভগবান সব সময়ই তাঁদের রক্ষার জন্য ছিলেন।

শ্লোক ৩৯

কচ্চিত্তেহনাময়ং তাত ভ্রষ্টতেজা বিভাসি মে।
অলব্ধমানোহবজ্ঞাতঃ কিং বা তাত চিরোষিতঃ ॥ ৩৯ ॥

কচ্চিৎ—কি, **তে**—তোমার; **অনাময়ম্**—আরোগ্য; **তাত**—হে প্রিয় ভ্রাতা; **ভ্রষ্ট**—বিহীন; **তেজাঃ**—দীপ্তি; **বিভাসি**—পরিলক্ষিত হচ্ছে; **মে**—আমার; **অলব্ধমানঃ**—অসম্মান; **অবজ্ঞাতঃ**—অবজ্ঞা প্রাপ্ত; **কিম্**—কি; **বা**—অথবা; **তাত**—হে প্রিয় ভ্রাতা; **চিরোষিত**—দীর্ঘকাল সেখানে থাকার ফলে।

অনুবাদ

হে ভ্রাতা অর্জুন, তোমার নিজের সমস্ত কুশল ত? তোমার শারীরিক দীপ্তি নষ্ট হয়ে গেছে বলে মনে হচ্ছে। তুমি দীর্ঘকাল দ্বারকায় ছিলে বলে কি তাঁরা তোমায় অবজ্ঞা প্রদর্শন করেছেন বা তোমার যথোচিত সম্মান রক্ষা করেননি?

তাৎপর্য

মহারাজ যুধিষ্ঠির অর্জুনের কাছে সর্বতোভাবে দ্বারকার কুশল জিজ্ঞাসা করেছিলেন, কিন্তু সব শেষে তিনি স্থির করেছিলেন যে, যতক্ষণ শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং সেখানে রয়েছেন, ততক্ষণ কোন অমঙ্গল ঘটতে পারে না। কিন্তু সেই সঙ্গে, অর্জুনকে যেন দীপ্তিহীন বলে তাঁর মনে হয়েছিল, এবং তাই মহারাজ তাঁর কুশল জিজ্ঞাসা করে অত রকম গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন করেছিলেন।

শ্লোক ৪০

কচ্চিন্নাভিহতোঽভাবৈঃ শব্দাদিভিরমঙ্গলৈঃ।
ন দত্তমুক্তমর্থিভ্য আশয়া যৎ প্রতিশ্রুতম্ ॥ ৪০ ॥

কচ্চিৎ—কি; **ন**—পারে না; **অভিহতঃ**—সম্বোধিত; **অভাবৈঃ**—অপ্রীতিকর; **শব্দাদিভিঃ**—বাক্যের দ্বারা; **অমঙ্গলৈঃ**—অশুভ ; **ন**—করেনি; **দত্তম্**—দান অর্পণ;

উক্তম্—বলা হয়; অর্থিভ্যঃ—যাচককে; আশয়া—আশার সহিত; যৎ—যা; প্রতিশ্রুতম্—দান করার প্রতিশ্রুতি দিয়ে।

অনুবাদ

কেউ কি তোমাকে অপ্রীতিকর অশুভ কথা বলেছে কিংবা যে কিছু প্রার্থনা করেছে, তাঁকে দাক্ষিণ্য দেখাতে পারনি, কিংবা কাউকে প্রতিশ্রুতি দিয়ে তুমি কি তা পূর্ণ করতে পারনি?

তাৎপর্য

অভাবগ্রস্ত মানুষ কখনও-বা অর্থের প্রত্যাশী হয়ে ক্ষত্রিয় বা ধনী ব্যক্তির কাছে যায়। ক্ষত্রিয় বা ধনী ব্যক্তির কাছে দান ভিক্ষা করা হলে, তাঁদের কর্তব্য হচ্ছে স্থান, কাল এবং পাত্র বিচার করে দান করা। তাঁরা যদি তা করতে সক্ষম না হন, তা হলে তাদের সেই বিচ্যুতির জন্য বিশেষ দুঃখিত হওয়া উচিত। তেমনই, কাউকে দান করার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হলে, সেই প্রতিশ্রুতি রক্ষা করা কর্তব্য। এই সমস্ত অক্ষমতাগুলি কখনও-বা অনুতাপের কারণ হয়, এবং লোকে তখন তাঁদের সমালোচনা করতে পারে। যুধিষ্ঠির মহারাজ মনে করেছিলেন যে, এই ধরনের কোন অক্ষমতা হয়ত অর্জুনের মনস্তাপের কারণ হয়ে থাকতে পারে।

শ্লোক ৪১

কচ্চিত্ত্বং ব্রাহ্মণং বালং গাং বৃদ্ধং রোগীণং স্ত্রিয়ম্ ।
শরণোপসৃতং সত্ত্বং নাত্যাক্ষীঃ শরণপ্রদঃ ॥ ৪১ ॥

কচ্চিৎ—কি; ত্বম্—তুমি; ব্রাহ্মণম্—ব্রাহ্মণ; বালম্—বালক; গাম্—গাভী; বৃদ্ধম্—বৃদ্ধ; রোগীণম্—রোগী; স্ত্রিয়ম্—স্ত্রী; শরণ-উপসৃতম্—শরণার্থী; সত্ত্বম্—কোন প্রাণীকে; ন—কিনা; অত্যাক্ষীঃ—আশ্রয় দাওনি; শরণ-প্রদঃ—শরণাগত।

অনুবাদ

তুমি সর্বদাই শরণাগত যোগ্য জীবমাত্রেই আশ্রয় প্রদান করে থাকে। আজ কি কোন শরণাগত ব্রাহ্মণ, বালক, গাভী, বৃদ্ধ, রোগী, স্ত্রীলোক কিংবা অন্য কোন প্রাণীকে আশ্রয়দানে অক্ষম হয়েছ?

তাৎপর্য

সমাজের ঐহিক এবং পারমার্থিক উভয়বিধ মঙ্গল সাধনের জন্য জ্ঞান আহরণে সর্বক্ষণ মগ্ন যে ব্রাহ্মণকুল, তাঁদের সবর্তোভাবে রক্ষা করা রাজার কর্তব্য। তেমনই বালক, গাভী, রোগী, স্ত্রী এবং বৃদ্ধদের রক্ষা করাও ক্ষত্রিয় রাজাদের বিশেষ কর্তব্য। তারা যদি ক্ষত্রিয়, রাজপুরুষ বা রাষ্ট্র কর্তৃক নিরাপদে সুরক্ষিত না হয়, তা হলে অবশ্যই তা অত্যন্ত লজ্জার বিষয়। সেই রকম কোনও ঘটনা অর্জুনের মনস্তাপের কারণ ছিল কি না, তা জানার জন্য মহারাজ যুধিষ্ঠির উদ্বিগ্ন হয়ে উঠেছিলেন।

শ্লোক ৪২

কচ্চিত্ত্বং নাগমোঽগম্যাং গম্যাং বাসৎকৃতাং স্ত্রিয়ম্ ।
পরাজিতো বাথ ভবান্নোত্তমৈর্নাসমৈঃ পথি ॥ ৪২ ॥

কচ্চিৎ—কি; **ত্বম্**—তুমি; **ন**—না; **অগমঃ**—গমন করেছ; **অগম্যাম্**—অগম্যা বা দোষযুক্ত; **গম্যাম্**—গম্য বা গ্রহণযোগ্য; **বা**—অথবা; **অসৎ-কৃতাম্**—অশোভনভাবে আচরণ করেছ; **স্ত্রিয়ম্**—স্ত্রীলোকের প্রতি ; **পরাজিত**—পরাজিত; **বা**—অথবা; **অথ**—অতএব; **ভবান্**—তুমি; **ন**—না; **উত্তমৈঃ**—উচ্চতর শক্তির দ্বারা; **ন**—না; **অসমৈঃ**—অসম; **পথি**—পথে।

অনুবাদ

তুমি কি কোন অগম্য স্ত্রীতে গমন করেছ? কিংবা, কোন গম্য স্ত্রীলোকের প্রতি যথাযথ আচরণ করনি? অথবা পথে তোমার সমকক্ষ বা তোমার থেকে অধম ব্যক্তির কাছে পরাজিত হয়েছ?

তাৎপর্য

এই শ্লোকটি থেকে বোঝা যায় যে, পাণ্ডবদের সময়ে কোনও কোনও বিশেষ অবস্থায় স্ত্রী-পুরুষের অবাধ সংযোগ অনুমোদিত হত। ব্রাহ্মণ বা ক্ষত্রিয় কুলোদ্ভূত পুরুষের নিম্নতর বৈশ্য বা শূদ্র রমণীতে গমন অনুমোদিত ছিল, কিন্তু নিম্ন বর্ণের পুরুষ উচ্চ বর্ণের রমণীতে গমন করতে পারত না।

এমন কি, ব্রাহ্মণ রমণীতে কোনও ক্ষত্রিয় গমন করতে পারত না। ব্রাহ্মণের স্ত্রীকে সপ্ত মাতার অন্যতম বলে বিবেচনা করা হয়েছে (সপ্ত মাতা হচ্ছেন—গর্ভধারিণী মাতা, গুরুপত্নী, ব্রাহ্মণ-পত্নী, রাজপত্নী, গাভী, ধাত্রী এবং ধরিত্রী)। এই

ধরনের স্ত্রী-পুরুষের মিলনকে উত্তম এবং অধম দুটি শ্রেণীতে ভাগ করা হয়েছে। ব্রাহ্মণ পুরুষের ক্ষত্রিয়ের রমণীতে গমন উত্তম, কিন্তু ক্ষত্রিয়ের পক্ষে ব্রাহ্মণ রমণীতে গমন অধম, অতএব নিন্দনীয়। কোন রমণী যখন কোন পুরুষের সঙ্গ কামনা করে, তখন তাকে প্রত্যাখ্যান করা উচিত নয়, কিন্তু সেই সঙ্গে উপরোক্ত বিচার বিবেচনা করাও কর্তব্য। শূদ্রাধম অন্ত্যজ কুলোদ্ভূত হিড়িম্বী ভীমের সঙ্গ কামনা করেছিল, এবং যযাতি শুক্রাচার্যের কন্যা দেবযানীকে বিবাহ করতে অস্বীকার করেন, কারণ শুক্রাচার্য ছিলেন ব্রাহ্মণ। ব্রাহ্মণ ব্যাসদেবকে আহ্বান করা হয়েছিল ক্ষত্রিয় রাণী অম্বিকা এবং অম্বালিকার গর্ভে সন্তান উৎপাদন করার জন্য, এবং তার ফলে ধৃতরাষ্ট্র এবং পাণ্ডুর জন্ম হয়। সত্যবতী ছিলেন ধীবর-রাজের কন্যা, এবং মহান্ ব্রাহ্মণ পরাশর মুনি তাঁর গর্ভে ব্যাসদেবের জন্ম দিয়েছিলেন।

এইভাবে শাস্ত্রে স্ত্রী-পুরুষের অবাধ মিলনের বহু দৃষ্টান্ত রয়েছে, কিন্তু সেই মিলন শাস্ত্র বিগর্হিত ছিল না এবং তার ফলও অশুভ হয়নি। স্ত্রী-পুরুষের মিলন স্বাভাবিক, কিন্তু তা শাস্ত্র-বিধির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হওয়া কর্তব্য, যাতে সমাজ ব্যবস্থার পবিত্রতা নষ্ট না হয়, অথবা অবাঞ্ছিত অপদার্থ জন সংখ্যা বর্ধিত হয়ে পৃথিবীর শান্তি বিনষ্ট না করে।

ক্ষত্রিয়ের পক্ষে সমকক্ষ বা অধম ব্যক্তির কাছে পরাজিত হওয়া অত্যন্ত নিন্দার বিষয়। যদি পরাজিত হতে হয়, তা হলে অধিক বলবান বা উত্তম ব্যক্তির কাছেই হওয়া উচিত। অর্জুন ভীষ্মদেবের কাছে পরাজিত হয়েছিলেন, এবং পরমেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ তাঁকে সেই বিপদ থেকে রক্ষা করেছিলেন। সেটি অর্জুনের পক্ষে অপমানজনক ছিল না, কারণ ভীষ্মদেব বয়স, শ্রদ্ধা এবং বল সর্বতোভাবে অর্জুনের চেয়ে অনেক শ্রেয় ছিলেন।

কিন্তু কর্ণ ছিল অর্জুনের সমকক্ষ, এবং তাই কর্ণের সঙ্গে যুদ্ধ করার সময় অর্জুন সঙ্কটাপন্ন হয়েছিলেন। অর্জুন তা বুঝতে পেরেছিলেন এবং তাই অন্যায়ভাবে কর্ণকে বধ করতে তিনি দ্বিধা করেননি। এইগুলি হচ্ছে ক্ষত্রিয়ের বৃত্তি, এবং তাই যুধিষ্ঠির মহারাজ তাঁর ছোট ভাই অর্জুনকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন দ্বারকা থেকে গৃহে প্রত্যাবর্তন করার সময় এই ধরনের কোন অবাঞ্ছিত ঘটনা ঘটেছিল কিনা।

শ্লোক ৪৩

অপি স্বিৎপর্যভুঙ্‌ক্থাস্ত্বং সম্ভোজ্যান্ বৃদ্ধবালকান্ ।
জুগুপ্সিতং কর্ম কিঞ্চিৎ কৃতবান্ন যদক্ষমম্ ॥ ৪৩ ॥

অপিস্বিৎ—হয়েছিল কি; পর্য—পরিত্যাগ করে; ভুক্তবান্‌—ভোজন করেছ; ত্বম্‌—তুমি; সম্ভোজ্যান্‌—একত্রে ভোজনের উপযুক্ত; বৃদ্ধ—বৃদ্ধদের; বালকান্‌—বালকদের; জুগুপ্সিতম্‌—নিন্দিত; কর্ম—ক্রিয়া; কিঞ্চিৎ—কিছু; কৃতবান্‌—করেছ; ন—না; যৎ—যা; অক্ষমম্‌—ক্ষমার অযোগ্য।

অনুবাদ

তোমার সাথে একত্রে ভোজন করবার যোগ্য বৃদ্ধ বা বালকদের তুমি কি যত্ন নাওনি? তাদের বাদ দিয়ে তুমি কি একাই ভোজন করেছ? ক্ষমার অযোগ্য কোনও গর্হিত কর্ম কি তুমি করেছ?

তাৎপর্য

গৃহস্থের কর্তব্য হচ্ছে প্রথমে পরিবারের শিশু এবং বৃদ্ধদের, ব্রাহ্মণ এবং পঙ্গুদের ভোজন করানো। তা ছাড়া, আদর্শ গৃহস্থের কর্তব্য হচ্ছে কোনও অপরিচিত ক্ষুধার্ত ব্যক্তিকে ডেকে এনে আহার করিয়ে তারপর স্বয়ং ভোজন করা। পথে নেমে তেমন কোনও ক্ষুধার্ত ব্যক্তিকে তিনবার ডাকতে হয়। কোনও গৃহস্থ যদি এই বিধির অবহেলা করে, বিশেষ করে বৃদ্ধ এবং শিশুদের ক্ষেত্রে, তা হলে তা ক্ষমার অযোগ্য হয়।

শ্লোক ৪৪

কচ্চিৎ প্রেষ্ঠতমেনাথ হৃদয়েনাত্মবন্ধুনা।
শূন্যোঽস্মি রহিতো নিত্যং মন্যসে তেঽন্যথা ন রুক্‌ ॥৪৪॥

কচ্চিৎ—কি; প্রেষ্ঠতমেন—সব চেয়ে প্রিয় পাত্রকে; অথ—ভ্রাতা অর্জুন; হৃদয়েন—খুব ঘনিষ্ঠ; আত্ম-বন্ধুনা—বন্ধু শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক; শূন্যঃ—শূন্য; অস্মি—আমি; রহিতঃ—হারিয়ে; নিত্যম্‌—চিরকালের জন্য; মন্যসে—তুমি মনে করছ; তে—তোমার; অন্যথা—অন্য উপায়ে; ন—না; রুক্‌—মনঃ পীড়া।

অনুবাদ

অথবা, তোমার অতি প্রিয়তম সখা শ্রীকৃষ্ণের বিরহে তুমি কি শূন্যতা বোধ করছ? হে অর্জুন ভাই, এ ছাড়া তোমার এই রকম অশান্তির আর কোনও কারণই আমি ভাবতে পারছি না।

তাৎপর্য

যুধিষ্ঠির মহারাজের এই সমস্ত প্রশ্ন থেকে বোঝা যায় যে, শ্রীকৃষ্ণের অন্তর্ধানের পর পৃথিবীর যে কি অবস্থা হবে, তা তিনি উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন, এবং অর্জুনের বিষণ্ণতা দর্শন করে তিনি তাঁর সেই আশঙ্কা ব্যক্ত করেছিলেন, যেন এ ছাড়া অর্জুনের বিষণ্ণতার আর কোন কারণ ছিল না। তাই সেই সম্বন্ধে দ্বিধাগ্রস্ত হলেও তিনি নারদ মুনির ইঙ্গিতের ভিত্তিতে খোলাখুলিভাবে অর্জুনকে জিজ্ঞাসা করতে বাধ্য হয়েছিলেন।

ইতি 'শ্রীকৃষ্ণের তিরোধান লীলা' নামক শ্রীমদ্ভাগবতের প্রথম স্কন্ধের চতুর্দশ অধ্যায়ের শ্রীল ভক্তিবেদান্ত তাৎপর্য সমাপ্ত।

পঞ্চদশ অধ্যায়

যথাসময়ে পাণ্ডবদের অবসর গ্রহণ

শ্লোক ১

সূত উবাচ

এবং কৃষ্ণসখঃ কৃষ্ণো ভ্রাত্রা রাজ্ঞাবিকল্পিতঃ ।
নানাশঙ্কাস্পদং রূপং কৃষ্ণবিশ্লেষকর্শিতঃ ॥ ১ ॥

সূত উবাচ—সূত গোস্বামী বললেন; **এবম্**—এইভাবে; **কৃষ্ণসখঃ**—শ্রীকৃষ্ণের স্বনামধন্য সখা; **কৃষ্ণঃ**—অর্জুন; **ভ্রাত্রা**—জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা কর্তৃক; **রাজ্ঞা**—মহারাজ যুধিষ্ঠির; **বিকল্পিতঃ**—অনুমান করেছিলেন; **নানা**—বিবিধ; **শঙ্কাস্পদম্**—নানা প্রকার আশঙ্কার ভিত্তিতে; **রূপম্**—রূপ; **কৃষ্ণ**—ভগবান শ্রীকৃষ্ণ; **বিশ্লেষ**—বিরহানুভূতি; **কর্শিতঃ**—অত্যন্ত ব্যথিত হয়েছিলেন।

অনুবাদ

সূত গোস্বামী বললেন—শ্রীকৃষ্ণের বিরহে কাতর কৃষ্ণসখা অর্জুনকে তাঁর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা মহারাজ যুধিষ্ঠির এইভাবে নানা প্রকার আশঙ্কাযুক্ত প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করলেন।

তাৎপর্য

গভীরভাবে শোকাচ্ছন্ন হওয়ার ফলে, অর্জুনের বাস্তবিকই কণ্ঠ রুদ্ধ হয়েছিল, এবং তাই তাঁর পক্ষে যুধিষ্ঠির মহারাজের নানা প্রকার আশঙ্কাযুক্ত প্রশ্নের উত্তর দেওয়া সম্ভব হয়নি।

শ্লোক ২

শোকেন শুষ্যদ্বদনহৃৎসরোজো হতপ্রভঃ ।
বিভুং তমেবানুস্মরন্নাশক্নোৎ প্রতিভাষিতুম্ ॥ ২ ॥

শোকেন—শোকহেতু; **শুষ্যদ্বদন**—শুষ্ক বদন; **হৃৎ-সরোজ**—পদ্মসদৃশ হৃদয়; **হতপ্রভঃ**—প্রভাহীন; **বিভুম্**—পরম; **তম্**—শ্রীকৃষ্ণকে; **এব**—অবশ্যই; **অনুস্মরন্**—স্মরণ করে; **ন**—পারে নি; **অশক্নোৎ**—সক্ষম হওয়া; **প্রতিভাষিতুম্**—যথাযথভাবে উত্তর দিতে।

অনুবাদ

গভীর শোকে অর্জুনের মুখ এবং হৃদয়পদ্ম শুষ্ক হয়েছিল। তাই তাঁর দেহ প্রভাহীন হয়েছিল। এখন, পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের স্মৃতি উদয় হওয়ার ফলে তাঁর পক্ষে উত্তর দেওয়া অত্যন্ত কষ্টকর হয়েছিল।

শ্লোক ৩

কৃচ্ছ্রেণ সংস্তভ্য শুচঃ পাণিনামৃজ্য নেত্রয়োঃ।
পরোক্ষেণ সমুন্নদ্ধপ্রণয়ৌৎকণ্ঠ্যকাতরঃ ॥ ৩ ॥

কৃচ্ছ্রেণ—বহু কষ্টে; **সংস্তভ্য**—আবেগ দমন করে; **শুচঃ**—শোকজনিত; **পাণিনা**—হস্ত দ্বারা; **আমৃজ্য**—মুছে; **নেত্রয়োঃ**—চক্ষুদ্বয়; **পরোক্ষেণ**—দৃষ্টির অগোচর হওয়ার ফলে; **সমুন্নদ্ধ**—বর্ধিত; **প্রণয়ৌৎকণ্ঠ্য**—অনুরাগজনিত উৎকণ্ঠা; **কাতরঃ**—কাতর।

অনুবাদ

তখন তিনি অতি কষ্টে বিগলিত শোকাশ্রু সংবরণ করলেন, অশ্রুধারা হস্ত দ্বারা মার্জিত করলেন। শ্রীকৃষ্ণের অদর্শনে তাঁর খুবই উৎকণ্ঠা হয়েছিল বলে অত্যন্ত কাতর হয়ে পড়লেন।

শ্লোক ৪

সখ্যং মৈত্রীং সৌহৃদং চ সারথ্যাদিষু সংস্মরন্।
নৃপমগ্রজমিত্যাহ বাষ্পগদ্গদয়া গিরা ॥ ৪ ॥

সখ্যম্—শুভাকাঙ্ক্ষী; **মৈত্রীম্**—উপকারিতা; **সৌহৃদম্**—সৌহার্দ্য; **চ**—ও; **সারথ্যাদিষু**—সারথ্য আদি; **সংস্মরন্**—স্মরণ করে; **নৃপম্**—মহারাজকে; **অগ্রজম্**—জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা; **ইতি**—এইভাবে; **আহ**—বলেছিলেন; **বাষ্প**—অশ্রু **গদ্গদয়া**—গদ্গদ; **গিরা**—স্বরে।

অনুবাদ

শ্রীকৃষ্ণের সখ্যভাব, মিত্রতা, বন্ধুত্ব এবং সারথ্য আদি কার্যের কথা স্মরণ করে অর্জুন বাষ্প গদ্‌গদ স্বরে অগ্রজ যুধিষ্ঠিরকে বলতে লাগলেন।

তাৎপর্য

পরমেশ্বর ভগবান তাঁর শুদ্ধ ভক্তদের সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক-সম্বন্ধের মাঝে অতি সর্বাঙ্গসুন্দর। সখ্য রসে অর্জুন ভগবানের শুদ্ধ ভক্তদের অন্যতম, এবং অর্জুনের প্রতি ভগবানের আচরণ বন্ধুত্বের সর্বোত্তম আদর্শ। তিনি কেবল অর্জুনের শুভাকাঙ্ক্ষী ছিলেন, তাই নয়, তিনি ছিলেন তাঁর পরম হিতকারী এবং সেই সম্পর্ক আরও ঘনিষ্ঠ করার জন্য তিনি সুভদ্রার সঙ্গে তাঁর বিবাহের আয়োজন করে তাঁকে আত্মীয়তার বন্ধনে আবদ্ধ করেছিলেন। অধিকন্তু, যুদ্ধে তাঁকে রক্ষা করার জন্য ভগবান তাঁর রথের সারথিও হয়েছিলেন, এবং পৃথিবীর একচ্ছত্র সম্রাট রূপে পাণ্ডবদের অধিষ্ঠিত করে তিনি বাস্তবিকই সুখী হয়েছিলেন। সেই সমস্ত কথা একে একে স্মৃতি পথে উদিত হওয়ায় অর্জুন অত্যন্ত শোকাচ্ছন্ন হয়ে পড়েছিলেন।

শ্লোক ৫

অর্জুন উবাচ

বঞ্চিতোঽহং মহারাজ হরিণা বন্ধুরূপিণা ।
যেন মেঽপহৃতং তেজো দেববিস্মাপনং মহৎ ॥ ৫ ॥

অর্জুন উবাচ—অর্জুন বললেন; **বঞ্চিতঃ**—বঞ্চিত হয়েছি; **অহম্**—আমি; **মহারাজ**—হে মহারাজ; **হরিণা**—পরমেশ্বর ভগবান কর্তৃক; **বন্ধুরূপিণা**—বন্ধুরূপী; **যেন**—যাঁর দ্বারা; **মে**—আমার; **অপহৃতম্**—অপহৃত; **তেজঃ**—বীর্য; **দেব**—দেবতারা; **বিস্মাপনম্**—বিস্মিত; **মহৎ**—বিপুল।

অনুবাদ

অর্জুন বললেন—মহারাজ! পরমেশ্বর ভগবান শ্রীহরি, যিনি আমার প্রতি ঘনিষ্ঠ বন্ধুর মতো আচরণ করতেন, তিনি আজ আমাকে ছেড়ে চলে গেছেন। তাই আমার যে বিপুল তেজ দেবতাদেরও বিস্ময় উৎপাদন করত, তা অপহৃত হয়েছে।

তাৎপর্য

ভগবদ্গীতায় (১০/৪১) ভগবান বলেছেন, "এই বিশ্বে যেখানেই বিশেষ ঐশ্বর্য, বীর্য, শ্রী, জ্ঞান আদি বিভূতি দেখা যায়, তা সবই আমার সম্যক্ শক্তির এক নগণ্য অংশ মাত্র।" তাই ভগবানের কৃপা ব্যতীত স্বতন্ত্রভাবে কেউই কোন রকম শক্তির প্রকাশ করতে পারে না। ভগবান যখন তাঁর নিত্য মুক্ত পার্ষদ পরিবৃত হয়ে এই পৃথিবীতে অবতরণ করেন, তখন তিনি কেবল তাঁর নিজেরই দিব্য শক্তি প্রদর্শন করেন, তা নয়, তাঁর পার্ষদ ভক্তদেরও তাঁর শক্তিতে আবিষ্ট করে তাঁর অবতরণের উদ্দেশ্য সাধন করেন।

ভগবদ্গীতায় (৪/৫) বর্ণিত হয়েছে ভগবান এবং তাঁর নিত্য পার্ষদেরা এই পৃথিবীতে বার বার অবতরণ করেন। তাঁর সেই সমস্ত অবতরণের কথা ভগবানের মনে থাকে, কিন্তু তাঁর ইচ্ছার প্রভাবে তাঁর ভক্তেরা তাঁদের অবতরণের কথা ভুলে যান। তেমনই, ভগবান যখন এই পৃথিবী থেকে তাঁর লীলা সংবরণ করেন, তখন তিনি তাঁর পার্ষদদেরও তাঁর সঙ্গে নিয়ে যান। ভগবান তাঁর অবতরণের উদ্দেশ্য সাধন করার জন্য অর্জুনকে যে তেজ এবং বীর্যে আবিষ্ট করেছিলেন, তাঁর উদ্দেশ্য সাধনের পর দেবতাদেরও বিস্ময় উৎপাদনকারী অর্জুনের সেই অলৌকিক শক্তি অপহরণ করেছিলেন, কারণ ভগবদ্ধামে ফিরে যাওয়ার জন্য সেই সমস্ত শক্তির কোন প্রয়োজন ছিল না।

অর্জুনের মতো মহান্ ভক্ত অথবা স্বর্গের দেবতারাও যদি ভগবানের শক্তিতে আবিষ্ট হন এবং ভগবানের দ্বারাই সেই শক্তি থেকে বঞ্চিত হন, তা হলে তাঁদের তুলনায় অতি নগণ্য সাধারণ জীবদের কথা বলে আর কি হবে! অতএব কারও পক্ষেই ভগবানের কাছ থেকে ধার করা শক্তিতে গর্বিত হওয়া উচিত নয়।

প্রকৃতিস্থ মানুষের কর্তব্য ভগবানের এই ধরনের কৃপার জন্য কৃতজ্ঞতা অনুভব করে ভগবানের সেবায় তাঁর সেই শক্তিকে নিয়োজিত করা। ভগবান যে কোন সময় সেই শক্তি প্রত্যাহার করে নিতে পারেন, তাই ভগবানের সেবাতেই এই ধরনের শক্তি এবং ঐশ্বর্যের প্রয়োগ করাই হল সেগুলির সর্বোত্তম উপযোগিতা।

শ্লোক ৬

যস্য ক্ষণবিয়োগেন লোকো হ্যপ্রিয়দর্শনঃ ।
উক্থেন রহিতো হ্যেষ মৃতকঃ প্রোচ্যতে যথা ॥ ৬ ॥

যস্য—যার; ক্ষণ—এক পলক; বিয়োগেন—বিরহের ফলে; লোকঃ—সমগ্র জগৎ; হি—অবশ্যই; অপ্রিয়-দর্শনঃ—সব কিছু অপ্রিয় বলে মনে হয়; উক্থেন—প্রাণের

দ্বারা; রহিতঃ—বিযুক্ত; হি—অবশ্যই; এষঃ—এই সমস্ত; মৃতকঃ—মৃত দেহগুলি; প্রোচ্যতে—বলা হয়; যথা—যেমন।

অনুবাদ

আমি তাঁকে হারিয়েছি যাঁর ক্ষণকালের বিরহে এই সমগ্র ভুবনের সব কিছুই প্রাণহীন দেহের মতো অপ্রিয় এবং শূন্য বলে মনে হয়।

তাৎপর্য

প্রকৃতপক্ষে কোন জীবের কাছেই ভগবানের থেকে প্রিয়তর আর কিছুই নেই। ভগবান স্বাংশ এবং বিভিন্নাংশ রূপে নিজেকে অসংখ্য রূপে বিস্তার করেন। পরমাত্মা হচ্ছেন ভগবানের স্বাংশ, আর জীব হচ্ছে তাঁর বিভিন্নাংশ। আত্মা জড় দেহের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, কারণ আত্মাহীন জড় দেহের কোনই মূল্য নেই; তেমনই পরমাত্মা বিনা আত্মারও কোন গুরুত্ব বা মর্যাদা নেই। আবার তেমনই, পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ব্যতীত ব্রহ্ম অথবা পরমাত্মারও কোন অস্তিত্ব নেই; সে-কথা শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় বিস্তারিতভাবে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। তারা সকলেই পরস্পরের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত, অথবা পরস্পর নির্ভরশীল; তাই চূড়ান্ত বিচারে ভগবানই হচ্ছেন সমস্ত কিছুর পরম তত্ত্ব বা সর্ব কারণের পরম কারণ।

শ্লোক ৭

যৎসংশ্রয়াদ্ দ্রুপদগেহমুপাগতানাং
রাজ্ঞাং স্বয়ংবরমুখে স্মরদুর্মদানাম্ ।
তেজো হৃতং খলু ময়াভিহতশ্চ মৎস্যঃ
সজ্জীকৃতেন ধনুষাধিগতা চ কৃষ্ণা ॥ ৭ ॥

যৎ—যাঁর কৃপায়; সংশ্রয়াৎ—বলের দ্বারা; দ্রুপদ-গেহম্—মহারাজ দ্রুপদের প্রাসাদে; উপাগতানাম্—সমুপস্থিত সকলে; রাজ্ঞাম্—রাজা এবং রাজপুত্রদের; স্বয়ংবর-মুখে—স্বয়ংবর সভায়; স্মরদুর্মদানাম্—কামোন্মত্ত; তেজঃ—শক্তি; হৃতম্—পরাভূত হয়েছিল; খলু—যথাযথভাবে; ময়া—আমার দ্বারা; অভিহতঃ—বিদ্ধ হয়েছিল; চ—ও; মৎস্যঃ—মৎস্যাকৃতির লক্ষ্য; সজ্জীকৃতেন—জ্যা আরোপণ করে; ধনুষা—ধনুকের দ্বারা, অধিগতা—প্রাপ্ত হয়েছিলাম; চ—ও; কৃষ্ণা—দ্রৌপদী।

অনুবাদ

আমি কেবল তাঁরই কৃপার বলে বলীয়ান্ হয়ে, দ্রুপদ রাজভবনে স্বয়ংবর সভায় সমাগত কামোন্মত্ত নৃপতিদের প্রভাব পরাভূত করেছিলাম। আমার ধনুকের জ্যা আরোপণ করে মৎস্যরূপী লক্ষ্য বিদ্ধ করেছিলাম এবং তার ফলে দ্রৌপদীকে লাভ করেছিলাম।

তাৎপর্য

দ্রৌপদী ছিলেন মহারাজ দ্রুপদের পরমা সুন্দরী কন্যা, এবং যখন তিনি তরুণী বালিকা ছিলেন, তখনই তাঁর রূপে মুগ্ধ হয়ে প্রায় সমস্ত রাজা এবং রাজপুত্রেরাই তাঁর পাণিগ্রহণের আকাঙ্ক্ষী হয়েছিলেন। কিন্তু মহারাজ দ্রুপদ অর্জুনের হস্তেই তাঁর কন্যাকে সমর্পণ করতে চেয়েছিলেন, এবং তাই তিনি এক অদ্ভুত উপায় উদ্ভাবন করেছিলেন। বাড়ির ছাদে ঝোলানো একটি চক্রের আড়ালে একটি মৎস্য ঝুলিয়ে রাখা হয়েছিল, এবং ওপরে তাকিয়ে সেটি কাউকে লক্ষ্য করতে দেওয়া হয়নি। ভূমিতে একটি পাত্রে জলের মধ্যে সেই চক্র এবং মৎস্যের প্রতিবিম্ব দেখা যাচ্ছিল এবং সেই পাত্রের কম্পমান জলের মধ্যে তাকিয়ে সেই লক্ষ্য বিদ্ধ করতে বলা হয়।

মহারাজ দ্রুপদ ভালভাবেই জানতেন যে, কেবল অর্জুন, অথবা তা না হলে কর্ণ সার্থকভাবে সেই লক্ষ্য ভেদ করতে সক্ষম। কিন্তু তবু তিনি চেয়েছিলেন অর্জুনের হস্তেই কেবল তাঁর কন্যাকে সমর্পণ করতে। আর সেই রাজপুত্রদের সমবেত স্বয়ংবর সভায় রাজন্যবর্গের সম্মুখে দ্রৌপদীর ভ্রাতা ধৃষ্টদ্যুম্ন যখন তাঁর বয়স্থা ভগিনী দ্রৌপদীর পরিচয় করিয়ে দেন, তখন কর্ণ সেই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। কিন্তু দ্রৌপদী চতুরতার সঙ্গে অর্জুনের প্রতিদ্বন্দ্বীরূপে কর্ণকে পরিহার করেন, এবং তিনি তাঁর ভাই ধৃষ্টদ্যুম্নের মাধ্যমে তাঁর বাসনা ব্যক্ত করেন যে, ক্ষত্রিয়ের থেকে অধম কোন পুরুষের পাণিগ্রহণ করতে তিনি অক্ষম। বৈশ্য এবং শূদ্রেরা হচ্ছেন ক্ষত্রিয়ের থেকে অধম। কর্ণকে সকলেই এক শূদ্রসূত পুত্ররূপে জানতেন। তাই এই অজুহাতে দ্রৌপদী কর্ণকে প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। দরিদ্র ব্রাহ্মণবেশী অর্জুন যখন কঠিন লক্ষ্যভেদ করেন, তখন প্রত্যেকেই অত্যন্ত বিস্মিত হয়েছিলেন, এবং তাঁরা সকলেই, বিশেষ করে কর্ণ, অর্জুনের সঙ্গে প্রচণ্ড সংগ্রামে লিপ্ত হন, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের কৃপায় সচরাচর যেমন ঘটে থাকে, তেমনই রাজন্যবর্গের সাথে যুদ্ধের মাধ্যমে অর্জুন তাদের সকলকে পরাস্ত করে কৃষ্ণা বা দ্রৌপদীর মর্যাদামণ্ডিত পাণিগ্রহণের সৌভাগ্য লাভ করেছিলেন। যাঁর বলে বলীয়ান্ হয়ে

অর্জুন এই ধরনের অপূর্ব ক্ষমতার অধিকারী হয়েছিলেন, সেই পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের বিরহে সেই ঘটনা স্মরণ করে অর্জুন শোক প্রকাশ করছিলেন।

শ্লোক ৮

যৎ সন্নিধাবহমু খাণ্ডবমগ্নয়েঽদা-
মিন্দ্রং চ সামরগণং তরসা বিজিত্য।
লব্ধা সভা ময়কৃতাদ্ভুতশিল্পমায়া
দিগ্‌ভ্যোঽহরন্নৃপতয়ো বলিমধ্বরে তে ॥ ৮ ॥

যৎ—যাঁর; **সন্নিধৌ**—সন্নিধানে; **অহম্**—আমি; **উ**—বিস্ময়সূচক শব্দ; **খাণ্ডবম্**—দেবরাজ ইন্দ্র কর্তৃক সুরক্ষিত বন; **অগ্নয়ে**—অগ্নিদেবকে; **অদাম্**—অর্পণ করেছিলাম; **ইন্দ্রম্**—ইন্দ্রকে; **চ**—ও; **স**—সহ; **অমরগণম্**—দেবগণ; **তরসা**—দক্ষতা সহকারে; **বিজিত্য**—পরাভূত করে; **লব্ধা**—লাভ করে; **সভা**—রাজসভা; **ময়-কৃতা**—ময়দানব কর্তৃক নির্মিত; **অদ্ভুত**—অতি আশ্চর্যজনক; **শিল্প**—শিল্পনৈপুণ্য; **মায়া**—মায়াময়ী শক্তি; **দিগ্‌ভ্যঃ**—চতুর্দিক থেকে; **অহরন্**—সমাগত; **নৃপতয়ঃ**—নরপতিগণ; **বলিম্**—উপহারসমূহ; **অধ্বরে**—প্রদান করেছিলেন; **তে**—আপনাকে।

অনুবাদ

তিনি নিকটে ছিলেন বলেই দক্ষতা সহকারে আমি দেবতাগন সহ মহাবলবান ইন্দ্রদেবকে জয় করতে সক্ষম হয়েছিলাম, এবং তাই অগ্নিদেবকে খাণ্ডব বন দহন করতে দিতে পেরেছিলাম। কেবল তাঁরই করুণায় সেই জ্বলন্ত খাণ্ডব বনের মধ্যে থেকে ময়দানব রক্ষা পেয়েছিল, এবং তাই আমাদের আশ্চর্য স্থাপত্য শিল্পমণ্ডিত মায়াময়ী সভাগৃহটি আমরা গড়ে তুলতে পেরেছিলাম—যে-সভাগৃহে সমস্ত নরপতিরা রাজসূয় যজ্ঞের অনুষ্ঠানে সমবেত হয়েছিলেন এবং আপনাকে শ্রদ্ধার্ঘ নিবেদন করেছিলেন।

তাৎপর্য

ময়দানব খাণ্ডব বনে বাস করত; এবং খাণ্ডব বন দহনের সময়, সে অর্জুনের সাহায্য ভিক্ষা করেছিল। অর্জুন তার প্রাণ রক্ষা করেন এবং তার ফলে দানবটি তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা স্বরূপ সে পাণ্ডবদের জন্য এক বিস্ময়কর সভাগৃহ গড়ে দিয়ে তার প্রতিদান করেছিল, যা বিভিন্ন রাজ্যের নৃপতিদের অসাধারণ মনোযোগ আকর্ষণ

করেছিল। তাঁরা পাণ্ডবদের অলৌকিক অতিপ্রাকৃত শক্তি অনুভব করতে পেরেছিলেন, এবং তার ফলে তাঁরা নিঃসঙ্কোচে মহারাজ যুধিষ্ঠিরের বশ্যতা স্বীকার করেন এবং তাঁকে শ্রদ্ধার্ঘ প্রদান করে।

দানবেরা তাদের বিস্ময়কর এবং অতিপ্রাকৃত মায়াশক্তির প্রভাবে জড়জাগতিক বিস্ময় উৎপাদন করবার ক্ষমতা রাখে। কিন্তু তারা সর্বদাই সমাজে উৎপাত সৃষ্টিকারী। অনিষ্টকারী জড় বৈজ্ঞানিকেরা হচ্ছে আধুনিক যুগের দানব, যারা কিছু কিছু জড়জাগতিক বিস্ময় উৎপাদন করে সমাজে উৎপাতের সৃষ্টি করে। যেমন, পারমাণবিক অস্ত্রের সৃষ্টি মানব সমাজে বেশ কিছুটা সন্ত্রাসের কারণ হয়েছে।

ময় ছিল তেমনই একজন জড়বাদী, এবং এই ধরনের আশ্চর্যজনক বস্তু সৃষ্টি করার কৌশল তার জানা ছিল এবং তা সত্ত্বেও শ্রীকৃষ্ণ তাকে হত্যা করতে চেয়েছিলেন। সে যখন অগ্নি এবং শ্রীকৃষ্ণের চক্র উভয়ের দ্বারা আক্রান্ত ও পশ্চাদ্ধাবিত হয়েছিল, তখন সে অর্জুনের মতো এক ভগবদ্ভক্তের আশ্রয় গ্রহণ করে, এবং অর্জুন তাকে শ্রীকৃষ্ণের ক্রোধাগ্নি থেকে রক্ষা করেন।

সুতরাং ভগবদ্ভক্তরা ভগবানের থেকেও অধিক কৃপাময়, এবং ভগবদ্ভক্তির মার্গে ভগবানের কৃপা থেকে ভক্তের কৃপা অধিক বলবান। অগ্নিদেব এবং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যখন দেখেন যে, অর্জুনের মতো এক মহান্ ভক্ত তাকে আশ্রয় দান করেছেন, তখন তাঁরা উভয়েই সেই অসুরটির পশ্চাদ্ধাবন থেকে বিরত হন।

ময়দানব তখন অর্জুনের প্রতি তার কৃতজ্ঞতা প্রদর্শন করার মানসে তাঁর কিছু সেবা করতে চায়, কিন্তু বিনিময়ে অর্জুন কিছু গ্রহণ করতে চাননি। শ্রীকৃষ্ণ অবশ্য তাঁর ভক্তের আশ্রয় গ্রহণ করার জন্য ময়দানবের প্রতি প্রসন্ন হন এবং তাঁকে নির্দেশ দেন যুধিষ্ঠির মহারাজের জন্য একটি আশ্চর্যজনক সভাগৃহ তৈরি করে দিতে। ভগবদ্ভক্তির পন্থা হচ্ছে যে, ভক্তের কৃপায় ভগবানের কৃপা লাভ হয়, এবং ভগবানের কৃপায় ভগবদ্ভক্তের সেবা করার সুযোগ পাওয়া যায়। ভীমসেনের গদাটিও ময়দানবের উপহার।

শ্লোক ৯

যত্তেজসা নৃপশিরোঽঙ্‌ঘ্রিমহন্মখার্থম্
আর্যোঽনুজস্তব গজাযুতসত্ত্ববীর্যঃ ।
তেনাহৃতাঃ প্রমথনাথমখায় ভূপা
যন্মোচিতাস্তদনয়ন্ বলিমধ্বরে তে ॥ ৯ ॥

যৎ—যাঁর; **তেজসা**—তেজ প্রভাবে; **নৃপ-শিরঃ-অঙ্ঘ্রিম্**—যাঁর পা রাজাদের মস্তক দ্বারা ভূষিত; **অহন্**—হত্যা করা হয়েছিল; **মখ-অর্থম্**—যজ্ঞের জন্য; **আর্যঃ**—সম্মানীয়; **অনুজঃ**—কনিষ্ঠ ভ্রাতা; **তব**—তোমার; **গজ-অযুত**—দশ সহস্র হস্তী; **সত্ত্ববীর্যঃ**—শক্তিশালী অস্তিত্ব; **তেন**—তাঁর দ্বারা; **আহৃতাঃ**—আহরণ করা হয়েছিল; **প্রমথনাথ**—ভূতেদের দেবতা (মহাভৈরব); **মখায়**—যজ্ঞের জন্য; **ভূপাঃ**—রাজাগণ; **যৎ-মোচিতাঃ**—যাঁর দ্বারা তাঁরা মুক্ত হয়েছিলেন; **তৎ-অনয়ন্**—তাঁরা সকলেই নিয়ে এসেছিলেন; **বলিম্**—কর; **অধ্বরে**—উপহার দিয়েছিলেন; **তে**—তোমার।

অনুবাদ

দশ হাজার হাতির শক্তি সমন্বিত আপনার ভ্রাতা ভগবানেরই কৃপায় বধ করেছিলেন জরাসন্ধকে, যার পদযুগল বহু নৃপতিদের দ্বারা পূজিত হত। জরাসন্ধের মহাভৈরব যজ্ঞে বলি দেওয়ার জন্য এই সমস্ত রাজাদের নিয়ে আসা হয়েছিল, কিন্তু তাঁরা এইভাবে মুক্ত হয়েছিলেন। পরে তাঁরা আপনাকে কর প্রদান করেছিলেন।

তাৎপর্য

জরাসন্ধ ছিল মগধের এক অতি শক্তিশালী রাজা এবং তার জন্ম এবং কার্যকলাপও খুব চিত্তাকর্ষক। তার পিতাও মহারাজ বৃহদ্রথ ছিলেন মগধের অত্যন্ত পরাক্রমশালী এবং সমৃদ্ধিশালী রাজা, কিন্তু কাশীরাজের দুই কন্যাকে বিবাহ করা সত্ত্বেও তাঁর কোন পুত্র ছিল না। দুই পত্নী থেকেই পুত্র লাভে নিরাশ হয়ে রাজা পত্নীসহ গৃহত্যাগ করে তপস্যা করার জন্য বনে যান, কিন্তু বনে এক মহান্ ঋষির কাছে পুত্রলাভের বর পান আর সেই মহর্ষি রানীদের খাওয়ানোর জন্য একটি আম তাঁকে দেন। রানীরা আমটি খান এবং অচিরেই গর্ভবতী হন। এইভাবে রানীদের গর্ভবতী হতে দেখে রাজা অত্যন্ত আনন্দিত হন, কিন্তু যখন প্রসবের সময় উপস্থিত হয়, তখন দুই রানীর গর্ভ থেকে দুই ভাগে বিভক্ত একটি শিশু উৎপন্ন হয়। সেই দুটি ভাগ বনে ফেলে দেওয়া হয়, যেখানে এক রাক্ষসী বাস করত। এক নবজাত শিশুর কোমল মাংস এবং রক্ত পেয়ে সেই রাক্ষসীটি খুশি হয়, এবং কৌতূহলের বশে সে যখন দুটি অংশকে একত্রিত করে, তখন সেই শিশুটি পূর্ণতা প্রাপ্ত হয় এবং জীবন লাভ করে।

সেই রাক্ষসীটির নাম ছিল জরা, এবং সে নিঃসন্তান রাজার প্রতি কৃপাপরবশ হয়ে রাজাকে সেই সুন্দর শিশুটি উপহার দেয়। রাজা তখন রাক্ষসীটির প্রতি অত্যন্ত প্রসন্ন হয়ে তাকে ইচ্ছা অনুসারে কোন পুরস্কার দিতে চান। রাক্ষসীটি

তখন তাঁকে জানায় যে, তার নাম অনুসারে যেন সেই শিশুটির নামকরণ করা হয়, এবং রাজা তখন তার নাম রাখেন জরাসন্ধ, অর্থাৎ জরা রাক্ষসী যাকে যুক্ত করেছিল।

আসলে, বিপ্রচিত্তি নামে অসুরের অবিচ্ছেদ্য অংশ রূপে এই জরাসন্ধ জন্মেছিল। রানীদের সন্তান লাভের জন্য যে মহাত্মা বরদান করেন, তাঁর নাম ছিল চন্দ্রকৌশিক, এবং তিনি সেই শিশুটির পিতা বৃহদ্রথকে শিশুটি সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন।

জন্ম থেকেই জরাসন্ধ আসুরিক ভাবাপন্ন হওয়ার ফলে, সে স্বাভাবিকভাবেই সমস্ত ভূত এবং আসুরিক ভাবাপন্ন মানুষদের ঈশ্বর শিবের পরম ভক্ত হয়। রাবণও ছিল শিবের পরম ভক্ত। শিবভক্ত জরাসন্ধ সমস্ত বন্দী রাজাদের মহাভৈরবের কাছে (শিবের কাছে) বলি দিত, এবং তার দুর্ধর্ষ সামরিক শক্তির প্রভাবে সে বহু রাজাদের বন্দী করে রেখেছিল মহাভৈরবের কাছে বলি দেওয়ার জন্য।

পূর্বে মগধ নামে পরিচিত বিহার প্রদেশে মহাভৈরব বা কালভৈরবের বহু ভক্ত রয়েছে। জরাসন্ধ ছিল শ্রীকৃষ্ণের মাতুল কংসের আত্মীয়, এবং তাই কংসের মৃত্যুর পর জরাসন্ধ শ্রীকৃষ্ণের ঘোর শত্রুতে পরিণত হয়েছিল, এবং শ্রীকৃষ্ণ ও জরাসন্ধের মধ্যে বহু সংগ্রাম হয়েছিল। শ্রীকৃষ্ণ জরাসন্ধকে সংহার করতে চেয়েছিলেন, কিন্তু তার সামরিক বাহিনীতে নিযুক্ত মানুষদের সংহার করতে চাননি। তাই তিনি তাকে হত্যা করার একটি পরিকল্পনা করেন। ভীম এবং অর্জুনকে নিয়ে তিনি দরিদ্র ব্রাহ্মণের ছদ্মবেশে জরাসন্ধের কাছে যান এবং তার কাছে দান ভিক্ষা করেন। কোন ব্রাহ্মণ কখনও জরাসন্ধের কাছে দান ভিক্ষা করলে জরাসন্ধ কখনও তাকে প্রত্যাখ্যান করত না। জরাসন্ধ বহু যজ্ঞ অনুষ্ঠান করেছিল কিন্তু তা সত্ত্বেও সে ভগবদ্ভক্তের সমকক্ষ হয়নি। শ্রীকৃষ্ণ, ভীম এবং অর্জুন দান স্বরূপ জরাসন্ধের কাছে যুদ্ধ প্রার্থনা করেন, এবং স্থির হয়েছিল যে, জরাসন্ধ কেবল ভীমের সঙ্গেই মল্লযুদ্ধ করবে। এইভাবে তাঁরা একই সঙ্গে জরাসন্ধের অতিথি এবং তার প্রতিদ্বন্দ্বী হন। ভীম এবং জরাসন্ধ কয়েকদিন ধরে প্রতিদিন মল্লযুদ্ধ করেন। ভীম বিফলমনোরথ হয়ে পড়েছিলেন, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ তাঁকে ইঙ্গিতে জানান যে, জন্মের সময় জরাসন্ধের দেহের দুই অর্ধাংশ যুক্ত করা হয়েছিল। তখন ভীম তার দেহ আবার দ্বিধাবিভক্ত করে তাকে হত্যা করেন।

মহাভৈরবের কাছে বলি দেওয়ার জন্য যে সমস্ত রাজাদের বন্দী করে রাখা হয়েছিল, ভীমের দ্বারা এইভাবে তাঁরা মুক্ত হন। পাণ্ডবদের প্রতি কৃতজ্ঞতা অনুভব করে, তাঁরা মহারাজ যুধিষ্ঠিরকে বন্দনা করেছিলেন এবং নানা প্রকার উপঢৌকন প্রদান করেছিলেন।

শ্লোক ১০

পত্ন্যাস্তবাধিমখক্লৃপ্তমহাভিষেক-
শ্লাঘিষ্ঠচারুকবরং কিতবৈঃ সভায়াম্ ।
স্পৃষ্টং বিকীর্য পদয়োঃ পতিতাশ্রুমুখ্যা
যস্তৎ স্ত্রিয়োঽকৃতহতেশবিমুক্তকেশাঃ ॥ ১০ ॥

পত্ন্যাঃ—পত্নীর; **তব**—তোমার; **অধিমখ**—মহা যজ্ঞোৎসবের সময়; **ক্লৃপ্ত**—বস্ত্র ভূষিত; **মহাভিষেক**—বিশেষভাবে পবিত্র করা হয়েছিল; **শ্লাঘিষ্ঠ**—এইভাবে মহিমান্বিত হয়ে; **চারু**—সুন্দর; **কবরম্**—কবরী; **কিতবৈঃ**—দুষ্টদের দ্বারা; **সভায়াম্**—মহান্ সভায়; **স্পৃষ্টম্**—ধরে; **বিকীর্য**—স্খলিত; **পদয়োঃ**—পায়ে; **পতিত-অশ্রু-মুখ্যাঃ**—অশ্রুপূর্ণ নেত্রে পতিত; **যঃ**—যিনি; **তৎ**—তাদের; **স্ত্রিয়ঃ**—পত্নীগণ; **অকৃত**—হয়েছিল; **হত-ঈশ**—পতি বিহীন; **বিমুক্ত কেশাঃ**—আলুলায়িত কেশ।

অনুবাদ

রাজসূয় যজ্ঞোৎসবে বিশেষভাবে পবিত্র এবং সুন্দর বস্ত্র আভরণে সজ্জিতা তোমার পত্নীকে যখন দুষ্কৃতকারীরা কেশাকর্ষণ করেছিল, তখন সে অশ্রুসিক্ত নয়নে শ্রীকৃষ্ণের চরণে পতিত হয়েছিল, এবং তিনিই সেই দুষ্কৃতকারীদের পত্নীদের কেশ বেণীমুক্ত করেছিলেন।

তাৎপর্য

মহারানী দ্রৌপদীর কেশ ছিল অত্যন্ত সুন্দর এবং তা রাজসূয় যজ্ঞের সময় পবিত্র করা হয়েছিল। কিন্তু দ্যূতক্রীড়ায় তাঁকে পণ রেখে যুধিষ্ঠির যখন তাঁকে হারান, দুঃশাসন তাঁকে অপমান করার উদ্দেশ্যে তাঁর মহিমামণ্ডিত কেশ আকর্ষণ করে, দ্রৌপদী তখন শ্রীকৃষ্ণের চরণে পতিত হন, এবং শ্রীকৃষ্ণ স্থির করেছিলেন যে, কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের ফলস্বরূপ দুঃশাসন এবং তার গোষ্ঠীর সকলের পত্নীদের কেশ বেণীমুক্ত হবে। তাই কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের পর, যখন ধৃতরাষ্ট্রের সমস্ত পুত্র এবং পৌত্রেরা হত হয়েছিল, তখন তাদের সকলের পত্নীরা বৈধব্য দশা বরণ করে কেশ বেণীমুক্ত করতে বাধ্য হয়েছিল। অর্থাৎ ভগবানের এক পরম ভক্তকে দুঃশাসন অপমান করেছিল বলেই কুরুবংশের সমস্ত স্ত্রীরা বিধবা হয়েছিল।

কোনও দুষ্কৃতকারী ভগবানকে অপমান করলে তিনি তা সহ্য করতে পারেন, কেননা পুত্র পিতাকে অপমান করলেও পিতা তা সহ্য করেন। কিন্তু তিনি কখনও তাঁর ভক্তের অপমান সহ্য করতে পারেন না। কোন মহাত্মাকে অপমান করলে মানুষ তার সমস্ত পুণ্যের ফল কৃপাশীর্বাদ সব কিছুই হারায়।

শ্লোক ১১

যো নো জুগোপ বন এত্য দুরন্তকৃচ্ছ্রাদ্
দুর্বাসসোঽরিরচিতাদযুতাগ্রভুগ্‌যঃ ।
শাকান্নশিষ্টমুপযুজ্য যতস্ত্রীলোকীং
তৃপ্তামমংস্ত সলিলে বিনিমগ্নসংঘঃ ॥ ১১ ॥

যঃ—যিনি; **নঃ**—আমরা; **জুগোপ**—রক্ষা করেছিলেন; **বন**—বনে; **এত্য**—প্রবেশ করে; **দুরন্ত**—ভয়ানক; **কৃচ্ছ্রাৎ**—সঙ্কট থেকে; **দুর্বাসসঃ**—দুর্বাসা মুনির; **অরি**—শত্রু; **রচিতাৎ**—রচিত; **অযুত**—দশ সহস্র; **অগ্রভুক্**—অগ্রে আহারকারী; **যঃ**—যিনি; **শাক-অন্ন-শিষ্টম্**—ভুক্তাবশেষ; **উপযুজ্য**—গ্রহণ করে; **যতঃ**—যেহেতু; **ত্রিলোকীম্**—ত্রিভুবন; **তৃপ্তাম্**—পরিতৃপ্ত; **অমংস্ত**—মনে মনে চিন্তা করেছিলেন; **সলিলে**—জলে; **বিনিমগ্নসংঘঃ**—স্বগোষ্ঠী জলে নিমজ্জিত হয়ে।

অনুবাদ

আমাদের বনবাসের সময়, আমাদের ভয়ঙ্কর সঙ্কটে ফেলার জন্য আমাদের শত্রুরা, দুর্বাসা মুনিকে, যিনি তাঁর অযুত শিষ্যসহ ভোজন করেন, আমাদের আশ্রমে পাঠিয়েছিলেন। সেই সময় তিনি (শ্রীকৃষ্ণ), শাকান্নের অবশিষ্টমাত্র গ্রহণ করেই আমাদের রক্ষা করেছিলেন। ঐভাবে তিনি অন্ন গ্রহণ করেছিলেন বলে নদীতে স্নানরত মুনিগোষ্ঠী বিপুল পরিমাণে আহারের পরিতৃপ্তি অনুভব করেছিলেন আর সমগ্র ত্রিভুবনও তাতে পরিতৃপ্ত হয়েছিল।

তাৎপর্য

দুর্বাসা মুনি ঃ কঠোর তপশ্চর্যা সহকারে ধর্মনীতি অনুশীলনে বদ্ধপরিকর এক শক্তিশালী ব্রহ্মজ্ঞ যোগী ব্রাহ্মণ। তাঁর নাম বহু ঐতিহাসিক ঘটনার সঙ্গে জড়িত, এবং মনে হয় যে তিনি শিবের মতোই অতি সহজে প্রসন্ন হতেন এবং অল্প দোষেই আবার অত্যন্ত রুষ্ট হতেন। তিনি যখন প্রসন্ন হতেন, তখন তিনি তাঁর সেবকের প্রভূত কল্যাণ সাধন করতেন, কিন্তু রুষ্ট হলে, চরম দুর্দশার সৃষ্টি করতে পারতেন। কুমারী কুন্তী তাঁর পিতৃগৃহে সমস্ত মহান্ ব্রাহ্মণদের সব রকম পরিচর্যা করতেন, এবং তাঁর সেবায় প্রসন্ন হয়ে দুর্বাসা মুনি তাঁকে বর দিয়েছিলেন যে, তাঁর ইচ্ছা অনুসারে তিনি যে কোন দেবতাকে আহ্বান করতে পারবেন। দুর্বাসা মুনি ছিলেন শিবের অংশাবতার, তাই তিনি অল্পেই সন্তুষ্ট হতেন অথবা রুষ্ট হতেন। তিনি

ছিলেন শিবের পরম ভক্ত, এবং শিবের আদেশে তিনি শ্বেতকেতুর শতবর্ষব্যাপী যজ্ঞে পুরোহিত হতে সম্মত হন। মাঝে মাঝে তিনি ইন্দ্রদেবের স্বর্গ সভায় যেতেন। তাঁর বিপুল যোগ শক্তির সাহায্যে তিনি মহাশূন্যে বিচরণ করতে পারতেন এবং তিনি জড় জগতের ঊর্ধ্বে বৈকুণ্ঠলোক পর্যন্ত বহু দূর অবধি বিচরণ করেছিলেন। সারা পৃথিবীর রাজা এবং ভগবানের পরম ভক্ত মহারাজ অম্বরীষের সঙ্গে তাঁর কলহের সময়ে তিনি এই দীর্ঘ দূরত্ব এক বছরে অতিক্রম করেছিলেন।

তাঁর দশ হাজার শিষ্য ছিল, এবং যখনই তিনি কোন ক্ষত্রিয় রাজার আতিথ্য বরণ করতেন, তখন তিনি তাঁর বেশ কয়েকজন শিষ্যদেরও নিয়ে যেতেন। এক সময় তিনি মহারাজ যুধিষ্ঠিরের শত্রু এবং পিতৃব্য পুত্র দুর্যোধনের গৃহে যান। দুর্যোধন যথেষ্ট বুদ্ধিমানের মতোই সর্বতোভাবে সেই ব্রাহ্মণকে সন্তুষ্ট করেছিল এবং সেই মহান ঋষি, দুর্যোধনকে কিছু বর দিতে চেয়েছিলেন। দুর্যোধন তাঁর অলৌকিক ক্ষমতা সম্বন্ধে জানত আর সে এও জানত যে, এই যোগী-ব্রাহ্মণ যদি অসন্তুষ্ট হন, তা হলে তিনি ব্যাপক ধ্বংসের কারণ হতে পারেন এবং এইভাবে এই ব্রাহ্মণকে তার শত্রু, জ্ঞাতিভাই পাণ্ডবদের উপর ক্রোধ প্রদর্শনে নিযুক্ত করার জন্য সে এক পরিকল্পনা করেছিল। সেই ঋষি যখন দুর্যোধনকে কিছু বর দিতে চাইলেন, তখন সে তাঁকে জানিয়েছিল যে, তিনি যেন তার জ্ঞাতিভাইদের মধ্যে জ্যেষ্ঠ মহারাজ যুধিষ্ঠিরের গৃহে পদার্পণ করেন। দুর্যোধন অনুরোধ করেছিলেন তিনি যেন দ্রৌপদীসহ তাদের সকলের ভোজন সমাপ্ত হওয়ার পর সেখানে যান। দুর্যোধন জানত যে, দ্রৌপদীর ভোজন হয়ে যাওয়ার পর, মহারাজ যুধিষ্ঠিরের পক্ষে এই রকম বিপুলসংখ্যক ব্রাহ্মণ অতিথিদের প্রসাদে আপ্যায়িত করা অসম্ভব হবে আর তাতে ঋষি অসন্তুষ্ট হবেন এবং তার জ্ঞাতিভাই মহারাজ যুধিষ্ঠিরের জন্য কোন এক মহা বিপদের সৃষ্টি করবেন। এটিই ছিল দুর্যোধনের পরিকল্পনা। দুর্বাসা মুনি এই প্রস্তাবে সম্মত হন এবং দুর্যোধনের পরিকল্পনা অনুসারে মহারাজ এবং দ্রৌপদীর ভোজন সমাপ্ত হওয়ার পর বনবাসী মহারাজের কাছে উপস্থিত হন।

মহারাজ যুধিষ্ঠিরের দুয়ারে আসা মাত্রই তাঁকে স্বাগত জানানো হয়, এবং মহারাজ তাঁকে অনুরোধ করেন মধ্যাহ্নিক ধর্মকৃত্য নদীতে সমাপন করতে, ততক্ষণে তাঁদের ভোজন তৈরি হয়ে যাবে। দুর্বাসা মুনি তাঁর বিপুলসংখ্যক শিষ্যদের নিয়ে নদীতে স্নান করতে গেলেন, এবং মহারাজ যুধিষ্ঠির তাঁর অতিথিদের কি ভাবে আপ্যায়ন করবেন, তাই নিয়ে অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েন। দ্রৌপদীর আহার গ্রহণ না করা পর্যন্ত যতজন হোক্ অতিথিকে ভোজন করানো যেত, কিন্তু দুর্যোধনের

পরিকল্পনা অনুসারে সেই ঋষি দ্রৌপদীর ভোজনের পর সেখানে উপস্থিত হয়েছিলেন। ভক্তেরা যখন কোন অসুবিধায় পড়েন, তখন তাঁরা একাগ্র চিত্তে ভগবানকে স্মরণ করেন। তাই দ্রৌপদী সেই ভয়ঙ্কর অবস্থায় শ্রীকৃষ্ণকে স্মরণ করেছিলেন, এবং সর্বব্যাপ্ত ভগবান তৎক্ষণাৎ তাঁর ভক্তের বিপদের কথা জানতে পেরেছিলেন। তাই তিনি তখন সেখানে উপস্থিত হয়ে দ্রৌপদীকে বলেন তাঁর কাছে যেটুকু খাদ্য আছে তাই তাঁকে দিতে। ভগবানের এই অনুরোধে দ্রৌপদী অত্যন্ত বিষণ্ণ হলেন, কারণ তাঁর কাছে তখন কোন খাদ্যই আর ছিল না। তখন দ্রৌপদী ভগবানকে বললেন, যদি তিনি নিজে আহার গ্রহণ না করতেন, তা হলে সূর্যদেবের দেওয়া সেই রহস্যময় থালি থেকে অপর্যাপ্ত খাদ্য তিনি সরবরাহ করতে পারতেন। কিন্তু সেদিন ইতিমধ্যেই তাঁর খাওয়া হয়ে গিয়েছিল, এবং তাই তাঁরা এই বিপদের সম্মুখীন হয়েছেন।

তাঁর এই দুর্দশার কথা ব্যক্ত করে দ্রৌপদী ভগবানের সামনে নারীসুলভ ক্রন্দন করতে লাগলেন। ভগবান তখন রন্ধন পাত্রে কোন খাদ্যকণিকা পড়ে আছে কিনা তা দেখবার জন্য পাত্রগুলি আনতে বললেন। এবং দ্রৌপদী দেখলেন যে, রন্ধন পাত্রে কয়েকটি শাকের টুকরো তখনও লেগে রয়েছে। ভগবান তখনই তা তুলে নিয়ে আহার করলেন। আহারের পর তিনি দ্রৌপদীকে বললেন তাঁর অতিথি, গোষ্ঠীসহ দুর্বাসা মুনিকে ভোজন করার জন্য আহ্বান করতে।

ভীমকে নদীতে পাঠানো হল তাঁদের ডাকবার জন্য। তাঁদের কাছে গিয়ে ভীম জিজ্ঞাসা করলেন, "মহাত্মাগণ, আপনারা এত দেরি করছেন কেন? আসুন, আপনাদের ভোজন তৈরি হয়ে আছে।" কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের এক কণা ভোজনের ফলে সেই ব্রাহ্মণেরা অনুভব করলেন যেন নদীতে স্নান করার সময় তাঁরা অপর্যাপ্ত পরিমাণে আহার করেছেন। তাঁরা বিচার করলেন, মহারাজ যুধিষ্ঠির নিশ্চয়ই তাঁদের জন্য বহু মূল্যবান বিবিধ প্রকার আহার্য প্রস্তুত করেছেন এবং যেহেতু ক্ষুধা না থাকায় তাঁরা আর খেতে পারবেন না, তাই যুধিষ্ঠির মহারাজ অত্যন্ত দুঃখিত হবেন, তাই সেখানে না যাওয়াই সমীচীন হবে। এইভাবে তাঁরা সেখান থেকে প্রস্থান করতে মনস্থ করলেন।

এই ঘটনাটি থেকে প্রমাণিত হয় যে, ভগবান হচ্ছেন সর্বশ্রেষ্ঠ যোগী, এবং তাই তিনি যোগেশ্বর নামে পরিচিত। এই ঘটনাটি থেকে আর একটি শিক্ষাও লাভ করা যায় যে, প্রত্যেক গৃহস্থের অবশ্য কর্তব্য হচ্ছে ভগবানকে ভোগ নিবেদন করা, এবং তার ফলে সকলেই, এমন কি দশ সহস্র অতিথি পর্যন্ত, সম্পূর্ণ রূপে তৃপ্ত হবেন। এইটিই ভগবদ্ভক্তির পন্থা।

শ্লোক ১২

যত্তেজসাথ ভগবান্ যুধি শূলপাণি-
র্বিস্মাপিতঃ সগিরিজোঽস্ত্রমদান্নিজং মে ।
অন্যেঽপি চাহমমুনৈব কলেবরেণ
প্রাপ্তো মহেন্দ্রভবনে মহদাসনার্ধম্ ॥ ১২ ॥

যৎ—যার দ্বারা; **তেজসা**—প্রভাবে; **অথ**—এক সময়; **ভগবান্**—দেবাদিদেব মহাদেব; **যুধি**—যুদ্ধে; **শূলপাণিঃ**—ত্রিশূলধারী; **বিস্মাপিতঃ**—বিস্মিত; **সগিরিজঃ**—হিমালয়ের কন্যাসহ; **অস্ত্রম্**—অস্ত্র; **অদাৎ**—দান করেছিলেন; **নিজম্**—তাঁর নিজের; **মে**—আমাকে; **অন্যেঽপি**—অন্যরাও; **চ**—এবং; **অহম্**—আমি; **অমুনা**—এর দ্বারা; **এব**—নিশ্চিতভাবে; **কলেবরেণ**—শরীর দ্বারা ; **প্রাপ্তঃ**—প্রাপ্ত হয়েছি; **মহেন্দ্রভবনে**—ইন্দ্রদেবের আলয়ে; **মহৎ**—মহান; **আসনার্ধম্**—আসনের অর্ধভাগ।

অনুবাদ

তাঁরই প্রভাবে আমি যুদ্ধে দেবাদিদেব মহাদেবকে এবং তাঁর পত্নী পার্বতীকে বিস্ময়ান্বিত করতে সমর্থ হয়েছিলাম। তিনি (শিব) তখন আমার প্রতি প্রসন্ন হয়ে তাঁর নিজের অস্ত্র প্রদান করেছিলেন। অন্য দেবতারাও তাঁদের নিজের নিজের অস্ত্র আমাকে দান করেছিলেন, এবং তা ছাড়াও এই শরীরেই আমি স্বর্গলোকে যেতে পেরেছিলাম এবং দেবরাজ ইন্দ্র তাঁর সভায় আমাকে তাঁর মহান আসনের অর্ধভাগ দান করেছিলেন।

তাৎপর্য

পরম পুরুষোত্তম ভগবান শ্রীকৃষ্ণের কৃপায় দেবাদিদেব মহাদেবসহ সমস্ত দেবতারা অর্জুনের প্রতি প্রসন্ন হয়েছিলেন। মহাদেব অথবা অন্য দেবতাদের দ্বারা অনুগৃহীত হলেও পরমেশ্বর ভগবানের কৃপা লাভ না হতেও পারে। রাবণ ছিল শিবের পরম ভক্ত, কিন্তু সে পরম পুরুষোত্তম ভগবান শ্রীরামচন্দ্রের ক্রোধাগ্নি থেকে রক্ষা পেতে পারেনি।

পুরাণে এইরকম বহু দৃষ্টান্ত রয়েছে। কিন্তু এই দৃষ্টান্তটি থেকে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, অর্জুন মহাদেবের সাথে যুদ্ধ করলেও মহাদেব তাঁর প্রতি প্রসন্ন হয়েছিলেন। ভগবানের ভক্তেরা জানেন কিভাবে দেবতাদের সম্মান প্রদর্শন করতে হয়, কিন্তু দেবদেবীদের ভক্তেরা কখনও কখনও মূর্খতাবশত মনে করে যে, পরম

পুরুষোত্তম ভগবান তাদের উপাস্য দেবতাদের থেকে বুঝি শ্রেষ্ঠ নন। এই ধরনের ধারণার বশবর্তী হয়ে তারা অপরাধ করে এবং পরিণামে রাবণের মতোই গতিপ্রাপ্ত হয়।

অর্জুন যে পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে সখ্যভাবাপন্ন কার্যকলাপের বর্ণনা করেছেন, তা থেকে সকলেই এই শিক্ষা লাভ করতে পারেন যে, পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সন্তুষ্টি বিধান করার মাধ্যমে সর্বতোভাবে মঙ্গল লাভ হয়, কিন্তু দেবতাদের ভক্ত বা উপাসকেরা যা লাভ করে তা আংশিক, এবং দেব-দেবীদের মতোই অপূর্ণ এবং অনিত্য।

এই শ্লোকটির আর একটি তাৎপর্য হচ্ছে যে, পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের কৃপায় অর্জুন সশরীরে স্বর্গে যেতে সক্ষম হয়েছিলেন এবং দেবরাজ ইন্দ্র তাঁকে সসম্মানে তাঁর আসনের অর্ধভাগ দান করেছিলেন। শাস্ত্রের কর্মকাণ্ডে নির্দেশিত পুণ্য কর্ম অনুষ্ঠান করার ফলে স্বর্গলোকে উন্নীত হওয়া যায়, এবং *শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় (৯/২১)* বলা হয়েছে যে, সেই সমস্ত পুণ্য কর্মের ফল ক্ষয় হয়ে গেলে, পুনরায় এই মর্তলোকে অধঃপতিত হতে হয়। চন্দ্রলোকও স্বর্গলোকেরই স্তরে অবস্থিত, এবং যে সমস্ত পুণ্যবান ব্যক্তি যজ্ঞাদি অনুষ্ঠান করেছেন, দান করেছেন, এবং কঠোর তপস্যা করেছেন, তাঁরাই কেবল দেহত্যাগ করার পর স্বর্গলোকে প্রবেশ করতে পারেন। কিন্তু পরমেশ্বর ভগবানের কৃপায় অর্জুন সশরীরে স্বর্গে যেতে সক্ষম হয়েছিলেন, তা না হলে কখনই তা সম্ভব নয়।

আধুনিক বৈজ্ঞানিকেরা যে স্বর্গলোকে যাওয়ার চেষ্টা করছে, তা কখনই সম্ভব হবে না, কারণ তারা অর্জুনের সমকক্ষ নয়। তারা সাধারণ মানুষ, তাদের যজ্ঞ, দান এবং তপস্যার পুণ্য ফলও অর্জিত নেই।

জড় শরীর সত্ত্ব, রজো ও তমো—প্রকৃতির এই তিনটি গুণের দ্বারা প্রভাবিত। বর্তমান যুগের জনসাধারণ সাধারণত রজো এবং তমো গুণের দ্বারা প্রভাবিত, এবং সেই প্রভাব তাদের অত্যধিক কাম এবং লোভের মাধ্যমে প্রকাশ পাচ্ছে। এই ধরনের অধঃপতিত মানুষেরা সাধারণত উচ্চলোকে যেতে পারে না।

স্বর্গলোকেরও উর্ধ্বে অন্য অনেক গ্রহলোক রয়েছে, সেখানে কেবল সত্ত্ব গুণের দ্বারা প্রভাবিত মানুষেরাই যেতে পারেন। ব্রহ্মাণ্ডের স্বর্গ আদি উচ্চতর গ্রহলোকের অধিবাসীরা অতীব বুদ্ধিমান, তাঁরা মানুষদের থেকে অনেক অনেক গুণ অধিক বুদ্ধিমান, এবং তাঁরা সকলেই সত্ত্বগুণের উচ্চ থেকে উচ্চতর স্তরে অধিষ্ঠিত পুণ্যবান ব্যক্তি। তাঁরা সকলেই ভগবানের ভক্ত, এবং তাঁদের সত্ত্ব গুণ যদিও অবিমৃশ্য নয়, তথাপি তাঁরা এই জড় জগতের সমস্ত সদ্ গুণাবলীর অধিকারী দেবতা বলেই পরিগণিত হয়ে থাকেন।

শ্লোক ১৩

তত্রৈব মে বিহরতো ভুজদণ্ডযুগ্মং
গাণ্ডীবলক্ষণমরাতিবধায় দেবাঃ ।
সেন্দ্রাঃ শ্রিতা যদনুভাবিতমাজমীঢ়
তেনাহমদ্য মুষিতঃ পুরুষেণ ভূম্না ॥ ১৩ ॥

তত্র—সেই স্বর্গলোকে; **এব**—অবশ্যই; **মে**—আমি; **বিহরতঃ**—অতিথিরূপে অবস্থান কালে; **ভুজদণ্ডযুগ্মম্**—আমার বাহুযুগল; **গাণ্ডীব**—গাণ্ডীব নামক ধনুক; **লক্ষণম্**—চিহ্ন; **অরাতি**—নিবাতকবচ নামক এক অসুর; **বধায়**—হত্যা করার জন্য; **দেবাঃ**—সমস্ত দেবতারা; **স**—সহ; **ইন্দ্রাঃ**—দেবরাজ ইন্দ্র; **শ্রিতাঃ**—আশ্রয় গ্রহণ করেছিল; **যৎ**—যার দ্বারা; **অনুভাবিতম্**—শক্তিমান হতে সম্ভবপর; **আজমীঢ়**—হে আজমীঢ় রাজার বংশধর; **তেন**—তাঁর দ্বারা; **অহম্**—আমি; **অদ্য**—এখন; **মুষিতঃ**—রহিত; **পুরুষেণ**—ব্যক্তির দ্বারা; **ভূম্না**—পরম।

অনুবাদ

যখন আমি অতিথিরূপে কয়েক দিনের জন্য স্বর্গলোকে অবস্থান করছিলাম; তখন দেবরাজ ইন্দ্রসহ সমস্ত দেবতারা নিবাতকবচ নামক এক অসুরকে সংহার করার জন্য গাণ্ডীবধারী আমার বাহুযুগলের আশ্রয় গ্রহণ করেছিলেন। হে আজমীঢ় রাজবংশের বংশধর, এখন আমি পরম পুরুষোত্তম ভগবানকে হারিয়েছি, যাঁর প্রভাবে আমি এত শক্তিশালী হয়েছিলাম।

তাৎপর্য

স্বর্গের দেবতারা অবশ্যই অধিক বুদ্ধিমান, শক্তিশালী এবং সুন্দর, কিন্তু তা সত্ত্বেও তাঁদের অর্জুনের সাহায্য গ্রহণ করতে হয়েছিল, কারণ তাঁর ধনুক গাণ্ডীব ভগবানের কৃপায় বিশেষ শক্তির দ্বারা আবিষ্ট ছিল। পরমেশ্বর ভগবান সর্বশক্তিমান, এবং তাঁর কৃপায় তাঁর শুদ্ধ ভক্তেরা তাঁর ইচ্ছা অনুসারে অসীম শক্তির অধিকারী হতে পারেন। কিন্তু ভগবান যখন তাঁর শক্তি সংবরণ করেন, তখন ভগবানের ইচ্ছায় তিনি সম্পূর্ণরূপে শক্তিহীন হয়ে পড়েন।

শ্লোক ১৪

যদ্বান্ধবঃ কুরুবলাব্ধিমনন্তপার-
মেকো রথেন ততরেঽহমতীর্যসত্ত্বম্ ।
প্রত্যাহৃতং বহু ধনঞ্চ ময়া পরেষাং
তেজাস্পদং মণিময়ঞ্চ হৃতং শিরোভ্যঃ ॥ ১৪ ॥

যৎ-বান্ধবঃ—যাঁর বন্ধুত্বের দ্বারাই কেবল; **কুরু-বল-অব্ধিম্**—কুরুদের সামরিক শক্তিরূপ সাগর; **অনন্ত পারম্**—দুরতিক্রম্য; **একঃ**—একাকী; **রথেন**—রথারূঢ় হয়ে; **ততরে**—অতিক্রম করতে সমর্থ হয়েছিলাম; **অহম্**—আমি; **অতীর্য**—অজেয়; **সত্ত্বম্**—অস্তিত্ব; **প্রত্যাহৃতম্**—প্রত্যাহার করেছিলেন; **বহু**—অত্যধিক; **ধনম্**—ধন; **চ**—ও; **ময়া**—আমার দ্বারা; **পরেষাম্**—শত্রুদের; **তেজাঃ পদম্**—তেজের উৎস; **মণিময়ম্**—মণিসমূহের দ্বারা মণ্ডিত; **চ**—ও; **হৃতম্**—বলপূর্বক গ্রহণ করা হয়েছিল; **শিরোভ্যঃ**—তাদের মস্তক থেকে।

অনুবাদ

কৌরবদের সামরিক শক্তি ছিল বহু অজেয় প্রাণী সমন্বিত সমুদ্রের মতো, এবং তার ফলে তা ছিল দুরতিক্রম্য। কিন্তু তাঁর সাথে বন্ধুত্বের ফলে, আমি, রথারূঢ় হয়ে তা অতিক্রম করতে সক্ষম হয়েছিলাম। এবং তাঁরই কৃপার প্রভাবে আমি গোধন ফিরিয়ে আনতে এবং সমস্ত তেজের উৎস স্বরূপ বহু রাজাদের মণিময় শিরোভূষণ বলপূর্বক সংগ্রহ করতে সক্ষম হয়েছিলাম।

তাৎপর্য

কৌরবদের পক্ষে ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপ, কর্ণ প্রমুখ বহু মহান্ সেনানায়ক ছিলেন, এবং তাঁদের সামরিক শক্তি ছিল মহাসমুদ্রের মতোই দুরতিক্রম্য। কিন্তু তা সত্ত্বেও শ্রীকৃষ্ণের কৃপায় রথারূঢ় হয়ে অর্জুন একাকী একের পর এক তাঁদের সকলকে অনায়াসে সংহার করতে সক্ষম হয়েছিলেন। কৌরবদের পক্ষে অনেক সেনাপতির পরিবর্তন হয়েছিল, কিন্তু পাণ্ডবদের পক্ষে শ্রীকৃষ্ণ-চালিত রথে আরূঢ় অর্জুন একাকী সেই মহাসমরের সমস্ত দায়িত্ব বহন করেছিলেন।

তেমনই, পাণ্ডবেরা যখন বিরাট রাজার প্রাসাদে অজ্ঞাতভাবে বাস করছিলেন, তখন কৌরবেরা বিরাট রাজার সঙ্গে কলহ করে তাঁর বিশাল গোধন অপহরণ করার প্রচেষ্টা করে। তারা যখন গোধন চুরি করে নিয়ে যাচ্ছিল, তখন ছদ্মবেশী অর্জুন

তাদের সঙ্গে যুদ্ধ করে বিরাট রাজার গোধন রক্ষা করেন এবং সমস্ত রাজাদের মণিময় মুকুট বলপূর্বক গ্রহণ করেন। শ্রীকৃষ্ণের কৃপার প্রভাবেই যে তা সম্ভব হয়েছিল, সে কথা অর্জুন তখন স্মরণ করছিলেন।

শ্লোক ১৫

যো ভীষ্মকর্ণগুরুশল্যচমূষ্বদভ্র-
রাজন্যবর্যরথমণ্ডলমণ্ডিতাসু ।
অগ্রেচরো মম বিভো রথযূথপানা-
মায়ুর্মনাংসি চ দৃশা সহ ওজ আর্চ্ছৎ ॥ ১৫ ॥

যঃ—তিনিই; **ভীষ্ম**—ভীষ্ম; **কর্ণ**—কর্ণ; **গুরু**—দ্রোণাচার্য; **শল্য**—শল্য; **চমূষু**—সৈন্যবাহিনীর মধ্যে; **অদভ্র**—বিশাল; **রাজন্যবর্য**—শ্রেষ্ঠ রাজন্যবর্গ; **রথমণ্ডল**—রথমণ্ডল; **মণ্ডিতাসু**—অলংকৃত হয়ে; **অগ্রেচরঃ**—অগ্রবর্তী; **মম**—আমার; **বিভো**—হে মহারাজ; **রথযূথপানাম্**—সমস্ত মহারথীদের; **আয়ুঃ**—আয়ু অথবা সকাম কর্ম; **মনাংসি**—মনের উদ্দীপনা; **চ**—ও; **দৃশা**—দৃষ্টিপাতের দ্বারা; **স**—বল; **ওজঃ**—শক্তি; **আর্চ্ছৎ**—হরণ করেছিলেন।

অনুবাদ

তিনিই তাদের আয়ু হরণ করে নিয়েছিলেন, এবং তিনিই যুদ্ধক্ষেত্রে ভীষ্ম, কর্ণ দ্রোণাচার্য, শল্য প্রমুখ কৌরব রাজন্যবর্গের দ্বারা রচিত বিপুল সৈন্যসজ্জা থেকে মনোবল এবং ওজ হরণ করেছিলেন। তাদের আয়োজন এবং দক্ষতা অপর্যাপ্ত ছিল, কিন্তু তিনি (শ্রীকৃষ্ণ) রথ অগ্রভাগে চালনা করার সময়ে এই সমস্ত কার্য সম্পাদন করেছিলেন।

তাৎপর্য

পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ পরমাত্মারূপে প্রতিটি জীবের হৃদয়ে নিজেকে বিস্তার করেন এবং তাঁর থেকেই সমস্ত জীবের স্মৃতি এবং জ্ঞান উৎপন্ন এবং বিলোপ হয়। তিনিই সমস্ত বেদের জ্ঞাতব্য, সমস্ত বেদ-কর্তা এবং বেদবেত্তা (শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা ১৫/১৫)। পরমেশ্বর ভগবান জীবের আয়ু বর্ধিত করতে পারেন অথবা হ্রাস করতে পারেন। সেইভাবেই তিনি তাঁর পরিকল্পনা অনুসারে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ পরিচালনা করেছিলেন। তাঁরই ইচ্ছা অনুসারে, যুধিষ্ঠির মহারাজকে এই

গ্রহলোকের সম্রাটরূপে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য, সেই যুদ্ধ সম্পাদিত হয়েছিল। সেই অপ্রাকৃত কার্য সাধন করার জন্য তিনি তাঁর সর্বশক্তিমত্তার প্রভাবে বিরুদ্ধ পক্ষের সকলকে সংহার করেছিলেন। বিরুদ্ধ পক্ষ ভীষ্ম, দ্রোণ এবং শল্য আদি সেনাপতিদের তত্ত্বাবধানে বিশাল সামরিক শক্তির বলে বলীয়ান হয়ে ছিল, এবং শ্রীকৃষ্ণের সহায়তা ব্যতীত অর্জুনের পক্ষে সেই যুদ্ধ জয় করা সম্পূর্ণরূপে অসম্ভব ছিল।

অর্জুনকে সাহায্য করার জন্য ভগবান নানা রকম কৌশল অবলম্বন করেছিলেন। আধুনিক যুদ্ধেও রাজ পুরুষেরা এই সমস্ত কৌশলের আশ্রয় অবলম্বন করেন; এবং তা সম্পাদিত হয় গুপ্তচর বৃত্তি, সামরিক কৌশল এবং রাজনৈতিক চাতুর্যপূর্ণ মতলবের মাধ্যমে।

কিন্তু অর্জুন যেহেতু ছিলেন ভগবানের প্রিয় ভক্ত, তাই অর্জুনকে সে সমস্ত বিষয়ে উদ্বিগ্ন হতে না দিয়ে ভগবান নিজেই সেই সমস্ত কার্য সম্পাদন করেছিলেন। ভগবদ্ভক্তির অনুশীলনের ফলে এইটি লাভ হয়—ভগবান ভক্তের সমস্ত দায়িত্ব গ্রহণ করেন।

শ্লোক ১৬

যদ্দোঃষু মা প্রণিহিতং গুরুভীষ্মকর্ণ-
নপ্তৃত্রিগর্তশল্যসৈন্ধববাহ্লীকাদ্যৈঃ ।
অস্ত্রাণ্যমোঘমহিমানি নিরূপিতানি
নোপস্পৃশুর্নৃহরিদাসমিবাসুরাণি ॥ ১৬ ॥

যৎ—যাঁর অধীনে; **দোঃষু**—বাহুযুগলের আশ্রয়; **মা প্রণিহিতম্**—আমি অবস্থিত হয়ে; **গুরু**—দ্রোণাচার্য; **ভীষ্ম**—ভীষ্ম; **কর্ণ**—কর্ণ; **নপ্তৃ**—ভূরিশ্রবা; **ত্রিগর্ত**—রাজা সুশর্মা; **শল্য**—শল্য; **সৈন্ধব**—রাজা জয়দ্রথ; **বাহ্লীক**—শান্তনুর ভ্রাতা (ভীষ্মের পিতা); **আদ্যৈঃ**—ইত্যাদি; **অস্ত্রাণি**—অস্ত্রশস্ত্র; **অমোঘ**—ব্যর্থ; **মহিমানি**—প্রচণ্ড শক্তিশালী; **নিরূপিতানি**—প্রযুক্ত হয়ে; **ন**—না; **উপস্পৃশুঃ**—স্পর্শ করতে; **নৃহরিদাসম্**—নৃসিংহদেবের সেবক (প্রহ্লাদ); **ইব**—মতো; **অসুরাণি**—অসুরদের প্রযুক্ত অস্ত্রসমূহ।

অনুবাদ

অসুরদের অস্ত্রসমূহ যেমন নৃসিংহদেবের পরম সেবক প্রহ্লাদের অঙ্গ স্পর্শ করতে পারেনি, তেমনই তাঁর (শ্রীকৃষ্ণের) কৃপায় ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণ, ভূরিশ্রবা, সুশর্মা,

শল্য, জয়দ্রথ এবং বাহ্লীক প্রভৃতি বীরচূড়ামণিদের প্রযুক্ত অব্যর্থ বীর্য অস্ত্রসমূহ আমার কেশ স্পর্শ করতেও সমর্থ হয়নি।

তাৎপর্য

নৃসিংহদেবের মহান্ ভক্ত প্রহ্লাদ মহারাজের কাহিনী শ্রীমদ্ভাগবতের সপ্তম স্কন্ধে বর্ণিত হয়েছে। ভগবানের শুদ্ধ ভক্ত হওয়ার ফলে পাঁচ বছরের শিশু প্রহ্লাদের প্রতি তাঁর পিতা দৈত্যরাজ হিরণ্যকশিপু অত্যন্ত ঈর্ষাপরায়ণ হয়েছিল। তার পুত্র ভক্ত প্রহ্লাদকে হত্যা করার জন্য দৈত্যরাজ হিরণ্যকশিপু তার সমস্ত অস্ত্র প্রয়োগ করেছিল, কিন্তু ভগবানের কৃপায় প্রহ্লাদ তাঁর পিতার সমস্ত বিপজ্জনক কার্যকলাপ থেকেই রক্ষা পেয়েছিলেন। তাঁকে আগুনে ছুঁড়ে ফেলা হয়েছিল, তপ্ত তেলে নিক্ষেপ করা হয়েছিল, পর্বত শিখর থেকে ছুঁড়ে ফেলে দেওয়া হয়েছিল, মত্ত হস্তীর পায়ের তলায় ফেলে দেওয়া হয়েছিল, এবং বিষ দেওয়া হয়েছিল। অবশেষে তাঁর পিতা তাঁকে তরবারির আঘাতে হত্যা করতে চেয়েছিল, তখন নৃসিংহদেব আবির্ভূত হয়ে পুত্রের সমক্ষেই তাঁর নৃশংস পিতাকে সংহার করেছিলেন। এইভাবে আমরা দেখতে পাই যে, ভগবানের ভক্তকে কেউই হত্যা করতে পারে না। তেমনই, ভীষ্ম প্রমুখ মহারথীরা ভয়ঙ্কর সমস্ত অস্ত্রশস্ত্র অর্জুনের প্রতি নিক্ষেপ করলেও ভগবান তাঁকে রক্ষা করেছিলেন।

কর্ণ ঃ মহারাজ পাণ্ডুর সঙ্গে বিবাহ হওয়ার পূর্বে কুন্তীদেবী সূর্যদেবের দ্বারা এঁকে তাঁর পুত্ররূপে প্রাপ্ত হন। কবচ এবং কুণ্ডলসহ কর্ণ জন্মগ্রহণ করেছিলেন। এই অসাধারণ লক্ষণ দেখে বুঝা গিয়েছিল যে, ভবিষ্যতে তিনি একজন অপরাজেয় বীর হবেন। প্রথমে তাঁর নাম ছিল বসুসেন, কিন্তু পরবর্তী কালে তিনি তাঁর সহজাত কবচ এবং কুণ্ডল ইন্দ্রদেবকে দান করেন, এবং তখন থেকে তাঁর নাম হয় বৈকর্তন। কুন্তীদেবীর কুমারী অবস্থায় তাঁর জন্ম হয়েছিল বলে তিনি তাঁকে গঙ্গায় ভাসিয়ে দেন। অধিরথ তাঁকে প্রাপ্ত হন, এবং তিনি ও তাঁর পত্নী রাধা তাঁকে তাঁদের নিজের পুত্রের মতো লালন-পালন করেন।

কর্ণ ছিলেন অত্যন্ত দানশীল, বিশেষ করে ব্রাহ্মণদের প্রতি। ব্রাহ্মণদের অদেয় তাঁর কিছুই ছিল না। তাই ব্রাহ্মণের ছদ্মবেশে ইন্দ্রদেব যখন তাঁর কাছ থেকে তাঁর সহজাত কবচ এবং কুণ্ডল ভিক্ষা করেন, তখন তিনি ইন্দ্রদেবকে তা দান করেন। তাঁর প্রতি অত্যন্ত প্রসন্ন হয়ে ইন্দ্রদেব তাঁকে শক্তি নামক অস্ত্র দান করেন।

দ্রোণাচার্য যখন তাঁর ছাত্রদের অস্ত্র পরীক্ষা করছিলেন, সেই সময় কর্ণ তাদের প্রতিদ্বন্দ্বিতায় আহ্বান করেছিলেন। প্রথম থেকেই অর্জুনের সঙ্গে তাঁর প্রচণ্ড বিরোধ

প্রকাশ পায়। অর্জুনের সঙ্গে তাঁর এই বিরোধ দর্শন করে দুর্যোধন তাঁর সঙ্গে বন্ধুত্ব স্থাপন করেন, এবং সেই বন্ধুত্ব ক্রমে ক্রমে গভীর ঘনিষ্ঠতায় পরিণত হয়।

তিনি দ্রৌপদীর স্বয়ংবরা সভায় উপস্থিত ছিলেন, এবং যখন তিনি দ্রৌপদীকে লাভ করার জন্য লক্ষ্যভেদে প্রবৃত্ত হন, তখন দ্রৌপদীর ভ্রাতা ধৃষ্টদ্যুম্ন ঘোষণা করেন যে, সূত্রধরের পুত্র হওয়ার ফলে কর্ণের সেই প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করার অধিকার নেই। সেই প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করতে তিনি প্রত্যাখ্যাত হলেও, অর্জুন যখন লক্ষ্যভেদ করে দ্রৌপদীকে লাভ করেন, তখন কর্ণ এবং অন্যান্য বিফলমনোরথ রাজপুত্রেরা দ্রৌপদীসহ প্রস্থানোদ্যত অর্জুনকে প্রচণ্ডভাবে বাধা দেন। বিশেষ করে কর্ণ অত্যন্ত বীরত্বের সঙ্গে তাঁর সাথে যুদ্ধ করেছিলেন, কিন্তু অর্জুন তাঁদের সকলকে পরাস্ত করেন।

অর্জুনের প্রতি নিরন্তর বিদ্বেষ ভাবাপন্ন হওয়ার ফলে দুর্যোধন কর্ণের প্রতি অত্যন্ত প্রসন্ন হয়েছিলেন, এবং তিনি কর্ণকে অঙ্গরাজ্যের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত করেন। দ্রৌপদীকে লাভ করতে অকৃতকার্য হয়ে, কর্ণ দুর্যোধনকে উপদেশ দেন দ্রুপদ রাজাকে আক্রমণ করতে, কারণ তাঁকে পরাস্ত করতে পারলে অর্জুন এবং দ্রৌপদী দুজনকেই বন্দী করা যাবে। কিন্তু দ্রোণাচার্য সেই দুরভিসন্ধির কথা জানতে পেরে তাঁদের তিরস্কার করলে তাঁরা সেই কার্য থেকে বিরত হন।

কর্ণ কেবল অর্জুনের দ্বারাই নন, ভীমসেনের দ্বারাও বহুবার পরাস্ত হয়েছিলেন। তিনি ছিলেন বঙ্গদেশ, উড়িষ্যা এবং মাদ্রাজের রাজা। পরে তিনি মহারাজ যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞে সক্রিয়ভাবে অংশ গ্রহণ করেছিলেন, এবং শকুনির চক্রান্তে যখন প্রতিদ্বন্দ্বী ভ্রাতাদের মধ্যে দ্যূতক্রীড়ার আয়োজন হয়, তখন কর্ণ তাতে যোগদান করেছিলেন, এবং সেই দ্যূতক্রীড়ায় যখন দ্রৌপদীকে পণ রাখা হয়, তখন তিনি অত্যন্ত প্রীত হয়েছিলেন। তাতে তাঁর পূর্বের আক্রোশ তৃপ্ত হয়েছিল। দ্রৌপদীকে সেই দ্যূতক্রীড়ায় কৌরবেরা যখন জয় করে, তখন সেই সংবাদ তিনি অত্যন্ত উৎসাহের সঙ্গে ঘোষণা করেছিলেন, এবং তিনি দুঃশাসনকে নির্দেশ দিয়েছিলেন পাণ্ডবদের এবং দ্রৌপদীর বস্ত্র হরণ করার জন্য। তিনি দ্রৌপদীকে উপদেশ দেন আর একজন পতি মনোনয়ন করার জন্য, কারণ পাণ্ডবেরা তাঁকে হারাবার ফলে, তিনি তখন কুরুদের দাসীতে পরিণত হয়েছিলেন।

তিনি সর্বদাই পাণ্ডবদের প্রতি বৈরীভাবাপন্ন ছিলেন, এবং সুযোগ পেলেই তিনি তাঁদের সর্বতোভাবে অনিষ্ট সাধন করার চেষ্টা করতেন। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের সময় তিনি সেই যুদ্ধের চরম পরিণতি দর্শন করেছিলেন, এবং তিনি জানিয়েছিলেন যে, শ্রীকৃষ্ণের অর্জুনের রথের সারথি হওয়ার ফলে অর্জুন সেই যুদ্ধে জয়লাভ

করবেন। ভীষ্মদেবের সঙ্গে সব সময় তাঁর মতানৈক্য হত, এবং কখনও কখনও তিনি গর্বভরে ঘোষণা করেছিলেন যে, তাঁর পরিকল্পনায় ভীষ্মদেব যদি হস্তক্ষেপ না করতেন, তা হলে তিনি পাঁচ দিনের মধ্যেই পাণ্ডবদের বিনাশ সাধন করতে পারতেন।

কিন্তু ভীষ্মদেবের মৃত্যু হলে তিনি অত্যন্ত মর্মাহত হয়েছিলেন। তিনি ইন্দ্রদেবের কাছ থেকে যে শক্তি অস্ত্র লাভ করেছিলেন, তা দিয়ে ঘটোৎকচকে হত্যা করেছিলেন। তাঁর পুত্র বৃষসেন অর্জুনের হাতে নিহত হয়।

অবশেষে অর্জুনের সঙ্গে তাঁর প্রবল সংগ্রাম হয়। তিনি কেবল অর্জুনের মাথা থেকে তাঁর মুকুট ফেলে দিতে সক্ষম হয়েছিলেন। কিন্তু যখন যুদ্ধক্ষেত্রে তাঁর রথের চাকা বসে যায়, এবং তিনি রথ থেকে নেমে কর্দমাক্ত মাটি থেকে রথের চাকা তুলতে চেষ্টা করছিলেন, তখন অর্জুন তাঁকে সংহার করেন, যদিও তিনি অর্জুনকে অনুরোধ করেছিলেন তা না করতে।

নপ্তা বা ভূরিশ্রবা ঃ ভূরিশ্রবা ছিলেন কুরু বংশের সোমদত্তের পুত্র। তাঁর অন্য ভ্রাতার নাম ছিল শল্য। তাঁদের পিতাসহ তাঁরা দুই ভ্রাতাই দ্রৌপদীর স্বয়ংবর সভায় উপস্থিত ছিলেন। তাঁরা সকলেই, ভগবানের ভক্ত এবং সখা অর্জুনের অদ্ভুত শক্তিমত্তার প্রশংসা করেছিলেন, এবং ভূরিশ্রবা ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রদের উপদেশ দিয়েছিলেন পাণ্ডবদের সঙ্গে কলহ না করতে। তাঁরা সকলেই মহারাজ যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞে অংশগ্রহণ করেছিলেন। তাঁর অশ্ব, হস্তী এবং রথ সমন্বিত এক অক্ষৌহিণী সেনা ছিল, এবং কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে তিনি সেই সৈন্যসহ দুর্যোধনের পক্ষ অবলম্বন করেছিলেন। ভীমসেন তাঁকে একজন যূথ-পতিরূপে গণ্য করেছিলেন। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে তিনি বিশেষভাবে সাত্যকির সঙ্গে সংগ্রামে লিপ্ত ছিলেন, এবং তিনি সাত্যকির দশটি পুত্রকে হত্যা করেছিলেন। পরে অর্জুন তাঁর হস্তদ্বয় ছেদন করেন, এবং অবশেষে সাত্যকির হস্তে নিহত হন। তাঁর মৃত্যুর পর তিনি বিশ্বদেবে লীন হন।

ত্রিগর্ত বা সুশর্মা ঃ তিনি ছিলেন ত্রিগর্ত দেশের রাজা এবং মহারাজ বৃদ্ধক্ষেত্রের পুত্র। তিনিও দ্রৌপদীর স্বয়ংবর সভায় উপস্থিত ছিলেন। তিনি ছিলেন দুর্যোধনের মিত্র এবং তিনি দুর্যোধনকে মৎস্য দেশ (দ্বারভাঙ্গা) আক্রমণ করতে উপদেশ দেন। বিরাট নগরে গোধন হরণের সময় তিনি মহারাজ বিরাটকে বন্দী করেছিলেন, কিন্তু পরে ভীমসেন মহারাজ বিরাটকে উদ্ধার করেন। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের সময় তিনি অত্যন্ত বীরত্বের সঙ্গে যুদ্ধ করেছিলেন, এবং অবশেষে অর্জুনের হস্তে নিহত হন।

জয়দ্রথ : মহারাজ বৃদ্ধক্ষেত্রের আর এক পুত্র। তিনি ছিলেন সিন্ধুদেশের (অধুনা পাকিস্তানের সিন্ধু অঞ্চল) রাজা। তিনি দুর্যোধনের ভগিনী দুঃশলাকে বিবাহ করেন। তিনিও দ্রৌপদীর স্বয়ংবর সভায় উপস্থিত ছিলেন, এবং প্রবলভাবে দ্রৌপদীকে লাভ করতে চেয়েছিলেন, কিন্তু সেই প্রতিদ্বন্দ্বিতায় তিনি অকৃতকার্য হন। এবং সেই সময় থেকেই তিনি সর্বদা দ্রৌপদীর সান্নিধ্য লাভের সুযোগ খুঁজছিলেন। তিনি যখন শল্য দেশে বিবাহ করতে যাচ্ছিলেন, পথে কাম্যবনে তিনি পুনরায় ঘটনাক্রমে দ্রৌপদীকে দেখতে পান এবং তাঁর প্রতি অত্যন্ত আসক্ত হন। পাণ্ডবেরা তখন পাশাখেলায় তাঁদের রাজ্য হারিয়ে দ্রৌপদীসহ বনবাস করছিলেন। জয়দ্রথ তখন কোটিশষ্য নামক তাঁর এক অনুচরের মাধ্যমে অবৈধভাবে দ্রৌপদীর কাছে সংবাদ পাঠানোই বুদ্ধিমানের কাজ বলে মনে করেন। অত্যন্ত ক্রোধভরে দ্রৌপদী তৎক্ষণাৎ জয়দ্রথের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন। কিন্তু দ্রৌপদীর রূপে তিনি এতই আকৃষ্ট হয়ে পড়েছিলেন যে, তিনি বারে বারে তাঁকে পাওয়ার চেষ্টা করেন, এবং প্রতিবারই দ্রৌপদী তাঁকে প্রত্যাখ্যান করেন। অবশেষে তিনি বলপূর্বক দ্রৌপদীকে রথে তুলে নিয়ে তাঁকে হরণ করার চেষ্টা করেন। দ্রৌপদী প্রথমে তাঁকে প্রবল চপেটাঘাত করেন, এবং তাঁর আঘাতে তিনি ছিন্নমূল বৃক্ষের মতো পতিত হন। কিন্তু তা সত্ত্বেও তিনি বিফলমনোরথ হননি, এবং বলপূর্বক দ্রৌপদীকে তাঁর রথে নিয়ে বসাতে পেরেছিলেন।

ধৌম্য ঋষি সেই ঘটনা লক্ষ্য করেন এবং জয়দ্রথের সেই আচরণের তীব্র প্রতিবাদ করেন। তিনি রথটির পশ্চাদ্ধাবনও করেছিলেন এবং ধাত্রেয়িকার মাধ্যমে সেই সংবাদ মহারাজ যুধিষ্ঠিরের কাছে পৌঁছায়। পাণ্ডবেরা তখন জয়দ্রথের সৈন্যদের আক্রমণ করে তাদের সকলকে সংহার করেন, এবং ভীমসেন অবশেষে জয়দ্রথকে ধরে প্রচণ্ডভাবে প্রহার করে মৃতপ্রায় করে ফেলেছিলেন। তারপর তাঁর মাথার পাঁচটি মাত্র চুল রেখে তাঁর মস্তক মুণ্ডন করা হয় এবং সমস্ত রাজাদের কাছে নিয়ে গিয়ে তাঁকে মহারাজ যুধিষ্ঠিরের ক্রীতদাস বলে পরিচয় করিয়ে দেওয়া হয়। সমস্ত রাজাদের কাছে নিজেকে মহারাজ যুধিষ্ঠিরের ক্রীতদাস বলে পরিচয় দিতে তাঁকে বাধ্য করা হয়, এবং সেই অবস্থায় তাঁকে মহারাজ যুধিষ্ঠিরের কাছে নিয়ে যাওয়া হয়। দয়াপরবশ হয়ে মহারাজ যুধিষ্ঠির তাঁকে মুক্ত করার আদেশ দেন, এবং যখন তিনি মহারাজ যুধিষ্ঠিরের অধীনস্থ কর প্রদানকারী রাজা হতে সম্মত হন, তখন দ্রৌপদীও তাঁকে ছেড়ে দেওয়ার নির্দেশ দেন।

এই ঘটনার পর তিনি তাঁর রাজ্যে ফিরে যান। এইভাবে অপমানিত হওয়ার ফলে তিনি মহাদেবকে সন্তুষ্ট করার জন্য হিমালয়ের গঙ্গোত্রীতে গিয়ে কঠোর

তপস্যা করেন। তিনি মহাদেবের কাছে বর প্রার্থনা করেন যাতে অন্তত একবারের জন্য পাণ্ডবদের পরাভূত করতে পারেন।

কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের সময় তিনি দুর্যোধনের পক্ষ অবলম্বন করেছিলেন। যুদ্ধের প্রথম দিন তিনি মহারাজ দ্রুপদের সঙ্গে সংগ্রামে লিপ্ত হয়েছিলেন, তারপর বিরাট রাজা এবং তারপর অভিমন্যুর সঙ্গে। সাত মহারথী মিলে ঘিরে ধরে যখন নির্দয়ভাবে অভিমন্যুকে বধ করতে উদ্যত হয়েছিলেন, তখন পাণ্ডবেরা তাঁর সাহায্যের জন্য এসেছিলেন, কিন্তু জয়দ্রথ মহাদেবের কৃপায় দারুণভাবে তাঁদের প্রতিহত করেছিলেন। তার ফলে অর্জুন জয়দ্রথকে বধ করার প্রতিজ্ঞা করেন। সেই সংবাদ শুনে, জয়দ্রথ কৌরবদের অনুমতি নিয়ে কাপুরুষের মতো যুদ্ধক্ষেত্র ত্যাগ করতে চান। কিন্তু তাঁকে তা করতে দেওয়া হয়নি, বরং তাকে অর্জুনের সাথে যুদ্ধ করতে বাধ্য করা হয়।

যুদ্ধ চলা কালে শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে স্মরণ করিয়ে দেন যে, জয়দ্রথ মহাদেবের কাছে আশীর্বাদ লাভ করেছেন যে, যার দ্বারা জয়দ্রথের মস্তক ভূমিতে পতিত হবে, তৎক্ষণাৎ তাঁর মৃত্যু হবে। তাই তিনি অর্জুনকে নির্দেশ দেন জয়দ্রথের মস্তক সমন্তপঞ্চক তীর্থে তপস্যারত তাঁর পিতার ক্রোড়ে নিক্ষেপ করতে। অর্জুন বাস্তবিকই তাই করেছিলেন। জয়দ্রথের পিতা তাঁর ক্রোড়ে একটা ছিন্ন মস্তক দেখতে পেয়ে অত্যন্ত বিস্মিত হন এবং তিনি তৎক্ষণাৎ তা মাটিতে ফেলে দেন। ফলে, তৎক্ষণাৎ তাঁর পিতার মস্তক সপ্ত ভাগে বিভক্ত হয়ে গিয়ে তাঁর মৃত্যু হয়।

শ্লোক ১৭

সৌত্যে বৃতঃ কুমতিনাত্মদ ঈশ্বরো মে
যৎপাদপদ্মমভবায় ভজন্তি ভব্যাঃ ।
মাং শ্রান্তবাহমরয়ো রথিনো ভুবিষ্ঠং
ন প্রাহরন্ যদনুভাব নিরস্তচিত্তা ॥ ১৭ ॥

সৌত্যে—সারথিরূপে; **বৃতঃ**—নিযুক্ত; **কুমতিনা**—অসৎ মতির দ্বারা; **আত্মদঃ**—উদ্ধার কর্তা; **ঈশ্বরঃ**—পরমেশ্বর ভগবান; **মে**—আমার; **যৎ**—যাঁর; **পাদপদ্মম্**—শ্রীপাদপদ্ম; **অভবায়**—উদ্ধারকার্যে; **ভজন্তি**—সেবা করেন; **ভব্যাঃ**—বুদ্ধিমান মানুষেরা; **মাম্**—আমাকে; **শ্রান্ত**—তৃষ্ণার্ত; **বাহম্**—আমার অশ্বগুলি; **অরয়ঃ**—শত্রুরা; **রথিনঃ**—মহান্ সেনাপতি; **ভুবিষ্ঠম্**—ভূমিতে দণ্ডায়মান; **ন**—করেনি; **প্রাহরন্**—আক্রমণ; **যৎ**—যাঁর; **অনুভাব**—কৃপায়; **নিরস্ত**—নিরস্ত; **চিত্তাঃ**—মন।

অনুবাদ

যখন আমার তৃষ্ণার্ত অশ্বদের জন্য জল আনতে আমি রথ থেকে নেমেছিলাম, তখন তাঁরই কৃপায় শত্রুরা আমাকে বধ করতে দ্বিধা করেছিল। আর জগতের উদ্ধারকর্তা আমার সেই পরমেশ্বর ভগবানেরই প্রতি আমার কুমতিবশত তাঁকে আমার রথের সারথিরূপে নিযুক্ত করতে দুঃসাহসী হয়েছিলাম, কারণ শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিরা পর্যন্ত মুক্তিলাভের জন্য তাঁরই উদ্দেশ্যে ভজনা করেন এবং ভক্তিসেবা নিবেদন করে থাকেন।

তাৎপর্য

নির্বিশেষবাদী এবং ভগবদ্ভক্ত উভয়েরই আরাধ্য পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ। নির্বিশেষবাদীরা তাঁর সৎ, চিৎ এবং আনন্দময় দেহ থেকে নির্গত ব্রহ্মজ্যোতির উপাসনা করে, আর ভগবদ্ভক্তরা তাঁকে পরম পুরুষোত্তম ঈশ্বররূপে ভজনা করেন। যারা নির্বিশেষবাদীদের থেকেও নিকৃষ্ট, তারা তাঁকে ঐতিহাসিক মহাপুরুষদের মধ্যে একজন বলে মনে করে। ভগবান কিন্তু এই জড় জগতে অবতরণ করেন তাঁর অপ্রাকৃত লীলা বিলাসের দ্বারা সকলকে আকর্ষণ করার জন্য, এবং এইভাবে তিনি সম্যক্ আদর্শ প্রভুরূপে, সখারূপে, পুত্ররূপে এবং প্রেমিকরূপে আচরণ করেন।

অর্জুনের সঙ্গে তাঁর অপ্রাকৃত সম্পর্ক ছিল সখ্য রসাশ্রিত, এবং ভগবান অপূর্বভাবে সেই লীলায় অভিনয় করেন, যেভাবে তিনি তাঁর পিতামাতা, প্রেয়সী এবং পত্নীদের সাথেও অভিনয় করেছিলেন। সেই অপ্রাকৃত সম্যক্ সম্পর্কে সম্বন্ধযুক্ত হয়ে, ভগবানের অন্তরঙ্গা শক্তির প্রভাবে ভগবদ্ভক্ত ভুলে যান যে, তাঁর সখা অথবা পুত্র হচ্ছেন পরমেশ্বর ভগবান, যদিও তাঁর অপ্রাকৃত কার্যকলাপ দর্শন করে তাঁরা কখনও কখনও অত্যন্ত বিস্মিত হন।

ভগবানের অপ্রকটের পর, অর্জুন তাঁর মহান্ সখার কথা স্মরণ করছিলেন। তাঁর সম্বন্ধে অর্জুনের কোন ভ্রান্ত ধারণা অথবা অসৎ উদ্দেশ্য ছিল না। অর্জুনের মতো শুদ্ধ ভক্তের প্রতি ভগবানের অপ্রাকৃত আচরণ দর্শন করে বুদ্ধিমান মানুষেরা তাঁর প্রতি আকৃষ্ট হন।

যুদ্ধক্ষেত্রে জলের অভাব হয়, সকলেই জানেন। কঠোর পরিশ্রমে শ্রান্ত মানুষ এবং পশুরা উভয়েই তাদের তৃষ্ণা নিবারণের জন্য সর্বদাই জলের প্রয়োজন অনুভব করেন। বিশেষ করে আহত সৈনিকেরা এবং সেনাপতিরা মৃত্যুর সময় প্রবল তৃষ্ণা অনুভব করেন, এবং কখনও কখনও এমনও ঘটে যে, প্রচণ্ড তৃষ্ণাতেই তাঁদের অনিবার্য মৃত্যু ঘটে।

কিন্তু কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে জলাভাবের সেই সমস্যার সমাধান হয়েছিল পৃথিবীর বক্ষ বিদীর্ণ করার মাধ্যমে। ভগবানের কৃপায়, মাটি খনন করতে পারলে, সর্বত্রই জল পাওয়া যায়। মাটি খুঁড়ে জল সংগ্রহ করার একই প্রথা বর্তমানে সর্বত্রই প্রচলিত, কিন্তু তবুও আধুনিক বিজ্ঞানীরা প্রয়োজন হলেই তৎক্ষণাৎ ভূমি বিদীর্ণ করে জল সংগ্রহ করতে অক্ষম। কিন্তু ঐতিহাসিক বর্ণনা থেকে আমরা জানতে পারি যে, বহুকাল পূর্বে, পাণ্ডবদের সময় অর্জুনের মতো মহান্ সেনাপতিরা শুধুমাত্র একটি তীক্ষ্ণ বাণের আঘাতে পৃথিবীর কঠিন আবরণ ভেদ করে তাঁদের অশ্বাদির জন্য জল সংগ্রহ করে আনতে পারতেন, মানুষদের কথা আর না বললেও চলে— যে-প্রথা আধুনিক বৈজ্ঞানিকদের কাছে আজও অজ্ঞাত।

শ্লোক ১৮

নর্মাণ্যুদাররুচিরস্মিতশোভিতানি
হে পার্থ হেঽর্জুন সখে কুরুনন্দনেতি ।
সংজল্পিতানি নরদেব হৃদিস্পৃশানি
স্মর্তুর্লুঠন্তি হৃদয়ং মম মাধবস্য ॥ ১৮ ॥

নর্মাণি—পরিহাস বাক্য; **উদার**—উদার আলোচনা; **রুচির**—মনোহর; **স্মিতশোভিতানি**—স্মিত হাস্যের দ্বারা শোভিত; **হে**—সম্বোধনসূচক অব্যয়; **পার্থ**—পৃথাপুত্র; **হে**—সম্বোধনসূচক অব্যয়; **অর্জুন**—অর্জুন; **সখে**—সখা; **কুরুনন্দন**—কুরুবংশজ; **ইতি**—ইত্যাদি; **সংজল্পিতানি**—সম্ভাষণ; **নরদেব**—হে রাজন্; **হৃদি**—হৃদয়; **স্পৃশানি**—স্পর্শ করছে; **স্মর্তুঃ**—তাঁদের স্মরণ করে; **লুঠন্তি**—অভিভূত করছে; **হৃদয়ম্**—হৃদয় এবং আত্মা; **মম**—আমার; **মাধবস্য**—মাধবের (শ্রীকৃষ্ণের)।

অনুবাদ

হে রাজন্! সেই মাধব আমার প্রতি যে সমস্ত গম্ভীর অথচ সুন্দর হাসিমাখা পরিহাস বাক্য প্রয়োগ করতেন, এবং আমাকে কখনও 'হে পার্থ, হে অর্জুন, হে সখে, হে কুরুনন্দন' ইত্যাদিরূপে যে সমস্ত মধুময় মনোজ্ঞ সম্বোধনে সম্বোধিত করতেন, আজ সেই সব স্মরণ করে আমার হৃদয় অত্যন্ত ব্যাকুল হচ্ছে।

শ্লোক ১৯

শয্যাসনাটনবিকত্থনভোজনাদি-
ষ্বৈক্যাদ্‌বয়স্য ঋতবানিতি বিপ্রলব্ধঃ ।
সখ্যুঃ সখেব পিতৃবৎ তনয়স্য সর্বং
সেহে মহান্মহিতয়া কুমতেরঘং মে ॥ ১৯ ॥

শয্য—এক শয্যায় শয়ন করে; **আসন**—এক আসনে আসীন হয়ে; **অটন**—একসঙ্গে ভ্রমণ করে; **বিকত্থন**—আত্ম-প্রশংসা; **ভোজন**—একত্রে আহার করে; **আদিষু**—ইত্যাদি আচরণে; **ঐক্যাৎ**—একাত্মতা হেতু; **বয়স্য**—হে বন্ধু; **ঋতবান্**—সত্যবাদী; **ইতি**—এইভাবে; **বিপ্রলব্ধঃ**—অশোভন আচরণ; **সখ্যুঃ**—বন্ধুর প্রতি; **সখেব**—বন্ধুর মতো; **পিতৃবৎ**—পিতার মতো; **তনয়স্য**—পুত্রের; **সর্বম্**—সমস্ত; **সেহে**—সহ্য করেছিলেন; **মহান্**—মহান্; **মহিতয়া**—মহত্ত্বের প্রভাবে; **কুমতেঃ**—মন্দমতি; **অঘম্**—অপরাধ; **মে**—আমার।

অনুবাদ

সাধারণত আমরা দুজনে একত্রে শয়ন, উপবেশন, ভ্রমণ ও ভোজনাদি করতাম। বীরত্বব্যঞ্জক কাজের আত্ম-প্রশংসার সময়ে যদি দৈবাৎ কোন কার্যের বা বাক্যের ব্যতিক্রম ঘটত, তখন আমি তাঁকে "ওহে! তুমি ত বড় সত্যবাদী" এই রকম বক্রোক্তিতে তিরস্কার করতাম। কিন্তু সখা যেমন সখার এবং পিতা যেমন পুত্রের অপরাধ সহ্য করেন, সেইভাবে দেবপূজ্য পরমাত্মা হলেও তিনিও মন্দমতি আমার সমস্ত অপরাধই নিজগুণে সহ্য করতেন।

তাৎপর্য

যেহেতু পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন সম্পূর্ণ বিশুদ্ধ, তাই তাঁর শুদ্ধ ভক্তের সঙ্গে সখারূপে, পুত্ররূপে অথবা প্রেমিকরূপে তাঁর অপ্রাকৃত লীলাবিলাসে কখনই কোন রকম অপূর্ণতা থাকে না। বিধিবদ্ধভাবে মহাপণ্ডিত এবং ধার্মিক ব্যক্তিরা যে বৈদিক মন্ত্রাদি উচ্চারণের মাধ্যমে তাঁকে বন্দনা করেন, তার থেকে তাঁর সখা, পিতামাতা এবং প্রেমিকাদের ভর্ৎসনায় ভগবান অধিকতর তৃপ্ত হন।

শ্লোক ২০

সোঽহং নৃপেন্দ্র রহিতঃ পুরুষোত্তমেন
সখ্যা প্রিয়েণ সুহৃদা হৃদয়েন শূন্যঃ ।
অধ্বন্যুরুক্রমপরিগ্রহমঙ্গ রক্ষন্
গোপৈরসদ্ভিরবলেব বিনির্জিতোঽস্মি ॥ ২০ ॥

সঃ—সেই; **অহম্**—আমি; **নৃপেন্দ্র**—হে নৃপ শ্রেষ্ঠ; **রহিতঃ**—বঞ্চিত; **পুরুষোত্তমেন**—পরমেশ্বর ভগবান কর্তৃক; **সখ্যা**—আমার সখার দ্বারা; **প্রিয়েণ**—পরম প্রিয়জনের দ্বারা; **সুহৃদা**—শুভাকাঙ্ক্ষীর দ্বারা; **হৃদয়েন**—হৃদয় এবং আত্মার দ্বারা; **শূন্যঃ**—শূন্য; **অধ্বনি**—সম্প্রতি; **উরুক্রম পরিগ্রহম্**—সর্বশক্তিমানের মহিষীগণ; **অঙ্গ**—দেহ; **রক্ষন্**—রক্ষা করার সময়; **গোপৈঃ**—গোপবালকদের দ্বারা; **অসদ্ভি**—ধর্মহীনদের দ্বারা ; **অবলা ইব**—স্ত্রী সদৃশ দুর্বল; **বিনির্জিতঃ অস্মি**—আমি পরাজিত হয়েছি।

অনুবাদ

হে রাজশ্রেষ্ঠ, এখন আমার পরম বন্ধু, পরম সুহৃদ, পুরুষোত্তম কর্তৃক আমি ত্যক্ত হয়েছি, এবং তাই আমার হৃদয় সম্পূর্ণরূপে শূন্য বলে মনে হচ্ছে। শ্রীকৃষ্ণের অবর্তমানে তাঁর সমস্ত স্ত্রীদের আমি যখন রক্ষা করে নিয়ে আসছিলাম, তখন পথে কতকগুলি অতি নীচ গোপ এসে আমাকে অবলার মতো অনায়াসে পরাস্ত করেছে।

তাৎপর্য

এই শ্লোকের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে, একদল হীনজাত গোপের পক্ষে কিভাবে অর্জুনকে পরাস্ত করা সম্ভব হয়েছিল এবং কিভাবে এই প্রাকৃত গোপেরা অর্জুনের দ্বারা সুরক্ষিত শ্রীকৃষ্ণের মহিষীদের শ্রীঅঙ্গ স্পর্শ করতে সক্ষম হয়েছিল। শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর *বিষ্ণু পুরাণ* এবং *ব্রহ্ম পুরাণ* থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে এই আপাতবিরোধী সিদ্ধান্তের যৌক্তিকতা প্রতিপন্ন করেছেন। এই পুরাণ দুটিতে বর্ণিত হয়েছে যে, এক সময় স্বর্গের দেবীরা তাঁদের সেবার দ্বারা অষ্টাবক্র মুনির সন্তুষ্টি বিধান করেন এবং তার ফলে মুনি তাঁদের বর দেন যে, তাঁরা পরমেশ্বর ভগবানকে পতিরূপে লাভ করবেন।

অষ্টাবক্র মুনির দেহের আটটি সন্ধিস্থল বাঁকা ছিল, এবং তাই তিনি অদ্ভুতভাবে বক্রগতিতে চলাফেরা করতেন। দেবকন্যারা অষ্টাবক্র মুনির সেই বক্রগতি গমন

ভঙ্গি লক্ষ্য করে তাঁদের হাস্য সংবরণ করতে পারেননি, এবং তার ফলে তাঁদের প্রতি ক্রুদ্ধ হয়ে মুনি তাঁদের অভিশাপ দেন যে, তাঁরা পরমেশ্বর ভগবানকে তাঁদের পতিরূপে লাভ করলেও তাঁরা দুর্বৃত্তদের হাতে অপহৃত হবেন।

পরে দেবকন্যারা তাঁদের অপরাধের জন্য মুনির কাছে ক্ষমা ভিক্ষা করে নানা ভাবে তাঁর স্তব স্তুতি করেন, এবং তখন তিনি তাঁদের আশীর্বাদ করেন যে, দুর্বৃত্তদের হাতে অপহৃত হলেও তাঁরা পুনরায় পতির সঙ্গে মিলিত হবেন। তাই মহান্ অষ্টাবক্র মুনির বাক্যের মর্যাদা রক্ষার্থে ভগবান স্বয়ং অর্জুনের রক্ষণাবেক্ষণ থেকে তাঁর মহিষীদের অপহরণ করেন, তা না হলে সেই দুর্বৃত্তদের স্পর্শ মাত্রই তাঁরা তৎক্ষণাৎ অন্তর্হিত হয়ে যেতেন।

আর তা ছাড়া, যে সমস্ত গোপীরা ভগবানের পত্নী হওয়ার প্রার্থনা করেছিলেন, তাঁদের বাসনা চরিতার্থ হওয়ার পর তাঁরা তাদের যথাযথ স্থানে ফিরে গিয়েছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ চেয়েছিলেন যে, তাঁর অন্তর্ধানের পর তাঁর সমস্ত পরিকরেরা ভগবদ্ধামে যাতে ফিরে যায়, এবং বিভিন্নভাবে তিনি তাঁদের তাঁর কাছে ফিরিয়ে নিয়ে যান।

শ্লোক ২১

তদ্বৈ ধনুস্ত ইষবঃ স রথো হয়াস্তে
সোঽহং রথী নৃপতয়ো যত আনমন্তি ।
সর্বং ক্ষণেন তদভূদসদীশরিক্তং
ভস্মন্‌-হুতং কুহকরাদ্ধমিবোপ্তমূষ্যাম্ ॥ ২১ ॥

তৎ—সেই; বৈ—অবশ্যই; ধনুস্ত—সেই ধনুক; ইষবঃ—তীর; সঃ—সেই একই; রথঃ—রথ; হয়াস্তে—সেই অশ্বগণ; সঃ অহম্—সেই আমি অর্জুন; রথী—রথী; নৃপতয়—সমস্ত রাজাগণ; যতঃ—যাঁদের; আনমন্তি—শ্রদ্ধা প্রদর্শন করেছিল; সর্বম্—সমস্ত; ক্ষণেন—ক্ষণকালের মধ্যে; তৎ—সেই সমস্ত; অভূত—হয়েছিল; অসৎ—অকর্মণ্য; ঈশ—ভগবানের প্রভাব হেতু; রিক্তম্—নিঃস্ব; ভস্মন্—ভস্মাদি; হুতম্—ঘৃতাহুতি; কুহকরাদ্ধম্—যাদুর প্রভাবে সৃষ্ট ধন; ইব—মতো; উপ্তম্—বপন; উষ্যাম্—উষর ভূমিতে।

অনুবাদ

পূর্বে রাজারা যাঁর প্রভাবে আমার কাছে মস্তক অবনত করতেন, আজ সেই ধনুক, সেই বাণ, সেই রথ ও সেই অশ্ব—সমস্তই আছে এবং আমিও সেই রথীই আছি,

কিন্তু যেমন বিবিধ মন্ত্র উচ্চারণপূর্বক ভস্মে ঘৃত আহুতি প্রদানের কোন ফল লাভ হয় না, যাদুর প্রভাবে সৃষ্ট ধনসম্পদ সঞ্চয়ে কোন লাভ হয় না অথবা উষর ভূমিতে বীজ বপন করলে কোন ফল উৎপন্ন হয় না, তেমনই শ্রীকৃষ্ণের বিরহে ক্ষণিকের মধ্যেই আমার ধনুক প্রভৃতি সমস্তই অকর্মণ্য হয়েছে ; আমিও অকর্মণ্য হয়ে পড়েছি।

তাৎপর্য

পূর্বে আমরা একাধিকবার আলোচনা করেছি যে, ধার করা অলংকারের গর্বে কখনও গর্বিত হওয়া উচিত নয়। সমস্ত বল এবং বীর্যের উৎস হচ্ছেন পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ, এবং তাঁরই ইচ্ছা অনুসারে তা লাভ হয় এবং যখন তিনি তা সংবরণ করে নেন, তখন আর তার কোন বল বীর্য থাকে না। ঠিক যেমন সমস্ত বিদ্যুৎ আসে বিদ্যুৎ শক্তি উৎপাদনের কেন্দ্র থেকে এবং যখন সেখান থেকে বিদ্যুৎ সরবরাহ বন্ধ হয়ে যায়, তখন আর বাতি জ্বলে না। পরমেশ্বর ভগবানের পরম ইচ্ছাতেই সেই শক্তির উৎপাদন ক্ষণিকের মধ্যেই হতে পারে অথবা তা সংবরণ হতে পারে। শ্রীকৃষ্ণের আশীর্বাদ বিনা জড় সভ্যতা কেবল ছেলে-খেলা মাত্র। পিতামাতা যতক্ষণ শিশুকে খেলার অনুমতি দেন, ততক্ষণ পর্যন্ত সে খেলতে পারে, কিন্তু পিতামাতা যখন তাকে ডাকেন, তখন তার খেলা বন্ধ করতে হয়।

মানব সভ্যতা এবং মানুষের সমস্ত কার্যকলাপ তাই পরমেশ্বর ভগবানের পরম আশীর্বাদ নিয়েই সম্পাদিত হওয়া উচিত, এবং সেই আশীর্বাদ ব্যতীত মানব সভ্যতার সমস্ত প্রগতি একটি মৃতদেহকে সাজানোর মতোই। এই শ্লোকে বলা হয়েছে যে, মৃত সভ্যতা এবং তাঁর কার্যকলাপ ছাইয়ের গাদায় ঘি ঢালার মতো এবং উষর ভূমিতে বীজ বপন করার মতোই নিরর্থক।

শ্লোক ২২-২৩

রাজংস্ত্বয়ানুপৃষ্টানাং সুহৃদাং নঃ সুহৃৎপুরে ।
বিপ্রশাপবিমূঢ়ানাং নিঘ্নতাং মুষ্টিভির্মিথঃ ॥ ২২॥
বারুণীং মদিরাং পীত্বা মদোন্মথিতচেতসাম্ ।
অজানতামিবান্যোন্যং চতুঃপঞ্চাবশেষিতাঃ ॥ ২৩ ॥

রাজন্—হে রাজন্; **ত্বয়া**—আপনার দ্বারা; **অনুপৃষ্টানাম্**—প্রশ্ন অনুসারে; **সুহৃদাম্**—বন্ধু-বান্ধব এবং আত্মীয়-স্বজনদের; **নঃ**—আমাদের; **সুহৃৎপুরে**—দ্বারকা নগরীতে;

বিপ্র—ব্রাহ্মণদের; **শাপ**—অভিশাপের ফলে; **বিমূঢ়ানাম্**—বিমুগ্ধ চেতাদের; **নিঘ্নতাম্**—নিহতদের; **মুষ্টিভিঃ**—এড়কা বৃক্ষের দণ্ড দ্বারা; **মিথঃ**—পরস্পর; **বারুণীম্**—ফেনায়িত অন্ন থেকে তৈরি বারুণী; **মদিরাম**—মদিরা; **পীত্বা**—পান করে; **মদোন্মথিত**—মদ্যপানের প্রভাবে আবিষ্ট হয়ে; **চেতসাম্**—চেতনা বিশিষ্ট; **অজানতাম্**—অপরিচিতের; **ইব**—মতো; **অন্যোন্যম্**—একে অপরকে; **চতুঃ**—চার; **পঞ্চ**—পাঁচ; **অবশেষিতা**—অবশিষ্ট রয়েছেন।

অনুবাদ

হে রাজন্, আপনি দ্বারকাপুরীর যে সুহৃদদের কথা জিজ্ঞাসা করলেন, ব্রাহ্মণদের অভিশাপে তাঁদের বিশেষভাবে মোহ উপস্থিত হয়; পরে অন্ন থেকে প্রস্তুত বারুণী নামক মদিরা পান করায় তাঁদের এমন চিত্তোন্মত্ততা উপস্থিত হয় যে, তাঁরা যেন পরস্পর পরস্পরকে চিনতে না পেরে এড়কা দণ্ডের দ্বারা পরস্পরকে আঘাত করে প্রায় সকলেই নিহত হয়েছেন, এখন তাঁদের চার-পাঁচ জন অবশিষ্ট আছেন।

শ্লোক ২৪

প্রায়েণৈতদ্ ভগবত ঈশ্বরস্য বিচেষ্টিতম্ ।
মিথো নিঘ্নন্তি ভূতানি ভাবয়ন্তি চ যন্মিথঃ ॥ ২৪ ॥

প্রায়েণ এতৎ—প্রায় এইভাবে; **ভগবত**—ভগবানের; **ঈশ্বরস্য**—পরমেশ্বরের; **বিচেষ্টিতম্**—ইচ্ছার দ্বারা; **মিথঃ**—পরস্পর; **নিঘ্নন্তি**—নিধন করে; **ভূতানি**—জীবগণ; **ভাবয়ন্তি**—পালন করে; **চ**—ও; **যৎ**—যার; **মিথঃ**—পরস্পর।

অনুবাদ

বাস্তবিকই, পরমেশ্বর ভগবানের ইচ্ছা শক্তির প্রভাবে জীব কখনও-বা পরস্পর পরস্পরকে সংহার করে বা পরস্পর পরস্পরকে পালন করে।

তাৎপর্য

নরবিজ্ঞানীদের মত অনুসারে, প্রাকৃতিক নিয়মে জীবকে জীবন ধারণের জন্য সংগ্রাম করতে হয় এবং যে সব চেয়ে যোগ্য, সে-ই বেঁচে থাকতে সক্ষম হয়। কিন্তু তারা জানে না যে, প্রকৃতির এই নিয়মের পিছনে রয়েছে পরম নিয়ন্তা পরমেশ্বর ভগবান। *শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায়* প্রতিপন্ন হয়েছে যে, ভগবানের অধ্যক্ষতায় প্রকৃতির

নিয়ম নিয়ন্ত্রিত হয়। তাই যখনই পৃথিবীতে শান্তি দেখা যায়, তখন বুঝতে হবে যে, ভগবানের শুভ ইচ্ছার প্রভাবেই তা হয়েছে, এবং যখন কোথাও অশান্তি দেখা যায়, তাও ভগবানেরই ইচ্ছার প্রকাশ বলে বুঝতে হবে।

ভগবানের ইচ্ছা ব্যতীত একটি তৃণও নড়ে না। তাই যখন ভগবানের বিধান অনুযায়ী সুবদ্ধ আইনসমূহ অমান্য করা হয়, তখন মানুষে মানুষে এবং দেশে দেশে যুদ্ধ হয়। তাই শান্তি লাভের সর্বোৎকৃষ্ট পন্থা হল সব কিছুই ভগবানের প্রতিষ্ঠিত বিধান অনুসারে সম্পাদন করা।

ভগবানের বিধান হচ্ছে, আমরা যা কিছু করি, যা কিছু খাই, যা কিছু উৎসর্গ করি অথবা যা কিছু দান করি, তা যেন অবশ্যই ভগবানেরই সম্যক্ সন্তুষ্টি বিধানের জন্য করা হয়। ভগবানের ইচ্ছার বিরুদ্ধে কখনই কোন কিছু করা উচিত নয়, খাওয়া উচিত নয়, উৎসর্গ করা উচিত নয় অথবা দান করা উচিত নয়।

বীরত্বের কাজে সব চেয়ে ভাল দিকটা হল বিবেচনা, এবং তাই ভগবানের প্রীতিবিধানমূলক কাজ আর ভগবানের কাছে অপ্রীতিকর কাজের মধ্যে যে কি পার্থক্য, তা কিভাবে বিচার করতে হয় সেই শিক্ষা লাভ করতে হবে। ভগবানের প্রীতি এবং অপ্রীতির পরিপ্রেক্ষিতেই এইভাবে কোনও কাজের যথার্থতা বিবেচিত হয়। ব্যক্তিগত খেয়ালের কোন অবকাশ সেখানে নেই; ভগবানের সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে লক্ষ্য স্থির করে আমাদের সর্বদা সব কিছু করতে হবে। এই ধরনের কার্যকলাপকে বলা হয় *যোগকর্মসু কৌশলম্*, বা পরমেশ্বর ভগবানের সঙ্গে যুক্ত হয়ে কর্তব্যকর্ম সম্পাদন করার কৌশল। এইটিই হচ্ছে সর্বাঙ্গসুন্দরভাবে কোনও কাজ করার কৌশল।

শ্লোক ২৫-২৬

জলৌকসাং জলে যদ্বন্মহান্তোঽদন্ত্যণীয়সঃ ।
দুর্বলান্বলিনো রাজন্মহান্তো বলিনো মিথঃ ॥ ২৫ ॥
এবং বলিষ্ঠৈর্যদুভির্মহদ্ভিরিতরান্ বিভুঃ ।
যদূন্ যদুভিরন্যোন্যং ভূভারান্ সঞ্জহার হ ॥ ২৬ ॥

জলৌকসাম্—জলজন্তুদের মধ্যে; **জলে**—জলে; **যদ্বৎ**—যেমন; **মহান্তঃ**—বড়; **অদন্তি**—গ্রাস করে; **অণীয়সঃ**—ছোটদের; **দুর্বলান্**—দুর্বলদের; **বলিনঃ**—বলবান; **রাজন্**—হে রাজন; **মহান্তঃ**—বলবান; **বলিনঃ**—বীর্যবান; **মিথঃ**—পরস্পর; **এবম্**—এইভাবে; **বলিষ্ঠৈঃ**—বলবানদের দ্বারা; **যদুভিঃ**—যদুদের দ্বারা; **মহদ্ভিঃ**—অধিক

শক্তিশালী; ইতরান্—বলহীনদের; বিভুঃ—পরমেশ্বর ভগবান; যদূন্—সমস্ত যদুরা; যদুভিঃ—যদুদের দ্বারা; অন্যোন্যম্—পরস্পরের মধ্যে; ভূভারান্—পৃথিবীর ভার; সঞ্জহার—সংহার করেছেন; হ—পূর্বে।

অনুবাদ

হে মহারাজ, সমুদ্রে বৃহৎ এবং অধিকতর বলশালী জলচর প্রাণীরা যেমন ক্ষুদ্র এবং দুর্বল জলচর প্রাণীদের ভক্ষণ করে, তেমনই পরমেশ্বর ভগবান সবল এবং বৃহৎ যদুদের দ্বারা দুর্বল এবং ক্ষুদ্র যদুদের সংহার করিয়ে পৃথিবীর ভার লাঘব করেছেন।

তাৎপর্য

জড় জগতে জীবন সংগ্রাম এবং সেই সংগ্রামে যোগ্য ব্যক্তির জয়লাভই প্রকৃতির নিয়ম, কারণ বদ্ধ জীব জড় জগতকে ভোগ করার চেষ্টায় সর্বদা লিপ্ত বলে পরস্পরের প্রতি বিদ্বেষপরায়ণ। জড় জগতকে ভোগ করার বাসনা জীবের বন্ধনের মূল কারণ। জীবের কৃত্রিম ভোগবাসনা চরিতার্থ করার সুযোগ দেওয়ার জন্য ভগবানের মায়াশক্তি প্রতিটি জীবযোনিতেই সবল এবং দুর্বল দেহ সৃষ্টি করার মাধ্যমে এক বৈষম্য সৃষ্টি করেছেন। জড় জগৎ তথা ভগবানের সৃষ্টির উপর আধিপত্য করার এই মনোভাব স্বাভাবিকভাবেই বদ্ধ জীবেদের মধ্যে বৈষম্য সৃষ্টি করেছে এবং তাই প্রকৃতির নিয়মে জীবের জীবন সংগ্রাম।

চিৎ জগতে এই ধরনের কোন বৈষম্য নেই, সেখানে বেঁচে থাকার জন্য কাউকে সংগ্রাম করতে হয় না। সেখানে জীবন সংগ্রাম নেই, কারণ সেখানে সকলেই নিত্য। সেখানে কোন বৈষম্য নেই, কারণ সেখানে সকলেই পরমেশ্বর ভগবানের সেবা করতে চান, এবং কেউই ভগবানের অনুকরণ করে ভোক্তা হতে চান না। সব কিছুর, এমন কি সমস্ত জীবের স্রষ্টা হওয়ার ফলে ভগবানই হচ্ছেন সব কিছুর অধীশ্বর এবং সব কিছুর পরম ভোক্তা, কিন্তু জড় জগতে মায়ার প্রভাবে মোহাচ্ছন্ন হয়ে জীব ভগবানের সঙ্গে তার নিত্য সম্পর্কের কথা ভুলে যায়, এবং তাই প্রকৃতির নিয়মে তারা জীবন সংগ্রামে লিপ্ত হয় এবং সেই সংগ্রামে যারা বলবান, তারাই বেঁচে থাকতে পারে।

শ্লোক ২৭

দেশকালার্থযুক্তানি হৃত্তাপোপশমানি চ ।
হরন্তি স্মরতশ্চিত্তং গোবিন্দাভিহিতানি মে ॥ ২৭ ॥

দেশ—স্থান; কাল—সময়; অর্থ—গুরুত্ব; যুক্তানি—যুক্ত; হৃৎ—হৃদয়; তাপ—দহন; উপশমানি—নির্বাপিত করে; চ—এবং; হরন্তি—আকর্ষণ করে; স্মরত—স্মরণ করে; চিত্তম্—মন; গোবিন্দ—পরমেশ্বর ভগবান; অভিহিতানি—বর্ণনা; মে—আমাকে।

অনুবাদ

পরমেশ্বর ভগবান (গোবিন্দ) প্রদত্ত উপদেশগুলির প্রতি এখন আমি আকৃষ্ট হচ্ছি, কেননা এগুলি দেশ এবং কালের সমস্ত পরিস্থিতিতে হৃদয়ের তাপ প্রশমিত করার সারগর্ভ উপদেশে পূর্ণ।

তাৎপর্য

এখানে অর্জুন *শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার* উপদেশের কথা বলছেন, যা কুরুক্ষেত্রের রণাঙ্গনে ভগবান তাঁকে দান করেছিলেন। ভগবান কেবল একলা অর্জুনের হিতের জন্যই *শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার* উপদেশ দান করেননি। তিনি সর্বকালের সর্বদেশের সমস্ত মানুষদের জন্য এই উপদেশ দান করেছিলেন। *শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা* ভগবানের শ্রীমুখ নিঃসৃত বাণী বলে তা হচ্ছে সমস্ত বৈদিক জ্ঞানের সারাতিসার। উপনিষদ, পুরাণ এবং বেদান্ত সূত্র আদি বিশাল বৈদিক শাস্ত্র অধ্যয়ন করার সময় যাদের নেই, তাদের জন্য পরমেশ্বর ভগবান স্বয়ং অত্যন্ত সুন্দরভাবে এই *শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার* জ্ঞান দান করেছেন। ঐতিহাসিক মহাকাব্য *মহাভারত* যা বিশেষভাবে স্ত্রী, শূদ্র এবং দ্বিজবন্ধুদের জন্য রচিত হয়েছে, তার অভ্যন্তরে এই *শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা* স্থাপন করা হয়েছে। কুরুক্ষেত্রের রণাঙ্গনে অর্জুনের হৃদয়ে সংশয় উদয় হয়েছিল, *শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার* নির্দেশ লাভ করে তার সমাধান হয়েছিল।

আবার, এই জড় জগৎ থেকে ভগবান অপ্রকট হলে, অর্জুন যখন তাঁর শৌর্য এবং যশ থেকে বিচ্যুত হওয়ার সম্মুখীন হয়েছিলেন, তখন তিনি পুনরায় *শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার* মহান্ শিক্ষা স্মরণ করেছিলেন সকলকে এই শিক্ষা দেওয়ার জন্য যে, সমস্ত সমস্যাতেই *শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার* উপদেশ গ্রহণ করা যায়—কেবল জড় দুঃখ-দুর্দশার উপশমের জন্যই নয়, যে বন্ধন সঙ্কট কালে আমাদের বিব্রত করতে পারে, তা থেকে মুক্ত হওয়ার জন্যও।

পরম করুণাময় ভগবান *শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা* রূপী তাঁর মহান শিক্ষা দিয়ে গেছেন, যাতে তাঁর অপ্রকটের পরেও মানুষ তাঁর সেই উপদেশ গ্রহণ করতে পারে। ভগবান জড়-ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য নন, কিন্তু বদ্ধ জীবেদের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য হওয়ার জন্য ভগবান তাঁরই শক্তিসম্ভূত জড় উপাদানের মাধ্যমে নিজেকে প্রকাশিত করতে পারেন।

তাই *শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা* বা যে কোন প্রামাণিক শাস্ত্র ভগবানেরই বাণীরূপে তাঁর স্বীয় শক্তি প্রকাশ, এবং সেই সূত্রে *শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা* বা যে কোনও প্রামাণ্য শাস্ত্রীয় ভগবদ্ প্রতিভূ মাত্রই ভগবানেরই অবতার। স্বয়ং ভগবান এবং ভগবানের বাণীর মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। ভগবানের ব্যক্তিগত সান্নিধ্যে অর্জুন যা লাভ করেছিলেন, যে কোন মানুষই এখনও *শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা* থেকে তা লাভ করতে পারেন।

যে শ্রদ্ধাবান ব্যক্তি জড় জগতের বন্ধন থেকে মুক্ত হতে চান, তিনি অনায়াসে *শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার* উপদেশের সুযোগ নিতে পারেন। সেই জন্যই ভগবান অর্জুনকে এই উপদেশ দিয়েছিলেন যেন অর্জুনের তা প্রয়োজন ছিল।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় জ্ঞানের পাঁচটি গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ বিশদভাবে বর্ণিত হয়েছে, যথা—(১) পরমেশ্বর ভগবান, (২) জীব, (৩) প্রকৃতি, (৪) স্থান এবং কাল এবং (৫) কর্মপ্রক্রিয়াদি। এর মধ্যে পরমেশ্বর ভগবান এবং জীব গুণগতভাবে এক। তাঁদের উভয়ের পার্থক্য বিশ্লেষণ করে বলা হয়েছে, ভগবান পূর্ণ এবং জীব তাঁর অবিচ্ছেদ্য অংশস্বরূপ। প্রকৃতি তিন গুণের ক্রিয়া প্রদর্শনকারী অচেতন পদার্থ, এবং নিত্য কাল ও অসীম দেশ জড়া প্রকৃতির অস্তিত্বের অতীত। জীব তার বিভিন্ন কার্যকলাপের ফলে এই জড়া প্রকৃতিতে আবদ্ধ হতে পারে অথবা প্রকৃতির বন্ধন থেকে মুক্ত হতে পারে।

এই সমস্ত বিষয় *শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায়* সংক্ষেপে আলোচনা করা হয়েছে, এবং সেই সমস্ত বিষয়ে গভীরভাবে আলোকপাত করার জন্য পরে তা *শ্রীমদ্ভাগবতে* বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হয়েছে। পাঁচটি বিষয়ের মধ্যে, পরমেশ্বর ভগবান, জীব, প্রকৃতি এবং কাল নিত্য, কিন্তু জীব, প্রকৃতি এবং কাল পরমেশ্বর ভগবানের নিয়ন্ত্রণাধীন, যিনি সম্পূর্ণরূপে স্বরাট্ এবং পরম। পরমেশ্বর ভগবান পরম নিয়ন্তা। জীবের জড় কার্যকলাপ অনাদি, কিন্তু তা অপ্রাকৃত গুণের দ্বারা পরিবর্তন করার ফলে সংশোধন করা যায়। এইভাবে জীব তার জড়জাগতিক গুণগত কর্মফল থেকে মুক্ত হতে পারে। ভগবান এবং জীব উভয়েই চেতন, এবং চিদ্ বস্তুরূপে উভয়েরই অভিন্নতা বোধ রয়েছে।

কিন্তু জীব মহত্তত্ত্ব নামক জড়া প্রকৃতির প্রভাবে তার স্বরূপ বিস্মৃত হয়ে ভগবানের সঙ্গে তার সম্পর্কের কথা ভুলে যায়। বৈদিক জ্ঞানের সর্বাঙ্গীণ পরিকল্পনাটির একমাত্র উদ্দেশ্য হচ্ছে জড় বন্ধনের মোহ থেকে জীবকে মুক্ত করে তার প্রকৃত স্বরূপে অধিষ্ঠিত করা। জ্ঞান এবং বৈরাগ্যের প্রভাবে জীব যখন এই মোহ থেকে মুক্ত হয়, তখন সে বুঝতে পারে যে, তার কর্মফলের সে ভোক্তা

এবং অভিনেতা মাত্র। প্রকৃতপক্ষে, ভগবানই কেবল ভোক্তা, কিন্তু জীবের মধ্যে সেই ভোগ বাসনা এক প্রকার অলীক কল্পনা মাত্র। ভগবান এবং জীবের মধ্যে আত্ম-সচেতনতার এইটিই হচ্ছে পার্থক্য। এছাড়া ভগবান এবং জীবের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। তাই জীব এবং ভগবানে একই সাথে ভেদ ও অভেদ উভয় সত্তাই রয়েছে। *শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার* সমস্ত উপদেশ এই তত্ত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় জীব এবং ভগবান উভয়কেই সনাতন বা নিত্য বলে বর্ণনা করা হয়েছে, এবং জড়া প্রকৃতির অনেক দূরে ভগবানের ধামও সনাতন বলে বর্ণনা করা হয়েছে। ভগবান জীবকে তাঁর সেই সনাতন ধামে নিত্য জীবন লাভ করতে নিমন্ত্রণ জানিয়েছেন, এবং যে পন্থায় আত্মার নিত্য বৃত্তি প্রদর্শনকারী ভগবানের ধামে ফিরে যাওয়া যায়, তাকে বলা হয় সনাতন ধর্ম।

জড় জগতের ভ্রান্ত পরিচিতি থেকে মুক্ত না হতে পারলে ভগবানের সেই নিত্য ধামে ফিরে যাওয়া যায় না, এবং *শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায়* ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে কিভাবে পরম পূর্ণ স্তর লাভ করা যায়। ভ্রান্ত জড় পরিচিতি থেকে মুক্ত হওয়ার বিভিন্ন স্তরগুলি হচ্ছে—সকাম কর্ম, অভিজ্ঞতাবাদী দর্শন এবং ভগবদ্ভক্তি। সেই ভগবদ্ভক্তির মাধ্যমেই চিন্ময় স্বরূপের উপলব্ধি হয়। জীবের সমস্ত কার্যকলাপ পরমেশ্বর ভগবানের সঙ্গে যুক্ত করার মাধ্যমেই কেবল এই অপ্রাকৃত উপলব্ধি লাভ করা সম্ভব।

বেদে জীবের কর্ম নির্দিষ্ট হয়েছে, এবং সেই নির্দেশের অনুশীলন জীবের পাপপ্রবৃত্তি সংশোধন করে তাকে জ্ঞানের স্তরে উন্নীত করে। জ্ঞানের সেই বিশুদ্ধ স্তর ভগবদ্ভক্তির ভিত্তি। জীবনের সমস্যার সমাধানের গবেষণায় জীব যখন লিপ্ত থাকে, তার সেই অবস্থাটিকে বলা হয় জ্ঞান বা বিশুদ্ধ জ্ঞান, কিন্তু জীবনের সমস্ত সমস্যার সর্বতোভাবে সমাধান যখন উপলব্ধ হয়, জীব তখন ভগবদ্ভক্তির স্তরে অধিষ্ঠিত হন।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার শুরুতে জীবনের সমস্যাগুলির ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে জড় পদার্থের সঙ্গে আত্মার পার্থক্য নিরূপণ করার মাধ্যমে, এবং সব রকম যুক্তি দিয়ে প্রমাণ করা হয়েছে যে, আত্মা সর্ব অবস্থাতেই অবিনশ্বর, এবং আত্মার জড় আবরণ, দেহ এবং মন, পরিবর্তিত অবস্থায় দুঃখ-দুর্দশাপূর্ণ জড় অস্তিত্বের আরেকটি পর্যায় লাভ করে। তাই *শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা* হচ্ছে সব রকম জড় দুঃখ-দুর্দশার নিবৃত্তি সাধন করার প্রকৃত উপায়। অর্জুন সেই মহান্ জ্ঞানের আশ্রয় অবলম্বন করেছিলেন, যা কুরুক্ষেত্রের রণাঙ্গনে ভগবান তাঁকে দান করেছিলেন।

শ্লোক ২৮

সূত উবাচ

এবং চিন্তয়তো জিষ্ণোঃ কৃষ্ণপাদসরোরুহম্ ।
সৌহার্দেনাতিগাঢ়েন শান্তাসীদ্বিমলা মতিঃ ॥ ২৮ ॥

সূতঃ উবাচ—সূত গোস্বামী বললেন; **এবম্**—এইভাবে; **চিন্তয়তঃ**—সেই উপদেশের কথা চিন্তা করার সময়; **জিষ্ণোঃ**—পরমেশ্বর ভগবানের; **কৃষ্ণপাদ**—শ্রীকৃষ্ণের শ্রীপাদপদ্ম; **সরোরুহম**—পদ্ম সদৃশ; **সৌহার্দেন**—গভীর বন্ধুত্বের দ্বারা; **অতি গাঢ়েন**—গভীর অন্তরঙ্গতায়; **শান্তা**—বিগত শোক; **আসীৎ**—হয়েছিল; **বিমলা**—সম্পূর্ণ জড় কলুষমুক্ত; **মতিঃ**—মন।

অনুবাদ

সূত গোস্বামী বললেন—এইভাবে অত্যন্ত গভীর সৌহার্দ্য সহকারে শ্রীকৃষ্ণের চরণ কমল চিন্তা করতে করতে অর্জুনের অন্তঃকরণ শোকরহিত হয়েছিল এবং জড় জগতের সমস্ত কলুষ থেকে মুক্ত হয়েছিল।

তাৎপর্য

পরমেশ্বর ভগবান পরম পুরুষ, তাই তাঁর ধ্যান করা যোগ সমাধিরই সমতুল্য। ভগবান তাঁর নাম, রূপ, গুণ, লীলা, পরিকর এবং বৈশিষ্ট্য থেকে অভিন্ন। অর্জুন কুরুক্ষেত্রের রণাঙ্গনে ভগবানের দেওয়া উপদেশ স্মরণ করছিলেন। সেই উপদেশ স্মরণ করার ফলেই অর্জুনের হৃদয় সমস্ত জড় কলুষ থেকে মুক্ত হয়েছিল।

শ্রীকৃষ্ণ সূর্যসম। সূর্যের উদয় হলে তৎক্ষণাৎ অন্ধকার দূর হয়ে যায়, তেমনই ভক্তের হৃদয়ে যখন কৃষ্ণরূপ সূর্যের উদয় হয় তৎক্ষণাৎ জড় জগতের দুঃখ-দুর্দশাপূর্ণ সমস্ত প্রভাব বিদূরিত হয়ে যায়। তাই জড় জগতের সমস্ত কলুষ থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু নিরন্তর ভগবানের নাম কীর্তন করার নির্দেশ দিয়েছেন।

ভক্তের পক্ষে ভগবানের বিরহ অত্যন্ত বেদনাদায়ক, কিন্তু যেহেতু তা ভগবানের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত, তাই তার এক বিশেষ অপ্রাকৃত প্রভাব রয়েছে যা হৃদয়কে শান্ত করে দেয়। বিরহের অনুভূতিও অপ্রাকৃত আনন্দের উৎস, এবং জড় জগতের কলুষিত বিরহ অনুভূতির সঙ্গে কখনই তা তুলনা করা যায় না।

শ্লোক ২৯

বাসুদেবাঙ্ঘ্র্যনুধ্যানপরিবৃংহিতরংহসা ।
ভক্ত্যা নির্মথিতাশেষকষায়ধিষণোঽর্জুনঃ ॥ ২৯ ॥

বাসুদেব-অঙ্ঘ্রি—ভগবানের শ্রীপাদপদ্ম; **অনুধ্যান**—নিরন্তর স্মরণ করার ফলে; **পরিবৃংহিত**—বর্ধিত; **রংহসা**—অতি দ্রুত বেগে; **ভক্ত্যা**—ভক্তি সহকারে; **নির্মথিত**—শান্ত হয়েছিল; **অশেষ**—অন্তহীন; **কষায়**—দ্বারা; **ধিষণঃ**—ধারণা; **অর্জুনঃ**—অর্জুন।

অনুবাদ

নিরন্তর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের শ্রীপাদপদ্মের ধ্যান করার ফলে অতি দ্রুত গতিতে অর্জুনের ভক্তি বর্ধিত হয়েছিল, এবং তাঁর মন থেকে সমস্ত মল বিদূরিত হয়েছিল।

তাৎপর্য

মনের জড় ভোগ বাসনা হচ্ছে মনের আবর্জনা। এই সমস্ত আবর্জনার ফলে জীব নানা প্রকার সঙ্গত এবং অসঙ্গত অবস্থার সম্মুখীন হয় যা তার চিন্ময় অস্তিত্বকে নিরুৎসাহিত করে। জন্ম-জন্মান্তরে বদ্ধ জীব কত রকম তৃপ্তিকর এবং অতৃপ্তিকর অনুভূতির বন্ধনে আবদ্ধ হয়, যা অলীক এবং অনিত্য। জড় বাসনার প্রতিক্রিয়া রূপে সেগুলি সঞ্চিত হয়, কিন্তু আমরা যখন ভগবদ্ভক্তি সাধনের ফলে পরমেশ্বর ভগবান এবং তাঁর বিচিত্র শক্তিরাজির সান্নিধ্যে আসি, তখন সমস্ত জড় কামনা বাসনার নশ্বররূপ প্রকাশিত হয়, এবং আমাদের বুদ্ধি প্রকৃত রঙে অনুরঞ্জিত হয়ে শান্ত হয়।

অর্জুন যখন *শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায়* প্রদত্ত ভগবানের নির্দেশে মনোনিবেশ করেছিলেন, তখন তাঁর হৃদয়ে ভগবানের সঙ্গে তাঁর নিত্য সম্পর্কের কথা স্মরণ হয়েছিল, এবং তাই তিনি তখন সমস্ত জড় কলুষ থেকে মুক্ত হয়েছিলেন বলে অনুভব করেছিলেন।

শ্লোক ৩০

গীতং ভগবতা জ্ঞানং যৎ তৎ সংগ্রামমূর্ধনি ।
কালকর্মতমোরুদ্ধং পুনরধ্যগমৎ প্রভুঃ ॥ ৩০ ॥

গীতম্—উপদিষ্ট; **ভগবতা**—পরমেশ্বর ভগবানের দ্বারা; **জ্ঞানম্**—দিব্য জ্ঞান; **যৎ**—যা; **তৎ**—তা; **সংগ্রামমূর্ধনি**—যুদ্ধস্থলে; **কালকর্ম**—কাল এবং কর্ম; **তমরুদ্ধম্**—তমসাবৃত; **পুনঃ অধ্যগমৎ**—পুনরুজ্জীবিত করেছিলেন; **প্রভুঃ**—তাঁর ইন্দ্রিয়ের প্রভু।

অনুবাদ

ভগবানের লীলাবিলাস এবং কার্যকলাপের ফলে এবং তাঁর অনুপস্থিতির ফলে, মনে হয়েছিল যেন অর্জুন তাঁর দেওয়া সমস্ত উপদেশ ভুলে গেছেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তা হয়নি, এবং তিনি পুনরায় তাঁর ইন্দ্রিয়সমূহের প্রভু হয়েছিলেন।

তাৎপর্য

বদ্ধ জীব নিত্য কালের প্রভাবে তার সকাম কর্মের আবরণে আচ্ছাদিত হয়ে পড়ে। কিন্তু পরমেশ্বর ভগবান যখন এই জড় জগতে অবতরণ করেন, তখন তিনি কালের দ্বারা প্রভাবিত হন না অথবা অতীত, বর্তমান এবং ভবিষ্যতের জড় ধারণার দ্বারাও প্রভাবিত হন না। ভগবানের কার্যকলাপ নিত্য, এবং তাঁর আত্ম-মায়া বা অন্তরঙ্গা শক্তির দ্বারা তা প্রকাশিত। ভগবানের সমস্ত লীলা বা কার্যকলাপ চিন্ময়, কিন্তু সাধারণ মানুষের কাছে তা জড় কার্যকলাপের সমপর্যায়ভুক্ত বলে প্রতিভাত হতে পারে।

কুরুক্ষেত্রের রণাঙ্গনে অর্জুন এবং ভগবানের কার্যকলাপ তাঁদের বিপক্ষের যোদ্ধাদের মতো বলেই মনে হতে পারে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ভগবান তাঁর অবতরণের উদ্দেশ্য সাধন করছিলেন এবং তাঁর নিত্য সখা অর্জুনকে তাঁর সঙ্গ দান করছিলেন। তাই অর্জুনের এই ধরনের আপাত জড় কার্যকলাপ তাঁর চিন্ময় স্তর থেকে তাঁকে বিচ্যুত করতে পারেনি, পক্ষান্তরে ভগবানের শ্রীমুখ নিঃসৃত *শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা* তাঁর চেতনায় পূর্ণ প্রকাশিত হয়েছিল। চেতনার এই পুনরুজ্জীবন সম্বন্ধে *শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় (১৮/৬৫)* ভগবান বলেছেন—

মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদ্‌যাজী মাং নমস্কুরু ।
মামেবৈষ্যসি সত্যং তে প্রতিজানে প্রিয়োঽসি মে ॥

সর্বক্ষণ ভগবানের কথা চিন্তা করা উচিত; কখনই তাঁকে বিস্মৃত হওয়া উচিত নয়। ভগবানের ভক্ত হওয়া উচিত এবং তাঁকে প্রণতি নিবেদন করা উচিত। যিনি এইভাবে জীবন যাপন করেন তিনি নিঃসন্দেহে ভগবানের কৃপা লাভ করে তাঁর শ্রীপাদপদ্মের আশ্রয় প্রাপ্ত হন। এই নিত্য সত্য সম্পর্কে মনে কোন সংশয় রাখা উচিত নয়। অর্জুন যেহেতু ছিলেন তাঁর অন্তরঙ্গ সখা, তাই এই গোপনীয় তত্ত্ব তাঁর কাছে তিনি প্রকাশ করেছিলেন।

আত্মীয়-স্বজনদের সঙ্গে যুদ্ধ করার কোন বাসনা অর্জুনের ছিল না; কিন্তু ভগবানের নির্দেশে ভগবানের উদ্দেশ্য সাধনের জন্য তিনি যুদ্ধ করেছিলেন। তিনি সর্বদাই ভগবানের উদ্দেশ্য সাধনে নিযুক্ত ছিলেন, এবং তাই ভগবানের অপ্রকটের

পর, শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার নির্দেশ বিস্মৃত হয়েছিলেন বলে মনে হলেও তিনি অপ্রাকৃত স্তরে অধিষ্ঠিত ছিলেন। ভগবানের উদ্দেশ্য সাধন করার জন্যই জীবন যাপন করা উচিত, এবং তার ফলেই নিঃসন্দেহে পরমেশ্বর ভগবানের কাছে ফিরে যাওয়া যায়। সেটাই জীবনের পরম পূর্ণতা।

শ্লোক ৩১

বিশোকো ব্রহ্মসম্পত্ত্যা সংছিন্নদ্বৈতসংশয়ঃ ।
লীনপ্রকৃতিনৈর্গুণ্যাদলিঙ্গত্বাদসম্ভবঃ ॥ ৩১ ॥

বিশোকঃ—শোকমুক্ত; **ব্রহ্মসম্পত্ত্যা**—চিন্ময় সম্পদ; **সংছিন্ন**—সম্পূর্ণরূপে ছিন্ন করে; **দ্বৈত সংশয়ঃ**—দ্বিধাজনিত সংশয়; **লীন**—বিলীন; **প্রকৃতি**—জড়া প্রকৃতি; **নৈর্গুণ্যাৎ**—চিন্ময় স্তরে অধিষ্ঠিত হওয়ার ফলে; **অলিঙ্গত্বাৎ**—প্রাকৃত শরীর রহিত হওয়ার ফলে; **অসম্ভবঃ**—জন্ম-মৃত্যু রহিত।

অনুবাদ

এই অপ্রাকৃত সম্পদ লাভ করার ফলে তিনি দ্বিধাজনিত সমস্ত সংশয় ছিন্ন করেছিলেন। তার ফলে তিনি প্রকৃতির তিন গুণের প্রভাব থেকে মুক্ত হয়ে নির্গুণ স্তরে অধিষ্ঠিত হয়েছিলেন। তাঁর আর জন্ম-মৃত্যুর বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার কোন সম্ভাবনা ছিল না, কারণ তিনি জড় শরীর থেকে মুক্ত হয়েছিলেন।

তাৎপর্য

অল্পবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষেরা তাদের জড় দেহকে তাদের স্বরূপ বলে ভুল করে বলেই তাদের চিত্তে দ্বৈত জ্ঞানজনিত সংশয়ের উদয় হয়। মূর্খ মানুষের সর্বশ্রেষ্ঠ অজ্ঞানতা হচ্ছে তার জড় দেহকে তার স্বরূপ বলে মনে করা।

মানুষ তার দেহের সঙ্গে সম্পর্কিত সব কিছুকেই তার নিজের বলে মনে করে। এই ভ্রান্ত ধারণার ফলেই 'আমি' এবং 'আমার' এই দ্বন্দ্ব ভাবের উদয় হয়। অর্থাৎ 'আমার দেহ', 'আমার আত্মীয়', 'আমার সম্পত্তি', 'আমার পত্নী', 'আমার পুত্র', 'আমার সম্পদ', 'আমার দেশ', 'আমার গোষ্ঠী', এবং এই ধরনের শত সহস্র ভ্রান্ত ধারণার উদয় হয়, এবং তার ফলে বদ্ধ জীব বিভ্রান্ত হয়। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার উপদেশ গ্রহণ করার ফলে মানুষ নিঃসন্দেহে এই সমস্ত মোহ থেকে মুক্ত হতে পারে, কারণ প্রকৃত জ্ঞান হচ্ছে পরমেশ্বর ভগবান, বাসুদেব, শ্রীকৃষ্ণকে সর্ব কারণের

পরম কারণরূপে জানা। সব কিছুই তাঁর বিভিন্ন অবিচ্ছেদ্য অংশ রূপে তাঁরই শক্তির প্রকাশ। শক্তি এবং শক্তিমান অভিন্ন, তাই এই বিশুদ্ধ জ্ঞান লাভ করার ফলে তৎক্ষণাৎ দ্বৈত ধারণা বিদূরিত হয়।

অর্জুন যখন অত্যন্ত দক্ষতা সহকারে *শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার* উপদেশ গ্রহণ করেছিলেন, তৎক্ষণাৎ তাঁর নিত্য সখা শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধে তাঁর সমস্ত জড় ধারণা বিদূরিত হয়েছিল। তিনি উপলব্ধি করেছিলেন যে, পরমেশ্বর ভগবান তাঁর বাণী, তাঁর রূপ, তাঁর লীলা, তাঁর গুণ এবং তাঁর সঙ্গে সম্পর্কিত সব কিছুর মাধ্যমে তাঁর সামনে উপস্থিত ছিলেন। তিনি উপলব্ধি করেছিলেন যে, তাঁর সখা শ্রীকৃষ্ণ বিভিন্ন অদ্বয় শক্তিতে উপস্থিত থেকে তখনও তাঁর সম্মুখে বর্তমান ছিলেন, এবং দেশ কালের প্রভাবে আরও একটি দেহের পরিবর্তন করে ভগবানের সান্নিধ্য লাভ করার কোন প্রশ্নই ছিল না।

পরম জ্ঞান লাভ করার ফলে নিরন্তর ভগবানের সঙ্গ লাভ করা যায়। এমন কি, এই জীবনেও ভগবানের মহিমা শ্রবণ, কীর্তন, স্মরণ এবং বন্দনের মাধ্যমে নিরন্তর তাঁর সঙ্গ লাভ করা যায়। ভগবানকে দর্শন করা যায়, শ্রবণাদি ভগবদ্ভক্তির অনুশীলনের দ্বারা অদ্বয় জ্ঞান লাভ করে এই জীবনেই তাঁর উপস্থিতি অনুভব করা যায়।

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু বলে গেছেন যে, কেবলমাত্র ভগবানের নাম কীর্তন করার ফলে চিত্তরূপ দর্পণের সমস্ত ধূলি মার্জনা করা যায়, এবং সেই ধূলি পরিষ্কৃত হলেই সব রকম জড় অবস্থা থেকে তৎক্ষণাৎ মুক্ত হওয়া যায়। জড় বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়া মানে আত্মাকে তার বদ্ধ দশা থেকে মুক্ত করা। তাই কেউ যখন দিব্য জ্ঞান লাভ করেন, তার জড় জীবনের তখন অবসান হয়, এবং জীবন সম্বন্ধে তাঁর ভ্রান্ত ধারণার নিরসন হয়। এইভাবে চিন্ময় তত্ত্ব উপলব্ধির ফলে শুদ্ধ আত্মার কার্যকলাপ পূর্ণ প্রকাশিত হয়।

জড়া প্রকৃতির সত্ত্ব, রজো এবং তমো গুণের প্রভাব থেকে মুক্ত হওয়ার ফলেই এই উপলব্ধি সম্ভব হয়। ভগবানের কৃপায়, শুদ্ধ ভক্ত তৎক্ষণাৎ পরা প্রকৃতিতে উন্নীত হন, এবং তখন আর তাঁর জড়া প্রকৃতির দ্বারা আবদ্ধ হওয়ার কোন সম্ভাবনা থাকে না। বৈদিক শাস্ত্রে বর্ণিত ভগবদ্ভক্তির অনুশীলনের মাধ্যমে দিব্য চেতনার উন্মীলন না হলে সর্ব অবস্থায় ভগবানের উপস্থিতি অনুভব করা যায় না।

কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের বহু পূর্বেই অর্জুন সেই স্তরে উপনীত হয়েছিলেন, এবং তিনি যখন আপাতভাবে ভগবানের অনুপস্থিতি অনুভব করেছিলেন, তিনি তৎক্ষণাৎ

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার উপদেশের আশ্রয় অবলম্বন করেছিলেন, এবং তার ফলে তিনি পুনরায় তাঁর প্রকৃত স্বরূপে অধিষ্ঠিত হয়েছিলেন। এইটি হচ্ছে বিশোক বা সমস্ত সংশয় এবং শোক থেকে মুক্ত হওয়ার স্তর।

শ্লোক ৩২

নিশম্য ভগবন্মার্গং সংস্থাং যদুকুলস্য চ।
স্বঃপথায় মতিং চক্রে নিভৃতাত্মা যুধিষ্ঠিরঃ ॥ ৩২ ॥

নিশম্য—গভীরভাবে চিন্তা করে; **ভগবৎ**—ভগবান সম্বন্ধীয়; **মার্গম্**—তাঁর আবির্ভাব এবং তিরোভাবের পন্থা; **সংস্থাম্**—সমাপ্তি; **যদুকুলস্য**—মহারাজ যদুর বংশের; **চ**—ও; **স্বঃ**—ভগবানের ধাম; **পথায়**—পথিমধ্যে; **মতিম্**—অভিলাষ; **চক্রে**—মনোনিবেশ করেছিলেন; **নিভৃত-আত্মা**—নিঃসঙ্গ এবং একাকী; **যুধিষ্ঠির**—যুধিষ্ঠির মহারাজ।

অনুবাদ

শ্রীকৃষ্ণের স্বধামে প্রত্যাবর্তনের কথা, এবং এই পৃথিবী থেকে যদুকুলের বিনাশের কথা শুনে নিশ্চলমতি মহারাজ যুধিষ্ঠির স্বগৃহে শ্রীকৃষ্ণের ধামে ফিরে যেতে স্থির সংকল্প করলেন।

তাৎপর্য

এই পৃথিবীর জনগণের সামনে থেকে ভগবানের অপ্রকট হওয়ার কথা শুনে মহারাজ যুধিষ্ঠির *শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার* উপদেশে মনোনিবেশ করেছিলেন। তিনি গভীরভাবে ভগবানের আবির্ভাব এবং তিরোভাবের তত্ত্ব সম্বন্ধে চিন্তা করতে শুরু করেছিলেন।

এই জড় জগতে ভগবানের আবির্ভাব এবং তিরোভাব সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করে তাঁর পরম ইচ্ছার উপর। সাধারণ জীবের মতো তাঁর আবির্ভাব এবং তিরোভাব প্রকৃতির নিয়মের বশবর্তী হয়ে কোন উন্নত শক্তির দ্বারা পরিচালিত হয় না। তিনি তাঁর ইচ্ছা অনুসারে অন্য কোনও স্থানে তাঁর আবির্ভাব কিংবা তিরোভাব ব্যাহত না করেও যে কোন স্থানে যে কোন সময়ে আবির্ভূত হতে পারেন।

তিনি সূর্যের মতো। সূর্য স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে উদিত হয় এবং অস্ত যায় এবং তার ফলে অন্য কোন স্থানে তার উপস্থিতি ব্যাহত হয় না। পশ্চিম গোলার্ধ থেকে অন্তর্হিত না হয়েই সূর্য সকালে ভারতবর্ষে উদিত হতে পারে। সৌরমণ্ডলের সর্বত্রই সূর্য সর্বদাই বিরাজমান, কিন্তু আপাতদৃষ্টিতে মনে হয় যেন কোন স্থানে সূর্য

সকালবেলা উদিত হচ্ছে এবং কোন বিশেষ সময়ে সন্ধ্যা বেলায় অস্ত যাচ্ছে। সূর্য সময়ের অপেক্ষা করে না, সুতরাং সূর্যের যিনি স্রষ্টা এবং নিয়ন্তা, সেই পরমেশ্বর ভগবানের কথা আর বলে কী হবে!

তাই, *শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায়* বর্ণনা করা হয়েছে যে, যিনি ভগবানের অচিন্ত্য শক্তির প্রভাবে তাঁর অপ্রাকৃত আবির্ভাব এবং তিরোভাবের তত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করতে পেরেছেন, তিনি জন্ম-মৃত্যুর বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে ভগবানের নিত্যধাম বৈকুণ্ঠলোকে ফিরে যাবেন। সেখানে এই ধরনের মুক্ত পুরুষেরা জন্ম-মৃত্যু, জরা-ব্যাধির ক্লেশমুক্ত হয়ে নিত্য জীবন লাভ করতে পারেন। চিৎ জগতে ভগবান এবং তাঁর প্রেমময়ী সেবায় নিত্যযুক্ত পার্ষদেরা সকলেই নিত্য যৌবনসম্পন্ন, কারণ সেখানে জরা, ব্যাধি এবং মৃত্যু নেই। যেহেতু সেখানে মৃত্যু নেই, তাই সেখানে জন্মও নেই। তাই সিদ্ধান্ত দেওয়া হয়েছে যে, ভগবানের আবির্ভাব এবং তিরোভাবের তত্ত্ব জানার ফলেই কেবল নিত্য জীবন লাভ করা যায়।

তাই, মহারাজ যুধিষ্ঠিরও ভগবদ্ধামে ফিরে যাওয়ার কথা বিবেচনা করেছিলেন। ভগবান যখন এই পৃথিবীতে অথবা মর্তলোকের অন্য কোন স্থানে অবতরণ করেন, তখন তিনি তাঁর নিত্য পার্ষদ্দের নিয়ে আসেন। সেই সূত্রে তাঁর লীলা সহচর যদুকুলোদ্ভুত যাদবেরা ছিলেন তাঁর নিত্য পার্ষদ। তেমনই মহারাজ যুধিষ্ঠির এবং তাঁর ভায়েরা এবং তাঁর মাতা কুন্তীদেবী, এঁরাও ছিলেন তাঁর নিত্য পার্ষদ। ভগবান এবং তাঁর নিত্য পার্ষদ্দের আবির্ভাব এবং তিরোভাব যেহেতু অপ্রাকৃত, তাই এই আবির্ভাব এবং তিরোভাবের আপাত প্রকাশে বিভ্রান্ত হওয়া উচিত নয়।

শ্লোক ৩৩

পৃথাপ্যনুশ্রুত্য ধনঞ্জয়োদিতং
নাশং যদূনাং ভগবদ্গতিং চ তাম্ ।
একান্তভক্ত্যা ভগবত্যধোক্ষজে
নিবেশিতাত্মোপররাম সংসৃতেঃ ॥ ৩৩ ॥

পৃথা—কুন্তী দেবী; **অপি**—ও; **অনুশ্রুত্য**—শ্রবণ করে; **ধনঞ্জয়**—অর্জুন; **উদিতম্**—উক্ত; **নাশম্**—বিনাশ; **যদূনাম্**—যদুবংশের; **ভগবৎ**—পরমেশ্বর ভগবানের; **গতিম্**—অপ্রকট; **চ**—ও; **তাম্**—তাঁরা সকলে; **একান্ত**—ঐকান্তিক; **ভক্ত্যা**—ভক্তি; **ভগবতি**—পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণে; **অধোক্ষজে**—ইন্দ্রিয় জ্ঞানের অতীত; **নিবেশিতাত্মা**—পূর্ণরূপে একাগ্র চিত্ত; **উপররাম**—মুক্ত হয়েছিলেন; **সংসৃতেঃ**—জড় অস্তিত্ব থেকে।

অনুবাদ

কুন্তীদেবীও অর্জুনের মুখে যদু বংশের বিনাশ এবং ভগবান শ্রীকৃষ্ণের অপ্রকট হওয়ার কথা শ্রবণ করে একান্ত ভক্তি সহকারে ইন্দ্রিয় জ্ঞানাতীত ভগবান শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্মে তাঁর চিত্ত সমর্পণ করে এই জড় জগৎ ত্যাগ করলেন।

তাৎপর্য

সূর্যের অস্ত সূর্যের সমাপ্তি নয়। এর অর্থ সূর্য আমাদের দৃষ্টিপথের অন্তরালে চলে যায়। তেমনই ভগবান যখন কোন বিশেষ গ্রহে বা ব্রহ্মাণ্ডে তাঁর কার্য সম্পাদন করেন, তখন তিনি আমাদের দৃষ্টির অন্তরালে চলে যান। যদু বংশের সমাপ্তির অর্থ এই নয় যে তার বিনাশ সাধন হয়েছে। ভগবানের সঙ্গে সঙ্গে তাঁরাও আমাদের দৃষ্টিপথের অন্তরালে চলে গিয়েছেন।

মহারাজ যুধিষ্ঠির যেমন ভগবদ্ ধামে ফিরে যেতে স্থির সংকল্প করেছিলেন, তেমনই কুন্তীদেবীও ঐকান্তিকভাবে ভগবানের অপ্রাকৃত সেবায় যুক্ত হয়েছিলেন, যার ফলে নিশ্চিতভাবে বর্তমান জড় দেহ পরিত্যাগ করার পর অনায়াসে ভগবদ্-ধামে ফিরে যাওয়ার ছাড়পত্র মেলে।

পরমেশ্বরের প্রতি ভক্তি সেবা চর্চার সূচনা থেকেই বর্তমান দেহটির চিন্ময় সত্তা রূপায়ণের সূচনা হয়ে থাকে, এবং এই ভাবেই পরমেশ্বরের কোন ঐকান্তিক ভক্ত বর্তমান দেহটির সঙ্গে সমস্ত জড় সংযোগ হারাতে থাকে। নাস্তিকেরা যে মনে করে ভগবানের ধাম মানুষের অলীক কল্পনা মাত্র, তা সত্য নয়, তবে স্পুটনিক বা মহাকাশ যানে চড়ে কোনও জড় উপায়ে সেখানে যাওয়া যায় না। কিন্তু যথাযথভাবে ভগবদ্ভক্তি অনুশীলন করার ফলে উপযুক্ত চেতনা লাভ করে এই জড় দেহ ত্যাগ করার পর সেখানে অবশ্যই ফিরে যাওয়া যায়। ভগবদ্ভক্তির ঐকান্তিক অনুশীলনের ফলে ভগবদ্ধামে ফিরে যাওয়ার ছাড়পত্র পাওয়া যায়, এবং কুন্তীদেবী তা লাভ করেছিলেন।

শ্লোক ৩৪

যয়াহরদ্ ভুবো ভারং তাং তনুং বিজহাবজঃ ।
কণ্টকং কণ্টকেনেব দ্বয়ং চাপীশিতুঃ সমম্ ॥ ৩৪ ॥

যয়া—যার দ্বারা; **অহরৎ**—হরণ করেছিলেন; **ভুবঃ**—পৃথিবীর; **ভারম্**—ভার; **তাম্**—তা; **তনুম্**—দেহ; **বিজহৌ**—পরিত্যাগ করেছিলেন; **অজঃ**—জন্মরহিত; **কণ্টকম্**—

কাঁটা; কন্টকেন—কাঁটার দ্বারা; ইব—মতো; দ্বয়ম্—উভয়; চ—ও; অপি—যদিও; ঈশিতুঃ—ঈশ্বরের; সমম্—সমান।

অনুবাদ

কাঁটা দিয়ে কাঁটা তোলার পর যেমন সেই দুটি কাঁটাকেই ফেলে দেওয়া হয়, তেমনই জন্মবিরহিত পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণও যাদবদের দ্বারা ধরিত্রীর ভারস্বরূপ অসুরদের বধ সাধন করে পৃথিবীর ভার হরণ করেছিলেন, এবং তারপর তাদেরও অপ্রকট করিয়েছিলেন, কারণ তাঁর কাছে উভয়েই সমান।

তাৎপর্য

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর তাঁর টীকায় লিখেছেন যে, মদোন্মত্ত অবস্থায় যাদবদের মৃত্যুর কাহিনী শ্রবণ করে নৈমিষারণ্যে সূত গোস্বামীর কাছে শ্রীমদ্ভাগবত শ্রবণরত শৌনকাদির ন্যায় ঋষিরা সুখী হননি।

তাঁদের সেই মনঃকষ্ট উপশম করার জন্য সূত গোস্বামী তাঁদের আশ্বাস দিয়েছিলেন যে, ভগবানই যদুদের দ্বারা অসুর সংহার করে ভূ-ভার হরণ করেছিলেন এবং তারপর তাঁদের দেহত্যাগ করিয়েছিলেন।

ভগবান এবং তাঁর নিত্য পার্ষদেরা ভূ-ভার হরণ করার জন্য দেবতাদের সাহায্য করতে এই পৃথিবীতে আবির্ভূত হয়েছিলেন। তিনি তাই তাঁর বিশ্বস্ত দেবতাদের যদুকুলে জন্মগ্রহণ করিয়েছিলেন, যাতে তাঁর মহান কার্য সাধনে তাঁকে তাঁরা সাহায্য করেন। সেই কার্য সম্পাদন হওয়ার পর ভগবানের ইচ্ছাক্রমে সেই দেবতারা সুরাপানে উন্মত্ত হয়ে পরস্পরকে সংহার করেছিলেন। এইভাবে ভগবান তাঁদের দেহত্যাগ করিয়েছিলেন।

দেবতারা সোমরস পানে অভ্যস্ত, এবং তাই তাঁদের কাছে সুরাপান অজ্ঞাত নয়। এইভাবে নেশা করার ফলে তাঁরা কখনও কখনও বিপদগ্রস্ত হন। একসময় কুবেরের দুই পুত্র নেশাগ্রস্ত হওয়ার ফলে নারদ মুনি কর্তৃক তিরস্কৃত হয়েছিলেন। কিন্তু পরে তাঁরা ভগবান শ্রীকৃষ্ণের কৃপায় তাঁদের স্বরূপ ফিরে পেয়েছিলেন। শ্রীমদ্ভাগবতের দশম স্কন্ধে সেই কাহিনী বর্ণিত হয়েছে।

ভগবানের কাছে অসুর এবং দেবতা উভয়েই সমান, তবে দেবতারা ভগবানের বাধ্য কিন্তু অসুরেরা অবাধ্য। তাই এখানে একটি কাঁটা দিয়ে আর একটি কাঁটা তোলার দৃষ্টান্তটি খুবই যথোপযুক্ত। যে কাঁটাটি ভগবানের পায়ে ফোটে, তা অবশ্যই ভগবানকে ব্যথা দেয়, এবং অন্য যে কাঁটাটি দিয়ে সেই কাঁটাটি তোলা হয়, তা অবশ্যই ভগবানের সেবা করে থাকে। সুতরাং যদিও প্রতিটি জীবই ভগবানের

বিভিন্ন অবিচ্ছেদ্য অংশ, তবুও কাঁটার মতো ভগবানের পায়ে ফুটে যে ভগবানকে যন্ত্রণা দেয়, তাকে বলা হয় অসুর, আর যিনি স্বতঃস্ফূর্তভাবে ভগবানের সেবা করেন, তাঁকে বলা হয় দেবতা।

এই জড় জগতে দেবতা এবং অসুরেরা সর্বদাই পরস্পরের সঙ্গে কলহ করে, এবং ভগবান সর্বদাই অসুরদের হাত থেকে দেবতাদের রক্ষা করেন। তাঁরা উভয়ই ভগবানের নিয়ন্ত্রণাধীন। এই পৃথিবী দুই প্রকার জীবে পূর্ণ, এবং ভগবান এখানে আসেন দেবতাদের রক্ষা করার জন্য এবং অসুরদের বিনাশ করার জন্য। যখনই পৃথিবীতে এই প্রয়োজন দেখা দেয়, তখন ভগবান আসেন তাঁদের উভয়েরই মঙ্গল সাধনের জন্য।

শ্লোক ৩৫

যথা মৎস্যাদিরূপাণি ধত্তে জহ্যাদ্ যথা নটঃ ।
ভূভারঃ ক্ষপিতো যেন জহৌ তচ্চ কলেবরম্ ॥ ৩৫ ॥

যথা—যেমন; **মৎস্যাদি**—মীন আদি অবতার; **রূপাণি**—রূপসমূহ; **ধত্তে**—নিত্য ধারণ করেন; **জহ্যাৎ**—আপাতদৃষ্টিতে পরিত্যাগ করে; **যথা**—ঠিক যেমন; **নটঃ**—যাদুকর; **ভূ-ভারঃ**—পৃথিবীর ভার; **ক্ষপিতঃ**—প্রশমিত করে; **যেন**—যার দ্বারা; **জহৌ**—অন্তর্হিত হয়েছিলেন; **তৎ**—তা; **চ**—ও; **কলেবরম্**—শরীর।

অনুবাদ

ঠিক যেমন একজন যাদুকর এক দেহ পরিত্যাগ করে অন্য দেহ ধারণ করে, তেমনই পরমেশ্বর ভগবান পৃথিবীর ভার হরণ করার জন্য মৎস্য-আদি বহুবিধ রূপ পরিগ্রহ করেন এবং প্রয়োজন সাধনের পর সেই সমস্ত রূপ অপ্রকট করেন।

তাৎপর্য

পরমেশ্বর ভগবান নির্বিশেষ বা নিরাকার নন, পক্ষান্তরে তাঁর দেহ তাঁর থেকে অভিন্ন, এবং তাই তিনি সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ বলে পরিচিত। বৃহদ্-বৈষ্ণব তন্ত্রে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে যে, কেউ যদি মনে করে যে, ভগবান শ্রীকৃষ্ণের রূপ জড়া শক্তি সম্ভূত, তবে তাকে সর্বতোভাবে পরিত্যাগ করা উচিত। আর যদি কখনও ঘটনাক্রমে সে নাস্তিকের মুখ দর্শন হয়, তা হলে তৎক্ষণাৎ বস্ত্রসহ নদীতে ডুব দিয়ে কলুষ মুক্ত হতে হয়।

ভগবানকে অমৃত বা মৃত্যুহীন বলে বর্ণনা করা হয়, কারণ তাঁর দেহ জড় নয়। এই অবস্থায়, ভগবানের দেহত্যাগ ঠিক কোনও যাদুকরের ভোজবাজির মতো। যাদুকর ভেলকি দেখায় যে, তার শরীর খণ্ড খণ্ড করে কাটা হয়েছে, আগুনে পুড়িয়ে ভস্মীভূত হয়েছে, অথবা সম্মোহিনী শক্তি দ্বারা অচেতন করা হয়েছে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এগুলি কেবলই অলীক অবাস্তব প্রদর্শনী মাত্র। বাস্তবিকই, যাদুকর ভস্মীভূত হয় না, অথবা তাকে কেটে খণ্ড খণ্ড করা হয় না, তার যাদু প্রদর্শনীর মধ্যে কোন অবস্থাতেই তার মৃত্যু হয় না অথবা সে অচেতন হয় না।

তেমনই, ভগবানের অন্তহীন নিত্য রূপ রয়েছে, তার মধ্যে একটি হচ্ছে মীন অবতার, তাঁর এই রূপ এই ব্রহ্মাণ্ডে প্রদর্শিত হয়েছিল। যেহেতু অসংখ্য ব্রহ্মাণ্ড রয়েছে, তাই কোথাও না কোথাও তাঁর মীন অবতার লীলা অবশ্যই এখন প্রকট রয়েছে। এইভাবে তাঁর লীলা নিত্য।

এই শ্লোকে '*ধত্তে*' অর্থাৎ নিত্য ধারণ করেন, এই বিশেষ শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে (এবং '*ধিত্বা*', অর্থাৎ "কোনও উপলক্ষ্যে ধারণ করেন", কথাটি নয়)। এর ভাবার্থ এই যে, ভগবান মীন অবতার সৃষ্টি করেন না; তাঁর এই সমস্ত রূপ নিত্য, এবং এই ধরনের অবতারদের আবির্ভাব এবং তিরোভাব কোনও বিশেষ উদ্দেশ্য সাধন করে থাকে।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় (৭/২৪-২৫) ভগবান বলেছেন, "নির্বিশেষবাদীরা মনে করে যে, আমার কোন রূপ নেই, আমি নিরাকার, কেবল কোন বিশেষ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য আমি রূপ পরিগ্রহ করে এখন প্রকাশিত হয়েছি। এই ধরনের জল্পনা কল্পনাকারীরা প্রকৃতপক্ষে বুদ্ধিহীন। তারা বৈদিক শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত হতে পারে, কিন্তু তারা আমার অচিন্ত্য শক্তি এবং নিত্য সবিশেষ রূপ সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অজ্ঞ। তার কারণ হল এই যে, আমি যোগমায়ার আবরণে আচ্ছাদিত থেকে অভক্তদের কাছে নিজেকে প্রকাশ করি না। তাই মূঢ় মানুষেরা আমার পরম ভাবসমন্বিত জন্মরহিত অবিনশ্বর রূপের কথা জানে না।"

পদ্মপুরাণে বলা হয়েছে, যারা ভগবানের প্রতি ক্রোধ এবং ঈর্ষাপরায়ণ, তারা ভগবানের নিত্য শাশ্বতরূপ জানার অযোগ্য। *শ্রীমদ্ভাগবতেও* বলা হয়েছে যে, ভগবান মল্লবীরদের কাছে বজ্রের মতো প্রতিভাত হয়েছিলেন। পরমেশ্বর ভগবানের হাতে শিশুপালের মৃত্যুর সময় ব্রহ্মজ্যোতির তীব্র আলোকে তাঁর চোখ ঝলসে যাওয়ায় তিনি শ্রীকৃষ্ণকে দেখতে পাননি। তাই কংসের মল্লদের কাছে ভগবান যে অশনি রূপে প্রকাশিত হয়েছিলেন, অথবা শিশুপালের কাছে তাঁর রশ্মিচ্ছটা রূপে প্রকাশিত হয়েছিলেন, তাঁর সেই সমস্ত রূপ তিনি পরিত্যাগ করেন, কিন্তু

একজন যাদুকরের মতো ভগবান নিত্য বিরাজমান এবং কোন অবস্থাতেই তাঁর বিনাশ হয় না।

এই ধরনের রূপ সাময়িকভাবে কেবল অসুরদেরই প্রদর্শন করান হয়, এবং সেই রূপ তিনি যখন সংবরণ করেন, তখন অসুরেরা মনে করে ভগবান হত হয়েছেন এবং তাঁর আর অস্তিত্ব নেই; ঠিক যেমন নির্বোধ দর্শকেরা মনে করে যে, যাদুকর আগুনে পুড়ে ভস্মীভূত হয়ে গেছে অথবা তার দেহ খণ্ড খণ্ড করে কেটে ফেলা হয়েছে। এ থেকে সিদ্ধান্ত হয় যে, ভগবানের দেহ জড় নয়, এবং তাই তাঁর কখনও মৃত্যু হয় না অথবা তাঁর চিন্ময় দেহের কোন পরিবর্তন হয় না।

শ্লোক ৩৬

যদা মুকুন্দো ভগবানিমাং মহীং
জহৌ স্বতন্বা শ্রবণীয়সৎকথঃ ।
তদাহরেবাপ্রতিবুদ্ধচেতসা-
মভদ্রহেতুঃ কলিরন্ববর্তত ॥ ৩৬ ॥

যদা—যখন; **মুকুন্দঃ**—শ্রীকৃষ্ণ; **ভগবান**—পরমেশ্বর ভগবান; **ইমাম্**—এই; **মহীম্**—পৃথিবী; **জহৌ**—পরিত্যাগ করেছিলেন; **স্বতন্বা**—স্বীয় শরীরের দ্বারা; **শ্রবণীয়সৎকথঃ**—তাঁর সম্বন্ধীয় কথা শ্রবণযোগ্য; **তদা**—সেই সময়; **অহঃ এব**—সেই দিন থেকে; **অপ্রতিবুদ্ধচেতসাম্**—যাদের চেতনা যথেষ্টভাবে পরিণত হয়নি; **অভদ্র হেতুঃ**—সমস্ত দুর্ভাগ্যের কারণ; **কলিঃঅন্ববর্তত**—কলি পূর্ণরূপে প্রকাশিত হলে।

অনুবাদ

যাঁর পবিত্র যশ শ্রবণ করা বিধেয়, সেই পরম পুরুষ ভগবান মুকুন্দদেব শ্রীকৃষ্ণ যেদিন সশরীরে এই পৃথিবী পরিত্যাগ করলেন, সেইদিনই অবিবেকী জনসমূহের অমঙ্গলের কারণ যে কলি ইতিপূর্বেই কিছুটা প্রকটিত হয়ে ছিল, সে অপরিণত চেতনাবিশিষ্ট মানুষদের জীবনে অশুভ পরিস্থিতি সৃষ্টির উদ্দেশ্যে পরিপূর্ণভাবে প্রকটিত হল।

তাৎপর্য

যারা যথেষ্টভাবে ভগবৎ চেতনাসম্পন্ন নয়, তারাই কেবল কলির দ্বারা প্রভাবিত হয়। পরমেশ্বর ভগবানের অপ্রাকৃত তত্ত্বাবধানে থাকলে কলির প্রভাব থেকে

অনায়াসে মুক্ত হওয়া যায়। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের ঠিক পরেই কলিযুগ শুরু হয়, কিন্তু ভগবানের উপস্থিতির ফলে সে তার প্রভাব বিস্তার করতে পারেনি। কিন্তু ভগবান যখন এই পৃথিবী ছেড়ে তাঁর চিন্ময় শরীর নিয়ে স্বধামে প্রত্যাবর্তন করেন, তখনই কলিযুগের সমস্ত অশুভ লক্ষণগুলি প্রকাশ পেতে থাকে, যা দ্বারকা থেকে অর্জুনের ফিরে আসার আগেই যুধিষ্ঠির মহারাজ দেখতে পেয়েছিলেন, এবং যথাযথভাবে উপলব্ধি করেছিলেন যে, ভগবান এই পৃথিবী থেকে বিদায় নিয়ে তাঁর স্বধামে প্রত্যাবর্তন করেছেন। পূর্বেই বিশ্লেষণ করা হয়েছে যে, সূর্য যেমন আমাদের দৃষ্টিপথের অন্তরালে চলে গেলে মনে হয় যে, সূর্য অস্ত গেছে, তেমনই পরমেশ্বর ভগবান আমাদের দৃষ্টিপথের আড়ালে চলে গিয়েছেন।

শ্লোক ৩৭

যুধিষ্ঠিরস্তৎপরিসর্পণং বুধঃ
পুরে চ রাষ্ট্রে চ গৃহে তথাত্মনি ।
বিভাব্য লোভানৃতজিহ্মহিংসনা-
দ্যধর্মচক্রং গমনায় পর্যধাৎ ॥ ৩৭ ॥

যুধিষ্ঠিরঃ—মহারাজ যুধিষ্ঠির; **তৎ**—তা; **পরিসর্পণম্**—প্রসারণ; **বুধঃ**—জ্ঞানসম্পন্ন; **পুরে**—রাজধানীতে; **চ**—ও; **রাষ্ট্রে**—রাজ্যে; **চ**—এবং; **গৃহে**—গৃহে; **তথা**—তথা; **আত্মনি**—স্বদেহে; **বিভাব্য**—দর্শন করে; **লোভ**—লোভ; **অনৃত**—মিথ্যাচার; **জিহ্ম**—কৌটিল্য; **হিংসন-আদি**—হিংসা, মাৎসর্য; **অধর্ম**—অধর্ম; **চক্রম্**—দুষ্টচক্র; **গমনায়**—পৃথিবী ত্যাগ করার জন্য; **পর্যধাৎ**—তদনুযায়ী পরিধান গ্রহণ করেছিলেন।

অনুবাদ

লোভ, মিথ্যা, কুটিলতা ও হিংসা প্রভৃতি অধর্মচক্র বিস্তার লাভ করতে দেখে বিজ্ঞ যুধিষ্ঠির মহারাজ বুঝলেন যে, তাঁর রাজধানীতে, রাজ্যে, গৃহে এবং দেহেও কলির সঞ্চার হচ্ছে, তাই তিনি মহাপ্রস্থান করবার উপযুক্ত বসনসমূহ পরিধান করলেন।

তাৎপর্য

এই যুগ কলির প্রভাবের দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের সময় থেকেই, প্রায় পাঁচ হাজার বছর আগে, কলিযুগের প্রভাব বিস্তার লাভ করতে শুরু

করে, এবং প্রামাণিক শাস্ত্রাদি থেকে জানা যায়যে, কলিযুগের আরও ৪,২৭,০০০ বছর বাকি আছে। উল্লিখিত কলিযুগের লক্ষণসমূহ, যথা—লোভ, মিথ্যাচার, কুটিলতা, প্রতারণা স্বার্থপরতা, হিংসা ইত্যাদি ইতিমধ্যেই প্রবলভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে, এবং কলিযুগের প্রভাব বর্ধিত হতে হতে বিনাশের সময় পর্যন্ত যে কি অবস্থা হবে তা কেউ কল্পনাও করতে পারে না।

আমরা ইতিমধ্যেই দেখেছি যে, ভগবদ্‌বিমুখ তথাকথিত সভ্য মানুষদের কলি প্রভাবিত করে। কিন্তু যারা ভগবানের শরণাগত হওয়ার ফলে ভগবান কর্তৃক সুরক্ষিত, তাদের এই ভয়ঙ্কর কলিযুগ থেকে ভয় পাওয়ার কিছুই নেই।

মহারাজ যুধিষ্ঠির ছিলেন ভগবানের এক মহান্ ভক্ত, এবং তাঁর পক্ষে কলির ভয়ে ভীত হওয়ার কোনই কারণ ছিল না, কিন্তু তা সত্ত্বেও তিনি গৃহস্থ আশ্রম থেকে অবসর গ্রহণ করে ভগবদ্-ধামে ফিরে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হতে মনস্থ করেছিলেন। পাণ্ডবেরা ভগবানের নিত্যপার্ষদ, এবং তাই তাঁর সান্নিধ্য লাভের জন্য তাঁরা সব চেয়ে বেশি আগ্রহী। আর তা ছাড়া, একজন আদর্শ রাজারূপে, মহারাজ যুধিষ্ঠির তাঁর দৃষ্টান্তের মাধ্যমে অন্যদের শিক্ষা দেওয়ার জন্য সংসার থেকে অবসর গ্রহণ করতে চেয়েছিলেন।

গৃহের কার্যকলাপ পরিচালনা করার জন্য যখন কোন উপযুক্ত যুবক থাকে, তখন পারমার্থিক জীবনের উন্নতি সাধনের জন্য গৃহস্থ আশ্রম থেকে অবসর গ্রহণ করা উচিত। যতক্ষণ পর্যন্ত যমরাজের ইচ্ছায় একজনকে টেনে হিঁচড়ে বার করে না আনা হচ্ছে, ততক্ষণ পর্যন্ত গৃহরূপ অন্ধকূপে আবদ্ধ থাকা উচিত নয়।

মহারাজ যুধিষ্ঠিরের এই দৃষ্টান্ত অনুযায়ী আধুনিক যুগের রাজনৈতিক নেতাদের স্বেচ্ছায় অবসর গ্রহণ করে নবীনদের জন্য পথ ছেড়ে দেওয়া উচিত। আর অবসরপ্রাপ্ত বৃদ্ধদেরও তাঁর থেকে এই শিক্ষা লাভ করে বলপূর্বক মৃত্যুর কবলিত হওয়ার পূর্বেই পারমার্থিক জ্ঞান লাভের জন্য গৃহত্যাগ করা উচিত।

শ্লোক ৩৮

স্বরাট্ পৌত্রং বিনয়িনমাত্মনঃ সুসমং গুণৈঃ ।
তোয়নীব্যাঃ পতিং ভূমেরভ্যষিঞ্চদ্ গজাহ্বয়ে ॥ ৩৮ ॥

স্বরাট্—সম্রাট; **পৌত্রম্**—পৌত্রকে; **বিনয়িনম্**—উপযুক্ত শিক্ষায় প্রশিক্ষিত; **আত্মনঃ**—তাঁর নিজের; **সুসমম্**—সর্বতোভাবে তাঁর সমান; **গুণৈঃ**—গুণাবলীর দ্বারা; **তোয়নীব্যাঃ**—সাগর পর্যন্ত যাঁর সীমা; **পতিম্**—প্রভু; **ভূমেঃ**—ভূমির; **অভ্যষিঞ্চৎ**—অভিষিক্ত করেছিলেন; **গজাহ্বয়ে**—হস্তিনাপুর নগরে।

অনুবাদ

অতঃপর, সম্রাট যুধিষ্ঠির সর্বাংশে তাঁর মতো গুণবান্, বিনীত পৌত্র পরীক্ষিতকে সসাগরা পৃথিবীর অধীশ্বররূপে হস্তিনাপুরের সিংহাসনে অভিষিক্ত করেছিলেন।

তাৎপর্য

হস্তিনাপুরের রাজা ছিলেন সসাগরা পৃথিবীর অধীশ্বর। মহারাজ যুধিষ্ঠির তাঁর সমতুল্য গুণবান পৌত্র মহারাজ পরীক্ষিতকে প্রজাপালনে রাজার কর্তব্য সম্বন্ধে শিক্ষাদান করেছিলেন। তারপর মহাপ্রস্থানের পূর্বে তিনি তাঁকে রাজ সিংহাসনে অভিষিক্ত করেছিলেন।

মহারাজ পরীক্ষিৎ সম্বন্ধে এই শ্লোকে যে *বিনয়িনম্* শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে, তা তাৎপর্যপূর্ণ। হস্তিনাপুরের রাজাদের অন্ততপক্ষে মহারাজ পরীক্ষিৎ পর্যন্ত, কেন সারা পৃথিবীর সম্রাট বলে স্বীকার করা হয়েছিল? তার একমাত্র কারণ হচ্ছে, সম্রাটের সুদক্ষ পরিচালনায় পৃথিবীর মানুষ সুখ এবং শান্তি লাভ করেছিল। প্রচুর পরিমাণে শস্য, ফলমূল, দুধ, ওষধি, মূল্যবান রত্ন, ধাতু এবং মানুষের অন্যান্য যা কিছু প্রয়োজন, প্রচুর পরিমাণে তার উৎপাদনের ফলে নাগরিকেরা সুখী হয়েছিল। তাঁদের রাজ্য শাসন কালে নাগরিকেরা দৈহিক ক্লেশ, মানসিক দুশ্চিন্তা, প্রাকৃতিক দুর্যোগ এবং অন্যান্য প্রাণীদের দ্বারা সৃষ্ট সব রকম ক্লেশ থেকে মুক্ত ছিলেন। যেহেতু সকলেই সর্বতোভাবে সুখী ছিলেন, তাই কারো কোন অভিযোগ ছিল না, যদিও রাজনৈতিক কারণে এবং আধিপত্য বিস্তার করার জন্য কখনও কখনও অন্যান্য রাষ্ট্রের রাজাদের সঙ্গে যুদ্ধ হত। জীবনে পরম উদ্দেশ্য সাধনের জন্য সকলেই শিক্ষা লাভ করতেন, এবং তাই মানুষেরা যথেষ্ট তত্ত্বজ্ঞান সম্পন্ন ছিলেন বলে তুচ্ছ বিষয় নিয়ে কলহ করতেন না। কলিযুগের প্রভাব বিস্তার লাভ করছে বলে রাজা এবং প্রজা উভয়েরই সদ্‌গুণাবলী নষ্ট হয়ে পড়েছে, এবং তাই শাসক এবং শাসিতের সম্পর্ক বিষময় হয়ে উঠেছে। তবুও এই বৈষম্যের যুগেও ভগবৎ চেতনার বিকাশ হতে পারে। এইটি এই যুগের বিশেষ গুণ।

শ্লোক ৩৯

মথুরায়াং তথা বজ্রং শূরসেনপতিং ততঃ ।
প্রাজাপত্যাং নিরূপ্যেষ্টিমগ্নীনপিবদীশ্বরঃ ॥ ৩৯ ॥

মথুরায়াম্—মথুরায়; **তথা**—ও; **বজ্রম্**—বজ্রকে; **শূরসেনপতিম্**—শূরসেন জাতির অধিপতি; **ততঃ**—তারপর; **প্রাজাপত্যাম্**—প্রাজাপত্য যজ্ঞ; **নিরূপ্য**—অনুষ্ঠান করে; **ইষ্টম্**—লক্ষ্য; **অগ্নীন্**—অগ্নি; **অপিবৎ**—নিজেতে আরোপ করেছিলেন; **ঈশ্বরঃ**—সক্ষম।

অনুবাদ

তারপর তিনি অনিরুদ্ধের পুত্র (শ্রীকৃষ্ণের পৌত্র) বজ্রকে শূরসেনদের অধিপতি-রূপে মথুরায় অভিষিক্ত করলেন। তারপর মহারাজ যুধিষ্ঠির প্রাজাপত্য যজ্ঞের অনুষ্ঠান করে গার্হস্থ্য জীবন পরিত্যাগ করে যাওয়ার উদ্দেশ্যে আপনাতে অগ্নি আরোপ করলেন।

তাৎপর্য

পরীক্ষিৎ মহারাজকে হস্তিনাপুরের রাজ্য সিংহাসনে অভিষিক্ত করে, এবং তার পর শ্রীকৃষ্ণের প্রপৌত্র বজ্রকে মথুরার রাজপদে অভিষিক্ত করে যুধিষ্ঠির মহারাজ বানপ্রস্থ আশ্রম অবলম্বন করেছিলেন। গুণ এবং কর্ম অনুসারে বিভক্ত চারটি আশ্রম এবং চারটি বর্ণসমন্বিত বর্ণাশ্রম ধর্ম অনুষ্ঠানের মাধ্যমে প্রকৃত মানব জীবন শুরু হয়। মানব সমাজের ধারক এবং বাহকরূপে মহারাজ যুধিষ্ঠির যথাসময়ে উপযুক্ত রাজকুমার পরীক্ষিতের হাতে রাজ্যভার অর্পণ করে গৃহত্যাগ করেছিলেন।

বর্ণাশ্রম ধর্মের এই বিজ্ঞানসম্মত প্রথা মানুষের জীবনকে চারটি আশ্রমে ভাগ করেছে এবং মানুষের বৃত্তিকে চারটি বর্ণে ভাগ করেছে। চারটি আশ্রম হচ্ছে ব্রহ্মচর্য, গার্হস্থ্য, বানপ্রস্থ এবং সন্ন্যাস। বর্ণ এবং বৃত্তি নির্বিশেষে সকলেরই এই চারটি আশ্রম অনুশীলন করা উচিত।

আধুনিক যুগের রাজনৈতিক নেতারা বৃদ্ধ এবং জরাগ্রস্ত হয়ে পড়া সত্ত্বেও তাদের সক্রিয় জীবন থেকে অবসর গ্রহণ করতে চায় না, কিন্তু আদর্শ রাজা যুধিষ্ঠির তাঁর পরবর্তী জীবনের জন্য নিজেকে প্রস্তুত করার উদ্দেশ্যে স্বেচ্ছায় রাজপদ থেকে অবসর গ্রহণ করেছিলেন।

সকলেরই কর্তব্য হচ্ছে তাদের জীবন এমনভাবে সাজিয়ে নেওয়া যাতে জীবনের শেষ পনের-কুড়ি বছর পরম পূর্ণতা লাভের জন্য সম্পূর্ণ রূপে ভগবানের সেবায় নিয়োজিত করা যায়। সারা জীবন জড় সুখভোগের জন্য সকাম কর্মে লিপ্ত থাকা নিতান্তই নির্বুদ্ধিতার পরিচায়ক, কারণ মন যদি জড় সুখভোগের জন্য সকাম কর্মে মগ্ন থাকে, তা হলে জড় বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়ার কোন সম্ভাবনাই থাকে না। জীবনের চরম সার্থকতা স্বরূপ ভগবদ্ধামে প্রত্যাবর্তনের পরম কর্তব্যে অবহেলা করে আত্মবিনাশকারী পন্থা অনুসরণ করা কারো উচিত নয়।

শ্লোক ৪০

বিসৃজ্য তত্র তৎ সর্বং দুকূলবলয়াদিকম্ ।
নির্মমো নিরহঙ্কারঃ সংছিন্নাশেষবন্ধনঃ ॥ ৪০ ॥

বিসৃজ্য—পরিত্যাগ করে; **তত্র**—সেই সব; **তৎ**—তা; **সর্বম্**—সব কিছু; **দুকূল**—কোমরবন্ধ; **বলয়াদিকম্**—কঙ্কণাদি; **নির্মমঃ**—মমতাশূন্য; **নিরহঙ্কারঃ**—অহঙ্কারশূন্য; **সংছিন্ন**—সম্পূর্ণরূপে ছিন্ন করে; **অশেষ বন্ধনঃ**—অন্তহীন বন্ধন।

অনুবাদ

মহারাজ যুধিষ্ঠির তৎক্ষণাৎ তাঁর বসন ও বলয়াদি রাজকীয় মর্যাদাব্যঞ্জক অলঙ্কারসমূহ পরিত্যাগ করে অহঙ্কার এবং মমতা বর্জন করলেন, এবং তাঁর সব কিছুর বন্ধন ছিন্ন করলেন।

তাৎপর্য

ভগবানের পার্ষদমণ্ডলীর মধ্যে অন্যতম হতে হলে জড় কলুষ থেকে মুক্ত হয়ে পবিত্র হওয়া প্রয়োজন। এইভাবে পবিত্র না হলে কখনই ভগবানের পার্ষদত্ব লাভ করা যায় না অথবা ভগবানের কাছে ফিরে যাওয়া যায় না। তাই, পারমার্থিক পবিত্রতা লাভ করার জন্য যুধিষ্ঠির মহারাজ তৎক্ষণাৎ তাঁর রাজবসন এবং অলঙ্কারাদি পরিত্যাগ করে তাঁর রাজৈশ্বর্য বর্জন করেছিলেন। কষায় বস্ত্র, বা সন্ন্যাসীর গৈরিক কৌপিন সব রকম চিত্তাকর্ষক জড়জাগতিক পোশাক-পরিচ্ছদ ত্যাগের প্রতীক, এবং তাই তিনি তাঁর বসন পরিবর্তন করেছিলেন। তিনি তাঁর রাজ্য এবং পরিবারের প্রতি উদাসীন হয়েছিলেন এবং তার ফলে সমস্ত জড় কলুষ থেকে অথবা জড় উপাধি থেকে মুক্ত হয়েছিলেন।

মানুষ সাধারণত নানা প্রকার পদমর্যাদার প্রতি আসক্ত—বংশ, সমাজ, দেশ, বৃত্তি, ঐশ্বর্য, প্রতিষ্ঠা এবং অন্য অনেক রকমের পদমর্যাদা। যতক্ষণ পর্যন্ত মানুষ এই সমস্ত পদমর্যাদার প্রতি আসক্ত হয়ে থাকে, ততক্ষণ তাকে জড়জাগতিক কলুষময় বলে বিবেচনা করা হয়ে থাকে। আধুনিক যুগে মানব সমাজের তথাকথিত নেতারা তাদের জাতীয় চেতনার প্রতি আসক্ত, কিন্তু তারা জানে না যে, এই ধরনের ভ্রান্ত চেতনা জড়জাগতিক বদ্ধ জীবের আর একটি পদমর্যাদা বোধ মাত্র। ভগবদ্-ধামে ফিরে যাওয়ার আগে তার জন্য যোগ্যতা অর্জন করতে হলে এই সমস্ত পদমর্যাদা বোধ মানুষকে পরিত্যাগ করতেই হবে।

জাতীয় চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে কেউ যখন মৃত্যু বরণ করে মূর্খ জনগণ তাদের গুণগান করে, কিন্তু এখানে আমরা মহারাজ যুধিষ্ঠিরের দৃষ্টান্ত দেখতে পাচ্ছি, যিনি রাজা হওয়া সত্ত্বেও এই ধরনের জাতীয় চেতনা অগ্রাহ্য করে এই পৃথিবী ত্যাগ করতে প্রস্তুত হয়েছিলেন। আর তাই আজও তাঁকে পরম পুরুষ ভগবান শ্রীরামচন্দ্রের প্রায় সমতুল্য বিবেচনা করে স্মরণ করা হয়ে থাকে, যেহেতু তিনি ছিলেন এমনই পুণ্যবান এক রাজা। আর, যেহেতু পৃথিবীর মানুষ এই রকম পুণ্যবান রাজাদের দ্বারা শাসিত হত, তাই তারা ছিল সর্বতোভাবে সুখী, এবং এই ধরনের মহান্ সম্রাটদের পক্ষেই পৃথিবী শাসন করা খুবই সম্ভব হত।

শ্লোক ৪১

বাচং জুহাব মনসি তৎপ্রাণ ইতরে চ তম্ ।
মৃত্যাবপানং সোৎসর্গং তং পঞ্চত্বে হ্যজোহবীৎ ॥ ৪১ ॥

বাচম্—বাগিন্দ্রিয়; **জুহাব**—পরিত্যাগ করে; **মনসি**—মনে; **তৎ প্রাণে**—মনকে প্রাণে; **ইতরে চ**—অন্যান্য ইন্দ্রিয়গুলিকেও; **তম্**—তাতে; **মৃত্যৌ**—মৃত্যুতে; **অপানম্**—অপান বায়ুতে; **স-উৎসর্গম্**—সম্যক্‌ভাবে উৎসর্গ করে; **তম্**—তাকে; **পঞ্চত্বে**—পঞ্চভূতাত্মক দেহে; **হি**—অবশ্যই; **অজোহবীৎ**—লীন করলেন।

অনুবাদ

তারপর তিনি বাক্-আদি ইন্দ্রিয়সমূহকে মনের মধ্যে, মনকে প্রাণে, প্রাণকে নিঃশ্বাসের অপানবায়ুতে, অপানবায়ুকে মৃত্যুতে, মৃত্যুকে পঞ্চভূতাত্মক দেহে লীন করলেন এবং জীবনের জড়জাগতিক ধারণা থেকে মুক্ত হলেন।

তাৎপর্য

মহারাজ যুধিষ্ঠির তাঁর ভ্রাতা অর্জুনের মতো মনকে একাগ্র করতে শুরু করলেন এবং ধীরে ধীরে সমস্ত জড় বন্ধন থেকে মুক্ত হলেন। প্রথমে তিনি সমস্ত ইন্দ্রিয়ের কার্যকলাপকে একাগ্র করে মনের মধ্যে লীন করলেন, অর্থাৎ তিনি তাঁর মনকে ভগবানের সেবা অভিমুখী করলেন। তিনি প্রার্থনা করলেন যে, সমস্ত জড় কার্যকলাপ যেহেতু সম্পাদিত হয় মনের দ্বারা জড় ইন্দ্রিয়ের কর্ম ও ফলের মাধ্যমে, এবং যেহেতু তিনি ভগবানের কাছে ফিরে যাচ্ছিলেন, তাই মন যেন সমস্ত জড় কার্যকলাপ থেকে নিবৃত্ত হয়ে ভগবানের অপ্রাকৃত সেবায় নিযুক্ত হয়। তখন আর কোন জড় কার্যকলাপের প্রয়োজন ছিল না।

প্রকৃতপক্ষে, মনের ক্রিয়াকলাপ বন্ধ করা যায় না, কারণ সেগুলি নিত্য শাশ্বত আত্মারই প্রতিফলন, কিন্তু কার্যকলাপের গুণবৈশিষ্ট্যগুলিকে জড় সত্তা থেকে ভগবানের অপ্রাকৃত সেবার সত্তায় পরিবর্তন করা যায়। প্রাণবায়ুর নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে যখন মনকে ধৌত করা হয়, তখন মনের জড় আবেশের পরিবর্তন হয় এবং তার ফলে জন্ম-মৃত্যুর আবর্ত চক্র থেকে তাকে উদ্ধার করে শুদ্ধ পারমার্থিক জীবনে অধিষ্ঠিত করা হয়।

অনিত্য জড় দেহ ধারণ করার ফলেই জীবের কাছে এই জড় জগৎ প্রকটিত হয়ে ওঠে, এবং এই জড় দেহটি তৈরি হয় মৃত্যুর সময় মনের অবস্থা অনুসারে, আর অপ্রাকৃত ভগবদ্ভক্তি অনুশীলনের মাধ্যমে মনকে যদি পবিত্র করা হয় এবং নিরন্তর ভগবানের শ্রীপাদপদ্মের সেবায় নিয়োজিত রাখা হয়, তা হলে আর মৃত্যুর পর মনের পক্ষে আর একটি জড় দেহ তৈরি করার কোনও সম্ভাবনা থাকে না। তা তখন জড় কলুষ মাঝে নিমজ্জিত হবার সম্ভাবনা থেকে মুক্ত হয়। বিশুদ্ধ আত্মা তখন তার প্রকৃত আলয় ভগবদ্ ধামে ফিরে যেতে সক্ষম হয়।

শ্লোক ৪২

ত্রিত্বে হুত্বা চ পঞ্চত্বং তচ্চৈকত্বেঽজুহোন্মুনিঃ ।
সর্বমাত্মন্যজুহবীদ্ ব্রহ্মণ্যাত্মানমব্যয়ে ॥ ৪২ ॥

ত্রিত্বে—তিন গুণে; **হুত্বা**—নিবেদন করে; **চ**—ও; **পঞ্চত্বম্**—পঞ্চমহাভূত; **তৎ**—তা; **চ**—ও; **একত্বে**—অবিদ্যায়; **অজুহোৎ**—লীন করেছিলেন; **মুনিঃ**—চিন্তাশীল; **সর্বম্**—সবকিছু; **আত্মনি**—আত্মায়; **অজুহবীৎ**—একাগ্র করেছিলেন; **ব্রহ্মণি**—ব্রহ্মে; **আত্মানম্**—আত্মাকে; **অব্যয়ে**—অব্যয় সত্তায়।

অনুবাদ

তারপর সেই মুনি যুধিষ্ঠির পঞ্চভূতের ঐক্যস্বরূপ জড় দেহকে জড়া প্রকৃতির তিন গুণে লীন করে, সেই গুণত্রয়কে একত্বে বা অবিদ্যায় লীন করলেন এবং তারপর অবিদ্যাকে আত্মায় এবং আত্মাকে অব্যয় ব্রহ্মে লীন করলেন।

তাৎপর্য

জড় জগতে যা কিছু তা সবই মহত্তত্ত্ব-অব্যক্ত থেকে প্রকাশিত, এবং আমাদের জড় দৃষ্টিতে যা কিছু গোচরীভূত হয়, তা সবই জড়া প্রকৃতির বৈচিত্র্যের বিভিন্ন

সমন্বয় ছাড়া আর কিছুই নয়। জীব কিন্তু সমস্ত জড় পদার্থ থেকে ভিন্ন। ভগবানের নিত্য দাসরূপে তার নিত্য স্বরূপ বিস্মৃত হওয়ার ফলেই জীব এইভাবে জড় জগতের বন্ধনে আবদ্ধ হয়, এবং জড়া প্রকৃতির প্রভু ও ভোক্তারূপে ভ্রান্ত ধারণার বশবর্তী হয় এবং তার ফলে সে ইন্দ্রিয়তৃপ্তির ভ্রান্ত প্রচেষ্টায় লিপ্ত হয়।

জড়া প্রকৃতির প্রভাবে মন এইভাবে প্রভাবিত হয়ে পড়ার ফলে জীব প্রকৃতির বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে পড়ে। তার ফলে পঞ্চভূতাত্মক স্থূল দেহ সৃষ্টি হয়। সেই প্রক্রিয়াকে মহারাজ যুধিষ্ঠির বিপরীতমুখী করেছিলেন। তিনি দেহের পাঁচটি উপাদানকে প্রকৃতির তিনটি গুণে লীন করেছিলেন।

জড়া প্রকৃতির গুণত্রয়ের প্রভাবে প্রকাশিত দেহের ভাল, খারাপ এবং মাঝারি— এই তিনটি বৈশিষ্ট্য নির্ধারিত হয়। তারপর প্রকৃতির গুণগুলি শুদ্ধ জীবের ভ্রান্ত পরিচিতি উদ্ভূত জড়া প্রকৃতির অবিদ্যায় লীন হয়।

কেউ যখন চিৎ জগতের অসংখ্য গ্রহলোকে, বিশেষ করে গোলোক বৃন্দাবনে, ভগবানের পার্ষদত্ব লাভ করতে চান, তখন তাঁকে পূর্ণরূপে হৃদয়ঙ্গম করতে হয় যে, তিনি এই জড়া প্রকৃতি থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন; এখানে তাঁর করণীয় কিছুই নেই, এবং তাঁকে শুদ্ধ আত্মা রূপে তাঁর স্বরূপ উপলব্ধি করতে হয়। আত্মার এই শুদ্ধ অবস্থাকে বলা হয় ব্রহ্ম, যা পরম ব্রহ্ম বা পরমেশ্বর ভগবানের সঙ্গে গুণগতভাবে এক।

পরীক্ষিৎ মহারাজ এবং বজ্রকে তাঁর রাজ্য দান করার পর যুধিষ্ঠির মহারাজ আর নিজেকে সারা পৃথিবীর অধীশ্বর বা কুরুবংশের প্রধান বলে মনে করেননি।

এইভাবে সব রকম জড় সম্পর্ক থেকে মুক্ত হওয়া, আর জড়া প্রকৃতির স্থূল এবং সূক্ষ্ম বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়ার ফলে এই জগতে অবস্থান কালেও ভগবানের দাসত্ব বরণ করা যায়। এই অবস্থাকে বলা হয় জীবন্মুক্ত অবস্থা। জড় জগতে অবস্থান কালেও এই জীবন্মুক্ত অবস্থা লাভ করা যায়। এইটিই হচ্ছে জড় অস্তিত্বের সমাপ্তি সাধনের পন্থা।

নিজেকে কেবল ব্রহ্ম বলেই অনুমান করা উচিত নয়, ব্রহ্মভূত স্তরে অবস্থানের উপযোগী আচরণ করাও কর্তব্য। যে নিজেকে কেবল ব্রহ্ম বলে মনে করে, সে নির্বিশেষবাদী, এবং যিনি ব্রহ্মভূত স্তরের উপযোগী আচরণ করেন, তিনি শুদ্ধ ভক্ত।

শ্লোক ৪৩

চীরবাসা নিরাহারো বদ্ধবাঙ্‌মুক্তমূর্ধজঃ।
দর্শয়ন্নাত্মনো রূপং জড়োন্মত্তপিশাচবৎ।
অনবেক্ষমাণো নিরগাদশৃণ্বন্ বধিরো যথা ॥ ৪৩ ॥

চীরবাসাঃ—ছিন্নবস্ত্র ধারণ করে; **নিরাহারঃ**—আহার পরিত্যাগ করে; **বদ্ধবাক্**—কথা বলা বন্ধ করে; **মুক্তমূর্ধজঃ**—বিক্ষিপ্ত কেশ; **দর্শয়ন্**—দেখাতে লাগলেন; **আত্মনঃ**—তাঁর নিজের; **রূপম্**—দেহের আকৃতি; **জড়**—জড়; **উন্মত্ত**—উন্মত্ত; **পিশাচবৎ**—পিশাচের মতো; **অনবেক্ষমানঃ**—কারও অপেক্ষা না করে; **নিরগাৎ**—নির্গত হয়েছিলেন; **অশৃণ্বন্**—না শুনে; **বধিরঃ**—বধিরের মতো; **যথা**—যেমন।

অনুবাদ

তারপর যুধিষ্ঠির মহারাজ ছিন্নবস্ত্র পরিধান করে, সব রকম আহার বর্জন করে, মৌনী ভাব অবলম্বন করে, আলুলায়িত কেশ হয়ে নিজেকে জড়, উন্মাদ ও পিশাচের মতো ভাব দেখিয়ে অনুজাদি কারও অপেক্ষা না করে এবং বধিরের মতো কারও কোনও কথায় কর্ণপাত না করেই গৃহ থেকে বহির্গত হলেন।

তাৎপর্য

সমস্ত জড় বিষয় থেকে মুক্ত হওয়ার ফলে যুধিষ্ঠির মহারাজের আর রাজকীয় জীবন এবং পারিবারিক সম্ভ্রমের সঙ্গে কোন যোগ ছিল না এবং জড়, উন্মাদ এবং পিশাচের মতো ভাব দেখিয়ে তিনি মৌনী ভাব অবলম্বন করেছিলেন। তাঁর ভাইয়েরা যাঁরা চিরকাল তাঁর সহায়তা করেছিলেন, তিনি তাঁদেরও অপেক্ষা করলেন না। সব কিছু থেকে সর্বতোভাবে মুক্ত হওয়াকে বলা হয় বিশুদ্ধ নির্ভীক অবস্থা।

শ্লোক ৪৪

উদীচীং প্রবিবেশাশাং গতপূর্বাং মহাত্মভিঃ।
হৃদি ব্রহ্ম পরং ধ্যায়ন্নাবর্তেত যতো গতঃ ॥ ৪৪ ॥

উদীচীম্—উত্তর দিকে; **প্রবিবেশাশাম্**—যারা সেখানে প্রবেশ করতে চায়; **গতপূর্বাম্**—পূর্বপুরুষেরা যেদিকে গমন করেছিলেন; **মহাত্মভিঃ**—মহাত্মাদের দ্বারাও; **হৃদি**—হৃদয়ে; **ব্রহ্ম**—পরমেশ্বর ভগবান; **পরম্**—ভগবান; **ধ্যায়ন্**—নিরন্তর তাঁর চিন্তায় মগ্ন হয়ে; **ন আবর্তেত**—ফিরে আসতে হয় না; **যতঃ**—যেখানে; **গতঃ**—গেলে।

অনুবাদ

একাগ্রচিত্তে পরব্রহ্মের ধ্যান করতে করতে, যেদিকে গমন করলে আর ফিরতে হয় না, মহাত্মারা যে পথে গমন করেছিলেন, যুধিষ্ঠির মহারাজ সেই উত্তর দিকেই গমন করলেন।

তাৎপর্য

এই শ্লোক থেকে বোঝা যায় যে, মহারাজ যুধিষ্ঠির তাঁর পূর্ববর্তী মহাত্মাদেরই পদাঙ্ক অনুসরণ করেছিলেন। পূর্বে বহুবার আমরা বর্ণাশ্রম ধর্ম সম্বন্ধে আলোচনা করেছি যা বিশেষ করে আর্যাবর্তের অধিবাসীরা অনুশীলন করতেন। এই বর্ণাশ্রম ধর্মে জীবনের বিশেষ স্তরে গৃহের সমস্ত বন্ধন ছিন্ন করবার গুরুত্ব বিশেষভাবে নির্ধারিত হয়েছে। সেই শিক্ষা এমন ভাবে দেওয়া হত যে, মহারাজ যুধিষ্ঠিরের মতো অতি সম্ভ্রান্ত এবং অতি শ্রদ্ধেয় ব্যক্তিও আত্মতত্ত্ব উপলব্ধি করে ভগবানের কাছে ফিরে যাওয়ার জন্য সমস্ত পারিবারিক বন্ধন ছিন্ন করে গৃহত্যাগ করতেন।

কোনও রাজা অথবা সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিও জীবনের অন্তিম সময় পর্যন্ত গৃহে থাকতেন না, কারণ তাকে মানব জীবনের প্রকৃত উদ্দেশ্য সাধনের পথে প্রতিবন্ধক স্বরূপ আত্মহত্যা বলে মনে করা হত। সব রকম পারিবারিক বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য এবং সর্বতোভাবে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সেবায় যুক্ত হওয়ার জন্য, সর্বদাই এই পন্থা অনুসরণ করতে সকলকে উপদেশ দেওয়া হয়েছে, কারণ এইটিই প্রামাণ্য পন্থা।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় (১৮/৬২) ভগবান নির্দেশ দিয়েছেন যে, জীবনের অন্তিম সময়ে ভগবানের ভক্ত হওয়া অবশ্য কর্তব্য। মহারাজ যুধিষ্ঠিরের মতো সাধু ব্যক্তিরা তাঁদের চরম মঙ্গল সাধনের জন্য পরমেশ্বর ভগবানের উপদেশ অনুসরণ করেন।

এই শ্লোকে *ব্রহ্ম পরম* শব্দে শ্রীকৃষ্ণকে ইঙ্গিত করা হয়েছে। *শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায়* (১০/১৩) অর্জুনও অসিত, দেবল, নারদ এবং ব্যাস প্রমুখ মহাজনদের উক্তির পুনরাবৃত্তি করে শ্রীকৃষ্ণকে পরম ব্রহ্ম বলে অভিহিত করেছেন। এইভাবে গৃহত্যাগ করে উত্তরাভিমুখে যাবার সময় মহারাজ যুধিষ্ঠির তাঁর পূর্বপুরুষদের এবং সর্ব কালের মহান্ ভক্তদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে নিরন্তর শ্রীকৃষ্ণের কথা স্মরণ করছিলেন।

শ্লোক ৪৫

সর্বে তমনুনির্জগ্মুর্ভ্রাতরঃ কৃতনিশ্চয়াঃ ।
কলিনাধর্মমিত্রেণ দৃষ্টা স্পৃষ্টাঃ প্রজা ভুবি ॥ ৪৫ ॥

সর্বে—তাঁর সমস্ত কনিষ্ঠ ভ্রাতারা; তম্—তাঁকে ; অনুনির্জগ্মুঃ—তাঁদের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে অনুসরণ করে গৃহত্যাগ করলেন; ভ্রাতরঃ—ভাইয়েরা; কৃতনিশ্চয়াঃ—দৃঢ় সংকল্প হয়ে; কলিনা—কলির দ্বারা; অধর্ম—অধর্ম; মিত্রেণ —বন্ধুর দ্বারা; দৃষ্টা—দর্শন করে; স্পৃষ্টাঃ—আক্রান্ত হয়ে; প্রজাঃ—প্রজাদের; ভুবি—পৃথিবীতে।

অনুবাদ

অধর্মের বন্ধু কলির প্রভাবে সারা পৃথিবীর প্রজাদের অধর্ম-আচরণের প্রবৃত্তি দ্বারা আক্রান্ত দেখে যুধিষ্ঠিরের কনিষ্ঠ ভ্রাতারাও অবিচলিত চিত্তে তাঁর অনুগমন করলেন।

তাৎপর্য

যুধিষ্ঠির মহারাজের অনুজেরাও ছিলেন সেই মহান্ নৃপতির অত্যন্ত অনুগত, এবং তাঁরাও জীবনের পরম উদ্দেশ্য সম্বন্ধে যথাযথভাবে অবগত ছিলেন। তাই তাঁরা তাঁদের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার পদাঙ্ক অনুসরণ করে পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সেবা করতে কৃতসঙ্কল্প হয়েছিলেন।

সনাতন ধর্মের বৃত্তান্ত অনুসারে জীবনের অর্ধভাগ অতিবাহিত হলে আত্মজ্ঞান লাভের চেষ্টায় নিযুক্ত হওয়ার জন্য গৃহত্যাগ করা অবশ্য কর্তব্য। কিন্তু তা সত্ত্বেও মানুষ স্থির করতে পারে না কিভাবে সে নিজেকে মুক্ত করবে। কখনও কখনও অবসরপ্রাপ্ত মানুষেরা বিভ্রান্ত হয়ে স্থির করতে পারে না কিভাবে তারা তাদের জীবনের শেষ দিনগুলি অতিবাহিত করবে।

এখানে পাণ্ডবদের মতো মহাজনেরা পথ প্রদর্শন করে গেছেন। তাঁরা সকলেই পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সেবায় নিজেদের যুক্ত করে সেই পথ প্রদর্শন করে গেছেন। শ্রীধর স্বামীর মতে ধর্ম, অর্থ, কাম এবং মোক্ষ জীবনের চরম উদ্দেশ্য নয়। এই সমস্ত পন্থা তারাই অনুসরণ করে, যারা জীবনের চরম উদ্দেশ্য সম্বন্ধে যথাযথভাবে অবগত নয়. জীবনের চরম উদ্দেশ্য সম্বন্ধে ভগবান স্বয়ং শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় (১৮/৬৪) নির্দেশ দিয়ে গেছেন, এবং পাণ্ডবেরা যথেষ্ট বুদ্ধিমান ছিলেন বলে তাঁরা সেই নির্দেশ নির্দ্বিধায় পালন করেছিলেন।

শ্লোক ৪৬

তে সাধুকৃতসর্বার্থা জ্ঞাত্বাত্যন্তিকমাত্মনঃ ।
মনসা ধারয়ামাসুর্বৈকুণ্ঠচরণাম্বুজম্ ॥ ৪৬ ॥

তে—তাঁরা সকলে; **সাধুকৃত**—সাধুর উপযোগী সমস্ত আচরণ সম্পাদন করে; **সর্বার্থাঃ**—সমস্ত অর্থসমন্বিত; **জ্ঞাত্বা**—ভালভাবে জেনে; **আত্যন্তিকম্**—চরম কল্যাণপ্রদ; **আত্মনঃ**—জীবের; **মনসা**—মনে; **ধারয়ামাসু**—ধারণ করেছিলেন; **বৈকুণ্ঠ**—বৈকুণ্ঠপতি ভগবান শ্রীকৃষ্ণের; **চরণাম্বুজম্**—শ্রীপাদপদ্ম।

অনুবাদ

যদিও পাণ্ডবেরা সকলে ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ রূপ চতুর্বর্গকে সম্যক্ রূপে আয়ত্ত করেছিলেন, তথাপি তাঁরা ভগবান শ্রীকৃষ্ণের চরণকমলকেই জীবের পরম পুরুষার্থ জেনে, মনে মনে তাঁরই ধ্যান ধারণা করতে লাগলেন।

তাৎপর্য

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় (৭/২৮) ভগবান বলেছেন যে, যাঁরা পূর্ব জন্মে বহু পুণ্য করেছেন এবং পাপকর্মের ফল থেকে মুক্ত হয়েছেন, তাঁরাই কেবল পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের শ্রীপাদপদ্মের ধ্যান করতে পারেন। পাণ্ডবেরা, কেবল এই জন্মেই নয়, পূর্বে জন্ম-জন্মান্তরে পরম পুণ্য ফলপ্রদ আচরণ করেছিলেন এবং তার ফলে তাঁরা সব রকম পাপ থেকে সর্বতোভাবে মুক্ত ছিলেন। তাই তাঁরা পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের শ্রীপাদপদ্মের ধ্যানে তাঁদের চিত্ত একাগ্রীভূত করতে সক্ষম হয়েছিলেন।

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুরের মতে, ধর্ম, অর্থ, কাম এবং মোক্ষ লাভের পন্থা তাঁরাই গ্রহণ করেন, যাঁরা পাপকর্মের ফল থেকে মুক্ত হতে পারেননি। এই চতুর্বর্গের প্রভাবের দ্বারা কলুষিত এই সমস্ত মানুষেরা বৈকুণ্ঠপতি পরমেশ্বর ভগবানের শ্রীপাদপদ্মের আশ্রয় অবলম্বন করতে পারে না। বৈকুণ্ঠলোক এই জড় জগতের অনেক অনেক উর্ধ্বে অবস্থিত। জড় জগৎ ভগবানের মায়াশক্তি দুর্গাদেবীর দ্বারা পরিচালিত হয়, কিন্তু বৈকুণ্ঠলোক পরিচালিত হয় ভগবানের অন্তরঙ্গা শক্তির দ্বারা।

শ্লোক ৪৭-৪৮

তদ্ধ্যানোদ্রিক্তয়া ভক্ত্যা বিশুদ্ধধিষণাঃ পরে ।
তস্মিন্ নারায়ণপদে একান্তমতয়ো গতিম্ ॥ ৪৭ ॥
অবাপুর্দুরবাপাং তে অসদ্ভির্বিষয়াত্মভিঃ ।
বিধূতকল্মষা স্থানং বিরজেনাত্মনৈব হি ॥ ৪৮ ॥

তৎ—সেই; **ধ্যান**—ধ্যান; **উদ্রিক্তয়া**—মুক্ত হয়ে; **ভক্ত্যা**—ভক্তিভাবের দ্বারা; **বিশুদ্ধ**—নির্মল; **ধিষণাঃ**—বুদ্ধির দ্বারা; **পরে**—পরমে; **তস্মিন্**—তাতে; **নারায়ণঃ**—পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ; **পদে**—শ্রীপাদপদ্মে; **একান্তমতয়ঃ**—পরমেশ্বর ভগবানে একাগ্র চিত্ত; **গতিম্**—গতি; **অবাপুঃ**—লাভ করেছিলেন; **দুরবাপাম্**—অত্যন্ত দুর্লভ; **তে**—তাঁরা; **অসদ্ভিঃ**—জড়বাদীদের দ্বারা; **বিষয়াত্মভিঃ**—জড় বিষয়ে অভিনিবিষ্ট চিত্ত; **বিধূত**—বিধৌত; **কল্মষাঃ**—জড় কলুষ; **স্থানম্**—স্থান; **বিরজেন**—রজোগুণের প্রভাব থেকে মুক্ত; **আত্মনা এব**—সশরীরে; **হি**—অবশ্যই।

অনুবাদ

নিরন্তর ভগবানের কথা স্মরণ করার ফলে তাঁদের চেতনা নির্মল হওয়ায় চিদাকাশে তাঁরা পরম নারায়ণ, পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের শাসনাধীন চিন্ময় ধাম লাভ করেছিলেন। সেই ধাম তাঁরাই প্রাপ্ত হন, যাঁরা ঐকান্তিকভাবে ভগবানের ধ্যান করেন। গোলোক বৃন্দাবন নামক ভগবানের সেই ধাম জড় বিষয়াসক্ত মানুষেরা কখনই লাভ করতে পারে না। কিন্তু পাণ্ডবদের সমস্ত জড় কলুষ সম্পূর্ণভাবে বিধৌত হয়েছিল বলে তাঁরা সশরীরে সেই ধাম প্রাপ্ত হয়েছিলেন।

তাৎপর্য

শ্রীল জীব গোস্বামীর মতে, যে মানুষ প্রকৃতির সত্ত্ব, রজো এবং তমো গুণের প্রভাব থেকে মুক্ত হয়ে চিন্ময় স্তরে অধিষ্ঠিত হয়েছেন, তিনি তাঁর দেহ পরিবর্তন না করেই জীবনের পরম গতি লাভ করতে পারেন। শ্রীল সনাতন গোস্বামী *হরিভক্তিবিলাসে* বলেছেন, যে কোন মানুষ সদ্‌গুরুর তত্ত্বাবধানে পারমার্থিক শিক্ষা অনুশীলন করার ফলে দ্বিজ ব্রাহ্মণত্বের চরম পূর্ণতা লাভ করতে পারেন, ঠিক যেমন কোন রসায়নবিদ্ বিশেষ রাসায়নিক কৌশলে কাঁসাকে সোনায় পরিবর্তন করতে পারে। তাই ব্রাহ্মণত্ব লাভের ব্যাপারে সদ্‌গুরুর শিক্ষা এবং নির্দেশই সব চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ, দেহের পরিবর্তন না করেই ব্রাহ্মণ হওয়া যায়, তেমনই যথাযথ পন্থা অনুসরণ করার মাধ্যমে দেহের পরিবর্তন না করেই ভগবানের কাছে ফিরে যাওয়া যায়।

শ্রীল জীব গোস্বামী তাঁর টীকায় মন্তব্য করেছেন যে, এখানে 'হি' শব্দটির ব্যবহার দৃঢ় নিশ্চিতভাবে এই সত্যকে প্রতিপন্ন করেছে, এবং সেই সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নেই।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাতেও (১৪/২৬) শ্রীল জীব গোস্বামীর এই উক্তিকে সমর্থন করা হয়েছে, যেখানে ভগবান বলেছেন যে, যিনি অব্যভিচারী ভক্তির দ্বারা আমার

সেবা করেন, তিনি জড়া প্রকৃতির তিনটি গুণের কলুষ থেকে মুক্ত হয়ে ব্রহ্মভূত অবস্থা প্রাপ্ত হন, এবং যখন অনন্য ভক্তি সহকারে ভগবানের সেবা করা হয়, তখন সেই ব্রহ্মের পূর্ণতার স্তরও অতিক্রম করা হয়। দেহের পরিবর্তন না করেই যে ভগবানের পরম ধাম গোলোক বৃন্দাবনে ফিরে যাওয়া যায়, সেই সম্বন্ধে কোন সংশয় নেই, যে কথা পূর্বেই ভগবানের শরীরের পরিবর্তন না করেই তাঁর ধামে ফিরে যাওয়া সম্বন্ধে আলোচনা করা হয়েছে।

শ্লোক ৪৯

বিদুরোঽপি পরিত্যজ্য প্রভাসে দেহমাত্মনঃ ।
কৃষ্ণাবেশেন তচ্চিত্তঃ পিতৃভিঃ স্বক্ষয়ং যযৌ ॥ ৪৯ ॥

বিদুরঃ—বিদুর (মহারাজ যুধিষ্ঠিরের পিতৃব্য); **অপি**—ও; **পরিত্যজ্য**—দেহত্যাগ করে; **প্রভাসে**—প্রভাস তীর্থে; **দেহমাত্মনঃ**—তাঁর দেহ; **কৃষ্ণ**—পরমেশ্বর ভগবান; **আবেশেন**—সেই চিন্তায় আবিষ্ট হয়ে; **তৎ**—তাঁর; **চিত্তঃ**—চিন্তা এবং কার্য; **পিতৃভিঃ**—পিতৃদের সঙ্গে; **স্বক্ষয়ম্**—তাঁর স্বীয় ধামে; **যযৌ**—গমন করেছিলেন।

অনুবাদ

বিদুরও শ্রীকৃষ্ণের চিন্তায় আবিষ্ট হয়ে প্রভাস তীর্থে দেহ পরিত্যাগ করে পিতৃগণসহ স্বস্থানে গমন করলেন।

তাৎপর্য

পাণ্ডব এবং বিদুরের মধ্যে পার্থক্য হচ্ছে যে, পাণ্ডবেরা ভগবানের নিত্য পার্ষদ, আর বিদুর পিতৃলোকের অধ্যক্ষ যমরাজ। মানুষ যমরাজকে ভয় পায়, কারণ একমাত্র তিনিই জড় জগতের দুষ্কৃতকারীদের দণ্ডদান করেন, কিন্তু যাঁরা ভগবদ্ভক্ত তাঁদের পক্ষে তাঁকে ভয় পাওয়ার কোন কারণ নেই। তিনি ভক্তদের সহৃদয় বন্ধু, কিন্তু অভক্তদের কাছে তিনি মূর্তিমান ভয়।

পূর্বে আমরা আলোচনা করেছি যে, যমরাজ মণ্ডূক মুনি কর্তৃক অভিশপ্ত হয়েছিলেন যে, তিনি শূদ্রকুলে জন্মগ্রহণ করবেন, এবং তাই বিদুর ছিলেন যমরাজের অবতার। ভগবানের নিত্য সেবকরূপে তিনি অত্যন্ত নিষ্ঠাভরে তাঁর প্রতি ভক্তি প্রদর্শন করেছিলেন এবং পবিত্র ভাবে জীবন যাপন করেছিলেন। তাঁর নির্দেশে ধৃতরাষ্ট্রের মতো অত্যন্ত জড়াসক্ত মানুষও মুক্তি লাভ করেছিলেন। তাঁর ভগবদ্ভক্তির

প্রভাবে তিনি সর্বদাই ভগবানের শ্রীপাদপদ্ম স্মরণ করতে সক্ষম ছিলেন, এবং তার ফলে শূদ্রযোনিতে জন্মগ্রহণ করার সমস্ত কলুষ বিধৌত হয়েছিল। তাঁর দেহান্তে পিতৃলোকের অধিবাসীরা পুনরায় তাঁকে নিয়ে গিয়েছিলেন এবং তাঁকে স্বপদে অধিষ্ঠিত করেছিলেন।

দেবতারাও ভগবানের পার্ষদ, তবে তাঁর ব্যক্তিগত সংস্পর্শ লাভ করতে তাঁরা পারেন না, কিন্তু ভগবানের নিত্য পার্ষদেরা নিরন্তর তাঁর সঙ্গ লাভ করেন। ভগবান এবং তাঁর নিত্য পার্ষদেরা অবিরতভাবে বিভিন্ন ব্রহ্মাণ্ডে অবতরণ করে তাঁদের লীলা বিলাস করেন। ভগবান সেই সমস্ত লীলা স্মরণ রাখেন, কিন্তু তাঁর পার্ষদেরা তাঁর অণুসদৃশ অবিচ্ছেদ্য বিভিন্ন অংশ হওয়ার ফলে তা ভুলে যান। সে-কথা *শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় (৪/৫)* বর্ণিত হয়েছে।

শ্লোক ৫০

দ্রৌপদী চ তদাজ্ঞায় পতীনামনপেক্ষতাম্ ।
বাসুদেবে ভগবতি হ্যেকান্তমতিরাপ তম্ ॥ ৫০ ॥

দ্রৌপদী—দ্রৌপদী (পাণ্ডবদের পত্নী); **চ**—এবং; **তদা**—তখন; **আজ্ঞায়**—শ্রীকৃষ্ণকে পূর্ণরূপে জেনে; **পতীনাম্**—পতীদের; **অনপেক্ষতাম্**—তাঁর অপেক্ষা না করে; **বাসুদেবে**—বাসুদেব শ্রীকৃষ্ণে; **ভগবতি**—পরমেশ্বর ভগবান; **হি**—যথার্থভাবে; **এক-অন্ত**—সম্পূর্ণভাবে; **মতিঃ**—একাগ্রচিত্ত; **আপ**—লাভ করেছিলেন; **তম্**—তাঁকে (পরমেশ্বর ভগবানকে)।

অনুবাদ

দ্রৌপদীও দেখলেন যে, তাঁর পতিদের মধ্যে কেউই তাঁর অপেক্ষা না করে একে একে সকলেই চলে গেলেন। তিনি পরমেশ্বর ভগবান বাসুদেবকে উত্তমরূপেই জানতেন। তিনি এবং সুভদ্রা উভয়েই শ্রীকৃষ্ণে একান্তভাবে চিত্ত সমর্পণ করে তাঁর পতিদেরই অনুরূপ সুফল অর্জন করলেন।

তাৎপর্য

আকাশে বিমান চালানোর সময় অন্য বিমানের চালনায় সাহায্য করা যায় না। প্রত্যেককেই তার নিজের নিজের বিমান চালাতে হয়, এবং কারও কোনও বিপদ

হলে অন্য কোনও বিমান এসে তাকে সাহায্য করতে পারে না। তেমনই জীবনের অন্তিম সময়ে, যখন ভগবানের কাছে ফিরে যাওয়ার সুযোগ লাভ হয়, তখন সকলকেই অন্যের সাহায্য ব্যতীতই সেই পথে এগিয়ে চলতে হয়। আকাশে উড়বার আগে, মাটিতে থাকার সময়, সাহায্য পাওয়া যায়।

তেমনই, শ্রীগুরু, পিতা, মাতা, আত্মীয়-স্বজন, পতি এবং অন্য সকলে জীবদ্দশায় নানাভাবে সাহায্য করতে পারেন, কিন্তু ভব সমুদ্র পার হওয়ার সময় পূর্বলব্ধ সমস্ত উপদেশ স্মরণ করে এবং সেগুলির সদ্‌ব্যবহার করে এবং একাকী গন্তব্য স্থলে এগিয়ে যেতে হয়।

দ্রৌপদীর পাঁচজন পতি ছিলেন, কিন্তু তাঁদের কেউই দ্রৌপদীকে তাঁদের সঙ্গে যেতে আহ্বান করেননি; তাঁর মহান্ পতিদের অপেক্ষা না করেই দ্রৌপদীকে আত্মনির্ভরশীল হতে হয়েছিল। যেহেতু তিনি পূর্বেই যথার্থ শিক্ষা লাভ করেছিলেন, তাই তিনি তৎক্ষণাৎ পরমেশ্বর ভগবান বাসুদেব শ্রীকৃষ্ণের শ্রীপাদপদ্মে তাঁর চিত্ত নিবিষ্ট করেছিলেন। পত্নীরাও তাঁদের স্বামীদের মতো একই গতি প্রাপ্ত হয়েছিলেন; অর্থাৎ, তাঁদের দেহের পরিবর্তন না করেই তাঁরা ভগবদ্-ধামে ফিরে গিয়েছিলেন।

শ্রীল বিশ্বনাথ ঠাকুর মন্তব্য করেছিলেন যে, সুভদ্রার নাম যদিও এই শ্লোকে উল্লেখ করা হয়নি, তিনিও দ্রৌপদীরই গতি প্রাপ্ত হয়েছিলেন। তাঁদের দুজনকেই দেহত্যাগ করতে হয়নি।

শ্লোক ৫১

যঃ শ্রদ্ধয়ৈতদ্ ভগবৎপ্রিয়াণাং
পাণ্ডোঃ সুতানামিতি সম্প্রয়াণম্ ।
শৃণোত্যলং স্বস্ত্যয়নং পবিত্রং
লব্ধ্বা হরৌ ভক্তিমুপৈতি সিদ্ধিম্ ॥ ৫১ ॥

যঃ—যিনি; **শ্রদ্ধয়া**—শ্রদ্ধা সহকারে; **এতৎ**—এই; **ভগবৎপ্রিয়াণাম্**—যাঁরা ভগবানের অত্যন্ত প্রিয় তাঁদের; **পাণ্ডোঃ সুতানাম্**—পাণ্ডুপুত্রদের; **ইতি**—এইভাবে; **সম্প্রয়াণম্**—মহাপ্রস্থান; **শৃণোতি**—শ্রবণ করেন; **অলম্**—কেবল; **স্বস্ত্যয়নম্**—সৌভাগ্য; **পবিত্রম্**—পবিত্র; **লব্ধ্বা**—লাভ করে; **হরৌ**—পরমেশ্বর ভগবানে; **ভক্তিম্**—ভক্তি; **উপৈতি**—লাভ করেন; **সিদ্ধিম্**—পরম গতি।

অনুবাদ

ভগবানের প্রিয় পাত্র পাণ্ডবদের এই পরম পবিত্র পরম মঙ্গলময় মহাপ্রস্থান কাহিনী যিনি শ্রদ্ধা সহকারে শ্রবণ করেন, তিনি অবশ্যই ভগবদ্ভক্তি লাভ করে পরম গতি প্রাপ্ত হন।

তাৎপর্য

শ্রীমদ্ভাগবত পরমেশ্বর ভগবান এবং পাণ্ডব প্রমুখ তাঁর ভক্তদের কার্যকলাপের বর্ণনা। পরমেশ্বর ভগবান এবং তাঁর ভক্তদের মহিমার বর্ণনা অপ্রাকৃত, এবং শ্রদ্ধা সহকারে তা শ্রবণ করলে ভগবান এবং তাঁর নিত্য পার্ষদদের সঙ্গলাভ করা যায়। *শ্রীমদ্ভাগবত* শ্রবণ করার মাধ্যমে জীবনের পরম গতি লাভ করা যায়, অর্থাৎ ভগবদ্ ধামে ফিরে যাওয়া যায়।

ইতি "যথাসময়ে পাণ্ডবদের অবসর গ্রহণ" শীর্ষক শ্রীমদ্ভাগবতের প্রথম স্কন্ধের পঞ্চদশ পরিচ্ছেদের শ্রীল ভক্তিবেদান্ত তাৎপর্য সমাপ্ত।

ষোড়শ অধ্যায়

কিভাবে পরীক্ষিৎ কলিযুগের সম্মুখীন হন

শ্লোক ১

সূত উবাচ
ততঃ পরীক্ষিদ্ দ্বিজবর্যশিক্ষয়া
মহীং মহাভাগবতঃ শশাস হ ।
যথা হি সূত্যামভিজাতকোবিদাঃ
সমাদিশন্ বিপ্র মহদ্গুণস্তথা ॥ ১ ॥

সূতঃ উবাচ—সূত গোস্বামী বললেন; ততঃ—তারপর; পরীক্ষিৎ—মহারাজ পরীক্ষিৎ; দ্বিজ বর্য—দ্বিজশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণেরা; শিক্ষয়া—তাঁদের শিক্ষার দ্বারা; মহীম্—পৃথিবীকে; মহাভাগবতঃ—মহান্ ভগবদ্ভক্ত; শশাস—শাসন করেছিলেন; হ—অতীতে; যথা—তাঁরা যেভাবে বলেছিলেন; হি—অবশ্যই; সূত্যাম্—তাঁর জন্মের সময়; অভিজাত-কোবিদাঃ—জাতকর্ম অনুষ্ঠানে যাঁরা অত্যন্ত পারদর্শী জ্যোতিষী; সমাদিশন্—তাঁদের মতামত প্রদান করেছিলেন; বিপ্র—হে ব্রাহ্মণগণ; মহদ্গুণঃ—মহান্ গুণাবলী; তথা—সেই অনুসারে।

অনুবাদ

সূত গোস্বামী বললেন—হে পণ্ডিত ব্রাহ্মণগণ, ভাগ্য গণনায় পারদর্শী পণ্ডিতেরা মহারাজ পরীক্ষিতের জন্মের সময় তাঁর যে সমস্ত মহদ্ গুণাবলীর কথা বলেছিলেন, কালক্রমে তিনি সেই সমস্ত শ্রেষ্ঠ গুণাবলীতে বিভূষিত হয়ে একজন পরম ভাগবতরূপে এবং শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণদের উপদেশ অনুসারে পৃথিবী শাসন করতে লাগলেন।

তাৎপর্য

মহারাজ পরীক্ষিতের জন্মের সময়, জ্যোতির্বিদ্যায় পারদর্শী ব্রাহ্মণেরা তাঁর কিছু গুণাবলী সম্বন্ধে ভবিষ্যৎ-বাণী করেছিলেন। মহারাজ পরীক্ষিৎ কালক্রমে একজন

মহান্ ভগবদ্ভক্তে পরিণত হয়ে সেই সমস্ত গুণাবলী বিকশিত করেছিলেন। মানুষের শ্রেষ্ঠ গুণ হচ্ছে ভগবানের ভক্ত হওয়া, এবং তা হলে অনুশীলনযোগ্য সমস্ত সদ্‌গুণাবলী ধীরে ধীরে তার মধ্যে বিকশিত হয়। মহারাজ পরীক্ষিৎ ছিলেন এক মহাভাগবত, বা উত্তম অধিকারী ভগবদ্ভক্ত, যিনি কেবল ভগবত্তত্ত্ব বিজ্ঞানে পারদর্শী ছিলেন তাই নয়, তিনি তাঁর অপ্রাকৃত উপদেশাবলীর দ্বারা অন্যদেরও ভগবদ্ভক্তে পরিণত করতে পারতেন। তাই মহারাজ পরীক্ষিৎ ছিলেন উত্তম অধিকারী ভক্ত, এবং তিনি সব সময় মহান্ ঋষি এবং বিচক্ষণ ব্রাহ্মণদের উপদেশ গ্রহণ করতেন। তাঁদের সেই শাস্ত্রসম্মত উপদেশ অনুসারে তিনি রাজ্য শাসন করতেন।

এই ধরনের মহান্ রাজারা জনসাধারণের ভোটে নির্বাচিত আধুনিক যুগের রাষ্ট্রনেতাদের থেকে অনেক বেশি দায়িত্বশীল ছিলেন, কারণ তাঁরা মহাজনদের কৃপাধন্য হয়ে তাঁদের বেদ বিহিত উপদেশ অনুসারে রাজ্য শাসন করতেন। নিত্য নতুন আইন তৈরি করে এবং কোন উদ্দেশ্য সাধনের মতলবে বার বার সেগুলির পরিবর্তন করবার জন্য মূর্খ অর্বাচীনদের দরকার হত না। মনু, যাজ্ঞবল্ক্য, পরাশর প্রমুখ মুক্তপ্রাণ মহর্ষিরা সমস্ত বিধিনিয়মাদির নির্দেশ দিয়ে গেছেন, এবং সেগুলি সর্বকালের এবং সর্বদেশের উপযোগী। সুতরাং সেই সমস্ত বিধিনিয়মাদি সম্পূর্ণরূপে সুনির্দিষ্ট মানসম্পন্ন এবং অভ্রান্ত।

মহারাজ পরীক্ষিতের মতো রাজাদের মন্ত্রীমণ্ডলী এবং সভাসদেরা ছিলেন মহান্ ঋষিবর্গ অথবা সর্বোত্তম ব্রাহ্মণগণ। তাঁরা কোন বেতন নিতেন না, এবং তাঁদের এই ধরনের বেতনের কোন প্রয়োজনই ছিল না। রাষ্ট্র বিনা খরচে তাঁদের কাছ থেকে সর্বশ্রেষ্ঠ উপদেশ লাভ করত। তাঁরা সকলেই ছিলেন সমদর্শী, তাঁরা মানুষ এবং পশু উভয়ের প্রতি সমভাবাপন্ন ছিলেন। মানুষকে রক্ষা করে নিরীহ পশুদের হত্যা করার নির্দেশ তাঁরা রাজাকে দিতেন না।

এই ধরনের সভাসদেরা মূর্খ ছিলেন না অথবা মূর্খদের স্বর্গরচনাকারীদের প্রতিনিধি ছিলেন না। তাঁরা সকলেই ছিলেন আত্মতত্ত্ববেত্তা, এবং তাঁরা জানতেন কিভাবে রাষ্ট্রের প্রতিটি প্রজা এই জীবনে এবং পরবর্তী জীবনে সুখী হতে পারে। তাঁরা "*যাবৎ জীবেৎ সুখং জীবেৎ ঋণং কৃত্বা ঘৃতং পিবেৎ*" —এই প্রকার ভোগপরায়ণ মতবাদের প্রচারকারী ছিলেন না। তাঁরা ছিলেন প্রকৃত অর্থেই দার্শনিক, এবং তাঁরা মানব জীবনের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে যথাযথভাবে অবগত ছিলেন।

এই সব কর্তব্য সম্বন্ধে পূর্ণরূপে সচেতন থেকে রাজার মন্ত্রীমণ্ডলী রাজাকে যথাযথভাবে পথনির্দেশ দিতেন, এবং ভগবদ্ভক্ত রাজা বা রাষ্ট্রনেতা রাষ্ট্রের যথার্থ কল্যাণ সাধনের জন্য পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে সেই সমস্ত নির্দেশ পালন করতেন।

মহারাজ যুধিষ্ঠির বা মহারাজ পরীক্ষিতের সময়ে রাষ্ট্র ছিল প্রকৃত কল্যাণব্রতী রাষ্ট্র, কারণ সেই রাষ্ট্রে মানুষ অথবা পশু কেউই অসুখী ছিল না। মহারাজ পরীক্ষিৎ ছিলেন পৃথিবীর কল্যাণব্রতী রাষ্ট্রের এক আদর্শ রাজা।

শ্লোক ২

স উত্তরস্য তনয়ামুপযেম ইরাবতীম্ ।
জনমেজয়াদীংশ্চতুরস্তস্যামুৎপাদয়ৎ সুতান্ ॥ ২ ॥

সঃ—তিনি; **উত্তরস্য**—মহারাজ উত্তরের; **তনয়াম্**—কন্যাকে; **উপমেয়**—বিবাহ করেছিলেন; **ইরাবতীম্**—ইরাবতী নামক; **জনমেজয়াদীন**—মহারাজ জনমেজয় আদি; **চতুরঃ**—চার; **তস্যাম্**—তাঁর; **উৎপাদয়ৎ**—উৎপন্ন করেছিলেন; **সুতান্**—পুত্রাদি।

অনুবাদ

মহারাজ পরীক্ষিৎ উত্তর নৃপতির কন্যা ইরাবতীকে বিবাহ করেছিলেন, এবং সেই ইরাবতীর গর্ভে জনমেজয়াদি চারটি পুত্র জন্মগ্রহণ করেছিল।

তাৎপর্য

মহারাজ উত্তর ছিলেন বিরাটের পুত্র এবং মহারাজ পরীক্ষিতের মাতুল। সেই সূত্রে মহারাজ উত্তরের কন্যা ইরাবতী ছিলেন মহারাজ পরীক্ষিতের মামাতো ভগিনী, তবে এক গোত্র না হলে মামাতো পিসতুতো ভাই-বোনদের মধ্যে বিবাহ শাস্ত্রে অনুমোদিত হয়েছে। বৈদিক বিবাহ প্রথায়, গোত্র বা বংশে অত্যন্ত গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। অর্জুনও সুভদ্রাকে বিবাহ করেছিলেন, যদিও সুভদ্রা ছিলেন তাঁর মামাতো বোন।

জনমেজয় ঃ মহারাজ পরীক্ষিতের বিখ্যাত পুত্র এবং একজন রাজর্ষি। তাঁর মায়ের নাম ছিল ইরাবতী, বা অন্য মতে মাদ্রবতী। মহারাজ জনমেজয়ের দুই পুত্র জ্ঞাতানীক এবং শঙ্কুকর্ণ। তিনি কুরুক্ষেত্রের পবিত্র তীর্থে বহু যজ্ঞ অনুষ্ঠান করেছিলেন। তাঁর তিনজন কনিষ্ঠ ভায়ের নাম শ্রুতসেন, উগ্রসেন এবং দ্বিতীয় ভীমসেন। তিনি তক্ষশীলা (অজন্তা) আক্রমণ করেছিলেন এবং তক্ষকের দংশনে তাঁর পিতার মৃত্যুর প্রতিশোধের নিমিত্ত তিনি তক্ষকসহ সমস্ত সর্পকুল বিনাশ করার উদ্দেশ্যে সর্প যজ্ঞ অনুষ্ঠান করেন। বহু প্রভাবশালী দেবতা এবং ঋষিদের অনুরোধে তিনি এই সর্প নিধন যজ্ঞ বন্ধ করেন, কিন্তু যজ্ঞ বন্ধ করলেও তিনি যজ্ঞে সমবেত সকলকেই যথাযথভাবে পুরস্কৃত করে সন্তুষ্ট করেছিলেন।

সেই অনুষ্ঠানে মহামুনি ব্যাসদেবও উপস্থিত ছিলেন, এবং তিনি স্বয়ং মহারাজের সম্মুখে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের ইতিহাস বর্ণনা করেন। পরে ব্যাসদেবের নির্দেশে তাঁর শিষ্য বৈশম্পায়ন রাজার কাছে মহাভারতের কাহিনী বর্ণনা করেন।

তাঁর পিতার অকালমৃত্যুতে তিনি অত্যন্ত মর্মাহত হন এবং পুনরায় তাঁকে দর্শন করার জন্য অত্যন্ত উদ্‌গ্রীব হন। তাঁর সেই বাসনা মহামুনি ব্যাসদেবের কাছে ব্যক্ত করলে, ব্যাসদেব তাঁর সেই বাসনা পূর্ণ করেন। তাঁর পিতা তাঁর সম্মুখে উপস্থিত হন, এবং তিনি তাঁর পিতা ও ব্যাসদেব উভয়কে গভীর শ্রদ্ধা এবং আড়ম্বর সহকারে পূজা করেন। সম্পূর্ণরূপে তৃপ্ত হয়ে তিনি অত্যন্ত উদারতা সহকারে সেই যজ্ঞে উপস্থিত সমস্ত ব্রাহ্মণদের দান করেছিলেন।

শ্লোক ৩

আজহারাশ্বমেধাংস্ত্রীন্ গঙ্গায়াং ভূরিদক্ষিণান্ ।
শারদ্বতং গুরুং কৃত্বা দেবা যত্রাক্ষিগোচরাঃ ॥ ৩ ॥

আজহার—অনুষ্ঠান করেছিলেন; **অশ্বমেধান্**—অশ্বমেধ যজ্ঞ; **ত্রিন**—তিন; **গঙ্গায়াম্**—গঙ্গার তীরে; **ভূরি**—যথেষ্টভাবে; **দক্ষিণান্**—দক্ষিণা দান করেছিলেন; **শারদ্বতম্**—কৃপাচার্যকে; **গুরুম্**—গুরুরূপে; **কৃত্বা**—বরণ করে; **দেবাঃ**—দেবতাদের; **যত্র**—যেখানে; **অক্ষি**—চক্ষু; **গোচরাঃ**—পথে।

অনুবাদ

মহারাজ পরীক্ষিৎ কৃপাচার্যকে গুরুরূপে বরণ করে গঙ্গার তীরে তিনটি অশ্বমেধ যজ্ঞ অনুষ্ঠান করেছিলেন। সেই যজ্ঞে তিনি প্রচুর দক্ষিণা দান করেছিলেন এবং এই যজ্ঞে সাধারণ মানুষেরাও স্বর্গের দেবতাদের দর্শন করতে পেরেছিলেন।

তাৎপর্য

এই শ্লোকটি থেকে বোঝা যায় যে, উচ্চতর লোকের অধিবাসীদের পক্ষে গ্রহ থেকে গ্রহান্তরে ভ্রমণ করা খুবই সহজ। পরাক্রমশালী রাজা-মহারাজা কর্তৃক অনুষ্ঠিত যজ্ঞে যোগদান করার জন্য স্বর্গের দেবতাদের এই পৃথিবীতে আসার বহু বর্ণনা শ্রীমদ্ভাগবতে রয়েছে। এই শ্লোকে আমরা দেখতে পাই যে, মহারাজ পরীক্ষিতের অশ্বমেধ যজ্ঞে সাধারণ মানুষেরাও স্বর্গের দেবতাদের দেখতে পেয়েছিলেন।

স্বর্গের দেবতারা সচরাচর সাধারণ মানুষের গোচরীভূত হন না, ঠিক যেমন ভগবান সকলের গোচরীভূত নন। কিন্তু ভগবান যেমন তাঁর অহৈতুকী কৃপার প্রভাবে এই পৃথিবীতে অবতরণ করে সাধারণ মানুষের দৃষ্টিপথে প্রকাশিত হন, তেমনই স্বর্গের দেবতারাও তাঁদের স্বীয় কৃপাবশে সাধারণ মানুষের গোচরীভূত হয়েছিলেন। যদিও স্বর্গের দেবতারা পৃথিবীর অধিবাসীদের চর্মচক্ষে প্রকাশিত হন না, কিন্তু মহারাজ পরীক্ষিতের প্রভাবে দেবতারা দৃষ্টিপথে প্রকাশিত হয়েছিলেন।

মেঘ যেমন বারিবর্ষণ করে, এই সমস্ত যজ্ঞে রাজারা তেমনই উদারভাবে দান করতেন। মেঘ হচ্ছে জলেরই রূপান্তর, অথবা বলা যায় যে, পৃথিবীর জলই মেঘে পরিণত হয়। তেমনই, রাজারা প্রজাদের কাছ থেকে কর সংগ্রহ করে এই ধরনের যজ্ঞে তা দান করতেন। বৃষ্টি যেমন অঝোর ধারায় ঝরে এবং তখন মনে হয় যেন প্রয়োজনের অতিরিক্ত বারিবর্ষণ হচ্ছে, তেমনই রাজারা যে দান করতেন, তা নাগরিকদের প্রয়োজনের অতিরিক্ত বলেই মনে হত। তৃপ্ত নাগরিকেরা কখনও রাজার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে না, এবং তাই তখনকার দিনে রাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের কোন পরিবর্তন করার প্রয়োজন হত না।

মহারাজ পরীক্ষিতের মতো রাজাকেও সদ্‌গুরুর নির্দেশ গ্রহণ করার প্রয়োজন হত। এইভাবে পরিচালিত না হলে পারমার্থিক জীবনে উন্নতি সাধন করা যায় না। গুরুকে অবশ্যই সদ্‌গুরু হতে হয়, এবং আত্মতত্ত্ব জ্ঞান লাভেচ্ছু মানুষকে প্রকৃত সাফল্য লাভের জন্য অবশ্যই সদ্‌গুরুর আশ্রয় গ্রহণ করতে হয়।

শ্লোক ৪

নিজগ্রাহৌজসা বীরঃ কলিং দিগ্বিজয়ে ক্বচিৎ ।
নৃপলিঙ্গধরং শূদ্রং ঘ্নন্তং গোমিথুনং পদা ॥ ৪ ॥

নিজগ্রাহ—যথেষ্টভাবে দণ্ড দান করে; **ওজসা**—স্বীয় শক্তির দ্বারা; **বীরঃ**—মহাবীর; **কলিম্**—কলিকে; **দিগ্বিজয়ে**—পৃথিবী জয় করার সময়; **ক্বচিৎ**—কোনও এক সময়; **নৃপলিঙ্গধরম্**—রাজবেশধারী; **শূদ্রম্**—শূদ্রকে; **ঘ্নন্তম্**—আঘাতকারী; **গোমিথুনম্**—গাভী এবং বৃষকে; **পদা**—পায়ে।

অনুবাদ

এক সময়, মহারাজ পরীক্ষিৎ যখন পৃথিবী জয় করতে বেরিয়েছিলেন, তখন তিনি দেখতে পান রাজবেশধারী এক শূদ্রাধম, কলি, একটি গাভী এবং একটি বৃষকে পায়ে আঘাত করছে। রাজা তৎক্ষণাৎ তাকে ধরে উপযুক্ত দণ্ড দান করতে উদ্যত হন।

তাৎপর্য

মহারাজ পরীক্ষিৎ নিজের মহিমা প্রচার করার জন্য পৃথিবী জয় করতে বেরোননি। তিনি সিংহাসনে আরোহণ করার পর পৃথিবী জয় করতে বেরিয়েছিলেন, অন্য রাষ্ট্রকে আক্রমণ করার জন্য নয়। তিনি ছিলেন সারা পৃথিবীর সম্রাট, এবং সমস্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাষ্ট্রগুলি ইতিমধ্যেই তাঁর অধীনস্থ হয়েছিল। তিনি বেরিয়েছিলেন ভগবানকে কেন্দ্র করে রাষ্ট্রগুলি পরিচালিত হচ্ছে কি না তা দেখবার উদ্দেশ্যে। ভগবানের প্রতিনিধি হওয়ার ফলে রাজার কর্তব্য হচ্ছে যথাযথভাবে ভগবানের ইচ্ছা সম্পাদন করা। তাঁর কার্যকলাপে স্বীয় মহিমা প্রচারের কোন প্রশ্ন ওঠে না।

তাই মহারাজ পরীক্ষিৎ যখন দেখলেন যে, রাজবেশ পরিহিত একটি শূদ্র একটি গাভী এবং একটি বৃষের পায়ে আঘাত করছে, তখন তিনি তৎক্ষণাৎ তাকে বন্দী করে দণ্ড প্রদান করেন। সব চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পশু গাভীকে নির্যাতন করা হলে রাজা কখনই তা সহ্য করতে পারেন না, তেমনি সমাজের সব চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ মানুষ ব্রাহ্মণদের প্রতি অশ্রদ্ধা তিনি কখনই সহ্য করতে পারেন না।

মানব সভ্যতার উদ্দেশ্য হচ্ছে ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির প্রগতি সাধন করা, এবং তা করতে হলে গো-রক্ষা অবশ্য কর্তব্য।

দুধ একটি অলৌকিক খাদ্য, কারণ তাতে মানব দেহের প্রয়োজনীয় সব ক'টি ভিটামিন রয়েছে। ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির প্রগতি হয় তখনই, যখন মানুষ সত্ত্ব গুণে বিকশিত হওয়ার শিক্ষালাভ করে, এবং সেই জন্য দুধ, ফল এবং শস্যজাত খাদ্যের প্রয়োজনীয়তা সব চেয়ে অধিক। একজন রাজবেশধারী কৃষ্ণবর্ণ শূদ্রকে মানব সমাজের সব চেয়ে হিতকারী পশু গাভীকে নির্যাতন করতে দেখে পরীক্ষিৎ মহারাজ অত্যন্ত আশ্চর্য হয়েছিলেন।

কলিযুগ মানেই হচ্ছে অরাজকতা এবং কলহ, আর এই অরাজকতা এবং কলহের মূল কারণ হচ্ছে নিম্ন শ্রেণীর নিষ্কর্মা মানুষেরা, যাদের কোন রকম উচ্চ আকাঙ্ক্ষা নেই, তারা রাষ্ট্রের কর্ণধারের ভূমিকা গ্রহণ করে। রাজপদে অধিষ্ঠিত হয়ে এই ধরনের মানুষেরা সর্বপ্রথমে গাভী এবং ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতিকে আঘাত করে, এবং তার ফলে সমগ্র সমাজ নরকগামী হয়। উপযুক্ত শিক্ষায় শিক্ষিত মহারাজ পরীক্ষিৎ এই পৃথিবীর সমস্ত কলহের মূল কারণ উপলব্ধি করেছিলেন। তাই তিনি সেই কারণটি অঙ্কুরেই বিনাশ করতে চেয়েছিলেন।

শ্লোক ৫

শৌনক উবাচ

কস্য হেতোর্নিজগ্রাহ কলিং দিগ্বিজয়ে নৃপঃ ।
নৃদেবচিহ্নধৃক্ শূদ্রকোঽসৌ গাং যঃ পদাহনৎ
তৎ কথ্যতাং মহাভাগ যদি কৃষ্ণকথাশ্রয়ম্ ॥ ৫ ॥

শৌনকঃ উবাচ—শৌনক ঋষি বললেন; **কস্য**—কিসের; **হেতোঃ**—জন্য; **নিজগ্রাহ**—যথেষ্ট দণ্ড দান করেছিলেন; **কলিম্**—এই যুগের অধ্যক্ষ কলিকে; **দিগ্বিজয়ে**—পৃথিবী ভ্রমণকালে; **নৃপঃ**—রাজা; **নৃদেব**—রাজপুরুষ; **চিহ্নধৃক্**—বেশধারণকারী; **শূদ্রকঃ**—শূদ্রাধমকে; **অসৌ**—সে; **গাম্**—গাভী; **যঃ**—যে; **পদা অহনৎ**—পায়ে আঘাত করেছিল; **তৎ**—সেই সমস্ত; **কথ্যতাম্**—দয়া করে বর্ণনা করুন; **মহাভাগ**—হে মহাসৌভাগ্যশালী; **যদি**—যদি; **কৃষ্ণ**—কৃষ্ণ সম্বন্ধে; **কথাশ্রয়ম্**—তাঁর সম্বন্ধীয় বিষয়।

অনুবাদ

শৌনক ঋষি জিজ্ঞাসা করলেন—সেই শূদ্রাধম রাজবেশ ধারণ করে গাভীকে তার পদাঘাত করা সত্ত্বেও, মহারাজ পরীক্ষিৎ কেন তাঁকে কেবলই সামান্য দণ্ড দান করেছিলেন? এই সমস্ত ঘটনা যদি কৃষ্ণ সম্বন্ধীয় হয়, তা হলে দয়া করে আপনি আমাদের কাছে তা বর্ণনা করুন।

তাৎপর্য

পুণ্যবান মহারাজ পরীক্ষিৎ যে সেই দুষ্কৃতকারীকে হত্যা না করে কেবল দণ্ড দান করেছিলেন, সেই কথা শুনে শৌনক প্রমুখ ঋষিরা আশ্চর্যান্বিত হয়েছিলেন। তা থেকে বোঝা যায় যে, অপরাধী রাজবেশ ধারণ করে জনসাধারণকে প্রতারণা করতে চায় এবং সব চেয়ে পবিত্র পশু গাভীকে অপমান করতে সাহস করে। মহারাজ পরীক্ষিতের মতো পুণ্যবান রাজাদের কর্তব্য সেই অপরাধীকে তৎক্ষণাৎ হত্যা করা।

তখনকার দিনের ঋষিরা কল্পনাও করতে পারতেন না যে, কলিযুগের প্রভাবে শূদ্রাধমেরা দেশনেতার পদে নির্বাচিত হবে এবং গোহত্যা করার জন্য কসাইখানা খুলবে। এক প্রতারক এবং গাভী নির্যাতনকারী শূদ্রকের কথা শুনতে মহর্ষিদের মোটেই আগ্রহ ছিল না। সেই ঘটনার সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের বিষয়ে কোন যোগাযোগ

ছিল কি না, তাঁরা তা জানতে চেয়েছিলেন। তাঁরা কেবল শ্রীকৃষ্ণ বিষয়ক কথা শুনতেই আগ্রহী ছিলেন, কারণ শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে সম্পর্কিত কথাই কেবল শ্রবণীয়। শ্রীমদ্ভাগবতে সমাজতত্ত্ব, রাজতত্ত্ব, অর্থনীতি, সাংস্কৃতিক বিষয় ইত্যাদি সম্বন্ধে বহু বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে, কিন্তু সে-সমস্তই শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধীয় এবং তাই সেগুলি শ্রবণযোগ্য। শ্রীকৃষ্ণের সম্পর্কে সব কিছুই, তা যাই হোক না কেন, পবিত্র হয়ে যায়। এই জড় জগতে প্রকৃতির তিনটি গুণের প্রভাবে সব কিছুই কলুষিত। তবে শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন পরম পবিত্রকারী মাধ্যম।

শ্লোক ৬

অথবাস্য পদাম্ভোজমকরন্দলিহাং সতাম্ ।
কিমন্যৈরসদালাপৈরায়ুষো যদসদ্ব্যয়ঃ ॥ ৬ ॥

অথবা—অন্যথা; **অস্য**—তাঁর (শ্রীকৃষ্ণের); **পদাম্ভোজ**—শ্রীপাদপদ্ম; **মকরন্দলিহাম্**—যাঁরা পদ্মের মধু লেহন করেন তাঁদের; **সতাম্**—যাঁদের অস্তিত্ব নিত্য তাঁদের; **কিমন্যৈঃ**—অন্য কিছুর কি প্রয়োজন; **অসৎ**—মায়িক; **আলাপৈঃ**—বিষয়াদি; **আয়ুষঃ**—আয়ু; **যৎ**—যা; **অসদ্ব্যয়ঃ**—জীবনের অনর্থক অপচয়।

অনুবাদ

ভগবদ্ভক্তেরা ভগবানের শ্রীপাদপদ্মের মধু লেহনকারী। যে সমস্ত বিষয় কেবল মানুষের মূল্যবান জীবনের অপচয় করে, সেই সমস্ত বিষয়ের কি প্রয়োজন?

তাৎপর্য

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এবং তাঁর ভক্তেরা উভয়েই চিন্ময় স্তরে অধিষ্ঠিত; তাই শ্রীকৃষ্ণ এবং তাঁর শুদ্ধ ভক্ত উভয়ের কথাই সমভাবে মঙ্গলময়। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ ছিল রাজনীতি এবং কূটনীতিতে পূর্ণ, কিন্তু যেহেতু তা শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে সম্পর্কিত তাই *শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা* সারা পৃথিবী জুড়ে সম্মানের সঙ্গে আদৃত হয়। রাজনীতি, অর্থনীতি, সমাজনীতি ইত্যাদি বিষয় বিষয়ীদের কাছে জড়বাদী বিষয় বলে মনে হলেও সেগুলি বর্জন করা উচিত নয়। ভগবানের সঙ্গে সম্পর্কিত শুদ্ধ ভক্তের কাছে এই সমস্ত জড় বিষয়ও ভগবানের সেবায় যুক্ত হওয়ার ফলে চিন্ময় হয়ে ওঠে।

আমরা পাণ্ডবদের কাহিনী শ্রবণ করেছি, এবং এখন আমরা মহারাজ পরীক্ষিতের কাহিনী আলোচনা করছি, কিন্তু যেহেতু এই সমস্ত বিষয়ই পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সম্পর্কিত, তাই সেগুলি চিন্ময়, এবং তা শ্রবণ করতে ভগবানের শুদ্ধ ভক্তেরা অত্যন্ত আগ্রহী। ভীষ্মদেবের প্রার্থনা আলোচনাকালে সেকথা আমরা ইতিমধ্যেই আলোচনা করেছি।

আমাদের আয়ু খুব বেশি নয়, এবং কখন যে সব কিছু ত্যাগ করে পরবর্তী স্তরে যাওয়ার আদেশ আসবে, সেই সম্বন্ধেও কোন নিশ্চয়তা নেই। তাই শ্রীকৃষ্ণের সম্পর্কবিহীন বিষয়ে যাতে আমাদের জীবনের একটি মুহূর্তেরও অপচয় না হয়, সেই সম্পর্কে সচেতন থাকা আমাদের কর্তব্য। যে কোন বিষয়ে, তা সে যতই শুনতে ভাল লাগুক, শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে সম্পর্কিত না হলে তা শ্রবণযোগ্য নয়।

ভগবান শ্রীকৃষ্ণের নিত্যধাম গোলোক বৃন্দাবনের আকৃতি একটি পদ্মের কোরকের মতো। ভগবান যখনই এই জড় জগতে অবতরণ করেন, তখনই তাঁর সঙ্গে তাঁর ধামও যথাযথরূপে প্রকাশিত হন। তাই তাঁর শ্রীপাদপদ্ম সর্বদাই সেই বিশাল পদ্মের কোরকের ওপরেই অবস্থান করে থাকে। তাঁর পদদ্বয়ও পদ্মেরই মতো সুন্দর। তাই বলা হয়, ভগবান শ্রীকৃষ্ণের শ্রীপাদ পদ্মসদৃশ।

জীব তাঁর স্বরূপে নিত্য সত্তা বিশিষ্ট। বলা যেতে পারে, জড়া প্রকৃতির সংস্পর্শে আসার ফলে সে জন্ম মৃত্যুর আবর্তে পতিত হয়। জড়া প্রকৃতির সেই বন্ধন থেকে মুক্ত হলে জীব তার নিত্য আলয় ভগবদ্ধামে ফিরে যাওয়ার যোগ্যতা অর্জন করে। যারা জড় দেহের পরিবর্তন না করে নিত্য জীবন লাভ করতে চায়, তাদের ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এবং তাঁর ভক্তদের কথা ছাড়া অন্য কোন বিষয়ে একটি মুহূর্ত নষ্ট করা উচিত নয়।

শ্লোক ৭

ক্ষুদ্রায়ুষাং নৃণামঙ্গ মর্ত্যানামৃতমিচ্ছতাম্ ।
ইহোপহূতো ভগবান্ মৃত্যুঃ শামিত্রকর্মণি ॥ ৭ ॥

ক্ষুদ্র—অতি অল্প; **আয়ুষাম্**—আয়ু; **নৃণাম্**—মানুষদের; **অঙ্গ**—হে সূত গোস্বামী; **মর্ত্যানাম্**—যাদের মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী; **ঋতম্**—নিত্য জীবন; **ইচ্ছতাম্**—ইচ্ছা করে; **ইহ**—এখানে; **উপহূতঃ**—উপস্থিত হতে আহ্বান করা হয়েছে; **ভগবান**—পরমেশ্বর ভগবানের প্রতিনিধি; **মৃত্যুঃ**—মৃত্যুর নিয়ন্তা যমরাজ; **শামিত্র**—দমন করে; **কর্মণি**—কার্যকলাপ।

অনুবাদ

হে সূত গোস্বামী, কিছু মানুষ অবশ্যম্ভাবী মৃত্যুর কবল থেকে মুক্ত হয়ে নিত্য জীবন লাভের প্রয়াস করেন। তাঁরা মৃত্যুর নিয়ন্তা যমরাজকে আহ্বান করে মৃত্যুর করাল গ্রাস থেকে রক্ষা পান।

তাৎপর্য

জীব যতই নিম্নতর পশুজীবন থেকে উচ্চতর বুদ্ধিমত্তাসম্পন্ন মনুষ্য জীবনে ক্রমে ক্রমে উন্নতি লাভ করে, ততই সে মৃত্যুর করাল গ্রাস থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য আকুল হয়। আধুনিক বিজ্ঞানীরা চিকিৎসা এবং রাসায়নিক জ্ঞানের উন্নতি সাধন করার মাধ্যমে মৃত্যুকে জয় করার চেষ্টা করছে, কিন্তু হায়! মৃত্যুর নিয়ন্তা যমরাজ এতই নিষ্ঠুর যে, তিনি সেই সমস্ত বিজ্ঞানীদের পর্যন্ত রেহাই দেন না। সেই সমস্ত বিজ্ঞানীরা, যারা বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের উন্নতি সাধনের মাধ্যমে মৃত্যুকে জয় করার প্রতিশ্রুতি দেয়, যমরাজ যখন ডাক দেন, তখন তাদেরও মৃত্যুর শিকার হতে হয়। মৃত্যুকে জয় করার কথা বলে আর কী হবে, কেউই এক মুহূর্তের জন্য কারও স্বল্প আয়ু বাড়িয়ে নিতেও পারে না।

যমরাজের এই নিষ্ঠুর সংহারের পন্থা তখনই কেবল রোধ করা যায়, যখন ভগবানের দিব্য নাম শ্রবণ এবং কীর্তন করার জন্য তাঁকে আহ্বান করা হয়। যমরাজ ভগবানের মহান্ ভক্ত, এবং ভগবানের প্রেমময়ী সেবায় সর্বদা যুক্ত, ভগবদ্ভক্তি চর্চায় সতত নিয়োজিত শুদ্ধ ভক্তেরা যখন তাঁকে কীর্তনে এবং যজ্ঞে যোগদান করার জন্য আমন্ত্রণ জানান, তখন তিনি অত্যন্ত প্রীত হন। তাই শৌনক প্রমুখ মহর্ষিরা নৈমিষারণ্যের যজ্ঞানুষ্ঠানে যমরাজকে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন। যারা মরতে চায় না, তাদের জন্য এটাই ছিল মঙ্গলপ্রদ।

শ্লোক ৮

ন কশ্চিন্ম্রিয়তে তাবদ্ যাবদাস্ত ইহান্তকঃ ।
এতদর্থং হি ভগবানাহূতঃ পরমর্ষিভিঃ ।
অহো নৃলোকে পীয়েত হরিলীলামৃতং বচঃ ॥ ৮ ॥

ন—না; কশ্চিৎ—কেউ; ম্রিয়তে—মৃত্যু; তাবৎ—ততক্ষণ; যাবৎ—যতক্ষণ; আস্তে—উপস্থিত; ইহ—এখানে; অন্তকঃ—জীবনের অন্ত সাধনকারী; এতৎ—এই; অর্থম্—কারণ; হি—অবশ্যই; ভগবান—ভগবানের প্রতিনিধি; আহূত—

আমন্ত্রিত; **পরমর্ষিভিঃ**—মহান্ ঋষিদের দ্বারা; **অহো**—হায়; **নৃলোকে**—মানব সমাজে; **পীয়েত**—পান করুক; **হরিলীলা**—পরমেশ্বর ভগবানের অপ্রাকৃত লীলাসমূহ; **অমৃতম্**—নিত্য জীবন প্রদানকারী অমৃত; **বচঃ**—বর্ণনাদি।

অনুবাদ

মৃত্যুর কারণ স্বরূপ যমরাজ যতক্ষণ এখানে উপস্থিত থাকবেন, ততক্ষণ কারও মৃত্যু হবে না। ভগবানের প্রতিনিধি, মৃত্যুর নিয়ন্তা যমরাজকে মহর্ষিরা সেখানে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন। যারা তাঁর কবলিত, তাদের কর্তব্য পরমেশ্বর ভগবানের অমৃতময় লীলাসমূহের বর্ণনা শ্রবণ করার সুযোগ গ্রহণ করা।

তাৎপর্য

প্রতিটি মানুষই মৃত্যুবরণ অপছন্দ করে, কিন্তু মৃত্যুর হাত থেকে কিভাবে উদ্ধার পাওয়া যায়, তা মানুষ জানে না। মৃত্যুর হাত থেকে উদ্ধার পাওয়ার সব চেয়ে সরল এবং নিশ্চিত পন্থা হচ্ছে *শ্রীমদ্ভাগবতে* সুসংবদ্ধভাবে বর্ণিত ভগবানের অমৃতময় লীলাসমূহ শ্রবণ করা। তাই এখানে উপদেশ দেওয়া হয়েছে যে, কোন মানুষ যদি মৃত্যুর গ্রাস থেকে মুক্ত হতে চান, তা হলে তিনি যেন শৌনক প্রমুখ ঋষির নির্দেশিত এই পন্থা অবলম্বন করেন।

শ্লোক ৯

মন্দস্য মন্দপ্রজ্ঞস্য বয়ো মন্দায়ুষশ্চ বৈ ।
নিদ্রয়া হ্রিয়তে নক্তং দিবা চ ব্যর্থকর্মভিঃ ॥ ৯ ॥

মন্দস্য—অলসদের; **মন্দ**—অল্প; **প্রজ্ঞস্য**—বুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তিদের; **বয়ঃ**—বয়স; **মন্দ**—অল্প; **আয়ুষঃ**—আয়ু; **চ**—এবং; **বৈ**—সঠিক; **নিদ্রয়া**—শয়নে; **হ্রিয়তে**—অতিবাহিত হয়; **নক্তম্**—রাত্রি; **দিবা**—দিন; **চ**—ও; **ব্যর্থ**—অর্থহীন; **কর্মভিঃ**—কর্মের দ্বারা।

অনুবাদ

স্বল্পবুদ্ধি এবং স্বল্প আয়ুবিশিষ্ট অলস মানুষেরা নিদ্রার দ্বারা তাদের রাত্রি অতিবাহিত করে এবং অর্থহীন কার্যকলাপে দিন অতিবাহিত করে।

তাৎপর্য

অল্পবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষেরা মানব জীবনের প্রকৃত মূল্য সম্বন্ধে অবগত নয়। জড়া প্রকৃতি তার কঠোর নিয়মে জীবকে নানা প্রকার দুঃখ-দুর্দশা রূপ দণ্ড দান করার সময় প্রকৃতির বিশেষ অবদান স্বরূপ এই মনুষ্য শরীরটি দিয়ে থাকেন। জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ আশীর্বাদ অর্জনের জন্য, অর্থাৎ জন্ম-মৃত্যুর বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য, এটি একটি সুযোগ। যিনি বুদ্ধিমান, তিনি বন্ধন মুক্ত হওয়ার জন্য কঠোর পরিশ্রম করে এই গুরুত্বপূর্ণ উপহারের যথাযথ সদ্ব্যবহার করেন। কিন্তু অল্পবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষেরা অলস এবং জড় বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য প্রদত্ত এই মানব শরীরের মূল্য বুঝতে অক্ষম। তাই তারা অনিত্য জড় শরীরটির ইন্দ্রিয় সুখের জন্য সারা জীবন কঠোর পরিশ্রম করে তথাকথিত অর্থনৈতিক উন্নতি সাধনে অধিক তৎপর হয়। প্রকৃতির নিয়মে নিম্নস্তরের পশুরাও ইন্দ্রিয় তর্পণের সুযোগ পায়, তেমনি মানুষেরাও তাদের পূর্ব জীবন এবং বর্তমান জীবনের কর্ম অনুসারে কিছু পরিমাণ ইন্দ্রিয় সুখ ভোগ করতে পায়।

তবে মানুষের পক্ষে বোঝা অবশ্য কর্তব্য যে, ইন্দ্রিয় সুখ ভোগ মানব জীবনের চরম উদ্দেশ্য নয়। এখানে বলা হয়েছে যে, দিনের বেলায় তারা 'অনর্থক' কার্যকলাপে লিপ্ত থাকে, যেহেতু তাদের জীবনের উদ্দেশ্য ইন্দ্রিয় তর্পণ ছাড়া আর কিছুই নয়। আমরা দেখতে পাই বড় বড় শহরে এবং শিল্প-নগরীগুলিতে মানুষেরা কিভাবে অর্থহীন কার্যকলাপে পরিশ্রম করে। মানুষের শক্তি দিয়ে কত কিছু তৈরি করা হচ্ছে, কিন্তু সে সমস্তই হচ্ছে ইন্দ্রিয় সুখের উদ্দেশ্যে, জড় জগতের বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য কোন কিছুই নয়। আর দিনের বেলায় কঠোর পরিশ্রম করার পর ক্লান্ত মানুষ রাত্রে নিদ্রা যায় অথবা যৌন চর্চায় লিপ্ত হয়। সেটাই হল অল্পবুদ্ধিসম্পন্নদের জন্য জড়জাগতিক সভ্যতার জীবনধারা। তাই এখানে তারা অলস, দুর্ভাগা এবং স্বল্পায়ু বলে নির্ণীত হয়েছে।

শ্লোক ১০

সূত উবাচ

যদা পরীক্ষিৎ কুরুজাঙ্গলেঽবসৎ
কলিং প্রবিষ্টং নিজচক্রবর্তিতে ।
নিশম্য বার্তামনতিপ্রিয়াং ততঃ
শরাসনং সংযুগশৌণ্ডিরাদদে ॥ ১০ ॥

সূতঃ উবাচ—সূত গোস্বামী বললেন; **যদা**—যখন; **পরীক্ষিৎ**—পরীক্ষিৎ মহারাজ; **কুরুজাঙ্গলে**—কুরু সাম্রাজ্যের রাজধানীতে; **অবসৎ**—বাস করছিলেন; **কলিম্**—কলিযুগের লক্ষণাদি; **প্রবিষ্টম্**—প্রবেশ করেছিল; **নিজচক্রবর্তিতে**—তাঁর রাজ্যে; **নিশম্য**—শুনে; **বার্তাম্**—সংবাদ; **অনতিপ্রিয়াম্**—প্রিয়প্রদ নয়; **ততঃ**—তারপর; **শরাসনম্**—ধনুর্বাণ; **সংযুগ**—সুযোগ লাভ করে; **শৌণ্ডিঃ**—সামরিক কার্যকলাপ; **আদদে**—গ্রহণ করেছিলেন।

অনুবাদ

সূত গোস্বামী বললেন—মহারাজ পরীক্ষিৎ যখন কুরু সাম্রাজ্যের রাজধানীতে অবস্থান করছিলেন, তখন কলিযুগের লক্ষণাদি তাঁর রাজ্যে অনুপ্রবেশ করতে শুরু করে। সেই সংবাদ তিনি যখন পান, তখন তাঁর কাছে তা মোটেই প্রীতিপ্রদ বলে মনে হয়নি। অবশ্য তার ফলে তিনি সংগ্রাম করার একটি সুযোগ পেয়েছিলেন। তিনি তাঁর ধনুর্বাণ তুলে নিয়ে সামরিক কার্যকলাপে প্রবৃত্ত হওয়ার জন্য প্রস্তুত হয়েছিলেন।

তাৎপর্য

মহারাজ পরীক্ষিতের রাজ্য এত সুন্দরভাবে পরিচালিত হচ্ছিল যে, তিনি শান্তিপূর্ণভাবে তাঁর রাজধানীতে অবস্থান করছিলেন। কিন্তু তিনি যখন সংবাদ পেলেন যে, কলিযুগের লক্ষণাদি তাঁর রাজ্যে অনুপ্রবেশ করেছে, তখন তিনি অসন্তুষ্ট হয়েছিলেন।

কলিযুগের লক্ষণগুলি কি কি? সেগুলি হচ্ছে ঃ (১) অবৈধ স্ত্রীসঙ্গ, (২) আমিষ আহার, (৩) মাদক দ্রব্যের নেশা, এবং (৪) দ্যূত ক্রীড়া। কলির আক্ষরিক অর্থ হচ্ছে কলহ, এবং উপরোক্ত চারটি লক্ষণ মানব সমাজের সমস্ত কলহের মূল কারণ।

পরীক্ষিৎ মহারাজ সংবাদ পেয়েছিলেন যে, তাঁর রাজ্যের কিছু মানুষ ইতিমধ্যেই এই সমস্ত লক্ষণাক্রান্ত হয়েছে, এবং তিনি তৎক্ষণাৎ তার প্রতিকার করার জন্য তৎপর হয়েছিলেন। তা থেকে বোঝা যায় যে, অন্তত মহারাজ পরীক্ষিতের রাজ্যকাল পর্যন্ত জনসাধারণের কাছে এই সমস্ত আচরণগুলি জানা ছিল না, কিন্তু তার স্বল্প আভাস পাওয়া মাত্রই পরীক্ষিৎ মহারাজ অশান্তির সেই কারণগুলির বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে চেয়েছিলেন। সংবাদটি তাঁর কাছে প্রীতিপ্রদ মনে হয়নি কিন্তু সেই সঙ্গে তিনি সংগ্রাম করার একটা সুযোগ পাওয়ায় আনন্দিতও হয়েছিলেন। ক্ষুদ্র রাষ্ট্রগুলির সঙ্গে যুদ্ধ করার কোন প্রয়োজন ছিল না, কারণ তাঁর অধীনে সকলেই সুখে শান্তিতে ছিল। কিন্তু দুষ্কৃতকারী কলি তাঁকে যুদ্ধ করার সুযোগ দিয়েছিল।

আদর্শ ক্ষত্রিয় রাজা যুদ্ধ করার সুযোগ পেলে অত্যন্ত উৎফুল্ল হন, ঠিক যেমন খেলবার সুযোগ পেলে খেলোয়াড়েরা আনন্দিত হয়। কলিযুগে কলির এই সমস্ত লক্ষণগুলি অবধারিত বলে যদি কেউ যুক্তি দেয়, তবে তা হবে অসঙ্গত। তা যদি হত, তা হলে এই সমস্ত লক্ষণগুলির বিরুদ্ধে পরীক্ষিৎ মহারাজ সংগ্রাম করেছিলেন কেন? অলস এবং দুর্ভাগা মানুষেরা এই ধরনের যুক্তি প্রদর্শন করে। বর্ষাকালে বর্ষা অবশ্যম্ভাবী, কিন্তু তবুও মানুষ সেই বৃষ্টি থেকে নিজেদের রক্ষা করার ব্যবস্থা করে তেমনই, কলিযুগে উল্লিখিত লক্ষণগুলি সমাজ ব্যবস্থায় প্রবেশ করবেই, কিন্তু তা সত্ত্বেও রাষ্ট্রনেতাদের কর্তব্য কলির সেই প্রভাব থেকে নাগরিকদের রক্ষা করা। মহারাজ পরীক্ষিৎ কলির প্রভাবে প্রভাবিত দুষ্কৃতকারীদের দণ্ড দান করতে চেয়েছিলেন, এবং তার ফলে নিষ্পাপ এবং ধর্মপরায়ণ নিরীহ নাগরিকদের রক্ষা করার ব্যবস্থা করেছিলেন। রাজার কর্তব্য এইভাবে প্রজাদের রক্ষা করা, এবং কলির বিরুদ্ধে পরীক্ষিৎ মহারাজের যুদ্ধের প্রস্তুতি সম্পূর্ণরূপে ন্যায়সঙ্গত ছিল।

শ্লোক ১১

স্বলঙ্কৃতং শ্যামতুরঙ্গযোজিতং
রথং মৃগেন্দ্রধ্বজমাশ্রিতঃ পুরাৎ ।
বৃতো রথাশ্বদ্বিপপত্তিযুক্তয়া
স্বসেনয়া দিগ্বিজয়ায় নির্গতঃ ॥ ১১ ॥

সু-অলঙ্কৃতম্—অত্যন্ত সুন্দররূপে অলঙ্কৃত; শ্যাম—কৃষ্ণবর্ণ; তুরঙ্গ—অশ্ব; যোজিতম্—যুক্ত; রথম্—রথ; মৃগেন্দ্র—সিংহ; ধ্বজম্—ধ্বজা; আশ্রিতঃ—রক্ষিত; পুরাৎ—রাজধানী থেকে; বৃতঃ—পরিবৃত হয়ে; রথ—রথীগণ; অশ্ব—অশ্বারোহী সৈনিক; দ্বিপপত্তি—হস্তীসমূহ; যুক্তয়া—এইভাবে সজ্জিত হয়ে; স্বসেনয়া—সৈন্যসহ; দিগ্বিজয়ায়—দিগ্বিজয়ে; নির্গতঃ—বাহির হলেন।

অনুবাদ

মহারাজ পরীক্ষিৎ, রথী, অশ্বারোহী, গজ এবং পদাতিক সৈন্য পরিবৃত হয়ে, কৃষ্ণবর্ণ অশ্বচালিত এবং সিংহচিহ্নিত ধ্বজাশোভিত রথে চড়ে দিগ্বিজয়ের উদ্দেশ্যে নগরী থেকে বাহির হলেন।

তাৎপর্য

তাঁর পিতামহ অর্জুনের সঙ্গে মহারাজ পরীক্ষিতের কিছু পার্থক্য হচ্ছে এই যে, শ্বেত অশ্বের পরিবর্তে তাঁর রথ কৃষ্ণ অশ্বে যোজিত ছিল এবং হনুমান চিহ্নের পরিবর্তে তাঁর ধ্বজা সিংহচিহ্নিত ছিল। সুসজ্জিত রথ, অশ্ব, গজ এবং পদাতিক সৈন্য পরিবৃত হয়ে মহারাজ পরীক্ষিতের সেই রাজকীয় শোভাযাত্রা যে কেবল দর্শনীয় ছিল, তাই নয়, তা যুদ্ধক্ষেত্রের মাঝেও সৌন্দর্যের পরিচায়ক এক সভ্যতার নিদর্শন হয়েছিল।

শ্লোক ১২

ভদ্রাশ্বং কেতুমালং চ ভারতং চোত্তরান্ কুরূন্ ।
কিম্পুরুষাদীনি বর্ষাণি বিজিত্য জগৃহে বলিম্ ॥ ১২ ॥

ভদ্রাশ্বম্—ভদ্রাশ্ব; **কেতুমালম্**—কেতুমাল; **চ**—ও; **ভারতম্**—ভারত; **চ**—এবং; **উত্তরান্**—উত্তরদিকের দেশগুলি; **কুরূন্**—কুরুরাজ; **কিম্পুরুষ-আদানি**—কিম্পুরুষ ইত্যাদি বিভিন্ন বর্ষ; **বর্ষাণি**—পৃথিবীর অংশসমূহ; **বিজিত্য**—জয় করে; **জগৃহে**—সংগ্রহ করেছিলেন; **বলিম্**—বলের দ্বারা।

অনুবাদ

মহারাজ পরীক্ষিৎ ভদ্রাশ্ব, কেতুমাল, ভারত, উত্তর কুরুজাঙ্গল, কিম্পুরুষ ইত্যাদি পৃথিবীর সমস্ত অংশ বা বর্ষ জয় করে সেই সমস্ত দেশের শাসকদের কাছ থেকে উপঢৌকনাদি আদায় করেছিলেন।

তাৎপর্য

ভদ্রাশ্ব ঃ মেরু পর্বতের সন্নিকটবর্তী একটি দ্বীপ। মহাভারতে (*ভীষ্ম পর্ব* ৭/১৪-১৮) এই দ্বীপটির বর্ণনা রয়েছে। ধৃতরাষ্ট্রের কাছে সঞ্জয় তা বর্ণনা করেন।

মহারাজ যুধিষ্ঠিরও এই দ্বীপটি জয় করেছিলেন, এবং তার ফলে এই প্রদেশটি তাঁর সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল। মহারাজ পরীক্ষিৎ ইতিপূর্বেই তাঁর পিতামহের সাম্রাজ্যের উত্তরাধিকারী রূপে বিঘোষিত হয়েছিলেন, কিন্তু তা সত্ত্বেও তিনি স্বীয় বলের দ্বারা সেই সমস্ত দেশের উপর তাঁর আধিপত্য বিস্তার করে উপঢৌকন সংগ্রহ করেছিলেন।

কেতুমাল ঃ এই ভূলোক সাতটি দ্বীপ এবং সাতটি সমুদ্রে বিভক্ত; আবার অনেকের মতে, নয় ভাগে বিভক্ত। এই পৃথিবীর নাম জম্বুদ্বীপ এবং এটি নয়টি

বর্ষে বিভক্ত। ভারতবর্ষ হল তার মধ্যে একটি বর্ষ, আধুনিক ভূগোলে যাকে বলা হয় মহাদেশ, এবং আর একটি বর্ষের নাম কেতুমাল। বলা হয় যে, কেতুমালবর্ষের রমণীরা সব চেয়ে সুন্দরী। এই বর্ষটি অর্জুনও জয় করেছিলেন। মহাভারতে (সভা ২৮/৬) পৃথিবীর এই অংশটির বর্ণনা পাওয়া যায়।

বলা হয় যে, পৃথিবীর এই অংশটি মেরু পর্বতের পশ্চিমভাগে অবস্থিত, এবং এখানকার অধিবাসীদের আয়ু ছিল দশ হাজার বৎসর (ভীষ্ম-পর্ব ৬/৩১)। এখানকার মানুষদের দেহ গৌরবর্ণ, এবং রমণীরা স্বর্গের দেবকন্যাদের মতো সুন্দরী। এখানকার অধিবাসীরা সব রকম রোগ এবং শোক থেকে মুক্ত।

ভারতবর্ষ ঃ পৃথিবীর এই অংশটিও জম্বুদ্বীপের ন'টি বর্ষের অন্যতম। ভারতবর্ষের একটি বর্ণনা মহাভারতে *(ভীষ্ম পর্ব, অধ্যায় ৯-১০)* দেওয়া হয়েছে।

জম্বুদ্বীপের মধ্যভাগে ইলাবৃত বর্ষ অবস্থিত, এবং ইলাবৃত বর্ষের দক্ষিণভাগে হরিবর্ষ অবস্থিত। মহাভারতে *(সভাপর্ব ২৮/৭-৮)* এই সমস্ত বর্ষের বিবরণ দেওয়া হয়েছে এই ভাবে—

নগরাংশ্চ বনাংশ্চৈব নদীশ্চ বিমলোদকাঃ ।
পুরুষান্ দেব-কল্পাংশ্চ নারীশ্চ প্রিয়দর্শনাঃ ॥
অদৃষ্টপূর্বান্ সুভগান্ স দদর্শ ধনঞ্জয়ঃ ।
সদনানি চ শুভ্রাণি নারীশ্চাপ্সরসাং নিভাঃ ॥

এখানে বর্ণনা করা হয়েছে যে, এই উভয় বর্ষের নারীরাই ছিলেন অত্যন্ত সুন্দরী, এবং তাঁদের কেউ কেউ স্বর্গের অপ্সরাদের মতোই সুন্দরী ছিলেন।

উত্তরকুরু ঃ বৈদিক বর্ণনা অনুসারে জম্বুদ্বীপের উত্তর প্রান্তে এই উত্তর কুরুবর্ষ অবস্থিত। এর তিনদিকে লবণ সমুদ্র এবং এটি শৃঙ্গবান পর্বত দ্বারা হিরণ্ময়বর্ষ থেকে বিভক্ত।

কিম্পুরুষ বর্ষ ঃ এই বর্ষটি দার্জিলিং ধবলগিরি পর্বতের উত্তর পারে অবস্থিত এবং সম্ভবত নেপাল, ভুটান, তিব্বত এবং চীনদেশের মতো কোন দেশ। এই স্থানটিও অর্জুন জয় করেছিলেন *(সভা পর্ব, ২৮/১-২)*। কিম্পুরুষেরা দক্ষের কন্যার বংশধর। মহারাজ যুধিষ্ঠির যখন অশ্বমেধ যজ্ঞ করেছিলেন, তখন এই সমস্ত দেশের অধিবাসীরাও সেই মহোৎসবে যোগদানের জন্য উপস্থিত হয়েছিলেন, এবং সম্রাটকে তাঁদের উপহার প্রদান করেছিলেন। পৃথিবীর এই ভূমণ্ডলটিকে বলা হয় কিম্পুরুষবর্ষ, অথবা কখনও বা হিমালয় অঞ্চলের দেশ বলে হিমবতী নামেও অভিহিত করা হয়। কথিত আছে যে, শুকদেব গোস্বামী হিমালয়ের এই প্রদেশে জন্মগ্রহণ করেছিলেন এবং তিনি হিমালয়ের দেশগুলি অতিক্রম করে ভারতবর্ষে এসেছিলেন।

অন্যভাবে বলতে গেলে, মহারাজ পরীক্ষিৎ এইভাবে সারা পৃথিবী জয় করেছিলেন। তিনি সারা পৃথিবীর পূর্ব, পশ্চিম, উত্তর এবং দক্ষিণ দিকের সব কটি সাগর এবং মহাসাগরাদির সংযোজনকারী সমস্ত মহাদেশগুলি জয় করেছিলেন।

শ্লোক ১৩—১৫

তত্র তত্রোপশৃণ্বানঃ স্বপূর্বেষাং মহাত্মনাম্ ।
প্রগীয়মাণং চ যশঃ কৃষ্ণমাহাত্ম্যসূচকম্ ॥ ১৩ ॥
আত্মানং চ পরিত্রাতমশ্বত্থাম্নোঽস্ত্রতেজসঃ ।
স্নেহং চ বৃষ্ণিপার্থানাং তেষাং ভক্তিং চ কেশবে ॥ ১৪ ॥
তেভ্যঃ পরমসন্তুষ্টঃ প্রীত্যুজ্জৃম্ভিতলোচনঃ ।
মহাধনানি বাসাংসি দদৌ হারান্ মহামনাঃ ॥ ১৫ ॥

তত্র তত্র—যেখানে মহারাজ গিয়েছিলেন; **উপশৃণ্বানঃ**—তিনি নিরন্তর শ্রবণ করেছিলেন; **স্বপূর্বেষাম্**—তাঁর পূর্বপুরুষদের কথা; **মহাত্মনাম্**—যাঁরা সকলেই ছিলেন ভগবানের মহান্ ভক্ত; **প্রগীয়মাণম্**—যাঁরা এইভাবে কীর্তন করছিলেন; **চ**—ও; **যশঃ**—মহিমা; **কৃষ্ণ**—ভগবান শ্রীকৃষ্ণ; **মাহাত্ম্য**—মহিমামণ্ডিত কার্যকলাপ; **সূচকম্**—সূচক; **আত্মানম্**—তাঁর নিজের; **চ**—ও; **পরিত্রাতম্**—পরিত্রাণ করেছিলেন; **অশ্বত্থাম্নঃ**—অশ্বত্থামার; **অস্ত্র**—ব্রহ্মাস্ত্র; **তেজসঃ**—তেজরশ্মি; **স্নেহম্**—স্নেহের বশে; **চ**—ও; **বৃষ্ণি-পার্থানাম্**—বৃষ্ণি এবং পৃথার বংশধরদের মধ্যে; **তেষাম্**—তাঁদের সকলের; **ভক্তিম**—ভক্তি; **চ**—ও; **কেশবে**—শ্রীকৃষ্ণের প্রতি; **তেভ্যঃ**—তাঁদের; **পরম**—অত্যন্ত; **সন্তুষ্টঃ**—প্রসন্ন; **প্রীতি**—অনুরাগ; **উজ্জৃম্ভিত**—সুন্দরভাবে উন্মীলিত; **লোচনঃ**—চক্ষু; **মহাধনানি**—মহামূল্যবান সম্পদ; **বাসাংসি**—বসন; **দদৌ**—দান করেছিলেন; **হারান্**—কণ্ঠহার; **মহা-মনাঃ**—উদার।

অনুবাদ

রাজা যেখানেই গিয়েছিলেন, সেখানেই তাঁর মহান্ ভগবদ্ভক্ত পূর্বপুরুষদের এবং শ্রীকৃষ্ণের মাহাত্ম্য শ্রবণ করেছিলেন। তিনি নিজেও কিভাবে অশ্বত্থামার অস্ত্রের প্রচণ্ড তেজোরশ্মি থেকে রক্ষা পেয়েছিলেন, সে-কথাও শ্রবণ করেছিলেন। লোকে তাঁর কাছে বৃষ্ণি এবং পৃথার বংশধরদের কেশবের প্রতি গভীর স্নেহ এবং ভক্তির কথাও বলত। এই প্রকার মহিমা কীর্তনকারীদের প্রতি অত্যন্ত প্রসন্ন

হয়ে মহারাজ গভীর তৃপ্তি সহকারে তাঁর চক্ষুদ্বয় উন্মীলিত করেছিলেন, এবং মহাবদান্যতা সহকারে তাদের অতি মূল্যবান কণ্ঠহার এবং বসন দান করেছিলেন।

তাৎপর্য

রাজা এবং মহান্ ব্যক্তিদের বন্দনা সহকারে স্বাগত জানাতে হয়। অবিস্মরণীয় কাল ধরে এই প্রথা চলে আসছে, এবং যেহেতু মহারাজ পরীক্ষিৎ ছিলেন পৃথিবীর সুবিদিত সম্রাটদের একজন, তাই তিনি পৃথিবীর সর্বত্র যেখানেই গেছেন, সেখানেই তাঁকে এইভাবে বন্দনা সহকারে স্বাগত জানানো হয়েছিল। সেই স্বাগত বন্দনার মূল বিষয় ছিলেন শ্রীকৃষ্ণ। শ্রীকৃষ্ণ মানে শ্রীকৃষ্ণ এবং তাঁর নিত্য ভক্তগণ, ঠিক যেমন রাজা মানে রাজা এবং তাঁর অন্তরঙ্গ পার্ষদগণ।

শ্রীকৃষ্ণকে তাঁর ঐকান্তিক ভক্তদের থেকে আলাদা করা যায় না, তাই তাঁর ভক্তদের বন্দনা করা মানে পরমেশ্বর ভগবানেরই বন্দনা করা, আবার শ্রীকৃষ্ণের বন্দনা করা মানে তাঁর ভক্তদের বন্দনা করা। মহারাজ যুধিষ্ঠির এবং অর্জুন প্রমুখ তাঁর পূর্বপুরুষেরা যদি শ্রীকৃষ্ণের লীলাকথার সঙ্গে যুক্ত না হতেন, তা হলে পরীক্ষিৎ তাঁদের মহিমা কীর্তন শুনে আনন্দিত হতেন না।

ভগবান অবতরণ করেন বিশেষভাবে তাঁর ভক্তদের পরিত্রাণ করবার জন্য *(পরিত্রাণায় সাধুনাং)*। ভগবানের উপস্থিতিতে ভক্তেরা মহিমান্বিত হন, কারণ তাঁরা ভগবান এবং তাঁর বিভিন্ন শক্তির সান্নিধ্য ব্যতীত এক মুহূর্তের জন্যও জীবন ধারণ করতে পারেন না। ভগবান তাঁর লীলা এবং মহিমার মাধ্যমে তাঁর ভক্তদের কাছে বিরাজমান থাকেন, এবং তাই মহারাজ পরীক্ষিৎ ভগবানের মহিমা কীর্তন শ্রবণ করে তাঁর উপস্থিতি অনুভব করছিলেন, বিশেষ করে যখন বর্ণনা করা হয়েছিল কিভাবে তাঁর মাতৃজঠরে অবস্থানকালে ভগবান তাঁকে রক্ষা করেছিলেন।

ভগবদ্ভক্তেরা কখনও বিপদগ্রস্ত হন না, কিন্তু প্রতি পদে বিপদসঙ্কুল এই জড় জগতে ভক্তরা কখনও-বা আপাত ভয়ঙ্কর পরিস্থিতির সম্মুখীন হন, এবং ভগবান যখন তাঁদের রক্ষা করেন, তখন ভগবদ্ভক্তির মহিমা কীর্তন করা হয়। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার বক্তা রূপে ভগবানের মহিমা প্রচারিত হত না, যদি তাঁর ভক্ত পাণ্ডবেরা কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে জড়িয়ে না পড়তেন।

ভগবানের এই সমস্ত লীলাময় কার্যকলাপ মহারাজ পরীক্ষিতের স্বাগত বন্দনায় কীর্তিত হয়েছিল, এবং মহারাজ পরীক্ষিৎ সেই বন্দনাকারীদের প্রতি পূর্ণরূপে সন্তুষ্ট হয়ে তাঁদের পুরস্কৃত করেছিলেন। তখনকার দিনের স্বাগত বন্দনার সঙ্গে এখনকার

স্বাগত বন্দনার পার্থক্য এই যে, তখনকার স্বাগত বন্দনা করা হত পরীক্ষিৎ মহারাজের মতো ব্যক্তিকে। সেই স্বাগত বন্দনা হত সম্পূর্ণ বাস্তব তত্ত্বের ভিত্তিতে এবং যাঁরা সে বন্দনা করতেন, তাঁদের যথেষ্ট পুরস্কৃত করা হত, কিন্তু এখনকার স্বাগত বন্দনা বাস্তব তত্ত্বের ভিত্তিতে হয় না, পক্ষান্তরে তা কোনও পদাধিকারীর সন্তুষ্টি বিধানের জন্যই শুধু করা হয়, এবং প্রায়ই সেগুলি থাকে কপট তোষামোদে পরিপূর্ণ। আর দীনহীন হতভাগ্য বন্দিতেরা সেই সমস্ত স্বাগত বন্দনাকারীদের কদাচিৎ পুরস্কৃত করে থাকেন।

শ্লোক ১৬

সারথ্যপারষদসেবনসখ্যদৌত্য-
বীরাসনানুগমনস্তবনপ্রণামান্ ।
স্নিগ্ধেষু পাণ্ডুষু জগৎপ্রণতিং চবিষ্ণো-
র্ভক্তিং করোতি নৃপতিশ্চরণারবিন্দে ॥ ১৬ ॥

সারথ্য—সারথির পদ গ্রহণ করে; **পারষদ**—রাজসূয় যজ্ঞ সভায় অধ্যক্ষতার পদ গ্রহণ করে; **সেবন**—ভগবানের সেবায় মন সর্বদা নিযুক্ত করে; **সখ্য**—সখারূপে ভগবানকে চিন্তা করে; **দৌত্য**—দূত রূপে; **বীর-আসন**—উন্মুক্ত তরবারি হস্তে রাত্রে প্রহরীর পদ গ্রহণ করা; **অনুগমন**—পদাঙ্ক অনুসরণ করে; **স্তবন**—স্তব করে; **প্রণামান্**—প্রণতি নিবদন করে; **স্নিগ্ধেষু**—যাঁরা ভগবানের ইচ্ছার বশবর্তী তাঁদের প্রতি; **পাণ্ডুষু**—পাণ্ডুপুত্রদের প্রতি; **জগৎ**—সারা জগতের; **প্রণতিম্**—মাননীয়; **চ**—এবং; **বিষ্ণোঃ**—শ্রীবিষ্ণুর; **ভক্তিম্**—ভক্তি; **করোতি**—করে; **নৃপতিঃ**—রাজা; **চরণারবিন্দে**—তাঁর শ্রীপাদপদ্মে।

অনুবাদ

মহারাজ পরীক্ষিৎ শুনেছিলেন যে, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ (বিষ্ণু), যিনি সারা জগতে মান্য, তিনি তাঁর অহৈতুকী কৃপাবশে তাঁর প্রিয় পাণ্ডুপুত্রদের সারথ্য বরণ করেছিলেন, দৌত্য করেছিলেন, সম্যক্‌রূপে তাঁদের সহচর হয়েছিলেন, রাত্রে উন্মুক্ত তরবারি হস্তে তাঁদের প্রহরী হয়েছিলেন, এবং এইভাবে তাঁদের ইচ্ছা অনুসারে তাঁদের নানা প্রকার সেবা করেছিলেন। কনিষ্ঠ ভ্রাতারূপে তিনি তাঁদের প্রণতি নিবেদন করেছিলেন এবং তাঁদের নির্দেশ পালন করেছিলেন। তা শুনে মহারাজ পরীক্ষিৎ ভগবানের শ্রীপাদপদ্মের প্রতি ভক্তিতে অভিভূত হয়েছিলেন।

তাৎপর্য

পাণ্ডবদের মতো ঐকান্তিক ভক্তদের কাছে শ্রীকৃষ্ণই সব কিছু। তাঁদের কাছে শ্রীকৃষ্ণ ছিলেন পরমেশ্বর ভগবান, শ্রীগুরুদেব, আরাধ্য বিগ্রহ, পথপ্রদর্শক, সারথি, সখা, সেবক, বার্তাবহ দূত এবং তাঁদের চিন্তনীয় সব কিছুই। আর এইভাবে ভগবানও পাণ্ডবদের ভালবাসার প্রতিদান দিয়েছিলেন। ভগবানের শুদ্ধ ভক্ত রূপে মহারাজ পরীক্ষিৎ ভগবানের ভক্তের ভালবাসার অপ্রাকৃত প্রতিদান উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন, এবং তাই তিনিও ভগবানের প্রতি ভক্তিতে অভিভূত হয়েছিলেন।

শুদ্ধ ভক্তের সঙ্গে ভগবানের ভাবের আদান-প্রদান উপলব্ধি করার মাধ্যমে অনায়াসে এই জড় জগতের বন্ধন থেকে মুক্তি লাভ করা যায়। ভক্তের সঙ্গে ভগবানের এই আদান-প্রদান সাধারণ মানুষের আচরণ বলে মনে হতে পারে, কিন্তু তত্ত্বগতভাবে যিনি তার মর্ম উপলব্ধি করেন, তিনি তৎক্ষণাৎ ভগবদ্ধামে ফিরে যাওয়ার যোগ্যতা অর্জন করেন।

পাণ্ডবেরা ভগবানের ইচ্ছার এতই বশবর্তী ছিলেন যে, তাঁর সেবায় যে কোনও পরিমাণ শক্তি ব্যয় করতে তাঁরা প্রস্তুত ছিলেন এবং তাঁদের এই ঐকান্তিক নিষ্ঠার ফলে তাঁদের ইচ্ছা অনুসারে যে কোনও আকারে তাঁরা ভগবানের কৃপা লাভ করতে পেরেছিলেন।

শ্লোক ১৭

তস্যৈবং বর্তমানস্য পূর্বেষাং বৃত্তিমন্বহম্ ।
নাতিদূরে কিলাশ্চর্যং যদাসীৎ তন্নিবোধ মে ॥ ১৭ ॥

তস্য—মহারাজা পরীক্ষিতের; **এবম্**—এইভাবে; **বর্তমানস্য**—সেই ধরনের চিন্তায় মগ্ন থেকে; **পূর্বেষাং**—তাঁর পূর্বপুরুষদের; **বৃত্তিম্**—সুকৃতি; **অন্বহম্**—দিনের পর দিন; **ন**—না; **অতিদূরে**—খুব দূরে; **কিল**—অতিশয়; **আশ্চর্যম্**—আশ্চর্য হয়ে; **যৎ**—যা; **আসীৎ**—ছিলেন; **তৎ**—তা; **নিবোধ**—জানো; **মে**—আমার কাছে।

অনুবাদ

যখন মহারাজা পরীক্ষিৎ তাঁর পূর্বপুরুষদের সুকৃতি বিষয়ক কথা শ্রবণ করে দিন যাপন করছিলেন এবং অতিশয় আশ্চর্য হয়ে দিনের পর দিন তাঁদেরই চিন্তায় মগ্ন হয়ে থাকতেন, তখন কী ঘটেছিল, তা এখন আপনারা আমার কাছে শুনতে পারেন।

শ্লোক ১৮

ধর্মঃ পদৈকেন চরন্ বিচ্ছায়ামুপলভ্য গাম্ ।
পৃচ্ছতি স্মাশ্রুবদনাং বিবৎসামিব মাতরম্ ॥ ১৮ ॥

ধর্মঃ—ধর্মনীতির রক্ষক ধর্মরাজ; **পদা**—পা; **একেন**—মাত্র একটির উপর; **চরন্**—বিচরণ করছিলেন; **বিচ্ছায়াম্**—বিষাদগ্রস্ত হয়ে; **উপলভ্য** —কাছে এসে; **গাম্**—গাই; **পৃচ্ছতি**—প্রশ্ন করেন; **স্ম**—সহিত; **অশ্রুবদনাম্**—অশ্রুপূর্ণ বদনে; **বিবৎসাম্**—বৎসকে হারিয়েছেন যিনি; **ইব**—মতো; **মাতরম্**—মা।

অনুবাদ

ধর্মনীতির রক্ষক ধর্মরাজ একটি বৃষের রূপ ধারণ করে ইতস্তত বিচরণ করছিলেন। আর তখন তাঁর দেখা হয়েছিল গাভীরূপী ধরিত্রী মাতার সাথে—তিনি যেন বৎসহারা গোমাতার মতোই বিষণ্ণ হয়ে ছিলেন। তাঁর চোখে ছিল অশ্রুধারা, আর তাঁর দেহের সৌন্দর্য যেন হারিয়ে গিয়েছিল। তাই ধর্মরাজ তখন ধরিত্রীমাতাকে নিম্নরূপ প্রশ্ন করেছিলেন।

তাৎপর্য

বৃষ হচ্ছে নীতিসূত্রের প্রতীক, এবং গাভী হচ্ছে পৃথিবীর প্রতিভূ। যখন বৃষ এবং গাভী হর্ষোৎফুল্ল হয়ে থাকে, বুঝতে হবে যে, জগৎবাসীরাও হর্ষোৎফুল্ল হয়ে আছে। তার কারণ হচ্ছে এই যে, কৃষিক্ষেত্রে শস্যাদি উৎপাদনে সহায়তা করে থাকে বৃষ, এবং সুষম খাদ্য-মূল্যমানের বিস্ময়কর সৃষ্টি যে দুধ, তার জোগান দেয় গাভী। তাই তারা যাতে সর্বত্রই প্রফুল্লতা নিয়ে চরে বেড়াতে পারে, সেই জন্য মানব-সমাজ এই দুই দরকারী প্রাণীকে অতি যত্ন সহকারে পালন করে থাকে।

কিন্তু এই কলিযুগে বর্তমানে বৃষ এবং গাভী দুটিকেই এখন জবাই করা হচ্ছে আর ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতি যারা জানে না, সেই শ্রেণীর মানুষেরা ওদের খাদ্যের মতো খেয়ে ফেলছে।

সব রকম সাংস্কৃতিক কার্যকলাপের সর্বোত্তম সার্থকতা অর্জন করতে গেলে শুধুমাত্র ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির প্রসারের মাধ্যমে সমগ্র মানব-সমাজের কল্যাণার্থে বৃষ আর গাভীকে রক্ষা করতে পারা যায়। এই ধরনের সংস্কৃতির প্রগতির মাধ্যমেই, সমাজের নীতিবোধ যথাযথভাবে অক্ষুণ্ণ রাখা যায়, এবং তার ফলে অযথা ব্যর্থ প্রচেষ্টা ছাড়াই শান্তি ও সমৃদ্ধিও অর্জন করা চলে। ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির যখন অবনতি ঘটে, গাভী এবং বৃষ তখন দুর্ব্যবহার পায়, আর তারই পরিণাম-প্রতিক্রিয়াস্বরূপ নিম্নলিখিত লক্ষণগুলি প্রকটিত হয়।

শ্লোক ১৯

ধর্ম উবাচ

কচ্চিদ্ভদ্রেঽনাময়মাত্মনস্তে
বিচ্ছায়াসি ম্লায়তেষন্মুখেন ।
আলক্ষয়ে ভবতীমন্তরাধিং
দূরে বন্ধুং শোচসি কঞ্চনাম্ব ॥ ১৯ ॥

ধর্মঃ উবাচ—ধর্মরাজ বললেন; **কচ্চিৎ**—কিনা; **ভদ্রে**—মহোদয়া; **অনাময়ম্**—সম্পূর্ণ কুশল; **আত্মনঃ**—নিজে; **তে**—আপনার; **বিচ্ছায়া অসি**—দুঃখছায়াগ্রস্ত মনে হচ্ছে; **ম্লায়তা**—যা অন্ধকারাচ্ছন্ন করে রেখেছে; **ঈষৎ**—সামান্য; **মুখেন**—মুখ থেকে; **আলক্ষয়ে**—আপনাকে দেখাচ্ছে; **ভবতীম্**—আপনার; **অন্তরাধিম্**—অন্তরের কোনও আধিব্যাধি; **দূরে**—দূরে; **বন্ধুম্**—বন্ধু; **শোচসি**—ভাবছেন; **কঞ্চন**—কোনও; **অম্ব**—হে মাতঃ।

অনুবাদ

ধর্মরাজ (বৃষরূপে) শুধালেন—হে মাতঃ, আপনি কি সম্পূর্ণ কুশলে নেই? আপনাকে কেন দুঃখছায়াগ্রস্ত মনে হচ্ছে? আপনার মুখ সামান্য অন্ধকারাচ্ছন্ন দেখাচ্ছে। আপনি কি অন্তরে কোনও আধিব্যাধিতে কষ্ট পাচ্ছেন, কিংবা কোনও আত্মীয়-বন্ধু দূরে চলে গেছে, তার কথা ভাবছেন?

তাৎপর্য

এই কলিযুগে জগদ্বাসী সব সময়ই উদ্বেগাকুল হয়ে থাকে। প্রত্যেকেই কোন না কোন আধিব্যাধিতে বিব্রত। এই যুগের মানুষদের কেবল মুখখানি থেকেই যে কেউ মনের লক্ষণাদির আভাস পেতে পারে। প্রত্যেকেই প্রবাসী আত্মীয়-স্বজন যারা বাড়ি ছেড়ে দূরে গেছে, তাদের অভাববোধ করে থাকে। কলিযুগের বিশেষ একটা লক্ষণ হল, কোনও পরিবারগোষ্ঠী এখন একসাথে বসবাস করার সৌভাগ্য পায় না। রুজি-রোজগারের জন্য, বাবা ছেলের কাছ থেকে বহু দূরে থাকেন, কিংবা স্ত্রী থাকেন পতির কাছ থেকে বহু দূরে। এমনি কত রকম ঘটছে। আভ্যন্তরীণ রোগব্যাধি, প্রিয়-পরিজনদের কাছ থেকে বিরহ-বিচ্ছেদ, আর সব কিছুর স্থিতাবস্থা রক্ষার চেষ্টায় মানুষ নিত্যই দুর্দশা ভোগ করছে। এগুলি শুধু কয়েকটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, যা এই যুগের মানুষদের নিয়তই অসুখী করে রাখে।

শ্লোক ২০

পাদৈর্ন্যূনং শোচসি মৈকপাদ-
মাত্মানং বা বৃষলৈর্ভোক্ষ্যমাণম্ ।
আহো সুরাদীন্ হৃতযজ্ঞভাগান্
প্রজা উত স্বিন্ন মঘবত্যবর্ষতি ॥ ২০ ॥

পাদৈঃ—তিনটি পায়ের দ্বারা; **ন্যূনম্**—হীন; **শোচসি**—আপনি কি জন্য দুশ্চিন্তা করছেন; **মা**—আমার; **একপাদম্**—একটি মাত্র পা; **আত্মানম্**—নিজের দেহ; **বা**—অথবা; **বৃষলৈঃ**—বিধি-অমান্যকারী মাংসভুক্ যারা; **ভোক্ষ্যমাণম্**—শোষিত হতে; **আহোঃ**—যজ্ঞে; **সুর-আদীন্**—দায়িত্বসম্পন্ন দেবতাগণ; **হৃত-যজ্ঞ**—যজ্ঞ-বহির্ভূত; **ভাগান্**—অংশ; **প্রজাঃ**—জীবসত্তা; **উত**—বৃদ্ধি; **স্বিৎ**—কি না; **মঘবতি**—দুর্ভিক্ষ এবং অভাব-অনটনে; **অবর্ষতি**—অনাবৃষ্টির জন্য।

অনুবাদ

আমার তিনটি পা আমি হারিয়েছি আর আমি এখন একটি মাত্র পায়ে দাঁড়িয়ে রয়েছি। আমার এই রকম অবস্থা দেখে আপনি কি দুঃখ করছেন? কিংবা যারা বিধি-অমান্যকারী মাংসভুক্ শূদ্র, এর পর তারা আমাকে গ্রাস করবে বলে আপনি কি নিদারুণ উদ্বেগাকুল হয়েছেন? অথবা বর্তমানে কোনই যজ্ঞাদি অনুষ্ঠিত হয় না বলে দেবতাদের উদ্দেশ্যে যজ্ঞ-উৎসর্গের ভাগ অপহৃত হচ্ছে, তাই আপনি কি ব্যাকুল হয়েছেন? কিংবা দুর্ভিক্ষ এবং অনাবৃষ্টির ফলে জীবদের দুঃখ-কষ্টের কথা ভেবে আপনি কি শোকাকুল হয়েছেন?

তাৎপর্য

কলিযুগের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে আয়ু, দয়া, স্মৃতি এবং ধর্মনীতি—বিশেষ করে এই চারটি জিনিস ক্রমশ হ্রাস পেতে থাকবে। যেহেতু ধর্মনীতির তিন-চতুর্থাংশ হারে বিলুপ্তি ঘটবে, তাই প্রতীকী বৃষটি একটি মাত্র পায়ে দাঁড়িয়ে ছিল। সমগ্র বিশ্বের তিন-চতুর্থাংশ জনগণ অধার্মিক হয়ে উঠবে, তখন পরিস্থিতি রূপান্তরিত হয়ে পশুদের উপযোগী নরকের মতোই হয়ে উঠবে। কলিযুগে ভগবৎ-বিমুখ সভ্যতা নানা রকমের তথাকথিত ধর্মীয় সমাজের সৃষ্টি করবে, যার মধ্যে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে পরমপুরুষ ভগবানকে তাচ্ছিল্য করা হবে। আর তাই মানুষের গড়া ঐ সব অবিশ্বাসী সমাজ-সম্প্রদায়গুলি জনগণের সুস্থিরমনা অংশটির পক্ষে এই জগৎটাকে বসবাসের অযোগ্য করে তুলবে।

পরম পুরুষোত্তম ভগবানে যথাযথ পরিমাণে বিশ্বাস পোষণের অনুপাতে মানব জাতির বিভিন্ন শ্রেণীস্তর আছে। প্রথম শ্রেণীর ভগবৎ-বিশ্বাসী মানুষেরা হচ্ছেন বৈষ্ণবগণ আর ব্রাহ্মণগণ, তার পরে ক্ষত্রিয়েরা, তার পরে বৈশ্যেরা, এবং তার পরে শূদ্রেরা, তার পরে ম্লেচ্ছেরা, যবনেরা, এবং সব শেষে চণ্ডালেরা। মানবিক সহজাত প্রবৃত্তির অবনতির সূচনা হয় ম্লেচ্ছদের থেকে, এবং চণ্ডাল-জীবনধারা হচ্ছে মানবিক অধঃপতনের শেষ কথা।

বৈদিক সাহিত্য-সম্ভারে বর্ণিত উল্লিখিত সমস্ত পরিচয়সূত্রগুলি কোনও বিশেষ সমাজ-সম্প্রদায় কিংবা জন্মগত পরিচয়কে মোটেই বোঝাচ্ছে না। সেগুলি সামগ্রিকভাবে সাধারণ মানবজাতিরই বিভিন্ন গুণগত যোগ্যতারই পরিচয়। এখানে জন্মগত অধিকার কিংবা সমাজ-সম্প্রদায়ের কোনও প্রশ্ন নেই। মানুষ নিজের উদ্যোগ-প্রচেষ্টার মাধ্যমে যথাযথ গুণগত যোগ্যতা অর্জন করতে পারে, এবং তাই বৈষ্ণবের ছেলে ম্লেচ্ছ হয়ে যেতে পারে, কিংবা চণ্ডালের ছেলে ব্রাহ্মণের চেয়েও গুণসম্পন্ন হয়ে উঠতে পারে—সবই পরমেশ্বর ভগবানের সাথে তাদের সান্নিধ্য-সংযোগ আর অন্তরঙ্গ সম্পর্ক-সম্বন্ধের অনুপাতে সম্ভব হয়ে ওঠে।

মাংসভুকদের সাধারণত ম্লেচ্ছ বলা হয়। তবে সব মাংসভুকেরা ম্লেচ্ছ নয়। শাস্ত্রীয় অনুশাসন অনুযায়ী যারা মাংস গ্রহণ করে, তারা ম্লেচ্ছ নয়, কিন্তু যারা অবাধে মাংস খায়, তাদেরই ম্লেচ্ছ বলা হয়। শাস্ত্রাদিতে গোমাংস নিষিদ্ধ করা হয়েছে, এবং বেদশাস্ত্রের অনুসারীদের দ্বারা বৃষ ও গাভীদের বিশেষ সুরক্ষার বিধান দেওয়া হয়েছে। কিন্তু এই কলিযুগে, মানুষ যথেচ্ছভাবে বৃষ আর গাভীর দেহ গ্রাস করবে, আর তাই নানা ধরনের দুঃখ-দুর্দশা তারা ডেকে আনবে।

এই যুগের মানুষেরা কোনও যজ্ঞানুষ্ঠান করবে না। যদিও জড়জাগতিক পদ্ধতিতে ইন্দ্রিয় উপভোগে নিয়োজিত মানুষদের যজ্ঞানুষ্ঠান করা একান্ত প্রয়োজন, তবু ম্লেচ্ছ জনগণ যজ্ঞাদি অনুষ্ঠানে নামমাত্র যত্ন নেবে। *শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায়* (৩/১৪-১৬) যজ্ঞাদি অনুষ্ঠান সম্পর্কে দৃঢ়ভাবে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মার দ্বারা জীবের সৃষ্টি হয়েছে, এবং ভগবদ্ধামে প্রত্যাবর্তনের পথে ধীরে ধীরে অগ্রসর হওয়ার সময়ে জীবকে পালনের উদ্দেশ্যেই যজ্ঞানুষ্ঠানের প্রথাও তাঁর দ্বারাই সৃষ্ট হয়েছে। প্রথাটি হচ্ছে এই যে, শস্যাদি আর শাক-সবজি উৎপাদনের ওপর নির্ভর করেই জীব জীবনধারণ করে, এবং সেই ধরনের খাদ্যসামগ্রী আহার করে তারা রক্ত ও বীর্যরূপে শরীরের মূল জীবনীশক্তি পায়, আর রক্ত ও বীর্য থেকে জীবসত্তা অন্যান্য জীব সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়।

কিন্তু শস্যাদি, তৃণ ইত্যাদির উৎপাদন বৃষ্টির দ্বারাই সম্ভবপর হয়, আর এই বৃষ্টি যথাযথভাবে বর্ষণ করানো হয় নির্দিষ্ট বিধিবদ্ধ যজ্ঞাদি অনুষ্ঠানের মাধ্যমে। ঐ ধরনের যজ্ঞ সাম, যজুঃ, ঋক্, এবং অথর্ব নামে বেদশাস্ত্রাদির অনুশাসিত ধর্মাচরণ অনুযায়ী পরিচালিত হয়ে থাকে।

মনু স্মৃতি শাস্ত্রে নির্দেশিত হয়েছে যে, অগ্নিহোত্র বেদীমূলে যজ্ঞ নিবেদনের মাধ্যমে সূর্যদেবকে সন্তুষ্ট করা যায়। যখন সূর্যদেব প্রীত হন, তিনি যথাযথভাবে সমুদ্র থেকে জল সংগ্রহ করেন, এবং তাই দিগন্তে প্রভূত মেঘের সঞ্চার হয় আর বৃষ্টি পড়ে। যথেষ্ট বৃষ্টিপাতের পরে, মানুষ আর সমস্ত পশুদের জন্য যথেষ্ট পরিমাণে শস্যাদির উৎপাদন হয়, আর তাই প্রগতিমূলক কার্যকলাপের জন্য জীবসত্তার মধ্যে শক্তি জাগে।

ম্লেচ্ছরা অবশ্য অন্য নানা প্রকার জীবজন্তুর সাথে বৃষ আর গাভীদের বধ করার উদ্দেশ্যে কসাইখানা বসাবার মতলব করে, ভাবে যে, যজ্ঞাদি অনুষ্ঠান আর শস্যাদি উৎপাদনের ব্যাপারে গ্রাহ্য না করে, তারা কল-কারখানার সংখ্যা বৃদ্ধির দ্বারা এবং পশুখাদ্য ভক্ষণের মাধ্যমে জীবনধারণ করেই সমৃদ্ধি লাভ করবে। কিন্তু তাদের অবশ্যই জানা দরকার যে, এমন কি ঐ পশুদের জন্যও ঘাসপাতা আর শাকসবজি উৎপাদন তাদের নিশ্চয় করতে হবে, না হলে পশুরা বাঁচতে পারে না। আর, পশুদের জন্য ঘাসপাতা ফলাতে গেলে, তাদের চাই প্রচুর বৃষ্টি। অতএব, সূর্যদেব, ইন্দ্রদেব এবং চন্দ্রদেবের মতো দেবতাদের কৃপার ওপরে তাদের শেষ পর্যন্ত নির্ভর করতেই হয়, এবং ঐসব দেবতাদের প্রীতিসাধন করতে হয় যজ্ঞ-অনুষ্ঠানাদির মাধ্যমেই।

এই জড় জগতটি এক ধরনের কারাগার, যা আমরা বেশ কয়েকবার বলেছি। দেবতারা হচ্ছেন পরমেশ্বর ভগবানের দাস, যাঁরা কারাগারটির যথাযথ রক্ষণাবেক্ষণ করে থাকেন। ঐ দেবতাগণ দেখতে চান, যে সমস্ত বিদ্রোহী জীব ভগবানে অবিশ্বাসী হয়েই বেঁচে থাকতে চায়, তারা যেন ক্রমেই পরমেশ্বর ভগবানের পরম শক্তির পানে ধাবিত হতে পারে। সেই কারণেই, যজ্ঞাদিতে নিবেদনের প্রথাটি শাস্ত্রাদির মাধ্যমে নির্দেশিত হয়েছে।

জড়বাদী লোকেরা কঠোর পরিশ্রম করতে চায় এবং ইন্দ্রিয়তৃপ্তি উপভোগের উদ্দেশ্যে সকাম কর্মে আনন্দ পায়। তাই তারা জীবনের প্রতি পদক্ষেপেই নানা ধরনের পাপাচরণ করে চলেছে। যাঁরা অবশ্য পরমেশ্বর ভগবানের ভক্তিসেবা চর্চায় সচেতন হয়ে আত্মনিয়োগ করে থাকেন, তাঁরা সকল রকমের পাপ-পুণ্যের ঊর্ধ্বে অধিষ্ঠিত হতে পারেন। তাঁদের কার্যকলাপ জড়া প্রকৃতির ত্রৈগুণ্যদোষ থেকে মুক্ত থাকে।

ভগবদ্ভক্তদের জন্য শাস্ত্রনির্দেশিত যজ্ঞাদি উদ্‌যাপনের কোন প্রয়োজনই হয় না, কারণ ভক্তের জীবনধারাটিই যজ্ঞকাণ্ডের একটা প্রতীক স্বরূপ। কিন্তু যে সব মানুষ ইন্দ্রিয় তৃপ্তির জন্য ফলাশ্রিত কার্যকলাপে নিয়োজিত থাকে, তাদের অবশ্যই বিধিবদ্ধ যজ্ঞাদি উদ্‌যাপন করতে হয়, কারণ ফলাকাঙ্ক্ষী কর্মীদের সকল পাপাচরণের প্রতিক্রিয়া থেকে মুক্ত হওয়ার সেটাই হচ্ছে একমাত্র উপায়। ঐ ধরনের পুঞ্জীভূত পাপরাশির প্রতিকারের উপায় হল যজ্ঞানুষ্ঠান। যখন ঐ সব যজ্ঞাদি উদ্‌যাপিত হয়, তখন দেবতারা সন্তুষ্ট হন, ঠিক যেমন কারাবাসীরা যখন অনুগত প্রজা হয়ে ওঠে, তখন কারারক্ষকও প্রীতি লাভ করে থাকেন।

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু অবশ্য একমাত্র যজ্ঞ নিবেদনের নির্দেশ দিয়েছেন, যাকে বলা হয় সংকীর্তন-যজ্ঞ, হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র উচ্চারণের যজ্ঞ, যাতে প্রত্যেকেই অংশগ্রহণ করতে পারে। তাই, ভগবদ্ভক্ত এবং ফলাকাঙ্ক্ষী কর্মীরা উভয়েই সংকীর্তন-যজ্ঞ উদ্‌যাপনের মাধ্যমে সমান উপকার লাভ করতে পারেন।

শ্লোক ২১

অরক্ষ্যমাণাঃ স্ত্রিয় উর্বি বালান্
শোচস্যথো পুরুষাদৈরিবার্তান্ ।
বাচং দেবীং ব্রহ্মকুলে কুকর্মণ্য
ব্রহ্মণ্যে রাজকুলে কুলাগ্র্যান্ ॥ ২১ ॥

অরক্ষ্যমাণাঃ—অরক্ষিত; **স্ত্রিয়ঃ**—স্ত্রীলোকগণ; **উর্বি**—পৃথিবীতে; **বালান্**—শিশুগণ; **শোচসি**—করুণা অনুভব করছেন; **অথো**—তাই; **পুরুষ-আদৈঃ**—পুরুষদের দ্বারা; **ইব**—তেমনি; **আর্তান**—আর্ত-অসুখীদের; **বাচম্**—বাক্; **দেবীম্**—দেবী; **ব্রহ্মকুলে**—ব্রাহ্মণ বংশে; **কুকর্মণি**—ধর্মনীতি বিরোধী কাজে; **অব্রহ্মণ্যে**—ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতি বিরোধী মানুষেরা; **রাজকুলে**—শাসকদের বংশে; **কুল-অগ্র্যান্**—সমস্ত পরিবারবর্গের অধিকাংশ (ব্রাহ্মণগণ)।

অনুবাদ

কাণ্ডজ্ঞানবর্জিত মানুষদের দ্বারা পরিত্যক্ত অসহায় আশ্রয়হীন অসুখী স্ত্রীলোক এবং শিশুদের জন্য আপনি কি করুণা অনুভব করছেন? কিংবা ধর্মনীতি বিরোধী কার্যকলাপে মত্ত ব্রাহ্মণদের দ্বারা বাগ্‌দেবী পরিচালিত হচ্ছে বলে কি আপনি অসন্তুষ্ট হয়েছেন? অথবা যে সমস্ত শাসককুল ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতিকে মান্য করে না, ব্রাহ্মণেরা তাদেরই কাছে আশ্রয় নিয়েছে বলে আপনি কি দুঃখিত?

তাৎপর্য

কলিযুগে নারী ও শিশুরা, ব্রাহ্মণ ও গাভীদের মতোই দারুণভাবে অবহেলিত এবং অরক্ষিত অবস্থায় থাকবে। এই যুগটিতে অবৈধ নারী সংসর্গের ফলে বহু নারী ও শিশু অযত্নে থাকবে। পরিস্থিতির চাপে, স্ত্রীলোকেরা পুরুষদের রক্ষণাবেক্ষণ থেকে স্বাধীন হয়ে ওঠবার চেষ্টা করবে, এবং বিবাহ ব্যবস্থাটি পুরুষ এবং নারীর মাঝে একটা গতানুগতিক চুক্তির মতোই উদ্‌যাপিত হতে থাকবে।

অধিকাংশ ক্ষেত্রেই, শিশুদের যথাযথভাবে যত্ন নেওয়া হবে না। ব্রাহ্মণেরা ঐতিহ্যগুণে বুদ্ধিমান মানুষ, এবং তাই তাঁরা আধুনিক শিক্ষার শ্রেষ্ঠ পর্যায়ে উন্নীত হতে সক্ষম হবেন, তবে নিয়মনীতি ও ধর্মাচরণের ক্ষেত্রে, তাঁরা চরম অধঃপতিত হবেন। শিক্ষা আর অসৎ চরিত্রের সমন্বয় সম্ভব নয়, কিন্তু কলিযুগে তা যুগপৎ সংঘটিত হবে।

শাসক সম্প্রদায়ের নেতৃবৃন্দ একদল হয়ে বৈদিক জ্ঞানের অনুশাসনাদির অবজ্ঞা করবে এবং তথাকথিত একটা ধর্ম নিরপেক্ষ রাষ্ট্রপরিচালনায় বেশি আগ্রহ দেখাবে, আর ঐসব কাণ্ডজ্ঞানবর্জিত শাসকবর্গ তথাকথিত শিক্ষিত ব্রাহ্মণদের মাথা যেন কিনে রাখবে। এমন কি, ধর্মনীতি সংক্রান্ত বহু গ্রন্থের গ্রন্থকার এবং দার্শনিকরাও সরকারী শাসন যন্ত্রের মধ্যে উচ্চ পদাধিকারী হয়ে বসবেন—যে সরকার শাস্ত্রাদির সমস্ত ধর্মনীতির অনুশাসনাদি অবজ্ঞা করে থাকে। ঐ ধরনের সেবাকার্য গ্রহণে ব্রাহ্মণদের বিশেষভাবে নিষেধ করা হয়ে থাকে। কিন্তু এই যুগটিতে তাঁরা যে শুধু ঐ ধরনের সেবাকার্যে নেমে পড়বেন, তাই নয়, ঐ কাজ হীনতম পর্যায়ের কাজ হলেও তাঁরা তা গ্রহণে দ্বিধা করবেন না। এগুলি মানব সমাজের সার্বিক কল্যাণের পক্ষে অহিতকর কলিযুগের কয়েকটি লক্ষণাদি।

শ্লোক ২২

কিং ক্ষত্রবন্ধূন্ কলিনোপসৃষ্টান্
রাষ্ট্রাণি বা তৈরবরোপিতানি ।
ইতস্ততো বাশনপানবাসঃ-
স্নানব্যবায়োন্মুখজীবলোকম্ ॥ ২২ ॥

কিম্—কি; **ক্ষত্রবন্ধূন্**—অযোগ্য ক্ষত্রিয় শাসকবর্গ; **কলিনা**—কলিযুগের প্রভাবে; **উপসৃষ্টান্**—বিভ্রান্ত; **রাষ্ট্রাণি**—রাষ্ট্র পরিচালনা কাজে; **বা**—অথবা; **তৈঃ**—ঐগুলির দ্বারা; **অবরোপিতানি**—বিপর্যস্ত; **ইতঃ**—এখানে; **ততঃ**—সেখানে; **বা**—অথবা;

অশন—আহার; পান—পান করা; বাসঃ—বাস করা; স্নান—স্নান; ব্যবায়—যৌন সঙ্গম; উন্মুখ—উন্মুখ; জীবলোকম্—মানব-সমাজ।

অনুবাদ

তথাকথিত ক্ষত্রিয় শাসকবর্গ এখন এই কলিযুগের প্রভাবে বিভ্রান্ত হয়ে গেছে, আর তাই তারা সমস্ত রাষ্ট্রীয় কার্যকলাপ বিপর্যস্ত করে ফেলেছে। আপনি কি এই বিপর্যয়ের জন্য শোকাভিভূত হয়েছেন? এখন সাধারণ লোকে আহার, নিদ্রা, পান, যৌন সংসর্গ ইত্যাদি ব্যাপারে বিধিনিয়মাদি কিছুই মেনে চলে না, আর সে-সব কাজ তারা যত্রতত্র ইচ্ছামতো করে থাকে। এর জন্য আপনি কি দুঃখিত?

তাৎপর্য

জীবনের কতকগুলি প্রয়োজন আছে, যেগুলি ইতর পশুদের সম স্তরের, এবং সেগুলি হল আহার, নিদ্রা, ভয় এবং যৌন সংসর্গ বা মৈথুন। এই দৈহিক চাহিদাগুলি মানুষ আর পশু উভয়েরই আছে। তবে মানুষকে সেই আকাঙ্ক্ষাগুলি পুরণ করতে হয় পশুদের মতো নয়, মানুষের মতো। একটা কুকুর বিনা দ্বিধায় লোকচক্ষুর সামনেই একটা কুকুরীর সাথে মৈথুন করতে পারে, কিন্তু যদি একটা মানুষ তেমনি করে, তবে সেই কাজ একটা সামাজিক নোংরা কাজ বলেই মনে করা হয়, এবং লোকটিকে দণ্ডনীয় অপরাধে অভিযুক্ত করাও হবে। তা হলে মানুষের ক্ষেত্রে সাধারণ চাহিদাগুলি পূরণের জন্যও কিছু বিধিনিয়ম রয়েছে।

মানব সমাজ যখন কলিযুগের প্রভাবে বিভ্রান্ত হয়, তখন এই ধরনের বিধিনিয়মাদি লঙ্ঘন করতে থাকে। এই যুগে, বিধিনিয়মাদি না মেনেই লোকে জীবনের ঐসব প্রয়োজনগুলিকে প্রশ্রয় দিচ্ছে, আর সামাজিক ও নৈতিক নিয়মাদির এই অধঃপতন অবশ্যই দুঃখজনক, কারণ ঐ ধরনের পশুসুলভ আচরণের অহিতকর পরিণাম ঘটে।

এই যুগে, পিতা এবং অভিভাবকেরা তাঁদের সন্তানদের আচরণে সুখী নন। তাঁদের জানা দরকার যে, কলিযুগের প্রভাব থেকে লব্ধ কুসঙ্গের শিকার হচ্ছে কত নিরীহ শিশু। শ্রীমদ্ভাগবত গ্রন্থ থেকে আমরা জানতে পারি যে, এক ব্রাহ্মণের নিরীহ এক শিশুপুত্র অজামিল পথ দিয়ে যাচ্ছিল এবং দেখতে পায় এক শূদ্র-যুগল যৌন আলিঙ্গনাবদ্ধ হয়ে রয়েছে। এই ব্যাপারটি ছেলেটিকে আকৃষ্ট করেছিল, এবং পরে ছেলেটি সকল রকমের ব্যভিচারিতার শিকার হয়ে পড়ে। এক শুদ্ধ ব্রাহ্মণ থেকে সে অধঃপতিত হয় অর্বাচীন চপলমতি এক তরুণের পর্যায়ে, আর এই সবই ঘটেছিল কুসঙ্গের প্রভাবে।

তখনকার দিনে অজামিলের মতো কুসঙ্গের শিকার একজন মাত্রই হয়েছিল, কিন্তু এই কলিযুগে নিরীহ বেচারী ছাত্রছাত্রীদের কতজনেই তো সিনেমার শিকার হচ্ছে প্রতিদিন, যে-সিনেমা মানুষকে আকর্ষণ করে শুধুই যৌনতাকে চরিতার্থ করার জন্য।

তথাকথিত শাসকবর্গ ক্ষত্রিয়েরা সবাই ক্ষত্রিয়ের উপযোগী কার্যকলাপে একেবারেই শিক্ষাদীক্ষাহীন। ক্ষত্রিয়দের কাজ শাসন-প্রশাসন, আর তেমনই ব্রাহ্মণদের কাজ হল জ্ঞানচর্চা আর মানুষকে পথনির্দেশ দান করা। 'ক্ষত্রবন্ধু' কথাটি দিয়ে বোঝানো হচ্ছে তথাকথিত শাসকবর্গ বা সেই সব লোকেদের, যারা কোনও সংস্কৃতি এবং ঐতিহ্যের মাধ্যমে যথার্থ সুশিক্ষা গ্রহণ না করেই শাসকের পদমর্যাদায় উন্নীত হয়ে বসেছে। আজকাল তারা ঐ ধরনের উচ্চপদে অধিষ্ঠিত হচ্ছে জনগণের ভোটের জোরে, আর সেই জনগণ নিজেরাই জীবনের বিধিনিয়ম থেকে অধঃপতিত হয়ে পড়েছে। ঐ জনগণ যখন নিজেরাই জীবনের নির্ধারিত মান থেকে অধঃপতিত হয়ে পড়েছে, তবে তারা কেমন করে যথার্থ লোক নির্বাচন করতে পারে?

অতএব, কলিযুগের প্রভাবে, সর্বত্রই, রাজনৈতিক, সামাজিক, বা ধর্ম সংক্রান্ত প্রতিটি ব্যাপারেই সব বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে, আর তাই সুস্থির প্রকৃতির মানুষের কাছে এই সবই পরম দুঃখজনক ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে।

শ্লোক ২৩

যদ্বাম্ব তে ভূরিভরাবতার-
কৃতাবতারস্য হরেধরিত্রি ।
অন্তর্হিতস্য স্মরতী বিসৃষ্টা
কর্মাণি নির্বাণবিলম্বিতানি ॥ ২৩ ॥

যদ্বা—হতে পারে; **অম্ব**—হে মাতঃ; **তে**—আপনার; **ভূরি**—প্রভূত; **ভর**—ভার; **অবতার**—ভার কমানো; **কৃত**—করা; **অবতারস্য**—যিনি অবতার হয়েছেন; **হরেঃ**—পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের; **ধরিত্রি**—হে পৃথিবী; **অন্তঃ হিতস্য**—যিনি এখন অন্তর্হিত; **স্মরতি**—তাঁর চিন্তায়; **বিসৃষ্টা**—যা কিছু সাধিত হয়েছিল; **কর্মাণি**—কার্যকলাপ; **নির্বাণ**—মোক্ষ; **বিলম্বিতানি**—যা ঘটে থাকে।

অনুবাদ

হে ধরিত্রী মাতা, পরম পুরুষোত্তম ভগবান শ্রীহরি স্বয়ং পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণরূপে অবতারত্ব গ্রহণ করেছিলেন কেবলই আপনার প্রভূত ভার লাঘবের

জন্য। এখানে তাঁর সকল লীলা সম্পাদনই অপ্রাকৃত, আর সেগুলি মোক্ষলাভের পথ সুদৃঢ় করে তোলে। এখন তিনি অন্তর্হিত হয়েছেন বলে আপনি নিশ্চয়ই তাঁর লীলাকথা স্মরণ করছেন এবং মনে হয় সেগুলির অভাবে শোকাকুলা হচ্ছেন।

তাৎপর্য

পরমেশ্বর ভগবানের কার্যকলাপের মধ্যে মোক্ষদান বিষয়ক লীলাও থাকে, তবে নির্বাণ বা মোক্ষ বিষয়ক কার্যকলাপের চেয়ে অন্যান্য লীলা থেকেই বেশি আনন্দ আস্বাদন করা যায়। শ্রীল জীব গোস্বামী এবং শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুরের মতে, এখানে যে *'নির্বাণ-বিলম্বিতানি'* শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে, তার অর্থ যা মোক্ষলাভের মূল্য মর্যাদা হ্রাস করে। *'নির্বাণ'* লাভ করতে হলে কঠোর তপস্যা করতে হয়। কিন্তু পরমেশ্বর ভগবান এতই কৃপাময় যে, তিনি ভূ-ভার হরণ করার উদ্দেশ্যে অবতারত্ব গ্রহণ করেন।

কেবলমাত্র এই সব কার্যকলাপ স্মরণ করার মাধ্যমেই, মানুষ 'নির্বাণ' থেকে অর্জিত আনন্দ তৃপ্তি তাচ্ছিল্য করে, পরমেশ্বর ভগবানের অপ্রাকৃত পরমধামে উপনীত হয়ে, ভগবানের প্রেমানন্দময় ভক্তি সেবা চর্চায় নিত্যকাল ধরে নিয়োজিত থেকে তাঁর সান্নিধ্যসুখ লাভ করতে পারে।

শ্লোক ২৪

ইদং মমাচক্ষ্ব তবাধিমূলং
বসুন্ধরে যেন বিকর্শিতাসি ।
কালেন বা তে বলিনাং বলীয়সা
সুরার্চিতং কিং হৃতমম্ব সৌভগম্ ॥ ২৪ ॥

ইদম্—এই; **মম**—আমার কাছে; **আচক্ষ্ব**—দয়া করে বলুন; **তব**—আপনার; **আধিমূলম্**—আপনার মনস্তাপের মূল কারণ; **বসুন্ধরে**—হে বসুন্ধরা; সকল ঐশ্বর্যের আধার; **যেন**—যার দ্বারা; **বিকর্শিতা অসি**—দুঃখ ক্লেশে জর্জরিত; **কালেন**—কালক্রমে; **বা**—অথবা; **তে**—আপনার; **বলিনাম্**—অতি বলিষ্ঠ; **বলীয়সা**—অতি বলবান; **সুর-অর্চিতম্**—দেবতাদের দ্বারা পূজিত; **কিম্**—কি; **হৃতম্**—অপহৃত; **অম্ব**—মাতা; **সৌভগম্**—সৌভাগ্য।

অনুবাদ

হে মাতা বসুন্ধরা, সকল ঐশ্বর্যের আপনি আধার। অনুগ্রহ করে আপনার মনস্তাপের মূল কারণ আমাকে বলুন, যার ফলে আপনি দুঃখ ক্লেশে জর্জরিত হয়ে এমন দুর্বল ক্ষীণতনু হয়েছেন। আমার মনে হয়, কালের দারুণ প্রভাব যা অতি বলিষ্ঠকেও পরাভূত করে, তার দ্বারাই আপনার সমগ্র সৌভাগ্য অপহৃত হয়েছে, যে-সৌভাগ্য দেবতাদের দ্বারাও বন্দিত হত।

তাৎপর্য

পরমেশ্বর ভগবানের করুণায়, এক-একটি গ্রহের প্রত্যেকটি সম্পূর্ণ সম্যক্‌ভাবে সুসজ্জিত হয়েই সৃষ্ট হয়েছে। তাই কেবলমাত্র এই পৃথিবীর অধিবাসীদের প্রতিপালনের উদ্দেশ্যেই এই গ্রহটি আগাগোড়া সাজানো হয়েছে, তা নয়—পরমেশ্বর ভগবান যখন পৃথিবীতে অবতরণ করেন, তখন সমগ্র পৃথিবী এমনই সকল ঐশ্বর্যে মণ্ডিত হয়ে ওঠে যে, স্বর্গলোকের অধিবাসী দেবতারাও সম্পূর্ণ প্রীতিভরে তাঁর প্রতি শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন করেন।

কিন্তু পরমেশ্বর ভগবানের কৃপায় সমগ্র পৃথিবীকে মুহূর্তের মধ্যে বদলে ফেলা যেতে পারে। তাঁর অভিলাষ অনুসারে কোনও জিনিস তিনি গড়তে পারেন, তিনি ভাঙতেও পারেন। সুতরাং নিজেকে পরমেশ্বর ভগবানের অধীনতার ঊর্ধ্বে অধিষ্ঠিত স্বতন্ত্র এবং স্বনির্ভর সত্তা বলে মনে না করাই উচিত।

শ্লোক ২৫

ধরণ্যুবাচ

ভবান্ হি বেদ তৎ সর্বং যন্মাং ধর্মানুপৃচ্ছসি ।
চতুর্ভির্বর্তসে যেন পাদৈর্লোকসুখাবহৈঃ ॥ ২৫ ॥

ধরণী উবাচ—পৃথিবী মাতা বললেন; **ভবান্**—আপনি; **হি**—অবশ্যই; **বেদ**—জানেন; **তৎ সর্বম্**—আমার কাছে যা কিছু জানতে চেয়েছেন; **যৎ**—যা; **মাম্**—আমার কাছে; **ধর্ম**—হে ধর্মনীতির পরম পুরুষ; **অনুপৃচ্ছসি**—আপনি একে একে জানতে চেয়েছেন; **চতুর্ভিঃ**—চারটি দ্বারা; **বর্তসে**—আপনি আছেন; **যেন**—যার দ্বারা; **পাদৈঃ**—পায়ের দ্বারা; **লোক**—একে একে প্রতিটি গ্রহলোকে; **সুখ-আবহৈঃ**—সুখ বৃদ্ধিকারক।

অনুবাদ

ধরিত্রী (গাভী রূপী) তাই ধর্মরাজকে (বৃষ রূপ) উত্তর দিলেন, হে ধর্মরাজ, আমার কাছে যা কিছু জানতে চেয়েছেন, সবই আপনি নিশ্চয়ই জানেন। ঐ সমস্ত প্রশ্নেরই আমি উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করব। একদা আপনিও চারটি পদের ওপরে অধিষ্ঠিত ছিলেন এবং পরমেশ্বর ভগবানের কৃপায় সারা বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের সুখ বর্ধন করেছিলেন।

তাৎপর্য

ধর্মনীতি স্বয়ং পরমেশ্বর ভগবানই নির্ধারিত করেছেন, এবং সেই বিধিনিয়মগুলিকে কার্যকর করেন ধর্মরাজ, অর্থাৎ যমরাজ। ঐসব বিধিনিয়মাদি সত্যযুগেই পরিপূর্ণভাবে কার্যকরী হয়ে থাকে, ত্রেতাযুগে সেগুলির কার্যকারিতা এক-চতুর্থাংশ হ্রাস পেয়ে যায়, দ্বাপর যুগে সেগুলি অর্ধেক অংশ কমে যায়, এবং কলিযুগে সেগুলি এক-চতুর্থাংশ মাত্র এসে দাঁড়ায়, ক্রমশ হ্রাস পেতে পেতে শূন্য হয়ে যায়, আর তখন প্রলয় নেমে আসে।

পৃথিবীতে সুখ-সমৃদ্ধি নির্ভর করে আনুপাতিকভাবে ধর্মনীতিগুলি সংরক্ষণেরই ওপরে, ব্যক্তিগত বা সমষ্টিগত দুই উপায়েই। সকল রকমের বিরূপতার মাঝেও ঐসব বিধিনিয়মাদি রক্ষা করার মধ্যেই মানুষের উত্তম সাহসিকতার পরিচয় পাওয়া যায়। তাতেই মানুষ সারা জীবন সুখী হয়ে থেকে, অবশেষে ভগবানের কাছে ফিরে যেতে পারে।

শ্লোক ২৬-৩০

সত্যং শৌচং দয়া ক্ষান্তিস্ত্যাগঃ সন্তোষ আর্জবম্ ।
শমোদমস্তপঃ সাম্যং তিতিক্ষোপরতিঃ শ্রুতম্ ॥ ২৬ ॥
জ্ঞানং বিরক্তিরৈশ্বর্যং শৌর্যং তেজো বলং স্মৃতিঃ ।
স্বাতন্ত্র্যং কৌশলং কান্তির্ধৈর্যং মার্দবমেব চ ॥ ২৭ ॥
প্রাগল্‌ভ্যং প্রশ্রয়ঃ শীলং সহ ওজো বলং ভগঃ ।
গাম্ভীর্যং স্থৈর্যমাস্তিক্যং কীর্তির্মানোঽনহঙ্কৃতিঃ ॥ ২৮ ॥
এতে চান্যে চ ভগবন্ নিত্যা যত্র মহাগুণাঃ ।
প্রার্থ্যা মহত্ত্বমিচ্ছদ্ভির্ন বিয়ন্তি স্ম কর্হিচিৎ ॥ ২৯ ॥

তেনাহং গুণপাত্রেণ শ্রীনিবাসেন সাম্প্রতম্ ।
শোচামি রহিতং লোকং পাপ্মনা কলিনেক্ষিতম্ ॥ ৩০ ॥

সত্যম্—যথার্থ ভাষণ; **শৌচম্**—শুদ্ধতা; **দয়া**—পরের দুঃখে অসহনীয়তা; **ক্ষান্তিঃ**—ক্রোধের কারণ ঘটলেও চিত্তের সংযম; **ত্যাগঃ**—মুক্ত হস্তে দান-দাক্ষিণ্য; **সন্তোষঃ**—অল্পেই তৃপ্তি; **আর্জবম্**—ঋজুতা; **শমঃ**—মনঃসংযোগ; **দমঃ**—বাহ্যেন্দ্রিয়াদি সংযম; **তপঃ**—স্বধর্ম প্রতিপালনে দায়িত্বজ্ঞান; **সাম্যম্**—শত্রু-মিত্রে ভেদাভেদ হীনতা; **তিতিক্ষা**—অন্যের অপরাধের সহনশীলতা; **উপরতিঃ**—লাভ-ক্ষতি বিষয়ে উদাসীনতা; **শ্রুতম্**—শাস্ত্রবিচার ও শাস্ত্রীয় অনুশাসনাদি অনুধাবন; **জ্ঞানম্**—জ্ঞান (আত্ম-উপলব্ধি); **বিরক্তিঃ**—ইন্দ্রিয় উপভোগে বিতৃষ্ণা; **ঐশ্বর্যম্**—নিয়ন্ত্রণক্ষমতা (নেতৃত্ব); **শৌর্যম্**—সংগ্রামে উৎসাহ; **তেজঃ**—প্রভাব; **বলম্**—অসম্ভবকে সম্ভব করবার দক্ষতা; **স্মৃতিঃ**—যথাযথভাবে কর্তব্য-অকর্তব্যের যথার্থতা অনুসন্ধান; **স্বাতন্ত্র্যম্**—পরাধীন না হয়ে থাকা; **কৌশলম্**—সকল কাজকর্মে ক্রিয়ানিপুণতা; **কান্তিঃ**—সৌন্দর্য; **ধৈর্যম্**—ব্যাকুলতা থেকে মুক্তি; **মার্দবম্**—চিত্তের নমনীয়তা; **এব**—তাই; **চ**—ও; **প্রাগল্‌ভ্যম্**—প্রতিভার আতিশয্য; **প্রশ্রয়ঃ**—বিনয়; **শীলম্**—ভদ্র স্বভাব; **সহঃ**—দৃঢ় প্রতিজ্ঞা; **ওজঃ**—যথার্থ জ্ঞান; **বলম্**—কর্মপটুতা; **ভগ**—উপভোগের বিষয়বস্তু; **গাম্ভীর্যম্**—উৎফুল্লতা; **স্থৈর্যম্**—অচঞ্চলতা; **আস্তিক্যম্**—বিশ্বস্ততা; **কীর্তিঃ**—যশ; **মানঃ**—মাননীয়তা; **অনহঙ্কৃতঃ**—গর্বশূন্য; **এতে**—এই সকল; **চ অন্যে**—এবং অন্যান্য আরও; **চ**—এবং; **ভগবন্**—পুরুষোত্তম ভগবান; **নিত্যাঃ**—নিত্যকাল স্থায়ী; **যত্র**—যেখানে; **মহাগুণাঃ**—মহৎ গুণাবলী; **প্রার্থ্যাঃ**—প্রার্থনীয়; **মহত্ত্বম্**—মহত্ত্ব; **ইচ্ছদ্ভিঃ**—যাঁরা তা ইচ্ছা করেন; **ন**—কখনই না; **বিয়ন্তি**—ক্ষীণ হয়ে আসে; **স্ম**—কখনও; **কর্হিচিৎ**—কোনও সময়ে; **তেন**—তাঁর দ্বারা; **অহম্**—আমি; **গুণপাত্রেণ**—সর্ব গুণবৈশিষ্ট্যের আধার; **শ্রী**—ঐশ্বর্য সম্পদের দেবী লক্ষ্মী; **নিবাসেন**—নিবাসস্থলে; **সাম্প্রতম্**—অতি সম্প্রতিকালে; **শোচামি**—আমি চিন্তা করছি; **রহিতম্**—বিরহিত; **লোকম্**—গ্রহলোকসমূহ; **পাপ্মনা**—সকল পাপাচরণের ভাণ্ডার; **কলিনা**—কলির দ্বারা; **ঈক্ষিতম্**—দৃষ্টিপাতে।

অনুবাদ

তাঁর মধ্যে অধিষ্ঠিত রয়েছে (১) সত্যবাদিতা, (২) শুচিতা, (৩) অন্যের দুঃখে অসহনীয়তা, (৪) ক্রোধ সংযমের ক্ষমতা, (৫) অল্পে তুষ্টি, (৬) ঋজুতা, (৭) মনের অচঞ্চলতা, (৮) বাহ্যেন্দ্রিয়াদির সংযম, (৯) কর্তব্য-অকর্তব্যের দায়িত্বজ্ঞান,

(১০) সাম্যভাব, (১১) সহনশীলতা, (১২) শত্রুমিত্র ভেদাভেদ-শূন্যতা, (১৩) বিশ্বস্ততা, (১৪) জ্ঞান, (১৫) ইন্দ্রিয় তৃপ্তিতে বিতৃষ্ণা, (১৬) নেতৃত্ব, (১৭) শৌর্য, (১৮) প্রভাব, (১৯) সব কিছু সম্ভব করার ক্ষমতা, (২০) যথাযথভাবে দায়িত্ব-কর্তব্য পালনের দক্ষতা, (২১) সম্পূর্ণ স্বতন্ত্রতা (পরাধীনতাশূন্য), (২২) কর্মকুশলতা, (২৩) সম্যক্ সৌন্দর্যের সম্পূর্ণতা, (২৪) উদ্বেগহীন ধৈর্য, (২৫) মৃদুতা, (২৬) অভিনবত্ব, (২৭) ভদ্রস্বভাব, (২৮) মুক্ত হস্তে দান-দাক্ষিণ্য, (২৯) দৃঢ় প্রতিজ্ঞা, (৩০) সকল জ্ঞানের পরিশুদ্ধি, (৩১) যথার্থ কর্ম প্রয়াস, (৩২) সকল ভোগ্যবস্তুতে অধিকার, (৩৩) উৎফুল্লতা, (৩৪) স্থৈর্য, (৩৫) নির্ভরযোগ্যতা, (৩৬) যশ, (৩৭) মাননীয়তা, (৩৮) গর্বশূন্যতা, (৩৯) ভগবত্তা, (৪০) নিত্যতা, এবং অন্যান্য আরও অনেক অপ্রাকৃত গুণবৈশিষ্ট্যাদি যা নিত্য বিরাজমান ও যেগুলি কখনই তাঁর থেকে বিচ্ছিন্ন করা যায় না। সকল সাত্ত্বিকতা এবং সৌন্দর্যের আধার পুরুষোত্তম ভগবান পরমেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ এই পৃথিবীর বুকে এখন তাঁর অপ্রাকৃত লীলা সংবরণ করেছেন। তাঁর অপ্রকটকালে, কলিযুগ সর্বত্র তার প্রভাব বিস্তার করেছে, তাই আমি এই পরিস্থিতি লক্ষ্য করে দুঃখিত হচ্ছি।

তাৎপর্য

পৃথিবীকে চূর্ণবিচূর্ণ করে ধুলায় পরিণত করার পরে ধূলিকণার অণু-পরমাণুগুলিকে গণনা করা যদিও-বা সম্ভব হয়, তবু পরমেশ্বর ভগবানের অতলান্ত অপ্রাকৃত গুণবৈশিষ্ট্যরাজির অনুমান করা সম্ভবপর নয়। বলা হয় যে, অনন্তদেব নাগ তাঁর অগণিত জিহ্বার সাহায্যে পরমেশ্বর ভগবানের অপ্রাকৃত গুণবৈশিষ্ট্যরাজি ব্যাখ্যা করবার প্রয়াস নিয়েছেন, এবং তাতেও একাদিক্রমে অগণিত বর্ষব্যাপী পরমেশ্বরের গুণবৈশিষ্ট্যাদির সম্যক্ পরিমাপ করা তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়নি।

পরমেশ্বর ভগবানের গুণরাজির উপরোক্ত বিবৃতিটি থেকে কেবলমাত্র অনুমান করা যায় যে, কোনও মানুষ তাঁকে কতটুকুই বা দেখতে বুঝতে পারে। তা হলেও উপরোক্ত গুণরাজিকে অনেকগুলি উপশিরোনামে শ্রেণীবিভক্ত করা চলে। শ্রীল জীব গোস্বামীর মতে, তৃতীয় গুণবৈশিষ্ট্যটি, অর্থাৎ অন্যের দুঃখে অসহনীয়তা,—গুণটিকে নিম্নোক্তভাবে উপবিভক্ত করা যায় ঃ

(১) আত্মসমর্পিত জীবাত্মার সুরক্ষা, এবং (২) ভগবদ্ভক্তজনের কল্যাণ কামনা।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় পরমেশ্বর ভগবান বলেছেন, তিনি চান প্রতিটি জীবাত্মা শুধুমাত্র তাঁর কাছেই আত্মসমর্পণ করুক, এবং তিনি প্রত্যেককেই প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন যে, যদি কেউ তা করে, তা হলে তার সকল পাপাচরণ থেকে তাঁকে তিনিই রক্ষা করবেন।

ভগবানের কাছে আত্মসমর্পিত নয় যারা, তারা ভগবদ্ভক্তও নয়, এবং সেই হেতুই সর্বসাধারণের মধ্যে প্রত্যেকের জন্য বিশেষ সুরক্ষার কোনই ব্যবস্থা থাকে না। ভগবদ্ভক্তজনের জন্য ভগবানের সকল শুভেচ্ছা বর্ষিত হয়, আর যাঁরা বাস্তবিকই পরমেশ্বর ভগবানের প্রেমময়ী ভক্তিসেবা চর্চায় নিয়োজিত থাকেন, তিনি তাঁদের প্রতি বিশেষ মনোযোগ আরোপ করে থাকেন। ভগবদ্ধামে প্রত্যাবর্তনের পথে শুদ্ধ ভক্তদের দায়িত্ব-কর্তব্যাদি সুসম্পন্ন করার জন্য তিনি তাদের পথনির্দেশ করে থাকেন।

সাম্যভাব (১০) দ্বারা বোঝায় যে, পরমেশ্বর ভগবান সকলের প্রতি সমভাবে কৃপাময়, ঠিক যেমন সূর্য প্রত্যেকের ওপরেই সমানভাবে তার কিরণ বর্ষণ করে চলেছে। তবু অনেকেই আছে যারা সূর্যকিরণের সুযোগ-সুবিধা গ্রহণে অক্ষম। তেমনই, পরমেশ্বর ভগবান বলেছেন যে, তাঁর প্রতি আত্মসমর্পণের মাধ্যমেই তাঁর কাছ থেকে পরিপূর্ণ সুরক্ষার নিশ্চিন্ততা লাভ করা যায়, কিন্তু হতভাগ্য মানুষেরা এই সুব্যবস্থার সুযোগ গ্রহণ করতে অক্ষম, এবং তাই তারা সকল রকমের জড়জাগতিক দুঃখ-দুর্দশা থেকে কষ্টভোগ করে।

সুতরাং যদিও পরমেশ্বর ভগবান প্রত্যেকেরই প্রতি সমভাবে কল্যাণময়, তবু হতভাগ্য জীবেরা কুসংসর্গ দোষে তাঁর নির্দেশ যথাযথভাবে গ্রহণ করতে অক্ষম হয় এবং এর জন্য পরমেশ্বর ভগবানকে কখনই দোষারোপ করা চলে না। তাঁকে কেবল ভক্তজনের হিতাকাঙ্ক্ষী বলা হয়ে থাকে। তাঁকে মনে হয় তাঁর ভক্তজনের প্রতি পক্ষপাতপূর্ণ, কিন্তু বাস্তবিকপক্ষে পরমেশ্বর ভগবানের সমভাবাপন্ন মনোযোগ গ্রহণ করা বা বর্জন করা জীবসত্তার অভিরুচির ওপরেই নির্ভর করে থাকে।

পরমেশ্বর ভগবান কখনই তাঁর প্রতিশ্রুতির মর্যাদা থেকে বিচ্যুত হন না। তিনি যখন সুরক্ষার আশ্বাস দেন, তখন সেই প্রতিশ্রুতি সমস্ত পরিস্থিতিতেই কার্যকর হয়ে থাকে।

শুদ্ধ ভক্তের কর্তব্য হল ভগবান অথবা ভগবানের যথার্থ প্রতিনিধি গুরুদেব প্রদত্ত নির্দেশ পালনে স্থির হওয়া। পরমেশ্বর ভগবান কিংবা পরমেশ্বর ভগবানের যথার্থ প্রতিনিধি যিনি পারমার্থিক দীক্ষাগুরু শুদ্ধ ভক্তের ওপরে যে কর্তব্য পালনের দায়িত্ব দিয়ে থাকেন, তা সুসম্পন্ন করাই শুদ্ধ ভগবদ্ভক্তের কাজ। বাকিটা পরমেশ্বর ভগবানের দ্বারাই নির্বিঘ্নে সুসম্পন্ন হয়ে থাকে।

পরমেশ্বর ভগবানের দায়দায়িত্বও অতুলনীয়। ভগবানের কোনই দায়দায়িত্ব নেই যেহেতু তাঁর সকল কাজই তাঁর বিভিন্ন কর্মরত শক্তিরাজির দ্বারাই সাধিত হয়ে থাকে। কিন্তু তবুও তিনি তাঁর অপ্রাকৃত লীলা-অভিনয়াদির বিভিন্ন ভূমিকা

উপস্থাপনের ক্ষেত্রে স্বতঃস্ফূর্তভাবে কিছু দায়দায়িত্ব গ্রহণ করে থাকেন। বালকরূপে তিনি গোপবালকের ভূমিকায় লীলা করছিলেন। নন্দ মহারাজের পুত্র হয়ে, তিনি যথাযথভাবে সব কর্তব্য পালন করতেন। সেই ভাবেই, যখন তিনি মহারাজা বসুদেবের পুত্ররূপে এক ক্ষত্রিয়ের ভূমিকায় লীলা প্রদর্শন করছিলেন, তখন তিনি রণকৌশলে উদ্দীপ্ত ক্ষত্রিয়ের সমস্ত দক্ষতাই দেখিয়েছিলেন। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই, ক্ষত্রিয় রাজাকে যুদ্ধ বা অপহরণ করে স্ত্রীলাভ করতে হত। কোনও ক্ষত্রিয়ের পক্ষে এই ধরনের আচরণ প্রশংসাযোগ্য, যেহেতু ক্ষত্রিয়মাত্রই অবশ্যই তার ভাবী স্ত্রীকে তার নিজের শৌর্যের পরিচয় দেবে যাতে কোনও ক্ষত্রিয়ের কন্যা দেখতে পায় যে, তার ভাবী-পতি কতখানি শৌর্যবীর্যসম্পন্ন।

পুরুষোত্তম ভগবান শ্রীরামচন্দ্রও তাঁর বিবাহের সময় এই ধরনের শৌর্যভাবের প্রদর্শন করেছিলেন। তিনি সর্বাপেক্ষা কঠিন হরধনু ভঙ্গ করেন এবং সর্ব ঐশ্বর্যের জননী সীতাদেবীর পাণিগ্রহণ করেন।

ক্ষত্রিয় তেজস্বিতার অভিপ্রকাশ হতে দেখা যায় বিবাহ উৎসবাদির মধ্যে, এবং ঐ ধরনের সংগ্রামের মধ্যে খারাপ কিছুই নেই। পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ঐ ধরনের কর্তব্যভার পালন করেছিলেন সম্যক্‌ভাবে, কারণ তাঁর যদিও ষোল সহস্রেরও বেশি স্ত্রী ছিলেন, তবু প্রত্যেকটি ক্ষেত্রেই তিনি শৌর্যবান ক্ষত্রিয়ের মতোই লড়াই করে স্ত্রী লাভ করেন। ষোল হাজার স্ত্রীলাভ করার জন্য ষোল হাজার বার সংগ্রাম করা একমাত্র পরম পুরুষোত্তম ভগবান শ্রীকৃষ্ণের পক্ষেই সম্ভবপর। তাঁর বিভিন্ন অপ্রাকৃত লীলার প্রতিটি কাজের মধ্যেই তিনি এইভাবেই সম্যক্‌ দায়িত্ব-সচেতনতার স্বাক্ষর রেখেছেন।

চতুর্দশতম গুণবৈশিষ্ট্য যে জ্ঞান, তাকে আবার পঞ্চবিধ উপবিভাগে বিভক্ত করা যেতে পারে, যথা—(১) বুদ্ধিমত্তা, (২) কৃতজ্ঞতা, (৩) দেশ, কাল, পাত্রভেদে পরিস্থিতির বিচার বিচক্ষণতা, (৪) সর্ব বিষয়ে সম্যক্‌ জ্ঞান, এবং (৫) আত্মজ্ঞান। শুধু নির্বোধ মূর্খেরাই তাদের হিতৈষীদের প্রতি অকৃতজ্ঞ হয়ে থাকে। অবশ্য ভগবান স্বয়ংসম্পূর্ণ হওয়ার ফলে তাঁর স্বীয় অস্তিত্ব ব্যতীত আর কারও কাছ থেকে কোন কিছু লাভের প্রত্যাশা করেন না, তবু তাঁর অনন্য ভক্ত যখন তাঁর সেবা করেন, তখন তিনি উপকৃত বোধ করেন। ভগবান তাঁর ভক্তের সরল অহৈতুকী নিঃশর্ত ভক্তির জন্য তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা অনুভব করেন এবং তার সেবা করে প্রতিদান দেওয়ার চেষ্টা করেন, যদিও ভক্তের হৃদয়েও এই প্রকার কোন রকম প্রতিদানের প্রত্যাশা থাকে না। ভক্তের কাছে ভগবানের অপ্রাকৃত সেবাই তাঁর অপ্রাকৃত লাভ এবং তাই ভগবানের কাছ থেকে আর কোন কিছুই ভক্তের প্রত্যাশা করার থাকে

না। বৈদিক সূত্র *সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম* থেকে জানা যায় যে, জড় আকাশ যেমন জড় জগতের সর্বত্র অবস্থিত, ভগবানের দেহনির্গত রশ্মিচ্ছটা ব্রহ্মজ্যোতিও তেমনই সব কিছুরই অন্তরে এবং বাহিরে পরিব্যাপ্ত এবং তাই তিনি সর্বজ্ঞ।

ভগবানের সৌন্দর্যের এমন কতকগুলি অসামান্য বৈশিষ্ট্য রয়েছে যা তাঁকে অন্য সমস্ত জীব থেকে স্বতন্ত্র রাখে, এবং সর্বোপরি তাঁর সৌন্দর্যের এমন কতকগুলি অসাধারণ আকর্ষণীয় বৈশিষ্ট্য রয়েছে যা ভগবানের অনন্য সুন্দর সৃষ্টি শ্রীমতী রাধারানীরও চিত্ত আকর্ষণ করে। এই জন্য তাঁর আর এক নাম মদনমোহন, অর্থাৎ যিনি কামদেব মদনের মনকেও মোহিত করেন।

শ্রীল জীব গোস্বামী পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে শ্রীভগবানের অন্যান্য অপ্রাকৃত গুণাবলীর বিশ্লেষণ করেছেন এবং তিনি প্রতিপন্ন করেছেন যে, শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন সম্যক্ পরম পুরুষোত্তম ভগবান (পরব্রহ্ম)। তাঁর অচিন্ত্য শক্তির প্রভাবে তিনি সর্বশক্তিমান, এবং তাই তিনি যোগেশ্বর অর্থাৎ সকল যোগশক্তির পরম প্রভু। তাঁর নিত্য শাশ্বত রূপ সৎ, চিৎ এবং আনন্দময়। অভক্ত শ্রেণীর লোকেরা তাঁর চিন্ময় জ্ঞানের অসামান্য গতিষ্ণু প্রকৃতি হৃদয়ঙ্গম করতে পারে না, কারণ তারা তাঁর নিত্য জ্ঞানময় রূপ পর্যন্ত পৌঁছেই সন্তুষ্ট হয়ে যায়। সমস্ত মহাত্মারাই তাঁর সমপর্যায়ের জ্ঞান লাভের আকাঙ্ক্ষা করেন। তার অর্থ হচ্ছে এছাড়া আর সমস্ত জ্ঞানই নিত্য অসম্পূর্ণ, পরিবর্তনসাপেক্ষ এবং পরিমাপযোগ্য, সে-ক্ষেত্রে, ভগবৎ-তত্ত্বজ্ঞান নিত্য দৃঢ়বদ্ধ এবং অতলান্ত।

শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীল সূত গোস্বামী প্রতিপন্ন করেছেন যে, দ্বারকার অধিবাসীরা যদিও তাঁকে প্রতিদিন দর্শন করতেন, কিন্তু তা সত্ত্বেও তাঁরা বারবার তাঁকে দেখার জন্য আকুল হয়ে থাকতেন। জীবেরা পরমেশ্বর ভগবানের গুণাবলী তাদের জীবনের চরম লক্ষ্য বলে উপলব্ধি করতে পারে, কিন্তু তারা কখনও তাঁর সমপর্যায়ভুক্ত হতে পারে না। এই জড় জগৎ মহত্তত্ত্ব থেকে প্রকাশিত, যা কারণ-সমুদ্রে শায়িত যোগনিদ্রায় নিদ্রিত ভগবানের স্বপ্নসদৃশ, কিন্তু তা সত্ত্বেও সমগ্র সৃষ্টি বাস্তব বলে প্রতিভাত হয়। অর্থাৎ ভগবানের স্বপ্নও বাস্তবতার অভিব্যক্তি তাই সব কিছুই তাঁর অপ্রাকৃত নিয়ন্ত্রণের অধীন, এবং তাই যখনই যেখানে তিনি প্রকাশিত হন, সেখানেই তিনি তাঁর পূর্ণরূপে নিজেকে প্রকাশিত করেন।

পূর্বোক্ত গুণাবলীতে বিভূষিত ভগবান সৃষ্টির সমস্ত বিষয় প্রতিপালন করেন, এবং তার মাধ্যমে তিনি তাঁর হস্তে নিহত তাঁর শত্রুদেরও মুক্তি দান করেন। তিনি সর্বোচ্চ স্তরের মুক্তাত্মার কাছেও সর্বাকর্ষক, এবং তাই তিনি ব্রহ্মা এবং দেবাদিদেব মহাদেবেরও পূজ্য। এমন কি পুরুষ অবতার রূপেও তিনি সৃষ্টিমূলক শক্তির

ঈশ্বর। জড়া সৃষ্টিশক্তি তাঁরই নির্দেশনায় কার্য করে। সেই কথা *শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায়* (৯/১০) প্রতিপন্ন হয়েছে। তিনি সর্বতোভাবে জড়া শক্তির নিয়ন্তা, এবং অনন্তকোটি ব্রহ্মাণ্ডে জড়া শক্তি নিয়ন্ত্রণ করার জন্য সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড মণ্ডলীতে তিনি অসংখ্য অবতারের কারণ।

একটি মাত্র ব্রহ্মাণ্ডেই পাঁচ লক্ষেরও অধিক মনুরূপে তিনি অবতীর্ণ হন, এ ছাড়া তো আরও অনেক অবতার রয়েছে। মহত্তত্ত্বের অতীত চিন্ময় জগতে অবশ্য তাঁর অবতরণের কোন প্রশ্নই ওঠে না, কিন্তু বিভিন্ন বৈকুণ্ঠে তিনি বহুরূপে নিজেকে বিস্তার করেন।

মহত্তত্ত্বের অন্তর্গত যে অসংখ্য ব্রহ্মাণ্ড রয়েছে, চিৎ-জগতে অন্তত তার থেকে তিনগুণ বেশি বৈকুণ্ঠলোক রয়েছে। সেখানে সমস্ত নারায়ণরূপ বাসুদেবের বিস্তার, এবং তাই তিনি একাধারে বাসুদেব, নারায়ণ এবং শ্রীকৃষ্ণ। তিনি একই রূপে শ্রীকৃষ্ণ *গোবিন্দ হরে মুরারে, হে নাথ নারায়ণ বাসুদেব* । তাই তাঁর গুণাবলীর পরিমাপ কেউ করতে পারে না, তা তিনি যতই মহৎ হন না কেন।

শ্লোক ৩১

আত্মানং চানুশোচামি ভবন্তং চামরোত্তমম্ ।
দেবান্ পিতৄনৃষীন্ সাধূন্ সর্বান্ বর্ণাংস্তথাশ্রমান্ ॥ ৩১ ॥

আত্মানম্—আমি; **চ**—ও; **অনুশোচামি**—শোক করি; **ভবন্তম্**—তুমি; **চ**—ও; **অমরোত্তমম্**—দেবশ্রেষ্ঠ; **দেবান্** —দেবতাদের; **পিতৄন্**—পিতৃলোকের অধিবাসীদের; **ঋষীন্**—ঋষিদের; **সাধূন্**—ভক্তদের; **সর্বান্**—সকলের; **বর্ণান্**—ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়াদি চারি বর্ণাদি; **তথা**—এবং; **আশ্রমান্**—মানব সমাজের ব্রহ্মচর্য-গার্হস্থ্যাদি চারি আশ্রম বিভাগ।

অনুবাদ

হে দেবশ্রেষ্ঠ, তোমার এবং আমার নিজের এবং সকল দেবতা, ঋষি, পিতৃলোকবাসী, ভগবদ্ভক্তজন এবং মানব সমাজের বর্ণ ও আশ্রম প্রথার অনুসরণকারী সকলের অবস্থা বিবেচনা করে আমি শোক করছি।

তাৎপর্য

মানব সমাজের পূর্ণতা সম্পাদন করার জন্য মানুষ, দেবতা, ঋষি, পিতৃলোকের অধিবাসী এবং ভগবদ্ভক্ত সাধুজনের পরস্পরের মধ্যে সহযোগিতা এবং বর্ণ ও

আশ্রম ব্যবস্থার বিজ্ঞানসম্মত আচরণের ব্যবস্থা রয়েছে। দেবতাদের সঙ্গে সম্পর্কিত ঋষিদের অভিজ্ঞতা দ্বারা পরিচালিত বিজ্ঞানসম্মত বর্ণাশ্রম ব্যবস্থার মাধ্যমেই পশু জীবন এবং মনুষ্য জীবনের পার্থক্য সূচিত হয় এবং তা ক্রমে ক্রমে মানুষকে পরম নিত্য সত্য, পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে তাদের নিত্য সম্পর্ক পুনঃপ্রতিষ্ঠার সর্বোচ্চ স্তরে উন্নীত করে।

ভগবৎ প্রবর্তিত বর্ণাশ্রম ধর্ম, যার একমাত্র উদ্দেশ্য হচ্ছে পাশবিক চেতনাকে দিব্য চেতনায় উন্নীত করা, তা যখন অজ্ঞানতার ব্যাপকতার ফলে ভেঙে পড়ে, তখন জীবনের শান্তি এবং সমৃদ্ধির সামগ্রিক সুব্যবস্থাটি অচিরেই বিধ্বস্ত হয়ে যায়।

কলিযুগে বিষধর কালসর্পের প্রথম আক্রমণটি হয় ভগবৎ প্রবর্তিত বর্ণাশ্রম ধর্মকে দংশনের মাধ্যমে এবং তার ফলে যথাযথভাবে ব্রাহ্মণোচিত গুণসম্পন্ন মানুষেরা শূদ্র নামে অভিহিত হচ্ছে, এবং শূদ্রোচিত যোগ্যতাসম্পন্ন মানুষেরা ব্রাহ্মণ বলে স্বীকৃতি লাভ করছে, আর এই সবই ঘটছে মিথ্যা জন্মগত অধিকারের দাবিতে। জন্মগত দাবির ভিত্তিতে ব্রাহ্মণ হওয়া মোটেই সমীচীন নয়, যদিও তা ব্রাহ্মণত্ব লাভের অন্যতম একটি যোগ্যতা হতে পারে।

কিন্তু ব্রাহ্মণের প্রকৃত গুণ হচ্ছে মন এবং ইন্দ্রিয়াদি সংযত করা, এবং সহনশীলতা, সরলতা, শুচিতা, জ্ঞান, সততা, বৈদিক জ্ঞানের প্রতি শ্রদ্ধা ও বিশ্বাসের অনুশীলন। বর্তমান যুগে আবশ্যকীয় গুণগত যোগ্যতাগুলি বিবেচনা করা হচ্ছে না এবং মিথ্যা জন্মগত-অধিকারের দাবি *রামচরিতমানসের* রচয়িতা এক দক্ষ সুকবির দ্বারাও সমর্থিত হচ্ছে।

কলির প্রভাবে এই সবই হচ্ছে। তাই গাভীরূপী ধরণী দেবী শোচনীয় অবস্থার জন্য শোক করছিলেন।

শ্লোক ৩২-৩৩

ব্রহ্মাদয়ো বহু তিথং যদপাঙ্গমোক্ষ-
কামাস্তপঃ সমচরন্ ভগবৎ প্রপন্নাঃ ।
সা শ্রীঃ স্ববাসমরবিন্দবনং বিহায়
যৎ পাদ সৌভগমলং ভজতেঽনুরক্তা ॥ ৩২ ॥
তস্যাহমব্জকুলিশাঙ্কুশকেতুকেতৈঃ
শ্রীমৎপদৈর্ভগবতঃ সমলঙ্কৃতাঙ্গী ।
ত্রীনত্যরোচ উপলভ্য ততো বিভূতিং
লোকান্ স মাং ব্যসৃজদুৎস্ময়তীং তদন্তে ॥ ৩৩ ॥

ব্রহ্ম-আদয়ঃ—ব্রহ্মা আদি দেবতা; **বহু-তিথম্**—বহুদিন; **যৎ**—লক্ষ্মীদেবীর; **অপাঙ্গ মোক্ষ**—কৃপাদৃষ্টি; **কামা**—কামনা করে; **তপঃ**—তপস্যা; **সমচরন্**—আচরণ করেছিলেন; **ভগবৎ**—পরমেশ্বর ভগবানকে; **প্রপন্নাঃ**—শরণাগত হয়ে; **সা**—তিনি (লক্ষ্মীদেবী); **শ্রীঃ**—লক্ষ্মীদেবী; **স্ববাসম্**—তাঁর নিজ আলয়; **অরবিন্দবনম্**—পদ্মবন; **বিহায়**—পরিত্যাগ করে; **যৎ**—যার; **পাদ**—পদদ্বয়; **সৌভগম্**—আনন্দময়; **অলম্**—নিঃসংশয়ে; **ভজতে**—ভজনা করেন; **অনুরক্তা**—অনুরক্ত হয়ে; **তস্য**—তাঁর; **অহম্**—আমি; **অব্জ**—পদ্মফুল; **কুলিশ**—বজ্র; **অঙ্কুশ**—হস্তীচালনার দণ্ড; **কেতু**—পতাকা; **কেতৈঃ**—চিহ্নাদির দ্বারা; **শ্রীমৎ**—সমগ্র ঐশ্বর্যের অধীশ্বর; **পদৈঃ**—পদদ্বয়ের দ্বারা; **ভগবতঃ**—পরমেশ্বর ভগবানের; **সমলঙ্কৃত-অঙ্গী**—যাঁর দেহ অলংকার দ্বারা সজ্জিত; **ত্রীন্**—তিন; **অতি**—অত্যন্ত; **অরোচে**—সুন্দরভাবে সজ্জিত; **উপলভ্য**—অনুভব করে; **ততঃ**—তারপর; **বিভূতিম্**—বিশেষ শক্তিরাজি; **লোকান্**—গ্রহলোকসমূহ; **সঃ**—তিনি; **মাম্**—আমাকে; **ব্যসৃজৎ**—পরিত্যাগ করেছেন; **উৎস্ময়তীম্**—গর্ববোধ করায়; **তদন্তে**—অবশেষে।

অনুবাদ

ব্রহ্মা প্রমুখ দেবতারা ভগবানের শরণাগত হওয়া সত্ত্বেও যে লক্ষ্মীদেবীর কিঞ্চিৎ করুণাকটাক্ষ লাভের আশায় বহুকাল তপস্যা করেছিলেন, সেই লক্ষ্মীদেবী তাঁর নিবাসস্থল পদ্মবন পরিত্যাগ করে অত্যন্ত অনুরাগ সহকারে যে শ্রীকৃষ্ণের নির্মল চরণকমলের সৌন্দর্য নিরন্তর সেবা করেন, সেই ভগবান শ্রীকৃষ্ণের ধ্বজ, বজ্র, অঙ্কুশ ও পদ্ম আদি চিহ্নে চিহ্নিত শ্রীচরণের দ্বারা আমি সম্যকরূপে অলংকৃত হয়ে ছিলাম, তখন ত্রিলোকের সমস্ত সৌন্দর্যই আমার সৌন্দর্যের কাছে পরাজিত হয়েছিল, কেননা আমি তখন ভগবানের কাছ থেকে বিভূতি লাভ করেছিলাম। তারপর যখন সেই বিভূতি নাশের সময় উপস্থিত হল, তখন আমার বড় গর্ব হল। বোধ হয়, সেই গর্ব খর্ব করার জন্যই ভগবান আমাকে ত্যাগ করেছেন।

তাৎপর্য

পৃথিবীর সৌন্দর্য এবং সমৃদ্ধি ভগবানের কৃপার প্রভাবেই কেবল বর্ধিত হতে পারে, কোনও মানুষের পরিকল্পনার মাধ্যমে নয়। পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এই পৃথিবীতে যখন প্রকট হয়েছিলেন, তখন ধরিত্রী তাঁর শ্রীপাদপদ্মের মঙ্গলময় চিহ্নসমূহের দ্বারা বিভূষিতা হয়েছিলেন, এবং তাঁর এই বিশেষ কৃপার প্রভাবে সারা পৃথিবী পরিপূর্ণ

হয়ে উঠেছিল। অর্থাৎ, নদী, সাগর, অরণ্য, পর্বত এবং খনিগুলি, যা মানুষ এবং পশুদের সমস্ত প্রয়োজনীয় দ্রব্য সরবরাহ করে, তাদের কর্তব্য পূর্ণরূপে সম্পাদন করছিল।

তাই পৃথিবীর ঐশ্বর্য ব্রহ্মাণ্ডের ত্রিলোকের অন্য সমস্ত গ্রহের ঐশ্বর্যকে অতিক্রম করেছিল। তাই সকলেরই প্রার্থনা করা উচিত যেন ভগবানের কৃপা সর্বদাই পৃথিবীর উপর বিরাজমান থাকে যাতে আমরা সকলেই তাঁর অহৈতুকী কৃপা লাভ করতে পারি এবং জনগণের সমস্ত অভাব পূর্ণ করে যথার্থ সুখ আস্বাদন করতে পারি।

কেউ প্রশ্ন করতে পারে ভগবান যখন পৃথিবীতে তাঁর উদ্দেশ্য সাধন করার পর তাঁর স্বীয় ধামে ফিরে যান, তখন কি করে তাঁকে এখানে ধরে রাখা যায়? তার উত্তর হচ্ছে যে, ভগবানকে ধরে রাখার কোন কারণ নেই। ভগবান সর্বত্রই বিরাজমান বলে সত্যিই আমরা যদি তাঁকে চাই, তা হলে তিনি আমাদের সঙ্গেই উপস্থিত থাকতে পারেন। শ্রবণ, কীর্তন, স্মরণ ইত্যাদি ভক্তিসেবার দ্বারা ভগবদ্ভক্তি সম্পাদিত হলে ভগবান সর্বদাই আমাদের সঙ্গে থাকবেন।

এই জগতে এমন কিছু নেই যার সঙ্গে ভগবান যুক্ত নন। কিভাবে তাঁর সঙ্গে যোগসূত্র স্থাপন করা যায় এবং অপরাধশূন্য সেবার মাধ্যমে তাঁর সঙ্গে যুক্ত হওয়া যায়, সে সম্বন্ধে আমাদের অবশ্যই শিক্ষাগ্রহণ করতে হবে। ভগবানের দিব্য নাম সমন্বিত শব্দ ব্রহ্মের মাধ্যমে আমরা তাঁর সঙ্গে যুক্ত হতে পারি। ভগবানের নাম এবং ভগবান স্বয়ং অভিন্ন, এবং যাঁরা নিরপরাধে ভগবানের নাম কীর্তন করেন তাঁরা তৎক্ষণাৎ উপলব্ধি করতে পারেন যে, ভগবান তাঁদের সম্মুখে রয়েছেন।

বেতার তরঙ্গের মাধ্যমেও আংশিকভাবে শব্দের আপেক্ষিকতা উপলব্ধি করা যায়, তেমনই ভগবানের দিব্য নাম উচ্চারণ করার ফলে ভগবানের উপস্থিতি অনুভব করা যায়। এই যুগে, কলির কলুষিত প্রভাবে যখন সব কিছুই দূষিত হয়ে গেছে, শাস্ত্র তখন ভগবানের দিব্য নাম উচ্চারণ করার নির্দেশ দিয়েছে এবং শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু এই পন্থা প্রদর্শন করে গেছেন। এই দিব্য নাম উচ্চারণের ফলে আমরা তৎক্ষণাৎ জড় জগতের সমস্ত কলুষ থেকে মুক্ত হতে পারি এবং চিন্ময় স্তরে উন্নীত হয়ে ভগবদ্ধামে ফিরে যেতে পারি। ভগবানের শুদ্ধ নাম কীর্তনকারী ভগবদ্ভক্ত ভগবানেরই মতো মঙ্গলময়, এবং সারা পৃথিবী জুড়ে ভগবানের শুদ্ধ ভক্তমণ্ডলীর আন্দোলনের ফলে অচিরেই পৃথিবীর দুর্দশাগ্রস্ত অবস্থার পরিবর্তন হয়। শুধুই ভগবানের দিব্যনাম সমন্বিত সংকীর্তনের প্রচারের ফলে কলির প্রভাব থেকে সর্বতোভাবে মুক্ত হওয়া যায়।

শ্লোক ৩৪

যো বৈ মমাতিভরমাসুরবংশরাজ্ঞা-
মক্ষৌহিণীশতমপানুদদাত্মতন্ত্রঃ ।
ত্বাং দুঃস্থমূনপদমাত্মনি পৌরুষেণ
সম্পাদয়ন্ যদুষু রম্যমবিভ্রদঙ্গম্ ॥ ৩৪ ॥

যঃ—যিনি; বৈ—অবশ্যই; মম—আমার; অতিভরম্—অত্যন্ত ভারী; আসুর-বংশ—নাস্তিকগণ; রাজ্ঞাম্—রাজাদের; অক্ষৌহিণী—অক্ষৌহিণী; শতম্—শত শত; অপানুদৎ—স্পর্শ করেছিলেন; আত্মতন্ত্রঃ—স্বয়ং সম্পূর্ণ; ত্বাম্—আপনাকে; দুঃস্থম্—দুর্দশাগ্রস্ত; ঊনপদম্—দাঁড়াবার মতো শক্তিও যাদের নেই; আত্মনি—অন্তরঙ্গা; পৌরুষেণ—শক্তি দ্বারা; সম্পাদয়ন্—সম্পাদন করার জন্য; যদুষু—যদুকুলে; রম্যম্—অপ্রাকৃত সৌন্দর্যমণ্ডিত; অবিভ্রৎ—গ্রহণ করেছিলেন; অঙ্গম্—দেহ।

অনুবাদ

হে মূর্তিমান ধর্ম, আমি যখন অসুরবংশীয় রাজাদের শত শত অক্ষৌহিণী* রূপ গুরুভারে আক্রান্ত হয়েছিলাম, তখন ভগবান সেই অসুরদের সংহার করে আমার গুরুভার হরণ করেছিলেন। তেমনই তুমি দুর্দশাগ্রস্ত অবস্থায় যখন (পাদত্রয় বিহীন হয়ে) দাঁড়াবার ক্ষমতা হারিয়েছিলে, তখন তোমাকে সুস্থ করার জন্য তিনি তাঁর অন্তরঙ্গা শক্তির প্রভাবে যদুকুলে জন্মগ্রহণ করে পরম রমণীয় শরীর ধারণ করেছিলেন।

তাৎপর্য

অসুরেরা অন্যের সর্বনাশ করেও তাদেরই ইন্দ্রিয় সুখ ভোগময় জীবন যাপন করতে চায়। তাদের উচ্চাকাঙ্ক্ষা পূরণ করার মানসে অসুরেরা, বিশেষ করে নাস্তিক রাজারা অথবা রাষ্ট্রনেতারা, সর্বপ্রকার মারণাস্ত্রে সজ্জিত হয়ে শান্তিপূর্ণ সমাজে যুদ্ধ বাধায়। তাদের নিজেদের গৌরব ঘোষণা করা ছাড়া আর কোন উচ্চাকাঙ্ক্ষা থাকে না, তার ফলে সর্ব প্রকার অবাঞ্ছিত সামরিক শক্তির ভারে বসুন্ধরা ভারাক্রান্ত হন।

*এক অক্ষৌহিণী সৈন্যবাহিনীতে ২১,৮৭০টি রথ, ২১,৮৭০টি হাতি এবং ১,০৯,৩৫০ জন পদাতিক সৈন্য এবং ৬৫,৬১০জন অশ্বারোহী সৈন্য থাকত।

আসুরিক ভাবাপন্ন মানুষদের সংখ্যা বৃদ্ধির ফলে যারা ধর্মপরায়ণ, বিশেষ করে ভক্ত বা দেবতারা, তাঁরা অত্যন্ত অসুখী হন। তখন পরমেশ্বর ভগবান অবাঞ্ছিত অসুরদের সংহার করার জন্য এবং যথার্থ ধর্ম সংস্থাপন করার জন্য অবতীর্ণ হন। সেই উদ্দেশ্য সাধন করার জন্যই শ্রীকৃষ্ণ অবতীর্ণ হয়েছিলেন এবং তাঁর সেই কার্য সম্পাদন করেছিলেন।

শ্লোক ৩৫

কা বা সহেত বিরহং পুরুষোত্তমস্য
প্রেমাবলোকরুচিরস্মিতবল্গুজল্পৈঃ ।
স্থৈর্যং সমানমহরন্মধুমানিনীনাং
রোমোৎসবো মম যদঙ্ঘ্রিবিটঙ্কিতায়াঃ ॥ ৩৫ ॥

কা—কে; **বা**—অথবা; **সহেত**—সহ্য করতে পারে; **বিরহম্**—বিরহ; **পুরুষোত্তমস্য**—পরমেশ্বর ভগবানের; **প্রেম**—প্রেম; **অবলোক**—দৃষ্টি; **রুচিরস্মিত**—মধুর হাস্য; **বল্গুজল্পৈঃ**—মধুর আলাপ; **স্থৈর্যম্**—গাম্ভীর্য; **সমানম্**—অভিমান সহ; **অহরৎ**—জয় করেছিলেন; **মধু**—প্রেয়সীদের; **মানিনীনাম্**—সত্যভামা আদি রমণীদের; **রোমোৎসবঃ**—রোমাঞ্চকর; **মম**—আমার; **যৎ**—যার; **অঙ্ঘ্রি**—পাদপদ্ম; **বিটঙ্কিতায়াঃ**—চিহ্নিত।

অনুবাদ

যিনি প্রেমপূর্ণ অবলোকন, রুচির হাস্য ও মধুর সম্ভাষণ করলে, সত্যভামা প্রভৃতি মধুমানিনী কামিনীগণ ধৈর্য ও মান হারাতেন, যাঁর চরণ-চিহ্নে অলংকৃত হয়ে এবং চরণ স্পর্শ অনুভব করে আমার অঙ্গ পুলকিত হত, সেই পুরুষোত্তম ভগবানের বিরহ কে সহ্য করতে পারে?

তাৎপর্য

ভগবান যখন তাঁর আলয়ে অনুপস্থিত থাকতেন, তখন তাঁর সহস্র সহস্র মহিষীর কাছ থেকে তাঁর বিচ্ছিন্ন হওয়ার সম্ভাবনা ছিল, কিন্তু সর্বদাই তাঁর পাদপদ্মে স্পর্শধন্যা ধরিত্রী কখনোই বিরহ অনুভব করতেন না। কিন্তু ভগবান যখন এই পৃথিবী ত্যাগ করে তাঁর চিন্ময় ধামে ফিরে গেলেন, তখন ধরিত্রী আরও গভীর ভাবে বিরহ বেদনা অনুভব করেছিলেন।

শ্লোক ৩৬

তয়োরেবং কথয়তোঃ পৃথিবীধর্ময়োস্তদা ।
পরীক্ষিন্নাম রাজর্ষিঃ প্রাপ্তঃ প্রাচীং সরস্বতীম্ ॥ ৩৬ ॥

তয়োঃ—তাঁদের মধ্যে; **এবম্**—এইভাবে; **কথয়তোঃ**—কথোপকথন; **পৃথিবী**—পৃথিবী; **ধর্ময়োঃ**—এবং মূর্তিমান ধর্ম; **তদা**—তখন; **পরীক্ষিৎ**—পরীক্ষিৎ মহারাজ; **নাম**—নামক; **রাজর্ষি**—রাজর্ষি; **প্রাপ্তঃ**—উপস্থিত হলেন; **প্রাচীম্**—পূর্বদিকবাহিনী; **সরস্বতীম্**—সরস্বতী নদী।

অনুবাদ

পৃথিবী এবং ধর্ম যখন পরস্পর এইভাবে কথোপকথন করছিলেন, তখন পরীক্ষিৎ নামক রাজর্ষি পূর্বদিকবাহিনী সরস্বতী নদীর তীরে উপস্থিত হলেন।

ইতি 'শ্রীমদ্ভাগবতের' প্রথম স্কন্ধের "কিভাবে পরীক্ষিৎ কলিযুগের সম্মুখীন হন" নামক ষোড়শ অধ্যায়ের ভক্তিবেদান্ত তাৎপর্য।

সপ্তদশ অধ্যায়

কলির দণ্ড এবং পুরস্কার

শ্লোক ১

সূত উবাচ

তত্র গোমিথুনং রাজা হন্যমানমনাথবৎ ।
দণ্ডহস্তঞ্চ বৃষলং দদৃশে নৃপলাঞ্ছনম্ ॥ ১ ॥

সূতঃ উবাচ—শ্রীসূত গোস্বামী বললেন; **তত্র**—তখন; **গোমিথুনম্**—গাভী এবং বৃষ; **রাজা**—রাজা; **হন্যমানম্**—নির্যাতিত; **অনাথবৎ**—অনাথের মতো; **দণ্ডহস্তম্**—হাতে একটি দণ্ড নিয়ে; **চ**—ও; **বৃষলম্**—শূদ্রকে; **দদৃশে**—দেখেছিলেন; **নৃপ**—একটি রাজা; **লাঞ্ছনম্**—বেশধারী।

অনুবাদ

সূত গোস্বামী বললেন—সেখানে উপস্থিত হয়ে মহারাজ পরীক্ষিৎ দেখলেন যে, এক শূদ্র রাজবেশ ধারণ করে একটি দণ্ডের দ্বারা অনাথবৎ একটি গাভী ও বৃষকে প্রহার করছে।

তাৎপর্য

কলিযুগের প্রধান লক্ষণ হচ্ছে, নিম্নবর্ণের শূদ্ররা অর্থাৎ ব্রাহ্মণোচিত সংস্কার এবং পারমার্থিক শিক্ষা দীক্ষা বিহীন মানুষেরা রাজা বা প্রশাসকের বেশ ধারণ করবে, এবং ঐ সমস্ত অক্ষত্রিয় শাসনকর্তাদের মুখ্য কাজ হবে নিরীহ পশুদের, বিশেষ করে গাভী এবং বৃষদের হত্যা করা। বৃষ আর গাভীদের রক্ষা করা যাদের কাজ, সেই যথার্থ বৈশ্যেরা, মালিক হলেও আর তারা তাদের রক্ষা করবে না। *শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায়* (১৮/৪৪) বলা হয়েছে যে, বৈশ্যদের কর্তব্য হচ্ছে কৃষি, গোরক্ষা এবং বাণিজ্য। কলিযুগে অধঃপতিত বৈশ্যেরা, ব্যবসায়ীরা গাভীদের কসাইখানাতে পাঠিয়ে দিতে থাকে। ক্ষত্রিয়দের কর্তব্য রাষ্ট্রের নাগরিকদের রক্ষা করা, আর

বৈশ্যদের কর্তব্য গাভী এবং বৃষদের পালন করে তাদের দুগ্ধ এবং শস্যাদি উৎপাদনে সাহায্য করা। কিন্তু কলিযুগে শূদ্রশ্রেণীর লোকেরা প্রশাসকের পদে অভিষিক্ত হয়ে রয়েছে আর গাভী এবং বৃষেরা অর্থাৎ মাতা এবং পিতারা, বৈশ্যদের দ্বারা সুরক্ষিত না হয়ে শূদ্র প্রশাসকদের দ্বারা সংগঠিত কসাইখানায় বলি হচ্ছে।

শ্লোক ২

বৃষং মৃণালধবলং মেহন্তমিব বিভ্যতম্ ।
বেপমানং পদৈকেন সীদন্তং শূদ্রতাড়িতম্ ॥ ২ ॥

বৃষম্—বৃষ; **মৃণালধবম্**—শ্বেতপদ্মের মতো শুভ্র; **মেহন্তম্**—মূত্র ত্যাগ করছিল; **ইব**—যেন; **বিভ্যতম্**—অত্যন্ত ভীত হয়ে; **বেপমানলম্**—কম্পমান; **পদৈকেন**—কেবল এক পায়ে দণ্ডায়মান হয়ে; **সীদন্তম্**—ভীত; **শূদ্রতাড়িতম্**—শূদ্রের প্রহারে।

অনুবাদ

বৃষটি শ্বেতপদ্মের মতো শুভ্রবর্ণ। শূদ্রের প্রহারে সে এমনি ভয়ভীত হয়ে পড়েছিল যে, মূত্র ত্যাগ করে কম্পিত হচ্ছিল এবং এক পায়ে দাঁড়িয়ে ছিল।

তাৎপর্য

কলির পরবর্তী লক্ষণটি হচ্ছে যে, শ্বেত পদ্মের মতো শুভ্র এবং নির্মল ধর্মনীতি এই যুগের অসভ্য শূদ্রদের দ্বারা আক্রান্ত হবে। ব্রাহ্মণ এবং ক্ষত্রিয়দের বংশধর হলেও, এই কলিযুগে, উপযুক্ত বৈদিক সংস্কৃতি এবং শিক্ষার অভাবে জনগণ শূদ্রবৎ হয়ে যাবে এবং ধর্মীয় অনুশাসনাদি অবজ্ঞা করবে। আর যারা ধর্মপরায়ণ, তারা সেই ধরনের মানুষদের ভয়ে ভীত হবে। শূদ্রশ্রেণীর লোকেরা নিজেদের নাস্তিক বলে ঘোষণা করবে, এবং নিষ্কলুষ ধর্মরূপী বৃষটিকে হত্যা করার জন্যই তারা নানা রকম মতবাদ এবং গোষ্ঠী সৃষ্টি করবে। রাষ্ট্রগুলি নিজেদের ধর্মনিরপেক্ষ, বা ধর্মহীন বলে ঘোষণা করবে, এবং তার ফলে ধর্মের প্রতি সম্পূর্ণ উদাসীনতা দেখা দেবে। নাগরিকেরা সাধু, শাস্ত্র এবং গুরুর প্রতি সম্পূর্ণরূপে শ্রদ্ধাহীন হয়ে যথেচ্ছ আচার করবে।

বৃষটি এক পায়ে দাঁড়িয়ে থাকার অর্থ হচ্ছে যে, ধর্ম ধীরে ধীরে লোপ পাচ্ছে। ধর্মের যেটুকুই-বা অস্তিত্ব, তা নানা প্রকার বাধা বিপত্তির প্রভাবে এমনভাবে বিপর্যস্ত হবে যে, কম্পমান অবস্থায় যে কোন সময় তা যেন পতনোন্মুখ হয়ে থাকবে।

শ্লোক ৩

গাঞ্চ ধর্মদুঘাং দীনাং ভৃশং শূদ্রপদাহতাম্ ।
বিবৎসামাশ্রুবদনাং ক্ষামাং যবসমিচ্ছতীম্ ॥ ৩ ॥

গাম্—গাভী; **চ**—ও; **ধর্ম-দুঘাম্**—যার থেকে ধর্ম আহরণ করা যায়; **দীনাম্**—দীন অবস্থা প্রাপ্ত; **ভৃশম্**—দুর্দশাগ্রস্ত; **শূদ্র**—শূদ্র; **পদাহতাম্**—পায়ে আঘাত প্রাপ্ত; **বিবৎসাম্**—বৎসহীনা; **অশ্রুবদনাম্**—অশ্রুপূর্ণ নয়নে; **ক্ষামাম্**—অত্যন্ত দুর্বল; **যবসম্**—তৃণ; **ইচ্ছতীম্**—আকাঙ্ক্ষা করে।

অনুবাদ

গাভীটি ধর্মস্রাবী হওয়ার ফলে অত্যন্ত শুভদা হলেও তিনি যেন দীনা এবং বৎসহীনা। শূদ্রটি তাঁর পদে আঘাত করছিল। তাই তাঁর নয়ন অশ্রুসিক্ত, এবং তিনি অত্যন্ত কৃশা হয়ে তৃণ ভক্ষণ করবার জন্য আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করছিলেন।

তাৎপর্য

কলিযুগের পরবর্তী লক্ষণটি হচ্ছে গাভীর দুর্দশাগ্রস্ত অবস্থা। দুগ্ধ যেন তরল ধর্মনীতি, আর তা যেন গাভীর থেকে দোহন করা যায়। মহান্ মুনি ঋষিরা কেবল দুধ পান করে জীবন ধারণ করতেন। শ্রীল শুকদেব গোস্বামী দুগ্ধ দোহন কালে গৃহস্থদের গৃহে যেতেন, এবং জীবন ধারণের জন্য একটু মাত্র দুধ ভিক্ষা করে নিতেন। এমন কি, প্রায় পঞ্চাশ বছর আগেও, কেউ কোন সাধুকে দু'-এক সের দুধ থেকে বঞ্চিত করতেন না, এবং প্রতিটি গৃহস্থই জলের মতোই দুগ্ধ দান করতেন।

বৈদিক অনুশাসনের অনুবর্তী সনাতন ধর্মাবলম্বী গৃহস্থের গৃহের অঙ্গ স্বরূপ গাভী এবং বৃষ থাকত, কেবল দুগ্ধপানের জনই নয়, ধর্মনীতি আহরণের জন্যও। সনাতন ধর্মাবলম্বীরা ধর্মনীতি অনুসারে গাভীর পূজা করেন এবং ব্রাহ্মণদের শ্রদ্ধা করেন। যজ্ঞ অনুষ্ঠানের জন্য গাভীর দুগ্ধের প্রয়োজন হয়, এবং যজ্ঞ অনুষ্ঠানের ফলে গৃহস্থরা সুখী হন। গোবৎস কেবল দেখতেই সুন্দর, তা নয়, তা গাভীর অন্তরে তৃপ্তি দানও করে, আর তার ফলে গাভী প্রচুর পরিমাণে যথাসম্ভব দুধ দেয়।

কিন্তু কলিযুগে গোবৎসদের যত শীঘ্র সম্ভব গাভীদের থেকে বিচ্ছিন্ন করা হয়, আর যে উদ্দেশ্যে তা করা হয়, তা এই শ্রীমদ্ভাগবতের পাতায় বর্ণনা না করাই শ্রেয়। অশ্রুসিক্তা গাভীর থেকে শূদ্র গোয়ালা কৃত্রিমভাবে দুগ্ধ আহরণ করে,

যখন আর দুগ্ধ পাওয়া যায় না, তখন গাভীটিকে জবাই করার জন্য কসাইখানায় পাঠানো হয়।

বর্তমান সমাজের সমস্ত দুর্দশার কারণ হচ্ছে এই সমস্ত অতি পাপপূর্ণ কার্যকলাপ। অর্থনৈতিক উন্নতির নামে মানুষ যে কি করছে, তা তারা জানে না। কলির প্রভাবে তারা সকলেই অজ্ঞানতার অন্ধকারে আচ্ছন্ন। শান্তি এবং সমৃদ্ধির সমস্ত চেষ্টার মাঝেও গাভী আর বৃষদের সকল রকমে সুখী করে রাখার দিকেও তাদের দৃষ্টি দেওয়া উচিত। মূর্খ মানুষেরা জানে না কিভাবে গাভী এবং বৃষকে সুখী রাখার মাধ্যমে অনায়াসে সুখ অর্জন করা যায়, অথচ সেটাই প্রকৃতির বিধি। মানব সমাজের সর্বাঙ্গীণ সুখ এবং শান্তি সম্পাদনের জন্য শ্রীমদ্ভাগবতের নির্দেশে এই পন্থা আমাদের গ্রহণ করা উচিত।

শ্লোক ৪

পপ্রচ্ছ রথমারূঢ়ঃ কার্তস্বরপরিচ্ছদম্ ।
মেঘগম্ভীরয়া বাচা সমারোপিতকার্মুকঃ ॥ ৪ ॥

পপ্রচ্ছ—জিজ্ঞাসা করলেন; **রথম্**—রথে; **আরূঢ়**—উপবিষ্ট; **কার্তস্বর**—স্বর্ণ; **পরিচ্ছদম্**—যথোপযুক্ত; **মেঘ**—মেঘ; **গম্ভীরয়া**—গম্ভীর; **বাচা**—শব্দ; **সমারোপিত**—আরোপিত; **কার্মুকঃ**—ধনুর্বাণ।

অনুবাদ

সুবর্ণখচিত রথে আরূঢ় হয়ে, ধনুর্বাণে সুসজ্জিত মহারাজ পরীক্ষিৎ সেই শূদ্রকে বজ্রগম্ভীর স্বরে জিজ্ঞাসা করলেন।

তাৎপর্য

মহারাজ পরীক্ষিতের মতো পূর্ণ রাজকীয় ক্ষমতাশালী, দুষ্কৃতকারীদের দণ্ড দানের জন্য অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত রাজা বা প্রশাসক নেতাই কেবল কলিযুগের প্রতিভূদের দ্বন্দ্বযুদ্ধে আহ্বান করতে পারেন। তবেই কেবল এই অধঃপতিত যুগটিকে প্রতিহত করা সম্ভব হতে পারে। আর, এই ধরনের শক্তিমান কার্যকর নেতাদের অভাব ঘটলে, সর্বদাই শান্তি ব্যাহত হয়ে থাকে। অধঃপতিত জনগণের প্রতিনিধি রূপে, নির্বাচিত লোক-দেখানো নেতারা কখনই পরীক্ষিৎ মহারাজের মতো পরাক্রমশালী রাজার সমতুল্য হতে পারে না। পোশাক বা রাজকীয় আদব কায়দায় কিছু যায় আসে না। কাজের দ্বারাই মানুষের যোগ্যতা নির্ধারিত হয়।

শ্লোক ৫

কস্ত্বং মচ্ছরণে লোকে বলাদ্ধংস্যবলান্ বলী ।
নরদেবোঽসি বেষেণ নটবৎকর্মণাঽদ্বিজঃ ॥ ৫ ॥

কঃ—কে; **ত্বম্**—তুমি; **মৎ**—আমার; **শরণে**—আশ্রয়ে; **লোকে**—এই পৃথিবীতে; **বলাৎ**—বলপূর্বক; **হংসি**—হত্যা করছ; **অবলান্**—দুর্বলদের; **বলী**—বলবান হওয়া সত্ত্বেও; **নরদেবঃ**—দেবতা (রাজা); **অসি**—উপস্থিত হচ্ছে; **বেষেণ**—তোমার বেশভূষার দ্বারা; **নটবৎ**—নটের মতো; **কর্মণা**—কর্মের দ্বারা; **অদ্বি-জঃ**—শূদ্র।

অনুবাদ

তুই কে? বলবান হওয়া সত্ত্বেও তুই এই পৃথিবীতে আমার আশ্রিত অসহায়দের হত্যা করতে সাহস করছিস্? তুই নটের মতো রাজবেশ ধারণ করেছিস্ বটে, কিন্তু তোর কার্যকলাপ ক্ষত্রিয় নীতির বিরোধী।

তাৎপর্য

ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্যদের দ্বিজ বলা হয়, কারণ পিতা-মাতার মিলনের মাধ্যমে এই ধরনের উচ্চ বর্ণের মানুষের প্রথম জন্ম হয় এবং তারপর সদ্‌গুরুর কাছে পারমার্থিক দীক্ষা গ্রহণের মাধ্যমে সংস্কারগত নবজীবন প্রাপ্তিরূপ দ্বিতীয় জন্ম হয়। তাই ক্ষত্রিয়ও ব্রাহ্মণের মতো দ্বিজ, এবং তার কর্তব্য অসহায়দের রক্ষা করা। অসহায়দের রক্ষা এবং দুরাচারীদের তিরস্কারের জন্যই ক্ষত্রিয় রাজাকে ভগবানের প্রতিনিধি রূপে বিবেচনা করা হয়ে থাকে।

যখনই প্রশাসকদের এই নিয়মমাফিক কাজের ব্যতিক্রম হয়, তখনই ভগবৎ-ভাবাপন্ন রাজ্য পুনঃস্থাপনার জন্য ভগবানের অবতরণ ঘটে। কলিযুগে, হতভাগ্য অসহায় পশু, বিশেষ করে গাভী, যাদের সর্বপ্রকারে রক্ষা করা প্রশাসক নেতাদের কর্তব্য, তাদেরই নির্বিচারে হত্যা করা হচ্ছে। সুতরাং যাদের চোখের সামনেই এই ধরনের অনাচার হয়, তারা কেবল নামে মাত্রই ভগবানের প্রতিনিধি। দরিদ্র নাগরিকদের এই ধরনের শক্তিমান নেতারা কেবলই সাজপোশাকে বা পদমর্যাদায় নেতা হবার অভিনয় করে থাকে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তারা দ্বিজত্বের সংস্কৃতিগত সম্পদ থেকে বিচ্যুত অপদার্থ শূদ্র মাত্র। পারমার্থিক সংস্কৃতিবিহীন নিম্নশ্রেণীর মানুষদের কাছ থেকে কোনই ন্যায় বিচার অথবা যথাযথ সমভাবাপন্ন আচরণ কেউ প্রত্যাশা করতে পারে না। তাই রাষ্ট্রনেতাদের অপশাসনের ফলে কলিযুগে প্রত্যেকেই অসন্তুষ্ট। আধুনিক মানব সমাজ পারমার্থিক সংস্কৃতিগত দ্বিজত্ব থেকে

বঞ্চিত। তাই অদ্বিজদের দ্বারা গঠিত জনগণের সরকার দ্বিজত্ব প্রাপ্ত নয় বলে তা নিশ্চয়ই কলির সরকার, যেখানে সকলেই অসন্তুষ্ট।

শ্লোক ৬

যস্ত্বং কৃষ্ণে গতে দূরং সহগাণ্ডীবধন্বনা ।
শোচ্যোঽস্যশোচ্যান্ রহসি প্রহরন্ বধমর্হসি ॥ ৬ ॥

যঃ—যেহেতু; **ত্বম্**—তুই দুরাত্মা; **কৃষ্ণে**—ভগবান শ্রীকৃষ্ণ; **গতে**—চলে যাওয়ায়; **দূরম্**—দৃষ্টির বাইরে; **সহ**—সহিত; **গাণ্ডীব**—গাণ্ডীব নামক ধনুক; **ধন্বনা**—ধারণকারী, অর্জুন; **শোচ্যঃ**—অপরাধী; **অসি**—হয়েছিস; **অশোচ্যান্**—নিরপরাধ; **রহসি**—নির্জন স্থানে; **প্রহরন্**—প্রহার করে; **বধম্**—বধ করার জন্য; **অর্হসি**—উপযুক্ত।

অনুবাদ

শ্রীকৃষ্ণ গাণ্ডীবধারী অর্জুনসহ দূরে প্রস্থান করেছেন বলে তুই কি নির্জনে নিরপরাধ প্রাণীকে বধ করতে সাহস করছিস? তার ফলে তোর যে অপরাধ হয়েছে, তাতে তুই বধের উপযুক্ত।

তাৎপর্য

যে সভ্যতায় ভগবান স্পষ্টতই বর্জিত হয়েছেন, এবং যেখানে অর্জুনের মতো মহাবলী ভক্ত নেই, সেখানে দুর্নীতিপরায়ণ পরিবেশের সুযোগ নিয়ে কলির অনুচরেরা নির্জনে কসাইখানায় গাভীর মতো নিরীহ প্রাণীদের হত্যা করার সুযোগ নেয়। মহারাজ পরীক্ষিতের মতো ন্যায়পরায়ণ রাজাদের আইনে এই ধরনের পশুঘাতকেরা প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হওয়ার যোগ্য।

নির্জন স্থানে নিরীহ শিশুকে যদি কেউ হত্যা করে, তা হলে যেমন সে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হওয়ার যোগ্য, ঠিক তেমনই নির্জন স্থানে গাভীর মতো নিরীহ পশুকে যে হত্যা করে, ন্যায়পরায়ণ রাজার বিচারে, সে প্রাণদণ্ডে কাজের হওয়ার যোগ্য।

শ্লোক ৭

ত্বং বা মৃণালধবলঃ পাদৈর্ন্যূনঃ পদা চরন্ ।
বৃষরূপেণ কিং কশ্চিদ্ দেবো নঃ পরিখেদয়ন্ ॥ ৭ ॥

ত্বম্—তুমি; বা—অথবা; মৃণালধবলঃ—শ্বেত পদ্মের মতো শুভ্র; পাদৈঃ—তিনটি পদের; ন্যূনঃ—বঞ্চিত হয়ে; পদা—এক পায়ে; চরন্—বিচরণকারী; বৃষ—বৃষ; রূপেণ—রূপে; কিম্—কি; কশ্চিৎ—কোনও; দেবঃ—দেবতা; নঃ—আমাদের; পরিখেদয়ন্—উদ্বেগের কারণ।

অনুবাদ

মহারাজ পরীক্ষিৎ তখন বৃষটিকে জিজ্ঞাসা করলেন—আপনি কে? আপনি কি মৃণালশুভ্র কোন বৃষ, না কোনও দেবতা? আপনি তিনটি চরণ হারিয়েছেন, এবং মাত্র এক পদে নির্ভর করে বিচরণ করছেন। আপনি কি কোনও দেবতা বৃষরূপ ধারণ করে আমাদের ছলনা করছেন?

তাৎপর্য

মহারাজ পরীক্ষিতের সময় পর্যন্ত গাভী এবং বৃষের দুরবস্থার কথা কেউ কল্পনাও করতে পারত না। তাই মহারাজ পরীক্ষিৎ এই করুণ দৃশ্য দেখে আশ্চর্যান্বিত হয়েছিলেন। তাই তিনি জানতে চেয়েছিলেন, গাভী এবং বৃষের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে ইঙ্গিত করার জন্যে কোন দেবতা এই করুণ দশা প্রাপ্ত বৃষের রূপ ধারণ করেছেন কিনা।

শ্লোক ৮

ন জাতু কৌরবেন্দ্রাণাং দোর্দণ্ডপরিরম্ভিতে ।
ভূতলেঽনুপতন্ত্যস্মিন্ বিনা তে প্রাণিনাং শুচঃ ॥ ৮ ॥

ন—না; জাতু—কখনও; কৌরবেন্দ্রাণাম্—কুরুশ্রেষ্ঠদের; দোর্দণ্ড—ভুজ বলে; পরিরম্ভিতে—সুরক্ষিত; ভূতলে—পৃথিবীতে; অনুপতন্তি—অনুতপ্ত হয়ে; অস্মিন্—এখনও পর্যন্ত; বিনা—ব্যতীত; তে—আপনি; প্রাণীনাম্—প্রাণীদের; শুচঃ—শোকাশ্রু।

অনুবাদ

কৌরবশ্রেষ্ঠ বীরদের ভুজ বলে সুরক্ষিত কোনও রাজ্যে এই প্রথম আপনাকে অশ্রুজলে অনুতপ্ত হতে দেখলাম। এখনও পর্যন্ত এই পৃথিবীতে রাজকীয় অবহেলার ফলে কারও অশ্রুপাত হতে দেখা যায়নি।

তাৎপর্য

মানুষ এবং পশু উভয়েরই জীবন রক্ষা করা রাষ্ট্রীয় সরকারের প্রাথমিক ও প্রধান কর্তব্য। কোনও সরকার অবশ্যই এই নীতি অনুসরণে দ্বিধা করবেন না। এই কলিযুগে রাষ্ট্র ব্যবস্থাই যে সুসংগঠিত ভাবে পশুহত্যার আয়োজন করেছে, তা দেখে যে কোনও শুদ্ধ চিত্ত মানুষই আতঙ্কগ্রস্ত হবেন। বৃষের চোখে জল দেখে পরীক্ষিৎ মহারাজ শোকার্ত হয়েছিলেন, এবং তাঁর রাজ্যে এই ধরনের অভূতপূর্ব ঘটনা ঘটতে দেখে আশ্চর্যান্বিত হয়েছিলেন। মানুষ এবং পশু উভয়েরই জীবন সমান ভাবে রক্ষা করা হত। ভগবানের রাজ্যে সেইটিই হচ্ছে প্রথা।

শ্লোক ৯

মা সৌরভেয়াত্র শুচো ব্যেতু তে বৃষলাদ্ ভয়ম্ ।
মা রোদীরম্ব ভদ্রং তে খলানাং ময়ি শাস্তরি ॥ ৯ ॥

মা—করো না; **সৌরভেয়**—হে সুরভীনন্দন; **অত্র**—আমার রাজ্যে; **শুচঃ**—শোক; **ব্যেতু**—হোক্; **তে**—আপনার; **বৃষলাৎ**—শূদ্র হতে; **ভয়ম্**—ভয়ের কারণ; **মা**—করো না; **রোদীঃ**—ক্রন্দন; **অম্ব**—গোমাতা; **ভদ্রম্**—সর্বমঙ্গল; **তে**—আপনার; **খলানাম্**—দুরাত্মার; **ময়ি**—আমি জীবিত থাকতে; **শাস্তরি**—শাসক অথবা নিয়ন্ত্রণকারী।

অনুবাদ

হে সুরভীনন্দন, আপনার আর শোক করার প্রয়োজন নেই। নিম্নশ্রেণীর শূদ্রটিকে ভয় পাওয়ারও দরকার নেই। আর, হে গোমাতা! আপনিও আর রোদন করবেন না। দুষ্টদের শাসনকর্তা আমি জীবিত থাকতে আপনার মঙ্গলই হবে।

তাৎপর্য

পরীক্ষিৎ মহারাজের মতো রাজাদের শাসনেই কেবল বৃষ, গাভী এবং অন্যান্য জন্তুদের রক্ষা সম্ভব হয়। পরীক্ষিৎ মহারাজ ছিলেন সংস্কৃতিসম্পন্ন, পারমার্থিক শিক্ষায় শিক্ষিত, ক্ষত্রিয় রাজা, তাই তিনি গাভীকে মাতা রূপে সম্বোধন করেছিলেন। চিৎজগতের গাভীদের নাম সুরভী এবং তাঁরা বিশেষভাবে শ্রীকৃষ্ণের দ্বারা পালিত হন। ভগবানের রূপ অনুসারে যেমন মানুষদের তৈরি করা হয়েছে, তেমনই চিৎজগতের সুরভী গাভীদের রূপ অনুসারে এই জগতের গাভীদের তৈরি করা হয়েছে।

জড় জগতে মানব সমাজ মানুষদের রক্ষা করে ঠিকই, কিন্তু সুরভী গাভীদের বংশধরদের, যারা অলৌকিক খাদ্য দুগ্ধ সরবরাহ করে মানুষদের পালন করে, তাদের রক্ষা করার জন্য কোন আইন নেই। কিন্তু মহারাজ পরীক্ষিৎ এবং পাণ্ডবেরা গাভী এবং বৃষের গুরুত্ব পূর্ণরূপে অবগত ছিলেন, এবং গোহত্যাকারীদের মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করার জন্যও তাঁরা প্রস্তুত ছিলেন।

গোরক্ষার দাবিতে কখনও কখনও আন্দোলন হয়েছে, কিন্তু ধর্মপরায়ণ রাষ্ট্রনেতার অভাবে এবং উপযুক্ত আইনের অভাবে, গাভী এবং বৃষদের রক্ষা করা হচ্ছে না। মহারাজ পরীক্ষিতের পদাঙ্ক অনুসরণ করে মানব সমাজের কর্তব্য গাভী এবং বৃষের গুরুত্ব হৃদয়ঙ্গম করে তাদের রক্ষা করার যথাযথ ব্যবস্থা অবলম্বন করা। কারণ গাভী এবং ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতি রক্ষা করা হলে পরমেশ্বর ভগবান, যিনি গাভী এবং ব্রাহ্মণদের প্রতি বিশেষ দয়াবান *(গো-ব্রাহ্মণ হিতায়)*, তিনি আমাদের প্রতি প্রসন্ন হবেন এবং প্রকৃত শান্তি এবং সমৃদ্ধি প্রদান করবেন।

শ্লোক ১০-১১

যস্য রাষ্ট্রে প্রজাঃ সর্বাস্ত্রস্যন্তে সাধ্ব্যসাধুভিঃ ।
তস্য মত্তস্য নশ্যন্তি কীর্তিরায়ুর্ভগো গতিঃ ॥ ১০ ॥
এষ রাজ্ঞাং পরো ধর্মো হ্যার্তানামার্তিনিগ্রহঃ ।
অত এনং বধিষ্যামি ভূতদ্রুহমসত্তমম্ ॥ ১১ ॥

যস্য—যাঁর; **রাষ্ট্রে**—রাজ্যে; **প্রজাঃ**—প্রাণীগণ; **সর্বা**—সকলে; **ত্রস্যন্তে**—সন্ত্রস্ত হয়ে; **সাধ্বি**—হে পবিত্র সাধ্বী জননী; **অসাধুভিঃ**—দুরাচারীদের দ্বারা; **তস্য**—তাঁর; **মত্তস্য**—মত্তের; **নশ্যন্তি**—বিনষ্ট হয়; **কীর্তিঃ**—যশ; **আয়ুঃ**—জীবৎকালে; **ভগঃ**—সৌভাগ্য; **গতিঃ**—যথার্থ পরলোক প্রাপ্তি; **এষঃ**—এগুলি; **রাজ্ঞাম্**—রাজাদের; **পরঃ**—শ্রেষ্ঠ; **ধর্মঃ**—কর্তব্য; **হি**—অবশ্যই; **আর্তানাম্**—বিপন্নদের; **আর্তি**—দুঃখ-দুর্দশা; **নিগ্রহঃ**—দূর করা; **অত**—তাই; **এনম্**—এই মানুষটিকে; **বধিষ্যামি**—বধ করব; **ভূতদ্রুহম্**—জীব হিংসাকারী; **অসত্তমম্**—সব চেয়ে অসাধু।

অনুবাদ

হে সাধ্বি, যে রাজার রাজ্যে প্রজারা অসৎ ব্যক্তিদের দ্বারা সন্ত্রস্ত হয়, সেই দুরাচার নরপতির যশ, পরমায়ু, সৌভাগ্য ও পরলোকে উৎকৃষ্ট পুনর্জন্মাদি সবই নাশ প্রাপ্ত হয়। উৎপীড়িতদের দুঃখ-দুর্দশা দূর করা অবশ্যই রাজার পরম ধর্ম, তাই আমি

অতীব জঘন্য এই মানুষটির প্রাণ অবশ্যই সংহার করব, কারণ সে অন্যান্য প্রাণীদের প্রতি হিংস্র হয়ে উঠেছে।

তাৎপর্য

যখন কোনও গ্রামে বা নগরে বন্য জন্তুরা উপদ্রব সৃষ্টি করে, তখন পুলিশ অথবা অন্য কেউ তাদের হত্যা করতে উদ্যোগী হয়। তেমনই, চোর, ডাকাত, এবং খুনীদের মতো সমস্ত অশুভ সমাজবিরোধীদের তৎক্ষণাৎ বধ করাই সরকারের কর্তব্য। পশুহত্যাকারীদেরও তেমনই শাস্তি প্রাপ্য, কারণ পশুরাও হচ্ছে রাষ্ট্রের প্রজা। প্রজা শব্দটির অর্থ হচ্ছে কোনও রাষ্ট্রে যার জন্ম হয়েছে, এবং তার মধ্যে মানুষ এবং পশু দুই-ই থাকছে। রাষ্ট্রের সীমানার মধ্যে যারই জন্ম হয়েছে, রাজার রক্ষা ব্যবস্থার মাধ্যমে জীবন যাপন করার অধিকার তারই রয়েছে। জঙ্গলের পশুরাও রাজার প্রজা, এবং তাদেরও বেঁচে থাকার অধিকার রয়েছে। সুতরাং গাভী এবং বৃষ প্রভৃতি গৃহপালিত পশুদের কথা আর বলার কী আছে। কোনও প্রাণী যদি অন্যান্য প্রাণীদের সন্ত্রস্ত করে, তা হলে সে মহা দুরাচারী, এবং রাজার কর্তব্য তেমন উপদ্রবকারীকে তৎক্ষণাৎ হত্যা করা। যেমন কোন বন্য পশু উৎপাত করলে তাকে হত্যা করা হয়, তেমনই কোনও মানুষ যদি অনর্থক বনের পশু বা অন্যান্য প্রাণীদের হত্যা করে বা সন্ত্রস্ত করে, তাকেও তৎক্ষণাৎ অবশ্যই দণ্ড দেওয়া উচিত। পরমেশ্বর ভগবানের আইনে, সমস্ত প্রাণী, যে কোনও শরীরেরই থাকুক, সকলেই ভগবানের সন্তান, এবং প্রাকৃতিক নিয়মবিধি অনুসারে অনুমোদিত না হলে অন্যায়ভাবে তাদের হত্যা করার কোনও অধিকার কারও নেই।

কোনও বাঘ জীবন ধারণের জন্য কোনও পশু হত্যা করতে পারে, কিন্তু কোনও মানুষ তার জীবন ধারণের জন্য পশুহত্যা করতে পারে না। ভগবানের সেটাই আইন, যিনি স্থির করেছেন যে, জীবকে আহার করেই জীব প্রাণ ধারণ করবে। অতএব শাকাহারী প্রাণীরাও অন্য জীবদের আহার করে জীবন ধারণ করে। সুতরাং, যে সমস্ত আহার ভগবানের আইনে নির্ধারিত হয়েছে, সেগুলি আহার করেই জীবের জীবন ধারণ করা উচিত।

ঈশোপনিষদে উপদেশ দেওয়া হয়েছে ভগবানের নির্দেশ অনুসারে জীবন যাপন করার জন্য, নিজের খেয়ালখুশি মতো নয়। বিভিন্ন প্রকার শস্য, ফল, দুধ ইত্যাদি আহার করে জীবন ধারণ করার নির্দেশ ভগবান মানুষকে দিয়েছেন, এবং কোনও কোনও বিশেষ অবস্থা ছাড়া মনুষের পক্ষে মাংস আহারের কোনই প্রয়োজন নেই।

মোহাচ্ছন্ন রাজা বা প্রশাসন কর্তারা কখনও বা মহা পণ্ডিত অথবা দার্শনিক বলে প্রচার লাভ করলেও তারা যে দেশের মধ্যে কসাইখানাগুলিতে পশুবলি

অনুমোদন করছে, এবং ঐভাবে হতভাগ্য প্রাণীদের নির্যাতন করার ফলে ঐ সব মূর্খ রাজা বা প্রশাসন কর্তাদের নিজেদের নরকের পথই সুগম হচ্ছে, তা তারা জানে না। সমাজের প্রশাসন নেতাদের প্রজাদের রক্ষার জন্য সব সময় সচেতন থাকা উচিত। প্রজা বলতে মানুষ এবং পশু উভয়কেই বোঝানো হয়, এবং তাদের কর্তব্য কোথাও কোনও প্রাণীকে অন্য কোন প্রাণী উৎপীড়ন করছে কি না সে সম্বন্ধে সব সময় অনুসন্ধান করা। উপদ্রবকারী প্রাণীকে মহারাজ পরীক্ষিতের দৃষ্টান্ত অনুসারে, তৎক্ষণাৎ বন্দী করে মৃত্যুদণ্ড দান করা উচিত।

জনগণের সরকারের অথবা জনগণের দ্বারা নির্বাচিত সরকারের মূর্খ কর্মচারীদের খেয়ালখুশি মতো নিরীহ প্রাণীদের হত্যা করতে দেওয়া উচিত নয়। শাস্ত্রের উল্লেখ অনুসারে ভগবানের বিধিনিষেধাদি সম্বন্ধে তাদের অবগত হওয়া অবশ্য কর্তব্য। মহারাজ পরীক্ষিৎ এখানে উল্লেখ করেছেন যে, ভগবানের আইন অনুসারে দায়িত্ব-জ্ঞানহীন রাজা অথবা রাষ্ট্র-প্রধানদের যশ, পরমায়ু, শৌর্যবীর্য নাশ প্রাপ্ত হয় এবং পরিণামে উন্নততর জীবন ধারা ও মৃত্যুর পরে মোক্ষলাভের সাবলীল গতি ব্যাহত হয়। এই ধরনের মূর্খ মানুষেরা পরবর্তী জীবনের অস্তিত্বে পর্যন্ত বিশ্বাস করে না।

এই সূত্রে সম্প্রতি পরলোকগত এক প্রসিদ্ধ রাজনৈতিক নেতার কথা মনে পড়ে যিনি তাঁর উইলে মহারাজ পরীক্ষিৎ যে ভগবানের আইনের উল্লেখ করেছেন সে সম্বন্ধে তাঁর চরম মূর্খতা প্রকাশ করে গেছেন। সেই রাজনৈতিক নেতাটি ভগবানের আইন সম্বন্ধে এতই অজ্ঞ ছিলেন যে, তিনি লিখে গেছেন, 'আমি এই ধরনের কোনও অনুষ্ঠানে বিশ্বাস করি না এবং মানতে চাই না, এমন কি গতানুগতিক ধারা হিসাবে সেটা মেনে নিলেও তা হবে কপটতা, এবং তার ফলে আমাদের নিজেদের এবং অন্যদের প্রতারণা করা হবে .... এই বিষয়ে আমার কোন রকম ধর্মীয় ভাবপ্রবণতা নেই।"

আধুনিক যুগের এই ধরনের বিখ্যাত রাজনীতিবিদের উক্তি এবং মহারাজ পরীক্ষিতের উক্তির মধ্যে, আমরা এক বিরাট পার্থক্য দেখতে পাই। শাস্ত্রের অনুশাসন অনুসারে মহারাজ পরীক্ষিৎ ছিলেন ধার্মিক, সেক্ষেত্রে আধুনিক রাজনীতিবিদ্‌টি নিজেরই বিশ্বাস এবং ভাবপ্রবণতা মেনে চলেছেন। জড় জগতের যে কোন মহৎ ব্যক্তিই, তিনি আর যাই হোন না কেন, একটি বদ্ধ জীব। জড়া প্রকৃতির রজ্জুতে তার হাত পা বাঁধা, কিন্তু তা সত্ত্বেও সেই মূর্খ বদ্ধ জীব তার নিজের খেয়ালখুশির আবেগে কাজ করবার মতো স্বাধীন বলে নিজেকে মনে করে।

এর সিদ্ধান্ত এই যে, পরীক্ষিৎ মহারাজের সময়ে জনগণ সুখে ছিল, এবং পশুদের যথাযথভাবে রক্ষা করা হত, কারণ প্রশাসন-কর্তা ভগবানের বিধিবিধান সম্বন্ধে অজ্ঞ ছিলেন না বা খামখেয়ালীপনা করতেন না।

মূর্খ, অবিশ্বাসী প্রাণীরা ভগবানের অস্তিত্ব অস্বীকার করতে চায় এবং অত্যন্ত দুর্লভ মনুষ্য জীবনের বিনিময়ে তারা নিজেদের ধর্মনিরপেক্ষ বলে প্রতিপন্ন করতে চায়। মানব জীবনের বিশেষ উদ্দেশ্য হচ্ছে ভগবৎ-তত্ত্বজ্ঞান অবগত হওয়া, কিন্তু মূর্খ জীবেরা বিশেষ করে এই কলিযুগে, ভগবানের বিধিবিধানের দ্বারা জন্ম, মৃত্যু, জরা এবং ব্যাধির লক্ষণাক্রান্ত বন্ধনে নিরন্তর আবদ্ধ থাকা সত্ত্বেও, বিজ্ঞানসম্মতভাবে ভগবানকে জানতে চেষ্টা করার পরিবর্তে ধর্ম বিশ্বাস আর ভগবানের অস্তিত্বের বিরোধী মতবাদ প্রচার করে থাকে।

শ্লোক ১২

কোঽবৃশ্চৎ তব পাদাংস্ত্রীন্ সৌরভেয় চতুষ্পদ ।
মা ভূবংস্ত্বাদৃশা রাষ্ট্রে রাজ্ঞাং কৃষ্ণানুবর্তিনাম্ ॥ ১২ ॥

কঃ—কে; **অবৃশ্চৎ**—ছেদন করেছে; **তব**—আপনার; **পাদান্**—পা; **ত্রীন্**—তিন; **সৌরভেয়**—হে সুরভীনন্দন; **চতুষ্পদ**—চারটি পা বিশিষ্ট প্রাণী; **মা-ভূবন্**—কখনও হয়নি; **তাদৃশা**—আপনার মতো; **রাষ্ট্রে**—রাজ্যে; **রাজ্ঞাম্**—রাজাদের; **কৃষ্ণানুবর্তিনাম্**—পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের আদর্শ অনুসরণকারী।

অনুবাদ

তিনি (মহারাজ পরীক্ষিৎ) সেই বৃষটিকে পুনরায় জিজ্ঞাসা করলেন—"হে সুরভীনন্দন, কে আপনার তিনটি পা ছেদন করেছে? পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের অনুবর্তী রাজাদের রাজ্যে আপনার মতো দুঃখ ত আর কারও হয়নি।"

তাৎপর্য

সমস্ত রাজ্যের রাজা বা প্রশাসন-কর্তাদের শ্রীকৃষ্ণের নীতি (সাধারণত *শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা* এবং *শ্রীমদ্ভাগবত*) জানা অবশ্য কর্তব্য এবং জড় জগতের দুঃখ-দুর্দশাময় জীবনের অবসান সাধন করে মানব জীবনের যথার্থ উদ্দেশ্য সাধনের চেষ্টায় সেই মতো কাজ করা উচিত। যে শ্রীকৃষ্ণের বিধিবিধান জানে, সে অনায়াসেই এই উদ্দেশ্য সাধন করতে পারে। *শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায়* সংক্ষিপ্তভাবে

ভগবানের সেই বিধিবিধান আমরা উপলব্ধি করতে পারি, এবং শ্রীমদ্ভাগবতে সেই একই বিধানই বিস্তারিতভাবে বিশ্লেষিত হয়েছে।

যে রাষ্ট্রে শ্রীকৃষ্ণের বিধিবিধান অনুসরণ করা হয়, সেখানে কেউ অসুখী থাকে না। যেখানে সেই বিধানাদি অনুসরণ করা হয় না, সেখানে ধর্মরূপী প্রতিভূর তিনটি ভিত্তিপদ কাটা যায় এবং তার ফলে সব রকমের দুঃখ-দুর্দশা দেখা দেয়। শ্রীকৃষ্ণ যখন প্রকট ছিলেন, তখন নিঃসঙ্কোচে শ্রীকৃষ্ণের ধর্মনীতি অনুসরণ করা হত, কিন্তু তাঁর অপ্রকটকালে সমাজের কর্ণধার রূপী অন্ধ মানুষদের পথ প্রদর্শন করার জন্য সেই ধরনের বিধিবিধানগুলি শ্রীমদ্ভাগবতের পাতায় লিপিবদ্ধ হয়েছে।

শ্লোক ১৩

আখ্যাহি বৃষ ভদ্রং বঃ সাধূনামকৃতাগসাম্ ।
আত্মবৈরূপ্যকর্তারং পার্থানাং কীর্তিদূষণম্ ॥ ১৩ ॥

আখ্যাহি—আমাকে বলুন; **বৃষ**—হে বৃষ; **ভদ্রম্**—ভাল; **বঃ**—আপনার; **সাধূনাম্**—সদাচারীদের; **অকৃতাগসাম্**—নিরপরাধদের; **আত্মবৈরূপ্য**—নিজের বিরূপ সাধন; **কর্তারম্**—সাধনকারীদের; **পার্থানাম্**—পৃথার পুত্রদের; **কীর্তিদূষণম্**—যশ নাশকারী ষড়যন্ত্র।

অনুবাদ

হে বৃষ, আপনি নিরপরাধ এবং সম্পূর্ণ সাধু প্রকৃতির; তাই আপনার সর্বাঙ্গীণ মঙ্গল হোক। দয়া করে আপনি আমাকে বলুন কোন্ দুষ্টজনে আপনার অঙ্গ ছেদন করেছে, যার ফলে পৃথাপুত্রদের যশ ও কীর্তি কলুষিত হচ্ছে?

তাৎপর্য

মহারাজ শ্রীরামচন্দ্রের রাজত্ব, এবং পাণ্ডব ও তাঁদের বংশধর প্রমুখ শ্রীরামচন্দ্রের পদাঙ্ক অনুসরণকারী রাজাদের রাজত্বের কীর্তি কখনই কেউ বিস্মৃত হবে না, কারণ তাদের রাজ্যে নিরপরাধ এবং সাধু প্রকৃতির প্রজাদের কখনই কোন রকম দুঃখ-দুর্দশা ভোগ করতে হয়নি। বৃষ এবং গাভী হচ্ছে সব চেয়ে নিরপরাধ জীব, কারণ তাদের বিষ্ঠা এবং মূত্র পর্যন্ত মানব সমাজের কল্যাণে লাগে।

মহারাজ পরীক্ষিতের মতো পৃথাপুত্র পাণ্ডবদের বংশধরেরা তাঁদের কীর্তি কলুষিত হওয়ার ভয়ে ভীত হয়েছিলেন, কিন্তু আধুনিক যুগের নেতারা এই ধরনের নিরপরাধ

এবং গুরুত্বগুণ প্রাণীদের হত্যা করতে দ্বিধা করে না। ভগবানের বিধিবিধান সম্পর্কে অজ্ঞ আধুনিক যুগের দায়িত্বজ্ঞানহীন প্রশাসন-কর্তাদের এবং মহারাজ পরীক্ষিতের মতো পুণ্যবান রাজাদের মধ্যে এইখানেই পার্থক্য।

শ্লোক ১৪

জনেঽনাগস্যঘং যুঞ্জন্ সর্বতোঽস্য চ মদ্ভয়ম্ ।
সাধূনাং ভদ্রমেব স্যাদসাধুদমনে কৃতে ॥ ১৪ ॥

জনে—প্রাণীদেরকে; অনাগসি—নিরপরাধ; অঘম্—দুঃখ; যুঞ্জন্—প্রয়োগের দ্বারা; সর্বতঃ—সর্বতোভাবে; অস্য—এই প্রকার অপরাধীদের; চ—এবং; মদ্ভয়ম্—আমাকে ভয় করে; সাধূনাম্—সাধুদের; ভদ্রম্—মঙ্গল; এব—অবশ্যই; স্যাৎ—হবে; অসাধু—অসৎ দুরাচারী; দমনে—দমন; কৃতে—করার জন্য।

অনুবাদ

যারা নিরপরাধ জীবের কষ্টের কারণ, এই জগতের সর্বত্রই আমি তাদের কাছে ভয়ের কারণ। দুর্বৃত্তদের দমনের মাধ্যমে স্বাভাবিকভাবে যে কেউই সাধুগণের কল্যাণ সাধন করেন।

তাৎপর্য

ভীরু এবং কাপুরুষ প্রশাসন-কর্তাদের জন্যই অসৎ প্রকৃতির দুরাচারীদের প্রভাব বৃদ্ধি পায়। কিন্তু যখন সকল প্রকার অসৎ দুরাচারীদের প্রতিহত করবার উদ্দেশ্যে প্রশাসন-কর্তারা শক্তিশালী হন, তখন রাষ্ট্রের কোনখানেই তারা বেড়ে উঠতে পারে না। যখন দুরাচারীরা উচিত মতো শাস্তি ভোগ করে, আপনা থেকেই তখন সৌভাগ্যের সূচনা হয়।

পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে, নিরপরাধ, শান্তিপ্রিয় নাগরিকদের সকল রকমে রক্ষা করাই রাজা অথবা প্রশাসন-কর্তাদের প্রাথমিক কর্তব্য। ভগবদ্-ভক্তেরা স্বভাবতই শান্তিপ্রিয় এবং নিরপরাধ, এবং তাই রাষ্ট্রের প্রাথমিক কর্তব্য হচ্ছে প্রতিটি নাগরিককে ভগবদ্ভক্তে পরিণত করার ব্যবস্থা করা। তা হলে আপনা থেকেই নাগরিকেরা শান্তিপ্রিয় এবং নিরপরাধ হবে। তখন রাজার একমাত্র কর্তব্য হবে দুষ্টদের দমন করা। তা হলেই সমগ্র মানব সমাজে শান্তি এবং শৃঙ্খলা আসবে।

শ্লোক ১৫

অনাগঃস্বিহ ভূতেষু য আগস্কৃন্নিরঙ্কুশঃ ।
আহর্তাস্মি ভুজং সাক্ষাদমর্ত্যস্যাপি সাঙ্গদম্ ॥ ১৫ ॥

অনাগঃস্বিহ—নিরপরাধদের; **ভূতেষু**—জীবদের; **যঃ**—যে ব্যক্তি; **আগঃ কৃৎ**—অপরাধ করে; **নিরঙ্কুশঃ**—প্রতিহত গতি; **আহর্তাস্মি**—আমি সম্পাদন করব; **ভুজম্**—বাহু; **সাক্ষাৎ**—স্বয়ং; **অমর্ত্যস্যাপি**—এমন কি সে যদি দেবতাও হয়; **স-অঙ্গদম্**—অলংকার এবং বর্মের দ্বারা অলংকৃত।

অনুবাদ

যে দুর্বৃত্ত নিরপরাধ জীবের প্রতি হিংসা করে অপরাধী হয়েছে, সে যদি স্বর্গের বর্ম-অলংকৃত সাক্ষাদ্ দেবতাও হয়, তবু আমি তার বাহু ছেদ করে ফেলব।

তাৎপর্য

মনুষ্যদের তুলনায় অনেক বেশি দীর্ঘায়ু বলে স্বর্গরাজ্যের অধিবাসীদের অমর বা মৃত্যুহীন বলা হয়। মনুষ্যদের আয়ু বড় জোর একশ বছর, তাই কারও আয়ু লক্ষ কোটি বছরেরও বেশি হলে, তাকে অবশ্যই অমর বা মৃত্যুহীন বলা যেতে পারে। যেমন *শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা* থেকে আমরা জানতে পারি যে, ব্রহ্মগ্রহ লোকে একদিন হয় আমাদের গণনায় ৪৩,০০, ০০০ x ১০০০ সৌর বছর। তেমনই, আমাদের ছ' মাসে স্বর্গলোকের একদিন, সেখানকার অধিবাসীদের আয়ু এই গ্রহের গণনা অনুসারে এক কোটি বছর। তাই উচ্চতর লোকের অধিবাসীদের আয়ু অত্যন্ত দীর্ঘ হওয়ার ফলে যদিও তাদের অমর বলা হয়, প্রকৃতপক্ষে এই জড় জগতে কেউই অমর নয়।

মহারাজ পরীক্ষিৎ ঘোষণা করেছিলেন স্বর্গের দেবতারাও যদি নিরপরাধ ব্যক্তিকে নির্যাতন করে, তা হলে তিনি তাদেরও দণ্ড দেবেন। এর থেকে বোঝা যায় যে, প্রশাসনকর্তাকে পরীক্ষিৎ মহারাজের মতো শক্তিশালী হতে হবে যাতে অপরাধী যতই শক্তিশালী হোক, তাকে দণ্ড দিতে তাঁরা বদ্ধপরিকর থাকেন। ভগবানের আইন অমান্যকারীদের সর্বদাই দণ্ড দিতে হবে—এটাই রাষ্ট্রীয় প্রশাসন-কর্তার নীতি হওয়া উচিত।

শ্লোক ১৬

রাজ্ঞো হি পরমো ধর্মঃ স্বধর্মস্থানুপালনম্ ।
শাসতোঽন্যান্ যথাশাস্ত্রমনাপদ্যুৎপথানিহ ॥ ১৬

রাজ্ঞঃ—রাজা বা প্রশাসনকর্তা; **হি**—অবশ্যই; **পরমঃ**—শ্রেষ্ঠ; **ধর্ম**—কর্তব্য; **স্ব-ধর্ম-স্থ**—স্বধর্মনিষ্ঠ; **অনুপালনম্**—সর্বদা পালনশীল; **শাসতঃ**—শাসনকালে;

অন্যান্—অন্যদের; যথা—অনুসারে; শাস্ত্রম্—শাস্ত্রের অনুশাসন; অনাপদি—বিপদমুক্ত; উৎপথান্—বিপথগামী; ইহ—বাস্তবিক।

অনুবাদ

যারা শাস্ত্রের অনুশাসন অনুসারে নিজ নিজ ধর্ম পালন করেন, তাঁদের পালন করা এবং যখন জরুরী অবস্থা থাকে না, তখনও যারা শাস্ত্রবিধি উল্লঙ্ঘন করে আপৎশূন্য স্বাভাবিক কালেও বিপথগামী হয়, তাদের যথাশাস্ত্র তিরস্কার করাই শাসনকারী রাজার পরম ধর্ম।

তাৎপর্য

শাস্ত্রে আপদ-ধর্ম, বা বিশেষ সঙ্কটকালে কর্তব্যকর্মের উল্লেখ করা হয়েছে। যেমন কোন বিশেষ সঙ্কটকালে বিশ্বামিত্র ঋষিকে কুকুরের মাংস আহার করে জীবন ধারণ করতে হয়েছিল। সঙ্কটকালে সব রকমের পশুর মাংস আহার অনুমোদন করা যেতে পারে, কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে, মাংসাহারী জনগণের উদরপূর্তির জন্য কসাইখানায় পশুহত্যা অনুমোদন করতে হবে, আর সেই ব্যবস্থার পৃষ্ঠপোষকতা করবে রাষ্ট্র, তা হয় না। কেবলমাত্র জিহ্বার তৃপ্তি সাধনের জন্য, স্বাভাবিক সময়ে, কারোরই মাংস আহারের প্রয়াস করা উচিত নয়। কেউ যদি তা করে, তা হলে রাজা অথবা প্রশাসনকর্তার কর্তব্য, তাদের এই জঘন্য আচরণের জন্য দণ্ড দান করা।

ভিন্ন ভিন্ন বর্ণের মানুষদের জন্য শাস্ত্রে বিশেষ অনুশাসনাদি দেওয়া হয়েছে, এবং যিনি এই নির্দেশগুলি পালন করেন, তাঁকে বলা হয় স্ব-ধর্মস্থ, অর্থাৎ নির্ধারিত ধর্মচর্চায় বিশ্বস্ত। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় (১৮/৪৮) উপদেশ দেওয়া হয়েছে যে, নিখুঁতভাবে আচরণ করতে সক্ষম না হলেও স্বধর্ম কখনও ত্যাগ করা উচিত নয়। সঙ্কটকালে পারিপার্শ্বিক অবস্থার চাপে, ঐসব স্ব-ধর্ম লঙ্ঘন করা যেতে পারে, কিন্তু স্বাভাবিক পরিবেশে সেগুলি কখনও লঙ্ঘন করা উচিত নয়। যাতে কেউ তার স্ব-ধর্ম পরিবর্তন না করে, তা দেখা এবং স্বধর্মনিষ্ঠ ব্যক্তিদের পালন করা রাষ্ট্রীয় প্রশাসনকর্তার কর্তব্য। যারা শাস্ত্রের অনুশাসন লঙ্ঘন করে, তারা শাস্ত্রের বিধান অনুসারে দণ্ডনীয়, এবং সকলে যাতে কঠোর নিষ্ঠা সহকারে শাস্ত্রবিধি অনুসরণ করে, রাজার তা দেখা কর্তব্য।

শ্লোক ১৭

ধর্ম উবাচ

এতদ্ বঃ পাণ্ডবেয়ানাং যুক্তমার্তাভয়ং বচঃ ।
যেষাং গুণগণৈঃ কৃষ্ণো দৌত্যাদৌ ভগবান্ কৃতঃ ॥ ১৭ ॥

ধর্ম উবাচ—ধর্ম বললেন; **এতৎ**—এই সমস্ত; **বঃ**—আপনার দ্বারা; **পাণ্ডবেয়ানাম্**—পাণ্ডবদের বংশধর; **যুক্তম্**—উপযুক্ত; **আর্ত**—বিপন্ন; **অভয়ম্**—সমস্ত ভয় থেকে মুক্তি; **বচঃ**—বাণী; **যেষাম্**—যাদের; **গুণগণৈঃ**—গুণসমূহের দ্বারা; **কৃষ্ণঃ**—পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ; **দৌত্য-আদৌ**—দৌত্য আদি কার্য; **ভগবান্**—পরমেশ্বর ভগবান; **কৃতঃ**—করেছিলেন।

অনুবাদ

ধর্মরাজ বললেন ঃ যে পাণ্ডবদের ভক্তিভাবময় গুণবৈশিষ্ট্যাদিতে বিমুগ্ধ হয়ে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ পর্যন্ত দৌত্যাদি কর্তব্যকর্ম পালন করেছিলেন, আপনি সেই পাণ্ডবদেরই বংশধরের মতো উপযুক্ত কথাই বলেছেন।

তাৎপর্য

মহারাজ পরীক্ষিৎ ধর্মপরায়ণ ব্যক্তিদের পালন করার যে আশ্বাস দিয়েছিলেন এবং দুরাচারীদের দণ্ডদানের নির্ভীকতা ব্যক্ত করেছিলেন, সেটা তাঁর যথার্থ ক্ষমতার অত্যুক্তি হয়নি। তিনি ঘোষণা করেছিলেন যে, স্বর্গের দেবতারাও যদি ধর্মের অনুশাসন লঙ্ঘন করেন, তা হলে তাঁরাও তাঁর কঠোর শাসন ব্যবস্থা পরিহার করতে পারবেন না। তিনি বৃথা গর্ব করেননি, কারণ ভগবানের ভক্ত ভগবানেরই মতো শক্তিশালী, এমন কি কখনও-বা ভগবানের কৃপায় তাঁরা ভগবানের থেকেও অধিক শক্তিশালী হন, এবং ভক্তের প্রতিজ্ঞা যত অসম্ভবই হোক, ভগবানের কৃপায় কখনই তা নিষ্ফল হয় না।

পাণ্ডবেরা ভগবানের প্রতি ঐকান্তিকভাবে ভক্তিপরায়ণ হওয়ার ফলে এবং সম্পূর্ণরূপে শরণাগত হওয়ার ফলে ভগবান তাঁদের সারথ্য গ্রহণ করেছিলেন বা কখনও তাঁদের পত্রবাহক হয়েছিলেন। পূর্ণ প্রেম এবং ভক্তি সহকারে ভগবানের সেবা ছাড়া যাঁরা আর কিছুই জানেন না, সেই অনন্য ভক্তদের সেবা করে ভগবান আনন্দ উপভোগ করেন।

ভগবানের সখা অর্জুনের পৌত্র মহারাজ পরীক্ষিৎ তাঁর পিতামহেরই মতো ভগবানের শুদ্ধ ভক্ত ছিলেন, এবং তাই ভগবান সর্বদাই তাঁর সঙ্গে ছিলেন, এমন

কি তাঁর মাতৃগর্ভে অবস্থানকালেও অশ্বত্থামার জ্বলন্ত ব্রহ্মাস্ত্রের আক্রমণ থেকে ভগবান স্বয়ং তাঁকে রক্ষা করেছিলেন। ভক্তকে ভগবান সর্বদাই রক্ষা করেন, এবং তাই মহারাজ পরীক্ষিতের আশ্বাসবাণী কখনই নিরর্থক ছিল না। ধর্মরাজ তা যথার্থভাবেই স্বীকার করেছিলেন এবং পরীক্ষিৎ মহারাজকে তাঁর মহানুভব মর্যাদার উপযোগী উদ্যোগের জন্য ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেছিলেন।

শ্লোক ১৮

ন বয়ং ক্লেশবীজানি যতঃ স্যুঃ পুরুষর্ষভ ।
পুরুষং তং বিজানীমো বাক্যভেদবিমোহিতাঃ ॥ ১৮ ॥

ন—না; বয়ম্—আমরা; ক্লেশবীজানি—দুঃখের মূল কারণ; যতঃ—যেখান থেকে; স্যুঃ—হয়েছে; পুরুষ-ঋষভ—হে নরশ্রেষ্ঠ; পুরুষম্—ব্যক্তি; তম্—তা; বিজানীমঃ—জানা; বাক্যভেদ—বাক্য বিরোধ; বিমোহিতাঃ—মুগ্ধ।

অনুবাদ

হে নরশ্রেষ্ঠ, কোন্ বিশেষ দুরাচারী যে আমাদের দুঃখ-দুর্দশা ঘটিয়েছে, তা নির্ণয় করা খুবই কঠিন, কারণ বহু মতাবলম্বী দার্শনিকদের বিভিন্ন সব অভিমতের দ্বারা আমরা বিমুগ্ধ হয়ে গেছি।

তাৎপর্য

এই জগতে বহু মতাবলম্বী দার্শনিকেরা কার্যকারণ সম্পর্কে, বিশেষ করে দুঃখের কারণ সম্পর্কে, আর বিভিন্ন জীবের ওপরে তার প্রভাব নিয়ে তাদের নিজেদের মতবাদ উপস্থাপন করে থাকে। মোটামুটি ছ' জন মহাদার্শনিক হলেন ঃ বৈশেষিক দর্শনের প্রণেতা কণাদ, ন্যায়ের প্রণেতা গৌতম, যোগের প্রণেতা পতঞ্জলি; সাংখ্য দর্শনের প্রণেতা কপিল, কর্ম মীমাংসার প্রণেতা জৈমিনি, এবং বেদান্ত-দর্শনের প্রণেতা ব্যাসদেব।

যদিও বৃষরূপী ধর্ম, এবং গাভীরূপী ধরণী যথার্থই জানতেন যে, কলি হচ্ছে তাঁদের দুঃখের সাক্ষাৎ হেতু, তথাপি ভগবদ্ভক্ত হওয়ার ফলে, তাঁরা ভালভাবেই জেনেছিলেন যে, ভগবানের অনুমোদন ছাড়া কেউই তাঁদের সঙ্কটাপন্ন করতে পারে না।

পদ্মপুরাণ অনুসারে, প্রারব্ধ পাপ কর্মের চারা গাছে ফল ধরার জন্যই আমাদের এখন ক্লেশ ভোগ হচ্ছে, কিন্তু সেই প্রারব্ধ পাপের চারাগুলিও শুদ্ধ ভগবদ্ভক্তি

অনুশীলনের মাধ্যমে ধীরে ধীরে বিলীন হয়ে যায়। তাই দুষ্কৃতকারীদের দেখলেও ভগবদ্ভক্তেরা তাঁদের ক্লেশের জন্য কাউকে দোষারোপ করেন না। তাঁরা স্বীকার করে নেন যে, কোন পরোক্ষ কারণের প্রভাবেই সেই দুরাচারটি তার কর্ম করছে এবং তাই তাঁরা সমস্ত দুঃখ-দুর্দশাকে ভগবানের কৃপা বলে মনে করে গ্রহণ করেন। তাঁরা মনে করেন যে, নেহাৎ কোন দুর্ঘটনা ঘটার ছিল, কিন্তু ভগবানের কৃপায় অল্পের উপর দিয়ে তা কেটে গেল।

মহারাজ পরীক্ষিৎ তাঁদের কাছ থেকে জানতে চেয়েছিলেন যে, দুষ্কৃতকারী ব্যক্তিটি কে, কিন্তু উপরোক্ত মনোভাবের ফলে তাঁরা তা জানালেন না। মনোধর্মী দার্শনিকেরা অবশ্য স্বীকার করে না যে, ভগবানের অনুমোদনই হচ্ছে পরম কারণ, পক্ষান্তরে তাদের নিজস্ব জল্পনা-কল্পনার মাধ্যমে দুঃখের কারণ নির্ধারণ করার চেষ্টা করে, যা পরবর্তী শ্লোকগুলিতে বর্ণিত হবে। শ্রীল জীব গোস্বামীর মতে, এই ধরনের মনোধর্মী দার্শনিকেরা বিভ্রান্ত এবং মোহাচ্ছন্ন, তাই তারা পরমেশ্বর ভগবানকে সর্ব কারণের পরম কারণ বলে জানতে পারে না।

শ্লোক ১৯

কেচিদ্ বিকল্পবসনা আহুরাত্মানমাত্মনঃ ।
দৈবমন্যেঽপরে কর্ম স্বভাবমপরে প্রভুম্ ॥ ১৯ ॥

কেচিৎ—তাদের কেউ; **বিকল্প বসনাঃ**—যারা দ্বৈতবাদ স্বীকার করে না; **আহুঃ**—ঘোষণা করে; **আত্মানম্**—নিজেদের; **আত্মনঃ**—আত্মার; **দৈবম্**—দেবতাদের; **অন্যে**—অন্যেরা; **অপরে**—অপর কেউ; **কর্ম**—কর্ম; **স্বভাবম্**—স্বভাব বা প্রকৃতি; **অপরে**—অপর অনেকে; **প্রভুম্**—প্রভু বা প্রধান কর্তা।

অনুবাদ

কিছু দার্শনিক যাঁরা সব রকমের দ্বৈতভাব অস্বীকার করেন, তাঁরা প্রচার করেন যে, জীব নিজেই নিজের সুখ-দুঃখের জন্য দায়ী। অন্যেরা বলে যে, অতিমানবীয় শক্তিই সুখ-দুঃখের জন্য দায়ী। আবার অন্যেরা বলে যে, কর্মই সুখ-দুঃখের কর্তা; তেমনি আবার জড়বাদীরা বলে যে, স্বভাব বা প্রকৃতি আমাদের সুখ-দুঃখের পরম কারণ।

তাৎপর্য

পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে, জৈমিনি প্রমুখ দার্শনিক এবং তাদের অনুগামীদের মতে, কর্মই হচ্ছে সুখ এবং দুঃখের কারণ; আর যদি কোন অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন

ঈশ্বর বা নিয়ন্তা থেকে থাকেন, তা হলেও তিনি কর্মের অধীন, কারণ তাঁরা কর্ম অনুসারে ফল প্রদান করে থাকেন। তাঁরা বলেন যে, কর্ম স্বতন্ত্র নয়, কারণ কর্তার দ্বারাই কর্ম সম্পাদিত হয়; তাই কর্তাই হচ্ছেন তাঁর সুখ এবং দুঃখের প্রকৃত কারণ।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় (৬/৫) প্রতিপন্ন হয়েছে যে, জড় জগতের প্রভাব থেকে মুক্ত মনের দ্বারা জড় জগতের দুঃখ-দুর্দশার বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়া যায়। তাই মনের আসক্তির প্রভাবে জড় জগতের বন্ধনে আবদ্ধ হওয়া উচিত নয়। মন আমাদের বন্ধুরূপে এবং শত্রুরূপে জড় সুখ এবং দুঃখ প্রদান করে।

নিরীশ্বর জড়বাদী সাংখ্য দার্শনিকদের মতে জড়া প্রকৃতিই সর্ব কারণের পরম কারণ। তাঁদের মতে, প্রকৃতির উপাদানগুলির সমন্বয়ের ফলে সুখ এবং দুঃখের উদ্ভব হয় এবং সেই উপাদানগুলির বিয়োজনের মাধ্যমে কেবল সমস্ত দুঃখ-দুর্দশার নিবৃত্তি হয়।

গৌতম এবং কণাদের মতে, পরমাণুর সমন্বয় সব কিছুর কারণ। আর, অষ্টাবক্র প্রমুখ নির্বিশেষবাদীদের মতে, ব্রহ্ম হচ্ছে সর্ব কারণের পরম কারণ। কিন্তু *শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায়* ভগবান স্বয়ং ঘোষণা করেছেন যে, তিনি হচ্ছেন ব্রহ্মের প্রতিষ্ঠা বা উৎস, এবং তাই তিনি হচ্ছেন সর্ব কারণের পরম কারণ। ব্রহ্ম সংহিতাতেও প্রতিপন্ন হয়েছে যে, শ্রীকৃষ্ণই হচ্ছেন সর্ব কারণের পরম কারণ।

শ্লোক ২০

অপ্রতর্ক্যাদনির্দেশ্যাদিতি কেম্বপি নিশ্চয়ঃ ।
অত্রানুরূপং রাজর্ষে বিমৃশ স্বমনীষয়া ॥ ২০ ॥

অপ্রতর্ক্যাৎ—বিচার বুদ্ধির অতীত; **অনির্দেশ্যাৎ**—চিন্তাশক্তির অতীত; **ইতি**—এইভাবে; **কেষু**—কেউ কেউ; **অপি**—ও; **নিশ্চয়ঃ**—সিদ্ধান্ত করেন; **অত্র**—এখানে; **অনুরূপম্**—যোগ্য; **রাজর্ষে**—হে রাজর্ষি; **বিমৃশ**—বিচার করুন; **স্ব**—নিজের; **মনীষয়া**—বুদ্ধির দ্বারা।

অনুবাদ

কিছু মনীষী আছেন, যাঁরা বিশ্বাস করেন যে, যুক্তি বিচারের সাহায্যে দুঃখ-শোকের কারণ নির্ণয় করতে কেউ পারে না, বা কল্পনার সাহায্যেও তা জানতে পারে না, অথবা ভাষায় প্রকাশ করতেও পারে না। হে রাজর্ষি, আপনার নিজের মনীষার সাহায্যে এই সকল বিষয়ে চিন্তা করে আপনি নিজেই বিচার করুন।

তাৎপর্য

ভগবদ্ভক্ত বৈষ্ণবেরা বিশ্বাস করেন যে, পরমেশ্বর ভগবানের অনুমোদন ব্যতীত কোনও কিছুই সংঘটিত হতে পারে না। তিনি পরম নিয়ন্তা। *শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায়* (১৫/১৫) প্রতিপন্ন হয়েছে যে, তিনি সর্বত্র বিরাজমান পরমাত্মারূপে সকলেরই হৃদয়ে বিরাজ করেন এবং সমস্ত কার্যকলাপের সাক্ষী হয়ে থাকেন। কোনও নাস্তিক পূর্বে এবং বর্তমানে যা কিছু করেছে, তা সে ভুলে যেতে পারে, কিন্তু পরমাত্মা কোন কিছুই ভোলেন না। জড় দেহরূপ বৃক্ষে আত্মা এবং পরমাত্মা দু'টি পক্ষীর মতো বিরাজ করেন। আত্মারূপী পক্ষীটি বৃক্ষের ফল ভোগ করে, আর পরমাত্মা সেই পক্ষীটির সমস্ত কার্যকলাপের সাক্ষ্য বহন করেন। পরমাত্মা জীবের সমস্ত কার্যকলাপের সাক্ষী থাকেন, এবং তাঁরই নির্দেশনায় জীবের পূর্বকৃত কার্যকলাপের স্মরণ এবং বিস্মরণ হয়। তাই তিনিই, সর্বব্যাপ্ত নির্বিশেষ ব্রহ্ম এবং প্রতিটি জীবের হৃদয়ে বিরাজমান পরমাত্মা। তিনি ভূত, ভবিষ্যৎ এবং বর্তমান সম্বন্ধে পূর্ণরূপে অবগত, এবং তাঁর কাছে কোনও কিছুই লুকানো যায় না।

ভগবদ্ভক্তেরা এই তত্ত্ব জানেন, এবং তাই তাঁরা সুফলের জন্য উদ্বেগাকুল না হয়ে নিষ্ঠা সহকারে তাঁদের কর্তব্য সম্পাদন করেন। তা ছাড়া জল্পনা-কল্পনা অথবা জ্ঞানবত্তার দ্বারা ভগবানের প্রতিক্রিয়া বিচার করা যায় না। কেন তিনি কাউকে সঙ্কটে ফেলেন আর অন্য কাউকে ফেলেন না? তিনি বৈদিক জ্ঞানের পরম তত্ত্ববেত্তা, এবং তাই তিনিই প্রকৃত বৈদান্তিক, এবং তাই তিনি বেদান্তের প্রণেতা। কেউই তাঁর থেকে স্বতন্ত্র নয়, এবং সকলেই ভিন্ন ভিন্ন ভাবে তাঁর সেবায় যুক্ত। বদ্ধ অবস্থায়, জীব জড়া প্রকৃতির বল প্রয়োগে তাঁর সেবা করতে বাধ্য হয়, সেক্ষেত্রে মুক্ত অবস্থায় জীব চিন্ময় প্রকৃতির সহায়তায় তাঁর স্বতঃস্ফূর্ত প্রেমময়ী সেবায় যুক্ত হন। ভগবানের কার্যকলাপে কোন অসামঞ্জস্য বা অপূর্ণতা নেই। সকলেই সেই পরম সত্যের পথে এগিয়ে চলেছে। ভীষ্মদেব ভগবানের অচিন্ত্য কার্যকলাপ সঠিকভাবেই বিচার করেছিলেন। তাই এই সিদ্ধান্ত হল, মহারাজ পরীক্ষিৎ যে একজন আদর্শ রাজা, একথা প্রমাণ করার পরিকল্পনা নিয়েই তাঁর সম্মুখে উপস্থিত ধর্ম এবং ভূমিদেবীর প্রতিনিধিদের যে দুঃখ-দুর্দশা, তা উপস্থাপিত হল। কারণ তিনি উত্তমরূপেই জানতেন কিভাবে পারমার্থিক প্রগতির দুটি স্তম্ভ স্বরূপ গাভী (পৃথিবী) এবং ব্রাহ্মণদের (ধর্ম) পালন করতে হয়।

সকলেই পরমেশ্বর ভগবানের সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণাধীন। বিশেষ অবস্থায় বিবেচনা অগ্রাহ্য করে, তিনি যখন কাউকে দিয়ে কিছু করিয়ে নিতে চান, তা তিনি সম্পূর্ণ ন্যায্যভাবেই করিয়ে থাকেন। তিনি যখন কাউকে দিয়ে কিছু করানোর অভিলাষ করেন, তখন বিশেষ ঘটনার বিবেচনা যাই হোক না কেন, তিনি সম্পূর্ণ ন্যায্যভাবেই

তা করান। মহারাজ পরীক্ষিতকে এইভাবে তাঁর মহানুভবতার পরীক্ষার সম্মুখীন করা হয়েছিল। এখন দেখা যাক্ কিভাবে তিনি তাঁর বিচক্ষণতার দ্বারা এর সমাধান করেন।

শ্লোক ২১

সূত উবাচ

এবং ধর্মে প্রবদতি স সম্রাড় দ্বিজসত্তমাঃ ।
সমাহিতেন মনসা বিখেদঃ পর্যচষ্ট তম্ ॥ ২১ ॥

সূত উবাচ—সূত গোস্বামী বললেন; **এবম্**—এইভাবে; **ধর্মে**—মূর্তিমান ধর্ম; **প্রবদতি**—বললেন; **সঃ**—তিনি; **সম্রাট**—মহারাজ পরীক্ষিৎ; **দ্বিজসত্তমাঃ**—হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ; **সমাহিতেন**—একাগ্রভাবে; **মনসা**—মনের দ্বারা; **বিখেদঃ**—বিগত মোহ; **পর্যচষ্ট**—প্রত্যুত্তর দিলেন; **তম্**—তাঁকে।

অনুবাদ

সূত গোস্বামী বললেন—হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ, এইভাবে মহারাজ পরীক্ষিৎ ধর্মরাজের কথা শ্রবণ করে সম্পূর্ণ সন্তুষ্ট হলেন এবং নির্ভুল ও বিগতমোহ হয়ে তিনি তার উত্তর দিলেন।

তাৎপর্য

বৃষরূপী ধর্মের উক্তি দার্শনিক জ্ঞানে পূর্ণ হওয়ার ফলে মহারাজ পরীক্ষিৎ সন্তুষ্ট হয়েছিলেন, কারণ তিনি বুঝতে পেরেছিলেন, দুর্দশাক্লিষ্ট সেই বৃষটি কোন সাধারণ বৃষ ছিল না। পরমেশ্বর ভগবানের আইন পূর্ণরূপে অবগত না থাকলে কেউ এইভাবে দার্শনিক তত্ত্বের ভিত্তিতে বিচার করতে পারে না। মহারাজ পরীক্ষিতও ছিলেন তেমনই বিচক্ষণ, তাই তিনিও নির্দ্বিধায় এবং নির্ভুলভাবে তাঁর উত্তর দিয়েছিলেন।

শ্লোক ২২

রাজোবাচ

ধর্মং ব্রবীষি ধর্মজ্ঞ ধর্মোঽসি বৃষরূপধৃক্ ।
যদধর্মকৃতঃ স্থানং সূচকস্যাপি তদ্ভবেৎ ॥ ২২ ॥

রাজা উবাচ— রাজা বললেন; ধর্মম্—ধর্ম; ব্রবীষি—আপনি বলছেন; ধর্মজ্ঞ—ধর্ম বিষয়ে অভিজ্ঞ; ধর্মঃ—মূর্তিমান ধর্ম; অসি—আপনি হন; বৃষ-রূপ-ধৃক—বৃষরূপী; যৎ—যা কিছু ; অধর্মকৃতঃ—অধার্মিক; স্থানম্—স্থান; সূচকস্য—নির্দেশকারীর; অপি—ও; তৎ—তা; ভবেৎ—হয়।

অনুবাদ

মহারাজ পরীক্ষিৎ বললেন—হে বৃষরূপধারী ধর্মজ্ঞ! ধর্ম শাস্ত্রে বলা হয় যে, অধার্মিক বা পাপাচারীর যে স্থান লাভ হয়, অধর্ম নির্দেশকেরও সেই স্থান লাভ হয়ে থাকে। সেই জন্য আপনার অনিষ্টকারীকে জেনেও আপনি তার পরিচয় দিচ্ছেন না, সুতরাং নিশ্চয়ই আপনি সাক্ষাৎ ধর্ম—বৃষরূপ ধারণ করেছেন মাত্র।

তাৎপর্য

ভগবদ্ভক্তের বিবেচনায় ভগবানের অনুমোদন ব্যতীত কেউই কারও উপকার অথবা অনিষ্ট সাধন করতে পারে না; তাই তিনি এই ধরনের কার্যকলাপের জন্য কাউকেই দায়ী করেন না। পক্ষান্তরে, তিনি ভাল এবং মন্দ সব কিছুই ভগবানের কৃপা বলে গ্রহণ করেন। যা কিছু ভাল, তা যে ভগবানের কৃপা তা কেউই অস্বীকার করে না, কিন্তু যখন কোন খারাপ কিছু ঘটে, তখন সন্দেহ হতে পারে ভগবান কেন তাঁর ভক্তের প্রতি এত নির্দয় হলেন এবং তাকে এই রকম কষ্টের মধ্যে ফেললেন।

আপাতদৃষ্টিতে যিশুখ্রিস্টকে মূর্খদের দ্বারা ক্রুশবিদ্ধ হওয়ার ফলে প্রচণ্ড কষ্ট ভোগ করতে হয়েছিল, কিন্তু তিনি কখনও সেই দুষ্কৃতকারীদের প্রতি ক্রুদ্ধ হননি। ভাল মন্দ সব কিছুই ভগবানের আশীর্বাদ রূপে গ্রহণ করার এটি একটি আদর্শ দৃষ্টান্ত। তাই ভক্তের কাছে অনিষ্টকারীর ইঙ্গিতকারীও অপরাধী। ভগবানের কৃপায় ভক্ত সমস্ত দুঃখ-দুর্দশা সহ্য করেন। মহারাজ পরীক্ষিৎ তা লক্ষ্য করেছিলেন এবং তাই তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে, সেই বৃষটি স্বয়ং ধর্ম ব্যতীত আর কেউ নয়। এইভাবে আমরা দেখতে পাই যে, ভগবানের ভক্ত কষ্টকেও কষ্ট বলে মনে করেন না, কেননা তাঁর কাছে কষ্টও ভগবানের আশীর্বাদ। এইভাবে তিনি সর্বত্র ভগবানকে দর্শন করেন।

যদিও সকলেই রাজার কাছে অভিযোগ করতে পারে, কিন্তু কলি কর্তৃক নির্যাতিত হওয়া সত্ত্বেও সেই গাভী এবং বৃষটি মহারাজ পরীক্ষিতের কাছে কোনও অভিযোগ করেননি। বৃষটির সেই বিস্ময়কর আচরণ লক্ষ্য করে সেই পরীক্ষিৎ মহারাজ স্থির করেছিলেন যে, তিনি নিশ্চয়ই মূর্তিমান ধর্ম, কেননা তা না হলে অন্য কারো পক্ষে ধর্মের অতি সূক্ষ্ম বিচার হৃদয়ঙ্গম করা সম্ভব নয়।

শ্লোক ২৩

অথবা দেবমায়ায়া নূনং গতিরগোচরা ।
চেতসো বচসশ্চাপি ভূতানামিতি নিশ্চয়ঃ ॥ ২৩ ॥

অথবা—অথবা; **দেব**—ভগবান; **মায়ায়াঃ**—ভগবানের শক্তির; **নূনম্**—অতি অল্প; **গতিঃ**—গতি; **অগোচরা**—অগোচর; **চেতসঃ**—মনের; **বচসঃ**—বাক্যের; **চ**—অথবা; **অপি**—ও; **ভূতানাম্**—সমস্ত জীবের; **ইতি**—এইভাবে; **নিশ্চয়ঃ**—নিশ্চয়।

অনুবাদ

এইভাবে দৈবী মায়ার গতি নিশ্চয় জীবেদের মন এবং বাক্যের অগোচর, এতে কোনও সন্দেহ নেই।

তাৎপর্য

এখানে প্রশ্ন হতে পারে, ভগবানকে সব কিছুর পরম কর্তা বলে জানলেও, ভক্ত কেন দুষ্কৃতকারীর পরিচয় প্রকাশ করবে না। পরম কর্তাকে জানলেও প্রকৃত কর্তা সম্বন্ধে অজ্ঞ থাকার অভিনয় করা উচিত নয়। এর উত্তরে বলা যায় যে, ভগবান কোন কর্মের জন্যই সরাসরি দায়ী নন, কেননা সব কিছুই তাঁর শক্তি বা জড়া প্রকৃতির দ্বারা সংঘটিত হয়। জড়া প্রকৃতি বা মায়া সর্বদাই পরমেশ্বর ভগবানের পরম প্রভুত্ব সম্বন্ধে সন্দেহের উদ্রেক করে। ধর্ম ভালভাবেই জানতেন যে, পরমেশ্বর ভগবানের অনুমোদন ব্যতীত কোনও কিছুই ঘটতে পারে না, কিন্তু তা সত্ত্বেও তিনি মায়া শক্তির প্রভাবে দ্বিধাগ্রস্ত হয়েছিলেন, এবং তাই তিনি পরম কারণ সম্বন্ধে উল্লেখ করা থেকে নিরস্ত হয়েছিলেন। জড়া প্রকৃতি এবং কলির প্রভাবে কলুষিত হওয়ার ফলে তিনি এই দ্বিধাগ্রস্ত অবস্থা প্রাপ্ত হয়েছিলেন। কলিযুগে সমগ্র পরিবেশ মায়ার প্রভাবে আচ্ছন্ন, এবং তার মাত্রা নির্ধারণ করা অসম্ভব।

শ্লোক ২৪

তপঃ শৌচং দয়া সত্যমিতি পাদাঃ কৃতে কৃতাঃ ।
অধর্মাংশৈস্ত্রয়ো ভগ্নাঃ স্ময়সঙ্গমদৈস্তব ॥ ২৪ ॥

তপঃ—তপস্যা; **শৌচম্**—শৌচ; **দয়া**—দয়া; **সত্যম্**—সত্য; **ইতি**—এইভাবে; **পাদাঃ**—পাগুলি; **কৃতে**—সত্যযুগে; **কৃতাঃ**—প্রতিষ্ঠিত ছিল; **অধর্ম**—অধর্ম; **অংশৈ**—অংশের দ্বারা; **ত্রয়ঃ**—তিনটি; **ভগ্নাঃ**—ভগ্ন; **স্ময়**—অহঙ্কার; **সঙ্গ**—অত্যধিক স্ত্রীসঙ্গ; **মদৈঃ**—নেশা; **তব**—তোমার।

অনুবাদ

সত্যযুগে তপস্যা, শৌচ, দয়া ও সত্য রূপ তোমার চারটি পা প্রতিষ্ঠিত ছিল। কিন্তু এখন আমি দেখছি যে, অহঙ্কার, স্ত্রীসঙ্গ এবং নেশাজনিত মত্ততা রূপে বর্ধমান অধর্মের প্রভাবে তোমার তিনটি পা ভগ্ন হয়েছে।

তাৎপর্য

জীব যে পরিমাণে মায়ার আকর্ষণের শিকার হয়, সেই পরিমাণে মায়া বা জড়া প্রকৃতি জীবের উপর তার প্রভাব বিস্তার করে। পতঙ্গ যেমন অগ্নির ঔজ্জ্বল্যে আকৃষ্ট হয়ে আগুনে পুড়ে মরে, তেমনই বদ্ধ জীব মায়া শক্তির প্রতি সর্বদা আকৃষ্ট হয়ে মায়ার আগুনে পুড়ে মরে। কিন্তু বৈদিক শাস্ত্রে বদ্ধ জীবকে বার বার সচেতন করে দেওয়া হয়েছে মায়ার শিকার না হয়ে বরং মায়ার প্রভাব থেকে মুক্ত হতে। বেদে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে *তমসো মা জ্যোতির্গময়ো*—অজ্ঞানের অন্ধকারে যেও না, জ্যোতির্ময় পথ অবলম্বন করে পারমার্থিক উন্নতি সাধন কর। ভগবান নিজেও আমাদের সতর্ক করে দিয়েছেন—জড়া প্রকৃতির মোহময় প্রভাব অত্যন্ত বলবতী এবং তা আয়ত্ত করা অসম্ভব, কিন্তু কেউ যখন সর্বতোভাবে ভগবানের শরণাগত হন, তখন তিনি অনায়াসে তা অতিক্রম করতে পারেন। কিন্তু ভগবানের শ্রীপাদপদ্মের শরণাগত হওয়াও সহজ নয়। সেই শরণাগতি তাঁদের পক্ষে সম্ভব যাঁরা সত্য, শৌচ, তপঃ এবং দয়া আচরণ করেন। উন্নত সভ্যতার প্রতীক ধর্মের এই চারটি অঙ্গ ছিল সত্যযুগের বৈশিষ্ট্য। সেই যুগে প্রতিটি মানুষই ছিলেন গুণগতভাবে সর্বোচ্চ স্তরের ব্রাহ্মণ, এবং পরমহংস বা বৈরাগ্যের সর্বোচ্চ স্তরে অধিষ্ঠিত। মানুষ তখন মায়ার দ্বারা মোটেই প্রভাবিত ছিল না। এই প্রকার উন্নত চরিত্রের মানুষেরাই কেবল সম্পূর্ণ রূপে মায়ার প্রভাব থেকে মুক্ত থাকতে পারেন। কিন্তু ধীরে ধীরে যখন অহঙ্কার, স্ত্রীসঙ্গ এবং আসব পানের প্রভাবে যথাক্রমে ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির ভিত্তি স্বরূপ তপস্যা, শৌচ, দয়া এবং সত্যের অবক্ষয় হতে লাগল, তখন ভববন্ধন মোচনের পথ বা দিব্য আনন্দ আস্বাদনের পথটি মানব সমাজ থেকে বহু দূরে সরে গেল। কলিযুগের প্রগতির প্রভাবে মানুষ অত্যন্ত অহঙ্কারী, স্ত্রীসঙ্গী এবং নেশার প্রভাবে উন্মত্ত হচ্ছে। কলিযুগের প্রভাবে পথের ভিক্ষুকও তার কানাকড়ির অহঙ্কারে মত্ত, স্ত্রীলোকেরা সর্বদাই পুরুষের চিত্ত আকর্ষণ করার জন্য নানা রকম উৎকট সাজে সজ্জিত, আর মানুষেরা সুরাপান, ধূমপান, চাপান, তামাক সেবন ইত্যাদি নেশার প্রতি অত্যন্ত আসক্ত। এই সমস্ত অভ্যাস অথবা সভ্যতার তথাকথিত প্রগতি হচ্ছে সমস্ত অধর্মের মূল কারণ, এবং তাই কোনও

মতেই শঠতা, ঘুষ আদান-প্রদান এবং স্বজনপোষণ রোধ করা সম্ভব হচ্ছে না। আইন তৈরি করে অথবা পুলিশ পাহারায় মানুষ সমস্ত পাপ প্রবৃত্তি প্রতিহত করতে পারে না, কিন্তু উপযুক্ত ঔষধের সাহায্যে, অর্থাৎ তপস্যা, শৌচ, দয়া এবং সত্যভিত্তিক ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির প্রচারের ফলে, মনের এই রোগ নিরাময় করা সম্ভব।

আধুনিক সভ্যতা এবং তথাকথিত অর্থনৈতিক উন্নতি এক রকম নতুন ধরনের অভাব এবং দারিদ্র্যের জন্ম দিচ্ছে, এবং নিত্য ব্যবহার্য দ্রব্যের কালোবাজারি হল তারই ফল। নেতা এবং ধনী ব্যক্তিরা যদি তাদের সঞ্চিত অর্থের অর্ধাংশ কৃপাপূর্বক বিপথগামী জনসাধারণকে ভগবদ্ভক্তি সম্বন্ধে শিক্ষা দানের জন্য, শ্রীমদ্ভাগবতের জ্ঞান দানের জন্য, ব্যয় করেন, তা হলে অবশ্যই কলির প্রভাব প্রতিহত করা যাবে। সারা পৃথিবী জুড়ে মানুষ যতই 'শান্তি শান্তি' বলে চিৎকার করুক না কেন, আমাদের সব সময় মনে রাখতে হবে যে, অহঙ্কার বা নিজের সম্বন্ধে অতি উচ্চ ধারণা, স্ত্রীলোকেদের প্রতি অত্যন্ত আসক্তি বা তাদের সঙ্গে সঙ্গ করা, এবং বিভিন্ন প্রকার নেশা মানব সমাজকে শান্তির পথ থেকে বিচ্যুত করবে। শ্রীমদ্ভাগবতের বাণীর প্রচার হলে আপনা থেকেই মানুষ সংযমপরায়ণ হবে, অন্তরে এবং বাইরে নির্মল হবে, দুঃখীদের প্রতি কৃপাপরবশ হবে, এবং তাদের দৈনন্দিন আচরণে সত্যনিষ্ঠ হবে। আজকের মানব সমাজে যে সমস্ত ভুল-ত্রুটি অত্যন্ত প্রকটভাবে দেখা দিয়েছে, সেগুলি সংশোধন করার এইটিই হচ্ছে পন্থা।

শ্লোক ২৫

ইদানীং ধর্ম পাদস্তে সত্যং নির্বর্তয়েদ্যতঃ ।
তং জিঘৃক্ষত্যধর্মোঽয়মনৃতেনৈধিতঃ কলিঃ ॥ ২৫ ॥

ইদানীম্—বর্তমান কালে; **ধর্ম**—হে মূর্তিমান ধর্ম; **পাদঃ**—পা; **তে**—আপনার; **সত্যম্**—সত্য; **নির্বর্তয়েৎ**—কোন মতে ধারণ করে আছেন; **যতঃ**—যার দ্বারা; **তম্**—তা; **জিঘৃক্ষতি**—ধ্বংস করার চেষ্টা করছে; **অধর্মঃ**—মূর্তিমান অধর্ম; **অয়ম্**—এই; **অনৃতেন**—প্রবঞ্চনার দ্বারা; **এধিতঃ**—সংবর্ধিত হচ্ছে; **কলিঃ**—কলি।

অনুবাদ

এখন আপনি সত্যরূপ একটি মাত্র পায়ের উপর ভর করে কোন মতে দাঁড়িয়ে আছেন। কিন্তু এই অধর্মরূপী কলি ক্রমশ প্রবঞ্চনার দ্বারা সংবর্ধিত হয়ে আপনার ঐ পদটিও ধ্বংস করার চেষ্টা করছে।

তাৎপর্য

ধর্ম মানুষের মনগড়া কতকগুলি বিধি বা মতবাদের উপর নির্ভর করে না, পক্ষান্তরে তা প্রতিষ্ঠিত হয় তপস্যা, শৌচ, দয়া এবং সত্যের যথাযথ আচরণের ভিত্তিতে। শৈশব থেকেই মানুষকে এই সমস্ত নৈতিক আচরণগুলি অভ্যাস করার শিক্ষা দেওয়া অবশ্য কর্তব্য।

তপস্যার অর্থ পারমার্থিক উন্নতি সাধনের জন্য স্বেচ্ছায় দৈহিক ক্লেশ স্বীকার করা, যেমন—উপবাস করা। মাসে দু' দিন অথবা চার দিন উপবাস করার তপশ্চর্যা স্বেচ্ছায় অনুশীলন করা উচিত, এবং তা কেবল পারমার্থিক উন্নতি সাধনের জন্যই করা উচিত, কোন রকম রাজনৈতিক বা অন্য কোন উদ্দেশ্যে তা করা উচিত নয়। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় (১৭/৫-৬) অধ্যাত্ম উপলব্ধি ব্যতীত অন্য কোন উদ্দেশ্যে উপবাস করার নিন্দা করা হয়েছে।

তেমনই, মন এবং দেহ উভয়েরই শুচিতার প্রয়োজন। কেবল দেহটি পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখলে কিছু লাভ হতে পারে ঠিকই, কিন্তু মনের শুচিতা অত্যন্ত প্রয়োজন, এবং তা সম্ভব হয় কেবল পরমেশ্বর ভগবানের মহিমা কীর্তনের ফলে। পরমেশ্বর ভগবানের মহিমা কীর্তন ব্যতীত মনের আবর্জনা কখনও পরিষ্কার করা সম্ভব হয় না।

নাস্তিক সমাজে মন কখনোই নির্মল হতে পারে না, কেননা তাদের ভগবান সম্বন্ধে কোনও ধারণাই নেই, তাই সেই সমাজের মানুষদের কোন সদ্‌গুণ থাকতে পারে না, জড় বিচারে তাঁরা যতই উন্নত হন না কেন।

মানুষের অবস্থা দেখে তা বোঝা যায়। কলিযুগের মানুষদের অবস্থা অত্যন্ত দুর্দশাগ্রস্ত, তাই সকলেই মনের সান্ত্বনা খুঁজছে। সত্যযুগে উপযুক্ত গুণগুলির প্রভাবে মানুষের মনে পূর্ণ শান্তি ছিল। ত্রেতাযুগে তার অবক্ষয় হয়ে তিন-চতুর্থাংশে দাঁড়ায়, দ্বাপর যুগে অর্ধাংশে এবং কলিযুগে এক-চতুর্থাংশে। আর এই এক-চতুর্থাংশও সত্য আচরণের অভাবে ধীরে ধীরে ক্ষয় প্রাপ্ত হচ্ছে।

সত্য কিংবা মিথ্যা অহঙ্কারের প্রভাবে তপস্যা নষ্ট হয়; স্ত্রী সঙ্গের প্রভাবে শৌচ নষ্ট হয়, নেশার প্রভাবে দয়া বিনষ্ট হয়; এবং মিথ্যা প্রচারের ফলে সত্য নষ্ট হয়। ভাগবত ধর্মের উত্থানের ফলেই কেবল মানব সমাজ সব রকম পাপের কবল থেকে মুক্ত হতে পারে।

শ্লোক ২৬

ইয়ং চ ভূমির্ভগবতা ন্যাসিতোরুভরা সতী ।
শ্রীমদ্ভিস্তৎপদন্যাসৈঃ সর্বতঃ কৃতকৌতুকা ॥ ২৬ ॥

ইয়ম্—এই; চ—এবং; ভূমিঃ—পৃথিবী; ভগবতা—পরমেশ্বর ভগবানের দ্বারা; ন্যাসিত—স্বয়ং এবং অন্যেরা অনুষ্ঠান করেছিলেন; উরু—মহান্; ভরা—ভার; সতী—অনুষ্ঠিত হল; শ্রীমদ্ভিঃ—সমগ্র শোভা এবং সৌভাগ্যসমন্বিত; তৎ—তা; পদন্যাসৈঃ—পদ চিহ্ন; সর্বতঃ—সর্বত্র; কৃত—সম্পাদিত; কৌতুকা—সৌভাগ্য।

অনুবাদ

পরমেশ্বর ভগবান এবং অন্যেরা অবশ্যই পৃথিবীর ভার হরণ করেছিলেন। তিনি যখন এখানে অবতরণ করেন, তখন তাঁর মঙ্গলময় পদচিহ্নের প্রভাবে সর্বতোভাবে পৃথিবীর মঙ্গল সাধিত হয়েছিল।

শ্লোক ২৭

শোচত্যশ্রুকলা সাধ্বী দুর্ভগেবোজ্ঝিতাসতী।
অব্রহ্মণ্যা নৃপব্যাজাঃ শূদ্রা ভোক্ষ্যন্তি মামিতি ॥ ২৭ ॥

শোচতি—শোক করতে করতে; অশ্রুকলা—অশ্রুপূর্ণ নয়নে; সাধ্বী—সতী; দুর্ভগা—দুর্ভাগ্যবতী; ইব—মতো; উজ্ঝিতা—পরিত্যক্তা; সতী—করা হলে; অব্রহ্মণ্যাঃ—ব্রাহ্মণোচিত সংস্কৃতিবিহীন; নৃপব্যাজাঃ—রাজবেশধারী; শূদ্রাঃ—শূদ্র; ভোক্ষ্যন্তি—ভোগ করবে; মাম্—আমাকে; ইতি—এইভাবে।

অনুবাদ

দুর্ভাগ্যবশত পরমেশ্বর ভগবান কর্তৃক পরিত্যক্তা হয়ে সাধ্বী ধরিত্রী, 'আমাকে ব্রাহ্মণ বিদ্বেষী শূদ্রেরা রাজা হয়ে ভোগ করবে'—এই বলে শোক করতে করতে অশ্রু ত্যাগ করছিলেন।

তাৎপর্য

দুঃখীদের রক্ষা করতে সমর্থ ক্ষত্রিয়ই রাজা হওয়ার যোগ্য। অশিক্ষিত নিম্নশ্রেণীর মানুষেরা, অথবা দুঃখীদের রক্ষা করার উচ্চ অভিলাষশূন্য মানুষদের কখনোই নেতৃত্ব করতে দেওয়া উচিত নয়।

দুর্ভাগ্যবশত, কলিযুগে, অশিক্ষিত এবং অনভিজ্ঞ নিকৃষ্ট শ্রেণীর মানুষেরা জনসাধারণের ভোটের বলে নেতার আসন অধিকার করছে, এবং দুর্দশাগ্রস্ত জনসাধারণকে রক্ষা করার পরিবর্তে অসহ্য দুঃখ-দুর্দশার সৃষ্টি করছে। এই প্রকার

নেতারা অবৈধভাবে জনসাধারণের ঘাড় ভেঙে নিজেদের ইন্দ্রিয়তৃপ্তি সাধন করে, এবং তার ফলে সাধ্বী ধরিত্রী মানুষ এবং পশুপক্ষী ইত্যাদি তার সমস্ত সন্তানদের দুঃখ-দুর্দশা লক্ষ্য করে অশ্রুপাত করেন।

কলিযুগে অধর্মের প্রভাবে সারা পৃথিবী জুড়ে এই অবস্থা হবে, এবং শ্রীমদ্ভাগবতের শিক্ষায় যথাযথভাবে মানুষকে শিক্ষা দান করতে অক্ষম, অধর্মের প্রভাব প্রতিহত করতে অক্ষম, উপযুক্ত রাজার অভাবে সারা পৃথিবী অনাচার, উৎকোচ গ্রহণ, কালোবাজারী, ইত্যাদি অসৎ কর্মের প্রভাবে কলুষিত হয়ে উঠবে।

শ্লোক ২৮

ইতি ধর্মং মহীং চৈব সান্ত্বয়িত্বা মহারথঃ ।
নিশাতমাদদে খড়্গং কলয়েঽধর্মহেতবে ॥ ২৮ ॥

ইতি—এইভাবে; **ধর্মম্**—মূর্তিমান ধর্মকে; **মহীম্**—পৃথিবীকে; **চ**—ও; **এব**—যেমন; **সান্ত্বয়িত্বা**—সান্ত্বনা দিয়ে; **মহারথঃ**—সহস্র শত্রুর সঙ্গে সংগ্রামে সক্ষম মহাবীর; **নিশাতম্**—ধারাল; **আদদে**—গ্রহণ করে; **খড়্গম্**—তরবারি; **কলয়ে**—মূর্তিমান কলিকে; **অধর্ম**—অধর্ম; **হেতবে**—মূল কারণ।

অনুবাদ

এইভাবে মহারথী (সহস্র শত্রুর সঙ্গে এককভাবে সংগ্রাম করতে সক্ষম) পরীক্ষিৎ, ধর্ম এবং পৃথিবীকে সান্ত্বনা দান করে, অধর্মের কারণ স্বরূপ কলিকে সংহার করার জন্য তীক্ষ্ণ খড়্গ গ্রহণ করলেন।

তাৎপর্য

পূর্বে বর্ণনা করা হয়েছে যে, মূর্তিমান কলি হচ্ছে সে..যে শাস্ত্র নিষিদ্ধ সমস্ত পাপ কর্মের আচরণ করে। এই কলিযুগ অবশ্যই কলির কার্যকলাপে পূর্ণ হবে, কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে, সমাজের নেতারা, নেতৃস্থানীয় শাসক, বিদ্বান ও বুদ্ধিমান মানুষেরা, এবং সর্বোপরি ভগবদ্ভক্তেরা কলির প্রভাবের প্রতি সম্পূর্ণ উদাসীন হয়ে হাত পা গুটিয়ে নিষ্ক্রিয়ভাবে বসে থাকবে।

বর্ষাকালে প্রবল বৃষ্টিপাত হবে, কিন্তু তা বলে বৃষ্টি থেকে নিজেকে রক্ষা করার চেষ্টা না করলে চলবে না। রাষ্ট্রপ্রধান এবং অন্যদের কর্তব্য কলির কার্যকলাপের অথবা কলির দ্বারা প্রভাবিত মানুষদের কার্যকলাপের বিরুদ্ধে সব রকম প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

মহারাজ পরীক্ষিৎ ছিলেন আদর্শ রাষ্ট্রনেতা, কেননা তিনি তৎক্ষণাৎ অধর্ম আচরণকারীকে তাঁর তরবারির দ্বারা সংহার করতে উদ্যত হয়েছিলেন। অন্যায় প্রতিহত করার জন্য কতকগুলি প্রস্তাব পাশ করলে চলবে না, শাস্ত্রের দৃষ্টিকোণ থেকে অন্যায় আচরণকারী ব্যক্তিদের চিনে নিয়ে তাদের তীক্ষ্ণ তরবারির দ্বারা সংহার করতে রাষ্ট্রনেতাদের প্রস্তুত থাকতে হবে।

মদের দোকান খোলার অনুমতি দিয়ে রাষ্ট্রনেতারা কখনই অবৈধ কার্যকলাপ রোধ করতে পারবেন না। তাদের অবশ্য কর্তব্য হচ্ছে এখনই সমস্ত মদের দোকান এবং মাদক দ্রব্যের দোকান বন্ধ করে দেওয়া এবং যারা কোন রকম নেশা করে, তাদের দণ্ড দান করা, এমন কি প্রাণদণ্ডে পর্যন্ত দণ্ডিত করা। কলির প্রভাব প্রতিহত করার এটি হচ্ছে প্রকৃষ্ট পন্থা, যে দৃষ্টান্ত এখানে মহারথী মহারাজ পরীক্ষিৎ প্রদর্শন করেছেন।

শ্লোক ২৯

তং জিঘাংসুমভিপ্রেত্য বিহায় নৃপলাঞ্ছনম্ ।
তৎপাদমূলং শিরসা সমগাদ্ ভয়বিহ্বলঃ ॥ ২৯ ॥

তম্—তাকে; **জিঘাংসুম্**—হত্যা করতে উদ্যত; **অভিপ্রেত্য**—ভালভাবে জেনে; **বিহায়**—ত্যাগ করে; **নৃপলাঞ্ছনম্**—রাজবেশধারী; **তৎপাদমূলম্**—আপনার চরণতলে; **শিরসা**—মস্তকের দ্বারা; **সমগাদ্**—সম্পূর্ণরূপে শরণাগত; **ভয়বিহ্বলঃ**—ভয়কাতর।

অনুবাদ

কলি যখন দেখলেন যে, রাজা তাকে বধ করতে উদ্যত, তখন ভয়ে বিহ্বল হয়ে সে তার রাজবেশ পরিত্যাগ করে তাঁর পদতলে অবনতমস্তকে নিপতিত হয়ে আত্মসমর্পণ করল।

তাৎপর্য

কলির রাজবেশ কৃত্রিম। রাজবেশ রাজা অথবা ক্ষত্রিয়েরই উপযুক্ত। যখন কোন নিম্ন বর্ণের মানুষ কৃত্রিমভাবে রাজা সাজার চেষ্টা করে, পরীক্ষিৎ মহারাজের মতো প্রকৃত ক্ষত্রিয় রাজা কর্তৃক যুদ্ধে আহত হলেই তাদের প্রকৃত পরিচয় প্রকাশ পেয়ে যায়।

ক্ষত্রিয় কখনও কারও বশ্যতা স্বীকার করে না। তিনি প্রতিদ্বন্দ্বী ক্ষত্রিয়ের আহ্বান স্বীকার করেন, এবং সেই যুদ্ধে তাঁর জয় হয়, নয়ত তিনি মৃত্যুবরণ করেন। আত্মসমর্পণ কাকে বলে তা প্রকৃত ক্ষত্রিয় জানেন না।

কলিযুগে বহু প্রতারক রাজা সাজার বা নেতা সাজার চেষ্টা করে, কিন্তু কোন প্রকৃত ক্ষত্রিয় যখন তাদের যুদ্ধে আহ্বান করে, তখন তাদের প্রকৃত পরিচয় প্রকাশ পেয়ে যায়। তাই রাজবেশধারী কলি যখন দেখল যে, পরীক্ষিৎ মহারাজের সঙ্গে যুদ্ধ করা তার পক্ষে অসম্ভব, তখন সে অবনতমস্তকে তাঁর কাছে আত্মসমর্পণ করে তার রাজবেশ পরিত্যাগ করেছিল।

শ্লোক ৩০

পতিতং পাদয়োর্বীরঃ কৃপয়া দীনবৎসলঃ ।
শরণ্যো নাবধীচ্ছ্লোক্য আহ চেদং হসন্নিব ॥ ৩০ ॥

পতিতম্—পতিত; **পাদয়োঃ**—চরণে; **বীরঃ**—বীর রাজা; **কৃপয়া**—কৃপাপূর্বক; **দীন-বৎসলঃ**—আর্তগণের পালক; **শরণ্যঃ**—শরণ গ্রহণের উপযুক্ত; **ন**—না; **অবধীৎ**—বধ করলেন; **শ্লোক্যঃ**—যশস্বী; **আহ**—বললেন; **চ**—ও; **ইদম্**—এই; **হসন্**—মৃদু হেসে; **ইব**—মতো।

অনুবাদ

দীনবৎসল, শরণাগত পালক, যশস্বী মহাবীর মহারাজ পরীক্ষিৎ তাকে চরণতলে নিপতিত দেখে কৃপাবশত তাকে বধ করলেন না; এবং যেন ঈষৎ হাস্য করতে করতে বলতে লাগলেন।

তাৎপর্য

একজন সাধারণ ক্ষত্রিয়ও শরণাগত ব্যক্তিকে হত্যা করেন না; সুতরাং পরীক্ষিৎ মহারাজের মতো দীনবৎসল, শরণাগত পালক মহাবীরের কথা আর কি বলার আছে! তিনি মৃদু মৃদু হাসছিলেন, কেননা কৃত্রিমভাবে রাজবেশধারী কলি যে আসলে শূদ্র, তা প্রকাশ পেয়ে গিয়েছিল, এবং তিনি যখন কোন দুষ্কৃতকারীকে সংহার করতে উদ্যত হন, তখন কেউই তাঁর তীক্ষ্ণ তরবারি থেকে রক্ষা পায় না, কিন্তু যথাসময়ে আত্মসমর্পণ করার ফলে নিকৃষ্ট বর্ণ থেকে উদ্ভূত দুরাত্মা কলি রক্ষা পেয়ে গেল। তাই মহারাজ পরীক্ষিতের মহিমা ইতিহাসের পাতায় কীর্তিত হয়েছে। তিনি ছিলেন অত্যন্ত দয়ালু এবং দীনবৎসল সম্রাট। তাঁর শত্রুরা পর্যন্ত সম্পূর্ণরূপে তাঁর বশ্যতা স্বীকার করেছিল।

শ্লোক ৩১

রাজোবাচ

ন তে গুড়াকেশযশোধরাণাং
বদ্ধাঞ্জলের্বৈ ভয়মস্তি কিঞ্চিৎ ।
ন বর্তিতব্যং ভবতা কথঞ্চন
ক্ষেত্রে মদীয়ে ত্বমধর্মবন্ধুঃ ॥ ৩১ ॥

রাজা উবাচ—মহারাজ পরীক্ষিৎ বললেন; **ন**—না; **তে**—তোমার; **গুড়াকেশ**—অর্জুন; **যশোধরাণাম্**—তাঁর যশের উত্তরাধিকারীদের; **বদ্ধাঞ্জলেঃ**—কৃতাঞ্জলি পুটে; **বৈ**—অবশ্যই; **ভয়ম্**—ভয়; **অস্তি**—আছে; **কিঞ্চিৎ**—একটুও; **ন**—না; **বর্তিতব্যম্**—থাকতে দেওয়া; **ভবতা**—তোমার দ্বারা; **কথঞ্চন**—কোন মতে; **ক্ষেত্রে**—রাজ্যে; **মদীয়ে**—আমার; **ত্বম্**—তুমি; **অধর্ম-বন্ধুঃ**—অধর্মের সহচর।

অনুবাদ

রাজা বললেন—আমরা অর্জুনের যশের উত্তরাধিকারী; তাই তুমি যখন কৃতাঞ্জলিপুটে আমার শরণাগত হয়েছ, তখন আমি তোমাকে বধ করব না, কিন্তু তুমি আমার রাজ্যের কোন স্থানে থাকতে পারবে না, কেননা তুমি অধর্মের প্রধান সহচর।

তাৎপর্য

অধর্মবন্ধু কলি যদি শরণাগত হয়, তা হলে তাকে ক্ষমা করা যেতে পারে, কিন্তু কোনও অবস্থাতেই তাকে রাজ্যের কোন স্থানে নাগরিকরূপে বাস করতে দেওয়া উচিত নয়।

পাণ্ডবেরা ছিলেন পরমেশ্বর ভগবানের বিশ্বস্ত প্রতিনিধি। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের সংগঠন করেছিলেন। কিন্তু তা তিনি তাঁর কোন ব্যক্তিগত স্বার্থে করেননি। তিনি চেয়েছিলেন যে, মহারাজ যুধিষ্ঠির এবং তাঁর বংশধর মহারাজ পরীক্ষিতের মতো আদর্শ রাজারা যেন পৃথিবী শাসন করেন। তাই মহারাজ পরীক্ষিতের মতো দায়িত্বপূর্ণ রাজা পাণ্ডবদের যশের কথা বিবেচনা করে অধর্মবন্ধু কলিকে কোন মতে তাঁর রাজ্যে তার প্রভাব বিস্তার করার অনুমতি দিতে পারেননি।

এই ভাবেই রাষ্ট্র থেকে সমস্ত পাপ নির্মূল করতে হয়। এছাড়া অন্য কোন ভাবে তা সম্ভব নয়। অধর্মের সহচরদের সম্পূর্ণরূপে রাষ্ট্র থেকে নির্বাসিত করা উচিত, তা হলেই কেবল রাষ্ট্রকে সম্পূর্ণরূপে অনাচার থেকে মুক্ত করা যায়।

শ্লোক ৩২

ত্বাং বর্তমানং নরদেবদেহে-
ষ্বনুপ্রবৃত্তোঽয়মধর্মপূগঃ ।
লোভোঽনৃতং চৌর্যমনার্যমংহো
জ্যেষ্ঠা চ মায়া কলহশ্চ দম্ভঃ ॥ ৩২ ॥

ত্বাম্—তুমি; **বর্তমানম্**—উপস্থিত থাকলে; **নরদেব**—নরদেবতা, রাজা ; **দেহেষু**—দেহে; **অনুপ্রবৃত্তঃ**—সর্বত্র বর্তমান; **অয়ম্**—এই সমস্ত; **অধর্ম**—অধর্ম, **পূগঃ**—জনসাধারণের মধ্যে; **লোভঃ**—লোভ; **অনৃতম্**—মিথ্যা; **চৌর্যম্**—চৌর্য; **অনার্যম্**—অসভ্যতা; **অংহঃ**—বিশ্বাসঘাতকতা; **জ্যেষ্ঠা**—দুর্ভাগ্য; **চ**—এবং; **মায়া**—কপটতা; **কলহঃ**—কলহ; **চ**—এবং; **দম্ভ**—অহঙ্কার।

অনুবাদ

কলি বা অধর্মকে যদি রাজা বা রাষ্ট্রনেতারূপে আচরণ করতে দেওয়া হয়, তা হলে অবশ্যই লোভ, মিথ্যা, চৌর্য, অসভ্যতা, বিশ্বাসঘাতকতা, দুর্ভাগ্য, কপটতা, কলহ ও দম্ভ প্রভৃতি অধর্মসমূহ প্রবলভাবে বৃদ্ধি পাবে।

তাৎপর্য

আমরা পূর্বেই আলোচনা করেছি যে, ধর্মের ভিত্তিস্বরূপ তপশ্চর্যা, শৌচ, দয়া এবং সততা যে কোন ধর্মাবলম্বী অনুসরণ করতে পারে। সে জন্য হিন্দু বা মুসলমান বা খ্রিস্টান বা অন্য কোন ধর্মে ধর্মান্তরিত হওয়ার প্রয়োজন হয় না। এইভাবে ধর্ম ত্যাগ করে ধর্মের অনুশাসন না মানলে কোন লাভ হয় না। ভাগবত ধর্ম মানুষকে প্রকৃত ধর্ম অনুশীলন করতে উদ্বুদ্ধ করে।

ধর্মনীতি কোন মনগড়া বিশ্বাসভিত্তিক আচার অনুষ্ঠান নয়। স্থান এবং কালের পরিপ্রেক্ষিতে এই সমস্ত আচার-অনুষ্ঠানের পার্থক্য হতে পারে, কিন্তু সব সময় সচেতন থাকতে হবে যে, ধর্মের প্রকৃত উদ্দেশ্য সাধিত হচ্ছে কি না। প্রকৃত বস্তু লাভ না করে কেবল কতকগুলি আচার-অনুষ্ঠানের প্রতি আসক্ত থাকলে কিছুই লাভ হয় না।

ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র কোন বিশেষ বিশ্বাসের প্রতি নিরপেক্ষ হতে পারে, কিন্তু উপরোক্ত ধর্মনীতিগুলি সম্বন্ধে রাষ্ট্রের উদাসীন থাকা উচিত নয়। কিন্তু কলিযুগে রাষ্ট্রনেতারা এই সমস্ত ধর্মনীতির প্রতি সম্পূর্ণ উদাসীন হবেন, এবং তার ফলে

তাদের পৃষ্ঠপোষকতায় লোভ, মিথ্যাচার, প্রতারণা চৌর্য প্রভৃতি অধর্মের প্রভাব স্বাভাবিকভাবে বৃদ্ধি পাবে, এবং তাই রাষ্ট্র থেকে অসদাচার এবং পাপ আচরণ দূর করার আদর্শ প্রচার করে কোন লাভ হবে না।

শ্লোক ৩৩

ন বর্তিতব্যং তদধর্মবন্ধো
ধর্মেণ সত্যেন চ বর্তিতব্যে ।
ব্রহ্মাবর্তে যত্র যজন্তি যজ্ঞৈ-
র্যজ্ঞেশ্বরং যজ্ঞবিতানবিজ্ঞাঃ ॥ ৩৩ ॥

ন—না; **বর্তিতব্যম্**—থাকতে পারে না; **তৎ**—সেহেতু; **অধর্ম**—অধর্ম; **বন্ধো**—বন্ধু; **ধর্মেণ**—ধর্মের দ্বারা; **সত্যেন**—সত্যের দ্বারা; **চ**—ও; **বর্তিতব্যে**—অধিষ্ঠিত হয়ে; **ব্রহ্মাবর্তে**—যে স্থানে যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হয়; **যত্র**—যেখানে; **যজন্তি**—অনুষ্ঠান করা হয়; **যজ্ঞৈঃ**—যজ্ঞ বা ভক্তি অনুশীলনের দ্বারা; **যজ্ঞেশ্বরম্**—পরমেশ্বর ভগবানকে; **যজ্ঞ**—যজ্ঞ; **বিতান**—বিস্তার লাভ করে; **বিজ্ঞাঃ**—নিপুণ।

অনুবাদ

অতএব, হে অধর্মবন্ধু! পরমেশ্বর ভগবানের সন্তুষ্টি বিধানের জন্য যেখানে সত্য ও ধর্মের ভিত্তিতে যজ্ঞ বিস্তারনিপুণ যাজ্ঞিকেরা যজ্ঞ অনুষ্ঠান করেন, সেই ব্রহ্মাবর্ত প্রদেশে তোমার থাকা উচিত নয়।

তাৎপর্য

যজ্ঞেশ্বর, বা পরমেশ্বর ভগবান, সমস্ত যজ্ঞের ভোক্তা। শাস্ত্রে বিভিন্ন যুগের জন্য বিভিন্ন প্রকার যজ্ঞ অনুষ্ঠানের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে, যজ্ঞ শব্দটির অর্থ হচ্ছে পরমেশ্বর ভগবানের পরম ঈশ্বরত্ব স্বীকার করা এবং সর্বতোভাবে তাঁর সন্তুষ্টি বিধানের জন্য আচরণ করা। নাস্তিকেরা ভগবানের অস্তিত্বে বিশ্বাস করে না, এবং তাই তারা ভগবানের সন্তুষ্টি বিধানের জন্য কোন রকম যজ্ঞের অনুষ্ঠান করে না।

যে স্থানে বা দেশে ভগবানের পরম ঈশ্বরত্ব স্বীকার করা হয় এবং তাঁর সন্তুষ্টি বিধানের জন্য যজ্ঞ অনুষ্ঠান করা হয়, সেই স্থানকে বলা হয় ব্রহ্মাবর্ত।

পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন দেশ রয়েছে এবং সেই সমস্ত দেশগুলিতে ভগবানের সন্তুষ্টি বিধানের জন্য বিভিন্ন প্রকার যজ্ঞ অনুষ্ঠানের প্রথা প্রচলিত থাকতে পারে, কিন্তু শ্রীমদ্ভাগবতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে, সেই সমস্ত অনুষ্ঠানের কেন্দ্রবিন্দু হচ্ছে সত্যতা। ধর্মের ভিত্তি হচ্ছে সত্যতা, ধর্মের চরম উদ্দেশ্য হচ্ছে পরমেশ্বর ভগবানের সন্তুষ্টি বিধান করা।

এই কলিযুগে সর্বশ্রেষ্ঠ যজ্ঞ হচ্ছে সংকীর্তন যজ্ঞ। যজ্ঞ বিস্তারনিপুণ বিজ্ঞদের সেইটি অভিমত। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু এই যজ্ঞের প্রথা প্রচার করে গেছেন, এবং শ্লোকটি থেকে বোঝা যায় যে, কলির প্রভাব থেকে মানব সমাজকে উদ্ধার করার উদ্দেশ্যে এই সংকীর্তন যজ্ঞ যে কোন অবস্থায় অনুষ্ঠান করা যেতে পারে।

শ্লোক ৩৪

যস্মিন্ হরির্ভগবানিজ্যমান
ইজ্যাত্মমূর্তির্যজতাং শং তনোতি ।
কামানমোঘান্ স্থিরজঙ্গমানা-
মন্তর্বহির্বায়ুরিবৈষ আত্মা ॥ ৩৪ ॥

যস্মিন্—এই প্রকার যজ্ঞ অনুষ্ঠানে; হরিঃ—পরমেশ্বর ভগবান; ভগবান্—পরম ঈশ্বর; ইজ্যমানঃ—পূজিত হয়ে; ইজ্য-আত্মা—আরাধ্য বিগ্রহের আত্মা; মূর্তিঃ—রূপে; যজতাম্—উপাসক; শম্—মঙ্গল; তনোতি—বিস্তার করে; কামান্—অভিলাষসমূহ; অমোঘান্—অব্যর্থ; স্থিরজঙ্গমানাম্—স্থাবর এবং জঙ্গম সব কিছু; অন্তঃ—অন্তরে; বহিঃ—বাইরে; বায়ু—বায়ু; ইব—মতো; এষঃ—তাদের সকলে; আত্মা—আত্মা।

অনুবাদ

যজ্ঞে যদিও কখনও কখনও কোন দেবতা পূজিত হন, তথাপি সেই পূজার মাধ্যমে পরমেশ্বর ভগবানেরই পূজা হয়ে থাকে, কারণ তিনি স্থাবর ও জঙ্গম সকলেরই আত্মা, এবং তিনি বায়ুর মতো সকলেরই অন্তরে ও বহিরে অবস্থিত। সেই ভগবান শ্রীহরি যজ্ঞের দ্বারা সন্তুষ্ট হয়ে যাজ্ঞিকদের সর্বাঙ্গীণ মঙ্গল সাধন করেন।

তাৎপর্য

কখনও কখনও ইন্দ্র, চন্দ্র আদি দেবতাদের পূজিত হতে এবং যজ্ঞভাগ নিবেদন করতে দেখা যায়, তথাপি সমস্ত যজ্ঞে নৈবেদ্য প্রকৃতপক্ষে পরমেশ্বর ভগবানকে

নিবেদন করা হয়, এবং ভগবানই কেবল যাজকের সর্বাঙ্গীণ মঙ্গল সাধন করতে পারেন। দেবতাদের পূজা করা হলেও তাঁরা পরমেশ্বর ভগবানের অনুমোদন ব্যতীত কিছুই করতে পারেন না, কেন না ভগবান হচ্ছেন স্থাবর এবং জঙ্গম সকলেরই অন্তর্যামী।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় (৯/২৩) ভগবান সে সম্বন্ধে বলেছেন—

যেঽপ্যন্যদেবতাভক্তা যজন্তে শ্রদ্ধয়ান্বিতাঃ ।
তেঽপি মামেব কৌন্তেয় যজন্ত্যবিধিপূর্বকম্ ॥

'হে কৌন্তেয়, অন্য দেবতাদের যা কিছুই উৎসর্গ করা হোক, প্রকৃতপক্ষে তা আমারই উদ্দেশ্যে নিবেদিত, কিন্তু সেই নিবেদন অবিধিপূর্বক হয়ে থাকে।'

পরমেশ্বর ভগবান এক এবং অদ্বিতীয়। তিনি ছাড়া আর কেউ ভগবান নন। তাই তিনি চিরকাল জড় সৃষ্টির অতীত। কিন্তু বহু মানুষ আছে, যারা জড় জগতে সূর্য, চন্দ্র, ইন্দ্র আদি পরমেশ্বর ভগবানের প্রতিনিধি দেবতাদের পূজা করেন। এই সমস্ত দেবতারা পরোক্ষভাবে এবং গুণগতভাবে পরমেশ্বর ভগবানের প্রতিনিধি। বিচক্ষণ পণ্ডিত অথবা ভক্তেরা তাঁদের পরিচয় যথাযথভাবে অবগত, তাই ভগবদ্ভক্ত সরাসরিভাবে পরমেশ্বর ভগবানের আরাধনা করেন এবং তিনি জড় জগতে ভগবানের গুণগত প্রতিনিধিদের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে ভগবদ্ভক্তির মার্গ থেকে বিচ্যুত হন না। যাঁরা অজ্ঞ, তাঁরাই ভগবানের এই জড়জাগতিক প্রতিনিধিদের পূজা করেন। কিন্তু তাঁদের সেই পূজা অবিধিপূর্বক সম্পাদিত হয়।

শ্লোক ৩৫

সূত উবাচ

পরীক্ষিতৈবমাদিষ্টঃ স কলির্জাতবেপথুঃ ।
তমুদ্যতাসিমাহেদং দণ্ডপাণিমিবোদ্যতম্ ॥ ৩৫ ॥

সূতঃ উবাচ—শ্রীসূত গোস্বামী বললেন; **পরীক্ষিতা**—মহারাজ পরীক্ষিৎ কর্তৃক; **এবম্**—এইভাবে; **আদিষ্টঃ**—আদিষ্ট হয়ে; **স**—সে; **কলি**—কলি; **জাত**—হয়েছিল; **বেপথুঃ**—কম্পিত; **তম্**—তাকে; **উদ্যত**—উত্তোলিত; **অসিম্**—তরবারি; **আহ**—বলেছিল; **ইদম্**—এইভাবে; **দণ্ডপাণি**—যমরাজ; **ইব**—মতো; **উদ্যতম্**—প্রস্তুত।

অনুবাদ

শ্রীসূত গোস্বামী বললেন—এইভাবে মহারাজ পরীক্ষিৎ কর্তৃক আদিষ্ট হয়ে কলি ভয়ে কাঁপতে লাগল। তরবারি হস্তে তাকে বধ করতে উদ্যত পরীক্ষিৎ মহারাজকে

তখন তার কাছে যমরাজের মতো মনে হয়েছিল। তখন সে মহারাজ পরীক্ষিতকে এইভাবে বলতে লাগল।

তাৎপর্য

আদেশ অমান্য করা মাত্রই মহারাজ পরীক্ষিৎ কলিকে বধ করতে উদ্যত হয়েছিলেন। তা না হলে কলিকে প্রাণ ভিক্ষা দিতে মহারাজের কোন আপত্তি ছিল না। কলিও নানাভাবে দণ্ড থেকে অব্যাহতি লাভের প্রচেষ্টা করার পর স্থির করেছিল যে, মহারাজ পরীক্ষিতের কাছে তাকে আত্মসমর্পণ করতেই হবে, এবং তাই সে প্রাণভয়ে ভীত হয়ে কাঁপতে শুরু করেছিল।

রাজা অথবা রাষ্ট্রনেতাদের এতই শক্তিশালী হওয়া উচিত যে, তারা কলির সম্মুখে যমরাজের মতো দণ্ডায়মান হতে পারেন। রাজার আদেশ পালন করা অবশ্য কর্তব্য। রাজার আদেশ অমান্যকারী অপরাধীর মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। এইভাবে রাষ্ট্রের নাগরিকদের জীবনে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকারী কলিকে শাসন করতে হয়।

শ্লোক ৩৬

কলিরুবাচ

যত্র ক্ব বাথ বৎস্যামি সার্বভৌম তবাজ্ঞয়া ।
লক্ষয়ে তত্র তত্রাপি ত্বামাত্তেষুশরাসনম্ ॥ ৩৬ ॥

কলিঃ উবাচ—কলি বলল; **যত্র**—যেখানে; **ক্ব**—এবং সর্বত্র; **বা**—অথবা; **অথ**—অতএব; **বৎস্যামি**—আমি বাস করব; **সার্বভৌম**—হে পৃথিবীর একমাত্র সম্রাট; **তব**—আপনার; **আজ্ঞয়া**—আজ্ঞায়; **লক্ষয়ে**—আমি দেখছি; **তত্র তত্র**—সর্বত্র; **অপি**—ও; **ত্বাম**—আপনার; **আত্ত**—গৃহীত; **ইষু**—বাণ; **শরাসনম্**—ধনুক।

অনুবাদ

হে পৃথিবীর একমাত্র সম্রাট, আপনার আজ্ঞানুসারে আমি যেখানে বাস করব বলে মনস্থ করছি, সেখানে আমি ধনুর্বাণসহ আপনাকে দেখতে পাচ্ছি।

তাৎপর্য

কলি দেখতে পেয়েছিল যে, মহারাজ পরীক্ষিৎ ছিলেন সারা পৃথিবীর একচ্ছত্র সম্রাট, এবং তাই যেখানেই সে বাস করুক, তাকে মহারাজের অধীনে থাকতে হত। কলি স্বভাবতই দুষ্কৃতকারী, আর মহারাজ পরীক্ষিৎ ছিলেন সব রকম

দুষ্কৃতকারীদের শাসনকর্তা এবং দণ্ডদাতা, বিশেষ করে কলির। তাই কলির পক্ষে মহারাজ পরীক্ষিৎ কর্তৃক অন্যত্র নিহত হওয়ার পরিবর্তে সেখানেই নিহত হওয়া শ্রেয়স্কর ছিল। মহারাজ পরীক্ষিতের কাছে সে আত্মসমর্পণ করেছিল এবং তাই কলিকে নিয়ে কি করা উচিত, তা সম্পূর্ণ রূপে নির্ভর করছিল মহারাজ পরীক্ষিতের উপর।

শ্লোক ৩৭

তস্মে ধর্মভৃতাং শ্রেষ্ঠ স্থানং নির্দেষ্টুমর্হসি ।
যত্রৈব নিয়তো বৎস্য আতিষ্ঠংস্তেঽনুশাসনম্ ॥ ৩৭ ॥

তৎ—অতএব; **মে**—আমাকে; **ধর্মভৃতাম্**—ধর্মরক্ষকদের; **শ্রেষ্ঠ**—শিরোমণি; **স্থানম্**—স্থান; **নির্দেষ্টুম্**—নির্দিষ্ট; **অর্হসি**—আপনি করতে পারেন; **যত্র**—যেখানে; **এব**—অবশ্যই; **নিয়তঃ**—সর্বদা; **বৎস্যে**—বাস করতে পারি; **আতিষ্ঠন্**—স্থায়িভাবে অবস্থিত; **তে**—আপনার; **অনুশাসনম্**—শাসনাধীনে।

অনুবাদ

অতএব, হে ধার্মিক-শ্রেষ্ঠ, আপনি এমন কোন স্থান নির্দেশ করুন, যেখানে আমি স্থিরচিত্তে আপনার আজ্ঞা পালন করতে পারি।

তাৎপর্য

মহারাজ পরীক্ষিতকে কলি ধার্মিক-শ্রেষ্ঠ বলে সম্বোধন করেছিল, কেননা মহারাজ পরীক্ষিৎ তাঁর শরণাগত ব্যক্তিকে হত্যা করা থেকে নিরস্ত হয়েছিলেন। শরণাগত যদি শত্রুও হয়, তা হলেও তাকে সর্বতোভাবে রক্ষা করা উচিত। সেইটি হচ্ছে ধর্মের অনুশাসন। তা থেকে আমরা অনুমান করতে পারি যে, যদি কেউ শত্রুরূপে নয়, অনুগত সেবকরূপে, ভগবানের শরণাগত হয়, তা হলে ভগবান কিভাবে তাকে রক্ষা করেন। শরণাগত ভক্তকে ভগবান সমস্ত পাপ থেকে এবং পাপের প্রতিক্রিয়া থেকে রক্ষা করেন। সেই কথা *শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায়* (১৮/৬৬) বর্ণিত হয়েছে।

শ্লোক ৩৮

সূত উবাচ
অভ্যর্থিতস্তদা তস্মৈ স্থানানি কলয়ে দদৌ ।
দ্যূতং পানং স্ত্রিয়ঃ সূনা যত্রাধর্মশ্চতুর্বিধঃ ॥ ৩৮ ॥

সূতঃ উবাচ—সূত গোস্বামী বললেন; **অভ্যর্থিতঃ**—এইভাবে প্রার্থিত হয়ে; **তদা**—তখন; **তস্মৈ**—তাকে; **স্থানানি**—স্থানসমূহ; **কলয়ে**—কলিকে; **দদৌ**—অনুমতি দিয়েছিলেন; **দ্যূতম্**—দ্যূতক্রীড়া; **পানম্**—আসব পান; **স্ত্রিয়ঃ**—অবৈধ স্ত্রীসঙ্গ; **সূনা**—পশুহত্যা; **যত্র**—যেখানে; **অধর্ম**—পাপ কর্ম; **চতুর্বিধঃ**—চার প্রকার।

অনুবাদ

সূত গোস্বামী বললেন—কলির এই আবেদন শ্রবণ করে মহারাজ পরীক্ষিৎ তাকে যেখানে দ্যূত ক্রীড়া, আসব পান, অবৈধ স্ত্রীসঙ্গ এবং পশু হত্যা হয়, সেই সেই স্থানে থাকবার অনুমতি দিলেন।

তাৎপর্য

দম্ভ, স্ত্রীসঙ্গ, আসব পান এবং মিথ্যাচার, এই অধর্ম আচরণগুলি ধর্মের চারটি পা, যথা—তপশ্চর্যা, শৌচ, দয়া এবং সত্য নষ্ট করে। মহারাজ পরীক্ষিৎ কলিকে যেখানে দ্যূতক্রীড়া, অবৈধ স্ত্রীসঙ্গ, আসব পান এবং পশু হত্যা হয়, সেই স্থানগুলিতে থাকবার অনুমতি দিয়েছিলেন।

শ্রীল জীব গোস্বামী নির্দেশ দিয়েছেন যে, *সৌত্রামণী যজ্ঞ* -এর মতো শাস্ত্রাদির নির্দেশ বহির্ভূত সুরাপান, বিবাহাতিরিক্ত স্ত্রীসঙ্গ, এবং শাস্ত্রের অনুশাসন বিরোধী পশুহত্যা অধর্মাচরণ। বৈদিক শাস্ত্রে প্রবৃত্ত বা জড়ভোগে লিপ্ত এবং নিবৃত্ত বা জড়বন্ধনমুক্ত—এই দু'ধরনের ব্যক্তিদের জন্য দু'প্রকার অনুশাসন রয়েছে। প্রবৃত্তদের জন্য বৈদিক নির্দেশ ধীরে ধীরে তাদের নিয়ন্ত্রিত করে মুক্তির পথে এগিয়ে নিয়ে চলে। তাই যারা অজ্ঞানের অন্ধকার স্তরে রয়েছে, তাদের *সৌত্রামণী* যজ্ঞের মাধ্যমে আসব পান, বিবাহের মাধ্যমে স্ত্রীসঙ্গ এবং যজ্ঞে মাংসাহারের অনুমতি কখনও কখনও দেওয়া হয়েছে। বৈদিক শাস্ত্রের এই প্রকার অনুমোদন বিশেষ স্তরের মানুষদের জন্য, সকলের জন্য নয়।

কিন্তু যেহেতু এগুলি বিশেষ ধরনের মানুষদের জন্য বৈদিক শাস্ত্র নির্দেশ, তাই প্রবৃত্তমার্গীদের জন্য এই আচরণগুলি অধর্ম আচরণ নয়। একজনের আহার আর একজনের বিষ হতে পারে; তেমনই তামসিক স্তরের মানুষদের জন্য যা অনুমোদন করা হয়েছে, তা সাত্ত্বিক স্তরের মানুষদের জন্য বিষবৎ হতে পারে। শ্রীল জীব গোস্বামী প্রভু তাই প্রতিপন্ন করেছেন যে, বিশেষ ধরনের মানুষদের জন্য শাস্ত্র নির্দেশগুলি কখনও অধর্ম বলে বিবেচনা করা উচিত নয়। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে সেগুলি অধর্ম, এবং মানুষকে কখনই সেই সমস্ত কার্যে অনুপ্রাণিত করা

উচিত নয়। শাস্ত্রনির্দেশ কখনও মানুষকে অধর্ম আচরণে অনুপ্রাণিত করার জন্য নয়, পক্ষান্তরে অধর্ম আচরণকে যথাযথভাবে নিয়ন্ত্রণ করার মাধ্যমে ধীরে ধীরে ধর্মের পথে নিয়ে আসার জন্য।

মহারাজ পরীক্ষিতের পদাঙ্ক অনুসরণ করে সমস্ত রাষ্ট্রনেতাদের কর্তব্য হচ্ছে ধর্মনীতি, অর্থাৎ তপশ্চর্যা, শৌচ, দয়া এবং সত্য যথাযথভাবে প্রতিষ্ঠা করা; এবং দম্ভ, অবৈধ স্ত্রীসঙ্গ বা বেশ্যাবৃত্তি, আসবপান এবং মিথ্যাচার রূপী অধর্ম সর্বতোভাবে প্রতিহত করা। এবং খারাপ সওদার সর্বোত্তম ব্যবহারের জন্য যেখানে দ্যূতক্রীড়া, আসব পান, বেশ্যাবৃত্তি এবং পশুহত্যা হয়, সেখানে কলিকে নির্বাসন দেওয়া যেতে পারে। যারা অধর্ম আচরণে আসক্ত, তাদের শাস্ত্রবিধির মাধ্যমে নিয়ন্ত্রণ করা উচিত। কোন রাষ্ট্রে কোন অবস্থাতেই এই সমস্ত পাপাচরণগুলি অনুমোদন করা উচিত নয়। অর্থাৎ রাষ্ট্রের অবশ্য কর্তব্য হচ্ছে বিধিবদ্ধভাবে সর্বপ্রকার দ্যূতক্রীড়া, আসব পান, বেশ্যাবৃত্তি এবং মিথ্যাচার বন্ধ করা। যে সমস্ত রাষ্ট্র সর্ব প্রকার অসদাচার সম্পূর্ণরূপে দূর করতে চায়, তাদের কর্তব্য হচ্ছে নিম্নলিখিত উপায়ে ধর্মনীতি প্রবর্তন করা ঃ

(১) মাসে কমপক্ষে দু'দিন উপবাস করা (তপশ্চর্যা)। অর্থনৈতিক দিক দিয়েও মাসে সকলে যদি দু'দিন উপবাস করে, তা হলে প্রচুর পরিমাণে খাদ্য সঞ্চয় হবে, এবং এই প্রথা অনুশীলন করা হলে নাগরিকদের স্বাস্থ্যের পক্ষেও তা অত্যন্ত মঙ্গলজনক হবে।

(২) ছেলেমেয়েদের যথাক্রমে চব্বিশ বছর এবং ষোল বছর বয়সে বিবাহ বাধ্যতামূলক হবে। স্কুল এবং কলেজে ছেলেমেয়েদের একত্রে শিক্ষালাভে কোন ক্ষতি নেই, যদি ছেলে এবং মেয়েরা যথাসময়ে যথাযথভাবে বিবাহিত হয়, এবং যদি ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে ওঠে, তা হলে অবৈধ সম্পর্কে সম্পর্কিত না হয়ে তাদের যথাযথভাবে বিবাহ করা উচিত। বিবাহ বিচ্ছেদ বেশ্যাবৃত্তি অনুপ্রাণিত করে, তাই তা সম্পূর্ণ রূপে নিষিদ্ধ হওয়া উচিত।

(৩) রাষ্ট্রে অথবা মানব সমাজে, এককভাবে এবং যৌথভাবে, পারমার্থিক পরিবেশ সৃষ্টি করার জন্য নাগরিকদের তাদের আয়ের ৫০% পর্যন্ত অবশ্যই দান করতে হবে। নিম্নলিখিত মাধ্যমে শ্রীমদ্ভাগবতের নীতি প্রচার করতে হবে ঃ (ক) কর্মযোগ বা ভগবানের সন্তুষ্টি বিধানের জন্য সব কিছু করা, (খ) ভগবদ্ভক্ত বা তত্ত্ববেত্তা মহাজনের কাছে নিয়মিতভাবে শ্রীমদ্ভাগবত শ্রবণ করা, (গ) গৃহে অথবা উপাসনালয়ে সম্মিলিতভাবে ভগবানের মহিমা কীর্তন করা, (ঘ) শ্রীমদ্ভাগবতের বাণী প্রচারক ভাগবতদের সর্বতোভাবে সেবা করা এবং (ঙ) ভগবৎ চেতনাময়

পরিবেশে বাস করা। রাষ্ট্র যদি উপরোক্ত পন্থায় নিয়ন্ত্রিত হয়, তা হলে স্বাভাবিকভাবে সর্বত্র ভগবৎ চেতনা বিরাজ করবে।

সর্ব প্রকার দ্যূতক্রীড়া, এমন কি ফাটকাবাজীর ব্যবসা, চেতনাকে অধোমুখী করে, এবং রাষ্ট্রে যখন দ্যূতক্রীড়া অনুমোদন করা হয়, তখন সততা সম্পূর্ণরূপে অন্তর্হিত হয়ে যায়। যুবক-যুবতীদের নির্দিষ্ট বয়সের ঊর্ধ্বে অবিবাহিত থাকতে দেওয়া এবং সর্বপ্রকার পশুহত্যা অচিরেই বন্ধ করা উচিত। যারা মাংস না খেয়ে থাকতে পারে না, তাদের শাস্ত্রের নির্দেশ অনুসারে মাংস খেতে দেওয়া যেতে পারে, অন্যথায় নয়। সর্বপ্রকার মাদক দ্রব্য, এমন কি ধূমপান, তামাক সেবন অথবা চা-পান আইনত নিষিদ্ধ করতে হবে।

শ্লোক ৩৯

পুনশ্চ যাচমানায় জাতরূপমদাৎপ্রভুঃ ।
ততোঽনৃতং মদং কামং রজো বৈরং চ পঞ্চমম্ ॥ ৩৯ ॥

পুনঃ—পুনরায়; **চ**—ও; **যাচমানায়**—ভিক্ষুককে; **জাতরূপম্**—স্বর্ণ; **অদাৎ**—দান করেছিলেন; **প্রভুঃ**—রাজা; **ততঃ**—যার ফলে; **অনৃতম্**—অসত্য; **মদম্**—গর্ব; **কামম্**—কাম; **রজঃ**—রজোগুণের প্রভাবে; **বৈরম্**—শত্রুতা; **চ**—ও; **পঞ্চমম্**—পঞ্চম।

অনুবাদ

কলি (উক্ত চতুর্বিধ স্থান পাওয়া সত্ত্বেও) পুনরায় স্থান প্রার্থনা করলে মহারাজ পরীক্ষিৎ তাকে সুবর্ণে বসবাসের অনুমতি দান প্রদান করলেন। কেননা যেখানেই সুবর্ণ সেখানেই মিথ্যা, মত্ততা, কাম এবং হিংসা বর্তমান।

তাৎপর্য

যদিও মহারাজ পরীক্ষিৎ কলিকে চারটি স্থানে থাকবার অনুমতি দিয়েছিলেন, তথাপি কলির পক্ষে সেই স্থানগুলি খুঁজে পাওয়া অত্যন্ত দুষ্কর হয়েছিল, কেননা পরীক্ষিৎ মহারাজের রাজত্বকালে কোথাও সেই সমস্ত পাপ কর্মগুলির আচরণ হত না। তাই কলি পরীক্ষিৎ মহারাজের কাছে আবেদন করেছিল তাকে এমন কোন স্থান দেওয়া হোক, যেখানে তার অসৎ উদ্দেশ্যগুলি সে সাধন করতে পারে।

মহারাজ পরীক্ষিৎ তাই তাকে যেখানে সোনা থাকে, সেখানে থাকবার অনুমতি দিয়েছিলেন, কেননা যেখানে সোনা, সেখানে পূর্বোক্ত চারটি অধর্ম যুগপৎ বিরাজ করে, অধিকন্তু সেখানে শত্রুতা নামক একটি পঞ্চম অনর্থও বিরাজ করে।

এইভাবে কলি স্বর্ণকে আশ্রয় করল। শ্রীমদ্ভাগবতের বর্ণনা অনুসারে এই স্বর্ণ মিথ্যাচার, আসব পান, বেশ্যাবৃত্তি, হিংসা এবং শত্রুতাকে বৃদ্ধি করে। এমন কি, স্বর্ণভিত্তিক বিনিময় এবং মুদ্রাও মন্দ। স্বর্ণভিত্তিক মুদ্রা মিথ্যার উপর প্রতিষ্ঠিত, কারণ সেই মুদ্রা সঞ্চিত স্বর্ণের সমান মূল্যবিশিষ্ট হয় না। সেই প্রথাটি প্রতারণাপূর্ণ, কারণ সঞ্চিত স্বর্ণের থেকে অনেক বেশি পরিমাণে নোট ছাপা হয়। কৃত্রিমভাবে মুদ্রাস্ফীতির ফলে রাজ্যের অর্থনীতির প্রবঞ্চনা হয়। মুদ্রার যথার্থ মূল্য হ্রাস পাওয়ার ফলে বা কৃত্রিম মুদ্রার প্রভাবে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি পায়। কালো টাকা ভাল টাকাকে দূর করে দেয়। এই সমস্যা সমাধানের জন্য কাগজের নোটের পরিবর্তে বিনিময়ের মাধ্যমস্বরূপ স্বর্ণমুদ্রা ব্যবহার করা উচিত এবং তার ফলে অর্থনৈতিক বেশ্যাবৃত্তি বন্ধ করা সম্ভব হবে। স্ত্রীলোকদের যথাযথ নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে স্বর্ণ-অলঙ্কার ব্যবহার করতে দেওয়া যেতে পারে, এবং সেই নিয়ন্ত্রণ গুণগতভাবে নয়, পক্ষান্তরে আয়তনগতভাবে হওয়া উচিত। তার ফলে কাম হিংসা এবং শত্রুতা রোধ করা সম্ভব।

যখন প্রকৃত স্বর্ণমুদ্রা বিনিময়ের মাধ্যম হিসাবে ব্যবহৃত হবে, তখন মিথ্যাচার, বেশ্যাবৃত্তি ইত্যাদি অধর্মের অঙ্গগুলি যা স্বর্ণের প্রভাবে বৃদ্ধি পায়, তা আপনা থেকেই বন্ধ হয়ে যাবে। তখন আরও প্রতারণা এবং প্রবঞ্চনা করার জন্য কোন দুর্নীতিবিরোধী মন্ত্রণালয়ের প্রয়োজন হবে না।

শ্লোক ৪০

অমূনি পঞ্চ স্থানানি হ্যধর্মপ্রভবঃ কলিঃ ।
ঔত্তরেয়েণ দত্তানি ন্যবসৎ তন্নিদেশকৃৎ ॥ ৪০ ॥

অমূনি—সেই সমস্ত; **পঞ্চ**—পাঁচ; **স্থানানি**—স্থানসমূহ; **হি**—অবশ্যই; **অধর্ম**—অধর্ম; **প্রভবঃ**—প্রণোদিত করে; **কলিঃ**—কলি; **ঔত্তরেয়েণ**—উত্তরার পুত্র কর্তৃক; **দত্তানি**—প্রদত্ত; **ন্যবসৎ**—বাস করতে লাগল; **তৎ**—তার দ্বারা; **নিদেশকৃৎ**—আজ্ঞানুসারে।

অনুবাদ

অধর্মাশ্রয় কলি, উত্তরানন্দন পরীক্ষিতের আজ্ঞা শিরোধার্য করে তাঁর দেওয়া সেই পাঁচটি স্থানে বাস করতে লাগল।

তাৎপর্য

স্বর্ণভিত্তিক মুদ্রা প্রচলনের মাধ্যমে এইভাবে কলিযুগের সূচনা হল, এবং তাই মিথ্যাচার, নেশা, পশুহত্যা এবং বেশ্যাবৃত্তি সারা পৃথিবী জুড়ে ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পেতে লাগল। যদিও সুস্থ মস্তিষ্কসম্পন্ন মানুষেরা এই সমস্ত অসদ্ আচরণ বন্ধ করতে আগ্রহী, তথাপি কলির প্রভাবে তাদের প্রচেষ্টা পদে পদে ব্যর্থ হচ্ছে। শ্রীমদ্ভাগবতে সেই সমস্ত অসদ্ প্রভাবগুলি প্রতিহত করার যথার্থ পন্থা বর্ণিত হয়েছে, এবং সকলেই সেই পন্থার সদ্ব্যবহার করতে পারেন।

শ্লোক ৪১

অথৈতানি ন সেবেত বুভূষুঃ পুরুষঃ ক্বচিৎ ।
বিশেষতো ধর্মশীলো রাজা লোকপতির্গুরুঃ ॥ ৪১ ॥

অথ—অতএব; **এতানি**—এই সমস্ত; **ন**—না; **সেবেত**—সংস্পর্শে আসা; **বুভূষুঃ**—মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী; **পুরুষঃ**—ব্যক্তি; **ক্বচিৎ**—কোন অবস্থাতেই; **বিশেষতঃ**—বিশেষভাবে; **ধর্মশীলঃ**—পারমার্থিক উন্নতি সাধনশীল; **রাজা**—রাজা; **লোকপতিঃ**—প্রজাপালক; **গুরুঃ**—ব্রাহ্মণ এবং সন্ন্যাসী।

অনুবাদ

অতএব যে মানুষ মঙ্গলময় প্রগতি আকাঙ্ক্ষা করেন, বিশেষ করে রাজা, লোকনেতা, ধর্মনেতা, ব্রাহ্মণ এবং সন্ন্যাসী—তাঁদের পক্ষে, ঐ সমস্ত অধর্ম আচরণে লিপ্ত হওয়া কখনো উচিত নয়।

তাৎপর্য

ব্রাহ্মণেরা অন্য সমস্ত বর্ণের গুরু, এবং সন্ন্যাসীরা হচ্ছেন সমস্ত বর্ণ এবং আশ্রমের গুরু। তেমনই রাজা এবং জননেতারা সমস্ত জনসাধারণের জাগতিক উন্নতির দায়িত্বভার বহন করেন। পরমার্থপরায়ণ মানুষেরা এবং যারা দায়িত্বশীল মানুষ অথবা যারা তাদের দুর্লভ মানব জীবনের অপচয় করতে চান না, তাঁদের কর্তব্য হচ্ছে সমস্ত অধর্ম আচরণ থেকে বিরত থাকা, বিশেষ করে অবৈধ স্ত্রীসঙ্গ থেকে। ব্রাহ্মণ যদি সত্যবাদী না হয়, তা হলে তার ব্রাহ্মণত্বের দাবি তৎক্ষণাৎ নষ্ট হয়ে যায়। সন্ন্যাসী যদি অবৈধ স্ত্রীসঙ্গে লিপ্ত হয়, তা হলে তার সন্ন্যাসী হওয়ার সমস্ত দাবি তৎক্ষণাৎ মিথ্যায় পর্যবসিত হয়। তেমনই, রাজা এবং জননেতারা

যদি অনর্থক দম্ভপরায়ণ হয় অথবা সুরা পান, ধূমপান আদি মাদক দ্রব্য সেবনে আসক্ত হয়, তা হলে অবশ্যই তারা জনসাধারণের কল্যাণ সাধনের যোগ্যতা হারিয়ে ফেলে।

সত্যতা সমস্ত ধর্ম আচরণের ভিত্তি। মানব সমাজের চার প্রকার নেতা, যথা— সন্ন্যাসী, ব্রাহ্মণ, রাজা এবং রাজনৈতিক নেতাদের চরিত্র এবং গুণাবলীর যথাযথ পরীক্ষা নেওয়া অবশ্য কর্তব্য। সমাজের পারমার্থিক অথবা জাগতিক নেতারূপে কাউকে স্বীকৃতি দেওয়ার পূর্বে চরিত্রের উপরি উক্ত পরীক্ষাগুলি নেওয়া অবশ্য কর্তব্য। জনসাধারণের এই ধরনের নেতারা জাগতিক শিক্ষায় উচ্চ শিক্ষিত না হতে পারেন, কিন্তু তাদের জুয়া-পাশা ইত্যাদি খেলা, নেশা, অবৈধ স্ত্রীসঙ্গ এবং পশুহত্যা এই চারটি পাপ কর্ম থেকে সম্পূর্ণভাবে মুক্ত হওয়া অবশ্য কর্তব্য।

শ্লোক ৪২

বৃষস্য নষ্টাংস্ত্রীন্ পাদান্ তপঃ শৌচং দয়ামিতি ।
প্রতিসন্দধ আশ্বাস্য মহীং চ সমবর্ধয়ৎ ॥ ৪২ ॥

বৃষস্য—বৃষের (মূর্তিমান ধর্মের); **নষ্টান্**—ভগ্ন; **ত্রীন্**—তিন; **পাদান্**—চরণ; **তপঃ**—তপশ্চর্যা; **শৌচম্**—শুচিতা; **দয়াম্**—দয়া; **ইতি**—এই; **প্রতিসন্দধে**—পুনঃ প্রতিষ্ঠা করে; **আশ্বাস্য**—আশ্বাস দান করে; **মহীম্**—পৃথিবী; **চ**—এবং; **সমবর্ধয়ৎ**—পূর্ণরূপে সমৃদ্ধ করেছিলেন।

অনুবাদ

তার পর মহারাজ পরীক্ষিৎ বৃষরূপ ধর্মের তপঃ, শৌচ এবং দয়ারূপ তিনটি ভগ্ন চরণ পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন, এবং তাঁর আশ্বাসপূর্ণ কার্যকলাপের মাধ্যমে পৃথিবীর প্রভূত উন্নতি সাধন করেছিলেন।

তাৎপর্য

কলিকে বিশেষ স্থান নির্দিষ্ট করে মহারাজ পরীক্ষিৎ প্রকৃতপক্ষে কলিকে প্রতারণা করেছিলেন। কলির উপস্থিতিতে বৃষরূপী ধর্ম এবং গাভীরূপী ধরিত্রীর অবস্থা দর্শন করে তিনি তাঁর রাজ্যের সাধারণ অবস্থা বুঝতে পেরেছিলেন, এবং তাই তিনি তৎক্ষণাৎ তপশ্চর্যা, শৌচ এবং দয়ারূপী ধর্মের তিনটি চরণ পুনঃপ্রতিষ্ঠা করার যথাযথ ব্যবস্থা নিয়েছিলেন। আর, পৃথিবীর মানুষের মঙ্গল সাধনের জন্য স্বর্ণের

মূল্য যাতে যথাযথভাবে নির্ধারিত থাকে। তাও তিনি লক্ষ্য রেখেছিলেন। স্বর্ণ অবশ্যই মিথ্যাচার, নেশা, স্ত্রীসঙ্গ এবং হিংসা উৎপাদন করে, কিন্তু আদর্শ রাজা বা রাজনৈতিক নেতা অথবা ব্রাহ্মণ বা সন্ন্যাসীর যথাযথ পরিচালনায় সেই সোনা ধর্মরূপ বৃষের ভগ্নপদগুলি পুনঃপ্রতিষ্ঠা করার জন্য যথাযথভাবে ব্যবহার করা যেতে পারে।

কলিযুগোচিত পাপ-কর্মের জন্য সংগৃহীত সমস্ত স্বর্ণ মহারাজ পরীক্ষিৎ তাই তাঁর পিতামহ অর্জুনের মতো সংগ্রহ করেছিলেন এবং শ্রীমদ্ভাগবতের নির্দেশ অনুসারে সংকীর্তন যজ্ঞ অনুষ্ঠানের জন্য সেগুলি ব্যবহার করেছিলেন।

পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে, সঞ্চিত অর্থ বিতরণ করার জন্য তিন ভাগে বিভক্ত করা যায়—অর্ধাংশে ভগবানের সেবায়, এক-চতুর্থাংশে আত্মীয়-স্বজনদের জন্য এবং বাকি এক-চতুর্থাংশ ব্যক্তিগত প্রয়োজনে। ভগবানের সেবায় অথবা সংকীর্তন যজ্ঞের মাধ্যমে ভগবত্তত্ত্বজ্ঞান প্রচারের জন্য যদি অর্ধাংশ ব্যবহার করা হয়, তা হলে সেইটি হচ্ছে মানব সমাজের সর্বশ্রেষ্ঠ কৃপার প্রকাশ।

এই পৃথিবীর সাধারণ মানুষেরা পারমার্থিক জ্ঞান সম্পর্কে সম্পূর্ণ অজ্ঞ, বিশেষ করে ভগবদ্ভক্তির বিষয়ে, এবং তাই যথাযথভাবে ভগবদ্ভক্তির দিব্য জ্ঞানের প্রচারই হল পৃথিবীর মানুষদের প্রতি সর্বশ্রেষ্ঠ করুণার প্রদর্শন। যদি সকলকে তাদের সঞ্চিত স্বর্ণের অর্ধাংশ ভগবানের সেবায় দান করার শিক্ষা দেওয়া হয়, তা হলে অবশ্যই তপশ্চর্যা, শৌচ, এবং দয়া আপনা থেকে প্রকাশ পাবে, এবং তার ফলে ধর্মের তিনটি ভগ্নপদ আপনা থেকে সংযোজিত হবে। যথেষ্ট তপশ্চর্যা, শৌচ, দয়া এবং সততা উপস্থিত থাকলে মাতা বসুন্ধরা সর্বতোভাবে তৃপ্ত হন, এবং তখন মানুষের সমাজ ব্যবস্থায় কলির অনুপ্রবেশ করার কোন সম্ভাবনা থাকে না বললেই চলে।

শ্লোক ৪৩-৪৪

স এষ এতর্হ্যধ্যাস্ত আসনং পার্থিবোচিতম্ ।
পিতামহেনোপন্যস্তং রাজ্ঞারণ্যং বিবিক্ষতা ॥ ৪৩ ॥
আস্তেঽধুনা স রাজর্ষিঃ কৌরবেন্দ্রশ্রিয়োল্লসন্ ।
গজাহ্বয়ে মহাভাগশ্চক্রবর্তী বৃহচ্ছ্রবাঃ ॥ ৪৪ ॥

সঃ—তিনি; **এষ**—এই; **এতর্হি**—এখন; **অধ্যাস্তে**—শাসন করছে; **আসনম্**—সিংহাসন; **পার্থিব-উচিতম্**—রাজার উপযুক্ত; **পিতামহেন**—পিতামহ কর্তৃক;

উপন্যস্তম্—অর্পিত; রাজ্ঞা—রাজার দ্বারা; অরণ্যম্—বনে; বিবিক্ষতা—অভিলাষী হয়ে; আস্তে—সেখানে আছে; অধুনা—এখন; স—তিনি; রাজর্ষিঃ—ঋষিসদৃশ রাজা; কৌরবেন্দ্র—কুরুশ্রেষ্ঠ; শ্রিয়া—মহিমা; উল্লসন্—বিস্তার করে; গজাহ্বয়ে—হস্তিনাপুরে; মহা-ভাগঃ—সৌভাগ্যবান্; চক্রবর্তী—সম্রাট; বৃহৎ-শ্রবাঃ—অত্যন্ত প্রসিদ্ধ।

অনুবাদ

মহা সৌভাগ্যশালী সম্রাট মহারাজ পরীক্ষিৎ বনগমনে অভিলাষী পিতামহ মহারাজ যুধিষ্ঠির কর্তৃক অর্পিত রাজ্যোপযুক্ত সিংহাসনে সেই সময় উপবিষ্ট হলেন। এখন সেই রাজর্ষি, মহাভাগ, চক্রবর্তী, মহাযশা, পরীক্ষিৎ কৌরব রাজলক্ষ্মীর দ্বারা মহিমান্বিত হয়ে হস্তিনাপুরে অবস্থান করছেন।

তাৎপর্য

মহারাজ পরীক্ষিতের অপ্রকটের অল্পকাল পরে নৈমিষারণ্যের ঋষিরা দীর্ঘকালব্যাপী সেই যজ্ঞ শুরু করেছিলেন। সেই যজ্ঞ এক হাজার বছর ধরে অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা ছিল, এবং শোনা যায় যে, সেই যজ্ঞের শুরুতে শ্রীকৃষ্ণের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা বলদেবের কয়েকজন অনুচর সেখানে উপস্থিত ছিলেন। পূর্বতন কয়েকজন আচার্যের মত অনুসারে, সাম্প্রতিক অতীতকাল ইঙ্গিত করার উদ্দেশ্যে এখানে মহারাজ পরীক্ষিতের রাজত্বকাল সূচিত করে বর্তমানকাল ব্যবহৃত হয়েছে। চলমান ঘটনার ক্ষেত্রেও বর্তমানকাল ব্যবহৃত হতে পারে। মহারাজ পরীক্ষিৎ যে আদর্শ প্রতিষ্ঠা করে গেছেন তা এখনও অনুসরণ করা যেতে পারে, এবং নেতারা যদি বদ্ধপরিকর হন, তা হলে সমাজ ব্যবস্থার এখনও উন্নতি সাধন করা যেতে পারে।

আমরা যদি মহারাজ পরীক্ষিতের মতো ব্যবস্থা গ্রহণ করতে দৃঢ়সংকল্প হই, তা হলে কলির প্রভাবে সমাজে যে সমস্ত গ্লানির উদ্ভব হয়েছে, সেগুলি রাষ্ট্র থেকে সম্পূর্ণরূপে দূর করে দিতে পারি। মহারাজ পরীক্ষিৎ কলিকে যে সমস্ত স্থানগুলি দিয়েছিলেন, কলি তখন এই পৃথিবীতে সেই রকম কোন স্থান খুঁজে পায়নি। কেননা মহারাজ পরীক্ষিৎ অত্যন্ত কঠোরতা সহকারে সতর্ক ছিলেন যে, তাঁর রাজ্যে কোথাও যেন আসব পান, দ্যূতক্রীড়া, অবৈধ স্ত্রীসঙ্গ এবং পশুহত্যা না হয়।

বর্তমানে রাষ্ট্র পরিচালকেরা রাষ্ট্র থেকে অন্যায় আচরণ দূর করতে চায়, কিন্তু তাদের মূর্খতার ফলে তারা জানে না কিভাবে তা করা সম্ভব। তারা দ্যূতক্রীড়া ভবন; মদ এবং অন্যান্য মাদক দ্রব্যের দোকান, বেশ্যালয়, প্রেক্ষাগৃহ ইত্যাদি খোলার

লাইসেন্স দিচ্ছে, এবং এইভাবে সব রকম অসৎ আচরণে লিপ্ত হওয়ার অনুমতি দিচ্ছে এবং তারা নিজেরাও সেই সমস্ত আচরণে লিপ্ত হচ্ছে; আবার সেই সঙ্গে তারা রাষ্ট্র থেকে পাপ এবং অন্যায় দূর করার সঙ্কল্প করছে। তারা ভগবান শ্রীরামচন্দ্রকে বাদ দিয়ে রামরাজ্য প্রতিষ্ঠা করতে চাইছে। দুটি বিরুদ্ধ ভাবধারার সমন্বয় কিভাবে সম্ভব?

আমরা যদি রাষ্ট্র থেকে সব রকম পাপাচরণ এবং অন্যায় দূর করতে চাই, তা হলে আমাদের সর্ব প্রথমে সমাজকে এমনভাবে সংগঠিত করতে হবে, যাতে সমাজে প্রতিটি মানুষ তপশ্চর্যা, শৌচ, দয়া এবং সত্য—ধর্মের এই সমস্ত অঙ্গ গুলি অনুসরণ করতে বাধ্য হয়। আর সেই সঙ্গে সেই অবস্থার অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করার জন্য শুঁড়িখানা, বেশ্যালয়, কসাইখানা এবং জুয়াপাশা খেলার স্থানগুলি আমাদের অবশ্যই সম্পূর্ণরূপে বন্ধ করতে হবে। *শ্রীমদ্ভাগবতের* পাতা থেকে এই ব্যবহারিক শিক্ষাগুলি আমরা পাচ্ছি।

শ্লোক ৪৫

ইত্থম্ভূতানুভাবোঽয়মভিমন্যুসুতো নৃপঃ ।
যস্য পালয়তঃ ক্ষৌণীং যূয়ং সত্রায় দীক্ষিতাঃ ॥ ৪৫ ॥

ইত্থম্-ভূত—এই প্রকার; **অনুভাবঃ**—অভিজ্ঞতা; **অয়ম্**—এই; **অভিমন্যু-সুতঃ**—অভিমন্যু পুত্র; **নৃপঃ**—মহারাজ পরীক্ষিৎ; **যস্য**—যাঁর; **পালয়তঃ**—শাসনের ফলে; **ক্ষৌণীম্**—পৃথিবীতে; **যূয়ম্**—আপনারা; **সত্রায়**—যজ্ঞ অনুষ্ঠানের জন্য; **দীক্ষিতাঃ**—দীক্ষিত হয়েছিল।

অনুবাদ

অভিমন্যু-পুত্র মহারাজ পরীক্ষিৎ এতই মহৎ গুণসম্পন্ন যে, তাঁর দ্বারা এই পৃথিবী শাসিত হয়েছে বলেই আপনাদের পক্ষে এই প্রকার যজ্ঞ করা সম্ভব হয়েছে।

তাৎপর্য

ব্রাহ্মণ এবং সন্ন্যাসীরা সমাজকে পারমার্থিক উন্নতির পথে এগিয়ে নিয়ে যেতে অত্যন্ত পারদর্শী, এবং ক্ষত্রিয়রা মানব সমাজে শান্তি এবং সমৃদ্ধি প্রতিষ্ঠা করতে অত্যন্ত পারদর্শী। এই দুটি বর্ণ সুখ এবং সমৃদ্ধির দুটি ভিত্তিস্বরূপ, এবং তাই সমাজের সর্বাঙ্গীণ মঙ্গলের জন্য তাদের পরস্পরের সহযোগিতা বাঞ্ছনীয়।

মহারাজ পরীক্ষিৎ অত্যন্ত দক্ষতা সহকারে কলিকে তার কর্মক্ষেত্র থেকে নির্বাসন দিয়েছিলেন এবং তার ফলে.তাঁর রাজ্যে পারমার্থিক প্রগতির অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করতে তিনি সক্ষম হয়েছিলেন।

জনসাধারণ যদি পারমার্থিক বিষয়ে আগ্রহী না হয়, তা হলে তাদের দিব্য জ্ঞান লাভে উদ্বুদ্ধ করা কষ্টকর হয়। ধর্মের চারটি মুখ্য অঙ্গ—তপঃ, শৌচ, দয়া এবং সত্য পারমার্থিক প্রগতির ভিত্তিস্বরূপ, এবং মহারাজ পরীক্ষিৎ সেই অনুকূল অবস্থা সৃষ্টি করেছিলেন। তার ফলে নৈমিষারণ্যের ঋষিরা সহস্র বর্ষব্যাপী সেই যজ্ঞ অনুষ্ঠান করতে সক্ষম হয়েছিলেন। অর্থাৎ রাষ্ট্রের সহযোগিতা ব্যতীত ধর্ম আচরণ এবং দার্শনিক ভাবধারার উন্নতি সাধন সম্ভব নয়। সকলের মঙ্গলের জন্য ব্রাহ্মণ এবং ক্ষত্রিয়দের পরস্পরের সঙ্গে পূর্ণরূপে সহযোগিতা করা উচিত।

মহারাজ অশোকের রাজত্বকাল পর্যন্ত সেই মনোভাব বিরাজমান ছিল। বুদ্ধদেবের বাণী প্রচারে মহারাজ অশোক প্রবলভাবে পৃষ্ঠপোষকতা করেছিলেন, এবং তার ফলে সেই মতবাদ সারা পৃথিবী জুড়ে প্রচারিত হয়েছিল।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতের প্রথম স্কন্ধের "কলির দণ্ড এবং পুরস্কার" নামক সপ্তদশ অধ্যায়ের ভক্তিবেদান্ত তাৎপর্য।

অষ্টাদশ অধ্যায়

মহারাজ পরীক্ষিৎ ব্রাহ্মণ বালকের দ্বারা অভিশপ্ত

শ্লোক ১

সূত উবাচ

যো বৈ দ্রৌণ্যস্ত্রবিপ্লুষ্টো ন মাতুরুদরে মৃতঃ ।
অনুগ্রহাদ্ভগবতঃ কৃষ্ণস্যাদ্ভুতকর্মণঃ ॥ ১ ॥

সূতঃ উবাচ—শ্রীসূত গোস্বামী বললেন; **যঃ**—যিনি; **বৈ**—অবশ্যই; **দ্রৌণ্যস্ত্র**—দ্রোণাচার্যের পুত্রের অস্ত্র কর্তৃক; **বিপ্লুষ্টঃ**—দগ্ধ; **ন**—না; **মাতুঃ**—মাতার; **উদরে**—গর্ভে; **মৃতঃ**—মৃত্যুঃ; **অনুগ্রহাৎ**—কৃপার দ্বারা; **ভগবতঃ**—পরমেশ্বর ভগবানের; **কৃষ্ণস্য**—শ্রীকৃষ্ণের; **অদ্ভুত-কর্মণঃ**—অদ্ভুতকর্মা।

অনুবাদ

শ্রীসূত গোস্বামী বললেন—মহারাজ পরীক্ষিৎ মাতৃগর্ভে অবস্থানকালে, দ্রোণাচার্যের পুত্র অশ্বত্থামার ব্রহ্মাস্ত্র দ্বারা দগ্ধ হওয়া সত্ত্বেও অদ্ভুতকর্মা ভগবান শ্রীকৃষ্ণের কৃপায় মৃত্যুমুখে নিপতিত হননি।

তাৎপর্য

মহারাজ পরীক্ষিতের অদ্ভুত শাসন ব্যবস্থার কথা শুনে, বিশেষ করে কলিকে দণ্ডদান এবং তাঁর রাজ্যে কোন রকম অনিষ্ট সাধন করা থেকে নিরস্ত করার কথা শুনে নৈমিষারণ্যের ঋষিরা অত্যন্ত বিস্ময়ান্বিত হয়েছিলেন। সূত গোস্বামীও মহারাজ পরীক্ষিতের অদ্ভুত জন্ম এবং কর্ম সম্বন্ধে বর্ণনা করতে অত্যন্ত উৎকণ্ঠিত ছিলেন, তাই সূত গোস্বামী নৈমিষারণ্যের ঋষিদের উৎসাহ বর্ধনের জন্য এই কথাগুলি বলেছিলেন।

শ্লোক ২

ব্রহ্মকোপোত্থিতাদ্ যস্তু তক্ষকাৎপ্রাণবিপ্লবাৎ ।
ন সম্মুমোহোরুভয়াদ্ ভগবত্যর্পিতাশয়ঃ ॥ ২ ॥

ব্রহ্ম-কোপ—ব্রাহ্মণের ক্রোধ; **উত্থিতাৎ**—উৎপন্ন; **যঃ**—যা ছিল; **তু**—কিন্তু; **তক্ষকাৎ**—তক্ষক সর্প দ্বারা; **প্রাণবিপ্লবাৎ**—প্রাণনাশ থেকে; **ন**—কখনই না; **সম্মুমোহ**—অভিভূত হয়েছিলেন; **উরু-ভয়াৎ**—মহাভয়; **ভগবতি**—পরমেশ্বর ভগবানে; **অর্পিত**—শরণাগত; **আশয়ঃ**—চেতনা।

অনুবাদ

অধিকন্তু, মহারাজ পরীক্ষিৎ সর্বদা জ্ঞাতসারে পরমেশ্বর ভগবানের শরণাগত ছিলেন, এবং তাই তিনি ব্রাহ্মণের অভিশাপে তক্ষক দংশনে প্রাণ সঙ্কট হলেও সেই ভয়ে বিচলিত হননি।

তাৎপর্য

ভগবানে শরণাগত ভক্তকে বলা হয় নারায়ণপরায়ণ। সেই প্রকার ব্যক্তি কোন স্থান অথবা কোন ব্যক্তির ভয়ে ভীত হন না, এমন কি তিনি মৃত্যুভয়েও ভীত হন না। তাঁর কাছে পরমেশ্বর ভগবানের থেকে গুরুত্বপূর্ণ আর কিছু নেই, এবং তাই তাঁর কাছে স্বর্গ এবং নরক সমান গুরুত্বপূর্ণ। তিনি ভালমতোই জানেন যে, স্বর্গ এবং নরক উভয়ই ভগবানের সৃষ্টি এবং তেমনই জীবন এবং মৃত্যু ভগবান কর্তৃক সৃষ্ট বিভিন্ন অবস্থা মাত্র। কিন্তু সমস্ত অবস্থায় এবং পরিস্থিতিতে নারায়ণকে স্মরণ করা অনিবার্য। নারায়ণপরায়ণ ব্যক্তি সব সময় এই অভ্যাস করেন।

মহারাজ পরীক্ষিৎ ছিলেন এমনই একজন শুদ্ধ ভক্ত। কলির দ্বারা প্রভাবিত এক অনভিজ্ঞ ব্রাহ্মণ বালকের দ্বারা তিনি অন্যায়ভাবে অভিশপ্ত হয়েছিলেন। কিন্তু পরীক্ষিৎ মহারাজ সেই অভিশাপকে নারায়ণের আশীর্বাদ বলে গ্রহণ করেছিলেন। তিনি জানতেন যে, নারায়ণ (শ্রীকৃষ্ণ) তাঁকে তাঁর মাতৃ জঠরে ব্রহ্মাস্ত্রের তেজ থেকে রক্ষা করেছিলেন এবং এখন যদি তক্ষকের দংশনে তাঁর মৃত্যু হয়, তা হলে সেটিও ভগবানেরই ইচ্ছা। ভক্ত কখনও ভগবানের ইচ্ছার বিরুদ্ধাচরণ করেন না; তাঁর কাছে সব কিছুই ছিল ভগবানের আশীর্বাদ। তাই মহারাজ পরীক্ষিৎ এই ঘটনায় ভীত বা বিচলিত হননি। সেইটি ভগবানের শুদ্ধ ভক্তের লক্ষণ।

শ্লোক ৩

উৎসৃজ্য সর্বতঃ সঙ্গং বিজ্ঞাতাজিতসংস্থিতিঃ ।
বৈয়াসকের্জহৌ শিষ্যো গঙ্গায়াং স্বং কলেবরম্ ॥ ৩ ॥

উৎসৃজ্য—পরিত্যাগ করে; **সর্বতঃ**—সর্ব প্রকার; **সঙ্গম্**—আসক্তি; **বিজ্ঞাত**—বিশেষরূপে জেনে; **অজিত**—যাঁকে কখনও জয় করা যায় না (পরমেশ্বর ভগবান); **সংস্থিতিঃ**—প্রকৃত অবস্থা; **বৈয়াসকেঃ**—ব্যাসদেবের পুত্র শুকদেবের; **জহৌ**—পরিত্যাগ করেছিলেন; **শিষ্যঃ**—শিষ্য; **গঙ্গায়াম্**—গঙ্গার তীরে; **স্বম্**—স্বীয়; **কলেবর**—জড় দেহ।

অনুবাদ

তারপর, সমস্ত সঙ্গ পরিত্যাগ করে মহারাজ পরীক্ষিৎ ব্যাসদেবের পুত্র শুকদেব গোস্বামীর শরণাগত হয়ে তাঁর শিষ্যত্ব বরণ করেছিলেন এবং ভগবানের তত্ত্ব সম্যক্‌ভাবে অবগত হয়ে গঙ্গার তীরে তাঁর দেহ ত্যাগ করেছিলেন।

তাৎপর্য

এখানে 'অজিত' শব্দটি তাৎপর্যপূর্ণ। পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ 'অজিত' নামে পরিচিত, কেননা কেউ কখনও তাঁকে পরাজিত করতে পারে না। কেউই তাঁর প্রকৃত স্থিতি জানতে পারে না। তিনি জ্ঞানের দ্বারাও অপরাজেয়। আমরা শুনেছি যে, তাঁর নিত্য ধাম হচ্ছে গোলোক বৃন্দাবন, কিন্তু বহু পণ্ডিত বিভিন্নভাবে তাঁর সেই ধামের ব্যাখ্যা করেন। তবে শুকদেব গোস্বামীর মতো গুরুদেবের কৃপায় মহারাজ পরীক্ষিতের মতো বিনীতভাবে আত্ম-নিবেদন করার ফলে ভগবান, তাঁর নিত্য ধাম, তাঁর অপ্রাকৃত পরিকর ইত্যাদির সম্বন্ধে যথাযথভাবে জানা যায়।

ভগবানের পরম পদ এবং যে অপ্রাকৃত উপায়ের দ্বারা তাঁর সেই দিব্য ধামে যাওয়া যায়, সেই সম্বন্ধে যথাযথভাবে অবগত হয়ে মহারাজ পরীক্ষিৎ নিশ্চিতভাবে উপলব্ধি করেছিলেন যে, সেটি হচ্ছে তাঁর চরম গন্তব্যস্থল। তা জানার ফলেই তিনি সমস্ত জড় বিষয়, এমন কি তাঁর নিজের দেহের প্রতিও সম্পূর্ণ অনাসক্ত হয়ে অনায়াসে সব কিছু পরিত্যাগ করতে পেরেছিলেন।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় বলা হয়েছে *পরং দৃষ্ট্বা নিবর্ততে* অর্থাৎ পরমেশ্বর ভগবানের উৎকৃষ্ট গুণাবলী দর্শন করার ফলে মানুষ জড় জগতের সমস্ত আসক্তি বর্জন করতে সক্ষম হয়। *শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা* থেকে আমরা জানতে পারি যে, ভগবানের অন্তরঙ্গা শক্তির গুণ জড়া প্রকৃতির গুণের থেকে উৎকৃষ্ট, এবং শুকদেব গোস্বামীর

মতো সদ্‌গুরুর কৃপায় ভগবানের সেই উৎকৃষ্ট প্রকৃতি—যার থেকে তাঁর দিব্য নাম, রূপ, গুণ, লীলা, পরিকর এবং বৈশিষ্ট্য প্রকাশিত হয়, সেই সম্বন্ধে সম্পূর্ণরূপে অবগত হওয়া যায়।

ভগবানের সেই উৎকৃষ্ট বা নিত্য প্রকৃতি যথাযথভাবে উপলব্ধি করতে না পারলে জড়া প্রকৃতি পরিত্যাগ করা কখনোই সম্ভব হয় না, যদিও পরম তত্ত্বের সেই প্রকৃতি সম্বন্ধে নানা রকম জল্পনা-কল্পনা করা যেতে পারে।

শ্রীকৃষ্ণের কৃপায় মহারাজ পরীক্ষিৎ শুকদেব গোস্বামীর মতো মহাত্মার কৃপা লাভ করতে পেরেছিলেন, এবং তার ফলেই তিনি অজিত ভগবানের প্রকৃত স্থিতি অবগত হতে পেরেছিলেন। পরমেশ্বর ভগবান বেদেরও দুর্লভ, কিন্তু শুকদেব গোস্বামীর মতো নিত্য মুক্ত ভক্তের কৃপায় অনায়াসে তাঁকে জানা যায়।

শ্লোক ৪

নোত্তমশ্লোকবার্তানাং জুষতাং তৎকথামৃতম্ ।
স্যাৎসম্ভ্রমোহন্তকালেহপি স্মরতাং তৎপদাম্বুজম্ ॥ ৪ ॥

ন—কখনোই না; উত্তম-শ্লোক—ভগবান; যাঁর মহিমা বৈদিক শ্লোকে গীত হয়; বার্তানাম্—বার্তা; জুষতাম্—যারা রত থাকেন; তৎ—তাঁর; কথা-অমৃতম্—তাঁর সম্বন্ধীয় অপ্রাকৃত বিষয়; স্যাৎ—হয়; সম্ভ্রমঃ—ভুল ধারণা; অন্তকালে—অন্তিম সময়ে; অপি—ও; স্মরতাম্—স্মরণ করে; তৎ—তাঁর; পদাম্বুজম্—শ্রীপাদপদ্ম।

অনুবাদ

তাঁর এরকম হওয়া বিচিত্র নয়, কেননা যাঁরা উত্তমশ্লোক ভগবানের বার্তাতেই অবিরত রত থাকেন, যাঁরা নিরন্তর ভগবানের কথারূপ সেই অমৃত পান করেন এবং তাঁর চরণ-কমল স্মরণ করেন, জীবনের অন্তিম সময়েও তাঁদের বুদ্ধি-বিভ্রম হয় না।

তাৎপর্য

জীবনের সর্বোচ্চ সিদ্ধি হচ্ছে অন্তিম সময়ে ভগবানের দিব্য প্রকৃতি স্মরণ করা। জীবনের এই সিদ্ধি তিনিই লাভ করেন, যিনি শুকদেব গোস্বামীর মতো গুরুপরম্পরা ধারায় স্থিত মুক্ত পুরুষের কাছ থেকে বৈদিক শ্লোকের মাধ্যমে ভগবানের দিব্য প্রকৃতি সম্বন্ধে শিক্ষা লাভ করেছেন। মনোধর্মী জ্ঞানীদের কাছ থেকে বৈদিক শ্লোক

শুনলে কোন লাভ হয় না। তা যখন তত্ত্বদ্রষ্টা মহাপুরুষের কাছ থেকে প্রণিপাত, পরিপ্রশ্ন এবং সেবার মাধ্যমে যথাযথভাবে শ্রবণ করা হয়, তখন সব কিছুই স্ফটিকের মতো স্বচ্ছ হয়ে যায়।

এইভাবে বিনীত শিষ্য তাঁর জীবনের অন্তিম সময় পর্যন্ত দিব্য জীবন যাপন করতে সক্ষম হয়। এই বিজ্ঞানসম্মত পন্থা অবলম্বন করার ফলে জীবনের অন্তিম সময়েও, যখন শরীর জর্জরিত হয়ে যাওয়ার ফলে স্মৃতিশক্তি শিথিল হয়ে যায়, তখনও ভগবানকে স্মরণ করা সম্ভব হয়। মৃত্যুর সময় সাধারণ মানুষের পক্ষে কোন কিছু মনে রাখা অত্যন্ত কঠিন, কিন্তু ভগবানের কৃপায় এবং তাঁর শুদ্ধ ভক্ত গুরুদেবের কৃপায় অনায়াসে সেই সৌভাগ্য অর্জন করা যায়। পরীক্ষিৎ মহারাজের বেলায় তা হয়েছিল।

শ্লোক ৫

তাবৎকলির্ন প্রভবেৎ প্রবিষ্টোঽপীহ সর্বতঃ ।
যাবদীশো মহানুর্ব্যামাভিমন্যব একরাট্ ॥ ৫ ॥

তাবৎ—তখন পর্যন্ত; **কলিঃ**—মূর্তিমান কলি; **ন**—পারেনি; **প্রভবেৎ**—প্রভাব বিস্তার করতে; **প্রবিষ্টঃ**—প্রবেশ করে; **অপি**—যদিও; **ইহ**—এখানে; **সর্বতঃ**—সর্বত্র; **যাবৎ**—যতক্ষণ পর্যন্ত; **ঈশঃ**—ভগবান; **মহান্**—মহান; **উর্ব্যাম্**—শক্তিশালী; **অভিমন্যব**—অভিমন্যু-পুত্র; **একরাট্**—একচ্ছত্র সম্রাট।

অনুবাদ

অভিমন্যুনন্দন মহারাজ পরীক্ষিৎ যতদিন এই পৃথিবীর একচ্ছত্র সম্রাট ছিলেন, ততদিন কলি এই পৃথিবীর সর্বত্র প্রবিষ্ট হলেও তার প্রভাব বিস্তার করতে সমর্থ হয়নি।

তাৎপর্য

পূর্বে বর্ণিত হয়েছে যে, কলি বহু পূর্বেই এই পৃথিবীতে প্রবেশ করেছিল, এবং সারা পৃথিবী জুড়ে তার প্রভাব বিস্তার করার সুযোগ খুঁজছিল। কিন্তু মহারাজ পরীক্ষিতের উপস্থিতির ফলে সে তা করতে পারেনি। এইটি সুষ্ঠু শাসন ব্যবস্থার লক্ষণ। কলির মতো উপদ্রবকারী ব্যক্তিরা সব সময় তাদের জঘন্য কার্যকলাপ বিস্তার করার চেষ্টা করবে, কিন্তু উপযুক্ত রাষ্ট্রনেতাদের কর্তব্য হচ্ছে সর্বতোভাবে তাদের নিরস্ত করা।

মহারাজ পরীক্ষিৎ যদিও কলির জন্য কতকগুলি বিশেষ স্থান নির্দেশ করেছিলেন তথাপি সেই সময়ে তিনি তাঁর প্রজাদের কলির দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার কোন সুযোগের অবকাশ রাখেননি।

শ্লোক ৬

যস্মিন্নহনি যর্হ্যেব ভগবানুৎসসর্জ গাম্‌।
তদৈবেহানুবৃত্তোঽসাবধর্মপ্রভবঃ কলিঃ ॥ ৬ ॥

যস্মিন্—যেই; **অহনি**—দিনে; **যর্হি এব**—ঠিক সেই সময়; **ভগবান্**—পরমেশ্বর ভগবান; **উৎসসর্জ**—ত্যাগ করেছিলেন; **গাম্**—পৃথিবী; **তদা**—তখন; **এব**—অবশ্যই; **ইহ**—এই পৃথিবীতে; **অনুবৃত্তঃ**—অনুপ্রবেশ করেছিল; **অসৌ**—সে; **অধর্ম**—অধর্ম; **প্রভবঃ**—প্রভাব বিস্তারকারী; **কলিঃ**—মূর্তিমান কলহ।

অনুবাদ

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যেদিন যে মুহূর্তে এই ধরাধাম পরিত্যাগ করেছিলেন, অধর্মের আশ্রয় কলি সেই দিন সেই মুহূর্তেই এখানে প্রবেশ করেছিল।

তাৎপর্য

পরমেশ্বর ভগবান এবং তাঁর দিব্য নাম, রূপ, গুণ ইত্যাদি সবই অভিন্ন। পরমেশ্বর ভগবানের উপস্থিতির ফলে কলি এই পৃথিবীতে প্রবেশ করতে পারেনি। তেমনি যদি নিরন্তর ভগবানের দিব্য নাম, যশ, গুণ ইত্যাদি কীর্তন হয়, তা হলে কলির প্রবেশ করার কোন সুযোগ থাকে না। এই পৃথিবী থেকে কলিকে দূর করে দেওয়ার এটিই হচ্ছে উপায়।

আধুনিক মানব সমাজে জড় বিজ্ঞানের অনেক উন্নতি হয়েছে, এবং তারা বায়ুমণ্ডলে শব্দের বিস্তারের জন্য বেতারযন্ত্র আবিষ্কার করেছে। এখন ইন্দ্রিয় তৃপ্তির জন্য কতকগুলি অর্থহীন শব্দ তরঙ্গায়িত না করে রাষ্ট্রনেতারা যদি *শ্রীমদ্ভাগবতের* ভিত্তিতে ভগবানের দিব্য নাম, যশ এবং লীলার অপ্রাকৃত শব্দ তরঙ্গ বিতরণ করেন, তা হলে এক অনুকূল পরিস্থিতির সৃষ্টি হবে, এবং সারা পৃথিবী জুড়ে ধর্মের পুনঃ প্রতিষ্ঠা হবে।

এইভাবে অন্যায় এবং অসদ্ আচরণ নির্মূল করতে আগ্রহী রাষ্ট্রনেতারা অনায়াসে কৃতকার্য হতে পারবেন। ভগবানের সেবায় ব্যবহৃত হলে কোন কিছুই আর খারাপ থাকে না।

শ্লোক ৭

নানুদ্বেষ্টি কলিং সম্রাট্ সারঙ্গ ইব সারভুক্ ।
কুশলান্যাশু সিদ্ধ্যন্তি নেতরাণি কৃতানি যৎ ॥ ৭ ॥

ন—কখনোই না; **অনুদ্বেষ্টি**—ঈর্ষাপরায়ণ; **কলিম্**—কলিকে; **সম্রাট্**—সম্রাট; **সারম্-গ ইব**—ভ্রমরের মতো; **সারভুক্**—সারগ্রাহী; **কুশলানি**—শুভ বস্তুসমূহ; **আশু**—অচিরেই; **সিদ্ধ্যন্তি**—সফল হয়; **ন**—কখনোই না; **ইতরাণি**—অশুভ; **কৃতানি**—অনুষ্ঠিত হলে; **যৎ**—যতখানি।

অনুবাদ

মহারাজ পরীক্ষিৎ ছিলেন মধুকরের মতো সারগ্রাহী। তিনি খুব ভালভাবেই জানতেন যে, এই কলিযুগে শুভ কর্ম সম্পাদন করার ইচ্ছামাত্রই তার ফল পাওয়া যায়, কিন্তু অশুভ কর্মসমূহের ক্ষেত্রে সেরূপ হয় না, সেগুলি অনুষ্ঠিত হলেই ফল দান করে। তাই তিনি কলিযুগের প্রতি বিদ্বেষী ছিলেন না।

তাৎপর্য

কলিযুগকে বলা হয় অধঃপতিত যুগ। এই অধঃপতিত যুগে সমস্ত জীবেরা অত্যন্ত দুর্দশাগ্রস্ত বলে পরমেশ্বর ভগবান তাদের কিছু বিশেষ সুবিধা প্রদান করেছেন। তাই ভগবানের কৃপায়, পাপ কর্মের অনুষ্ঠান না করা পর্যন্ত জীবকে পাপের ফল ভোগ করতে হয় না। অন্যান্য যুগে পাপ কর্মের কথা চিন্তা করার ফলেই কেবল জীবকে সেই কর্মের ফল ভোগ করতে হত।

পক্ষান্তরে, এই যুগে পুণ্য কর্মের কথা চিন্তা করলেই কেবল তার ফল লাভ করা যায়। ভগবানের কৃপায় মহারাজ পরীক্ষিৎ ছিলেন অত্যন্ত জ্ঞানী এবং অভিজ্ঞ রাজা, তাই তিনি কলির প্রতি অনর্থক বিদ্বেষপরায়ণ ছিলেন না, কেননা তিনি তাকে কোন পাপ কর্ম করার সুযোগ দিতে চাননি। তিনি তাঁর প্রজাদের কলিযুগের পাপময় প্রভাব থেকে রক্ষা করেছিলেন, আবার সেই সঙ্গে তিনি কলিকে সমস্ত সুযোগ দিয়েছিলেন কতকগুলি বিশেষ বিশেষ স্থানে থাকবার অনুমতি দিয়ে।

শ্রীমদ্ভাগবতের শেষে বলা হয়েছে যে, কলিযুগ যদিও একটি পাপের সমুদ্র কিন্তু এই যুগে একটি মহান্ গুণ রয়েছে। তা হচ্ছে কেবলমাত্র ভগবানের দিব্য নাম কীর্তন করার ফলে জীব অনায়াসে এই জড় জগতের বন্ধন থেকে মুক্ত হতে পারে। এইভাবে মহারাজ পরীক্ষিৎ ভগবানের দিব্য নাম প্রচারের এক সুসংবদ্ধ প্রচেষ্টা করেছিলেন, এবং কলির কবল থেকে তাঁর প্রজাদের রক্ষা করেছিলেন।

এই বিশেষ সুবিধাটির জন্যই কেবল মহর্ষিরা কখনো কখনো কলিযুগের শুভ কামনা করেন। বেদেও বলা হয়েছে যে, শ্রীকৃষ্ণের কার্যকলাপের কথা আলোচনার ফলে কলিযুগের সমস্ত অসুবিধা থেকে মুক্ত হওয়া যায়। শ্রীমদ্ভাগবতের শুরুতেও বলা হয়েছে যে, শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ করার ফলে পরমেশ্বর ভগবান হৃদয়ে বন্দী হয়ে যান। এইগুলি কলিযুগের কয়েকটি বিশেষ গুণ, এবং মহারাজ পরীক্ষিৎ সেগুলির পূর্ণ সদ্ব্যবহার করেছিলেন এবং একজন প্রকৃত বৈষ্ণব হওয়ার ফলে তিনি কলির কোন অমঙ্গল কামনা করেননি।

শ্লোক ৮

কিং নু বালেষু শূরেণ কলিনা ধীরভীরুণা ।
অপ্রমত্তঃ প্রমত্তেষু যো বৃকো নৃষু বর্ততে ॥ ৮ ॥

কিম্—কি; **নু**—হতে পারে; **বালেষু**—অজ্ঞ ব্যক্তিদের মধ্যে; **শূরেণ**—শক্তিশালী; **কলিনা**—কলির দ্বারা; **ধীর**—আত্মসংযত; **ভীরুণা**—ভয়ভীত ব্যক্তির দ্বারা; **অপ্রমত্তঃ**—সতর্ক; **প্রমত্তেষু**—প্রমত্তদের মধ্যে; **যঃ**—যিনি; **বৃকঃ**—ব্যাঘ্র; **নৃষু**—মানুষদের মধ্যে; **বর্ততে**—বিরাজমান।

অনুবাদ

মহারাজ পরীক্ষিৎ বিবেচনা করেছিলেন যে, নির্বোধ মানুষেরাই কেবল কলিকে অত্যন্ত শক্তিশালী বলে মনে করবে, কিন্তু যারা আত্মসংযত তাদের কলি থেকে কোন ভয় থাকবে না। মহারাজ পরীক্ষিৎ ছিলেন সিংহের মতো পরাক্রমশালী এবং তিনি মূর্খ এবং অসতর্ক ব্যক্তিদের রক্ষা করেছিলেন।

তাৎপর্য

যারা ভগবানের ভক্ত নয়, তারা অসাবধান এবং বুদ্ধিহীন। যথার্থ বুদ্ধিমান না হলে পরমেশ্বর ভগবানের ভক্ত হওয়া যায় না। যারা ভগবানের ভক্ত নয়, তারা কলির কার্যকলাপের শিকার হয়। যতক্ষণ পর্যন্ত না আমরা মহারাজ পরীক্ষিতের দ্বারা প্রদর্শিত কার্য পদ্ধতি স্বীকার করি, ততক্ষণ সমাজে সুস্থ পরিস্থিতির সৃষ্টি করা সম্ভব হবে না, অর্থাৎ জনসাধারণের কাছে ভগবদ্ভক্তির প্রচার সম্ভব হবে না।

শ্লোক ৯

উপবর্ণিতমেতদ্বঃ পুণ্যং পারীক্ষিতং ময়া ।
বাসুদেবকথোপেতমাখ্যানং যদপৃচ্ছত ॥ ৯ ॥

উপবর্ণিতম্—প্রায় সব কিছুই বর্ণিত হয়েছে; **এতৎ**—এই সমস্ত; **বঃ**—আপনাকে; **পুণ্যম্**—পুণ্য; **পারীক্ষিতম্**—পরীক্ষিৎ মহারাজ সম্বন্ধে; **ময়া**—আমার দ্বারা; **বাসুদেব**—শ্রীকৃষ্ণের; **কথা**—বর্ণনা; **উপেতম্**—সেই প্রসঙ্গে; **আখ্যানম্**—উক্তি; **যৎ**—যাঁর; **অপৃচ্ছত**—আমাকে জিজ্ঞাসা করেছেন।

অনুবাদ

হে ঋষিবৃন্দ, আপনারা আমাকে যে প্রশ্ন করেছিলেন, সেই অনুসারে আমি আপনাদের মহারাজ পরীক্ষিতের পবিত্র ইতিহাসের প্রসঙ্গে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের কথা বর্ণনা করেছি।

তাৎপর্য

শ্রীমদ্ভাগবত হচ্ছে পরমেশ্বর ভগবানের কার্যকলাপের ইতিহাস। ভগবানের কার্যকলাপ তাঁর ভক্তদের নিয়েই সম্পন্ন হয়। তাই ভক্তের ইতিহাস এবং ভগবান শ্রীকৃষ্ণের কার্যকলাপের ইতিহাস ভিন্ন নয়। ভগবদ্ভক্ত মনে করেন যে, ভগবানের কার্যকলাপ এবং তাঁর শুদ্ধ ভক্তের কার্যকলাপ সমপর্যায়ভুক্ত, কেননা তা অপ্রাকৃত।

শ্লোক ১০

যা যাঃ কথা ভগবতঃ কথনীয়োরুকর্মণঃ ।
গুণকর্মাশ্রয়াঃ পুম্ভিঃ সংসেব্যাস্তা বুভূষুভিঃ ॥ ১০ ॥

যাঃ যাঃ—যা কিছু; **কথা**—বিষয়; **ভগবতঃ**—পরমেশ্বর ভগবান সম্বন্ধে; **কথনীয়**—আমার বলার ছিল; **উরুকর্মণঃ**—যাঁর কার্যকলাপ অত্যন্ত অদ্ভুত; **গুণ**—দিব্য গুণ; **কর্ম**—অসাধারণ কার্যকলাপ; **আশ্রয়াঃ**—সম্বন্ধীয়; **পুম্ভিঃ**—ব্যক্তিদের দ্বারা; **সংসেব্যা**—শ্রবণ করা উচিত; **তাঃ**—সেই সমস্ত; **বুভূষুভিঃ**—যাঁরা তাঁদের কল্যাণ আকাঙ্ক্ষা করেন।

অনুবাদ

যাঁরা তাঁদের জীবনের পূর্ণ সিদ্ধি অভিলাষী, তাঁদের অবশ্যই শ্রদ্ধাবনত চিত্তে অদ্ভুতকর্মা পরমেশ্বর ভগবানের অপ্রাকৃত গুণ এবং কার্যকলাপ সম্বন্ধীয় কথা শ্রবণ করা কর্তব্য।

তাৎপর্য

পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের অপ্রাকৃত কার্যকলাপ, গুণ এবং নাম যথাযথভাবে শ্রবণ করলে নিত্য জীবনের প্রতি অগ্রসর হওয়া যায়। যথাযথভাবে শ্রবণ করার অর্থ হচ্ছে ধীরে ধীরে তাঁকে বাস্তব সত্য বলে জানা, এবং তার ফলে শাশ্বত জীবন লাভ করা যায়, এ কথা *শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায়* বর্ণিত হয়েছে। শ্রীকৃষ্ণের এই প্রকার মহিমান্বিত অপ্রাকৃত কার্যকলাপের শ্রবণ জন্ম-মৃত্যু-জরা-ব্যাধিরূপ ভবরোগ নিরাময়ের ঔষধ। এই প্রকার জীবনের সিদ্ধ অবস্থার পরিণতি মানব জীবনের চরম লক্ষ্য এবং দিব্য আনন্দ উপলব্ধির প্রকৃত পন্থা।

শ্লোক ১১

ঋষয় উচুঃ

সূত জীব সমাঃ সৌম্য শাশ্বতীর্বিশদং যশঃ ।
যস্ত্বং শংসসি কৃষ্ণস্য মর্ত্যানামমৃতং হি নঃ ॥ ১১ ॥

ঋষয়ঃ উচুঃ—ঋষিরা বললেন; **সূত**—হে সূত গোস্বামী; **জীব**—আমরা তোমার দীর্ঘায়ু কামনা করি; **সমাঃ**—বহু বৎসর; **সৌম্য**—গম্ভীর; **শাশ্বতীঃ**—নিত্য; **বিশদম্**—বিশেষভাবে; **যশঃ**—যশ; **যঃ-ত্বম্**—যেহেতু আপনি; **শংসসি**—সুন্দরভাবে বলছেন; **কৃষ্ণস্য**—শ্রীকৃষ্ণের; **মর্ত্যানাম্**—মর্ত্যলোকের জীব; **অমৃতম্**—নিত্য জীবন; **হি**—অবশ্যই; **নঃ**—আমাদের।

অনুবাদ

ঋষিরা বললেন—হে সৌম্য সূত গোস্বামী! আপনি দীর্ঘায়ু হন এবং অনন্ত যশ লাভ করুন, কেননা আপনি অত্যন্ত সুন্দরভাবে পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের কার্যকলাপ আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন। আমাদের মতো মরণশীল জীবেদের কাছে তা ঠিক অমৃতের মতো।

তাৎপর্য

আমরা যখন পরমেশ্বর ভগবানের দিব্য গুণাবলী এবং কার্যকলাপের কথা শুনি, তখন আমরা সব সময় মনে রাখতে পারি ভগবান স্বয়ং *শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায়* (৪/৯) কি বলেছেন। যখন তিনি একজন সাধারণ মানুষের মতো তাঁর লীলাবিলাস করেন, তখনও তাঁর সমস্ত কার্যকলাপ দিব্য, কারণ তা সম্পাদিত হয় তাঁর পরা শক্তির মাধ্যমে, যা জড়া প্রকৃতি থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। *শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায়* তাঁর সেই সমস্ত কার্যকলাপকে 'দিব্যম্' বলে বর্ণনা করা হয়েছে। অর্থাৎ তিনি মায়ার দ্বারা প্রভাবিত হয়ে একজন সাধারণ জীবের মতো জন্মগ্রহণ করেন না, অথবা কার্যকলাপ করেন না। তাঁর দেহও সাধারণ জীবের মতো জড় অথবা পরিবর্তনশীল নয়।

যিনি এই তত্ত্ব ভগবানের কাছ থেকে অথবা কোন প্রামাণিক সূত্র থেকে যথাযথভাবে হৃদয়ঙ্গম করতে পারেন, তাঁর জড় দেহ ত্যাগ করার পর তাঁকে আর পুনরায় জন্মগ্রহণ করতে হয় না। সেই প্রকার জ্ঞানের আলোকে উদ্ভাসিত আত্মা ভগবানের দিব্য ধামে প্রবেশ করেন এবং ভগবানের অপ্রাকৃত প্রেমময়ী সেবায় যুক্ত হন। তাই *শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, শ্রীমদ্ভাগবত* আদি প্রামাণিক শাস্ত্র গ্রন্থে বর্ণিত ভগবানের দিব্য কার্যকলাপ আমরা যতই শ্রবণ করি, ততই আমরা তাঁর পরা প্রকৃতি সম্বন্ধে জানতে পারি এবং ভগবদ্ধামে ফিরে যাওয়ার পথে নিশ্চিতভাবে অগ্রসর হতে পারি।

শ্লোক ১২

কর্মণ্যস্মিন্নানাশ্বাসে ধূমধূম্রাত্মনাং ভবান্ ।
আপায়য়তি গোবিন্দপাদপদ্মাসবং মধু ॥ ১২ ॥

কর্মণি—কর্মের অনুষ্ঠান; **অস্মিন্**—এই; **অনাশ্বাসে**—নিশ্চিতভাবে নয়; **ধূম**—ধোঁয়া; **ধূম্র-আত্মনাম্**—কলুষিত দেহ এবং শরীর; **ভবান্**—আপনি; **আপায়য়তি**—অত্যন্ত সন্তুষ্টিজনক; **গোবিন্দ**—পরমেশ্বর ভগবান; **পাদ**—পা; **পদ্ম-আসবম্**—পদ্মফুলের অমৃত; **মধু**—মধু।

অনুবাদ

আমরা যে যজ্ঞ অনুষ্ঠান করছি, সেই অনুষ্ঠানে ভুলত্রুটিজনিত বহুবিধ বিঘ্নের সম্ভাবনা, তাই আমরা জানি না নিশ্চিতভাবে তার ফল লাভ করা যাবে কি না।

ধূমের দ্বারা বিবর্ণ আমাদের দেহকে আপনি শ্রীগোবিন্দের চরণারবিন্দের অমৃত পান করিয়েছেন।

তাৎপর্য

নৈমিষারণ্যের ঋষিরা যে যজ্ঞাগ্নি প্রজ্বলিত করেছিলেন তা অবশ্যই ধূম এবং সংশয়ে পূর্ণ ছিল, কেননা তাতে অনেক ত্রুটি-বিচ্যুতি ছিল। তাই প্রথম ত্রুটিটি হচ্ছে যে, এই কলিযুগে যথাযথভাবে যজ্ঞ অনুষ্ঠান করার মতো সুদক্ষ ব্রাহ্মণদের অত্যন্ত অভাব। এই প্রকার যজ্ঞ অনুষ্ঠানে যদি একটিও ভুল হয়, তা হলে সেই যজ্ঞ অনুষ্ঠান সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থ হয়। অতএব এই প্রকার যজ্ঞেরও কোন নিশ্চয়তা নেই। ধানের ক্ষেতে ভালভাবে লাঙল দিয়ে জমি তৈরি করলেও ফসল নির্ভর করে বৃষ্টির উপর, এবং তাই তার ফল অনিশ্চিত। তেমনই, এই কলিযুগে যজ্ঞ অনুষ্ঠানের ফলও অনিশ্চিত। কলিযুগে কিছু অসৎ এবং লোভী ব্রাহ্মণেরা অবোধ মানুষদের প্রতারণা করার জন্য এই সব অনিশ্চিত এবং লোক-দেখানো যজ্ঞ অনুষ্ঠান করে। এই কলিযুগে হরিনাম সংকীর্তন ছাড়া অন্য কোন যজ্ঞই ফলপ্রসূ নয়—এই শাস্ত্রীয় নির্দেশ তারা প্রকাশ করে না।

সূত গোস্বামী নৈমিষারণ্যে সমবেত ঋষিদের কাছে ভগবানের দিব্য লীলাবিলাসের কথা বর্ণনা করছিলেন, এবং তাঁরা বাস্তবিকভাবে সেই অপ্রাকৃত কার্যকলাপের কথা শ্রবণ করার ফল অনুভব করতে পারছিলেন। খাদ্য আহার করার ফল যেমন খাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে অনুভব করা যায়, তেমনই ভগবানের কথা শ্রবণ করার সুফল তৎক্ষণাৎ অনুভব করা যায়। পারমার্থিক উপলব্ধি এইভাবেই ক্রিয়া করে।

নৈমিষারণ্যের ঋষিরা যজ্ঞাগ্নির ধূমের প্রভাবে বিশেষ ক্লেশ অনুভব করছিলেন এবং সেই যজ্ঞের ফল সম্বন্ধেও তাঁদের যথেষ্ট সন্দেহ ছিল। কিন্তু সূত গোস্বামীর মতো একজন তত্ত্বদ্রষ্টা পুরুষের শ্রীমুখ নিঃসৃত বাণী শ্রবণ করে তাঁরা সম্পূর্ণরূপে তৃপ্ত হয়েছিলেন।

ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণে শ্রীবিষ্ণু শিবকে বলেছেন যে, এই কলিযুগে মানুষ বিভিন্ন প্রকার উৎকণ্ঠায় পূর্ণ হওয়ার ফলে সকাম কর্ম এবং মনোধর্ম প্রসূত জ্ঞানে অনর্থক প্রয়াস করবে, কিন্তু তারা যখন ভগবদ্ভক্তিতে যুক্ত হবে, তখন তার ফল নিশ্চিত এবং অবশ্যম্ভাবী, এবং সেই পন্থা অনুসরণে কোন শক্তির অপচয় হয় না। অর্থাৎ, ভগবদ্ভক্তি ব্যতীত যথার্থ উপলব্ধির পারমার্থিক প্রয়াস অথবা জড়জাগতিক কোন প্রকার লাভের প্রয়াস কখনোই সফল হতে পারে না।

শ্লোক ১৩

তুলয়াম লবেনাপি ন স্বর্গং নাপুনর্ভবম্ ।
ভগবৎসঙ্গিসঙ্গস্য মর্ত্যানাং কিমুতাশিষঃ ॥ ১৩ ॥

তুলয়াম—সমতুল্য; **লবেন**—অতি অল্পকাল; **অপি**—ও; **ন**—না; **স্বর্গম্**—স্বর্গলোক; **ন**—না; **অপুনর্ভবম্**—জড় জগতের বন্ধন থেকে মুক্তি; **ভগবৎ-সঙ্গি**—ভগবানের ভক্ত; **সঙ্গস্য**—সঙ্গ করার; **মর্ত্যানাম্**—মরণশীল; **কিম্**—কি আছে; **উত**—বলার; **আশিষঃ**—পার্থিব আশীর্বাদ।

অনুবাদ

ভগবৎসঙ্গীর সঙ্গে নিমেষমাত্র সঙ্গ করার ফলে জীবের যে অসীম মঙ্গল সাধিত হয়, তার সঙ্গে স্বর্গ বা মোক্ষেরও তুলনা করা যায় না, তখন মরণশীল মানুষের জাগতিক সমৃদ্ধির কথা আর কি বলার আছে!

তাৎপর্য

একটি বস্তুর সঙ্গে অন্য আর একটি বস্তুর তুলনা তখনই সম্ভব হয়, যখন তাদের মধ্যে কোন সাদৃশ্য থাকে। শুদ্ধ ভক্তের সান্নিধ্যের তুলনা কোন জাগতিক বস্তুর সঙ্গে করা সম্ভব নয়। যারা জড় সুখের প্রতি আসক্ত, তারা চন্দ্র, শুক্র, ইন্দ্রলোক আদি স্বর্গলোকে যাওয়ার কামনা করে, আর যারা মনোধর্মী ভৌতিক দর্শনের প্রতি আসক্ত, তারা জড় জগতের বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়ার কামনা করে। কেউ যখন সব রকম জড় সুখ ভোগের প্রচেষ্টায় ব্যর্থ হয়, তখন সে অপুনর্ভব বা পুনর্জন্ম না হওয়ার বিপরীত ধরনের মুক্তি কামনা করে। কিন্তু ভগবানের শুদ্ধ ভক্ত স্বর্গসুখ অথবা জড়জাগতিক বন্ধন থেকে মুক্তি, এর কোনটি কামনা করেন না। অর্থাৎ, ভগবানের শুদ্ধ ভক্তের কাছে স্বর্গসুখ আকাশ কুসুমের মতো অর্থহীন এবং যেহেতু তাঁরা সব রকমের জড়সুখ এবং দুঃখের অনুভূতি থেকে মুক্ত, তাই তাঁরা জড় জগতে অবস্থান কালেও মুক্ত। অর্থাৎ, ভগবানের শুদ্ধ ভক্ত জড় জগৎ এবং চিৎ জগৎ যেখানেই থাকুন না কেন, ভগবানের প্রেমময়ী সেবারূপ চিন্ময় অস্তিত্বে বিরাজ করেন।

একজন সরকারী কর্মচারী যেমন অফিসে অথবা তাঁর গৃহে অথবা যে কোন জায়গাতেই থাকুন না কেন, সর্ব অবস্থাতেই তিনি সরকারী কর্মচারী, তেমনই ভগবদ্ভক্তের সঙ্গে জড় জগতের কোন সম্পর্ক নেই, কেননা তিনি সর্বদাই ভগবানের সেবায় ঐকান্তিকভাবে যুক্ত। যেহেতু জড় জগতে তার কাম্য কিছুই নেই, তাই

প্রভুত্ব বা রাজত্বের মতো জড়জাগতিক সুখে তার কী আসে যায়? এসব তো দেহের বিনাশের সঙ্গে সঙ্গেই শেষ হয়ে যাবে।

ভগবদ্ভক্তি নিত্য; তা অন্তহীন, কারণ তা চিন্ময়। তাই, ভগবানের শুদ্ধ ভক্তের সম্পদ জড় সম্পদ থেকে ভিন্ন হওয়ার ফলে এই দুয়ের মধ্যে কখনো কোন তুলনা করা সম্ভব হয় না।

সূত গোস্বামী ছিলেন ভগবানের শুদ্ধ ভক্ত, এবং তাই নৈমিষারণ্যের ঋষিদের সঙ্গে তাঁর সঙ্গ ছিল অতুলনীয়। জড় জগতে জড় বিষয়াসক্ত মানুষদের বলা হয় যোষিত সঙ্গী, কারণ তারা স্ত্রীলোক এবং অন্যান্য জড় বিষয়ের প্রতি অত্যন্ত আসক্ত। এই প্রকার আসক্তি সর্বতোভাবে ত্যাজ্য, কেননা তার ফলে মঙ্গল এবং সমৃদ্ধি দূর হয়ে যায়। তার ঠিক বিপরীত হচ্ছে ভগবৎ সঙ্গী, অর্থাৎ যিনি সর্বদা ভগবানের নাম, রূপ, গুণ ইত্যাদির প্রতি আসক্ত। সেই প্রকার সঙ্গ সব সময় কাম্য; তা পূজনীয়, প্রশংসনীয়, এবং সেইটিই হচ্ছে জীবনের চরম লক্ষ্য।

শ্লোক ১৪

কো নাম তৃপ্যেদ্ রসবিৎকথায়াং
মহত্তমৈকান্তপরায়ণস্য।
নান্তং গুণানামগুণস্য জগ্মু-
র্যোগেশ্বরা যে ভবপাদ্মমুখ্যাঃ ॥ ১৪ ॥

কঃ—তিনি কে; **নাম**—বিশেষভাবে; **তৃপ্যেৎ**—পূর্ণ সন্তোষ লাভ করেন; **রসবিৎ**—রস আস্বাদনে পারদর্শী; **কথায়াম্**—বিষয়ে; **মহত্তম্**—জীবদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ; **একান্ত**—একমাত্র; **পরায়ণস্য**—আশ্রয়ের; **ন**—কখনোই না; **অন্তম্**—শেষ; **গুণানাম্**—গুণসমূহের; **অগুণস্য**—চিজ্জগতের; **জগ্মু**—নিশ্চিত করতে পারে; **যোগ-ঈশ্বরাঃ**—যোগশক্তির অধিকারী; **যে**—তাঁরা সকলে; **ভব**—শিব; **পাদ্ম**—ব্রহ্মা; **মুখ্যাঃ**—মুখ্য।

অনুবাদ

পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ (গোবিন্দ) পরম শ্রেষ্ঠ মহাত্মাদের একমাত্র আশ্রয়। শিব, ব্রহ্মা প্রমুখ যোগেশ্বরেরাও তাঁর অপ্রাকৃত গুণসমূহের ইয়ত্তা করতে পারেন না। কোনও রসজ্ঞ ব্যক্তি কি তাঁর মহিমা শ্রবণ করে কখনো পূর্ণরূপে তৃপ্ত হতে পারেন?

তাৎপর্য

শিব এবং ব্রহ্মা হচ্ছেন দেবতাদের মধ্যে দুজন প্রধান দেবতা। তাঁরা পূর্ণ যোগশক্তিসম্পন্ন। যেমন শিব বিষের সমুদ্র পান করেছিলেন, যে বিষের এক ফোঁটা যে কোনো সাধারণ মানুষের প্রাণ নাশের পক্ষে যথেষ্ট। তেমনই ব্রহ্মা শিব আদি বহু দেবতাদের সৃষ্টি করেছেন, তাই তাঁরা দুজন হচ্ছেন ঈশ্বর বা ব্রহ্মাণ্ডের নায়ক। কিন্তু তাঁরা পরম শক্তিমান নন। পরম শক্তিমান হচ্ছেন গোবিন্দ, শ্রীকৃষ্ণ। তিনি চিন্ময় এবং তাঁর চিন্ময় গুণাবলী শিব, ব্রহ্মা প্রমুখ শক্তিশালী ঈশ্বরের দ্বারাও মাপা সম্ভব নয়। তাই শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন শ্রেষ্ঠ মহাত্মাদেরও একমাত্র আশ্রয়। ব্রহ্মা হচ্ছেন জীবতত্ত্ব, কিন্তু সমস্ত জীবেদের মধ্যে তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ। সর্বশ্রেষ্ঠ জীব ব্রহ্মা কেন ভগবানের কথার প্রতি এত আসক্ত? কেননা ভগবান হচ্ছেন সমস্ত আনন্দের উৎস। সকলেই সব কিছুর মধ্যে কোনও রস আস্বাদন করতে চান, কিন্তু যিনি ভগবানের অপ্রাকৃত প্রেমময়ী সেবায় যুক্ত হয়েছেন তিনি অন্তহীন আনন্দ আস্বাদন করতে পারেন। পরমেশ্বর ভগবান অনন্ত, এবং তাঁর নাম, রূপ, গুণ, লীলা, পরিকর, বৈশিষ্ট্য ইত্যাদি সবই অনন্ত, আর যাঁরা তা আস্বাদন করেন, তাঁরা অন্তহীনভাবে তা আস্বাদন করেও তৃপ্ত হন না। সেই তত্ত্ব প্রতিপন্ন হয়েছে *পদ্মপুরাণে* —

রমন্তে যোগিনোঽনন্তে সত্যানন্দচিদাত্মনি ।
ইতি রামপদেনাসৌ পরং ব্রহ্মাভিধীয়তে ॥

'যোগীরা পরম সত্য থেকে অসীম দিব্য আনন্দ লাভ করে, এবং তাই পরম সত্য, পরমেশ্বর ভগবানকে বলা হয় রাম।'

এই প্রকার দিব্য আলোচনার অন্ত নেই। জড় বিষয় ভোগে অবসাদের একটি নিয়ম আছে, কিন্তু চিন্ময় বিষয়ে এই নিয়ম নেই। সূত গোস্বামী নৈমিষারণ্যে ঋষিদের কাছে শ্রীকৃষ্ণের কথা বলে যেতে চেয়েছিলেন, এবং ঋষিরাও একাদিক্রমে তাঁর কথা শুনতে প্রস্তুত ছিলেন। যেহেতু পরমেশ্বর ভগবান চিন্ময় এবং তাঁর গুণাবলী দিব্য, তাই তাঁর কথা শুদ্ধ শ্রোতাদের তা গ্রহণ করার বাসনা ক্রমান্বয়ে বর্ধিত করে।

শ্লোক ১৫

তন্নো ভবান্ বৈ ভগবৎপ্রধানো
মহত্তমৈকান্তপরায়ণস্য ।
হরেরুদারং চরিতং বিশুদ্ধং
শুশ্রূষতাং নো বিতনোতু বিদ্বন্ ॥ ১৫ ॥

তৎ—অতএব; নঃ—আমাদের; ভবান্—আপনি; বৈ—অবশ্যই; ভগবৎ—পরমেশ্বর ভগবান সম্বন্ধীয়; প্রধানঃ—প্রধানত; মহত্তম্—সর্বশ্রেষ্ঠ; একান্ত—একমাত্র; পরায়ণস্য—আশ্রয়; হরেঃ—ভগবানের; উদারম্—নিরপেক্ষ; চরিতম্—কার্যকলাপ; বিশুদ্ধম্—দিব্য; শুশ্রূষতাম্—শ্রবণেচ্ছুক; নঃ—আমাদের; বিতনোতু—কৃপা করে বর্ণনা করুন; বিদ্বন্—হে বিদ্বান।

অনুবাদ

হে সূত গোস্বামী, আপনি বিদ্বান্ এবং ভগবানের শুদ্ধ ভক্ত, কারণ ভগবানের সেবাই আপনার একমাত্র উদ্দেশ্য। তাই আপনি দয়া করে আমাদের ভগবানের লীলাসমূহ বর্ণনা করুন, যা সমস্ত ভৌতিক বিচার ধারার অতীত, কেননা, সেই বাণী গ্রহণ করতে আমরা ঐকান্তিকভাবে আগ্রহী।

তাৎপর্য

ভগবানের দিব্য লীলা বিলাসের যিনি বক্তা, তাঁর সেব্য এবং আরাধ্য শুধু একজনই—তিনি হলেন পরমপুরুষ ভগবান শ্রীকৃষ্ণ। আর সেই বর্ণনা শ্রবণকারী শ্রোতাদের তাঁর কথা শ্রবণে ঐকান্তিক আকুলতা থাকা উচিত। এই প্রকার যোগ্য বক্তা এবং যোগ্য শ্রোতার যখন সংযোগ হয়, তখন অপ্রাকৃত বিষয়ের আলোচনা অত্যন্ত সুন্দরভাবে ফলপ্রসূ হয়। এই ধরনের আলোচনা থেকে পেশাদারী বক্তা আর জড় বিষয়ে মগ্ন শ্রোতার বাস্তবিক কোন লাভ হয় না। পেশাদারী বক্তারা তাদের পরিবার প্রতিপালনের জন্য লোক-দেখানো ভাগবত-সপ্তাহের আলোচনা করতে পারে, এবং জড় বিষয়াসক্ত শ্রোতারা ধর্ম, অর্থ, কাম অথবা মোক্ষরূপ জাগতিক লাভের জন্য সেই ভাগবত-সপ্তাহ শ্রবণ করতে পারে; কিন্তু এই প্রকার ভাগবত আলোচনা জড়জাগতিক কলুষতা থেকে মুক্ত নয়, এবং তার ফলে কারুরই কিছু লাভ হয় না।

কিন্তু শ্রীসূত গোস্বামী এবং নৈমিষারণ্যের মহাত্মাদের মধ্যে যে আলোচনা হয়েছিল, তা চিন্ময় স্তরের আলোচনা। তাঁদের কোন জাগতিক লাভের আকাঙ্ক্ষা বা উদ্দেশ্য ছিল না। এই প্রকার আলোচনায় বক্তা এবং শ্রোতা উভয়েই অন্তহীন দিব্য আনন্দ আস্বাদন করেন, এবং তার ফলে তাঁরা হাজার হাজার বছর ধরে সেই আলোচনা চালিয়ে যেতে পারেন।

আজকাল কেবল সাতদিন ধরে ভাগবত-সপ্তাহ হয়, এবং অনুষ্ঠানের পর, বক্তা এবং শ্রোতা উভয়েই জাগতিক কার্যকলাপে আগের মতো লিপ্ত হয়ে পড়ে। তার কারণ সেই বক্তা ভাগবত-প্রধান নন এবং শ্রোতারাও শুশ্রূষতাম্ নন, যে কথা পূর্বে বর্ণিত হয়েছে।

শ্লোক ১৬

স বৈ মহাভাগবতঃ পরীক্ষিদ্-
যেনাপবর্গাখ্যমদভ্রবুদ্ধিঃ ।
জ্ঞানেন বৈয়াসকিশব্দিতেন
ভেজে খগেন্দ্রধ্বজপাদমূলম্ ॥ ১৬ ॥

সঃ—তিনি; **বৈ**—অবশ্যই; **মহাভাগবতঃ**—সর্বোচ্চ স্তরের ভক্ত; **পরীক্ষিৎ**—মহারাজ পরীক্ষিৎ; **যেন**—যার ফলে; **অপবর্গাখ্যম্**—মুক্তি নামক; **অদভ্র**—স্থির; **বুদ্ধিঃ**—বুদ্ধি; **জ্ঞানেন**—জ্ঞানের দ্বারা; **বৈয়াসকি**—ব্যাসনন্দন; **শব্দিতেন**—উচ্চারিত; **ভেজে**—প্রাপ্ত হয়েছিলেন; **খগেন্দ্র**—পক্ষীরাজ গরুড়; **ধ্বজ**—পতাকা; **পাদমূলম্**—শ্রীপাদপদ্ম।

অনুবাদ

হে সূত গোস্বামী, সেই মহাভাগবত মহারাজ পরীক্ষিৎ ব্যাসনন্দন শুকদেবের কাছে যে ভগবৎ তত্ত্বজ্ঞান লাভ করে গরুড়ধ্বজ শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্ম প্রাপ্তিরূপ মোক্ষফল লাভ করেছিলেন, সে কথা আপনি দয়া করে আমাদের কাছে বর্ণনা করুন।

তাৎপর্য

মোক্ষ মার্গের অনুসরণকারী পরমার্থবাদীদের মধ্যে কিছু মতভেদ রয়েছে। সেই পরমার্থ অনুশীলনকারীরা নির্বিশেষবাদী এবং ভগবদ্ভক্ত এই দুটি শ্রেণীতে বিভক্ত। ভগবদ্ভক্তরা ভগবানের অপ্রাকৃত রূপের আরাধনা করেন, আর নির্বিশেষবাদীরা ব্রহ্মজ্যোতি নামক ভগবানের দেহ নির্গত রশ্মিচ্ছটার ধ্যান করেন।

এই শ্লোকে বর্ণনা করা হয়েছে যে, মহারাজ পরীক্ষিৎ ব্যাসনন্দন শ্রীল শুকদেব গোস্বামীর বাণী শ্রবণ করার মাধ্যমে ভগবানের শ্রীপাদপদ্ম লাভ করেছিলেন। শ্রীল শুকদেব গোস্বামীও প্রথমে নির্বিশেষবাদী ছিলেন, যে কথা তিনি নিজেই *শ্রীমদ্ভাগবতে* (২/১/৯) স্বীকার করেছেন, কিন্তু পরে তিনি ভগবানের অপ্রাকৃত লীলা বিলাসের প্রতি আকৃষ্ট হন এবং তার ফলে ভগবদ্ভক্তে পরিণত হন। এই প্রকার পূর্ণ জ্ঞান প্রাপ্ত ভক্তদের বলা হয় মহাভাগবত বা সর্বোচ্চ শ্রেণীর ভক্ত। ভক্ত সাধারণত তিন প্রকার, যথা—প্রাকৃত, মধ্যম এবং মহাভাগবত। প্রাকৃত বা কনিষ্ঠ অধিকারীর ভক্ত হচ্ছেন তাঁরা, যাঁদের ভগবান সম্বন্ধে এবং ভগবদ্ভক্ত সম্বন্ধে বিশেষ জ্ঞান নেই অথচ মন্দিরে ভগবানের পূজা করেন। মধ্যম অধিকারী বা

দ্বিতীয় স্তরের ভক্ত ভগবান, ভক্ত, নির্বোধ এবং বিদ্বেষী সম্বন্ধে ভালভাবে অবগত। আর মহাভাগবত বা সর্বোচ্চ শ্রেণীর ভক্তরা ভগবৎ সম্বন্ধে সব কিছু দর্শন করেন এবং সকলকেই ভগবানের সঙ্গে সম্পর্কিত বলে দর্শন করেন। মহাভাগবতেরা তাই ভগবদ্ভক্ত এবং অভক্তের মধ্যে কোন ভেদ দর্শন করেন না।

মহারাজ পরীক্ষিৎ ছিলেন তেমনি একজন মহাভাগবত কেননা তিনি ছিলেন মহাভাগবত শুকদেব গোস্বামীর শিষ্য। তিনি সকলের প্রতি সমভাবে কৃপাপরায়ণ ছিলেন, তাই তিনি কলিকে পর্যন্ত কৃপা করেছিলেন, অন্যের কি কথা!

পারমার্থিক ইতিহাসের পাতায় বহু নির্বিশেষবাদীর ভক্তে পরিণত হওয়ার বর্ণনা রয়েছে। কিন্তু কোন ভক্ত কখনও নির্বিশেষবাদী হননি। তার থেকে প্রমাণিত হয় যে, পারমার্থিক স্তরে ভক্তের স্থান নির্বিশেষবাদীদের ঊর্ধ্বে। *শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাতেও* (১২/৫) বর্ণনা করা হয়েছে যে, নির্বিশেষবাদের স্তরে আটকে পড়েছেন যে ব্যক্তি, তার লাভের থেকে অধিক কষ্ট ভোগ করতে হয়।

তাই শুকদেব গোস্বামীর কাছ থেকে প্রাপ্ত জ্ঞান মহারাজ পরীক্ষিতকে ভগবানের সেবা লাভে সাহায্য করেছিল। পূর্ণতা প্রাপ্তির এই স্তরকে বলা হয় অপবর্গ, বা মুক্তির চরম অবস্থা। মোক্ষ সম্বন্ধীয় সাধারণ জ্ঞান ভৌতিক জ্ঞান। জড় জগতের বন্ধন থেকে প্রকৃত মুক্তিকে বলা হয় মোক্ষ, কিন্তু ভগবানের অপ্রাকৃত সেবা লাভ হচ্ছে মোক্ষের চরম অবস্থা। এই স্তর জ্ঞান এবং বৈরাগ্যের মাধ্যমে লাভ হয় যে কথা পূর্বেই (*শ্রীমদ্ভাগবত* ১/২/১২) বিশ্লেষণ করা হয়েছে। শ্রীল শুকদেব গোস্বামীর মতো মহাভাগবত যে পূর্ণজ্ঞান দান করেন, তা লাভ করার ফলে ভগবানের দিব্য সেবা লাভ হয়।

শ্লোক ১৭

তন্নঃ পরং পুণ্যমসংবৃতার্থ-
মাখ্যানমত্যদ্ভুতযোগনিষ্ঠম্ ।
আখ্যাহ্যনন্তাচরিতোপপন্নং
পারীক্ষিতং ভাগবতাভিরামম্ ॥ ১৭ ॥

তৎ—অতএব; **নঃ**—আমাদের; **পরম্**—পরম; **পুণ্যম্**—পবিত্রকারী; **অসংবৃতার্থম্**—যথারূপ; **আখ্যানম্**—বর্ণনা; **অতি**—অত্যন্ত; **অদ্ভুত**—আশ্চর্যজনক; **যোগনিষ্ঠম্**—ভক্তিযোগে নিষ্ঠাপরায়ণ; **আখ্যাহি**—বর্ণনা করে; **অনন্ত**—অনন্ত; **আচরিত**—কার্যকলাপ; **উপপন্নম্**—পূর্ণ; **পারীক্ষিতম্**—মহারাজ পরীক্ষিতকে বলেছিলেন; **ভাগবত**—শুদ্ধ ভক্ত; **অভিরামম্**—বিশেষভাবে অত্যন্ত প্রিয়।

অনুবাদ

দয়া করে আপনি আমাদের কাছে সেই অনন্ত সত্তার মহিমা বর্ণনা করুন, কেননা তা পবিত্রকারী এবং সর্বশ্রেষ্ঠ। তা মহারাজ পরীক্ষিতকে শোনানো হয়েছিল এবং তা ভক্তিযোগে পূর্ণ হওয়ার ফলে ভগবানের শুদ্ধ ভক্তদের অত্যন্ত প্রিয়।

তাৎপর্য

মহারাজ পরীক্ষিতকে যা শোনানো হয়েছিল এবং যা শুদ্ধ ভক্তদের অত্যন্ত প্রিয় তা হচ্ছে *শ্রীমদ্ভাগবত*। *শ্রীমদ্ভাগবত* মুখ্যত পরম অনন্তের কার্যকলাপের বর্ণনায় পূর্ণ, এবং তাই তা ভক্তিযোগের বিজ্ঞান। তাই তা হল 'পরা', অর্থাৎ পরম, কেননা যদিও তা সমস্ত জ্ঞান এবং ধর্মে পূর্ণ, তথাপি তা ভগবদ্ভক্তির দ্বারা বিশেষভাবে সমৃদ্ধ।

শ্লোক ১৮

সূত উবাচ

অহো বয়ং জন্মভৃতোঽদ্য হাস্ম
বৃদ্ধানুবৃত্ত্যাপি বিলোমজাতাঃ।
দৌষ্কুল্যমাধিং বিধুনোতি শীঘ্রং
মহত্তমানামভিধানযোগঃ ॥ ১৮ ॥

সূতঃ উবাচ—সূত গোস্বামী বললেন; **অহো**—কিভাবে; **বয়ম্**—আমরা; **জন্মভৃতঃ**—সফলজন্মা; **অদ্য**—আজ; **হ**—স্পষ্টভাবে; **আস্ম**—হয়েছি; **বৃদ্ধ-অনুবৃত্ত্যা**—জ্ঞানবৃদ্ধের সেবা করা; **অপি**—যদিও; **বিলোমজাতাঃ**—মিশ্র বর্ণ উদ্ভূত; **দৌষ্কুল্যম্**—জন্মজাত অযোগ্যতা; **আধিম্**—কষ্ট; **বিধুনোতি**—বিশুদ্ধ করে; **শীঘ্রম্**—অতি শীঘ্র; **মহত্তমানাম্**—মহাত্মাদের; **অভিধান**—আলাপ আলোচনা; **যোগঃ**—সম্বন্ধ।

অনুবাদ

শ্রীসূত গোস্বামী বললেন—আহা! যদিও আমরা সঙ্কর বর্ণোদ্ভূত তথাপি জ্ঞানবৃদ্ধ মহাপুরুষদের সেবা করার ফলেই কেবল সফলজন্মা হয়েছি। এই প্রকার মহাত্মাদের সঙ্গে কেবল বার্তালাপ করার ফলেই নিম্নকুলে জন্মজনিত অযোগ্যতা অচিরেই বিদূরিত হয়ে যায়।

তাৎপর্য

সূত গোস্বামী ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করেননি। তিনি এক মিশ্রজাতির অসংস্কৃত নিম্নকুলে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু শ্রীল শুকদেব গোস্বামী এবং নৈমিষারণ্যের ঋষিদের মহৎ সঙ্গ প্রভাবে তাঁর নিম্নকুলে জন্মজনিত অযোগ্যতা নিঃসন্দেহে দূর হয়ে গিয়েছিল। ভগবান শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু বৈদিক প্রথার এই সিদ্ধান্ত অনুসরণ করেছিলেন, এবং তাঁর দিব্য সঙ্গ প্রভাবে তিনি বহু নিম্নকুলোদ্ভূত, জন্ম অনুসারে অথবা কর্ম অনুসারে অযোগ্য ব্যক্তিদের, ভগবদ্ভক্তির অতি উন্নত স্তরে উন্নীত করেছিলেন এবং আচার্য পদ প্রদান করেছিলেন। তিনি স্পষ্টভাবে ঘোষণা করেছিলেন যে, ব্রাহ্মণ-শূদ্র, সন্ন্যাসী-গৃহস্থ নির্বিশেষে যে কোনো মানুষ কৃষ্ণতত্ত্ববেত্তা হওয়ার ফলে আচার্য অথবা গুরু হতে পারেন।

সূত গোস্বামী কৃষ্ণতত্ত্ব বিজ্ঞান শিক্ষা লাভ করেছিলেন শুকদেব গোস্বামী এবং ব্যাসদেব প্রমুখ মহর্ষিদের কাছ থেকে, এবং তিনি এতই যোগ্য ছিলেন যে, নৈমিষারণ্যের ঋষিরা ঐকান্তিক আগ্রহ সহকারে তাঁর কাছ থেকে শ্রীমদ্ভাগবত রূপী কৃষ্ণতত্ত্ববিজ্ঞান শুনতে চেয়েছিলেন। এইভাবে শ্রবণ এবং উপদেশ দ্বারা তিনি দ্বিগুণ সাধুসঙ্গ লাভ করেছিলেন। দিব্য জ্ঞান বা কৃষ্ণতত্ত্ব বিজ্ঞান লাভ করতে হয় অভিজ্ঞ মহাজনদের কাছ থেকে, এবং সেই জ্ঞান যখন উপদেশ দেওয়া হয়, তখন আরও অধিক যোগ্যতা লাভ হয়। তাই সূত গোস্বামীর দ্বিগুণ লাভ হয়েছিল; এবং তার ফলে তিনি নিঃসন্দেহে নিম্নকুলে জন্মজনিত অযোগ্যতা এবং মনঃপীড়া থেকে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত হয়েছিলেন।

এই শ্লোকটি থেকে স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয় যে, নিম্নকুলে সূত গোস্বামীর জন্ম হয়েছিল বলে শ্রীল শুকদেব গোস্বামী তাঁকে দিব্য জ্ঞান দান করতে অস্বীকার করেননি এবং নৈমিষারণ্যের ঋষিরা তাঁর কাছ থেকে তা গ্রহণ করতে অস্বীকার করেননি। তা থেকে বোঝা যায় যে, হাজার হাজার বৎসর পূর্বেও নিম্নকুলোদ্ভূত মানুষদের পারমার্থিক বিজ্ঞান শিক্ষা লাভে এবং প্রচারে কোন রকম বাধা ছিল না।

হিন্দু সমাজের তথাকথিত জাতিভেদ প্রথার কঠোরতা ব্রাহ্মণ কুলোদ্ভূত কতগুলি অযোগ্য দ্বিজবন্ধুর প্রভাবে কেবলমাত্র গত একশ বছরের মধ্যে প্রাধান্য লাভ করেছে। ভগবান শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু মূল বৈদিক পদ্ধতির পুনরুত্থাপন করেছেন, এবং তিনি মুসলমান কুলোদ্ভূত শ্রীল হরিদাস ঠাকুরকে নামাচার্যের পদে অধিষ্ঠিত করেছেন।

ভগবানের শুদ্ধ ভক্তদের এমনই ক্ষমতা। গঙ্গার জল পবিত্র বলে স্বীকৃত, এবং গঙ্গায় স্নান করলে পবিত্র হওয়া যায় কিন্তু ভগবদ্ভক্তের মহিমা এতই যে, কেবল দর্শন দান করার মাধ্যমে তিনি অধঃপতিত জীবদের পবিত্র করতে পারেন। ভগবান

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে তাঁর সুযোগ্য প্রচারকদের প্রেরণ করার মাধ্যমে সারা পৃথিবীর অত্যন্ত কলুষিত পরিবেশ পবিত্র করতে চেয়েছিলেন, এবং ভারতবাসীদের কর্তব্য হচ্ছে বিজ্ঞানসম্মতভাবে এই দায়িত্ব গ্রহণ করে সর্বোচ্চ স্তরের পরোপকার সাধন করা।

বর্তমানে মানব সমাজে মানুষদের দেহের রোগ থেকে মনের রোগ অধিক প্রবল। তাই অচিরেই সারা পৃথিবী জুড়ে শ্রীমদ্ভাগবতের প্রচার কার্য শুরু করা উচিত।

মহত্তমানাম্ অভিধান শব্দটির আরেকটি অর্থ হচ্ছে মহান ভক্তদের অভিধান, বা মহান ভক্তদের বাণীসমন্বিত গ্রন্থ। মহান ভক্তদের এবং ভগবানের বাণীর এই অভিধান হচ্ছে বেদ এবং বেদের অনুগামী শাস্ত্রসমূহ, বিশেষ করে শ্রীমদ্ভাগবত।

শ্লোক ১৯

কুতঃ পুনর্গৃণতো নাম তস্য
　　মহত্তমৈকান্ত পরায়ণস্য।
যোঽনন্তশক্তির্ভগবাননন্তো
　　মহদ্‌গুণত্বাদ্ যমনন্তমাহুঃ ॥ ১৯ ॥

কুতঃ—কি বলা যায়; **পুনঃ**—পুনরায়; **গৃণতঃ**—কীর্তনকারী; **নাম**—দিব্য নাম; **তস্য**—তাঁর; **মহত্তম**—মহান ভক্ত; **একান্ত**—একমাত্র; **পরায়ণস্য**—যাঁর আশ্রয় গ্রহণ করা যায়; **য**—যিনি; **অনন্ত**—অন্তহীন; **শক্তিঃ**—শক্তি; **ভগবান্**—পরমেশ্বর ভগবান; **অনন্ত**—অসংখ্য; **মহৎ**—মহান; **গুণত্বাৎ**—এই প্রকার গুণের ফলে; **যম্**—যাকে; **অনন্তম্**—অনন্ত নামক; **আহুঃ**—বলা হয়।

অনুবাদ

আর যাঁরা মহান ভক্তের নির্দেশ অনুসারে অসীম শক্তিসম্পন্ন অনন্তের দিব্য নাম কীর্তন করেন, তাঁদের কি কথা? পরমেশ্বর ভগবানের শক্তি অনন্ত এবং গুণাবলী দিব্য, তাঁর নাম অনন্ত।

তাৎপর্য

উচ্চকুলোদ্ভূত অল্পবুদ্ধিসম্পন্ন, অসংস্কৃত দ্বিজবন্ধুরা নিম্ন বর্ণের মানুষদের এই জন্মেই ব্রাহ্মণত্ব লাভের বিরুদ্ধে অনেক যুক্তি প্রদর্শন করে; তারা যুক্তি দেখায় যে, পূর্বকৃত পাপের ফলে শূদ্র অথবা শূদ্রাধম কুলে মানুষের জন্ম হয় এবং তাই নীচকুলে জন্মজনিত দুঃখ-দুর্দশা ভোগের মাধ্যমে তাদের সেই পাপের মেয়াদ পূর্ণ করতে হয়।

এই সমস্ত কু-তার্কিকদের ভ্রান্ত যুক্তি খণ্ডন করে *শ্রীমদ্ভাগবত* প্রতিপন্ন করেছে যে, কেউ যখন শুদ্ধ ভক্তের নির্দেশনায় ভগবানের দিব্য নাম কীর্তন করেন, তিনি তৎক্ষণাৎ নিম্নকুলে জন্মজনিত অসুবিধা থেকে মুক্ত হন। ভগবানের শুদ্ধ ভক্ত কখনও নাম অপরাধ করেন না। দশটি নামাপরাধ রয়েছে। শুদ্ধ ভক্তের নির্দেশনায় যখন নাম কীর্তন হয়, তখন অপরাধশূন্য হয়ে নামগ্রহণ হয়। অপরাধশূন্য নাম দিব্য, এবং তাই সেই নাম গ্রহণের ফলে পূর্বকৃত সমস্ত পাপ থেকে মুক্ত হওয়া যায়।

অপরাধশূন্য নাম কীর্তন বলতে বোঝায়, পূর্ণরূপে নামের দিব্য প্রকৃতি সম্বন্ধে অবগত হয়ে ভগবানের শরণাগত হওয়া। ভগবানের দিব্য নাম এবং ভগবান স্বয়ং পরম তত্ত্ব, তাই তাঁরা অভিন্ন। ভগবানের নাম ভগবানেরই মতো শক্তিসম্পন্ন। ভগবান সর্বশক্তিমান পরমেশ্বর, এবং তাঁর অনন্ত নাম রয়েছে যেগুলি তাঁর থেকে অভিন্ন এবং তাঁরই মতো শক্তিসম্পন্ন।

শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতায় ভগবানের চরম নির্দেশ হচ্ছে, কেউ যখন তাঁর শরণ গ্রহণ করেন, তখন তিনি তাঁকে সমস্ত পাপ থেকে মুক্ত করেন। যেহেতু তাঁর নাম এবং তিনি স্বয়ং অভিন্ন, তাই ভগবানের দিব্য নাম ভক্তকে সমস্ত পাপের ফল থেকে রক্ষা করতে পারে। ভগবানের দিব্য নামের কীর্তন কোন ব্যক্তিকে নিঃসন্দেহে নিম্নকুলে জন্মজনিত দোষ থেকে মুক্ত করতে পারে।

ভগবানের অনন্ত শক্তি তাঁর অন্তহীন ভক্ত এবং অবতারদের দ্বারা ক্রমান্বয়ে বর্ধিত হয়, এবং এইভাবে ভগবানের প্রতিটি ভক্ত এবং অবতার ভগবানের শক্তির দ্বারা সমভাবে আবিষ্ট হতে পারেন। যেহেতু ভগবানের ভক্ত ভগবানের শক্তির দ্বারা আবিষ্ট হন, তা যত স্বল্পমাত্রাতেই হোক, তাই নিম্নকুলে জন্মজনিত কোন রকম অযোগ্যতা ভগবদ্ভক্তির পথে প্রতিবন্ধক হতে পারে না।

শ্লোক ২০

এতাবতালং ননু সূচিতেন
গুণৈরসাম্যানতিশায়নস্য ।
হিত্বেতরান্ প্রার্থয়তো বিভূতি-
র্যস্যাঙ্ঘ্রিরেণুং জুষতেঽনভীপ্সোঃ ॥ ২০ ॥

এতাবতা—পর্যন্ত; **অলম্**—অনাবশ্যক; **ননু**—স্বল্পমাত্রায় হলেও; **সূচিতেন**—বর্ণনার দ্বারা; **গুণৈঃ**—গুণের দ্বারা; **অসাম্য**—অতুলনীয়; **অনতিশায়নস্য**—যাঁর সমকক্ষ

কেউ নেই; হিত্বা—পরিত্যাগ করে; ইতরান্—অন্যদের; প্রার্থয়তঃ—প্রার্থনা করে; বিভূতিঃ—লক্ষ্মীদেবীর কৃপা; যস্য—যাঁর; অঙ্ঘ্রি—চরণ; রেণুম্—ধূলি; জুষতে—সেবা করে; অনভীপ্সোঃ—অনিচ্ছুক।

অনুবাদ

এখানে প্রতিপন্ন হল যে, পরমেশ্বর ভগবান অনন্ত এবং কেউই তাঁর সমতুল্য নন। তাই কেউই যথেষ্টভাবে তাঁর সম্বন্ধে বলতে পারেন না। মহান্ দেবতারা অনেক প্রার্থনা করেও যে লক্ষ্মীদেবীর কৃপা লাভ করতে পারেন না, সেই লক্ষ্মীদেবী ভগবানের শ্রীপাদপদ্মের সেবা করেন, যদিও ভগবান এই প্রকার সেবার আকাঙ্ক্ষী নন।

তাৎপর্য

শ্রুতি থেকে জানা যায় যে, ভগবান বা পরব্রহ্মের করণীয় কিছু নেই। কেউই তাঁর সমকক্ষ নন এবং কেউই তাঁর থেকে বড় নন। তাঁর শক্তি অনন্ত, এবং তাঁর প্রতিটি কর্ম তাঁর স্বাভাবিক পূর্ণতায় সম্পাদিত হয়। তাই পরমেশ্বর ভগবান স্বয়ং-সম্পূর্ণ, এবং তাই তাঁকে অন্য কারও কাছ থেকে কিছু গ্রহণ করতে হয় না, এমন কি ব্রহ্মার মতো মহান দেবতার থেকেও নয়। সকলেই লক্ষ্মীদেবীর কৃপা লাভ করতে চান, এবং তাদের বহু প্রার্থনা সত্ত্বেও তিনি তাঁদের কৃপা করেন না। আর সেই লক্ষ্মীদেবী পরমেশ্বর ভগবানের সেবা করেন, যদিও তাঁর কাছ থেকে ভগবানের গ্রহণীয় কিছুই নেই। গর্ভোদকশায়ী বিষ্ণুরূপে পরমেশ্বর ভগবান তাঁর নাভিপদ্ম থেকে এই জড় জগতের প্রথম সৃষ্ট জীব ব্রহ্মাকে সৃষ্টি করেন। তিনি তাঁর নিত্য সেবায় যুক্ত লক্ষ্মীদেবীর গর্ভ থেকে তাঁকে উৎপন্ন করেননি। এইগুলি তাঁর পূর্ণ স্বাতন্ত্র্য এবং পূর্ণতার কয়েকটি উদাহরণ।

তাঁর কিছু করণীয় নেই বলতে এই বোঝায় না যে, তিনি নির্বিশেষ। তিনি এই প্রকার অচিন্ত্য শক্তিতে পূর্ণ যে, তাঁর ইচ্ছার প্রভাবেই কেবল সব কিছু সম্পাদিত হয়। তাই তাঁকে বলা হয় যোগেশ্বর, বা সমস্ত যৌগিক শক্তির ঈশ্বর।

শ্লোক ২১

অথাপি যৎপাদনখাবসৃষ্টং
জগদ্বিরিঞ্চোপহৃতার্হণাম্ভঃ ।
সেশং পুণাত্যন্যতমো মুকুন্দাৎ
কো নাম লোকে ভগবৎপদার্থঃ ॥ ২১ ॥

অথ—অতএব; **অপি**—অবশ্যই; **যৎ**—যাঁর; **পাদনখ**—পায়ের নখ; **অবসৃষ্টম্**—নিঃসৃত হয়ে; **জগৎ**—সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড; **বিরিঞ্চ**—ব্রহ্মা; **উপহৃত**—সংগ্রহ করেছেন; **অর্হন**—পূজা; **অম্ভঃ**—জল; **স**—সহ; **ঈশম্**—শিব; **পুণাতি**—পবিত্র করে; **অন্যতমঃ**—আর কে; **মুকুন্দাৎ**—পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ভিন্ন; **কঃ**—কে; **নাম**—নাম; **লোকে**—এই জগতে; **ভগবৎ**—পরমেশ্বর ভগবান; **পদ**—পদ; **অর্হঃ**—যোগ্য।

অনুবাদ

ব্রহ্মা যাঁর পাদনখ নিঃসৃত সলিল সংগ্রহ করে অর্ঘ্যস্বরূপ তা মহাদেবকে নিবেদন করেন (গঙ্গা রূপে), এবং যা মহাদেবসহ সমগ্র জগতকে পবিত্র করছেন, এই জগতে সেই মুকুন্দ ভিন্ন অন্য কে ভগবৎ শব্দবাচ্য হতে পারেন?

তাৎপর্য

মূর্খ লোকেরা মনে করে যে, বৈদিক শাস্ত্রে বহু ঈশ্বরবাদ প্রতিপন্ন হয়েছে, তাদের সেই ধারণা ভ্রান্ত। ভগবান হচ্ছেন এক এবং অদ্বিতীয়, কিন্তু তিনি বহুরূপে নিজেকে প্রকাশ করেন। সে কথা বেদে প্রতিপন্ন করা হয়েছে। ভগবানের এই প্রকার বিস্তার অসংখ্য, কিন্তু তাদের মধ্যে কেউ জীব। জীবেরা ভগবানের অংশের মতো শক্তিশালী নন, এবং তাই ভগবানের বিস্তার দুভাবে হয়। ব্রহ্মা হচ্ছেন জীবতত্ত্ব, এবং শিব হচ্ছেন ভগবান এবং জীবের মধ্যবর্তী মাধ্যমস্বরূপ। অর্থাৎ ব্রহ্মা এবং শিব আদি মুখ্য দেবতারাও ভগবানের সমকক্ষ বা ভগবানের থেকে বড় নন। লক্ষ্মীদেবী এবং ব্রহ্মা ও শিবের মতো সর্বশক্তিমান দেবতারাও বিষ্ণু বা শ্রীকৃষ্ণের আরাধনা করেন; তাই মুকুন্দের (শ্রীকৃষ্ণের) থেকে অধিক শক্তিশালী এবং পরমেশ্বর ভগবান পদবাচ্য আর কে হতে পারেন?

লক্ষ্মীদেবী, ব্রহ্মা এবং শিব স্বতন্ত্র শক্তিসম্পন্ন নন, ভগবানের অংশ হওয়ার ফলে তাঁরা ভগবানের শক্তিতে শক্তিমান, এবং তাঁরা সকলেই ভগবানের প্রেমময়ী সেবায় যুক্ত।

ভগবানের বিভিন্নাংশ জীবেরাও তেমন ভগবানের সেবায় যুক্ত। ভগবদ্ভক্তদের চারটি সম্প্রদায় রয়েছে এবং তাদের মধ্যে মুখ্য হচ্ছে ব্রহ্মা থেকে প্রবর্তিত ব্রহ্ম সম্প্রদায়, শিব থেকে প্রবর্তিত রুদ্র সম্প্রদায় এবং লক্ষ্মীদেবী থেকে প্রবর্তিত শ্রী সম্প্রদায়। এই তিনটি সম্প্রদায়ের অতিরিক্ত আর একটি চতুর্থ সম্প্রদায় রয়েছে যেটি হচ্ছে সনৎ কুমার থেকে প্রবর্তিত কুমার সম্প্রদায়। এই চারটি মূল সম্প্রদায় আজও ভগবানের দিব্য সেবায় যুক্ত, এবং তাঁরা সকলেই ঘোষণা করেন যে, শ্রীকৃষ্ণ বা মুকুন্দ হচ্ছেন পরমেশ্বর ভগবান এবং কেউই তাঁর সমান বা তাঁর থেকে মহৎ নন।

শ্লোক ২২

যত্রানুরক্তাঃ সহসৈব ধীরা
ব্যপোহ্য দেহাদিষু সঙ্গমূঢ়ম্ ।
ব্রজন্তি তৎ পারমহংস্যমন্ত্যং
যস্মিন্নহিংসোপশমঃ স্বধর্মঃ ॥ ২২ ॥

যত্র—যাঁর প্রতি; অনুরক্তাঃ—দৃঢ়ভাবে আসক্ত; সহসা—হঠাৎ; এব—নিশ্চিতভাবে; ধীরাঃ—আত্ম-সংযমী; ব্যপোহ্য—পরিত্যাগ করে; দেহ—স্থূল দেহ এবং সূক্ষ্ম মন; আদিষু—সম্বন্ধিত; সঙ্গম্—আসক্তি; উঢ়ম্—ধৃত; ব্রজন্তি—চলে যান; তৎ—তা; পারম-হংস্যম্—পরমহংসত্ব; অন্ত্যম্—তাঁর উর্ধ্বে; যস্মিন্—যাতে; অহিংসা—অহিংসা; উপশমঃ—বৈরাগ্য; স্বধর্মঃ—স্বাভাবিক ধর্ম।

অনুবাদ

পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণে আসক্ত আত্ম-সংযত ব্যক্তিরা সহসা স্থূল দেহ এবং সূক্ষ্ম মন সহ জড়জাগতিক আসক্তি পরিত্যাগ করে সন্ন্যাস আশ্রমের চরম সিদ্ধি পারমহংস্যত্ব প্রাপ্তির জন্য গৃহত্যাগ করে চলে যান, যার ফলে অহিংসা তথা বৈরাগ্য স্বাভাবিকভাবে সম্পাদিত হয়।

তাৎপর্য

আত্ম-সংযত ব্যক্তিরা কেবল ধীরে ধীরে পরমেশ্বর ভগবানের প্রতি আসক্ত হতে পারে। আত্ম-সংযত বলতে বোঝায় যিনি অত্যাবশ্যক ইন্দ্রিয় তৃপ্তির চেষ্টায় লিপ্ত হন না। আর যারা আত্ম-সংযত নয়, তারা ইন্দ্রিয় তৃপ্তির চেষ্টাতে সর্বক্ষণ মগ্ন থাকে। শুষ্ক দার্শনিক জ্ঞানের প্রয়াস হল মনের সূক্ষ্ম ইন্দ্রিয় সুখভোগ। ইন্দ্রিয় তৃপ্তির প্রচেষ্টা মানুষকে অজ্ঞানের অন্ধকারাচ্ছন্ন পথে পরিচালিত করে। যারা আত্ম-সংযত, তারা জড়জাগতিক বদ্ধ জীবন থেকে মুক্ত হয়ে পরমার্থের পথে অগ্রসর হতে পারে। বেদে তাই নির্দেশ দেওয়া হয়েছে—*তমসি মা জ্যোতির্গময়োঃ* অর্থাৎ তমসার অন্ধকারাচ্ছন্ন পথে অগ্রসর না হয়ে ভব বন্ধন মুক্তির জ্যোতির্ময় পথে অগ্রসর হওয়া উচিত।

কৃত্রিমভাবে ইন্দ্রিয়গুলিকে জড় সুখ ভোগের প্রচেষ্টা থেকে নিরস্ত করার মাধ্যমে আত্ম-সংযম লাভ করা যায় না, পক্ষান্তরে ইন্দ্রিয়গুলিকে ভগবানের প্রেমময়ী সেবায় যুক্ত করার মাধ্যমেই কেবল তা সম্ভব হয়। ইন্দ্রিয়গুলিকে জোর করে দমন করা যায় না, পক্ষান্তরে উপযুক্ত কার্যে নিযুক্ত করার মাধ্যমেই কেবল তা সম্ভব হয়।

তাই ইন্দ্রিয় যখন সম্পূর্ণরূপে জড় কলুষ থেকে মুক্ত হয়ে পবিত্র হয়, তখন সেগুলি সর্বদাই ভগবানের দিব্য সেবায় যুক্ত থাকে। ইন্দ্রিয় তৃপ্তির এই সিদ্ধ অবস্থাকে বলা হয় ভক্তিযোগ।

তাই যাঁরা ভক্তিযোগের পন্থায় যুক্ত, তাঁরা যথাযথভাবে সংযত ইন্দ্রিয় এবং তাঁরা সহসা ভগবানের সেবার জন্য তাঁদের গৃহ এবং দেহের আসক্তি পরিত্যাগ করতে পারেন। এই স্তরকে বলা হয় পরমহংস স্তর। হংস দুধ এবং জলের মিশ্রণ থেকে দুধ আলাদা করে নিতে পারে। তেমনই, যাঁরা মায়ার সেবার পরিবর্তে ভগবানের সেবায় যুক্ত, তাঁদের বলা হয় পরমহংস। তাঁরা স্বাভাবিকভাবে সমস্ত সদ্‌গুণের দ্বারা গুণান্বিত, যথা—নিরভিমান, নিরহঙ্কার, অহিংসা, ধৈর্য, সরলতা, শ্রদ্ধাশীলতা, পূজা, ভক্তি এবং নিষ্ঠা।

এই সমস্ত দিব্য গুণগুলি ভগবদ্ভক্তের মধ্যে স্বাভাবিকভাবে প্রকাশিত হয়। সর্বতোভাবে ভগবানের সেবায় যুক্ত এই প্রকার পরমহংস অত্যন্ত দুর্লভ। মুক্তদের মধ্যেও তাঁরা দুর্লভ। প্রকৃত অহিংসা হচ্ছে মাৎসর্য থেকে মুক্ত হওয়া। এই পৃথিবীতে প্রতিটি মানুষই অপরের প্রতি মাৎসর্যপরায়ণ। কিন্তু আদর্শ পরমহংস সর্বতোভাবে ভগবানের সেবায় যুক্ত হওয়ার ফলে সম্পূর্ণরূপে নির্মৎসর। তিনি পরমেশ্বর ভগবানের সঙ্গে সম্পর্কের ভিত্তিতে প্রতিটি জীবকে ভালবাসেন।

প্রকৃত বৈরাগ্য হচ্ছে সম্পূর্ণরূপে ভগবানের উপর নির্ভর করা। প্রতিটি জীবই অন্য কারও উপর নির্ভরশীল, কারণ সেইভাবে তাকে সৃষ্টি করা হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে, সকলেই পরমেশ্বর ভগবানের কৃপার উপর নির্ভরশীল, কিন্তু কেউ যখন ভগবানের সঙ্গে তার সম্পর্কের কথা ভুলে যায়, তখন সে প্রকৃতির জড় অবস্থার উপর নির্ভরশীল হয়। বৈরাগ্যের অর্থ হচ্ছে জড়া প্রকৃতির উপর নির্ভর না করে সম্পূর্ণরূপে ভগবানের কৃপার উপর নির্ভর করা।

প্রকৃত স্বতন্ত্রতার অর্থ হচ্ছে জড় অবস্থার উপর নির্ভরশীল না হয়ে পরমেশ্বর ভগবানের কৃপার উপর সম্পূর্ণরূপে শ্রদ্ধাশীল হওয়া। এই পরমহংস স্তর ভক্তিযোগের সর্বোচ্চ সিদ্ধি।

শ্লোক ২৩

অহং হি পৃষ্টোঽর্যমণো ভবদ্ভি-
রাচক্ষ আত্মাবগমোঽত্র যাবান্ ।
নভঃ পতন্ত্যাত্মসমং পতত্রিণ-
স্তথা সমং বিষ্ণুগতিং বিপশ্চিতঃ ॥ ২৩ ॥

অহম্—আমি; **হি**—নিশ্চিতভাবে; **পৃষ্টঃ**—আপনাদের দ্বারা জিজ্ঞাসিত হয়ে; **অর্যমণঃ**—সূর্যের মতো শক্তিশালী; **ভবদ্ভিঃ**—আপনার দ্বারা; **আচক্ষে**—বর্ণনা করতে পারি; **আত্ম-অবগম**—আমি যতদূর জানি; **অত্র**—এখানে; **যাবান্**—যতদূর পর্যন্ত; **নভঃ**—আকাশ; **পতন্তি**—উড়ে; **আত্মসমম্**—তাদের শক্তি অনুসারে; **পতত্রিণঃ**—পক্ষীগণ; **তথা**—তেমনই; **সমম্**—সম; **বিষ্ণুগতিম্**—বিষ্ণুসম্বন্ধীয় জ্ঞান; **বিপশ্চিতঃ**—পণ্ডিতেরাও।

অনুবাদ

হে সূর্যসদৃশ দীপ্তিমান ঋষিগণ! শ্রীবিষ্ণুর অপ্রাকৃত লীলা আমি আমার জ্ঞান অনুসারে যথাসাধ্য বর্ণনা করার চেষ্টা করব। পাখিরা যেমন তাদের শক্তি অনুসারে আকাশে বিচরণ করে, তেমনই পণ্ডিতেরাও তাঁদের উপলব্ধি অনুসারে ভগবানের লীলা কীর্তন করেন।

তাৎপর্য

পরম সত্য অনন্ত। কেউ তাঁর নিজের সীমিত ক্ষমতার দ্বারা অনন্তকে জানতে পারেন না। ভগবান একাধারে নির্বিশেষ, সবিশেষ এবং একদেশবর্তী। তাঁর নির্বিশেষ রূপ হচ্ছে সর্বব্যাপ্ত ব্রহ্ম, তাঁর একদেশবর্তী প্রকাশের দ্বারা তিনি প্রতিটি জীবের হৃদয়ে পরমাত্মারূপে বিরাজমান, এবং তাঁর পরম সবিশেষরূপে তিনি তাঁর ভাগ্যবান পার্ষদ শুদ্ধ ভক্তদের অপ্রাকৃত প্রেমাস্পদ। বিভিন্নরূপে ভগবানের লীলাসমূহ মহাজ্ঞানী ভক্তরা কেবল আংশিকভাবে হৃদয়ঙ্গম করতে পারেন।

তাই শ্রীল সূত গোস্বামী তাঁর উপলব্ধি অনুসারে ভগবানের লীলা বর্ণনার চেষ্টা করার কথা বলেছেন, তা যথার্থই সমীচীন। প্রকৃতপক্ষে, ভগবানই কেবল নিজেকে বর্ণনা করতে পারেন, আর বিদ্বান ভক্তরা ভগবান তাঁদের যেমন ক্ষমতা দিয়েছেন, সেই ক্ষমতা অনুসারে ভগবানের বর্ণনা করতে পারেন।

শ্লোক ২৪-২৫

একদা ধনুরুদ্যম্য বিচরন্ মৃগয়াং বনে ।
মৃগাননুগতঃ শ্রান্তঃ ক্ষুধিতস্তৃষিতো ভৃশম্ ॥ ২৪ ॥
জলাশয়মচক্ষাণঃ প্রবিবেশ তমাশ্রমম্ ।
দদর্শ মুনিমাসীনং শান্তং মীলিতলোচনম্ ॥ ২৫ ॥

একদা—এক সময়; **ধনুঃ**—ধনু এবং বাণ; **উদ্যম্য**—দৃঢ়তাপূর্বক ধারণ করে; **বিচরন্**—পরিভ্রমণ; **মৃগয়াম্**—মৃগয়ায়; **বনে**—অরণ্যে; **মৃগান্**—হরিণদের; **অনুগতঃ**—অনুগমন করতে করতে; **শ্রান্তঃ**—অবসন্ন; **ক্ষুধিতঃ**—ক্ষুধার্ত; **তৃষিতঃ**—তৃষ্ণার্ত; **ভৃশম্**—অত্যন্ত; **জলাশয়ম্**—জলাশয়; **আচক্ষাণঃ**—অন্বেষণ করতে করতে; **প্রবিবেশ**—প্রবেশ করেছিলেন; **তম্**—সেই; **আশ্রমম্**—শমীক ঋষির আশ্রমে; **দদর্শ**—দেখেছিলেন; **মুনিম্**—মুনিকে; **আসীনম্**—উপবিষ্ট; **শান্তম্**—সম্পূর্ণরূপে মৌন; **মীলিত**—মুদিত; **লোচনম্**—নেত্র।

অনুবাদ

এক সময় মহারাজ পরীক্ষিৎ শরাসনে শর যোজন করে মৃগয়ার্থে বনে মৃগের অনুসরণ করতে করতে অত্যন্ত ক্লান্ত এবং ক্ষুধা ও পিপাসায় কাতর হয়ে পড়লেন। জলাশয়ের অন্বেষণ করতে করতে তিনি শমীক ঋষির প্রসিদ্ধ আশ্রমে প্রবিষ্ট হলেন এবং দেখলেন যে, এক মুনি নয়ন নিমীলিত করে প্রশান্তভাবে উপবেশন করে আছেন।

তাৎপর্য

ভগবান তাঁর শুদ্ধ ভক্তদের প্রতি এতই কৃপাশীল যে, উপযুক্ত সময়ে সেই ভক্তকে তাঁর কাছে নিয়ে আসার জন্য তিনি এক শুভ অবস্থার সৃষ্টি করেন। মহারাজ পরীক্ষিৎ ছিলেন ভগবানের শুদ্ধ ভক্ত, এবং তাঁর পক্ষে অত্যন্ত অবসন্ন, ক্ষুধার্ত এবং তৃষ্ণার্ত হওয়ার কোন কারণ ছিল না; কেননা ভগবানের ভক্ত কখনও এই প্রকার দৈহিক আবেদনের দ্বারা বিচলিত হন না। কিন্তু ভগবানের ইচ্ছা অনুসারে এই প্রকার ভক্তরাও আপাতদৃষ্টিতে অবসন্ন এবং তৃষ্ণার্ত হতে পারেন, তবে সেটি ভগবানেরই ইচ্ছার প্রভাবে প্রকাশিত হয় তাঁদের জাগতিক কার্যকলাপে বৈরাগ্য উৎপাদনের অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করার জন্য। ভগবানের কাছে ফিরে যেতে হলে সব রকম জড়জাগতিক আসক্তি এবং সম্পর্ক পরিত্যাগ করতে হয়, এবং কোন ভক্ত যখন জড় বিষয়ে অত্যন্ত মগ্ন হয়ে পড়েন, তখন ভগবান তাঁর বৈরাগ্য উৎপাদনের জন্য এক বিশেষ পরিস্থিতির সৃষ্টি করেন। ভগবানের শুদ্ধ ভক্ত তথাকথিত জাগতিক বিষয়ে যুক্ত থাকলেও ভগবান কখনও তাঁকে ভুলে যান না। কখনও কখনও তিনি সমস্যাপূর্ণ পরিস্থিতির সৃষ্টি করেন এবং তাঁর ভক্ত তাঁর সমস্ত জাগতিক বিষয় পরিত্যাগ করতে বাধ্য হয়। ভক্ত বুঝতে পারেন যে, তা হচ্ছে ভগবানের ইঙ্গিত, কিন্তু অন্যেরা সেই পরিস্থিতিকে প্রতিকূল এবং নৈরাশ্যজনক বলে মনে করে।

ভগবান শ্রীকৃষ্ণের দ্বারা *শ্রীমদ্ভাগবতের* উদ্‌ঘাটনে পরীক্ষিৎ মহারাজকে মাধ্যম করার প্রয়োজন ছিল, ঠিক যেমন তাঁর পিতামহ অর্জুন *শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতার* বাণী প্রচারের মাধ্যম হয়েছিলেন। যদি ভগবানের ইচ্ছায় অর্জুনের আত্মীয়স্বজনের প্রতি স্নেহজনিত মোহ উৎপন্ন না হত, তা হলে ভগবানের শ্রীমুখ থেকে *শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতার* বাণী প্রকাশিত হত না। তেমনই যদি সেই সময় পরীক্ষিৎ মহারাজ অবসন্ন, ক্ষুধার্ত এবং তৃষ্ণার্ত না হতেন, তা হলে শ্রীল শুকদেব গোস্বামীর মুখ থেকে *শ্রীমদ্ভাগবত* নিঃসৃত হত না। অতএব, সকলের মঙ্গল সাধনের জন্য যে পরিস্থিতিতে *শ্রীমদ্ভাগবত* কীর্তিত হয়েছিল, সেটি ছিল তারই সূচনা। তাই, সেই সূচনার শুরু হয়েছে "কোন এক সময়" শব্দটির মাধ্যমে।

শ্লোক ২৬

প্রতিরুদ্ধেন্দ্রিয়প্রাণমনোবুদ্ধিমুপারতম্ ।
স্থানত্রয়াৎ পরং প্রাপ্তং ব্রহ্মভূতমবিক্রিয়ম্ ॥ ২৬ ॥

প্রতিরুদ্ধ—দমন করে; **ইন্দ্রিয়**—ইন্দ্রিয়; **প্রাণ**—প্রাণবায়ু; **মনঃ**—মন; **বুদ্ধিম্**—বুদ্ধি; **উপারতম্**—নিষ্ক্রিয়; **স্থান**—স্থান; **ত্রয়াৎ**—ত্রিবিধ; **পরম**—তুরীয়; **প্রাপ্তম্**—প্রাপ্ত হয়েছেন; **ব্রহ্মভূতম্**—গুণগতভাবে পরব্রহ্মের সমান; **অবিক্রিয়ম্**—নির্বিকার।

অনুবাদ

সেই মুনির ইন্দ্রিয়, প্রাণ, মন এবং বুদ্ধি সমস্তই জড় বিষয় থেকে প্রত্যাহৃত হয়েছিল, এবং তিনি জাগ্রত, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি এই ত্রিবিধ অবস্থার অতীত তুরীয় পদ প্রাপ্ত হয়েছিলেন বলে তিনি ব্রহ্মভূত ও নির্বিকার ছিলেন।

তাৎপর্য

মনে হয়, যে মুনির আশ্রমে মহারাজ পরীক্ষিৎ প্রবেশ করেছিলেন, তিনি তখন সমাধিস্থ ছিলেন। এই চিন্ময় অবস্থা তিনটি উপায়ে লাভ করা যায়, যথা, জ্ঞান বা চিন্ময় তত্ত্বের ধারণার মাধ্যমে, যোগ বা দেহ মনের কার্যকলাপ নিয়ন্ত্রিত করে সমাধির বাস্তবিক উপলব্ধির মাধ্যমে, এবং যোগ বা ইন্দ্রিয়গুলিকে ভগবানের প্রেমময়ী সেবায় যুক্ত করার সব চাইতে স্বীকৃত পন্থার মাধ্যমে।

শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতাতেও জড় থেকে জীবনের অনুভূতির ক্রমবিকাশের তত্ত্ব আমরা পাই। আমাদের জড় মন এবং দেহ আত্মা থেকে বিকশিত হয়, এবং জড় জগতের

তিনটি গুণের দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার ফলে আমরা আমাদের প্রকৃত স্বরূপ বিস্মৃতি হই। জ্ঞানের পন্থা আত্মার অস্তিত্ব সম্বন্ধে অনুমানের ভিত্তিতে ধারণা সৃষ্টি করে। কিন্তু ভক্তিযোগ বাস্তবিকভাবে আত্মাকে চিন্ময় ক্রিয়ায় যুক্ত করে। বস্তুর অনুভূতি ইন্দ্রিয়ের অতীত আরও সূক্ষ্ম স্তরে অনুভূত হয়। ইন্দ্রিয়সমূহ প্রথমে সূক্ষ্ম মনে, এবং তারপর প্রাণে এবং ধীরে ধীরে বুদ্ধিতে অর্পিত হয়। বুদ্ধির ঊর্ধ্বে, চিন্ময় আত্মার উপলব্ধি যৌগিক ক্রিয়াকলাপ অথবা ইন্দ্রিয় সংযম, প্রাণায়াম এবং বুদ্ধিকে চিন্ময় অবস্থায় উন্নীত করার অভ্যাস করার মাধ্যমে সম্পাদিত হয়। সমাধি স্তরে দেহের সমস্ত কার্যকলাপ স্তব্ধ হয়।

মহারাজ পরীক্ষিৎ মুনিকে সেই অবস্থায় দর্শন করেছিলেন। তিনি মুনিকে যেভাবে দর্শন করেছিলেন, সেই সম্বন্ধে নিয়ে আরও বর্ণনা করা হয়েছে।

শ্লোক ২৭

বিপ্রকীর্ণজটাচ্ছন্নং রৌরবেণাজিনেন চ ।
বিশুষ্যত্তালুরুদকং তথাভূতমযাচত ॥ ২৭ ॥

বিপ্রকীর্ণ—বিক্ষিপ্ত; **জটাচ্ছন্নম্**—জটার দ্বারা আচ্ছন্ন; **রৌরবেণ**—মৃগ চর্মের দ্বারা; **অজিনেন**—চর্মের দ্বারা; **চ**—ও; **বিশুষ্যৎ**—শুষ্ক; **তালুঃ**—তালু; **উদকম্**—জল; **তথাভূতম্**—সেই অবস্থায়; **অযাচত**—চেয়েছিলেন।

অনুবাদ

সমাধিস্থ সেই মুনির দেহ ইতস্তত বিক্ষিপ্ত জটা এবং মৃগচর্মের দ্বারা আচ্ছাদিত ছিল। তৃষ্ণায় রাজার তালু পর্যন্ত বিশুষ্ক হয়ে পড়েছিল, তাই তিনি সেই সমাধিস্থ মুনির কাছে জল প্রার্থনা করেছিলেন।

তাৎপর্য

তৃষ্ণার্ত হয়ে রাজা সেই মুনির কাছে জল চেয়েছিলেন। মহাভাগবত রাজা যে সমাধিস্থ মুনির কাছে জল চেয়েছিলেন, তা অবশ্যই দৈবের লিখন। তা না হলে এই অলৌকিক ঘটনার কোন সম্ভাবনা ছিল না। মহারাজ পরীক্ষিৎ এইভাবে এক অদ্ভুত পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়েছিলেন, যার ফলে কালক্রমে শ্রীমদ্ভাগবত প্রকাশিত হয়েছিল।

শ্লোক ২৮

অলব্ধতৃণভূম্যাদিরসংপ্রাপ্তার্ঘ্যসূনৃতঃ ।
অবজ্ঞাতমিবাত্মানং মন্যমানশ্চুকোপ হ ॥ ২৮ ॥

অলব্ধ—না পাওয়ার ফলে; **তৃণ**—তৃণের আসন; **ভূমি**—স্থান; **আদিঃ**—ইত্যাদি; **অসংপ্রাপ্ত**—যথাযথভাবে আমন্ত্রিত না হওয়ার ফলে; **অর্ঘ**—স্বাগত জানিয়ে যে জল দেওয়া হয়; **সুনৃতঃ**—মিষ্টবাক্য; **অবজ্ঞাতম্**—উপেক্ষিত হওয়ার ফলে; **ইব**—এইভাবে; **আত্মানম্**—স্বয়ং; **মন্যমান**—মনে করে; **চুকোপ**—ক্রোধান্বিত হয়েছিলেন; **হ**—এইভাবে।

অনুবাদ

রাজা যখন দেখলেন যে, মুনি তাঁকে তৃণাসন, স্থান, অর্ঘ কিছুই প্রদান করলেন না, এমন কি প্রিয় বচনে সম্ভাষণও করলেন না; তখন তিনি নিজেকে অবমানিত মনে করে অত্যন্ত ক্রোধান্বিত হলেন।

তাৎপর্য

বৈদিক প্রথা অনুসারে গৃহে যদি শত্রুও আসে, তা হলে তাকেও সমস্ত সম্মান সহকারে অভ্যার্থনা করার নির্দেশ দেওয়া আছে। তার সঙ্গে এমনভাবে আচরণ করা হত যে, তাকে বুঝতে দেওয়া হত না যে, সে তার শত্রুর গৃহে এসেছে। ভীম এবং অর্জুনসহ শ্রীকৃষ্ণ যখন মগধরাজ জরাসন্ধের কাছে গিয়েছিলেন, তখন জরাসন্ধ তাঁর সম্মানিত অতিথিদের রাজকীয় ঐশ্বর্যে অভ্যার্থনা করেছিলেন। তাঁর অতিথিরূপী শত্রু, ভীম, জরাসন্ধের সঙ্গে লড়াই করতে চেয়েছিলেন, কিন্তু তা সত্ত্বেও তাঁদের মহা আড়ম্বরে সম্বর্ধনা করা হয়েছিল। রাত্রিবেলা তাঁরা বন্ধু এবং অতিথিদের মতো একত্রে বসতেন, আর দিনের বেলা তাঁদের জীবন বিপন্ন করে লড়াই করতেন। সেইটি হচ্ছে অভ্যার্থনার বিধি।

শাস্ত্রবিধি হচ্ছে, এই যে একজন অক্ষম দরিদ্র ব্যক্তি যার অতিথিকে দেওয়ার মতো কিছু নেই, তিনিও অতিথিকে অন্তত বসার জন্য একটি তৃণাসন, পান করার জন্য জল এবং মধুর বাক্য নিবেদন করবেন। তার ফলে তাঁর অতিথি সৎকার করতে কোন অর্থ ব্যয় হবে না। এটি ত কেবল শিষ্টাচারের কথা।

মহারাজ পরীক্ষিৎ যখন শমীক ঋষির দ্বারস্থ হয়েছিলেন, তখন তিনি সেই ঋষির কাছ থেকে কোন রাজকীয় অভ্যার্থনা প্রত্যাশা করেননি, কেননা তিনি জানতেন

যে, মহাত্মা এবং ঋষিরা জাগতিক বিচারে ধনী নন। কিন্তু তিনি আশা করেননি যে, তিনি একটি তৃণাসন, একপাত্র জল, এবং কিছু মধুর বাক্য থেকেও বঞ্চিত হবেন। তিনি কোন সাধারণ অতিথি ছিলেন না, এবং তিনি ঋষির শত্রুও ছিলেন না, এবং তাই ঋষির এই অপ্রত্যাশিত আচরণে রাজা অত্যন্ত বিস্মিত হয়েছিলেন।

প্রকৃতপক্ষে, অত্যন্ত তৃষ্ণার্ত রাজার পক্ষে তখন ঋষির প্রতি ক্রোধান্বিত হওয়া ন্যায়সঙ্গত ছিল। একজন রাজার পক্ষে এই রকম একটি পরিস্থিতিতে ক্রুদ্ধ হওয়া অস্বাভাবিক ছিল না, কিন্তু যেহেতু রাজা স্বয়ং কোন মহাত্মা থেকে কম ছিলেন না, তাই তাঁর ক্রুদ্ধ হওয়া এবং ক্রোধের বশবর্তী হয়ে কার্য করা আশ্চর্যজনক ছিল।

তাই বুঝতে হবে যে, পরমেশ্বর ভগবানের ইচ্ছার প্রভাবে তা হয়েছিল। মহারাজ পরীক্ষিৎ ছিলেন ভগবানের একজন মহান্ ভক্ত এবং সেই ঋষিও ছিলেন রাজারই মতো একজন মহাত্মা। কিন্তু ভগবানের ইচ্ছার প্রভাবে এমন একটি পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়, যার ফলে রাজা তাঁর আত্মীয়-স্বজন এবং রাজকার্যের প্রতি অনাসক্ত হয়ে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের শ্রীপাদপদ্মে সর্বতোভাবে শরণাগত হতে পারেন।

পরম করুণাময় ভগবান কখনও কখনও তাঁর শুদ্ধ ভক্তকে জড় জগতের বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে তাঁর কাছে ফিরিয়ে আনার জন্য এই প্রকার অদ্ভুত অবস্থার সৃষ্টি করেন, যদিও আপাতদৃষ্টিতে সেই অবস্থা ভক্তদের কাছে নৈরাশ্যজনক বলে মনে হতে পারে।

ভক্তদের ভগবান সর্বদাই রক্ষা করেন, এবং নৈরাশ্যে অথবা সাফল্যে, সর্ব অবস্থাতেই ভগবান তাঁদের পরিচালিত করেন। তাই ভগবানের শুদ্ধ ভক্তরা নৈরাশ্যজনক অবস্থাকেও ভগবানের আশীর্বাদ বলে মনে করেন।

শ্লোক ২৯

অভূতপূর্বঃ সহসা ক্ষুত্তৃড্‌ভ্যামর্দিতাত্মনঃ ।
ব্রাহ্মণং প্রত্যভূদ্ব্রহ্মন্ মৎসরো মন্যুরেব চ ॥ ২৯ ॥

অভূত-পূর্ব—যা পূর্বে কখনো হয়নি; **সহসা**—ঘটনাক্রমে; **ক্ষুৎ**—ক্ষুধা; **তৃড্‌ভ্যাম্**—এবং তৃষ্ণা; **অর্দিত**—পীড়িত হয়ে; **আত্মনঃ**—তাঁর নিজের; **ব্রাহ্মণম্**—ব্রাহ্মণকে; **প্রতি**—বিরুদ্ধে; **অভূৎ**—হয়েছিলেন; **ব্রহ্মন্**—হে ব্রাহ্মণগণ; **মৎসরঃ**—ঈর্ষাপরায়ণ; **মন্যু**—ক্রুদ্ধ; **এব**—এইভাবে; **চ**—এবং।

অনুবাদ

হে ব্রাহ্মণগণ! ক্ষুধার্ত এবং তৃষ্ণার্ত মহারাজ পরীক্ষিতের সেই ব্রহ্মর্ষির প্রতি ক্রোধ এবং মৎসরতা ছিল সম্পূর্ণ অভূতপূর্ব। পূর্বে রাজা কখনো এরকম আচরণ করেননি।

তাৎপর্য

বিশেষ করে একজন ব্রহ্মর্ষির প্রতি মহারাজ পরীক্ষিতের এইভাবে ক্রুদ্ধ এবং মাৎসর্যপরায়ণ হওয়া নিঃসন্দেহে অত্যন্ত অস্বাভাবিক ছিল। রাজা ভালভাবেই জানতেন যে, ব্রাহ্মণ, ঋষি, শিশু, স্ত্রী এবং বৃদ্ধ মানুষেরা সর্বদাই সর্বপ্রকার দণ্ডের অতীত। তেমনই রাজা যদি ভয়ঙ্কর ভুলও করেন, তবুও তাঁকে অপরাধী বলে বিবেচনা করা হয় না।

কিন্তু এখানে, ভগবানের ইচ্ছার প্রভাবে, ক্ষুধা এবং তৃষ্ণায় কাতর হয়ে পড়ার ফলে মহারাজ পরীক্ষিৎ ঋষির প্রতি ক্ষুব্ধ এবং মাৎসর্যপরায়ণ হয়েছিলেন। তাঁকে অবহেলা করার জন্য এবং অভ্যর্থনা না করার জন্য তাঁর প্রজাকে দণ্ড দেওয়ার অধিকার রাজার ছিল, কিন্তু এখানে অপরাধী যেহেতু একজন ঋষি এবং ব্রাহ্মণ, তাই তা ছিল অভূতপূর্ব।

ভগবান যেমন কারও প্রতি মাৎসর্যপরায়ণ নন, তেমনই ভগবানের ভক্তও কারও প্রতি কখনো মাৎসর্যপরায়ণ হন না। মহারাজ পরীক্ষিতের এই আচরণের একমাত্র যৌক্তিকতা হচ্ছে যে, তা ঘটেছিল ভগবানেরই ইচ্ছার প্রভাবে।

শ্লোক ৩০

স তু ব্রহ্মঋষেরংসে গতাসুমুরগং রুষা ।
বিনির্গচ্ছন্ ধনুষ্কোট্যা নিধায় পুরমাগতঃ ॥ ৩০ ॥

সঃ—সেই রাজা; তু—কিন্তু; ব্রহ্ম-ঋষেঃ—সেই ব্রহ্মর্ষির; অংসে—স্কন্ধে; গত-অসুম্—মৃত; উরগম্—সর্প; রুষা—ক্রোধে; বিনির্গচ্ছন্—যাওয়ার সময়; ধনুষ্কোট্যা—ধনুকের অগ্রভাগের দ্বারা; নিধায়—স্থাপন করে; পুরম্—রাজপ্রাসাদে; আগতঃ—প্রত্যাবর্তন করলেন।

অনুবাদ

এইভাবে অপমানিত হয়ে মহারাজ পরীক্ষিৎ ক্রোধবশত ব্রহ্মর্ষির স্কন্ধদেশে একটি মৃত সর্প ধনুকের অগ্রভাগ দ্বারা স্থাপন করে তাঁর রাজপ্রাসাদে প্রত্যাবর্তন করলেন।

তাৎপর্য

মহারাজ পরীক্ষিৎ এইভাবে মুনির আচরণের উচিত প্রত্যাচরণ করলেন, যদিও পূর্বে তিনি কখনও এই প্রকার নির্বোধ আচরণ করেননি। ভগবানের ইচ্ছায়, রাজা যখন চলে যাচ্ছিলেন, তখন তাঁর সামনে একটি মৃত সর্প দেখতে পেয়ে তিনি মনে মনে বিচার করেছিলেন যে, যে ঋষি তাঁকে এইভাবে উপেক্ষা করলেন, তাঁর পক্ষে একটি মৃত সর্পের মালাই হবে একটি উপযুক্ত পুরস্কার। সাধারণ মানুষের পক্ষে একজন ব্রহ্মর্ষির প্রতি এই প্রকার আচরণ ছিল অবশ্যই অভূতপূর্ব। আমাদের বুঝতে হবে যে, ভগবানের ইচ্ছার প্রভাবে তা হয়েছিল।

শ্লোক ৩১

এষ কিং নিভৃতাশেষকরণো মীলিতেক্ষণঃ ।
মৃষাসমাধিরাহো স্বিৎ কিং নু স্যাৎ ক্ষত্রবন্ধুভিঃ ॥ ৩১ ॥

এষঃ—এই; **কিম্**—কি; **নিভৃতাশেষ**—ধ্যানস্থ অবস্থা; **করণঃ**—ইন্দ্রিয়সমূহ; **মীলিত**—নিমীলিত; **ঈক্ষণঃ**—চক্ষু; **মৃষা**—মিথ্যা; **সমাধি**—সমাধি; **আহো**—থাকে; **স্বিৎ**—তাই যদি হয়; **কিম্**—হয়তো; **নু**—কিন্তু; **স্যাৎ**—হতে পারে; **ক্ষত্র-বন্ধুভিঃ**—অযোগ্য ক্ষত্রিয়ের দ্বারা।

অনুবাদ

গৃহে প্রত্যাবর্তন করে তিনি মনে মনে ভাবতে লাগলেন, সেই ঋষি কি সত্যি সত্যি তাঁর ইন্দ্রিয়সমূহ একাগ্র করে নিমীলিত নেত্রে ধ্যান করছিলেন, নাকি, একজন ক্ষত্রবন্ধুকে অভ্যর্থনা না করার জন্য সমাধিমগ্ন হওয়ার ভান করছিলেন।

তাৎপর্য

ভগবদ্ভক্ত মহারাজ পরীক্ষিৎ তাঁর নিজের কার্যকলাপের অনুমোদন করেননি, এবং তাই তিনি মনে মনে ভাবছিলেন যে, সেই ঋষি কি প্রকৃতই ধ্যানস্থ ছিলেন, না, নিম্ন বর্ণের ক্ষত্রিয় রাজাকে অভ্যর্থনা না করার জন্য ধ্যান করার ভান করছিলেন।

সৎ ব্যক্তির মন কোন ভুল করা মাত্রই অনুতপ্ত হয়। রাজা যে তাঁর পূর্বকৃত পাপ কর্মের ফলে এইভাবে আচরণ করেছিলেন, তা শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর এবং শ্রীল জীব গোস্বামী স্বীকার করেননি। তাঁকে ভগবদ্ধামে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য ভগবান এই আয়োজন করেছিলেন।

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুরের মতে, ভগবানের ইচ্ছার প্রভাবে এই পরিকল্পনা হয়েছিল, এবং তাঁর ইচ্ছার প্রভাবেই এই প্রকার নৈরাশ্যজনক পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছিল। সেই পরিকল্পনাটি ছিল যে, তাঁর ভ্রান্ত আচরণের ফলে রাজা কলির দ্বারা প্রভাবিত এক অনভিজ্ঞ ব্রাহ্মণ বালকের দ্বারা অভিশপ্ত হবেন, এবং তার ফলে রাজা তাঁর গৃহ এবং গৃহসম্বন্ধীয় সব কিছু চিরকালের জন্য পরিত্যাগ করবেন। তখন তাঁর সঙ্গে শ্রীল শুকদেব গোস্বামীর যোগাযোগ হবে এবং ফলে গ্রন্থরূপী ভগবানের অবতার *শ্রীমদ্ভাগবত* শ্রীল শুকদেব গোস্বামীর শ্রীমুখ থেকে প্রকাশিত হবেন।

গ্রন্থরূপী ভগবানের এই অবতার, ব্রজভূমির গোপবালিকাদের সঙ্গে ভগবানের রাসলীলা আদি বহু অপ্রাকৃত লীলার অতি চমৎকার সংবাদ প্রদান করে। ভগবানের এই বিশেষ লীলাটির একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য আছে, কারণ কেউ যখন যথাযথভাবে ভগবানের এই লীলার বৈশিষ্ট্য হৃদয়ঙ্গম করতে পারেন, তখন তিনি জড় কামভাব থেকে মুক্ত হয়ে পরম মহিমান্বিত ভগবদ্ভক্তির মার্গে অধিষ্ঠিত হতে পারেন।

শুদ্ধ ভক্তের জাগতিক নৈরাশ্য তাঁকে অপ্রাকৃত স্তরে অধিষ্ঠিত করার উপায় মাত্র। অর্জুন প্রমুখ পাণ্ডবদের যে দুর্যোধন প্রমুখ জ্ঞাতিবর্গের ষড়যন্ত্রের প্রভাবে লাঞ্ছিত ও দুঃখ-দুর্দশাগ্রস্ত হতে হয়েছিল, তা কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের সূচনা করার জন্য ভগবানের আয়োজন। ভগবান তাঁর শব্দরূপী প্রতিনিধি *শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা* অবতরণ করানোর জন্য সেই আয়োজন করেছিলেন।

তেমনই মহারাজ পরীক্ষিতকে একটি সমস্যাপূর্ণ পরিবেশে স্থাপন করে ভগবান তাঁর ইচ্ছায় *শ্রীমদ্ভাগবতকে* অবতরণ করিয়েছিলেন। তাঁর পক্ষে ক্ষুধায় এবং তৃষ্ণায় কাতর হওয়া ছিল অভিনয় মাত্র, কেননা তিনি তাঁর মাতৃগর্ভে অবস্থানকালেও আরও অনেক দুঃখ সহ্য করেছিলেন। অশ্বত্থামা কর্তৃক নিক্ষিপ্ত ব্রহ্মাস্ত্রের প্রচণ্ড তাপে পর্যন্ত তিনি বিচলিত হননি। মহারাজ পরীক্ষিতের এই বিষাদপূর্ণ অবস্থা অবশ্যই অভূতপূর্ব ছিল। মহারাজ পরীক্ষিতের মতো ভক্তেরা এই ধরনের বিপদ ভগবানের কৃপায় অনায়াসে সহ্য করতে পারেন, এবং তাঁরা কখনও বিচলিত হন না। অতএব এই প্রসঙ্গে এই পরিস্থিতি ভগবান কর্তৃকই পরিচালিত হয়েছিল।

শ্লোক ৩২

তস্য পুত্রোঽতিতেজস্বী বিহরন্ বালকোঽর্ভকৈঃ ।
রাজ্ঞাঘং প্রাপিতং তাতং শ্রুত্বা তত্রেদমব্রবীৎ ॥ ৩২ ॥

তস্য—তাঁর (সেই ঋষির); **পুত্রঃ**—পুত্র; **অতি**—অত্যন্ত; **তেজস্বী**—শক্তিশালী; **বিহরন্**—খেলা করার সময়; **বালকৈঃ**—বালকদের সঙ্গে; **অর্ভকৈঃ**—যারা সকলেই ছিল শিশু; **রাজ্ঞা**—রাজা কর্তৃক; **অঘম্**—বিপত্তি; **প্রাপিতম্**—প্রাপ্ত হয়েছিল; **তাতম্**—পিতা; **শ্রুত্বা**—শুনে; **তত্র**—তৎক্ষণাৎ; **ইদম্**—এই; **অব্রবীৎ**—বলেছিলেন।

অনুবাদ

সেই মুনির একটি পুত্র ছিল, সে ব্রাহ্মণপুত্র হওয়ার ফলে অত্যন্ত শক্তিমান ছিল। সে যখন অন্য বালকদের সঙ্গে খেলা করছিল, তখন সে জানতে পারে রাজা কিভাবে তাঁর পিতাকে লাঞ্ছিত করেছে। তৎক্ষণাৎ সেই বালক এই কথাগুলি বলে।

তাৎপর্য

মহারাজ পরীক্ষিতের সুন্দর শাসন ব্যবস্থার ফলে একটি শিশুবালক পর্যন্ত, যে তখন অন্য অনভিজ্ঞ বালকদের সঙ্গে খেলা করত, একজন যোগ্য ব্রাহ্মণের মতো তেজস্বী হতে পেরেছিল। সেই বালকটির নাম ছিল শৃঙ্গী, এবং সে তাঁর পিতার কাছে খুব ভালভাবে ব্রহ্মচর্যের শিক্ষা পেয়েছিল, যার ফলে সে সেই বয়সেই একজন ব্রাহ্মণের মতো তেজস্বী হয়েছিল।

কিন্তু কলি তখন জীবনের চতুরাশ্রমের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য বিনষ্ট করার সুযোগ খুঁজছিল এবং সেই অনভিজ্ঞ বালকটি কলিকে তখন বৈদিক সংস্কৃতির ক্ষেত্রে প্রবেশ করার সুযোগ দিয়েছিল। কলির প্রভাবে সেই ব্রাহ্মণ বালকটির থেকে নিম্ন বর্ণের প্রতি ঘৃণার সৃষ্টি হয়েছিল, এবং তার ফলে দিনে দিনে সাংস্কৃতিক জীবন ক্ষয়প্রাপ্ত হচ্ছে। ব্রাহ্মণের অন্যায় আচরণের প্রথম শিকার হয়েছিলেন পরীক্ষিৎ মহারাজ, এবং তার ফলে কলির আক্রমণ থেকে রাজার প্রদত্ত সংরক্ষণ শিথিল হয়ে পড়ে।

শ্লোক ৩৩

অহো অধর্মঃ পালানাং পীবাং বলিভুজামিব ।
স্বামিন্যঘং যদ্দাসানাং দ্বারপানাং শুনামিব ॥ ৩৩ ॥

অহো—দেখ; **অধর্মঃ**—অধর্ম; **পালানাম্**—শাসকদের; **পীবাম্**—যারা পুষ্ট হয়েছে; **বলিভুজামিব**—কাকের মতো; **স্বামিনি**—প্রভুকে; **অঘম্**—পাপ; **যৎ**—যা; **দাসানাম্**—ভৃত্যদের; **দ্বারপানাম্**—দ্বারপালদের; **শুনাম্**—কুকুরদের; **ইব**—মতো।

অনুবাদ

(ব্রাহ্মণবালক শৃঙ্গী বলল) দেখ! শাসকেরা কি রকম পাপ আচরণপরায়ণ হয়েছে। কাক এবং দ্বাররক্ষক কুকুরের সঙ্গে যাদের তুলনা হতে পারে, আজ কি না তারাই প্রভুর প্রতি পাপাচরণে প্রবৃত্ত হয়েছে!

তাৎপর্য

ব্রাহ্মণদের সমাজরূপী শরীরের মস্তক এবং মস্তিষ্ক বলে মনে করা হয়, আর ক্ষত্রিয়রা হচ্ছেন সমাজরূপী শরীরের বাহু। শরীরকে সব রকম আঘাত থেকে রক্ষা করার জন্য বাহুর প্রয়োজন, কিন্তু বাহুকে অবশ্যই মস্তকের নির্দেশ অনুসারে আচরণ করতে হয়। ভগবানের পরম নির্দেশনায় এইটি একটি স্বাভাবিক আয়োজন, এবং *শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায়* প্রতিপন্ন হয়েছে যে, ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়-বৈশ্য-শূদ্র এই চারটি বর্ণ গুণ এবং কর্ম অনুসারে বিভক্ত করা হয়েছে।

সুযোগ্য ব্রাহ্মণ পিতার নির্দেশনায় ব্রাহ্মণ-পুত্রের স্বাভাবিকভাবেই ব্রাহ্মণ হওয়ার খুব ভাল সুযোগ থাকে, ঠিক যেমন একজন চিকিৎসকের পুত্রের চিকিৎসক হওয়ার খুব ভাল সম্ভাবনা থাকে। এই প্রকার বর্ণাশ্রম ব্যবস্থা অত্যন্ত বিজ্ঞানসম্মত। পিতার বৃত্তি অনুসারে পুত্রের ব্রাহ্মণ অথবা চিকিৎসক হওয়ার খুব ভাল সম্ভাবনা থাকে। সমস্ত শাস্ত্রে এবং সমাজ ব্যবস্থায় নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে, উপযুক্ত গুণাবলী অর্জন না করলে ব্রাহ্মণ অথবা চিকিৎসক হওয়া যায় না।

এখানে শৃঙ্গী, একজন মহান্ ব্রাহ্মণের গুণসম্পন্ন পুত্র, তার জন্ম এবং শিক্ষা অনুসারে ব্রাহ্মণোচিত তেজ লাভ করেছিল, কিন্তু একজন অনভিজ্ঞ বালক হওয়ার ফলে তাঁর সংস্কৃতির অভাব ছিল। কলির প্রভাবে ব্রাহ্মণের পুত্র ব্রহ্মতেজের গর্বে গর্বিত হয়ে অন্যায়ভাবে পরীক্ষিৎ মহারাজকে কাকের সঙ্গে এবং দ্বাররক্ষক কুকুরের সঙ্গে তুলনা করেছিল। রাজা অবশ্যই রাষ্ট্রের দ্বাররক্ষক কুকুরের মতো, কেননা তিনি শত্রুর আক্রমণ থেকে রাষ্ট্রকে রক্ষা করার জন্য সতর্ক দৃষ্টিতে সীমানা পাহারা দেন, কিন্তু তা বলে তাকে একটি কুকুরের সঙ্গে তুলনা করা সংস্কৃতির অভাবের পরিচায়ক।

এইভাবে সংস্কৃতির বিচার না করে জন্মের উপর গুরুত্ব দেওয়ার ফলে ব্রাহ্মণ্য শক্তির অবক্ষয় শুরু হয়। ব্রাহ্মণদের অধঃপতন শুরু হয় কলিযুগে, এবং ব্রাহ্মণেরা যেহেতু সমাজের মস্তক স্বরূপ, তাই সমাজের অন্য সমস্ত বর্ণেরও তার ফলে অধঃপতন শুরু হয়। ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির এই অধঃপতনের সূত্রপাত শৃঙ্গীর পিতা শমীক ঋষির গভীর অনুতাপের কারণ হয়েছিল, যা আমরা এখানে দেখতে পাব।

শ্লোক ৩৪

ব্রাহ্মণৈঃ ক্ষত্রবন্ধুর্হি গৃহপালো নিরূপিতঃ ।
স কথং তদ্‌গৃহে দ্বাঃস্থঃ সভাণ্ডং ভোক্তুমর্হতি ॥ ৩৪ ॥

ব্রাহ্মণৈঃ—ব্রাহ্মণদের দ্বারা; **ক্ষত্রবন্ধুঃ**—ক্ষত্রিয়ের পুত্র; **হি**—নিশ্চিতভাবে; **গৃহপালঃ**—দ্বাররক্ষক কুকুর; **নিরূপিতঃ**—সম্বোধিত; **সঃ**—সে; **কথম্**—কিভাবে; **তৎগৃহে**—তার প্রভুর গৃহে; **দ্বাঃস্থঃ**—দ্বারপাল; **সভাণ্ডম্**—সেই পাত্র থেকে; **ভোক্তুম্**—খাওয়ার; **অর্হতি**—যোগ্য হয়।

অনুবাদ

ব্রাহ্মণেরা ক্ষত্রবন্ধুদের গৃহরক্ষক কুকুর বলেই নিরূপিত করেছে। তারা অবশ্যই দ্বারদেশে থাকবে। আজ তারা কিসের ভিত্তিতে গৃহে প্রবেশ করে প্রভুর সঙ্গে এক পাত্রে ভোজন করার সাহস পায়?

তাৎপর্য

সেই অনভিজ্ঞ ব্রাহ্মণ বালক অবশ্যই জানত যে, রাজা তার পিতার কাছে জল চেয়েছিলেন এবং তার পিতা কোন উত্তর দেননি। সে তার পিতার আতিথেয়তার অভাবের ত্রুটি ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেছিল অসভ্য বালকোচিত অশিষ্ট ভাষায়। রাজাকে যে যথাযথভাবে অভ্যর্থনা করা হয়নি, সেজন্য তার কোন রকম অনুশোচনা হয়নি। পক্ষান্তরে, সে ঠিক একজন কলিযুগের ব্রাহ্মণের মতো তার অন্যায় আচরণের বৈধতা প্রমাণ করার চেষ্টা করছিল। সে রাজাকে একজন দ্বাররক্ষক কুকুরের সঙ্গে তুলনা করেছিল এবং প্রতিপন্ন করতে চেয়েছিল যে, রাজার পক্ষে ব্রাহ্মণের গৃহে প্রবেশ করে তার পাত্র থেকে জল পান করতে চাওয়া অন্যায় আচরণ।

কুকুরকে অবশ্যই তার প্রভু পালন করেন, কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে, কুকুর তার প্রভুর পাত্র থেকে আহার এবং পান করবে। এই মিথ্যা অহঙ্কারের মনোভাব আদর্শ সমাজ ব্যবস্থার অধঃপতনের কারণ, এবং আমরা দেখতে পাই যে, তার সূচনা হয়েছিল অনভিজ্ঞ ব্রহ্মবন্ধুদের দ্বারা।

একটি কুকুর যেমন প্রভুর দ্বারা প্রতিপালিত হলেও তার প্রভুর গৃহের অভ্যন্তরে প্রবেশ করতে পারে না, তেমনই শৃঙ্গীর মতে, মহারাজ পরীক্ষিতের শমীক ঋষির গৃহে প্রবেশ করার কোন অধিকার ছিল না। এই বালকের মতে, রাজাই অন্যায় আচরণ করেছিলেন, তার পিতা করেননি, এবং এইভাবে সে তার মৌন পিতার আচরণ ন্যায়সঙ্গত বলে প্রমাণ করার চেষ্টা করেছিল।

শ্লোক ৩৫

কৃষ্ণে গতে ভগবতি শাস্তর্য্যুৎপথগামিনাম্ ।
তদ্ভিন্নসেতূনদ্যাহং শাস্মি পশ্যত মে বলম্ ॥ ৩৫ ॥

কৃষ্ণে—ভগবান শ্রীকৃষ্ণ; **গতে**—এই জগৎ থেকে প্রস্থান করার ফলে; **ভগবতি**—পরমেশ্বর ভগবান; **শাস্তরি**—পরম শাসক; **উৎপথগামিনাম্**—উচ্ছৃঙ্খলদের; **তদ্ভিন্ন**—বিচ্ছিন্ন হওয়ার ফলে; **সেতূন্**—রক্ষক; **অদ্য**—আজ; **অহম্**—আমি; **শাস্মি**—দণ্ডদান করব; **পশ্যত**—দেখ; **মে**—আমার; **বলম্**—পরাক্রম।

অনুবাদ

সকলের পরম শাসক পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ স্বধামে গমন করেছেন বলে এই সমস্ত উচ্ছৃঙ্খল লোকেরা তাদের প্রভাব বিস্তার করছে। তাই আমি তাদের দণ্ডদান করছি। তোমরা আমার শক্তি দেখ।

তাৎপর্য

ক্ষুদ্র ব্রহ্মতেজের প্রভাবে মদমত্ত সেই অনভিজ্ঞ ব্রাহ্মণ কলির দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিল। মহারাজ পরীক্ষিৎ কলিকে পূর্ব উল্লিখিত চারটি স্থানে থাকবার অনুমতি দিয়েছিলেন, কিন্তু তাঁর সুদক্ষ শাসন ব্যবস্থায় কলি তাঁর রাজ্যে থাকবার উপযুক্ত জায়গা খুঁজে পায়নি, তাই কলি তার আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করার সুযোগ খুঁজছিল এবং ভগবানের কৃপায় সে সেই অনভিজ্ঞ অহঙ্কারে মত্ত ব্রহ্মবন্ধুর মধ্যে একটি ছিদ্র খুঁজে পেয়েছিল। সেই ক্ষুদ্র ব্রাহ্মণ তার ধ্বংসকারী শক্তি প্রদর্শন করতে চেয়েছিল, এবং সে মহারাজ পরীক্ষিতের মতো একজন মহান রাজাকে দণ্ডদান করার দুঃসাহস করেছিল। শ্রীকৃষ্ণের অপ্রকটের পর সে তাঁর স্থান অধিকার করতে চেয়েছিল। কলির দ্বারা প্রভাবিত যে সমস্ত উৎপথগামী মানুষ শ্রীকৃষ্ণের স্থান অধিকার করতে চায়, তারাই এই প্রকার আচরণ করে। অল্প শক্তি লাভের ফলে মদমত্ত হয়ে তারা ভগবানের অবতার সাজতে চায়। শ্রীকৃষ্ণের অপ্রকটের পর বহু প্রতারক অবতার সাজার চেষ্টা করেছে, এবং তারা মিথ্যা প্রতিষ্ঠা লাভের জন্য নির্বোধ জনসাধারণকে ভ্রান্তপথে পরিচালিত করছে। অর্থাৎ, ব্রাহ্মণবালক শৃঙ্গীর মাধ্যমে কলি এই পৃথিবীর উপর তার আধিপত্য বিস্তার করার সুযোগ পেয়েছিল।

শ্লোক ৩৬

ইত্যুক্ত্বা রোষতাম্রাক্ষো বয়স্যানৃষিবালকঃ ।
কৌশিক্যাপ উপস্পৃশ্য বাথ্বজ্রং বিসসর্জ হ ॥ ৩৬ ॥

ইতি—এইভাবে; **উক্ত্বা**—বলে; **রোষ-তাম্র-অক্ষঃ**—ক্রোধে আরক্ত নয়ন; **বয়স্যান্**—তার খেলার সাথীদের; **ঋষি-বালকঃ**—ঋষিপুত্র; **কৌশিকী**—কৌশিকী নদী; **আপ**—জল; **উপস্পৃশ্য**—স্পর্শ করে; **বাক্**—বাক্য; **বজ্রম্**—বজ্র; **বিসসর্জ**—ফেলেছিল; **হ**—অতীতকালসূচক শব্দ।

অনুবাদ

ঋষিবালক শৃঙ্গীর চক্ষুদ্বয় ক্রোধে আরক্ত হয়েছিল, সে তার খেলার সাথীদের সঙ্গে এইভাবে কথা বলতে বলতে কৌশিকী নদীর জলে আচমন করে বজ্রোপম বাক্য উচ্চারণ করল।

তাৎপর্য

এই শ্লোকটি থেকে বোঝা যায় যে, যে পরিস্থিতিতে মহারাজ পরীক্ষিৎ অভিশপ্ত হয়েছিলেন, সেটি ছিল অত্যন্ত শিশুসুলভ একটি পরিস্থিতি। শৃঙ্গী তার খেলার সাথীদের কাছে তার ঔদ্ধত্য প্রদর্শন করছিল, যারা ছিল নিতান্তই নির্বোধ। যে কোন সুস্থ মস্তিষ্কের মানুষ তাকে সমগ্র মানব সমাজের এই বিরাট ক্ষতি করা থেকে নিরস্ত করত। তার ব্রহ্মতেজ প্রদর্শন করার জন্য এক অনভিজ্ঞ ব্রাহ্মণবালক পরীক্ষিৎ মহারাজের মতো একজন আদর্শ রাজাকে হত্যা করে এক মস্ত বড় ভুল করেছিল।

শ্লোক ৩৭

ইতি লঙ্ঘিতমর্যাদং তক্ষকঃ সপ্তমেঽহনি ।
দঙ্ক্ষ্যতি স্ম কুলাঙ্গারং চোদিতো মে ততদ্রুহম্ ॥ ৩৭ ॥

ইতি—এইভাবে; **লঙ্ঘিত**—লঙ্ঘন করার ফলে; **মর্যাদম্**—শিষ্টাচার; **তক্ষকঃ**—তক্ষক সর্প; **সপ্তমে**—সপ্তম; **অহনি**—দিনে; **দংক্ষ্যতি**—দংশন করবে; **স্ম**—নিশ্চিতভাবে; **কুলাঙ্গারম্**—বংশের মর্যাদা বিনাশকারী; **চোদিতঃ**—করার ফলে; **মে**—আমার; **ততদ্রুহম্**—পিতার প্রতি শত্রুতা।

অনুবাদ

সেই ব্রাহ্মণের পুত্র রাজাকে অভিশাপ দিল—"যে কুলাঙ্গার মর্যাদা লঙ্ঘন করে আমার পিতাকে এইভাবে অবমাননা করেছে, আমার আদেশক্রমে তক্ষক সর্প সপ্তম দিনে তাঁকে দংশন করবে।"

তাৎপর্য

এইভাবে ব্রাহ্মণ্য শক্তির অপচয় শুরু হয়, এবং ধীরে ধীরে কলিযুগের ব্রাহ্মণেরা তাদের ব্রহ্মতেজ এবং সংস্কৃতি হারিয়ে ফেলে। ব্রাহ্মণবালকটি মহারাজ পরীক্ষিতকে কুলাঙ্গার বলে অভিহিত করেছিল, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সে ব্রাহ্মণবালকটি নিজেই ছিল কুলাঙ্গার, কেননা তার জন্যই ব্রাহ্মণ সমাজ বিষদাঁত ভাঙা সাপের মতো শক্তিহীন হয়ে পড়েছে। সাপের যতক্ষণ বিষদাঁত থাকে ততক্ষণই কেবল সে ভীতিজনক, তা না হলে কেবল শিশুরাই কেবল তাকে ভয় করে।

কলি প্রথমে ব্রাহ্মণবালকটিকে জয় করেছিল, এবং ধীরে ধীরে সে অন্যান্য বর্ণগুলিও জয় করে। তার ফলে আজ সম্পূর্ণরূপে বিজ্ঞানসম্মত বর্ণ-ধর্মের ব্যবস্থা এক দূষিত জাতিভেদ প্রথার রূপ নিয়েছে, যা কলিযুগের প্রভাবে প্রভাবান্বিত আর এক শ্রেণীর মানুষদের দ্বারা উৎপাটিত হচ্ছে। মানুষের কর্তব্য এই কলুষের মূল কারণ খুঁজে দেখা এবং এই ব্যবস্থার বৈজ্ঞানিক মাহাত্ম্য না জেনে তার নিন্দা না করা।

শ্লোক ৩৮

ততোঽভ্যেত্যাশ্রমং বালো গলে সর্পকলেবরম্ ।
পিতরং বীক্ষ্য দুঃখার্তো মুক্তকণ্ঠো রুরোদ হ ॥ ৩৮ ॥

ততঃ—তার পর; **অভ্যেত্য**—প্রবেশ করে; **আশ্রমম্**—আশ্রমে; **বালঃ**—বালক; **গলে সর্প**—যার গলদেশে সর্প; **কলেবরম্**—শরীর; **পিতরম্**—পিতাকে; **বীক্ষ্য**—দেখে; **দুঃখার্তঃ**—দুঃখিত অবস্থায়; **মুক্তকণ্ঠঃ**—উচ্চস্বরে; **রুরোদ**—ক্রন্দন করেছিল; **হ**—অতীতে।

অনুবাদ

ঋষিকুমার এই বলে আশ্রমে প্রত্যাগমন করল এবং তাঁর পিতার গলদেশে মৃত সর্প দেখে অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে উচ্চস্বরে রোদন করতে লাগল।

তাৎপর্য

সেই বালক একটি মস্ত বড় ভুল করার জন্য অন্তরে দুঃখ অনুভব করেছিল; এবং সে ক্রন্দন করে তার হৃদয়ের সেই ভার লাঘব করার চেষ্টা করেছিল। তাই আশ্রমে প্রবেশ করে তার পিতাকে সেই অবস্থায় দেখে সে উচ্চস্বরে ক্রন্দন করতে শুরু করেছিল যাতে সেই ভার লাঘব হয়। কিন্তু অনেক দেরি হয়ে গিয়েছিল। তার পিতা সেই ঘটনা সম্বন্ধে অবগত হয়ে গভীরভাবে অনুতাপ প্রকাশ করেছিলেন।

শ্লোক ৩৯

স বা আঙ্গিরসো ব্রহ্মন্ শ্রুত্বা সুতবিলাপনম্ ।
উন্মীল্যশনকৈর্নেত্রে দৃষ্ট্বা চাংশে মৃতোরগম্ ॥ ৩৯ ॥

সঃ—তিনি; **বৈ**—ও; **আঙ্গিরসঃ**—অঙ্গিরার বংশোদ্ভূত ঋষি; **ব্রহ্মন্**—হে শৌনক; **শ্রুত্বা**—শ্রবণ করে; **সুত**—তাঁর পুত্র; **বিলাপনম্**—দুঃখজনিত ক্রন্দন; **উন্মীল্য**—খুলে; **শনকৈ**—ধীরে ধীরে; **নেত্রে**—নেত্র দ্বারা; **দৃষ্ট্বা**—দেখে; **চ**—ও; **অংসে**—স্কন্ধে; **মৃত**—মৃত; **উরগম্**—সর্প।

অনুবাদ

হে ব্রাহ্মণগণ! অঙ্গিরা মুনির গোত্র উদ্ভূত সেই শমীক ঋষি তাঁর পুত্রের ক্রন্দন শ্রবণ করে ধীরে ধীরে তাঁর নেত্রদ্বয় উন্মীলিত করলেন এবং তাঁর গলদেশে এক মৃত সর্প দেখতে পেলেন।

শ্লোক ৪০

বিসৃজ্য তঞ্চ পপ্রচ্ছ বৎস কস্মাদ্ধি রোদিষি ।
কেন বা তেঽপকৃতমিত্যুক্তঃ স ন্যবেদয়ৎ ॥ ৪০ ॥

বিসৃজ্য—এক পাশে ছুঁড়ে ফেলে; **তম্**—তা; **চ**—ও; **পপ্রচ্ছ**—জিজ্ঞাসা করেছিলেন; **বৎস**—হে পুত্র; **কস্মাৎ**—কি জন্য; **হি**—অবশ্যই; **রোদিষি**—ক্রন্দন করছ; **কেন**—কার দ্বারা; **বা**—অথবা; **তে**—তারা; **অপকৃতম্**—অপব্যবহার করেছে; **ইতি**—এইভাবে; **উক্তঃ**—জিজ্ঞাসিত হয়েছে; **সঃ**—সেই বালক; **ন্যবদয়ৎ**—সব কিছু বলেছিল।

অনুবাদ

তিনি সেই সাপটিকে একপাশে ছুঁড়ে ফেলে তাঁর পুত্রকে জিজ্ঞাসা করলেন— বৎস! কি জন্য তুমি ক্রন্দন করছ? কেউ কি তোমার অনিষ্ট করেছে? সে কথা শুনে ঋষিবালক তাঁর পিতাকে সমস্ত বৃত্তান্ত বলেছিল।

তাৎপর্য

তার পিতা তাঁর গলায় জড়ানো মৃত সর্পটি সম্বন্ধে বিশেষ গুরুত্ব দেননি। তিনি কেবল সেটি দূরে নিক্ষেপ করেছিলেন। প্রকৃতপক্ষে, মহারাজ পরীক্ষিতের আচরণে তেমন কোন গর্হিত অন্যায় হয়নি; কিন্তু সে মূর্খ বালকটি সেই ঘটনাটিকে অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়েছিল, এবং কলির দ্বারা প্রভাবিত হয়ে রাজাকে অভিশাপ দিয়েছিল। এইভাবে সেই ইতিহাসের একটি সুখময় অধ্যায়ের সমাপ্তি ঘটেছিল।

শ্লোক ৪১

নিশম্য শপ্তমতদর্হং নরেন্দ্রং
স ব্রাহ্মণো নাত্মজমভ্যনন্দৎ ৷
অহো বতাংহো মহদদ্য তে কৃত-
মল্পীয়সি দ্রোহ উরুর্দমো ধৃতঃ ॥ ৪১ ॥

নিশম্য—শ্রবণ করে; **শপ্তম্**—অভিশাপ; **অতৎ-অর্হম্**—যাঁকে কখনো অভিসম্পাত করা উচিত নয়; **নরেন্দ্রম্**—রাজাকে, নরশ্রেষ্ঠকে; **সঃ**—সেই; **ব্রাহ্মণঃ**—ব্রাহ্মণ ঋষি; **ন**—না; **আত্মজম্**—তাঁর পুত্রকে; **অভ্যনন্দৎ**—প্রশংসা; **অহো**—হায়; **বত**—দুঃখজনক; **অংহঃ**—পাপ; **মহৎ**—মহা; **অদ্য**—আজ; **তে**—তুমি; **কৃতম্**—করেছ; **অল্পীয়সি**—নগণ্য; **দ্রোহে**—অপরাধে; **উরু**—মহা; **দমঃ**—দণ্ড; **ধৃতঃ**—দেওয়া হয়েছে।

অনুবাদ

তাঁর পুত্র অভিসম্পাতের অনুপযুক্ত সেই মহারাজ পরীক্ষিতকে শাপ দিয়েছে শুনে সেই ব্রাহ্মণ শমীক ঋষি তাঁর পুত্রকে প্রশংসা করলেন না। পক্ষান্তরে, তিনি পুত্রকে বললেন, আহা কী দুঃখের বিষয়! তুমি মহা পাপ করেছ। তুমি লঘু অপরাধে গুরুতর দণ্ড প্রদান করেছ।

তাৎপর্য

রাজা হচ্ছেন নরশ্রেষ্ঠ। তিনি ভগবানের প্রতিনিধি, এবং কখনও তাঁকে অভিসম্পাত করা উচিত নয়। অর্থাৎ, রাজা কখনও অন্যায় আচরণ করেন না। রাজা অপরাধী ব্রাহ্মণ-সন্তানকে ফাঁসি দেওয়ার আদেশ দিতে পারেন, কিন্তু তার ফলে তাঁর ব্রহ্ম-হত্যাজনিত পাপ হয় না। রাজা কখনও কোন অন্যায় করলেও তাঁকে অভিসম্পাত করা উচিত নয়। ভুল চিকিৎসার ফলে যদি কোন রোগীর মৃত্যু হয়, সেজন্য কখনো চিকিৎসককে হত্যাজনিত অপরাধের জন্য মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয় না।

অতএব পরীক্ষিৎ মহারাজের মতো একজন সৎ ও পুণ্যবান রাজার কি কথা? বৈদিক সমাজ ব্যবস্থায় রাজারা রাজর্ষি হওয়ার শিক্ষা লাভ করতেন। অর্থাৎ, রাজ্য শাসন করা সত্ত্বেও তাঁরা ছিলেন মহা-ঋষিসদৃশ। রাজার সুন্দর শাসন ব্যবস্থার ফলে প্রজারা নির্ভয়ে শান্তিপূর্ণভাবে জীবন যাপন করতে পারে।

রাজর্ষিরা তাঁদের রাজ্য এত সুন্দরভাবে এবং পবিত্রভাবে পরিচালনা করতেন যে, প্রজারা তাঁদের ভগবানের মতো সম্মান করতেন। সেইটি বেদের নির্দেশ। রাজাকে বলা হয় নরেন্দ্র, অর্থাৎ, সমস্ত মানুষদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ। তা হলে পরীক্ষিৎ মহারাজের মতো একজন আদর্শ রাজা কেমন করে সুযোগ্য ব্রাহ্মণের মতো শক্তিসম্পন্ন এক অনভিজ্ঞ দাম্ভিক ব্রাহ্মণ-বালকের দ্বারা অভিশপ্ত হলেন?

যেহেতু শমীক ঋষি ছিলেন একজন অভিজ্ঞ সদ্ ব্রাহ্মণ, তাই তিনি তাঁর অধম পুত্রের কার্য সমর্থন করেননি। পক্ষান্তরে, তিনি তাঁর পুত্রের আচরণে শোক প্রকাশ করেছিলেন। সাধারণ নিয়ম অনুসারে রাজা অভিসম্পাতের অতীত, আর মহারাজ পরীক্ষিতের মতো একজন সৎ রাজার কি কথা। মহারাজের অপরাধ ছিল অত্যন্ত নগণ্য এবং সেজন্য তাঁকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করা শৃঙ্গীর পক্ষে অবশ্যই এক মহা পাপ হয়েছিল। তাই শমীক ঋষি সেজন্য গভীরভাবে অনুতাপ করেছিলেন।

শ্লোক ৪২

ন বৈ নৃভির্নরদেবং পরাখ্যং
সম্মাতুমর্হস্যবিপক্ববুদ্ধে ।
যত্তেজসা দুর্বিষহেণ গুপ্তা
বিন্দন্তি ভদ্রাণ্যকুতোভয়াঃ প্রজাঃ ॥ ৪২ ॥

ন—কখনোই না; **বৈ**—সত্য সত্য; **নৃভিঃ**—কোন মানুষের দ্বারা; **নরদেবম্**—নরদেবতাকে; **পরাখ্যম্**—দিব্য; **সম্মাতুম্**—সমপর্যায়ভুক্ত করা; **অর্হসি**—পরাক্রমের

দ্বারা; **অবিপক্ক**—অপক্ক বা অপরিণত; **বুদ্ধে**—বুদ্ধি; **যৎ**—যার; **তেজসা**—তেজের দ্বারা; **দুর্বিষহেণ**—অলঙ্ঘনীয়; **গুপ্তা**—সুরক্ষিত; **বিন্দতি**—ভোগ করেন; **ভদ্রানি**—সমগ্র সমৃদ্ধি; **অকুতোভয়াঃ**—সম্পূর্ণরূপে সুরক্ষিত হয়ে, নির্ভয়ে; **প্রজাঃ**—প্রজাগণ।

অনুবাদ

হে বৎস! তোমার বুদ্ধি অপরিণত, এবং তাই যে রাজা নরশ্রেষ্ঠ এবং বিষ্ণুতুল্য বলে বিদিত, যাঁর দুর্বিষহ তেজের প্রভাবে সমস্ত প্রজারা সুরক্ষিত হয়ে নির্ভয়ে সুখৈশ্বর্য ভোগ করে, তাঁকে সাধারণ মানুষের সমতুল্য বলে মনে করা তোমার উচিত হয়নি।

শ্লোক ৪৩

অলক্ষ্যমাণে নরদেবনাম্নি
রথাঙ্গপাণাবয়মঙ্গ লোকঃ ৷
তদা হি চৌরপ্রচুরো বিনঙ্ক্ষ্য-
ত্যরক্ষ্যমাণোঽবিবরূথবৎ ক্ষণাৎ ॥ ৪৩ ॥

অলক্ষ্যমাণে—অন্তর্হিত হলে; **নরদেব**—নৃপ; **নাম্নি**—নামক; **রথাঙ্গপাণৌ**—ভগবানের প্রতিনিধি; **অয়ম্**—এই; **অঙ্গ**—হে বৎস; **লোকঃ**—এই পৃথিবী; **তদা হি**—তৎক্ষণাৎ; **চৌর**—চোর; **প্রচুরঃ**—বহু; **বিনঙ্ক্ষ্যতি**—বিনাশপ্রাপ্ত হবে; **অরক্ষ্যমাণঃ**—সুরক্ষিত না হয়ে; **অবিবরূথবৎ**—মেষদের মতো; **ক্ষণাৎ**—শীঘ্রই।

অনুবাদ

হে বৎস, চক্রধারী শ্রীভগবানের প্রতিনিধি হচ্ছেন রাজা। সেই রাজা অন্তর্হিত হলে এই পৃথিবীতে প্রচুর চোরের প্রাদুর্ভাব হবে এবং প্রজারা রক্ষকবিহীন মেষপালের মতো মুহূর্তের মধ্যে বিনষ্ট হবে।

তাৎপর্য

শ্রীমদ্ভাগবতের বর্ণনা অনুসারে রাজতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা পরমেশ্বর ভগবানের প্রতিনিধিত্ব করে। রাজাকে পরমেশ্বর ভগবানের প্রতিনিধি বলা হয় কারণ তাঁকে প্রজাপালনরূপ ভগবানের গুণাবলী অর্জন করার শিক্ষা লাভ করতে হয়।

ভগবান কর্তৃক কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ আয়োজিত হয়েছিল ভগবানের প্রকৃত প্রতিনিধি মহারাজ যুধিষ্ঠিরকে সিংহাসনে অধিষ্ঠিত করার জন্য। সামরিক তেজে তেজস্বী

রাজা যখন যথাযথভাবে সংস্কৃতি এবং ভগবদ্ভক্তির শিক্ষায় শিক্ষিত হন, তখন তিনি একজন আদর্শ রাজা হন। শিক্ষাহীন এবং দায়িত্বহীন তথাকথিত প্রজাতন্ত্র থেকে নিজতন্ত্র অনেক ভাল। আধুনিক যুগে প্রজাতন্ত্রে চোর এবং দুর্বৃত্তরা নেতৃত্বের আসনে নির্বাচিত হওয়ার চেষ্টা করছে, এবং যে সমস্ত চোর এবং দুর্বৃত্তরা সফল হচ্ছে, তারা জনসাধারণের যথা সর্বস্ব আত্মসাৎ করছে। একজন সুশিক্ষিত সম্রাট শত শত নিষ্কর্মা দুর্বৃত্ত মন্ত্রীদের থেকে অনেক ভাল, এবং এখানে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, মহারাজ পরীক্ষিতের মতো রাজতন্ত্রের উচ্ছেদের ফলে জনসাধারণ কলির অজস্র আক্রমণের শিকার হয়েছে।

বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে প্রজাতন্ত্রের মহিমা যতই ঘোষণা করা হোক, তার ফলে জনসাধারণ কখনও সুখী হয় না। রাজাহীন এই প্রকার শাসন ব্যবস্থার কুফল পরবর্তী কয়েকটি শ্লোকে বর্ণিত হয়েছে।

শ্লোক ৪৪

তদদ্য নঃ পাপমুপৈত্যনন্বয়ং
যন্নষ্টনাথস্য বসোর্বিলুম্পকাৎ ।
পরস্পরং ঘ্নন্তি শপন্তি বৃঞ্জতে
পশূন্ স্ত্রিয়োঽর্থান্ পুরুদস্যবো জনাঃ ॥ ৪৪ ॥

তৎ—সেই কারণে; **অদ্য**—আজ থেকে; **নঃ**—আমাদের; **পাপম্**—পাপের ফল; **উপৈতি**—অধিকার করবে; **অনন্বয়ম্**—সঙ্কট; **যৎ**—যেহেতু; **নষ্ট**—বিনষ্ট; **নাথস্য**—রাজার; **বসোঃ**—সম্পত্তির; **বিলুম্পকাৎ**—রহিত হওয়ার ফলে; **পরস্পরম্**—একে অপরকে; **ঘ্নন্তি**—হত্যা করবে; **শপন্তি**—হানি সাধন করবে; **বৃঞ্জতে**—অপহরণ করবে; **পশূন্**—পশুদের; **স্ত্রিয়ঃ**—স্ত্রীলোকদের; **অর্থান্**—ধন-সম্পত্তি; **পুরু**—অধিক; **দস্যবঃ**—দস্যুরা; **জনাঃ**—জনসাধারণ।

অনুবাদ

রাজতন্ত্রের সমাপ্তির ফলে এবং দস্যু এবং দুর্বৃত্ত কর্তৃক জনসাধারণের সম্পত্তি লুণ্ঠিত হওয়ার ফলে ভয়ঙ্কর সামাজিক সঙ্কট দেখা দেবে। মানুষ পরস্পরকে বিনাশ করবে এবং পশু, স্ত্রী ও ধন অপহরণ করবে। আর এই সমস্ত পাপের জন্য আমরা দায়ী হব।

তাৎপর্য

এই শ্লোকে নঃ (আমরা) শব্দটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। শমীক ঋষি রাজতন্ত্রের বিনাশ সাধনের জন্য এবং জনসাধারণ এবং রাষ্ট্রে ধন অপহরণকারী তথাকথিত প্রজাতান্ত্রিকদের নেতৃত্বের আসন অধিকার করার সুযোগ দেওয়ার জন্য সমগ্র ব্রাহ্মণ সমাজকে যথাযথভাবে দায়ী করেছেন। তথাকথিত গণতন্ত্রবাদীরা জনসাধারণের সমৃদ্ধি এবং সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য বিধানের দায়িত্ব গ্রহণ না করে নেতৃত্বের পদ অধিকার করে। সকলেই এই পদ অধিকার করে তাদের ব্যক্তিগত স্বার্থে এবং তার ফলে একজন রাজার পরিবর্তে বহু দায়িত্বহীন শাসক উৎপন্ন হয় জনসাধারণকে শোষণ করার জন্য। ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছে যে, রাজতন্ত্রের অনুপস্থিতিতে মানুষ পরস্পরের ধন-সম্পদ, পশু, স্ত্রী ইত্যাদি অপহরণ করতে শুরু করবে এবং তার ফলে সর্বত্রই প্রচণ্ড বিশৃঙ্খলা দেখা দেবে।

শ্লোক ৪৫

তদার্যধর্মঃ প্রবিলীয়তে নৃণাং
বর্ণাশ্রমাচারযুতস্ত্রয়ীময়ঃ ।
ততোঽর্থকামাভিনিবেশিতাত্মনাং
শুনাং কপীনামিব বর্ণসঙ্করঃ ॥ ৪৫ ॥

তদা—তখন; **আর্য**—প্রগতিশীল সভ্যতা; **ধর্মঃ**—ধর্ম; **প্রবিলীয়তে**—পরিকল্পিতভাবে ক্ষয়প্রাপ্ত হবে; **নৃণাম্**—মানুষদের; **বর্ণ**—বর্ণ; **আশ্রম**—আশ্রম; **আচার-যুতঃ**—শিষ্টাচারের দ্বারা গঠিত; **ত্রয়ীময়ঃ**—বৈদিক নির্দেশ অনুসারে; **ততঃ**—তারপর; **অর্থ**—অর্থনৈতিক উন্নতি; **কাম-অভিনিবেশিত**—ইন্দ্রিয় তৃপ্তি সাধনে সম্পূর্ণ মগ্ন; **আত্মনাম্**—মানুষদের; **শুনাম্**—কুকুরদের মতো; **ইব**—এইভাবে; **বর্ণসঙ্করঃ**—অবাঞ্ছিত সন্তান-সন্ততি।

অনুবাদ

তখন মানুষ বেদ বিহিত বর্ণাশ্রম ব্যবস্থার প্রগতিশীল সভ্যতা থেকে বিচ্যুত হবে। তার ফলে তারা কেবল অর্থনৈতিক উন্নতি এবং ইন্দ্রিয়তৃপ্তি সাধনের চেষ্টাতেই মগ্ন থাকবে, এবং তার ফলে বর্ণসঙ্করের সৃষ্টি হবে এবং তারা কুকুর এবং বানরের মতো সন্তানসন্ততি উৎপাদন করবে।

তাৎপর্য

এখানে ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছে যে, রাজতন্ত্রের অনুপস্থিতিতে জনসাধারণ কুকুর এবং বানরের মতো অবাঞ্ছিত প্রজায় পর্যবসিত হবে। বানর যেমন অত্যন্ত কামুক এবং কুকুর যেমন সম্ভোগের ব্যাপারে একেবারে নির্লজ্জ, বর্ণসঙ্করের ফলে উৎপন্ন মানুষেরা বৈদিক সদাচার বিমুখ হয়ে এবং বর্ণাশ্রম ধর্ম থেকে ভ্রষ্ট হয়ে, বানর এবং কুকুরের মতো কামুক ও নির্লজ্জ হয়ে উঠবে।

বৈদিক জীবনধারা আর্যদের প্রগতিশীল সভ্যতা। বৈদিক সভ্যতায় আর্যরা প্রগতিশীল। বৈদিক সভ্যতার চরম লক্ষ্য হচ্ছে প্রকৃত আলয় ভগবদ্ধামে ফিরে যাওয়া যেখানে জন্ম নেই, মৃত্যু নেই, জরা নেই এবং ব্যাধি নেই। বৈদিক সভ্যতা সকলকে নির্দেশ দিচ্ছে জড় জগতের অজ্ঞানতার অন্ধকারে আচ্ছন্ন না থেকে জ্যোতির্ময় চিজ্জগতে ফিরে যাওয়ার জন্য।

ভগবান এবং তাঁর প্রতিনিধি মহান ঋষিরা গুণ এবং কর্মের ভিত্তিতে অত্যন্ত বিজ্ঞানসম্মতভাবে বর্ণাশ্রম ধর্ম সৃষ্টি করেছেন। এই সর্বাঙ্গসুন্দর সমাজ ব্যবস্থা জাগতিক এবং পারমার্থিক উভয় বিষয়েই সর্বপ্রকার উপদেশ প্রদান করে। বৈদিক সমাজ ব্যবস্থায় কোন মানুষকে বানর অথবা কুকুরের মতো আচরণ করতে দেওয়া হয় না। ইন্দ্রিয় তৃপ্তিসাধন এবং অর্থনৈতিক উন্নতিসাধন ভিত্তিক অধঃপতিত সভ্যতা হচ্ছে জনসাধারণের উদ্দেশ্যে, জনসাধারণের জন্য, জনসাধারণের দ্বারা গঠিত ভগবদ্ বিহীন অথবা রাজা বিহীন শাসন ব্যবস্থার পরিণতি। তাই আজকের মানুষেরা নিজেরাই ভোট দিয়ে যে অতি জঘন্য শাসন ব্যবস্থার সৃষ্টি করেছে, তার প্রতি তাদের ক্ষুব্ধ হওয়া উচিত নয়।

শ্লোক ৪৬

ধর্মপালো নরপতিঃ স তু সম্রাড়্‌বৃহচ্ছ্রবাঃ ।
সাক্ষান্মহাভাগবতো রাজর্ষির্হয়মেধযাট্ ।
ক্ষুত্তৃট্‌শ্রমযুতো দীনো নৈবাস্মচ্ছাপমর্হতি ॥ ৪৬ ॥

ধর্মপালঃ—ধর্মের রক্ষক; **নরপতিঃ**—রাজা; **সঃ**—তিনি; **তু**—কিন্তু; **সম্রাট**—সম্রাট; **বৃহৎ**—প্রধান; **শ্রবাঃ**—যশস্বী; **সাক্ষাৎ**—প্রত্যক্ষরূপে; **মহাভাগবতঃ**—অতি উচ্চস্তরের ভগবদ্ভক্ত; **রাজর্ষি**—ঋষিসদৃশ রাজা; **হয়মেধযাৎ**—অশ্বমেধ যজ্ঞকারী; **ক্ষুৎ**—ক্ষুধা; **তৃৎ**—তৃষ্ণা; **শ্রমযুতঃ**—পরিশ্রান্ত হয়ে; **দীনঃ**—কাতর; **ন**—কখনই না; **এব**—এইভাবে; **অস্মাৎ**—আমাদের দ্বারা; **শাপম্**—অভিশাপ; **অর্হতি**—যোগ্য।

অনুবাদ

ধর্মরক্ষক, মহাযশস্বী, পরম ভাগবত, অশ্বমেধ যজ্ঞকারী রাজর্ষি ক্ষুধা, তৃষ্ণা ও পরিশ্রমে কাতর হয়ে বিপন্নভাবে আমাদের কাছে আগত সেই পরীক্ষিৎ মহারাজ কোন মতেই আমাদের অভিশাপের পাত্র নন।

তাৎপর্য

রাজপদে অধিষ্ঠিত ব্যক্তির সাধারণ আচার সম্বন্ধে ব্যাখ্যা করে এবং রাজা যে কখনো কোন অন্যায় করতে পারেন না এবং সেজন্য তাঁকে কখনো অভিসম্পাত করা উচিত নয়, সে কথা বিশ্লেষণ করার পর শমীক ঋষি পরীক্ষিৎ মহারাজ সম্বন্ধে বিশেষভাবে কিছু বলতে চেয়েছেন। পরীক্ষিৎ মহারাজের বিশেষ গুণাবলী এখানে সংক্ষেপে বর্ণিত হয়েছে।

যদি মহারাজ পরীক্ষিতকে কেবল একজন রাজারূপে গণ্য করা হয়, তা হলে তিনি ছিলেন মহা যশস্বী একজন শাসক, যিনি ধর্মের নিয়ম অনুসারে রাজ্য শাসন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। সমাজের সমস্ত বর্ণ এবং আশ্রমের কর্তব্য সম্বন্ধে শাস্ত্রে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। *শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় (১৮/৪৩)* বর্ণিত ক্ষত্রিয়ের সমস্ত গুণগুলি পরীক্ষিৎ মহারাজের মধ্যে বর্তমান ছিল। তদুপরি তিনি ছিলেন একজন মহান ভগবদ্ভক্ত এবং স্বরূপসিদ্ধ মহাপুরুষ। ক্ষুধা, তৃষ্ণা এবং পরিশ্রমে কাতর হয়ে রাজা যখন তাদের কাছে এসেছিলেন, তখন তাঁকে অভিশাপ দেওয়া কোনমতেই সমীচীন হয়নি।

এভাবে শমীক ঋষি স্বীকার করেছিলেন যে, পরীক্ষিৎ মহারাজকে অভিশাপ দেওয়া সর্বতোভাবে অন্যায় হয়েছিল। যদিও সমস্ত ব্রাহ্মণেরা সেই ঘটনার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন না, তথাপি সেই ব্রাহ্মণবালকের অপরিণত আচরণের ফলে সারা পৃথিবীর অবস্থার পরিবর্তন হয়েছিল। এইভাবে শমীক ঋষি, একজন ব্রাহ্মণ, পৃথিবীর অবস্থার অধঃপতনের সমস্ত দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলেন।

শ্লোক ৪৭

অপাপেষু স্বভৃত্যেষু বালেনাপক্কবুদ্ধিনা ।
পাপং কৃতং তদ্ভগবান্ সর্বাত্মা ক্ষন্তুমর্হতি ॥ ৪৭ ॥

অপাপেষু—যিনি সমস্ত পাপ থেকে সর্বতোভাবে মুক্ত; **স্বভৃত্যেষু**—যে ব্যক্তি অধীন এবং যাকে রক্ষা করা উচিত; **বালেন**—বালকের দ্বারা; **অপক্ক**—অপরিণত;

বুদ্ধিনা—বুদ্ধির দ্বারা; **পাপম্**—পাপ কর্ম; **কৃতম্**—করা হয়েছে; **তদ্ভগবান**—তাই পরমেশ্বর ভগবান; **সর্বাত্মা**—যিনি সর্বব্যাপ্ত; **ক্ষন্তুম্**—ক্ষমা করার; **অর্হতি**—যোগ্য।

অনুবাদ

তখন সেই ঋষি, সর্বব্যাপ্ত পরমেশ্বর ভগবানের কাছে প্রার্থনা করলেন তিনি যেন তাঁর বুদ্ধিহীন অপরিণত বালকপুত্রকে ক্ষমা করেন, যে সমস্ত পাপ থেকে মুক্ত তাঁর মহান ভক্তকে অভিশাপ দিয়ে মহা অপরাধ করেছে।

তাৎপর্য

প্রত্যেক ব্যক্তি তার পুণ্য অথবা পাপ কর্মের জন্য দায়ী। শমীক ঋষি বুঝতে পেরেছিলেন যে, তাঁর পুত্র মহারাজ পরীক্ষিতকে অভিশাপ দিয়ে এক মহাপাপ করেছে, কেননা মহারাজ পরীক্ষিৎ ছিলেন একজন পুণ্যবান রাজা এবং ভগবানের একজন মহান ভক্ত হওয়ার ফলে তিনি সমস্ত পাপ থেকে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত ছিলেন, অতএব ব্রাহ্মণদের তাঁকে রক্ষা করাই কর্তব্য ছিল।

ভগবদ্ভক্তের প্রতি কোনও অপরাধ করা হলে তার থেকে উদ্ধার পাওয়া অত্যন্ত কঠিন। সমাজের নেতারূপে ব্রাহ্মণদের কর্তব্য হচ্ছে আশ্রিতদের রক্ষা করা, অভিশাপ দেওয়া নয়। কখনো কখনো ব্রাহ্মণদের তাঁদের অধীনস্থ ক্ষত্রিয়-বৈশ্যদের প্রতি উগ্র শাপ দিতে দেখা যায়, কিন্তু মহারাজ পরীক্ষিতের ক্ষেত্রে সে রকম শাপ দেওয়ার কোনও ভিত্তি ছিল না, যে কথা পূর্বেই বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

সেই মূর্খ বালকটি কেবল ব্রাহ্মণের পুত্র হওয়ার গর্বে গর্বিত হয়ে তা করেছিল, এবং তার ফলে সে ভগবানের আইন অনুসারে দণ্ডনীয় হয়েছিল। ভগবানের শুদ্ধ ভক্তের চরণে যদি কেউ অপরাধ করে, তা হলে ভগবান তাকে কখনোই ক্ষমা করেন না।

তাই, মহারাজ পরীক্ষিতকে অভিশাপ দিয়ে সেই মূর্খ শৃঙ্গী কেবল এক মহা পাপই করেনি, এক মহা অপরাধও করেছিল। তাই শমীক ঋষি বুঝতে পেরেছিলেন যে, কেবল পরমেশ্বর ভগবানই তাঁর পুত্রকে সেই মহা পাপ থেকে রক্ষা করতে পারেন। তাই তিনি পরমেশ্বর ভগবানের কাছে ক্ষমা ভিক্ষা করে প্রার্থনা করেছিলেন, কেননা তিনি অপরিবর্তনীয় কর্মফল থেকে জীবকে উদ্ধার করতে পারেন। এই আবেদনটি করা হয়েছিল সেই মূর্খ বালকের নামে যার বুদ্ধিমত্তা ছিল সম্পূর্ণ অপরিণত।

এখানে প্রশ্ন হতে পারে যে, ভগবানের ইচ্ছানুক্রমেই যখন পরীক্ষিৎ মহারাজ সেই কঠিন অবস্থার সম্মুখীন হয়েছিলেন যাতে তিনি জড় জগতের বন্ধন থেকে মুক্ত হতে পারেন, তা হলে কেন সেই ব্রাহ্মণবালককে তার অপরাধজনক কর্মের জন্য দায়ী করা হচ্ছে? তার উত্তর হচ্ছে যে, যে অপরাধটি শুধু একটি বালকের দ্বারা ঘটেছিল, যাতে সে অনায়াসে ক্ষমা লাভ করতে পারে, এবং তাই তার পিতার প্রার্থনা ভগবান শুনেছিলেন। কিন্তু যদি প্রশ্ন হয়, কলিকে এই পৃথিবীতে প্রবেশ করতে দেওয়ার জন্য সমস্ত ব্রাহ্মণ-সমাজকে কেন দায়ী করা হচ্ছে, তার উত্তর বরাহ পুরাণে দেওয়া হয়েছে—যে সমস্ত অসুরেরা পরমেশ্বর ভগবানের প্রতি শত্রুতা করেছিল কিন্তু ভগবানের দ্বারা নিহত হয়নি; তারা যেন কলিযুগের সুযোগ গ্রহণ করতে পারে সেজন্য তাদের ব্রাহ্মণ পরিবারে জন্মগ্রহণ করতে দেওয়া হয়েছিল। পরম করুণাময় ভগবান তাদের পুণ্যবান ব্রাহ্মণ পরিবারে জন্মগ্রহণ করার সুযোগ দিয়েছিলেন যাতে তারা মুক্তির পথে অগ্রসর হতে পারে। কিন্তু অসুরেরা সেই সুযোগের সদ্ব্যবহার না করে ব্রাহ্মণ হওয়ার গর্বে গর্বিত হয়ে ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির অপব্যবহার করেছিল। তার একটি জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত হচ্ছে শমীক ঋষির পুত্র।

সমস্ত মূর্খ ব্রাহ্মণ-সন্তানদের এখানে সাবধান করে দেওয়া হচ্ছে যাতে তারা তাদের পূর্ব জন্মকৃত আসুরিক বৃত্তিগুলি দমন করে রাখার জন্য সর্বদা সচেষ্ট হন এবং মূর্খ শৃঙ্গীর মতো আচরণ না করেন। সেই মূর্খ বালকটিকে অবশ্য ভগবান ক্ষমা করেছিলেন, কিন্তু অন্যদের, যাদের পিতা শমীক ঋষির মতো নন, তাঁরা যদি ব্রাহ্মণ পরিবারে জন্ম হওয়ার সুযোগের অপব্যবহার করেন, তা হলে তাঁদের ভয়ঙ্কর কষ্ট ভোগ করতে হবে।

শ্লোক ৪৮

তিরস্কৃতা বিপ্রলব্ধাঃ শপ্তাঃ ক্ষিপ্তা হতা অপি ।
নাস্য তৎ প্রতিকুর্বন্তি তদ্ভক্তাঃ প্রভবোঽপি হি ॥ ৪৮ ॥

তিরস্কৃতাঃ—অপমানিত হয়ে; **বিপ্রলব্ধাঃ**—প্রতারিত হয়ে; **শপ্তাঃ**—অভিশপ্ত হয়ে; **ক্ষিপ্তাঃ**—উপেক্ষার ফলে বিচলিত হয়ে; **হতাঃ**—হত হওয়ার ফলে; **অপি**—ও; **ন**—কখনোই না; **অস্য**—সমস্ত কার্যের জন্য; **তৎ**—তাদের; **প্রতিকুর্বন্তি**—প্রতিকার করা; **তৎ**—ভগবানের; **ভক্তাঃ**—ভক্তগণ; **প্রভবঃ**—শক্তিশালী; **অপি**—যদিও; **হি**—নিশ্চিতভাবে।

অনুবাদ

ভগবানের ভক্ত এতই সহিষ্ণু যে, যদি তাঁরা অপমানিত, প্রতারিত, অভিশপ্ত, বিচলিত, উপেক্ষিত, এমন কি নিহতও হন, তা হলেও তাঁরা কখনো প্রতিশোধ নেওয়ার কথা ভাবেন না।

তাৎপর্য

শমীক ঋষি জানতেন যে, ভগবান তাঁর ভক্তের চরণে অপরাধী ব্যক্তিদের কখনো ক্ষমা করেন না। ভগবান কেবল তাঁর ভক্তের চরণাশ্রয় গ্রহণ করার নির্দেশ দিতে পারেন। তিনি মনে মনে ভেবেছিলেন যে, মহারাজ পরীক্ষিৎ যদি তাঁর পুত্রকে প্রতিঅভিশাপ দেন, তা হলে তাঁকে রক্ষা করা কোন মতেই সম্ভব হবে না। কিন্তু তিনি এও জানতেন যে, একজন শুদ্ধভক্ত এই প্রকার প্রতিশোধ নেওয়ার ব্যাপারে সম্পূর্ণ উদাসীন। ভগবদ্ভক্ত কখনো ব্যক্তিগত অপমান, অভিশাপ, উপেক্ষা ইত্যাদির প্রতিশোধ নিতে চান না। এই সমস্ত ব্যক্তিগত ব্যাপারে ভগবদ্ভক্তেরা সম্পূর্ণরূপে নিস্পৃহ।

কিন্তু যদি ভগবান অথবা ভগবানের ভক্তের বিরুদ্ধে সেরকম কোনও আচরণ করা হয়, তখন ভগবদ্ভক্ত অত্যন্ত কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বন করেন। মহারাজ পরীক্ষিতের কাছে সেটি ছিল একটি ব্যক্তিগত ব্যাপার, এবং তাই শমীক ঋষি জানতেন যে, তিনি তাঁর প্রতিকার করার কোন রকম চেষ্টা করবেন না। তাই সেই অপরিণত বালকের হয়ে ভগবানের কাছে আবেদন করা ছাড়া আর কোনও গত্যন্তর ছিল না।

এমন নয় যে, কেবল ব্রাহ্মণেরাই তাঁদের অধস্তনদের অভিশাপ অথবা আশীর্বাদ দিতে পারেন; ভগবদ্ভক্তেরা ব্রাহ্মণ না হলেও ব্রাহ্মণদের থেকে অধিক শক্তিসম্পন্ন। কিন্তু এই প্রকার শক্তিশালী ভক্তরা কখনো তাঁদের ব্যক্তিগত লাভের জন্য তাঁদের সেই শক্তির অপচয় করেন না। ভগবদ্ভক্ত তাঁর সমস্ত শক্তি সর্বদা ভগবানের সেবায় এবং তাঁর ভক্তের সেবায় ব্যবহার করেন।

শ্লোক ৪৯

ইতি পুত্রকৃতাঘেন সোঽনুতপ্তো মহামুনিঃ ।
স্বয়ং বিপ্রকৃতো রাজ্ঞা নৈবাঘং তদচিন্তয়ৎ ॥ ৪৯ ॥

ইতি—এইভাবে; পুত্র—পুত্র; কৃত—কৃত; অঘেন—পাপের দ্বারা; সঃ—তিনি (সেই মুনি); অনুতপ্তঃ—অনুতপ্ত হয়ে; মহা-মুনিঃ—মহর্ষি; স্বয়ম্—ব্যক্তিগতভাবে; বিপ্রকৃতঃ—এইভাবে অপমানিত হয়ে; রাজ্ঞা—রাজা কর্তৃক; ন—না; এব—নিশ্চিতভাবে; অঘম্—পাপ; তৎ—তা; অচিন্তয়ৎ—ভেবেছিলেন।

অনুবাদ

সেই মুনিশ্রেষ্ঠ শমীক তাঁর পুত্রের অপরাধ চিন্তা করে এইভাবে অনুতাপ করতে লাগলেন, কিন্তু তিনি নিজে যে রাজার দ্বারা অপমানিত হয়েছিলেন সেই অপরাধের কথা একবারও চিন্তা করলেন না।

তাৎপর্য

এই সম্পূর্ণ ঘটনাটি এখন স্পষ্ট হয়ে গেল। মহারাজ পরীক্ষিৎ যে শমীক ঋষির গলায় একটি মৃত সাপ মালার মতো পরিয়ে দিয়েছিলেন, সেটি খুব একটা বড় অপরাধ ছিল না, কিন্তু রাজার প্রতি শৃঙ্গীর অভিশাপ ছিল একটি মস্ত বড় অপরাধ। সেই অপরাধটি করেছিল একটি মূর্খ বালক; তাই সে ছিল ভগবানের কাছে ক্ষমার্হ, যদিও এই প্রকার বৈষ্ণব অপরাধ থেকে মুক্ত হওয়া প্রায় অসম্ভব।

মহারাজ পরীক্ষিতও সেই মূর্খ ব্রাহ্মণের অভিশাপে কিছু মনে করেননি। পক্ষান্তরে, তিনি সেই কঠিন অবস্থার পূর্ণ সদ্ব্যবহার করেছিলেন, এবং ভগবানের ইচ্ছা অনুসারে শ্রীল শুকদেব গোস্বামীর কৃপায় জীবনের পরম সাফল্য অর্জন করেছিলেন। প্রকৃতপক্ষে, সেটি ছিল ভগবানেরই ইচ্ছা, এবং মহারাজ পরীক্ষিৎ, শমীক ঋষি এবং তাঁর পুত্র শৃঙ্গী, এঁরা সকলেই ছিলেন ভগবানের সেই ইচ্ছাকে ফলপ্রসূ করার নিমিত্ত মাত্র। তাই তাঁদের কাউকেই কোন রকম অসুবিধা ভোগ করতে হয়নি, কেননা সব কিছুই সম্পাদিত হয়েছিল পরমেশ্বর ভগবানকে কেন্দ্র করে।

শ্লোক ৫০

প্রায়শঃ সাধবো লোকে পরৈর্দ্বন্দ্বেষু যোজিতাঃ ।
ন ব্যথন্তি ন হৃষ্যন্তি যত আত্মাঽগুণাশ্রয়ঃ ॥ ৫০ ॥

প্রায়শঃ—সাধারণত; সাধবঃ—সাধুরা; লোকে—এই পৃথিবীতে; পরৈঃ—অন্যের দ্বারা; দ্বন্দ্বেষু—দ্বন্দ্বে; যোজিতাঃ—যুক্ত হয়ে; ন—কখনোই না; ব্যথন্তি—দুঃখিত হন; ন—না; হৃষ্যন্তি—তুষ্ট হন; যতঃ—যেহেতু; আত্মা—আত্মা; অগুণ-আশ্রয়ঃ—গুণাতীত।

অনুবাদ

সংসারে প্রায়ই সাধুরা অন্য কর্তৃক সুখ-দুঃখ প্রাপ্ত হলেও তাতে বিহ্বল হন না, কেননা তাঁরা সুখ-দুঃখ আদি গুণে অনাসক্ত।

তাৎপর্য

পরমার্থবাদীরা জ্ঞানী, যোগী এবং ভগবদ্ভক্ত। জ্ঞানীদের উদ্দেশ্য হচ্ছে সিদ্ধিলাভ করে ব্রহ্মে লীন হয়ে যাওয়া, যোগীদের উদ্দেশ্য হচ্ছে অন্তর্যামী পরমাত্মাকে দর্শন করা, এবং ভগবদ্ভক্তদের উদ্দেশ্য হচ্ছে ভগবানের প্রেমময়ী সেবায় যুক্ত হওয়া। যেহেতু ব্রহ্ম, পরমাত্মা এবং ভগবান এক এবং অদ্বিতীয় চিন্ময় তত্ত্বের বিভিন্ন প্রকাশ, তাই পরমার্থবাদীরা জড়া প্রকৃতির তিনটি গুণের অতীত। জড় সুখ-দুঃখ প্রকৃতির গুণজাত, এবং তাই প্রকৃতির সুখ এবং দুঃখের কারণ সম্বন্ধে পরমার্থবাদীরা কখনোই কোন রকম গুরুত্ব দেন না।

মহারাজ পরীক্ষিৎ ছিলেন একজন ভগবদ্ভক্ত, এবং শমীক ঋষি ছিলেন একজন যোগী। তাই তাঁরা উভয়েই ভগবানের ইচ্ছার প্রভাবে সম্পাদিত সেই আকস্মিক ঘটনার প্রতি সম্পূর্ণ উদাসীন। আর সেই ক্রীড়ারত শিশুটি ছিল ভগবানের ইচ্ছা ফলপ্রসূ করার একটি নিমিত্তমাত্র।

ইতি *"মহারাজ পরীক্ষিৎ ব্রাহ্মণবালকের দ্বারা অভিশপ্ত"* নামক শ্রীমদ্ভাগবতের অষ্টাদশ অধ্যায়ের শ্রীল ভক্তিবেদান্ত তাৎপর্য।

ঊনবিংশতি অধ্যায়

শুকদেব গোস্বামীর আবির্ভাব

শ্লোক ১

সূত উবাচ
মহীপতিস্ত্বথ তৎ কর্ম গর্হ্যং
বিচিন্তয়ন্নাত্মকৃতং সুদুর্মনাঃ ।
অহো ময়া নীচমনার্যবৎকৃতং
নিরাগসি ব্রহ্মণি গূঢ়তেজসি ॥ ১ ॥

সূতঃ উবাচ—সূত গোস্বামী বললেন; **মহী-পতিঃ**—রাজা; **তু**—কিন্তু; **অথ**—তারপর (গৃহে ফিরে আসার সময়); **তৎ**—তা; **কর্ম**—কার্য; **গর্হ্যম্**—নিন্দনীয়; **বিচিন্তয়ন্**—এইভাবে চিন্তা করে; **আত্ম-কৃতম্**—স্বকৃত; **সু-দুর্মনাঃ**—অত্যন্ত ব্যথাতুর চিত্তে; **অহো**—হায়; **ময়া**—আমার দ্বারা; **নীচম্**—জঘন্য; **অনার্য**—অসভ্য; **বৎ**—সদৃশ; **কৃতম্**—করা হয়েছে; **নিরাগসি**—নির্দোষ; **ব্রহ্মণি**—ব্রাহ্মণকে; **গূঢ়**—গম্ভীর, **তেজসি**—তেজস্বী।

অনুবাদ

শ্রীসূত গোস্বামী বললেন—রাজা (মহারাজ পরীক্ষিৎ) গৃহে প্রত্যাবর্তন করার সময় ভাবতে লাগলেন যে, তিনি একজন নির্দোষ এবং তেজস্বী ব্রাহ্মণের প্রতি অত্যন্ত জঘন্য এবং অশিষ্ট আচরণ করেছেন। তার ফলে তিনি অন্তরে অত্যন্ত ব্যথিত হয়েছিলেন।

তাৎপর্য

পুণ্যবান রাজা নির্দোষ এবং তেজস্বী ব্রাহ্মণের প্রতি তাঁর আকস্মিক অভদ্র আচরণের জন্য অনুশোচনা করেছিলেন। মহারাজ পরীক্ষিতের মতো উত্তম ব্যক্তির পক্ষে এই প্রকার অনুশোচনা স্বাভাবিক। এই প্রকার অনুশোচনা ভগবদ্ভক্তকে সব রকম

আকস্মিক পাপ থেকে উদ্ধার করে। ভক্তরা স্বভাবতই নিষ্পাপ। যদি আকস্মিকভাবে কোন পাপ হয়ে যায়, তা হলে ভক্ত তার জন্য ঐকান্তিকভাবে অনুতাপ করেন, এবং ভগবানের কৃপায় তাঁদের অনিচ্ছাকৃত সমস্ত পাপ অনুশোচনার আগুনে দগ্ধ হয়ে য

শ্লোক ২

ধ্রুবং ততো মে কৃতদেবহেলনাদ্
দুরত্যয়ং ব্যসনং নাতিদীর্ঘাৎ।
তদস্তু কামং হ্যঘনিষ্কৃতায় মে
যথা ন কুর্যাং পুনরেবমদ্ধা ॥ ২ ॥

ধ্রুবম্—নিশ্চিত; **ততঃ**—অতএব; **মে**—আমার; **কৃত-দেব-হেলনাৎ**—ভগবানের নির্দেশ অবমাননা করার ফলে; **দুরত্যয়ম্**—অত্যন্ত কঠিন; **ব্যসনম্**—বিপত্তি; **ন**—না; **অতি**—অত্যন্ত; **দীর্ঘাৎ**—দীর্ঘ; **তৎ**—তা; **অস্তু**—হোক; **কামম্**—নিরঙ্কুশ কামনা; **হি**—নিশ্চয়ই; **অঘ**—পাপ; **নিষ্কৃতায়**—নিষ্কৃতির জন্য; **মে**—আমার; **যথা**—যার ফলে; **ন**—কখনোই না; **কুর্যাম্**—করব; **পুনঃ**—পুনরায়; **এবম্**—এই প্রকার ; **অদ্ধা**—প্রত্যক্ষভাবে।

অনুবাদ

(মহারাজ পরীক্ষিৎ ভাবলেন—) ভগবানের আদেশ অবমাননা করার ফলে অদূর ভবিষ্যতে আমার অবশ্যই ভয়ঙ্কর বিপদ সমুপস্থিত হবে, সেই বিষয়ে কোন সংশয় নেই। সেই বিপদ শীঘ্রই উপস্থিত হোক, তা হলেই আমার পাপের উপযুক্ত প্রায়শ্চিত্ত হবে এবং পুনরায় আমি সেই প্রকার গর্হিত কর্মে প্রবৃত্ত হব না।

তাৎপর্য

ভগবান নির্দেশ দিয়েছেন যে, ব্রাহ্মণ এবং গাভীদের সর্বতোভাবে রক্ষা করা উচিত। ভগবান স্বয়ং ব্রাহ্মণ এবং গাভীদের কল্যাণ সাধনে অত্যন্ত আগ্রহী (*গো-ব্রাহ্মণ হিতায় চ*)। মহারাজ পরীক্ষিৎ সেই কথা ভালভাবেই জানতেন, এবং তাই তিনি বিচার করেছিলেন যে, একজন তেজস্বী ব্রাহ্মণকে অপমান করার ফলে ভগবানের নিয়মে তাঁকে অবশ্যই দণ্ড ভোগ করতে হবে, এবং তিনি আশঙ্কা করছিলেন যে,

অদূর ভবিষ্যতে তাঁকে কোন ঘোর সঙ্কটের সম্মুখীন হতে হবে। তাই তিনি চেয়েছিলেন যে, সেই অবশ্যম্ভাবী সঙ্কট যেন তাঁকেই ভোগ করতে হয়; তাঁর পরিবার-পরিজনদের যেন সেজন্য কোন দুঃখ ভোগ না করতে হয়।

মানুষের দুর্ব্যবহার তার পরিবারের সদস্যদেরও প্রভাবিত করে। তাই মহারাজ পরীক্ষিৎ চেয়েছিলেন যে, সেই বিপত্তি যেন একা তাঁর উপরেই আসে। স্বয়ং সেই কষ্ট ভোগ করার ফলে তিনি ভবিষ্যতে পাপ কর্ম থেকে বিরত হবেন, এবং যে পাপ তিনি করেছেন তারও প্রতিকার হয়ে যাবে, যার ফলে তাঁর বংশধরদের সেজন্য কোন কষ্ট ভোগ করতে হবে না।

কোন দায়িত্বশীল ভক্ত এইভাবেই চিন্তা করেন। ভক্তের পরিবারের সদস্যরাও ভগবানের প্রতি তাঁর সেবার ফল লাভ করেন। প্রহ্লাদ মহারাজ তাঁর ভগবদ্ভক্তির দ্বারা তাঁর অসুর পিতাকে রক্ষা করেছিলেন। পরিবারে ভক্তসন্তান হলে সেটি ভগবানের সর্বশ্রেষ্ঠ বর অথবা আশীর্বাদ।

শ্লোক ৩

অদ্যৈব রাজ্যং বলমৃদ্ধকোষং
প্রকোপিতব্রহ্মকুলানলো মে ।
দহত্বভদ্রস্য পুনর্ন মেঽভূৎ
পাপীয়সী ধীর্দ্বিজদেব গোভ্যঃ ॥ ৩ ॥

অদ্যৈব—আজই; **রাজ্যম্**—রাজ্য; **বলমৃদ্ধ**—বল এবং ধন-সম্পদ; **কোষম্**—রাজকোষ; **প্রকোপিত**—প্রজ্বলিত; **ব্রহ্ম-কুল**—ব্রাহ্মণ সমাজের দ্বারা; **অনলঃ**—অগ্নি; **মে**—আমাকে; **দহতু**—দহন করুক; **অভদ্রস্য**—অসভ্য; **পুনঃ**—পুনরায়; **ন**—না; **মে**—আমাকে; **অভূৎ**—হোক; **পাপীয়সী**—পাপপূর্ণ; **ধীঃ**—বুদ্ধি; **দ্বিজ**—ব্রাহ্মণ; **দেব**—পরমেশ্বর ভগবান; **গোভ্যঃ**—গাভীগণ।

অনুবাদ

ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতি, ভগবৎ চেতনা এবং গো-রক্ষায় অবহেলা করার ফলে আমি অত্যন্ত অসভ্য এবং পাপী। তাই আমি চাই যে, আমার রাজ্য, পরাক্রম এবং ধন-সম্পদ ব্রাহ্মণের ক্রোধাগ্নিতে এক্ষণি ভস্ম হয়ে যাক্, যাতে আমি ভবিষ্যতে এই প্রকার অমঙ্গলজনক মনোভাবের দ্বারা কখনো প্রভাবিত না হতে পারি।

তাৎপর্য

প্রগতিশীল মানব-সভ্যতা ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতি, ভগবৎ চেতনা এবং গো-রক্ষার ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত। ব্যবসা, বাণিজ্য, কৃষি এবং শিল্প-উদ্যোগ আদি রাষ্ট্রের সব রকম অর্থনৈতিক উন্নতি যেন অবশ্যই উপরোক্ত উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হয়, তা না হলে তথাকথিত সমস্ত অর্থনৈতিক উন্নতি অধঃপতনের কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

গো-রক্ষার অর্থ হচ্ছে ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির পুষ্টি সাধন করা, যার ফলে ভগবৎ চেতনার উন্মেষ হয় এবং মানব সমাজের সর্বাঙ্গীণ সাফল্য সাধিত হয়। কলিযুগের লক্ষ্য হচ্ছে জীবনের উচ্চ আদর্শগুলি বিনষ্ট করা, এবং মহারাজ পরীক্ষিৎ যদিও প্রবলভাবে কলিকে এই পৃথিবীর উপর তার প্রভাব বিস্তার করা থেকে নিরস্ত করেছিলেন, কিন্তু উপযুক্ত সময়ে কলির প্রভাব প্রকট হয়েছিল, যার ফলে মহারাজ পরীক্ষিতের মতো একজন মহানুভব রাজাও সামান্য ক্ষুধা ও তৃষ্ণায় উত্তেজিত হয়ে ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির অবমাননা করেছিলেন। মহারাজ পরীক্ষিৎ সেই আকস্মিক ঘটনার জন্য অনুতপ্ত হয়েছিলেন, এবং তিনি চেয়েছিলেন যে, ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির পৃষ্ঠপোষকতায় যুক্ত না হওয়ার ফলে তাঁর রাজ্য, ঐশ্বর্য এবং পরাক্রম যেন ব্রহ্মতেজে দগ্ধ হয়ে যায়।

ঐশ্বর্য এবং শক্তি যদি ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতি, ভগবৎ চেতনা এবং গো-রক্ষার জন্য ব্যবহৃত না হয়, তা হলে গৃহ এবং রাজ্য অবশ্যই বিধির বিধানে নষ্ট হয়ে যায়। আমরা যদি পৃথিবীতে শান্তি এবং সমৃদ্ধি চাই, তা হলে আমাদের এই শ্লোকটি থেকে শিক্ষা লাভ করতে হবে।

প্রতিটি রাষ্ট্র এবং গৃহকে আত্মশুদ্ধির উদ্দেশ্যে ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির প্রসার, আত্মোপলব্ধির জন্য ভগবৎ চেতনার প্রচার এবং এক যথার্থ সভ্যতাকে টিকিয়ে রাখার জন্য যথেষ্ট পরিমাণে দুধ ও উত্তম আহার্য লাভের উদ্দেশ্যে গো-সংরক্ষণের প্রচেষ্টা অবশ্যই করতে হবে।

শ্লোক ৪

স চিন্তয়ন্নিত্থমথাশৃণোদ্ যথা
মুনেঃ সুতোক্তো নির্ঋতিস্তক্ষকাখ্যঃ।
স সাধু মেনে ন চিরেণ তক্ষকা-
নলং প্রসক্তস্য বিরক্তিকারণম্ ॥ ৪ ॥

সঃ—তিনি, রাজা; চিন্তয়ন্—চিন্তা করেছিলেন; ইত্থম্—এইভাবে; অথ—এখন; অশৃণোৎ—শ্রবণ করেছিলেন; যথা—যেমন; মুনে—ঋষির; সুত—পুত্র; উক্তঃ—উচ্চারিত; নির্ঋতিঃ—মৃত্যু; তক্ষকাখ্যঃ—তক্ষক সর্পের বিষয়ে; সঃ—তিনি (রাজা); সাধু—শুভ এবং ভাল; মেনে—স্বীকার করেছিলেন; ন—না; চিরেণ—দীর্ঘকাল পর্যন্ত; তক্ষক—তক্ষক সর্প; অনলম্—অগ্নি; প্রসক্তস্য—অত্যন্ত আসক্ত; বিরক্তি—নির্লিপ্ততা; কারণম্—কারণ।

অনুবাদ

রাজা যখন এইভাবে অনুশোচনা করছিলেন, তখন তিনি সংবাদ পেলেন যে, ঋষিপুত্রের অভিশাপের ফলে তক্ষকের দংশনে অচিরেই তাঁর মৃত্যু হবে। রাজা সেই সংবাদটি শুভ সমাচার বলে মনে করেছিলেন, কারণ তার ফলে জাগতিক বিষয়ের প্রতি তাঁর বৈরাগ্য উৎপন্ন হবে।

তাৎপর্য

প্রকৃত সুখ লাভ হয় পারমার্থিক স্তরে উন্নীত হওয়ার ফলে অথবা জন্ম-মৃত্যুর আবর্ত থেকে মুক্ত হওয়ার ফলে। ভগবদ্ধামে ফিরে যাওয়ার ফলেই কেবল জন্ম-মৃত্যুর আবর্তন বন্ধ করা যায়। এই জড় জগতের সর্বোচ্চ লোক (ব্রহ্মলোক) প্রাপ্ত হওয়া সত্ত্বেও জন্ম-মৃত্যুর চক্র থেকে উদ্ধার পাওয়া যায় না। কিন্তু তা সত্ত্বেও জীব সিদ্ধিলাভের পন্থা অবলম্বন করতে চায় না। এই সিদ্ধির পথ মানুষকে সমস্ত জড় আসক্তি থেকে মুক্ত করে, এবং এইভাবে কোন ব্যক্তি ভগবদ্ধামে ফিরে যাওয়ার যোগ্যতা অর্জন করে। তাই, এই জড় জগতে যারা দারিদ্র্যগ্রস্ত, তারা সমৃদ্ধিশালী ব্যক্তিদের থেকে অধিক ভাগ্যবান।

মহারাজ পরীক্ষিৎ ছিলেন ভগবানের একজন মহান্ ভক্ত এবং ভগবদ্ধামে ফিরে যাওয়ার উপযুক্ত পাত্র, কিন্তু তা সত্ত্বেও সারা পৃথিবীর একচ্ছত্র সম্রাট রূপে তাঁর জড়জাগতিক ঐশ্বর্য ছিল চিজ্জগতে ভগবানের পার্ষদত্ব লাভের প্রতিবন্ধক। ভগবদ্ভক্ত রূপে তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে, সে ব্রাহ্মণবালক যদিও অজ্ঞানের বশবর্তী হয়ে তাঁকে অভিশাপ দিয়েছিল, প্রকৃতপক্ষে তা ছিল তাঁর প্রতি আশীর্বাদ স্বরূপ, কেননা তার ফলে তিনি সামাজিক এবং রাজনৈতিক উভয় প্রকার জড়জাগতিক বন্ধনের প্রতি অনাসক্ত হতে পেরেছিলেন।

সেই ঘটনার ব্যাপারে অনুশোচনা করার পর শমীক ঋষিও তাঁর কর্তব্য স্বরূপ সেই সংবাদ রাজাকে প্রেরণ করেছিলেন যাতে তিনি ভগবদ্ধামে ফিরে যাওয়ার

জন্য প্রস্তুত হতে পারেন। শমীক ঋষি রাজার কাছে সংবাদ পাঠিয়েছিলেন যে, তাঁর মূর্খ পুত্র শৃঙ্গী তেজস্বী ব্রাহ্মণবালক হওয়া সত্ত্বেও দুর্ভাগ্যবশত তার আধ্যাত্মিক শক্তির অপব্যবহার করে অবৈধভাবে রাজাকে অভিশাপ দিয়েছে। রাজার পক্ষে মুনির গলায় মৃত সর্পের মালা পরানোর অপরাধ মৃত্যুশাপের পর্যাপ্ত কারণ ছিল না। কিন্তু যেহেতু শাপ প্রত্যাহার করা সম্ভব নয়, তাই রাজাকে জানানো হয়েছিল যে, তিনি যেন সাত দিনের মধ্যে মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হন।

শমীক মুনি এবং রাজা উভয়েই ছিলেন আত্মতত্ত্ববেত্তা। শমীক ঋষি ছিলেন একজন যোগী, আর মহারাজ পরীক্ষিৎ ছিলেন ভক্ত। তাই পারমার্থিক দিক দিয়ে তাঁদের মধ্যে কোন পার্থক্য ছিল না। তাঁদের উভয়েরই মৃত্যু সম্বন্ধে কোনও ভয় ছিল না। মহারাজ পরীক্ষিৎ মুনির কাছে গিয়ে ক্ষমা ভিক্ষা করতে পারতেন, কিন্তু শমীক ঋষি এত অনুতাপের সঙ্গে রাজার আসন্ন মৃত্যু সংবাদ পাঠিয়েছিলেন যে, তিনি তাঁর উপস্থিতির দ্বারা মুনিকে আর লজ্জা দিতে চাননি। তিনি ভগবদ্ধামে ফিরে যাওয়ার প্রচেষ্টা করে তাঁর আসন্ন মৃত্যুকে বরণ করার জন্য নিজেকে প্রস্তুত করতে মনস্থ করেছিলেন।

মানব জীবন ভগবানের কাছে ফিরে যাওয়ার জন্য, অথবা জন্ম-মৃত্যুর চক্র রূপ জড়জাগতিক বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য নিজেকে প্রস্তুত করার এক অপূর্ব সুযোগ। তাই বর্ণাশ্রম ধর্মে প্রতিটি স্ত্রী এবং পুরুষকে সেই উদ্দেশ্য সাধনের শিক্ষা দেওয়া হয়। অর্থাৎ, বর্ণাশ্রম ধর্মের আর একটি নাম সনাতন ধর্ম বা নিত্য ধর্ম। বর্ণাশ্রম ধর্মের প্রথা মানুষকে ভগবদ্ধামে ফিরে যাওয়ার উপযুক্ত করে তোলে, এবং তাই নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে, গৃহস্থরা পূর্ণজ্ঞান লাভের জন্য বনে গিয়ে বানপ্রস্থ অবলম্বন করবেন এবং তারপর অবশ্যম্ভাবী মৃত্যুকে বরণ করার জন্য সন্ন্যাস গ্রহণ করবেন।

পরীক্ষিৎ মহারাজ ছিলেন অত্যন্ত ভাগ্যবান, কেননা তিনি তাঁর আসন্ন মৃত্যুর কথা সাত দিন আগেই জানতে পেরেছিলেন। কিন্তু সাধারণ মানুষের পক্ষে, মৃত্যু যদিও অবশ্যম্ভাবী, কখন যে তার মৃত্যু হবে সে কথা সে জানতে পারে না। মূর্খ মানুষেরা তাদের অবশ্যম্ভাবী মৃত্যুর কথা ভুলে যায় এবং ভগবদ্ধামে ফিরে যাওয়ার প্রস্তুতিমূলক কর্তব্যে অবহেলা করে। আহার, নিদ্রা, ভয় এবং মৈথুন রূপ পশু প্রবৃত্তিগুলি চরিতার্থ করার উদ্দেশ্যে তারা তাদের জীবনের অপচয় করে।

এই কলিযুগে মানুষ এই প্রকার দায়িত্বহীন জীবন যাপন করছে কেননা তারা ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতি, ভগবদ্-চেতনা এবং গো-রক্ষার গুরুদায়িত্ব পরিত্যাগ করার পাপপূর্ণ বাসনার দ্বারা প্রভাবিত হয়েছে, সেই জন্য রাষ্ট্রই দায়ী। সরকারের অবশ্য কর্তব্য

হচ্ছে এই তিনটি আদর্শের উন্নতির জন্য রাজস্ব ব্যয় করা যাতে জনসাধারণ মৃত্যুকে জয় করার শিক্ষা লাভ করতে পারে। যে রাষ্ট্র তা করে তা হচ্ছে প্রকৃত কল্যাণপ্রদ রাষ্ট্র।

তাই ভারত সরকারের কর্তব্য—ভগবদ্ চেতনাবিহীন, মানব জীবনের চরম উদ্দেশ্য সম্পর্কে সম্পূর্ণ অজ্ঞ, জড়বাদী রাষ্ট্রগুলির অনুকরণ না করে, ভারতবর্ষেরই আদর্শ রাজা মহারাজ পরীক্ষিতের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করা। ভারতীয় সংস্কৃতির আদর্শের অবক্ষয়ের ফলে আজ কেবল ভারতবর্ষের সামাজিক জীবনেরই অধঃপতন হয়নি, পৃথিবীর অন্যান্য দেশগুলিরও অধঃপতন হয়েছে।

শ্লোক ৫

অথো বিহায়েমমমুঞ্চ লোকং
বিমর্শিতৌ হেয়তয়া পুরস্তাৎ ।
কৃষ্ণাঙ্ঘ্রিসেবামধিমন্যমান
উপাবিশৎ প্রায়মমর্ত্যনদ্যাম্ ॥ ৫ ॥

অথো—এইভাবে; **বিহায়**—পরিত্যাগ করে; **ইমম্**—এই; **অমুম্**—পরবর্তী; **চ**—ও; **লোকম্**—লোক; **বিমর্শিতৌ**—বিচারিত; **হেয়তয়া**—নিকৃষ্ট হওয়ার ফলে; **পুরস্তাৎ**—পূর্বে; **কৃষ্ণাঙ্ঘ্রি**—শ্রীকৃষ্ণের শ্রীপাদপদ্ম; **সেবাম্**—অপ্রাকৃত প্রেমময়ী সেবা; **অধিমন্যমানঃ**—সর্বশ্রেষ্ঠ উপলব্ধির বিষয়ে চিন্তাশীল; **উপাবিশৎ**—দৃঢ়ভাবে উপবিষ্ট; **প্রায়ম্**—উপবাস করার জন্য; **অমর্ত্য-নদ্যাম্**—অপ্রাকৃত নদীর (গঙ্গা অথবা যমুনার) তীরে।

অনুবাদ

শ্রীকৃষ্ণের শ্রীপাদপদ্মের সেবা সর্ববিধ পুরুষার্থের সারাতিসার জেনে, মহারাজ পরীক্ষিৎ আত্ম-উপলব্ধির অন্য সমস্ত পন্থা পরিত্যাগ করে সেই শ্রীকৃষ্ণের শ্রীপাদপদ্মে তাঁর চিত্ত একাগ্র করার জন্য সুরধুনী গঙ্গার তীরে প্রায়োপবেশন করলেন।

তাৎপর্য

মহারাজ পরীক্ষিতের মতো ভক্তের কাছে কোন জড়লোক, এমন কি এই ব্রহ্মাণ্ডের সর্বোচ্চ লোক ব্রহ্মলোকও পরমেশ্বর ভগবান আদিপুরুষ শ্রীকৃষ্ণের ধাম গোলোক

বৃন্দাবনের মতো বাঞ্ছনীয় নয়। এই পৃথিবী ব্রহ্মাণ্ডের অগণিত গ্রহলোকের মধ্যে একটি গ্রহ, আর মহত্তত্ত্বের মধ্যে তেমনই অসংখ্য ব্রহ্মাণ্ড রয়েছে। ভগবান এবং তাঁর প্রতিনিধি শ্রীগুরুদেব বা আচার্য ভক্তদের বলেন যে, অসংখ্য ব্রহ্মাণ্ডের কোনও একটি লোকও ভক্তদের বসবাসের উপযোগী নয়। ভক্তরা সর্বদাই তাঁদের প্রকৃত আলয় ভগবদ্ধামে ফিরে যেতে চান যাতে তাঁরা ভগবানের দাসরূপে, সখারূপে, পিতামাতা রূপে অথবা প্রেয়সীরূপে অসংখ্য বৈকুণ্ঠলোকে অথবা শ্রীকৃষ্ণের স্বীয় ধাম গোলোক বৃন্দাবনে ভগবানের পার্ষদত্ব লাভ করতে পারেন। এই সমস্ত গ্রহলোকগুলি মহত্তত্ত্বের অন্তর্গত কারণ-সমুদ্রের পরপারে চিদাকাশ বা পরব্যোমে নিত্য বিরাজমান।

নিজের পুঞ্জীভূত পুণ্য এবং অতি উচ্চ বৈষ্ণব ভক্তকুলে জন্মগ্রহণ করার ফলে পরীক্ষিৎ মহারাজ এই সমস্ত তত্ত্ব পূর্বেই অবগত ছিলেন, এবং তাই তিনি কোনও জড় লোকের প্রতি মোটেই আগ্রহী ছিলেন না।

আধুনিক বৈজ্ঞানিকেরা ভৌতিক উপায়ে চন্দ্রগ্রহে যাওয়ার জন্য অত্যন্ত উদ্‌গ্রীব, কিন্তু এই জড় ব্রহ্মাণ্ডের সর্বোচ্চ লোক সম্বন্ধে তাদের কোন ধারণাই নেই। কিন্তু মহারাজ পরীক্ষিতের মতো ভক্ত চন্দ্র অথবা এই জড় জগতের অন্য কোন গ্রহের প্রতি একেবারেই আসক্ত নন। তাই যখন তিনি জানতে পারেন যে, কোন নির্দিষ্ট দিনে তাঁর মৃত্যু হবে, তখন তিনি তাঁর রাজধানী হস্তিনাপুরের (আধুনিক দিল্লী) পাশ দিয়ে প্রবাহিতা অপ্রাকৃত নদী যমুনার তীরে সম্পূর্ণরূপে প্রায়োপবেশন অবলম্বন করে পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের অপ্রাকৃত সেবায় যুক্ত হওয়ার জন্য দৃঢ়তরভাবে সংকল্পবদ্ধ হয়েছিলেন। গঙ্গা এবং যমুনা উভয় নদী অমর্ত্যা (অপ্রাকৃত), এবং তাদের মধ্যে নিম্নলিখিত কারণগুলির জন্য যমুনা অধিক পবিত্র।

শ্লোক ৬

যা বৈ লসচ্ছ্রীতুলসীবিমিশ্র-
কৃষ্ণাঙ্ঘ্রিরেণ্বভ্যধিকাম্বুনেত্রী ।
পুনাতি লোকানুভয়ত্র সেশান্
কস্তাং ন সেবেত মরিষ্যমাণঃ ॥ ৬ ॥

যা—যেই নদী; বৈ—সর্বদা; লসৎ—প্রবাহিত; শ্রীতুলসী—তুলসীপত্র; বিমিশ্র—মিশ্রিত; কৃষ্ণাঙ্ঘ্রি—ভগবান শ্রীকৃষ্ণের শ্রীপাদপদ্ম; রেণু—ধুলি; অভ্যধিক—শুভ; অম্বু—জল; নেত্রী—বহনকারী; পুনাতি—পবিত্র করে; লোকান্—লোকসমূহকে;

উভয়ত্র—উচ্চ এবং নীচ অথবা অন্তরে এবং বাইরে; স-ঈশান্—মহাদেবসহ; কঃ—আর কে; তাম্—সেই নদীর; ন—না; সেবেত—পূজা করে; মরিষ্যমাণঃ—যে কোন সময় যার মৃত্যু হতে পারে।

অনুবাদ

যে সুরধুনী শ্রীকৃষ্ণের চরণরেণু বিমিশ্রিত তুলসীদলের সংস্পর্শে সর্বোৎকৃষ্ট সলিলরাশি বহন করছে ; যিনি মহাদেব পর্যন্ত দেবতাদের অন্তর এবং বাহির উভয় পবিত্র করছেন, মৃত্যু নিকটবর্তী জেনে কোন্ মানুষ সেই পবিত্র ভাগীরথীর সেবা না করবে?

তাৎপর্য

পরীক্ষিৎ মহারাজ যখন সংবাদ পেলেন যে, সাত দিনের ভিতর তাঁর মৃত্যু হবে, তৎক্ষণাৎ তিনি সংসার জীবন পরিত্যাগ করে পবিত্র যমুনা নদীর তীরে চলে গিয়েছিলেন। সাধারণত বলা হয় যে, মহারাজ পরীক্ষিৎ গঙ্গার তীরে গিয়েছিলেন, কিন্তু শ্রীল জীব গোস্বামীর মতে তিনি যমুনার তীরে গিয়েছিলেন। ভৌগোলিক অবস্থান বিচার করলে শ্রীল জীব গোস্বামীর উক্তিটি সঠিক বলে মনে হয়। মহারাজ পরীক্ষিৎ তাঁর রাজধানী হস্তিনাপুরে বাস করতেন, যা আধুনিক দিল্লীর নিকট অবস্থিত ছিল, এবং যমুনা নদী সেই নগরীর পাশ দিয়ে প্রবাহিত। স্বাভাবিকভাবে মহারাজ পরীক্ষিৎ যমুনা নদীর আশ্রয় নিয়েছিলেন কেননা তা ছিল তাঁর প্রাসাদের পাশ দিয়ে প্রবাহিত।

আর পবিত্রতার বিচারে শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে সরাসরিভাবে যুক্ত থাকার ফলে যমুনা নদী গঙ্গার থেকে অধিক পবিত্র। এই পৃথিবীতে তাঁর অপ্রাকৃত লীলা বিলাসের শুরু থেকেই ভগবান যমুনা নদীকে পবিত্র করেছিলেন। তাঁর পিতা বসুদেব যখন তাঁর জন্মের ঠিক পরে তাঁকে নিরাপদ স্থানে রাখার জন্য মথুরা থেকে যমুনার অপর পারে গোকুলে নিয়ে যাচ্ছিলেন, তখন শিশুকৃষ্ণ যমুনার জলে পড়ে যান, এবং তাঁর শ্রীপাদপদ্মের স্পর্শে যমুনা তৎক্ষণাৎ পবিত্র হয়ে যায়।

এখানে বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে যে, মহারাজ পরীক্ষিৎ সেই বিশেষ নদীর আশ্রয় গ্রহণ করেছিলেন যা তুলসীদল মিশ্রিত ভগবান শ্রীকৃষ্ণের শ্রীপাদপদ্মের ধূলিকণা বহন করে অত্যন্ত সুন্দরভাবে প্রবাহিত হচ্ছিল। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের শ্রীপাদপদ্ম সর্বদাই তুলসীদলে প্রলিপ্ত থাকে, এবং তাই যখন তাঁর শ্রীপাদপদ্ম গঙ্গা এবং যমুনার জলের সংস্পর্শে আসে, তৎক্ষণাৎ সেই নদীগুলি পবিত্র হয়ে যায়।

গঙ্গার থেকে যমুনার সঙ্গে ভগবানের সংস্পর্শ অধিকতর। 'বরাহপুরাণ' থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে শ্রীল জীব গোস্বামী বলেছেন যে, গঙ্গা এবং যমুনা জলের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই, কিন্তু গঙ্গার জল যখন শতগুণ পবিত্র হয়, তখন তাঁর নাম হয় যমুনা। তেমনই, শাস্ত্রে বলা হয়েছে যে, এক সহস্র বিষ্ণু নাম এক রাম নামের সমতুল্য, এবং তিনটি রাম নাম একটি কৃষ্ণ নামের সমান।

শ্লোক ৭

ইতি ব্যবচ্ছিদ্য স পাণ্ডবেয়ঃ
প্রায়োপবেশং প্রতি বিষ্ণুপদ্যাম্ ।
দধৌ মুকুন্দাঙ্ঘ্রিমনন্য ভাবো
মুনিব্রতো মুক্তসমস্তসঙ্গঃ ॥ ৭ ॥

ইতি—এইভাবে; **ব্যবচ্ছিদ্য**—স্থির করে; **সঃ**—সেই রাজা; **পাণ্ডবেয়ঃ**—পাণ্ডবদের সুযোগ্য বংশধর; **প্রায়োপবেশম্**—আমরণ উপবাস করার জন্য; **প্রতি**—প্রতি; **বিষ্ণু-পদ্যাম্**—গঙ্গা নদীর তীরে (যা শ্রীবিষ্ণুর পাদপদ্মে থেকে উদ্ভূতা); **দধৌ**—নিজেকে উৎসর্গ করেছিলেন; **মুকুন্দাঙ্ঘ্রিম্**—শ্রীকৃষ্ণের শ্রীপাদপদ্মে; **অনন্য**—অবিচলিত; **ভাবঃ**—ভাব; **মুনি-ব্রতঃ**—মুনিদের ব্রত; **মুক্ত**—মুক্ত; **সমস্ত**—সর্ব প্রকার; **সঙ্গঃ**—সঙ্গ।

অনুবাদ

পাণ্ডবদের উপযুক্ত বংশধর পরীক্ষিৎ মহারাজ তখন স্থির করেছিলেন যে, গঙ্গার তীরে উপবেশন করে আমরণ অনশন করবেন এবং মুক্তিদাতা ভগবান শ্রীকৃষ্ণের শ্রীপাদপদ্মে নিজেকে সম্পূর্ণ রূপে নিবেদন করবেন। তাই, সব রকম আসক্তি এবং সঙ্গ পরিত্যাগ করে তিনি মুনিদের মতো শান্তভাব অবলম্বন করেছিলেন।

তাৎপর্য

পরমেশ্বর ভগবান শ্রীবিষ্ণুর শ্রীপাদ থেকে উদ্ভূত হওয়ার ফলে গঙ্গা দেব-দেবী সমেত ত্রি-ভুবনকে পবিত্র করে। শ্রীকৃষ্ণ বিষ্ণুতত্ত্বের উৎস, এবং তাই তাঁর শ্রীপাদপদ্মের আশ্রয় সকলকে সমস্ত পাপ থেকে, এমন কি ব্রাহ্মণের প্রতি কোনও রাজার অপরাধ থেকেও মুক্ত করতে পারে।

মহারাজ পরীক্ষিৎ তাই স্থির করেছিলেন মুকুন্দ বা মুক্তিদাতা শ্রীকৃষ্ণের শ্রীপাদপদ্মের ধ্যান করতে। গঙ্গা অথবা যমুনার তীর নিরন্তর ভগবানের কথা স্মরণ করতে উদ্বুদ্ধ করে। মহারাজ পরীক্ষিৎ নিজেকে সব রকম জড় আসক্তি থেকে মুক্ত করেছিলেন এবং ভগবান শ্রীকৃষ্ণের শ্রীপাদপদ্মের ধ্যান করেছিলেন। সেইটিই হচ্ছে মুক্তিলাভের পন্থা। সব রকম জড় সঙ্গ থেকে মুক্ত হওয়ার অর্থ হচ্ছে আরও পাপ করা থেকে সম্পূর্ণরূপে নিরস্ত হওয়া। ভগবানের শ্রীপাদপদ্মের ধ্যান করার ফলে পূর্বকৃত সমস্ত পাপের ফল থেকে মুক্ত হওয়া যায়।

জড় জগতের অবস্থা এমনই যে, ইচ্ছাকৃতভাবে অথবা অনিচ্ছাকৃতভাবে পাপ আচরণ হয়ে যায়, এবং তার একটি জ্বলন্ত উদাহরণ হচ্ছেন নিষ্পাপ এবং পুণ্যবান রাজা পরীক্ষিৎ মহারাজ স্বয়ং। কোন দোষ না করতে চাইলেও তিনি এক অপরাধের শিকার হয়ে পড়েছিলেন। সেজন্য তিনি শাপগ্রস্ত হন, কিন্তু যেহেতু তিনি ছিলেন ভগবানের মহান্ ভক্ত, তাই জীবনের এই প্রকার প্রতিকূলতাও তাঁর পক্ষে অনুকূল হয়ে উঠেছিল। সিদ্ধান্ত এই যে, স্বেচ্ছায় বা জ্ঞাতসারে জীবনে কোন পাপ করা উচিত নয় এবং সর্বক্ষণ অবিচলিতভাবে পরমেশ্বর ভগবানের শ্রীপাদপদ্মের ধ্যান করা কর্তব্য। এই প্রকার মনোভাব অবলম্বন করতে পারলেই ভগবদ্ভক্ত মুক্তির পথে অগ্রসর হওয়ার জন্য ভগবানের কৃপা লাভ করবে এবং তাঁর শ্রীপাদপদ্ম প্রাপ্ত হবেন। ভগবদ্ভক্ত ঘটনাক্রমে কোন অপরাধ করে ফেললেও ভগবান সেই শরণাগত ভক্তকে সমস্ত পাপ থেকে রক্ষা করেন। সেই কথা শাস্ত্রে প্রতিপন্ন হয়েছে—

স্বপাদমূলং ভজতঃ প্রিয়স্য
ত্যক্তান্যভাবস্য হরিঃ পরেশঃ ।
বিকর্ম যচ্চোৎপতিতং কথঞ্চিদ্
ধুনোতি সর্বং হৃদি সন্নিবিষ্টঃ ॥

(শ্রীমদ্ভাগবত ১১/৫/৪২)

শ্লোক ৮

তত্রোপজগ্মুর্ভুবনং পুনানা
মহানুভাবা মুনয়ঃ সশিষ্যাঃ ।
প্রায়েণ তীর্থাভিগমাপদেশৈঃ
স্বয়ং হি তীর্থানি পুনন্তি সন্তঃ ॥ ৮ ॥

তত্র—সেখানে; **উপযযুঃ**—সমাগত; **ভুবনম্**—ত্রিভুবন; **পুনানাঃ**—পবিত্রকারী; **মহানুভাবাঃ**—মহানুভব; **মুনয়ঃ**—মুনিগণ; **সশিষ্যাঃ**—শিষ্যসহ; **প্রায়েণ**—প্রায়; **তীর্থ**—তীর্থস্থান; **অভিগম**—যাত্রা; **অপদেশৈঃ**—অছিলায়; **স্বয়ম্**—স্বয়ং; **হি**—নিশ্চয়; **তীর্থানি**—তীর্থস্থানসমূহ; **পুনন্তি**—পবিত্র করেন; **সন্তঃ**—মুনিগণ।

অনুবাদ

সেই সময় ভুবনপাবন মহানুভব মুনিরা তাঁদের শিষ্যসহ সেখানে এসে উপস্থিত হলেন। সাধুরা স্বয়ংই তীর্থ স্বরূপ, তাঁরা তীর্থগমনছলে তীর্থসকলকে পবিত্র করেন।

তাৎপর্য

মহারাজ পরীক্ষিৎ যখন গঙ্গার তীরে উপবেশন করেছিলেন, তখন সেই সংবাদ ব্রহ্মাণ্ডের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছিল, তখন সেই ঘটনার মাহাত্ম্য উপলব্ধিকারী মহানুভব মুনিরা তীর্থভ্রমণছলে সেখানে এসে উপস্থিত হয়েছিলেন। প্রকৃতপক্ষে তাঁরা মহারাজ পরীক্ষিতের সঙ্গে সাক্ষাৎ করার জন্য সেখানে এসেছিলেন, তীর্থস্নান করার জন্য নয়; কেননা তাঁরা সকলে তীর্থস্থানকেও পবিত্র করার ক্ষমতাসম্পন্ন ছিলেন।

সাধারণ মানুষ তীর্থ করতে যায় সমস্ত পাপ থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য। তাই তীর্থস্থানগুলি মানুষের পাপে ভারাক্রান্ত হয়ে পড়ে। কিন্তু সাধুরা যখন সেই সমস্ত ভারাক্রান্ত তীর্থস্থানগুলিতে যান, তখন তাঁদের উপস্থিতির ফলে তীর্থস্থানগুলি পবিত্র হয়ে যায়। তাই যে সমস্ত ঋষিরা মহারাজ পরীক্ষিতের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে এসেছিলেন, তাঁরা সাধারণ মানুষদের মতো নিজেদের পবিত্র করার ব্যাপারে আগ্রহী ছিলেন না; পক্ষান্তরে, স্নান করার অছিলায় তাঁরা সেখানে পরীক্ষিৎ মহারাজের সঙ্গে সাক্ষাৎ করার জন্য এসেছিলেন, কারণ তাঁরা পূর্বেই অনুভব করতে পেরেছিলেন যে, সেখানে শুকদেব গোস্বামী *শ্রীমদ্ভাগবত* কীর্তন করবেন। তাঁরা সকলেই সেই মহান সুযোগের সদ্ব্যবহার করতে চেয়েছিলেন।

শ্লোক ৯-১০

অত্রির্বশিষ্ঠশ্চ্যবনঃ শরদ্বা-
নরিষ্টনেমির্ভৃগুরঙ্গিরাশ্চ ।
পরাশরো গাধিসুতোঽথ রাম
উতথ্য ইন্দ্রপ্রমদেধ্মবাহৌ ॥ ৯ ॥

মেধাতিথির্দেবল আর্ষ্টিষেণো
ভারদ্বাজো গৌতমঃ পিপ্পলাদঃ ।
মৈত্রেয় ঔর্বঃ কবষঃ কুম্ভযোনি-
র্দ্বৈপায়নো ভগবান্নারদশ্চ ॥ ১০ ॥

অত্রি থেকে নারদ—এই সবগুলি নাম ব্রহ্মাণ্ডের বিভিন্ন স্থান থেকে সেখানে সমাগত বিভিন্ন মুনি ঋষির নাম।

অনুবাদ

অত্রি, বশিষ্ঠ, চ্যবন, শরদ্বান, অরিষ্টনেমি, ভৃগু, অঙ্গিরা, পরাশর, বিশ্বামিত্র, পরশুরাম, উতথ্য, ইন্দ্রপ্রমদ, ইধ্মবাহু, মেধাতিথি, দেবল, আর্ষ্টিষেণ, ভারদ্বাজ, গৌতম, পিপ্পলাদ, মৈত্রেয়, ঔর্ব, কবষ, কুম্ভযোনি, দ্বৈপায়ন, ভগবান নারদ প্রমুখ মহর্ষিরা ব্রহ্মাণ্ডের বিভিন্ন স্থান থেকে সেখানে উপস্থিত হয়েছিলেন।

তাৎপর্য

চ্যবন ঃ ভৃগুমুনির পুত্র এবং একজন মহান্ ঋষি। যখন তাঁর গর্ভবতী মাতা অপহৃতা হন, তখন যথাসময়ের পূর্বেই তাঁর জন্ম হয়। চ্যবন হচ্ছেন তাঁর পিতার ছয় পুত্রের অন্যতম।

ভৃগু ঃ ব্রহ্মা যখন বরুণের হয়ে এক মহান্ যজ্ঞানুষ্ঠান করছিলেন, তখন সেই যজ্ঞাগ্নি থেকে মহর্ষি ভৃগুর জন্ম হয়। তিনি ছিলেন এক মহান্ ঋষি এবং তাঁর প্রিয়তমা পত্নী ছিলেন পুলোমা। তিনিও দুর্বাসা এবং নারদের মতো অন্তরীক্ষে বিচরণ করতে পারতেন, এবং ব্রহ্মাণ্ডের বিভিন্ন লোকে গমনাগমন করতেন। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের পূর্বে তিনি সেই যুদ্ধ বন্ধ করার প্রয়াস করেছিলেন। কোন এক সময় তিনি ভরদ্বাজ মুনিকে জ্যোতিষ শাস্ত্র বিষয়ে শিক্ষা দিয়েছিলেন এবং তিনি 'বৃহৎ ভৃগু সংহিতা' নামক এক মহান্ জ্যোতির্গণনা শাস্ত্র প্রণয়ন করেছিলেন। তিনি বিশ্লেষণ করেছিলেন কিভাবে বায়ু, অগ্নি, জল এবং ভূমি আকাশ থেকে উৎপন্ন হয়েছে। তিনি বিশ্লেষণ করেছেন কিভাবে উদরস্থ বায়ু অন্ত্রকে নিয়ন্ত্রিত করে। এক মহান্ দার্শনিক রূপে, ন্যায়সঙ্গতভাবে তিনি জীবের নিত্যত্ব প্রতিপন্ন করেছেন (মহাভারত)। তিনি ছিলেন এক মহান্ নৃতত্ত্ববিদ্ এবং বহু পূর্বেই তিনি 'জীবনের ক্রমবিবর্তনবাদ' (theory of evolution) বিশ্লেষণ করেছেন। তিনি বর্ণাশ্রম ব্যবস্থার বৈজ্ঞানিক প্রতিপাদক। তিনি ক্ষত্রিয় রাজা বীতহব্যকে ব্রাহ্মণে রূপান্তরিত করেছিলেন।

বশিষ্ঠ—শ্রীমদ্ভাগবত ১/৯/৬ দ্রষ্টব্য।

পরাশর ঃ বশিষ্ঠ মুনির পৌত্র এবং ব্যাসদেবের পিতা। তিনি মহর্ষি শক্তির পুত্র এবং তাঁর মায়ের নাম অদৃশ্যতী। তাঁর মায়ের বয়স যখন মাত্র বার বছর, তখন তাঁর জন্ম হয়, এবং মাতৃগর্ভে অবস্থানকালে তিনি বেদের শিক্ষা লাভ করেন। তাঁর পিতা কল্মাষপাদ নামক এক রাক্ষসের দ্বারা নিহত হন, এবং তার প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য তিনি সারা পৃথিবী ধ্বংস করতে উদ্যত হন। কিন্তু তাঁর পিতামহ বশিষ্ঠ তাঁকে নিরস্ত করেন। তিনি তখন রাক্ষস নিধন যজ্ঞ অনুষ্ঠান করেন, কিন্তু মহর্ষি পুলস্ত্য তাঁকে নিরস্ত করেন। তিনি সত্যবতীর রূপে আকৃষ্ট হওয়ার ফলে ব্যাসদেবকে পুত্ররূপে প্রাপ্ত হয়েছিলেন। পরবর্তীকালে এই সত্যবতী মহারাজ শান্তনুর পত্নী হন। পরাশরের আশীর্বাদে সত্যবতী যোজনগন্ধায় পরিণত হন, অর্থাৎ এক যোজন দূর থেকেও তাঁর অঙ্গের সৌরভ পাওয়া যেত। ভীষ্মের প্রয়াণের সময়েও পরাশর মুনি সেখানে উপস্থিত ছিলেন। তিনি ছিলেন মহারাজ জনকের গুরু এবং শিবের একজন মহান্ ভক্ত। তিনি বহু বৈদিক শাস্ত্র এবং সমাজতাত্ত্বিক নির্দেশাবলী প্রণয়ন করেন।

গাধিসুত বা বিশ্বামিত্র ঃ কঠোর তপশ্চর্যাপরায়ণ যোগশক্তিসম্পন্ন একজন মহর্ষি। তিনি ছিলেন কান্যকুব্জের (উত্তরপ্রদেশের একটি অংশ) পরাক্রমশালী রাজা গাধির পুত্র, তাই তিনি গাধিসুত নামে প্রসিদ্ধ। যদিও জন্ম অনুসারে তিনি ছিলেন ক্ষত্রিয়, আধ্যাত্মিক শক্তি লাভ করার ফলে তিনি সেই জন্মেই ব্রাহ্মণত্ব লাভ করেছিলেন। তিনি যখন ক্ষত্রিয় রাজা ছিলেন, তখন বশিষ্ঠ মুনির সঙ্গে তাঁর কলহ হয় এবং তখন তিনি মতঙ্গ মুনির সহায়তায় এক মহা যজ্ঞ অনুষ্ঠান করে বশিষ্ঠের পুত্রদের নিধন করেন। তিনি একজন মহা যোগীতে পরিণত হন, কিন্তু তথাপি ইন্দ্রিয় দমনে অসমর্থ হওয়ার ফলে তাঁর থেকে বিশ্ববিখ্যাত সুন্দরী শকুন্তলার জন্ম হয়। তিনি যখন ক্ষত্রিয় রাজা ছিলেন, তখন এক সময় তিনি বশিষ্ঠ মুনির আশ্রমে গমন করেন, এবং রাজকীয় অভ্যর্থনা প্রাপ্ত হন। বিশ্বামিত্র বশিষ্ঠের কাছে নন্দিনী নামক একটি গাভী প্রার্থনা করেন, কিন্তু মুনি তাঁকে তা দিতে অস্বীকার করেন। বিশ্বামিত্র সেই গাভীটিকে বলপূর্বক অপহরণ করে, এবং তার ফলে মহর্ষি বশিষ্ঠের সঙ্গে তাঁর কলহ হয়। বশিষ্ঠের আধ্যাত্মিক শক্তির কাছে বিশ্বামিত্র পরাজিত হন, এবং তাই তিনি ব্রাহ্মণ হবেন বলে স্থির করেন। তিনি কৌশিক নদীর তীরে ব্রাহ্মণ হওয়ার জন্য কঠোর তপস্যা করেন। যে সমস্ত মহানুভব ব্যক্তি কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ বন্ধ করার চেষ্টা করেন, তিনি ছিলেন তাঁদের মধ্যে একজন।

অঙ্গিরা : ব্রহ্মার ছয় জন মানসপুত্রের অন্যতম এবং স্বর্গের দেবতাদের মহাবিদ্বান পুরোহিত বৃহস্পতির পিতা। অঙ্গারে অর্পিত ব্রহ্মার বীর্য থেকে তাঁর জন্ম হয়েছিল। উতথ্য এবং সংবর্ত তাঁর পুত্র। কথিত আছে যে, তিনি এখনও গঙ্গার তীরে অলকানন্দা নামক স্থানে তপস্যা করছেন এবং ভগবানের দিব্য নাম কীর্তন করছেন।

পরশুরাম—শ্রীমদ্ভাগবত ১/৯/৬ দ্রষ্টব্য।

উতথ্য : মহর্ষি অঙ্গিরার তিন পুত্রের অন্যতম। তিনি ছিলেন মহারাজ মান্ধাতার গুরু। তিনি সোমের (চন্দ্রের) কন্যা ভদ্রাকে বিবাহ করেন। বরুণ তাঁর পত্নী ভদ্রাকে অপহরণ করে, এবং জলের দেবতার এই অপরাধের প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য তিনি পৃথিবীর সমস্ত জল পান করে ফেলেন।

মেধাতিথি : প্রাচীনকালের এক প্রবীণ ঋষি। স্বর্গের দেবরাজ ইন্দ্রের সভার তিনি একজন সদস্য। তাঁর পুত্র ছিলেন কণ্ব মুনি, যিনি তাঁর তপোবনে শকুন্তলাকে পালন করেছিলেন। কঠোরভাবে বানপ্রস্থ আশ্রম পালন করার ফলে তিনি স্বর্গলোকে উন্নীত হন।

দেবল : নারদ মুনি ও ব্যাসদেবের মতো এক মহান্ তত্ত্ববিদ্। *শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায়* অর্জুন যখন শ্রীকৃষ্ণকে পরমেশ্বর ভগবান বলে স্বীকার করেছিলেন, তখন তিনি প্রামাণিক তত্ত্ববিদদের মধ্যে তাঁর নাম উল্লেখ করেছিলেন। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের পর মহারাজ যুধিষ্ঠিরের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ হয়। পাণ্ডবদের কুলপুরোহিত ধৌম্য ছিলেন তাঁর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা। তিনি তাঁর কন্যাকে ক্ষত্রিয়ের মতো স্বয়ংবর সভায় পতি মনোনয়ন করার অনুমতি দেন, এবং সেই সভায় ঋষিদের অবিবাহিত পুত্রেরা নিমন্ত্রিত হন। কারো কারো মতে তিনি অসিত দেবল নন।

ভারদ্বাজ—শ্রীমদ্ভাগবত ১/৯/৬ দ্রষ্টব্য।

গৌতম : সপ্ত মহর্ষির অন্যতম। শরদ্বান গৌতম ছিলেন তাঁর পুত্র। গৌতম গোত্রীয়েরা তাঁর বংশধর অথবা তাঁর পরম্পরাভুক্ত। গৌতম গোত্রীয় ব্রাহ্মণেরা তাঁর বংশধর এবং ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যরা তাঁর পরম্পরাভুক্ত। তিনি ছিলেন বিখ্যাত অহল্যার পতি। অহল্যা দেবরাজ ইন্দ্র কর্তৃক ধর্ষিতা হওয়ার ফলে পাথরে পরিণত হন। শ্রীরামচন্দ্র অহল্যাকে উদ্ধার করেন। গৌতম ছিলেন কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের একজন নায়ক কৃপাচার্যের পিতামহ।

মৈত্রেয় : পুরাকালের এক মহর্ষি। তিনি ছিলেন বিদুরের গুরু এবং এক মহান্ ধর্মাচার্য। তিনি ধৃতরাষ্ট্রকে পাণ্ডবদের সঙ্গে প্রীতিপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপনের উপদেশ দিয়েছিলেন। দুর্যোধন তাতে অসম্মত হয় এবং তার ফলে তিনি তাঁকে অভিশাপ দেন। ব্যাসদেবের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎকার হয় এবং ধর্ম সম্বন্ধে আলোচনা হয়।

শ্লোক ১২

সুখোপবিষ্টেষ্বথ তেষু ভূয়ঃ
কৃতপ্রণামঃ স্বচিকীর্ষিতং যৎ ।
বিজ্ঞাপয়ামাস বিবিক্তচেতা
উপস্থিতোঽগ্রেঽভিগৃহীতপাণিঃ ॥ ১২ ॥

সুখে—সুখে; **উপবিষ্টেষু**—উপবিষ্ট; **অথ**—তারপর; **তেষু**—তাঁদের (অতিথিদের); **ভূয়ঃ**—পুনরায়; **কৃত-প্রণামঃ**—প্রণাম করে; **স্ব**—তাঁর নিজের; **চিকীর্ষিতম্**—অনশনের অভিপ্রায়; **যৎ**—যিনি; **বিজ্ঞাপয়াম্ আস**—জিজ্ঞাসা করেছিলেন; **বিবিক্তচেতাঃ**—যাঁর চিত্ত সমস্ত জড় বিষয় থেকে মুক্ত হয়েছে; **উপস্থিতঃ**—উপস্থিত হওয়ার ফলে; **অগ্রে**—তাঁদের সম্মুখে; **অভিগৃহীত-পাণিঃ**—বিনীতভাবে কৃতাঞ্জলিপুটে।

অনুবাদ

তারপর, তাঁরা সকলেই যখন সুখে উপবেশন করলেন, তখন রাজা তাঁদের পুনরায় প্রণাম করলেন এবং বিনীতভাবে কৃতাঞ্জলিপুটে তাঁর প্রায়োবেশনের অভিলাষের কথা জানালেন।

তাৎপর্য

যদিও রাজা ইতিমধ্যেই গঙ্গার তীরে প্রায়োপবেশন করতে মনস্থ করেছিলেন, তথাপি তিনি বিনীতভাবে তাঁর সেই অভিলাষের কথা সেখানে উপস্থিত সমস্ত মহাত্মাদের জানালেন। যে কোন সিদ্ধান্ত, তা যতই গুরুত্বপূর্ণ হোক, মহাজনদের দ্বারা অনুমোদিত হওয়া উচিত। তার ফলে সর্ব সিদ্ধিলাভ হয়। এর থেকে বোঝা যায় যে, তখনকার যে সমস্ত সম্রাট পৃথিবীর উপর আধিপত্য করতেন, তাঁরা কেউই দায়িত্বহীন স্বেচ্ছাচারী ছিলেন না। তাঁরা বৈদিক নির্দেশ অনুসারে সাধু মহাত্মাদের প্রামাণিক সিদ্ধান্ত নিষ্ঠা সহকারে অনুশীলন করতেন। একজন আদর্শ রাজারূপে মহারাজ পরীক্ষিৎ তাঁর জীবনের শেষদিন পর্যন্ত মহাজনদের অনুমতি গ্রহণের প্রথা অনুসরণ করেছিলেন।

শ্লোক ১৩

রাজোবাচ

অহো বয়ং ধন্যতমা নৃপাণাং
মহত্তমানুগ্রহণীয়শীলাঃ ।
রাজ্ঞাং কুলং ব্রাহ্মণপাদশৌচাদ্
দূরাদ্ বিসৃষ্টং বত গর্হ্যকর্ম ॥ ১৩ ॥

রাজা উবাচ—সেই ভাগ্যবান রাজা বললেন; অহো—আহা; বয়ম্—আমরা; ধন্যতমা—অত্যন্ত ধন্য; নৃপাণাম্—সমস্ত রাজাদের; মহত্তম্—মহাত্মাদের; অনুগ্রহণীয়-শীলাঃ—অনুগ্রহ লাভের শিক্ষাপ্রাপ্ত; রাজ্ঞাম্—রাজাদের; কুলম্—কুল; ব্রাহ্মণ পাদশৌচাদ্—ব্রাহ্মণদের পাদ প্রক্ষালনের অবশিষ্ট জল; দূরাৎ—দূর থেকে; বিসৃষ্টম্—সর্বদা পরিত্যাগ করেন; বত—সেই কারণে; গর্হ্য—নিন্দনীয়; কর্ম—কার্যকলাপ।

অনুবাদ

সেই ভাগ্যবান রাজা বললেন—আমরা যথার্থই মহাত্মাদের কৃপা লাভের শিক্ষায় শিক্ষিত অত্যন্ত শ্রদ্ধাশীল রাজাদের মধ্যে মহা সৌভাগ্যবান। সাধারণত আপনারা (মহর্ষিরা) মনে করেন যে, রাজকুল আবর্জনার মতো দূরে বর্জনীয়।

তাৎপর্য

ধর্মের নিয়ম অনুসারে মল, মূত্র, ধৌতজল ইত্যাদি দূরে ফেলে দেওয়া উচিত। ঘরের সংলগ্ন স্নানাগার, মলাশয় ইত্যাদি আধুনিক সভ্যতার সুবিধাজনক অবদান হতে পারে, কিন্তু সেগুলি গৃহ থেকে দূরে অবস্থিত হওয়া উচিত। সেই দৃষ্টান্ত এখানে দেওয়া হয়েছে—যাঁরা ভগবদ্ধামে ফিরে যাওয়ার প্রত্যাশী, তাঁরা রাজকুলকে সেইভাবে পরিত্যাগ করবেন। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু বলেছেন, যাঁরা ভগবদ্ধামে ফিরে যাওয়ার প্রত্যাশী, তাঁদের পক্ষে বিষয়ী অথবা রাজাদের সঙ্গ করা আত্মহত্যা করার থেকেও খারাপ। অর্থাৎ যারা ভগবানের সৃষ্টির বাহ্যিক সৌন্দর্যের দ্বারা আকৃষ্ট, পরমার্থবাদীদের তাদের সঙ্গ করা উচিত নয়। দিব্য জ্ঞান প্রাপ্ত পরমার্থবাদী জানেন যে, এই সুন্দর জড় জগৎ হচ্ছে ভগবদ্ধামের প্রতিবিম্ব মাত্র। তাই তাঁরা রাজৈশ্বর্য ইত্যাদির দ্বারা মোহিত হন না। কিন্তু মহারাজ পরীক্ষিতের অবস্থা ছিল অন্যরকম।

আপাতদৃষ্টিতে তিনি একজন অনভিজ্ঞ ব্রাহ্মণবালক কর্তৃক মৃত্যুশাপ প্রাপ্ত হয়েছিলেন, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ভগবান তাঁকে তাঁর কাছে ফিরে যাওয়ার জন্য ডেকেছিলেন। মহান্ ঋষি এবং যোগী আদি অন্য সমস্ত মহাত্মারা প্রায়োপবেশনরত ভগবদ্ধামে প্রত্যাবর্তনকারী মহারাজ পরীক্ষিতকে দর্শন করার জন্য উৎসুক হয়ে সেখানে সমবেত হয়েছিলেন। মহারাজ পরীক্ষিতও বুঝতে পেরেছিলেন যে, সেখানে সমবেত সমস্ত মুনিঋষিরা তাঁর পিতামহ পাণ্ডবদের প্রতি অত্যন্ত সদয় ছিলেন, কারণ তাঁরা ছিলেন ভগবদ্ভক্ত। তাই তাঁর জীবনের অন্তিম সময়ে সমস্ত মহর্ষিদের সঙ্গ লাভ করে তিনি অত্যন্ত কৃতজ্ঞতা অনুভব করেছিলেন। তিনি অনুভব করেছিলেন যে, তাঁর পূর্বপুরুষদের মাহাত্ম্যের ফলে তিনি সেই সৌভাগ্য লাভ করেছিলেন। সেই প্রকার মহান্ ভক্তদের বংশধর হওয়ার ফলে তিনি এই গর্ব অনুভব করেছিলেন। ভগবদ্ভক্তের এই গর্ব জাগতিক সমৃদ্ধিজাত দর্প থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। প্রথমটি বাস্তব কিন্তু অন্যটি মিথ্যা এবং ব্যর্থ।

শ্লোক ১৪

তস্যৈব মেঽঘস্য পরাবরেশো
ব্যাসক্তচিত্তস্য গৃহেষ্বভীক্ষ্ণম্ ।
নির্বেদমূলো দ্বিজশাপরূপো
যত্র প্রসক্তো ভয়মাশু ধত্তে ॥ ১৪ ॥

তস্য—তাঁর; **এব**—নিশ্চয়ই; **মে**—আমার; **অঘস্য**—পাপের; **পরা**—পারমার্থিক; **অবর**—জাগতিক; **ঈশঃ**—নিয়ন্তা, ভগবান; **ব্যাসক্ত**—বিশেষভাবে আসক্ত; **চিত্তস্য**—মনের; **গৃহেষু**—পারিবারিক বিষয়; **অভীক্ষ্ণম্**—সর্বদা; **নির্বেদ-মূলঃ**—বৈরাগ্যের কারণ; **দ্বিজশাপ**—ব্রাহ্মণের অভিশাপ; **রূপঃ**—রূপ; **যত্র**—যেখানে; **প্রসক্ত**—প্রভাবিত; **ভয়ম্**—ভয়; **আশু**—অতি শীঘ্র; **ধত্তে**—সংঘটিত হয়।

অনুবাদ

চিন্ময় ও জড় জগতের নিয়ন্তা পরমেশ্বর ভগবান ব্রাহ্মণের শাপরূপে আমাকে অত্যন্ত কৃপা করেছেন। আমি নিরন্তর গৃহের প্রতি অত্যন্ত আসক্ত ছিলাম, কিন্তু ভগবান আমাকে রক্ষা করার জন্য এমনভাবে আমার সম্মুখে উপস্থিত হয়েছেন যে, ভয়ের বশে আমি এই জগতের প্রতি বিরক্ত হব।

তাৎপর্য

মহারাজ পরীক্ষিৎ যদিও পরম ভক্ত পাণ্ডবদের পরিবারে জন্মগ্রহণ করেছিলেন এবং ভগবানের সান্নিধ্য লাভের প্রতি আসক্ত হওয়ার শিক্ষা লাভ করেছিলেন, তথাপি তিনি দেখেছিলেন যে, সংসার জীবনের আকর্ষণ এত প্রবল যে, তা থেকে তাঁকে মুক্ত করার জন্য ভগবানকে বিশেষ পরিকল্পনা করতে হয়েছিল। কোন বিশেষ ভক্তের জন্যই কেবল ভগবান প্রত্যক্ষভাবে এই প্রকার ব্যবস্থা করেন। এই ব্রহ্মাণ্ডের সর্বশ্রেষ্ঠ মহাত্মাদের উপস্থিত হতে দেখে পরীক্ষিৎ মহারাজ তা উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন। ভগবান সর্বদা তাঁর ভক্তের সঙ্গে বিরাজ করেন, তাই মহান্ ভগবদ্ভক্তদের উপস্থিতি ভগবানেরই উপস্থিতিসূচক ছিল। মহারাজ পরীক্ষিৎ তাই মহর্ষিদের আগমনকে পরমেশ্বর ভগবানের অনুগ্রহের প্রকাশ বলে মনে করে তাঁদের স্বাগত জানিয়েছিলেন।

শ্লোক ১৫

তং মোপয়াতং প্রতিযন্তু বিপ্রা
গঙ্গা চ দেবী ধৃতচিত্তমীশে ।
দ্বিজোপসৃষ্টঃ কুহকস্তক্ষকো বা
দশত্বলং গায়ত বিষ্ণুগাথাঃ ॥ ১৫ ॥

তম্—সেইজন্য; **মা**—আমি; **উপয়াতম্**—শরণাগত; **প্রতিযন্তু**—আমাকে গ্রহণ করুন; **বিপ্রাঃ**—হে ব্রাহ্মণগণ; **গঙ্গা**—গঙ্গা; **চ**—ও; **দেবী**—ভগবানের প্রত্যক্ষ প্রতিনিধি; **ধৃত**—ধারণ করে; **চিত্তম্**—হৃদয়; **ঈশে**—ভগবানকে; **দ্বিজ-উপসৃষ্টঃ**—ব্রাহ্মণ কর্তৃক সৃষ্ট; **কুহক**—মায়িক; **তক্ষকঃ**—তক্ষক সর্প; **বা**—অথবা; **দশতু**—দংশন করুক; **অলম্**—অচিরেই; **গায়ত**—দয়া করে কীর্তন করুন; **বিষ্ণুগাথাঃ**—শ্রীবিষ্ণুর কার্যকলাপের বর্ণনা।

অনুবাদ

হে ব্রাহ্মণগণ, আমাকে সম্পূর্ণরূপে আত্মসমর্পিত বলে গ্রহণ করুন, এবং ভগবানের প্রতিনিধি মা গঙ্গাও আমাকে সেইভাবে স্বীকার করুন, কেননা আমি ভগবানের শ্রীপাদপদ্ম আমার হৃদয়ে ধারণ করেছি। এখন ব্রাহ্মণ-তনয় প্রেরিত তক্ষকই হোক বা কুহকই হোক আমাকে দংশন করুক। আমার একমাত্র বাসনা যে, আপনারা সকলে ভগবান শ্রীবিষ্ণুর লীলাসমূহ কীর্তন করুন।

তাৎপর্য

কেউ যখন সম্পূর্ণরূপে ভগবানের শ্রীপাদপদ্মের শরণাগত হন, তখন আর তাঁর মৃত্যুভয় থাকে না। গঙ্গার তীরে তখন ভগবদ্ভক্তদের উপস্থিতি এবং মহারাজ পরীক্ষিতের ভগবানের চরণকমলে পূর্ণ শরণাগতির ফলে যে পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছিল, তার ফলে নিশ্চিতভাবে সূচিত হয়েছিল যে, মহারাজ পরীক্ষিৎ ভগবানে কাছে ফিরে যাচ্ছেন। এইভাবে তিনি মৃত্যুভয় থেকে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত হয়েছিলেন।

শ্লোক ১৬

পুনশ্চ ভূয়াদ্ভগবত্যনন্তে
রতিঃ প্রসঙ্গশ্চ তদাশ্রয়েষু ।
মহৎসু যাং যামুপযামিসৃষ্টিং
মৈত্র্যস্তু সর্বত্র নমো দ্বিজেভ্যঃ ॥ ১৬ ॥

পুনঃ—পুনরায়; **চ**—এবং; **ভূয়াৎ**—হোক; **ভগবতি**—পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণে; **অনন্তে**—অনন্ত শক্তিসম্পন্ন; **রতিঃ**—আকর্ষণ; **প্রসঙ্গ**—প্রসঙ্গ; **চ**—ও; **তৎ**—তাঁর; **আশ্রয়েষু**—তাঁর ভক্তদের সঙ্গে; **মহৎসু**—জড় সৃষ্টিতে; **যাম্ যাম্**—যেখানে যেখানে; **উপযামি**—প্রাপ্ত হই; **সৃষ্টিম্**—জন্ম; **মৈত্রী**—মিত্রতা; **অস্তু**—হোক; **সর্বত্র**—সর্বত্র; **নমঃ**—প্রণতি ; **দ্বিজেভ্য**—ব্রাহ্মণদের।

অনুবাদ

আমি সমস্ত ব্রাহ্মণদের প্রণতি নিবেদন করে পুনরায় প্রার্থনা করছি যে, যদি আমাকে আবার এই জগতে জন্মগ্রহণ করতে হয়, তবে যেন অনন্ত ভগবান শ্রীকৃষ্ণের প্রতি আমার পূর্ণ আসক্তি থাকে, আমি যেন সর্বদা তাঁর ভক্তদের সঙ্গ লাভ করতে পারি এবং সমস্ত জীবের প্রতি যেন আমার মৈত্রীভাব থাকে।

তাৎপর্য

ভগবদ্ভক্তই যে একমাত্র পূর্ণ জীব, সেকথা পরীক্ষিৎ মহারাজ এখানে বিশ্লেষণ করেছেন। ভক্তের প্রতি অনেকে শত্রুভাবাপন্ন হলেও ভক্ত কারও শত্রু নন। ভক্ত যদিও কারও শত্রু নন, তথাপি তিনি অভক্তদের সঙ্গ করতে চান না। তিনি কেবল ভক্তদেরই সঙ্গের অভিলাষী। তা সম্পূর্ণ স্বাভাবিক কেননা সমভাবাপন্ন মানুষদের মধ্যেই কেবল মৈত্রী সম্ভব। আর ভক্তের সব চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ হচ্ছে সমস্ত জীবের পিতা পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের প্রতি সম্পূর্ণরূপে আসক্ত হওয়া। পিতার

সুসন্তান যেমন তাঁর অন্য সমস্ত ভ্রাতাদের প্রতি মিত্রবৎ আচরণ করেন, তেমনই ভগবদ্ভক্ত পরম পিতা পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সুসন্তান হওয়ার ফলে, সমস্ত জীবকে পরম পিতার সঙ্গে সম্পর্কিতরূপে দর্শন করেন। তিনি তাঁর পিতার উদ্ধত পুত্রদের প্রকৃতিস্থ করে ভগবানকে তাঁদের পরম পিতারূপে জানবার চেষ্টা করেন। মহারাজ পরীক্ষিৎ নিশ্চিতভাবে ভগবানের কাছে ফিরে যাচ্ছিলেন, কিন্তু তিনি যদি ভগবানের কাছে ফিরে নাও যেতেন, তিনি এমন জীবন প্রার্থনা করেছিলেন যা হচ্ছে এই জগতের সর্বশ্রেষ্ঠ স্থিতি। ভগবানের শুদ্ধ ভক্তের প্রার্থনা হচ্ছে—

'কীট জন্ম হউক যথা তুয়া দাস।
বহির্মুখ ব্রহ্ম জন্মে নাহি আশ॥'

শ্লোক ১৭

ইতি স্ম রাজাধ্যবসায়যুক্তঃ
প্রাচীনমূলেষু কুশেষু ধীরঃ।
উদঙ্মুখো দক্ষিণকূল আস্তে
সমুদ্রপত্ন্যাঃ স্বসুতন্যস্তভারঃ॥ ১৭॥

ইতি—এইভাবে; **স্ম**—অতীতে; **রাজা**—রাজা; **অধ্যবসায়**—অধ্যবসায়; **যুক্তঃ**—যুক্ত; **প্রাচীন**—পূর্ব; **মূলেষু**—মূলসহ; **কুশেষু**—কুশাসন; **ধীরঃ**—আত্ম-সংযত; **উদক্‌-মুখঃ**—উত্তরমুখী; **দক্ষিণ**—দক্ষিণদিকে; **কূলে**—তীরে; **আস্তে**—স্থিত হয়ে; **সমুদ্র**—সমুদ্র; **পত্ন্যাঃ**—পত্নীর (গঙ্গা); **স্ব**—নিজের; **সুত**—পুত্র; **ন্যস্ত**—ত্যাগ করে; **ভারঃ**—প্রশাসনের দায়িত্ব।

অনুবাদ

সম্পূর্ণরূপে আত্ম-সংযত মহারাজ পরীক্ষিৎ তাঁর পুত্রের হাতে রাজ্যভার ন্যস্ত করে, গঙ্গার দক্ষিণ তীরে পূর্বমূল কুশাসনে উত্তরমুখী হয়ে উপবেশন করলেন।

তাৎপর্য

গঙ্গাকে সমুদ্রপত্নী বলা হয়। মূলসহ কুশ নির্মিত আসনকে শুদ্ধ বলে বিবেচনা করা হয়, এবং সেই মূলগুলি যখন উত্তরমুখী হয়, তখন তা পবিত্র বলে বিবেচিত হয়। উত্তরদিকে মুখ করে বসা পারমার্থিক সিদ্ধিলাভে অত্যন্ত অনুকূল। গৃহত্যাগের পূর্বে মহারাজ পরীক্ষিৎ তাঁর পুত্রের হস্তে রাজ্যভার ন্যস্ত করেছিলেন। এইরূপে তিনি সর্বতোভাবে অনুকূল অবস্থা প্রাপ্ত হয়েছিলেন।

শ্লোক ১৮

এবং চ তস্মিন্নরদেবদেবে
প্রায়োপবিষ্টে দিবি দেবসঙ্ঘাঃ ।
প্রশস্য ভূমৌ ব্যকিরন্ প্রসূনৈ-
র্মুদা মুহুর্দুন্দুভয়শ্চ নেদুঃ ॥ ১৮ ॥

এবম্—এইভাবে; চ—এবং; তস্মিন্—তাতে; নর-দেব-দেবে—রাজার উপর; প্রায়োপবিষ্টে—আমরণ উপবাসের ব্রত গ্রহণকারী; দিবি—আকাশে; দেব—দেবতারা; সঙ্ঘাঃ—তাঁরা সকলে; প্রশস্য—প্রশংসা করে; ভূমৌ—পৃথিবীতে; ব্যকিরন্—বর্ষণ করেছিলেন; প্রসূনৈঃ—পুষ্প; মুদা—আনন্দে; মুহুঃ—নিরন্তর; দুন্দুভয়ঃ—দুন্দুভিবাদ্য; চ—ও; নেদুঃ—বাজিয়েছিলেন।

অনুবাদ

মহারাজ পরীক্ষিৎ যখন এইভাবে প্রায়োপবেশন করলেন, তখন স্বর্গের দেবতারা তাঁর কার্যের প্রশংসা করে পুষ্পবৃষ্টি করতে লাগলেন এবং দুন্দুভি বাজাতে লাগলেন।

তাৎপর্য

মহারাজ পরীক্ষিতের সময়েও গ্রহ থেকে গ্রহান্তরে সংবাদ আদান প্রদান হত, এবং মহারাজ পরীক্ষিতের প্রায়োপবেশনের সংবাদ স্বর্গের দেবতাদের কাছে পৌঁছেছিল। দেবতারা মানুষদের থেকে অনেক বেশি সমৃদ্ধিশালী, কিন্তু তাঁরা সকলে পরমেশ্বর ভগবানের নির্দেশের অনুগামী। স্বর্গলোকে কোন নাস্তিক নেই। তাই তাঁরা সর্বদা পৃথিবীর ভগবদ্ভক্তদের প্রশংসা করেন, এবং পরীক্ষিৎ মহারাজের আচরণে তাঁরা অত্যন্ত আনন্দিত হয়েছিলেন এবং দুন্দুভি বাজিয়ে পৃথিবীর উপর পুষ্পবৃষ্টি করেছিলেন। কেউ যখন ভগবদ্ধামে ফিরে যান, তখন দেবতারা অত্যন্ত আনন্দিত হন। তাঁরা ভগবদ্ভক্তদের প্রতি সর্বদা এতই প্রসন্ন যে, তাঁদের আধিদৈবিক শক্তির দ্বারা সর্বতোভাবে ভগবদ্ভক্তদের সাহায্য করেন এবং তাঁদের সেই কার্যকলাপে ভগবান তাঁদের প্রতি প্রসন্ন হন। ভগবান, দেবতা এবং এই পৃথিবীর ভগবদ্ভক্তদের মধ্যে পূর্ণ সহযোগিতার একটি অদৃশ্য শৃঙ্খল রয়েছে।

শ্লোক ২০

ন বা ইদং রাজর্ষিবর্য চিত্রং
ভবৎসু কৃষ্ণং সমনুব্রতেষু ।
যেঽধ্যাসনং রাজকিরীটজুষ্টং
সদ্যো জহুর্ভগবৎপার্শ্বকামাঃ ॥ ২০ ॥

ন—না; **বা**—এই প্রকার; **ইদম্**—এই; **রাজর্ষি**—ঋষিসদৃশ রাজা; **বর্য**—প্রধান; **চিত্রম্**—আশ্চর্যজনক; **ভবৎসু**—আপনাদের সকলকে; **কৃষ্ণম্**—শ্রীকৃষ্ণ; **সমনুব্রতেষু**—সেই ধারায় যাঁরা দৃঢ়ভাবে স্থিত; **যে**—যিনি; **অধ্যাসনম্**—সিংহাসনে আরূঢ়; **রাজ-কিরীট**—রাজমুকুট; **জুষ্টম্**—অলঙ্কৃত ; **সদ্যঃ**—শীঘ্র; **জহুঃ**—ত্যাগ করেছিলেন; **ভগবৎ**—পরমেশ্বর ভগবান; **পার্শ্বকামাঃ**—সঙ্গ লাভের অভিলাষী।

অনুবাদ

(ঋষিরা বললেন ঃ) হে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের নিষ্ঠাপরায়ণ অনুসরণকারী পাণ্ডু বংশীয় রাজর্ষিদের কুলতিলক! আপনি যে পরমেশ্বর ভগবানের নিত্য সান্নিধ্য লাভের জন্য বহু রাজাদের রাজমুকুটে শোভিত আপনার সিংহাসন পরিত্যাগ করেছেন, তাতে আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই।

তাৎপর্য

রাষ্ট্রের প্রশাসনিক পদে অধিষ্ঠিত মূর্খ রাজনীতিবিদেরা মনে করে যে, তাদের সেই অস্থায়ী পদটি হচ্ছে জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ প্রাপ্তি, এবং তাই তারা তাদের জীবনের অন্তিম সময় পর্যন্ত সেই পদ আঁকড়ে ধরে থাকে। তারা জানে না যে, জীবনের সর্বোচ্চ প্রাপ্তি হচ্ছে মুক্তি লাভ করে ভগবদ্ধামে ভগবানের নিত্য পার্ষদত্ব লাভ করা। *শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায়* ভগবান বহুবার আমাদের শিক্ষার জন্য উল্লেখ করেছেন যে, তাঁর নিত্য ধামে ফিরে যাওয়াই হচ্ছে জীবনের চরম উদ্দেশ্য।

ভগবান শ্রীনৃসিংহদেবের কাছে প্রহ্লাদ মহারাজ প্রার্থনা করেছেন, 'হে প্রভু! আমি আপনার ভয়ঙ্কর উগ্র নরসিংহ রূপকে মোটেই ভয় করি না, কিন্তু আমি জড় বিষয়াসক্ত জীবনকে অত্যন্ত ভয় করি। জড়জাগতিক জীবন পাথরের চাকির মতো, এবং আমরা তাতে নিরন্তর চূর্ণ-বিচূর্ণ হচ্ছি। আমি জীবনের উত্তাল তরঙ্গে ভয়াবহ ঘূর্ণিতে পতিত হয়েছি, তাই হে ভগবান, আমি প্রার্থনা করি যে, আপনার নিত্য ধামে আমাকে আপনার এক সেবকরূপে ফিরিয়ে নিয়ে যান। জড়জাগতিক জীবনের

সেইটিই হচ্ছে চরম মুক্তি। জড়জাগতিক জীবন সম্বন্ধে আমি অত্যন্ত তিক্ত অভিজ্ঞতা লাভ করেছি। আমি আমার কর্মের বশীভূত হয়ে যেই যেই যোনিতে জন্মগ্রহণ করেছি, সর্বত্রই আমি দুরকমের অত্যন্ত কষ্টদায়ক অভিজ্ঞতা অর্জন করেছি—যথা, প্রিয়জনের বিচ্ছেদ এবং অবাঞ্ছিতের সংযোগ। আর তার প্রতিকার করার যে ব্যবস্থাই আমি গ্রহণ করেছি, তা রোগের থেকেও অধিক ভয়ঙ্কর। আমি জন্ম-জন্মান্তরে এক স্থান থেকে আর এক স্থানে ঘুরে বেড়াচ্ছি, তাই আমি আপনার কাছে প্রার্থনা করি যে, আপনি যেন আমাকে আপনার শ্রীচরণকমলে আশ্রয় দান করেন।

পাণ্ডুবংশীয় রাজারা, যাঁরা ছিলেন অনেক মহাত্মাদের থেকেও উচ্চ পদে অধিষ্ঠিত, তাঁরা জড়জাগতিক জীবনের তিক্ত পরিণতির কথা জানতেন। তাঁরা কখনোই তাঁদের রাজসিংহাসনের ঐশ্বর্যে মোহিত হননি, পক্ষান্তরে তাঁরা সেই সুযোগের প্রতীক্ষা করছিলেন, যখন ভগবান তাঁদের নিত্য পার্ষদরূপে তাঁর কাছে ডেকে নেবেন।

মহারাজ পরীক্ষিৎ ছিলেন মহারাজ যুধিষ্ঠিরের উপযুক্ত পৌত্র। মহারাজ যুধিষ্ঠির তাঁর রাজসিংহাসন হেলাভরে পরিত্যাগ করে তাঁর পৌত্রকে তা দান করেছিলেন। তেমনই মহারাজ যুধিষ্ঠিরের পৌত্র মহারাজ পরীক্ষিৎ তাঁর রাজসিংহাসন হেলাভরে পরিত্যাগ করে তাঁর পুত্র জনমেজয়কে দান করেছিলেন। সেই বংশের সমস্ত রাজারাই এইভাবে আচরণ করেছিলেন, কেননা তাঁরা সকলেই ছিলেন শ্রীকৃষ্ণের ঐকান্তিক ভক্ত। ভগবানের ভক্তরা কখনো জড়জাগতিক জীবনের জাঁকজমকের দ্বারা মোহিত হন না, পক্ষান্তরে তাঁরা জড় জগতের মায়িক, অনিত্য বস্তুসমূহের প্রতি অনাসক্ত থেকে নিরপেক্ষভাবে জীবন যাপন করেন।

শ্লোক ২১

সর্বে বয়ং তাবদিহাস্মহেঽথ
কলেবরং যাবদসৌ বিহায় ।
লোকং পরং বিরজস্কং বিশোকং
যাস্যত্যয়ং ভাগবতপ্রধানঃ ॥ ২১ ॥

সর্বে—সকলে; **বয়ম্**—আমরা; **তাবৎ**—যতক্ষণ পর্যন্ত; **ইহ**—এই স্থানে; **আস্মহে**—থাকব; **অথ**—তারপর; **কলেবরম্**—দেহ; **যাবৎ**—ততক্ষণ; **অসৌ**—রাজা; **বিহায়**—পরিত্যাগ করে; **লোকম্**—লোক; **পরম্**—পরম; **বিরজস্কম্**—জড় কলুষ থেকে

সম্পূর্ণরূপে মুক্ত; **বিশোকম্**—সমস্ত শোক থেকে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত; **যাস্যতি**—ফিরে যায়; **অয়ম্**—এই; **ভাগবত**—ভক্ত; **প্রধানঃ**—শ্রেষ্ঠ।

অনুবাদ

যতক্ষণ পর্যন্ত ভগবানের শ্রেষ্ঠ ভক্ত মহারাজ পরীক্ষিৎ সমস্ত জড় কলুষ এবং সর্ব প্রকার শোক থেকে পূর্ণরূপে মুক্ত হয়ে পরম ধামে ফিরে না যান, ততক্ষণ পর্যন্ত আমরা সকলে এখানে প্রতীক্ষা করব।

তাৎপর্য

আকাশের মেঘের সঙ্গে তুলনীয় সীমিত জড় সৃষ্টির ঊর্ধ্বে রয়েছে পরব্যোম বা চিদাকাশ, যা বৈকুণ্ঠ নামক গ্রহপুঞ্জে পূর্ণ। সেই বৈকুণ্ঠলোকও ভিন্ন ভিন্ন নামে পরিচিত, যথা—পুরুষোত্তমলোক, অচ্যুতলোক, ত্রিবিক্রমলোক, হৃষিকেশলোক, কেশবলোক, অনিরুদ্ধলোক, মাধবলোক, প্রদ্যুম্নলোক, সঙ্কর্ষণলোক, শ্রীধরলোক, বাসুদেবলোক, অযোধ্যালোক, দ্বারকালোক ইত্যাদি অসংখ্য চিন্ময় গ্রহলোক, যেখানে পরমেশ্বর ভগবান হচ্ছেন সব কিছুর কেন্দ্র; এবং সেখানে সমস্ত জীবাত্মা ভগবানেরই মতো চিন্ময় দেহসম্পন্ন মুক্ত আত্মা। সেখানে কোন জড় কলুষ নেই; সেখানে সব কিছুই চিন্ময় এবং তাই সেখানে কোন রকম শোক নেই। সেই জগৎ দিব্য আনন্দে পূর্ণ; সেখানে জন্ম নেই, মৃত্যু নেই, জরা নেই এবং ব্যাধি নেই।

উপরোক্ত সেই চিজ্জগতে সমস্ত বৈকুণ্ঠলোকের মধ্যে একটি পরম ধাম রয়েছে যার নাম গোলোক বৃন্দাবন এবং তা হচ্ছে পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এবং তাঁর বিশিষ্ট পার্ষদদের ধাম। মহারাজ পরীক্ষিতের সেই ধাম প্রাপ্তি পূর্ব নির্ধারিত ছিল এবং সেখানে সমবেত মহর্ষিরা পূর্বেই তা জ্ঞাত ছিলেন। তাঁরা সকলে মহারাজ পরীক্ষিতের মহাপ্রস্থান সম্বন্ধে নিজেদের মধ্যে আলোচনা করেছিলেন; এবং তাঁর অন্তিম সময় পর্যন্ত তাঁকে দেখতে চেয়েছিলেন কেননা এ রকম একজন মহান ভক্তকে তাঁরা আর দেখতে পাবেন না। ভগবানের কোনও মহান ভক্ত যখন এই জগৎ থেকে চলে যান, তখন শোক করা উচিত নয়, কেননা ভগবদ্ভক্ত ভগবদ্ধামে ভগবানের কাছে ফিরে যান। তবে দুঃখের বিষয় হচ্ছে যে, এই রকম একজন মহান ভক্ত আমাদের দৃষ্টিপথের অন্তরালে চলে যান। আমাদের এই জড় চক্ষুর দ্বারা ভগবৎ দর্শন যেমন বিরল, ভগবানের মহান ভক্তদের দর্শনও তেমন বিরল। তাই মহর্ষিরা স্থির করেছিলেন যে, পরীক্ষিৎ মহারাজের অন্তিম সময় পর্যন্ত তাঁরা সেখানে প্রতীক্ষা করবেন।

শ্লোক ২২

আশ্রুত্য তদৃষিগণবচঃ পরীক্ষিৎ
সমং মধুচ্যুদ্ গুরু চাব্যলীকম্ ।
আভাষতৈনানভিনন্দ্য যুক্তান্
শুশ্রূষমাণশ্চরিতানি বিষ্ণোঃ ॥ ২২ ॥

আশ্রুত্য—শোনার পর; তৎ—তা; ঋষিগণ—সমবেত ঋষিগণ; বচঃ—বললেন; পরীক্ষিৎ—মহারাজ পরীক্ষিৎ; সমম্—নিরপেক্ষ; মধু-চ্যুৎ—শ্রুতিমধুর; গুরু—গম্ভীর; চ—ও; অব্যলীকম্—পূর্ণরূপে সত্য; আভাষত—বলেছিলেন; এনান্—তাঁরা সকলে; অভিনন্দ্য—অভিনন্দন জানিয়েছিলেন; যুক্তান্—যথাযথভাবে প্রস্তাবিত; শুশ্রূষমাণঃ—শুনতে উৎসুক; চরিতানি—কার্যকলাপ; বিষ্ণোঃ—পরমেশ্বর ভগবান।

অনুবাদ

ঋষিরা যা বলেছিলেন তা অত্যন্ত শ্রুতিমধুর, গম্ভীর অর্থপূর্ণ এবং পূর্ণরূপে সত্য ছিল। তাই তা শুনে মহারাজ পরীক্ষিৎ শ্রীকৃষ্ণের কার্যকলাপ শোনবার অভিলাষে সেই মহর্ষিদের অভিনন্দন জানিয়ে বলতে লাগলেন।

শ্লোক ২৩

সমাগতাঃ সর্বত এব সর্বে
বেদা যথা মূর্তিধরাস্ত্রিপৃষ্ঠে ।
নেহাথনামুত্র চ কশ্চনার্থ
ঋতে পরানুগ্রহমাত্মশীলম্ ॥ ২৩ ॥

সমাগতাঃ—সমবেত; সর্বতঃ—সমস্ত দিক থেকে; এব—নিশ্চিতভাবে; সর্বে—আপনারা সকলে; বেদাঃ—পরম জ্ঞান; যথা—যেমন; মূর্তিধরাঃ—মূর্তিমান; ত্রি-পৃষ্ঠে—ব্রহ্মলোকে (যা ঊর্ধ্ব, মধ্য এবং অধঃলোকের ঊর্ধ্বে); ন—না; ইহ—এই জগতে; অথ—তারপর; ন—না; অমুত্র—অন্য জগতে; চ—ও; কশ্চন—অন্য কোন; অর্থঃ—প্রয়োজন; ঋতে—বিনা; পর—অন্য; অনুগ্রহম্—কৃপা; আত্মশীলম্—স্ব-স্বভাব।

অনুবাদ

রাজা বললেন—হে মহর্ষিগণ! আপনারা সকলে অত্যন্ত কৃপাপরবশ হয়ে ব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত দিক থেকে এখানে এসেছেন। আপনারা সকলে ত্রিভুবনের উর্ধ্বে (সত্যলোকে) বিরাজমান মূর্তিমান বেদসমূহের মতো। কেননা অপরের প্রতি অনুগ্রহ করাই আপনাদের স্বভাব, এবং তা ছাড়া এই জীবনে অথবা পরবর্তী জীবনে আপনাদের কোন স্বার্থ নেই।

তাৎপর্য

ছয় প্রকার ঐশ্বর্য আছে, যথা—সম্পদ, বল, যশ, সৌন্দর্য, জ্ঞান এবং বৈরাগ্য। মূলত এগুলি পরমেশ্বর ভগবানেরই গুণ। সেই পরম পুরুষের বিভিন্ন অংশ জীবের মধ্যেও সেই সমস্ত গুণগুলি আংশিকভাবে বিরাজমান। জীব বড় জোর শতকরা ৭৮ ভাগ পর্যন্ত এই গুণগুলি অর্জন করতে পারে। জড় জগতের সমস্ত গুণগুলি (ভগবানের গুণের শতকরা ৭৮ ভাগ পর্যন্ত) জড়া শক্তির দ্বারা আচ্ছন্ন, ঠিক যেমন কখনো কখনো সূর্য মেঘের দ্বারা আচ্ছাদিত হয়ে পড়ে। সূর্যের স্বাভাবিক দীপ্তির তুলনায় আচ্ছাদিত সূর্যের শক্তি যেমন অত্যন্ত ক্ষীণ, তেমনই জড় জগতের বন্ধনে আবদ্ধ জীবদের মধ্যে সেই সমস্ত গুণগুলি প্রায় লুপ্ত হয়ে যায়।

ব্রহ্মাণ্ডের তিনটি গ্রহলোক পর্যায় রয়েছে, যথা—অধঃলোক, মধ্যলোক এবং উর্ধ্বলোক। পৃথিবীর মানুষেরা মধ্যলোকের যেখানে শুরু হচ্ছে সেখানে অবস্থিত, কিন্তু ব্রহ্মা এবং তাঁর সমস্তরের জীবেরা উর্ধ্বলোকে বাস করেন, যাদের মধ্যে সর্বোচ্চ লোক হচ্ছে সত্যলোক। সত্যলোকের অধিবাসীরা পূর্ণরূপে বৈদিক জ্ঞানে পারঙ্গম, এবং তার ফলে তাঁরা মায়ারূপ মেঘের আবরণ থেকে মুক্ত। তাই তাঁদের মূর্তিমান বেদ বলা হয়। পূর্ণরূপে জড় এবং দিব্য জ্ঞানসম্পন্ন এই সমস্ত পুরুষেরা জড় এবং চিন্ময় উভয় জগতের প্রতিই উদাসীন। তাঁরা প্রকৃতপক্ষে নিস্পৃহ ভক্ত বা শান্ত ভক্ত। এই জড় জগতে তাঁদের ঈপ্সিত কিছু নেই, এবং চিন্ময় জগতে তাঁরা স্বয়ংসম্পূর্ণ। তা হলে তাঁরা এই জড় জগতে আসেন কেন? ভগবানের আদেশে, অধঃপতিত জীবদের উদ্ধার করার জন্য, তাঁরা বিভিন্ন গ্রহলোকে অবতরণ করেন। এই পৃথিবীতে বিভিন্ন পরিবেশে এবং বিভিন্ন পরিস্থিতিতে মানুষদের মঙ্গল সাধনের জন্য তাঁরা আসেন। জড় জগতে দুর্দশাগ্রস্ত মায়াচ্ছন্ন জীবদের পুনরুদ্ধার করা ছাড়া তাঁদের আর কিছুই করণীয় নেই।

শ্লোক ২৪

ততশ্চ বঃ পৃচ্ছ্যমিমং বিপৃচ্ছে
বিশ্রভ্য বিপ্রা ইতিকৃত্যতায়াম্ ।
সর্বাত্মনা ম্রিয়মাণৈশ্চ কৃত্যং
শুদ্ধং চ তত্রামৃশতাভিযুক্তাঃ ॥ ২৪ ॥

ততঃ—এই প্রকার; **চ**—এবং; **বঃ**—আপনাকে; **পৃচ্ছ্যম্**—প্রশ্ন করার যোগ্য; **ইমম্**—এই; **বিপৃচ্ছে**—প্রশ্ন করি; **বিশ্রভ্য**—বিশ্বাসযোগ্য; **বিপ্রাঃ**—ব্রাহ্মণগণ; **ইতি**—এইভাবে; **কৃত্যতায়াম্**—বিভিন্ন কর্তব্যের মধ্যে; **সর্ব-আত্মনা**—প্রত্যেকের দ্বারা; **ম্রিয়মাণৈঃ**—বিশেষভাবে যারা মরণোন্মুখ; **চ**—এবং; **কৃত্যম্**—কর্তব্যপরায়ণ; **শুদ্ধম্**—সঠিক; **চ**—এবং; **তত্র**—সেখানে; **অমৃশত**—পূর্ণরূপে বিচারপূর্বক; **অভিযুক্তাঃ**—উপযুক্ত।

অনুবাদ

হে বিশ্বাসভাজন ব্রাহ্মণগণ! আমি এখন আপনাদের কাছে আমার আসন্ন কর্তব্য সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করছি। দয়া করে, যথাযথভাবে বিচার করে আমাকে বলুন, সমস্ত পরিস্থিতিতে প্রতিটি মানুষের, বিশেষ করে যে মানুষ মরণোন্মুখ, তার অবশ্য কর্তব্য কি।

তাৎপর্য

এই শ্লোকে বিজ্ঞ মহর্ষিদের কাছে মহারাজ দুটি প্রশ্ন উপস্থাপন করেছেন। প্রথম প্রশ্নটি হচ্ছে সর্ব অবস্থায় প্রতিটি মানুষের কি কর্তব্য, এবং দ্বিতীয় প্রশ্নটি, মরণোন্মুখ মানুষের অবশ্য কর্তব্য কি? এই দুটি প্রশ্নের মধ্যে মরণোন্মুখ মানুষটি সম্বন্ধে প্রশ্নটি সব চাইতে গুরুত্বপূর্ণ, কেননা প্রতিটি মানুষই মরণশীল—হয় এখনই, নয় একশ বছর পরে। মানুষের আয়ু কতদিন সেই প্রশ্নটি নিরর্থক, কিন্তু মরণাপন্ন মানুষের কি কর্তব্য, তা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

মহারাজ পরীক্ষিৎ এই প্রশ্ন দুটিই শুকদেব গোস্বামীর আগমনের ঠিক পরে করেছিলেন, এবং বিশেষ করে সমগ্র শ্রীমদ্ভাগবতে, দ্বিতীয় স্কন্ধ থেকে শুরু করে দ্বাদশ স্কন্ধ পর্যন্ত, এই প্রশ্ন দুটিরই আলোচনা করা হয়েছে।

এই থেকে চরম সিদ্ধান্ত হচ্ছে যে, পরমেশ্বর ভগবানের প্রেমময়ী সেবাই প্রতিটি মানুষের পরম কর্তব্য। সেকথা ভগবান স্বয়ং শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার শেষ অংশে প্রতিটি

মানুষের নিত্য ধর্ম বলে বর্ণনা করেছেন। মহারাজ পরীক্ষিৎ সেই সম্বন্ধে ইতিমধ্যে অবগত ছিলেন, কিন্তু তিনি চেয়েছিলেন যে, সেখানে সমবেত সমস্ত মহর্ষিরা যেন ঐক্যবদ্ধভাবে তাঁর সেই বিশ্বাসকে সমর্থন করেন যাতে তিনি নির্দ্বিধায় তাঁর কর্তব্য নির্ণয় করতে পারেন। তিনি বিশেষ করে 'শুদ্ধ' শব্দটির উল্লেখ করেছেন।

অপ্রাকৃত উপলব্ধি বা আত্ম উপলব্ধির জন্য বিভিন্ন প্রকারের দার্শনিকেরা বিভিন্ন প্রকার পন্থা বর্ণনা করে গেছেন। তাদের কয়েকটি উত্তম পন্থা, এবং অন্যগুলি মধ্যম এবং কনিষ্ঠ পন্থা। তবে সর্বোত্তম পন্থা হচ্ছে অন্য সমস্ত পন্থা পরিত্যাগ করে কেবল পরমেশ্বর ভগবানের শ্রীপাদপদ্মের শরণাগতির ফলে সমস্ত পাপ থেকে মুক্ত হওয়া।

শ্লোক ২৫

তত্রাভবদ্ভগবান্ ব্যাসপুত্রো
যদৃচ্ছয়া গামটমানোঽনপেক্ষঃ ।
অলক্ষ্যলিঙ্গো নিজলাভতুষ্টো
বৃতশ্চ বালৈরবধূতবেষঃ ॥ ২৫ ॥

তত্র—সেখানে; **অভবৎ**—আবির্ভূত হয়েছিলেন; **ভগবান্**—শক্তিশালী; **ব্যাসপুত্রঃ**—ব্যাসদেবের পুত্র; **যদৃচ্ছয়া**—ইচ্ছাক্রমে; **গাম্**—পৃথিবী; **অটমানঃ**—পর্যটন; **অনপেক্ষঃ**—নিরপেক্ষ; **অলক্ষ্য**—প্রকাশিত; **লিঙ্গঃ**—লক্ষণাদি; **নিজলাভ**—আত্ম উপলব্ধ; **তুষ্টঃ**—সন্তুষ্ট; **বৃতঃ**—পরিবৃত; **চ**—এবং; **বালৈঃ**—বালকদের দ্বারা; **অবধূত**—অপর কর্তৃক অবজ্ঞাত; **বেষঃ**—বেশভূষা।

অনুবাদ

তখন ব্যাসদেবের শক্তিমান পুত্র যদৃচ্ছক্রমে পৃথিবী পর্যটন করতে করতে সেখানে এসে উপস্থিত হলেন। তিনি ছিলেন বহির্বিষয়ে উদাসীন, কোন আশ্রম বিশেষের চিহ্নবিহীন, আত্মারাম এবং অবধূত বেশধারী। তাঁকে পাগল ভেবে নারী ও বালকেরা বেষ্টন করেছিল।

তাৎপর্য

'ভগবান' শব্দটি কখনো কখনো শুকদেব গোস্বামীর মতো ভগবানের মহান্ ভক্তদের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হয়। এই প্রকার মুক্ত পুরুষেরা জাগতিক বিষয়ে উদাসীন

কেননা তাঁরা ভগবদ্ভক্তির প্রভাবে আত্মতৃপ্ত। পূর্বে বর্ণনা করা হয়েছে যে, শুকদেব গোস্বামী আনুষ্ঠানিকভাবে কোন গুরুগ্রহণ করেননি, এবং দীক্ষা সংস্কারের দ্বারা সংস্কৃতিপ্রাপ্ত হননি। তাঁর পিতা ব্যাসদেব ছিলেন তাঁর স্বাভাবিক গুরু, কেননা তিনি তাঁর কাছ থেকে শ্রীমদ্ভাগবত শ্রবণ করেছিলেন। তারপর তিনি সম্পূর্ণরূপে আত্মতৃপ্ত হন। এভাবে তিনি কোন আনুষ্ঠানিক প্রক্রিয়ার উপর নির্ভরশীল ছিলেন না।

উপচারিক বিধি তাঁদেরই জন্য আবশ্যক, যাঁরা সম্পূর্ণরূপে মোক্ষ লাভ করতে চান, কিন্তু শ্রীল শুকদেব গোস্বামী তাঁর পিতার কৃপায় সেই স্তরে ইতিমধ্যেই অধিষ্ঠিত ছিলেন। তরুণ বালকরূপে তাঁর যথাযথ বেশ পরিধান করা উচিত ছিল, কিন্তু তিনি সম্পূর্ণ নগ্ন অবস্থায় সব রকম সামাজিক আচার ব্যবহারে উদাসীন হয়ে ইতস্তত ভ্রমণ করছিলেন। সাধারণ মানুষ তাঁকে অবহেলা করেছিল, এবং বালকেরা ও স্ত্রীলোকেরা কৌতূহলের বশে তাঁকে বেষ্টন করেছিল।

পরীক্ষিৎ মহারাজের প্রশ্ন থেকে বোঝা যায় যে, সেখানে সমবেত মহর্ষিরা তাঁর কর্তব্য সম্বন্ধে একমত হতে পারেননি। বিভিন্ন মানুষের বিভিন্ন গুণ অনুসারে পারমার্থিক উদ্দেশ্য সাধনের বিভিন্ন পন্থা রয়েছে। কিন্তু ভগবানের প্রতি ভক্তিমূলক সেবার সর্বোচ্চ সিদ্ধিলাভই হচ্ছে জীবনের পরম লক্ষ্য। চিকিৎসকদের মধ্যে যেমন কখনো কখনো মতভেদ হয়, তেমনই ঋষিদের মধ্যেও নিরাময়ের বিভিন্ন পন্থা সম্বন্ধে মতভেদ হয়। সেই সময় ব্যাসদেবের মহাশক্তিশালী পুত্র সেখানে উপস্থিত হয়েছিলেন।

শ্লোক ২৬

তং দ্ব্যষ্টবর্ষং সুকুমারপাদ-
করোরুবাহ্বংসকপোলগাত্রম্ ।
চার্বায়তাক্ষোন্নসতুল্যকর্ণ-
সুভ্র্বাননং কম্বুসুজাতকণ্ঠম্ ॥ ২৬ ॥

তম্—তার; **দ্ব্যষ্ট**—ষোল; **বর্ষম্**—বয়স; **সুকুমার**—নির্মল; **পাদ**—পা; **কর**—হাত; **উরু**—জঙ্ঘা; **বাহু**—ভুজ; **অংস**—কাঁধ; **কপোল**—গাল; **গাত্রম্**—দেহ; **চারু**—সুন্দর; **আয়ত**—বিস্তৃত; **অক্ষ**—চোখ; **উন্নস**—উন্নত নাসিকা; **তুল্য**—সদৃশ; **কর্ণ**—কান; **সুভ্রু**—সুন্দর ভ্রূযুগল; **আননম্**—মুখমণ্ডল; **কম্বু**—শঙ্খ; **সুজাত**—সুন্দরভাবে গঠিত; **কণ্ঠম্**—কণ্ঠ।

অনুবাদ

ব্যাসদেবের সেই পুত্রের বয়স ছিল ষোল বছর। তাঁর চরণ, হাত, জঙ্ঘা, বাহু, স্কন্ধ, কপোল এবং দেহের অন্যান্য সমস্ত অঙ্গগুলি অত্যন্ত সুন্দরভাবে গঠিত ছিল। তাঁর চোখ দুটি ছিল অত্যন্ত সুন্দর ও আকর্ণ বিস্তৃত, তাঁর নাসিকা ছিল উন্নত এবং কান দুটি ছিল ঠিক এক মাপের। তাঁর মুখমণ্ডল ছিল অত্যন্ত আকর্ষণীয়, এবং তাঁর কণ্ঠদেশ ছিল অত্যন্ত সুগঠিত এবং শঙ্খের মতো সুন্দর।

তাৎপর্য

শ্রদ্ধাস্পদ ব্যক্তিদের বর্ণনা চরণ থেকে শুরু করা হয়, এবং সেই চিরাচরিত সম্মানজনক প্রথা শুকদেব গোস্বামীর ক্ষেত্রেও পালন করা হয়েছিল। তাঁর বয়স ছিল তখন কেবলমাত্র ষোল বছর। মানুষকে সম্মান করা হয় তাঁর বয়সের জন্য নয়, তাঁর কর্মের জন্য। বয়সে প্রবীণ না হলেও কেউ তাঁর অভিজ্ঞতায় প্রবীণ হতে পারেন। শ্রীশুকদেব গোস্বামী, যাঁকে এখানে ব্যাসদেবের পুত্র বলে বর্ণনা করা হয়েছে, তাঁর জ্ঞানের ভিত্তিতে সেখানে সমবেত সমস্ত মহর্ষিদের থেকে অধিক অভিজ্ঞ ছিলেন, যদিও তাঁর বয়স তখন ছিল কেবলমাত্র ষোল বছর।

শ্লোক ২৭

নিগূঢ়জত্রুং পৃথুতুঙ্গবক্ষস-
মাবর্তনাভিং বলিবল্গূদরঞ্চ
দিগম্বরং বক্ত্রবিকীর্ণকেশং
প্রলম্ববাহুং স্বমরোত্তমাভম্ ॥ ২৭ ॥

নিগূঢ়—আচ্ছাদিত; জত্রুম্—কণ্ঠের অধঃভাগস্থ অস্থি; পৃথু—বিস্তীর্ণ; তুঙ্গ—উন্নত; বক্ষম্—বক্ষ; আবর্ত—আবর্ত; নাভিম্—নাভি; বলিবল্গু—ত্রিবলীরেখা; উদরম্—উদর; চ—ও; দিগম্বরম্—দিকসমূহ যাঁর বস্ত্র (উলঙ্গ); বক্র—কুঞ্চিত; বিকীর্ণ—বিস্তৃত; কেশম্—চুল; প্রলম্ব—দীর্ঘ; বাহুম্—বাহু; সু-অমর-উত্তম—সুন্দরের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ; (শ্রীকৃষ্ণ); আভম্—অঙ্গকান্তি।

অনুবাদ

তাঁর কণ্ঠের অধঃভাগের অস্থি মাংসের দ্বারা আবৃত, বক্ষস্থল বিশাল সমুন্নত, নাভিমণ্ডল গভীর আবর্তের মতো, উদর ত্রিবলী রেখায় অঙ্কিত। তাঁর বাহুযুগল

দীর্ঘ, এবং কুঞ্চিত কেশদাম তাঁর সুন্দর মুখমণ্ডলের উপর ইতস্তত বিকীর্ণ। দিকসমূহই তাঁর বস্ত্র, এবং তাঁর অঙ্গকান্তি অমরোত্তম শ্রীকৃষ্ণের মতো অতি রমণীয়।

তাৎপর্য

তাঁর দেহসৌষ্ঠব থেকে বোঝা গিয়েছিল যে, তিনি সাধারণ মানুষদের থেকে ভিন্ন। শুকদেব গোস্বামীর দেহসৌষ্ঠব সম্বন্ধে যে লক্ষণগুলি বর্ণনা করা হয়েছে, তা সাধারণ লক্ষণ, এবং সামুদ্রিক (Physiognomical) গণনা অনুসারে সেগুলি মহাপুরুষদের লক্ষণ। তাঁর অঙ্গকান্তি ছিল ভগবান শ্রীকৃষ্ণের মতো, যিনি হচ্ছেন সমস্ত দেবতা এবং জীবেদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ।

শ্লোক ২৮

শ্যামং সদাপীব্যবয়োঽঙ্গলক্ষ্ম্যা
স্ত্রীণাং মনোজ্ঞং রুচিরস্মিতেন ।
প্রত্যুত্থিতাস্তে মুনয়ঃ স্বাসনেভ্য-
স্তল্লক্ষণজ্ঞা অপি গূঢ়বর্চসম্ ॥ ২৮ ॥

শ্যামম্—শ্যামবর্ণ; **সদা**—সর্বদা; **অপীব্য**—অত্যধিক; **বয়ঃ**—বয়স; **অঙ্গ**—লক্ষণসমূহ; **লক্ষ্ম্যা**—ঐশ্বর্যের দ্বারা; **স্ত্রীণাম্**—রমণীদের; **মনোজ্ঞম্**—আকর্ষণীয়; **রুচির**—সুন্দর; **স্মিতেন**—হাসি; **প্রত্যুত্থিতাঃ**—উঠে দাঁড়ালেন; **তে**—তাঁরা সকলে; **মুনয়ঃ**—মহর্ষিগণ; **স্ব**—স্বীয়; **আসনেভ্যঃ**—আসন থেকে; **তৎ**—তাঁরা; **লক্ষণজ্ঞা**—শারীরিক লক্ষণ বিচারে পারদর্শী; **অপি**—ও; **গূঢ়-বর্চসম্**—যাঁর মহিমা আচ্ছাদিত।

অনুবাদ

তাঁর অঙ্গকান্তি শ্যামবর্ণ এবং নবযৌবনজনিত অত্যন্ত সুন্দর। তাঁর দেহের সৌন্দর্য এবং মধুর হাসি রমণীদের কাছে রমণীয় ছিল। যদিও তিনি তাঁর স্বাভাবিক মহিমা লুকাবার চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু সেখানে উপস্থিত মহর্ষিরা ছিলেন দেহের লক্ষণ বিচারে পটু, এবং তাই তাঁকে এক মহাপুরুষরূপে চিনতে পেরে তাঁরা তাঁদের আসন থেকে উঠে দাঁড়িয়ে তাঁকে সম্মান প্রদর্শন করলেন।

শ্লোক ২৯

স বিষ্ণুরাতোঽতিথয়ে আগতায়
তস্মৈ সপর্যাং শিরসাজহার ।
ততো নিবৃত্তা হ্যবুধাঃ স্ত্রিয়োঽর্ভকা
মহাসনে সোপবিবেশ পূজিতঃ ॥ ২৯ ॥

স—তিনি; **বিষ্ণুরাতঃ**—মহারাজ পরীক্ষিৎ, (যিনি সর্বদাই শ্রীবিষ্ণুর দ্বারা রক্ষিত ছিলেন); **অতিথয়ে**—আতিথ্য গ্রহণ করার জন্য; **আগতায়**—সেখানে আগত; **তস্মৈ**—তাঁকে; **সপর্যাম্**—সারা শরীর দিয়ে; **শিরসা**—অবনতমস্তকে; **আজহার**—প্রণতি নিবেদন করেছিলেন; **ততঃ**—তারপর; **নিবৃত্তা**—নিবৃত্ত হয়ে; **হি**—নিশ্চিতভাবে; **অবুধাঃ**—অল্প বুদ্ধিমান; **স্ত্রিয়ঃ**—স্ত্রীগণ; **অর্ভকাঃ**—বালকেরা; **মহাসনে**—শ্রেষ্ঠ আসনে; **স**—তিনি; **উপবিবেশ**—উপবেশন করেছিলেন; **পূজিতঃ**—সম্মানিত হয়ে।

অনুবাদ

মহারাজ পরীক্ষিৎ, যিনি শ্রীবিষ্ণু কর্তৃক রক্ষিত হওয়ার ফলে, বিষ্ণুরাত নামে পরিচিত, অবনতমস্তকে তাঁর মুখ্য অতিথি শুকদেব গোস্বামীকে স্বাগত জানালেন। তখন শুকদেবের অনুগামী নির্বোধ বালক-বালিকারা দূরে পলায়ন করল। শুকদেব গোস্বামী সকলের শ্রদ্ধা গ্রহণ করে শ্রেষ্ঠ আসনে উপবেশন করলেন।

তাৎপর্য

সেই সভায় যখন শুকদেব গোস্বামী এসে উপস্থিত হলেন, তখন শ্রীল ব্যাসদেব, নারদ মুনি এবং অন্য কয়েকজন ব্যতীত সকলেই তাঁদের আসন থেকে উঠে দাঁড়িয়েছিলেন, এবং মহারাজ পরীক্ষিৎ ভগবানের সেই মহান্ ভক্তকে স্বাগত জানিয়ে আনন্দিত হয়ে তাঁকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করেছিলেন। শুকদেব গোস্বামীও প্রত্যভিবাদন জানিয়ে কাউকে আলিঙ্গন করেছিলেন, কারও করমর্দন করেছিলেন, কারও প্রতি ঈষৎ মাথা ঝুঁকিয়েছিলেন এবং তাঁর পিতা ও নারদ মুনিকে প্রণাম করেছিলেন। তখন তাঁকে সেই সভায় মুখ্য আসন প্রদান করা হয়েছিল। যখন রাজা এবং ঋষিরা তাঁকে এইভাবে স্বাগত জানিয়েছিলেন, তখন তাঁকে অনুসরণকারী বালকেরা এবং নির্বোধ স্ত্রীলোকেরা ভীত এবং বিস্ময়ান্বিত হয়েছিল। তখন তারা তাদের চপলতা পরিত্যাগ করেছিল এবং সব কিছু শান্ত এবং গম্ভীর হয়ে উঠেছিল।

শ্লোক ৩০

স সংবৃতস্তত্র মহান্ মহীয়সাং
ব্রহ্মর্ষিরাজর্ষিদেবর্ষিসঙ্ঘৈঃ ।
ব্যরোচতালং ভগবান যথেন্দু-
গ্রহর্ক্ষতারানিকরৈঃ পরীতঃ ॥ ৩০ ॥

সঃ—শ্রীশুকদেব গোস্বামী; **সংবৃতঃ**—পরিবৃত হয়ে; **তত্র**—সেখানে; **মহান্**—মহান; **মহীয়সাম্**—মহত্তম; **ব্রহ্মর্ষি**—ব্রাহ্মণদের মধ্যে ঋষি; **রাজর্ষি**—রাজাদের মধ্যে ঋষি; **দেবর্ষি**—দেবতাদের মধ্যে ঋষি; **সঙ্ঘৈঃ**—সমূহের দ্বারা; **ব্যরোচত**—যোগ্য; **অলম্**—সমর্থ; **ভগবান্**—শক্তিমান; **যথা**—যেমন; **ইন্দুঃ**—চন্দ্র; **গ্রহ**—গ্রহসমূহ; **ঋক্ষ**—নক্ষত্র; **তারা**—তারা; **নিকরৈঃ**—সমূহের দ্বারা; **পরীতঃ**—পরিবৃত।

অনুবাদ

সেই সভায় ব্রহ্মর্ষি, রাজর্ষি এবং দেবর্ষিসমূহে পরিবৃত হয়ে মহা বীর্যবান শুকদেব তখন গ্রহ-নক্ষত্র-তারকারাজিতে পরিবেষ্টিত চন্দ্রের মতো অতি অপূর্ব শোভা ধারণ করেছিলেন।

তাৎপর্য

মহাত্মাদের সেই মহতী সভায় ব্রহ্মর্ষি ব্যাসদেব, দেবর্ষি নারদ, এবং ক্ষত্রিয় রাজাদের মহান্ শাসক পরশুরাম প্রভৃতি উপস্থিত ছিলেন। তাঁদের কেউ ছিলেন ভগবানের শক্তিশালী অবতার। শুকদেব গোস্বামী ব্রহ্মর্ষি ছিলেন না, রাজর্ষি অথবা দেবর্ষি ছিলেন না, অথবা তিনি নারদ, ব্যাস বা পরশুরামের মতো ভগবানের অবতারও ছিলেন না, তথাপি তিনি সেখানে সর্বোচ্চ সম্মান লাভ করেছিলেন। তা থেকে বোঝা যায় যে, এই জগতে ভগবানের ভক্ত ভগবানের থেকেও অধিক সম্মান প্রাপ্ত হন। তাই শুকদেব গোস্বামীর মতো ভক্তের মহিমা কখনও কম করে দেখা উচিত নয়।

শ্লোক ৩১

প্রশান্তমাসীনমকুণ্ঠমেধসং
মুনিং নৃপো ভাগবতোঽভ্যুপেত্য ।
প্রণম্য মূর্ধ্নাবহিতঃ কৃতাঞ্জলি-
র্নত্বা গিরা সূনৃতয়ান্বপৃচ্ছৎ ॥ ৩১॥

প্রশান্তম্—পূর্ণরূপে শান্ত; **আসীনম্**—অভীষ্ট; **অকুণ্ঠ**—নিঃসংকোচে; **মেধসম্**—পর্যাপ্ত বুদ্ধিসম্পন্ন; **মুনিম্**—ঋষিদের; **নৃপঃ**—রাজা (মহারাজ পরীক্ষিৎ); **ভাগবতঃ**—মহান্ ভক্ত; **অভ্যুপেত্য**—তাঁর কাছে এসে; **প্রণম্য**—প্রণাম করে; **মূর্ধ্না**—তাঁর মস্তক দ্বারা; **অবহিতঃ**—যথার্থভাবে; **কৃতাঞ্জলিঃ**—হাত জোড় করে; **নত্বা**—বিনয়পূর্বক; **গিরা**—বাক্যের দ্বারা; **সুনৃতয়া**—মধুর বচনে; **অন্বপৃচ্ছৎ**—প্রশ্ন করেছিলেন।

অনুবাদ

তখন মুনিবর শুকদেব গোস্বামী প্রশান্ত চিত্তে উপবেশন করলেন। তাঁর বুদ্ধি ছিল অত্যন্ত তীক্ষ্ণ এবং তিনি নিঃসংকোচে সমস্ত প্রশ্নের উত্তর দিতে প্রস্তুত ছিলেন। পরম ভাগবত মহারাজ পরীক্ষিৎ তখন তাঁর কাছে এসে তাঁকে অবনতমস্তকে প্রণতি নিবেদন করলেন, এবং হাত জোড় করে সুমধুর বচনে তাঁকে প্রশ্ন করতে লাগলেন।

তাৎপর্য

শ্রীগুরুদেবের কাছে প্রশ্ন করার যে মুদ্রা পরীক্ষিৎ মহারাজ এখানে অবলম্বন করেছেন, তা যথাযথভাবে শাস্ত্রবিহিত। শাস্ত্রে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে, দিব্য জ্ঞান লাভের জন্য অত্যন্ত বিনীতভাবে সদ্গুরুর সমীপবর্তী হতে হয়। এখানে পরীক্ষিৎ মহারাজ মৃত্যুবরণ করার জন্য প্রস্তুত হচ্ছিলেন এবং ভগবদ্ধামে ফিরে যাওয়ার পন্থা সম্বন্ধে শিক্ষা লাভ করার জন্য তাঁর কেবল সাত দিন সময় ছিল। এই প্রকার জরুরী অবস্থায় সদ্গুরুর শরণাগত হওয়া অবশ্য কর্তব্য। জীবনের সমস্যাগুলির সমাধান করার উদ্দেশ্য ব্যতীত সদ্গুরুর সমীপবর্তী হওয়ার কোন প্রয়োজন থাকে না। সদ্গুরুর কাছে কিভাবে প্রশ্ন করতে হয় তা না জানলে সদ্গুরুর সঙ্গে সাক্ষাৎ করার কোন আবশ্যকতা নেই। সদ্গুরুর সমস্ত গুণাবলী শুকদেব গোস্বামীর মধ্যে সম্পূর্ণরূপে বিরাজিত ছিল। গুরু এবং শিষ্য উভয়েই, যথা শ্রীশুকদেব গোস্বামী এবং মহারাজ পরীক্ষিৎ *শ্রীমদ্ভাগবতের* মাধ্যমে সিদ্ধিপ্রাপ্ত হয়েছিলেন। শুকদেব গোস্বামী *শ্রীমদ্ভাগবত* শিক্ষা লাভ করেছিলেন তাঁর পিতা ব্যাসদেবের কাছ থেকে, কিন্তু তা আবৃত্তি করার কোন সুযোগ তিনি পূর্বে পাননি। মহারাজ পরীক্ষিতের কাছে তিনি*শ্রীমদ্ভাগবত* আবৃত্তি করেছিলেন এবং নিঃসংকোচে তাঁর প্রশ্নের উত্তর দিয়েছিলেন এবং তার ফলে গুরু এবং শিষ্য উভয়েই পরম পদ প্রাপ্ত হয়েছিলেন।

শ্লোক ৩২

পরীক্ষিদুবাচ

অহো অদ্য বয়ং ব্রহ্মন্ সৎসেব্যাঃ ক্ষত্রবন্ধবঃ ।
কৃপয়াতিথিরূপেণ ভবদ্ভিস্তীর্থকাঃ কৃতাঃ ॥ ৩২ ॥

পরীক্ষিৎ উবাচ—ভাগ্যবান মহারাজ পরীক্ষিৎ বললেন; **অহো**—আহা; **অদ্য**—আজ; **বয়ম্**—আমাদের; **ব্রহ্মন্**—হে ব্রাহ্মণ; **সৎ-সেব্যাঃ**—ভক্তদের সেবা করার যোগ্য; **ক্ষত্র**—শাসকবর্গ; **বন্ধবঃ**—অযোগ্য; **কৃপয়া**—কৃপাপূর্বক; **অতিথি-রূপেণ**—অতিথিরূপে; **ভবদ্ভিঃ**—আপনার দ্বারা; **তীর্থকাঃ**—তীর্থ হওয়ার যোগ্য; **কৃতাঃ**—তিনি করেছেন।

অনুবাদ

ভাগ্যবান রাজা পরীক্ষিৎ বললেন—হে ব্রাহ্মণ! আপনি কৃপা করে আমার অতিথিরূপে উপস্থিত হয়ে আমাদের তীর্থের মতো পবিত্র করেছেন। আপনার কৃপায় আমরা অযোগ্য ক্ষত্রিয় হওয়া সত্ত্বেও ভক্তদের সেবা করার যোগ্যতা অর্জন করেছি।

তাৎপর্য

শুকদেব গোস্বামীর মতো সন্ত ভক্তরা সাধারণত জড় ভোগে আসক্ত বিষয়ীদের, বিশেষ করে ক্ষত্রিয় রাজাদের, কাছে যান না। মহারাজ প্রতাপরুদ্র ছিলেন শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর অনুগামী, কিন্তু তিনি যখন শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর দর্শনের অভিলাষ করেন, তখন শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তাঁকে প্রত্যাখ্যান করেছিলেন, কেননা তিনি ছিলেন এক রাজা। যে সমস্ত ভক্ত ভগবদ্ধামে ফিরে যেতে চান, তাঁদের দুটি বস্তু বিশেষভাবে বর্জন করতে হয়—বিষয়ীসঙ্গ এবং স্ত্রীসঙ্গ। তাই শুকদেব গোস্বামীর মতো ভক্তরা কখনও রাজা দর্শন করতে চান না। মহারাজ পরীক্ষিতের কথা অবশ্য আলাদা ছিল। রাজা হওয়া সত্ত্বেও তিনি ছিলেন এক মহান্ ভক্ত এবং তাই শুকদেব গোস্বামী তাঁর জীবনের অন্তিম সময়ে তাঁর কাছে এসেছিলেন। ভক্তোচিত বিনয়ের বশে মহারাজ পরীক্ষিৎ নিজেকে তাঁর মহান্ ক্ষত্রিয় পিতামহদের অযোগ্য বংশধর বলে মনে করেছিলেন, যদিও তিনি ছিলেন তাঁর পূর্বপুরুষদের মতোই মহান্। অযোগ্য ক্ষত্রিয় সন্তানদের বলা হয় ক্ষত্রবন্ধব, অর্থাৎ ক্ষত্রবন্ধু, ঠিক যেমন অযোগ্য ব্রাহ্মণ সন্তানদের বলা হয় দ্বিজবন্ধু বা ব্রহ্মবন্ধু ।

শুকদেব গোস্বামীর উপস্থিতিতে মহারাজ পরীক্ষিৎ বিশেষভাবে অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন। যিনি যে কোন স্থানকে পবিত্র তীর্থে পরিণত করতে পারেন, সেই মহাত্মার উপস্থিতিতে তিনি পবিত্র হয়েছিলেন বলে অনুভব করেছিলেন।

শ্লোক ৩৩

যেষাং সংস্মরণাৎ পুংসাং সদ্যঃ শুদ্ধ্যন্তি বৈ গৃহাঃ ।
কিং পুনর্দর্শনস্পর্শপাদশৌচাসনাদিভিঃ ॥ ৩৩ ॥

যেষাম্—যাঁর; **সংস্মরণাৎ**—স্মরণের ফলে; **পুংসাম্**—মানুষের; **সদ্যঃ**—তৎক্ষণাৎ; **শুদ্ধ্যন্তি**—শুদ্ধ হয়; **বৈ**—নিশ্চিতভাবে; **গৃহাঃ**—গৃহ; **কিম্**—কি; **পুনঃ**—তা হলে; **দর্শন**—সাক্ষাৎকার; **স্পর্শ**—স্পর্শ; **পাদ**—পা; **শৌচ**—ধোওয়া; **আসনাদিভিঃ**—আসন আদি প্রদান করা।

অনুবাদ

কেবলমাত্র আপনাকে স্মরণ করার ফলে আমাদের গৃহ তৎক্ষণাৎ পবিত্র হয়ে যায়, অতএব আপনাকে দর্শন, স্পর্শন, পাদ প্রক্ষালন এবং গৃহে আসনাদি দান করার ফলে যে কি লাভ হয়, তা কে বর্ণনা করতে পারে!

তাৎপর্য

পবিত্র তীর্থস্থানের মাহাত্ম্য মহান্ ঋষি ও মহাত্মাদের উপস্থিতির ফলেই হয়। বলা হয় যে, পাপীরা তীর্থস্থানে গিয়ে তাদের পাপ ছেড়ে আসে। কিন্তু মহাত্মাদের উপস্থিতির ফলে সেই সঞ্চিত পাপ শোধন হয়ে যায়। এইভাবে এখানে উপস্থিত ভক্ত এবং মহাত্মাদের কৃপায় তীর্থস্থানগুলি সর্বদাই পবিত্র থাকে। এই প্রকার মহাত্মারা যখন কোনও বিষয়ীর গৃহে আসেন, তখন অবশ্যই জড় ভোগে আসক্ত বিষয়ীরা তাদের পাপ থেকে মুক্ত হয়ে যায়। তাই পুণ্যবান মহাত্মাদের গৃহস্থদের গৃহে যাওয়ার কোনও ব্যক্তিগত স্বার্থ নেই, কিন্তু তাঁরা তাদের গৃহে যান কেবলমাত্র তাদের গৃহ পবিত্র করার জন্য, এবং তাই যখন এই প্রকার মহাত্মা এবং ঋষিরা তাঁদের গৃহে আসেন, তখন গৃহস্থদের গভীর কৃতজ্ঞতা অনুভব করা উচিত। কোন গৃহস্থ যদি এই পবিত্র আশ্রমের অবমাননা করে, তা হলে তাদের মহা অপরাধ হয়। তাই শাস্ত্রে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে, কোনও গৃহস্থ যদি মহাত্মাকে দর্শন করে প্রীতি নিবেদন না করে, তা হলে তাকে সেই মহা অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ সারাদিন উপবাস থাকতে হয়।

শ্লোক ৩৪

সান্নিধ্যাত্তে মহাযোগিন্ পাতকানি মহান্ত্যপি ।
সদ্যো নশ্যন্তি বৈ পুংসাং বিষ্ণোরিব সুরেতরাঃ ॥ ৩৪ ॥

সান্নিধ্যাৎ—উপস্থিতির ফলে; তে—আপনার; মহাযোগিন্—হে মহাযোগী; পাতকানি—পাপসমূহ; মহান্তি—ভেদ্য; অপি—সত্ত্বেও; সদ্যঃ—তৎক্ষণাৎ; নশ্যন্তি—বিনষ্ট হয়; বৈ—নিশ্চিতভাবে; পুংসাম্—মানুষের; বিষ্ণোঃ—ভগবানের উপস্থিতি; ইব—মতো; সুর-ইতরাঃ—দেবতাদের ছাড়া।

অনুবাদ

হে মহাযোগী! বিষ্ণুর সান্নিধ্য মাত্রই যেমন অসুরেরা বিনাশ প্রাপ্ত হয়, তেমনই আপনার দর্শন মাত্রই জীবের মহা পাতকসমূহ তৎক্ষণাৎ নাশ প্রাপ্ত হয়।

তাৎপর্য

দুই প্রকার মানুষ রয়েছে, যথা—নাস্তিক এবং ভগবদ্ভক্ত। ভগবদ্ভক্তেরা যেহেতু দিব্য গুণাবলী প্রকাশ করেন, তাই তাঁদের বলা হয় সুর, আর যারা ভগবানে বিশ্বাস করে না, তাদের বলা হয় অসুর। অসুরেরা ভগবানের উপস্থিতি সহ্য করতে পারে না। অসুরেরা সর্বদাই পরমেশ্বর ভগবানকে বিনাশ করার চেষ্টা করে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ভগবানের আবির্ভাব মাত্রই তাঁর অপ্রাকৃত নাম, রূপ, গুণ, লীলা পরিকর অথবা বৈশিষ্ট্যের দ্বারা অসুরেরা তৎক্ষণাৎ বিনাশ প্রাপ্ত হয়।

কথিত আছে যে, ভগবানের দিব্য নাম উচ্চারিত হলেই ভূতেরা আর সেখানে থাকতে পারে না। মহাত্মা এবং ভগবদ্ভক্তেরা হচ্ছেন ভগবানের পরিকর, এবং তাঁদের উপস্থিতির ফলেই তৎক্ষণাৎ ভূতসদৃশ সমস্ত পাপ নষ্ট হয়ে যায়। সমস্ত বৈদিক শাস্ত্রে সেকথা বলা হয়েছে। বেদে মানুষকে কেবল ভগবদ্ভক্তের সঙ্গ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যাতে ভূত, প্রেত এবং রাক্ষসেরা তাদের উপর অশুভ প্রভাব বিস্তার করতে না পারে।

শ্লোক ৩৫

অপি মে ভগবান্ প্রীতঃ কৃষ্ণঃ পাণ্ডুসুতপ্রিয়ঃ ।
পৈতৃষ্বসেয়প্রীত্যর্থং তদ্‌গোত্রস্যাত্তবান্ধবঃ ॥ ৩৫ ॥

অপি—নিশ্চিতভাবে; মে—আমাকে; ভগবান্—পরমেশ্বর ভগবান; প্রীতঃ—প্রসন্ন; কৃষ্ণঃ—ভগবান; পাণ্ডু-সুত—মহারাজ পাণ্ডুর পুত্র; প্রিয়ঃ—প্রিয়; পৈতৃ—পিতার মাধ্যমে সম্পর্কিত; স্বস্রেয়—ভগিনীর পুত্র; প্রীতি—সন্তোষ; অর্থম্—সম্পর্কে; তৎ—তাঁদের; গোত্রস্য—বংশধরের; আত্ত—স্বীকৃত; বান্ধবঃ—বন্ধুরূপে।

অনুবাদ

পাণ্ডবদের অত্যন্ত প্রিয় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ, তাঁর ভাইদের প্রীতি সম্পাদনের জন্য আমাকে তাঁর আত্মীয়রূপে স্বীকার করেছেন।

তাৎপর্য

ভগবানের বিশুদ্ধ এবং অনন্য ভক্ত বিষয়াসক্ত মানুষদের থেকেও অধিক দক্ষতার সঙ্গে তাঁদের পরিবারের সেবা করেন। সাধারণত মানুষেরা তাদের পরিবারের প্রতি অত্যন্ত আসক্ত, এবং মানব সমাজের সমস্ত অর্থনৈতিক প্রচেষ্টা পারিবারিক স্নেহের প্রভাবে পরিচালিত হয়। এই প্রকার মোহাচ্ছন্ন মানুষেরা জানে না ভগবদ্ভক্ত হওয়ার ফলে কিভাবে আরও ভালভাবে পরিবারের সেবা করা যায়। ভগবদ্ভক্তদের আত্মীয়-স্বজনদের ভগবান বিশেষভাবে রক্ষা করেন, যদিও সেই সমস্ত আত্মীয়-স্বজনেরা ভগবদ্ভক্ত নাও হতে পারে।

মহারাজ প্রহ্লাদ ছিলেন ভগবানের এক মহান্ ভক্ত, কিন্তু তাঁর পিতা হিরণ্যকশিপু ছিল এক মহানাস্তিক এবং ভগবানের শত্রু। কিন্তু তা সত্ত্বেও, কেবলমাত্র প্রহ্লাদ মহারাজের পিতা হওয়ার ফলে হিরণ্যকশিপু মুক্তি লাভ করেছিল।

ভগবান ভক্তদের প্রতি এতই কৃপাময় যে, তিনি তাদের পরিবারের সদস্যদের সর্বতোভাবে রক্ষা করেন, এমন কি ভগবদ্ভক্ত যদি ভগবানের সেবা করার জন্য তাঁর আত্মীয় স্বজনদের ছেড়ে চলেও যান, তবুও তাঁকে তাদের জন্য দুশ্চিন্তা করতে হয় না। মহারাজ যুধিষ্ঠির এবং তাঁর ভায়েরা ছিলেন শ্রীকৃষ্ণের পিতৃস্বসা কুন্তীর পুত্র, এবং মহারাজ পরীক্ষিৎ স্বীকার করেছেন যে, মহান্ পাণ্ডবদের একমাত্র পৌত্র হওয়ার ফলে শ্রীকৃষ্ণ সর্বদা তাঁকে রক্ষা করেছেন।

শ্লোক ৩৬

অন্যথা তেঽব্যক্তগতের্দর্শনং নঃ কথং নৃণাম্ ।
নিতরাং ম্রিয়মাণানাং সংসিদ্ধস্য বণীয়সঃ ॥ ৩৬ ॥

অন্যথা—তা না হলে; তে—আপনার; অব্যক্ত-গতেঃ—তাঁর গতিবিধি অদৃশ্য; দর্শনম্—সাক্ষাৎকার; নঃ—আমাদের জন্য; কথম্—কিভাবে; নৃণাম্—মানুষদের; নিতরাম্—বিশেষভাবে; ম্রিয়মাণানাম্—মুমূর্ষুদের; সংসিদ্ধস্য—যিনি স্বয়ংসম্পূর্ণ; বণীয়সঃ—স্বেচ্ছায় যিনি আবির্ভূত হয়েছেন।

অনুবাদ

তা না হলে কি আমাদের মতো পাপিষ্ঠ মানুষ কখনও এই আসন্ন মৃত্যুকালে আপনার দর্শন লাভ করতে পারত? কেননা আপনার মতো মহাপুরুষেরা আপনাদের পরিচয় গোপন রেখে অদৃশ্যভাবে বিচরণ করেন।

তাৎপর্য

মহর্ষি শুকদেব গোস্বামী অবশ্যই পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে স্বেচ্ছায় ভগবানের মহান্ ভক্ত মহারাজ পরীক্ষিতের সামনে আবির্ভূত হয়েছিলেন তাঁকে *শ্রীমদ্ভাগবত* শিক্ষা দেওয়ার জন্য।

শ্রীগুরুদেব এবং পরমেশ্বর ভগবানের কৃপায় ভগবদ্ভক্তির বীজ লাভ করা যায়। শ্রীগুরুদেব হচ্ছেন জীবনের পরম সিদ্ধিলাভের পথে সাহায্যকারী ভগবানের মূর্ত প্রতিনিধি। ভগবানের অনুমোদন ব্যতীত কেউ কখনও গুরু হতে পারে না। শ্রীল শুকদেব গোস্বামী ছিলেন ভগবানের আদর্শ প্রতিনিধি, তাই তিনি ভগবান কর্তৃক অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন পরীক্ষিৎ মহারাজের কাছে এসে তাঁকে *শ্রীমদ্ভাগবত* শিক্ষা দান করার জন্য।

যদি কেউ ভগবান কর্তৃক প্রেরিত যথার্থ প্রতিনিধির কৃপা লাভ করেন, তবেই কেবল তিনি ভগবদ্ধামে ফিরে যাওয়ার চরম সিদ্ধি প্রাপ্ত হন। ভগবদ্ভক্তের সঙ্গে যখন ভগবানের যথার্থ প্রতিনিধির সাক্ষাৎকার হয়, তখন তিনি, তাঁর জড়দেহ ত্যাগের পর, ভগবদ্ধামে ফিরে যাওয়ার পূর্ণ প্রতিশ্রুতি প্রাপ্ত হন। অবশ্য তা সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করে থাকে ভক্তের ঐকান্তিকতার উপর।

ভগবান প্রতিটি জীবের হৃদয়ে বিরাজ করছেন, এবং তাই তিনি সকলের গতিবিধি সর্বতোভাবে অবগত। ভগবান যখন দেখেন যে, কোন জীব ভগবদ্ধামে ফিরে যাওয়ার জন্য অত্যন্ত উৎসুক হয়েছে, তিনি তৎক্ষণাৎ তাঁর কাছে তাঁর প্রতিনিধিকে পাঠিয়ে দেন। এইভাবে ঐকান্তিক ভক্ত ভগবদ্ধামে ফিরে যাওয়ার পূর্ণ প্রতিশ্রুতি প্রাপ্ত হন। অর্থাৎ সদ্গুরুর কৃপা এবং সহযোগিতা লাভ করার অর্থ হচ্ছে সরাসরিভাবে স্বয়ং ভগবানের সাহায্য প্রাপ্ত হওয়া।

শ্লোক ৩৭

অতঃ পৃচ্ছামি সংসিদ্ধিং যোগিনাং পরমং গুরুম্ ।
পুরুষস্যেহ যৎকার্যং ম্রিয়মাণস্য সর্বথা ॥ ৩৭ ॥

অতঃ—অতএব; **পৃচ্ছামি**—জিজ্ঞাসা করি; **সংসিদ্ধিম্**—সিদ্ধিলাভের উপায়; **যোগিনাম্**—মহাত্মাদের; **পরমম্**—পরম; **গুরুম্**—শ্রীগুরুদেব; **পুরুষস্য**—মানুষের; **ইহ**—এই জীবনে; **যৎ**—যা কিছু; **কার্যম্**—কর্তব্য; **ম্রিয়মাণস্য**—মরণোন্মুখ; **সর্বথা**—সর্বতোভাবে।

অনুবাদ

আপনি পরম যোগী এবং ভক্তদেরও গুরু। তাই আমি আপনার কাছে প্রার্থনা করছি আপনি সকলের, এবং বিশেষ করে যে-মানুষের মৃত্যু আসন্ন, তার সিদ্ধিলাভের পন্থা প্রদর্শন করুন।

তাৎপর্য

যতক্ষণ পর্যন্ত মানুষ জীবনের পরম উদ্দেশ্য সাধনের জন্য ব্যাকুল না হয়, ততক্ষণ পর্যন্ত সদ্‌গুরুর শরণাগত হওয়ার অবশ্যকতা থাকে না। গুরু কোনও গৃহস্থের অলঙ্কার নন। কেতাদুরস্ত জড়বাদীরা সাধারণত তথাকথিত গুরুদের কাছ থেকে দীক্ষা নেয়, কিন্তু তাতে তাদের কোন লাভ হয় না। এই সমস্ত ভণ্ড গুরুরা তাদের তথাকথিত শিষ্যদের তোষামোদ করে, এবং তার ফলে গুরু এবং শিষ্য উভয়েই নিঃসন্দেহে নরকগামী হয়।

মহারাজ পরীক্ষিৎ ছিলেন আদর্শ শিষ্য, কেননা তিনি সকলের জন্য, বিশেষ করে মরণাপন্ন মানুষদের কর্তব্য সম্বন্ধে পরিপ্রশ্ন করেছিলেন। মহারাজ পরীক্ষিতের প্রশ্নগুলির ভিত্তিতেই শ্রীমদ্ভাগবতের মূল সিদ্ধান্ত নির্ণীত হয়েছে। এখন দেখা যাক কি রকম বুদ্ধিমত্তা সহকারে মহান্ গুরু সেই প্রশ্নগুলির উত্তর দেন।

শ্লোক ৩৮

যচ্ছ্রোতব্যমথো জপ্যং যৎ কর্তব্যং নৃভিঃ প্রভো ।
স্মর্তব্যং ভজনীয়ং বা ব্রূহি যদ্বা বিপর্যয়ম্ ॥ ৩৮ ॥

যৎ—যা কিছু; **শ্রোতব্যম্**—শ্রবণযোগ্য; **অথো**—তার থেকে; **জপ্যম্**—কীর্তনীয়; **যৎ**—যা কিছু; **কর্তব্যম্**—কর্তব্য; **নৃভিঃ**—সাধারণ মানুষের দ্বারা; **প্রভো**—হে প্রভু;

স্মর্তব্যম্—স্মরণীয়; **ভজনীয়ম্**—পূজ্য; **বা**—অথবা; **ব্রূহি**—দয়া করে বিশ্লেষণ করুন; **যদ্বা**—যা হোক না কেন; **বিপর্যয়ম্**—সিদ্ধান্তের বিপরীত।

অনুবাদ

দয়া করে আমাকে বলুন মানুষের কি শ্রবণ করা উচিত, কীর্তন করা উচিত, স্মরণ করা উচিত, এবং ভজন করা উচিত, আর তার যা করা উচিত নয়, তাও আমাকে কৃপা করে বলুন।

শ্লোক ৩৯

নূনং ভগবতো ব্রহ্মন্ গৃহেষু গৃহমেধিনাম্ ।
ন লক্ষ্যতে হ্যবস্থানমপি গোদোহনং ক্বচিৎ ॥ ৩৯ ॥

নূনম্—যেহেতু; **ভগবতঃ**—অত্যন্ত শক্তিমান আপনার; **ব্রহ্মন্**—হে ব্রাহ্মণ; **গৃহেষু**—গৃহে; **গৃহ-মেধিনাম্**—গৃহস্থদের; **ন**—না; **লক্ষ্যতে**—দেখা যায়; **হি**—নিশ্চিতভাবে; **অবস্থানম্**—অবস্থিত; **অপি**—এমন কি; **গো-দোহনম্**—গো-দোহন; **ক্বচিৎ**—কদাপি।

অনুবাদ

হে মহা তেজস্বী ব্রাহ্মণ! আপনার দর্শন অত্যন্ত দুর্লভ। শোনা যায় যে, যে সময়ের মধ্যে একটি গাভী দোহন করা যায়, আপনি ততক্ষণও কোনও গৃহস্থের গৃহে অবস্থান করেন না।

তাৎপর্য

সন্ন্যাস আশ্রমে অবস্থিত ঋষি এবং মহাত্মারা খুব সকালে গৃহস্থরা যখন গাভী দোহন করেন, তখন তাঁদের গৃহে যান এবং তাঁদের দেহ ধারণের জন্য একটু দুধ ভিক্ষা করেন। আধসের খাঁটি দুধ একজন পরিণত বয়স্ক মানুষের দেহ ধারণের সমস্ত উপাদানগুলি সরবরাহ করে, এবং তাই সাধু এবং ঋষিরা তাঁদের জীবন ধারণের জন্য কেবল দুধ গ্রহণ করেন।

একজন দরিদ্র গৃহস্থও কমপক্ষে দশটি গাভী পালন করেন, এবং তাঁদের প্রতিটি গাভীই বার থেকে কুড়ি সের দুধ দেয় এবং তাই তাঁরা কেউই সাধুদের জন্য কয়েক সের দুধ দিতে ইতস্তত করেন না।

গৃহস্থদের কর্তব্য হচ্ছে শিশুদের মতো সাধু-সন্তদের ভরণপোষণ করা। তাই শ্রীল শুকদেব গোস্বামীর মতো মহাত্মারা প্রভাতকালে গৃহস্থদের গৃহে পাঁচ মিনিটের বেশিও অবস্থান করেন না। অর্থাৎ, এই প্রকার মহাত্মাদের গৃহস্থদের গৃহে সচরাচর দেখতে পাওয়া যায় না, এবং তাই মহারাজ পরীক্ষিৎ তাঁর কাছে প্রার্থনা করেছিলেন যত শীঘ্র সম্ভব তিনি যেন তাঁকে উপদেশ দান করেন।

গৃহস্থদেরও যথেষ্ট বুদ্ধিমান হওয়া উচিত যাতে তাঁরা অতিথিরূপে আগত মহাত্মাদের কাছ থেকে পারমার্থিক উপদেশ গ্রহণ করেন। বাজারে যা পাওয়া যায় সেই রকম কোন বস্তু মূর্খের মতো সাধুর কাছে প্রার্থনা না করাই গৃহস্থদের উচিত। এইভাবে সাধু এবং গৃহস্থদের মধ্যে পারস্পরিক আদান প্রদান হওয়া উচিত।

শ্লোক ৪০

সূত উবাচ

এবমাভাষিতঃ পৃষ্টঃ স রাজ্ঞা শ্লক্ষ্ণয়া গিরা ।
প্রত্যভাষত ধর্মজ্ঞো ভগবান্ বাদরায়ণিঃ ॥ ৪০ ॥

সূতঃ উবাচ—শ্রীসূত গোস্বামী বললেন; **এবম্**—এইভাবে; **আভাষিতঃ**—বলা হলে; **পৃষ্টঃ**—এবং প্রশ্ন করলে; **স**—তিনি; **রাজ্ঞা**—রাজার দ্বারা; **শ্লক্ষ্ণয়া**—মধুর; **গিরা**—বাক্যের দ্বারা; **প্রত্যভাষত**—উত্তর দিতে শুরু করলেন; **ধর্মজ্ঞঃ**—ধর্ম সম্বন্ধে তিনি অবগত; **ভগবান্**—তেজস্বী পুরুষ; **বাদরায়ণিঃ**—ব্যাসদেবের পুত্র।

অনুবাদ

শ্রীসূত গোস্বামী বললেন, রাজা পরীক্ষিৎ মধুর সম্ভাষণে এইভাবে প্রশ্ন করার পর, সেই ধর্মজ্ঞ মহাপুরুষ, ভগবান ব্যাসনন্দন শুকদেব উত্তর দিতে শুরু করলেন।

ইতি "শুকদেব গোস্বামীর আবির্ভাব" নামক শ্রীমদ্ভাগবতের প্রথম স্কন্ধের ঊনবিংশতি অধ্যায়ের শ্রীভক্তিবেদান্ত তাৎপর্য।

প্রথম স্কন্ধ সমাপ্ত

উপমহাদেশে আরও বহু বিশিষ্ট গুরুত্বপূর্ণ জায়গাতেও অন্যান্য কেন্দ্র গড়ে তোলার পরিকল্পনা রয়েছে।

অবশ্য শ্রীল প্রভুপাদের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অবদান হল তাঁর গ্রন্থাবলী। দিব্য জ্ঞান সমন্বিত এই গ্রন্থাবলীর প্রামাণিকতা, গভীরতা এবং সরলতার জন্য বিদ্বৎ-সমাজে এগুলি উচ্চ মর্যাদা অর্জন করেছে এবং বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রামাণ্য পাঠ্যপুস্তক রূপে অনুমোদিত হয়েছে। পঞ্চাশটিরও বেশি ভাষায় তাঁর রচনা অনূদিত হয়েছে। শ্রীল প্রভুপাদের গ্রন্থাবলী প্রকাশনার জন্য ১৯৭২ সালে প্রতিষ্ঠিত 'ভক্তিবেদান্ত বুক ট্রাস্ট' আজ ভারতীয় ধর্ম ও দর্শন ক্ষেত্রে বৃহত্তম গ্রন্থ-প্রকাশক প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছে।

কেবলমাত্র বারো বছরের মধ্যে, এত বয়স হয়ে যাওয়া সত্ত্বেও শ্রীল প্রভুপাদ পৃথিবীর ছটি মহাদেশেরই বিভিন্ন স্থানে ভগবৎ-তত্ত্বজ্ঞান সমন্বিত প্রবচন-ভাষণ প্রদানের উদ্দেশ্যে চোদ্দবার পৃথিবী প্রদক্ষিণ করেছিলেন। এই ধরনের দুর্দান্ত কর্মসূচি থাকা সত্ত্বেও, শ্রীল প্রভুপাদ প্রবলভাবে রচনা-কার্য চালিয়ে গিয়েছেন। বৈদিক দর্শন, ধর্ম এবং সংস্কৃতির ক্ষেত্রে নিঃসন্দেহে এক প্রামাণ্য গ্রন্থাগার স্বরূপ হয়ে উঠেছে তাঁর অনবদ্য গ্রন্থাবলী।

পৃথিবীর মানুষ যেদিন বৈষয়িক জীবনের নিরর্থকতা উপলব্ধি করতে পেরে পারমার্থিক জীবনে ব্রতী হবে, সেদিন তারা সর্বান্তঃকরণে শ্রীল প্রভুপাদের অবদান উপলব্ধি করতে পারবে এবং শ্রদ্ধাবনত চিত্তে তাঁর চরণারবিন্দে প্রণতি জানাবে। ১৯৭৭ সালে শ্রীধাম বৃন্দাবনে তিনি অপ্রকট হলেও তাঁর অমৃতময় গ্রন্থাবলীর মধ্যে, ভগবানের বাণীর মধ্যে মূর্ত হয়ে আছেন তিনি এবং আমরা জানি, তাঁর শিক্ষায় অনুপ্রাণিত হয়ে যাঁরা ভগবানের কাছে ফিরে যাওয়ার প্রয়াসী, তাঁদের পথ দেখাবার জন্য তিনি চিরকাল তাঁদের হৃদয়ে বিরাজ করবেন।